উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল— দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

৯৩তম বর্ষ

(মাঘ ১৩৯৭ থেকে পৌষ ১৩৯৮ ; ইংরেজী ১৯৯১)

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : চল্লিশ টাকা □ সডাক : ছেচল্লিশ টাকা □ প্রতি সংখ্যা : পাঁচ টাকা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৯৩তম বর্ষ

(মাঘ ১৩৯৭ থেকে পৌষ ১৩৯৮)

হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী (কবিতা)... কাকে যে কাছে টানি ... ৬২২
ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী (প্রবন্ধ)... নির্বাসনা ... ৬৮৩

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ☐ জয়নগরের ইতিহাস—৬০১ ; স্বামী সোমেশ্বরানন্দ ☐ ভ্রমণকাহিনী যখন কাব্য হয়ে ওঠে—১৭২ ; হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য ☐ ভারতীয় মনোবিদ্যার মৌলিকতা—২৮৫ ; হোসেনুর রহমান ☐ ম্যাকলাউড ঃ সাধনা, স্বাধীনতা, সংস্কৃতি—৫৪৯

পত্র-পত্রিকা পরিচয় ঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ☐ একটি আলাদা ধরনের কাগজ—৪৪২ ; দিলীপকুমার দত্ত ☐ বিদায় 'আলেখ্য' ! 'পুনরাগমনায় চ'—৪৪০ ; বিনয় চট্টোপাধ্যায় ☐ উল্লেখযোগ্য মুখপত্র—৪৪৩

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ঃ ৩৭, ৫৬, ১১৫, ১৭৩, ২৩৫, ২৮৭, ৩৩৭, ৩৯২, ৪৪৪, ৫৫২, ৬০২, ৬৫৫, ৬৯১, স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি—৬১২

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ঃ ৫৮, ১১৭, ১৭৬, ২৩৭, ২৮৯, ৩৩৯, ৩৯৩, ৪৪৫, ৫৫৩, ৬০৪, ৬৫৭, ৭০১

বিবিধ সংবাদ ঃ ৫৯, ১১৮, ১৭৭, ২৩৮, ২৯০, ৩৪০, ৩৯৪, ৪৪৬, ৫৫৪, ৬০৫, ৬৫৮, ৭০২, মরণজয়ী যে জীবন (ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি)—২৯৬

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ঃ ভারতের বিজ্ঞানগবেষণার ভিতরে পর্যন্ত পচন ধরেছে—৬০ ; শিশুদের কি হাঁপানি রোগ বেড়েছে—১২০ ; বাদাম খেয়ে অ্যানাফাইলেক্সিস (সাংঘাতিক) ধরনের অ্যালার্জি—১২০ ; প্রতিরাত্রে নাসিকাগর্জন হৃদ্‌রোগ ঘটাতে পারে—১২০ ; টিকটিকিজাতীয় প্রাণীর লাঙ্গুলবর্জন—১৭৯ ; প্রসঙ্গ ভিটামিন—২৪০ ; ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসাবে পেট্রোলের বিকল্প—২৯২ ; এইড্‌স রুখতে সূর্যের আলো—২৯২ ; চুল দেখে রোগ নির্ণয়—২৯২ ; চিনি না দিয়ে মিষ্টি করার রাসায়নিক দ্রব্য—৩৪৩ ; পুষ্টির স্বল্পতা ও বুদ্ধিমত্তা—৩৯৬ ; পরোক্ষ ধূমপানে কি হৃৎপিণ্ডের অসুখ হয় ?—৪৩৭ ; সুরক্ষিত বসন্তরোগের ভাইরাসকে নষ্ট করতে হবে—৫৫৬ ; হাঁপানির ওষুধগুলি রোগীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে না তো ?—৬০৮ ; খাদ্য-অসহিষ্ণুতা—৬৫৯ ; জাপানে চাকুরে মেয়েদের সমস্যা—৭০৪

চিত্রসূচী ঃ নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ির মানচিত্র—২৪৯, বাগানবাড়ির (১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ) রেখাচিত্র—৩৫৪, বাগানবাড়ির (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ) রেখাচিত্র—৪০৪, বাগানবাড়ির (১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ) রেখাচিত্র—৫৭০ ; মহিষাসুরমর্দিনী—৪৪৮ (ক) ; মীরাটে ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের পরিবার—৫৩২ (ক), ৫৩২ (খ) ; ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্লেগের সময় স্বামীজীর নির্দেশে বিতরিত হ্যান্ডবিল (ফটোকপি)—৬১৬

প্রচ্ছদ-পরিচিতি ঃ ৮, ৬৭, ১৪৭, ১৯১, ২৫৭, ৩২৬, ৩৭৩, ৪০৮, ৬৩৬, ৬৬৮

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত।

31 JAN 1991

সূচীপত্র

উদ্বোধন ৯৩তম বর্ষ মাঘ ১৩৯৭

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র

বিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

৯৩তম বর্ষ উদ্বোধন

সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় যে, গত কয়েকমাস যাবৎ গ্রাহকদের অনেকে **সাধারণ ডাকে, এমনকি রেজেস্ট্রি ডাকেও,** উদ্বোধন হয় দেরিতে পাচ্ছেন অথবা **একেবারেই পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ** করছেন। সহৃদয় গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানাই যে, **এর জন্য ডাকবিভাগই সম্পূর্ণ দায়ী। এবিষয়ে** স্থানীয় ডাকঘর এবং ঊর্ধ্বতম ডাকবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণও করা হচ্ছে। **গ্রাহকদের অনেকেই** ভাবছেন হয়তো **উদ্বোধন-এর পক্ষ থেকে ঠিকমতো পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয় না।** কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। **স্থানীয় ডাকঘরের সঙ্গে ব্যবস্থানুযায়ী আমরা প্রতি** ইংরেজী মাসের ২৩ অথবা ২৪ তারিখে নিয়মিত পত্রিকা ডাকে দিয়ে থাকি।

মাঘ ১৩৯৭—পৌষ ১৩৯৮

জানুয়ারি ১৯৯১—ডিসেম্বর ১৯৯১

☐ আগামী মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে **আগামী** বর্ষের (৯৩তম বর্ষ : ১৩৯৭-১৩৯৮/১৯৯১) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে আপনাদের গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিতে অনুরোধ করছি।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) সংগ্রহ : **চল্লিশ টাকা** ☐ **ডাকযোগে** (By Post) **সংগ্রহ : ছেচল্লিশ টাকা** ☐ **বাংলাদেশ— আশি টাকা** ☐ বিদেশের অন্যত্র— **একশো আশি টাকা (সমুদ্র-ডাক),** তিনশো পঞ্চাশ টাকা (বিমান-ডাক)।

আজীবন গ্রাহকমূল্য : **এক হাজার টাকা**

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ **বৎসরান্তে নবীকরণ-সাপেক্ষ**) কিস্তিতেও (অনূর্ধ্ব বারোটি) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে **প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা** দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা (প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা) জমা দিতে হবে।

☐ ভারতের বাইরে (বাংলাদেশ ছাড়া) **থেকে আজীবন গ্রাহক হলে সমুদ্র-ডাক ও বিমান-ডাক সহ যথাক্রমে ৩৫০ ও ৬০০ ডলার (আমেরিকান)** দিতে হবে। বাংলাদেশ—২০০০ টাকা (ভারতীয়)।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta", এই নামে পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না।

☐ উদ্বোধন-প্রকাশিত গ্রন্থে গ্রাহকরা ১০% এবং আজীবন গ্রাহকরা ২০% কমিশন পাবেন।

☐ **কার্যালয় খোলা থাকে :** বেলা ৯·৩০—৫·৩০ ; শনিবার বেলা ১·৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

☐ **ঠিকানা :** উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ ; টেলিফোন : ৫৪-২২৪৮

☐ **কার্যালয় ভিন্ন গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র :** এ সম্পর্কে বর্তমান সংখ্যায় সূচীপত্রের বাঁ-দিকের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি—'উদ্বোধন'-এর **পাঠক-সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিবেদন** দ্রষ্টব্য।

☐ রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র (মাসিক) **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তেই হবে।

মাঘ, ১৩৯৭ | জানুয়ারি, ১৯৯১ | ৯৩তম বর্ষ—১ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ! স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। ...ঈশ্বরে এবং নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ।

আমরণ কাজ করে যাও—আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি, আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ

॥ ১ ॥

'উদ্বোধন' ৯৩তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে (১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে) 'উদ্বোধন'-এর ৯০তম বর্ষে পদার্পণকে ভারতীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিহ্নিত করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিলঃ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে একমাত্র 'উদ্বোধন'-ই নিরবচ্ছিন্নভাবে নব্বই বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইবার বিরল ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অব্যাহতভাবে প্রকাশই নহে, এই দীর্ঘ সময়ে 'উদ্বোধন' তাহার ঐতিহ্যকে গৌরবের সহিত অক্ষুণ্ণ রাখিতেও সমর্থ হইয়াছে। অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখা এবং অস্তিত্বকে আপন শক্তি ও যোগ্যতায় সর্বসময় সকলকে অনুভব করানো—এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। 'উদ্বোধন' তাহার দীর্ঘ নব্বইবর্ষ-ব্যাপী প্রকাশকালে তাহার অস্তিত্বকে বাংলার কৃষ্টিক্ষেত্রে স্বমহিমায় অনুভূতও করাইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই একটি দুর্লভ গৌরব।

'উদ্বোধন'-এর শতাব্দী-পূর্তির দিকে আরও একধাপ অগ্রসর হইবার লগ্নে কথাগুলি আবার স্মরণ করিতেছি। স্মরণ করিতেছি সেই সময় কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রের এই মন্তব্যটিও :

"নব্বই বৎসর বয়সেও 'উদ্বোধন' যৌবনশক্তিতে পূর্ণ।" মন্তব্যটি এক অর্থে যথার্থ, কিন্তু আর এক অর্থে নহে। 'উদ্বোধন' তাহার দীর্ঘ নব্বই বৎসরের যাত্রাপথে যে প্রভূত শক্তির স্বাক্ষর রাখিয়াছে, সেকথা অনস্বীকার্য। কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর ক্ষেত্রে সেই শক্তিকে যৌবনোচিত শক্তি বলিলে ঠিক হইবে না। কারণ, যৌবন হইল জীবনের পূর্ণিমা। 'পূর্ণিমা' বলিলেই স্বীকার করিতে হইবে পূর্ণিমার পরবর্তী ক্রমাবনতিকেও অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে শুরু করিয়া অবশেষে অমাবস্যাকেও। অর্থাৎ ক্রমেই চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস বা অবক্ষয় এবং পরিশেষে ঔজ্জ্বল্যের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। ঠিক সেইরূপ, যৌবনের পরেই শুরু হয় জীবনের অবক্ষয়—প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এবং ক্রমে উপনীত হয় অন্তিম লগ্ন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রচারিত ভাবাদর্শ সার্ধ-সহস্র বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া মানুষকে অনুপ্রাণিত করিবে। 'উদ্বোধন' স্বামী বিবেকানন্দের মানস সন্তান, তাঁহার ভাব ও আদর্শের বাহক। যতদিন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ থাকিবে, আমরা বিশ্বাস করি, ততদিন তাঁহার প্রবর্তিত 'উদ্বোধন'ও থাকিবে। সুতরাং 'উদ্বোধন'-কে অন্ততঃপক্ষে আরও সার্ধ-সহস্র বৎসরের পথ পরিব্রাজন করিতে হইবে। যত দিন যাইবে ততই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ মানুষের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় হইবে। অতএব 'উদ্বোধন'-এর ভবিষ্যৎও ক্রমেই অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল হইবে। সেই বিচারে শত বৎসরের প্রান্তে উপনীত 'উদ্বোধন' সম্পর্কে বলা উচিত যে, তাহার এখন শৈশব-অবস্থা চলিতেছে। 'উদ্বোধন' এর এখন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, [শুক্লপক্ষের] "দ্বিতীয়ার চাঁদ"-এর অবস্থা। গতিতে, গৌরবে এবং মহিমায় ধীরে, কিন্তু 'উদ্বোধন' দৃঢ় ও নিশ্চিত পদ-ক্ষেপে আগাইয়া চলিয়াছে তাহার পরিপূর্ণতার পথে।

'উদ্বোধন' স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-শরীর। সে যেন একই সঙ্গে দুইটি ভূমিকা পালন করিবার চেষ্টা করিতেছে। একটি হইল মহাদেবের, অপরটি ভগীরথের। গঙ্গা যখন পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন তখন তাঁহার দুর্বার স্রোতোধারাকে ধারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কথিত আছে, ইন্দ্রের ঐরাবতও তাঁহার বেগে তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়া গিয়াছিল। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব গঙ্গাকে আপন জটামধ্যে ধারণ করেন। পরে ভগীরথের প্রার্থনায় মহাদেব গঙ্গাকে জটা হইতে উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং ভগীরথ লোককল্যাণের জন্য গঙ্গাকে পৃথিবীতে বহন করিয়া আনেন। স্বামী বিবেকানন্দের লোকপাবন ভাবাদর্শকে 'উদ্বোধন' যেন মহাদেবের মতো ধারণ করিতেছে এবং ভগীরথের মতো ঐ ভাবতরঙ্গকে সে মানুষের কল্যাণের জন্য বহন করিয়া চলিয়াছে। শুধু ভাব কেন, আক্ষরিক-অর্থেই স্বামীজীর বহু রচনা (মূল এবং অনুবাদ) 'উদ্বোধন' তাহার জন্মলগ্ন হইতেই বহন করিতেছে।

'উদ্বোধন'-এর ঐতিহ্য সুমহান। সেই ঐতিহ্যের সূচনা করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং এবং 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তাহার পর স্বামীজীর অপর গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব লইয়াছেন এবং 'উদ্বোধন'-এর সুমহান ঐতিহ্যকে সযত্নে লালন ও পোষণ করিয়া-ছেন। আজ 'উদ্বোধন' যেখানে দাঁড়াইয়াছে তাহা তাঁহাদেরই সাধনার ফলশ্রুতি। তাহার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হইয়াছে 'উদ্বোধন'-এর সহিত সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী, অ-সন্ন্যাসী কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সেবা এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ী ও পাঠকবর্গের শুভেচ্ছা ও প্রেরণা। 'উদ্বোধন'-এর নববর্ষ-প্রবেশের শুভলগ্নে আমরা ইহা স্মরণ করিতেছি। বর্তমানে আমরা যাহারা 'উদ্বোধন'-এর সহিত সংযুক্ত রহিয়াছি তাহাদের পক্ষে প্রতিটি নূতন বর্ষই তাই পরীক্ষার। কারণ, 'উদ্বোধন' তো নিছক পত্রিকামাত্র নহে, উহা স্বামী বিবেকা-নন্দের ভাব-প্রতিমা, তাঁহার বাণী-শরীর। সুতরাং 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের মহান ভাবাদর্শ ও চিন্তা কতখানি মানুষের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারিতেছি তাহা যেমন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাশা, তেমনই প্রত্যাশা বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগীদেরও। আমরা সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করিবার যোগ্য কিনা তাহারই পরীক্ষা আমাদের। সই পরীক্ষায় আমরা যেমন স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, তেমনই আমাদের কাম্য 'উদ্বোধন'-এর শুভানুধ্যায়ী এবং পাঠকবর্গের শুভেচ্ছাও।

॥ ২ ॥

আমরা বলিয়াছি, 'উদ্বোধন' স্বামী বিবেকানন্দের ভাব-প্রতিমা, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-শরীর। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী কি? যদি এক কথায় স্বামীজীর ভাব ও বাণীকে উপস্থাপন করা যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, স্বামীজীর ভাব ও বাণীর মূল-ধ্বনি হইল জাগরণ এবং উত্তরণ।

যখন ভারত ও পৃথিবী স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনে নাই, শিকাগো মহাসম্মেলনে যাত্রার বহু পূর্বেই একদিন অপরিচিত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বারাণসীতে প্রফেটের কণ্ঠে বলিয়াছিলেন: "আমি সমাজের উপর [একদিন] বোমার মতো ফাটিয়া পড়িব, আর সমাজ আমাকে কুকুরের ন্যায় অনুসরণ করিবে।" যাহার বা যাহাদের নিকট স্বামীজী এই কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন সে বা তাহারা ইহাকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল আমাদের জানা নাই, তবে অল্পদিনের মধ্যেই শুধু ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র জগৎ চমকিত বিস্ময়ে দেখিয়াছিল বিবেকানন্দ নামক এক মহাশক্তিধর অগ্নি-পুরুষ পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হইয়াছেন যিনি, অরবিন্দের ভাষায়, "সমগ্র পৃথিবীকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া উহাকে পাল্টাইয়া দিতে সমর্থ"। পাশ্চাত্যে তাঁহার নামে ধন্যধ্বনি উঠিল—পৃথিবীর বুকে বুদ্ধ অথবা যীশুর তুল্য একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং পৃথিবীকে তাঁহার কথা শুনিতে হইবে, তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হইবে। স্বামীজী বলিলেন: ভারতবর্ষের জন্য আমার একটি বাণী আছে—যেমন কৃষ্ণ, বুদ্ধ অথবা শঙ্করের ছিল। কিন্তু তাঁহাদের পরে যেহেতু আমি আসিয়াছি তাই পাশ্চাত্য তথা পৃথিবীর জন্যও আমার একটি বাণী রহিয়াছে।

কি সেই বাণী? এককথায় মনুষ্যত্ব, অন্যকথায় শক্তি অথবা বীর্য। প্রতি কথায় এবং আচরণে, নিঃশ্বাসে এবং প্রশ্বাসে, স্বপ্নে এবং জাগরণে মনুষ্যত্বকে বা শক্তিকে বা বীর্যকে প্রকাশ করিতে হইবে। স্বামীজী বলিতেন: "মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে।" বলিতেন: "বীরত্বের (manliness) উপরই সবকিছু নির্ভর করে। ইহাই আমার নূতন বাণী।" এই বাণী ভারতবর্ষের মানুষের জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন দেশান্তরের মানুষের জন্যও। স্বামীজীর ভাব ও বাণীকে আমরা দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করিতে পারি—একটি তাঁহার সমসাময়িক কালের এবং ভারতবর্ষের জন্য প্রযোজ্য, অপরটি সর্বকালের এবং সর্বদেশের জন্য প্রযোজ্য। আবার স্বামীজীর ভাব ও বাণী অন্যদিকে তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার্য: প্রথম—ব্যক্তি-স্তর, দ্বিতীয়—ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিত, এবং তৃতীয়—পাশ্চাত্য তথা বৃহত্তর মানবসমাজের বা সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিত। বর্তমানে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর নানা স্থানে স্বামীজীর ভাবাদর্শ ধীরে, কিন্তু দৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে প্রবেশ করিতেছে। আজ সর্বত্র ইহাই প্রবলভাবে অনুভূত হইতেছে যে, প্রায় একশত বৎসর আগে স্বামীজী ব্যক্তিবিশেষ অথবা ভারতবর্ষ অথবা পাশ্চাত্যকে লক্ষ্য করিয়া যে ভাবাদর্শ বা বাণীকে উপস্থাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রাসঙ্গিকতা আজ ব্যক্তিবিশেষ, ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বাস্তবিকই সর্বকালীন ও সর্বজনীন স্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। দেশ ও বিদেশের মনীষী ও চিন্তাবিদ্গণ বলিতেছেন যে, সমগ্র পৃথিবী আজ যে-সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছে এবং ভাবীকালেও পৃথিবী যে-সংকটের সম্মুখীন হইবে তাহা হইতে উত্তরণের পথ দেখাইয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। যদি পৃথিবীর বর্তমান কালের সঙ্কটসমূহ এবং ভাবী কালের সংকটসমূহকে আমরা সংহত করিয়া দেখিবার প্রয়াস করি তাহা হইলে দেখিব যে, সর্বকালে সকল সঙ্কটের মূলে হইল চরিত্রের সঙ্কট বা মনুষ্যত্বের সঙ্কট। যদি ভারতবর্ষের কথাই ধরি তাহা হইলে দেখিব, স্বামীজীর সমকালে ভারতবর্ষের যেসব সমস্যা ছিল আজও সেইসব সমস্যা রহিয়াছে—সেই নিষ্ক্রিয়তা, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জাতীয় ঐতিহ্যে অশ্রদ্ধা এবং পরানুকরণ—হয়তো উহাদের তীব্রতা এখন বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সকল সমস্যার মূলে কি চরিত্রের সঙ্কট বা মনুষ্যত্বের সঙ্কট বিষয়টিই ক্রিয়া-শীল নহে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান এবং জার্মানী এই দুইটি দেশ প্রায় ধ্বংসই হইয়া গিয়াছিল। আজ আমরা সবাই জানি যে, জাপান অথবা জার্মানী (সাম্প্রতিক সংযুক্তির আগে পশ্চিম জার্মানী)

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। কিভাবে উহারা ইহা সম্ভবপর করিয়াছে, স্বাধীনতার চার দশক পরেও যাহার ধারে-কাছেও ভারতবর্ষ পৌঁছাইতে পারে নাই? উত্তর ঐ একটিই—আমরা মানুষ হই নাই, মানুষের শক্তিকে জাগ্রত করিবার সামগ্রিক কোন প্রয়াস ও পরিকল্পনা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি নাই, আমাদের বীরত্বকে প্রস্ফুটিত করিতে পারি নাই, আমরা চরিত্র-শক্তিতে বলীয়ান হই নাই। অথচ স্বাধীনতা-পূর্বকালে স্বামীজীর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতির মধ্যে জাগরণের ঢেউ আসিয়াছিল।

স্বামীজী শৌর্যময় কণ্ঠে ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জাতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন মানুষের শক্তি প্রকাশ করিবার জন্য—যে-শক্তি প্রত্যেকের অন্তরেই নিহিত। তিনি বলিলেন: "আমাদের যাহা চাই তাহা হইল শক্তি। অন্যান্য জাতির চাহিতে ভারতবাসীর—আমাদের বেশি দরকার বলিষ্ঠ তেজস্বী চিন্তার। সর্ববিষয়ে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মের অনুশীলন আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের ভিতরে রহস্যময় বস্তু ঠাসিয়া পুরা হইয়াছে। তাহার ফলে আমাদের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক পরিপাকশক্তি এমনভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে যাহা প্রায় চিকিৎসার অসাধ্য এবং জাতিটিকে অকর্মণ্য মানসিক জড়তার এমন এক নিম্নস্তরে টানিয়া নামানো হইয়াছে যাহার অভিজ্ঞতা ইহার আগে বা পরে অন্য কোন সভ্যসমাজকে লাভ করিতে হয় নাই। একটি বলশালী জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার পিছনে তরতাজা ও বলিষ্ঠ চিন্তা থাকা দরকার। [তাহা] রহিয়াছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত—উপনিষদের মধ্যে, যাহা পৃথিবীকে শক্তিশালী করিতে পারে।"

শক্তিলাভ করিলে শ্রেয়োলাভ হইবে; কিন্তু শক্তিলাভের জন্য কোন্ উৎসের দিকে তাকাইব? স্বামীজী বলিলেন—উপনিষদের দিকে। উপনিষদ্ হইল ভারত-সংস্কৃতির ভিত্তি। কিন্তু এতদিন 'উপনিষদ্' বলিতে আমরা বুঝিয়াছি 'রহস্যবিদ্যা'—সাধারণের বুদ্ধি ও ধারণার অতীত অতীন্দ্রিয়বাদ। স্বামীজীই প্রথম ভারতবর্ষের মানুষের নিকট উপনিষদ্‌কে নূতন রূপে তুলিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন, রহস্যবিদ্যা বা অতীন্দ্রিয়বাদ প্রচার নহে, উপনিষদের লক্ষ্য হইল মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ। উপনিষদের প্রধান বাণীই হইল: "উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!—উঠ! জাগ!" স্বামীজী বলিলেন: উপনিষদের মূলকথা হইল 'অভীঃ'—অর্থাৎ তেজস্বী হও, নির্ভীক হও। সকল প্রতিবন্ধককে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়া তোমার অন্তর্নিহিত শক্তিকে তুমি প্রকাশ করিতে যত্নবান হও।

এই শক্তির মন্ত্র, এই জাগরণের বাণী, এই উদ্বোধনের আহ্বান জাতিকে দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারত আজ স্বাধীন, কিন্তু স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষের রূপায়ণ এখনও হয় নাই। কারণ ঐ আত্ম-উদ্বোধনের বাণীকে, ঐ শক্তির মন্ত্রকে, আমরা আবার ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র জগতের সমস্যার সমাধানের মন্ত্রও রহিয়াছে উপনিষদের বাণীতে স্বামীজী বলিয়াছেন। বলিয়াছেন: "উপনিষদ্ যে-শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। উহা সকল জাতির, সকল মতের, সকল পথের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতদের উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।...

"প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও—দুর্বলতা হইতে মুক্ত হও।"

উপনিষদ্ যেন ভারতবর্ষের শঙ্খ। সেই শঙ্খে ফুৎকার দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার মাধ্যমে সেই শঙ্খধ্বনি জগৎ শুনিয়াছে। সমুদ্রের গভীরে শঙ্খ থাকে। সমুদ্রের প্রতিটি ধ্বনি শঙ্খের ভিতরে ও বাহিরে নানা রেখায় থাকে মুদ্রিত। শঙ্খের ধ্বনিতে তাই সমুদ্রের ধ্বনিই শোনা যায়। সেইরূপ ভারতবর্ষ-রূপ সমুদ্রের ধ্বনি শোনা যায় উপনিষদের মধ্যে। আর সেই উপনিষদের ধ্বনি ও স্পন্দন রেখায়িত হইয়া রহিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায়। উহাতেই নিহিত নূতন ভারতবর্ষের উত্থানের মন্ত্র, নূতন পৃথিবীর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি। নূতন ভারত গঠনের জন্য, নূতন পৃথিবীর আবির্ভাবকে সম্ভবায়িত করিবার জন্য উপনিষদের নবভাষ্যকার, উপনিষদ্-মূর্তি বিবেকানন্দ ভারত ও পৃথিবীকে পথ দেখাইয়াছেন। সেই পথই মুক্তির পথ, উত্তরণের পথ। অতএব এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ।

ভাষণ

বিবেকানন্দ এবং নতুন ভারত

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী এসেছিলেন জনগণের শারীরিক মানসিক ও আত্মিক—সামাজিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক—অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য। এবং এই জনগণ সমগ্র বিশ্বের—দেশগত বা জাতিগত-বর্ণগত-শ্রেণীগত কোন প্রভেদ তাঁরা রাখেননি। নবভাবে অনুপ্রাণিত এক নতুন পৃথিবীর আভাস তাঁরা দিয়েছেন।

আজ অবশ্য সমগ্র বিশ্বের কথা নয়, কেবলমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অপর বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারতবর্ষের কথাই আমি তুলে ধরতে চাই। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ভাবাদর্শকে অবলম্বন করে যে নতুন ভারতবর্ষের রূপ স্বামীজী দেখেছেন এবং কিভাবে সে-রূপকে বাস্তবায়িত করা যায় তার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন ভাষণে, অজস্র পত্রের মাধ্যমে এবং তাঁর অন্যান্য মৌলিক রচনার মধ্য দিয়ে তাই আজ সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

নতুন ভারত গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রকৃত শিক্ষার প্রসার। এই শিক্ষার প্রসার করতে হবে শতকরা ১০০ জনের মধ্যেই। শহরে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তা পৌঁছে দিতে হবে গ্রামে গঞ্জে—দেশের প্রত্যন্ত অংশে। তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষাকে তিনি বলতেন, **'Man-making education'** বা মানুষ গড়ার শিক্ষা। শিক্ষার একটি অর্থকরী দিক নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটিই প্রথম ও শেষ কথা নয়। শিক্ষার মূল কথা হলো, স্বামীজীর মতে, **"Stand on your own feet and be man"**—নিজের পায়ে দাঁড়াও এবং মানুষ হও। ঘণ্টানাড়া-পূজো-ভোগরাগ অনেক হয়েছে। ভক্তির প্রাবল্যে ক্রন্দন তো ভারতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেসবের থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন সত্যিকারের মানুষ তৈরি করা।—এই কথাই স্বামীজী আমাদের বারবার বোঝাতে চেয়েছেন।

'মানুষ' হওয়ার অর্থ কি? অর্থ হলো আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। উপনিষদের বাণীকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করে বারবার তিনি আমাদের সচেতন করেছেন—তোমরা 'অমৃতের পুত্র'। আত্ম-চৈতন্য তোমার প্রকৃত স্বরূপ। তুমি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। তুমি ক্ষুদ্র নও, তুচ্ছ নও—পরমাত্মাই তোমার স্বরূপ। শিক্ষার তথা জীবনের উদ্দেশ্য এই সত্যকে উপলব্ধি করা। স্বামীজীর আগে জগতের কোন ধর্মগুরু একই সঙ্গে শারীরিক মানসিক এবং আত্মিক—সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক—একই সঙ্গে এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা উচ্চারণ করেননি। স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য এইখানেই। শুধু ভাবের ঘোরে কান্না বা চোখ বন্ধ করে ধ্যান নয়, আত্মচৈতন্যের উপলব্ধি—যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপের নির্দেশ দেয়। এইজন্যই স্বদেশী যুগে গীতা এবং স্বামীজীর বাণী ও রচনা প্রেরণা জুগিয়েছে তৎকালীন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের। কিন্তু সেই উন্মাদনা ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে স্তিমিত হয়ে গেছে। পারস্পরিক নানাবিধ বিদ্বেষের মাধ্যমে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে যেন একটা নরকে পরিণত করেছি। সেইজন্যই আজ স্বামীজীর বই পড়া—তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাঁর আদর্শই পারে ভারতকে আবার স্বর্গে পরিণত করতে। এই আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই পারে শ্রেণীগত জাতিগত দেশগত বৈষম্য বিদ্বেষ দূর করে সুষ্ঠু সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে—প্রত্যেককে 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' উদ্বুদ্ধ করতে।

একদা ভগবান বুদ্ধ বোধিলাভ করে দীর্ঘ পথ পদব্রজে পরিক্রমা করে বারাণসীর নিকট সারনাথে যে ভাষণ দেন সেটিই বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি। সেই যে ধর্মচক্র প্রবর্তিত হলো সেই চাকা এগিয়েই চলছিল। কিন্তু চাকা মাঝে মাঝে বিকল হয়। ধর্মচক্রও তেমনি যখন কালক্রমে থেমে যায়—কোনও মহাপুরুষ এসে আবার তাকে ঠেলে দেন। এযুগে স্বামীজী যেন সেই বুদ্ধের ধর্মচক্রটিকেই আবার সচল করতে এসেছিলেন।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ করে ভারতের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারিকায় ধ্যাননেত্রে দেখলেন তাঁর ভারতের ভাবীরূপ এবং জানলেন তথাকথিত মানুষকে কি করে যথার্থ মানুষে পরিণত করতে হয়। তার পরে তা-ই হলো তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর মতে আদর্শ মানুষের থাকবে বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের মস্তিষ্ক। আবার নতুন ভারত গড়ে তোলায় অবদান থাকবে সকল প্রদেশের সকল জাতির—অধস্তন শ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত সকল লোকের। শত শত শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ ঘোর ঈর্ষাবিষে জর্জরিত। ভারতের সবথেকে বড় পাপ এটিই। এই ঈর্ষানল থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে এক নবীন ভারতীয় জাতি—যেখানে পারস্পরিক সৌহার্দ থাকবে, সহযোগিতা থাকবে। বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, সর্বোপরি ভারতের যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধর্ম—সর্বক্ষেত্রে ভারত আবার প্রাচীন যুগের মতো সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করবে। স্বামীজী বলতেন: "ভারতে যে-কোন সংস্কার বা উন্নতিরই চেষ্টা করা হোক—প্রথমে ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর। ...ভারতে ধর্মই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ... জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর।"

জাগতিক ক্ষেত্রে এটিই বিবেকানন্দের স্বপ্ন, যা সফল করার জন্য তিনি আমৃত্যু প্রয়াস করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র ধর্মই পারে মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটাতে। এই ধর্ম বেদান্তের ধর্ম। কিন্তু এ-বেদান্ত আরণ্যক বেদান্ত নয়। স্বামীজীর অসাধারণত্ব এখানেই যে তিনি সেই আরণ্যক বেদান্তকে দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে এসেছেন—যাকে বলা হয় 'সর্বাবয়ব বেদান্ত'—'কার্যকরী বেদান্ত'। এই বেদান্ত "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জগতের কল্যাণ—দুটি একই সঙ্গে করতে হবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের এটিই আদর্শ—এটিই স্বামীজীর নির্দেশ। এই আদর্শ গীতারই আদর্শ। কিন্তু আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম। স্বামীজী আমাদের আবার সচেতন করে দিলেন। আমরা গীতা মাথায় ছোঁয়াই—পূজা করি—নিয়মমাফিক পড়িও হয়তো, কিন্তু আত্মসাৎ করি না। ফলে গীতার অন্তর্নিহিত শক্তিও অনুভব করি না। স্বামীজী তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণ ও রচনার মধ্য দিয়ে সেই শক্তিকে চেয়েছেন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে। বৈদান্তিক দৃষ্টি-ভঙ্গি যে কি নিদারুণ বিপ্লব ঘটাতে পারে ব্যক্তিগত ও সমাজগত তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে তা তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। এসব ভাষণ আমরা পাই 'ভারতে বিবেকানন্দ'—এই সংকলন গ্রন্থে। 'আমার সমর-নীতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন কি ধরনের শিক্ষা তাঁর কাম্য। তিনি বলছেন: "এই শিক্ষালয়ে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারত-বহির্ভূত দেশে আমাদের শাস্ত্রনিহিত সত্যসমূহ প্রচার করবার কাজে শিক্ষালাভ করবে। ...ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যাকিছু আবশ্যক, তাও শেখানো হবে। ধর্মকে বাদ দিয়ে লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা কখনো সফল হয় না।"

বর্তমান ভারতের কোটি কোটি লোকের দুঃখ-দুর্দশায় অভিভূত বীর সন্ন্যাসী যে আমেরিকার ধর্মমহাসভায় নিঃসম্বল অবস্থায় গিয়েছিলেন তার মূলে ছিল ভারতের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম—তাঁর স্বদেশপ্রেম। তিনি বলেছেন: "দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চেপেছিল। ধর্মমহাসভা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমার নিজের রক্তমাংসস্বরূপ জনসাধারণের—আমার স্বদেশবাসীর জন্য কাজ করবার সুযোগের জন্যই আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম।" এবং এই স্বদেশের গঠনমূলক কাজের জন্য ভাবী সংস্কারক এবং ভাবী স্বদেশ হিতৈষিগণের উদ্দেশ্যে তিনি

বলেছেন ঃ "তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা বা আন্তরিকতা। হৃদয়দ্বার দিয়েই মহাশক্তির প্রেরণা আসে। দ্বিতীয়তঃ বৃথাবাক্যে সময় নষ্ট না করে কার্যকরী পথ অবলম্বন করা চাই। স্বদেশবাসীকে গালাগালি না দিয়ে যথার্থ সাহায্য করবার পথ আবিষ্কার করা চাই। তৃতীয়তঃ লক্ষ্য একবার স্থির হলে—সেই পথ থেকে কোন ক্রমেই বিচলিত হওয়া চলবে না।"—নতুন ভারত গঠনের জন্য আজকের যুবসমাজকে এই তিনটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। তিনি বলেছেন ঃ চাই ইচ্ছাশক্তি, চাই আত্মবিশ্বাস, চাই বীর্য—চাই হৃদয়বত্তা। নতুন ভারত গঠনের জন্য চাই বীর্যবান—সম্পূর্ণ অকপট তেজস্বী বিশ্বাসী কিছু যুবক।

স্বামীজীর বাণী ও রচনা আমার কাছে "literature of strength"—শক্তিদায়ী সাহিত্য। এই সাহিত্য যেন সর্বাবস্থায়ই শক্তি জোগায় —অভয় দান করে। সত্য সত্যই তো তাঁর জীবন ও বাণী কত বিশ্ববন্দিত ব্যক্তির অনুপ্রেরণার কারণ হয়েছে। আমাদের অতি প্রিয় সুভাষচন্দ্র বসুকে আমরা বলি নেতাজী। কিন্তু স্বামীজী হলেন নেতাজীর নেতাজী। কৈশোর থেকেই সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত। মহাত্মা গান্ধী যখন বিশের দশকে বেলুড়ে আসেন তখন তাঁকে ভাষণ দিতে অনুরোধ করলে তিনি বললেন ঃ "আমি সত্যাগ্রহ বা খাদি প্রচার করতে এখানে আসিনি। বক্তৃতা করতেও আসিনি। আমি এসেছি স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। স্বামী বিবেকানন্দের বই আমি গভীরভাবে পড়েছি। আমার দেশপ্রেম সহস্রগুণ বেড়ে গিয়েছে স্বামীজীর বাণী ও রচনা পড়ে। তাই এসেছি তাঁর স্থান দর্শন করতে।" মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলছেন ঃ বিবেকানন্দের জীবনে আমরা দেখি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিখুঁত সমন্বয়। মানুষের সকল শক্তির সমন্বয় তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার পরে প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল—দু-চারটি ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও সমগ্র ভারতবর্ষে অবক্ষয়ের চিহ্নই প্রবল। এই নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের আবার প্রয়োজন যুগ-নায়কের নির্দেশ। 'ভারতের ভবিষ্যৎ', 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' ইত্যাদি ভাষণে স্বামীজী ঋষির দৃষ্টি নিয়ে ভারতের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আজকের তরুণ-তরুণীদের স্বামীজীর এইসব ভাষণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ও ভাবা দরকার যে, বিখ্যাত ধনী বিশ্বনাথ দত্তের সুদর্শন, বহুবিষয়ে প্রতিভার অধিকারী, তীক্ষ্ণধী পুত্র নরেন্দ্রনাথ কিভাবে দেশপ্রেমী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেন। সেটা না জানলে বিবেকানন্দ-সাহিত্য তথা বিবেকানন্দের আদর্শ বোঝা কঠিন। এখন সেই প্রসঙ্গে দু-চারটি কথা বলছি।

অত্যন্ত মেধাবী নরেন্দ্রনাথ স্কুল-কলেজে পড়ার সময়েই পাঠ্য পুস্তকের বাইরে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ইতিহাস ও দর্শনে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। অতৃপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে অনেক মহাপুরুষের সঙ্গও তিনি করেছেন। শেষে দেখা হলো শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এবং ক্রমশঃ বহু পরীক্ষা, বহু সংশয় অতিক্রম করে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এই তাঁর 'বিবেকানন্দ' হওয়ার শুরু। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁর শুরু হয় পরিব্রাজক-জীবন। আত্মজিজ্ঞাসা এবং ভারতাত্মার স্বরূপ উভয়েরই অনুসন্ধানে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, দীনতমের কুটির থেকে ধনীশ্রেষ্ঠের প্রাসাদ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে একদিকে যেমন স্ব-স্বরূপে উপলব্ধি করলেন, অপরদিকে তেমনি ধ্যানদৃষ্টিতে দেখলেন ভারতের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। সেইসঙ্গে উপলব্ধি করলেন নব ভারত গঠনে নিজের ভূমিকাও।

এই পরিব্রাজক-জীবনের রহস্যটি আমাদের বুঝতে হবে। বৈদিক যুগ থেকেই এই পরিব্রাজকের আদর্শ ভারতবর্ষে চলে আসছে। সাধারণ মানুষ বিদ্যাভ্যাস করে, ডিগ্রী পায়, চাকরি পায়, সংসারজীবনে প্রবেশ করে হারিয়ে যায় গড্ডলিকা-প্রবাহে। কিন্তু অসাধারণ পুরুষের বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে জীবন-জিজ্ঞাসা। উত্তরের অন্বেষণে গ্রহণ করেন প্রব্রজ্যা —অবলম্বন করেন ধ্যান। সহায় সম্বলহীন

বিবেকানন্দ এই দীর্ঘ ভারত-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে জাতির ধমনীর স্পন্দন অনুভব করলেন। ভারতের প্রান্ত সীমার শেষ পাথরটি—যা 'বিবেকানন্দ শিলা' নামে পরিচিত—তার ওপর বসে ধ্যানে দেখলেন ভারতবর্ষের মহিমময় রূপ। তখন থেকে শুরু হলো সেই রূপকে সফল করার কঠিন সাধনা। তাঁর পরিব্রাজক জীবনের এই অধ্যায় এবং তারপর নব ভারত গড়ে তোলার জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস—এইটি ভাল করে জানতে হবে—মনন করতে হবে আমাদের তরুণ বন্ধুদের। তবেই স্বামীজীর ভাব তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন।

তাঁর ভাব নিয়ে এগোতে পারলে এই ভারতবর্ষেই স্বর্গ নেমে আসবে—কলিযুগের অবসান হয়ে সত্য-যুগের আবির্ভাব হবে। আশ্রম শুধুমাত্র পূজা করার জন্য নয়। পূজা-পাঠের মাধ্যমে সেই অনুপ্রেরণা চাই যা দিয়ে দেশ ও সমাজকে শুভ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি—তাকে উন্নততর, সমৃদ্ধতর করতে পারি সর্বতোভাবে।

আজ স্বামী বিবেকানন্দ স্থূল শরীরে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আছে তাঁর বিপুল সাহিত্য-সম্ভার—তাঁর তেজঃপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাষণে প্রতিফলিত জ্বলন্ত আদর্শ ও তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত। এসবের ধারণা ও মননই আমাদের প্রকৃত শিক্ষার সহায়ক। তাই আমি অন্যত্র ইংরেজীতে বলি :

"Educated people in India need re-education. All the problems of India come from the educated people. They are really the problem-creating people. Education is meant to solve the problems of nation, but education itself has become a problem in India now. How can we solve other problems then ? That is why we need Vivekananda's literature—wonderful education in itself both in language as well as idea and inspiration."

(ভারতের শিক্ষিত লোকেদেরও আবার নতুন করে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন। তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাই দেশে নিত্য-নতুন সমস্যা গড়ে তুলছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয় সমস্যার নিরাকরণ, কিন্তু এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ঘটছে তার বিপরীত। এই সমস্যার সমাধান করে দেশের কল্যাণকল্পে প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে। ভাষা এবং ভাব ও আদর্শ উভয়ের সমন্বয় ঘটেছে একমাত্র তাঁরই রচনায়।)

শিক্ষার সমস্ত স্তরেই স্বামীজীর রচনার একটি বৃহৎ অংশ পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত হলে সমাজের অশেষ কল্যাণ হবার সম্ভাবনা। নতুন ভারত গঠনের ক্ষেত্রে তা হবে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।*

*** গত ১ জুলাই ১৯৯০, বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ।**

অনুলিখন : সীতা রায়চৌধুরী এবং বাসন্তী মুখোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্বমুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের দেখছেন? 'উদ্বোধন'-এর কলকাতার ত্রিশতবার্ষিকী পূর্তি সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।

আলোকচিত্র : স্বামী চেতনানন্দ

কবিতা

মায়াবী বারান্দা

[বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের বাসকক্ষের সংলগ্ন বারান্দায় রচিত]

শান্তিকুমার ঘোষ

আলো আর ছায়া
পড়ছে নদীর বুকে
ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে।
থেকে-থেকে উথলে উঠছে
ভিতরের ঐশ্বর্য।

আর স্থির আছে এই মায়াবী বারান্দা,
পিছনের ভূমিতে গৈরিকবর্ণের দেউল
এবং সামনে প্রবাহিত ছলচ্ছল ভাগীরথী।

এইখানে অনন্ত মুহূর্ত কাল
দাঁড়িয়েছিলেন তিনি,
তাকিয়েছিলেন অনিমেষ
ভেদ করে দেশ-কাল-পদার্থের সীমা।

থামছে না তাই স্তবগান,
ধীরে জাগছে হৃদয়ের মহাদেশ ;
কেটে গিয়ে নীল বিষণ্ণতা
আনন্দে উদ্ভাসিত জননী—

কোলে তাঁর দেব-শিশু।

চরৈবেতি

বিভাস রায়

অন্ধকারে চলে যাত্রী
আলোকের পায়নি সন্ধান,
দিবা শেষ, আসে রাত্রি ;
তবু তার চলা অনির্বাণ।

সূর্য চন্দ্র নিত্য ওঠে
গতিবেগে আসেনি স্থিরতা,
নদী অবিশ্রান্ত ছোটে
জলে তাই নেই আবিলতা।

চলে গ্রহ উপগ্রহ
থামে নাকো, হয় নাকো স্থাণু
চলার এ মহামোহ
ছেয়ে আছে অণু পরমাণু।

কাল ছোটে কালান্তরে
যুগে যুগে যুগ হয় শেষ ;
এই বিশ্ব চরাচরে
সত্য লাগি চলা অনিমেষ।

একি শ্রেয়ঃ, নেতি, নেতি—
প্রেয় লয়ে রবে ক্ষণসুখে
শোন ধ্বনি 'চরৈবেতি',
নিত্য চল সত্য অভিমুখে।

চরৈবেতি, চরৈবেতি—
অবিরাম চল অসংশয়
এ চলার হবে ইতি
যবে হবে আত্মপরিচয়।

তোমার কথা

পলাশ মিত্র

তোমার ছবিতে শুধু মালা দিয়েই
কাটিয়ে দিলাম সারা দিনমান।
ধূপের ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হলো বুঝি
তোমার আসল চেহারা,
তোমার কথার একটিকেও যদি আজ নিতাম।
তোমাকে কথার মালায় সাজাতে গিয়ে
ভাবের ঘরে চুরি করে
নিজেরাই হারিয়ে ফেলেছি পথের দিশা।
দেশের লোকে দু-বেলা দু-মুঠো
খেতে পায় না দেখে তোমার মনে হয়েছিল—
'ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো ঘণ্টা নাড়া,
ফেলে দিই তোর লেখাপড়া'।
আমরা কি এর মর্ম বুঝেছি স্বামীজী?
দিনরাত খালি 'ছুঁসনে ছুঁসনে' বলেই
কাটিয়ে দিলাম সারাটা জীবন ঃ
সব কিছুর গণ্ডি ভেঙে পতিত-কাঙালদের
বুকে তুলে নিলে হে রাজাধিরাজ, সহস্রদল কমল!
তোমার ছবিতে শুধু মালা দিয়েই দিন ফুরালো।

পবিত্র ভারতবর্ষের জন্য

বিজয়কুমার দাস

সব জড়তার অন্ধকার
আজীবন দুহাতে সরিয়ে গেছেন
সেই বিশ্বপথিক
একটি আলোকিত সকালের জন্য।
সব পরাজয়ের পাহাড়
অবহেলায় পেরিয়ে গেছেন
সেই চির-যুবক
হার-না-মানা যৌবনের জন্য।
সব মানুষকে বুকে টেনে
ভালবাসার গান শুনিয়ে গেছেন
সেই বিবেকানন্দ
তাঁর প্রিয়তম ভারতবাসীর জন্য।
তাঁর পবিত্র ভারতবর্ষের জন্য।

ঘনীভূত ভারতবর্ষ

শিবশম্ভু সরকার

ভারত-চরণোপান্তে
দুই আঁখি খেলা করে
উচ্ছলে অশান্তে—
উপল-ব্যথিত শেষপ্রান্তে
জলধির বুকে এক পাথরে একান্তে
যোগীবর আছে বসি
ধ্যানাসনে যেন শশী
শতাব্দী-নিচয় কত ভেসে চলে যায়
পতিত ব্যুত্থিত হোক—মন্ত্র কোথা পাই?
মন্দিরে মন্দিরে জাগে শিখা
আরতির দীপে দীপে অনুরাগ লিখা
সে শিখা এনেছে বয়ে
গোটা দেশ সাথে লয়ে
মাগে আলো—কুহেলীর হৃদ্ ছিন্ন করি—
জড় যাবে জাগরণে—নিদ্রা পরিহরি।
দেবতারা দেখে অলক্ষিতে
গুরু স্তব্ধ—অধীর সম্বিতে—
আর্ত আঁখি—হেরিছে ভারত
ঘর্ঘরিত হোক তব রথ
উচ্চারিত হোক তব স্বপ্নভগ্ন ডাক
কুরুক্ষেত্র-অন্ধকারে পাঞ্চজন্য শাঁখ!
'ত্যাগ আর সেবা'—এই দুই মহামন্ত্র স্মরি
প্রভাত আনিবে রবি—অন্ধকার যাবে সরি
সাধু, রিক্ত, মুমুক্ষুর দল
শুদ্ধ আত্মা ত্যাগেচ্ছু সবল
ইহারাই লবে দায়—জনগণ লাগি
নবযুগে সত্রযজ্ঞ ঘটাবে বিবাগী!
ঝাঁপি-ভরা রত্নরাজি সমুদ্রের পারে
ঋষিদের জ্ঞান দেবে—আনিতে এপারে—
হাজার তরুণ সাধক তুচ্ছ করি সকল বাধক
মঙ্গল স্পর্শের গুণে ভাঙে সম্মোহন
জড়তার ধ্বংস নামে—জাগিবে তপন!
শুধু ভারত আর ভারতের জন
সাধুত্বের দৃপ্ত ব্যথা আনে জাগরণ
গৈরিক রঙীন বাসে শিবাজী-স্বপন—
শৃঙ্খলিত ভারতের বন্ধন-মোচন!

ভবিষ্যৎ ভারত

দেবী রায়

বেঁচে আছ কি তোমরা ?
'চলমান শ্মশান' বলে
তোমাদের করেছেন ঘৃণা
পূর্বপুরুষেরা !
তোমাদের বাড়ি-ঘর-দুয়ার
সব মিউজিয়াম ;
তোমাদের আচার-ব্যবহার
চাল-চলন যেন সবই
ঠাকুমার মুখের গল্প !
তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে বাড়ি ফিরে
যেন মনে হয় দেখে এলাম
চিত্রশালিকার ছবি !
তোমরা ভূত কাল !
তোমাদের যে দেখছি এখন, ওটা হলো
যেন অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন ।
শূন্যে বিলীন হও তোমরা,
আর বের হোক
নূতন ভারতের সন্তানেরা !
বের হোক লাঙ্গল ধরে
চাষার কুটির ভেদ করে
জেলে-মালা-মুচি-মেথরের
ঝুপড়ির ভেতর থেকে ।
বের হোক মুদির দোকান থেকে
ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে ।
বেরুক কারখানা থেকে,
হাট ও বাজার থেকে ।
বেরুক ঝোপ-জঙ্গল থেকে ।...
ওরা সহস্র-সহস্র বৎসর
সয়েছে নিপীড়ন, অত্যাচার ।
তবু নীরবে মুখ বুজে
কাজ করে গেছে !
মনে রেখো ঃ এই সামনে তোমার
উত্তরাধিকারী—ভবিষ্যৎ ভারত, নতুন ভারত

মানব-প্রেমিক

নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

কে তুমি কাঁদিছ বসি জনহীন একেলা প্রান্তরে
চক্ষে বহে জল,
বিগত দিনের অশ্রু পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি
ঝরে অবিরল ।
হে মানব, জাগো পুনঃ, হাতে লও তুলি
প্রজ্বলিত অভীঃ দীপখানি,
যে-গান ভুলিয়া গেছ,
কভু তার হয়নি বিলীন
কোন সুর কোন ছন্দবাণী ।
অতীত—অতীত শুধু,
অতীতের ত্রুটি কিছু নয়
বর্তমান শ্রেষ্ঠ বাস্তব,
হে মানব, ভবিষ্যৎ আনে
শুধু আসার সন্দেশ
দুঃখান্তের বার্তা অভিনব ।
যা কিছু করেছ ভুল ।
যাহা কিছু হলো না সঞ্চয়
যে-সাধনা রয়ে গেল পিছে,
তাহার বেদনা লাগি দিবা-নিশি রুদ্ধ করি দ্বার
কেন ভ্রান্ত কাঁদো বল মিছে !
মানুষের ভালবাসা ধরণীর এই ধূলি দেহে
মৃত্তিকার মর্মে মর্মে কাঁদে,
মানুষের ভগবান মানুষেরই বেদনার লাগি
সকরুণ স্নেহে প্রেমে বাঁধে ।
নিভৃতে গহীন মনে কভু বা নিশীথ রাতে
বারবার শয়নের ছলে
পরের চোখের জলে বেদনায় বিদীর্ণ অন্তরে
যদি ভেসে থাকো আঁখিজলে,
তার চেয়ে শ্রেয় কোথা ?
মুছে গেছে যাহা কিছু গ্লানি ।
হে প্রণম্য, হে প্রেম-যাজ্ঞিক,
তোমারে রাখিবে মনে জন্ম হতে জন্মান্তরে সবে,
হে মহান মানব-প্রেমিক !

সহস্র দ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর স্বপ্ন

সহস্র-সমুদ্রদ্বীপ উদ্যানে একদা সন্ন্যাসীর হলো অভ্যুদয়,
গেরুয়া বসনে তাঁকে মনে হলো বীর কিম্বা ধ্যানীদের মতো।
বুদ্ধ, খ্রীস্ট প্রভৃতির পর আমেরিকাবাসীদের মনে হলো সহসা আগত
প্রাচ্যদেশ থেকে আর এক ঐশ্বরিক মানবতাবাদী : তাঁর হোক জয়।
স্বপ্ন দেখেছেন একা সেদিন সন্ন্যাসী ; তাঁর পদ্মপলাশ দু-চোখে
ফুটেছে সেদিন এক প্রবল বৃহৎ শান্তি, এবং তেজস্বী কণ্ঠস্বরে
সমাগত বিদেশের শিষ্য-শিষ্যাদের দিয়েছেন উপদেশ ধ্যানঘরে
বলেছেন, মানুষই মহোত্তম সৃষ্টি, প্রকৃতি সৌন্দর্যময় মর্ত্য-ভূলোকে।

আজকে এখানে তিনি নেই, তবু তাঁর অম্লান মহিমা পরিবেশে ভাসে
সঙ্গী-সঙ্গিনীগণ সকলে গেছেন চলে, তবু মনে হয় অভয়-আবৃতা
এই পৃথিবীতে প্রেম আজও আছে—সূর্যোদয়ে পূর্ণিমাতে জাগে সে অমৃতা।
'সর্ব বাধা, ব্যঙ্গ, হতাশাকে পায়ে দলে ছুটে যেতে হবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ;
মানুষ দেবতা হবে, মানুষ দেবতা হয়েছিল'—জাগে স্বপ্ন মহৎ প্রতীতী,
আকাশের নীলিমায় সমুদ্রের নীল ঢেউ-এ সন্ন্যাসীর শোন অগ্নিগীতি।

তোমার ইচ্ছায়

মানস দাস

মহাকালগর্ভ হতে
এ শতাব্দীর জন্মলগ্নে উঠেছে সোনার চাঁদ
আকাশের পূর্বদিক জুড়ে।
ঈশ্বরের আশিসধারা
লক্ষ কোটি সূর্যরশ্মি হয়ে ঝরেছিল সেদিন।
বজ্রকণ্ঠে সেদিনের নির্ঘোষ :
"চাই শুধু মানুষ, আর সব হয়ে যাবে"—
আজও আছে তেমনি ঋজু আর তেজোময়।
তেজোদ্দীপ্ত জ্বলন্ত পৌরুষ
জনমনে আজও ধিকি ধিকি জ্বলে
জ্বেলে দিতে সকল মালিন্যের মূল।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"-র শক্তিময়ী
সঞ্জীবনী সুর আজও আছে
শতাব্দীর শেষযামেও অবিকৃত।
নাই শুধু "মান-হুঁশ"—
যা দিয়ে তৈরি হয় সোজা শিরদাঁড়া,
বলে দিতে পারা যায় : 'আমিও মানুষ
সেই একই মাটির—যে-মাটিকে
ভালবেসে নরেন পেয়েছে রূপ বিবেকানন্দে।'
হে নরেন্দ্র!
রিক্ত হাত ভরে দাও আলোকধারায় ;
ক্লীবত্ব পুড়ে যাক তোমার ইচ্ছায়।

ভাষণ

বিবেকানন্দের নববেদান্ত

অমলেশ ত্রিপাঠী

উপনিষদের চারটি মহাকাব্যের কথা জ্ঞানীরা বলে থাকেন। আর দুটি যোগ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ — "যত মত তত পথ" ও "যত্র জীব তত্র শিব"। স্বামীজী যোগ করলেন সপ্তম এবং শেষটি ঃ "বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে হবে"। শুনতে সহজ, কিন্তু এরই মধ্যে লুকিয়ে ছিল ভারতের ধর্ম-ইতিহাসের ব্যাপকতম বিপ্লবের বীজ। অতীতে বেদান্তচর্চা ছিল তপোবনে সীমাবদ্ধ। ঋষিরা সত্যদর্শন করতেন, শিষ্যের সঙ্গে গোপনে বসে তার রহস্য আলোচনা করতেন, কদাপি যাজ্ঞবল্ক্যের মতো দুঃসাহসী কোন মহাপুরুষ জনকের মতো কোন উচ্চকোটির রাজাকে তার ব্যাখ্যা শোনাতেন। কজনই বা ছিলেন নচিকেতার মতো জিজ্ঞাসু, মৈত্রেয়ীর মতো অমৃতের পিপাসু? কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মার সেই চিরন্তন অভিযানের অভিজ্ঞতা বিলিয়ে দিচ্ছেন হাটে-বাটে, ধনী-নির্ধনে, নরনারী নির্বিশেষে। তা শুনতেই তো নরেন এসেছিলেন, শুনে বিজিত হয়ে বলেছিলেন—"বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে হবে"।

বস্তুতঃ এখানেই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বুদ্ধ ও চৈতন্যের উত্তরসূরী। বুদ্ধ শুধু রাজা বিম্বিসার ও প্রসেনজিতের সভায় নির্বাণতত্ত্ব আলোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, তা প্রাকৃত ভাষায়, জাতকের কাহিনী বুনে সকলের বোধগম্য করেছিলেন। সেখানে রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-নাপিত, কুলবধূ-বারবধূর ভেদ নেই। কপিলাবস্তুর রানী মহাপ্রজাপতি ও বৈশালীর নটীমুখ্যা আম্রপালি সবাই নির্বাণপথের ভিক্ষুণী।

শঙ্করাচার্য এসে বেদান্তকে সরিয়ে নিলেন অরণ্যে পর্বতে, ভারতের চার প্রান্তে চার ধামে, দশনামী সম্প্রদায়ের আশ্রমে। অধঃপতনের জন্য তিনি দায়ী করলেন অযাচিতভাবে সদ্ধর্ম বিতরণকে। অপাত্রে পড়ার ফলে ধর্ম কলুষিত। তাই ইতরজনের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে তাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য ও টীকার মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে। আচার্য তাই করলেন এবং তাঁর শিষ্যগণ সেই ধারা অনুসরণ করলেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে চৈতন্য এসে দেখলেন উল্টো ফল ফলেছে। কতিপয় পণ্ডিত ধনী সমাজ-নেতাদের সমর্থনে ধর্মের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করছেন আর মূঢ় জনতা অস্বাভাবিক, অমানবিক আচার পালন করে মুক্তির উপায় খুঁজছে। তাই তিনি ভাষ্য-টীকার আবর্জনা গঙ্গার জলে ফেলে, ভেদাভেদের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে প্রেম-ভক্তির বন্যা বওয়ালেন। কোল দিলেন যবনকেও। কিন্তু জীবনের শেষ বার বছর দিব্যোন্মাদনার বশে তিনিও সরে গেলেন গম্ভীরার অন্তরালে। ষড় গোস্বামী তাঁর অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব সংস্কৃতে প্রতিষ্ঠিত করলেন, কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ লিখলেন অতীব সংস্কৃত-গন্ধী বাঙলায়। জনসাধারণ কিছু বুঝল না। তারা চৈতন্যের আবেগের দিকটা নিল, সংযম ও শুচিতার দিকটা নয়।

যুগের প্রয়োজনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এলেন বুদ্ধের করুণা, চৈতন্যের প্রেম এবং উভয়ের শুচিতা নিয়ে। কী দীর্ঘ, কঠিন তপস্যা তাঁর—অথচ তাঁর কাজে বা কথায় কোথাও কোন কঠোরতার ছাপ পড়ল না। বৃহদারণ্যকের জ্ঞান, নারদীয় ভক্তি, গীতার নিষ্কাম কর্ম, শাক্ত বাৎসল্য ও বৈষ্ণবীয় রাগানুগা মিলে গেল সমাধিলব্ধ উপলব্ধির অপার আনন্দসমুদ্রে। ঠাকুর কোন এক সম্প্রদায়, এক মত, এক সাধনপন্থার জয় গাইলেন না। জ্ঞান থেকে ভক্তিমার্গের সব রাগ-রাগিণীতে সিদ্ধ তিনি, দ্বৈতাদ্বৈতে সব্যসাচী।

তিনি বললেন, ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর, তাই তাঁর নামরূপ নিয়ে এত তর্ক। বললেন—নির্গুণ ও সগুণ নিত্য ও লীলার খেলা ; সাকার শুদ্ধ দুর্বলাধিকারীর আশ্রয় নয়, জ্ঞানমার্গীরও চিত্তশুদ্ধির উপায়। অপরোক্ষানুভূতি হলে সব সংশয় মুছে যায়, তখন দেখি তিনি এক, অনেক, আরও কত কি। তখন শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান, মুসলমান কিছু ভেদ থাকে না।

নরেন দেখলেন—এই গুরু অদ্বৈতবোধে সমাধিস্থ—নৃত্যে, গানে, কথামৃতবর্ষণে তাঁর আনন্দ অকৃপণভাবে তিনি বিতরণ করছেন। তিনিও বাদ পড়লেন না। শাস্ত্র নিয়ে তর্ক চলে, কিন্তু সর্বশাস্ত্রের মূর্ত প্রতীকের সঙ্গে নয়। আর কি গুরু!—"জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা ও উদারতায় জমজমাট!" ব্রহ্মানন্দকে লিখেছেন, "এ দুনিয়া ঘুরে দেখছি যে তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই ভাবের ঘরে চুরি।" তিনি শাস্ত্রের বাইরে কোন কথা বলছেন না। শাস্ত্রের ওপরেও একটি নতুন মাত্রা যোগ করছেন। সেটি হলো জীবের শিবত্ব প্রতিপাদন। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলছেন: "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" ঈশ উপনিষদ্ বলছেন: "ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্।" কঠ বলছেন: "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" এমনকি বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এত 'নেতি নেতি' করেও বলছেন ব্রহ্ম সৃষ্টিতে অনুস্যূত—ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে। তবে তো ব্রহ্ম, শক্তি, জীব ও জগৎ আলাদা নয়। সবই ব্রহ্মরূপ ঊর্ণনাভের ঊর্ণা, ব্রহ্মরূপে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। তবে মত আর পথ নিয়ে কেন 'মতুয়ার বুদ্ধি'? রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'য় সুন্দরভাবে বলেছেন: "অন্তহীন এক অন্তহীন অনেকে আপনাকে প্রকাশ করেন··· সেজন্য ধর্মমত বিচিত্র হয়ে সেই ধর্মরাজকে নানা দিক দিয়ে উপলব্ধি করছি।" "যিনি নিরাকার তাঁর আকারের অন্ত নেই—যিনি অনন্তবিশেষ তিনিই নির্বিশেষ, যিনি অনন্তরূপ তিনিই অরূপ।" ঠাকুর শোনালেন, ভারতবর্ষ ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখার চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু এও জানে তিনি বিশেষকে অনন্তগুণে অতিক্রম করে আছেন।

কিন্তু কি করে করব আপাতবিরোধী মতের সমন্বয়? কিভাবে করব জীবরূপী শিবের পূজা? উত্তর বিশদ না করেই গুরু চলে গেলেন তাঁর যোগ্যতম শিষ্যকে সমাধানের ভার দিয়ে। প্রব্রজ্যায় চললেন নরেন্দ্রনাথ, যেমন শত যুগ ধরে চলেছেন ভারতের সাধু-সন্তরা। গুরু দেখেছেন, শাস্ত্র পড়েছেন, এবার দেখতে হবে মাতৃভূমি। কি দেখলেন তিনি? দেখলেন, পথের দুধারে পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, রুগ্ন, অশিক্ষিত জীবরূপী শিব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—যাঁরা ধর্মের রক্ষক—তাঁরাই করছেন মানুষের শোষণ—শাস্ত্রের নামে, স্মৃতির দোহাই দিয়ে। তাঁরা জাতিভেদ সৃষ্টি করে সমাজদেহ শত খণ্ড করেছেন। অধিকাংশ হিন্দু হয়েছে শূদ্র, অস্পৃশ্য, বেদবহির্ভূত। ধর্ম আশ্রয় করেছে ভাতের হাঁড়িতে, নারী হয়েছে সন্তানপ্রসবের যন্ত্র, নরকের দ্বার। আবু রোডে তাঁকে দেখে হরিভাইয়ের (স্বামী তুরীয়ানন্দের) মনে হলো: "তাঁর হৃদয়টা একটা বড় কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে পাক করে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরি হচ্ছে।"

মলম তৈরি হলো। আমেরিকা পৌঁছে এক চিঠিতে রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন: "একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comarin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার ওপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজী বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে। ···আমাদের জাতটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্য ভারতের এত দুঃখকষ্ট।··· নীচ জাতকে তুলতে হবে।··· তাদের ওঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে—গোঁড়া হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে।···ধর্মের দোষ নেই, লোকেরই দোষ। এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি দশ-পনের জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের

লোক পয়সা দেবে !!!··· তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব, আর আমার বাকি জীবন এই এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করব।"[১]

কী তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, কী নির্ভীক সিদ্ধান্ত! কিন্তু এ অর্থোপার্জন এক তরফা নয়। পাশ্চাত্যের অর্থ তিনি নেবেন প্রাচ্যের অধ্যাত্ম বিনিময়ের মূল্যরূপে। একদিকে জীবরূপী শিবের পূজোপচার সংগ্রহ, অন্যদিকে গুরুদেবের, তথা সনাতন হিন্দুধর্মের, সমন্বয়ের বাণী প্রচার। পাশ্চাত্য থেকে তিনি নেবেন তার রজঃ শক্তি, তার আবিষ্কারের প্রতিভা ও কৃৎকৌশল, তার নিরলস কর্মোদ্যম, তার সংগঠনী শক্তি; বদলে তিনি শোনাবেন, অপরোক্ষ অনুভূতিই হিন্দুধর্মের মূল, মূর্তি বা প্রতীকোপাসনা মনঃসংযোগের সহায় মাত্র। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার প্রকাশিত। শোনাবেন, ধর্ম অসীম, অনন্ত তার পথচিহ্ন; সেখানে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, জাতি, সম্প্রদায়ের ভেদ নেই; কোন ধর্মের শ্রেষ্ঠতা নেই; কোন পাপী নেই; সকলেই অমৃতের অধিকারী। শোনাবেন—একত্বের উপলব্ধিই ঈশ্বর-উপলব্ধি; তিনি বাইরে, তিনি অন্তরে, তিনি রয়েছেন সর্বত্র জুড়ে। প্রেমে তাঁর বিকাশ। বলছেন—জ্ঞানীর লক্ষ্য সর্বব্যাপী সমষ্টিভূত এককে জানা আর ভক্তের লক্ষ্য তাঁকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে সেই সমষ্টিকে ভালবাসা। ভালবাসা প্রকাশ পাবে কিসে? ভালবাসা প্রকাশ পাবে প্রীতিতে, করুণায়, সেবায়।

কেমন হবে তাঁর ধর্ম? "সকল মানুষের মনের উপযোগী—সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে মরমী এবং কর্ম প্রেরণাময়।" রোমাঁ রোলাঁ বলেছেনঃ স্বামীজী চার যোগের চৌঘুড়ি হাঁকাতে চাইছেন। আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে তিনি যোগশিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। কারণ, পূর্ণ মানুষ তৈরি করার গ্রীক স্বপ্ন রেঁনেশাসের সময় আবার দেখা দিলেও খ্রীস্টান সাম্প্রদায়িক বাদবিসম্বাদে ভেঙে গিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় আঠারো শতকের যুক্তিবাদী জড়বাদী প্রগতির চিন্তা সেক্যুলারিজমের নামে ধর্মকে বাদ দিয়েই চলতে চেয়েছিল। তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল ভৌতবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শেষে বিবর্তনবাদ। বিবেকানন্দ দেখলেন ধর্ম দায়ী নয়, দায়ী ধার্মিকদের সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, স্বার্থান্বেষী বুদ্ধি, অগ্নমিকা ও মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সত্যকার ধর্ম জোর করে কাউকে ধরে নিয়ে আসে না। ঠাকুরের মতো সবাইকে ভাবমুখে থাকতে বলে। "আমি চাই মেথডিস্টকে আরও ভাল মেথডিস্ট করতে, ব্যাপটিস্টকে প্রেসবিটেরিয়ানকে আরও ভাল ব্যাপটিস্ট বা প্রেসবিটেরিয়ান করতে।" হিন্দুর মুক্তি খ্রীস্টধর্মাবলম্বনে নয়—আরও ভাল হিন্দু হওয়ায়।

খ্রীস্টান মিশনারীরা ভারতে এই ভুলই করেছিল। সাম্রাজ্যবাদীর সহচর তারা, ভারতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল পবিত্র খ্রীস্ট-সাম্রাজ্য। তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে ব্রাহ্মরা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করলেন। ভিতরে থেকে ভালবেসে সংস্কার করলে হয়তো তাঁরা সফলও হতেন। পানুবাবুর মুখে গোরা *সংশোধনের কথা শুনে গর্জে বলেছিলঃ "সংশোধন* ঢের পরের কথা। সংশোধনের চেয়ে ঢের বড় কথা ভালবাসা, শ্রদ্ধা। আপনারা বলেন দেশের কুসংস্কার আছে, অতএব আমরা সুসংস্কারীর দল হয়ে থাকব। আমি এই কথা বলি, আমি কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারো থেকে পৃথক হব না।" তা বাইরে থেকে আক্রমণ আসায় দেখা দিল নব্য হিন্দু প্রতিক্রিয়া। বিবেকানন্দ এই শশধর তর্কচূড়ামণি মার্কা হিন্দুধর্ম উপহাসে নস্যাৎ করে দিলেন। প্রথমে অধ্যাত্মসংস্কার, পরে সমাজসংস্কার—পরেরটা আগে করতে গেলে চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে কি বিপর্যয় দেখা দেয় ভারতের উনিশ শতকের অভিজ্ঞতাই তো তার প্রমাণ। কিন্তু শুধু প্রাচীন বলেই প্রাচীনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা চাননি তিনি। অনেকে মনে করেন তিনি ছিলেন রিভাইভ্যালিস্ট। *তাঁদের স্বামীজীর 'বর্তমান সমস্যা'* পড়তে বলি। "যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৪১২-৪১৩

সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম কীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে···রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?"[২]

অতএব কর্মবৃত্তি ছাড়তে হবে। ম্লেচ্ছ কথাটার প্রাচীর তুলে বিশ্বের সঙ্গে আমরা আদান-প্রদানের পথ বন্ধ করে দিলাম। এখন আবার সর্বজনীন ভাবকে তুলে ধরতে হবে। "Perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform"—স্বামীজী বলছেন। পূর্ণ মানব সৃষ্টি করতে প্রাচ্যের প্রতীচ্যকে চাই, যেমন প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের। যে প্রকাণ্ড তামসিকতা একদিকে উপবাসে ক্লিষ্ট, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর একদিকে মুমূর্ষুর রক্ত শোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ভারতকে পীড়িত করে পড়ে আছে, তারই সঙ্গে লড়াই। তমঃ এনেছে ভয়, এনেছে ছুঁৎমার্গ, প্রবলের কাছে নতিস্বীকার আর দুর্বলের ওপর অত্যাচার। তার সঙ্গে লড়াই করতে চাই অভীঃ, লৌহের মতো পেশী ও বজ্রের মতো স্নায়ু। "আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহার নাশ কে করে?"[৩]

আমাদের দেশের বীর্যদায়ী বলপ্রদ মন্ত্রটি হলো অদ্বৈত। এক আত্মা সর্বত্র বিরাজমান এবং তা "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়মং পুরাণঃ"। তার মধ্যে সহস্র সূর্যের শক্তি। যেমন পরমাণুর মধ্যেকার শক্তি বিস্ফোরণে জগৎ ধ্বংস করা যায়, তেমনি আত্মার শক্তির বিস্ফোরণে উড়ে যাবে পরশাসন আর ব্রাহ্মণ-শূদ্র নর-নারী উচ্চ-নীচের অবিদ্যাপ্রসূত ভেদ। কিন্তু শুধু শাস্ত্রের পাতায় যা আছে তাকে করতে হবে ফলিত।

স্বামীজী চিরদিন টাকার চেয়ে লোকের ওপর বেশি জোর দিতেন আর তাঁর সন্ন্যাসী ভ্রাতা ও শিষ্যদের চেয়ে ভাল লোক কই? চিরদিন ভারতের সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সংসার ছেড়েছে। বিবেকানন্দ প্রথম তাদের বললেন, সংসারের সেবায় রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান পাঠ। স্বামীজীর ভাষায়, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। ···পরের জন্য প্রাণ দিতে জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মোছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশের চিন্তার দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"[৪]

স্বামীজীর কোন কোন গুরুভ্রাতা প্রথমে তাঁর এ কর্মপ্রণালী শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের বিরোধী মনে করেছিলেন। তাঁদের মতে ঠাকুর শুধু জ্ঞানচর্চা করতে, সাধন-ভজন করতে বলে গেছেন? আর তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরলাভ। জ্ঞানের দিক থেকে এর উত্তর আছে। শুদ্ধ জ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশ নেই সত্য, কিন্তু ক্রিয়া-কর্তা-কর্মবোধ যতদিন আছে ততদিন সাধ্য কি কর্ম ত্যাগ করার? শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজী বলছেন: "অতএব কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন যেসব কর্ম এই আত্মজ্ঞান বিকাশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন করে যা না।"[৫] আবেগের দিক থেকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "কে তোমার ভক্তিমুক্তি চায়? আমি রামকৃষ্ণ কি কারুর দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তি-মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।" একটু পরে শান্ত হয়ে বলছেন: "আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস, তিনি আমার ঘাড়ে যে-কাজ চাপিয়ে গেছেন, যতদিন না সে-কাজ শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই।" আসলে কেউই জানতেন না একান্ত নিভৃতে গুরুদেব নরেনকে কি নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমি বিশ্বাস করি—সেটা

২ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩
৩ ঐ, পৃঃ ৩৪
৪ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪
৫ ঐ, পৃঃ ২০৬

জীবরূপী শিবসেবারই নির্দেশ। তিনি যে তাঁকে বিশাল বটের মতো সকলকে আশ্রয় দিতে বলেছিলেন, তার অন্য কি অর্থ হতে পারে? তা না হলে শ্রীমা-ই বা সেই সংকটে বিবেকানন্দকে পূর্ণ সমর্থন জানাতেন কি?

স্বামীজী যে-ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন তা একই সঙ্গে অভিনব, কোন যুগের হিন্দু সন্ন্যাসী তা করেনি; আবার একান্তভাবে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত, তার পেছনে রয়েছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মৈত্রী-ভাবনা। নিবেদিতাকে দীক্ষাদানের দিন তিনি বলেছিলেন: "যিনি পরের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বোধিলাভের পূর্বে পাঁচশত বার স্বীয় জীবন পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধের অনুসরণেরই জন্য হোক তোমার অভিযাত্রা।"[৬] স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, ঐ দর্শন শুধু যুগোপযোগীই নয়, যুগের দাবিও। শ্রীমা বলেছিলেন: "ঠাকুরের অনেক রসদদার ছিলেন, তোমরা কাজ না করলে রসদ জোগাবে কে?"

আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। জ্ঞানচর্চা ত্যাগ করা দূরের কথা, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বামীজী বেলুড় মঠে শিষ্যদের শাস্ত্র, ভাষ্য পাঠ দিয়ে গেছেন। তবে তিনি বারবার বলতেন বেদান্তের সঙ্গে যোগ করতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে ধুমধামের কথা শুনে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন: "তোমরা মহোৎসবে তো লুচি-সন্দেশ বাঁটলে, আর কতকগুলো নিষ্কর্মার দল গান করলে,··· তোমরা কী spiritual food (আধ্যাত্মিক খোরাক) দিলে, তা তো শুনলাম না?"[৭] ঠাকুরের স্মৃতি রক্ষিত হবে তাঁর নাম প্রচারে নয়, ভাব প্রচারে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামী শিবানন্দকে লিখছেন: "তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়··· তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ (শিক্ষা) ফলবতী হোক। তিনি কি নামের দাস?"[৮] ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন—"যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India (বর্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব!··· রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া।"[৯] ঘুরে ফিরে ধুয়োর মতো ফিরে আসছে সেই ভগবান নর-নারায়ণের মানবদেহধারী রূপের পূজার কথা। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখছেন: "পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্যে যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পূজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'। এই তো আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ—পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য!"[১০]

তা-ই হলো—তাঁকে ঘিরে বেলুড় মঠে কি বিপুল কর্মযজ্ঞের সূচনা! তৈরি হলো মায়ের জায়গা, মঠ, মিশন। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও। কারণ ঠাকুর তো শুধু ভারতের নয়, তিনি সকলের। ব্যারোজ, স্টার্ডি, ম্যাক্সমুলার, ডয়সন পশ্চিমে প্রচার করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী। সেভিয়ার এলেন আলমোড়ায়, গুডউইন মাদ্রাজে, নিবেদিতা কলকাতায়। ওদিকে শরৎ ও কালী গেলেন বিলেতে-আমেরিকায়, বিরজানন্দ ঢাকায়, তুরীয়ানন্দ গুজরাটে। টাকা পাঠালেন ওলিবুল, ম্যাকলাউড। বেরুল ব্রহ্মবাদিন্, প্রবুদ্ধ ভারত, উদ্বোধন। একে একে বেরুতে লাগল স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ রচনাবলী। বীরসন্ন্যাসী বিশ শতকের সেরা বিপ্লবের সূচনা করলেন।

কি আদর্শ এই বিপ্লবের? ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতাকে লিখছেন: "মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।"[১১] সবচেয়ে বড় দান—ধর্মদান, মানুষকে তার স্বরূপের পরিচয়দান।

কিন্তু কি অর্থ কি পরমার্থ—সকল ব্যাপারে দান যদি গ্রহীতাকে স্বয়ম্ভর না করে তবে তা বৃথা। *মিশনের কথা—গীতার কথা—"উদ্ধরেৎ*

৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, ১৩৭৬, পৃ: ৯৬
৭ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৩৮০, পৃ: ১৩৩
৮ ঐ, পৃ: ৭৬
৯ ঐ, পৃ: ১০৭-১০৯
১০ ঐ, পৃ: ৪০২
১১ ঐ, পৃ: ২৯৮

আত্মনা আত্মানম্"। দুর্ভিক্ষের দিন দু-মুঠো অন্ন দিলে হবে না, যে নেবে তাকে স্বাবলম্বী করতে হবে। স্বামী অখণ্ডানন্দ শিল্প-শিক্ষার আয়োজন করলেন। আজ নরেন্দ্রপুর, রহড়া, পুরুলিয়া, বেলুড় বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়—গর্বের বস্তু। প্লেগের ভয়াল দিনে তার শুশ্রূষা করলেই চলবে না, তার সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থাও করতে হবে। স্বামী সদানন্দ, নিবেদিতার আত্মদানে এর শুরু। আজ সারা ভারতে কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল, আর কত ক্লিনিক! বহু শক্তিশালী ও বিত্তশালী সরকার যা পারেননি তারই প্রতীক মিশনের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি। কিন্তু শুধু ক্ষুধিতকে অন্নদান, রুগ্নকে আরোগ্যদানেই শেষ নয়—তদুপরি বোঝাতে হবে—ভয় নেই, ভগবান শুভের মতো অশুভের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেন। এ যে মৃত্যুরূপা মাতা।

জ্ঞান এবং ধর্মদান অঙ্গাঙ্গী, পরস্পর-সাপেক্ষ। অপরাবিদ্যা অধিগত না হলে পরাবিদ্যার অধিকার জন্মায় না। আবার পরাবিদ্যার উপলব্ধি না হলে অপরাবিদ্যা জড় ভোগবাদে পরিণত হয়। পাখি যেমন দু পাখায় ভর করে ওড়ে, তেমনি পরা অপরা ভর করে আমাদের উড়তে হবে। স্বামীজী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ওপর ও ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, কলা বিষয়ের ওপর সমান জোর দিতেন। ম্যাকলাউড লিখছেন: "সাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান যেকোন তত্ত্বের বিচারে তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি অদ্বয় অনন্তের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র তাহা আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতেন।" স্বদেশী সংস্কৃতিকে অবহেলা করলে জন্মাবে হীনম্মন্যতা, হীনম্মন্যতা জন্ম দেবে বীর্যহীনতা। ধর্মের ক্ষেত্রে বীর্যহীনতাই একদিন দেশাচার, লোকাচারের কদর্যরূপ নিয়েছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমন ঘটলে আমরা মূলের সঙ্গে যোগ তো হারাবই, পাশ্চাত্য সভ্যতার সারটুকুও গ্রহণ করতে পারব না। তাই প্রয়োজন এমন শিক্ষার যার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন, যা একই সঙ্গে দেশপ্রেমী ও বিশ্বপ্রেমী। এর উদ্দেশ্য ভারতের অপূর্ণতার দিকে অন্ধ হয়ে থাকা নয়, কিন্তু সত্যদৃষ্টি, সহানুভূতি নিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে বোঝবারও চেষ্টা। নিবেদিতাকে তিনি সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

বস্তুতঃ আমার এই ক্লান্তিকর ভাষণের শেষে আপনাদের সামনে আনতে চাই সেই চিরন্তন মহা পরিব্রাজককে যিনি ভারতপথের পথিক, বিশ্বপথেরও পথিক। জওহরলাল নেহরু তাঁর 'Discovery of India'-র অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন স্বামীজীর কাছ থেকে। আজ ভারতবর্ষ যে সংকটের মুখে, সেখানে আত্মবিশ্বাস, বৈচিত্র্য সমন্বয় ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা ছাড়া সমাধানের পথ নেই। স্বামীজীর মহাবাক্য দিয়ে শেষ করি: "উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি।"[১২] এই কথার ও কাজের, মাথার ও হাতের বৈপরীত্য দূর করে, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীকে সত্যকার ভাই মনে করে, দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করে—যতদিন না মানব-কল্যাণে নিজেদের নিষ্কামভাবে নিয়োজিত করব—ততদিন সত্যিকারের মুক্তি আসবে না। নেতি নেতি নয়—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই হলো স্বামীজীর বেদান্ত। সমষ্টির মুক্তি ছাড়া ব্যষ্টির মুক্তি সম্ভব নয়—এই হলো স্বামীজীর বেদান্ত-ভাষ্য।

আমার কানে বাজছে সেই বজ্রনাদ: "কি করলি বল্ দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পারলিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত-ফেদান্ত পড়বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানব—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।"[১৩] *

১২ বাণী ও রচনা, ১৩৮০, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭১

১৩ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬

* স্বামী বিবেকানন্দের ১২৮তম জন্মতিথি দিবসে (১৮ জানুয়ারি, ১৯৯০) বেলুড় মঠে প্রদত্ত ভাষণ।

প্রবন্ধ

শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনের পরে

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলন শুরু হবার আগেই এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনটি মতামত স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ (১) খ্রীস্টীয় মৌলবাদীরা ভেবেছিল, এই ধরনের সম্মেলন খ্রীস্টীয় আন্দোলনের পরিপন্থী, কারণ বিশ্বে একমাত্র সত্যধর্ম হলো খ্রীস্টধর্ম—অন্যান্য ধর্মগুলি সবই ভুয়ো, মিথ্যার জঞ্জাল। সুতরাং ধর্মসম্মেলন—যেখানে সব ধর্মমতকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হবে—সেখানে যোগদানের অর্থ মিথ্যাকে সত্যের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে স্থাপন করা। অতএব এথেকে দূরে থাকাই খ্রীস্টীয় আনুগত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (২) দ্বিতীয় দলটির অভিমত প্রথমটির থেকে পৃথক কিছু নয়—কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল কিছু ধূর্ততা। তাঁরা চেয়েছিলেন, একটি মঞ্চে যখন সকল ধর্মমত উপস্থাপিত হবে তখন খ্রীস্টধর্মের আলোকে অন্যান্য ধর্মমতগুলির অন্তঃসারশূন্যতা ও অসারতা আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠবে, ফলে খ্রীস্টধর্ম নতুনতর শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে বিশ্ববাসীকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করবে—খ্রীস্টীয় আন্দোলন নবতর উদ্দীপনা লাভ করবে। প্রকৃতপক্ষে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অধিকাংশ মুখে ধর্মীয় সাম্য ও পরস্পরকে চেনা-জানার কথা বললেও অন্তরে এই অভিমতই পোষণ করতেন।

(৩) তৃতীয় একটি সংখ্যালঘু দল ছিল, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও উন্মুক্ত। এঁরা খ্রীস্টীয় আবহাওয়ায় মানুষ হলেও নতুন চিন্তার প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সমাজ ও সভ্যতার নতুন নতুন সমস্যা ধর্ম সম্পর্কে কিছু মানুষকে সংশয়বাদী করে তুলেছিল। একদিকে খ্রীস্টীয় পাপবাদ, অনুশাসনের কঠোরতা, পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য, আধ্যাত্মিকতার বদলে বৈষয়িকতার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক তাঁদের মনকে যেমন ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, তেমনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যুক্তিবাদী বিচারে তাঁদের ধারণা ও সংস্কারগুলি ক্রমশঃ মূল্যহীন হতে শুরু করেছিল। তাঁরা উদারতর, সমকালীন জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

প্রথম শ্রেণীটি পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নের (ধর্ম-মহাসম্মেলন) সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চললেও সম্মেলনের গতিপ্রকৃতির দিকে সর্বদাই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল এবং যথাকালে তীব্র সমালোচনা থেকেও বিরত ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীটিই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এদের বিস্মিত করে এক অপরিচিত গৈরিকধারী হিন্দু সেই সম্মেলনকে কিভাবে স্বপক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন তার সরস বর্ণনা দিয়েছেন পার্লামেন্টে যোগদানকারী সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিরাম ম্যাক্সিম, সম্মেলন সমাপ্তির ২০ বছর পরেঃ

"আমেরিকার প্রোটেস্টান্টরা, যাঁরা ছিলেন সংখ্যায় সর্বাধিক, ভেবেছিলেন, ধর্মসম্মেলনে তাঁরা খুব সহজেই বাজিমাৎ করবেন। প্রভূত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কর্মসূচী ধরে তাঁরা এগোচ্ছিলেন। ভাবখানা ছিল, 'দ্যাখো, তোমাদের কিভাবে নস্যাৎ করি।' কিন্তু তাঁদের দেবার মধ্যে ছিল কতকগুলি পুরনো বস্তাপচা বুলি, যা নোভাস্কোশিয়া থেকে কালিফোর্নিয়ার প্রতিটি ক্ষুদ্র গ্রাম ও পল্লীতে বারবার কপচানো হয়েছে হাজার বছর ধরে। এতে কেউই আকর্ষণ বোধ করল না—কেউ চেয়েও দেখল না।

"কিন্তু বিবেকানন্দ যখন কথা শুরু করলেন, তারা দেখতে পেল এবার তাদের সামনে একজন নেপোলিয়ন উপস্থিত, এঁর সঙ্গে রীতিমত যুঝতে

হবে। বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতা ঐশ্বরিক উন্মোচনা ভিন্ন আর কিছু নয়।··· বিবেকানন্দ হয়ে দাঁড়ালেন সেদিনের জনারণ্যের কেশরী (Lion of the day)। শীঘ্রই তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বিপুল হয়ে দাঁড়াল। তাঁর কথা শোনার জন্য এত লোক ভিড় করত যে, কোন হলেই স্থান সঙ্কুলান হতো না। এতদিন পর্যন্ত এরা এশিয়ায় কিছু হাঁদা মেয়ে আর অর্ধশিক্ষিত আহাম্মক ছেলে এবং সেইসঙ্গে লাখ লাখ ডলার পাঠিয়ে এসেছে বছরের পর বছর। উদ্দেশ্য ছিল, সেখানকার দরিদ্র, অজ্ঞানতায় তিমিরাচ্ছন্ন হিদেনদের ধর্মান্তরিত করে তাদের নরক-সম্ভাবনা থেকে উদ্ধার করা। পার্লামেন্টে তারা দেখল, সেই পতিত মানুষদেরই একটি নমুনা—তিনি যে-পরিমাণ আধ্যাত্মিকতা জানেন, এদেশের (আমেরিকার) সমস্ত পাদ্রী ও মিশনারীর জ্ঞান যোগ করলেও তার ধারে কাছে পৌঁছায় না। এর সঙ্গে তর্ক অসম্ভব। বিড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে তিনি পাদ্রীদের নিয়ে সেইরকম খেলা করতে লাগলেন। তারা তখন আর কি করে? সর্বদা তারা যা করে থাকে তাই করল—শয়তানের চর বলে তাঁকে ধিক্কার দিল। কিন্তু ততক্ষণে বিবেকানন্দ আসল কাজটা সেরে ফেলেছেন—বীজ বপন করে দিয়েছেন। আমেরিকানরা ভাবতে শুরু করেছে 'এই লোকটির দেশে আমরা সেইসব মিশনারী পাঠিয়ে কেন টাকা নষ্ট করছি, যারা এঁর তুলনায় ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানে না। না, আর নয়।' ফলে মিশনারীদের বাৎসরিক আয় লাখ দশেক ডলারেরও বেশি কমে গেল।"

আমেরিকাবাসীর মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক বিচিত্র ধারণা গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ মিশনারী ও কিছু পর্যটকের কৃপায়। এই ব্যাপারে ক্যালেব রাইটের (Caleb Wright) 'ইন্ডিয়া এ্যান্ড ইট্‌স্‌ ইনহ্যাবিট্যান্টস্‌' বইটি আমেরিকান সমাজের মানসিকতা গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। রাইট তাঁর বইতে বেশ মানানসই ছবি দিয়ে পৌত্তলিক মা তার শিশু-সন্তানকে কুমীরের মুখে ফেলে দিচ্ছে অথবা বিধবারা স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিচ্ছে অথবা জগন্নাথের রথের চাকার তলায় ধর্মোন্মাদ মানুষ আত্মাহুতি দিচ্ছে ইত্যাদি ঘটনার নানা বর্ণনা দিয়েছেন। কাহিনীগুলি মানুষের মনে কতখানি গেঁথে গিয়েছিল তার একটা উদাহরণ পাই একজন জাহাজী ক্যাপটেনের গল্পে। একবার প্রাচ্যগামী একটি জাহাজের যাত্রী যখন উক্ত ক্যাপটেনের কাছে শুনতে পেল যে, সে বেচারী সেখানে পৌঁছে এসব কিছুই দেখতে পাবে না তখন সে হতাশায় মেজাজ হারিয়ে বলেছিল, তাহলে প্রাচ্যে আর কাব্য রইল কোথায়? এরচেয়ে বাড়ি ছেড়ে না-আসাই ভাল ছিল।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এই ধরনের কাহিনী পরিবেশন করে ছাত্রদের সহানুভূতি জাগ্রত করে তাদের কাছ থেকেও মিশনারীরা টাকা তুলত। রবিবার চার্চের প্রার্থনাসভায় মাসে একদিন এইসব কাহিনী যথেষ্ট করুণ করে শুনিয়ে ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত আদায় হতো। বোস্টন চার্চের পাদ্রী গর্ডন অহংকার করে বলেছিলেন, তিনি এমনকি এক দরিদ্র পরিচারিকার কাছ থেকেও ৫০ ডলার আদায় করেছেন। আর এক দরিদ্র বৃদ্ধা যিনি ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন, বৃদ্ধ বয়সের সম্বল বলতে যাঁর হাজার খানেক ডলার, তাঁর কাছ থেকেও ৮০০ ডলার বাগাতে পেরেছিলেন।

পার্লামেন্টের আগে এবং পার্লামেন্টে স্বামীজী আমেরিকার বৃহত্তর সমাজের চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তখন তাঁর মধ্যে এক নতুন কর্মোদ্যম দেখা দিয়েছে।

স্বামীজীর ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদানের প্রকৃত লক্ষ্য যাই হোক না কেন সম্মেলন-পরবর্তী কালে তিনি প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে লিসিয়াম লেকচার ব্যুরোয় যোগ দিয়েছেন। এই ধরনের লেকচার ব্যুরো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। বক্তা তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট তারিখে বক্তৃতা দেন এবং শর্ত অনুযায়ী প্রতিটি বক্তৃতার জন্য নির্দিষ্ট টাকা পান। সেখানে বক্তৃতার যাবতীয় ব্যবস্থা, যথা হলের সংরক্ষণ, টিকিটমূল্য নিরূপণ, প্রচার প্রভৃতির যাবতীয় ভার থাকে ব্যুরো কর্তৃপক্ষের হাতে। বক্তার পারিশ্রমিকের টাকা বাদ দিয়ে বাকি সবটাই যায় ব্যুরো কর্তৃপক্ষের

তহবিলে। স্বামীজী আমেরিকার পদ্ধতির সঙ্গে অপরিচিত, তাঁর পক্ষে সর্বত্র বক্তৃতাব্যবস্থা করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং লেকচার ব্যুরোতে যোগদানই তাঁর পক্ষে সহজ পথ ছিল, কিন্তু লিসিয়াম লেকচার ব্যুরো তাঁর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এমনভাবে শর্ত ঠিক করেছিল যাতে তিনি দিনের পর দিন একস্থান থেকে অন্যস্থানে অবিশ্রাম ছুটে বেড়িয়েছেন। বক্তৃতাকালে সভায় ভিড় উপচে পড়েছে, টিকিট-মূল্যও বেশ চড়া, অথচ তাঁর প্রাপ্য দাঁড়িয়েছে সামান্য, সিংহভাগ আত্মসাৎ করেছে ব্যুরো কর্তৃপক্ষ।

স্বামীজী প্রধানতঃ যে দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই বক্তৃতা-সভায় যোগদান করেছিলেন তা হলো: (১) আমেরিকান সমাজে ভারত সম্পর্কে যেসব ধারণা মিশনারী ও পর্যটকদের কল্যাণে প্রচলিত ছিল তা দূর করে ভারতের সঠিক পরিচয় যুক্তরাষ্ট্রবাসী তথা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা এবং (২) ভারতের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ, যাতে তিনি তাঁর পরিকল্পনামতো সন্ন্যাসী-শিক্ষক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে পারেন। স্বামীজীর পরিকল্পনায় এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা-প্রাপ্ত সন্ন্যাসীরা ভারতের সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষকে ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করবেন, তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবেন। অবশ্য এই দুই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ছিল আমেরিকানদের কাছে আধ্যাত্মিক চেতনার নবদিগন্ত উন্মোচনের প্রয়াস, কারণ স্বামীজী ভিক্ষার ঝুলিতে বিশ্বাস করতেন না—বিশ্বাস করতেন দেওয়া-নেওয়ার স্বাভাবিক ও সম্মানজনক রীতিতে। তাঁর বক্তৃতার বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিলে একটা জিনিস সহজেই চোখে পড়বে যে, প্রায় ক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছেন 'ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি' এবং অপেক্ষাকৃত কম হলেও অনেক ক্ষেত্রে 'ভারতের নারী'। মিশনারীদের সঙ্গে এই বিষয়নির্বাচনই ছিল সংঘাতের বড় কারণ। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকান সমাজে ভারতের রীতিনীতির কলঙ্কিত চিত্র উপস্থাপিত করে আসছিলেন এবং তার মাধ্যমে সামাজিকভাবে যে বিশ্বাসটা গড়ে তুলেছিলেন স্বামীজীর বক্তৃতা তাতে চিড় ধরাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল—তাদের প্রচার যে মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল এটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমেরিকায় তখন নারী-জাগরণের যুগ—মিশনারীদের অনেকখানি শক্তি যুগিয়েছিল মার্কিন নারীসমাজ। ভারতের নারীজাতির দুর্দশা বর্ণনা ও সেখানে প্রচলিত রীতিনীতিতে নারীর শোচনীয় অবস্থা এই নবজাগ্রত নারীচেতনাকে আহত করার দরুণ স্বভাবতই তারা মিশনারীদের প্রতি আনুকূল্যে অকৃপণ ছিল। দেখা যায়, আমেরিকা প্রবাসকালে স্বামীজী যেমন মহীয়সী নারীর সহায়তা পেয়েছেন, তেমনি সমপরিমাণে নারীদের কাছ থেকে বিরোধিতাও পেয়েছেন এবং এব্যাপারে 'চার্চের মেয়েরা' (Church women) সবচেয়ে বেদনাদায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ভারতীয় সমাজে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা কি, সামাজিক বিন্যাসের ঐতিহাসিক কারণ ও প্রকৃতি কি, ভারতীয় নারীর প্রকৃত মহত্ত্ব কোথায়—সবকিছুই স্বামীজী শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করার প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সামনে উপস্থাপিত হতো সেই একঘেয়ে মিশনারী প্রশ্নগুলি: ভারতে কি বিধবাদের জোর করে স্বামীর চিতায় নিক্ষেপ করা হয়? কেবলমাত্র নবজাত শিশুকন্যাদেরই কি কুমীরের সামনে নিক্ষেপ করা হয়? জগন্নাথের রথচক্রের তলায় দলে দলে মানুষ আত্ম-বিসর্জন দেয়? প্রথম দিকে স্বামীজী যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেন, কিন্তু পরবর্তী কালে একই প্রশ্ন বারবার উচ্চারিত হওয়াতে তাঁর উত্তরে কিছু শ্লেষ মিশ্রিত হতো। যেমন কোন মহিলার প্রশ্ন 'ভারতে কি কেবলমাত্র শিশুকন্যা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের কুমীরের মুখে ফেলে দেওয়া হয়?' অবিচলিত কণ্ঠে স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ মহাশয়া, কথাটা সত্য। সেই কারণেই ভারতে এখন প্রসবাদি কর্ম পুরুষদেরই করতে হচ্ছে।' সহমরণের প্রশ্ন শুনে নাটকীয় ভাবে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিতেন, 'কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চিতভাবে জানাতে পারি ওদেশে ডাইনী পোড়ায় না' (কিছুকাল আগে সালেমে একটি স্ত্রীলোককে ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সেই ঘটনার উল্লেখ স্বভাবতই শ্রোতাদের স্তব্ধ করেছিল। তবে স্বামীজী এখানে শুধু সালেমের ঘটনাটির জন্য খোঁচা দেননি, সাধারণভাবে খ্রীস্টীয় মতবাদে এটি হত্যার একটি স্বীকৃত ও প্রচলিত

পন্থতি, যা দীর্ঘকাল ধরে খ্রীস্টীয় জগতে বলবৎ ছিল।)

মিশনারীরা এইসব ঘটনা নিয়ে যে প্রচার শুরু করেছিল তা অনেক চিন্তাশীল মানুষকে বিরক্ত করে তুলেছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। একজন খ্রীস্টীয় যাজক রেভারেন্ড এ. ডি. রোয়ে (A. D. Rowe) তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছিলেন ঃ

"কেতাবী ভারতবর্ষের বাইরে আর একটা ভারতবর্ষ আছে। এই দুয়ের মধ্যে মিলের অভাব এমনই যে, যদি কোন বই-পড়া ছাত্র গাইড ছাড়া কোন হিন্দুর গ্রামে হাজির হয় তাহলে সে তাকে চিনতেই পারবে না। ইউরোপীয় পর্যটকদের লেখা এইসব বইয়ের রচনাকারীরা বেশিরভাগই তাদের যাত্রাপথটা শহর ও বড় বড় নগরের মধ্যে সীমাবন্ধ করে রেখেছেন যেখানে তারা অনাবৃত হিন্দু জীবনযাত্রাকে দেখতেই পান না। এইসব বইয়ের বেশির ভাগই লেখা হয়েছে পাঠকের জ্ঞানবৃন্ধির জন্য নয়, তাকে চমকিত করার জন্য। ফলে তাদের মনে এই ধারণাটাই গড়ে ওঠে যে, সে-দেশের মেয়েদের তোতাপাখীর মতো খাঁচায় আবন্ধ করে রাখা হয়, সেখানে বিধবাদের জীবন্ত দগ্ধ করা হয় এবং শিশুদের ঝুড়িতে করে ঝুলিয়ে রাখা হয় পাখিদের আহার্য হিসাবে অথবা গঙ্গায় কুমীরের মুখে ছুঁড়ে দেবার জন্য। সে-দেশে আছে ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেশীয় রাজা, আত্মনিগ্রহকারী ভক্তমণ্ডলী, মন্ত্রোচ্চারণকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিত, জহরতে আচ্ছাদিত নর্তকী এবং হিংস্র বেঙ্গল টাইগার। লক্ষ লক্ষ প্রশান্ত মানসিকতাসম্পন্ন সাধারণ মানুষ যারা আমাদেরই মতো পরিশ্রমরত জীব, যারা আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, সহানুভূতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবনযাপন করছে, তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না বা খুব সামান্যই বলা হয়।"

রেভারেন্ড কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেননি। ভারতবর্ষ সম্পর্কে মিশনারী ও বিদেশী প্রচারকদের কুৎসা রটনা যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে তার একটি ছোট নিদর্শন সমকালে বিবেকানন্দ-বিদ্বেষী 'অক্সিডেন্টাল' ছদ্মনামধারী লেখকের এক ভয়াবহ চিত্রে প্রকাশিত ঃ

"বিভীষিকা! প্রবল বিভীষিকা! সামগ্রিক শিশুহত্যা, কেউটে, কুমীর, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যাচার! ম্যাকবেথের ডাইনীদের কড়াই কি এর সমতুল্য নয়?"

শিকাগো পরিত্যাগ করে স্বামীজী একটির পর একটি শহরে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। সেখানকার উদার মতাবলম্বী যাজক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আনুকূল্যও লাভ করছেন কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা যতই বেড়ে চলেছে ততই কট্টরপন্থীদের প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে উঠছে। প্রায় সর্বত্রই তাঁর বিরুদ্ধে চার্চের মঞ্চ থেকে কিছু-না-কিছু প্রতিবাদ উত্থিত হচ্ছে কিন্তু চরম অবস্থা দেখা দিল ডেট্রয়েটে।

২২ জানুয়ারি (১৮৯৪) স্বামীজী মেমফিস থেকে কয়েকদিনের জন্য শিকাগোয় ফিরে আসেন। ১২ ফেব্রুয়ারি শিকাগো থেকে রওনা হয়ে সারাদিন তাঁর কেটেছে ট্রেনে আর বরফের মধ্যে, পেঁাছেছেন রাত্রি ১টায়। শিকাগো থেকে ডেট্রয়েট রেলে ২৭০ মাইল পথ, কিন্তু সেদিন রেলপথের কিছু অংশ বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। দুধারে ইঞ্জিন লাগিয়ে বরফ কেটে কেটে ট্রেন পেঁাছায় নির্দিষ্ট সময়ের ৭ঘণ্টা পরে। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত্রে প্রথম সাধারণ বক্তৃতা দেন ইউনিটেরিয়ান চার্চে। পূর্বদিন অর্থাৎ ১৩ তারিখে সন্ধ্যায় শ্রীমতী ব্যাগলি (স্বামীজী এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ডেট্রয়েটে) তাঁর একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। ডেট্রয়েটের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং নির্বিঘ্নেই সে-অধিবেশন শেষ হয়েছিল, কিন্তু পরদিন ইউনিটেরিয়ান চার্চের সাধারণ সভার পরেই ঘটল বিস্ফোরণ। মেথডিস্ট চার্চের বিশপ নিনডে স্বামীজীকে শ্রোতাদের কাছে পরিচিত করতে গিয়ে খ্রীস্টীয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন ঃ "ধর্মবোধ ও কর্তব্য সম্বন্ধে ওঁর চিন্তাধারার সঙ্গে যদিও আমার প্রভূত ব্যবধান, তবু আমি সেই দিনটির জন্য প্রার্থনা জানাই যেদিন পরিচ্ছন্ন ঐশ্বরিক আলোক আমাদের ওপর বর্ষিত হবে—সে-আলোকে সকল দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ পরস্পরের দিকে তাকাতে পারবে এবং সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে একজন সাধারণ ত্রাণকর্তার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।" বলা বাহুল্য বিশপ যে 'সাধারণ ত্রাণকর্তা'র

স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যাঁর ছত্রছায়ায় একদিন সমগ্র বিশ্বের অবস্থিতি কল্পনা করেছিলেন, তিনি যীশু। পূর্বে 'ফ্রী প্রেস'-এর রিপোর্টে স্বামীজীকে ব্রাহ্ম-সমাজের হিন্দু সন্ন্যাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। নিনডে স্বামীজীকে ব্রাহ্মসমাজের লোক ভেবে নিয়ে আশা করেছিলেন, তাঁর মুখ থেকে পৌত্তলিক হিন্দুদের কদাচার সম্পর্কে বেশ মুখরোচক কিছু শুনতে পাবেন। কিন্তু স্বামীজী বিশপ-কথিত পৌত্তলিকদের খ্রীস্টীয় আলোকে স্নাত ও শুদ্ধ হওয়ার বাসনায় বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠতে পারেননি, তদুপরি বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি'। স্বামীজী সংযত অথচ দৃঢ়ভাবে জানালেন : "ভারতে সাধারণ মানুষের ভাগ্যবিড়ম্বনার যন্ত্রণা ও দুঃখভোগের মধ্যে যে বিনম্র সহনশীলতা আছে তা কিছুটা খ্রীস্টতুল্য। এ ধরনের দেশে 'নতুন চিন্তাধারায়' দীক্ষিত করার জন্য খ্রীস্টীয় মিশনারীর প্রয়োজন নেই, কারণ সেখানে যে ধর্ম বর্তমান তাই তাদের শান্ত, মধুর, বিবেচক এবং সকল মানুষ ও প্রাণীর প্রতি দয়াবান করে তুলেছে। ...নৈতিকতার দিক থেকে ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্র অথবা বিশ্বের যে-কোন দেশের চেয়ে অনেক উঁচুতে। মিশনারীরা সেখানে গিয়ে বিশুদ্ধ জল পান করতে পারেন, দেখতে পারেন সেখানকার সৎ ও পবিত্র মানুষেরা এ-পর্যন্ত বৃহত্তর জনসমষ্টির ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।"

বিশপ নিনডে স্বয়ং মিশনারী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত—সেই কার্যাবলী পরিদর্শনের জন্য কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর চীন সফরে যাওয়ার কথা। সেখান থেকে সময় পেলে একবার ভারত পরিদর্শনেরও পরিকল্পনা তাঁর ছিল। বিবেকানন্দের বক্তৃতায় তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। পরদিনই তিনি 'ফ্রী প্রেস' সংবাদপত্রে চিঠি পাঠিয়ে বিবেকানন্দের সভায় উপস্থিত থেকে এবং তাঁকে পরিচিত করে দিয়ে যে গর্হিত কাজ করেছেন তার জন্য সর্বসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও যোগ করেছেন যে, "পরিশ্রমী ও স্বার্থ-বোধহীন মিশনারীদের কাজ উচ্চ ও অকৃপণ প্রশংসার যোগ্য—নাসিকাকুঞ্চন বা সমালোচনার আদৌ যোগ্য নয়...ভারতের জনসমষ্টি দ্রুত কুসংস্কারের গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে এবং যে-ধর্ম তাদের সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে তাদের প্রবল আগ্রহেই ভারতে মিশনারীরা সাফল্য লাভ করেছে।"

শুরু হলো সংগ্রাম।

স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতায় নিনডে আর উপস্থিত হলেন না। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে স্বামীজীর বক্তৃতার বিবরণী প্রকাশ করতে সতর্ক হয়ে উঠল অথবা বিরূপ সমালোচনা শুরু করল। স্বামীজী এনিয়ে একেবারেই মাথা ঘামালেন না অথবা তার প্রয়োজনই হলো না। কারণ, বিদগ্ধ মহলে তাঁর অনুগামী সংখ্যাও যথেষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং তাদের পক্ষ থেকে তিনখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হলো 'ফ্রী প্রেস' পত্রিকায়। এর মধ্যে ও. পি. ডেলডক ছদ্মনামের আড়ালে ভদ্রলোকটির পত্রগুলি যথেষ্ট আক্রমণাত্মক। একটি পত্রে তিনি নিনডের সমালোচনা করে শ্লেষাত্মক ভাষায় লিখলেন : "ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকলে বিশপ নিশ্চয় জানতেন খ্রীস্ট আগমনের অনেক আগেই ভারত বুদ্ধ, ব্রহ্ম, কনফুশিয়াস ও অন্যান্য নৈতিক সংস্কারকদের নীতি ও সদ্‌গুণাবলীর বনিয়াদ সম্পর্কে সুবিদিত ছিল। সেখানে বহুযুগ আগেই মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে। প্রকৃত মিশনারী হিসাবে ভারতে গিয়ে গস্‌পেলের শান্তি ও প্রেমের সুসমাচার শিক্ষা দেওয়ার আগে বিশপকে একটি প্রধান পাঠ গ্রহণ করতে হবে—সেটি হলো, 'মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজিত'।"

নিনডের নিন্দাসূচক আরও দুটি পত্রের লেখক 'এ লাভার অব ফেয়ার প্লে' এবং ই. জে. জে.।

নিনডে-উপাখ্যান শেষ হলেও তখন থেকে যে সংগ্রাম শুরু হলো তা ডেট্রয়েটের সমাজকে রীতিমতো আলোড়িত করে তুলেছে এবং পরবর্তী প্রত্যেকটি বক্তৃতার পর চার্চের প্রার্থনাসভায় গোঁড়া যাজকরা রীতিমতো শোরগোল তুলেছে। তার ঢেউ এসে পৌঁছেছে সংবাদপত্রের পাতায়। সংবাদপত্রে স্বামীজীর পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক চিঠিপত্র প্রকাশিত হলো—স্বামীজীর পক্ষে যেমন 'ডেলডক' ও 'জাস্টিশিয়া' ছদ্মনামধারী কলম ধরলেন তেমনি সনাতনপন্থীদের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালেন

'অক্সিডেন্টাল' ছদ্মনামধারী জনৈক ব্যক্তি। বিরোধীরা স্বামীজীকে 'ভণ্ড', 'প্রতারক', 'মিথ্যাবাদী' ইত্যাদি নানা খ্রীস্টীয় সৌজন্যসূচক বিশেষণে ভূষিত করল। প্রায় প্রত্যেক ডাকে স্বামীজীর নামে নানা অপমানসূচক চিঠি আসতে লাগল, কিন্তু স্বামীজী কোন কিছুরই উত্তর না দিয়ে অকুতোভয়-যোদ্ধার মতো একটার পর একটা বক্তৃতা দিয়ে চললেন এবং সেখানে লোকসমাগমেরও বিরাম ছিল না। এইভাবেই ডেট্রয়েট-পর্ব শেষ করে পূর্বব্যবস্থামতো স্বামীজী ২৩ ফেব্রুয়ারি আডা (ওহিও) অভিমুখে যাত্রা করলেন।

॥ ৪ ॥

স্বামীজী ডেট্রয়েট পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে চার্চমঞ্চ থেকে শুরু হলো তাঁর বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গিরণ। এক লেখকের ভাষায় "পদাঘাতে চার্চের গদিতে সঞ্চিত যাবতীয় ধুলো" উড়িয়ে দিল সনাতনপন্থী যাজকরা। সংবাদপত্রেও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে আরম্ভ হলো; উদারপন্থীরা চুপ করে বসে রইলেন না—তাঁরাও সাময়িকপত্রে পাঠাতে লাগলেন সমুচিত জবাব। রেভারেন্ড স্টুয়ার্ট এবং ইহুদী যাজক (র‍্যাব্বি) গ্রসম্যান প্রকাশ্য প্রার্থনা সভাতেই স্বামীজীকে সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন। র‍্যাব্বি গ্রসম্যান বললেন: "আমরা পাশ্চাত্যবাসী—আমাদের ঈশ্বর থাকেন আকাশে কিন্তু কানন্দের ঈশ্বর মর্ত্যবাসী। আমাদের ঈশ্বর স্বর্গীয় ভাবে অলস, ব্যতিক্রম শুধু রবিবারে। সেদিন কিছু দুর্ভাগা প্রার্থনা জানিয়ে তাঁকে সামান্য কাজ দেয় এবং আশীর্বাদ বর্ষণ ও ছোটখাট কার্যসম্পাদনের জন্য সক্রিয় করে তোলে। আসুন, আমরা ঐ হিন্দুর কাছে শিক্ষালাভ করি যে, ঈশ্বর নিত্য বিরাজমান। তাঁর উপস্থিতি উদ্যানের প্রতিটি পুষ্পে, শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসে, রক্ত-স্পন্দনে।"

স্বামীজী ডেট্রয়েট পরিত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই 'ডেট্রয়েট স্টুডেন্ট ভলেন্টিয়ার মিশনারী মুভমেন্ট'-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হলো। ঐ সম্মেলন সম্পর্কে খ্রীস্টান এ্যাডভোকেট পত্রিকায় লেখা হয়েছে:

"বিবেকানন্দ এবং তাঁর বক্তৃতার চমৎকার প্রতিষেধক।... তাঁর সুকোমল কুযুক্তি যে মোহিনী মায়া বিস্তার করেছিল তা বলিষ্ঠ এক ধর্মবিশ্বাস এবং যারা পৌত্তলিকতাবাদের নিজস্ব ভূমিতে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করেছে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে কুয়াশার মতো বিলীন হয়ে গেল। বিদায় বিবেকানন্দ।"

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বিবেকানন্দ বিদায় নেবার বদলে মিশনারী চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। মিশনারীদের সম্পর্কে স্বামীজীর অন্যতম অভিযোগ ছিল, ভারতের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির অভাবে তারা ভারতের মাটিতে পৌঁছেও সেখানকার মানুষের অন্তরে পৌঁছাতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রচারিত খ্রীস্টধর্মের নিজের মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার অভাব, বৈষয়িকতার আধিপত্য—ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে তার স্থান নেই। ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবক মিশনারী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নতুন শ্লোগান বড় বড় হরফে চারদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো: "আমাদের নতজানু হয়ে অগ্রসর হতে হবে।" আর এই সম্মেলনের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো (সমকালীন সাময়িকপত্রের ভাষায়). "আধ্যাত্মিক সুরের অনুরণন··· শিক্ষা, সংস্কৃতি, পদ্ধতি এবং অন্যসব ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের আধ্যাত্মিকতার অধীনে স্থান লাভ।"

এই সম্মেলনের বিপুল সাফল্য মৌলবাদীদের আশান্বিত করলেও তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করেছে। সাফল্য এসেছে স্বামীজীর। সম্মেলনের বেশির ভাগ বক্তা তাদের বক্তৃতায় স্বামীজীকে আক্রমণ করলেও খ্রীস্টধর্মের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বের ওপর জোর দিলেন বেশি।

সনাতনপন্থীদের খ্রীস্টীয় চার্চ থেকে ক্রমাগত বিষোদ্গার এবং সম্মেলনের বিভিন্ন বক্তার রণহুঙ্কার কিন্তু স্বামীজীর বন্ধু ও অনুগামীদের বিচলিত করেনি। তাঁরা এর যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার জন্য স্বামীজীকে ডেট্রয়েট প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করেছেন। অন্যান্য কর্মসূচী স্থগিত রেখে তিনি ৯ মার্চ ডেট্রয়েটে ফিরে এসেছেন।

এই প্রতিকূল অবস্থা ও যাবতীয় প্ররোচনার মধ্যেও স্বামীজী অবিচলিত। পরে তিনি একটি পত্রে লিখেছেন: "আমি জীবনে যত বাধা পাইয়াছি

ততই আমার শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে।" সেই স্ফুরিত শক্তি নিয়ে ১১ মার্চ আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী তিনি যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিলেন তার সম্পর্কে নিজেই একটি পত্রে লিখেছেন: "এযাবৎ যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছি তার মধ্যে শেষেরটাই সবথেকে ভাল।" ধর্ম-মহাসম্মেলনের বক্তৃতার কথা স্মরণ রেখেই একথা সত্য, কারণ ডেট্রয়েটে তিনি "যত বাধা" পেয়েছেন ধর্ম-মহাসম্মেলন তার তুলনায় কুসুমাস্তীর্ণ। সেদিন ডেট্রয়েটের অপেরা হাউসে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল আহত ভারতাত্মার ক্ষুব্ধ গর্জন: "খ্রীস্টান জাতিসমূহ বিশ্বকে রক্তপাত ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ করেছে। এখন তাদেরই দিন চলছে। তোমরা আমাদের দেশে বিনাশ ও হত্যাসাধন করেছ, মদ্যাসক্তি ও ব্যাধি এনেছ এবং তারপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে খ্রীস্ট-ধর্ম প্রচার শুরু করেছ—স্বয়ং খ্রীস্টকেই ক্রুশবিদ্ধ করেছ। এই ভয়াবহতার বিরুদ্ধে কোন খ্রীস্টানের কণ্ঠ শোনা গেছে? আমি কখনও শুনিনি। তোমরা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই একটা ধারণা গিলেছ, তা হলো, তোমরা দেবদূত, আমরা শয়তান।... মানুষের মধ্যে শুধু গুণ থাকলেই হবে না, সেই গুণকে উপলব্ধি করার জন্য তোমাদেরও গুণগ্রাহী হতে হবে। কুসংস্কার ও বীভৎস ঈশ্বরনিন্দায় তাকে হত্যা করা না হলে প্রত্যেকের অন্তরেই তা আছে।"

খ্রীস্টীয় বিষ উদ্‌গিরণ এখানেই থামেনি। উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়েই সৈনিক সন্ন্যাসীর অভীষ্ট পূর্ণতা লাভ করেছে। ডেট্রয়েটের সেই দিনগুলি স্বামীজীর যোদ্ধৃজীবনের চরম পরীক্ষা, যার দ্বারা তিনি আমেরিকার নবজাগ্রত চেতনাকে ক্রমশঃ বিকশিত করে তুলেছেন। বিবেকানন্দের কুৎসা-নিন্দা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই সেই চেতনা ক্রমশঃ সঞ্জীবিত হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ:

(১) মারি লুইস বার্ক—'স্বামী বিবেকানন্দ ইন্ দ্য ওয়েস্ট: নিউ ডিসকভারিজ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ৬-৭।
(২) স্বামীজীর পত্রাবলী।

স্মৃতিকথা

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকথা

স্বামী প্রভবানন্দ

ভাষান্তর: সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আমি মহারাজকে প্রথম দর্শন করি বলরামবাবুর বাড়িতে। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা দূর থেকে আমি তাঁকে দেখেছিলাম। অনেক লোক ছিল, আমি আর ভিতরে যাইনি। দ্বিতীয়বার তাঁকে দর্শন করি বেলুড় মঠে ১৯১১ কিংবা ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে। আমি তখন ১৭/১৮ বছরের তরুণ। একদিন সকালবেলায় তাঁকে দর্শন করেছিলাম। আমি মঠের দোতলায় বারান্দা-সংলগ্ন স্বামীজীর ঘর দেখছি—এইরকম ভাব করে দাঁড়িয়ে আছি। আসলে আমার দৃষ্টি ছিল পাশের দিকে—আমি মহা-রাজকেই দেখছিলাম। সোজা আমি তাঁর কাছে যাইনি, পাছে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন। একটু পরে তিনি আমাকে ডাকলেন: "বাবা, এদিকে আয়।" আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম। মহারাজ বললেন: "তোকে কি আগে দেখিনি? তুই কি যোগীন ঠাকুরের দলের (এই দলটি ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত একটি বিপ্লবী দল) লোক?' আমি বললাম: "না, আমি তাঁকে চিনি না।" তখন আমি কোথায় পড়ি ইত্যাদি কয়েকটি প্রাথমিক পরিচয়-সূচক কথার পর মহারাজ আমাকে তাঁর পায়ের মোজা খুলে রোদে দিতে বললেন। আমার এখনো মনে আছে মোজার রঙ ছিল ঘোর লাল। তারপর আমাকে তাঁর পা টিপে দিতে বললেন। আমিও তাই চাইছিলাম। এই হলো আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের ইতিহাস।

তারপর থেকে আমি প্রায়ই তাঁর নিকট যেতাম। কিন্তু আমি কখনো তাঁর কাছে কোন ধর্মোপদেশ চাইনি, তাঁর সঙ্গ পেয়েই আমি সুখী ছিলাম।

কয়েক সপ্তাহ পরে আমাদের বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমায় বলেন তাঁকে মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতে। আমি একদিন তাঁকে নিয়ে মঠে গেলাম। তিনি মহারাজের নিকট ধর্মোপদেশ চাইলেন। মহারাজ যখন তাঁকে কি করে ধ্যান করতে হয় এসম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। মহারাজ তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা। আমি বললাম: 'না'।

বাড়ি ফেরবার পথে শিক্ষক মহাশয় আমায় বললেন: "তুমি কোন উপদেশ চাইলে না কেন?" আমি বললাম: "আমার খুব লজ্জা করছিল।" তখনই আমি স্থির করলাম পরদিন মহারাজের কাছে যাব এবং সাধনোপদেশ চাইব। পরদিন সেই শিক্ষক মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। মহারাজ আমাদের দেখেই বললেন: "এই যে তোমরা দেখি আবার এসেছ!" আমি বললাম: "হ্যাঁ মহারাজ, আমি কিছু উপদেশ চাই।" মহারাজ তখন শিক্ষক মহাশয়কে সরে যেতে বললেন এবং আমাকে ধ্যানাভ্যাস সম্পর্কে কয়েকটি প্রাথমিক নির্দেশ দিলেন। কলকাতায় কোথায় জপের মালা পাওয়া যায় তা তিনি আমাকে বলে দিলেন। তারপর একটি ঘণ্টা কিনে এনে দিতে বললেন। বললেন, সেটি তাঁর প্রিয় পোষা গরুটির গলায় ঝুলিয়ে দিতে চান।

কয়েক মাসের মধ্যে আমি কলেজ ছেড়ে মহারাজের কাছে গিয়ে থাকবার সংকল্প করলাম। আমি আমার বাবাকে এক চিঠিতে জানিয়ে দিলাম যে, আমি মঠে যোগদান করছি। এটা ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। মহারাজ তখন কনখলে ছিলেন। আমি কনখল রওনা হলাম। সেখানে যাবার পথে আমি কাশীতে নামলাম এবং কাশী অদ্বৈত আশ্রমে উঠলাম। সেখানকার সাধুরা কেউই আমাকে চিনতেন না। তবুও তাঁরা আমাকে স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করলেন। আমি কনখল যাচ্ছি একথা তাঁদের বলাতে তাঁরা জানতে চাইলেন, আমি মহারাজের কাছে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছি কিনা। আমি তাঁদের বললাম, আমি যে যাচ্ছি তা মহারাজ জানেন না। শুনে তাঁরা বললেন: "না জানিয়ে যাওয়া, মহারাজ আদৌ পছন্দ করেন না।" তাই তাঁরা আমাকে যাওয়ার সংকল্প থেকে বিরত হতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁদের কথায় আমি নিরস্ত না হয়ে কনখল চলে গেলাম।

পরদিন সকালে আমি হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছালাম। যখন আমি আশ্রমে গিয়ে পৌঁছেছি তখন ভোর চারটে। তখনো অন্ধকার রয়েছে। আশ্রমে আমি কতকগুলি ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পেলাম। তারই কোন একটায় মহারাজকে পাব আশা করলাম এবং সোজা বারান্দায় উঠে একটি দরজার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহারাজ ঠিক সেই দরজা দিয়ে এবং তাঁর প্রধান সেবক স্বামী শঙ্করানন্দ অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। মহারাজ তখন শুধু বললেন: "এই যে তুই এখানে এসেছিস!" তারপর তিনি শঙ্করানন্দ মহারাজের দিকে ফিরে বললেন: "এই ব্রহ্মচারীটির জন্য একটি জায়গা করে দাও, ও এখানে থাকবে।"

মহারাজ কনখল আশ্রমে দুর্গোৎসব করবেন। কয়েকজন ভক্ত তাই কলকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে দিয়েছেন। মহারাজের একজন সেবক পূজা করবেন বলে স্থির হয়েছে। পূজার কয়েকদিন মহারাজ আমাকে তাঁর সেবকের কাজ করতে বললেন। আমার পক্ষে তো এটি অভাবনীয় আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। সেই কয়েকদিন এবং তার পরেও কয়েক সপ্তাহ আমি তাঁর সেবা করেছিলাম।

কনখলে আমরা চারজন একঘরে থাকতাম। আমাদের মধ্যে একজন হলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নবম সঙ্ঘগুরু স্বামী মাধবানন্দ। একদিন মহারাজ আমাদের ঘরে এলেন। চারটি শয্যা দেখে বললেন: "এক ঘরে তোমাদের তো বড় ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হয়।" তারপর মন্তব্য করলেন: "তোমরা জানো তো দুজন রাজা কখনো একই রাজ্যে

থাকতে পারে না, কিন্তু পঞ্চাশজন সাধু একটা কম্বলের নিচে থাকতে পারে।"

আমি মঠেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহারাজ আমাকে বললেন কলেজে ফিরে যেতে এবং লেখাপড়া শেষ করে আসতে। দুবছর বাদে আমি সঙ্ঘে যোগ দিলাম। মহারাজ আমার ভবিষ্যৎ ভাল করেই জানতেন, কারণ কনখলে থাকতেই তিনি আমাকে 'ব্রহ্মচারী' বলে অভিহিত করেন।

যখনই মহারাজকে দেখেছি, মনে হয়েছে তিনি যেন সর্বদা ঈশ্বরকে নিয়ে ঘর করছেন, চলছেন, ফিরছেন—কিন্তু তাঁর সত্তা যেন ঈশ্বরে ওতপ্রোত হয়ে আছে। সমাধি অবস্থা তাঁর পক্ষে খুব সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। অনেক সময়ই মঠের অধ্যক্ষতা করা, সকলকে শিক্ষা দেওয়া—এইসব কর্ম করবার জন্য তাঁর মনকে জোর করে নামিয়ে আনতে হতো। নিচের ঘটনাটি তার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ঘটনাটি আমাকে বলেন স্বামী অম্বিকানন্দ—মহারাজের অন্যতম সেবক।

আইনসংক্রান্ত একটি কাগজে মহারাজের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। তিনদিন হয়ে গেল, মহারাজ সই করছেন না। একদিন সচিব কাগজপত্র নিতে এসে দেখলেন মহারাজ কলম হাতে কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। একজন সেবক বললেন: "মহারাজ, দয়া করে ওটা সই করে দিন।" মহারাজ উত্তর দিলেন: "জানি, জানি। আমি চেষ্টা তো করছি। কিন্তু দেখ, নাম কি করে লিখতে হয় তা আমি ভুলে গিয়েছি।" সাধকপুরুষের মন অতীন্দ্রিয় চেতনায় ডুবে যাবার পূর্বে কয়েকটি প্রাথমিক লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। অনেকবার আমি দেখেছি মহারাজ কিভাবে মনকে সমাধিভূমি হতে জোর করে নামিয়ে রাখছেন। একবার চেয়ার থেকে উঠছেন, একবার ঘরের বাইরে গিয়ে পায়চারি করে আসছেন।

আমাদের ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিচ্ছেন না বলে আমি একবার তাঁর কাছে অনুযোগ করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন: "সবসময় আমি কি করে শিক্ষা দেব? আমি যখন দেখি ভগবান তোমাদের মধ্য দিয়ে কিভাবে লীলা করছেন তখন আমি তোমাকে কি করে শিক্ষা দিই বল?" পরে অবশ্য কয়েকবারই তিনি আমাদের ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছেন।

যদিও মহারাজ খুবই সহজ স্বাভাবিক আচরণ করতেন, তাহলেও এক এক সময় তাঁর পক্ষে ভাব গোপন করা শক্ত হয়ে পড়ত। একবারের কথা মনে পড়ছে। শ্রীশ্রীমা তখন কাশীতে আছেন, মহারাজও আছেন সেখানে। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর দেশের ভানুপিসীও ছিলেন। ভানুপিসী শ্রীশ্রীমায়ের বিয়ে দেখেছেন। তাঁর খুব সুন্দর গানের গলা ছিল। তিনি ঠাকুরকেও গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছেন। একদিন মাকে প্রণাম করে উঠে মহারাজ ভানুপিসীকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর সঙ্গে রঙ্গরস করতে লাগলেন। একটু পরে ভানুপিসী কৃষ্ণ বিষয়ক একটি গান ধরলেন। গান শুনে মহারাজের খুব উদ্দীপন হলো, তিনি ভাবসমাধিতে মগ্ন হলেন। শ্রীশ্রীমা সমস্ত দৃশ্যটি দেখলেন। মহারাজ চলে গেলে মা ভানুপিসীকে বললেন: "তুমি তো কম নও, তুমি রাখালের মনে উদ্দীপনা এনেছ! রাখাল যে সাগর গো।"

মহারাজ প্রতি বছর খ্রীস্ট-উৎসব পালন করতেন। ঐদিন মঠে যীশুর পূজা হয়। একবার মঠে খ্রীস্ট-উৎসবের দিন মহারাজ ও তাঁর গুরুভাই স্বামী শিবানন্দ গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ আনুষ্ঠানিক পূজা করছিলেন। শুনেছি, মহারাজ ও স্বামী শিবানন্দ উভয়েরই সেদিন যীশুর দর্শন লাভ হয়েছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দের কোন দর্শন না হলেও তিনিও অনুভব করেছিলেন যেন মন কত উচ্চে উঠে গেল, এবং সেবার তিনি পূজায় খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

একজন প্রকৃত সাধুকে চিনতে পারা সহজ নয়। এবিষয়ে স্বামী নির্বাণানন্দ আমাকে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বলেছিলেন। ঘটনাটি মহারাজের অন্যতম সেবক হিসাবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঘটনায় উল্লিখিত সেবক তিনি নিজে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক 'কথামৃত' পাঠ করে মহারাজের কথা জানতে পারেন। মহারাজ কত বড় মহাপুরুষ তা জেনে তার ইচ্ছা হলো মহারাজকে দর্শন করবেন। মহারাজ তখন

বলরামবাবুর বাড়িতে আছেন। বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণবাবু মঠের পরম ভক্ত। তিনি মহারাজের জন্য একটি ঘর নানান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত করে রেখে দিয়েছিলেন। মহারাজকে খুব সুন্দর একটি রেশমের পোশাকও তিনি দিয়েছিলেন।

একদিন যখন মহারাজের সেবক নিকটে নেই, তখন পূর্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয় এসে কাউকে না জানিয়ে মহারাজের ঘরে ঢুকে পড়েন। মহারাজকে বিলাসবহুল উপকরণের মধ্যে বসে হুঁকো করে তামাক খেতে দেখে মনে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। এই রামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র' যাঁকে তিনি কঠোর তপস্বী ভেবে এসেছিলেন। তিনি মহারাজকে আর নিজের পরিচয় না দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বারান্দায় বসে নিজের অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। সেবক ফিরে এসে অধ্যাপককে বারান্দায় বেঞ্চের ওপর উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। দর্শনার্থী ব্যক্তিটি যে ইতিমধ্যেই মহারাজের ঘর হয়ে এসেছেন একথা তিনি জানতেন না। তাই অধ্যাপকের কাছে এসে তাঁকে বললেন : "আপনি কি মহারাজকে দর্শন করবেন?" অধ্যাপকটি মুহূর্তের জন্য চিন্তা করলেন, তারপর বললেন 'করব'। সেবক তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। মহারাজ তাঁকে স্বাগত জানালেন। ঘণ্টাখানেক পরে মহারাজের ঘর থেকে বাইরে এসে তিনি সেবককে বললেন : "আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করতে বসেছিলাম। ধর্মের সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত ধারণানুযায়ী বাহ্য ব্যাপার দিয়ে মহারাজকে বিচার করতে যাচ্ছিলাম। এখন আমি দেখছি আমার জীবনের কঠিনতম সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।" পরে তিনি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেদিন পরে কি হয়েছিল, যাতে মহারাজ সম্পর্কে তাঁর ভুল ভেঙেছিল, তা অবশ্য তিনি সেবকের কাছে বলেননি।

মহারাজকে বোঝা খুবই শক্ত ব্যাপার ছিল। তিনি নিজে না বুঝিয়ে দিলে বোঝা প্রায় অসম্ভব ছিল। একবার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নাট্যকার গিরিশ-চন্দ্রকে লেখেন : "রাখালকে কেউই বোঝেনি।" উত্তরে আত্মদীপ্ত গিরিশচন্দ্র লেখেন : "খুব সত্য কথা। খুব কম লোকই রাখালকে বোঝে। রাখালকে যে বুঝতে পারবে, তাঁকে যে ভালবাসতে পারবে, সে তো তখুনি মুক্ত হয়ে যাবে। রাখালকে ভালবাসা আর ভগবানকে ভালবাসা একই কথা।"

দিনের পর দিন মহারাজের উপস্থিতিতে আমি একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। আমরা তাঁর কাছে নীরবে বসে থেকেছি। হয়তো সমস্যা বা দুশ্চিন্তা পীড়িত মন নিয়ে কাছে গিয়েছি। কোন কথা কেউ বলিনি, শুধু চুপ করে বসে রয়েছি। কিন্তু যখন তাঁর ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছি তখন মনে হয়েছে, আমাদের মন তিনি এত উঁচুতে তুলে দিয়েছেন যে, আমাদের চিত্তের সমস্ত মালিন্য দূর হয়ে গিয়েছে। মহারাজের সান্নিধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরে চলে যেত। তাঁকে আর ধর্মোপদেশ দিয়ে কথা বলে দিতে হতো না। আমরা তাঁর কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদ বা দর্শন শিক্ষা করিনি। মহারাজ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বর আছেন এবং তাঁকে অনুভব করা যায়, এবং তাঁর উপস্থিতি দিয়েই নীরবে তিনি আমাদের সম্মুখে সেই সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন।

অবশ্য সবসময়ই যে তিনি চুপ করে বসে থাকতেন তা নয়। এক-এক সময় এক-এক ভাব ছিল তাঁর। কখনো ছোট বালকের মতো লীলাচঞ্চল হয়ে উঠতেন। তখন তিনি রঙ্গরস করতেন, মজার মজার গল্প বলতেন আর আমরা উচ্চরবে হেসে ফেটে পড়তাম। তিনি শেখাতেন ধর্ম খুব আনন্দের ব্যাপার। অন্য সময় আবার তাঁর অন্য ভাব। তখন তিনি গম্ভীর প্রশান্ত। তখন তিনি যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করতেন সমস্ত মঠবাড়ি যেন তার দ্বারা স্পন্দিত হতো। পাছে তাঁকে বিরক্ত করা হয়, এই ভয়ে আমরা তাঁর নিকটে পর্যন্ত যেতে সাহস পেতাম না।

যেখানে মহারাজ যেতেন, সেখানেই যেন সারাক্ষণ উৎসব লেগে থাকত। অপরিচিত কোন ব্যক্তিও এই পরিমণ্ডলে এসে পড়লে একই অনুভূতি লাভ করতেন। যখন মহারাজ আমাদের তিরস্কার করেছেন, তখনো আমাদের এই অনুভূতি অব্যাহত থেকেছে। কখনো কখনো আমাদের নিজেদের চোখে বিনা অপরাধে বা সামান্য দোষ-ত্রুটির জন্য তিনি আমাদের তীব্র তিরস্কার করেছেন। অবশ্য আমরা কখনো

মহারাজের সঙ্গে এনিয়ে তর্ক বা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইনি। কারণ তিনি বুঝিয়ে দিতেন যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে যা প্রতীয়মান তারচেয়ে গভীরতম কোন কারণ ঐরূপ শাসনের পশ্চাতে কাজ করছে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেও সঙ্গোপনে আনন্দের ফল্গুধারা ঠিক বয়ে যেত। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন: "মা যখন ছেলেকে ধরে মারে, ছেলে তখনো 'মা মা' বলেই ডাকে।"

মহারাজের ভালবাসার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সকলেই মনে করত যে, মহারাজ বুঝি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। সেই অনন্য ভালবাসা ঈশ্বরের ভালবাসা ছাড়া আর কি হতে পারে?

মহারাজ তাঁর শিক্ষায় সহজযোগ বা সহজে ঈশ্বরের কৃপালাভের উপায়ের ওপর খুবই জোর দিতেন। সেই সহজ উপায়টি হলো, সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন। তিনি বলতেন: "জপ কর, ভগবানের নাম কর। যাই করনা কেন, ঈশ্বরের নাম যেন সারাক্ষণ অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মতো সবসময় চলতে থাকে।"

মহারাজ আমাকে দুটি বস্তুর জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। সে-দুটি বস্তু হলো—শুদ্ধা ভক্তি আর শুদ্ধ জ্ঞান। তিনি আমাদের সবভূতে ঈশ্বর দর্শন করে নিষ্কাম কর্ম ও ধ্যানকে যুক্ত করতে বলতেন। তিনি আমাদের সর্বদা বলতেন: "কর্মই উপাসনা। কর্মই উপাসনা।"

তাঁর নীতিশিক্ষায় মহারাজ পবিত্রতা ও সত্যাচরণের প্রতি খুব জোর দিতেন—বিশেষ করে সত্য আচরণের ওপর। তিনি বলতেন: "মানুষের সব অপরাধের জন্য তাকে ক্ষমা করা চলে, কিন্তু মিথ্যাচারের ক্ষমা নেই।"

মাঝে মাঝে আমি বিস্মিত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করতাম—মহারাজ কি হিন্দু, না খ্রীস্টান, না বৌদ্ধ? তাঁকে এভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। তিনি সোজাকথায় একজন ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ ছিলেন।

শাস্ত্র বা দর্শন অধ্যয়ন করে ভগবানকে জানা যায় না। যখন আমরা এমন ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ দেখি যিনি শাস্ত্রের জীবন্ত ব্যাখ্যা, তখনই আমরা ধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারি। আলোর স্পন্দন তো সর্বত্র আছে, এমনকি অন্ধকারের মধ্যেও। কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক বাল্বের মধ্য দিয়ে আলো দেখতে পাই, কারণ বাল্বটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। অনুরূপভাবে যাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করেছেন, তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় সত্য আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।

মহারাজ কে ছিলেন? মহারাজ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ; তিনি দিব্যভাবে আরূঢ় লোকগুরু; একটি মহান ধর্মসঙ্ঘের মহান নায়ক। কিন্তু তিনি স্বয়ং নিজস্বরূপ সম্বন্ধে কি বলেছেন?

আমরা ধর্মীয় ইতিহাসে সর্বকালেই দেখি যে, মানবকুলের মহান নায়কেরা অতি দুর্লভ মুহূর্তে ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের নিকট নিজস্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। বুদ্ধ বলেছেন: "আমিই বুদ্ধ, জ্ঞানী"। খ্রীস্ট বলেছেন: "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন। যে কেউ পিতার (ঈশ্বর) নিকট যেতে চায়, তাকে আমার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।" মহারাজ যখন সমাধি ও বাহ্যাবস্থার মাঝামাঝি থাকতেন তখন বলতেন: "জানা ও অজানার মধ্যে, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে আমিই সেতুস্বরূপ।" তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণ এই যে, যে-ঈশ্বরীয় শক্তি তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, তা দিয়ে তিনি যাঁদের জীবনে রূপান্তর এনে ধন্য করেছিলেন, তা তাঁদের মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে।

আনন্দের সন্তান

স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

স্বামী সারদানন্দজী অনেক গল্প বলতেন। একদিন বললেন, "একবার স্বামীজী, আমি ও গঙ্গা (স্বামী অখণ্ডানন্দ) পাহাড়ে ঘুরছিলাম। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। সঙ্গে পয়সা ছিল না। গঙ্গা আমাদের চেয়ে বেশি বেশি হিমালয়ে ঘুরেছিল। তাই সে বললে, 'দাঁড়ান, আমি ভিক্ষার ব্যবস্থা করছি।' এই বলে এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে মাটিতে জোরে জোরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'এ পধান, এধার আও। দেখো সন্ত লোক ভুখে হ্যায়। খিলাও।' লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আটার রুটি, তরকারি, ডাল প্রভৃতি দিয়ে আমাদের পেট ভরে খাওয়াল। স্বামীজী তো গঙ্গার কাণ্ড দেখে হেসে কুটিপাটি! গঙ্গা বললে, 'এদেশে প্রবাদ আছে, গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহী, পর লাঠ্ঠি বেগর দেতা নহী'। মানে, গাড়োয়ালীদের মতো দাতা নাই। কিন্তু তারা লাঠি না দেখালে দেয় না—মানে, তারা চায় সাধুরা জোর করে আমাদের সেবা নেবেন।' 165225

"আর একবার স্বামীজী, রাজা মহারাজ, আমি ও কৃপানন্দ (সান্যাল মশাই) কোথাও যাচ্ছিলাম। মাঠের পথ। পথে একটি টাকা পড়েছিল। প্রথম তিনজন টাকাটি দেখেও চলে গেলেন। সান্যাল মশাই দেখেই হাতে উঠিয়ে বললেন, "এখানে একটা টাকা পড়েছিল। কোনও গরিব লোককে দেওয়া যাবে।" স্বামীজী বকলেন। বললেন, 'টাকা যেখানে ছিল ফেলে দে সেখানে। আমি টাকাটা দেখেছি, কিন্তু হাতে নিইনি। রাখালও দেখেছে, শরৎও দেখেছে। কেউ হাতে নেয়নি। তুই কেন নিতে গেলি? টাকা ফেলে দে। যার টাকা সে বেচারা যদি খুঁজতে বেরোয় তো পেয়ে গেলে খুশি হবে। নতুবা গরিব লোক পায় তো কুড়িয়ে নেবে'।"

স্বামী সারদানন্দ আর একটি মজার গল্প বলেছিলেন, "একবার স্বামীজী, গঙ্গা ও আমি হিমালয়ে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজীর একটু শরীর খারাপ হওয়ায় একটি গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, 'একটু বেগুনের ঝোল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।' আমরা দুজনে বললাম, 'হাতে নেই পয়সা। ডাল-রুটি ভিক্ষে মিলে না। কোথায় পাব বেগুন?' স্বামীজী বললেন, 'দ্যাখ না, কোথাও পাওয়া যায় কিনা।' আমরা দুজনে ঘুরতে ঘুরতে এক সাধুর আশ্রম দেখলাম। দেখলাম সেখানে অনেকগুলি বেগুনগাছ আছে, গাছে বেগুনও হয়েছে। সাধু আমাদের অভিবাদন করে বসালেন ও বেদান্তের প্রকরণের কথা শুরু করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে বেদান্তের আলোচনায় যোগ দেওয়ায় তিনি খুব খুশি হলেন। কিছুক্ষণ পরে, 'আমাদের বড় গুরুভাই একটু অসুস্থ। আমরা তাঁর কাছে যাব,' বলে তাঁর জন্য দুটি বেগুন ভিক্ষা চাইলাম। কিন্তু তিনি দিলেন না। তাঁর আশ্রমে আমাদের ভিক্ষা নেবার কথা তো বললেনই না। ফিরে স্বামীজীকে বলতে তিনি বললেন, 'তোরা দুজনে আবার যা। একজন তাঁর সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করবি। আর একজন তাঁর বাগান থেকে বেগুন নিয়ে আসবি। সাধুর বেগুন থাকতে চাইতেও যখন দেননি, তখন জোর করে নিলে কিছু দোষ বা অন্যায় হবে না। যদি হয় সে দোষ বা অন্যায়ের জন্য আমি দায়ী। তোরা যা।' তখন আমি গিয়ে, 'ওঁ নমো নারায়ণ স্বামীজী মহারাজ' বলে অভ্যর্থনা করতেই তিনি খুশি হয়ে আমাকেও অভিবাদন করে ভেতরে ডাকলেন ও আমরা তাঁর বেদান্ত আলোচনায় খুশি হয়ে আবার এসেছি মনে করে আবার বেদান্ত আলোচনা শুরু করলেন। এদিকে গঙ্গা চারটি বেগুন তুলে নিয়ে একটু দূরে এসে জোরে জোরে হাততালি বাজাতেই কার্য উদ্ধার হয়ে গেছে জেনে আমিও সাধুকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে ও ভিক্ষার ব্যবস্থায় বেরোতে হবে বলে সরে পড়লাম। স্বামীজী তো বেগুন পেয়ে হেসে কুটি-পাটি! বললেন, 'বেশ করেছিস এখন দুটি ভাতের চেষ্টা দেখ দিকি।' গঙ্গা ভাত ডাল ভিক্ষা করে আনল তিন মূর্তির জন্য। আমি বেগুনের ঝোল রাঁধলাম। তিনজনে খেয়ে খুব আনন্দ করলাম।..."

মাধুকরী

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারত-ধর্ম

যোগেশচন্দ্র বাগল

॥ ১ ॥

তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের নূতন সহকারী প্রধানশিক্ষক আসিয়াছেন। লম্বা দোহারা চেহারা, মুখমণ্ডল তেজোদীপ্ত, মস্তকে উষ্ণীষ। দেড় কি দুই মাইল দূর হইতে আসিতেন, কিন্তু দেহে ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র দেখিয়াছি। মনে প্রশ্ন জাগিত, ইনি তাঁহার মতো উষ্ণীষ পরেন কেন? এই শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল একত্র বাস করি, তখন বুঝিতে পারি, ইনি স্বামীজীর দ্বারা কত অনুপ্রাণিত। স্কুল-লাইব্রেরীতে 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইখানি ছিল। তিনি লাইব্রেরীতে বিবেকানন্দের লেখা বাঙলা বই আরও কিছু আনাইলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'কর্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'বীরবাণী', এই রকম আরও কিছু কিছু নূতন বই। শিক্ষক মহাশয় এই সকল হইতে অনেক অংশ আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন, সাধারণতঃ অপরাহ্ণেই তাঁহার নিকট আমরা গিয়া বসিতাম।

দুই বৎসরের মধ্যেই অসহযোগের বান আসিল। আমরা এই বানে গা ভাসাইলাম। তখন আমাদের মনে কত আত্মপ্রত্যয়। আত্মশক্তির কি অভূতপূর্ব বিকাশ। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সম্মুখে। কিন্তু এই পরিণতির জন্য প্রস্তুতি তো চাই। আর ইহা সময়সাপেক্ষও বটে। আমরা তখন পরিণতি দেখিয়াই মুগ্ধ হই। পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভাবিয়া দেখি নাই ইহার মূলে পূর্ববর্তী বহু বৎসর যাবৎ কি কি শক্তি কার্য করিয়াছে, আর ইহার মূলাধার কে বা কাহারা। আট নয় বৎসর পরের কথা। মনে হইতেছে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ। বিবেকানন্দের স্মৃতিসভায় গিয়াছি। প্রধান বক্তা দুইজনের কথা মনে আছে, রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং মনীষিপ্রধান বিপিনচন্দ্র পাল। দুজনেই স্বামীজীর সমসাময়িক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন। বিপিনচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় স্বামীজীর মার্কিন-বিজয়ের কথা ব্যক্ত করেন। তখন এ-বিষয়টি শুনিতে ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ব্যঞ্জনা আদৌ হৃদ্গত হয় নাই। দীর্ঘকাল পরে বিপিনচন্দ্রের আত্মজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়টি পড়িয়া ইহা কতকটা বুঝিতে পারি। তিনি শতাব্দীর শেষে চারি মাস কাল আমেরিকায় কাটান। সেখানকার ধর্মপিপাসু ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মনে বিবেকানন্দের প্রভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন এবং পরাধীন ভারতবাসী সম্বন্ধে ওদেশবাসীরা যে নূতন করিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছেন তাহাতেও বিশেষ আনন্দলাভ করেন। তিনি বলেন শেষোক্ত বিষয়টির মধ্যেও ছিল বিবেকানন্দের মঙ্গল হস্ত।

আর একজন সমসাময়িকের কথাও এখানে একটু বলি। তখন ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে আমি লিখিব স্থির করিয়াছি। তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি হইতে তথ্য আহরণে প্রবৃত্ত হইলাম। নিবেদিতার 'The Master as I Saw Him' (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি), যতদূর মনে হইতেছে, ইতিপূর্বেই পড়িয়া ফেলি। স্বামীজীর জীবনদর্শনের এমন সুনিপুণ বিশ্লেষণ দ্বিতীয়টি দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। আমার উদ্দেশ্য নিবেদিতা সম্বন্ধে কিছু লেখা। একদিন লেডী অবলা বসুর সঙ্গে দেখা করিলাম। জানিতাম নিবেদিতা শেষজীবনে বসু-দম্পতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন এবং মারাও যান তাঁহাদেরই দার্জিলিংস্থ বাসভবনে। নিবেদিতা, সারদামণি দেবী (শ্রীশ্রীমা) এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ঐদিন, এবং পরেও লেডী বসু আমাকে অনেক কথা বলেন। স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে যে-কটি কথা বলেন, তাহার মর্ম এই: "১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। যেমন নানাদেশ থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র আমদানি হয়েছে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারীরাও বিভিন্ন

সভা-সমিতিতে যোগদানের জন্য সমবেত হয়েছেন। আচার্য বসুর সঙ্গে আমিও সেখানে যাই, দেখি স্বামী বিবেকানন্দ দলবল সমেত সেখানে উপস্থিত। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করতেন। একদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। দু-চার কথা হবার পরই তিনি আমাকে বললেন তাঁকে গান গেয়ে শোনাতে হবে। তাঁর কথা কি অমান্য করতে পারি? আমি সসঙ্কোচে তাঁকে গান গেয়ে শুনাই। পরে যখন শুনি তিনি নিজেও একজন সুগায়ক, তখন আমি লজ্জায় মরে গেলুম। আচার্য বসুকে তিনি 'Indian scientist' বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন।"

এইরূপে যাঁহারা স্বামীজীর সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং যাঁহারা মঠ-মিশনের বাহিরে থাকিয়াও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, এমন কয়েকজনের কথা শুনিয়া এবং সঙ্গলাভ করিয়া আমিও নিজেকে ধন্য মনে করি।

আট-নয় বৎসর পূর্বে চুঁচুড়ায় সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলন হয়। পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বহুদেশ পর্যটন করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিদেশীয়দের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব দেখিয়া তিনিও কম বিস্মিত হন নাই। তিনি বলেন—মেক্সিকো পর্যটনকালে মেক্সিকান ভাষায় গীতার এবং স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন বইয়ের অনুবাদ দেখিয়াছেন। সুইডেনেও এই ধরনের অনুবাদ-পুস্তক তাঁহার নজরে আসিয়াছে। এই সকল অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা প্রচাররত ব্যক্তিবিশেষ বা মণ্ডলীবিশেষ দ্বারা করা হয় নাই। ঐ ঐ দেশের বিদগ্ধজনেরা হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই স্বেচ্ছায় নিজ নিজ দেশবাসীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার-কল্পে ইহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি বিদেশীয় ও বিধর্মীয়দের দীর্ঘকাল পোষিত প্রতিকূল মনোভাবের এরূপ পরিবর্তন সম্ভব হইল কিরূপে? উত্তরে বক্তা যাহা বলেন তাহার মর্ম এই: স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও মার্কিন মুলুকে হিন্দুধর্মের যে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছেন, তাহার ফলেই এমনটি সম্ভব হয়। এখন আর হিন্দুর ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে খ্রীস্টানেরা নাসিকা কুঞ্চিত করিতে ভরসা পান না। খ্রীস্টান পাদ্রীরা ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া হিন্দুদের কতকগুলি রীতি-পদ্ধতি—যেমন সংকীর্তন, গেরুয়া পরিধান প্রভৃতিও অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র এবং ডঃ সুনীতিকুমারের মুখে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে প্রায় একই কথা শুনি। বিদেশ-বিভূঁইয়ে অজানা-অচেনা লোকেদের প্রাণে বিবেকানন্দ যে সাড়া জাগাইয়াছেন তাহা ক্রমে নানা-স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিরূপে এমনটি সম্ভব হইল, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি! আজকাল ধর্মসমন্বয়ের কথা আকছার শুনি। জনৈক বন্ধু বলিলেন, সেদিন বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের এক অধি-বেশনে বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী নেতাদের লইয়া ধর্মসমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা-বৈঠক বসিয়াছিল। বিবেকানন্দ-জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতেও এ-বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়া থাকিবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু স্বামীজী কর্তৃক অনুশীলিত ও প্রচারিত ভারত-ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকিলে ধর্ম-সমন্বয়ের সাড়ম্বর আলোচনার হয়তো আবশ্যকতাই থাকিত না। বিদেশে তিনি যে ভারত-ধর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং যাহা শুনিয়া বিদেশীরা বিমোহিত হন সে-সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই বিষয়টি জানিতে পারিলে বিবেকানন্দের সুকৃতি কোথায় তাহা বুঝিতে পারিব।

॥ ২ ॥

এই প্রসঙ্গে কিছু বলিতে গেলে ঐতিহাসিক পারম্পর্যের কথাও আমাদের জানা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় ও খ্রীস্টান ধর্মবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রায় সমকালেই তিনি হিন্দুধর্ম আলোচনা শুরু করিয়া দেন। ইহার ফলস্বরূপ আমরা পাইলাম তৎসম্পাদিত উপনিষদ্ গ্রন্থনিচয়। উপনিষদ্ আগেও ছিল, কিন্তু ইহার যুক্তিনিষ্ঠ টীকাটিপ্পনী সমেত সাধারণগ্রাহ্য করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করার প্রথম কৃতিত্ব রামমোহনের। এই উপনিষদ্ আবিষ্কার তাঁহার একটি অপূর্ব কীর্তি। হিন্দুধর্মের সার ইহাতে বিধৃত। গত শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তাহার মূলে রহিয়াছে রামমোহনের এই আবিষ্কার। তিনি উপনিষদ্ তথা বেদান্তের ভিত্তিতে একেশ্বর-বাদের আলোচনা 'আত্মীয়সভা'র মাধ্যমে আরম্ভ

করেন। এই সভার পরিণতি ঘটে তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে (১৮২৮)। দুই বৎসর পরে ইহার জন্য যে মন্দির স্থাপিত হয় তাহার ন্যাসপত্রে রামমোহন এই মর্মে লেখেন যে, এই মন্দিরের দ্বার সকল লোকের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনায় যোগ দিতে পারিবেন।

রামমোহনের সমসময়ে খ্রীস্টান মিশনারীরা হিন্দুধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং দেশবিদেশে ইহা প্রচার করিতে থাকেন। রামমোহন কিন্তু আদৌ ইহা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুধর্মের ভিত্তিস্বরূপ একেশ্বরবাদের গুণকীর্তন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, নিম্নাধিকারীর পক্ষে সাকার অর্থাৎ দেবদেবীর পূজার প্রয়োজন আছে। তিনি অতঃপর আরও লেখেন যে, খ্রীস্টান পাদ্রীরা পরাধীন ভারতবাসীর ধর্মের বিরুদ্ধে উক্তি করিয়া রেহাই পাইতেছেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব নাই। তাঁহারা একবার স্বাধীন পারস্যে বা তুরস্কে গিয়া ধর্মপ্রচার করুন না, তাহাতে তাঁহারা যে কত বীরপুরুষ তাহা প্রমাণিত হইবার সুযোগ মিলিবে। ঐ ঐ দেশে বসিয়া ধর্মের গ্লানিকর উক্তি করিলে কি ফল হয় তাহাও বুঝিতে পারিবেন। রামমোহনের প্রতিবাদের পর তাঁহার স্বদেশবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে খ্রীস্টানী প্রচারের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। সংস্কৃতি শাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থাদি প্রকাশে ও অনুবাদে কেহ কেহ তৎপর হইয়া উঠিলেন।

পরবর্তী চতুর্থ দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে মহর্ষি) রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনে মন দিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার কর্তৃত্বাধীনে। সুষ্ঠুরূপে বেদ-বেদান্তের অনুশীলনের নিমিত্ত চারিজন ব্রাহ্মণ যুবককে কাশীধামে পাঠানো হইল। সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় শাস্ত্র-গ্রন্থাদির 'চূর্ণক' বাহির হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে দিয়া উপনিষদের অনুবাদ করান ও ইহা ক্রমশঃ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি স্বয়ং ঋক্‌বেদের অনুবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু এত করিয়াও দেবেন্দ্রনাথ মনে স্বস্তি পাইলেন না। তিনি ব্রাহ্মধর্মের বীজ অন্যত্র খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহারই ভাষায়—"তন্ত্র, পুরাণ, বেদান্ত, উপনিষদ্ কোথাও ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল, ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে, ব্রাহ্মধর্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে। ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম, বলিলাম, 'আমার আঁধার হৃদয় আলো কর।' তাঁহার কৃপায় তখনি আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্মধর্মের একটি বীজ দেখিতে পাইলাম, অমনি একটি পেন্সিল দিয়া সম্মুখে কাগজ খণ্ডে তাহা লিখিলাম এবং সেই কাগজ তখনি একটি বাক্সে ফেলিয়া দিলাম ও সেই বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম। তখন ১৭৭০ শক; আবার বয়স ৩১ বৎসর।" (আত্মজীবনী, পৃঃ ১৩১, ৪র্থ সংস্করণ)

দেবেন্দ্রনাথ দুই খণ্ডে 'ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থঃ' প্রচার করিলেন। ইহাই হইল ব্রাহ্মদিগের অনুসরণীয় একমাত্র ধর্মগ্রন্থ। রামমোহনের উপনিষদ্-ভিত্তিক একেশ্বরবাদ হইতে দেবেন্দ্রনাথ সমাজকে একটি স্বতন্ত্রপথে চালনা করিলেন। হিন্দুসমাজ হইতে আলাদা নূতন মণ্ডলী গঠিত হইল। তবে ইহার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, আচারনিষ্ঠ হিন্দুরাও একেশ্বরবাদ তথা পরব্রহ্মে বিশ্বাসী হইলে এই মণ্ডলীভুক্ত হইতে পারিতেন। সাধারণের নিকট ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের অঙ্গ বলিয়াই প্রতিভাত হইল দেবেন্দ্রনাথের বহু জনহিতকর প্রচেষ্টা, যেমন খ্রীস্টানবিরোধী আন্দোলন, হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি রাজা রাধাকান্ত দেবের ন্যায় রক্ষণশীল হিন্দু নেতার নিকট হইতেও আন্তরিক ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করে।

পঞ্চম দশকের শেষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সংযোগ একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেশবচন্দ্র যুবক, যুবজনোচিত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইলেন। তিনি ক্রমে কেশবচন্দ্রের উপর বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিলেন। ষষ্ঠ দশকে বহু কৃতবিদ্য যুবক দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সংস্রবে আসেন ও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজ নূতন বল পাইল। এই সকল যুবকের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌর-

গোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), অঘোরনাথ গুপ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং কিছু পরে আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ ভট্টাচার্যের (শাস্ত্রী) নাম উল্লেখযোগ্য কেশবচন্দ্রের সংস্কারমুখী মনোভাব ও কার্যকলাপে দেবেন্দ্রনাথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এই দশকের মধ্যভাগেই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল।

উৎসাহী যুবক অনুবর্তীদের লইয়া কেশবচন্দ্র ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১১ নভেম্বর নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, আর ইহার নাম দিলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। পূর্ব সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে অতঃপর পরিচিত হইল। এই সনে কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় "ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ" সঙ্কলিত ও প্রচারিত হয়। হিন্দু, খ্রীস্টান, মুসলমান, অগ্নি-উপাসক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে সার শ্লোকনিচয় এই পুস্তকে সংগৃহীত হয়। ক্রমে ক্রমে শ্লোকসংখ্যা খুবই বাড়িয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ'-এর পরিবর্তে এই শ্লোকসংগ্রহের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের ধর্মাদর্শ। যীশুখ্রীস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী সম্পর্কে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই নূতন সমাজের সভ্যেরা কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় হিন্দুশাস্ত্রের মধ্য হইতে গৃহীত সার তথ্যের উপর নির্ভর মাত্র না করিয়া বিভিন্ন ধর্মের ভিতর হইতেই আদর্শ খুঁজিতে তৎপর হইলেন।

কেশবপন্থীরা বিবিধ উপায়ে সমাজের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের তিন আইনের (বিবাহ আইন) মধ্যে তাঁহাদের সংস্কার প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটিল। এইরূপে হিন্দুত্ব বর্জন পুরাপুরি সংসাধিত হইল। নূতন সমাজের ব্রাহ্মরা বিরাট হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেকেরই অশেষ নির্যাতন, ক্লেশ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ইঁহারা নিজদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, হিন্দু হইতে তাঁহারা যে আলাদা এ কথাও তাঁহারা কথায় এবং কার্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিক দিয়া পরবর্তী দশকে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরাও কেশবপন্থীদেরই অনুবর্তী ও অনুকারী। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাসে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, অপরেরা কিন্তু ব্রাহ্ম শিখাইতেই লাগিয়া যান। ইহা অবশ্য পরের কথা। কেশবচন্দ্র বিলাতে একবার ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইউরোপে ও আমেরিকায় কয়েকবার নূতন ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রচারকল্পে গমন করেন। তাঁহাদের মুখে বিদেশীরা উপনিষদে বিধৃত শাশ্বত হিন্দুধর্মের কথা শুনিতে পাইলেন না। হিন্দুদের সাকার উপাসনা অর্থাৎ বহু দেবদেবী পূজার গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা যে নূতন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যত, এই ধরনের কথাই তাঁহারা স্পষ্টতঃ প্রচার করিলেন। তবে বিলাতে প্রদত্ত কেশবচন্দ্রের স্বদেশহিতকারক ধর্মাতিরিক্ত বক্তৃতাটিও এখানে স্মরণীয়।

একদিকে যেমন উৎসাহী কর্মকুশল ব্রাহ্মদের মুখে নিছক হিন্দুধর্মের কথা শোনা যায় না, অন্যদিকে বিপরীত কথাই আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বহুভাষাবিদ্ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি উপনিষদ্-বেদান্ত, ষড়্দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার একটি সকলকেই ছাড়াইয়া যায়। তাঁহার মতে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাদিতে প্রকটিত উচ্চ ভাবধারার পরিসমাপ্তি ঘটে যীশুখ্রীস্ট প্রচারিত বাইবেলের মধ্যে। বেদচর্চার নিমিত্ত ম্যাক্সমুলারকে তখন আমরা কত আপন করিয়া ভাবিয়াছি। তাঁহার আত্মজীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার একটি উক্তিতে বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। হিন্দুগণকে তিনি 'হীদেন' ও 'প্যাগান' বলিয়া উল্লেখ করেন। উপরন্তু গোঁড়া খ্রীস্টানের মতো তিনিও বিশ্বাস করিতেন—বাইবেলই সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ, হিন্দুর বেদ-বেদান্ত নহে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়ম জোন্সও ইহার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে হিন্দু দেবদেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেন।* [ক্রমশঃ। পরবর্তী অংশ আগামী চৈত্র (১৩৯৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। —যুগ্ম সম্পাদক]

* **শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৭০**

সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক ঃ স্বামী নিরাময়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঠাকুর সারারাত মশারির ভিতর বসে ভগবানকে ডাকতেন। লোকে ভাবত বুঝি ঘুমুচ্ছেন। তাঁর ঘুমই ছিল না। তাঁর কাছে যারা গেছল, তারাও ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছিল। এই আমারই বা কি? আমি তো তাঁদের কাছে নগণ্য—দু-ঘণ্টার বেশি ঘুমুতে পারি না। যদি বেশি ঘুম হয়ে যায় তো লজ্জা হয়—কোথায় ভোরবেলা বিছানায় বসে একটু ঠাকুরদের নাম করব—তা না, একি! মঠে মঙ্গলারতির পর শুয়ে থাকতে ভারি লজ্জা হতো—ঠাকুর উঠে পড়েছেন, আর আমি শুয়ে থাকব? ছি, ছি! অমনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়তাম।

Time (সময়) তো relative (আপেক্ষিক)। অনন্ত যদি চাও, এসব ভাব দূর করতে হবে। দিন-রাত মিনিট-ঘণ্টা—এসব কতদূর পর্যন্ত? এই পৃথিবী—বড় জোর সূর্যের রাজত্ব পর্যন্ত! সূর্যের রাজত্ব আর কতটুকু? এই অনন্ত বিশ্বে কত সূর্য রয়েছে। এক-একটা নক্ষত্র সূর্যের চেয়েও বড়। Sirius (লুব্ধক) প্রভৃতি উজ্জ্বল নক্ষত্র দূরে দূরে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। Galactic System, nebula—(ছায়াপথ, নীহারিকা) তার এক একটা থেকে কত-কত সূর্য জন্মাবে! সেখানে কি time (সময়) আছে? Time (সময়)-ও সেখানে জন্মায়নি।

আমরা ধ্যান করতুম—এই যেন পৃথিবীর বাইরে চলে যাচ্ছি। ঐ যেন পৃথিবী দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে! আর আমি? যে-দিকে তাকাই অনন্ত কোটি নক্ষত্র—আলোর কণা, বিদ্যুতের বেগে—Light-এর Velocity-তে (আলোর গতিবেগ) যার চেয়ে দ্রুত আজ পর্যন্ত যাওয়া যায়নি (জড়জগতে) তার চেয়েও দ্রুতবেগে চলে গেলাম একদিকে—কোন কূলকিনারা নেই—যতদূর যতদূর যাও একরকম—বড়জোর Periodic (একই ধরনের পরিবর্তন বারবার), সেদিকে তৃপ্তি হলো না, শান্তি হলো না। তখন আবার ঐ প্রচণ্ড গতিতে উল্টো দিকে—সেদিকেও ঐরকম—সব দিকে ঐ একই ধরন।

তখন? ধীর স্থির নিস্পন্দ! অনন্তের কি সীমা আছে? এতো গেল macrocosm (বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড), তারপর দেখবে microcosm—অণু-পরমাণু—তার ভিতরও আবার কোটি জগৎ খেলা করছে। এসব ভাবলে মন আপনা হতেই স্থির হয়ে যায়, সময়ের হিসেব উড়ে যায়, সময় থেমে যায়, অন্ততঃ তার পক্ষে; সত্যি বলছি—এমন কত দিন হয়েছে।

হিসেবী—Calculating হলে তার কখনো অনন্তের ধারণা হয় না, ভগবান লাভ হয় না। যতক্ষণ calculation (হিসাব), ততক্ষণ time and space (দেশ-কাল)-এর ব্যাপার, মায়ার রাজ্য। সত্য সেখান থেকে অনেক দূরে।

শরণাগত, শরণাগত। শরণাগত মানে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। সর্বত্যাগ না হলে শরণাগতি হয় না, আর শরণাগতি হলেই হয়ে গেল। 'যো মাকো শরণ লিয়ে সো তাকো রাখে লাজ। উলট জলে মছলী চলে বহি যায় গজরাজ'॥ এসব অমনি হয় না—সাধুসঙ্গ চাই। 'দয়া ধরম কী মূল হৈ নরক মূল অভিমান। তুলসী দয়া ন ছোড়িয়ে যব কণ্ঠাগত প্রাণ॥' সেই দয়া কি করে হয়? 'তুলসী ইয়ে জগমে পাঁচো রতন হৈ সার। সাধুসঙ্গ হরিকথা দয়া দীন উপকার॥' সাধুসঙ্গ থেকেই হরিকথা (ভগবৎ প্রসঙ্গ), হরিকথা থেকে দয়া দীনতা; সেই দয়া থেকে ধর্ম। ভবেই বোঝ—দয়া ধরম কী মূল। আবার দয়ার মূল হরিকথা। আর হরিকথার মূলে সাধুসঙ্গ।

গীতায় ভগবান অর্জুনকে সতেরো অধ্যায়ে সাংখ্য জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগ সব বলে অষ্টাদশের শেষে বলছেন, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। 'শরণাগতি'-র চেয়ে বড় কথা আর নেই। শরণাগত, শরণাগত—এটিও একটি মন্ত্র। ঠাকুর কতবার বলেছেন।

কাশীপুরে একদিন কার কি কথায় একজন বলেছেন, 'জানি জানি'। ঠাকুরের তখন কথা বলতে গেলে গলা চিরে রক্ত বেরোয়, তবু হাত দিয়ে বালিস থেকে মাথা তুলে বললেন, 'কি বললি—জানিস? আর বলিসনি। কি জানিস? সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। যে বলে—জানি, সে জানে না; যে বলে জানি না, সে বরং জানে। অনন্তজ্ঞান কতটুকু জানিস?' এই বলে সেই অসুস্থ শরীরে কত কথা। —গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল। আর কখনো কেউ ঐ কথা উচ্চারণ করেনি।

পরে উপনিষদে দেখলাম ঠিক কথা—'যস্য মতং তস্যামতম্ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম-বিজানতাম্' আছে—যে বলে জানি, সে জানে না, যে বলে জানি না সে বরং জানে।

মায়ার স্বরূপ বোঝাবার সময় ঠাকুর এই গল্পটি বলতেন, মায়াকে চিনতে পারলেই মায়া পালিয়ে যায়। 'আমি বোকা বুদ্ধিহীন', এটি ঠিক ঠিক ধারণা হলেই তো সে ঠিক ঠিক বুদ্ধিমান। সরল প্রাণে তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে একরাত্তির বলো দেখি —'প্রভু, আমি বোকা বুদ্ধিহীন; কিছু জানি না, কিছু বুঝি না। তুমি বুঝিয়ে দাও, দেখা দাও'। দেখবে রাতারাতি সব উল্টে গেছে। যে বুঝতে পেরেছে—'আমি বোকা', সে কি আর বোকা থাকে? 'The fool who knows that he is a fool is wise so far. But the fool who thinks himself wise is a fool indeed.'—যে বোকা জানে যে, সে বোকা, সে ততটুকুই জ্ঞানী। কিন্তু যে নিজেকে জ্ঞানী বলে মনে করে, সে সত্যি বোকা। ভারি সুন্দর কথা।

মায়া দুইপ্রকার—বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া—সত্ত্বপ্রধানা আর তমঃপ্রধানা। সর্বপ্রথম অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য, তারপর মায়োপাধিক ঈশ্বরচৈতন্য—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান স্বতন্ত্র, তারপর অবিদ্যোপাধিক জীবচৈতন্য—অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান পরতন্ত্র। যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশ। ঘটাকাশ কিরকম? যেমন, এই যে বাড়িটার মধ্যে খানিকটা আকাশ, ঘটিতে বাটিতে আকাশ খণ্ড খণ্ড মনে হচ্ছে। আবার কূটস্থ চৈতন্য—কি রকম?—যেমন, কামারের 'নাই' (anvil), কত পিটছে—কিন্তু স্থির। জীবচৈতন্যকে ঈশ্বরচৈতন্যে ব্রহ্মচৈতন্যে যেতে হবে। স্বরূপ অনুভব করতে হবে। এই হলো উদ্দেশ্য। উপায়—আকুল আগ্রহ, বিবেক, বৈরাগ্য। বৈরাগ্য আবার কত রকম আছে—শ্মশান বৈরাগ্য, বিচারে বৈরাগ্য।

স্বামীজী বলেছিলেন—দেখ, আমরা sincere (সরল অকপট) হব। শ্মশানে গেলে তো সংসারী গৃহস্থ লোকেরও বৈরাগ্য হয়। দেখলে চোখের সামনে প্রিয় শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, দেখে ক্ষণিক বৈরাগ্য—ও তো সবারই হয়, কিন্তু তারা আবার সংসারে গিয়ে মায়ায় ভুলে যায়, ডুবে যায়। কিন্তু আমরা যখন জেনেছি সংসার কি—তখন আর ফিরব না, ভগবান লাভ হয় ভালই, না হয় নাই হলো, তবু ফিরছি না। ধীরে ধীরে চলে যাব—পাল উড়িয়ে। যখন অনুকূল বাতাস তখন এগিয়ে যাব, আর যখন প্রতিকূল বাতাস তখন থেমে থাকব, তবু ফিরব না।

শঙ্কর বলেছেন 'বিবেকচূড়ামণি'তে, সব জন্মের মধ্যে মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ। মুক্তিলাভ—জ্ঞানলাভ করতে হলে দেবতাদেরও মনুষ্যশরীর ধারণ করতে হবে। তারপর সদ্গুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে, তাদের তো পোয়া বারো। সদ্গুরুর কাছ থেকেও যারা তাঁর কৃপা বুঝতে পারছে না, তাদের আর কি বলব? জ্ঞানযোগের পথ বড় কঠিন। রাজযোগের উপযুক্ত শরীর কোথায়? ভক্তিযোগ সহজ এযুগে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মযোগ—তাঁর উপাসনা ভেবে, তাঁকে স্মরণ করে, তাঁকে ফল সমর্পণ করে সব কাজ করতে হবে।

কত রকমে বৈরাগ্য আসে। তুলসীদাসজী পালকির পেছনে পেছনে চলেছেন কাঁদতে কাঁদতে—বৌয়ের বাপের বাড়ির পথে। বৌয়ের লজ্জা ও তিরস্কার: 'তোমার লজ্জা হয় না? হায় হায়!

তুমি আমার রক্তমাংসকে যে ভালবাসা দিয়েছ, তা যদি ঠাকুরকে (ভগবানকে) রামচন্দ্রকে দিতে?' আহা! শেষে ফিরলেন, আসক্তি থেকে বৈরাগ্য।

তারপর বিল্বমঙ্গল—চিন্তামণি-বেশ্যার ওপর কি টান। পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ না করে ঝড়-তুফানে মড়া আঁকড়ে নদী পেরিয়ে সাপ ধরে পাঁচিল টপকে দুর্যোগের রাত্তিরে এসে হাজির।—চিন্তামণি প্রথমে খুব চটে গেছে, শেষে করুণা। বললে, 'হায়, এই টানের এক কণাও যদি তোমার কৃষ্ণের প্রতি হতো!' তার ঐ এক কথায় ও বেরিয়ে পড়ল। এরকম খুব কম।

শেখ সাদী কুয়োর ধারে বসে বসে দেখছে—দড়ি ঘসে ঘসে সান কেটে যাচ্ছে; অমনি উদ্দীপনা: 'কি! সংসার-বন্ধন কাটবে না?'

এক রাজা এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করেছে, 'সংসার ছুটবে কি করে?' প্রাসাদের দালানে নিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী রাজাকে বললেন, 'থাম পাকড়ো'। রাজা থামকে জড়িয়ে ধরল। 'ছোড় দেও'। রাজা থাম ছেড়ে দিল। সন্ন্যাসী বললেন: 'ঐসী সংসার ছুট যায় গা।'

[ক্রমশঃ]

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সভার ১৯৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৮১তম (একাশিতম) বার্ষিক সাধারণসভা গত ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯০ বিকাল সাড়েতিনটায় বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যদের নিকট রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দের কার্য বিবরণী উপস্থাপিত করা হয়।

কোয়েম্বাটোরে অন্ধ ছাত্রদের জন্য কম্প্যুটার পরিচালিত ব্রেইল পদ্ধতিতে পুস্তক প্রণয়নে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা, **কামারপুকুরে** গ্রামীণ যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহ একটি ক্ষুদ্রায়তন পাটকলের উদ্বোধন এবং **ত্রিপুরায়** বিবেকনগরে ও **কানাডায়** টরন্টোতে দুটি নতুন কেন্দ্রের কর্মারম্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের এই বর্ষের ব্যাপক কর্মসূচীতে রামকৃষ্ণ মিশন ২৯.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। এছাড়া ৬.১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রীও দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

জনকল্যাণমূলক কর্ম তালিকায় দরিদ্র ছাত্রছাত্রী, রুগ্ন, বার্ধক্যক্লিষ্ট, দুঃস্থ ও অনাথ নরনারীর সাহায্যের জন্য ৪২.৫৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

চিকিৎসা ও সেবাক্ষেত্রে মিশনের নটি হাসপাতাল, আশিটি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাকেন্দ্র ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের প্রশংসনীয় কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে ৬.৫০ কোটি টাকা খরচ করে প্রায় ৪৫ লক্ষেরও বেশি রোগীদের সেবা করা হয়েছে।

শিক্ষাবিভাগে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরীক্ষার ফলাফল পূর্ব পূর্ব বছরের মতোই অত্যন্ত উচ্চমানের ধারা বজায় রেখেছে। এবছর মিশনের ১,৫৬১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,০২,৮৩১ জন। এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়েছে ২১.৩২ কোটি টাকা।

গ্রামীণ ও আদিবাসীদের সেবায় মিশন দেশের বহু পল্লী ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিস্তারিত কর্মসূচীতে প্রায় ২.২২ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

বিদেশের শাখাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মিশন প্রধানতঃ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচারেই ব্যাপৃত ছিল।

বেলুড়ের মূলকেন্দ্র ভিন্ন রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠের ভারতে ও বিদেশে যথাক্রমে ৭৭টি এবং ৭৫টি শাখাকেন্দ্র এই বছরে ছিল।

২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯০

স্বামী গহনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সামাজিক ছবি

"ধ"

"শ্যাম গেও মধুপুর, হাম কুলবালা,
বিপথে পড়ল সখি মালতী মালা।"

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানায় হারমোনিয়ম ও ডাইনে ডুবকির বাজনার সঙ্গে একখানি মিঠা গলা গাহিতেছিল,

"বঁধু গেও মধুপুর"

বাহিরে চাঁদনি সন্ধ্যা। বিরহসন্তপ্ত গোপ-বধূর আক্ষেপ প্রতিধ্বনি তান তরঙ্গে গা ভাসাইয়া নিশ্চল জ্যোৎস্নাসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছিল।

সন্ধ্যাটি যথার্থই 'শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতা'। পাছে তাহার সৌন্দর্যরাশি মূকতারূপ অঙ্গ-হীনতা দোষে দূষিত হয়, তাই বুঝি কেহ ছবিখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার জন্য স্বীয় মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়া মধুর মানবকণ্ঠ সৃষ্টি করিয়াছিল

"শ্যাম গেও মধুপুর"

সেই সন্ধ্যায় সেই মধুর কণ্ঠের কুহকে বড় কাহারও শীঘ্র চলিয়া যাইবার শক্তি রহিল না। পূর্ণবাবুর বৈঠকখানার সম্মুখে সাধারণ রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া গেল। দুটি যুবক সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিয়া সেই পথে ফিরিয়া যাইতেছিল, তাহারাও দাঁড়াইল।

গায়ক আবার ধরিল,

"গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল ;
আমার এ-রূপ যৌবন, পরশ রতন
কাঁচের সমান ভেল।"

এমন সময় যুবক-দুটির দৃষ্টি বৈঠকখানার উপরের ঘরে জানালার দিকে আকৃষ্ট হইল। কারণ, হঠাৎ সেই জানালা দিয়া একটি আলো দেখা গেল এবং একটি বিরক্তিপূর্ণ স্বর বলিল : "এখানে একলা বসে আছিস কেন, কি হচ্ছে এখানে ?"

* * *

"ব্যাপারটা বুঝলে ?" একটি যুবক অপরটিকে বলিল।

"বুঝলুম বৈকি। কি অন্যায়। মেয়েটি বিধবা হয়েছে বলে গান শুনতেও দোষ। চল। আমার আর ভাল লাগছে না।"

"দোষ হতে পারে বৈকি। পূর্ণবাবুর বাড়িতে গান-বাজনা করা উচিত নয়।" চলিতে চলিতে প্রথম যুবকটি বলিল।

"কি রকম ? মেয়ে বিধবা হয়েছে বলে পূর্ণবাবুকেও বৈধব্য গ্রহণ করতে হবে নাকি ?"

"মেয়ের ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা উদ্দেশ্য থাকলে কিছু তপস্যা, আত্মসংযম করতে হবে বৈকি। যুবতী মেয়ে—এক বছর হয়নি বিধবা হয়েছে, বাপ সেই মেয়ের কানের কাছে বৈঠকখানায় 'বিরহসঙ্গীত' গাওয়াচ্ছেন। মেয়ে নিজের বাড়িতে ও পাড়ায় অনবরত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের ও কামের চর্চা শুনছে ও দৃষ্টান্ত দেখছে। একে দুরন্ত যৌবন, তার উপর এত উদ্দীপন, ব্রহ্মচর্যের অবসর কোথায় ?"

"একথা মানি। কিন্তু বাড়িতে একজন বিধবা হলে বাড়িশুদ্ধ বিধবা হতে হবে, এও তো বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার। তার চেয়ে বিধবাবিবাহ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।"

"তাতে লাভ হবে না। বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবাদের জ্বালাগুলি কুমারীদের পোয়াতে হবে। মেয়েদের সংখ্যা স্বভাবতঃ পুরুষদের চেয়ে বেশি। সমান সমান ধরলেও যতগুলি বিধবা দুবার বিবাহ করবে, ততগুলি কুমারীর বিবাহ হবে না। কাজেই পতি অভাবে বিধবাদের যে অবস্থাগুলি হচ্ছে, কুমারীদের ঠিক সেইগুলি হবে। লাভের মধ্যে কুমারীদের ওপর অবিচারটা জ্যায়দা হবে, কারণ, বিধবাদের একবারের অধিক পতি লাভের অবসর দেওয়া হবে, তারা একবারও পাবে না।"

"বটে। তাই বুঝি বলে, ইউরোপে বিবাহের বাজারে বিধবাদের জন্য কুমারীদের বর মেলা ভার। তাহলে উপায় কি? আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।"

"প্রশ্নটা গুরুতর। এককথায় মীমাংসা হবার নয়। সব দেশে সব সমাজেই এক গোল আছে। তবে আমাদের সমাজে বাড়ার ভাগ কতকগুলো মিছে জঞ্জাল জন্মে ব্যাপারটাকে আরও খারাপ করে তুলেছে। এই বাজে ঝামেলাগুলোকে এখনি ওঠানো উচিত। তাহলে দুঃখ অনেক লাঘব হবে।"

"কি সেগুলো?"

"প্রথম বাল্য-বিবাহ। একে তো এ প্রথাটা মহা অস্বাভাবিক, সমস্ত জাতটাকে নির্বীর্য করে ফেলেছে। মনে কর, উনিশ-কুড়ি বছর বয়স না হলে মেয়েদের শরীর পুষ্ট হয় না ও গর্ভ ধারণের পরিপক্কতা হয় না। আর তের বছরে সন্তান হচ্ছে! এরকম পুরুষানুক্রমে কত শতাব্দী ধরে হয়ে আসছে। কাঁচ বাঁশে ঘুণ ধরে, কাঁচ গাছে তক্তা হয় না, এসব কথা আমাদের দেশের লোকে খুব বোঝে। আর এইটুকু বোঝে না যে, কাঁচ ছেলের ছেলে হওয়া কত অনিষ্টজনক! আমাদের দেশের লোকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, আত্মনির্ভরশীল হবে কি করে? কারুর যে হাড় শক্ত হতে পায়নি! মানুষের গুণ-দোষ পুরো পেতে হলে মানুষের শরীরটা পুরোমাত্রায় পাওয়া চাই। দুশো পুরুষ ধরে বিশ-বাইশ বছরের বাপ, আর তের চৌদ্দ বছরের মা হয়ে আসছেন, শরীর গড়বে কি করে? তাই না আমরা শারীরিক বা মানসিক বলের কাজ করতে পারি না, কোন জাতীয় বা সামাজিক একটা বড় কাজ করতে পারি না? যারা চেষ্টা করতে যায়, ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে তাদের অধিকাংশকে মানব লীলা সম্বরণ করতে হয়। জমার বল নাই, খরচ করে কি?

"আমারও মত তাই। আমি বলি, দশ বছর যদি অকাল পড়ে, বিবাহটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কতকটা মঙ্গল হয়। সে যা হোক,—আমাদের বিধবাদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।"

"হাঁ। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হলে, বালবিধবা থাকবে না। আমাদের সমাজে বালবিধবাদের যন্ত্রণাই ভয়ানক। দ্বিতীয় কথা, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, লেখাপড়া শিখলে আপনাদের ভাল-মন্দ বুঝতে পারবে, আপনার পায়ে দাঁড়াতে পারবে, আপনাদের কষ্ট লাঘব করার উপায় করতে পারবে। তৃতীয় কথা, চিরকুমারী থাকার প্রথা প্রবর্তন করা। অনেকের মত, বৈদিক সময়ে, এমনকি মহাভারতের সময়েও আমাদের সমাজে এ প্রথা ছিল। মেয়েদের বিবাহ ছাড়া গতি নাই, একথার মানে কি? পুরুষের বেলা অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের চেয়ে উচ্চদশা আর নাই, আর মেয়েদের বেলা উল্টো বুঝি? এসব লক্ষ্মীছাড়া ভুলগুলো সামাজিক মন থেকে হটাতে না পারলে হিন্দুজাতির কল্যাণ নাই।

* * *

"গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি;
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেথায় নিঠুর হরি।
(প্রাণবঁধু লাগি আমি যোগিনী হব।)"

বেরিলি স্টেশন প্ল্যাটফরমে তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদের অপেক্ষা করিবার আড্ডায় বসিয়া একতারার সঙ্গে গাহিতেছিল একটি বৈষ্ণবী। গলাখানি সাধা, মিঠা। বয়স ত্রিশের কম নহে; শ্যামবর্ণা, নাক খাঁদা, মুখ বাঙলা পাঁচের মতো, তবে রঙ্গিন কাপড়, রসকলি আর দুটো ভাসা ভাসা চোখে একটা ঢলঢলে মহা চতুর ভাব রূপের অভাব বড় বুঝিতে দেয় না। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা। বৈষ্ণবী রেল হইতে নামিয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখিয়া যেখানে কতকগুলি হিন্দুস্থানী স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়াছিল, সেইখানে আপনার পুঁটলিগুলি রাখিয়া বসিল এবং একতারা বাজাইয়া গান ধরিল ঃ

"আমি মথুরানগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হয়ে;
যদি মিলায় বিধি, মম গুণনিধি,
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে।
আপন বঁধুয়া, আপনি বাঁধিব,
রাখিতে কেবা পারে;

যদি রাখে কেউ, ত্যজিব এ জীউ,
নারী বধ দিব তারে।"

কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ বৈষ্ণবীর দিকে সরিয়া আসিল। বৈষ্ণবী থামিলে একজন বলিল:

"বাঙ্গালীন হৈ, কলকাত্তাসে আয়ি?"

বৈষ্ণবী এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল: "এখানে বাঙ্গালী নাই নাকি?" পরে প্রশ্নকর্তাকে বলিল: "হাঁ, কলকাত্তাসে আয়া, হিঁয়া সাধু-বৈরাগী কাঁহা থাকতা?"

লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ রাস্তার অপর পার্শ্বে, স্টেশনের ঠিক বিপরীত দিকে একটি বাগান-বাড়ি দেখাইয়া বলিল:

"ও যাঁহা নয়া মোকান লাগ রহা হৈ, হুঁয়া যাও; ও ধরমশালা হৈ।"

বৈষ্ণবী দাঁড়াইয়া সেদিকে দেখিল, পরে লোকটিকে বলিল: "হাম মেয়ে মানুষ হৈ, নেই পছানতা; তোম হামকো সঙ্গ আকে দেখিয়ে দেও।"

"চল, অব রেলকো দের হৈ", বলিয়া লোকটি বৈষ্ণবীকে ধর্মশালায় পৌঁছাইয়া আসিল।

বড় রাস্তার উপরেই একটি বৃহৎ কুয়া, সম্মুখে আম, কাঁঠাল, পিয়ারা, কলাগাছে ঠাসা, ফুলগাছও যথেষ্ট, নূতন পাকা বাড়ি তৈয়ার হইতেছে, স্থানীয় কোন ধনাঢ্য বৈশ্যদের ধর্মশালা।

বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কারিন্দা খাতাপত্র ফেলিয়া উঠিয়া আসিল, বলিল:

"মায়ি, আপ হিঁয়া রহনা চাতি হৈ?"

"ঘরদোরের মধ্যে তো দেখছি সবে একটি দালানে ছাদ হয়েছে, আর সব খোলা, থাকবো কোথায়? এখানে নিকটে কোন বাঙালী থাকে না?" বৈষ্ণবী কারিন্দাকে শুনাইয়া 'স্বগত' করিল।

কারিন্দা বাঙালী শব্দটি বুঝিয়া বলিল, "বাঙালী বাবু হৈ, মেরা মোকান কি পাস, আপ হুঁয়া জানা চাতি হৈ?"

"হাঁ বাপু, হাম মেয়ে মানুষ হৈ, হিঁয়া কাঁহা থাকেগে। কেৎনা দূর হৈ?"

"কৈ মাইল ভর হোগা। তো এসা কর, হিঁয়া প্রসাদ পাও, ফের কৈ দো তিন বাজেমে ঘরকো যাওগী, তোমকো সাথ লেযাওগী।"

"বেশ, তাই আচ্ছা।"

বৈষ্ণবী প্রাতঃকৃত্যাদি করিতে গেল। ক্রমে আরও তিন জন হিন্দুস্থানী রামায়েৎ সাধু আসিল এবং অনতিবিলম্বে অধিষ্ঠাতার গৃহে পাকাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ পাচক ধর্মশালায় শালগ্রাম পূজা ও অভ্যাগতদিগের জন্য পাক করিতে আসিল। মধ্যাহ্নে পাক শেষ হইবার কিছু পূর্বে আরও একটি অতিথি আসিলেন, সন্ন্যাসী, দীর্ঘ কেশ শ্মশ্রু, শান্ত কমনীয় মূর্তি, বয়স ৩৫।৩৬, গলা হইতে পা পর্যন্ত একটি আলখাল্লা পরা, পায়ে জুতা, সঙ্গে একখানি কম্বল ও একটি কমণ্ডলু। কারিন্দা সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল এবং একখানি খাটিয়া বাহির করিয়া বাসতে দিল।

বৈষ্ণবী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কারিন্দা দালানে নিজের দপ্তরের কাছে সন্ন্যাসীকে খাটিয়াতে বসাইয়াছে এবং কি ভিক্ষা করিবেন, জিজ্ঞাসা করিতেছে; সম্বোধন করিতেছে, কখন 'পরমহংস বাবা' কখন 'মহাপুরুষ' বলিয়া। বৈষ্ণবী অনতিদূরে বৃক্ষতলে যেখানে অন্য সাধুরা বসিয়াছিলেন, সেইখানে নিজের পুঁটলিগুলি রাখিয়া বসিল এবং তাঁহাদের সঙ্গে আধা বাঙলায় আধা হিন্দিতে আলাপ করিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে দালানের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী কারিন্দার নানাবিধ ধর্মবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসীর কোমল ও শান্তিমাখা স্বরে সারগর্ভ ও সরল কথাগুলি শুনিতে পাইতেছিল, কিন্তু একবারও সন্ন্যাসীর চক্ষু দুটিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট দেখিতে পাইল না। বৈষ্ণবী ভাবিতেছিল, "লোকটির চেহারা দেখে বোধ হয়, কোন বড় ঘরের ছেলে, জ্ঞান, সংযমও বেশ আছে দেখছি; কিছু পেয়েছে কি? আচ্ছা দেখা যাক।"

[ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম ও ১৯শ সংখ্যা, মাঘ ১৩১০, পৃঃ ১-৩ ও অগ্রহায়ণ ১৩১১, পৃঃ ৬৮২-৬৮৪

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

গত অক্ষয়তৃতীয়াতেই রাধিকাদাস বাবাজী ও শ্রীমান অমিতানন্দ শ্রীবিহারীজীর মন্দিরে আমাকে এনেছিলেন নিধুবন থেকে। সেদিন ছিল প্রচণ্ড ভিড়। মন্দিরে আসার সঙ্কীর্ণ গলিপথের দুধারে বহুরকমের মনোহারী দোকানে দোকানীদের হাঁক-ডাক, বৃন্দাবনের বিখ্যাত রাবড়ি আর পাঁয়াড়ার গন্ধের সঙ্গে গোলাপ আর বেলফুলের সুগন্ধ, এইসব মিলিয়ে এক বিচিত্র পরিবেশ পার হয়ে যখন মন্দিরের সুবিস্তৃত সিঁড়ি বেয়ে উঁচু চাতালে উঠে এসেছিলাম তখনই বাবাজী বলেছিলেনঃ "এই মন্দির প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো, তবে বর্তমান শোভন-সজ্জা দেড়শো বছরের। সামনেই বিশাল তোরণ পার হয়ে নাটমন্দিরে ঢুকতে হয়। বাইরে দুপাশে মন্দির-কমিটির অফিস, সেখানে প্রসাদ পাওয়ার ও ভোগ দেওয়া সংক্রান্ত টাকা-পয়সা দেওয়া-নেওয়া হয়। ভিতরে বাঁদিকে ভোগ রান্নার বিরাট ব্যবস্থা। সবই দেশী ঘিয়ের তৈরি জিনিস নিবেদন করা হয়। ডালডা জাতীয় কিছু দেওয়া হয় না। সেদিন মন্দিরের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণ ছিল শ্রীবিহারীজীর পূর্ণ বিগ্রহ ও শ্রীচরণ দর্শনলাভের সুযোগ। অক্ষয়-তৃতীয়াতে শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত মন্দিরেই দেববিগ্রহের সর্বাঙ্গ শ্বেতচন্দনের প্রলেপে ঢেকে দেওয়া হয়। ব্যতিক্রম একমাত্র এই শ্রীবাঁকেবিহারীজী। সেদিন তাঁর শরীরের সমস্ত সাজপোশাক খুলে দিয়ে অনাবৃত ঘন মেঘবরণ শরীর আর তার সঙ্গে বঙ্কিম ভঙ্গিতে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত চরণযুগল দেখতে পাওয়া যায়। বছরে ঐ একদিনই বিহারীজীর চরণযুগল দেখবার সৌভাগ্য হয়। অন্য দিনগুলিতে কোঁচা দিয়ে তা ঢেকে রাখা হয়। ঐদিন শুধু একখানি সাদা চাদর কাঁধের দুপাশে ঝুলিয়ে দিয়ে পীতবসনের কোঁচাটি দুই পায়ের ফাঁকে এমন-ভাবে রাখা হয় যাতে চরণদ্বয়ের পূর্ণ দর্শন হয়। বছরের ঐ একটি দিন দুর্লভ শ্রীচরণদর্শনের জন্য প্রচণ্ড ভিড় হয় এখানে। আমিও সেদিন ঐ কালো চরণ প্রাণভরে দর্শন করেছিলাম, খুব কাছে থেকে—শ্রীবিগ্রহের বাঁ-পাশের রেলিঙে শরীর যতটা ঝুঁকিয়ে দেওয়া যায়। তবে ভিড়ের চাপে সেদিন বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হয়নি।

তাই আজ আবার এসেছি। সঙ্গে শুধু অমিতানন্দ। সে আজ আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মন্দিরের জনৈক সেবাইত গোস্বামীজীর সঙ্গে। তিনিই এদিনের পালাদার, আমাকে রামকৃষ্ণ মঠের সাধু জেনে খুব আগ্রহ করে একেবারে রেলিঙের প্রান্তে শ্রীবিগ্রহের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেনঃ "স্বামীজী, এই বিগ্রহ স্বামী হরিদাসজীর সেবা-বিগ্রহ। এখনো যেন তিনিই সেবা করছেন—এই ভাবেই সেবা-পুজো করা হয়। আমরা তাঁর ভাই জগন্নাথ গোস্বামীজীর বংশধর—এখন বহু ঘর আমাদের হয়ে গিয়েছে; কিন্তু সেবা-পুজো ঠিক এক নিয়মে চালাতে হচ্ছে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রাচীন বিগ্রহ-গুলিকে, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভের তৈরি বলে কথিত আছে, সেই গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, কেশবদেব, শ্রীহরিদেব, বলদেব, সাক্ষীগোপাল ও শ্রীনাথজী—মুসলমান আমলের অত্যাচারের আশঙ্কায় বহুকালযাবৎ শ্রীবৃন্দাবনের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একমাত্র সেইকালেই যিনি প্রকট হয়েছেন সেই শ্রীবাঁকে-বিহারীজী বৃন্দাবনে রয়ে গিয়েছেন। পূর্বোক্ত দেববিগ্রহগুলি যেমন—সনাতন, রূপ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য প্রমুখ সাধকের ভক্তিতে পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল ভূগর্ভ হতে। এই বিহারীজীও প্রায় ঐ সময়েই নিধুবন থেকে প্রকট হন হরিদাস স্বামীর সাধনায়। সুতরাং প্রাচীনত্বের বিচারে বিহারীজীর বিগ্রহ পূর্ব-উল্লিখিত বিগ্রহগুলিকারই সমসাময়িক।

পরে জগন্নাথ গোস্বামীজীর গৃহস্থ বংশধরেরা এখানে শ্রীবিগ্রহকে নিয়ে আসেন। কারণ, নিধুবনের রাসস্থলীর প্রকাশ্যস্থানে ঐ বিধর্মীদের হাত থেকে বিগ্রহকে রক্ষা করবার জন্যই গোপনস্থানে তখন সরিয়ে নিয়ে রাখা হয়। পরে বিপদ কেটে গেলে এই মন্দিরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

"এখন এই বিগ্রহের বিশেষত্ব লক্ষ্য করুন। মূল বিগ্রহ ছাড়াও তাঁর বাঁদিকে নিচের বেদিতে একটি ছোট্ট বিগ্রহের মতো দেখতে পাচ্ছেন—দেখা যাচ্ছে শুধু মুকুটমাত্র। তাঁরও বাঁপাশে একটু নিচে একটি প্রাচীন পট। এই পটটি হরিদাস স্বামীর তৈলচিত্র। বহু প্রাচীন রাজস্থানী মিনিয়েচার পেন্টিং-এর অপূর্ব নিদর্শন। পটটি একটু বিগ্রহের দিকে মুখ ফেরানো অবস্থায় রাখা। যেন তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় কিশোর-কিশোরীর শ্রীরূপ সর্বদা দর্শন করছেন। আর এখানকার পূজা-বিধিতেও আছে, যা-কিছু ভগবানকে নিবেদন করা হয় সবকিছুই আগে এই পটে স্পর্শ করিয়ে তবে দেবতাকে অর্পণ করা হয়, যেন হরিদাসজীই সবকিছু বিহারীজীকে নিবেদন করছেন।

"এর পরে লক্ষ্য করুন তাঁর ডানপাশের মুকুটের প্রতীকটির দিকে। এটিই হচ্ছে ব্রজেশ্বরী রাধারানীর প্রতীক। ঐ মুকুটের নিচে রয়েছে একটি দুই ইঞ্চি ব্যাসার্ধের গোমুখী আকৃতির শিলা। এটি আসলে 'রাধাযন্ত্র'। ঐ শিলার ওপরে মনে হয় জ্যামিতিক রেখায় 'রাধাযন্ত্র' আঁকা ছিল, এটি নিয়েই সম্ভবতঃ হরিদাস স্বামী সাধন করতেন। বহু প্রাচীন এই যন্ত্র-শিলাটি। এঁর উৎপত্তি সম্পর্কে বর্তমান সেবাইতরা কেউ কিছু বলতে পারেন না। ঐ যন্ত্র-শিলাটিকে ভেলভেটের গদির মধ্যে একটি গর্ত করে তার ভিতরে রাখা হয়। তারপর ঐ ভেলভেটের গদির ওপর ঘাগরা পরিয়ে মাথায় মুকুট দিয়ে রাধারানীর প্রতীকরূপে সাজিয়ে বিহারীজীর বাঁদিকে রাখা হয়। বিহারীজীকে যেমন দিনে দুবার আতরসেবা করা হয় তেমনি এই রাধা-শিলাকেও আতরসেবা করা হয় দুবার। আর সবচেয়ে যা অদ্ভুত, তা হলো এঁর শয়ন-পদ্ধতি—দুপুরে ও রাত্রে বিহারীজীর শয়নের সময় এই শিলাটিকে তুলে নিয়ে বিহারীজীর বুকের ওপর রাখা হয়। রাধা-কৃষ্ণ এক তনু হয়ে যায় তখন। স্বয়ং পরমা শক্তি পরমাত্মার হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা হলেন। এ ধারা হরিদাস স্বামীর সময় থেকেই চলে আসছে।"

*

ডাক আসে গোস্বামীজীর—আরতির সময় হয়েছে—বৈকালিক ভোগারতির। সুতরাং অমিতানন্দ আমাকে নিয়ে এসে নাটমন্দিরের এক প্রান্তে উঁচু বারান্দার ওপর বসে। এখান থেকেও বিগ্রহের বেশ দর্শন হয়। আরতি শুরু হয়। এ আরতিও অভিনব—কোন বাজনা-বাদ্যি কিছুই নেই, এমনকি পূজারীর হাতে ঘণ্টাও নেই। তিনি শুধু একটি দীপাধারে পাঁচটি দীপশলাকা নিয়ে শান্তভাবে আরতি করছেন। আর নাটমন্দিরে সমবেত ব্রজবাসিনী ভক্ত রমণীরা হাততালি দিয়ে ভজন করছেন, "হে গোপাল, হে গিরিধারীলাল, গোষ্ঠ হতে ফিরে ক্লান্ত তুমি—এবার আমাদের এই সেবা গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ কর।" অপূর্ব ভাবের সঙ্গে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে সমস্বরে এই ভজন একটা অন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেন গোপীরা তাদের আদরের দুলালকে কত আদর সোহাগ করে খেতে বসবার জন্য অনুনয় করছে। সামান্যক্ষণ আরতির পরেই সামনের পর্দা টানা হয়। এটিও এই মন্দিরের বিশেষত্ব। এর নাম 'ঝাঁকি দর্শন'। দুই-এক মিনিট পর-পরই দেবতার সামনে পর্দা ফেলে দেওয়া হয়।

এই 'ঝাঁকি দর্শন' নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। সেইসব কথার মূল বক্তব্য মনে হয় ভক্তের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করা। ঐ ভুবনভোলানো রূপ মানুষকে পাগল করে দেয়, সে ছুটে যেতে চায় প্রিয়তমকে হৃদয়ে ধারণ করতে। রূপ দেখে দেখে যেন নয়ন ভরে না। আরও শোনা যায়, বিহারীজীও নাকি কোন এক সময় এই রকম এক প্রেমে পাগলিনী ভক্তিমতি সাধিকার একাগ্র দৃষ্টির আকর্ষণে বাইরে চলে আসতে শুরু করেছিলেন। সেই সময়ই তাঁর এই তন্ময় আকর্ষণী দৃষ্টির সামনে অবরোধ সৃষ্টি করার জন্যই এই পর্দার আড়াল দেওয়া হয়েছিল। বিহারীজী যেন আর ভক্তের টানে চলে না যান। সেই থেকেই 'ঝাঁকি দর্শন' চালু এখানে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই আমার মনে পড়ে গেল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে আসেন মথুরবাবুর সঙ্গে, তখন এই বিহারীজীর মন্দিরেই তাঁর অদ্ভুত ভাবাবেশ হয়, আত্মহারা হয়ে তিনিও শ্রীবিগ্রহকে আলিঙ্গন করার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। ব্রজের নানা স্থানে তাঁর সেসময় শ্রীকৃষ্ণলীলার নানা-ভাবের উদ্দীপনে প্রেমাবেশ হয়েছিল। বৃন্দাবনের অন্য মন্দির অপেক্ষা এই মন্দিরেই তাঁর ভাবসমুদ্র উথলে উঠেছিল সর্বাধিক।

আরো মনে পড়ছিল শ্রীশ্রীমায়ের কথা। তিনি এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রসঙ্গেই বলেছিলেনঃ "বৃন্দাবনে যখন থাকতুম তখন বাঁকেবিহারীকে দর্শন করে বলতুম, 'তোমার রূপটি বাঁকা মনটি সোজা—আমার মনের বাঁকটি সোজা করে দাও'।" তাইতো শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার স্মৃতি-বিজড়িত এই পবিত্র মন্দির আমার মনকে আরও বেশি করে আকর্ষণ করে।

অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে—অমিতানন্দও অনেক কথা এর মধ্যে শুনিয়েছে। জানিয়েছে মন্দিরের কিছু নিয়মের কথা। সে বললঃ "এই একমাত্র মন্দির বৃন্দাবনে, যেখানে মঙ্গলারাত্রিক হয় বেলা নটা-সাড়ে নটার সময়। তার কারণও বড় আবেগ-মধুর। এখানে শ্রীভগবানের সেবা জীবন্ত-জ্ঞানে করা হয়; এবং বিশ্বাস করা হয়, এই বিগ্রহ রাধা-কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। এঁরা নিত্য মধ্যরাত্রে এখান থেকে রাসবিহারে যান তাঁদের স্বক্ষেত্র নিধুবনে। সেই রাসলীলার অন্তে ফিরে আসেন শেষ প্রহরে। সেজন্য ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিয়ে মঙ্গলারতির নামে তাঁদের কষ্ট দেওয়া হরিদাস স্বামী সহ্য করতে পারতেন না। সেই ট্র্যাডিশন এখনো চলে আসছে। এইভাবে প্রতি রাত্রে বিহারীজীর মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া নিয়েও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ভক্ত-ভগবানের মধ্যে আকর্ষণের বড় মধুর সেসব কাহিনী। তার মধ্যে হাতিবাবা বলে একজন বিখ্যাত সাধকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়, যা খুব বেশি দিনের নয়, মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের ঘটনা। তিনি এক সময় মন্দিরের বাইরে গেটের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন রাত্রিবেলায় দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর। সেই সময় মধ্য-রাত্রে তাঁর মনে হতো কেউ যেন তাঁকে ঠেলছে। তিনি কোন সাড়াশব্দ না দিয়ে চুপ করে শুয়েই থাকতেন। পরে মনে হলো কেউ তাঁকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে চলে গেল। এই হাতিবাবাকে পাড়ার ছেলেরা খুব ভালবাসতো, তারাই এই পরমহংস সাধুটিকে রোজ মিষ্টি, ফল খাওয়াত। কিন্তু দু-তিন রাত্রি এই ঘটনার পর হঠাৎ দেখা গেল ঐ ছেলেরাই হাতিবাবাকে দেখলেই ইঁট মারছে, গালাগালি দিচ্ছে, গায়ে থুতু দিচ্ছে। হাতিবাবা ভাবলেন এর কারণ একটাই হতে পারে, বিহারীজী হয়তো চান না তাঁর অভিসারের পথে আমি বাধা সৃষ্টি করি। সেজন্য এই সরল ব্রজবালকদের মনে এই বিচিত্র ভাবের উদয় ঘটিয়েছেন। তার পর থেকে হাতিবাবা আর এই পাড়ায় থাকলেন না। চলে গেলেন বৃন্দাবনের দক্ষিণপ্রান্তে দাবানল কুণ্ডের কাছে। এক টিলায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আর অভিমানে ভিক্ষায় যাওয়াও বন্ধ করলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখা গেল আবার ঐ অঞ্চলের ব্রজবাসীরা তাঁর জন্য আগের মতো খাদ্য ও পানীয় এনে দিচ্ছে। এর বেশ কিছুকাল পরে সেখানকার একজন তরুণ সন্ন্যাসী হাতিবাবাকে প্রশ্ন করেনঃ "বাবাজী, আপ আভি কিঁউ নেহি বিহারীজীকো দর্শনমে যাতে হেঁ?" (বাবাজী, আপনি এখন বিহারীজীর দর্শনে কেন যান না?) উত্তরে প্রায় আশি বছরের সেই বৃদ্ধ তপস্বী জানানঃ "পহলে তো ম্যায়নে হি যাতা থা, লেকিন আভি উনহোনে খুদ হামারি পাস আতে হেঁ।" (আমি তো প্রথমদিকে যেতাম। কিন্তু উনিই যে এখন স্বয়ং আমার কাছে আসেন।) এই ঘটনাটি আমি সেই তরুণ সন্ন্যাসীর বার্ধক্যাবস্থায়, যখন তিনি অখণ্ডানন্দ সরস্বতীজী নামে বহুমানিত, গত ১৯৮৬-তে বৃন্দাবনে থাকা-কালে তাঁর স্বমুখেই শুনেছি। এখন তাঁরই বয়স পঁচাত্তর, এই ধরনের বহু অভাবনীয় ঘটনা বিহারীজীর সম্পর্কে শোনা যায়। বড় জাগ্রত এই ঠাকুর।" [ক্রমশঃ]

প্রবন্ধ

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"

মিনতি কর

'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।'

শ্রুতিতে পরমাত্মাই পরিপূর্ণ রসস্বরূপ বলে নির্ণীত হয়েছেন। পরমাত্মাই রস, যা লাভ করে জীব আনন্দিত হয়ে থাকে। সেই আনন্দস্বরূপে যদি রস না থাকত তাহলে কে এই সংসারে স্পন্দিত হতো, কে প্রাণক্রিয়াযুক্ত হতো? ভগবান আনন্দস্বরূপ। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর সত্তায় সত্তাবান এই জগৎ। তাঁরই আনন্দরূপের অভিব্যক্তিতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে নিরন্তর আনন্দপ্রবাহ প্রকটিত হচ্ছে।

প্রকৃতির রাজ্যে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেদিকেই যেন অনন্ত আনন্দ উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। জীবজগতে যেখানেই আনন্দের পরিস্ফুরণ হয় সেখানেই এই আনন্দময় ভগবৎ-সত্তার কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তিমাত্র হয়ে থাকে। আনন্দ লাভ করার জন্য, আনন্দকে আস্বাদন করার জন্য, আনন্দময় হবার জন্য জীবের মধ্যে একটি ব্যাকুলতা থাকেই —সে বুঝুক অথবা না বুঝুক।

উপনিষদ্ বলেছেন: "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আনন্দ থেকেই প্রাণিগণ উদ্ভূত হয়, আনন্দেই জীব জীবিত থাকে, আবার অন্তে আনন্দেই লীন হয়ে যায়। প্রতিটি জীব প্রতিনিয়তই আনন্দের অনুসন্ধান করছে, কিন্তু পার্থিব বস্তুনিচয় থেকে যে আনন্দ বা সুখ অনুভূত হয় তা চিরস্থায়ী নয়, তা মর্তের গ্লানির দ্বারা ক্লিষ্ট। অতএব শাশ্বত আনন্দ বা সুখকে লাভ করতে প্রয়াসী মানবাত্মা আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতেই আত্মসমর্পণ করে।

গীতাতে বলা হয়েছে: "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ"—বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি হয়। নিরন্তর ভোগতৃষ্ণায় প্রধাবিত জীবগণ বিষয়ের সংস্পর্শ থেকেই আনন্দরস আস্বাদন করে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হলেই আনন্দানুভূতি হয় কেন? এর উত্তরে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে: "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"—ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ। সর্বব্যাপী পরমানন্দ ব্রহ্ম সকল বস্তুতে অবস্থিত আছেন। প্রত্যগাত্মা থেকে বহির্মুখী জীবগণ মূলীভূত ব্রহ্মস্বরূপের অনুসন্ধান না করে বহির্বিষয়ে আনন্দের অনুসন্ধান করে এবং সেই বিষয় থেকে আপাত-সুখকর আনন্দ গ্রহণ করে। এই আনন্দ সংসারের গ্লানির দ্বারা ক্লিষ্ট ও বাসনার দ্বারা পীড়িত, তাই এই আনন্দ দুঃখ সংস্পৃষ্ট, এই আনন্দ অনন্ত কালাবস্থায়ী নয়, এই আনন্দ ক্ষয়যুক্ত। এই কারণে ক্রান্তদর্শিগণ লৌকিক বিষয় ভোগসুখে বিতৃষ্ণ হয়ে অনন্ত কালাবস্থায়ী আনন্দের ঈপ্সাপূর্বক সকল আনন্দের মূলীভূত উৎস ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের জন্য চেষ্টিত হন।

পরব্রহ্ম রসস্বরূপ। তিনিই আনন্দের মূলকেন্দ্র। "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আনন্দময়ঃ"। এইভাবে শ্রুতিতে পরব্রহ্মেরই আনন্দময়ত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। "যঃ সর্বজ্ঞঃ"। "সর্বং অয়মাত্মা সর্বানুভূঃ" এই সকল শ্রুতিবাক্য থেকে জানা যায়, তিনি জ্ঞানস্বরূপ হয়েও জ্ঞানবান, তিনি জ্ঞানস্বরূপ হয়েও সর্বজ্ঞঃ, তিনি আনন্দস্বরূপ হয়েও আনন্দরস আস্বাদনের জন্য বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করেন।

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণে ময়ট্ প্রত্যয়কে প্রাচুর্যার্থে গ্রহণ করে আনন্দময় পদের দ্বারা আনন্দের প্রাচুর্যকে গ্রহণ করেছেন। "এষ হ্যেবানন্দয়তি" এই শ্রুতিবাক্যে বলা হয়েছে যে, এই পরমাত্মাই জীবকে আনন্দে অভিষিঞ্চিত করেন। লৌকিক

জগতে দেখা যায়, যে অন্যকে ধন দান করে সে স্বয়ং প্রভূত ধনশালী, সেরূপ যিনি জীব-জগৎকে আনন্দ দান করেন তিনি যে স্বয়ং আনন্দময় হবেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" এই শ্রুতিবাক্যসকল বারংবার ব্রহ্মের আনন্দময় সত্তাকে প্রতিপাদন করেছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" এই শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা জীবগণকে যে আনন্দ দান করেন সেই আনন্দের স্বরূপ কি? তিনি কি তাঁর আনন্দময় স্বরূপের আনন্দ দান করেন অথবা অন্য কোনও আনন্দ দান করেন? কারণ, সংসারের প্রাণিনিচয় যে আনন্দ ভোগ করে তা দুঃখ-সংযুক্ত, এই আনন্দ অনন্ত আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, কারণ পরব্রহ্মে দুঃখরূপতা নেই।

এর উত্তরে বলা যায় যে, এই আনন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দ থেকে পৃথক নয়; কারণ তিনি আনন্দ-দাতা। জীবগণ অনাদি কর্মজনিত প্রত্যগাত্মা থেকে বহির্মুখ বলে বিষয় থেকে দুঃখসংসৃষ্ট আনন্দ ভোগ করে। কিন্তু যখনই সে ভগবৎসত্তা অনুভব করে তখনই সে পূর্ণ আনন্দ লাভ করে নিরতিশয় সুখ লাভ করে থাকে।

শ্রীভগবান আপ্তকাম হয়েও অনন্ত লীলা প্রকটিত করবার জন্য এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন। রামানুজাচার্য শ্রীভাষ্যে বলেছেন: "অবাপ্তসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্য স্বসংকল্প-বিকার্য-বিবিধ-বিচিত্র-চিদ-চিন্মিশ্রজগৎসর্গে লীলৈব কেবলা প্রয়োজনং লোকবৎ।" স্বীয় সংকল্পমাত্রেই বিবিধ বিচিত্র চিদ্ ও অচিদ্ মিশ্রিত এই জগৎ সৃজনে আপ্তকাম পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীভগবানের লীলা ব্যতীত আর অন্য কোনও প্রয়োজন নেই। ভগবানের কোনরূপ ফলাভিসন্ধি না থাকলেও তিনি লীলার জন্য এই বিশ্ব প্রপঞ্চের বিস্তার করেছেন। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে: "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।" শ্রীভগবান কোনও প্রকার প্রয়োজনের অপেক্ষা না রেখেই স্বরূপভূত পরমানন্দের উচ্ছ্বাসবশতঃ বিবিধ বিচিত্র লীলা করে থাকেন। তিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁর আনন্দ নিত্য ও অপরিসীম।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ঈশ্বর যদি সর্ব জীবেই সমভাবে আনন্দ বিতরণ করেন তবে কেউ আনন্দ লাভ করে কেউ বা সংসারের দুঃখে দুঃখী হয়ে থাকে কেন?

এর উত্তরে বলা যায়, জীবের আনন্দের আস্বাদন দুঃখনিবৃত্তির জন্য। সূর্য যেমন সর্বদা সর্বত্র সমভাবে কিরণ বিতরণ করে, কিন্তু তৈজসপত্রা-দিতে বা সূর্যকান্তমণিতে অধিকতর ঔজ্জ্বল্যপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু মৃত্তিকাপাত্রে ঐ ঔজ্জ্বল্য প্রকটিত হয় না। সেরূপ শ্রীভগবানের আনন্দ সকল জীবের ওপর সমভাবে বিতরিত হলেও ভগবৎ-অভিমুখী বিষয়ে অনাসক্ত জীব যে-প্রকারে ভগবানের করুণা লাভ করে, বিষয়াসক্ত জীব তদ্রূপে আনন্দ গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষের আশঙ্কা নিরাকৃত হয়। বিষয়ে অনাসক্ত জীবগণ সর্ববিধ বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের অফুরন্ত আনন্দরস আস্বাদন করে।

যে একবার তাঁর রূপমাধুরী আস্বাদন করেছে তাকে আর পার্থিব কোনও বিষয় আকৃষ্ট করতে পারে না। তত্ত্বসন্দর্ভকার বলেছেন: "প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।" ভগবৎ-প্রেমের অঞ্জন একবার যার নয়নে লাগে, সেই ভক্ত নিখিল বিশ্বে ভগবৎ-সত্তার অপার আনন্দ-মাধুর্য উপলব্ধি করে কৃতকৃতার্থ হয়। এই অবস্থার বর্ণনা করে বৈষ্ণব কবি বলেছেন: "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" যে একবার ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য-মাধুর্য হৃদয়ে উপলব্ধি করে, তার নিকট সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণরূপে স্ফুরিত হয়। তখন আর বিষয়-বাসনা থাকে না, আত্ম-পর ভেদ থাকে না। এই অবস্থায় ভক্ত সকল ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করে অনন্ত আনন্দরস হৃদয়ে উপলব্ধি করে থাকে।

আত্মাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা হয়। আত্মা আনন্দস্বরূপ, এজন্য জীব যখন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধনের মাধ্যমে নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত বলে অনুভব করে তখন সে আনন্দস্বরূপে অবস্থান করে। অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে এই হলো সাধনার চরমতম প্রাপ্তি।

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

শ্বেত মহাদেশ—অ্যাণ্টার্কটিকা

মাইকেল ডি. লেমোনিক

পাহাড়ের ওপর ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে দেখা যাবে এক ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর হলেও কিন্তু জীবনরক্ষার প্রতিকূল। গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ গরমের সময়ও চারিদিক বরফে ঢাকা নিঃসঙ্গতা। বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে একটি উপসাগর, যার জল শক্ত বরফ হয়ে আছে; তার ওপারে চকচক করছে হিমবাহগুলি ও পাহাড়ের চূড়াগুলি। দক্ষিণে এবং পূর্বে ধাপ ধাপ করা চিরতুষার পাহাড়। উত্তরে বরফে ঢাকা আগ্নেয়গিরি, যা থেকে সবসময় দূষিত ধোঁয়া বার হয়ে চলেছে। এই হচ্ছে পৃথিবীর তলদেশ, যেখানে হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার (২০০ মাইল) এবং তাপমাত্রা বরফের তাপমাত্রার চেয়ে ৮৫°C (−৮৫°C) নিচে নেমে যেতে পারে।

কিন্তু অ্যান্টার্কটিকার পূর্বাংশে 'ম্যাকমার্দো সাউন্ড' নামক স্থানের পাশে পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখে যা বর্ণনা দেওয়া হলো, তা পুরোপুরি সত্য নয়। আরও খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই আপাতঃ প্রাণহীন স্থানটি প্রাণিকুলে পূর্ণ। মহাদেশের চারিধারের সমুদ্রকূলে প্ল্যাঙ্কটন নামক আণুবীক্ষণিক জীব ও মাছে ভরা; মোটা বরফের স্তরে যেসব গর্ত দেখা যায় তা সীলমাছের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য। একটু দূরে 'কেপ-রয়েড' নামক জায়গায় হাজার হাজার অ্যাডেলি পেঙ্গুইনদের আবাসভূমি। সেখানে তাদের ডিম থেকে বাচ্চা হয়ে চলেছে। স্কুয়া (skua) নামক সমুদ্রচিল মৃত সীলমাছের মাংস এবং অরক্ষিত পেঙ্গুইন-বাচ্চা খাবার জন্য ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বরফে রয়েছে কোটি কোটি জীবাণু ও সমুদ্রশৈবাল অ্যালজী।

এছাড়া আর একরকমের প্রাণী আছে এখানে। অ্যান্টার্কটিকার চারিধারে উপকূলবর্তী অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যাবে অসংখ্য ভাঁজকরা (corrugated) ধাতুনির্মিত বাড়ি, তৈলসংরক্ষণের আধার, জমা করা ময়লা, যা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে যে, এখানে মানুষ থাকে। পৃথিবীর সকল মানবসম্প্রদায়ের নিজস্ব এই একটি মাত্র মহাদেশে এখন ১৬টি জাতি তাদের আপন আপন স্থায়ী কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেছে। এরা প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এসেছে, কিন্তু তারা গাদা গাদা যাত্রী আকর্ষণ করছে, যারা পাহাড়ের চূড়া আর পেঙ্গুইনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। পরিবেশ-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, খনিজদ্রব্য ও তেলের সন্ধানে লোক আসতে আর দেরি নেই। এরই মধ্যে পৃথিবীর যা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার জায়গা ছিল, তা এখন নোংরা হয়ে গেছে! বছরের পর বছর তারা সমুদ্রে তেল ফেলছে, অপরিশ্রুত ময়লা সমুদ্র-উপকূলে ফেলছে, খোলা জায়গায় জঞ্জাল পোড়াচ্ছে আর বরফের ওপর গাদা গাদা ভাঙা যন্ত্রপাতিতে মরচে পড়তে দিচ্ছে।

পরিবেশের ওপর এই ধ্বংসলীলার ফলে অ্যান্টার্কটিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বের সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ওয়াশিংটনে ও (নিউজিল্যান্ড-এর) ওয়েলিংটনে এ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। সবাই মনে করে যে, এবিষয়ে কিছু করা দরকার এবং তা এখনি। এসব সত্ত্বেও অ্যান্টার্কটিকা এখনো অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় একমাত্র মহাদেশ, যা আদিম অবস্থায় আছে। এখানে বৈজ্ঞানিকেরা আবহাওয়া বিষয়ে সেইসব গবেষণা করতে পারে যার ফলাফল সমগ্র বিশ্বের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। এই তুষার-মহাদেশ ছাড়া অন্যত্র সেইসব গবেষণা সম্ভব নয়। এখন যেটা বিতর্কের ব্যাপার, সেটা হচ্ছে তেল ও খনিজদ্রব্য খোঁজার ব্যাপারে যে ওয়েলিংটন কনভেনশন হয়েছিল, সেইটি। এই কনভেনশনের সমর্থনকারীরা মনে করেন, তেল ও খনিজদ্রব্য আহরণে সতর্কতা নেওয়ার ব্যাপারে ছয় বছরের

চেষ্টায় যেসব নিয়মকানুন গৃহীত হয়েছে, তা খুবই কঠোর (stringent)। কিন্তু অনেক পরিবেশ-বিশারদরা এই নিয়মকানুন করার মধ্যে অ্যান্টার্ক-টিকার গুপ্ত খনিজ-দ্রব্য লুণ্ঠনের সূচনা বলে মনে করেছেন। তাঁরা এই মহাদেশকে 'বিশ্বপাক''-এ পরিণত করতে চান যাতে এখানে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে দেওয়া হবে। ব্যাপারটি ঘোরালো হয়ে উঠল যখন এখানকার স্থায়ী আবাসস্থাপনকারীদের দুটি বড় দেশ, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়া ঘোষণা করল যে, তারা ওয়ার্ল্ড-পার্ক'' করার পক্ষপাতী। যতদিন পর্যন্ত এ-ব্যাপারে সবাই একমত না হচ্ছে, ততদিন এই মহাদেশের খনিজলুণ্ঠন বন্ধ করা যাবে না।

কিন্তু এর মধ্যে যা ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়। বহুবছর ধরে শিল্পোন্নত জাতিগুলি যে পরিমাণ ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (সি.এফ. সি.) গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছেড়েছে, তা মহাকাশের পরিবেশে 'ওজোন' (ozone) স্তরের ক্ষতিসাধন করেছে। এই 'ওজোন'স্তরই ক্ষতিকারী আল্ট্রাভায়ালেট রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। এই রশ্মি মানুষ ও জন্তুর দেহের ক্ষতি করে, ক্যান্সার সৃষ্টি করে, ফসলের ক্ষতি করে। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে 'ওজোন গর্ত'' আবিষ্কারের পরই এই ব্যাপারে সকলের টনক নড়ল। তারপরেই মহাদেশের যেখানে মনুষ্য-বসতি বেশি, সেখানে 'ওজোন' ধ্বংসের পরিমাণ মাপা শুরু হয়েছে। উপস্থিত সকল জাতি যাতে সি. এফ. সি. গ্যাস কম পরিমাণে তৈরি করে, সেইরকম শর্তে রাজি হতে চেষ্টা করছে, যাতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে না যায়। ইউনাইটেড স্টেটস্ যে 'পামার স্টেশন' নামক ঘাঁটি করেছে, সেখানে 'ওজোন' কমে যাওয়ায় অ্যান্টার্কটিকা উপদ্বীপে (peninsula) প্রাণিকুলের কি ক্ষতি হয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখছে। দেখা গেছে যে, বেশি পরিমাণ আল্ট্রাভায়ালেট রশ্মি ফাইটোপ্লাংকটন-জাতীয় আণবিক প্রাণীর ক্লোরো-ফিল নামক সবুজ রঞ্জক পদার্থ নষ্ট করে ; এর ফলে এদের বর্ধনহার ৩০ শতাংশ কমে যায়। সেরকম হলে ক্রিল নামক চিংড়িজাতীয় প্রাণী, যা ঐ ফাইটো-প্লাংকটন খায়, তা কমে যায়। আবার অন্যান্য মাছ —তিমি, পক্ষযুক্ত পাখি—যারা ঐ ক্রিল খেয়ে বাঁচে, তাদের সংখ্যাও কমে যায়।

অ্যান্টার্কটিকার জীবনযাত্রাপ্রণালী যে কত ক্ষণ-ভঙ্গুর তা বোঝা গেল, যখন ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আর্জেন্টিনার একটি যাত্রী ও মাল-বাহী জাহাজ পামার স্টেশনের খানিক দূরে ভেঙে গিয়ে প্রায় ১৭০,০০০ গ্যালন জেট ও ডিজেল তেল পড়ে যায়। এর ফলে অসংখ্য ক্রিল ও পেঙ্গুইন-শাবক মারা পড়ল। পামার স্টেশনের প্রাণিকুল বিষয়ে ২৫ বছরের অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা এইভাবে নষ্ট হলো। এর পরেই পেরুভিয়ান জাহাজ 'বাহিয়া' ঝড়ের মুখে পড়ে এত তেল ফেলল যে, আধমাইল জুড়ে তেলের স্তর সৃষ্টি হলো। এইসব ঘটনায় বিজ্ঞানীদের যে আশা ছিল—এই মহাদেশটি অবিকৃত ল্যাবরেটরি থাকবে, তাতে আঘাত পেল। কিন্তু তাঁরাও অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা কম ক্ষতি করছেন না। আমেরিকার ম্যাকমার্দো স্টেশন কয়েক মাস আগে জানিয়েছে যে, বরফের ওপরে থাকা তাদের তেল-ভাণ্ডারের রবার নষ্ট হয়ে গিয়ে ৫২,০০০ গ্যালন তেল ছড়িয়ে পড়েছে।

এই মহাদেশ পৃথিবীর অন্য অংশের আবহাওয়াকেও প্রভাবিত করছে, যদিও ঠিক কিভাবে করছে তা জানা যায়নি। এখানকার শ্বেত তুষারস্তর সূর্য কিরণের উত্তাপকে শূন্যে প্রতিফলিত করছে, যার ওপরে জমাট হাওয়ার স্তর বর্তমান। এর ফলে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে, যা পৃথিবীর আবর্তনের জন্য প্রচণ্ড ঝড়ে পরিণত হচ্ছে, যাকে নাবিকরা 'গর্জনকারী ৪০' এবং 'সাংঘাতিক ৫০' বলে ; এই ঝড়ই ৪০° এবং ৬০° ল্যাটিচিউড-এর সমুদ্রকে শাসন করে। যদি বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারেন যে, কিভাবে এই ঝড় সারা পৃথিবীর হাওয়াকে প্রভাবিত করছে, তাহলে এই পৃথিবী গ্রহটির আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে।

অ্যান্টার্কটিকা পৃথিবীর জন্ম-ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় অধ্যায়ের সাক্ষ্য (ফসিল—Fossil) বহন করছে। বিশ কোটি বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা একটি অতি-মহাদেশের (super continent) অংশ ছিল, যার নাম ছিল 'গন্ডোয়ানাল্যান্ড'। এই নামটি এসেছে ভারতবর্ষের একটি অংশের নাম 'গন্ডোয়ানা' থেকে, যেখানে সেই অতি-মহাদেশের ভূতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। সেকালের অতি-মহাদেশটি

প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলে (ট্রপিক্যাল) ছিল; জঙ্গলাবৃত এবং সরীসৃপ, আদি স্তন্যপায়ী প্রাণী ও নানা ধরনের পাখিতে ভর্তি ছিল। কিন্তু আনুমানিক ১৬ কোটি বছর আগে অতি-মহাদেশটি টুকরো হতে থাকে; এর মধ্যে বড় বড় টুকরোগুলি দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হয়ে রয়ে গেল, অ্যান্টার্কটিকা দক্ষিণ মেরুতে চলে এলো। এইভাবে সৃষ্ট হলো পৃথিবীর মনুষ্যবাসের অনুপযোগী সবচেয়ে বড় জায়গা।

এই মহাদেশের দেড়কোটি কিলোমিটার অঞ্চলে বারিপাত এত কম যে, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি বলে পরিগণিত। এখানে বেশিরভাগ বরফ গলে না এবং শত শত বছর ধরে কেবল জমে যাচ্ছে; মহাদেশের ৯৮ শতাংশ ২১৫৫ মিটার মোটা তুষারে আবৃত। এই বরফ পৃথিবীর সমগ্র বরফের ৯০ শতাংশ এবং সমগ্র জলরাশির ৬৮ শতাংশ। যদিও গ্রীষ্মের কয়েক মাস সূর্য সবসময় মহাদেশে কিরণদান করে, কিন্তু সূর্যকিরণ এত কোণাকুণিভাবে পড়ে যে এতে বরফ গলে না। দক্ষিণমেরুতে গড় তাপমাত্রা —৪৯°C (—৫৬°২F) এবং সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা উঠেছিল —১৩·৬°C (—৭·৫°F)। শীতের সর্বসময়ব্যাপী অন্ধকার অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ভস্টক' আবাসস্থানে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা হয়েছিল —৮৯°C (—১২৮·৬°F)। এই মহাদেশে ৩৫টি উপজাতির পেঙ্গুইন, অন্যান্য পাখি, ছয় প্রকারের সীল, বারো রকমের তিমি এবং প্রায় দুশো রকমের মাছ আছে।

প্রচুর সামুদ্রিক প্রাণীই বহু লোককে এই মহাদেশে আসতে আকৃষ্ট করেছিল। যখন ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ ও ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি জেমস কুক প্রথম অ্যান্টার্কটিকা প্রদক্ষিণ করেছিলেন তখন তিনি প্রচুর সীলমাছ দেখেছিলেন; পরবর্তী শতাব্দীতে এই মহাদেশ শিকারীদের স্বর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় ... হাতি এবং লোমশ সীল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের পরে মহাদেশের আশেপাশের জলে দশ লক্ষেরও বেশি সীল, মিঙ্কে ও ফিন তিমি হারপুন-বিদ্ধ হলো।

এসব লুণ্ঠনকারীদের সঙ্গে এলেন আবিষ্কারীরা, যাঁদের উদ্দেশ্য হলো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান—তা নিজের গৌরবের জন্য হোক কিংবা তাঁর দেশের গৌরবের জন্যই হোক। সবথেকে প্রথম এলেন ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেনের জেমস ক্লার্ক রস সমুদ্রের বরফ পার হয়ে; লক্ষ্য দক্ষিণ মেরু। সাত দশক পরে সেই মেরুতে পৌঁছালেন দুজন, কিন্তু বড় করুণ পটভূমিকায়। একজন হলেন নরওয়ের রোয়াল্ড অ্যামান্ডসেন, যিনি কুকুরে টানা স্লেজগাড়ি ব্যবহার করেছিলেন; কিন্তু ব্রিটিশ অভিযানকারী স্কট যান্ত্রিক গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন, যে-গাড়ি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। অ্যামান্ডসেনের দল পৌঁছালেন ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর। এক মাস পরে স্কট সেখানে গিয়ে নরওয়ের পতাকা এবং অ্যামান্ডসেনের মন্তব্য লেখা চিঠি দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন। ফেরার কাহিনী আরও দুঃখদায়ক। সরবরাহ ডিপোর মাত্র ১১ মাইল দূরে পর্যন্ত এসে স্কট ও তাঁর দুই সঙ্গী প্রবল তুষার ঝড়ে পড়লেন; সেই সঙ্গে হলো খাবার ও জ্বালানীর অভাব। স্কটের ডায়েরী এইভাবে শেষ হয়েছেঃ "আমরা শেষ পর্যন্ত দেখব, তবে দুর্বল হয়ে পড়ছি এবং মনে হচ্ছে অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। খুবই দুঃখের বিষয়, কিন্তু আমি আর লিখতে পারছি না।... ভগবানের দোহাই, আমাদের অন্যান্য লোকদের জন্য অনুসন্ধান কর।"

আকাশযানের প্রচলন হওয়ায় অ্যান্টার্কটিকা যাওয়া তত বিপজ্জনক নয়। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে রিচার্ড বিয়ার্ড নামক একজন আমেরিকান আকাশযানে প্রথম দক্ষিণ মেরুতে আসেন; মহাদেশের পশ্চিম উপকূল থেকে ঘুরে দক্ষিণ মেরুতে আসতে লেগেছিল ১৬ ঘণ্টা। ১৯30-এর দশকে জার্মান বৈমানিকরা অ্যান্টার্কটিকার একাংশ তাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করে স্বস্তিকা পতাকা দিয়ে শত শত খুঁটি পুঁতেছিল। যুদ্ধোত্তর জার্মান, নাৎসি (Nazi)-দের সেই দাবি নিয়ে বিশেষ জিদ করেনি, কিন্তু অন্য সাতটি জাতি—আর্জেন্টিনা, চিলি, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, ব্রিটেন, নরওয়ে এবং অস্ট্রেলিয়া, যারা এই মহাদেশে অভিযান চালিয়েছিলেন—তাদের অংশবিশেষ বলে দাবি করে রেখেছেন। কারও কারও দাবি অন্যের দাবির

অংশের ওপরে পড়েছে। যেমন, চিলি, ব্রিটেন, আর্জেন্টিনা—এরা সবাই অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলাকে নিজের বলে দাবি করে। ইউনাইটেড স্টেট্স নিজের বলে কোন অংশ দাবি করে না। তবে অন্যের দাবিকেও স্বীকার করে না। তাঁরা এই মহাদেশে অসংখ্য বড় বড় অভিযান চালিয়েছে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ১৩টি জাহাজ, ৫০টি হেলিকপ্টার এবং প্রায় ৫০০০ সৈন্য নিয়ে যে অভিযান চালিয়েছিল, তার অব্যক্ত উদ্দেশ্য হলো যে, যখন দরকার হবে, তখন সে নিজের বলে মহাদেশের অংশ দাবি করবে। এলাকা নিয়ে ঝগড়া বাধাতে পারতো, কিন্তু বিজ্ঞান-গবেষণায় পরস্পরের সহযোগিতায় তা হতে পারেনি। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীস্টাব্দে আঠার মাস ব্যাপী ইন্টারন্যাশানাল জিওফিজিক্যাল ইয়ারে যে সূর্য-কলঙ্ক (sunspot) দেখা যাবে এবং সূর্য ও পৃথিবী পরস্পরের ওপরে যে প্রভাব ফেলবে ৫৭টি দেশ সে বিষয়ে গবেষণায় মেতে উঠল। এই গবেষণার জন্য আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সাউথ আফ্রিকা, ইউনাইটেড স্টেট্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মহাদেশে ঘাটি স্থাপন করেছিল। এই সহযোগিতায় একাজ এত সাফল্য লাভ করেছিল যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ঐ এগোরটি দেশকে নিমন্ত্রণ করে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করালেন, যে-চুক্তি অনুযায়ী এই জমাট মহাদেশের সব কাজকর্ম পরিচালিত হবে। চুক্তিটি ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে অনুমোদিত হলো। এই চুক্তিতে মহাদেশে সামরিক কার্যকলাপ, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, রেডিওশক্তি মিশ্রিত জঞ্জাল ফেলা বন্ধ করা হলো এবং এতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বাধীনতা দেওয়া হলো। যেসব দেশ নিজের নিজের অংশ বলে দাবি করেছিল, তারা যতদিন এই চুক্তি পালিত হবে, ততদিন ঐ দাবির জন্য চাপ সৃষ্টি করবে না বলে জানিয়েছে। এর পরে তেরটি দেশ এই চুক্তিতে ভোটিং মেম্বার হয়েছে এবং চুক্তির মধ্যে স্থানীয় স্তন্যপায়ী ও পক্ষীদের সংরক্ষণ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কিন্তু ঐ চুক্তিতে ক্ষমতালাভের চেষ্টাকে বন্ধ করা হয়নি। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্যদের দাবি করা জায়গায় ঘাটি স্থাপন করেছে এবং কোন কোন দেশ নিজেদের দাবিকে জোরদার করার জন্য পোস্ট অফিস স্থাপন করেছে, সেখানে স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করেছে। আর্জেন্টিনা তাদের ঘাটি 'ম্যারাম্বিও'তে একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে পাঠিয়েছে, যাতে তিনি আর্জেন্টিনার প্রথম অধিবাসীর জন্ম দিতে পারেন। কিন্তু ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে খোলাখুলিভাবে কোন দেশ কোন অংশের ওপর দাবি জানায়নি। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় গবেষণার কাজ ভালই হচ্ছে। জীববিজ্ঞানীরা বরফের গর্ত থেকে ৫০ কেজি মাছ বার করে দেখেছেন, এইসব মাছ শরীরে কি উৎপন্ন করে নিজেদের ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বন্ধ করে। আগ্নেয়গিরি-বিশারদরা কনকনে ঠাণ্ডায় ও দমবন্ধ গ্যাসের মধ্যে বসে থেকে পরীক্ষা করছেন, মহাদেশের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি (মাউন্ট এরেবাস) ধূম্রাকারে কি জিনিস বার করছে। দক্ষিণ মেরুতে একবার যে উষ্ণবায়ু বয়েছিল (−২৩°C) অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা তা পরীক্ষা করে দেখছেন, যদি তার মধ্যে পৃথিবীর জন্মকালে যে 'বিগ ব্যাঙ্গ' (Big Bang) বিস্ফোরণ হয়েছিল তার কিছু মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনের আভাস পাওয়া যায়। দক্ষিণ মেরুর শেষ তুষারশীর্ষে জমে যাওয়া আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বের যে শুষ্কতম ও বিশুদ্ধতম বাতাস রয়েছে তার সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা চলছে আদিতে একবারই বিগ ব্যাঙ্গ হয়েছিল না পরে ছোট ছোট বিগ ব্যাঙ্গ আরও হয়েছিল। এখানে আরও পরীক্ষা চলছে, পৃথিবীর অন্যত্র সৃষ্ট কোন নোংরা বা দূষিত গ্যাস বা দ্রব্যের চিহ্ন সেখানেও পৌঁছেছে কিনা। এইসব অনুসন্ধানকারীরা বা তাদের সহযোগীরা কতদূর কষ্টসহিষ্ণু তা বলা যায় না। গরমকালেও অ্যান্টার্কটিকার জনসংখ্যা ৪০০০-এর বেশি হয় না। বেশ কয়েক জায়গায় তাদের আবাসস্থল মাটির নিচে করতে হয়। তবে এরই মধ্যে জীবন যতদূর সম্ভব আরামপ্রদ করার চেষ্টা হয়। বড় জায়গায় মদ্যপানের বার, টেলিভিশন, ভি. সি. আর. প্রভৃতি আছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে লোকজন চলে যেতে আরম্ভ করে, এরোপ্লেনও কম আসে। মহাদেশের ২ শতাংশ স্থান বছরের কোন কোন সময়ে বরফ-মুক্ত থাকে এবং এখানেই গাছপালা ও লোকজন

বেশি। অ্যান্টার্কটিকা উপদ্বীপে (পেনিনসুলা) এইজন্য তেরটি ঘাঁটি আছে। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে হেলিকপ্টার, উড়োজাহাজ, লরি, বুলডোজার এখানে অনবরত চলাচল করে। এখানকার ঘাঁটির লোকেরা খুবই অসতর্ক এবং এখানে-সেখানে এমন সব জিনিস ফেলে, যা ফেলা তাদের নিজেদের দেশে অবৈধ। এবিষয়ে কেউ কিছু করছিল না; কিন্তু ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে 'গ্রীনপেস' নামক এক বেসরকারি সংস্থা এখানে ঘাঁটি স্থাপন করার পর এইসব কিছু কমেছে। এই সংস্থা অনেকগুলি ঘাঁটি প্রতিবছর পরিদর্শন করে দেখছে যাতে যেখানে-সেখানে যা-তা ফেলা না হয় বা পোড়ান না হয়। অনেক ঘাঁটির লোকেরাও এবিষয়ে সজাগ হচ্ছে। কিন্তু পর্যটনকারীরা এবিষয়ে খুবই অসাবধান। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম পর্যটকদল বিমানে আসে। তবে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে নিউজিল্যান্ড-এর এক বিমান দুর্ঘটনায় ২৫৭ জন প্রাণ হারানোর পর জাহাজে আসা বেড়ে গেছে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে গত বছর ৩,৫০০ জন (বেশির ভাগ আমেরিকান) প্রত্যেকে ৫০০০ থেকে ১৬,০০০ ডলার ভাড়া দিয়ে এখানে এসেছে। বেশির ভাগ এসেছে ৪।৫ দিনের জন্য। চিলির ঘাঁটিতে ওরা একটা হোটেল খুলেছে। এলিফেন্ট দ্বীপে পাহাড়ের পাথরে পুরনো ছবি আঁকা (graffiti)-ও দেখা গেছে। দায়িত্বশীল পর্যটন-পরিচালকেরা নিয়ম চালু করেছেন যে, পর্যটকরা কেউ জন্তু-জানোয়ারকে কষ্ট দেবেন না, কোন গবেষণাগারে নিমন্ত্রিত না হলে প্রবেশ করবেন না বা স্মারকচিহ্ন হিসাবে কিছু নেবেন না। অ্যান্টার্কটিক-চুক্তিকারী জাতিগুলি এই বছরের শেষে পর্যটন ব্যাপারে আলোচনা করবেন, কিন্তু মনে হয় তাঁরা তেল ও খনিজদ্রব্যের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান তর্ক-বিতর্ক নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের তেল সঙ্কটের পর অনেকেই চিন্তা করছেন যে, অনেক দেশই প্রয়োজনের তাগিদে অ্যান্টার্কটিকার কঠোর পরিবেশে তৈল সন্ধান করতে বাধ্য হবে। প্রথম থেকে এইরকম অবস্থার জন্য তৈরি হওয়ার জন্য ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে ওয়েলিংটন কনভেনশন করা হলো, যাতে কুড়িটি চুক্তিকারী জাতি মিলিত হয়েছিল। এতে ঠিক হলো যে, সকলে সম্মত না হলে কেউ তেল অনুসন্ধান করতে পারবে না।

ঐ মহাদেশে যে মূল্যবান ধাতু পাওয়া যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। পাহাড়ে সামান্য মাত্রায় লোহা, টাইটেনিয়াম, নিম্নস্তরের সোনা, টিন, মলিবডিনাম, কয়লা, তামা ও দস্তা পাওয়া গেছে। হাইড্রোকার্বন গ্যাস, কখনো বা তেল মিশান পাওয়া গেছে 'রস সমুদ্র'-এর গর্ভে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধাতুর পরিমাণ এক শতাংশেরও কম। তাছাড়া এই মহাদেশে এইসবের অনুসন্ধান যেমন বিপজ্জনক, তেমন ব্যয়সাপেক্ষ।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেকে এই মহাদেশকে 'ওয়ার্লড-পার্ক' করার পক্ষেই এবং ধাতবদ্রব্যের অনুসন্ধানের বিপক্ষে। তবে আগেকার চুক্তিগুলিতে পরিষ্কার-ভাবে একথা লেখা হয়নি। ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়া ওয়েলিংটন কনভেনশনকে অনুমোদন না করায় এই কনভেনশনকে প্রায় হত্যা করা হয়েছে। কোন কোন দেশ, যেমন ব্রিটেন চায় না যে, চিরকালের জন্য ধাতববস্তুর অনুসন্ধান বন্ধ করা হোক। ফ্রান্সের মতো ব্রিটেনেরও ভিটো ক্ষমতা আছে। এসবের অর্থ হচ্ছে, ভবিষ্যতে কোনদিন এই মহাদেশে যথেচ্ছভাবে ধাতব অনুসন্ধান হতে পারে। মুশকিল হচ্ছে এই যে, আগের যেসব চুক্তি হয়েছে, তার নিয়মগুলি ভালভাবে পালিত হয় না।

সকল দেশের বোঝা উচিত যে, কয়েক ব্যারেল তেলের জন্য এই মহাদেশের আদিম পরিবেশকে নষ্ট করা উচিত নয়। হয়তো এটিই একমাত্র দেশ থাকবে যেখানে সকল জাতি মিলিতভাবে স্বাভাবিক পরিবেশে বাস করতে পারবে।*

* **'টাইম', জানুয়ারি ১৫, ১৯৯০, পৃঃ ৩০-৩৬**

ভাষান্তর ঃ জলধিকুমার সরকার

পরমপদকমলে

"দস্তুরমতো পথ"

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হতে শিষ্যে আসে, আবার তাঁর শিষ্যে যায় তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা—আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য, একি ছেলেখেলা নাকি?" স্বামীজী লিখছেন স্পষ্ট-ভাষায়। স্বামীজী একটি ছেলে সম্পর্কে মঠের ভাইদের নির্দেশ দিচ্ছেন: "সেই যে বোম্বাই থেকে এক ছোকরা মাথা মুড়িয়ে তারকদার সঙ্গে রামেশ্বর যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য! না-দেখা, না-শোনা—একি চ্যাংড়ামো নাকি? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোনও কাজ হয় না—ছেলেখেলা নাকি? সে ছোঁড়াটা যদি দস্তুরমতো পথে না চলে, দূর করে দেবে।"

একটি কথা পাওয়া গেল, 'দস্তুরমতো পথ'। সেই পথটা কি? আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য, এই বললেই হয়ে যাবে। দেয়ালে তাঁর ছবি, একপাশে মা সারদা, অন্যপাশে স্বামীজী। মাঝে মাঝে মালা ঝোলাই। তাঁদের একটি-দুটি উক্তি আমার মনে লেগে আছে। সেইগুলোই কপচাই। লাগসই জায়গায় লাগিয়ে দি। মুখে এমন একটা ভাব করে থাকি, যেন আমার পা দুটো শুধুমাত্র সংসারে আছে, মাথা ঠেকে আছে 'রামকৃষ্ণলোকে'। স্বামীজী যাকে 'দস্তুরমতো পথ' বলছেন সে-পথ আংশিক সমর্পণ নয়। সম্পূর্ণ সমর্পণ। ছোটখাট সংস্কার নয়, সম্পূর্ণ সংস্কার। জীবনটাকে একেবারে ঢেলে সাজান। চিন্তায়, ভাবনায়, জীবনচর্যায়, বিশ্বাসে, নিষ্ঠায় সম্পূর্ণ রূপান্তর। বাইরের লোক-দেখান বিজ্ঞাপন নয়। জীবনটা কাপড়ের দোকানের শো উইন্ডো নয়। ভেতরের আগুনকে জ্বালাতে হবে। 'স্পিরিচুয়াল ফায়ার'।

স্বামীজীর সেই প্রবল ধমক—"আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়।" আর কি করতে হবে? "লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। ভাব ছড়া গাঁয়ে-গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ। স্বাধীন হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ। অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি?"

আচারের চেয়ে বিচার বড়। স্বয়ং ঠাকুর সে-কথা বারে বারে বলেছেন। স্বামীজীর তেজ কোথা থেকে এসেছিল! ঠাকুরকে আমরা সদা ভাবাবিষ্ট, শান্ত, সমাহিত পুরুষ বলেই মনে করি। তাঁর চাবুকের মতো মহাসত্তার কথা অস্বীকার করতে চাই। ভুল। ঠাকুর কেন অবতার! অবতার আর মহাপুরুষে কি তফাৎ! মহাপুরুষ নিজের মুক্তি খোঁজেন, অবতার আসেন জীবকে মুক্তির সন্ধান দিতে। তিনি প্রয়োজনে চাবকান, বাক্যের দ্বারা বিদ্ধ করেন। শিক্ষিত ভণ্ড মানুষের, আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মুখোশ তিনি পাকা সার্জেন যেভাবে ছুরি চালান, সেই ভাবে সামান্য আঁচড়েই খুলে ফেলে দিতেন। ঠাকুর বিশাল বক্তৃতা দিতেন না, মহাদম্ভে বা দাপটে সকলকে হতচকিত করতেন না। তাঁর অস্ত্র ছিল গল্প, অস্ত্র ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাওয়া। অস্ত্র ছিল প্রকৃত মানুষের সঙ্গে ভণ্ড মানুষ, ভোগী মানুষ, নীচ মানুষের তফাৎটা ধরিয়ে দেওয়া। কিছু বলার প্রয়োজন নেই। দর্পণটি তুলে ধরা মাত্রই সে বুঝতে পারবে—শকুন আকাশের বহু উঁচুতে ঘুরপাক খায় নজর থাকে ভাগাড়ে। পদ্মলোচনের শাঁখ। ভোঁ ভোঁ বাজে; কিন্তু মন্দিরে যে মাধব নেই। ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন, হৃদে পালিয়ে আয় লোকটার পয়সা হয়েছে। এঁড়েদার ঘাটে বসে আছেন ভদ্রলোক, ঠাকুর নামছেন নৌকা থেকে। দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঠাকুর আছ কেমন? তিন সন্ন্যাসী বসে আছেন। ঠাকুর দেখছেন। একজন আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে। ঠাকুরের মন্তব্য: বিবাহিত সন্ন্যাসী তাই মেয়েদের দিকে অমন আড়ে আড়ে চাইছে। ঠাকুর এমন সূক্ষ্মভাবে

মানুষকে মানুষের উদাহরণ দিয়েই ধরিয়ে দিতেন, স্বামীজী যা সোচ্চারে বলেছেন—'একি চ্যাংড়ামো নাকি!' ঠাকুর ছিলেন মৃদু, অন্তর্ভেদী। স্বামীজী সেই গুরুপরম্পরায় বিস্ফোরক; কারণ ঠাকুর তাঁকে তৈরি করেছিলেন সেই ধারায়। যাতে তিনি আসল কথাটি বোমা ফাটানোর মতো বলতে পারেন—"রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি। আজ ঘণ্টা হলো, কাল তার ওপর ভেঁপু হলো, পরশু তার ওপর চামর হলো, আজ খাট হলো, কাল খাটের ঠ্যাঙে রুপো বাঁধানো হলো ··· চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র ইত্যাদি।

আঘাতের পর আঘাত হানছেন স্বামীজীঃ "একেই ইংরেজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐরকম বেলকোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদিম দুবার ঘুরবে না চার বার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন-রাত ঘামতে চায়, তাহাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।"

অতঃপর আবার কঠোরতর আঘাতঃ "যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানব-দেহধারী হরেক মানুষের পুজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পুজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম; ঘণ্টার ওপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুর ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে!"

'দস্তুরমতো পথ' ও নয়। দেহে মন্দির হও, মনের ইজারা দাও মাধবকে।

বাতায়ন

ইজরায়েলে পুনর্বাসিত ভারতীয় ইহুদি

প্রায় দুহাজার বছর আগে আরবসাগরে জাহাজডুবি হয়ে ১৪জন জলে ভেসে এসে পেঁছে-ছিলেন ভারতের পশ্চিম-উপকূলে। দুর্যোগের মধ্যে টিকে থাকা এই ১৪জনের মধ্যে ৭জন ছিলেন পুরুষ ও ৭জন মহিলা। প্রচলিত কাহিনী মতে এঁরা ইহুদি ছিলেন এবং এখনকার বোম্বাই শহরের দক্ষিণে কোঙ্কন অঞ্চলে এঁরা বাড়ি-ঘর তৈরি করে চাষবাস ও তেলপেষার কাজে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যদিও তাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য ইহুদিদের থেকে সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়লেন, তাঁদের বংশধরগণ ইহুদিদের আচার-ব্যবহার বজায় রেখে শত শত বছর ধরে ভারতীয় ইহুদিদের পূর্বপুরুষ হয়ে গেলেন। ভারতীয় ইহুদিদের আর এক নাম 'বেনে ইজরায়েল' (Bene Israel) বা 'বেনে ইহুদি'। এঁরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। মারাঠা ভাষাভাষী বেনে ইহুদিরা কোচিনী ইহুদি বা বাগদাদী ইহুদিদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় ইহুদিদের সংখ্যা বরাবরই নগণ্য ছিল এবং এঁদের তিন সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই প্রধানতঃ ইজরায়েলে ফিরে গেছেন। বেনে ইজরায়েল দের কোন 'তোরা' (Torah—হিব্রু বাইবেল) ছিল না বা তাঁরা হিব্রু অনুষ্ঠান-পদ্ধতি জানতেন না। তাঁরা যুগ যুগ ধরে কতকগুলি মূল ইহুদি রীতি-নীতি পালন করে এসেছেন ঃ স্যাবাথ (Sab-bath হলো ইহুদিদের ধর্মীয় বার—শনিবার) পালন; সেমা (Shema—ইহুদিধর্মের মূল শাস্ত্র) পাঠ ; বালক দের জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগের ত্বককর্তন (circum-cision) এবং কাশরুৎ (kashrut) অর্থাৎ খাদ্য ব্যাপারে কয়েকটি নিয়ম পালন। তাঁরা বাইবেলে বর্ণিত প্রধান প্রধান উৎসবগুলি পালন করতেন। অবশ্য পরবর্তী কালে প্রচলিত উৎসবগুলি যেমন চানুকা (Chanukah) তাঁদের জানা ছিল না। বেনে ইজরায়েলরা নিজেদের অঞ্চলে 'শানোয়ার তেলী' বা 'শনিবারের তেলপেষক' বলে পরিচিত ছিলেন এবং এইসব নামের দ্বারা তাঁদের ধর্ম এবং (উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত) তাঁদের পোশাককেও বোঝান হতো।

কোচিনী ইহুদিরা অন্ততঃ একহাজার বছর ধরে ভারতে আছেন। তাঁরা প্রথমে মালাবার এবং পরে সেখান থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোচিনে এসেছিলেন। দুটি জায়গাই মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের কাছে পূর্ব-পরিচিত ছিল। কোচিনীরা ইহুদি-উৎসবগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করতেন, যা বেনে ইহুদিরা করতেন না। বাস্তবক্ষেত্রে কোচিনী ইহুদিরাই বেনে ইহুদিদের ইহুদি-উৎসব পালন-রীতি শিখিয়েছিলেন। যদিও বেনে ইহুদিদের চেয়ে কোচিনীরা সংখ্যায় অনেক কম। কোচিনী ইহুদিরা তাঁদের পূর্বপুরুষ হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম ভাগ হলো 'মিউচাসিম'(meu-chasim), যাঁরা আদি ইহুদিদের বংশধর ; দ্বিতীয় ভাগ হলো যাঁরা আদিতে ক্রীতদাস ছিলেন পরে ইহুদিধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন ; তৃতীয়ভাগ হলো 'শ্বেত ইহুদি' বা সেফার্দি (sephardi) ইহুদিদের বংশধর, যাঁরা মধ্যযুগে কোচিনে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তবে ইজরায়েলে পুনর্বাসনের পরে এইসব ভাগাভাগি অন্তর্হিত হয়েছে। কোচিনীরা যদিও স্থানীয় ভাষা মলয়ালম শিখেছিলেন, তাঁরা তাঁদের হিব্রুভাষা ভোলেননি এবং এটা তাঁরা ব্যবহার করতেন পৃথিবীর অন্যান্য ইহুদিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে। এই ইহুদিরা যে ইজরায়েলে ভালভাবে পুনর্বাসন করতে পেরেছিলেন, তাতে তাঁদের হিব্রুভাষায় জ্ঞানই প্রধান সহায় হয়েছিল।

বাগদাদী ইহুদিরা এসেছিল বিভিন্ন আরব দেশ থেকে, প্রধানতঃ বাগদাদ থেকে এবং এঁরা ব্যবসা উপলক্ষে ভারতবর্ষে এসেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে। তাঁরা প্রধানতঃ বোম্বাই ও কলকাতাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা আরবীতে এবং পরে ইংরেজীতে

কথাবার্তা বলতেন, বেনে ইহুদি বা কোচিনী ইহুদিদের মতো কোন ভারতীয় ভাষাকে নিজের করে নেননি।

এটা লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর অন্য সব দেশে যেমন ইহুদিদের ওপর নির্যাতন (persecution) করা হয়েছে, ভারতীয় ইহুদিদের সেরূপ কোন নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা ছাড়া পোশাকে বা আচার ব্যবহারে তিন শ্রেণীর ভারতীয় ইহুদিরাই তাঁদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ইজরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের পরেই ভারতীয় ইহুদিরা ব্যাপকভাবে দেশান্তরিত হতে আরম্ভ করলেন। অনেকে আর্থিক উন্নতির জন্য এলেও ভারতীয় ইহুদিরা ইজরায়েলে এসেছেন প্রধানতঃ আদর্শগতভাবে—যুগ যুগান্তের স্বপ্ন জিয়ন (zion) বা জেরুজালেমে ফিরে যাওয়া। কত ভারতীয় ইহুদি ইজরায়েলে এসেছেন, এবিষয়ে মতভেদ আছে; ইজরায়েলের সরকারি মতে তিন শ্রেণীর ভারতীয় ইহুদিদের সমষ্টি-সংখ্যা ২০,০০০; ভারতীয় ইহুদিরা মনে করেন এসংখ্যা আরো অনেক বেশি। বর্তমানে ইজরায়েলে আছে ২৮,০০০ বেনে ইহুদি, ৫,৫০০ কোচিনী ইহুদি এবং ৭০০০ বাগদাদী ইহুদি।

বেনে ইহুদিরা আগে তাঁদের বালক ও যুবকগণকে ইজরায়েলে পাঠিয়েছেন, যাতে ছেলেরা পূর্ণ ইহুদি-জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারে এবং বিবাহে সঙ্গিনী পেতে পারে। ১৯৫০-এর দশকে এদের বেশিরভাগ সেখানে 'যুবক-পল্লী'তে বা বোর্ডিং স্কুলে বাস করত যতদিন না পড়াশুনা শেষ হতো। এইভাবে তারা মা-বাবার চেয়ে ইজরায়েলে বাস করার বেশি করে সুযোগ লাভ করত। গ্রাম থেকে বেনে ইহুদিরা এসেছেন পরে; তার আগেই শহর থেকে আসা বেনে ইহুদিরা শহরে ভালভাবে বাসিন্দা হয়ে গেছেন। গ্রাম্য ইহুদিরা শহরে তাঁদের আত্মীয়দের কাছাকাছি বাস করতে চাইতেন, কৃষি উপনিবেশে যেতে চাইতেন না। বেশির ভাগ বেনে এবং কোচিনী ইহুদিরা ইজরায়েলে এলেও, বাগদাদী ইহুদিরা, যাঁরা ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ ছেড়েছেন, তাঁদের খুব কমই ইজরায়েলে এসেছেন। তাঁদের বেশির ভাগ ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে চলে গেছেন। এঁদের মধ্যে ইজরায়েলে যাঁরা বসবাসী হয়েছেন তাঁদের এই নতুন দেশে একসূত্রে বাঁধবার মতো কোন পূর্ববর্তী বসবাসকারী দল ছিল না। ইজরায়েলে বর্তমানে কয়েকটি বাগদাদী সিনাগগ (synagogue—উপাসনাগার) আছে বটে, কিন্তু বেনে ও কোচিনী ইহুদিদের যেমন নিজস্ব শ্রেণী ও সম্প্রদায় আছে, ইজরায়েলে এঁদের সেরূপ কিছু নেই। অন্যদিকে, বেনে ইহুদিরা নিজেদের সিনাগগে পূজা-উপাসনা করেন, ছোট ছোট শহরে মেয়েরা শাড়ি পরেন এবং নিজেদের মধ্যে মারাঠী ভাষায় কথা বলেন। যদিও মারাঠী ভাষা ছোটদের মধ্যে আস্তে আস্তে কমে আসছে। ভারতীয় খাবার এঁদের বাড়িতে এখনো হয় এবং তাঁদের বাড়িতে আছে ভারতীয় পরিবেশ। ভারতীয় চলচ্চিত্র এখানে খুবই জনপ্রিয়; শনিবার কয়েকটি পরিবার একত্র হয়ে ভারতীয় ভিডিও টেপ (Video tape)-এ পর পর ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখেন। তবে বেনে ইহুদিদের কোচিনীদের তুলনায় ইজরায়েলে মানিয়ে নিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তার একটি কারণ, তাঁরা ছোট ছোট দলে এসেছেন। কোচিনীরা প্রায় সবাই এক সঙ্গে এসেছেন বলে সেরূপ বেগ পেতে হয়নি। প্রায় সকলেই মোসাভিন (moshavin) নামক গ্রাম্য পরিবেশে পুনর্বাসিত হয়েছেন।

ভারতে ব্যবসায় বা কারিগরি কাজে নিযুক্ত থেকে এখানে চাষবাসের কাজে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। তবে পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকায় এবং গ্রাম্য পরিবেশ পাওয়ায় এঁদের সম্প্রদায়গত ভাবটা বজায় আছে। ইজরায়েলে কোচিনী ধরনের ধর্মানুষ্ঠান সিনাগগে পালন করলেও ভারতীয় কৃষ্টিকে তাঁরা আর ফিরে পাবেন না।

ইজরায়েলের ভারতীয় ইহুদিরা টুরিস্ট হিসাবে মাঝে মাঝে ভারতে আসেন। স্যামসন নামক একজন বললেন, "ভারতকে আমরা এখনো ভালবাসি। ইজরায়েল আমাদের পবিত্র ভূমি, কিন্তু ভারত আমাদের জন্মভূমি।"

[News From Israel, May 1990; pp. 14-16]

গ্রন্থ-পরিচয়

বিবেকানন্দ-গবেষণায় নতুন সংযোজন

গুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দের নব মূল্যায়ন ঃ জীবন ও দর্শন ঃ সুরেশকুমার কুইতি। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ঃ ষাট টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি মূলতঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের গবেষণা-প্রচেষ্টার অন্যতম সার্থক উদাহরণ। গবেষক সুরেশকুমার কুইতি তাঁর একনিষ্ঠ গবেষণার সাহায্যে বিবেকানন্দ-মনীষার উত্তুঙ্গ শিখরটির প্রতি মননশীল ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াসে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। গ্রন্থটির প্রথমাংশে গবেষক বিবেকানন্দ-জীবনপঞ্জীর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তাঁর গবেষণার একটি দিক সুসম্পন্ন করেছেন। তিনি যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে বিবেকানন্দ-জীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে একটি ধারণা জন্মায়। যদিও বিশ্লেষণের সাহায্যে বক্তব্য প্রাঞ্জল করার আরও সুযোগ ছিল।

গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্ধে লেখক স্বামীজীর দার্শনিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণে মনোযোগী। সে-প্রয়াসে স্বামীজীর অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। বিবেকানন্দ-দর্শনের প্রধান বক্তব্য সম্বন্ধে লেখকের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা বিবেকানন্দ-রচনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবনের সহায়তায় সযত্ন-সঙ্কলিত উদ্ধৃতিরাশির সমাবেশে অদ্বৈত-বেদান্তে স্বামীজীর অনন্য অভিনিবেশ ও উপলব্ধির মহিমা প্রমাণে সচেষ্ট। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য পন্থা বা পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার (যার প্রভাব স্বামীজীর মানসে স্বাভাবিকভাবেই ছিল) সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখকের বক্তব্য উপস্থাপিত হলে এগ্রন্থের দার্শনিক তাৎপর্য বহুগুণে বর্ধিত হতো।

বস্তুতঃ দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে স্বামীজীর অনন্যতা বুঝতে হলে যে বিস্তার ও আলোচনা আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তা আমরা পাই না। অথচ বিবেকানন্দের অদ্বৈতচিন্তার সারসঙ্কলনরূপে এ-গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশ মনোজ্ঞ। এরকম মূল্যায়ন বিবেকানন্দ-চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই গবেষক ডঃ কুইতি আমাদের ধন্যবাদভাজন।

রাজা রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বেদান্তপ্রাণ লেখকদের ঐতিহ্যে স্বামী বিবেকানন্দ যে গতিবেগ সঞ্চার করে বেদান্তকে জাতীয় জীবনের প্রধান চৈতন্যশক্তিরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক চিন্তাধারার চেয়ে জাতীয়চিন্তাকে অনেক গভীর-ভাবে আন্দোলিত করেছিল। এবিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের ভক্তিবাদী বেদান্তচিন্তার চেয়ে বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তার পূর্ণতা অনেক বেশি। গ্রন্থকার তাঁর গবেষণার পটভূমিতে এইসব পূর্বগামী ও সমসাময়িকদের কথা তেমন আলোচনা করেননি। তবু অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস সার্থক। গবেষণাগ্রন্থের প্রকাশসৌষ্ঠবে প্রকাশক সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। এ-গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

গত কার্তিক ১৩৯৭ সংখ্যায় উদ্বোধনে **'ডায়াবেটিসে করণীয় ও জ্ঞাতব্য'** শিরোনামায় 'Querries on Diabetes Answered' বইটির সমালোচনা পড়ে অনেক পাঠক বইটি পাবার জন্য উদ্বোধন অফিসে ও প্রকাশকের কাছে চিঠি লিখছেন। তাঁদের সুবিধার্থে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন লোক মারফত প্রকাশকের কাছ থেকে (ঠিকানা—শ্রীকান্ত বসুমল্লিক, পি ১৮৫, সি. আই. টি. স্কীম IV M, কলিকাতা-৫৪) বইটি সংগ্রহ করেন। কোন মূল্য লাগবে না। যাঁরা ডাক-মারফত বইটি পেতে চান, তাঁরা প্রকাশককে ডাকমাশুল পাঁচ টাকা মনিঅর্ডার করলে বইটি পাবেন। —যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী ঃ গত ৮ থেকে ১৬ নভেম্বর '৯০ নানা অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুরী-আগমনের শতবর্ষ পূর্তি-উৎসব পালিত হয়েছে। ৮ নভেম্বর সকাল ৮টায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। শোভাযাত্রায় প্রায় ১২০০ ভক্ত অংশ নিয়েছিল। শোভাযাত্রার শেষে সবাইকে টিফিন দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৯ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা-সভা হয় এবং ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধীয় ছবি প্রদর্শিত হয়। সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী দীনেশানন্দ। ১৩ নভেম্বর জাতীয় সংহতির ওপর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথেই জাতীয় সংহতি সম্ভব'। ঐদিন গ্রাম ও শহরের তিনশ দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে পোশাক ও শিক্ষার সরঞ্জাম দেওয়া হয়। ১৪ নভেম্বর বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১টায় আশ্রমের নবনির্মিত 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হল'-ঘরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। ১৪, ১৫ ও ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় উক্ত হল ঘরে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে শ্রীশ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ভাষণ দেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। এই তিন-দিনে অন্যান্য বক্তা ছিলেন স্বামী ভক্ত্যানন্দ, মনোরমা মহাপাত্র, অধ্যাপক নীলমণি সাহু ও দিগম্বর পাত্র। এই তিন দিনের সভায় প্রারম্ভিক ভাষণ দেন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী দীনেশানন্দ। ১৬ তারিখ সভার শেষে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী প্রতিযোগিদের পুরস্কার প্রদান করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী।

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর ঃ গত ২৭ নভেম্বর '৯০ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে এই আশ্রমে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৪০০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের ২০০ জন দুঃস্থ নরনারীকে কম্বল ও খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়। কম্বল বিতরণ করেন স্বামী সত্যময়ানন্দ। অপরাহ্নে তাঁর সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌরেন্দ্রনাথ সরকার, বক্তা ছিলেন হিমাংশু ঘোষ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন হাওড়া বিবেকানন্দ আশ্রমের শিল্পীবৃন্দ এবং সঙ্গীতাঞ্জলি পরিবেশন করেন কলকাতার 'ঈশ্বরপ্রীতি সংসদ'। বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন খানাকুলের দুর্গাদাস বাউল ও সম্প্রদায়।

গত ১৪ নভেম্বর '৯০ **নরোত্তমনগর আশ্রম (অরুণাচল প্রদেশ)** তিরাপ জেলার নামসাং গ্রামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। স্থানীয় মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অরুণাচল প্রদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ মন্ত্রী ওয়াংফা লোয়াং।

উদ্বোধন

গত ১৮ নভেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তের উপস্থিতিতে **বেলুড় মঠে** একটি **'ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট'**-এর উদ্বোধন করেন। এটি ভারত সরকারের ন্যাশনাল ড্রিংকিং ওয়াটার মিশন, ইউনিসেফ-এর ইউনাইটেড ন্যাশনস্ চিল্ড্রেন্স ফাণ্ড এবং কলকাতার অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাব্লিক হেল্থ-এর সহযোগিতায় নির্মাণ করা হয়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল ড্রিংকিং ওয়াটার মিশনের অধিকর্তা ও ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম সচিব গৌরীশঙ্কর ঘোষ। এই উপলক্ষে ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর '৯০ পর্যন্ত **বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সমাজসেবক শিক্ষণমন্দিরে** পানীয় জল ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

বিষয়ক পাঁচদিনের এক শিবির পরিচালনা করা হয়। ১৮ নভেম্বর শিবিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী এবং আশীর্বাণী প্রদান করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

গত ৭ অক্টোবর '৯০ **রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন স্যানাটোরিয়াম**-এর নবনির্মিত সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের জলের চাহিদা মেটাতে ৭ হাজার লিটার বৃষ্টির জল ধরে রাখতে সমর্থ একটি বৃহৎ জলাধার ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর '৯০ এই জলাধারের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী।

ভিত্তি স্থাপন

গত ২৬ নভেম্বর **বেলুড় মঠের** দক্ষিণ দিকের সংলগ্ন জমির উত্তর-পূর্বকোণে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহির্ভূত সাধুদের জন্য একটি সাধুনিবাসের ভিত্তিস্থাপন করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

ইউনাইটেড স্কুলস অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়া পরিচালিত প্রযুক্তি ও পরিবেশ বিষয়ের ওপর জাতীয় চিত্রাঙ্কণ-প্রতিযোগিতায় **নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশন** বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র চতুর্থ স্থান লাভ করেছে।

পরিদর্শন

গত ৭ নভেম্বর '৯০ মেঘালয়ের শ্রম ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী এস. পি. সুয়ের ঐ দপ্তরের উচ্চ পদাধিকারী অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে **চেরাপুঞ্জি আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

চক্ষুশিবির

গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে **জামতাড়া আশ্রম (বিহার)** এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে মোট ৮৬ জনের চোখের ছানি বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করা হয়।

আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গত ২৪—৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অনুরূপ একটি শিবির পরিচালনা করে। এই শিবিরে মোট ৫১ জন রোগীর চোখের ছানি বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং বিনামূল্যে তাদের চশমাও দেওয়া হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেছেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ।

রামকৃষ্ণ মঠ, পুরী গত ৮ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। এই শিবিরে ৩৭০ জন রোগীর চোখের চিকিৎসা এবং ১৫ জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। শিবির পরিচালনায় কলকাতার গুজরাট রিলিফ সোসাইটি সহযোগিতা করেছে। চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করেন কলকাতার ডাঃ সুনীল বাগচী এবং অপর ছয়জন চক্ষু-বিশেষজ্ঞ। এই আশ্রমের পরিচালনায় গত ৯ ও ১০ নভেম্বর মঠ-প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে এক দন্ত-চিকিৎসা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ শিবিরে মোট ১৬০জন রোগীর চিকিৎসা হয়। তার মধ্যে ৭০ জনের দাঁত তোলা হয়েছে। চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করেছেন রাউরকেল্লার ডাঃ কে. কে. পাল।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

তামিলনাড়ু বন্যাত্রাণ: মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ মাদ্রাজ শহরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চারটি অঞ্চলে মোট ১৭,৯৫০ জন লোককে ফুড প্যাকেট, পাউরুটি, চাল, কাপড়-চোপড় এবং বিস্কুট বিতরণ করেছে।

উড়িষ্যা বন্যাত্রাণ: উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণকার্যের জন্য বেরহামপুরের নিকট একটি অস্থায়ী ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ধুতি, শাড়ি, শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসনপত্র দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন: অন্ধ্রপ্রদেশের ইল্লামঞ্চিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে প্রস্তাবিত ৮৫টি বাড়ির মধ্যে ৪৪টি বাড়ির কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। লক্ষ্মীপুরম গ্রামে কমিউনিটি হল-সহ আশ্রয়গৃহের কাজও এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি-ঘর নির্মাণের জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে।

বহির্ভারত

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি: গত ডিসেম্বর (১৯৯০) মাসের রবিবারগুলিতে বেলা ১১টায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ এবং প্রতি মঙ্গলবার তিনি 'গসপেল অব

শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন। ৮ ডিসেম্বর পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের বাণীর ওপর ভাষণ দিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ১৪ ডিসেম্বর সিনিয়র গ্রুপ ও জুনিয়র গ্রুপ বালক-বালিকাদের জন্য দুটি বিতর্ক-সভা পরিচালনা করেন। তাছাড়া ২৮ ডিসেম্বর হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন। ২৪ ডিসেম্বর যীশুখ্রীস্টের জন্মদিন পালন করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সেন্টার: গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ। তাছাড়া তিনি শুক্রবার কঠ উপনিষদ্ ও প্রতি মঙ্গলবার গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন। ৯ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে তাঁর বাণীর ওপর এবং ২৫ ডিসেম্বর যীশুখ্রীস্টের জন্মদিন উপলক্ষে যিশু-সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

নতুন শাখাকেন্দ্র

নেদারল্যান্ডস-এর হারলেম-এ রামকৃষ্ণ মঠের একটি নতুন শাখাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। কেন্দ্রটির নাম রাখা হয়েছে **রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি, নেদারল্যান্ডস**।

দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মঠের (বাংলাদেশ) সঙ্গে 'রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর' নামে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্রের সংযোজন করা হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী বাগীশ্বরানন্দ (অমরনাথ) গত ৪ নভেম্বর নাগপুরের কাছে অজনী স্টেশনে রেলদুর্ঘটনায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল বিয়াল্লিশ বছর। ঐ দিন প্রাত্যহিক প্রাতঃভ্রমণ সেরে আশ্রমে ফেরার পথে তিনি ঐ দুর্ঘটনায় পতিত হন।

স্বামী বাগীশ্বরানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তিনি ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে নাগপুর কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদানের পর থেকে নাগপুর কেন্দ্রে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে নানা দায়িত্ব পালন করেছেন। মারাঠী মাসিক পত্রিকা 'জীবন বিকাস'-এর তিনি একজন অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। দক্ষতা ও বহুমুখী কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি ও হৃদয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণাবলী, সরলতা প্রভৃতির গুণের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী অমরেশ্বরানন্দ (সমীর) গত ২০ নভেম্বর '৯০ বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল বিয়াল্লিশ বছর। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে তাঁকে তীব্র হেপাটাইটিস রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

স্বামী অমরেশ্বরানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন এবং ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি বেলুড় মঠ, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম, পুরুলিয়া, আলমোড়া ও পুরী মঠের কর্মী ছিলেন। সরল জীবনযাত্রা ও কঠোর পরিশ্রমী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ৮ ডিসেম্বর '৯০ (২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭) বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজনগান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৮তম শুভ আবির্ভাব-তিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঐ দিন ভোর থেকে রাত্রি ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ হাজার ভক্ত নরনারী মায়ের বাড়ীতে মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করেন। সকলকেই হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। দুপুরে প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সকাল ৯টায় 'সারদানন্দ হল'-এ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সকাল ১০টায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন রসরঙ্গ-এর শিল্পিবৃন্দ এবং সন্ধ্যারতির পর অরুণকৃষ্ণ ঘোষের পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন 'সুরপীঠ'-এর শিল্পিবৃন্দ।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

দমদম সাতপুকুর রামকৃষ্ণ পাঠচক্র : গত ৮ ডিসেম্বর এই পাঠচক্রের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৮তম আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। বিকাল ৪টায় এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা-সংঘ, গোয়াবাগান, কলকাতা-৬ : শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ৮-১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৮ ডিসেম্বর বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন দুপুরে প্রায় সহস্রাধিক নরনারীকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। ৯ ডিসেম্বর ১৬ থেকে ৩৫ বছর বয়স্কদের জন্য শ্রীমায়ের ওপর প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। ১০ তারিখ বিকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে ধর্মসভা। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণা, প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন মদন নন্দী এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন অসীম অধিকারী। সভা শেষে প্রতিযোগিদের অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

গত ৪ নভেম্বর '৯০ বিকাল ৩টায় **শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্রের** (কলাবেড়িয়া : চড়াবাড়, মেদিনীপুর) পরিচালনায় সেবামূলক প্রকল্প হিসাবে একটি মেডিক্যাল এইডস ইউনিটের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপকুমার মণ্ডল এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বরানগর জেনারেল হাসপাতালের বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসক ডাঃ ত্রিশক্তি দাস। সভায় বিশিষ্ট গুণিজনের সমাবেশ হয় ও অনুষ্ঠানে চৌদ্দজন দুঃস্থ রোগীকে বিনামূল্যে পরীক্ষা করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **ননীবালা বল** গত ১৬ নভেম্বর ১৯৯০ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি দীর্ঘকাল উদ্বোধনের নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন।

প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী, লামডিং রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক **হরিপদ গোস্বামী** গত ১০ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। প্রয়াত গোস্বামী স্নাতক হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থাতেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করে কিছুদিন কারাবরণ করেন। অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি স্বদেশী সংগঠনের তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ঐ সময় তিনি বেলুড় মঠেও যাতায়াত করতেন এবং মঠের কিছু কিছু কাজে অংশগ্রহণ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। ঐ সময় তিনি মহাপুরুষ মহারাজ সহ কয়েকজন প্রাচীন সন্ন্যাসীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেছিলেন। আদর্শবান, সঙ্গীতজ্ঞ প্রয়াত গোস্বামী স্বাধীনতালাভের পর শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। অসমের লামডিং রেলওয়ে হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ওপর অনেক গান ও লীলাগীতি রচনা করেছেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলায়।

ভ্রম সংশোধন

গত পৌষ, ১৩৯৭ সংখ্যার ১৮১ পৃষ্ঠায় **'দেহত্যাগ'** বিভাগে দ্বিতীয় স্তম্ভে '১৯১৯ থেকে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজের সেবক ছিলেন' স্থলে পড়তে হবে—'১৯১৯ থেকে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেলুড় মঠে থাকাকালীন তিনি মহাপুরুষ মহারাজের সেবক ছিলেন।'

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

ভারতের বিজ্ঞানগবেষণার ভিতরে পর্যন্ত পচন ধরেছে

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড-ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে ধারা দেখা যাচ্ছে, তা বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পনাকারীদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে। ঐ সমীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল : 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ টেকনোলজিগুলিতে বিজ্ঞানগবেষণার গুণ, ধরন ও যোগ্যতা'। এর চেয়ারম্যান ছিলেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান প্রফেসর রাইস আহমেদ। সমীক্ষা-রিপোর্টের ভিত্তি হচ্ছে—২৭টি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষক-ছাত্রদের কাছে পাঠান প্রশ্নাবলী; প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল ৫টি ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং ৬টি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বসমেত ৮২৪ জন অধ্যাপক, রিডার এবং ১৭৪০ জন গবেষক-ছাত্র প্রশ্নাবলীর উত্তর পাঠিয়েছিলেন। লব্ধ তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে গবেষণার নিকৃষ্টমান, অসংবৃত্তির ঘন ঘন অভিযোগ এবং পরিচালনা-পদ্ধতিতে অসদুপায় গ্রহণের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাতে নেতৃত্ব দেওয়া বা তত্ত্বাবধান করা হয় না বললেই চলে। ক্বচিৎ তত্ত্বাবধান করা হয় এবং ৮০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষকদের মধ্যে বছরে একবারেরও কম দেখা হয়। ৪০ শতাংশ তত্ত্বাবধায়ক গবেষণাকার্যে নিজে অংশ নেন না বা গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি খতিয়ে দেখেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কুসংস্কার (prejudice) ও অসদুপায় গ্রহণের জন্য গবেষণার আবহাওয়া বিষিয়ে রয়েছে। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, গবেষকদের জাতপাত, লিঙ্গ, ধর্ম বা দেশের কোন্ স্থান থেকে আসছে—এই সবের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। তত্ত্বমূলক গবেষণা আরও কলঙ্কিত হয়েছে এইগুলির দ্বারা : গবেষণালব্ধ তথ্যগুলিকে নিজের সুবিধামতো করে ব্যবহার করা, অন্যের পাওয়া তথ্য নকল করা এবং পরীক্ষকদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা পাওয়া সত্ত্বেও ডিগ্রী দেওয়া। ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ গবেষক বলেছেন যে, তাঁরা এসব অসদুপায়ের কথা জানেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে : "এইসব অসদুপায় সম্বন্ধে যা ভাবা হয়েছিল, তার চেয়ে সেগুলি অনেক বেশি।"

তাত্ত্বিক মূল্যায়ন করাও ঠিকমতো হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব পরীক্ষা-প্রণালীও এমন যে, ভাল খারাপ বা উদাসীন ছাত্রদের মধ্যে তফাৎ করতে পারে না। ৪০ শতাংশ তত্ত্বাবধায়ক মনে করেন যে, যে-সব থিসিস-এর মূল ধারণাই ভুল অথবা গবেষণা-কার্য-পদ্ধতিতে গলদ, তারাও ডিগ্রী পেয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভিতর থেকে লোক নেওয়া আর এক গলদ। এমনকি ৯০ শতাংশ শিক্ষকও নেওয়া হয় ভিতর থেকে (অর্থাৎ বাইরে বিজ্ঞাপন না দিয়ে)।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উদ্ভিদের ন্যায় নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে এবং এদের "কাজকর্ম কেউ পরীক্ষা করে না, বিশ্লেষণ করে না বা পূর্ব-পরিকল্পনা করে না।"

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু শুধু অর্থ দিলেই এদের পরিবর্তন করা যাবে না, যদি এদের শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্তন করা না হয়। সমস্ত পদ্ধতিকে এখন নতুনভাবে গড়তে হবে, এখানে-ওখানে সামান্য অঙ্গ পরিবর্তন করলে হবে না।

[Nature, 21 June 1990, p. 651]

সূচীপত্র

- 5 MAR 1991

উদ্বোধন ৯৩তম বর্ষ ফাল্গুন ১৩৯৭

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

ফাল্গনে, ১৩৯৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ ৯৩তম বর্ষ—২য় সংখ্যা

দিব্য বাণী

"অন্যের মত ভুল হয়েছে, এ-কথা আমাদের দরকার নাই।... মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়।... একজন গাছের ওপর বহুরূপী দেখেছিল, বন্ধুদের কাছে এসে বললে, আমি একটা লাল গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস, একেবারে পাকা লাল। আর একজন সেই গাছতলা থেকে এসে বললে যে, আমি একটি সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস, একেবারে পাকা সবুজ। কিন্তু যে গাছতলায় বাস করত, সে এসে বললে, তোমরা যা বলছ সব ঠিক, তবে জানোয়ারটি কখনো লাল কখনো সবুজ, কখনো হলদে, আবার কখনো কোন রঙ থাকে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

কথাপ্রসঙ্গে

এবার

এই নিবন্ধ যখন লেখা হইতেছে তখন পৃথিবীর বুকে সাম্প্রতিককালের বীভৎসতম যুদ্ধের চব্বিশতম দিবস অতিক্রান্ত হইতেছে। বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী ও যুদ্ধবিরোধী মানুষের উদ্বেগ ও আশাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া যুদ্ধকামী দেশগুলি মারণ-মহোৎসবে মত্ত হইল গত ১৬ জানুয়ারি ১৯৯১। বিশ্বের ইতিহাসে দিনটি একটি অন্ধকার দিন রূপে চিহ্নিত হইয়া রহিল। এই যুদ্ধে একদিকে রহিয়াছে ইরাক, অপর দিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইংলন্ড, ফ্রান্স, সৌদি আরব প্রভৃতি বহুজাতিক বা সম্মিলিত বাহিনী। যুদ্ধ কাহার দোষে, কাহারা এই যুদ্ধে 'দুর্যোধন' অথবা 'যুধিষ্ঠির' সে-প্রশ্ন আমাদের নহে। আমরা পৃথিবীর কোটি কোটি শান্তিকামী ও যুদ্ধবিরোধী নরনারীর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি যে, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, অথবা ক্ষুদ্রের সহিত বৃহতের, অথবা বৃহতের সহিত বৃহতের, যাহাই হউক না কেন—যুদ্ধ অপরাধ, যুদ্ধ পাপ। সেই সঙ্গে ইহাও আমরা সুস্পষ্টভাবে বলিতেছি যে, দুর্বলের উপর, অনগ্রসরের উপর দুর্বলতা ও অনগ্রসরতার সুযোগ লইয়া সবল ও

অগ্রসরের সদম্ভ আগ্রাসন ও অস্ত্র-ব্যবহার জঘন্য অন্যায়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এই উগ্রতম অধ্যায়ে বৃহৎ শক্তি কোথাও যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হইলে যুদ্ধের প্রভাব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, উহা সমগ্র পৃথিবীর উপরেও ছায়াপাত ঘটায়। সাম্প্রতিক যুদ্ধ এখনও বিশ্বযুদ্ধের রূপ লয় নাই, তবে যে-কোন মুহূর্তেই উহা তৃতীয় এবং হয়তো-বা সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। 'সর্বশেষ' বলিতেছি এই কারণে যে, এবার যদি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে তাহা হইলে পৃথিবীর অস্তিত্বই লুপ্ত হইবার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই এই আংশিক বা 'উপসাগরীয়' যুদ্ধের সূচনায় সমুদ্র-দূষণ, নদী-দূষণ, বায়ু-দূষণ, পরিবেশ-দূষণ যেরূপ ভয়াবহ আকারে প্রকট হইতেছে, শুধু মানুষের নহে, পশু-পাখি প্রভৃতিরও যেরূপ নির্বিচারে প্রাণহানি হইতেছে, যে-ধরনের ভয়ংকর মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে (শোনা যাইতেছে উহা অপেক্ষাও লক্ষগুণ শক্তিশালী ও ক্ষতিকর অস্ত্রসমূহ প্রয়োগের প্রহর গণিতেছে)—তাহাতে সেই আশঙ্কাই দৃঢ়মূল হইয়া উঠিতেছে। শোনা যায়, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বলিয়াছিলেন, "ইহার (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের) পর যদি আবার যুদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহা হইবে পাথর লইয়া। কারণ, এই যুদ্ধ (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ) বর্তমান মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। পৃথিবীতে আসিবে নূতন গুহামানবের দল। মানুষ আবার প্রস্তরযুগে ফিরিয়া যাইবে।"

কয়েকদিন আগে (২৬ জানুয়ারি শনিবার রাত্রে) দূরদর্শনে যুদ্ধ-সংবাদ পরিবেশনের সময় দূরদর্শনের পর্দায় আকাশ বিদীর্ণ করিয়া আধুনিক 'ব্রহ্মাস্ত্রের' ঝলকানি, মরুভূমির বুকে ভূমিসাৎ গজকচ্ছপের মতো কিম্ভূত ক্ষেপণাস্ত্র-উৎক্ষেপক, বিধ্বস্ত জনপদ, আতঙ্কগ্রস্ত অগণিত দিশাহারা মানুষের মুখ প্রভৃতির সহিত ভাসিয়া উঠিল একটি মর্মন্তুদ দৃশ্য। যুদ্ধরত দেশগুলি বিবেকহীন হঠকারিতায় সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অংশে লক্ষ লক্ষ ব্যারেল খনিজ তেল ঢালিয়া দিয়াছে। সেই তেলে সমুদ্রের সাদা সফেন ঢেউ কালো ও কাদাটে হইয়া গিয়াছে। ঢেউয়ের তোড়ে বালিয়াড়িতে আছড়াইয়া পড়িল একটি পাখির মৃতদেহ, আর একটি পাখি হাঁস-ফাঁস করিতে করিতে মৃত্যুর সহিত আপ্রাণ যুদ্ধ করিতেছে। তাহার শ্বেত-শুভ্র শরীর কালো হইয়া গিয়াছে ঘন তেলের প্রলেপে। তেলের ঘন আস্তরণে ডানা মেলিবার ক্ষমতা পাখিটি হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার সমস্ত শরীর হইতে তেলের কালো রং গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ তেলে পাখিটি ঠোঁট ঠেকাইতেও ভয় পাইতেছে। হঠাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া দূরদর্শনের ক্যামেরার দিকে সরাসরি সে তাকাইল। উঃ, কী মর্মভেদী সেই দৃষ্টি! অবলা জীবটির সেই দৃষ্টি যেন প্রতীকী। উহাতে যেন প্রতিফলিত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান প্রাণী মানুষের প্রতি এবং মানুষের সুউচ্চ বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি ও কৌশলের (এখানে ক্যামেরা যাহার প্রতীক) প্রতি পৃথিবীর সকল প্রাণীর সুতীব্র ঘৃণা, অবিশ্বাস এবং বিদ্রূপ। সংবাদ-মাধ্যমে কয়েকদিন পর আরও দুটি করুণ দৃশ্য: হাসপাতালের শয্যায় শায়িত প্রাণান্তক বোমায় মারাত্মকভাবে আহত যন্ত্রণাকাতর এক গৃহবধূ। অপরটি এক নিষ্পাপ শিশুর ভয়ার্ত মুখ। একটি বিধ্বস্ত অট্টালিকার ইঁট বালির স্তূপ ও ভাঙা-চোরা দরজা-জানালার মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া আতঙ্ক-পাণ্ডুর চোখে সে তাকাইয়া আছে। ভয়ে সে কাঁদিতেও পারিতেছে না। দৃশ্যটি দেখিলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। ঐ শিশুর দৃষ্টিতে নিহিত এই নিরুচ্চার প্রশ্ন—'বয়স্ক, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, মার্জিত, সভ্য মানুষ কেন এই আসুরিক উন্মত্ততায় মাতিয়া উঠিল?' শিশুটির এই বিমূঢ় নীরব প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? এই প্রতিবাদের ভাষা বুঝিবার সামর্থ্য অথবা সদিচ্ছা কি যুদ্ধোন্মাদদের কাহারও আছে?

বস্তুতঃ উদার সমুদ্র, স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী, নির্মল বাতাস, সুনীল আকাশ, সুন্দর পাখি, মমতাময়ী গৃহবধূ, নিষ্পাপ শিশু—ইহারাই তো পৃথিবীর সৌন্দর্য। ইহারাই তো পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করিয়া রাখে। ইহারাই যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবী তো আর পৃথিবী থাকে না। ইহারাই তো পৃথিবীর লবণ। পৃথিবীর সেই লবণকে হরণ করিয়া লইতেছে কিছু মানুষের লোভ, হিংসা, আত্মম্ভরিতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা। এই ক্ষয় রোধ করার, এই অপচয় বন্ধ করার কি কোন পথ নাই, কোন উপায় নাই?

আজ বসরা অথবা বাগদাদ জ্বলিতেছে, জ্বলিতেছে রিয়াদ অথবা তেল আভিভ, অথবা পশ্চিম এশিয়ার অন্য কোন শহর; কিন্তু কাল যে এই আগুনেই বেইজিং অথবা টোকিও, ইসলামাবাদ অথবা নয়াদিল্লী, মস্কো অথবা ওয়াশিংটন, লন্ডন, বন অথবা প্যারিস জ্বলিবে না, কে তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিরোসিমা নাগাসাকি ধ্বংস হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ ও পশু-পাখির জীবন হইতে পৃথিবীর আলো চিরতরে নিভিয়া গিয়াছিল। সেদিনের মানুষের পাশবিক রূপ দেখিয়া পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, আণবিক অস্ত্রের ক্ষমতা দেখিয়া হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ মানুষের অধঃপতন পাশবিক লোভ ও হিংস্রতাকেও বহুগুণ ছাড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমানে মারণাস্ত্রের শক্তি অতীতের আণবিক অস্ত্রের শক্তিকে লক্ষগুণ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। মনুষ্যত্বের এই অধোগমনকে রোধ না করিলে, মারণাস্ত্র প্রস্তুত এবং প্রয়োগ হইতে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি নিবৃত্ত না হইলে পৃথিবীকে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ইহা চিন্তাশীল মানুষমাত্রেই আজ বুঝিতে পারিতেছে। তবে আজ এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যখন শুধু বুঝিলেই হইবে না, বুঝাকে সংগ্রামশীল (aggressive) করিয়া তুলিতে হইবে, বিশ্বব্যাপী শান্তিকামী ও যুদ্ধবিরোধী মানুষকে জনমত সংগঠন করিয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধঘোষণা করিতে হইবে এবং হিংসাশ্রয়ী যুদ্ধকে পৃথিবী হইতে চিরতরে নির্মূল করিতে হইবে।

যুদ্ধ শুধু প্রাণই লয় না, যুদ্ধ শুধু জনপদই ধ্বংস করে না, যুদ্ধ শুধু পরিবেশ-দূষণই করে না, যুদ্ধ সভ্যতার চরম দুর্ভাগ্যের সূচক, যুদ্ধ সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিপর্যয়ের অগ্রদূত, যুদ্ধ ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের প্রতীক। যুদ্ধ মানুষের মানবিকতা, সংবুদ্ধি, মমতা ও যুক্তিকে গ্রাস করে। প্রকৃতির নিরীহ ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে মানুষ চাহে না, তাহা মনুষ্যত্বের লক্ষণ; প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে গিয়া মানুষ তাহার উদ্ভাবনী শক্তিকে ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞানকে তাহার ক্রীতদাস করিয়াছে—উহা অবশ্যই মানুষের কৃতিত্বের স্বাক্ষর, যাহা সভ্যতার অগ্রগতিকে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বমুখী করিয়াছে। কিন্তু ইহার বিনিময়ে মানব যে দানবে রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে, বিজ্ঞান অথবা মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষা মানুষকে যে পক্ষান্তরে তাহার যান্ত্রিক ক্রীতদাসে পর্যবসিত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা কোন্ শক্তিতে প্রতিরোধ করিব?

এই প্রশ্ন প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াল রূপে দেখার পর হইতেই বিবেকবান্ মানুষদের আলোড়িত করিতেছে। আলোড়িত করিতেছে এই উত্তর সন্ধানের ব্যাকুলতাও: 'এই মহা-বিপর্যয় হইতে মুক্তির পথ কোথায়?' 'এই বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণের বিকল্প কী?'

তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলিতেছে। বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী তখন যুদ্ধ-পরিদর্শক হিসাবে গ্রীসের একটি রণক্ষেত্রে গিয়াছেন। সেখানে দেখিলেন সৈনিকদের মৃতদেহের স্তূপ। মৃতদেহগুলির গায়ে তখনও লাগিয়াছিল তাজা রক্তের দাগ। বিস্মিত ব্যথিত যুবক টয়েনবী ভাবিতেছিলেন: "এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধকে কি পরিহার করা যায় না?" সেদিন হইতে তাঁহার প্রশ্নটির উত্তর-সন্ধান শুরু হইল। ইতিহাসের এক-একটি অধ্যায়, এক-একটি যুগ ধরিয়া তাঁহার অনুসন্ধান চলিল। দেখিলেন ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায় নাই, এমন একটি যুগ নাই যাহা যুদ্ধকে এড়াইতে পরিয়াছে। 'যুদ্ধ কি তাহা হইলে অপরিহার্য?'

দেখিতে দেখিতে পঁয়ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিয়া গিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধ অপেক্ষাও উহা ছিল অধিকতর ভয়াবহ। গভীর বিষাদে পূর্ণ হইল টয়েনবীর হৃদয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখিতে দেখিতে তিনি লিখিলেন দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'এ স্টাডি অব হিস্টরি'-র শেষ খণ্ড। উহার সর্বশেষ অধ্যায়ে তিনি তাঁহার ইতিহাস-দর্শনের উপলব্ধিকে লিপিবদ্ধ করিলেন: "বর্তমান প্রতীচ্যের প্রয়োজন অর্থ নহে, সমাজ-উন্নতি নহে, যুদ্ধ-সামগ্রী নহে, প্রয়োজন আধ্যাত্মিক শান্তি ও পূর্ণতা।" সুগভীর হতাশায় রূঢ় হইয়া উঠিল তাঁহার লেখনী: "পেলোপেনেশিয়ান যুদ্ধের শেষে গ্রীক-সভ্যতা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। হয়তো বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণতিও তাহাই হইবে।" অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও একদিন শেষ

হইল। টয়েনবী আশঙ্কা করিয়াছিলেন পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইলে উহার অগ্নিবলয় সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। যেমন করিয়াই হউক সেই বিশ্ববিধ্বংসী মহাপ্রলয় হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিতেই হইবে। কিন্তু সেই রক্ষাকবচ কে দিবেন, কে রক্ষা করিবেন পৃথিবীকে—সভ্যতাকে, তাহার উত্তর তিনি তখনও পান নাই। অকস্মাৎ জীবনের প্রান্তসীমায় ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরিচয় ঘটিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সহিত। তিনি মহানন্দে ঘোষণা করিলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ এমন এক সময়ে এবং এমন এক পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন যখন এবং যে-পৃথিবীতে তাঁহার এবং তাঁহার বাণীরই প্রয়োজন ছিল।… আমরা বর্তমানে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি যুগ-পরিবর্তনের অধ্যায়ে বাস করিতেছি, যে-ইতিহাসের সূচনা করিয়াছে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ; কিন্তু এই অধ্যায়কে যদি সমগ্র মানবজাতির আত্মহননে নিশ্চিহ্ন হওয়া হইতে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে উহার প্রয়োজন ভারতীয় পরিণতি। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির দ্বারা পৃথিবীতে বাহ্যিক ক্ষেত্রে [পৃথিবীর এক প্রান্তকে অপর প্রান্তের সহিত সংযুক্ত করিয়া] ঐক্য আনয়ন সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই 'দূরত্ব নাশ' করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রযুক্তিকৌশল পৃথিবীর মানুষকে ভয়ংকর ক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্রেও সজ্জিত করিয়াছে এবং দূরতম প্রান্তে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র অপরকে হত্যার সহজ নিশানার গণ্ডিতে আনিয়া ফেলিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়,এই নৈকট্যের সহিত মানুষ শিখে নাই পরস্পরকে বুঝিতে এবং ভালবাসিতে। মানব-ইতিহাসের এই চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে মানুষের পরিত্রাণের একমাত্র পথ ভারতের পথ।… শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের অভ্রান্ত সাক্ষ্যের মধ্যেই নিহিত আছে সেই ভাব ও আদর্শ যাহা মানবজাতিকে একটি পরিবারের গণ্ডিতে স্থাপন করিতে পারে—এবং উহাই এই আণবিক যুগে আমাদের আত্মহনন হইতে মুক্তির একমাত্র বিকল্প।"

আর্নল্ড টয়েনবী যখন কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহার পর দুটি দশক অতিক্রান্ত হইয়াছে। আণবিক যুগ হইতে পৃথিবী পদার্পণ করিয়াছে পারমাণবিক যুগে। ঠিক এই মুহূর্তে পারমাণবিক অধ্যায়ও হয়তো শেষ হইয়া পরবর্তী অধ্যায় সূচিত হইতে চলিয়াছে, যাহার অর্থ মানুষের দুর্ভাগ্য অধিকতর গভীরে নিমজ্জিত হওয়া। তবে দুর্ভাগ্যের চরিত্র একই থাকিতেছে: ধ্বংস—সামগ্রিক ধ্বংস। সেই ধ্বংসের অগ্নিবলয়ের শক্তিনাশ করিতে পারেন ভারতের ঐ দরিদ্র নিরক্ষর অমৃতপুরুষ, যিনি বলিলেন: "মতুয়ার বুদ্ধি যত অনর্থের মূল।" "যত মত তত পথ।" বলিলেন: "একত্বদর্শন বা অদ্বৈতদর্শনই শেষ কথা।" উচ্চারণ করিলেন মানবমহিমার চরম সমীকরণ-বাক্য: "জীবই শিব, শিবই জীব।"

পরিশেষে বলিলেন: "তোমাদের চৈতন্য হউক।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীকে, এই ভাবকেই তুলিয়া ধরিলেন স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক কালের কেন্দ্রভূমি আমেরিকার জনমণ্ডলীর নিকট। শিকাগো মহাসম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনে তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় বলিলেন: "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং ইহাদের ভয়াবহ জাতক ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। উহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারম্বার নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সকল জাতিকে হতাশায় নিমজ্জিত করিয়াছে। এইসকল ভীষণ দানব যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ বর্তমান অপেক্ষা বহুগুণ অধিক উন্নত হইত।… আজ এই মহাসম্মেলনের সম্মানার্থে যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে তাহা যেন সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং…সর্ববিধ অসম্ভাবনার সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করে।" মহাসম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনেও পুনরায় ধ্বনিত হইল স্বামীজীর সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর: "বিবাদ নহে, সহায়তা; বিনাশ নহে, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নহে, সমন্বয় ও শান্তি।"

কথাগুলি অবশ্যই বিবেকানন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত, কিন্তু বিবেকানন্দ বলিয়াছেন তাঁহার প্রতিটি কথাই তাঁহার মহান আচার্যদেবের, যাঁহার মুষ্ঠিতে ধরা রহিয়াছে বর্তমান সভ্যতার জীবন এবং স্থায়িত্ব, যাঁহার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত সমগ্র মানবসমাজের প্রতি অমৃত-জীবনের অভয় আহ্বান অথবা নিত্য-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার অমেয় আশ্বাস।

স্বামী অভেদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

The Ramakrishna Vedanta Ashram,
Darjeeling
June 28th, 1926

স্নেহের বিভাবতী

অদ্য তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। তোমার প্রেরিত ১০০ (একশত) টাকা পাইয়াছি। ইহা এইসময়ে বিশেষ উপকারে আসিল জানিবে। তোমাকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি যাহাতে তোমার মনে শান্তি ও আনন্দ আইসে এবং তোমার ছোট ছোট দোষগুলি বিদূরিত হইয়া যায়। তোমার লিখিত শেষ পত্র ৮ই মে তারিখে পাইবার পর অপর কোন পত্র তোমার নিকট হইতে পাই নাই। তজ্জন্য আমি বিশেষ ভাবিত ছিলাম। নিশ্চয়ই তোমার পত্র ইতিমধ্যে [পথে] হারাইয়া গিয়াছে।

তোমার উন্নতিলাভ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে জানিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি যাহাতে শীঘ্র হয় সেইরূপ উপদেশই দিব। ৮।১০ দিনের মধ্যে আমি কলিকাতায় যাইয়া সাক্ষাতে এই বিষয়ে আলোচনা করিব। ইতিমধ্যে তুমি প্রত্যহ পূজা, ধ্যান, জপ যেরূপ বলিয়াছি সেইরূপ নিয়মমত দুই বেলা করিতে থাক। মন হইতে সমস্ত দুর্ভাবনা দূর করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা করিবে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে যাহাতে তোমার ভিতর তাঁহার পবিত্র শক্তির বিকাশ হয়। আমিও এইবিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিতেছি। ধৈর্য ধারণ করিয়া সাধন করিতে থাক, শীঘ্রই ফল দেখিতে পাইবে। এইটি নিশ্চিত জানিও যে তুমি যাহা প্রাণের সহিত [তাঁহার নিকট] মন মুখ এক করিয়া চাহিবে তাহাই পাইবে। অন্তর্যামী তোমার অন্তরে আছেন। তুমি এতদিনে বুঝিয়াছ যে, সংসার অসার ও অনিত্য। সুতরাং ইহাতে আসক্তি যত কম হয় ততই ভাল। ক্ষুদ্র আমিত্বের উপর আসক্তি হইতে হিংসা, দ্বেষ, অভিমানাদি আইসে। এইটি বুঝিতে পারিলেই ঐ সব দোষ পালাইয়া যায়। এ সম্বন্ধে পরে সাক্ষাতে বলিব।

এখানে বর্ষা নামিয়াছে। কলিকাতায় গরম একটু কমিয়াছে কিনা লিখিবে। এই কয়দিন এখানে বিশেষ গরম পড়িয়াছে। যেমন গরম তেমনি মাছি বাড়িয়াছে।

তোমরা সকলে ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। গতকল্য স্বপ্নে তোমাদের সকলকে দেখিয়াছিলাম। বোধ হয় তোমরাও স্বপ্নে আমাকে দেখিয়া থাকিবে। এবিষয়ে পরে বলিব। সকলকে আমার ভালবাসা ও শুভাশীর্বাদ দিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভাশীর্বাদ জানিবে।

ইতি তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
অভেদানন্দ

P. S.—গত মঙ্গলবার Sonada-তে গিয়াছিলাম। তথায় নগরকীর্তনাদি করিয়া মহাসমারোহে আমাদের একটি আশ্রম ও dispensary খোলা হইয়াছে। তথায় একজন ব্রহ্মচারী ঔষধ দিতেছে।

—ইতি অঃ

* অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার নড়াইলের বিখ্যাত জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায়ের (তিনি আই. সি. এস. ছিলেন।) সহধর্মিণী বিভাবতী দেবীকে লিখিত পত্রটি বিভাবতী দেবীর পৌত্র (সৌরেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র) দেবাশিস রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—যুগ্ম সম্পাদক

ভাষণ

প্রয়োজন প্রস্তুতির

স্বামী ভূতেশানন্দ

ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত বহু মানুষ আছেন। ভেবে দেখতে হবে দীক্ষাগ্রহণের পর এই ভাবাদর্শ তাঁদের জীবনকে একটা স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করছে কিনা। তারা একটি স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে উঠছে কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে হৃদয়কে তাঁর অধিষ্ঠানের উপযোগী শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে কিনা তা বিচার করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক। তাঁকে আমরা যত্রতত্র স্থান দিতে পারি না। পবিত্র, পরিষ্কৃত আসনে তাঁকে বসাতে হবে, যেখানে তিনি সানন্দে বিরাজ করবেন। একথাটি আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে বসাবার উপযুক্ত বেদি রচনা করতে হবে। হৃদয় যেখানে শুদ্ধ নয়, নানা আবর্জনায় মলিন, সেখানে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই স্থানটি যাতে শুদ্ধ পবিত্র ও সুন্দর হয় সেজন্য সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। যদি তাঁকে অশুদ্ধ অশুচি স্থানে বসাতে না চাই তাহলে প্রথমেই হৃদয়কে শুদ্ধ সুন্দর করতে হবে। তাঁকে হৃদয়ে স্থান দেবার জন্য যতটা আগ্রহ তার চেয়ে বেশি আগ্রহ দরকার সেই আসনকে তাঁর যোগ্য করবার জন্য। এই কথাটি মনে রাখলে দীক্ষাগ্রহণ কতকটা সার্থক হবে।

আমরা তাঁকে চাইছি, জীবনে তাঁকে বরণ করে নেবার একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের আছে; সেই আকাঙ্ক্ষাটি যাতে প্রবল হয় সে-চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব। বাইবেল-এ Parable of Sower-এ আছেঃ এক কৃষক কিছু বীজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলে তার কতকগুলি পড়ল ঊষর ক্ষেত্রে, অঙ্কুরিত হলো না, শুকিয়ে গেল, কতকগুলি পাখিতে খেয়ে ফেলল; আর কতকগুলি বীজ এমন ক্ষেত্রে পড়ল যেটি অঙ্কুরিত হবার পক্ষে উপযোগী এবং পরে বীজগুলি অঙ্কুরিত হলো, বড় হলো, তাতে ফুল-ফল হলো।

এখন বিচার্য এই যে, যে-স্থানটিতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের নামরূপ বীজ বপন করছি তা কর্ষিত ক্ষেত্র তো? আমরা কি যথেষ্ট সতর্ক আছি যে, বীজগুলি যেন অনুর্বর ঊষর ক্ষেত্রে না পড়ে? পাখিরা যেন সেগুলি খেয়ে না ফেলে কিংবা পাথরের ওপর পড়ে যেন শুকিয়ে না যায়। সেগুলি যেন বপনোপযোগী ক্ষেত্রে পড়ে ফলপ্রসূ হয়। এটি দেখা আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম এখন চলতি মুদ্রা। তিনি আজ সর্বত্র সমাদৃত। সকলে তাঁকে সাগ্রহে গ্রহণ করছে। কিন্তু গ্রহণের দায়িত্ব বিপুল। তাঁকে আমরা এমন জায়গায় রাখতে পারব না যা তাঁর পক্ষে প্রতিকূল হবে। তিনি যেখানে প্রফুল্ল থাকবেন, যে-জায়গা তাঁর অনুকূল সেখানেই তাঁকে রাখতে হবে। সেই পরিবেশটি আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। যে যেমন কাজেই নিযুক্ত থাকি এই ভাবটি বজায় রাখতে হবে, এই কথাটি ভাবতে হবে।

দীক্ষাগ্রহণের জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু দীক্ষার পরে কি হবে? পরে কি সেই ভাবটিকে জাগিয়ে রাখতে পারব? অনেকসময় দেখা যায় যে, অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা দীক্ষার জন্য কাঁদে। সে-কান্না বালসুলভ কান্না, তা তাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত নয়। তখন তারা বিচার করতে পারে না, যে বিরাট দায়িত্ব নিতে চাইছে তা পালন করবার উপযুক্ত প্রস্তুতি তাদের আছে কিনা। কিছুদিন পরে এই ভাবাবেগ যখন স্তিমিত হয়ে যাবে তখন সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। যখন বান আসে তখন খড়কুটোও দ্রুত ভেসে যায়, কিন্তু পরে স্রোতের বেগ যখন কমে যায় তখন সেই কুটো নড়ে না। সেইরকম আমাদের এই ভাবালুতা যখন শান্ত হবে, তখন কি ভিতরের এই আকর্ষণকে জাগিয়ে রাখতে পারব? মনে রাখতে হবে সমগ্র জীবন যাতে একটি আদর্শ অনুসারে রূপায়িত হতে পারে,

একটা নির্দিষ্ট পথে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, জীবনধারা যাতে এক শুদ্ধ স্বচ্ছ প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে চলে সেভাবে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। নাহলে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে দীক্ষাগ্রহণ আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে না। সময় সাময়িক-ভাবে অনুকূল হয় বটে, কিন্তু তাকে যদি ধরে রাখতে না পারি, নিরন্তর মনের মধ্যে জাগ্রত রাখতে না পারি, তাহলে আমরা পড়ে থাকব, স্রোত চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা অবশ্যই চাইছি। কিন্তু তাঁর জন্য আমরা কতটুকু প্রস্তুত আছি? বারবার নিজেদের এই প্রশ্ন করতে হবে। এ এক সুকঠিন দায়িত্ব। তাঁকে অন্তরে আহ্বান করছি, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যদি তিনি এগিয়ে আসেন তখন তাঁকে আসন দান করবার জন্যে আমরা কি প্রস্তুত হয়ে আছি? মনকে এপ্রশ্ন না করলে আমাদের প্রয়াস খুব ফলপ্রসূ হবে না। ভক্তসংখ্যা যে-পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে জীবনকে কি সে-পরিমাণে সকলে শক্তিশালী করতে পারছে? এচিন্তা সকলকেই করতে হবে।

অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, আমরা যে সাধন করছি তার দ্বারা খুব যে এগিয়ে যাচ্ছি বা নানান রকম অনুভূতি হচ্ছে তা তো বুঝতে পারছি না। প্রথমতঃ অনুভূতি বলতে কি বোঝায় তা তারা জানে না। যখন প্রশ্ন করি অনুভূতি মানে কি? বলতে পারে না। ভাবে কিছু একটা রূপ দেখা, অলৌকিক কিছু দর্শন—এইরকম। এইগুলি আসল নয়। জীবনকে সেই ভাবধারায় নিষ্ণাত করাই আসল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত ভক্ত হলে জীবনও তাঁর অনুরূপ হবে। তিনি ছিলেন ত্যাগসম্রাট, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তাঁর ভিতরে বিন্দুমাত্র কালিমা ছিল না। এমন যে ব্যক্তিত্ব তাঁকে যখন হৃদয়ে বরণ করব তখন এই সংকোচ, এই ভয় যেন আমাদের থাকে যে, আমাদের অশুদ্ধি তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে না তো? শ্রীকৃষ্ণ লুকিয়ে আছেন। তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোপীরা বৃন্দাবনের অরণ্যের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন, 'হে প্রভু, এই অরণ্যের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কত পাথর তোমার পায়ে লাগছে, কত কাঁটা ফুটছে। তোমার চরণ যে আমরা বক্ষে ধারণ করতেও ভয় পাই যদি তোমার অতি কোমল পাদপদ্মে আঘাত লাগে। আর তুমি এই জঙ্গলে বেড়াচ্ছ তাতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, তা আমাদের মনকে ব্যথিত করছে।' এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি এটি বোঝানোর জন্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে বরণ করতে হলে আমাদের খুব চিন্তা করে নিজেদের জীবনকে প্রস্তুত করতে হবে। তারপর তাঁকে বরণ করতে হবে। প্রস্তুতি যথাযথ হলে আর ভাবতে হবে না।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করি তাঁর কৃপায় তাঁর ভক্তমণ্ডলীর ভিতরে সেই প্রবল আগ্রহ জাগুক যাতে তাদের জীবন তাঁর ভাবে রূপায়িত হয়। তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করে আমাদের হৃদয়কে তাঁর আসনের উপযুক্ত করে নেন। আমাদের প্রার্থনা তিনি অবশ্যই শোনেন, তবে সেই প্রার্থনা কেবল মুখের কথা হলে হবে না, আন্তরিক হতে হবে।*

* গত এপ্রিল, ১৯৮৯-এ তমলুক রামকৃষ্ণ মঠে প্রদত্ত ভাষণ।

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্ব-মুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের 'দেখছেন'? 'কলকাতা' মানে অবশ্য শুধু কলকাতা নামক ভূখণ্ডটিই নয়, কলকাতা এখানে একটি প্রতীক। সারা পৃথিবীর মানুষ এবং সারা পৃথিবীই এখানে উদ্দিষ্ট। সুতরাং কলকাতার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, কলকাতার মাধ্যমে সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের দৃষ্টি প্রসারিত—মা সারা জগৎ অর্থাৎ সারা জগতের লোককে 'দেখছেন'। কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক। **আলোকচিত্র: স্বামী চেতনানন্দ**

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসে যুগপৎ ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি ও জীবসেবার আকুতি

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

পঞ্চতন্ত্রকার বিষ্ণুশর্মার সর্বজনবিদিত উক্তির অনুকরণে বলা যায়—অনন্তপারং শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গম্। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু তাঁর পূর্ণ তাৎপর্য ও মহিমা আজও উদ্ঘাটিত হয়নি, হচ্ছে না, হবেও না। সাম্প্রতিক-কালে তাই তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর—তাঁর 'কথামৃত'-এর—অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ বিশ্লেষণের তৎপরতা শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে। এই তৎপরতা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমনিষ্ঠ গবেষণার মর্যাদা পাবার উপযুক্ত।

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মেজাজ বা মনোভাবের শিকার হয় মানুষ অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় তাৎকালিক কোন এক ভাবের আবেগে এমন কোন উক্তি নির্গত হতে পারে ব্যক্তি-বিশেষের মুখ দিয়ে যা হয়তো তাঁর সামগ্রিক জীবন-দর্শনের মূল তত্ত্বের সঙ্গে আপাতঃ সঙ্গতিবোধ হয় না। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় তাঁর সর্বাঙ্গীণ জীবনবেদের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিভ্রান্তিকর উক্তিটির মর্ম বিশ্লেষণ করার।

সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ব্রত বা মূল আদর্শ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কিছু বিতণ্ডার। ঈশ্বরে পরানুরক্তি ও জীবসেবা—এই দুই আদর্শের মধ্যে কোনটি তিনি শ্রেয়তর বিবেচনা করে ঐকান্তিকচিত্তে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তদনুযায়ী ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দকে উপদেশ দিতেন—এই বিষয়-সূত্রেই এই বিতর্কের উৎপত্তি।

'কথামৃত'-এ অভিনিবিষ্ট পাঠকমাত্রেরই মনে বিষয়টি বহুকাল থেকেই অল্পবিস্তর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এসেছে।

'কথামৃত'-এ জীবসেবা অপেক্ষা ঈশ্বরভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক বিখ্যাত উক্তিগুলির মধ্যে থেকে প্রবন্ধের সীমিত পরিসরহেতু মাত্র দুটি উদ্ধার করে বিষয়টি প্রাঞ্জল করা যাক ঃ

১। "ঠাকুর কৃষ্ণদাস পালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা জীবনের উদ্দেশ্য কি ?' কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দূর করা।' ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তোমার ওরূপ রাঁড়ীপুতি বুদ্ধি কেন ? জগতের দুঃখনাশ তুমি করিবে ? জগৎ কি এতটুকু' ?"[১]

২। "মাস্টার—শম্ভু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলেছিল, 'আমার ইচ্ছা যে, টাকা দিয়ে কতকগুলি হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি, স্কুল, এইসব করে দিই; হলে অনেকের উপকার হবে।' আপনি তাকে যা বলেছিলেন, তাই বললুম, 'যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তবে তুমি কি বলবে, আমাকে কতকগুলি হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি, স্কুল করে দাও' !"[২]

এপ্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, 'কথামৃত'-এ তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যার অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তাঁর ঈশ্বর-বিভোর ভাবটিই সমর্থিত হয়। 'মন সর্বদাই অন্তর্মুখ', 'ভাবস্থ-অর্ধবাহ্যদশা', 'প্রস্তরমূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। নয়ন পলকশূন্য'—তাঁর প্রতি প্রযুক্ত ইত্যাকার মন্তব্যগুলি পাঠকচিত্তে তাঁর যে ভাবমূর্তি অঙ্কিত করে, তার সঙ্গে জীবসেবার আকুতি যেন সঙ্গতিহীন বোধ হয়।

এই অনুমানের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রকৃত অর্থে সেই শ্রেণীর সাধক—অধ্যাত্মশাস্ত্রে যাঁকে ভূষিত করা হয়েছে—

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ১১৭২

২ ঐ, পৃঃ ১০২৬-১০২৭

আত্মারাম, আত্মরতি, আত্মানন্দ, আত্মতৃপ্ত ইত্যাদি আখ্যায়—অর্থাৎ যাঁর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়েছে এবং নির্বিকল্প সমাধির মাধ্যমে যাঁর অপরোক্ষ অববোধে প্রতিভাত হয়েছে এই পরমতত্ত্ব—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। এহেন সিদ্ধযোগী সম্বন্ধেই গীতায় বলা হয়েছে—'আত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি'—অর্থাৎ, আত্মাদ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দেখে পরম পরিতোষ লাভ করেন।

এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে স্বতঃই কর্মে অনীহা আসে। গীতায় শ্রীভগবান তাই বললেন ঃ

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥"[৩]

—যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোন কর্ম থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন স্ব-উপলব্ধির আলোকে ঃ

"সচ্চিদানন্দ সাগর।—তার ভিতর 'আমি' ঘট। ··· ঘট ভেঙে গেলে—এক জল—তাও বলবার জো নাই।—কে বলবে?"[৪]

এই ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দ অনির্বচনীয়। তাই উপনিষদ্ বলেছেন ঃ 'মৌনং ব্রহ্ম'।

এই পটভূমিতে বিচার করলে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ববিধ জাগতিক কৃত্যকর্মের প্রতি পরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে ঈশ্বর-তন্ময়তাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করেছিলেন—এমন ধারণার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

'কিন্তু এহ বাহ্য।'

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আরোপিত এধারণা পক্ষপাত-দুষ্ট। এটি কেবল আংশিক সত্য এবং সেই হেতু সত্যের বিকৃতি। তাঁর জীবনব্রতের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এর বিপরীত সিদ্ধান্তেই উপনীত করে—কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে—এই দ্বৈত আদর্শকে অদ্বৈতরূপে প্রতিপন্ন করে।

সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

এই বিতর্কের সার্থক মীমাংসা করতে হলে অনুধাবন করতে হবে সাধক হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যতা। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ চিহ্নিত হয়ে আছেন পরমাশ্চর্য এক পরমপুরুষরূপে, ব্রহ্মবেত্তা মহাযোগীদের মধ্যে এক বিরল ব্যতিক্রম-রূপে। অধ্যাত্ম-সাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করেও—নির্বিকল্প সমাধিতে সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্নসত্তা হয়েও তিনি আবার ফিরে এসেছেন এই সংসারভূমিতে—জীবসেবার আকুতি নিয়ে।

এই প্রত্যাবর্তন বা অবতরণ কিন্তু সহজসাধ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "যারা জীবকোটি তারা সাধন করে ঈশ্বরলাভ করতে পারে ; তারা সমাধিস্থ হয়ে আর ফেরে না।···

"যারা ঈশ্বরকোটি—তারা যেমন রাজার বেটা ; সাততলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাততলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামতো নেমে আসতে পারে।"[৫]

এই শ্রেণীর সাধকরা সমাধি থেকে সংসারভূমিতে অবতরণ করেও বজায় রাখে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্বের উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই উচ্চতম অবস্থাকে বলেছেন 'বিজ্ঞান'-অবস্থা। তিনি বলছেন ঃ

"···ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।··· ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান ;··· জীবজগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।"[৬]

"যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। ··· তখন দেখে, তিনি আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।"[৭]

বলা বাহুল্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরকোটি-শ্রেণীর সাধক, তাঁর ভাষায়—'রাজার বেটা'। তাই 'আমি'-ঘট ভেঙে সচ্চিদানন্দ সাগরে বিলীন হয়েও আবার ফিরে আসতে পেরেছিলেন ইহলোকে, দেখতে পেয়েছিলেন— "···বর্ষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে—সেইরূপ এই (ঈশ্বরের) চৈতন্যতে জগৎ জরে রয়েছে।"[৮]

এই 'বিজ্ঞান'-অবস্থালাভের ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন ঈশ্বর "সর্বভূতস্থিত"—"জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" আর তাই দৃপ্তকণ্ঠে

৩ গীতা, ৩।১৭

৪ কথামৃত, পৃঃ ৯২৬

৫ ঐ, পৃঃ ৯১৭-৯১৮

৬ ঐ, পৃঃ ৩১১

৭ ঐ, পৃঃ ৫৪

৮ কথামৃত, পৃঃ ২৭১

ঘোষণা করেছিলেন তাঁর প্রবাদোপম বাণীঃ "যত্র জীব তত্র শিব"।

এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর যুগের, অর্থাৎ বাংলার নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁ'র যুক্তি-নির্ভর, বৈজ্ঞানিক চিন্তন-প্রণালীর অনুকূল। তাই জীব ও ঈশ্বরের অভেদত্বের তত্ত্বটি তাঁর অপরোক্ষ অনুভূতিতে ভাস্বর না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তিনি নিঃসংশয় হতে পারেননি। তিনি বলছেনঃ

"শুনলে ষোল আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হলে আর বিশ্বাসের কিছু বাকি থাকে না।

"... কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে, সব চিন্ময়, কোশাকুশি, বেদী... মানুষ, জীব, জন্তু,—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম।"[৯]

এই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের ফলেই, নরেন (বিবেকানন্দ) নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বিরক্ত হয়ে বললেনঃ "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। ও অবস্থার চেয়ে উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস, 'যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়'।"[১০]

নরেন ছিল তাঁর 'অপর সত্তা' (alter ego)। তাই বিশেষভাবে তাকেই তিনি দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পরম ব্রতে—লোককল্যাণ বা লোকশিক্ষার ব্রতে। তিনি একদা একটা কাগজের চিরকুটে লিখেছিলেনঃ "নরেন শিক্ষে দিবে"।

এপ্রসঙ্গে আরও স্মর্তব্য যে, তিনি সেবাব্রতে দীক্ষিত করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে আকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন ত্যাগী তরুণদের। তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেক নিবেদিতপ্রাণ কিশোর ও যুবক এসেছিলেন, এমনকি —স্বামীজীর কৌতুকময় ভাষায়—'ইউনিভার্সিটির ব্রহ্মদত্যিরা' অবধি। এঁদের মধ্যে উপযুক্ত কয়েকজনকে নির্বাচন করে তাঁদের দীক্ষিত করেছিলেন ত্যাগ ও সেবার আদর্শে—তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের হাতে বৈরাগ্যের প্রতীক হিসাবে 'গেরুয়া' বস্ত্র। প্রয়াণ-কালে এঁদের দায়িত্ব ও ভার অর্পণ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথের ওপর।

তিনি বলতেনঃ "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" অন্নবস্ত্রের অভাবে কাতর মানুষের দুঃখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হতো। এই প্রসঙ্গে দেওঘর ও কলাইঘাটায় মথুরবাবুকে দিয়ে দরিদ্রনারায়ণ সেবার এবং কলাইঘাটা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাদের মথুরবাবুকে দিয়ে খাজনা মকুব করানোর ঘটনা সর্বজনবিদিত।

'কথামৃত'-এর বহু স্থানে এই জীবসেবার আকুতি প্রকাশ পেয়েছেঃ

"প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।"[১১]

"(মণি মল্লিকের প্রতি) দেখ রাখাল [পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ] বলছিল, ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করিণী কাটাও না কেন। তাহলে কত লোকের উপকার হয়।"[১২]

তিনি ভক্তদের বলছেনঃ

"পরমহংস—নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী। এঁরা আপ্ত-সারা—নিজের হলেই হলো।

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে।... এরা যেসব সাধনা করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে—তাদের হিতের জন্য।"[১৩]

এই দুই শ্রেণীর পরমহংসকে তিনি অন্যত্র বলেছেন—"জ্ঞানী পরমহংস" ও "প্রেমী পরমহংস"।

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলঙ্গস্বামীর মতো 'আপ্তসারা' ছিলেন না। তিনি ছিলেন "প্রেমী পরমহংস"।

এত আলোচনার পরেও কিন্তু 'কথামৃত' থেকে জীবসেবা-সম্পর্কিত উপরোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে পারে না। এহেন

৯ কথামৃত, পৃঃ ৪৭১

১০ ঐ, পৃঃ ১১১৬

১১ ঐ, পৃঃ ৮৪৪

১২ ঐ, পৃঃ ১৯০

১৩ ঐ, পৃঃ ৬০৬-৬০৭

উক্তিসমূহের মধ্যে অভিব্যক্ত বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতার আভাষ অস্বীকার করা যায় না।

একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই এই প্রহেলিকার মীমাংসা মেলে। সেই বৈশিষ্ট্যটি হলো তাঁর অহঙ্কার বা কর্তৃত্বাভিমান-শূন্যতা।

এই 'অহং' বা অভিমান ত্যাগ না হলে যে ঈশ্বর-লাভ সম্ভব নয়—অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই অনিবার্য সত্যটি তাঁর বোধে প্রতিভাত হয়েছিল জীবনের ঊষালগ্নেই। 'কথামৃত'-এ এই অহং বর্জনের প্রসঙ্গ বিধৃত হয়ে আছে অসংখ্য স্থানে। তাঁর মুখে স্বগতোক্তির মতো প্রায়শই উচ্চারিত হতো: "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল", "মুক্তি হবে কবে, অহং যাবে যবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে⋯কিন্তু আবার এসে পড়ে।⋯ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, আবার তার পরদিন ফেঁকড়ি বেরিয়েছে।⋯

"সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' তো যাবার নয়। তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।"[১৪]

নিজের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-দর্শনের বিষয় উল্লেখ করে বলছেন:

"কিন্তু এত তো দেখা হচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না।⋯

"মাইরি বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়।"[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গীতোক্ত তাৎপর্যে "নিঃস্পৃহ, নির্মম নিরহঙ্কার"।[১৬] তাই ভক্তদের মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র প্রকাশ দেখলে তিনি বিরক্ত হতেন, তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো। তাই একদা প্রকৃত বৈষ্ণব পদবাচ্য হবার উপযুক্ত গুণাবলীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি "জীবে দয়া"—কথাটি উচ্চারণ করেই বলে ওঠেন: "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে?"[১৭]

তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন: "নিষ্কাম-কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়।"[১৮] "তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবানলাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়।"[১৯]

শম্ভু মল্লিক ও কৃষ্ণদাস পালের পূর্বে উল্লিখিত পরোপকারের প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্যই তাঁদের প্রচ্ছন্ন অহমিকা—অর্থাৎ এই "জীবে দয়া"-র ভাবটি ফুটে উঠেছিল। আর সেইটিই হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের উষ্মা বা বিরক্তির যথার্থ উপলক্ষ।

নিষ্কাম কর্মী সমস্ত কর্মফল 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' সমর্পণ করেন। সমস্ত বাসনা-কামনা ত্যাগ করে একমাত্র শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকাম হয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্মবোধে তাঁরই প্রীতিকামনায় করতে পারলেই তাঁর অর্চনা হয়।

এহেন কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত দানের কথাই যীশুখ্রীস্ট বলেছেন:

"When thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee.⋯

"But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth."[২০]

এ আলোচনার উপসংহারে এই সিদ্ধান্তই অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপাদিত হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনীহা জীবসেবার প্রতি নয়, জীবসেবার অভিমান বা অহমিকার প্রতি।

১৪ ঐ, পৃঃ ৫৫-৫৬
১৫ ঐ, পৃঃ ২৭১
১৬ গীতা, ২।৭১

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ১৩৫৮, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২২৪-২২৫
১৮ ঐ, পৃঃ ৬০ ১৯ ঐ, পৃঃ ৫০
২০ Gospel of St. Matthew, 6. 2-3

কবিতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তুতিঃ

গোষ্ঠবিহারী রাণা

যস্য স্মরণমাত্রেণ স্মরঃ সরতি সত্বরম্ ।
স্মরামি রামকৃষ্ণং তং স্মরারিং স্মরঘাতকম্ ॥

যস্য দর্শনমাত্রেণ ক্ষয়ং প্রাপ্নোতি কিল্বিষম্ ।
পশ্যামি তৎপাদপদ্মং ধ্যানমগ্নেন চেতসা ॥

যস্য কথামৃতং শ্রুত্বা সুরত্বং লভতে নরঃ ।
শৃণোমি তৎকথাং নিত্যং মধুরামৃতবর্ষিণীম্ ॥

বিবেকানন্দবন্দিতং সারদামণিশোভিতম্ ।
সপার্ষদং সদানন্দং রামকৃষ্ণং নমাম্যহম্ ॥

সারদা যস্য জিহ্বাগ্রে স্ফুরতি মঙ্গলপ্রদা ।
ত্র্যক্ষরজ্ঞং নিরক্ষরং নিরুপাধিং নমামি তম্ ॥

রামকৃষ্ণং স্মরেন্নিত্যং পিবেৎ তস্য কথামৃতম্ ।
ধ্যায়েৎ তদ্বিমলং রূপং হৃদয়ানন্দদায়কম্ ॥

গচ্ছেৎ পুণ্যময়ং তীর্থং দক্ষিণেশ্বরমন্দিরম্ ।
পশ্যেৎ পঞ্চবটীক্ষেত্রং গঙ্গাশীকরশীতলম্ ॥

বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং কলিকলুষহরং সচ্চিদানন্দমূর্তিং
যোগীন্দ্রং যোগযুক্তং সুসরলমতিং দীপ্তপূর্ণাবতারম্ ।
সংসারাম্ভোধিপোতং তব হি চরণমাশ্রয়ে মজ্জমানঃ
শুদ্ধাং ভক্তিঞ্চ নিষ্ঠাং চরণকুবলয়ে কাময়ে দীয়তাং মে ॥

রামকৃষ্ণবাদ

শান্তি সিংহ

জাত-পাতের খানা-খন্দ
মতুয়া-বুদ্ধির খাল-বিল পেরিয়ে
মুচি-মেথর-জোলা, ব্রাহ্মণ কিংবা চণ্ডাল,
দেশী কিংবা বিদেশী—
বিশাল মহামানবের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এই মিলনের ব্যাকুলতা তিনি বারবার জানিয়েছেন
কুঠিবাড়ি থেকে
আরতির সন্ধ্যায়, ডাক দিয়েছেন ঃ
"ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয় !"
তাদের আসতে দেরি দেখে
তিনি নিজেই ছুটে এসেছেন আপনভাবে।
কেশব-বিজয়-শিবনাথ, গিরিশ-বিদ্যাসাগর শুধু নয়—
সংখ্যাহীন অসহায়-আতুর নরনারী
সবার হৃদয়ের দরজায়
গামছা-নিঙড়ানো ব্যাকুলতায়
প্রেমের ভিখিরি হয়ে তিনি ডাক দিয়েছেন ঃ
"ওরে, আয়, তোরা আয় !"

মহাভাবের প্রবল ঝড়ে
আম-তেঁতুল গাছ সবই এক বোধ হয় !
নবানুরাগের বর্ষায়
ভেসে গেছে কত-শত সঙ্কীর্ণতার কুঁড়েঘর।
আজ, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের অগণিত ভাববাদী
সহজ ভালবাসায়
নতুন-পৃথিবী-গড়ার স্বপ্নে বিভোর।
সেখানে নেই ক্ষুদ্র-স্বার্থ-দিয়ে গড়া বার্লিন প্রাচীর,
ধনতন্ত্র-রাজতন্ত্র-সমাজতন্ত্র—গ্লাস্‌তনস্‌ত্‌-পেরেস্ত্রৈকা
সবই নক্সখেলার পাঁচ-সাত-দশ ফোঁটা।

মানুষের অন্তরের বিপ্লব যাতে আপসে ঘটে
সেই মতবাদের নাম—
রামকৃষ্ণবাদ।

প্রভু আমার

দেবব্রত ঘোষ

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
কোনদিন যদি হয়,
জেনে রেখ প্রভু সেদিন আমার
জয় হবে নিশ্চয়।

আমার মনোমন্দিরে তোমার
চরণ যেদিন পড়বে,
জেনে রেখ প্রভু আমার জীবনে
নতুন সূর্য উঠবে।

জানি দূরে থেকে পরীক্ষা করো
কতখানি তুমি আমার,
জেনো নির্বোধ আমি দূরে সরে আছি,
কাটেনি আমার আঁধার।

আমার আঁধার, আমার কালিমা
সব গ্লানি হবে ক্ষয়,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
কোনদিন যদি হয়।

রামকৃষ্ণ নামে পাল তুলে দে

স্বামী ভূতাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ নামে পাল তুলে দে
ভবনদীতে।
তোর দেহতরী ডুববে নাকো, দুলবে নাকো,
যাবে ভবপারেতে ॥
ও-যে ভক্তি-প্রেমের তরী
ঢুকলে জল হয় না রে ভারী।
নেচে নেচে চলবে তরী নদীর মাঝেতে ॥
ওপারেতে দাঁড়িয়ে আছে,
ধীরে তরী যাচ্ছে কাছে।
তোর হাতটি ধরে নামিয়ে নেবেন,
লবেন কোলেতে ॥
ভয় কিরে তোর ভবপারে,
রামকৃষ্ণ নাম ভয় হরে।
পাপী-তাপী উদ্ধারিতে, আসেন ধরাতে ॥

নিবেদন

সংযুক্তা মিত্র

আমার শূন্যপ্রাণে উজ্জ্বল আলোয়
কে তুমি আজ এলে?
ভুবন আমার উজ্জ্বল হেসে
দুঃখজ্বালা গেল ভেসে
হৃদয়পুরে কোমল তব
চরণদুটি ফেলে।
ভরলে তুমি জীবন আমার
সহস্র দীপ জ্বেলে ॥
তুমিই কি সেই অগমপুরের
চিরপথিক মম?
তোমার তরেই সারাজীবন
আশায় আশায় থাকি মগন
বন্ধু আমার, প্রিয় আমার,
আমার প্রিয়তম?
কুয়াশা মোর ছিন্ন করে হাতছানি দাও বারে বারে
তুমিই কি সেই পুণ্য নিরুপম?
তবে আমার কিসের এ সংশয়?
তোমায় যেন এমন করেই পাই,
কর্মে আমার মর্মে আমার
দোল দিয়ে যাও ছন্দে বেদনার,
দুঃখ-শোকের নিত্য ঘাতে
শুষ্ক আমার জীবনতরু প্রায়,
তোমার রসের ভাবের সুরে
পূর্ণ করে তোমায় আমি চাই ॥

শেষ বেলা

অটলচন্দ্র দাশ

রেখে দাও এই বেলা
ধন রত্ন অর্থ বিত্ত সব,
কিছু নাহি লাগে ভাল,

শুধু চাই উদ্বেল ঐ আঁখি
মেলি ফুল্লদল,
ঢালিবে যা স্নিগ্ধ সুধা
হিল্লোলিয়া হৃদয়-পল্বল ॥

সহজ কথা

হিমাংশুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সহজ হওয়া নয়তো সহজ, মোটেই সহজ নয় ;
সাধনায় সিদ্ধ হলে তবেই সহজ হয় ।
সহজ-পাঠ নয়তো সহজ—যুক্তাক্ষরে ভরা,
অনায়াসে মর্ম তাহার যাবে কি গো ধরা ?

বিয়োগেতে কাতর মন, যোগে হাসির রেখা
ভাগে যদি থাকে লেখা, জগৎগুরু দেবেন দেখা,
তিনগুণের গুণাগুণ নির্গুণেতে হবে লয় ।
সহজ হওয়া নয়তো সহজ, মোটেই সহজ নয় ॥

রামকৃষ্ণের গোলামে কয়—অতশত হবার যে নয়,
সত্যাসত্য বিচার করে সত্যের ঘর করতে হয় ;
রামকৃষ্ণ নামের হলুদ মেখে নিয়ে গায়ে—
সাত সমুদ্র তের নদেয় চল আসি নেয়ে ।

পার যদি দিতে তারে আমমোক্তারনামা,
কুমীরের ভয় রবে না আর, জলে যাবে নামা ।
সহজ হওয়া নয়তো কঠিন, তেমন কঠিন নয় ;
সহজ পথটি ধরতে পারলে তবেই সিদ্ধ হয় ॥

তুমি আসবে বলেছিলে

করবীবরণ মুখোপাধ্যায়

কতকাল বসে আছি তোমার পথ চেয়ে
কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত গেল পার হয়ে
কত দীপান্বিতার আলো গেল নিভে,
তোমার কিন্তু দেখা নেই ।
শুনি না তোমার চরণধ্বনি,
লোকে বলে তুমি নাকি আসবেই ?

একদিন গ্রামের পায়েচলা পথ মাড়িয়ে
লক্ষ্মীজলার মাঠের আলপথ ধরে হাঁটিতে হাঁটিতে
শ্রাবণের আকাশে ঘননীল মেঘ দেখে
মনে তোমার মহাভাব জেগেছিল—
শ্রীরাধার যেমনটি হতো স্মরণে তাঁর মাধবকে ।

কত লীলাখেলা দক্ষিণেশ্বরে,
কত কথাবলা কথামৃতে—
কত স্নেহ, কত আশা—
প্রতিশ্রুতিও দিয়েছ আবার আসবে বলে—
সেই আশ্বাসে বসে আছি পথ চেয়ে
রাতভোর জেগে আছি—চরণধ্বনি কখন শুনব ।

তুমি

প্রভা গুপ্ত

তুমি যে রয়েছ মোর হৃদয় ভরি',
আমি যে তোমারই প্রভু, আমি যে তোমারই ॥
হৃদয়েতে আমি তাহা যতনে স্মরি,
তুমি যে রয়েছ মোর, মরি মরি ॥
তুমি যে এনেছ মোরে ভুবনে টানি
রয়েছ আমার সাথে জানি যে জানি ॥
তুমি যে রয়েছ মোর নয়ন ভরি' ।
আমার জীবনসাথী, আমার খেলুড়ি ॥

কামারপুকুরে

প্রসিত রায়চৌধুরী

চিত্তের যত কলুষ কামনা পলকে গেল কি থমকি,
সুরভিত কার স্মৃতির স্মরণে হঠাৎ উঠিল চমকি ?
নব-ভারতের নব-ইতিহাস লেখা শুরু এইখানে—
খড়ে ছাওয়া এই মাটির কুটিরে অজ গাঁয়ে নির্জনে ।
সারা জগতের সব ভাবনার সার
অবাধে মিশেছে জীবন-বাণীতে যাঁর,
সে মহাজীবন, স্মরিয়া আবার
অবনত দেশ উঠুক দাঁড়ায়ে, জাগুক পুনর্বার ।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বলরাম মন্দির ঃ পুরনো কলকাতার একটি ঐতিহাসিক বাড়ি

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ গত পৌষ, ১৩৯৭ সংখ্যার পর]

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর শ্রীমা বলরাম মন্দিরে অবস্থান করেছিলেন আট দিন (আগস্ট ১৮৮৬)। বিভিন্ন সময়ে তীর্থ-প্রত্যাবর্তনের পথে বা কামারপুকুর-জয়রামবাটি থেকে কলকাতায় আগমনে শ্রীমায়ের আবাসস্থল ছিল বলরাম মন্দির। অন্যসময়েও তাঁর শুভাগমন হয়েছিল বলরাম মন্দিরে।[৩৯] তাঁর সঙ্গে থাকতেন গোলাপ-মা, যোগীন-মা, লক্ষ্মী-দি প্রভৃতিরা। শ্রীমা নিজেকে খুব স্বচ্ছন্দ মনে করতেন বলরাম মন্দিরে।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শ্রীমা বেশ কয়েকদিন বলরাম মন্দিরে ছিলেন। তিনি ধ্যান করতেন ওখানকার বাড়ির ছাদে। একদিন ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থ হন শ্রীমা। ব্যুত্থিতাবস্থায় তিনি যোগীন-মাকে বলেছিলেন ঃ "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমায় কত আদরযত্ন করছে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর করে বসালে—সে যে কি আনন্দ বলতে পারিনে। একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতর ঢুকব ? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম ও দেহে হুঁশ এল।"[৪০]

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ। বলরাম বসু মৃত্যুশয্যায় শায়িত। হলঘরেই আছেন। প্রথমে ইনফ্লুয়েঞ্জা, পরে ডবল নিউমোনিয়া হয়। ফুসফুস দুটি ফুটো হয়ে যায়। মুখে পচা গন্ধ। এই অসুস্থ বলরাম বসুকে শেষ দর্শন দেবার জন্য কৃষ্ণভাবিনীর প্রার্থনায় শ্রীমা এলেন বলরাম মন্দিরে। শ্রীমায়ের শ্রীচরণ-দর্শনে বলরাম কৃতার্থ হলেন। সে-সময়ে বলরামের সেবার জন্য স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং স্বামী সদানন্দ বলরাম মন্দিরে ছিলেন। কিন্তু সব তুচ্ছ করে রামকৃষ্ণের বলরাম বসু রামকৃষ্ণলোকে চলে গেলেন। যোগীন-মায়ের দর্শন হয়েছিল—মেঘের আড়াল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের রথ হলঘরে এসে নামল এবং স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়ে গেলেন তাঁর বলরামকে। বলরামের দেহান্তে শ্রীমা অত্যন্ত ব্যথিতা হন। বলরামের নিষ্ঠাভক্তি ও সেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন শ্রীমা।[৪১]

বলরাম মন্দিরের ছাদে শ্রীমা। পাশেই গিরিশ ও তাঁর পত্নী তাঁদের বাড়ির ছাদে। শ্রীমাকে দেখতে পেয়ে গিরিশ-পত্নী বললেন ঃ "ঐ দেখ, মা ও-বাড়ির

৩৯ বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত বলরাম মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানের কয়েকটি তারিখ ঃ
(১) আগস্ট ১৮৮৭—১৫ দিন ; (২) নভেম্বর ১৮৮৮—২।১ দিন ; (৩) ৩০ মাঘ ১৩১৭ ; (৪) ২ আশ্বিন ১৩১৯। এছাড়াও বহুবার শ্রীশ্রীমায়ের বলরাম মন্দিরে শুভাগমন হয়েছিল। প্রবন্ধে উল্লিখিত তারিখগুলি এখানে দেওয়া হয়নি।

৪০ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ১১৬

৪১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৮৬, পৃঃ ১১৫ ; সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী, ১৩৬১, পৃঃ ১৭১-১৭২; 'বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ,' পৃঃ ১৭৪

ছাদে বেড়াচ্ছেন।" গিরিশ অমনি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "না, না, আমার পাপনেত্র; এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখব না।" সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে গেলেন গিরিশ।[৪২] ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গিরিশের আকুল আহ্বানে শ্রীমা বলরাম মন্দিরে এলেন। সপ্তমী ও অষ্টমীর দিন বলরাম মন্দিরে 'জ্যান্ত দুর্গা'র পূজা অনুষ্ঠিত হলো। শত শত ভক্ত শ্রীমায়ের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করলেন।[৪৩]

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক সঙ্গতিপন্ন ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বলরাম মন্দিরে শ্রীমাকে দর্শন করে প্রার্থনা জানালেনঃ "মা, আপনি ইচ্ছাময়ী, আমার প্রাণের বাসনা আপনি তো জানেন। আমার যেন কাশীপ্রাপ্তি হয়, মা-ভবানীর চরণে যেন স্থান পাই।" এই ব্রাহ্মণের পত্নী ছিলেন শ্রীমায়ের দীক্ষিতা। সেদিন শ্রীমা ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় অসম্মতি জানালেন। কিছুকাল পর ব্রাহ্মণের পত্নী মারা যান। তখন মধুসূদন আবার প্রার্থনা জানালেনঃ

"গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।"

এবার শ্রীমা ব্রাহ্মণের প্রার্থনা অনুমোদন করলেন।[৪৪] ব্রাহ্মণ কাশীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজ থাকতেন। মা ও ছেলের সম্পর্কের একটি মধুর চিত্র পাই তাঁর স্মৃতি-চারণ থেকেঃ "দেখো! মা বলরাম মন্দিরে মাঝে মাঝে আসতেন। হামনে বাহিরের ঘরে থাকতুম। হামাকে হামেশা লোকে জিগ্‌গেস করতো—'মশয়! মা উপরে রইয়েছেন, আপ্‌নি এখানে কেনো?' তাদের বলতুম —'তাতে কি হয়েছে?' হামার মনের ভাব কেউ বুঝত, কেউ বুঝত না। কেউ কেউ আমার একথা শুনে চটে যেত। গালাগালি করত। হামনে তো একদিন তাদের তাড়া দিলুম—'শালারা কেউ কুছু করবে না কেবল 'মা-ঠাউন', 'মা-ঠাউন' বলে হুজুগ করবে।"[৪৫]

বলরাম মন্দির থেকে শ্রীমা যাবেন জয়রামবাটি। সকলেই শ্রীমায়ের শ্রীচরণে প্রণাম করছেন। খেয়ালী লাটু মহারাজ নিজের ঘরে পাইচারি করতে করতে বললেনঃ "সন্ন্যাসীকো কো পিতা, কো মাতা, সন্ন্যাসী নির্মায়া।" শ্রীমা যখন সিঁড়িতে, তখনও অদ্ভুতানন্দজী আপন খেয়ালে ঐকথাগুলি বলছেন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রীমা যেই বললেনঃ "বাবা লাটু! তোমার আমাকে মেনে কাজ নেই,বাবা।" অমনি লাটু তড়াক্ করে এক লাফে শ্রীমায়ের শ্রীচরণে পতিত হলেন। "প্রণাম করিতে করিতে লাটু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেবকের কান্না দেখিয়া মায়ের চোখেও জল আসিয়া গেল। তখন লাটু নিজের উত্তরীয় দিয়া মায়ের চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলঃ "বাপ ঘরে যাচ্ছ, মা! কাঁদতে কি আছে? আবার শরোট (শরৎ মহারাজ—স্বামী সারদানন্দ) তোমায় শিগ্‌গির এখানে নিয়ে আসবে, কেঁদো না মা! যাবার সময় চোখের জল ফেলতে আছে কি? সেবক লাটুর এই দরদমাখানো কথায় আমরা সকলেই অভিভূত হইয়া পড়ি" —বর্ণনা দিয়েছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী।[৪৬]

বলরাম মন্দিরে একবার শ্রীমা আসছেন। অদ্ভুতানন্দজীও সেখানে আছেন। প্রবেশদ্বারে আসতেই অদ্ভুতানন্দজী নিজের ঘরের বাইরে এসে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেনঃ "মা-ঠাকরুণ, বরমময়ী [ব্রহ্মময়ী] এথিকে, এথিকে।" অবগুণ্ঠিতা শ্রীমা গোলাপ-মাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "গোলাপ, লাটু বলে কি?" তৎক্ষণে লাটু মহারাজ শ্রীমায়ের চরণযুগল জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আর গুন্ গুন্ স্বরে গাইছেন—"তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি মা পাতাল।/তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।" গাইতে গাইতে লাটু মহারাজ ভাবস্থ— শ্রীমাও ভাবস্থা। তাঁদের ভাবাবস্থা দর্শনে উপস্থিত সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমায়ের সঙ্গিনীরা শ্রীমাকে ওপরে নিয়ে গেলেন। লাটু মহারাজও ধীরে ধীরে সাধারণ ভূমিতে নেমে এলেন।[৪৭]

একদিন গৌরী-মা তাঁর কয়েকজন আশ্রম-

৪২ শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ২৫৫
৪৩ ঐ পৃঃ ২৬৬
৪৪ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ২০৫-২০৬
৪৫ লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩২৯-৩৩০
৪৬ ঐ
৪৭ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩২৪

বাসিনীদের নিয়ে শ্রীমাকে দর্শনের জন্য বলরাম মন্দিরে উপস্থিত। তখন সবেমাত্র শ্রীমায়ের মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হয়েছে। তখন গৌরী-মা তাঁর আশ্রম-কন্যাদের বললেন : "ওরে, আজ তোদের সৌভাগ্য, মা ব্রহ্মময়ীর ভোগ শেষ হয়েছে, তোরা শিগ্গির করে এঁটো পরিষ্কার করে জায়গা ধুয়েমুছে দে। আর যদি এক-আধ কণা প্রসাদ মাটিতে পড়ে থাকে, ভক্তি করে মুখে দে।" আশ্রমবাসিনীরা সে আদেশ পালন করলেন আনন্দে। শ্রীমা তাঁদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন : "ঝাঁট দাও, তা বেশ। ঠাকুর বলতেন, 'পথঘাট দেবালয় ঝাঁট দেওয়া ভাল। কত সাধুভক্তের পায়ের ধুলো পড়ে থাকে, তার স্পর্শে নিজের মনের ধুলোময়লা ঘুচে যায়'।" বলরাম-পত্নী কৃষ্ণভাবিনী দেবী তাঁদের প্রসাদের ব্যবস্থা করলেন।[৪৮]

একবার ব্রহ্মানন্দজীর ইচ্ছা হলো চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্য-কৌতুক শ্রীমাকে শোনাবেন। বলরাম মন্দিরে ব্যবস্থা করা হলো। অসুস্থ তুরীয়ানন্দজী চিকিৎসার জন্য ওখানে আছেন। শ্রীমা ঘোড়ার গাড়িতে এলেন বলরাম মন্দিরে। কথা ছিল শ্রীমা স্বয়ং যাবেন তুরীয়ানন্দজীর ঘরে। ঘোড়ার গাড়ি দরজার কাছে আসতেই তুরীয়ানন্দজী নিজের ঘরের বাইরে এলেন। শ্রীমাও অনেকটা দরজা পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছেন। স্ত্রী-ভক্তদের ভিড় ঠেলে সিঁড়িতে নেমে তুরীয়ানন্দজী শ্রীমায়ের চরণ স্পর্শ করলেন। শ্রীমা হাস্য-কৌতুক উপভোগ করে "মায়ের বাড়ীতে" ফিরে গেলেন।[৪৯]

বলরাম মন্দিরে শ্রীমায়ের স্মৃতি-চিত্র অঙ্কন করেছেন উমাশশী বসু (বলরাম বসুর দৌহিত্রী) : "শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি আমার অনেক ছোট বয়স থেকে। আমি তখন কত ছোট তা মনে নেই। মা বাগবাজারের বাড়িতে আসতেন, থাকতেন, বড়মা দিদিমা সকলের সঙ্গে গল্প করতেন। একটা খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন আর অনেক লোক তাঁর পায়ে ফুল দিয়ে একে একে প্রণাম করছেন। আমারও তাই দেখে ইচ্ছে হয়েছিল ঐ রকম ফুল দিয়ে প্রণাম করবার, আমি এগিয়ে এসে অন্য একজনের দেওয়া একটি লাল পদ্ম দিয়ে প্রণাম করতে গেলুম। মা বললেন : 'ওটি আর দিও না, এমনিই কর'।"[৫০]

উষারানী বসু (বলরাম বসুর আরেক দৌহিত্রী) স্মৃতিচারণ করেছেন : "ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ১৩০৮ সাল হবে। আমরা মামার বাড়িতে। নিচে কলতলায় আমার মা স্নান করিয়ে দিয়ে গামছা হাতে দিয়ে আমাকে বললেন, 'উপরে যাও দিদিমার (বলরাম বসুর স্ত্রীর) কাছে, গা মুছিয়ে দেবেন।" উপরে সিঁড়ির পাশের ঘরে (যেখানে ছোটমামাবাবু থাকতেন শেষ বয়সে) তখন শ্রীশ্রীমা থাকতেন। আমি ওপরে উঠতেই উনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি আমার গা মুছিয়ে, পা মুছিয়ে দিচ্ছেন। আর ঠিক সেই সময় দিদিমা ঠাকুরঘর থেকে দালানে আসতেই আমায় দেখতে পেয়েছেন। দিদিমা তাড়াতাড়ি এসে বললেন, 'প্রণাম কর, প্রণাম কর। ছি ছি, মা পায়ে হাত দিচ্ছেন।' আমি তাড়াতাড়ি প্রণাম করলাম। শ্রীশ্রীমা দুহাতে আমায় কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'ও ছেলে মানুষ, ওর কোন দোষ নেই'।"[৫১]

স্বামী প্রেমানন্দজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী রাজলক্ষ্মী বসু বলছেন : "শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি তখন তৈয়ার হয় নাই। শ্রীশ্রীমা আসিয়া ৫৭ নং বাগবাজারে (বলরাম মন্দিরে) থাকিতেন। বাড়িতে হৈ হৈ, পবিত্র আবহাওয়া।... কি আনন্দের দিনই গিয়াছে। বাড়ির ভিতর সেই লক্ষ্মী-দিদির উদ্ধব-সংবাদ, বৃন্দাবন লীলা। একাই লক্ষ্মী-দিদি শ্রীকৃষ্ণ, বিন্দেদূতী, উদ্ধব, রাধারানী, সিপাফুকার ইত্যাদি দেখাইয়া কত আনন্দ দিতেন। পুজনীয়া গৌরীপিসিমা (গৌরী-মা) কি সুন্দর গান গাহিতেন, ...অতি সুকণ্ঠী ছিলেন।"[৫২] [ক্রমশঃ]

৪৮ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩৪৪

৪৯ স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৩৯৩, পৃঃ ১৭০

৫০ মাতৃদর্শন—স্বামী চেতনানন্দ কর্তৃক সংকলিত, ১৩৯৪ পৃঃ ২৫৯

৫১ ঐ পৃঃ ২৬১

৫২ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ২০২

সামাজিক ছবি

"খ"

[পূর্বানুবৃত্তি]

বৈষ্ণবী একতারা লইয়া গান ধরিল ঃ

"বৈরাগ-যোগ কঠিন উধো,
হম ন করব হো।
কৈসে ত্যজব ঐযো দেশ,
জটা মুকুট ধরব কেশ,
অঙ্গ বিভূতি লায় জহর,
খায় মরব হো।
কৈসে ধরব অঙ্গচীর,
মৃগছালা ধারি শরীর,
সুখদ শেজ ছাড়ি ভুঁইয়া
কৈসে পরব হো।
যমুনা জল অতি গভীর,
তনমন নহি ধরত ধীর,
কৃষ্ণ বিরহ লাগি বরুক
ডুবি মরব হো।
একতো দুবল গাত,
দুজে লিখত বিরহ বাত,
সুর শ্যাম দরশ বিনা
প্রাণ ত্যজব হো।"

কারিন্দা কথা বন্ধ করিয়া বৈষ্ণবীর দিকে ফিরিয়া উদ্গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল এবং "মায়ি বহুত আচ্ছা গাতি হৈ" না বলিয়া থাকিতে পারিল না। অন্য সাধুরা নানাপ্রকারে আপনাদের সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য সত্ত্বেও বৈষ্ণবী পরমহংসটির দৃষ্টি একবারও তাহার দিকে আসিতে দেখিল না।

ওদিকে ব্রাহ্মণ পাক শেষ করিয়া শালগ্রামের ভোগ দিয়া সকলকে প্রসাদ পাইতে ডাকিল। একখানি ঝুপড়ির মধ্যে রান্নাঘর। চৌখার সন্নিকটেই ছাই দিয়া গণ্ডি কাটিয়া পরমহংসকে বসাইল এবং কিছু দূরে অন্য অভ্যাগতদিগকে এক একটি গণ্ডির ভিতর বসিতে দিল। কারিন্দা পরমহংসের জন্য কিছু দহি ও বরফি আনাইয়াছিল। কারিন্দার বিশেষ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পরমহংস তাহা সকলকে ভাগ করিয়া দিতে বলিলেন।

আহারান্তে সকলে স্ব স্ব আসনে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী দালানে উঠিল। কারিন্দা জিজ্ঞাসা করিল ঃ "ক্যা মায়ি, কুছ কহোগি ?"

বৈষ্ণবী বলিল ঃ "সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?"

সন্ন্যাসী খাটিয়ার উপর বসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবীর প্রতি নির্ভয়, আশ্বাসপূর্ণ, শুদ্ধ, শান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ঃ "কহিয়ে মায়ি, ক্যা আজ্ঞা হৈ ?"

"আমি হিন্দীতে কথা কইতে পারিনি, বাঙলায় বললে বুঝতে পারবেন ?"

"কহিয়ে।"

বৈষ্ণবী ভাবিল ঃ লোকটি বাঙালী নাকি ? এবং কহিল ঃ "হ্যাঁগা, এই যে পৃথিবীতে সুখ আছে, যার জন্যে মা ছেলে-অন্ত প্রাণ, যার জন্যে পতি-পত্নী পরস্পরের কাছে বাঁধা, যার জন্যে দাতা দান করে, তপস্বী তপস্যা করে, ডাকাত মানুষ মারে, বাঘ শিকার ধরে তাকে আধমরা করে তার সঙ্গে খেলে ও গর্জন করে, এসব তো মানসিক ও শারীরিক সুখ। এ ছাড়া অন্য কোন সুখ আছে ?"

"ইয়ে জো সুখ শরীর ও মনকি আপনে কহা, উয়ো বিষয় জন্য, অতএব পরাধীন হোনেসে সুখাভাস মাত্র হৈ, সুখ নাহি হৈ। উয়ো কিসি সময় সুখরূপী হৈ, কভি দুঃখরূপী হৈ। উসকো সুখ কহা নহি জা সক্তা হৈ। পরন্তু দুঃখকি নামান্তর মাত্র হৈ। সচ্চা সুখ মন ও শরীরসে নহি পায়া জা সক্তা হৈ। উয়ো আত্মাহিসে অনুভব হোতা। ইন্দ্রিয়াঁ আউর মন আপনা নিকৃষ্ট বিষয়বৃত্তি ছোড় কর, উৎকৃষ্ট আত্ম-

গতি প্রাপ্ত হোকর্ শান্ত হোতে হেঁ, তব সূর্যগ্রহণ-কালে আকাশমে য্যাসা তারকা দেখাই দেতি, এসাহি আনন্দময় আত্মা আপনা স্বরূপমে প্রকাশিত হোতা। তারকারাজি সদা আকাশমে মহজুদ হৈ, কেবল সূর্য কি জ্যোতিসে দেখাই নাহি পড়তি, এসাহি আনন্দময় আত্মা সবজীবোঁকো হৃদয়মে সদা বিরাজিত হৈ, ইন্দ্রিয়োঁ আউর মনকি মলিনতাকি কারণ, মালুম নাহি হোতা। ঐহি যথার্থ সুখস্বরূপ হৈ।"

"সন্ন্যাসী ঠাকুর, বিষয়টি গুছিয়ে তো বেশ বললে। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও মনকে শান্ত করে যে সুখ অনুভব হয়, তার প্রমাণ কি? সে অবস্থাতে আর জড়াবস্থাতে তো প্রভেদ দেখি না। আর যদিই কোনপ্রকার সুখবোধ হয়, সে যে সূক্ষ্ম স্নায়বীয় সুখ নয়, তাই বা কে বললে?"

"আপকা আক্ষেপ সহি হোতি, অগর বে আনন্দরূপী আত্মা অনুভবসিদ্ধ বস্তু নাহি হোতা। প্রামাণিক বস্তুমে কল্পনাকা মৌকা নাহি হোতি। যথা আপ কাঁহি নাহি সকতি কি আম নাম ফল নাহি হৈ, অগর হৈ তো কন্দ হৈ, আউর মিঠা নাহি হৈ, পরন্তু মিরিচসে তেজি হৈ।"

"বলি ঠাকুর, আমার তো কল্পনা হলো। তুমি আম খেয়েছ কি? না, পুঁথি পড়ে বলছ?"

মুহূর্তেকের জন্য সন্ন্যাসী নির্বাক হইয়া বৈষ্ণবীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন: "আপকি বঙ্গদেশমে এক কহাবৎ হৈ না কি আদ্রক কি বনিয়াকো জাহাজকি খবরসে ক্যা মতলব?"

*

কারিন্দা একমনে বৈষ্ণবী ও পরমহংসের কথোপ-কথন শুনিতেছিল। বৈষ্ণবীর কথা প্রায়ই বুঝিতে পারিতেছিল না, কিন্তু পরমহংসের উত্তর শুনিয়া বৈষ্ণবীর প্রশ্নের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল এবং মনে মনে বৈষ্ণবীকে একটা কেহ ঠাওরাইতেছিল। কিন্তু বিষয়সংযোগজনিত অপর সুখের ন্যায় তাহার চিত্ত-চমৎকারজনক সুখ স্থায়ী হইল না, চকিতে নাশ হইয়া গেল। কারণ, পরমহংসের 'কহাবৎ' প্রহারে বৈষ্ণবীকে বাকশক্তিরহিত, নিস্পন্দ ও ভূমিবদ্ধদৃষ্টি পুত্তলিকার মতো দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল।

পরমহংসও পুনরায় নিজ শান্ত অন্তর্মুখী ভাব অবলম্বন করিলেন। কারিন্দা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বৈষ্ণবীর ঘোর ভাঙ্গে না। গতিক দেখিয়া কারিন্দা বলিল: "মায়ি অব মে ঘরকো যাওগী, আপ ভি চলিয়ে।" বৈষ্ণবী নিঃশব্দে দালান হইতে নামিয়া গেল।

ডান হাতে একতারা, বাঁ কাঁধে পুঁটলিপাটলার ঝুলি, ধর্মশালা পার হইতে না হইতে সিধা রাস্তা ও খোলা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবীর স্বাভাবিক চিত্ত-তারল্য, প্রগলভতা, স্ফূর্তি প্রভৃতি ফিরিয়া আসিল। সমস্ত পথ নিজের পেটেন্ট হিন্দিতে কারিন্দার নিকট তাহার প্রতিবেশী বাঙালী বাবুর ঘরের খবর লইতে লাগিল।

উচ্চৈঃস্বরে "চারুবাবু মোকানমে হৈ" বলিয়া কারিন্দা একটি ঘিঞ্জি সরু গলিতে একখানি পুরাতন দোতালা বাটির সম্মুখে দাঁড়াইল। দাসী বারান্দায় দেখা দিয়া বলিল, "বাবুজি অভি দপ্তরসে আয়া নাহি।"

"দেখোতো, মায়িজিকো কহো কি এক বাঙ্গালীন মায়ি আয়ি হৈ, আপসে ভেট করনা চাতি হৈ", কারিন্দা বৈষ্ণবীকে দেখাইয়া কহিল।

দাসী ভিতরে চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে সদর দরজা খুলিয়া বৈষ্ণবীকে বাটির ভিতর আসিতে বলিল। কারিন্দা বৈষ্ণবীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

বাটীর ভিতর ঢুকিয়াই বৈষ্ণবী উচ্চরবে বলিল: "জয় রাধে, কোথায় গিন্নিমা?"

একটি প্রবীণা বিধবা, (তাঁহার আঁচল ধরিয়া একটি ছোট মেয়ে) আসিয়া বৈষ্ণবীকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি ঘরে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন: "কোথা থেকে এসেছ গা?"

"এখন ইস্টিশনের কাছে ধর্মশালা থেকে আসছি, সকালে রেল থেকে নেমেছি। ধর্মশালায় থাকবার জায়গা নেই দেখে সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে সে তোমাদের কথা বললে, আর এখানে পোঁছে দিলে। সরকার মানুষটি বেশ বাপু।"

"তা বেশ করেছ, এখানে এসেছ। রাত্রে কি খেয়ে থাক?" এমন সময় শিশুসন্তান ক্রোড়ে একটি যুবতী আসিল। প্রবীণা তাহাকে বলিলেন: "বৌমা, তুমি এই বষ্টমদের মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা কও, আমি চারুর রুটি করিগে" এবং বৈষ্ণবীকে বলিলেন: "হ্যাঁগা বাছা, তুমি রাত্রে কি খেয়ে থাক?"

"মা, আমরা ভিখারি, যা পাই তাই খাই, তোমরা যা দেবে, তাই খাব।"

"আমরা কায়স্থ, আমাদের হেঁসেলে খাবে, না, নিজে রাঁধবে?"

"তোমাদের হেঁসেলেই হবে।" বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল। প্রবীণা চলিয়া গেলেন।

"তোমাদের বাড়ি কোথায়?" বৌ জিজ্ঞাসা করিল। "এখন যেখানে-সেখানে থাকি; আগে ছিল কলকাতায়।"

"তোমরা—আপনারা?"

"এখন বৈষ্ণব। আমি কুলীন কায়স্থের মেয়ে।"

"হ্যাঁগা, তোমার বিবাহ হয়েছিল? তুমি বৈষ্ণব হলে কেন?"

"সে অনেক কথা। এখন বল, তোমাদের বাড়ি কোথা?"

"আমার শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ি কলকাতারই নিকটে। এখানে আমার স্বামীর চাকরি উপলক্ষে থাকা।"

"চারুবাবু কত মাহিনে পান?"

"ষাট টাকা।"

"হ্যাঁগা, তুমি এমন কাহিল কেন? তোমার ছেলেমেয়ে দুটিই রোগা দেখছি। এখানে এমন জলহাওয়া ভাল। কোন অসুখ আছে নাকি? না, দেশের রোগ যা, অল্প বয়সে সন্তান হওয়া। তোমাদেরও তাই?

বৌ সলজ্জভাবে বলিল: "না, এমন কোন অসুখ নেই, তবে অল্প বয়সে মা হয়েছি বটে।"

"আহা দেখ দেখি বোন, এমন সুখের জীবন, সুখের ঘরকন্না, অল্প বয়সে বিয়ের জন্য সবই যেন এক কলসী দুধে একফোঁটা চোনা পড়ার মতো হয়েছে। তোমার শরীরখানি যেন কচি বাঁশে ঘুন ধরেছে। ছেলেমেয়ে দুটি যেন অপুরুষ্ট বর্শেথি বাচ্ছা। আজ লিভার, কাল পিলে, পরশু পেটের ব্যামো, ভাবনায় ভাবনায় হাড় কালি। না আছে রাত্রে ঘুম, না হয় দিনে খাওয়া। ভেবে দেখ দেখি, বয়সে সন্তান হলে, কি সুখের হতো?" বহির্দ্বারে শব্দ হইল: "কেওয়াড় খোল দেও।" বৌ ডাকিল: "গঙ্গাকি মায়ি, বাবু আয়া, কেওয়াড় খোল দেও।" দাসী গিয়া দরজা খুলিয়া দিল; চারুবাবু উপরে গেলেন। বৌ বৈষ্ণবীর কাছে বিদায় লইল: "এখন আসি, আবার আসব।" দাসী বৈষ্ণবীর ঘরে আলো লইয়া আসিল এবং তাহার শয্যা করিয়া দিল।

বৌ চারুবাবুর খাবার উপরে লইয়া গেলে, প্রবীণা বৈষ্ণবীর ঘরে তাহাকে খাবার আনিয়া দিলেন, কিছু বিলম্বে স্বামীকে খাওয়াইয়া বৌ বৈষ্ণবীর কাছে আসিল এবং প্রবীণাকে বলিল: "পিসিমা, তুমি যাও, আহ্নিক করগে, আমি এখানে বসছি।" প্রবীণা চলিয়া গেলেন।

বৈষ্ণবী বলিল: "উনি তোমার পিসশাশুড়ী, আমি ভেবেছিলাম তোমার শাশুড়ী।"

"না, আমার শাশুড়ী একটি পাঁচ বছরের ছেলে ও একটি দুমাসের মেয়ে রেখে মারা যান। পিসিমা কড়ে রাঁড়, ভাইয়ের বাড়িতেই থাকতেন, ভাইয়ের ঘরের গিন্নি হয়ে ছেলেমেয়ে দুটি মানুষ করেন। উনিই আমাদের সংসারের লক্ষ্মী।"

"বটে, তোমার ননদ আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় বিবাহ হয়েছে?"

"তার বিবাহ হয়নি।"

"বিবাহ হয়নি! কেন?"

"সে অনেক কথা, অন্য এক সময়ে বলব। এখন আসি। পিসিমা এই ঘরেই এসে শোবেন।"

বৈষ্ণবী ভাবিল: মন্দ নয়, হয়তো কোন ইতিহাস আছে। পরদিন প্রাতে চারুবাবু বৈষ্ণবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন: "আপনি কতদিন এই বেশ নিয়েছেন?"

"প্রায় সাত বৎসর হলো।"

"আপনাদের আখড়া কোথায়?"

"আমি কোন আখড়ার নই, এমনি ঘুরে বেড়াই।"

"আপনা আপনিই এই আশ্রম নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বটে। আপনাকে পূর্বাশ্রমের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"তা জেনে আর কি হবে? এখন রাধাকৃষ্ণ বলে পথে দাঁড়িয়েছি। ঝড়ের পাতার মতো এখানে-ওখানে যাই, এই আমার জীবন।"* [ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১১, পৃঃ ৫৮৪-৫৯০

সমকালীন ইংরেজী সংবাদপত্রে

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ সংবাদ

THE LATE RAMKRISHNA PARAMHANSA—On Monday, the 23rd instant, at 8-30 A. M., a *sankirtan* (religious procession) marched from Simla-street to a garden in Kankurgachee, to bury the ashes of the late Ramkrishna Paramhansa, of Dhukkinessur. The. procession was in every sense a representative and numerously attended one; throughout the road, a distance of 3 miles, the ashes, which had been collected and put in a copper *ghatta* (jug), were reverently carried by the followers of the Paramhansa (all graduates and under graduates of the university), with solemn songs and music. A temple is to be built over the place where the ashes have been interred. After the burial was over, the mourners, numbering about 300, retired to another garden-house, where that part of the *shradh* ceremony called *utsab* was performed, and alms were distributed to the poor and indigent. The proceedings were throughout performed according to orthodox Hindoo rites.

Ramkrishna Paramhansa was born at Sripore [?] in the Burdwan [?] district. His father and brothers were rigidly orthodox Brahmins. He came to Calcutta to study Sanskrit in a *tole* and was appointed the officiating priest of the temple in the garden of Ranee Rashmony in Dhukkinessur, which post he left to become a *Jogee* or ascetic. In this character he kept himself aloof from the outside world, and passed his days in solemn meditation and religious discussions in a garden called Panchabutty. His disciples belonged to the educated class. Keshub Chunder Sen recognized him as his spiritual guide. Ramkrishna was the author of the "New Dispensation" religion. The characteristic features of his religion were poverty and chastity. He tolerated every religion on the face of the earth.

Brahmos, Buddhists, Christians, Hindoos, Mahomedans, and Parsees were alike the objects of his sympathy. He was of opinion that any one could be saved by the practice of virtue, no matter to what creed he belongs. Although not a profound scholar, he possessed a powerful intellect. Simplicity, earnestness, purity, self-sacrifice and love for all in the highest degree, were his leading attributes. He died on the 15th[?] instant at the age of 45[?], and his body was burnt at the Baranagore-ghat [?], where a second temple is shortly to be built to commemorate his name. In the Upper Provinces, he was highly respected. His followers have this

consolation, that he initiated a religious and moral movement in the minds of the educated natives, more noble and abiding than any the hand of man had yet constructed. *

*** The Statesman, August 25, 1886, Calcutta**

সংগ্রহ : ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত

বঙ্গানুবাদ

রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রয়াত

গত ২৩ আগস্ট সোমবার একটি সংকীর্তন (ধর্মীয় শোভাযাত্রা) দল দক্ষিণেশ্বরের প্রয়াত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভস্ম সমাধিস্থ করার জন্য কীর্তন করতে করতে সিমলা স্ট্রীট থেকে কাঁকুড়গাছির একটি উদ্যানে গিয়েছিল। শোভাযাত্রাকে সর্বতোভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায় এবং তাতে প্রচুর সংখ্যক লোক যোগদান করেছিল। তিন মাইল ব্যাপী রাস্তায় পরমহংসের অনুগামীরা (সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বা স্নাতকার্থী) ভাবগম্ভীর সঙ্গীত করতে করতে ভস্মরক্ষিত তাম্রপাত্রটি শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করছিলেন। যেখানে ভস্ম সমাধিস্থ হবে তার ওপরে একটি মন্দির নির্মিত হবে। ভস্ম সমাধিস্থ হওয়ার পর প্রায় ৩০০ শোকসন্তপ্ত মানুষ অন্য একটি উদ্যানে [কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্র দত্তের বাগানে] গিয়ে অনুষ্ঠানের অন্য অংশ যাকে 'উৎসব' বলে তার অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং যেখানে দীন-দরিদ্রকে ভিক্ষা দান করা হয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটিই নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বর্ধমান জেলার [?] শ্রীপুরে [?] জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ও ভ্রাতারা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষালাভ করতে কলকাতা এসেছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির উদ্যানবাটিতে সাময়িকভাবে পূজারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। যোগী বা তপস্বী না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তপস্যা-কালে তিনি বহির্জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন এবং পঞ্চবটী নামক উদ্যানাংশে গভীর ধ্যানে সময় কাটাতেন। তাঁর শিষ্যগণ সকলেই শিক্ষিত। কেশবচন্দ্র সেন তাঁকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। রামকৃষ্ণ 'নব-বিধান' (New Dispensation) ধর্মের প্রবর্তক। তাঁর ধর্মের বিশেষত্ব হলো দারিদ্র্য এবং সংযম। পৃথিবীতে যতরকম ধর্মমত আছে, সবই তিনি স্বীকার করতেন।

ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, হিন্দু, মুসলমান এবং পার্সী—এঁদের সকলের ওপর তাঁর সহানুভূতি ছিল। তাঁর মতে একজনের ধর্মমত যাই হোক, নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করলে সে তাতেই মুক্তিলাভ করবে। তাঁর বিদ্যাশিক্ষা বেশি না হলেও, তাঁর বুদ্ধি খুবই প্রখর ছিল। সারল্য, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, আত্মত্যাগ এবং সকলের প্রতি গভীরতম প্রেম ছিল তাঁর বিশেষ গুণাবলী। ৪৫ [?] বছর বয়সে গত ১৫ আগস্ট [?] তাঁর দেহত্যাগ হয়। এবং তাঁর দেহ বরানগর-ঘাটে [?] চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে শীঘ্রই সেখানে একটি মন্দির নির্মিত হবে। উত্তর প্রদেশ অঞ্চলে তিনি খুব শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর অনুগামীদের এই সান্ত্বনা যে, তিনি শিক্ষিত দেশীয় লোকদের মনে এমন একটি মহৎ ও স্থায়ী প্রভাবসম্পন্ন ধর্মীয় এবং নৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন যার মতো একটিও আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারেননি।*

* দি স্টেট্‌সম্যান, ২৫ আগস্ট, ১৮৮৬, কলকাতা

প্রবন্ধ

বাংলার লোকজীবনে শিব

তাপস বসু

শিব এমন একজন দেবতা যাঁর মধ্যে আর্য ও অনার্য উভয় সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। মহেঞ্জোদেড়োর নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি পশুপতি তিনি, ব্রাত্যজনের কাছে তিনি একব্রাত্য, আবার বেদে তিনি রুদ্র, ভব, ঈশান নামেও পরিচিত, কালে কালে তিনিই আবার হয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি শিব, তিনি আশুতোষ আবার তিনি নটরাজ, মহাকাল। শিবের সমন্বিত রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায় অথর্ববেদের পৈপ্পলাদশাখার ব্রাত্যকাণ্ডে। সেখানে শিব একাধারে রুদ্র, পশুপতি, রোগোপশমকারী ভিষক্, বিদ্রোহী, শান্ত ও নিরঞ্জন। শিবের এই পরিচয় একদিনে গড়ে ওঠেনি, যুগ-যুগান্ত ধরেই চলেছে নব নব রূপারোপ ও নামকরণ। ব্রাত্যদেবতা-রূপে শিব হয়ে যান হীন, নিন্দিত, নগণ্য, নগ্ন, বিকৃতলোচন।[১] এই নঞর্থক রূপটি শিবকে লোক-জীবনের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। বৈদিক ভাবনায় শিব "ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং মহদ্ভয়ং বজ্রসমুদ্যত"। শিব তস্করদেরও দেবতা, পশুপতি, সর্প-সংযুক্ত তাঁর তনু।[২]

মহাভারতে শিব নগ্ন, উগ্র, যোগী ও তপস্বী। লোকসাহিত্যে তিনি ভিক্ষুক, ভোলানাথ, উন্মাদ, দিগম্বর, আত্মবিস্মৃত ও শ্মশানবাসী। আবার তিনি রাজরাজেশ্বরী অভয়দাত্রী, বরদাত্রী দেবী অন্নপূর্ণার পতি। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে—উত্তরে-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে, আগমে, তন্ত্রে, সূত্রে ও প্রকরণে—সর্বত্র তাঁর অবাধ উপস্থিতি। বহুমুখী নানা পথ যেন এসে মিশে গেছে তাঁর তিনটি নয়নে। প্রাচীন অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু, প্রস্তরপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গো-পাসনা, কৌম সাধনার স্তর থেকে আজ পর্যন্ত নানা ভাবে শৈব-সাধনার ধারাটি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শঙ্করাচার্য তাঁকে লৌকিক দেবতারূপে যেমন কল্পনা করেছেন, তেমনি তাঁকে বৈদান্তিক ব্রহ্মত্বেও নিয়ে গেছেন। তিনি পরমাত্মা, তিনি অজ, তিনি শাশ্বত, তিনি কারণসমূহের কারণ, আদি-অন্তহীন, নির্গুণ ও নিরাকার। তাঁর মাধ্যমে বিশ্ব লয় হয়, বিশ্ব পালিত হয়। তাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, দেশ নেই, বেশ নেই, তিনি ত্রিমূর্তি, জ্যোতিষ্কসমূহের জ্যোতিঃ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়ঃ

> "আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া তিনি নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী, গঞ্জিকা ও ভাঙ ধুতুরায় উন্মত্ত। আর্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ এবং সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন; অন্যদিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। একদিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা; অন্যদিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকার ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।"[৩]

ব্রাত্যদের উপাস্য শিব আদিতে ছিলেন কর্ষণের অধিপতি। আর্যমনন শিবের কৃষকরূপ না মেনে তাঁকে ভিখারি করে তুলল এবং ঔপনিষদিক যতি-ধর্ম, বৈদান্তিক সন্ন্যাস ও বৌদ্ধ জৈন প্রভাব ভিক্ষুত্বের

১ Elements of Indian Iconography—Gopinath Rao, Vol. II, pp. 61-62

২ ঋগ্বেদ, ২।৩৩।৪

৩ রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৮শ খণ্ড (বিশ্বভারতী, ১৩৮৫), পৃঃ ৪৪৫

প্রতিভাসে ভিখারি শিবের নানা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিল। পরবর্তী কালে লোকসমাজে শিবের ভিখারি রূপটি যেমন বজায় রইল তেমনি তাঁর কৃষির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রূপটি উজ্জ্বলতা হারাল না। এই দুই রূপেই বাংলাদেশে শিবের উপস্থিতি ঘটেছে। স্বভাবতঃ ভিক্ষুক শিব এবং কৃষক শিবের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান রয়ে গেছে। ধর্মের সূত্রে অনাসক্ত বৈরাগ্য যারা বেছে নিয়েছে, ভিক্ষাচারকে যারা পবিত্র মনে করেছে, তারা ভিক্ষুক শিবকে আরাধনা করেছে। আর কঠিন বাস্তবতার মাঝে কর্মকে প্রাধান্য দিয়ে মাটির সঙ্গে পাঞ্জা কষে ফসল ফলিয়েছে যারা, তাদের সঙ্গে কৃষক শিবের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে। তাই আমরা একদিকে নাথ-পন্থী সাধকদের সাধনাকে প্রত্যক্ষ করেছি নাথ-সাহিত্যে, যোগীসিদ্ধ কথায় আবার শিবায়ন কাব্যে দেখেছি কৃষকরূপী শিবকে। কবি-চিত্তের যোগ ও প্রবণতা যেদিকে, তাঁর কাব্যে সেই জাতীয় শিবচিত্র অঙ্কিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কালে কালান্তরে ভিখারি শিব বাঙালী সমাজে হয়ে উঠলেন হাস্যরসের আধার, আর কৃষক শিব হলেন আদিরসের আধেয়। মধ্যযুগে বাঙালী কবিদের হাতে নিপুণ ছন্দে, সুললিত ভাষায় প্রকাশিত হলো দুই রসের ধারা। বিদ্যাপতির শৈবগীতিতেও শিবের এই দুই চিত্র ফুটে উঠেছে।

পৌরাণিক দেবতা শিব যখন লৌকিক দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন তখন তিনি বাঙালী জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। সেখানে তিনি প্রেমিক নন কামুক, কৃষক, ভিখারি, গাঁজাখোর, ঔদরিক, স্ত্রীর নিত্যগঞ্জনা সহ্য করেন, পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণ করতে পারেন না। বাঙালী কবিদের হাতে শিবের এই রূপ প্রত্যক্ষ করা গেল সমসাময়িক জীবনযাত্রারই প্রতিফলনে। লৌকিক শিবকে আমরা দেখি বিবাহের জন্য পাগল অথচ উদরপূরণের ক্ষমতা তাঁর নেই। কৌলিন্যপ্রথার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাত পরিবারের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বাভাবিক কারণে বার্ধক্যে তিনি কর্মে অপটু, শ্রমে বীতরাগ, মাদকে আসক্ত। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হওয়ায় কিছুটা স্ত্রৈণও।

বাংলাদেশে ভিখারি শিব-ভাবনার মূলে আছে পুরাণ। আর এই ভিখারি শিবের জনপ্রিয়তার মূলে আছে আজীবক ও নাথযোগীরা এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের ভিক্ষামুখিনতা। রাজসভার মাঝে যে শিবকাহিনী বর্ণিত হয়েছে, নাগরিক মানসিকতায় জুড়ে থেকেছে যে শিবমহিমা, তা এই ভিখারি শিবকে নিয়ে। রাজসভার বহু দূরে গ্রামীণ জীবনে শিবের যে রূপটি উজ্জ্বলতা পেয়েছে তা কৃষক শিবের। বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রমথ-প্রমথিনী কৃষি সংশ্লিষ্ট ; এদের আখ্যান, কৃষিকথা স্থানীয় লোক-সঙ্গীতের অন্যতম বিষয়। এইসব গানে কৃষক শিবের পরিচয় আছে বিস্তৃতভাবে। পশ্চিমবাংলার গাজন, গম্ভীরা, বোলাকী, বোলান, মাঘমণ্ডল, পৌষালী ; পূর্ববাংলার গাজী, বালা, হাঁওলী, কুলপাট, ভাদুলী ইত্যাদি গান এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

শিবের লৌকিক ছবিটি মঙ্গলকাব্যগুলিতে লোক-সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের লোকজীবনের সঙ্গে এই দুই ধারার সাহিত্যের বিশেষ সংযোগ প্রথম থেকে লক্ষ্য করা যায়। মনসা-মঙ্গলকাব্যে তাই দেখা যায় শিব সতীর দেহত্যাগে লুটিয়ে কাঁদেন। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে পার্বতীর দৃষ্টিতে শিবকে দেখি—"সিদ্ধিগুঁড়া খেয়ে বুড়া পড়ে রবে ঘরে। / তোর কি উচিত হয় ছেড়ে যেতে মোরে।" ভারতচন্দ্রের কাছে কালিদাসের কামজিৎ শিব কামুকরূপে চিহ্নিত হয়ে যান—

"শিহরিলা অঙ্গ ধ্যান হইল ভঙ্গ নয়ন মেলিলা হর
কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত নেহালেন
চারিপাশে।"

লোকসাহিত্যে, প্রবাদ-প্রবচনে, ছড়ায় আমরা শিবের লৌকিক রূপটি প্রত্যক্ষ করি। গাজনে, ব্রতকথায়, গম্ভীরা, বোলাকী, বোলান, মাঘমণ্ডল, পৌষালী, ভাদুলী প্রভৃতিতে শিবকে আমরা দেখেছি কোম চেতনায়, গৃহস্থালী কৃষিকর্মে, যেন কৃষক পরিবারের মানুষ ; কৃষক সমাজের সুখ-দুঃখ ; চাষবাসের কথায়, ব্যথায় অধীর। বাংলার লৌকিক শিবের মধ্যে নানা ধারা এসে মিশেছে। তিনি একাধারে 'তিননাথ' ও 'বুড়োশিব'। "এরই মধ্যে ঢুকে গেছেন ধর্মঠাকুর—স্থূলে শক্তির যেমন তিনি প্রতীক স্থূলে সিদ্ধির প্রতিও তাঁর আসক্তি—

'গুহ্যে সাধন, কায় সাধন চন্দ্র-সূর্য মেলন রক্তমাংস মজ্জায়।"[৪] বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজনের তিনি আরাধ্য দেবতা।

বাংলার লোকসমাজে শিবের কৃষিজীবী স্বরূপটি আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর মাধ্যমে বাংলার কৃষিকথা ও কৃষিগীতি পরস্পর মিলিত হয়েছে শিবগীতির মধ্যে তাই কৃষক শিবের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' তারই কাব্যরূপ। বিবাহ-উত্তর জীবনে সঞ্চিত খাদ্যশস্য যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন পার্বতী শিবকে বলেছে :

"চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন।"

এর উত্তরে শিব জানিয়েছেন—

"ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিঞ্চন পণে
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে।"

কৃষিকাজে নানা অন্তরায়। সেই অন্তরায় দূর করে কৃষিকাজে অংশ নিতে শিবের অনীহায় কাব্যরচনার সমকালীন কৃষিজনিত সংকটেরই প্রতিফলন ঘটেছে। কৃষিকাজ ছাড়া অন্য ব্যবসা করতে চান তিনি—

"চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি॥"

কিন্তু যে "পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল" তা শিবের ছিল না। তাই দেবীর কথায় তাঁকে চাষেই নামতে হলো। ইন্দ্রের কাছে জমির পাট্টা নিলেন। কুবের দিলেন বীজধান, শূল ভেঙে হাল হলো; বাঘ ও বৃষকে তাতে জুড়ে ভীমের সাহায্যে শিব দেবীচক দ্বীপে চাষ শুরু করলেন। মাঘের বৃষ্টিতে রোপণ করা হলো শস্য বৈশাখে দিল কাঁচ ধান। তাই দেখে উৎফুল্ল শিবের ছবিটি রামেশ্বর তুলে ধরেছেন এইভাবে—

"হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নবঘনশ্যাম॥
হাপুতের পুত যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখ্যা রাহিল পাসর্যা পরিজন॥"[৫]

রামেশ্বরের কাব্যে কৃষকরূপী শিবের বিস্তৃত বিবরণ আমরা পেয়েছি। শুধু চাষবাস, ফসল ফলানো নয়, কৃষিকাজের ফাঁকে শিবের কোচনী সংস্পর্শের বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে। কোচপলরা কৃষক, কোচনারীরাও চাষের কাজে স্বামীকে সাহায্য করে নানাভাবে। আঞ্চলিক স্তরে 'মহাকাল' হলেন কৃষিদেবতা। ঐ অঞ্চলে হুদুম, কাতি ও মদনপুজো এখানকার কৃষি-অনুষ্ঠান। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের খেতিপুজো, পাটপুজো এবং বর্ষাকালে হর-গৌরীর পুজো-অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রচলিত। এইসব কৃষিকৃত্য ও কৃষিকথার সঙ্গে শিব যুক্ত হয়ে গেছেন।[৬] কৃষক শিবের উদ্ভব, কৃষিজীবী মানুষজনের সঙ্গে শিবের ওতপ্রোত সম্পর্কের সূচনা নাকি কোচ কৃষকদের মাধ্যমে। এপ্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন :

"কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈব-ধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলার বহু দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমণীদিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক শিবের ছড়ায় কোচনী রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব মনে হয় কোচজাতীয় কৃষকদিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্বপ্রথম আসিয়া প্রবেশলাভ করেন; অতঃপর সেখানেই তাহার চরিত্র স্থানীয় কোচদিগের সামাজিক জীবনের উপাদানে মিশ্রিত হইয়া একটি স্থানীয় ও লৌকিক রূপ পরিগ্রহ করে; কালক্রমে তাহাই বাংলার সর্বত্র প্রচারলাভ করে। কিন্তু বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে তাহা প্রচারলাভ করিবার পরেও কোচ-সংস্রবের লোক-রুচিকর উপকরণগুলি কখনও তাহার মধ্য হইতে পরিত্যক্ত হয় নাই।"[৭]

কৃষক-শিবের উপস্থিতিতে ঘটেছে বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রান্তবাসী আদিম উপজাতি ওরাওঁদের

৪ শিবভাবনা—সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৯, পৃঃ ১১৩

৫ শিবায়ন—যোগীলাল হালদার সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃঃ ২১৬। শিবায়ন থেকে উদ্ধৃত অন্যান্য অংশগুলি এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে, পৃঃ ২১৬-৩৫০

৬ বাঙলা কাব্যে শিব—গুরুদাস ভট্টাচার্য, ১৩৮২, পৃঃ ১২০

৭ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৩৫৭, পৃঃ ৬৬-৬৭

সমাজেও। সংশ্লিষ্ট মানুষদের প্রধান উপ-জীবিকা কৃষিকাজ। বিভিন্ন ঋতুতে সেখানে যেসকল অনুষ্ঠান হয় তা সবই শস্যনির্ভর। কৃষির উৎপত্তি বিষয়ে তাদের যে আখ্যায়িকা আছে তার সঙ্গে রামেশ্বরের শিবায়নের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় অনেকাংশে। ওরাওঁদের উপপুরাণে বলা হয়েছে: ধর্মেশ পৃথিবীকে একবার দগ্ধ করলেন আবার দগ্ধ হেতু ধানের অভাবে কাতর হয়ে পড়লেন। পার্বতীর সাহায্যে তিনি আদিম নর-নারীকে পাটবীজ ও ধান দিলেন। তার ফলে পৃথিবী শস্যশালিনী হলো।[৮] রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যের শেষাংশে এই ঘটনার বিবরণ আছে:

"হুতি দ্রব্য যত পাল্য অনল প্রবল হল্য
বৃকোদর তাতে দিল ফুঁক।
আকাশ আচ্ছাদিল ধূমে ধান্য পোড়ে যত ক্রমে
দেখি ভীম হল মহামোহ॥"

দগ্ধ পৃথিবী আবার যাতে শস্যশালিনী হয়ে ওঠে সেজন্য শিব-পার্বতীর উদ্যোগের কথা রামেশ্বর জানিয়েছেন এইভাবে:

'শিবদুর্গা দৃষ্টিমাত্র তৃপ্ত হৈল বীতিহোত্র
মূর্তিমান হয়্যা দিল বর॥
এক শস্য দিল মোকে নানা শস্য দিব লোকে
দগ্ধ সে শীষ ভগবতী
বল্যা অগ্নি অন্তর্ধান দ্বিজ রামেশ্বর গান
যে যে শস্য জন্মিল তথি।[৯]

রামেশ্বরের শিবায়নে পার্বতী শিবকে কৃষিকাজের জন্য যে-কথাগুলি বলেছিলেন তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে বোঝা যাবে যে, তা ছিল আদেশ এবং নির্দেশ। কিন্তু 'শূন্যপুরাণ'-এ পার্বতী যা বলেছেন তা বিনীত আবেদন:

"আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরী কাঁদাও লইব ভুমু খানি।
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ॥
ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥[১০]

পার্বতীর আবেদনে সাড়া দিয়ে শিব চাষ করতে চললেন। মুগ, তিল, সরিষা, কার্পাস, ইক্ষু চাষের জন্য শিব সোনার লাঙল রূপার হাল নিয়ে মাঘ মাসে মাঠে উপস্থিত হলেন। শিব-শিবানীর মিলন-জাত 'কামদ ধান' থেকে হলো বীজ, হরিণের ছাল থেকে জাঁতা, সোনার কাস্তে গড়লেন বিশাই, ভীম এল ধান কাটতে, হনুমান রইল পাহারায়। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে শিব ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর আদেশে ভীম হিঙ্গুলী দেবীকে নিয়ে ধানে আগুন দিলেন। অবশেষে পার্বতীর অনুরোধে, ইন্দ্রের বর্ষণে ও শিবের স্পর্শে আগের ধান ফিরে এল। শিব আবার ধান বুনলেন; পৃথিবী হয়ে উঠল শস্যশালিনী। শিবায়নের এই কাহিনী শূন্যপুরাণেও পাওয়া গেল। গাজন-গম্ভীরা উৎসবের সময় শূন্যপুরাণের 'অথ চাষপালা'র গান গাওয়া হয়। এই উৎসব কৃষি উৎসব। এই উৎসবে সন্ন্যাসীরা কৃষক, লাঙল, বৃষ ইত্যাদি ভূমিকা সেজেগুজে চাষের অভিনয় করে।

পটুয়া সঙ্গীত, খণ্ডগীতি, প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ায় কৃষক শিবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ধান ভানতে শিবের গীত' আজও জনমানসে প্রচলিত। মুর্শিদাবাদের 'পৌষালি ছড়া'য় রাখালরা আজও বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গায়:

"সোনার লাঙ্গল রুপার থাল।
গাই বলদে জুড়েনু হাল॥
বোলো ভাই শিব্বো।
একসের চাল লোটা ভরি লিব্বো॥"

বাংলাদেশে কৃষক-দেবতারূপে শিবের আরো একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় শিব-অনুচরের উপস্থিতির মধ্যে। পুরাণে শিবানুচর নন্দী, মনসামঙ্গলে হনুমান, শিবায়নে ভীম। ভীম ও হনুমান দুই-ই পবননন্দন—কৃষির সহায়ক। উত্তর ভারতে হনুমান উর্বরতার দেবতা। মহাভারতের শক্তিশালী দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমও উর্বরতার দেবতারূপে উত্তরকালে পরিচিত হয়েছেন। মধ্যপ্রদেশে ভীমকে তাই নতুন

৮ The Oraons of Chhotonagpur—S. C. Roy, pp. 463-476

৯ শিবায়ন, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮

১০ শূন্যপুরাণ—ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৭৭, পৃঃ ১৭০

শস্য উৎসর্গ করা হয়। গোন্দরা ভীমকে বৃষ্টি-দেবতারূপে পূজা করে। চামরদের কাছে ভীম শস্য-রক্ষক।[১১]

এই ভীম শিবায়নে, শূন্যপুরাণে ও ধর্মমঙ্গলে শিবকে চাষের কাজে সহায়তা করেছে নানাভাবে। উর্বতার অধিপতি রূপে শিবানুচর ভীম ও হনুমান কৃষিকথা ও কৃষি উৎসবের মাধ্যমে বাংলাদেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায় ভীমের পূজা হয়, তাকে নিয়ে লোকসঙ্গীত রচিত হয় এবং গম্ভীরা ও পটুয়া সঙ্গীতে থাকে তার উজ্জ্বল ভূমিকা।

বাংলাদেশে কৃষক-দেবতারূপে শিবের লৌকিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙালী কর্ষণজীবী মানুষেরা তাদের শব্দহীন কান্না-হাসি, অপরিসীম দারিদ্র্য, কারুণ্য নিষিক্ত দৈনন্দিন জীবনচিত্র শিব ও পার্বতীর মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে তাই শিব ও পার্বতী কৃষক, কৃষক-রমণী রূপে উপস্থিত হয়েছেন। লৌকিক কাব্যে, সাহিত্যে, অনুষ্ঠানে কৃষক শিবের ভূমিকা আজও প্রধান। কৃষিকাজে ও উৎসবে তিনি অধিপতি। শস্য বপনে ও চয়নে তাঁর গান গাওয়া হয়। এভাবেই শিব বাংলাদেশের লোকমানসের, লোকজীবনের আপনজন হয়ে গেছেন। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে শিবের বর্ণনা, লোকসাহিত্যে, উৎসবে শিবের উপস্থিতি এবং শিবকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র কাব্য রচনা—এসবের মধ্যে শিবের সঙ্গে লোকজীবনের একাত্মতা অনুভব করা যায়। কৃষকজীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট (যার সম্পর্কে এই গবেষণার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে) নিরসনে, অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অনার্য যুগে ব্রাত্যপতি কৃষি-দেবতা শিবকে মধ্যযুগে বাংলাদেশের কৃষকেরা আপনজন করে নিয়েছে। অত্যাচার, অন্যায়, অস্বাভাবিক অবস্থার বিরুদ্ধে শিব সবসময় জাগ্রত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"মানুষের যিনি শিব
তিনি বিষপান করেন বিষকে কাটাবেন বলে।
'ভিক্ষা দাও', 'ভিক্ষা দাও' দ্বারে দ্বারে রব উঠল তাঁর কণ্ঠে—
সে মুষ্টিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা।
নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস
তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান।
দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ এখানে তিমিরবিনাশী শিবের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তার সাযুজ্য আমরা লক্ষ্য করি লোক-জীবনে তিমির বিনাশের জন্য কৃষকরূপী লৌকিক শিবরূপ কল্পনার মধ্যে।

পৌরাণিক পটভূমি এবং সার্বিকভাবে এদেশের লোকজীবনে শিবের উজ্জ্বল ভূমিকা নিরীক্ষণ করেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র অমোঘ নির্দেশ দিয়ে গেলেন সেকালে, উত্তরকালে এবং সর্বকালের মানুষদের কাছে। শৈশবে কামার-পুকুরে শিবের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে বিহ্বল হয়ে যাওয়া লোকজীবনে শিবের নৈকট্যকেই উন্মোচিত করে দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ লোক-জীবনে শিবের গুরুত্ব অনুভব করেই ঘোষণা করলেন ভারতীয় সভ্যতায় সর্বকালের আরাধ্য দেবতারূপেই শিব বিরাজ করবেন। কোন বিপন্নতাই তাঁকে টলাতে পারবে না। এই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের চেতনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে অন্ধকার থেকে আলোর আঙিনায় সব মানুষের উত্তরণের রাঙা পথটিতে দিশারী হবেন স্বয়ং শিব। তাই ১৮৯৪-এ মাদ্রাজবাসীদের তিনি লিখলেন ঃ "ঘর যদি অন্ধকার হয়, তবে সর্বদা 'অন্ধকার, অন্ধকার', বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্ধকার দূর হইবে না, বরং আলো আনো।...এস, আমরা বলিতে থাকি, 'আমরা সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, আর আমরাই ব্রহ্ম', 'শিবোঽহম্ শিবোঽহম্'—এই বলিয়া চলো—অগ্রসর হই। জড় নয়, চৈতন্যই আমাদের লক্ষ্য।"[১৩] স্বামীজীর কাছে শিব মানুষ-রূপেই আবির্ভূত, আবিষ্কৃত এবং স্বীকৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সেই শিক্ষাই উচ্চকণ্ঠে দিয়ে গেছেন। সেই শিক্ষাই লোকজীবনের সঙ্গে দেবতার সম্পর্কটিকে সর্বকালের জন্য প্রোথিত করে দিয়েছে।

১১ বাঙলা কাব্যে শিব—গুরুদাস ভট্টাচার্য, ১৯৭১, পৃঃ ১২২
১২ রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮), পৃঃ ১১২৪
১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড ১৩৬৯, পৃঃ ৪৬৪-৪৬৫

সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক : স্বামী নিরাময়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঠাকুর বলতেন, 'সাধু হবে কারা ?—না, তালগাছ থেকে হাত-পা ছেড়ে পড়তে পারবে যারা।' সাধু হওয়া কি সহজ কথা ? কতখানি সাহস চাই। এতখানি বুকে পাটা চাই, ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাঁর জন্য সর্বস্বত্যাগ—এইসব চাই।

সর্বদা মনে করবে, আমি ভাল হবো—ভাল হয়েছি। ঠাকুর বলতেন—নেই নেই করলে সাপের বিষও নেমে যায়।

এই আত্মবস্তুই একমাত্র আছে, আর কিছুই নেই। আত্মা থেকেই সব, আত্মাতেই সব। সবার ভেতর এই আত্মা, কোথাও বা সুপ্ত। তাকে জাগাতে হবে। নিয়ত সবাই চেষ্টা করছে আত্মাকে express (প্রকাশ) করবার। সেই চেষ্টাই সাধনা।

সেই আত্মা যখন অনুভূত হবে, তখন সর্বত্র তাঁর অস্তিত্ব বুঝতে পারবে। তাই হলো সিদ্ধি। এই অবস্থা লাভ করাই হলো উদ্দেশ্য। সকলকে এই অনুভূতি ফিরে পেতে হবে। কারণ, সেই হচ্ছে আমাদের স্বরূপ। মনে করো না আমি পারব না, আমি দুর্বল। গীতায় ভগবান বলেছেন—চিরকাল মনে রেখ সেই কথা যখনই বিষাদ আসবে :

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥'

অর্জুন ভেবেছিলেন : 'আমি পারব না। এ আমার দ্বারা হবে না। এইসব আত্মীয়-স্বজনদের দুঃখকষ্ট দেওয়ার চেয়ে মরণও ভাল। ভিক্ষে করে খাওয়াও ভাল।' ভগবান তাঁর সারথি, তাঁর গুরু, সখা—এসব কথা তিনি ভুলে গেছেন ; তিনি মায়ায় অভিভূত। তাই ভগবান তাঁকে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য উৎসাহিত করেছেন ; যুগে যুগে তিনি তো তাই করে আসছেন।

তাঁকে পাওয়া কি সোজা কথা? অবতার-পুরুষরা তো সাক্ষাৎ ভগবান। তাঁদেরই কত চেষ্টা তপস্যা-সাধনা করতে হয়, অন্য লোকের তো কথাই নেই। কোনও উপায় নেই, শুধু প্রাণভরে তাঁকে ডেকে যাওয়া ছাড়া। শুধু বলা—দেখা দাও, দেখা দাও। আমি আর কিছু চাই না, স্বর্গসুখও চাই না, শুধু তোমাকে চাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করতে হয়—প্রভু আমার ভোগবাসনা ঘুচিয়ে দাও।

স্বার্থপরতা সংকীর্ণতার মধ্যে আত্মোন্নতি অসম্ভব। সুখভোগের এতটুকু ইচ্ছা থাকলে হবে না। প্রভু, সুখ চাইব আমি কোন লজ্জায় ? তুমি যতবার দেহধারণ করে এসেছ, কখনো তো সুখ পাওনি, তুমি তো সবচেয়ে দুঃখের জীবন কাটিয়ে গেছ। রামরূপে রাজপুত্র হয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ বনবাসে কাটালে, বনবাস যদি ফুরুলো তো অত কাণ্ডের পর যে সীতার উদ্ধার হলো সেই সীতাকে হারালে। কৃষ্ণরূপে রাজার ছেলে—জন্ম নিলে কারাগৃহে। তারপর সারা শৈশব নিজের মায়ের দুধ থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হলে। গোয়ালার ঘরে মানুষ হলে। সারাজীবন শুধু যুদ্ধ আর দুষ্টদলন। কখনও শান্তি পেলে না ; জগতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলে, তবু সবাই তোমাকেই দায়ী করে, দোষী করে কুরুক্ষেত্রের অশান্তির জন্য। অভিশাপ তুমি মাথায় পেতে নিয়েছ। সিংহাসন নিয়ে খেলা করেছ, কখনও সিংহাসনে বসনি। নিজের চোখের সামনে আত্মীয়-স্বজনদের সবাইকে মরতে দেখেছ, আর অতর্কিতে ব্যাধশরে প্রাণ হারিয়েছ। বুদ্ধরূপে, খ্রীস্টরূপে সারাজীবন কত কষ্টই পেয়েছ। কতদিন শোবার জায়গা পর্যন্ত পাওনি। তারপর তোমার ঐ নতুনরূপে কত কষ্টই না করে গেলে শুধু জগৎকে দেখাবার জন্যে যে তোমার পূর্ব পূর্ব বিকাশ কোনটিই ভুল নয়, ধর্মজীবন দিবাস্বপ্ন নয়, ভোগ কখনও লক্ষ্য নয়।

দীনতার অবতার। উদ্ধত জগৎকে দীনতা শেখাতে এসেছিলেন। বাইরের কোন ঐশ্বর্য নেই। ফুলের মালী বলে ভুল করে এক বাবু তাঁর কাছে ফুল চেয়েছে। তিনি তখনি গিয়ে ফুল তুলে এনে দিয়েছেন। ঐরকম আর একবার চাকর ভেবে তাঁকে তামাক সাজতে বলেছিল। তিনি তখনি তামাক সেজে দিয়েছিলেন, কাঙালীদের এঁটো পরিষ্কার করেছেন। মেথরের পায়খানা সাফ করেছেন।

আমাদের কোনও উপায় নেই—শুধু নাম, আর অবিরত ঐ চিন্তা, ঐ ধ্যান। মন পরিষ্কার করার জন্য নিষ্কাম কর্ম—সেবাধর্ম।

শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন নামপ্রচারের জন্য বিশেষভাবে :

> 'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
> স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
> এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
> দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥'

—তোমার বহুনাম, সকলেতে সমান শক্তি। নিয়মিত স্মরণ করার কোন কিছু নেই, যখন খুশি করা যায়। প্রভু, তোমার এত দয়া, তবু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, অত নামের একটিতেও অনুরাগ হলো না।

শ্রীচৈতন্যদেব এই কথা বলছেন, অন্যে পরে কা কথা। অবতার-পুরুষেরা জীবের ভাবে কথা বলেন, ঐ ভাব আরোপ করে নিয়ে।

বর্তমান যুগধর্ম সকল যুগধর্মের সমন্বয়—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের। জ্ঞান চাই, ভক্তি চাই, কর্ম চাই। শুধু একটি হলে চলবে না—সব চাই, সব চাই। ঠাকুর-স্বামীজী পরিপূর্ণ আদর্শ। ঐ জ্বলন্ত আদর্শ জীবনের সামনে রেখে যেতে হবে।

ঐ ত্যাগ তপস্যা সাধনা—আবার ঐ প্রেম, সবার দুঃখে কাতরতা, দুঃখ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা—এই তো জীবন, এই তো উদ্দেশ্য। জীবনের প্রতি পদে ঐ আদর্শ মনে রেখে চলে যাও, তাহলেই সব হয়ে যাবে, নিশ্চয় হবে। আমরা তাঁর দূরে নই, পর নই; বলছি, তিনি বলেছেন—"হবে"।

মনে ময়লা রয়েছে, ধুয়ে ফেলতে হবে। সেই হচ্ছে সাধন। যেরকম surrounding-এ (পারিপার্শ্বিক অবস্থায়) থাকবে মনের ধারণা-বিশ্বাস সেই ভাবে গড়ে উঠবে। তাই তো সাধুসঙ্গ দরকার, যারা সবসময়ে অনুভব করছে, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'।

সাধু আর কি?—সতত যে তাঁর চিন্তা করছে, তাঁর ওপর সব নির্ভর, নিরভিমান, পবিত্র, স্বার্থশূন্য। 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'। আমরা কি কিছু করছি? আমরা কি কিছু করতে পারি? তিনি যে এইখানে (হৃদয় দেখাইয়া) আছেন, তিনিই করাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে, সত্যি বলছি—এ-অনুভব করছি—জীবনের প্রতি পদে। তাঁর ইচ্ছে—তাঁর কৃপা নইলে কার সাধ্য কিছু করে। প্রভু, 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'। এগুলি ঠাকুরের উচ্চারিত বাক্য, মহাবাক্য, জপ করলে সিদ্ধ হয়।

ত্যাগ করতেই হয়। কামকাঞ্চনত্যাগ। তারপর মনের সব সূক্ষ্ম বাসনাত্যাগ—নামযশের বাসনা, সব তারে বাড়া—আরো বাসনা আছে—সে-সবও ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগের সীমা নেই, তাই আনন্দেরও সীমা নেই। ত্যাগ থেকেই আনন্দ। যত ত্যাগ তত আনন্দ। আদর্শ চাই, ত্যাগের আদর্শ। তাই তিনি দেখাতে আসেন, যখন যেখানে যেমনটি দরকার। ত্যাগই মনুষ্যত্ব—দেবত্বের চেয়েও বড়। দেবতারাও মানুষের ত্যাগের অপেক্ষায় চেয়ে বসে থাকেন—যথা দধীচির দেহত্যাগ। অবতার পরিপূর্ণ আদর্শ। যে যতটুকু নিতে পারে তার ততটুকু। অনন্ত অগাধ সমুদ্র, ছোট ঘটি—যে যতটুকু ভরতে পারে। ঘটি ডুবে যাক—যাক না। ত্যাগ চাই। ভাল পেতে হলে মন্দ ত্যাগ—আবার মন্দ পেতে হলে ভাল ত্যাগ।

> সুখার্থী ন লভেদ্ বিদ্যাং
> বিদ্যার্থী ন লভেৎ সুখম্।
> সুখার্থী বা ত্যজেদ্ বিদ্যাং
> বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্ ॥

সুখভোগের বাসনা থাকলে কিছুই হবে না। বিচার কর—সংসারে প্রকৃত সুখ নেই। সুখের পরই দুঃখ। জন্ম জন্ম ধরে এই চলেছে, আর না। এবার unalloyed (খাঁটি) সুখের সন্ধানে যেতে হবে—যে সুখে ভেজাল নেই। ভেজাল খেয়ে খেয়ে প্রকৃত জিনিসের আস্বাদই ভুলে গেছে—আর তা হজম করার শক্তিও সব হারিয়ে ফেলেছে। সস্তায় ভেজাল পেলে আজকাল আর খাঁটি কেউই চায় না।

[ক্রমশঃ]

পরমপদকমলে

শয়নে স্বপনে জাগরণে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গৃহী কি সন্ন্যাসীর মতো সংসারে থাকতে পারে! গৃহী অথচ সন্ন্যাসী। নিশ্চয় পারে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তো সেইকারণেই এসেছিলেন। এসেছিলেন গৃহীকে পথ দেখাতে। মানুষ, বিশেষতঃ কলকাতার মানুষ সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত এক করুণা ছিল। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে যাওয়ার আগে, আমাদের ছেড়ে মহাপ্রয়াণে যাওয়ার আগে একটি অনুরোধ করেছিলেন : "দ্যাখো, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"

সংসারের কাম-ক্রোধাদি অন্ধকারে লোক না পোক! মতুয়ার বুদ্ধি নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। সকলেই ভাবছে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। মুলো খেয়ে মুলোর ঢেঁকুর তুলছে। ভাবছে, বেশ আছি। এই তো বেশ। সংসারার্ণবঘোরে লাট খাচ্ছে, শত শত জীব। হাসছে, কাঁদছে। দুঃখ, শোক, জরা, ব্যাধি। আত্মার অবমাননা। অষ্টপাশে বদ্ধ অহঙ্কারের পুঁটুলি। নিত্য ভুলে অনিত্য নিয়ে মাতামাতি। যখন বোঝা গেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ডাক এসে গেছে। বাঁশ পেকে গেছে। কাঁচা বাঁশই নোয়ানো যায়। পাকা বাঁশ ভেঙে যায় পটাশ করে। মাটির হাঁড়ি পুড়ে পাকা হয়ে গেলে নতুন আর কোনও আদল দেওয়া যায় না।

ঠাকুরের দৃষ্টি ছিল সবদিকে। সংসারী মানুষকে তিনি কড়া নজরে রেখেছিলেন, ছোট অহঙ্কারের কত রকমের প্রকাশ। মায়া জীবকে নিয়ে কেমন বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছেন। সেই দর্শনের পরেই অভিযোগ : স্ত্রী-পুত্রের জন্যে লোকে "একঘটি কাঁদে"। অথচ দারা-পুত্র-পরিবার, কেউ নয়, কে তোমার! প্রেয়সী! কে তোমার প্রেয়সী বাপু! মরে দেখো। ভূতের যদি জ্ঞানচক্ষু থাকে, তাহলে সে দেখতে পাবে, "সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে।" বড় ছেলে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসবে, বাবার ভূত ঘাড় না মটকায়। সেই স্ত্রী-পুত্রের জন্যে ঘটি ঘটি অশ্রু-বিসর্জন। দ্বিতীয় কান্নার বস্তু হলো টাকা। টাকার জন্যে লোকে "কেঁদে ভাসিয়ে দেয়"। যেন টাকাই জীবন। টাকায় মরণ-বাঁচন। পৃথিবীতে এলে কেন? না, টাকা কামাতে? ঠাকুরের প্রশ্ন, "টাকায় কি হয় বাপু?" নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, জ্ঞানচক্ষু খুলে দিচ্ছেন : "টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবানলাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার, বুঝেছ?"

বিষ্ঠাকে ঘৃণা করে মানুষ বললে : "তুই নীচ, অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য, দুর্গন্ধী আবর্জনা!"

বিষ্ঠা বললে : "প্রভু! তুমি যে আমার চেয়েও নীচ, নীচতম। তোমার সংস্পর্শেই আমার এই অবস্থা। আমি তো দুর্মূল্য, স্বাদু খাদ্যবস্তু ছিলুম। তোমার সংসর্গেই আমার এই হাল!' টাকায় আর বিষ্ঠায় তফাৎ কোথায়? যে-টাকা ঈশ্বরসেবায় ব্যয়িত হয় না, নিজের ভোগেই লাগে, সে অর্থ বর্জ্য-পদার্থের মতোই ঘৃণ্য। সঙ্গদোষে ব্রাত্য।

ঠাকুর বলছেন : "বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। বস্তুবিচার! এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র—এই সব আছে। এইসব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?"

তুলসীদাস আরও কড়া ভাষায় সাবধান করছেন ঃ

দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লহ চোষে।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে ॥

—দিনে যে মোহিনী, রাতে সেই বাঘিনী। মুহুর্মুহু রক্ত শোষণ করে। আর জগতের লোক কি করছে, উন্মত্ত হয়ে গৃহে গৃহে সেই বাঘিনীকে প্রতিপালন করছে।

মহিলারা হয় তো দুঃখ পাবেন। ভাববেন তাঁদের বুঝি ছোট করা হলো। তা নয়, এ হলো সাধনের কথা।* সাধন-জগতের কথা। নারীরাও জানেন তাঁদের কি সাংঘাতিক মোহিনীশক্তি। সংসারে যাঁরা মজে থাকতে চান, তাঁরা থাকুন না। কে বারণ করছে। ঠাকুরের সান্নিধ্যে এমন মানুষও এসেছিলেন, যিনি বন্ধুকে বলছেন, তুমি তাহলে এই ব্যাড়োর-ব্যাড়োর শোনো, আমার একটু কাজ আছে, ইম্পর্টান্ট বিজনেস, আমি যাই। এমন মানুষ দেখলেই ঠাকুর চিনতে পারতেন, আর বলতেন, "যাও যাও, রাসমণির বিল্ডিং-টিল্ডিং দ্যাখো, বাগান দেখ।" আর যাকে দেখে মনে হতো অন্বেষণ জেগেছে, তাকে কাছে ডেকে নিতেন। ঠাকুর তুলসীদাসের মতোই জানতেন ঃ

ওছে নরকি পেট্মে, রহে ন কোটি বাৎ।
আধ সের পাত্র মে, কৈসে সের সমাৎ ॥

—যে-ভাঁড়ে আধসের মাত্র ধরে, সে-ভাঁড়ে কদাচিৎ একসের ঢালা উচিত নয়, সেইরকম সামান্য অর্থাৎ বিষয়ী মানুষের উদরে ভাবভারপূর্ণ বাক্য কখনই স্থান পায় না।

অপাত্রে দান পণ্ডশ্রম। সব মহাপুরুষেরই এক বাণী; কারণ, সত্য এক, ঈশ্বর এক। জেন বৌদ্ধ-ধর্মের মহাপুরুষদেরও একই শিক্ষা—আর একটু বিস্তারিত। গল্পাকারে। যেমন,

এক অহঙ্কারী জেনারেল এসেছেন মঠাধ্যক্ষের কাছে। কোমর থেকে খাপসুদ্ধ তরোয়াল খুলে তাঁর টেবিলের ওপর ঠকাস করে রেখে চালিয়াতের মতো বললেন ঃ "শুনলুম মানুষকে খুব জ্ঞান-ট্যান দিচ্ছেন। সেই জ্ঞানে সব জীবনধারা বদলে যাচ্ছে, মানুষ শান্তি পাচ্ছে। তা দেখি, সেটা জ্ঞান না অজ্ঞান। আমাকে একটু ছাড়ুন তো।"

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই চ্যাটাং চ্যাটাং কথায় সামান্যতম উষ্ণ হলেন না।

তিনি বললেন ঃ "আপনি আমার অতিথি, দূর থেকে আসছেন, আগে এক কাপ চা খান"—এই বলে তিনি ভর্তি এক কাপ চা আনলেন। হাতে একটা কেটলি। ভর্তি কাপ জেনারেলের সামনে রেখে, সেই কাপেই কেটলি থেকে হুড় হুড় করে চা ঢালতে লাগলেন। কাপ উপচে চা পড়ল প্লেটে, প্লেট উপচে টেবিলে, টেবিল থেকে গড়িয়ে মেঝেতে।

জেনারেল তাঁর কাণ্ড দেখে বললেন ঃ "করছেন কি? আপনি পাগল? ভর্তি কাপে চা ধরে?" সন্ন্যাসী হেসে বললেন ঃ "আমি ঐ কথাই বলতে চাইছি তো! কাম এম্পটি। খালি কাপ হয়ে আসুন, তবেই তো আমি জ্ঞানের চা ঢালতে পারব। ইউ আর এ ফুল। অহঙ্কারে টইটম্বুর?"

তুলসীদাসজী বলছেন ঃ

যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহি,
যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম।
দোনো এক নাহি মিলে,
রবি রজনী এক ঠাম ॥

—যেখানে কাম সেখানে রাম নেই, যেখানে রাম সেখানে কাম নেই। রাম আর কাম এক জায়গায় থাকতে পারে না, যেমন দিন আর রাত। আলো থাকলে অন্ধকার থাকে না, অন্ধকার থাকলে আলো।

এত কথা এল এই কারণে, সংসার-মায়ায় যাঁরা মজে থাকতে চান থাকুন। তুলসীদাস এক কথায় ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন ঃ

শাকট সুকট কুকুরা, তিনকে মত এক।
কোটি ভাঁতি সমাঝও, তৌ ন ছোড়ে টেক্ ॥

—পাষণ্ড, শূকর, কুক্কুট এই তিনের মত এক। কোটি কোটি সদুপদেশ নম্র প্রিয়বাক্য যতই বর্ষণ কর, কিছুতেই নিজের জেদ ছাড়বে না?

কিন্তু যাঁরা তাঁকে চান, ঠাকুরকে চান, তাঁদের প্রথম প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধির। ঠাকুর স্পষ্ট করে বললেন ঃ "চিত্তশুদ্ধি না হলে হয় না। কামিনী-

* রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-অনুসারে 'কামিনী' 'কাম'কে বুঝতে হবে, 'নারী'কে নয়।—যুগ্ম সম্পাদক

কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বক টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বক টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়।"

দেহশুদ্ধি আর চিত্তশুদ্ধি, দুটি বড় কথা। দেহশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মচর্যের, আর চিত্তশুদ্ধির জন্যে প্রয়োজন নির্মল চিন্তার। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, "ঠাকুর, কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের ওপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।"

কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, পথ তো সেই এক 'রয়্যাল রোড'। দেহ আর মনে বিশুদ্ধ হও। আর কী? মনে, বনে, কোণে। কারোকে দেখাবার প্রয়োজন নেই, হাঁক-ডাক করার প্রয়োজন নেই, তুমি আছ, 'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম।' আর কী? আবার তুলসীজীকে স্মরণ করি:

এক ঘড়ি আধি ঘড়ি, আধি হুমে আধ্।
তুলসী সঙ্গত সন্তকি, হরে কোটি অপরাধ॥

—এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা, এমনকি আধেরও আধ ঘণ্টা যদি সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহলে সেই সাধুসঙ্গ কোটি অপরাধ হরণ করে।

ঠাকুর বলছেন: "দেখ! ঈশ্বরকে দেখা যায়। অবাঙ্মনসোগোচর বেদে বলেছে। এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। বৈষ্ণবচরণ বলত, তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। তাই সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ এই সব প্রয়োজন। তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। তবে তাঁর দর্শন হয়। ঘোলা জলে নির্মলি ফেললে পরিষ্কার হয়, তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আরশিতে ও মুখ দেখা যায় না।"

স্বামীজী বলছেন: "তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে।" স্বামীজী বলছেন: "যদি দেহমন শুদ্ধ না হয় তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজো করা বৃথা।"

তুলসীদাস বলছেন:

তুলসী পিঁদনে হরি মেলেতো,
মেয় পেঁদে কুঁদা আউর ঝাড়।
পাথর পূজনে হর মেলেতো
ময়ু পূজে পাহাড়॥

—তুলসীর মালা গলায় ধারণ করলেই সাক্ষাৎ হরিদর্শন। তাহলে আমি তুলসীগাছের একটা মোটা গুঁড়ি গলায় ঝুলিয়ে বসে থাকি। আর পাথর কেন, গোটা একটা পাহাড় পুজো করি—শিলার বদলে পর্বত।

ঠাকুর বলছেন, ও হে! ঘাবড়াও মাত্! গৃহীও পাবে, অবশ্যই পাবে। যদি ইচ্ছা থাকে। প্রবল ইচ্ছা। 'তিন টান' এক করতে হবে। "মনই সব জানবে। জ্ঞানই বলো আর অজ্ঞানই বলো, সবই মনের অবস্থা। মানুষ মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত, মনেই সাধু এবং মনেই অসাধু। মনেই পাপী ও মনেই পুণ্যবান। সংসারী জীব মনেতে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ-মনন করতে পারলে তাদের আর অন্য কোনও সাধনের দরকার হয় না।"

মনই সব। ঠাকুর বলছেন, মন আর মুখ এক কর। তিনি মন দেখেন। তুলসীদাসের কি সুন্দর দর্শন! একেবারে ঠাকুর! তুলসীদাসজী বলছেন:

রাম ঝরোখে বয়েঠ কর, সবকো মুজরা লে
জ্যায়সা যাকে চাকুরি, অ্যায়সা উকো দে॥

—ভগবান শ্রীরাম জগদ্রূপ গৃহের উচ্চ বাতায়নে বসে আছেন। দেখছেন জগতের লোক কে কি করছে। অহর্নিশ দেখছেন। আর কি করছেন? যার যেমন কাজ তাকে সেইরকম পুরস্কার দিচ্ছেন।

ঠাকুর বলছেন: সংসারে আছ। থাকো। প্রারব্ধ তোমার ক্ষয় কর। মনে রেখ, "নিষ্কাম-কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।"

পরিক্রমা

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রাধিকাদাস বাবাজী ও অমিতানন্দের কাছে যেসব কথা শুনেছি সেসব কথাই ভাবছিলাম বসে বসে। ভাবতে ভাবতে অনেক সময় কেটে গেছে। এর মধ্যে আবার গোস্বামীজী এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঐ রেলিং-এর পাশে, যাতে খুব কাছ থেকে শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয়।

তিনি বললেন: "এ বিগ্রহে এক দেহেই দুই মূর্তির কল্পনা করে শৃঙ্গার করা হয়। হরিদাস স্বামীর 'ইচ্ছা-বিগ্রহ' ইনি। নিধুবনে প্রকট হওয়ার কালে তাঁর ইচ্ছায় রাধাকৃষ্ণ দুই পৃথক তনু এক হয়ে গিয়েছিলেন। সেইজন্য দেখুন এঁর সাজ-পোশাক কেমন। ঐ অপরূপ ত্রিভঙ্গ মূর্তিকে প্রথমে পায়জামা পরানো হয়, তার ওপরে ঘাগরা। বুকে প্রথমে চোলি তার ওপরে জামা। মাথায় জরি দেওয়া বেণী বাঁদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তার ওপর ডানদিকে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট। বাঁদিকে ছোট টায়রা আর একটি ছোট মুকুট, নাকে হীরের বেশর সব সময় ঝকমক করছে—রাধা-কৃষ্ণের বেশ একই শরীরে। হাতে কিন্তু বেণু নেই। এটিও এই বিগ্রহের আর একটি বিশেষত্ব। ইনি বছরে একদিন মাত্র মুরলীধারী হন। আর সেই দিনে হয় মদনমোহনের রাজবেশ। ভুবন ভোলানো সেই মূর্তির মাথায় বিরাট মুকুট, কানে মকরকুণ্ডল, কোমরে কোমরবন্ধনী, হাতে বংশী। সেদিনটি হলো আশ্বিনের কোজাগরী পূর্ণিমা। এখানে ঐদিনকেই আমরা শরৎ-পূর্ণিমা বলি, এই দিনই এখানে রাসোৎসব হয়। বাংলাদেশের কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমা এখানে হয় না। এখানে যদিও নিত্যরাস, তবুও ঐ কোজাগরী পূর্ণিমার দিনটিতেই 'মহারাস' উৎসব পালন করা হয়। সেদিন সমস্ত বৃন্দাবন আনন্দে মেতে ওঠে।"

শ্রীকিশোরলাল ও শ্রীজীর রাসোৎসব মূর্তি স্মরণ করতেই আমার মনে পড়ে শ্রীরূপ গোস্বামীজীর 'বিদগ্ধ-মাধব'-এর কথা:

"ধৃতকনকসুগৌরস্নিগ্ধ-মেঘৌঘনীল-
চ্ছবিভিরখিল-বৃন্দারণ্যমুদ্ভাসয়ন্তৌ।
মৃদুলনবদুকূলে নীলপীতে বসানৌ॥
স্মর নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।
কনকমুকুটচূড়ৌ পুষ্পিতোদ্ভূষিতাঙ্গৌ॥
সকলবন-নিবাসৌ সুন্দরানন্দপুঞ্জৌ।
চরণকমলদিব্যৌ দেবদেবাদিসেব্যৌ॥
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।
আগম-নিগমসারৌ সৃষ্টিসংহারকারৌ॥
বয়সি নবকিশোরৌ নিত্যবৃন্দাবনস্থৌ।
শমনভয়বিনাশৌ পাপিনস্তারয়ন্তৌ॥
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।"

কি অপূর্ব বর্ণনা করেছেন সাধক-চূড়ামণি শ্রীরূপ গোস্বামী এই যুগল বিগ্রহের। গোস্বামীজীকে শ্লোকটি শোনাতেই তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তিনি বাঙলা বোঝেন, কারণ হাওড়ার লিলুয়াতেই তাঁর বর্তমান আবাস। শুধু সেবার পালার সময় বৃন্দাবনে আসেন। সেখানে একটি কলেজের হিন্দীর অধ্যাপনা করেন। আমার এই মন্দির ও বিগ্রহ সম্পর্কে আগ্রহ দেখে তিনি তাই খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাকে সব দেখাবার শোনাবার চেষ্টা করছেন .

বিগ্রহের সারাদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তিনি জানালেন: "মন্দির খুলে মঙ্গলারাত্রিক হয় বেলা নয়টা-সাড়ে নয়টায়। তারপরে হয় শৃঙ্গার। এই শৃঙ্গারের জন্য লাগে চব্বিশ গজ কাপড়, রাধাকৃষ্ণ দুই শরীর একত্রে ভেবে সেই মতো সাজিয়ে দেওয়া হয় নানা রত্নালঙ্কারে। তারপর হয় শৃঙ্গার-ভোগ।

ভোগ হয় দিনে চারবার। প্রথম ভোগ হয় বেলা সাড়ে নয়টা-দশটায়, তারপর সাড়ে এগারোটা-বারোটায়। এর নাম রাজভোগ, তার পরে বিকেল সাড়ে পাঁচটা-ছয়টায় হয় উত্থাপন-ভোগ, শেষে রাত্রি সাড়ে আটটা-নয়টায় হয় শৃঙ্গার-ভোগ। এইসব ভোগের মধ্যে 'গোবি' দেওয়া হয় না—'গো' শব্দ আছে বলে। তরমুজ চলে না লাল রঙ বলে। কুল দিলে তার বীজ ফেলে দিয়ে তার মধ্যে খোয়া পুরে দেওয়া হয়। টমাটো চলে না লাল বলে। রাত্রে ভোগে ভাত রুটি ডাল বাদ, তিন-চার রকমের পুরি, কচুড়ি, মিষ্টি এইসব দেওয়া হয়। শৃঙ্গার-বেশ পরিবর্তন দিনে দুবার হয়। সকালে একবার আর বিকালে বিশ্রামের পরে আর একবার। শৃঙ্গারের আগে হাতে পায়ে মুখে আতর লাগিয়ে দেওয়া হয়। পায়ের কাছে তুলোয় আতর রাখা হয়। শৃঙ্গার-বেশের পর ঠাকুরকে বড় আয়না দেখানো হয়, ঠিক মতো শৃঙ্গার-বেশ হলো কিনা তা দেখার জন্য। ভোগের পরেও মাঝে মাঝে কেশর খয়ের দেওয়া পান সাজিয়ে রাখা হয় তাঁর সেবার জন্য। বিগ্রহকে একটু বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখা হয় যাতে রাধারানীর প্রতীকটি তিনি দেখতে পান।

বিহারীজীর ভোগে দইবড়া প্রতিদিন দেওয়া হয়। এটি তাঁর প্রিয় খাদ্য। এনিয়ে একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। তিনি কোন এক সময় ছোট ছেলের রূপ ধরে কাছাকাছি এক দোকানে হাতের বালা বন্ধক রেখে দই-বড়া কিনে খেয়ে এসেছিলেন। পরদিন তাঁর সেবকেরা শৃঙ্গারের সময় এসে একটি বালা কম দেখেন ও হৈচৈ পড়ে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, প্রতিবেশী দোকানদার জানায়, কাল রাত্রে দোকান বন্ধ করার সময় একটি ছোট ছেলে এসে হাতের বালা বন্ধক দিয়ে তার দোকান থেকে দইবড়া খেয়ে গিয়েছে। দুই আর দুইয়ে চার। বোঝা গেল শ্রীমান বিহারীলালেরই এই কাজ। সেই থেকে সেই দোকানদারই দইবড়া দিয়ে এসেছেন মন্দিরে। বর্তমানে আর সেই দোকান থেকে নেওয়া হয় না, আলাদা তৈরি করা হয়। রাত্রে শয়নের সময় সব সাজ-পোশাক খুলে শুধু কোপীন পরিয়ে দেওয়া হয়। তার পরে চলে আতর মালিশ। এক তোলা আতর নিত্য লাগে; শয়নের সময় দুটো বালিশ মাথায়, দুটো করে চারটে বালিশ দুই পাশে আর একটা বালিশ পায়ে দিয়ে, ঐ 'রাধা শিলাটি'কে বুকের ওপরে রেখে দেওয়া হয়, আর স্বামীজীর পটটি পায়ের কাছে রাখা হয়, যেন তিনি এই যুগল মূর্তির চরণসেবা করছেন। শীতে লেপ ও গ্রীষ্ম কালে গায়ে চাদর ঢাকা দেওয়া হয়। আর ঐ কোপীন জোড়া, যখন সেবাইৎদের পালা বদল হয় তখন তাঁরা নিয়ে যান। তাঁদের গলায় সেটা বেঁধে রাখেন। ভিতরে যখন শয়ন চলে বাইরে তখন ব্রজবাসী ভক্তেরা হাততালি দিয়ে গান করেন মন্দির পরিক্রমা করতে করতে, 'কুঞ্জ পধারো রাধে রাস লিয়ে'। অর্থাৎ এবার রাসের সময় হলো। হে রাধে, তুমি তোমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে নিয়ে এবার রাসে চলো। তারপরই মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। এই মন্দির মাত্র একদিনই সারা রাত্রি খোলা থাকে—জন্মাষ্টমীর দিন, সেদিন ভাগবত পাঠ ও পুজাদি হয়ে ভোর চারটায় মঙ্গলারাত্রিক হয়। বছরে ঐ একদিনই শেষরাত্রে মঙ্গলারাত্রিক হয়।"

এই কথা বলতে বলতেই রাত্রে শয়নের সময় হয়ে আসে। গোস্বামীজী চলে যান ভিতরে। আমরাও বেড়িয়ে এসে মন্দির পরিক্রমায় অংশ নিই। সমস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে দিই 'কুঞ্জ পধারো রাধে রাস লিয়ে'—। কানের কাছে মুখ এনে অমিতানন্দ গাঢ় স্বরে বলে ঃ "দাদা, 'কৃষ্ণ' নাম সত্যিই আমাকে পাগল করেছে।" বলেই আবৃত্তি করে—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং
বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

—"'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি যে কি অমৃত থেকে সৃষ্টি হয়েছে জানি না আহা। যখন এরা আমার জিহ্বায় নৃত্য করে তখন বহু বদন প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, আবার যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অর্বুদকর্ণ পাওয়ার ইচ্ছা জন্মায়। আর যখন চিত্ত-

প্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে আবিভূর্ত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়।"

কথা বন্ধ হয়ে যায় শ্রীমানের। সে আমায় আশ্রমে পেঁছে দিয়ে চলে যায় তার ডেরায়। সে-রাত আমার ঐ 'কৃষ্ণ' নামের অপরূপ পদলালিত্যের চিন্তায় কেটে যায় পরমানন্দে। আবার সেই পরিক্রমার পথে এনে হাজির করল শ্রীমান অমিতানন্দ। 'ধীর সমীর' ধরে বালির ওপর দুহাত তুলে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে সে। বাঁয়ে যমুনাও নৃত্য-ছন্দে এগিয়ে চলেছে। কদিন ধরে বর্ষা শুরু হয়েছে। যমুনার রং বদলেছে—নীল যমুনা এখন চন্দনবর্ণা। আকাশ কিন্তু কালো—সমস্ত বৃন্দারণ্য জুড়ে আনন্দ উৎসবের প্রস্তুতি। সামনেই ঝুলন। একমাস বৃন্দাবনের মানুষ মেতে থাকবে উৎসবে—জন্মাষ্টমী পর্যন্ত। আমার ব্রহ্মচারী বাবাজী কিন্তু কেন জানি না উতলা হয়ে উঠেছে। এই ভিড় সে সহ্য করতে পারছে না, তাই চলে এসেছে যমুনার পাড়ে। এবার বোধ হয় সে এখানকার আসন তুলবে। কদিন থেকেই সে ঘুরঘুর করছে আমার পাশে-পাশে কিছু বলবার জন্য। আমার সঙ্গে দু-তিনজন সাধু থাকায় সে সুযোগ পায়নি। আজ একেবারে সেবাশ্রম থেকেই ধরে এনেছে, আর রাধাবাগের পাশ দিয়ে সোজা চলে এসেছে এখানে। আজও কাঁধে তার একটা ঝোলা। পানিঘাট পার হয়ে শ্মশানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

যমুনার জল বাড়তে বাড়তে বালিয়ারি ডুবে গিয়েছে। জল একেবারে সবুজ ঘাসের জমি স্পর্শ করেছে। আমার দুহাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসলো সেই সবুজ ঘাসের ওপর। পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যমুনা—একটু জল মাথায় ছুঁইয়ে সে বলল: "দাদা, সেই নচিকেতা তালের পথে আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখনকার সেই বিচিত্র বেশের কথা আপনার স্মরণে আছে তো। এবারে বৃন্দাবনে এসে প্রথম দিনের দেখাতেই আমাকে সেই প্রশ্নই করেছিলেন—আজ সেই কথাই বলছি—অমরকণ্টকে পরিব্রাজক অবস্থায় আমি সব ছেড়ে দিয়েছিলাম। এক ভীল ডাকাত আমার জামা-কাপড় নিয়ে নেয়, শুধু কোপীনটুকু রেখে দিয়ে। আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কিছু পরবো না। যতদিন না আমার অন্তরের শান্তি ফিরে আসে, আমার মন যাকে চায় তাঁর দর্শন না হয়, ততদিন আমি এইভাবেই ঘুরবো। তিনি যখন নিজেই এই বেশে সাজিয়ে দিয়েছেন, তখন এই ভাল।

"এইভাবে ঘুরতে ঘুরতেই উত্তরকাশীতে হাজির হয়েছিলাম। মধ্যপ্রদেশ থেকে এই হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত অযাচিতভাবে—কেউ চাদর দিয়েছে, কেউ কম্বল দিয়েছে, কাপড় দিয়েছে। আমি কিছুক্ষণ ব্যবহার করেছি। পরদিনই কোন দরিদ্র রুগ্নকে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে দিয়ে দিয়েছি। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিলাম এই ব্রজভূমিতে। এখানে এসে এই কৌপীন পরেই একদিন যমুনার ধারে একলা বসেছিলাম—প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়—শীতও বেশ লাগছিল। সন্ধ্যার মুখোমুখি হঠাৎ দেখলাম, এক ব্রজবাসিনী নারী ধীরে ধীরে আমার পিছন থেকে এসে যমুনার দিকে এগিয়ে গেলেন। নীল শাড়িপরা সেই মূর্তি, একটু পরেই কালিন্দীর পার থেকে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে বললেন: 'মেরে লাল, মেরে প্যার, তুম্ কিউ নাঙ্গা হো কর্ হিঁয়া বৈঠা হ্যায়, জানতা নেহি ইয়ে উনকা বিহারক্ষেত্র—ইধর অ্যায়সা বৈঠনা ঠিক নেহি হ্যায়।' আমি বিস্মিত হলেও কোন জবাব না দিয়ে চুপ করেই বসে থাকলাম। সন্ধ্যাবেলায় মহিলার সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল না। বুঝতে পারছিলাম না, কি মতলবে ইনি এসেছেন। কোন কুমতলব নাকি। আমার কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে আরও কাছে এসে বললেন: 'ফিকর মৎ করো লাল, এ লো কাপড়া—পিন্ধলো—যাও যমুনা মে নাহা কর্ আপকা বদন সাফ করো, বাদ সে হিঁয়া ছত্র হ্যায়, প্রসাদী লে লো।' এবার খেয়াল হলো কে ইনি, কেন এত আগ্রহ আমার জন্য, কোন উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি বললেন: 'ঠ্যারো, ম্যায় বাত্তি ভেজ দেতি হুঁ।' বলেই তিনি পিছন দিকে চলে গেলেন। তখন অন্ধকার বেশ নেমে এসেছে। কিন্তু কই তিনি তো আলো নিয়ে ফিরে এলেন না। তবে দূরে একটি আলো এগিয়ে আসতে দেখলাম, যিনি এলেন তিনি একজন বাবাজী, তাঁর কুঠিয়া থেকে যমুনার ধারে জঙ্গলে আসছেন,

লোটা হাতে বৈকালিক কৃত্য সারতে। তাঁকে প্রশ্ন করলাম ঃ 'কোন মহিলাকে কি এই পথে যেতে দেখেছেন? আমার এখানে বসে থাকার কথা কি তিনি আপনাকে বলেছেন?' তারপর আমার মুখে সব শুনে বাবাজী আমারই চরণে সাষ্টাঙ্গে পড়ে বললেন ঃ 'কি করলেন ভাই—বুঝতে পারছেন না কি ঘটেছে —কে এসেছিলেন? তাঁর লালার দুঃখ দেখে বৃন্দাবনের অধীশ্বরী স্বয়ং এসে এই বহির্বাস দিয়ে গেছেন—কত জন্মের তপস্যার ফলে আপনার এই বস্তু লাভ হলো। চলুন ভাই এই কাপড় মাথায় নিয়ে—আমার কুঠিয়ায় থাকবেন যতদিন খুশি।' বিস্ময়ে হতবাক আমি রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই দেবীর চিন্তা করতে করতে ফিরে গেলাম সেই বাবাজীর কুঠিয়ায়। এই আমার মাথায় পাগড়ী আর গলায় চাদর সেই কাপড়ের টুকরা দিয়ে। তারপর থেকে দুবছর এখানে নিত্য পরিক্রমা করছি তাঁর নির্দেশমত নগ্নবেশ পরিত্যাগ করে। কিন্তু আর তো তাঁকে দেখতে পাই না। কবে তাঁকে পাবো সেই বৃন্দাবন-বিহারিণী রাধারানীকে, কবে তিনি কৃপা করে আমাকে হদিস দেবেন সেই কুঞ্জ গলির, যেখানে শ্রীবৃন্দাবন বিহারীলালের নিত্য অধিষ্ঠান। —'সে কানু কেন গো দূর এত দূরে!' বলুন দাদা কবে পাবো তাঁর কৃপা।"

ছোট্ট ছেলের মতো আকুল হয়ে অমিতানন্দ ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলল ঐ গানের একটাই কলি বলতে বলতে। তার এই ভাবান্তর দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কি অদ্ভুত পরিবর্তন! কতখানি ব্যাকুলতা থাকলে এই ভাব হয়! নচিকেতাতালের সেই নাগাসন্ন্যাসীর আজ এ কি রূপ! আমি চুপ করেই থাকলাম। আর বলবারই বা কি আছে—এ তো শুধু দেখবার, শুনবার, ধ্যান করবার বিষয়। ভগবানের জন্য ভক্তের এই আর্তি আমাকেও বিহ্বল করে তুলল। স্থির হয়ে শুধু চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে তখনও বলে চলেছে ঃ "মহাশক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধার কৃপা ছাড়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্ভব নয়। আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছি —'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—তিনি কৃপা করে দ্বার ছেড়ে না দিলে আমার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শন হবে না দাদা—তাই তাঁর কৃপার ভিখারি হয়ে তাঁর আবির্ভাবভূমি বর্ষাণা যাওয়ার সংকল্প করেছি। আজই বৃন্দাবন ছেড়ে যাব—আর যাওয়ার পথে রাধাকুণ্ডে যাব—যদি সেখানে মন বসে যায়—তাহলে সেখানেই স্থির হয়ে থাকব। ঘোরাঘুরি আর নয়, আমি বুঝেছি, 'অনাদিরূপী গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্‌' যিনি তিনিই 'পরম-কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ'। তাঁকে চাই, আমারই স্বরূপ তিনি, আমিই তিনি। আমার কৃষ্ণকে পাওয়ার চাবিকাঠি যাঁর হাতে তাঁর চরণের নূপুর-ধ্বনি আমি শুনেছি। শ্রীবিহারীজীর মন্দিরে সে-শব্দ তো আপনিও শুনেছেন। সেই রুনুঝুনু শব্দে আমি পাগল হয়েছি। আজ বিদায় দিন দাদা। জানি না আর কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হবে কিনা —শুধু আশীর্বাদ করুন যেন আমার তৃষ্ণা মেটে—'সর্ব অঙ্গ মোর কানু ক্ষুধাতুর—সে কানু কেন গো দূর এতদূর'।"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অমিতানন্দ। দুচোখে অবিরল অশ্রুধারা। আমায় ছেড়ে, সে দুটি হাত সামনে ছড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো ঐ পরিক্রমার পথ বেয়ে দক্ষিণ দিকে। যমুনার ধার ধরে অপসৃয়-মান সেই সাদা কাপড়ের চিহ্ন অন্ধকারে ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়ে আসছে··· কিন্তু কণ্ঠস্বর তখনও কানে ভেসে আসছে—সে গেয়ে চলেছে ঃ

"দেখেছি রূপসাগরে অরূপরতন কাঁচা সোনা
তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়েও
আর পেলাম না।
ও তারে চেয়ে চেয়ে, ঘুরছি আমি পাগল হয়ে
মরমে জ্বলছে আগুন আর নেভে না···
পথিক, তুমি ভেবো নারে—ডুবে যাও রূপসাগরে
ডুবিলে পাবে তারে—আর ভেবো না—
ওগো এবার, ধরতে পেলে মনের মানুষ
ছেড়ে যেতে আর দিও না।"

[ক্রমশঃ]

প্রবন্ধ

স্বামীজীর গুরুভক্তির একটি দিক

গোরাচাঁদ কুণ্ডু

বিবেকানন্দ-জীবনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্বামীজী ছিলেন প্রধানতঃ মৌন অথবা স্বল্পবাক্। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আপনজন ছাড়া কারুর কাছে সহজে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ তিনি তুলতে চাইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে সমাগত সকলেই জানতেন ঠাকুর তাঁর এই "রাঙা চক্ষু রুই", এই "সহস্রদল পদ্ম" বা এই "তিড়িং মিড়িং লাফানো গরু"-টিকে কী সমাদরই না করতেন। তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপী 'উন্মদ প্রেম-পাথার' বেলাভূমির সীমাবন্ধন উল্লঙ্ঘন করে কিভাবে বারবার তাঁর নরেনকে আলিঙ্গন করতে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধানে উপবিষ্ট এই অচল অটল যুবক-শিষ্যের কথায় বা আচরণে বাহ্যতঃ গুরুর প্রতি ভক্তির কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। পরবর্তী কালেও দেখা যায় স্বামীজী বহু জায়গায় বহুবার বহুভাবে বুদ্ধের কথা বলেছেন, কৃষ্ণের কথা বলেছেন, চৈতন্য, যীশু এবং শঙ্করের কথাও বলেছেন। যাঁর কথা সবথেকে কম বলেছেন তিনি তাঁরই গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু গুরুভাইরা এবং একান্ত ঘনিষ্ঠ-জনেরা জানতেন নরেনের মনের কথা। তাঁরাই শুধু বুঝতেন গুরুর প্রতি হৃদয়পোষিত আসল ভাবটি নরেন কিভাবে কতখানি গোপন করে রেখেছেন।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের এক শীতের দিনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ রচয়িতা স্বামী সারদানন্দ গিয়েছিলেন শিমুলিয়া পল্লীতে নরেন্দ্রনাথের বাসভবনে। সঙ্গে ছিলেন শশী মহারাজ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। নরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে তখন এঁরা এক দিব্য প্রেমপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিভৃতে রামকৃষ্ণ-কথা আলাপনই হয়তো ছিল এই সাক্ষাতের মুখ্য উদ্দেশ্য। নরেন সেদিন আপন গৃহে প্রাণাধিক প্রিয় গুরুভাইদের পেয়ে গৃহদ্বার যেমন খুলে দিয়েছিলেন, তেমনি আনন্দাবেশে আপন হৃদয়দুয়ারও অর্গলমুক্ত করে দিয়েছিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের কিছু আগে থেকে শুরু হলো রামকৃষ্ণ-কথা—চলল একটানা রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত। "ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যানুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে" —হৃদয়ের আবরণ উন্মোচন করে সেই অনুচ্চারিত গূহ্য কথা বলতে বলতে নরেন সেদিন একেবারে আত্মহারা।[১] গুরুভাইদের সাথে রামকৃষ্ণ-কথালাপ-কালে স্বামীজীর প্রাণের মধ্যে যে রূপান্তর ঘটত, তিনি নিজে যেমনটি হয়ে যেতেন, বিরল ভাগ্যের অধিকারী কেউ কেউ তা দেখেছেন। সে-দৃশ্য দর্শনীয়, বর্ণনীয় নয়। আমরা এখানে বিস্ময়-বিমুগ্ধ মহাকবি গিরিশের কথা অনুধ্যান করে শুধু এইটুকুমাত্র বুঝতে পারি যে, হৃদয় ভাবে উৎফুল্ল বিবেকানন্দের সেই মুখকান্তি কোন প্রবন্ধে ফুটবে না, তাঁর জগৎ-মুগ্ধকারী সেই কণ্ঠস্বর কোন কালির আঁচড়ে ধ্বনিত হবার নয় অথবা প্রতি কথায় গুরুর প্রতি তাঁর যে অচলা ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হতো তা কদাচ কোন পাঠকের হৃদয়তীরে পৌঁছাবে না। তবু আমাদের অশেষ সৌভাগ্য এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকাহিনীর বেদব্যাস পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ তাঁর আপন অভিজ্ঞতায় লব্ধ এই ভাবদ্যুতিময় আলাপনের প্রত্যক্ষ ফলটুকু জগতের মানুষের জন্য রক্ষা করেছেন। সারদানন্দজী লিখছেন ঃ

"ইতঃপূর্বে আমরা ঠাকুরকে একজন ঈশ্বর-জানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুরুষ মাত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অদ্যকার প্রাণস্পর্শী কথাসমূহ আমাদের অন্তরে নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম, মহামহিম শ্রীচৈতন্য বা ঈশা প্রভৃতি জগদ্গুরু মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে লিপিবদ্ধ যেসকল

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ ঃ দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ১৩৬৮, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ১৪০-১৪১

অলৌকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তদ্রূপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিত্যই ঘটিতেছে।...[রামকৃষ্ণ-কথা আলোচনা করিতে করিতে] সন্ধ্যার অন্ধকার ঘণীভূত হইয়া তামসী রাত্রিতে পরিণত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও হইতেছে না। কারণ নরেন্দ্রের জ্বলন্ত ভাবরাশি মরমে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা আনিয়া দিয়াছে—যাহাতে শরীর টলিতেছে এবং এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দূরে স্বপ্নরাজ্যে অপসৃত হইয়াছে, আর অহেতুকী কৃপার প্রেরণায় অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সান্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কার-বন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করারূপ সত্য—যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনাসম্ভূত —তাহা তখন জীবন্ত সত্য হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।”[২]

সম্মুখে দণ্ডায়মান এই জীবন্ত সত্য সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ একবার গুরুভাইদের কাছে লিখেছিলেন —স্তবস্তুতির ভাষায় নয়—নিজের প্রাণের ঘরোয়া ভাষায়—“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট ; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয় ? ...আমি তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য,...তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং।”[৩]

স্বামী বিবেকানন্দের এই অনুপম গুরুনিষ্ঠার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, পরম ভাগ্য জ্ঞানে শিরোধার্য করলেও এবং এক নিঃশ্বাসে তিনবার ‘দাসোঽহং’ বললেও অপরের কাছে গায়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ‘গুরুত্ব’ বা ‘অবতারত্ব’ প্রমাণ করার প্রয়াসকে তিনি এক প্রকার গোঁড়ামি বলে মনে করতেন। অ-জিজ্ঞাসুদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা-কীর্তন বা অবতারত্ব প্রমাণের চেষ্টার প্রতি স্বামীজীর ছিল ঘোর অনীহা।

পরবর্তী কালে ইউরোপ আমেরিকা থেকে লেখা কয়েকখানা চিঠিতে স্বামীজী বারবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন যাতে তাঁর গুরুভায়েরা ঠাকুরের লৌকিক পূজা বা অবতারত্ব প্রচারের দিকে বেশি ঝোঁক না দেন। যার ঠাকুরঘর নিয়ে স্বামীজীর ‘মহাভয়’ (!), সেই শশী মহারাজকে লিখেছেন ঃ “পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন— নামের বা মানের জন্য নয়। তিনি যা শেখাতে এসেছিলেন, তাই ছড়াও। তাঁর নামের দরকার নেই—তাঁর নাম আপনা হতে হবে।”[৪] অপর একটি পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন ঃ

“পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন ; আমি তাঁকে যাই ভাবি, দুনিয়া তা ভাববে কেন ?”[৫] ধর্ম এবং অধ্যাত্মচর্চার জগতে মানুষের স্বাধীন চিন্তার অধিকারকে স্বামীজী কতখানি শ্রদ্ধা করতেন এই চিঠিখানি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিজের দেবতা হলেও বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনো অন্যের দেবতা করে তোলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতেন না। তিনি চাইতেন সকলে যে যার বিদ্যাবুদ্ধি বা সাধনা অনুযায়ী জগতের সামনে দণ্ডায়মান এই জীবন্ত সত্যকে যাচাই করে দেখুক। তিনি চাইতেন জগতের মানুষ ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হোক, তাঁর কথা জানুক, শুনুক। নিজেরা বিচার করে দেখুক শ্রীরামকৃষ্ণ কী বস্তু। তখন তারা শ্রীরামকৃষ্ণকে যে চোখে দেখবে সেটাই হবে পাকা দেখা। স্বামীজী অবশ্য একথাও জানতেন, পাকা দেখার পর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করা জগতে কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব, গুরুত্ব বা অবতারত্ব নিরূপণের প্রশ্নে নিরপেক্ষ থেকে যে মহৎ ভাবরাশি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা ও নিষ্কাম কর্মযোগের যে মহান আদর্শ এবং শিক্ষা তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছিলেন, স্বামীজী চাইতেন তা জগতের মানুষের কাছে আগে প্রচারিত হোক এবং বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠুক। তাছাড়া ব্যক্তি-রামকৃষ্ণ যিনি ছিলেন স্বামীজীর প্রাণের দেবতা তাঁকে বাইরে নিয়ে এসে যেখানে-সেখানে তাঁর প্রসঙ্গ তুলতে চাইতেন না তিনি। একটি সুবিদিত ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একবার আমেরিকার বস্টনে কিছু অনুরাগী জনের

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ ঃ দিব্যভাব ও পৃঃ ১৪০-১৪২

৩ পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৫৫

৪ ঐ, পৃঃ ১১৬ ৫ ঐ, পৃঃ ২১৮

অনুরোধে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু বলতে সম্মত হন। কিন্তু বক্তৃতা দিতে গিয়ে সভাগৃহে সম্মুখের সারিতে উপবিষ্ট বিলাসমত্ত, ভোগপরায়ণ নরনারীদের দেখে স্বামীজী থমকে গেলেন। ভাবলেন সেই বৈরাগ্যপূত ত্যাগীশ্বরের জীবন-কথা এদের সামনে কি উচ্চারণ করা যায়। এরা কি ন্যূনতম শ্রদ্ধা বজায় রেখে তার কিছুমাত্র মূল্য দিতে পারবে? অতএব প্রসঙ্গ পাল্টে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা আর বলা হলো না। তার বদলে ভোগপরায়ণ ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব জীবনের পঙ্কিলতা ও অসারতার ওপর তীব্র কটাক্ষপাত করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।[৬]

যাই হোক, ইতিহাসের একটা নিজস্ব গতি আছে। মহাকালের পথে সে আপন গতির টানে এগিয়ে চলে। তাই প্রচারের জন্য অপরের কাছে তুলে না ধরলেও, শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমায় অবগাহন করবার পর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-সন্ন্যাসিবৃন্দ ইতিহাসের গতির টানে তাঁকে জগদ্‌গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁর পূজা ও আরাত্রিকের ব্যবস্থা করেন। এতে কোন কোন দিক থেকে কিছু বিরূপ মন্তব্য উত্থিত হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তানেরা তাতে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে নীরব থাকতেন। কিন্তু একটু উচ্চকণ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন ঘটল যখন রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের গুণগ্রাহী সমর্থক জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসের মতো মনীষী ব্যক্তি এইভাবে আনুষ্ঠানিক শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

সাগরপার থেকে স্বামীজী দেওয়ানজীকে লিখলেন: "শুধু মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানকে জানা সম্ভব। যেমন আলোকস্পন্দন সর্বত্র, এমনকি অন্ধকার কোণেও বিদ্যমান, কেবলমাত্র প্রদীপের মধ্যেই উহা লোকচক্ষুর গোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ যদিও ভগবান সর্বত্র বিরাজিত, তথাপি তাঁহাকে আমরা কেবল এক বিরাট মানুষরূপেই কল্পনা করিতে পারি। করুণাময়, রক্ষক, সহায়ক প্রভৃতি ভগবৎসম্বন্ধীয় ভাবগুলি—মানবীয় ভাব; মানুষ স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়াই ভগবানকে দেখে বলিয়া এইসব ভাবের উদ্ভব হইয়াছে। কোন মনুষ্যবিশেষকে আশ্রয় করিয়াই ঐসকল গুণের বিকাশ হইতে বাধ্য—তাঁহাকে গুরুই বলুন, ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষই বলুন আর অবতারই বলুন। নিজদেহের সীমা আপনি যেমন উল্লম্ফনে অতিক্রম করিতে পারেন না, মানুষও তেমনি নিজ প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না।"[৭]

মানববিগ্রহে ঈশ্বরপূজার দার্শনিকতত্ত্ব এবং তার বাস্তব যুক্তিগ্রাহ্য আবেদন এমন স্বচ্ছ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করবার পর স্বামীজী স্বীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আপনার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণরূপী মানববিগ্রহকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে এক হৃদয়ভেদী প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন: "যে গুরু আপনাদের ইতিহাসে বর্ণিত সমুদয় অবতারপ্রথিত পুরুষগণ অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক পবিত্র—সেই প্রকার গুরুকে যদি কেহ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাই করে, তবে তাহাতে কী ক্ষতি হইতে পারে? যদি খ্রীস্ট, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধকে পূজা করিলে কোন ক্ষতি না হয়, তবে যে পুরুষপ্রবর জীবনে চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নাই, যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি-প্রসূত তীক্ষ্ণবুদ্ধি অন্য সকল একদেশদর্শী ধর্মগুরু অপেক্ষা ঊর্ধ্বতর স্তরে বিদ্যমান—তাঁহাকে পূজা করিলে কী ক্ষতি হইতে পারে?"[৮] এরপর দৃঢ় প্রত্যয়সিদ্ধ স্বামীজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বাস্তবোচিত এক সপ্রেম আহ্বান: "দেওয়ানজী, ঈশ্বর মহান ও করুণাময়—ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করুন, আরও বহু কিছু দেখিতে পাইবেন।"[৯] ভূয়োদর্শী দেওয়ানজীকে অবশ্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। এর অনতিকাল পরে, কয়েক বছরের মধ্যেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোধূলিবেলায় যিনি ছিলেন মাত্র কয়েকজন 'ছোকরা সন্ন্যাসী'র গুরু, রজনী প্রভাত হতেই বিংশ শতাব্দীর প্রত্যূষকালে অরুণোদয়ের মধ্যে দেখা গেল তিনি বহুজন হৃদয়ে বহু সমাদরে নর-দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, এই দেবতাকে আসনচ্যুত করবার জন্য এক অদ্ভুত রোমহর্ষণকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল বিবেকানন্দেরই কাছে, এই বাংলা-দেশে, কতিপয় মূর্তিপূজাবিরোধী সমাজ-সংস্কারকের দ্বারা। ইতিহাসের দেবতা বোধ হয়

৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় খণ্ড ৩য় সং, পৃঃ ২৭৮

৭ পত্রাবলী, পৃঃ ১০৬ ৮ ঐ

৯ ঐ, পৃঃ ১০৭

এমনি করেই সাধক-সন্ন্যাসীর গুরুনিষ্ঠার দৃঢ়তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। চিঠিপত্রে দেখা যায় তৎকালীন সমাজহিতৈষীদের মধ্যে কেউ কেউ বিবেকানন্দের লোকহিতকর কর্মের সৌরভে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সাথে একযোগে মানবসেবার কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু শর্ত ছিল মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দকে গুরুপূজারূপ কুসংস্কারটি ত্যাগ করতে হবে। এই নিষ্ঠুর শর্তের কণ্টকটি গুরুগত-প্রাণ বিবেকানন্দকে যে কতখানি বিঁধ করতে পারে, 'সুসংস্কৃত' ও 'পরিশীলিত' মনের অধিকারী সমাজ-সংস্কারকেরা সে-প্রশ্ন একবারও চিন্তা করেছিলেন কিনা জানি না। না করবারই কথা। কেননা, গুরুপূজাবিরোধী সংস্কারকগণ কি করেই বা জানবেন গুরু-শিষ্যের দিব্যপ্রেম-সম্বন্ধের সেই ঐকান্তিকতা, যার টানে ভাবাবিষ্ট গুরু শিষ্যের কোলে চেপে বসে বলতে পারেন "দেখছি কি এটা আমি, আবার এটাও আমি!"

তাঁরা বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কর্মদর্শনটি তলিয়ে দেখেননি। যে মানবসেবামূলক কর্মের স্বার্থে এই সমাজ-হিতৈষিগণ বিবেকানন্দকে গুরুপূজারূপ কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁরা বোধ হয় জানতেন না যে, সেই কর্মোদ্যমের উৎসটি হচ্ছেন তাঁর গুরুই স্বয়ং—যিনি সমাধিলিপ্সু শিষ্যকে ধ্যানের আসন থেকে জোর করে তুলে নিয়ে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন বৃহৎ জগৎক্ষেত্রে। তিনি তাঁর প্রধান শিষ্যকে মানুষের মাঝে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আর শিখিয়েছিলেন—চোখ বুজে নয়, চোখ খুলে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করতে। মানবসেবা যে আসলে নারায়ণপূজা, গুরুবাক্যে এসত্য প্রতীত হওয়ায় ঈশ্বরসাধনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল বিবেকানন্দের জীবনে। এমন গুরুকে ত্যাগ করার প্রস্তাব। মহাবীর শিষ্যের হৃদয়ে সেদিন নিশ্চয়ই অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল। তবু তিনি কতই না ধীর এবং সংযত ছিলেন! সামান্য একটু খোঁচায় ঠুনকো সমাজহিতৈষণার কৃত্রিমতাকে উদ্ঘাটন করে দিয়ে তিনি শুধু লিখলেন: "যদি আমার বা আমার গুরু-ভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্ত-মাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়িবে না জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও তো দেখি নাই, সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু-একজন আমাদের hobby-র জায়গায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন, এই পর্যন্ত।... তাহার পর যে-সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়িলেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে ঘড়-ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে?"...[১০]

দেশে-বিদেশে সর্বত্র অন্যায় অযৌক্তিকের বিরুদ্ধে যে সন্ন্যাসী তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করতে কদাপি পশ্চাৎপদ হতেন না তিনি গুরুপূজা ত্যাগের এমন অবমাননাকর প্রস্তাবটি কেন সামান্য দু-একটি তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তির মধ্য দিয়েই এড়িয়ে গেলেন। তলিয়ে দেখলে মনে হয় এর কারণও স্বামীজীর সেই অনন্য গুরুভক্তি, কেননা বিষয়টি যে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে, যাঁর প্রসঙ্গ স্বামীজী সকলের কাছে তুলতেই চাইতেন না পাছে তর্কবিতর্ক এবং বাদবিসংবাদের ধূলিজাল উত্থিত হয়ে তাঁর প্রাণের দেবতার আসনস্পর্শ করে।

স্বামীজী তাঁর প্রাণের দেবতাকে প্রাণের কোন প্রদেশে, কী গভীর শ্রদ্ধায়, কত সন্তর্পণে রেখে-ছিলেন—বাইরের জগতের কাছে বিরল হলেও—তার কিছু আভাস সময় সময় বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো প্রকাশিত হয়ে পড়ত। নিগূঢ় প্রেমের লক্ষণ এই যে, সে সরব হয় না, তর্ক করতে চায় না, প্রেমাস্পদকে প্রাণের মধ্যে রেখে গোপনে কান্না করে—প্রাণের দেবতা প্রাণের ব্যথায় পরিণত হয়। স্বামীজীর জীবন অনুধ্যান করলে তেজোবীর্যময় আবরণের তলায় এমনিতর একটি গুরু-কাতর ব্যথিত প্রাণের সন্ধান মেলে।

'শ্রীরামকৃষ্ণ' নামটি পর্যন্ত উচ্চারিত হলে স্বামীজীর মর্মলোক কেমনভাবে শিহরিত হয়ে

১০ পত্রাবলী, পৃঃ ৬৪৯

উঠত তার বাঙ্ময় একটি ছবি উদ্ঘাটিত হয়েছিল স্বামীজীর কলকাতা অভিনন্দনের উত্তরে। শিকাগোর পর দীর্ঘ প্রবাস-জীবন অন্তে এসেছেন কলকাতায়—অদূরেই তো দক্ষিণেশ্বর। অভিনন্দন-সভায় কোন বক্তা প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেন। অমনি বিশ্ববিজয়ী মহাবীরের প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগে উৎসারিত হলো ঃ

"ভ্রাতৃগণ। তোমরা আমার হৃদয়ের আর একটি তন্ত্রীতে—গভীরতম সুরের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছ, আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করিয়া। যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনও অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত—সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র—সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী, এবং তিনি স্বয়ং।"[১১]

শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়ে ভরা তাঁর এই বিশাল প্রাণটি কি দুঃসহ বেদনায় না উদ্বেলিত হতো যদি কখনো কারও কোন কথা বা আচরণে ঠাকুরের প্রতি কিছুমাত্র শৈথিল্য বা অনাদর প্রকাশিত হতো—বিশেষ করে কোন ঘনিষ্ঠ আপনজনের কাছ থেকে। বেদনার্ত অথচ প্রবল ধিক্কার-ধ্বনি-প্রকম্পিত একখানি চিঠির একাংশ এর সাক্ষ্য বহন করছে ঃ "সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়। ধিক্ তোদের জীবনে !! আর আমি কি বলিব? দেশে দেশে নাস্তিক পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা করছে, আর তোদের মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে !!! তোদের মতো লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরি করে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধূলা পেয়েছিস।"[১২]

এরপর গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটি যে কতখানি দৃঢ়মূল তা বলতে গিয়ে হৃদয়বেদনা চেপে, সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে, অভিমানে ভরা এক বক্র ক্ষোভের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়েছেন ঃ "দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম না হয় বাজেই গেল ; মরদের বাত কি ফেরে?··· আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।"[১৩] স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কথাগুলি আক্ষেপের ভাষায় তির্যক্ ভঙ্গিতে ব্যক্ত হলেও এতে আক্ষেপের লেশমাত্র নেই বরং আকাশ-প্রমাণ গর্বের ভাবটি আছে পুরোমাত্রায়। অপর বহু মানুষ যাকে 'মূর্খ বামুন' বলে জেনেছে তাঁকেই শিরোধার্য করে, তাঁর নিরঙ্কুশ অধিকারে নিজেকে সমর্পণ করতে পেরে স্বামীজীর যেন কতই উল্লাস! তিনি যে কিনে নিয়েছেন তাঁকে। কিনে নেওয়া জিনিসের প্রতি মালিকের ষোল আনা অধিকার।

তাই এই জীবন, এই জন্ম একেবারে নিঃশেষে তাঁর পায়ে বিকিয়ে গেছে। তবু হিসাবী মানুষ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারে, তিনি তো কিনে নিয়েছেন তাঁর কাজের জন্য, তাতে তোমার কি ফল লাভ? তার উত্তরে রামকৃষ্ণগত-প্রাণ বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দের কণ্ঠে গোপীজনসুলভ সেই চির-অম্লান কামনাহীন প্রেমের বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ "তিনি শরণ দিয়েছেন, আবার কি চাই? ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা—আবার চাই কি?"[১৪]

১১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ২০৯
১২ পত্রাবলী, পৃঃ ৩৭৭
১৩ ঐ, পৃঃ ৩৭৬ ১৪ ঐ, পৃঃ ৩৭৭

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে

স্বামী সারদেশানন্দ

পূজনীয় মহারাজের দর্শনলাভ করিবার সৌভাগ্য সম্ভবতঃ প্রথমবার মঠে যাওয়ার সময়েই (১৩১৯ সালের ফাল্গুন মাসে—শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসবের সময়) হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত মিলিবার, আলাপ পরিচয় করিবার সুবিধা তখনও হয় নাই। তবে, তাঁহার সম্বন্ধে কথামৃতে অনেক কথা পড়িয়া ও ভক্তগণের মুখে তাঁহার অলৌকিক ভাব-ভক্তির কথা শুনিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে ভয়, বিস্ময় ও সংকোচ জন্মিয়াছিল বলিয়া নিকটস্থ হইতেও সাহস পাই নাই। বয়স অল্প থাকায় (২০ বৎসরের মধ্যে) ও পাড়াগাঁয়ে জন্ম বলিয়া প্রথমবার মঠে গিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরবর্তী কালে যখন তাঁহার নিকটে থাকা ও খোলাখুলি কথাবার্তার সুযোগ হইয়াছিল তখন সেই বিরাট গম্ভীর মহান পর্বতসদৃশ মূর্তির অন্তরে যে মধুর সুধা-প্রস্রবণের করুণাধারা বর্তমান, তাহার আস্বাদ পাইয়া মোহিত ও বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই অমৃতের সন্ধান পাইবার অল্পকাল পরেই তাহা মর্ত্যবাসীর দৃষ্টির অগোচর হইয়া যাওয়াতে প্রাণ ভরিয়া পান করিবার সুযোগ-সুবিধা হয় নাই। সে দুঃখ এখনও অন্তরে রহিয়াছে।

মহারাজের সঙ্গে মিশিতে ভয়-সংকোচের কারণও বলিতেছি। বন্ধুগণের নিকট শুনিয়াছিলাম মহারাজ খুব রঙ্গরসপ্রিয়, কখন কিভাবে কাহাকে উপলক্ষ করিয়া হাস্য-পরিহাসের রোল তুলিবেন তাহা বুঝা কঠিন। স্বভাবতই আমি লোকসমক্ষে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হই, তদুপরি যেখানে গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোকের সমাবেশ সেখানে অগ্রসর হইতেই পারি না। মহারাজ যখন যেখানে থাকিতেন—মঠে, উদ্বোধনে ও বলরাম মন্দিরে—দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই দেখিয়াছি আমার নমস্যগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছেন। তাঁহাদের সঙ্গেই কথাবার্তা চলিতেছে। পিছনে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিয়াই বিদায় লইয়াছি। তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমাদের বন্ধু পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আশ্রিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বিনোদবন্ধু গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৯১৫/১৬ সনের ঘটনা, তিনি তখন কলিকাতায় ডাক্তারি পড়েন।) শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের দিনে মঠে গিয়াছেন সকালের দিকে। তখনও মঠে বিশেষ ভিড় জমে নাই। রাজা মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি তাঁহাকে অঙ্গুলি নির্দেশে অল্পদূরে উপবিষ্ট জনৈক ভদ্রলোককে দেখাইয়া বলিলেন: "উঁহার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এসো—'মহাশয়, মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী এখন কোথায় আছেন'?" তিনি মহারাজের আদেশ অনুসারে সেই ভদ্রলোকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলিলেন: "কে জানে বাপু! শিবানন্দ স্বামী এখন কোথায় আছেন। মহারাজকে গিয়ে বল আমি কিছু জানি না।" ভদ্রলোকের পার্শ্বে উপবিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বিনোদবাবু বিস্মিত-চমকিত হইলেন। তিনি পূর্বে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিয়াছেন। ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া ও উপবিষ্ট লোকদের হাসি শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে একটু সন্দেহ হইল, উনিই মহাপুরুষ নাকি? যাই হোক তিনি মহারাজের কাছে ফিরিয়া আসিয়া যখন ভদ্রলোকের জবাবের কথা বলিলেন, তখন সেখানেও হাসির রোল উঠিল। বিনোদবাবু অবাক হইয়া সেই রঙ্গরস দর্শন করিলেন এবং অপরের নিকট শুনিলেন মহারাজই রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে মহাপুরুষজীকে সাদা ধুতি-চাদর-জামা পরাইয়া বাবু বানাইয়া বসাইয়াছেন। বিনোদবাবু আমাদিগকে এই মজার ঘটনা শুনাইয়াছিলেন।

আমাদের অপর একজন বন্ধু যতীন্দ্রনাথ দত্ত (শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত) অপর এক বন্ধুর সঙ্গে বলরাম মন্দিরে বিকালবেলা রাজা মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। বৈঠকখানা ঘরে মহারাজ বহু দর্শনার্থী ভক্ত-পরিবৃত। তাঁহারা প্রণামান্তে উপবেশন করিলে মহারাজ তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন তাঁহাদের জন্মস্থান শ্রীহট্ট তখন অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন : "উভয়ে খাঁটি শ্রীহট্টের ভাষায় কিছু কথাবার্তা বলিয়া শুনাও তো দেখি।" তাঁহার বারম্বার আদেশ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া উভয়ে সসঙ্কোচে মাতৃভাষায় কয়েকটি বাক্য বিনিময় করিলেন। সেই দুর্বোধ্য শব্দ ও অদ্ভুত উচ্চারণ শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিস্মিত-স্তম্ভিত। কিন্তু মহারাজ মজা উপভোগ করিয়া খুব খুশি, হট্টিয়াগণ লজ্জিত, সঙ্কুচিত।

আমি নিজেও একবার এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। মহারাজ উদ্বোধনে আছেন, নিচে অফিস ঘরে (বর্তমানে মায়ের বাড়ীর একতলার 'গদিঘরে'); পূজনীয়া মাতাঠাকুরানী উপরে আছেন। তাঁহার বাসস্থান ঠাকুরঘরে। মায়ের সান্নিধ্যে সন্তানের হৃদয় আনন্দে ভরপুর—সদা রঙ্গরস উছলিয়া উঠিতেছে। মহারাজের এই বালকভাবের কথা তখন আমার অজ্ঞাত। আমি জয়রামবাটী হইতে পূর্বদিন রাত্রে আসিয়াছি, পরদিন সকালে মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছি তাঁহার ঘরে। মহারাজ একখানি ছোট ধুতি ও একটি ছোট ঢিলা পাঞ্জাবি গায়ে সদানন্দ চঞ্চল বালকের মতো ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং উপস্থিত সেবক ও সাধু-ব্রহ্মচারিগণের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দু-একটি রঙ্গরসের কথা—হাসি-তামাশা করিতেছেন। আমি ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়াই এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত ও স্তব্ধ হইলাম। জনৈক পরিচিত সাধু মহারাজকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি কিছুকাল জয়রামবাটীতে ছিলাম। উপস্থিত সেখান হইতে আসিয়াছি। মহারাজ সেই কথা শুনিয়া আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলে, আমি নিকটে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ অতি বিনীতভাবে কাছে দাঁড়াইলাম। তখন মহারাজ একেবারে আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন : "ওখানে গেছ্‌লো ক্যান্‌? বক্ত হইতে গেছ্‌ল্যা বুঝি?" 'ভক্ত' শব্দটির 'ভ' এর দীর্ঘ না করিয়া পূর্ববঙ্গের মতো হ্রস্ব উচ্চারণ 'ব' করিবার চেষ্টাতে অতি অদ্ভুত শুনাইল ও উপস্থিত সকলের হাস্যের উদ্রেক করিল। আমি কোন প্রকারে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িলাম। এরপরে যে-কয়দিন উদ্বোধনে ছিলাম, যতদূর সম্ভব নিজেকে মহারাজের সম্মুখ হইতে আড়ালে রাখিতে চেষ্টা করিতাম, পাছে না মুস্কিলে পড়ি। সেইজন্য এখন কত আপশোষ হয়! পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরানীর সান্নিধ্যে তাঁহার পরম আদরের দুলালের হৃদয় কি অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত তাহা পরবর্তী কালে প্রত্যক্ষদর্শী প্রাচীন সাধুগণের মুখে শুনিবার সৌভাগ্য লাভ হওয়ায় মহারাজের অদ্ভুত স্বভাবের ও আচরণের কারণ কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইয়াছে। উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণামকালে মহারাজের চাল-চলন, দৃষ্টি, বাচনভঙ্গি ঠিক বালগোপালের প্রতিরূপ হইতে দেখা যাইত। আর জগদম্বাও যশোদার ভাবে বাৎসল্যপূর্ণ হৃদয়ে সন্তানের চিবুক ধরিয়া চুমা খাইতেন। পরম স্নেহাদরে জিজ্ঞাসা করিতেন কুশল সংবাদ : "কেমন আছ বাবা?" বহুপূর্বে মহারাজ একবার জয়রামবাটীতে মাতৃদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। পুলকে পূরিত হৃদয়ে তিনি যে-স্থানে 'গোপাল নৃত্য' নাচিয়াছিলেন—বড় মামার সেই বৈঠকখানা ঘরটি আমাদিগকে প্রাচীনেরা দেখাইয়াছিলেন। আমাদের সেই ঘরে বাস করিবার সৌভাগ্যও হইয়াছিল এবং শ্রুতঘটনার দিব্যস্মৃতি আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিত। পরবর্তী কালে বর্তমান মালিক ঘরখানি ভঙ্গ করাতে প্রাচীন ভক্তগণের মনে খুব কষ্ট হয়।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘরূপে মহান মহীরুহের যে সূক্ষ্মতম বীজ তাঁহার প্রধান পার্ষদ নরেন্দ্রনাথের হস্তে প্রদান করিয়া-ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দরূপে নরেন্দ্রনাথ সেই বীজ অঙ্কুরিত করিয়া গুরুদেবের মানসপুত্র রাখালরাজের তত্ত্বাবধানে তাহা সুরক্ষিত করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। মহারাজ অপরাপর গুরুভ্রাতা, ভক্ত অনুরাগিগণকে একত্র সংহত রাখিয়া কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অসাধারণ বুদ্ধি-মত্তা ও বিচক্ষণতা বলে সমবেত চেষ্টায় সেই ক্ষুদ্র

অঙ্কুরকে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত করিয়া বিশাল বৃক্ষে পরিণত করেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়মাত্র লোকের নিকট প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা প্রাচীনগণের মুখে কখনও কখনও কোন কোন ঘটনার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কারণ, আমরা যখন তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি তখন তিনি লোক তৈয়ার করিয়া তাহাদের হস্তেই কার্যভার অর্পণপূর্বক সাক্ষীরূপে অবস্থিত ও সময়মত সুমন্ত্রণা দান ও সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই বিশেষ আগ্রহান্বিত, মনে হইয়াছে। তাঁহার অদ্ভুত কর্মতৎপরতা ও কুশলতা সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এসম্বন্ধে শোনা কিছু কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

পূজ্যপাদ স্বামীজী স্থায়ী মঠের জমি সংগ্রহের জন্য অতীব ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং মহারাজের উপর উহার ভারার্পণ করিলেও দেরি হইতেছে দেখিয়া অতীব উতলা হইয়া এদিকে সেদিকে অপরের নিকটেও জমি ও বাড়ির সন্ধান লইতেছিলেন। কিন্তু মহারাজ ঐ সকল জমি পছন্দ করেন নাই। সেইজন্য একদিকে স্বামীজীকে প্রবোধ দিয়া সন্তুষ্ট রাখা এবং অপর দিকে গঙ্গাতীরে মনোমত প্রশস্ত জমি সংগ্রহ করা খুবই কঠিন সমস্যা হইয়া উঠে। মহারাজ অতিশয় ধৈর্য ও পরিশ্রমের সহিত বেলুড় মঠের বর্তমান মনোহর ভূমিভাগ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই জমির মালিকানা-স্বত্ব লইয়া অনেক গণ্ডগোল ছিল। মহারাজ বহু খোঁজখবর লইয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া, আইনজ্ঞ উকিল ও বিজ্ঞ বিষয়ী লোকের সাহায্যে সেই সকল ব্যাপারের সুমীমাংসা করতঃ জমি ক্রয় ও হস্তগত করিলে স্বামীজী ও অপরাপর গুরুভ্রাতা ও ভক্তবৃন্দ সকলেরই মন সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে সেই সময়ে মহারাজের কর্মতৎপরতা ও কষ্টস্বীকারের কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক প্রাচীন সাধু এক সময় বলিয়াছিলেনঃ "মহারাজ তখন সকালে উঠিয়া স্নান করিয়া চারিটি ভিজা চিঁড়া মুখে দিয়া ব্যাগের ভিতর আবশ্যকীয় দলিল কাগজপত্র পুরিয়া হাঁটিয়া বাহির হইয়া যাইতেন। দিনভোর এখানে সেখানে উকিল মক্কেল ও সহায়ক পরামর্শদাতা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া, কোর্ট অফিস করিয়া কোন দিন অপরাহ্ণে, কোনদিন সন্ধ্যায় ক্লান্ত অবসন্ন দেহে মঠে ফিরিতেন। কোনদিন মধ্যাহ্নে কোন ভক্ত বা পরিচিত লোকের বাড়িতে খাওয়া হইত, কোনদিন হইত না। কোনদিন অপরাহ্ণে মঠে ফিরিয়া ঠাণ্ডা ভাত, কোনদিন ভিজা চিঁড়া, কোনদিন বা উপবাসের পর রাত্রেই একেবারে অন্নগ্রহণ করিতেন। এজন্য কেহ কখনও তাঁহার মুখে বিরক্তি, অবসাদ, দুঃখ বা নৈরাশ্যের কথা শুনে নাই।"

অপর একজন প্রাচীন সাধু বেলুড় মঠের সম্মুখস্থ গঙ্গাগর্ভে যে ঘাট ছিল তাহা বাঁধাইবার সময়ে মহারাজের কর্মতৎপরতা, উৎসাহ-উদ্দীপনার বর্ণনা শুনাইয়াছিলেন। যাঁহারা সেই প্রাচীন ঘাট দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে উহা নির্মাণের কৃতিত্ব, কৌশল-সুদক্ষতা ও মনোহারিতার প্রশংসা করিয়াছেন। জ্যোৎস্নারাত্রে জোয়ারের সময় সেই ঘাটে বসিয়া থাকিলে মনে হইত যেন ধরাধামের বাহিরে স্বর্গ-মন্দাকিনীর মধ্যস্থিত দ্বীপোদ্যানে রহিয়াছি। কালে সেই সুন্দর সুপ্রশস্ত সোপানাবলী সুশোভিত ঘাট ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু মহারাজের কৃতিত্বের কথা আমাদের মনে জাগিতেছে। ঘাট কিরূপ হইবে মহারাজ স্বয়ং তাহা পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং নির্মাণ-কর্মে অভিজ্ঞ দীনু মহারাজের (স্বামী সচ্চিদানন্দ) সহায়তায় তাহা কার্যে পরিণত করেন। অর্থের অনটন থাকাতে স্থির হয় যে, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান ক্রয়ের জন্যই পয়সা খরচ হইবে। মজুর ও সহায়কদের কাজ করিবেন সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ। কাজটি অত্যন্ত কঠিন। গঙ্গায় মাত্র ভাটার সময়েই গাঁথনি চলিবে, আবার ভাটা প্রতিদিন রাত্রে বিভিন্ন সময়ে হয়। তদুপরি অজানা নূতন লোকের পক্ষে ঐ কাজে যোগাড় দেওয়াও অতীব কঠিন ব্যাপার। সেজন্য মহারাজ প্রতিদিন সকলকে সমবেত করিয়া কোন সময়ে কাজে হাজির থাকিতে হইবে, কাহাকে কি কাজ কিভাবে কতক্ষণ করিতে হইবে দীনু মহারাজের সহায়তায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া বলিতেন।

[ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

মহাসমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত সম্পদ

ইগর গ্রামবার্গ

ভূতত্ত্বের দিক থেকে বলতে গেলে মহাসমুদ্রের তলদেশ অত্যন্ত গতিশীল ও নবীন অঞ্চল। আজও সেখানে ভাঙা-গড়ার প্রক্রিয়া চলছে। ডুবুরিদের সাহায্যে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ভূপদার্থবিদ্যাগত অনুসন্ধান চালানোর ফলে বসে যাওয়া এলাকাগুলিতে আগ্নেয়শিলা এবং ঐসব শিলায় গভীর ফাটল আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব ফাটল ভূত্বকের শিলামণ্ডলীয় স্তরগুলির আলোড়নেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ। মহাসমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে গবেষণা চালানো হলে তা থেকে অতীতের ভূতত্ত্বগত প্রধান প্রধান পর্বগুলি নির্দেশ করা, ভূত্বকের বিকৃতি অনুযায়ী এলাকা বিভাগ করা এবং তার নিচের খনিজসম্পদের গঠন ও বণ্টন চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

সামুদ্রিক খনিজ অনুসন্ধানের ব্যাপারে মহাসমুদ্রের তলদেশকে সাধারণভাবে স্বীকৃত মহীসোপান ও গভীর সমুদ্র অঞ্চলে ভাগ করার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। মহীসোপান কার্যত হলো একটা দেশের ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত প্রসারিত এলাকা। ভূতত্ত্বগতভাবে মহীসোপান হলো মহাদেশীয় ভূগঠনেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ, তাই খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা মহাদেশে যতটা, সেখানেও ততটাই। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এব্যাপারটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নের মহীসোপান অঞ্চল রয়েছে বিরাট এলাকা জুড়ে।

গভীর সমুদ্র এলাকায় যেসব খনিজসম্পদ পাওয়া যায় সেগুলো অনেক বেশি স্পষ্ট নির্ধারিত। তার কয়েকটি মহাদেশের খনিগুলিতে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে রয়েছে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ গুটিকা এবং বিপুল পরিমাণে গন্ধক আকর।

সোভিয়েত ভূতাত্ত্বিকরা একটা বড় ধরনের আবিষ্কার করেছেন: তাঁরা কিছু কঠিন পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন যার নাম তাঁরা দিয়েছেন গ্যাস-হাইড্রেট। পদার্থটি দেখতে তুষারের মতো। ওপরে তুলে আনলে সেগুলো বরফের মতোই গলে যায়। রাসায়নিক দিক থেকে গ্যাসহাইড্রেট হলো মিথেন ও জলের যৌগ। সমুদ্রতলে বিরাজমান অবস্থার সঙ্গে মেলে এমন একটা নির্দিষ্ট চাপ ও তাপে, যেমন সমুদ্রতলে উচ্চ তাপ ও শূন্য ডিগ্রি তাপে, সেগুলি তৈরি হয়। সেগুলি দিয়ে পাললিক শিলার ছিদ্র বা গর্ত পূরণ করা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে মহাসমুদ্রে বিপুল পরিমাণে গ্যাসহাইড্রেট আছে। জাগতিক প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে এটা পৃথিবীর গ্যাসের যথোপযুক্ত পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এনিয়ে সার্বিক গবেষণার কাজ চলছে এবং আমরা আরও অনেক চমকের সম্মুখীন হতে পারি। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা এখন এনিয়ে কানাডার ভূতাত্ত্বিক সংস্থার সঙ্গে মিলে গবেষণা চালাচ্ছেন।

মহাসমুদ্রের গভীর অঞ্চলে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের গুটি তৈরি হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো তৈরির ব্যাপারের মতো। সুক্তির মধ্যে এক কণা বালি ঢুকে গেলে তার ওপর মৌক্তিকের স্তর পড়ে তৈরি হয় মুক্তো। লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের গুটির ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যাপার ঘটে। সাগরতলের পাঁচ কিলোমিটার গভীরে পাথরের কুচি, হাঙরের দাঁত প্রভৃতির ওপর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ দ্রবণের আস্তরণ পড়ে পড়ে এটা তৈরি হয়। আর সাগরতলে যে আস্তরণটি ছড়িয়ে পড়ে তার ঘনত্ব কয়েক সেন্টিমিটার। অত্যন্ত ধীরে ধীরে তৈরি হয় বলে এটা গভীর সমুদ্রের জল ও পলি থেকে নিকেল, তামা ও কোবাল্টের মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদও আহরণ করে। গুটিগুলিতে এসব ধাতব উপাদানের পরিমাণ বেশ উঁচু: ম্যাঙ্গানিজ ২৫ শতাংশ, লোহা ১৪ শতাংশ, নিকেল ১'১ শতাংশ,

তামা ০·৫ শতাংশ, কোবাল্ট ০·৪ শতাংশ। এগুলো গড়পড়তা হিসাব। গুটিগুলিতে সামান্য পরিমাণ সীসা, তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং অন্য কিছু পার্থিব উপাদানও থাকে। এমন নমুনাও আছে যাতে সাধারণ পরিমাণের চেয়ে মূল্যবান উপাদান পাঁচ থেকে সাতগুণ বেশি।

লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের গঠন-স্তর খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞদের সামনে নতুন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যেমন দেখা গিয়েছে যে, চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীর অঞ্চলের গুটিতে নিকেল ও তামার অংশ থাকে সবচেয়ে বেশি, অথচ দুই বা তিন কিলোমিটার গভীরের গুটিতে কোবাল্ট বেশি থাকে। কেন এটা হয়? সমুদ্রজলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এর কারণ জানা গিয়েছে। বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে, গভীরতার বিভিন্ন অংশের ভৌতিক ও রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তনেই নিকেল, তামা ও কোবাল্ট যৌগের হাইড্রোলিসিসের (জলের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিয়োজন) হারের তারতম্য নির্ধারিত হয়।

সমুদ্রতলের বিশাল বিশাল এলাকা জুড়ে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ গুটিগুলি রয়েছে। বর্তমানে যে এলাকাটি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখানো হচ্ছে সেটি হলো বিষুবরেখার কিছু উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল ক্লারিয়ন ক্লিপারটন ক্ষেত্র। সব দেশের বিশেষজ্ঞদের মতে এই ক্ষেত্রটিতে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ গুটির সঞ্চয় নিবিড়তম এবং গুটিগুলিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণও বেশি। এগুলি আহরণ করা গেলে নিঃসন্দেহে তা ভবিষ্যতে শিল্পের পক্ষে বড় একটা ক্ষেত্র হবে।

মহাসমুদ্রের তলদেশে অনুসন্ধান চালানোর কাজে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দেশই অপেক্ষাকৃত বেশি সম্ভাবনাময় এলাকাগুলির ওপর দাবি জানাচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাই একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থা গঠন করেছে, তারা বিভিন্ন দেশের দাবি বিচার-বিবেচনা করে বিরোধের মীমাংসা করবে।

আজ সামুদ্রিক ভূতত্ত্বের মূল কাজ হলো বহু ধাতব সালফাইড আকর ঘনীভবনের পরিমাণ নির্ণয় করা এবং তা যেখানে বিশাল পরিমাণে তৈরি হয় সেই এলাকাগুলি নির্দেশ করা। এগুলির বাস্তব মূল্য সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যায় না।

অভিযান শেষ, এবারে কাজের পালা

দিলীপ এম. সালয়াই

॥ ২ ॥

'দক্ষিণ মেরু অভিযান শেষ। এখন এই মহাদেশে জৈব ও খনিজ সম্পদ সমীক্ষা করার, উপযুক্ত সহায়ক কৃত্যক সমেত আরামদায়ক বাসস্থান গড়ে তোলার, প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবনের এবং আন্তর্জাতিক স্তরে কল্যাণকর বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রয়াস চালানোর সময় এসেছে।' দক্ষিণ মেরু সমীক্ষা বিষয়ে নয়াদিল্লীতে ১৯৮৮ সালে যে কর্মীসভা হয়েছিল তাতে এই মন্তব্য করেছিলেন সাগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব ডঃ এস. জেড. কাসিম। সাতটি সফল অভিযান, একটি স্থায়ী স্টেশন, কয়েকটি শীতকালীন অভিজ্ঞতা এবং জীবনহানি বা যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈকল্য না ঘটিয়ে একটা উন্নয়নশীল দেশের কাছে আগ্রহোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষামূলক কাজকর্ম ভারতকে এই তুষারাচ্ছন্ন মহাদেশে ও বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে চলেছে। আজ ভারত দক্ষিণ মেরু চুক্তির ও দক্ষিণ মেরু বিষয়ে পরামর্শ দান কমিটির সদস্য।

দক্ষিণ মেরুতে একটা ভারতীয় অভিযাত্রী দল পাঠানো ও সেখানে একটা সাহসী কেন্দ্র গড়ে তোলার চিন্তাটা এসেছিল ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে। এর তিনমাস পরে ২১ জনকে নিয়ে প্রথম ভারতীয় অভিযাত্রীদল গড়া হয়। তাতে ছিলেন ডঃ কাসিমের নেতৃত্বে বিভিন্ন সাতটি ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীবৃন্দ। নরওয়ের বরফভাঙ্গা জাহাজ এম. ভি. পোলার ভাড়া নিয়ে ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর তারিখে অভিযান শুরু হয় মার্মোগোয়া জাহাজঘাটা থেকে। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন গঙ্গোত্রী'। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের

৯ জানুয়ারি তারিখে জাহাজ গিয়ে ভেড়ে কুইন মদ ল্যান্ড নামে পরিচিত এই মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে।

প্রথম ভারতীয় অভিযাত্রীদলের ফিরে আসার আটমাসের মধ্যেই ভারতকে দক্ষিণ মেরু চুক্তির এবং তারপরে দক্ষিণ মেরু বিষয়ে পরামর্শ দান কমিটির সদস্য করা হয়। এতে উন্নয়নশীল দুনিয়ার প্রতিনিধি ভারত অন্যান্য সদস্যদেশের সঙ্গে এই মহাদেশ ও তার পরিবেশ বিষয়ে তথ্য বিনিময় করার ও ভবিষ্যতে সম্পদ আহরণ বিষয়ে নিজের বক্তব্য বলার এবং এই মহাদেশ সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকার পায়। এই মহাদেশ পরিচালনাকারী বিশ্বসংস্থা আজ ভারতের প্রথম স্থায়ী স্টেশন 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'কে একটা ঐতিহাসিক স্মারক নিদর্শন বলে স্বীকার করে নিয়েছে। ভারতের ইঞ্জিনিয়ার দল ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে এই স্টেশনটি তৈরি করেছে রেকর্ড সময়ে, কুমেরু গ্রীষ্মের ৬০ দিনের মধ্যে।

দক্ষিণ গঙ্গোত্রী হলো দুটি ব্লকে ভাগ করা একটা দোতলা ইমারত, যাতে ১৫ জন লোক সাধারণ জামা-কাপড় পরে কাজ করতে পারে। এর নাম দেওয়া হবে মৈত্রী। এটা প্রতিবেশী বন্ধু সোভিয়েত স্টেশন 'নোভলাজারেভস্কায়া' থেকে মাত্র ৩·৭৫ কিলোমিটার দূরে।

এটা দীর্ঘকাল থেকেই সকলের জানা যে, তুষারাচ্ছন্ন এই মহাদেশটি সারা দক্ষিণ এশিয়ার আবহাওয়াকে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ুকে প্রভাবিত করে। ভারত মহাসাগরেই বিশাল ভূভাগ দুটিকে পৃথক করে রেখেছে। আবহবিদ্যাগত সমীক্ষায় সে-কারণেই একেবারে শুরু থেকে ভারতের বিজ্ঞান কর্মসূচীর ওপরে বিপুল গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতের মতো একটা কৃষিপ্রধান দেশের কাছে মৌসুমী বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করার কারণগুলি জানা একান্ত জরুরী। এই স্টেশনে নিয়মিতভাবে আবহ বেলুন ছাড়া হয়। আবহবিদ্যাগত বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, এমন সব যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে, এবং এইভাবে লব্ধ তথ্য নিয়মিত গবেষণা চালানো ও তা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্টেশনটিতে তথ্য নিয়ে সংগ্রাহক মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় আবহাওয়ার অবস্থা, যথা তাপ, চাপ, বাতাসের গতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এবং তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্য নিয়মিতভাবে দিল্লীতে পাঠায় এই মঞ্চটি। এধরনের অনুসন্ধান থেকে দেখতে পাওয়া গেছে যে, এই মহাদেশে একেকটা মরসুমে এবং সেই সঙ্গে এক বছরের সঙ্গে আরেক বছরের আবহাওয়ার বিরাট পার্থক্য ঘটে।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতীয়দের এই মহাদেশে দীর্ঘকাল বাস করতে হবে। সেই কারণে বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক অবস্থায় টিকে থাকতে সক্ষম একটা স্থায়ী স্টেশন হলেই চলবে না, দরকার এমন সব লোকজনও যারা স্টেশনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় দিগন্ত বিস্তৃত বরফের মরুভূমির দিকে তাকিয়ে কনকনে শৈত্যে কর্মক্ষমও থাকবে। নতুন নতুন উপকরণ ও যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখার এবং মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক দিক থেকে লোকজনকে যাচাই করে দেখার কাজ চলছে। স্টেশনটিতে অগ্নিসহ প্রলেপের রং, ফটোভোলটাইক (উৎসে তাপ বিকীরণ কমে গেলে প্রয়োজনীয় তাপ উৎপাদনে সক্ষম) সৌর প্যানেল, বাতচক্র বা উইন্ড মিল, পলিমার উপকরণ ইত্যাদি বারবার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ রক্ষা করার জন্য প্রতিবেশী সোভিয়েত ও জি. ডি. আর. সদস্যদের ওখানে বন্ধুত্বপূর্ণ যাওয়া-আসা চলে। ষষ্ঠ অভিযানের সময়ে এই স্টেশনে এক রুশ রোগীর এ্যাপেন্ডিসাইটিস সফলভাবে অস্ত্রোপচার করা হয়।

আজ পর্যন্ত দক্ষিণ মেরু অভিযানের জন্য সাগর উন্নয়ন দপ্তর ৩৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। একটা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে কোন মানদণ্ডেই এটা বড় কম টাকা নয়। এথেকেই অভিযান সম্পর্কে ভারতের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রমাণ মেলে। আজ পর্যন্ত এই মহাদেশ ও তার পরিবেশ সম্পর্কে যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার সবগুলিই সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে কম্পিউটারে, যাতে বোতাম টিপলেই তা পাওয়া যায়। বস্তুতঃ পক্ষে গোয়াতে একটা দক্ষিণ মেরু গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে মনে হয়। এই কেন্দ্রে শুধু এবিষয়েই গবেষণা চালানো হবে।

কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত কর্মিসভায় অভিযানের কিছু সদস্য দক্ষিণ মেরু ক্লাব প্রতিষ্ঠার এবং শুধুমাত্র দক্ষিণ মেরু বিষয়ে গবেষণার জন্য রিসার্চ ফেলোশিপ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। আসন্ন অভিযান বিষয়ে কিছু কিছু সুপারিশ করাও হয়েছে। যেমন, অগ্রাধিকার দিয়ে ওজোন গহ্বর সম্পর্কে গবেষণা চালানো হবে। এর আরেকটা হলো ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের বিদ্যুতায়িত আবরণ স্তর আয়ন মণ্ডলের গবেষণার জন্য দক্ষিণ মেরুর সোভিয়েত-ভারত অঞ্চল থেকে ধ্বনি রকেট (সাউন্ডিং রকেট) উৎক্ষেপণ। এই আয়ন মণ্ডলের জন্যই বেতার যোগাযোগ সম্ভব হয়।*

* সোভিয়েত দেশ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃঃ ৪০-৪১

যৎকিঞ্চিৎ

শরণাগতিই শেষ কথা

বলাইলাল চিনি

একজন ব্রাহ্মভক্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রশ্ন করলেনঃ "মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—"নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছো। সা-রে-মা-তে। (সকলের হাস্য)। তোমরা বেশ আছো। নস্ক খেলা জান? আমি বেশ কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো। বেশি কাটাও নাই; তাই আমার মতো জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে—এতো বেশ।

"সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপা-ঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ। যে রঙে ছোপাও সেই রঙেই ছুপবে। দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড়, তো মুখে এমনি ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট (সকলের হাস্য)। আবার পায়ে বুট জুতো, শিস দিয়ে গান করা; এইসব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে অমনি শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, তাহলে ঈশ্বর চিন্তা, হরিকথা, এইসব হবে।

"মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার, একপাশে সন্তান। একজনকে একভাবে, সন্তানকে আর একভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।"

ঠাকুর, এখন আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন কি? কুকুরের লেজের অবস্থা কি হবে তাহলে? তাকে তো কোন মতেই সোজা করার উপায় নেই। সর্বদাই বাঁকা পথ ধরতে চায়। আপনি সর্বশক্তিমান কর্তা। একদিন জোর করে সোজা করে টেনে ধরলেন হয় তো; কিছুক্ষণ পরে যেই ছেড়ে দিলেন সেই আগেকার অবস্থা। পাখি দাঁড়ে বসলে 'রাম রাম' বলে। আবার বনে গেলে কিচির মিচির করে। আপনি তো বলেই ক্ষান্ত। কিন্তু মনটি তৈরি করার ভার যে আমার ওপর ছেড়ে দিলেন। ঠাকুর, আপনি তো জানেন, আমি যে সংসারে থেকে থেকে, আপনার ভাষায়, উট বনে গেছি। কাঁটা ঘাসের লোভ যে কিছুতেই

ছাড়তে পারি না। তাহলে কি করে আপনার রঙে মন রঙাই? মন যে সব রঙে রঙ ধরতে চায় কিন্তু আপনার রঙে রঙাতে গেলে বড় ঝঞ্ঝাট, বড় কষ্ট। মনে যে রসুনের গন্ধ লেগে গেছে। কিছুতেই গন্ধ ছাড়তে চায় না।

আপনি সর্বদা 'মা মা' করেছেন আর মাকে নিয়েই ঘর করেছেন। কিন্তু আমি যে আপনাকে নিয়ে সর্বদা থাকতে পারছি না। আপনি তো জানেন ঠাকুর, সংসারে কুমীর আছে। সর্বদা হাঁ করে বসে রয়েছে। আপনি বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ মাখতে বলেছেন। গায়ে হলুদের রঙ কিছুতেই ছুপতে চাইছে না। আপনি কি জানেন না ঠাকুর, উটের গা লোমে ভর্তি। রঙ ধরবে কেমন করে? তাইতো কাঁটা ঘাস দেখলেই মন উথলে উঠে। রসে বসে আর কতদিন রাখবেন ঠাকুর? সেয়ানা বলে আর কতদিন বোকা বানিয়ে রাখবেন?

মাঝে মাঝে মনে পড়ে আপনার অন্য আর এক কথা। আপনি বলেছেন স্বাধীন ইচ্ছার কথা। স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। 'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'। কিন্তু আমরা দরকার মতো আপনার এই কথাকে অন্যভাবে ব্যবহার করি, যা হলো আসলে মনকে ফাঁকি দেওয়ার আর এক কৌশল। একেই বলে 'ভাবের ঘরে চুরি'।

আসলে আপনি যে সপ্তভূমির কথা বলেছেন। এই সাতভূমি মনের স্থান। কিন্তু নিচের ভূমি তিনটি থেকে মন কিছুতেই এক চুল সরে আসতে চায় না। মন এমনই ফাঁকিবাজ যে, মনে ভাবি সৃষ্টির সবকিছুই তো বোধগম্য হয়ে গেছে। ঈশ্বর-তত্ত্ব অনেক জেনে গেছি। জ্ঞানী হয়ে গেছি। আমি তো আত্মা। আত্মা তো কিছুই ভোগ করে না। ভোগ করে দেহ। প্রকৃতির দেহ। খেলা চলছে—এতো বেশ। ফাঁকি আর কাকে বলে।

প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যজীবনে জ্ঞান তো হয়। কিন্তু জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকাটা আদৌ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মনের স্বাভাবিক গতিই হলো প্রবৃত্তির দিকে। বুদ্ধের এই কষ্টসাধ্য নির্বাণলাভ তত্ত্বটি সহজভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখালেন ভক্তিপথের মধ্যে। তাই আমাদের ঠাকুর বারে বারে বলেছেন ভক্তিপথ সহজ পথ। কলিতে অন্নগত প্রাণ। ভক্তিপথই শ্রেষ্ঠ পথ। এই ভক্তিপথেই আমাদের মনকে ধীরে ধীরে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তির দিকে তৈরি করতে হবে। মন যেন পৃথিবীর মায়া কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তাই তো আমাদের ঠাকুর সর্বত্যাগী হয়েও তবু বারে বারে গাইতেন—

"ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়,
মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুল না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ৷৷"

তাই ধীরে ধীরে নিবৃত্তির পথ অবলম্বনের জন্য ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য পার্থক্যবোধ তিনি মনে রেখেই দেন। তাই ঠাকুর বলছেন: "তুমি মুখে বলতে পার, আমার পাপ পুণ্য সমান হয়ে গেছে; তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি। কিন্তু অন্তরে জান যে, ওসব কথার কথা মাত্র; মন্দ কাজটি করলেই মন ধুগ ধুগ করবে।"

তাহলে মনের এই বিকারের কি ঔষধ? আমাদের ঠাকুর বলছেন: "সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম গুণগান, তাঁকে সর্বদা প্রার্থনা। আমি বলেছিলাম, 'মা, আমি জ্ঞান চাই না, এই নাও তোমার জ্ঞান; এই নাও তোমার অজ্ঞান,—মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও। আর আমি কিছুই চাই নাই।"

"যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলেছেন, 'হে অর্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তিনি সম্বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বলছি—তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?"

আনন্দের সন্তান

ওঁ

স্বামী গোপেশানন্দ

শুনেছি, শ্রীভগবান সর্বভূতেই বিরাজিত এবং তিনি রসস্বরূপ। তিনি যখন রসস্বরূপ তখন সিধান্ত দাঁড়ায় কিছু-না-কিছু রস সব প্রাণীতেই বর্তমান আছে; হয়তো কোথাও তার প্রকাশ বেশি এবং কোথাও কম। রস যখন সকলেরই মধ্যে আছে তখন রসিকতা কাকে বলে সে-জ্ঞানে আমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদের অর্থে, কেউ বাদ নেই—সকলেরই। তাই না, হাতি যে হাতি, সেও তার প্রভু মাহুতের মাথায় নারকেল ফাটায়। একজনের রসিকতায় আর একজনের প্রাণ যায়-যায় হতে পারে। কিন্তু তাই বলে হাতি রসিকতা জানে না—এমন কথা পুরো সাহসের সঙ্গে বলা চলে না। সত্যি কথা বলতে কি, রসিকতায় যদি কাউকে খোঁচা মারা যায় তাহলে রসিকতা নাকি আরো জমে ওঠে। যিনি খোঁচা খান তাঁর কেমন লাগে তা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। তবে রসিকমশায় শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রচুর বাহবা পান—এ আমরা হামেশাই দেখে থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী এই রসিকতা থেকে বাদ পড়েন না। বরঞ্চ সময় সময় তাঁরা এমন রসিকতা করতেন যা আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব। তবে ভক্তেরা ওনাদের রসিকতা দেখে বাহবা না দিয়ে 'আহা, আহা' করেন, এই যা তফাৎ। একে একে তাঁদের রসিকতার কথা বলি। আপনারা আহা, আহা করতে পারেন কিনা দেখুন।

স্বামীজীর রসিকতা:

স্বামীজীর প্রিয় গুরুভাই অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে পোস্তা নির্মাণের কাজে ব্যস্ত আছেন। মাঝ দুপুরে কাঠ-ফাঠা রোদে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় নিবিষ্টমনে কাজ করে চলেছেন। কারণ, জোয়ার আসবার আগেই কাজ শেষ করতেই হবে। এদিকে পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কাজ ছেড়ে দূরে যাবার উপায় নেই। এই সময় দোতলায় অসুস্থ স্বামীজী ডাক্তারের নির্দেশমত বরফ দিয়ে দুধ পান করছিলেন। গ্লাস যখন শূন্যপ্রায় তখন পোস্তার দিকে তাঁর কৃপা-দৃষ্টি পড়ল। কি জানি কি খেয়াল হলো—সেবকের হাতে গ্লাসটা দিয়ে বললেন: "পেসনকে গিয়ে দে।" গ্লাসটি পেয়ে বিজ্ঞান মহারাজ দুঃখিত মনে ভাবলেন: এই অবস্থায়ও স্বামীজী ব্যঙ্গ করছেন। তবু বিজ্ঞান মহারাজ রাগ করে শূন্য গ্লাসটা পোস্তার ওপর আছড়ে না ভেঙে বরঞ্চ স্বামীজীর দু-এক ফোঁটা প্রসাদ যা পাওয়া যায় ভেবে ভক্তি সহকারে যা পেলেন তাই পান করলেন। তার পরে কি হলো, সে বিষয়ে বিজ্ঞান মহারাজ নিজে কি বলছেন দেখি:

"আশ্চর্যের বিষয়, মুখে যেন কে সুধা ঢালিয়া দিল—পিপাসা তখনই দূর হইয়া গেল এবং শরীর স্নিগ্ধ হইল।"[১]

আহা, আমি-আপনি যদি এমন রসিকতা করতে পারতাম তবে আমাদের ভাগ্যে প্রথম চোটেই কি অবস্থা হতো বলুন তো!

মন্দের ভাল, স্বামীজীর কাছ থেকে দু-এক ফোঁটা প্রসাদ তবু পাওয়া গিয়েছিল। এ যদি স্বামীজীর 'রসেবশে' থাকা গুরুদেব হতেন তাহলে বিজ্ঞান মহারাজের ভাগ্যে এক ফোঁটাও জুটতো কিনা সন্দেহ। গুরু কিনা! রসিকতাতেও গুরু! শুনুন তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের রসিকতার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তিনজন ভক্তের সাথে নৌকায় কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর ফিরছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সী বিধবা ভদ্রমহিলাও আছেন। বেলা আড়াই প্রহর। কারও পেটে তখনো কিছু পড়েনি। সকলেরই খিদে পেয়েছে। খিদে প্রচণ্ড হয়ে উঠছে।

১ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭১, পৃঃ ১০১-১০২

আমার মনে হয়, ঠাকুর তখন চাবিকাঠি নাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন। তা না হলে খিদেয় এনারা এতটা উতলা হবেন কেন? অন্ততঃ বিধবা ভদ্রমহিলার তো উপবাসের অভিজ্ঞতা থাকবারই কথা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি[২] বলছে:

"ক্রমশঃ গগনে হৈল অতিশয় বেলা ॥
ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে যবে অগ্রসর।
তখন অতীত প্রায় আড়াই প্রহর ॥
জলস্পর্শ নাই করে সব অনাহারে।
তরী আরোহণ কৈলা ফিরিতে মন্দিরে ॥
কিছু দূরে অগ্রসর আসিলে তরণী।
ক্ষুধায় আকুল হৈল সকলের প্রাণী ॥
পেট যেন তপ্ত খোলা নাড়ী জ্বলে চুঁয়ে।
উপবাসী যেন কত মাসাদি ধরিয়ে ॥"

তারপর আবার শুনুন:

"কিছু কেহ মুখে কিন্তু বলিতে না পারে।
জঠরের জ্বালা খালি জঠরে সম্বরে ॥
ভক্তদের পানে চেয়ে কন প্রভুরায়।
বড়ই পেয়েছে ক্ষুধা পেট জ্বলে যায় ॥
সহিতে না পারি আর ভকত-বৎসল।
জিজ্ঞাসিলা কার কাছে কি আছে সম্বল ॥
লাটু কালী শূন্য-থলি এক বস্ত্র সার।
প্রভুর নিকটে থাকে সেবা করে তাঁর।
ভক্ত-মা[৩] বিশুষ্ককণ্ঠ বাক্য নাহি ফুটে।
বলিলেন এক আনা পুঁজি আছে গেঁঠে ॥"

মাত্র এক আনা পুঁজি! সেটি নিয়ে একজন গেল খাবার কিনতে। বরানগরের ঘাটে নৌকা বাঁধা হলো। বাজার থেকে রসমুণ্ডি এল। সংখ্যায় ষোলটির মতো। কম কি! এবার সরাই প্রসাদ পাবে—সেই আশায় ব্যগ্রভাবে সকলে অপেক্ষা করছে। পুঁথিকার লিখছেন:

"বরানগরের ঘাটে বাঁধিয়া তরণী।
গ্রামের ভিতরে কালী চলিল অমনি ॥
ক্ষুধায় না চলে পদ লাগে পায় পায়।
কিছু পরে রসমুণ্ডি আনিল ঠোঙ্গায় ॥
গুন্তিতে অনেকগুলি প্রায় চারিগণ্ডা।
দেখিয়াই সবাকার প্রাণ হৈল ঠাণ্ডা ॥
প্রসাদ পাবার আশা সকলের মনে।
মিষ্টিমুখে উদর পুরাবে জলপানে ॥"

কিন্তু প্রসাদ পাওয়া আর হলো না কারোরই। অত ব্যগ্রভাবে থাকা—প্রসাদ পেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করবে—কিন্তু সে গুড়ে বালি।

"শ্রীকরে ধরিয়া ঠোঙ্গা মুদিয়া নয়ন।
একে একে সব প্রভু করিলা ভোজন ॥"

কাণ্ড দেখুন! সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে একটা-একটা করে রসমুণ্ডি রসরাজ মহা আরামে শেষ করে দিলেন। ঠাকুরের অত খিদেই যদি পেয়েছিল তাহলে একটা-একটা করে শেষ করলেন কেন? শুধু তাই নয়। ঠোঙায় যাতে নামমাত্র রসমুণ্ডি লেগে না থাকে তার জন্যে পাতাটা চেটে-পুটে, তা আবার নিজে না ফেলে, যার পয়সায় রসমুণ্ডি কেনা হয়েছিল, তার হাত দিয়ে গঙ্গায় ভাসালেন। একি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে নয়? এবার ঠাকুর জল পান করলেন। রসিকতা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

"আজিকার লীলা কথা শুন অতঃপর।
জল পানে শ্রীপ্রভুর ভরিল উদর ॥
প্রভুর তৃপ্তিতে পূর্ণ তৃপ্ত ভক্তগণে।
দেখিয়া রঙ্গের কাণ্ড হাসে তিন জনে ॥

খেলেন তিনি আর পেট ভরে গেল সকলের! রসিকতাটি দেখুন!

আপনারা হয়তো আহা, আহা করে "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ"—পাঠ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমি বলি, থামুন—থামুন। উনি সদাসর্বদা তুষ্টই আছেন। আমরাই তুষ্ট নই, কেন? কারণ, আমরা ভক্ত নই।

এবার রসিক-চূড়ামণির শেষটা দেখুন:

"পরস্পর মুখপানে চায় বারে বারে।
আনন্দ উথলে পড়ে হৃদয় আধারে ॥
প্রভুও তাঁদের সঙ্গে হাসি মিশাইয়া।
উত্তাল তরঙ্গ আরো দিলা উথলিয়া ॥"

সকলের প্রাণ আনন্দে উথলে উঠল। তিনি যেন আনন্দের তরঙ্গ তুলে দিলেন ঐ অভুক্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলির প্রাণে। বুঝুন, এ কোন রসিকতা এবং কোন সে রসিক।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, ৮ম সংস্করণ, ১৩৭৮, পৃঃ ৫৬৫-৫৬৬ ৩ গোলাপ-মা

গ্রন্থ-পরিচয়

কিশোরদের জন্য মহিমান্বিত গ্রন্থ

পলাশ মিত্র

ছোটদের কথামৃত : জিতেন্দ্রনাথ সরকার-সংকলিত। নগেন্দ্র প্রজ্ঞামন্দির, সি/২৭ বাঘাযতীন পল্লী, কলিকাতা-৭০০ ০৯২। আঠার টাকা।

বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ দশটি গ্রন্থের মধ্যে যদি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলেও যেন মন তৃপ্ত হয় না। 'কথামৃত'কে কোনও বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত করাও সুকঠিন কাজ। একাধারে সাহিত্য-শিল্প-সমাজ-ধর্ম-দর্শন, সর্বোপরি অরূপ রতনে ভরা এই রূপসাগরের সন্ধান জানেন না, এমন মানুষ এদেশে বিরল। যিনি যে-দৃষ্টিতেই কথামৃতকে গ্রহণ করুন না কেন, তাতেই তিনি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবেন। বস্তুতঃ কথামৃত নিত্য-পাঠের আজীবন সঙ্গী। এবং এই মহাগ্রন্থ মানুষকে স্বভূমিতে স্থিত হতে প্রভূত সাহায্য করে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী কথামৃতকারকে আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন : "তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এসকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে না জানিবে। তোমার নিকট যে-সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।" উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-র ভূমিকায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ যথার্থই বলেছেন : "এই ভাগ্যধর শ্রীম প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে অসাধারণ সব বাক্যপুষ্পহার চয়ন করিয়া রাখা আছে। এটি নিত্যপাঠের স্বাধ্যায় গ্রন্থ। যে ইহা করিবে তাহার জীবন অমৃতান্বিত হইয়া যাইবে, তাহার মন মোক্ষলুব্ধ হইবে।"

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কথামৃত-র প্রথম ভাগ প্রকাশ হবার পর থেকে পরবর্তী পর্যায়ে আরও চারটি ভাগ প্রকাশিত হয়ে এদেশে জনপ্রিয়তার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। আজও এই মহাগ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব অম্লান। তৎকালীন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা কথামৃতকে 'অমৃতের নিধি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছিলেন : "The exactitude is almost stenographic".

এতদিন কথামৃত শুধু বড়দের পাঠ্যরূপেই গৃহীত হতো। কিশোরদের জন্য আলাদা কোনও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। অথচ এমন এক মহাগ্রন্থের অমৃতস্বাদ থেকে কিশোরসমাজ বঞ্চিত থাকবে—এবেদনায় সঙ্কলক জিতেন্দ্রনাথ সরকার যে সত্যিই অস্বস্তি বোধ করতেন, তার প্রমাণ এই 'ছোটদের কথামৃত'। 'সপ্তম হইতে দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যোপযোগী' এই গ্রন্থ কিশোরদের বহুদিনের প্রত্যাশা সার্থকভাবে পূরণ করল। প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে বক্তব্যের অনুষঙ্গে শিরোনাম-যুক্ত সংকলক শ্রীযুক্ত সরকার ছোটদের কৌতূহল জাগাবার কাজে সফল হবেন বলা যায়। উপযুক্ত বিষয়গুলি তিনি যথাযথভাবে বজায় রেখেছেন। মূল কথামৃতের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের যে মহিমা বিরাজিত, ছোটদের কথামৃতে তা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকার দরুণ বইটির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কোনও দ্বিধা থাকে না। গল্প বলায় এবং ছোট কথায় অপূর্ব চমক সৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তুলনারহিত। তাঁর এক-একটি কথা উজ্জ্বল মণির মতোই পাঠকের মনোলোক আলোকিত করে। ছোটদের কথামৃতে সেই সব কথা ও গল্পের বহু উদাহরণ পাঠ করে কিশোর পাঠকসম্প্রদায় এক নবতর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবে।

আলোচ্য গ্রন্থে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, বলরাম মন্দির, গিরিশ-চন্দ্রের বাড়ি, শ্যামপুকুরবাটী ও কাশীপুর উদ্যান-বাটীর সুন্দর আলোকচিত্র আছে। রুচিসম্পন্ন প্রকাশমানে শোভিত এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা। এছাড়াও একটি পত্রে সংকলককে তিনি লিখেছেন : "ছোটদের কথামৃত বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তক হলে ছোটদের মন অল্প বয়স হতে

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারায় ভাবিত হবে। বাল্যবয়স হতে ঐ ভাবে ভাবিত হতে থাকলে—শুকদেব, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিবেকানন্দ, নেতাজী প্রভৃতির শুভ আগমন ভবিষ্যৎ জগজ্জন আশা করতে পারবে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত স্বমহিমায় ভাস্বর এক অনন্য মহাগ্রন্থ। 'ছোটদের কথামৃত' এই অনুপম ও চিরন্তন মহাগ্রন্থের শাশ্বত স্বাদ আস্বাদনে কিশোর-সমাজকে সহায়তা করবে।

লোকমাতা রাসমণি

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

রানী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত ঃ নির্মলকুমার রায়, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০৭৩। মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা।

বিশ্বসংসারের শাশ্বত নিয়ম এই যে, যা বিরাট ও অসামান্য তার প্রমাণের জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত অনুষঙ্গ ও মাধ্যমের। সৌরজগতে গ্রহমণ্ডলের মধ্য দিয়েই সূর্যের অনন্ত শক্তি ও মহিমা বিচ্ছুরিত হয়। একই নিয়ম লক্ষ্য করা যায় মানবসংসারেও। এই পৃথিবীতে এযাবৎ যত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পরম জ্ঞান ও সাধনার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন যে-মহাপুরুষ তাঁর কাছে এই প্রদীপের সলিতা যোগান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এক বা একাধিক বিশেষ গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি যাঁরা সাধারণ হয়েও ছিলেন অসাধারণ, সংশ্লিষ্ট মহামানবের পূত জীবনেতিহাসে যাঁদের অবদানের কথা সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। লোকমাতা রানী রাসমণি ছিলেন এই ইতিহাসখ্যাত অনন্য মানবগোষ্ঠীরই একজন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার অবিস্মরণীয় ইতিহাস তাঁকে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ। কারণ দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের অনুকূল জাগতিক পরিবেশ তিনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর ধরে অবিচল ভক্তি ও সেবার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন গদাধরের চরণে। এই কারণেই, কানু ছাড়া যেমন গীত নাই তেমনই রানী রাসমণির পুণ্যাবদান উপেক্ষা করে রামকৃষ্ণ-জীবন-জ্যোতির পূর্ণ বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এই ভক্তিমতী রমণীকে শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্ট-নায়িকার একজন রূপে চিহ্নিত করেছিলেন।

তবে শুধু রামকৃষ্ণ-সেবিকারূপেই নয়, এক অসামান্যা রমণীরূপেও রানী রাসমণির ছিল এক স্বতন্ত্র পরিচয়। আধুনিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আলো পাওয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি, তথাপি তিনি ছিলেন এক বিশেষ পরিশীলিত ও শিক্ষিত মনের অধিকারিণী। বস্তুতঃ, তাঁর বহুমুখী কর্মধারায় বারে বারে প্রমাণিত হয়েছিল তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, তাঁর দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও দুর্জয় সাহস। আপন তেজস্বিতা ও বুদ্ধিবলে তিনি বহুবার ইংরেজ-প্রশাসনকে পযুদস্ত করে তার কাছ থেকে ন্যায়বিচার আদায় করতে পেরেছিলেন। নারী হয়েও জমিদারি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিত্তশালিনী হয়েও তিনি মুক্ত ছিলেন বিত্তের অহঙ্কার থেকে এবং সাধারণ মানুষের দুঃখমোচন ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। অর্থাৎ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের এক সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে ও জীবনচর্যায়। আবার নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী হয়েও কর্মক্ষেত্রে তিনি মূলতঃ নির্ভর করেছিলেন যুক্তিবাদের ওপর এবং মানবতাবাদের মহৎ আদর্শ ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম প্রেরণা। এই বিচারে বলা যায় যে, রানী রাসমণি ছিলেন উনিশ শতকীয় নবজাগরণের এক সার্থক প্রতিনিধি।

আজকের ছন্নছাড়া বাঙালী-জীবনে সঙ্গত কারণেই এই মহীয়সী রমণীকে স্মরণ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এজন্যই তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিতের মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। লেখক নির্মলকুমার রায়কে ধন্যবাদ যে, তিনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে রানী রাসমণির ঘটনাবহুল জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার জীবনীকার হিসাবে তিনি যে গভীর নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাও সবিশেষ প্রশংসনীয়। রাসমণির জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে এবং প্রতিটি তথ্য পেশ

করার আগে তিনি যথাসম্ভব যাচাই করে নিয়েছেন। এছাড়া রানী রাসমণি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি অকারণ ভক্তির আবেগে অতিশয়োক্তি বা অতি-কথনে প্রবৃত্ত হননি। সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি এই জীবনচরিত প্রণয়ন করেছেন। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনার বর্ণনা অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ। যেমন, রানী রাসমণির পিতৃকুলের আলোচনা প্রসঙ্গে মাহিষ্য সম্প্রদায় ও শূদ্রবর্ণ সম্পর্কে তিনি যে ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়েছেন তা নিতান্তই গবেষণানির্ভর। আবার রাসমণিকে দেবীর আসনে বসিয়েও তাঁর মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাই রাসমণি অত্যন্ত বিচক্ষণা নারী হওয়া সত্ত্বেও ভুলক্রমে যে তিনি পরমাত্মীয়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন একথা লেখক জানিয়েছেন অকপটে। গ্রন্থটির আর একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে সংযোজিত হয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও প্রাথমিক তথ্যসূত্র যা শুধু রানী রাসমণিকে বুঝতেই সাহায্য করবে না, একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কালপর্বের গবেষণায় আগ্রহী সকল ব্যক্তিরই বিশেষ কাজে লাগবে

মননের আলোকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন

তারকনাথ ঘোষ

বিনয় সরকার ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ঃ হরিদাস মুখোপাধ্যায়। অসীমা প্রকাশনী, ১৮ তারামণি ঘাট রোড, কলকাতা-৪১, মূল্য ঃ দশ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরেই বহু রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে আসছে। সেসবের অনেকগুলিতে ভাবুকতার পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, মননের নিদর্শন তুলনায় অতি বিরল। সেদিক দিয়ে এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট সংযোজন।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ এবং বিদ্যার বহুবিধ শাখায় পারঙ্গম বিনয় সরকারের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। তারই প্রাক্কালে তাঁর ভাবশিষ্য হরিদাস মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর চিন্তার কিছু কিছু পরিচয় এই গ্রন্থে বিন্যস্ত করেছেন—পারম্পর্য রক্ষা করার জন্য নিজেও কিছু কিছু আলোচনা করেছেন।

বিনয় সরকার স্বামী বিবেকানন্দকে যুগ-নেতারূপে উপলব্ধি করেছেন। স্বামীজীর সহোদর মহেন্দ্রনাথ কোন এক প্রসঙ্গে স্বামীজীকে 'অগ্র-সেনা' (Vanguard)-রূপে বর্ণনা করেছিলেন। বিনয় সরকারের দৃষ্টিতে ঐ যোদ্ধৃ-সন্ন্যাসী 'রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সে-সাম্রাজ্য মঠ-মিশনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। 'কিসের জোরে রামকৃষ্ণ জগদ্বরেণ্য গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন' তার চারটি কারণ (মৌল বিশেষত্ব) তিনি নির্দেশ করেছেন। (১) [রামকৃষ্ণের] "কথাগুলিই মানুষকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছে।... কথাগুলি সহজ-সরল মন্তরের মতো ছোট্ট।" (২) "রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল রক্ত-মাংসের মানুষের জন্য রচিত।" (৩) "রামকৃষ্ণ-দর্শনের এক মস্তবড় বিশেষত্ব হলো জীব (মানুষ)=শিব (ভগবান)।" (৪) "রামকৃষ্ণের ধর্মীয় উদারতা এত ব্যাপক ও গভীর ছিল যে, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া ভার।"—তাঁর মতে "বিবেকানন্দ যদি রামকৃষ্ণের আবিষ্কার হয়, রামকৃষ্ণও বিবেকানন্দের আবিষ্কার।" শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীন গভীর সত্য প্রচার করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে যিনি 'তামাম দুনিয়া' জয় করেছেন—তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের কথাও স্মরণ করতে হয়।

এই যথার্থ মনস্বী পুরুষ অর্ধশতাব্দী আগে বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, পরবর্তী কালের আলোচকমণ্ডলী নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দ-সন্দর্শন করলেও এ-জাতীয় মৌলিক চিন্তার পরিচয় বিশেষ দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। গ্রন্থকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব—তিনি স্বল্প পরিসরে আচার্যতুল্য মনীষীর বিভিন্ন চিন্তা সুবিন্যস্ত আকারে পরিবেশন করেছেন। 'বিনয় সরকার ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন' পুস্তিকাটির কাগজের মলাট হলেও কাগজ ও মুদ্রণ দুই-ই উৎকৃষ্ট মানের।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব

বেলুড় মঠে গত ৮ ডিসেম্বর '৯০ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৮তম আবির্ভাব-উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। সারাদিন ব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানে অগণিত ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। দুপুরে ২১ হাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী।

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৮ ডিসেম্বর **মাদ্রাজ সারদা বিদ্যালয়ের** সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, ছাত্রসম্মেলন, পুরস্কার-বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তামিলনাড়ুর শিক্ষামন্ত্রী আনবাঝাগন। আশীর্বাদসূচক ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ এবং সুবর্ণ-জয়ন্তী-ভাষণ দেন স্বামী গহনানন্দজী। অনুষ্ঠানে বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, প্রাক্তন ছাত্র, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী, ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়। এই বিদ্যালয়ের অধীনস্থ মডেল স্কুলগুলি ২৩—২৫ ডিসেম্বর এবং উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ২৬, ২৭ ও ২৯ ডিসেম্বর এই উৎসব উদ্‌যাপন করে।

কোয়েম্বাটোর কেন্দ্র (তামিলনাড়ু) পরিচালিত কলেজের হীরকজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে গত ২৩ ডিসেম্বর। ঐদিন এক অনুষ্ঠানে হীরক-জয়ন্তী ভবনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল মিঃ সুব্রমণ্যম। গত ২৯ ডিসেম্বর এই কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত পলিটেকনিক কলেজের হীরকজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ঐদিন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী এই কলেজের ডায়মন্ড জুবিলি ব্লকের উদ্বোধন করেন এবং ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম।

রাজকোট আশ্রম গত ২৪ নভেম্বর '৯০ একদিনের একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। মোট ৪০০ জন যুবপ্রতিনিধি এবং কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় ছিল প্রশ্নোত্তর-পর্ব।

গত ১৯৯০-এর ১৭ নভেম্বরে **গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার** জাতীয় সংহতি বিষয়ে সারাদিন ব্যাপী একটি আলোচনা-সভার আয়োজন করে। আলোচনা-সভার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ নুরুল হাসান এবং স্বাগত ভাষণ দেন ইনস্টিটিউটের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী।

উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অধিবেশন সহ মোট চারটি অধিবেশনে জাতীয় সংহতির সমস্যাটিকে ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের এমারিটাস অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত, জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূতপূর্ব অধিকর্তা ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এই অধিবেশনগুলিতে সভাপতিত্ব করেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঐতিহাসিক ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অর্থ-নীতির অধ্যাপক ডঃ ধীরেশ ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক অমলেন্দু দাশগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অন্যতম সহ-উপাচার্য ডঃ ভারতী রায়, হুগলী মহসীন কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমান এবং বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব ও বর্তমান দুই উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু ও ডঃ অশীন দাশগুপ্ত।

ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতালে গত ২ ও ৩ নভেম্বর '৯০ 'এ্যাসোসিয়েশন অব দ্য

অটোলারীঙ্গোলজিস্টস অব ইন্ডিয়া' কর্তৃক তাদের আঞ্চলিক পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়াংফা লোয়াং। এ-উপলক্ষে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকগণ সম্মেলনের বিজ্ঞান-অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে ইটানগর হাসপাতালের নার্সিং স্কুলের ছাত্রীগণ এবং দনি পোলো মিউজিক কলেজের কর্মিগণ একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সম্মেলনে বিদায়ী ভাষণ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়াংফা লোয়াং।

উদ্বোধন

গত ২৫ ডিসেম্বর **সরিষা আশ্রমের** নবনির্মিত অফিস-বাড়ির উদ্বোধন করেন স্বামী গহনানন্দজী। গত ২৬ ডিসেম্বর তিনি চিঙ্গেলপত্তু আশ্রমেও (তামিলনাড়ু) একটি নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন করেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৮ ডিসেম্বর একটি পাঠগৃহের (study hall) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী গহনানন্দজী।

ছাত্র-কৃতিত্ব

গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের বি. এ. পরীক্ষায় **মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ কলেজের** একজন ছাত্র ইংরেজীতে ৫ম স্থান এবং দর্শনশাস্ত্রে তিনজন ছাত্র যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থান লাভ করেছে।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

গত ৮ থেকে ১৩ অক্টোবর '৯০ **রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গলের** ব্যবস্থাপনায় কামারপুকুরে এক বিনা-মূল্যে চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালিত হয়। ঐ শিবিরে মোট ১০৫ জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। শিবিরে রোগীদের বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। গত ১৬ ডিসেম্বর তাদেরকে বিনামূল্যে চশমাও দেওয়া হয়েছে। এটি ছিল পল্লীমঙ্গলের ব্যবস্থাপনায় নবম চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

উড়িষ্যা বন্যাত্রাণ: **ভুবনেশ্বর আশ্রমের** মাধ্যমে গঞ্জাম জেলার ধারাকোতে এবং সোরদা ব্লকের ১৪টি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৬৪০টি পরিবারকে ২৮৯০টি ধুতি, ২৭৭২টি শাড়ি, ২৭৯২ সেট শিশুদের পোশাক, ৩৩৫ সেট এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র (প্রতি সেটে ৭টি বাসন) দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন

গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের লক্ষ্মীপুরম গ্রামে নির্মীয়মাণ আশ্রয়-গৃহের একতলার ছাদ-ঢালাইয়ের জন্য আর. সি. সি. কলাম তোলা হয়েছে। তাছাড়া চন্দ্রমৌলিপুরম এবং মুক্তেশ্বরমে দুটি আশ্রয়-গৃহ নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে ও আর. সি. সি. কলাম তোলার কাজ চলছে। বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামঞ্চিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম ও ধর্মভরম গ্রামে বাড়ি তৈরির কাজ চলছে এবং সেখানে তৃতীয় আবাসন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মালকান গোমটির বিদ্যালয়গৃহ-সহ আশ্রয় গৃহের চুনকাম করার কাজ শেষ হয়েছে।

গুজরাটের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভাবনগর জেলায় **রাজকোট আশ্রমের** মাধ্যমে পুনর্বাসন কাজ পরিচালনা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বহির্ভারত

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া): গত জানুয়ারি মাসের রবিবার ও বুধবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া ২৬ জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা হয়েছে। ১ জানুয়ারি সকাল দশটায় নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ পূজা এবং পরে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ৭ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন করা হয়। ঐদিন বিশেষ পূজা, ধ্যান, সঙ্গীত স্তোত্রপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানান্তে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে ১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ভাষণ দেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১৯ জানুয়ারি পূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, ভক্তিগীতি,

ব্রহ্মানন্দজীর উপদেশ পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার: জানুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার ও প্রতি মঙ্গলবার যথাক্রমে মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ও গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর ক্লাস নিচ্ছেন।

টরন্টো বেদান্ত সোসাইটি (কানাডা): গত ৮ ডিসেম্বর '৯০ শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর যিশুখ্রীস্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর রাত্রে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাক্ নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। ১ জানুয়ারি '৯১ বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে, শ্রীশ্রীমা, যীশুখ্রীস্ট এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ওপর আলোচনা হয়। বুধবারগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের ওপর ক্লাস হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

জাতীয় যুবদিবস

গত ১২ জানুয়ারি '৯১ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ৫ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় **উদ্বোধন কার্যালয়ের** সারদানন্দ হল-এ বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বয়স অনুযায়ী প্রতিযোগীদের দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়। ক বিভাগে ১৫ থেকে ২১ বছর এবং খ বিভাগে ২২ থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছিল। ক ও খ বিভাগে বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ ও আজকের যুবসমাজ'। আবৃত্তির বিষয় ছিল যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'পানপাত্র' (The Cup) ও 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' (To The Awakend India)। খ বিভাগের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নয়াদিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী পঙ্কজা কুলাবকার প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় ১২ জানুয়ারি বিকাল ৪টায়। বিকাল ৩টায় কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় স্থানাধিকারীরা তাদের বক্তৃতা ও আবৃত্তি পুনরুপস্থাপনা করে। ধানবাদ থেকে আগত প্রতিনিধি অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়ও সভায় ভাষণ দেন। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকেই স্বামী বিবেকানন্দের বই দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগীদের মোট সংখ্যা ছিল ২০০ জন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব এবং পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্বামী মন্ত্রসঙ্গানন্দ। সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত ও সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় প্রায় ৪০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ২৩ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে উপস্থিত সকলকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীপ্রচার সঙ্ঘ কর্তৃক গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

গত ১২ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের এবং ৩০ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী গর্গানন্দ ও স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

গত ২৪ ডিসেম্বর যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাবের প্রাক্ সন্ধ্যা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। এদিন সন্ধ্যায় যীশুখ্রীস্টের প্রতিকৃতির সম্মুখে আরাত্রিক, ক্যারল সঙ্গীত ও ভোগরাগ নিবেদন করা হয়। তাঁর বাণীর তাৎপর্য আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানান্তে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৬ ডিসেম্বর **কটক শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতির** উদ্যোগে স্থানীয় আলমচাঁদ বাজার দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে সকাল দশটায় আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নবকুমার দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক 'সমাজ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদিকা মনোরমা মহাপাত্র। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন সুনীলচন্দ্র পালিত। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্নেহময়ী মহাপাত্র ও অপর্ণা ঘোষ। ঐদিন প্রায় দেড়হাজার ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভার শেষে 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ভি.ডি.ও. শো দেখানো হয়। ঐদিন মনোরমা মহাপাত্র কর্তৃক অনূদিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নামে একটি বই ও সমিতির মুখপত্র 'বিবেক প্রভা'র বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ঐদিন অপরাহ্ণে জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রতি সভাতেই প্রায় দেড় হাজার ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

জলেশ্বর সর্বধর্ম-সমন্বয়ী আশ্রম (উড়িষ্যা)ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর এই আশ্রমের উদ্যোগে জলেশ্বর মেঘমরাই বিবেকানন্দ পল্লীতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৮তম জন্মোৎসব পালিত হয়। ঐদিন প্রায় দেড়হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা।

শিখরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ মাতৃমন্দিরে (পোঃ বাগু, উত্তর ২৪ পরগনা) গত ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ শনিবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ১৩৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এ-উপলক্ষে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্পর্কীয় প্রবন্ধ পাঠ ও আবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্পর্কীয় পুস্তক বিতরণ করা হয়। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বরাহ-নগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুধীর কুমার রাহা। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করেন বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বাগু সর্বেশ্বর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণকান্ত দত্ত এবং কাজিয়ালপাড়া শ্রীমা কে. জি.-র অধ্যক্ষা আলপনা মণ্ডল। এদিন দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

উত্তর বাকসারা (হাওড়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রঃ গত ১৫ ডিসেম্বর '৯০ এই পাঠচক্রের প্রথম বর্ষ-পূর্তি-উৎসব ও শ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৮তম জন্মোৎসব পালন করা হয়। এদিন বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডি-পাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে এক ধর্মসভারও আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন সভার প্রধান অতিথি বরুণকুমার ভট্টাচার্য ও সভাপতি স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। পাঠচক্রের বার্ষিক বিবরণ ও উদ্দেশ্য এবং 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন পাঠচক্রের সম্পাদক প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন অঞ্জলি চক্রবর্তী, সান্ত্বনা ভট্টাচার্য ও পাপিয়া চক্রবর্তী। সন্ধ্যায় লীলাগীতি পরিবেশন করেন বেতারশিল্পী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও সহশিল্পিবৃন্দ। উল্লেখ্য এই পাঠ-চক্রের দ্বারা স্থানীয় গরিব অধিবাসীদের জন্য একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়।

অসমের শিবসাগর জেলার সোনারী রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি ও শ্রীশ্রীসারদা সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে সোনারী রামকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৮তম জন্মতিথি-উৎসব সারাদিন ব্যাপী নানা

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। ঐদিন প্রায় ৫০০ জন ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করেন জিতুমণি বরঠাকুর ও বিমলেন্দুকুমার বোস। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে পাঠ করেন বাণী সেনগুপ্ত।

রামপাড়া (হুগলী) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘের সহযোগিতায় গত ২২ ডিসেম্বর '৯০ বিকাল ৩টায় শিয়াখালার উত্তরবাহিনী বিশালাক্ষী মন্দির প্রাঙ্গণে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ সভায় 'ধর্মের লক্ষ্য' বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গত ২৪ ও ২৫ নভেম্বর '৯০ **পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্র প্রাঙ্গণে** উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ৭ম ষাণ্মাষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ভক্তসম্মেলন, যুবকদের মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং ধর্মমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয় দিন ভাব-প্রচার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত আশ্রম-সমূহের কার্যাবলী ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারে তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন সন্ধ্যায় এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সুমেধানন্দ ও স্বামী মুক্তিকামানন্দ। এই সম্মেলনে ২৯টি সদস্য আশ্রমের মোট ৬০ জন প্রতিনিধি এবং ভাব-প্রচার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক স্বামী প্রমেয়ানন্দ, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভাবপ্রচার পরিষদের সভাপতি স্বামী উদ্গীথানন্দ, স্বামী রঘুনাথানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, স্বামী নিয়তাত্মা-নন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

রামপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ এবং **কলকাতা রোটারী ক্লাবের** সহযোগিতায় গত ১৮ নভেম্বর আঁইয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি (হুগলী) পাঁচদিনের বিনামূল্যে এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। মোট ৩৬ জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। রোগীদের ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

বহির্ভারত

কানাডার টরন্টো থেকে ৪০০ কি. মি. দূরে **উইন্ডসর বিশ্ববিদ্যালয়ের** ধর্মশিক্ষা বিভাগ (ডিপার্ট-মেন্ট অব রিলিজিয়াস স্টাডিজ) এবং ভারতীয় ছাত্রসংগঠন (ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন) -এর আমন্ত্রণে গত ১৫ ডিসেম্বর '৯০ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের **টরন্টো** কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ 'বেদান্ত এবং আধুনিক যুগ' বিষয়ে ভাষণ দেন।

পরলোকে

চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের উপকেন্দ্র শেলা আশ্রমের একনিষ্ঠ খাসি ভক্ত **রামানন্দ রায়** ৫৫ বছর বয়সে গত ৮ সেপ্টেম্বর '৯০ সকাল ৮-০৫ মিনিটে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীশ্রীমায়ের নাম করতে করতে পরলোকগমন করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শেলা আশ্রমের দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পূজানুষ্ঠানা-দিতে তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী। খাসি ভাষায় পৌরাণিক নাটক অভিনয় করা এবং দেবীর প্রতিমা নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

অশোকনগর শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্মী **সরোজ ধর** গত ২৫ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের (তুলসী মহারাজ) মন্ত্রশিষ্য। তাঁর স্বামী প্রয়াত যোগেন্দ্র ধর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাংলাদেশস্থ নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠের জমির কিছু অংশও তিনি দান করেছিলেন।

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (উদ্বোধন কার্যালয়ের) স্বেচ্ছাসেবী **কানাইলাল মজুমদার** গত ২৮ নভেম্বর ১৯৯০ সন্ধ্যায় ৬-৪০ মিঃ সময়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। কর্মজীবনে তিনি ভারত সরকারের সংস্থা জেসপ অ্যান্ড কোম্পানীতে সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর কর্মরত থাকার পর অবসর গ্রহণ করে উদ্বোধন কার্যালয়ে ছয় বছর কাল সেচ্ছাসেবাদানে রত ছিলেন। কর্মনিষ্ঠা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

শিশুদের কি হাঁপানিরোগ বেড়েছে

১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংলন্ডে ৬ থেকে ৩৪ বছর বয়স্কদের হাঁপানিতে মৃত্যুর হার বেড়েছে। এটা একটু আশ্চর্যের ব্যাপার, কারণ যেসব অসুখের ভাল ওষুধ আছে, তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার কমেছে। এই রোগবৃদ্ধির সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক এবং ইউনাইটেড স্টেট্‌সেও। যেসব শিশু ১৯৬১ থেকে ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের ভিতর জন্মেছে, তাদের মধ্যে ১৫,০০০ জন ছেলে ও ১৪,১৫৬ জন মেয়েকে প্রাইমারি স্কুলে পরীক্ষার আওতায় এনে একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। তাদের অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, গত এক বছরে তাদের ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানির টান হয়েছিল কিনা।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রোগ সত্যই বেড়েছে এবং এই বাড়াটা রোগনির্ণয়-পদ্ধতির উন্নতির জন্য নয়। রোগটা যখন অ্যালার্জিটিক (শরীরের অস্বাভাবিক অত্যধিক প্রতিক্রিয়াশীলতা-জনিত), তখন যেসব জিনিসে অ্যালার্জি হয়, সেগুলি বেড়েছে অথবা শরীরে অ্যালার্জি হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। প্রথমোক্ত সম্ভাবনা কম। শেষোক্ত সম্ভাবনার মধ্যে মায়েদের বিশেষতঃ গর্ভবতী মায়েদের ধূমপান একটি, তবে নিশ্চিত প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি।

[British Medical Journal, 19 May, 1990, pp. 1306-1309]

বাদাম খেয়ে অ্যানাফাইলেক্সিস (সাংঘাতিক) ধরনের অ্যালার্জি

খাদ্য থেকে যে অ্যানাফাইলেক্সিস হতে পারে তা অজানা নয়। কিন্তু সম্প্রতি ১৮ মাসের মধ্যে লন্ডনে ১৫-২৩ বছর বয়স্ক চারজন বাদাম (peanut) খাওয়ার পর এই রোগ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে দুজন মারা যায়। চারজনই শৈশবকাল থেকে জানত যে, তাদের বাদামে অ্যালার্জি আছে এবং তারা বাদাম খেত না, কিন্তু খাবারে বাদাম দেওয়া আছে তা না জেনে তারা সেই খাবার খেয়েছিল। তাদের ওপর নানাভাবে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, বাদামের জন্যই তাদের এই অসুখ হয়েছিল। তিনজন বাড়ির বাইরে অন্যত্র খাবার খেয়েছিল। তিনজনের শ্বাসযন্ত্রে ও হৃদ্‌পিণ্ডে বৈকল্য দেখা দিয়েছিল।

প্রতিরাত্রে নাসিকাগর্জন হৃদ্‌রোগ ঘটাতে পারে

সম্প্রতি নাকডাকার সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ড ও রক্ত-নালীর বৈকল্যের সম্পর্ক নিয়ে কয়েকটি গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান রিপোর্টে নাক-ডাকার সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত চলাচল বন্ধ বা মায়ো-কার্ডিয়্যাল ইনফার্কশন (Myocardial infarction)-এর সম্পর্ক দেখানো হচ্ছেঃ

৫০ জন রোগীকে (৪১ জন পুরুষ, ৯ জন মহিলা—বয়স ৩৮-৮৩ বছর, গড় ৬৩·৮ বছর), যারা এই প্রথমবার মায়োকার্ডিয়্যাল ইনফার্কশন হয়ে ইটালির বলোগনা অঞ্চলের হাসপাতালে করোনারি কেয়ার বিভাগে ভর্তি হয়েছিল, পরীক্ষা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বলোগনা অঞ্চলে হৃদ্‌পিণ্ডের অসুখ হয়নি, অথচ নাক ডাকে তাদেরও কন্ট্রোল হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। নাকডাকার সময়ে কিছুটা শ্বাসরোধ হয়। তুলনা-মূলক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যাদের প্রতিরাত্রে নাক ডাকে, তাদের মায়োকার্ডিয়্যাল ইনফার্কশন হবার সম্ভাবনা বেশি। আরও বিস্তৃতভাবে এই পরীক্ষা চালিয়ে যদি উপরোক্ত তথ্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে নাকডাকা লোকেদের (যাদের কিছুটা শ্বাসরোধ হয়) চিকিৎসা করা উচিত।

[British Medical Journal, 16 June, 1990, pp. 1557-1558]

উদ্বোধন ৯৩তম বর্ষ চৈত্র ১৩৯৭

সম্পাদক

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

Statement about Ownership and Other Particulars of

UDBODHAN

FORM IV

Place of Publication :	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700003
Periodicity of its Publication :	Monthly
Printer's Name	Swami Satyavratananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
Publisher's Name	Swami Satyavratananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
Editor's Name	Swami Satyavratananda & Swami Purnatmananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
Name & Address of individuals who own the Newspaper	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal

Swami Bhuteshananda	*President*	do
Swami Tapasyananda	*Vice-President*	do
Swami Ranganathananda	*Vice-President*	do
Swami Gahanananda	*General Secretary*	do
Swami Atmasthananda	*Asstt. Secretary*	do
Swami Gitananda	" "	do
Swami Prabhananda	" "	do
Swami Satyaghanananda	*Treasurer*	do
Swami Bhajanananda		do
Swami Gautamananda		do
Swami Hiranmayananda		do
Swami Mumukshananda		do
Swami Prameyananda		do
Swami Shivamayananda		do
Swami Smarananda		do
Swami Tattwabodhananda		do
Swami Vagishananda		do
Swami Vandanananda		do

I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI SATYAVRATANANDA
Signature of Publisher

Date : 1. 3. 1991.

Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

চৈত্র, ১৩৯৭ মার্চ, ১৯৯১ ৯৩তম বর্ষ—৩য় সংখ্যা

দিব্য বাণী

ধর্ম অনুরাগে—বাহ্য অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমেই ধর্ম। যদি দেহ মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা।··· কে শিবের প্রিয়তর? যিনি শিবের সন্তানগণের সেবা করেন।··· যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে—জগতের জীবগণের সেবা আগে করিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

শিব-উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য

ভারতবর্ষে শিব-উপাসনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। সম্ভবতঃ বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা শিব। কবে তাঁহার উপাসনার সূচনা হইয়াছিল তাহা কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব নহে। কারণ, বৈদিক যুগের পূর্বেও যে পশুপতি শিব পূজিত হইতেন তাহার প্রমাণ সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া গিয়াছে। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিব বা রুদ্র বা অগ্নি প্রথমে অন্যতম প্রধান দেবতা ছিলেন। ক্রমে 'শিব' অভিধাটি পরম ব্রহ্মের সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইতে শুরু করে। অর্থাৎ 'শিব' ও 'ব্রহ্ম' উভয় শব্দই পরম সদ্‌বস্তুর অভিধা হইয়া দাঁড়ায়। পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বা মহেশ্বর এই ত্রয়ীকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুর ধর্ম ও ঈশ্বর-ভাবনা গড়িয়া উঠে। পুরাণে বলা হইয়াছে, উঁহারা নাম ভেদে তিন হইলেও স্বরূপতঃ এক পরমেশ্বরের তিন প্রকাশ। তিনে এক, একে তিন। বলা হইয়াছেঃ "যো বিষ্ণুঃ স স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্মাসৌ মহেশ্বরঃ।"—যিনি বিষ্ণু তিনিই ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মা তিনিই মহেশ্বর। (বরাহপুরাণ, ৭০।২৬) বলা হইয়াছেঃ "যো ভেদং কুরুতে ত্রয়াণাম্"—যে-ব্যক্তি তিন দেবতার মধ্যে ভেদ কল্পনা করে, "স পাপকারী দুষ্টাত্মা দুর্গতিং সমবাপ্নুয়াৎ"—সে পাপাত্মা, সে দুষ্টবুদ্ধি এবং তাহার ভাগ্যে নিতান্ত দুর্গতি ঘটে। (বরাহপুরাণ, ৭০।২৭)

পরম সদ্‌বস্তু বা ব্রহ্ম যে এক, বিভিন্ন দেবতা যে আসলে উঁহারই বিভিন্ন নাম বা প্রকাশ, ইহা অবশ্য পৌরাণিক যুগের ঋষিগণের উপলব্ধি নহে, ইহা বৈদিক যুগের ঋষিগণেরই আবিষ্কার। ঋক্, সাম্, যজুঃ ও অথর্ব চতুর্বেদেই এই তত্ত্বটি সুস্পষ্ট-ভাবে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের যুগ হইতে দেখা যাইতে শুরু করিল যে, বাস্তব ক্ষেত্রে তিন প্রধান দেবতার মধ্যে শিবই সমাজের সকল শ্রেণী ও বর্ণের নিকট অধিক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন এবং একমাত্র তাঁহারই একটি লোকায়ত রূপকল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। শিবের উপাসনায় স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, পাপী-পুণ্যবান, আর্য-অনার্য, হিন্দু-অহিন্দু সকলের সমান অধিকার। শুচি-অশুচি, মন্ত্র-তন্ত্র, উপচার-উপকরণের প্রশ্ন শিবপূজায় অবান্তর। কিভাবে যে শিব এবং তাঁহার উপাসনা সম্পর্কে এইরূপ ধ্যান-ধারণা গড়িয়া উঠিল তাহা পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়।

পরবর্তী কালে আচার্য শঙ্কর ভারত-ইতিহাসের ধারা ও গতিপথ বিশ্লেষণ করিয়া এবং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের নির্যাসকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্ম ও শিবের অভিন্নতার ধারণাকে পুনরায় জনপ্রিয় করিয়া দিলেন। তাঁহার বিখ্যাত 'নির্বাণষট্‌কম্' স্তোত্রে আচার্য শঙ্কর লিখিলেন ঃ "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্"—আমি চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ, আমি শিব, আমিই শিব।

ব্রহ্ম ও শিবের এই একীকরণ তথা জীব ও ঈশ্বরের এই সমীকরণ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের মধ্যে বিধৃত থাকিলেও 'শিবাবতার' আচার্য শঙ্করই উহাকে সুদৃঢ়-ভাবে মানুষের সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। অথর্ব-বেদের অন্তর্গত কৈবল্য উপনিষদের এই মন্ত্রগুলি (৫—৮) আচার্যের সাক্ষাৎ প্রেরণা হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল কিনা গবেষকগণ ভাবিয়া দেখিতে পারেন ঃ

হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং
বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং
শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্॥

তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং
বিভুং চিদানন্দরূপমদ্ভুতম্।
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্॥

ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ।
স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ
সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্॥

স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ
স এব সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥

—রাগদ্বেষরহিত, বিশুদ্ধ, নির্মল, শোকাতীত, বাক্যমনের অগোচর, অব্যক্ত, অনন্ত, শিবস্বরূপ, অবিদ্যাদিদোষরহিত জগৎকারণকে আপন হৃদয়-কমল মধ্যে গভীরভাবে মনন করিয়া [এবং] আদি-মধ্য-অন্ত বিহীন, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী চৈতন্য ও আনন্দরূপ, দুর্লভ, উমাপতি, সর্বনিয়ন্তা, ত্রিলোচন নীলকণ্ঠ, শান্তমূর্তি পরমেশ্বরকে নিদিধ্যাসন করিয়া মুমুক্ষু সাধক সর্বভূতের কারণ, নিখিলব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক, অবিদ্যার ঊর্ধ্বে অবস্থিত তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষরপুরুষ, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্ব-নিরপেক্ষ। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই বায়ু, তিনিই কালরূপী অগ্নি, তিনিই চন্দ্র। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ আবার চিরন্তন—সকলই তিনি। তাঁহাকে জানিলে [মানুষ] মৃত্যুকে অতিক্রম করে। তদ্‌ব্যতীত মুক্তির অপর কোন উপায় নাই।

মানুষমাত্রেই যে স্বরূপতঃ শিব অথবা ব্রহ্ম, সেই অমৃতবার্তা আচার্য ভারতবর্ষের মানুষকে শুনাইয়া-ছিলেন। কিন্তু কালপ্রবাহে মানুষ তাহা ভুলিয়া গেল। আচার্য মানুষকে স্বয়ং শিব হইতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক-একটি জীবন্ত শিবমূর্তি হইয়া উঠিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ ক্রমে তাহা বিস্মৃত হইয়া মৃত্তিকা ও প্রস্তর-নির্মিত শিবমূর্তির পূজা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্মবাণী শাস্ত্রমধ্যেই আবার নিবদ্ধ হইয়া গেল। পূজা-উপাসনার নামে সারা দেশে পুরোহিততন্ত্রের অপশাসন কায়েম হইয়া পড়িল।

মানুষের অন্তর্নিহিত শিবত্বের ধারণা অর্থহীন আচার-অনুশাসনের আবর্জনায় চাপা পড়িয়া গেল।

তাহার পর বেশ কয়েকটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হইল। ভারতবর্ষে শঙ্করের তুল্য প্রজ্ঞা, মেধা ও মনীষা লইয়া আবির্ভূত হইলেন একজন তরুণ আচার্য। শুধু ভারতের নহে, জগতের মানুষের জন্য তিনি পুনরায় জাগরণের আহ্বান লইয়া আসিলেন। তিনি 'শিবাবতার' স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলিলেন: শিব-উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য হইল প্রত্যেক মানুষের স্বয়ং শিব হইয়া উঠা। "দেব ভূত্বা দেবং যজেৎ।" স্বয়ং দেবতা হইয়া দেবতার উপাসনা। আত্মার দ্বারা আত্মার পূজা।

স্বামীজী বলিলেন: "এস, আমাদের ধর্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য—যাহা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য, তাহারই ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হই।"

কি সেই কেন্দ্রীভূত সত্য? স্বামীজী বলিলেন: "সেই কেন্দ্রীভূত সত্য—এই অজর অনন্ত সর্বব্যাপী অবিনাশী মানবাত্মা, যাঁহার মহিমা স্বয়ং বেদ প্রকাশ করিতে অক্ষম, যাঁহার মহিমার সমক্ষে অনন্ত সূর্য চন্দ্র তারকা নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকামণ্ডলী বিন্দু-তুল্য। প্রত্যেক নরনারী, শুধু তাহাই নহে, উচ্চতম দেবতা হইতে তোমাদের পদতলে ঐ কীট পর্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা—হয় উন্নত, নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নয়, পরিমাণগত।

"আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করিলে জাগতিক উন্নতি হয়, চিন্তার উপর প্রয়োগ করিলে মনীষার বিকাশ হয় এবং নিজেরই উপর প্রয়োগ করিলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়।

"প্রথমে এস, আমরা দেবত্বলাভ করি, পরে অপরকে দেবতা হইতে সাহায্য করিব। 'নিজে সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। মানুষকে পাপী বলিও না; তাহাকে বল, 'তুমি ব্রহ্ম'।

"এস, আমরা বলিতে থাকি, 'আমরা সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, আর আমরাই ব্রহ্ম, শিবোঽহং শিবোঽহম্'।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৪৬৪—৪৬৫)

শিবপূজার অর্থ আত্মপূজা—নিজের পূজা। আমার মধ্যে যে ব্রহ্মশক্তি আগুনের স্পর্শবিহীন অঙ্গাররূপে নিহিত রহিয়াছে, উহাকে ঐ পূজার যজ্ঞাগ্নির স্পর্শদান করিতে হইবে। মুহূর্তে ঐ কৃষ্ণ অঙ্গার একটি অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হইবে। আমার মধ্যে ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিবেন, শিব জাগিয়া উঠিবেন। আমি স্বয়ং শিব হইয়া যাইব, আমি শিবস্বরূপ প্রাপ্ত হইব।

আচার্য শঙ্কর শাস্ত্রের নির্যাসস্বরূপ 'শিবোঽহম্' মন্ত্র জগৎকে দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি জগৎকে শিবের জীবন্ত বিগ্রহও দান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—জীব ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। শঙ্কর বলিয়াছিলেন, জীবই শিবের জীবন্ত বিগ্রহ। জীবই শিবের সাক্ষাৎ মূর্তি। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম বা শিব প্রতিটি জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন। (কঠ উপনিষদ্, ২।২।৯-১০; ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্, ১২; অমৃতবিন্দু উপনিষদ্, ১২) গীতাতেও (১৩।২৮-২৯, ১৮।২০) বলা হইয়াছে, বহুধাবিভক্ত সর্বভূতে এক অবিভক্ত অক্ষয় সত্তার দর্শনই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, যথার্থ দর্শন।

ভাগবতে শ্রুতি ও গীতার সূত্রটিকে বিস্তারিত করিয়া বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হইল, সর্বভূতের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে বিরাজিত ঈশ্বরকে উপাসনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হইল সর্বভূতের সেবা; শুধু শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিই নহে, বলা হইল, তাহাই একমাত্র ফলপ্রসূ পদ্ধতি:

"অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্ ॥
যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
(ভাগবত, ৩।২৯।২১-২২)

—সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ হইয়া আমি সর্বভূতে সতত বিরাজমান। এতাদৃশ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যে-ব্যক্তি প্রতিমাদি নির্মাণ করিয়া আমার পূজা করে, সে শুধু পণ্ডশ্রমই করে। আমি সর্বভূতে বর্তমান এবং সকল প্রাণীর আত্মাস্বরূপ ও ঈশ্বর। যে-ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ আমার সেই সত্তাকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিমায় আমার পূজা করে সে কেবল ভস্মেই আহুতি প্রদান করে।

সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভাগবতে (৩।২৯।২৪) বলা হইল ঃ "নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ"—জীবগণকে অপমান করিয়া প্রতিমাদিতে আমাকে অর্চনা করিলে আমি প্রীত হই না।

অর্থাৎ জীবসেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ পূজা। সেই পূজা কিভাবে করিতে হইবে? জীবকে জীবজ্ঞানে নহে, জীব ও ঈশ্বরে অভেদজ্ঞানে জীবের পূজা করিতে হইবে। "অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা" (ভাগবত, ৩।২৯।২৭)। পূজা করিতে হইবে জীবকে দান করিয়া। সেই দান যেন 'দয়া' না হয়, তাহাতে যেন সম্মান বা শ্রদ্ধা সংযুক্ত থাকে, আর থাকে মৈত্রী বা প্রীতি। কেন শ্রদ্ধা এবং কেন প্রীতি? কারণ, জীব তো জীব নহে, জীব এবং ঈশ্বর যে অভিন্ন। সেই দৃষ্টিতে যখন মানুষ জীবের সেবা করে তখন উহা উপাসনায় পর্যবসিত হয়।

লীলাপ্রসঙ্গ এবং কথামৃতে দেখি এযুগে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণও ঐ একই কথা বলিতেছেন ঃ "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"; "যত্র জীব তত্র শিব"; "চোখ বুজলে ঈশ্বর আছেন, আর চোখ খুললে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন।"; "অগ্নিতত্ত্ব সব জিনিসে রয়েছে, কিন্তু কাঠে বেশি প্রকাশ। ঈশ্বর সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশি প্রকাশ।" "প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?" ইত্যাদি। কাশীর বিশ্বনাথ দর্শন অপেক্ষা দীন-দরিদ্র মানুষের সেবা তাঁহার নিকট অগ্রাধিকার পাইয়াছিল। 'সচল' শিবগণের সেবার জন্য 'অচল' বিশ্বনাথের পূজাকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সেই কাহিনী সর্বজনপরিচিত। জীবন্ত শিবের উপাসনার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের 'উৎসব-বিগ্রহ' স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে আহ্বান জানাইয়া বলিলেন ঃ

"ওরে মূর্খদল!
জীবন্ত দেবতা ঠেলি',
অবহেলা করি'
অনন্ত প্রকাশ তাঁর এ ভুবনময়,
চলেছিস ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে
বৃথা দ্বন্দ্ব কলহের পানে—
কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা,
ভেঙে ফেল আর সব পুতুল প্রতিমা।"

(বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৭)

সুস্পষ্ট ভাষায় স্বামীজী বলিলেন ঃ

"এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত, সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তোমরা ধাবিত হইতেছ? তোমাদের সম্মুখে, তোমাদের চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না?

"প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা; তোমাদের সম্মুখে—তোমাদের চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই-সব মানুষ ও পশু—ইহারাই তোমাদের ঈশ্বর,... তোমাদের প্রথম উপাস্য।"

(বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৯)

পূজা বা উপাসনা তখনই সার্থক যখন সাধকের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাই প্রকৃত অশুদ্ধি। অপরের সেবার দ্বারা সেই অশুদ্ধি নাশ হয়, নিজের মধ্যে যে শিব রহিয়াছেন তিনি জাগিয়া উঠেন, প্রকাশিত হন। স্বামীজী বলিলেন ঃ "দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলের মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে-ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে-ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা যে-ব্যক্তি জাতি-ধর্মনির্বিশেষে একটি দরিদ্রকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব অধিকতর প্রসন্ন হন।...

"কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ, সে-ই অধিক ধার্মিক। সে-ই শিবের সামীপ্য লাভ করে। সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিকতর নিকটবর্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি পৃথিবীতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া থাকে... তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।"

(বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৩৭)

ভগবৎ-প্রসঙ্গ
স্বামী মাধবানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় যান। ঐসময়ে সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটিতে আয়োজিত এক সভায় পূজনীয় মহারাজ যে প্রশ্নোত্তর অধিবেশন পরিচালনা করেন তা এখানে উপস্থাপিত হলো। এটি ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে Vedanta Kesari পত্রিকায় প্রকাশিত 'Work, Discipleship and Prayer' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজী থেকে ভাবানুবাদ করেছেন স্বামী শরণ্যানন্দ।

প্রশ্ন: কর্মযোগের সাহায্যে কি প্রত্যক্ষভাবে আত্মজ্ঞানলাভ হয়, অথবা কেবল চিত্তশুদ্ধি হয়—জ্ঞানলাভ হয় না, যেমন, আচার্য শঙ্কর রচিত 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে বলা হয়েছে? দ্বিতীয় ধারণাটি কি স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র পরিপন্থী?

উত্তর: প্রাচীন মত যা আচার্য শঙ্কর সমর্থন করেছেন তা হলো কর্মযোগের দ্বারা কেবল চিত্তশুদ্ধি হয়, প্রত্যক্ষভাবে আত্মজ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, জ্ঞানযোগ ছাড়াও সাধনার বিভিন্ন পথ আছে, যেগুলি স্বতন্ত্রভাবে সাধককে আত্মসাক্ষাৎকার করাতে পারে—যে আত্মা আমাদের সকলের অন্তরে চৈতন্যরূপে আছেন। কর্ম যদি নিষ্কামভাবে এবং সেবাবুদ্ধিতে করা যায় তবে তার সাহায্যেও জ্ঞানলাভ হতে পারে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলছি।

একথা সত্য যে, সাধনার মনোভাব নিয়ে নিষ্কামভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করলে তার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। আবার এই মতও বহু প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুদের মধ্যে স্বীকৃত হয়ে এসেছে যে, চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হলে আত্মা স্বতঃপ্রকাশিত হন। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, যদি কর্ম শতকরা একশো ভাগ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করা যায়, তবে পরিণামে চিত্তও শতকরা একশো ভাগ বা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে যাবে। চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে গেলে চৈতন্যস্বরূপ অন্তরাত্মার প্রকাশ হতে আর কতই বা দেরি হবে? আমার ধারণা, একটুও দেরি হবে না। যে-মুহূর্তে আমাদের চিত্ত কর্মযোগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই পরমতত্ত্ব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এবিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মনে করুন, একটা বাড়ির ছাদে ওঠার জন্য কতকগুলি সিঁড়ি আছে। আগেকার দিনে সিঁড়ির শেষ ধাপ ছাদের একটু নিচে করা হতো। কিন্তু আজকাল সিঁড়ির শেষ ধাপ ছাদের সঙ্গে একই সমতলে করা হয়। তেমনি জ্ঞানযোগ এবং অন্যান্য যোগের মতো কর্মযোগের দ্বারাও প্রত্যক্ষভাবে আত্মজ্ঞানলাভ হয়।[১] এটি আমার ব্যক্তিগত ধারণা। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দের একটি মন্তব্য জানাচ্ছি। সেইসময় বেলুড় মঠে একজন পণ্ডিত সাধু ও ব্রহ্মচারীদের সংস্কৃত পড়াতেন। প্রাচীনপন্থী এই পণ্ডিতটি একদিন বলেন: "স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, কর্মযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আত্মজ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র বলেন, কর্মযোগের দ্বারা প্রথমে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সাধককে আত্মজ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। তারপর মনোনাশ, বাসনাক্ষয় প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শেষে সাধক আত্মজ্ঞানলাভ করেন। সুতরাং স্বামীজী কি করে ঐরূপ

১ এখানে সিঁড়ির সঙ্গে কর্মযোগের এবং ছাদের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠলেই যেমন ছাদে পৌঁছানো যায়, তেমনি কর্মযোগের চরম অবস্থায় পৌঁছালে সাধকের পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি এবং আত্মজ্ঞানলাভ হয়।

মত প্রকাশ করেন?" জনৈক তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে পণ্ডিতমশায়ের এই সংশয়ের কথা জানালে স্বামী তুরীয়ানন্দ যে-উত্তর দেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন: "তোমাদের পণ্ডিতকে বলো—পণ্ডিতমশাই, যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ ঐ কথা বলেছিলেন সেইদিনই নতুন শাস্ত্র সৃষ্টি হয়ে গেছে।" ভাব হচ্ছে এই—স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন সত্যদ্রষ্টা পুরুষ। তিনি কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নিজের মতামত প্রকাশ করতেন না। ধর্মজীবনে কোন্‌টা সত্য এবং কোন্‌টা সত্য নয় এবিষয়ে প্রাচীন ঋষিদের মতোই স্বামীজী ছিলেন একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি (authority)। সুতরাং তাঁর মতামতকে আমরা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "এক যুগের টাকার মূল্য অন্য যুগে কমে যায়। নবাবী আমলের টাকা বাদশাহী আমলে চলে না।" তেমনি বর্তমান যুগে প্রাচীন ঋষিদের মত অপেক্ষা স্বামীজীর মতকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ—দ্বিতীয় ধারণাটি কি স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র পরিপন্থী?

উত্তর: পরিপন্থী হওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং চিত্তশুদ্ধির জন্য যে কর্ম করা হয় তা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র সমতুল্য। স্বামীজী-প্রচারিত কর্মের সঙ্গে পূর্বোক্ত কর্মযোগের সাদৃশ্য আছে। অবশ্য 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'কে প্রকৃত কর্মযোগ বলা যায় না। আমার মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে জীবের মধ্যে শিবকে অথবা জীবরূপী শিবের সেবার কথা বলেছেন তাকে ভক্তিযোগ বলাই উচিত। কারণ, পূজার মনোভাব নিয়ে কোন কর্ম করলে তা শুধু কর্ম বা কর্মযোগে সীমাবদ্ধ না থেকে ভক্তিযোগে রূপান্তরিত হয়। এই কর্ম প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগই; এরূপ ক্ষেত্রে সাধকের মনে ঈশ্বরচিন্তা সর্বদা জাগরূক থাকে, তিনি তখন কর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর কৃপালাভের চেষ্টা করেন এবং তাঁকে একান্ত আপন-জন ভেবে অন্তরে তাঁর দিব্যদর্শনলাভের চেষ্টা করে থাকেন। অবশ্য যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন না তাঁদের ক্ষেত্রে 'কর্ম' শব্দ ব্যবহার করা যায় এবং 'ঈশ্বরের পূজা' না বলে 'মানুষের সেবা' বলাই তখন যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু পূজার মনোভাব নিয়ে কর্ম করলে সেই কর্ম কর্মযোগের সীমা অতিক্রম করে ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হয়। সুতরাং, 'কর্মযোগ' স্বামীজী-প্রচারিত ('শিবজ্ঞানে জীবসেবা'রূপ) কর্মযোগের পরিপন্থী নয়, বরং সহায়ক।

প্রশ্ন: আচার্য শঙ্কর যখন কর্মের কথা বলতেন তখন কি তিনি নিষ্কাম কর্ম অথবা বৈদিক কর্মের কথা বলতেন?

উত্তর: আচার্য শঙ্কর সাধারণত বৈদিক কর্মের কথাই বলতেন। কারণ বুদ্ধদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে-নিষ্কাম কর্ম প্রচার করে গিয়েছেন আচার্য শঙ্করের সময়ে সেবিষয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেই সময়ে লোকে স্বর্গ প্রভৃতি নিম্নস্তরের কামনা করে ছাগ এবং অন্যান্য পশু প্রচুর সংখ্যায় বলিদান দিত। কর্ম বলতে তখন (বৈদিক) কর্মকাণ্ডকেই বোঝাত, যা লোকে অনুষ্ঠান করত অনন্তকালব্যাপী সুখভোগের কামনা করে। এরূপ কোনও বিষয় কামনা করে কর্মের অনুষ্ঠানই বৈদিক কর্ম।

প্রশ্ন: ধর্মজগতে এমন কি কোনও কেন্দ্র (point) আছে, যেখানে বিভিন্ন সাধনপথ জ্ঞানযোগে মিলিত হয়?

উত্তর: কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ—প্রত্যেক পথই স্বতন্ত্রভাবে একই স্থানে গিয়ে পৌঁছায়—তা হলো আত্মদর্শন। সুতরাং প্রশ্নটি যথার্থ নয় যে, বিভিন্ন সাধনপথ কোন একটি স্থানে জ্ঞানযোগের সঙ্গে মিলিত হয় কিনা। জ্ঞান-যোগ অন্যান্য যোগের মিলনক্ষেত্র নয়। প্রত্যেক সাধনপথই সাধককে ঈশ্বর-উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। অতএব জ্ঞানযোগের যা গন্তব্যস্থান অন্যান্য যোগেরও তাই।

প্রশ্ন: শিষ্যের কি কি গুণ থাকা উচিত?

উত্তর: শিষ্য হতে গেলে একজন সদ্‌গুরুর অধীনে থেকে তাঁর উপদেশ ও শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করা উচিত। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে

ভাবের আদান-প্রদানের যেন সুযোগ থাকে। শিষ্যের মধ্যে কোন অহংকার থাকা উচিত নয়, কারণ অহংকার আত্মজ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক। গুরুর প্রতি শিষ্যের পূর্ণ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। অধিকন্তু শিষ্যের কর্তব্য যথাসাধ্য গুরুর সেবা করা, কারণ সেবার মধ্য দিয়েই গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জাগতিক ভোগসুখের কামনা না করে নিঃস্বার্থভাবে গুরুর শরণাগত হয়ে থাকাই শিষ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক।

একটা মজার গল্প আছে। একজন লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে একজন বড় সাধুর কাছে এসেছে। সাধুর নিকট সে জানতে চাইল: "এখানে শিষ্য হয়ে থাকতে হলে কি কি কাজ করতে হয়?" সাধু উত্তর দিলেন: "শিষ্য হতে হলে আমার এবং আশ্রমের অন্যান্য সাধুদের সেবা করতে হয়। তাছাড়া জল তোলা, কাঠ কাটা প্রভৃতি আরও অনেক কাজ করতে হয়।" তারপর গুরু শিষ্যের করণীয় কাজের একটি তালিকা লোকটিকে দিলেন। লোকটি একটু চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করল: "গুরুকে কি কাজ করতে হয়?" সাধু উত্তর দিলেন: "গুরুর কাজ হলো শিষ্যদের সেবাপরিচর্যা গ্রহণ করা।" লোকটি তখন খুশি হয়ে বলল: "আমাকে তাহলে গুরুই করে নিন, আমি শিষ্য হতে চাই না।" যাহোক, যা বলছিলাম, শিষ্য সম্পূর্ণ অহংকারশূন্য হবেন। তিনি কখনো নিজেকে গুরুর চেয়ে বড় বা তাঁর সমকক্ষ বলে মনে করবেন না। অধিকন্তু তিনি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান ও সেবাপরায়ণ হবেন। তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে যে, গুরুর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে এবং সেই শক্তি তিনি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চার করতে পারেন। গুরুর কৃপালাভে তিনিও ধন্য হবেন এই বিশ্বাস তাঁর থাকা কর্তব্য। শিষ্যের এরূপ মনোভাব থাকলে শীঘ্র হোক বিলম্বে হোক গুরুর কৃপায় তাঁর মধ্যে সত্য প্রকাশিত হবে। এর জন্য বেশি উপদেশ-গ্রহণের প্রয়োজন নেই। শিষ্যের সেবায় প্রসন্ন হয়ে গুরু আশীর্বাদ করে বলবেন: "আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়েছি। আশীর্বাদ করি, তুমি মুক্ত হও এবং আত্মজ্ঞানলাভ কর।" সুতরাং নিজের কল্যাণের জন্যই শিষ্য গুরুর নিকট বিচারপূর্বক আত্মসমর্পণ করবেন।

প্রশ্ন: শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কেবল প্রার্থনা বা ভক্তি নিবেদন করলেই কি তিনি এই জন্মে আমাদের মুক্তি দেবেন?

উত্তর: কেবল প্রার্থনা বা ভক্তি নিবেদন করা—কথাগুলি খুব সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু প্রার্থনা যদি আন্তরিকভাবে করা যায় তবে তা দৃঢ় (আধ্যাত্মিক) শক্তিতে পরিণত হয়। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা সামান্য জিনিস নয়। যিনি প্রার্থনা করেন তিনি নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস করবেন যে, তাঁর আরাধ্যদেবতার (বা মহাপুরুষের) মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি আছে অথবা তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারজ্ঞানে তাঁর নিকট ভক্তির সঙ্গে প্রার্থনা জানান এবং তাঁর শরণাগত হয়ে থাকেন তাঁদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ অবশ্যই হবে। কারণ, তাঁর নিকট প্রার্থনা বা ভক্তি নিবেদন করার অর্থ তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবন-গঠন করা। নতুবা কেবল মুখে বলবেন, 'আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁর উপাসনা করি', কিন্তু বাস্তবজীবনে তাঁর আদর্শের বিপরীত আচরণ করবেন—তাতে কিছু হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অনুরাগ ও ভক্তির সঙ্গে প্রার্থনা জানাতে থাকলে আমাদের জীবনও তাঁর ভাব ও আদর্শ অনুসারে গড়ে উঠবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সমস্ত ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি সকলকেই উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে নিজ নিজ রুচি ও সংস্কার অনুসারে ইষ্টদেবতার উপাসনা করতে বলতেন। অতএব এরূপ (সমদর্শী) অবতারপুরুষের নিকট প্রার্থনাকে সামান্য বিষয় জ্ঞান করা উচিত নয়। তাঁর নিকট অনুরাগের সঙ্গে প্রার্থনা জানালে ধর্মজীবনে অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না, মুক্তিলাভও সম্ভব। কেনই বা নয়? যদি শ্রীরামকৃষ্ণ বা অন্য কোনও অবতারপুরুষের নিকট অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায়, ঈশ্বর সেই অবতার-শরীরে ভক্তকে অবশ্যই কৃপা করবেন।

নিবন্ধ

আরাত্রিক

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

'উদ্বোধন' ১৩৮৮ সালের অগ্রহায়ণ এবং পৌষ সংখ্যায় পূজার মূলতত্ত্ব ও সাধারণ পূজায় অবশ্য অনুষ্ঠেয় কয়েকটি অনুষ্ঠানের তাৎপর্য অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় 'আরাত্রিক', যার অপর নাম 'নীরাজন', প্রচলিত ভাষায় 'আরতি'। দেবতার প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, বস্ত্র, পুষ্প এবং চামরাদি আবর্তনে দেবতাকে প্রীত ও সংবর্ধিত করবার যে অনুষ্ঠান তাকেই 'আরাত্রিক' বলা হয়। আরাত্রিক-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শাস্ত্রে আছে ঃ

"মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎকৃতং পূজনং হরেঃ।
সর্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে ॥"[১]

—দেবদেবের নীরাজন করলে, যেকোন পূজা তা মন্ত্রবর্জিত হোক আর ক্রিয়াবর্জিতই হোক, ফলবতী হবেই। যে-ব্যক্তি নীরাজন দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করেন তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে—উভয় লোকেই মুক্তিপ্রাপ্ত হন ঃ

"নীরাজনেন যঃ পূজাং করোতি বরবর্ণিনি।
অমৃতং প্রাপ্নুয়াৎ সোঽপি ইহলোকে পরত্র চ ॥"[২]

আর শ্রীভগবানের আরাত্রিক দর্শনের ফলও কম নয়।

"নীরাজনস্য যঃ পশ্যেদ্দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
সপ্তজন্মানি বিপ্র স্যাদন্তে চ পরমং পদম্ ॥"[৩]

—যিনি চক্রধারী শ্রীভগবান বিষ্ণুর আরাত্রিক ভক্তি-চিত্তে দর্শন করেন, সাতজন্ম পর্যন্ত তিনি বর্ণশ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে উৎপন্ন হয়ে অন্তে তাঁর পরমপদ লাভ করেন।

আচমন, প্রাণায়াম, বিভিন্ন প্রকার শুদ্ধি এবং ন্যাসাদি যে-অর্থে পূজার অঙ্গীভূত অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান, আরাত্রিক ঠিক সেই অর্থে পূজাঙ্গীভূত অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়ে না। আরাত্রিককে বরং একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সাঙ্কেতিক পূজা বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। পূজার ক্রম অনুসরণ করলেও দেখা যাবে যে, পূজার প্রাথমিক পর্ব শেষ করে দেবতাকে আমন্ত্রণ করে আসনে বসানো হয়; পরে ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ ও নানাবিধ সুখাদ্য বস্তু নিবেদন করে তাঁর সেবা করা হয়। এখানে স্পষ্টতই দেবতার ওপর মানবিক ভাব আরোপ করা হয়। আরতিতে সেই ভাবকে উত্তরণ করার তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায় ঃ

"এইরূপে শ্রীভগবানের মানুষের মতো সেবা করার পর আরাত্রিক নামক প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার লোকোত্তর মহিমার অনুধ্যানে জোর দেওয়া হয়। আরাত্রিক যেন এক রকমের সাঙ্কেতিক পূজা।"[৪]

আরাত্রিকের বিধানে আছে প্রথমে ঘৃতের দীপ-মালা, তারপর জলপূর্ণ শঙ্খ, তারপর বিশুদ্ধ বস্ত্র, পরে আম্রপল্লব, অশ্বত্থপল্লব ইত্যাদি এবং সর্বশেষে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দ্বারা নীরাজন করণীয়। কালোত্তর-তন্ত্রে বলা হচ্ছে ঃ

"পঞ্চনীরাজনং কুর্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া।
দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা ॥
চুতাশ্বত্থাদি পত্রৈশ্চ চতুর্থং পরিকীর্তিতং।
পঞ্চমং প্রণিপাতেন সাষ্টাঙ্গেন যথাবিধিঃ ॥"[৫]

তবে পল্লবাদির পরিবর্তে বিল্বপত্র, পুষ্প এবং কর্পূর-দীপ ও ধূপাদি এবং পরে চামর দ্বারা আরাত্রিক করাও বিধিসম্মত।

আরাত্রিক করবার নিয়ম হলো প্রথমে দীপমালা প্রজ্বালিত করে তাকে সম্মুখে একটি ত্রিকোণ মণ্ডলের ওপর স্থাপন করে অর্চনার দ্বারা দেবতাকে নিবেদন করতে হয়। দীপ বহুশিখাযুক্ত ও অযুগ্ম অর্থাৎ এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদি বিষম সংখ্যায় হবে ঃ

"প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্তিকম্ ॥"[৬]

দীপমালা অর্চনা ও নিবেদন করার পর উহা দক্ষিণ হস্তে উঠিয়ে বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মূলমন্ত্র জপ অথবা দেবতার স্তোত্র পাঠ করতে করতে আরাত্রিক করতে হয়। দীপমালা ঘোরাবারও একটি বিধি আছে ঃ

"আদৌ চতুষ্পাদতলে চ বিষ্ণোর্দ্বৌ নাভিদেশে
মুখমণ্ডলৈকম্।

১ হরিভক্তিবিলাস, ৮।১৩৬ ২ যোগিনীতন্ত্র, ২।৯।১৬৪ ৩ হরিভক্তিবিলাস, ৮—নীরাজন-মাহাত্ম্যম্
৪ হিন্দুধর্ম—স্বামী নির্বেদানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২০-২২১
৫ নিত্যপূজাপদ্ধতি—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, পৃঃ ১২৫ দ্রষ্টব্য। ৬ হরিভক্তিবিলাস, ৮।১৩৩

সর্বেষু চাঙ্গেষ্বপি সপ্তবারানারাত্রিকং
ভক্তজনস্তু কুর্যাৎ ॥"[7]

—দীপমালা দেবতার শ্রীচরণে চারবার, নাভিদেশে দুবার, মুখমণ্ডলে একবার এবং সর্বাঙ্গে সাতবার ঘোরাতে হয়। তবে মুখমণ্ডলে সাধারণতঃ তিনবার ঘোরানো হয়।

পূজার মূল যে উদ্দেশ্য—দেবতাকে প্রীত করে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা, পূজা ও পূজকের আত্ম-স্বরূপে মিলিত ও একীভূত হওয়া, আরাত্রিকেরও একই উদ্দেশ্য। আরাত্রিক-পূজার উপচার প্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, বস্ত্র, পুষ্প এবং চামর। "ঐগুলি যথাক্রমে অগ্নি, জল, আকাশ, মাটি ও বায়ু—এই পাঁচটি ভূতের প্রতীক বলিয়া মনে হয়। বস্ত্রে রন্ধ্র থাকায় উহা আকাশের প্রতীক এবং মাটির বিশেষ গুণ গন্ধ বলিয়া ফুল উহার সার্থক প্রতীক। বস্তু-জগতের মূল উপাদান পাঁচটি ভূতের মধ্য দিয়া যেন সাঙ্কেতিকভাবে সমগ্র বিশ্বকে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া তাঁহার পূজা করা হয়। সর্বব্যাপী ঈশ্বরের নরত্ব-আরোপিত মূর্তি হইতে তাঁহার বিশ্বাবগাহী বিরাট রূপের দিকে সাধকের দৃষ্টি প্রসারিত করিবার জন্য কী গাম্ভীর্যপূর্ণ অপূর্ব এই আরাত্রিক নামক সাঙ্কেতিক পূজার বিধি।"[8]

পঞ্চভূত নামে অভিহিত বস্তু-জগতের মূল পাঁচটি উপাদান—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এই পঞ্চভূত জগদ্রূপী কার্যব্রহ্মের প্রতীক। জগদ্রূপী এই কার্যব্রহ্মের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারলে তবেই পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। সাধক আরাত্রিক নামক পূজা-আরাধনার মাধ্যমে পঞ্চভূতকে পূজ্য দেবতার চরণে নিবেদন করে দেবতার বিশ্বাব-গাহী বিরাট সত্তার সঙ্গে মিলিত হন। এখানেই আরাত্রিকের সার্থকতা।

বিভিন্ন উপচার দিয়ে আরাত্রিক না করে অনেক সময় শুধুমাত্র প্রদীপ দিয়েও আরাত্রিক করা হয়। তারও একটি তাৎপর্য আছে। পরমাত্মা জ্যোতিস্বরূপঃ

"ত্বং জ্যোতিঃ শ্রীরবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎ-সৌবর্ণতারকাঃ।
সর্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতির্দীপজ্যোতিঃ
স্থিতা তু যা ॥"[9]

—জ্যোতিঃ, রবি, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, সুবর্ণ তারকা—এসবই তুমি। আবার এসকলের জ্যোতির জ্যোতিও তুমি এবং তুমিই জ্যোতিস্বরূপে অবস্থিত।

সুমনোহর দৃশ্য দীপরাজি দ্বারা হরির নীরাজন করলে তমোবিকার (কামক্রোধাদি), কিংবা অজ্ঞান-বিকার (অভিমানাদি) বিদূরিত হয় এবং উহা দূরীভূত হলে আর ধরাধামে দেহধারণ করতে হয় নাঃ

"কৃত্বা নীরাজনং বিষ্ণোর্দীপাবল্যা সুদৃশ্যয়া।
তমো বিকারং জয়তি জিতে অস্মিংশ্চ কো ভবঃ ॥"[10]

কাজেই অজ্ঞাননাশক জ্যোতির প্রতীক প্রদীপ স্বাভাবিকভাবেই সাধকের মনকে উদ্দীপিত করে জ্যোতিস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে লাভ করবার জন্য। বলাবাহুল্য, পরমাত্মাকে লাভ করলে সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। চিরকালের মতো সাধক ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

বৈষ্ণবমতে আরাত্রিকের একটি সুন্দর তাৎপর্য আছে। যশোদানন্দন গোষ্ঠে ধেনু চরাতে গেছে সেই প্রাতঃকালে। এখন সন্ধ্যা হয় হয়, গোধূলি লগ্ন। উদ্বিগ্ন যশোদা উৎকণ্ঠিতনয়নে চেয়ে আছেন পথপানে, তাঁর নয়নের মণি, হৃদয়ের ধন গোপাল গোচারণা থেকে ফিরবে বলে। গোধূলি লগ্নে যশোদার ধন ঘরে ফিরে আসে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পুত্রের মুখ দেখাও ভার। তাই প্রদীপ জ্বালিয়ে তার উজ্জ্বল আলোয় মা যশোদা প্রাণভরে দেখেন পুত্রের মুখ। হাতের প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন তাঁর প্রাণপ্রিয় দুলালের কোমল অঙ্গের কোথায় কোথায় মর্ত্যের ধূলোকাদা লেগে তার অঙ্গকে মলিন করে দিয়েছে। অতি সন্তর্পণে স্নিগ্ধ সুরভিত জলে সেসব স্থান ধৌত করেন। তারপর কাপড় দিয়ে মুছে দেন সর্বাঙ্গ। সুগন্ধি ফুলে মনের মতো করে সাজান গোপালকে। সাজিয়ে এক মনে নিরীক্ষণ করতে থাকেন তাঁর নয়নের মণিকে। নিরীক্ষণকালে মা যশোদা চামর দুলিয়ে ক্লান্তি দূর করেন প্রিয় পুত্রের। সহসা নিজ সন্তানের মধ্যে জগৎকারণ শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করে ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভয়-বিহ্বল চিত্তে মা সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানান তাঁর শ্রীপদে।

লক্ষণীয় যে, আরাত্রিক যে ভাব নিয়ে আর যে উপচারেই করা হোক না কেন, দেবতার চরণে আত্মনিবেদনেই আরাত্রিকের পরিসমাপ্তি।

৭ শব্দকল্পদ্রুম
৮ হিন্দুধর্ম, পৃঃ ২২১-২২২
৯ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১২২।১২৩
১০ হরিভক্তিবিলাস, ৮।১৩৭

কবিতা

কাহার আরতি গগনে
আর্যকুমার পালিত

কাহার আরতি গগনে।
হেমমণ্ডিত মন্দির মাঝে
সন্ধ্যা-ধূসর লগনে।

গরজে দামামা জলদমন্দ্রে
বজ্র নিনাদে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
ভীম গম্ভীরে দূর অম্বরে
ঘোর ঘনঘটা সঘনে।

পঞ্চপ্রদীপ জ্বালায় বিজলি
নাচিয়া নাচিয়া পড়িছে উছলি
ধূপ-গুগ্গুলে ঘন ঢেউ তুলি
মেঘেরা ধূম্র বরনে।

কে গো আনন্দছন্দে গলিয়া
চন্দ্রমাদীপ দিয়েছে জ্বালিয়া
তারকার ফুল ঢলিয়া ঢলিয়া
লুটাইছে চারু চরণে।

ঝলকিত ঐ আরতির দোলে
কভু আলো কভু আঁধার উছলে
হসিত চন্দ্র মুখখানি খোলে
ঢাকে পুনঃ অবগুণ্ঠনে।

গগন বেড়িয়া কি মোহন মেলা,
আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা
প্রণত বিশ্ব বিরাট বিপুলা
করজোড়ে শির নমনে।

কে গো সিঞ্চিয়া শান্তিসলিল
আরতির শেষে ভাসায় নিখিল
ধরণী সে বারি ধরি' তিল তিল
মেখেছে অঙ্গে যতনে।

হাসে তরুলতা হাসে ফুলফল
নিয়ে ছয় ঋতু হইয়া উথল
সাগর তটিনী বহে কলকল
ধরণী মগন ধেয়ানে।

হে অনঘ, মহান!
অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অহর্নিশ অনির্বাণ শিখা
জ্বালি চিত্তে তোমার,
আলোকিত করিলে ভুবন
হে যুগ-অবতার।

অনন্ত—সে কাহাকে বলে
তাহা নাহি জানি,
শুধু মানি—
সান্ত আমি, শান্ত মুখখানি
তব মুখ হেরি
হৃদে করি অনুভব—
অসীম, অখণ্ড অভয়
ছড়ায়ে দিয়েছ বিশ্বময়।

অদ্বয় তত্ত্ব, অদ্বিতীয় পুরুষ,
অথচ যুগে যুগে যুগন্ধর তুমি—
রাম-সীতা, কৃষ্ণ-রাধা,
রামকৃষ্ণ-সারদা—
সদা আনন্দ-নিধান।

যেই কালী, সেই ব্রহ্ম—
কে বুঝিবে তার মর্ম,
যদি না বুঝায়ে দাও
হে অনঘ, মহান।

আমার তুমি

তুলসী দেবী

অপার উত্তাল সিন্ধু হতে
বিন্দুটিরে ভিন্ন করি দিলে,
দিলে তারে স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ অধিকার
পূর্ণত্বের স্ফীত বিন্দুটিরে
বুকে ভরে দিলে অহঙ্কারে।
জানি বন্ধু, সাধ তব দেখিবার
ক্ষুদ্রতার কত অহঙ্কার—
আপনার জন্মতত্ত্ব ভুলে বারবার
আপনার চিন্তাস্রোতে ভাসিছে সদাই
অনন্তের কোন চিন্তা নাই ;
মূলেরে ভুলিয়া হায়, লতা পুষ্প ফল
ভাবে যদি, হইব সফল,
হবে না সফল।
নিতান্তই পরিহাস অতি অভিনব
তোমাতেই এসব সম্ভব—
তোমা হতে ছিন্ন করে চিন্তাসূত্র যত
কায়া ছাড়ি ছায়াটিরে করি মনোমত
আঁকড়ি রাখিতে চায় লক্ষ বাহু দিয়া
সত্যটিকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া।
দৃষ্টিটুকু লাল কাঁচে ঢাকা
তাই সবি লাল দেখে অন্য রঙ নাই,
শুধালে তখনি বলে কি করিব ভাই
অন্য রঙ আছে বলে মোর জানা নাই।
উপায় যে নিরুপায়ে গিয়াছে হারায়ে
ব্যস্ত হয়ে আছি তাই আমি-টারে নিয়ে
তুমি যে সবারই মূলে সবারই আপন
ইচ্ছা করি একথাটি করিয়া গোপন
রয়েছ সবার মাঝে সবারি আপন।
আমিও তোমারে যাই লক্ষবার ভুলে
তবু দয়া করে
চকিতে চেতনাপাতে আমি আছি বলে
আমারে পরশ কর
আনন্দে অধীর প্রাণ নয়নের জলে
আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ি ধ্যানের গভীরে।

দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

যখনই অন্যায় করি,
কারো প্রতি করি অবিচার,
কিম্বা হয়তো বাক্য-ব্যবহারে
সাবধান না হওয়াতে
কারো প্রাণে দিয়ে ফেলি ব্যথা,
ছুটে যাই ঠাকুরের কাছে।
'ক্ষমা কর, হে ঠাকুর!
অন্যায় যে হয়ে গেছে খুবই।
এমন অন্যায় আর
হবে না কখনো।'
দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ
হেসে যান মিটি মিটি করে।
আমার চোখের জলে
ভিজে যায় কাঁচে-বাঁধা ছবি।
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত আমি।
অবসন্ন মন।
ঠাকুর বলেন যেন আমাকে তখন,
অমৃত-নির্ঝর কণ্ঠে,
মধুমাখা স্বরে,
"ওরে আহাম্মক!
এই নিয়ে কতবার হলো ?
প্রতিবারই একই কথা—
'এমন আর হবে না কখনো।'
অথচ আবার হয়।
আবার! আবার!
এ কেমন সত্যনিষ্ঠা তোর ?"
কেঁদে বলি, 'হে ঠাকুর!
এবারটা ক্ষমা করে দাও।
দেখে নিও, সত্যিই
এমন আর হবে না কখনো।'
অজ্ঞানে আবার মিথ্যে
অনায়াসে বলে যাচ্ছি দেখে,
দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ
হেসে যান মিটি মিটি করে।

তোমার অসীম আশিস-কৃপা

শেখ সদরউদ্দীন

তোমার অসীম আশিস-কৃপা,
অশেষ মেহেরবাণী—
দিলে জীবন, জল-সমীরণ, দিলে ভুবনখানি।

ঊর্ধ্বে দিলে সুনীল আকাশ, নিচে শ্যামল ভূমি,
ক্ষেত ভরিয়ে দিলে ফসল,
প্রভু-দয়াল তুমি।

ফুলবাগানে ফুলে ফুলে সুবাস দিলে আনি—
তোমার অসীম আশিস-কৃপা,
অশেষ মেহেরবাণী।

ধু-ধু জীবন-মরুর বুকে
শান্তি-মরূদ্যান—
সবুজ নিশান উড়িয়ে দিয়ে জুড়িয়ে দিলে প্রাণ।

জীবন যখন তপন-তাপন,
হয় অমৃতহারা—
ফুটিফাটা মাঠে তোমার বহে স্নেহের ধারা।
তপ্ত জীবনধরার বুকে ঢালো শীতল পানি—
তোমার অসীম আশিস-কৃপা,
অশেষ মেহেরবাণী।

জীবরূপী শিব

প্রণব ঘোষ

জীবনের এক সত্য শুধু ভালবাসা,
পৃথিবীতে জন্মে জন্মে তারই তরে আসা,
তারই তরে আত্মা মহতিয়া
সংগোপনে জেবলে রাখে চেতনার—
জ্যোতিদীপ্ত দিয়া।
এজীবনে একমাত্র নিত্য সেই বিশ্বাসের পাখি
সংশয়ের অন্ধকারে মেলেছে যে প্রত্যয়ের আঁখি।
দিয়ে যায় শাশ্বত যে পথের হদিস
নিজে থেকে জেগে অহর্নিশ।
অতল হৃদয় তার নাহি যার থৈ,
বিশ্বাসের বীজে বাঁচে নিত্য মাভৈঃ।
জীবন সে প্রণামের এক নাম-ই,
জীবনই তো শ্রেষ্ঠ পূজা—সবচেয়ে দামী।
জীবনের যত গর্ব, যত অহঙ্কার
নিজের তো কিছু নয় সকলই তাঁর।
আর সে জীবনস্বামী কোথা কোন্ স্থানে?
মন্দিরে মসজিদে নয়—নয় গির্জা গুহা বনে।
তিনি যে বিশ্বাসে প্রেমে—জীবরূপে শিব,
মানুষেরে ভালবেসে হরে নেন
পৃথিবীর সকল অশিব॥

কে লেখে কবিতা

নিমাই মুখোপাধ্যায়

কখন কবিতা লেখ?
সারাদিন ব্যস্ত থাক নানা সব কাজে
কখন কবিতা লেখ?
লিখিনা তো আমি।
তবে কে? জানি না।
শুধু জানি লেখে যে সে ভেতরেতে থাকে।
শৈশবের কুসুমকলিতে কবে জেগে ওঠে কালি
কে বা জানে
শুধু জানে শৈশব কৈশোর হয়
কৈশোরেতে যৌবনের গান শোনে কানে।
কে বাজায় বাঁশি তা আজও জানিনাকো
শুধু জানি বাঁশি বাজে, বাঁশি শুনি কানে।
কে দেখায় সূর্য রোজ তাও বুঝিনাকো
তবু দেখি সূর্য আছে তারই নিজ স্থানে।
রোজ রাতে কে পাড়ায় ঘুম
কতদিন চেয়েছি দেখিতে
সেও দেয়নাকো দেখা।
তাই বৃথা খুঁজিনাকো কে লেখে কবিতা।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বলরাম মন্দির ঃ পুরনো কলকাতার ঐতিহাসিক বাড়ি

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৮ ॥

বলরাম মন্দিরে বলরামকে একবার স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ "আপনারা তিনপুরুষ যে সন্ন্যাসী, বৈরাগী, বৈষ্ণবসেবা করে আসছেন, সেই পুণ্যের ফল কি ক্ষয় হবার? এই পুণ্যের ফলে আপনি এত বড় মহাপুরুষের, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করবার অধিকার পেলেন। তিনি আপনার বাড়ি এসে থাকতে ভালবাসতেন এবং আপনার জিনিস আদর করতেন।"[৫৩] তাই বলরাম মন্দির ছিল স্বামীজীরও প্রিয়। বলরামকে স্বামীজী বলতেন ঃ "আপনার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আলাদা। আপনি যদি আমাদের এ দরজা দিয়ে বার করে দেন তো আবার ও দরজা দিয়ে ঢুকব।"[৫৪]

বলরাম মন্দিরের একটি অভূতপূর্ব ঘটনা স্বামী প্রেমানন্দের অগ্রজ তুলসীরাম ঘোষ উল্লেখ করেছেন ঃ "বলরামবাবুর বাড়ির দোতলার হলঘর। একদিন ঠাকুর দক্ষিণ-শিয়রী শায়িত। মধ্যাহ্ন। নরেন্দ্রনাথ কিছুদূরে পূর্বদিকের দেওয়ালে মুখ করে দক্ষিণ-শিয়রী শুয়ে। ঠাকুরের দিকে পিছন। ঠাকুর বসে হামা দিতে দিতে ওঁর কাছে এসে ওঁকে আস্তে আস্তে স্পর্শ করছেন। সহসা চমক লেগে নরেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ। চিৎকার করে বললেন ঃ "Lo! the man is entering into me!" (দেখ লোকটা আমার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে!) তাই শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন ঃ "শালা মনে করেছ, তোমার কিড়ির-মিড়ির ইংরিজি বুলি বুঝি না? তুমি বলছ, আমি তোমার ভিতর ঢুকে যাচ্ছি।"[৫৫]

বলরাম মন্দিরে হলঘরে স্বামীজী প্রভৃতি সব সন্ন্যাসীরা একত্রে থাকতেন। সকলের জন্য এক-একটি ছোট মশারি। গড়াগড় শুয়ে থাকতেন। বলরাম নিজেই মশারিগুলি গুছিয়ে রাখতেন।[৫৬]

পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে স্বামীজী বহুবার বলরাম মন্দিরে বাস করেছেন। যখন তিনি এখানে থাকতেন, তখন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় বহু উৎসাহী যুবক, কলেজের ছাত্র ও জিজ্ঞাসুরা তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ধর্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন।[৫৭]

ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরির (বর্তমানে ন্যাশান্যাল লাইব্রেরির) সহকারী লাইব্রেরিয়ান ও স্বামীজীর উত্তর-ভারত ভ্রমণের সঙ্গী সুরেন্দ্রনাথ সেন বলরাম মন্দিরে স্বামীজীর একটি চিত্র উপহার দিয়েছেন ঃ "স্বামীজী কলকাতায় থাকতে নিত্যই এরূপ লোকের ভিড় হতো। লোকের বিরাম নেই। সকাল থেকে রাত্রি আটটা-নয়টা পর্যন্ত ক্রমাগত লোকের যাওয়া-আসা চলত। ফলে স্বামীজীর খাওয়া-দাওয়াও বড় অসময়ে হতো। সেজন্য অনেকে জনতা বন্ধ করতে অভিলাষী হলেন। একটা নির্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময় কারও সঙ্গে দেখা করবেন না, এইরূপ করবার জন্য স্বামীজীকে অনেকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু চির পরহিতাকাঙ্ক্ষী স্বামীজীর প্রেমিক হৃদয় জনসাধারণের এইরূপ ধর্মপিপাসা দেখে একেবারে গলে গিয়েছিল, তাঁর শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও জনতারোধ সম্বন্ধে কারও কথা তিনি রাখলেন না। বললেন, 'তারা এত কষ্ট করে দূর দূর থেকে হেঁটে আসতে পারে, আর আমি এখানে বসে বসে, একটু নিজের শরীর খারাপ হবে বলে তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারব না'।"[৫৮]

৫৩ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫

৫৪ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ২৫০

৫৫ ঐ,

৫৬ ঐ, পৃঃ ১২৪

৫৭ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীর বলরাম মন্দিরে অবস্থানকালের কথোপকথনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্রঃ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩, ৩৯, ৬০, ৮৩, ১১৮

৫৮ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ২১৪-২১৫

একবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলরাম মন্দিরে এসেছেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গী কয়েকজনের কাছে ছিল খোল ও করতাল। হলঘরে বসেছেন তাঁরা। স্বামীজী আসতেই তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়ালেন। গোঁসাইজী স্বামীজীকে প্রণাম করতে চেষ্টা করলেন, আর স্বামীজী দূরে সরে গিয়ে গোঁসাইজীকে প্রণাম করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেউ কাউকে প্রণাম করতে পারলেন না। শেষকালে গোঁসাইজীকে হাত ধরে স্বামীজী বসালেন। গোঁসাইজী সে-সময় ভাবে মগ্ন। সবাই নীরব। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী গোঁসাইজীকে অনুরোধ করলেনঃ "ঠাকুর সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।" ভাবে বিভোর গোঁসাইজী শুধুমাত্র বললেনঃ "ঠাকুর!—আমাকে কৃপা করেছিলেন।" তার বেশি কিছু বলতে পারলেন না তিনি। তাঁর দুনয়নে প্রেমাশ্রু। গোঁসাইজীর সঙ্গীরা আরম্ভ করলেন কীর্তন। খানিকক্ষণ কীর্তন হবার পর তাঁরা গোঁসাইজীকে নিয়ে চলে গেলেন।[৫৯]

বলরাম মন্দিরের দোতলায় ভিতরদিকে পশ্চিম ঘরটিতে স্বামীজী দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বামী প্রেমানন্দের ছোটভাই শান্তিরাম ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী সরোজিনীকে।[৬০]

বলরামের প্রতিবেশী শৈলেশ্বর বসুর বলরাম মন্দিরের স্মৃতিঃ "বলরাম-ভবনের বারবাড়ির ভিতরের বারান্দা। বেঞ্চির ওপর স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, লাটু মহারাজ প্রমুখ। গঙ্গাধর মহারাজ খুব হাসছেন ও চিৎকার করে কথা বলছেন। এমন সময় ত্রিগুণাতীত স্বামী এলেন। রামকৃষ্ণবাবু (বলরামবাবুর ছেলে) আমার পরিচয় ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বললেন। শুনে ত্রিগুণাতীত স্বামী বললেনঃ "এরা সব এখানে এসে পড়েছে, এরা তো জীবন্মুক্ত।" স্বামীজী আমাকে বললেনঃ "এঁকে চেন হে?" আমি বললুমঃ "আজ্ঞে না।" স্বামীজী বললেনঃ "এঁর নাম সারদা মহারাজ। মহাকর্মী, উদ্বোধনের সমস্ত ভার এঁর মাথায়।"[৬১]

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি রবিবার। বলরাম মন্দিরে সভা বসেছে। উপস্থিত আছেন স্বামীজী, তুরীয়ানন্দজী, যোগানন্দজী, প্রেমানন্দজী প্রমুখ। স্বামীজী পূর্বদিকের বারান্দায় বসে আছেন। চারদিকের বারান্দা লোকে পরিপূর্ণ। শ্রীমও আছেন। শ্রীমর ইচ্ছা স্বামীজীর গান শুনবেন, কিন্তু নিজে তা বলছেন না। অপরকে দিয়ে বলাচ্ছেন। স্বামীজী শ্রীমর কাণ্ড দেখতে পেয়ে বলছেনঃ "কি বলছ মাস্টার বল না? ফিস ফিস করছ কেন?" শ্রীমর অনুরোধে স্বামীজী গান ধরলেন—'যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে'। "যেন বীণার ঝঙ্কার উঠতে লাগল। যাঁরা তখনো আসছিলেন, সত্যই তাঁরা সিঁড়ি থেকে যেন মনে করলেন—গানটি বেহালার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গীত হচ্ছে।" গান শেষে স্বামীজী শ্রীমকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ "হয়েছে তো? আর গাইব না। নেশা ধরে যাবে। আর গলাটা লেকচার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। Voice (গলার স্বর)-টা roll করে (কাঁপে)।"[৬২]

বলরাম মন্দিরে স্বামীজীর দর্শনে আসতেন ভগিনী নিবেদিতা। একবার এসেছেন নিবেদিতা। "স্বামীজী যে-ঘরে ছিলেন তার চৌকাঠের কাছে গিয়ে সিস্টার হলঘরের মধ্যেই নতজানু হয়ে বসলেন, দুই হাত জোড় করে স্বামীজীকে প্রণাম করলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বসে রইলেন। স্বামীজী নিজ কক্ষ থেকেই তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণ কথাবার্তা কইলেন। তারপর স্বামীজীকে পুনর্বার প্রণাম করে সিস্টার চলে গেলেন"—স্মৃতিচারণ করেছেন স্বামীজীর শিষ্য এলাহাবাদের সরকারি কর্মচারী মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।[৬৩]

স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাবেন শুনে স্বামী অখণ্ডানন্দ চারজন আশ্রমবালক নিয়ে বেলুড় মঠে হাজির হলেন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে। মঠে দু-চার দিন থাকার পর অখণ্ডানন্দজী তাঁদের নিয়ে বলরাম মন্দিরে এলেন। বিদেশ যাত্রার একদিন পূর্বে স্বামীজীরও শুভাগমন হলো বলরাম মন্দিরে। হলঘরে বসে আছেন স্বামীজী। বহু দর্শনার্থী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। এমন সময়ে স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীকে বললেনঃ "দ্যাখ্ খোকা

৫৯ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ১৪
৬০ ঐ, পৃঃ ১২৫
৬১ ঐ, পৃঃ ২৪৪-২৪৫
৬২ ঐ, পৃঃ ২০৭-২০৮
৬৩ ঐ, পৃঃ ১৪

(স্বামী সুবোধানন্দ) এসে বলছিল, তুই খুব চমৎকার ভজন শিখিয়েছিস ছেলেদের। খোকার খুব ভাল লেগেছে। সেইসব ভজন আমাকে শোনা।”

স্বামীজীর আদেশে অখণ্ডানন্দজী ভজন আরম্ভ করলেন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে। প্রথমেই বৈদিক প্রার্থনা : ‘তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি’,… ইত্যাদি। তারপর নির্ভীক শিখ বীরগণের আত্মদানের অগ্নিমন্ত্র —গুরুজীর জয়ধ্বনি : ‘ওয়া গুরুজী!… ওয়া গুরুজী …!! ওয়া গুরুজী!!!’ এরপর নাম-সংকীর্তন : ‘হর নারায়ণ গোবিন্দ, ভজ রামকৃষ্ণ গোবিন্দ। জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল, কেশব মাধব দীন দয়াল।’ দেশের জন্য ঋষিদের প্রার্থনা : ‘আব্রাহ্মণ ব্রহ্মবর্চসী’ ইত্যাদি; শেষে আবার বৈদিক মন্ত্র ‘যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু…’ পাঠের পর ‘ওঁ পরমাত্মনে নমঃ’ বলে করজোড়ে প্রণামমন্ত্র উচ্চারণান্তে অখণ্ডানন্দজী ভজন শেষ করলেন। সমবেত সকলের অন্তরে সঞ্চার হলো এক দিব্যভাবের। স্বামীজীও তন্ময়। অনেকক্ষণ পরে স্বামীজী বললেন : “বেশ ভজন তো! Cosmopolitan character! সর্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক ভজন। সবাই করতে পারেন।”[৬৪]

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম ও তাঁর পরিবারদের বলেছিলেন : “তোমরা রাখালকে খাওয়াবে ও আদর-যত্ন করবে।” ‘রাখাল’ অর্থাৎ ‘মহারাজ’ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তিনিও বহুবার বহুসময়ে বলরাম মন্দিরে অবস্থান করেছেন। পুঁথিকার লিখেছেন :

“সাদরে রাখেন তিনি রাখালে ভবনে।
সৌভাগ্যবানের ঘরে রাখাল যে দিনে॥”[৬৫]

রাখালের স্বাস্থ্য খারাপ হলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন বলরাম মন্দিরে। বলরাম মন্দিরে রাজা মহারাজের ভাবতন্ময়তার একটি চিত্র : “রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া জপ করিত; কখনো কখনো দেখা যাইত যে, রাখাল রাস্তার দিকের বারান্দাতে বৈকাল-বেলা পায়চারি করিতেছে ও জপ করিতেছে। … দেহের ভিতর মনটি থাকিত না, যেন মনটি অন্য কোথাও চলিয়া যাইত। যখন সে ঘরে বসিয়া জপ করিত, তখন আমরা কেহ ঘরের ভিতর ঢুকিতে সাহস করিতাম না।”[৬৬]

বলরাম মন্দিরে মহারাজের ঘরে স্তবপাঠ হতো। তিনি স্থির হয়ে শুনতেন। এরূপ একদিন তিনি স্তবপাঠ শুনছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাও শুনছিলেন। স্তবপাঠ শেষ হবার পর মহারাজ রামলালদাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করলেন। রামলালদা মধুর কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রিয় গান গাইলেন— ‘বলরে শ্রীদুর্গানাম। (ওরে আমার, আমার মন)’। এই গানটি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বহুবার শুনিয়েছেন। আর একটি গানও রামলালদা গাইলেন—‘কে রণে নেমেছে বামা নীরদবরনী’। মহারাজ ভাবস্থ।

বলরাম মন্দিরে মহারাজ থাকলে সেখানে আনন্দের জমাট আবহাওয়া গড়ে উঠত। সাধু-ভক্ত সবাই এসে তাঁর ঘরে বসতেন, তিনি সৎপ্রসঙ্গ করতেন। “রবিবার সকাল ৭টা (৩০ জানুয়ারি, ১৯১৮)। মহারাজ ছোট ঘরটিতে স্থিরভাবে চুপ করে বসে আছেন। সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ একে একে এসে প্রণাম করে বসল। তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন, খুব সকাল সকাল ওঠা ভাল। রাত্রি যায় দিন আসে, দিন যায় রাত্রি আসে—এই সময়টা সংযমের সময়। এই সময় প্রকৃতি বেশ শান্ত থাকে—ধ্যানজপের বিশেষ অনুকূল। এই সময় সুষুম্না নাড়ী চলে, তখন দুই নাক দিয়েই নিঃশ্বাস বয়। নচেৎ সর্বদা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী চলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বয়। তখন চিত্ত চঞ্চল হয়। যোগীরা সর্বদা watch (নজর) রাখেন কখন সুষুম্না নাড়ী বইবে। সেই সময় তাঁরা যে কাজেই থাকুন না কেন, সব ছেড়ে দিয়ে ধ্যানে বসবেন।”[৬৭]

বলরাম মন্দিরে একবার মহারাজ আছেন। মধ্যাহ্ন-আহারের পর বিশ্রাম করছেন নিজ ঘরে।

৬৪ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, ১৩৮৯, পৃঃ ১৬৫-১৬৬

৬৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৩১৪

৬৬ অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯১, পৃঃ ৪০

৬৭ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ১৩৮২, পৃঃ ১২২-১২৪

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো একটি বালিকা ও তার ভাই। সেবক স্বামী নির্বাণানন্দের কাছে বালিকাটি অনুমতি চাইল রাজা মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। নির্বাণানন্দজী মহারাজকে জানালে মহারাজ বিকেল চারটায় আসতে বললেন। হতাশ হয়ে বালিকাটি কান্নাকাটি করতে লাগল। নির্বাণানন্দজী জানতে পারলেন যে, বালিকাটিকে এখানে পাঠিয়েছেন স্বামী সারদানন্দ। মহারাজকে সে-কথা বলায় মহারাজ তাকে ডেকে পাঠালেন। মহারাজকে প্রণাম করে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মহারাজ ভাবস্থ। তিনি বালিকাটিকে কান্নার কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে দেখিয়ে বলল: "উনিই আমাকে আপনার নিকট আসতে বলেছেন।" রাজা মহারাজ তার কাছে সব জানতে চাইলেন। সব বলল সে। ১৪ বছর বয়সে বালিকাটি বিধবা হয়। ভবিষ্যৎ-জীবন অন্ধকারময় বোধ হওয়ায় সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত সঠিক পথ নির্দেশের জন্য। এক বছর পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে দর্শন দেন ও বলেন: "কাঁদিসনি, আমার ছেলে রাখাল বাগবাজারে আছে। তার কাছে যা, সে তোকে সাহায্য করবে।" বালিকাটির সঙ্গে মঠের কারও পরিচয় ছিল না। সে তার মায়ের কাছে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলে। তার মা ভাই-এর সঙ্গে তাকে বাগবাজারে পাঠিয়েছেন। তারা খুঁজতে খুঁজতে উদ্বোধনে সারদানন্দ মহারাজের দর্শন পায়। তিনি সব শুনে তাদের বলরাম মন্দিরে পাঠিয়ে দেন। বালিকাটির কাছে সব শুনে মহারাজ সেদিন তাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন এবং তাদের আহারেরও ব্যবস্থা করেন। দীক্ষার পর বালিকাটি যখন ঘরের বাইরে এল, তখন তাকে দেখে মনে হলো সেই শোক-দুঃখের চিহ্নমাত্র তার ভিতরে নেই। রাজা মহারাজের কৃপা-কটাক্ষে এমন একটা কিছু ঘটেছিল, যার ফলে সে আনন্দে ভরপুর হয়েছিল।[৬৮]

একবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা অধ্যাপকের কন্যা মহারাজের দর্শনমানসে বেলুড় মঠে আসেন। মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে। মহিলাটির একান্ত আগ্রহ ও অনুরাগ লক্ষ্য করে স্বামী শিবানন্দ তাঁকে সঙ্গে করে বলরাম মন্দিরে নিয়ে গেলেন। রাজা মহারাজকে দর্শন করে ও তাঁর দিব্য উপদেশে মহিলা এক অপূর্ব ভাবে ভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অনুভবের কথা আমেরিকায় স্বামীজী-শিষ্যা ভগিনী দেবমাতাকে এক পত্রে জানান: "ভগিনি! আমি যা আশা করিয়াছিলাম, তার চেয়েও অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার—মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য দর্শন পাইয়াছিলাম। কিন্তু…এমন আশ্চর্যজনক ও উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন যাহাতে আমার ভিতর নিশ্চিত একটা কিছু ঘটিয়াছিল।… এই দিনটি আমার কাছে অপূর্ব। সেই দিন হইতে কত তৃপ্তি আর শান্তি উপলব্ধি করিতেছি। ইহার জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, আর যাঁহারা আমাকে এই দর্শনলাভে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকটেও আমি কৃতজ্ঞ।"[৬৯]

স্বামী অখণ্ডানন্দের অনাথ আশ্রমের এক সাধু-কর্মী মহারাজকে চিঠিতে লেখেন, ওখানকার আশ্রমের ভজন একঘেয়ে। মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে। অখণ্ডানন্দজীও সে-সময় সেখানে আছেন। মহারাজ তাঁকে ঐ চিঠির কথা বললেন এবং আশ্রমের ভজন শোনাতে অনুরোধ করলেন। অখণ্ডানন্দজী ভজন ধরলেন—দুর্গানাম, শিবপঞ্চাক্ষর স্তোত্র, বৈদিক স্তোত্র, প্রার্থনামন্ত্র, শিখদের ভজন, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যে হলো' ইত্যাদি গান। পরমাত্মা-বিষয়ক একটি প্রণামমন্ত্র দিয়ে শেষ করলেন অখণ্ডানন্দজী। তন্ময় ও ভাবাবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন মহারাজ। কিছুক্ষণ পর তিনি অখণ্ডানন্দজীকে বললেন: "এমন সুন্দর ভজন! বলে কিনা একঘেয়ে! দেখ, তোমার ছেলেরা তাঁতের কাজ, ছুতোরের কাজ শিখে কি করবে বলতে পারি না, কিন্তু দুবেলা যদি এই ভজন করে, তবে তারা তরে যাবে, তরে যাবে।"[৭০]

[ক্রমশঃ]

৬৮ দ্রঃ ব্রহ্মানন্দচরিত—স্বামী প্রভানন্দ, ১৯৮২, পৃঃ ২৬৯-২৭০

৬৯ বলরাম মন্দিরে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৫২-৫৪

৭০ ব্রহ্মানন্দচরিত, পৃঃ ৩৪৮

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সামাজিক ছবি

"খ"

[পূর্বানুবৃত্তি]

"আপনি লেখাপড়া জানেন ?"

"জানি।"

"এদেশে এসেছেন, যাবার উদ্দেশ্য কোথায় ?"

"বদ্রীনাথ যাব।"

"এখানে কিছুদিন থাকুন না !"

"আপনারা রাখেন তো থাকব।"

"বেশ ; আপনার যত দিন ইচ্ছা থাকুন।" এই বলিয়া চারুবাবু স্নানাদি করিতে গেলেন।

চারুবাবু আপিসে চলিয়া গেলে, যে-সময় বৈষ্ণবী স্নান করিতেছিল, চারুবাবুর চার বছরের মেয়ে সুহাসিনী বৈষ্ণবীর একতারা লইয়া পিসীমার কাছে উপস্থিত। পিসীমা বামালসহিত চোরকে বৈষ্ণবীর কাছে আনিলেন। বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, "বৈষ্ণবী হবে ? এস রসকলি পরিয়ে দি।" পিসীমা বলিলেন, "সুহাস তোমার কাছে গান শুনতে চায়।"

বৈষ্ণবী একতারা লইয়া গাহিতে বসিল :

"রাধা নামে হাট বসেছে, তাই এসেছি শুনে,
(ঘরে মন কি মানে)
আমার রাধা মন্ত্রের উপাসনা স্থির হতে পারিনে।
রাধা নামের কি মাধুরী ভুলিল যত পুরুষ নারী,
তারা চলেছে সব সারি সারি হরি সংকীর্তনে।
(জয় রাধে শ্রীরাধে বলে)
রাধা নামে পাতক কাটে, নিতাই বিলাচ্ছেন প্রেম হাটে মাঠে,
আবার যে পেলে সে নিলে লুটে, অধম চন্ডাল জনে।"

বৈষ্ণবীর কোকিল ঝংকার শুনিয়া পার্শ্বের দু-তিন বাড়ির মেয়েরা আসিল। পিসীমা ও বৌ তো বিস্মিত ও মোহিত। আগন্তুকদের হিন্দুস্থানী দেখিয়া বৈষ্ণবী আবার গান ধরিল।

"মেরে গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই,
জাকে শির মোর মুকুট মেরো পতি সোই।
আঁখিবন জন সীঁচ সীঁচ প্রেম বেল বোই,
অবতো বাত কৈল গই জানে সব কোই।
সাধুন সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোক লাজে খোই,
দধিমথ ঘৃত কাঢ় লীন ছাচ পিবে কোই।
ছোড় দই কুলকী লাজ ক্যা করেগা কোই,
দাস মীরা শরণ আই হোনী হোসো হোই।"

বৈষ্ণবী থামিলে বৌ বলিল, "পিসীমা, কাল সরলাকে গান শুনতে ডাকলে হয়।"

পিসী। "বেশ তো।"

বৈষ্ণবী বলিল : "নিকটে বাঙ্গালী আর কেউ আছে নাকি ?"

বৌ। "নিকটে একঘর আছে। সমস্ত বেরিলি শহরে অনেক বাঙ্গালী আছে।"

সেই দিন আহারান্তে বৈষ্ণবী বৌকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল : "একটি মেয়েকে রান্নাঘরের ভিতর লুকুতে দেখলুম, ওটি তোমার ননদ নাকি ?"

"হ্যাঁ। ও বড় লাজুক, নূতন লোকের সুমুখে বেরুতে পারে না।"

"তা ওঁর বে হয়নি কেন ?"

"ওর বের সন্ধান করতে আর টাকা যোগাড় করতে বয়স অনেক হয়ে গিয়েছিল—প্রায় ষোল বছর। কিছু গহনা ও টাকা কম দেবার কথাতে তারা রব তুলে দিলে যে, ওর স্বভাব খারাপ হয়ে গিয়েছে শেষে এমন মুস্কিল হলো, যে ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে হলো ; কিন্তু কোন ক্রমেই কোথাও বিবাহের স্থির করতে পারা গেল না। যেখানে কথাবার্তা হয়, শত্রুরা উড়ো চিঠি বা অন্য কোন উপায়ে বদনাম রটিয়ে দিয়ে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়ে দেয়। এই রকমে ৪।৫ বছর হতে আমার ননদ একদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গিয়েছিল। কি ভাগ্যে জানতে পারা গিয়েছিল। না হলে মরতো। তারপর থেকে বের চেষ্টা বন্ধ করে দেওয়া হলো।"

"বটে, সেই পুরনো কাহিনী। পুরুষে যা ইচ্ছে

করুক, কোন দোষ নেই, মেয়ের নামে একটু সন্দেহ ওঠাতে পারলে হয়, তাহলেই সমাজ মেয়ের সর্বনাশ করবেন। কি হবে, আমাদের দেশে মেয়েদের পশুত্ব ঘোচেনি, তারা লেখাপড়া জানে না, ভীরুর একশেষ, পুরুষের পা-চাটা, কোন উপায়ই হবার জো নেই। মুখটি বুজে পুরুষের সায়ে সায় দিয়ে যেতে হয়।"

বৌ। "তুমি কি বল, মেয়ে-পুরুষ সমান?"

বৈষ্ণবী। "অসমান কিসে? পুরুষের যে রক্তমাংসের শরীর, মেয়ের কি তা নয়? পুরুষের যে ইন্দ্রিয়, মন, মেয়ের কি তা নয়? পুরুষের যে ইচ্ছা, অভাব, সুখ, দুঃখ, আশা, সাধ, মেয়ের কি তা নয়? মেয়ের স্বভাব খারাপ হয়, পুরুষের দ্বারাই তো। কিন্তু দণ্ড পায় কে? মেয়ে। আর দণ্ডই বা কেমন? যাবজ্জীবন জীবন্মৃতত্ব, সমাজের চূড়ান্ত ঘৃণা, যার চেয়ে আর দণ্ড হতে পারে না।"

বৌ। "মেয়ে গর্ভধারিণী, সমস্ত বংশের কল্যাণ মেয়ের সতীত্বের ওপর নির্ভর করে, তাই মেয়ের ওপর এত কড়াক্কড়।"

বৈষ্ণবী। "ও সব জোচ্চুরি কথা। মেয়ে পুরুষের সম্পত্তি, ক্রীতদাসী, 'আমার জিনিসে আর কেউ হাত দিতে পারে না', পুরুষের এই ধারণা থেকে নিয়মের উৎপত্তি হয়েছে যে, 'স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষকে জানতে পারবে না।' বংশের কল্যাণের জন্য পুরুষের যতটা সতীত্বের দরকার, মেয়ের তার বেশি নয়। পুরুষ আইনের কর্তা কিনা, তাই নিজের কোলে ঝোল টেনেছেন। নিজেদের বেলা স্বেচ্ছাচার, মেয়েদের বেলা কড়াক্কড় নিয়ম। ন্যায়ের দিক থেকে হলে, মেয়ে-পুরুষের একই নিয়ম হতো। বোঝ না, পুরুষের বৈধব্য নেই, আশি বছরের বুড়ো পর্যন্ত দশবার বিয়ে করতে পারে, আর পাঁচ বছরের মেয়ে বিধবা হলে, তার আর বিয়ে হবার জো নাই। অবিচারের দৌড়টা একবার দেখ দেখি।"

বৌ। "তুমি কি বল বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত?"

বৈষ্ণবী। "উচিত নয়? বিধবারা কি অপরাধ করেছে যে, যাবজ্জীবন সংসারের সুখে বঞ্চিত থাকবে? পুরুষের কি অধিকার আছে যে, মেয়েদের জ্যান্তে মরা করে রাখে?"

বৌ। "দেখ, সরলাও বলে, বিধবার বিয়ে হওয়া উচিত। সে বেশ লেখাপড়া জানে। মেম টিচার রেখে তার স্বামী তাকে ইংরেজী শিখিয়েছে। ছেলে-পুলে হয়নি। স্বামী বড় চাকরি করে, সংসারে বেশি কাজ-কর্ম নেই, খুব পড়াশুনা করে। তার সঙ্গে তোমার আলাপ হলে বেশ হবে। আজ তাকে চিঠি দিয়েছি, কাল দুপুরবেলা আসবে।"

বৈষ্ণবী। "সরলারা ব্রাহ্ম নাকি?"

বৌ। "না। সরলার স্বামী দুর্গাদাসবাবু কোন ধর্মের ধার ধারেন না। তবে সরলার মামা ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি সরলাকে মানুষ করেন ও লেখা-পড়া শেখান। দুর্গাদাসবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পাঁচ-ছয় বছর পরে সরলাকে বে করেন। দুর্গাদাসবাবু এদিকে লোক মন্দ নন, তবে বেশ্যা আছে, মদও খান। সরলার অন্য সব সুখ থাকলেও স্বামীর স্বভাবের জন্যে বড় মনোকষ্ট।"

বৈষ্ণবী। "মনোকষ্ট করলে কি হবে, আপনার সুখ কি কেউ ছাড়ে? তা যাক, এখন তোমার ননদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও।"

বৌ। "আমি কত বলেছি, সে শোনে না। সরলার সঙ্গে তার খুব ভাব। সে যদি কাল আসে, জোর করে ধরে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। এখন বল, তোমার বিয়ে হয়েছিল কিনা, আর তুমি এমনই বা হয়েছ কেন?"

বৈষ্ণবী। "নেহাৎ শুনবে আমার কাহিনী, তবে ফুল মুঠো করে বস। আমি ভরা যৌবনে বিধবা হয়ে একজন পুরুষের জন্য পাগল হয়েছিলুম; সেও খুব ভালবাসা দেখিয়েছিল। পরে আমার বোকামির জন্য বাড়ি থেকে বেরুতে হলো আর কি। তারপর এই বৈষ্ণবী হয়েছি। এদেশ ওদেশ ঘুরি; নূতন জায়গা দেখি, নূতন মানুষ দেখি, আপনার মনে স্বচ্ছন্দে থাকি।"

বৌয়ের চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। বৈষ্ণবী হাসিয়া উঠিল এবং একতারা বাজাইয়া গান ধরিল :

"শ্যামের নাগাল পেলুম নালো সই,
কি সুখে আর ঘরে রই।
আমি বন-পোড়া হরিণের মতো ইতিউতি চেয়ে রই।"

বউ উঠিয়া চলিয়া গেল।* [ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১১, পৃঃ ৫১০-৫১৩

সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক : স্বামী নিরাময়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঈশোপনিষদে আছে : যারা আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করে না, তারা আত্মঘাতী এই চেষ্টায় যদি জীবন যায় তো সে জীবন ধন্য। সেই আত্মা কি? আত্মার বিষয় আগে শুনতে হবে, তারপর মনন করতে হবে, তারপর ধ্যান করতে হবে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বোঝাচ্ছেন—আত্মাই সবচেয়ে প্রিয়, আত্মার জন্যই সব কিছু প্রিয় :

'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি
আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।

*   *

ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।

*   *

ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি ॥'[১]

ব্রহ্মনিরূপণ? দেঁতোর হাসি। না হাসলেও হাসছে। নিরূপণ না করলেও নিরূপিত হয়ে রয়েছে। তোমার নিরূপণের অপেক্ষা রাখে না—নিরপেক্ষ। সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করে প্রকাশ পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না? তোমার চোখ বাঁধা বলে, সামনে মায়ার মেঘ বলে।

বাবা* আপন মনে তাঁর সহজ সুরে গাইছেন—

মা, তোর কোলে আমি লুকিয়ে থাকি।
থেকে থেকে চেয়ে চেয়ে,
চেয়ে চেয়ে তোর মুখপানে
শুধু মা, মা, মা, মা বলে ডাকি।
ওমা তোর কোলে আমি লুকিয়ে থাকি ॥

—যেন ছোটছেলে মায়ের কোলে রয়েছে, মায়ের দিকে তাকিয়ে—ভারি আনন্দ; ইচ্ছে করে মায়ের মাঝে মিলিয়ে যাই। কেউ দেখতে পাবে না, শুধু মা আর আমি—আর কিছু না। থেকে থেকে চেয়ে চেয়ে মাকে দেখতে দেখতে আনন্দে যখন আটখানা, যখন আর চেপে রাখতেও পারছে না—তখন 'মা, মা, বলে ডাকি'। মায়ের কাছে, মায়েরই কোলে রয়েছে, ডাকবার কোন কারণ নেই; তবু অকারণ আনন্দে অকারণ ডাক। তারপর কিসব আছে—'যোগানন্দ নিদ্রারসে'; আরও কত সব। ও সব কি? ছোটছেলে মায়ের কোলে, তার মধ্যে ঢোকালে কিনা 'যোগানন্দ নিদ্রারসে'। আমরা ঐ দুলাইন গাইতুম—একঘণ্টা দুঘণ্টা ধরে। সব আত্মহারা। আর তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) হাসতেন বা গানে যোগ দিতেন। খুব আনন্দ।

মা তোর কোলে আমি লুকিয়ে থাকি।
থেকে থেকে চেয়ে চেয়ে,
চেয়ে চেয়ে তোর মুখপানে
মা, মা, মা, মা, বলে ডাকি।

আমি কি করব? যা দেবার দিয়েছি একবারেই। এবার তোমার কাজ। শান্তি পাই না—অশান্তি, সংসার ভাল লাগে না—কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে সংসারেই থাকতে বলেছে? বন আছে জঙ্গল আছে, এত আশ্রম রয়েছে—চলে যাও না। সাধুসঙ্গ চাই, কাজ চাই, তবে শান্তি পাবে, কাজ কর প্রাণভরে।

এখানে [সারগাছি] আসা ঠাকুরের নির্দেশে। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ। কলকাতা থেকে চন্দননগর আসি। সেখান থেকে নবদ্বীপ আসার ইচ্ছা হয়। তারপর গঙ্গাতীর ধরে ভ্রমণের ইচ্ছা—এইরূপে বেলডাঙ্গা আসি, সেখানে গঙ্গার ধারে দেখি একটি মুসলমানের মেয়ে কাঁদছে—কলসী ভেঙে গেছে। কাছে যা সামান্য পয়সা ছিল, তা থেকেই কলসী কিনে দিই ও কিছু চিঁড়ে। তারপরই আমাকে ঘিরে দাঁড়াল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত

* সাধু-ভক্তগণ স্বামী অখণ্ডানন্দকে 'বাবা' বলিয়া ডাকতেন।

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ২।৪।৫

জন দশ-বারো—বললে, 'বাবা, খেতে দাও।' সেই থেকে 'বাবা'। বাকি যা অল্প পয়সা ছিল, তাই দিয়ে চিঁড়ে কিনে তাদের দিয়ে আমি এগিয়ে চললাম। সন্ধ্যায় ভাবতা স্টেশনের কাছেই রাত কাটালাম। সকালে উত্তর দিকে যাবার ইচ্ছে—কিন্তু মহুলায় অন্নপূর্ণাপূজার নিমন্ত্রণ। তারপর ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁর কাজে—এখানেই আটকে গেলাম।

দুর্ভিক্ষের দেশে ঠাকুরই মা অন্নপূর্ণা। তাইতো ওদের পেটভরে খাওয়াবার আয়োজন। মন্দির হওয়া—ইচ্ছা ছিল না। তাঁরই ইচ্ছায় হলো শেষ পর্যন্ত, ঠাকুরের তিথিপূজার দিন শত চেষ্টাতেও সব কাজ শেষ হলো না। অন্নপূর্ণাপূজার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো, ঠাকুর এসে বসলেন। তাইতো ঐদিন 'দীয়তাং ভুজ্যতাং।' "খালি পেটে ধর্ম হয় না"। দুর্ভিক্ষের দেশে আসল ধর্ম খাওয়ানো পরানো—তারপর লেখাপড়া শেখানো, অসুখ-বিসুখে সেবা করা।

গুরুবাক্য বেদান্তবাক্য—সবাই মুখে বলে, কেউ কিছু শোনে না, একটা কথা রাখে না। ঠাকুর আমাদের বেশি কিছু বলে যাননি—দুটি কথাঃ প্রথম—'গালে হাত দিয়ে ভাববি না', আর দ্বিতীয় 'দাঁড়িয়ে জল খাবি না'। দুটিই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করেছি। আজকালকার ছেলেরা? যেটি বলবে, ঠিক উল্টোটি করবে। তাইতো কিছু বলি না। আমরা তো আমাদের পালা শেষ করে যাই। কখনো গালে হাত দিয়ে ভাবিনি। কেন ভাবব? তাঁর ভালবাসা—তাঁর আশ্রয় পেয়েছি, আনন্দে ভরে আছি।

কাজ কর। কাজ কর। বসে থাকা দুচক্ষে দেখতে পারি না। যাহোক একটা কিছু কর। কুটনোও তো কুটতে পারো—তা না পারো, ঝাঁটা দিয়ে ঝাট দাও—দেখ না কোথায় ময়লা। আশ্রমটি পরিষ্কার কর।

নায়মাত্মা বলহীনেনা লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

*

ন প্রবচনেন ন চেজ্যয়া
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ॥

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আগে শরীর শক্ত করতে হবে। Healthy strong body (সুস্থ সবল শরীর) হলে তবে healthy thoughts (সুস্থ চিন্তারাশি) আসবে। তা নইলে শুধু মনের যা তা চিন্তা। দুধ ছানা মাছ মাংস দই ঘোল—সব খাবে। Fruits are gold in morn (সকালে ফল খুব ভাল)।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরটি সবসময় ভগবদ্‌ভাবে ভরে থাকত। সবাই অল্পবিস্তর অনুভব করত, সহজেই ধর্মভাবের উদ্দীপনা হতো। শত শত জন্মের সাধনার ফল যেখানে বসে বসেই লাভ হতো। মুহুর্মুহু ভাবসমাধি—এই ভাঙে তো এই হয়। সেসব কি ভোলবার? তাঁর এক-একটি কথায় বেদ-বেদান্ত বোঝা কত সহজ হয়ে যেত।

ঠাকুর বলেছিলেন, "নরেনকে জানিস? কলকাতার ছেলে, সুমুখ দিকে চোখ ঠেলা—অন্তর্মুখী। ওর সঙ্গে খুব মিশবি।" তার পরদিনই তাঁর কাছে যাই। তিনিও কাছে টেনে নিলেন। পরে ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি।

তখন ছিলাম খুব আচারী, নিরামিষ খেতাম। স্বামীজী বকতেন, বলতেন, 'ওসব ছাড়ো, মাছ-মাংস খাও। এর সঙ্গে ধর্মের কিছু নেই।'

ঠাকুরও বলতেন, 'আচারী হবি কেন? যা কালীঘরে প্রসাদ খেয়ে আয়।' ইচ্ছে হতো না, তাই ঠাকুর আবার দেখতেন—কোন্ ঘরে যাচ্ছি, কালীঘরে না বিষ্ণুঘরে। কালীঘরেই খেতাম, প্রসাদ খেতাম আর ভাবতাম—মা, তোমার কি এসব না খেলে চলে না? এইরকম কত সব কথা, বলতে গেলে ফুরোয় না। কতটুকু আর প্রকাশিত হয়েছে—one fourth, কি সিকির সিকি।

স্বামীজীর কথাই বা কত মনে পড়ছে। স্বামীজী যখন যেভাবের ওপর জোর দিতেন, তখনকার মতো সেখানে উপস্থিত সকলের মনে হতো—সেইটিই সত্য, আর সব যেন কিছু নয়। বেলুড়ে গঙ্গার ধারে কতদিন কতভাবের কথা, যেদিন যেভাবের কথা হতো, সেদিন যেন সারা মঠটি সেই ভাবেই ভরে থাকত। যেদিন শিবের কথা, সেদিন মনে হতো—স্বামীজীই সাক্ষাৎ শিব, শঙ্কর, সারা মঠে সেই ভাব। আর যেদিন বুদ্ধের কথা, সেদিন মনে হতো—এটি বুঝি একটি বৌদ্ধ মঠ, সব শান্ত স্থির। আবার যেদিন তিনি রাধারানীর কথা পাড়তেন, সেদিন যেন

সব বাঁধ ভেঙে যেত—মনে হতো তিনি বুঝি সেই ব্রজগোপী। সারা মঠ সুমধুর গোপীভাবে ভরপুর। স্বামীজী বলতেন কতদিন—

Radha was not of flesh and blood,

Radha was a froth in the ocean of love.

—(রাধা রক্ত-মাংসের ছিলেন না, রাধা ছিলেন প্রেম-সমুদ্রের একটি বুদ্বুদ)।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬, বেলা ৩টা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি ও শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ একটু আগে সারগাছি থেকে বেলুড় মঠে এসেছেন, বহু ভক্ত ইতিমধ্যে তাঁকে দর্শন করার জন্য ছুটে এসেছে।

পূজ্যপাদ মহারাজ চেয়ারে বসে আছেন। ভক্তেরা কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ মাটিতে বসে।

তিথিপূজার রাত, আজ অতি পুণ্যরাত্রি—কালীপূজা হবে, তারপর বিরজাহোম, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য। আজ মঠের হাওয়া গায়ে লাগলে বিবেক বৈরাগ্য আপনি হবে, সংসার-বন্ধন সব কেটে যাবে।

আহা! গঙ্গার ধার দিয়ে যেতে কি সুন্দর! একটা idea (ভাব) ছিল, হয়ে ওঠেনি। মাঝপথে মুর্শিদাবাদেই আটকে গেলাম। গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে যাব—বরাবর—সেই গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী—পশ্চিম কূল ধরে ধরে—কেউ যাক না—দেখেও সুখ। এখন আর সে শক্তি নেই। কালই পাঁচজন বেরিয়ে যাক না—আমাদের মঠের সাধু। মিশনের সাধু বলো না—মঠের সাধু। মিশনের কর্মী। মিশন হচ্ছে রিলিফের কাজ, সেবাকার্য—এইসব।

বেলুড় থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দেখবে—ওধারে দক্ষিণেশ্বর, তারপর সব কলকারখানা—চিমনি, ধোঁয়া—চলল কতদূর। এধারে শ্রীরামপুর, তারপর ওধারে নৈহাটি। অনেকদূর যেতে যেতে কালনা, নবদ্বীপ। আরও ছাড়িয়ে ওধারে পলাশী, মুর্শিদাবাদ পড়বে। আরও উত্তরে ডানদিকে পদ্মা বেরিয়ে গেল।—গঙ্গার ধারে ধারে যাবে, ভাটার সময় চলবে, একটু আশেপাশের গ্রামে ঢুকবে ভিক্ষার জন্য। সাথে একটি পয়সাও নেবে না। সেইতো মজা। সম্পূর্ণ ঈশ্বরনির্ভর। টাকাপয়সা নিয়ে রেলগাড়িতে ভ্রমণ করা কি সুখের? দেশই দেখা হয় না, ৪০০ মাইল রাস্তা চলে গেলে একরাতে—কি মরি ভ্রমণ করা!

আর প্রচার, প্রভুর নাম করবে—গুণকীর্তন করবে যেখানে যাবে। আর গঙ্গার ধারে ধারে কত সাধুদর্শন! যথার্থ সাধু—যাঁরা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন—এমন সব ভক্ত মহাপুরুষ!

পয়সা ছুঁতাম না বলে স্বামীজী কত ভালবাসতেন। ভ্রমণের সময় গুজরাটে একবার ডাকাতের হাতে প্রাণ যেত। বেঁচে গেলাম—পয়সাকড়ি কিছু ছিল না বলে। আহা! সে একটা কেমন অবস্থা! সর্বদা নির্ভর, সর্বদা তাঁর চিন্তা!

টাকাই তো ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়। ভগবন্নির্ভরতাই আত্মনির্ভরতা, টাকায় নির্ভরতা আত্মনির্ভরতা নয়। দেখ না যারা চাকরি করে, টাকা রোজগার করে তারা ঠিক ঠিক ভগবানে বিশ্বাস করতে পারে না, ঠিক ঠিক নির্ভর করতে পারে না। ও-দুটো একসঙ্গে হয় না, দুনৌকায় পা বড় ভীষণ।

অনেক ছেলে-ছোকরারা এসে বলে—'রামকেষ্ট' যদি ভগবান, তো ভারত স্বাধীন হচ্ছে না কেন? আরে বাপু! তিনি নিরপেক্ষ হয়ে তাঁর ভাবের বীজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন—যেখানে যেমন মাটি, আর যেমন লোকেদের চেষ্টা, সেই রকম ফসল হবে তো?

ভারতকে—বাংলাকে যা দিয়েছেন—যথেষ্ট। এই ভাবই ধারণ করতে পারছে না। ৮০০ বছরের গোলামের জাত। কি করবে? না আছে শক্তি—না আছে কিছু। Spirit of adventure, determination, discipline (সাহসিকতার ভাব, দৃঢ়-সংকল্প, নিয়মানুবর্তিতা) কিছুই তো দেখি না। সত্যি বলছি, আমার কোন আস্থা নেই এদের ওপর। আর দেখ, স্বাধীন দেশের মাটিতে ঠাকুরের ভাব কিরকম ফুটে উঠছে ও উঠবে! ওদের একটা শক্তি আছে, আগ্রহ আছে—উপযুক্ত আধার।

এই দেখ না ঠাকুরেরই ভাব—সবার ভিতরে, তবে যে যেমন আধার, তার ভিতর তেমন প্রকাশ। স্বামীজী অনন্ত আধার, তাই তাঁর ভিতর অনন্ত ভাবের প্রকাশ। আর যে যেমনটুকু, তার ভিতর তেমনি। সত্যি বলছি, আমি যতটুকু পেয়েছি, তাতেই ধন্য হয়ে গেছি। [ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারত-ধর্ম

যোগেশচন্দ্র বাগল

[পূর্বানুবৃত্তি : মাঘ, ১৩৯৭-এর পর]

এই সময় তৃতীয় বিপদ দেখা দিল উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পশ্চিমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ স্বদেশীয়দের নিকট হইতে। তখন কোন কোন নেতার মুখে এমন কথাও শুনি, ইংরাজী ভাষা এবং ইউরোপীয় আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ না করিলে জাতির মুক্তি নাই। নব্য শিক্ষিতের ইংরাজী ভাষায় গল্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থাদিও লিখিতে অভ্যস্ত হন। বাঙলা ভাষা, সাহিত্য তাঁহাদের নিকট যেন অস্পৃশ্য। মহামতি সি. এফ. এন্ড্রুজ বলিয়াছেন, ব্রিটিশ শাসনের দাসত্ব অপেক্ষা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিজয় তথা প্রাধান্যলাভ ভারতীয় সমাজের পক্ষে ঘোরতর মারাত্মক হইয়া ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সময়কার একটি উক্তির মধ্যেও ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তিনি বলেন : "হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ন পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি।" ('সীতারাম') সত্য বটে, রাজনারায়ণ বসু উদ্ভাবিত এবং নবগোপাল মিত্র প্রবর্তিত হিন্দুমেলার ন্যায় স্বাজাতিক প্রতিষ্ঠান এই সময়কার বিজাতীয় মনোবৃত্তির স্রোত রোধ করিতে খুবই তৎপর হইয়াছিল। স্বদেশীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ও সংস্কার-সাধনে এই মেলার বিশেষ প্রযত্ন লক্ষ্য করি। কিন্তু দিশাহারা বিভ্রান্ত জাতির পক্ষে ইহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

হিন্দুমেলারই অঙ্গ জাতীয় সভার একটি অধিবেশনে (১৮৭২) রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। তিনি একেশ্বরবাদী হিন্দু, আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, কাজেই বক্তৃতায় সাকার বা বহু-দেবদেবীর পূজার যে তিনি প্রশস্তি করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ চিন্তা যা উপনিষদে বিবৃত তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া 'বহুনিন্দিত' হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা তিনি প্রতিপালন করিতে প্রয়াসী হন। হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন তথা সর্বজনীন মঙ্গলময় রূপটি ইহাতে ফুটিয়া ওঠে। কিন্তু তখন এই বক্তৃতায় কত আপত্তি! কেশবপন্থী ব্রাহ্মগণ এবং খ্রীস্টান পাদ্রীরা প্রতিবাদ সভা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে নামিলেন। প্রথমোক্তদের একটি প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং এবং বক্তৃতা দেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়)। কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের শেষে বিবিধ উপায়ে স্বদেশীয়দের সেবা, সংস্কার ও উন্নতিসাধন-কল্পে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভারত-সংস্কার সভা গঠন করেন। হিন্দুমেলার মতো ইহা দ্বারাও সমাজের কল্যাণ খানিকটা সাধিত হয়, কিন্তু মূলে যে হা-ভাত! হীনম্মন্যতা আত্মপ্রত্যয় আনে না; আত্মচেতনাই আত্মপ্রত্যয়ের দ্যোতক, এই চেতনা কিরূপে আসিবে? সন্তরণ শিক্ষার্থী ঠাঁই হারাইয়া জলে যেমন হাবুডুবু খায়, আমরাও তেমনি ধর্মীয় ভিত্তির অভাবে কেমন যেন বিভ্রান্তির মধ্যে গা ভাসাই। বিভ্রান্তি দূরকরতঃ আত্মচেতনা দান করিবে কে?

॥ ৩ ॥

এই সময়ে আবির্ভূত হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার অবস্থিতি, মন্দিরের পূজারী ছিলেন তিনি। ধর্মবিষয়ে তিনি কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন, তাঁহার মুখে কিরূপ তত্ত্বকথা! ধর্মপ্রাণ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে প্রথমে সাধারণের গোচরে আনেন। পরমহংসদেবের উক্তিসমূহ লইয়া একখানি চটি বইও তিনি প্রচারিত করেন। এই

'পূজারী' ব্রাহ্মণের (অবশ্য তিনি প্রচলিত অর্থে তখন আর 'পূজারী' নন) নিকট বিভিন্ন স্তরের ও ধর্মাশ্রয়ী লোকের আনাগোনা শুরু হইল। ব্রাহ্মেরা শুধু নন, খ্রীস্টান, মুসলমান এবং উচ্চশিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরাও তাঁহার নিকট তত্ত্বকথা শুনিতে যাইতেন এবং শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। একজন পূজারী ব্রাহ্মণ, যিনি কোনরকমে নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন মাত্র, তিনি এমন উন্নতমনা সাধক হইলেন কিরূপে?— সকলেই এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীরাও যে তাঁহার মুখে তাঁহাদেরই কথা শুনিতে পাইতেছিলেন।

পরমহংসদেব উচ্চকোটির সাধক, তাঁহার ঈশ্বর, যাঁহাকে তিনি 'মা' বলিতেন, মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ নয়; কোন একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও নয়, তাঁহার অস্তিত্ব সর্বজীবে, সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া। তিনি ইতিপূর্বে বিভিন্ন ধর্মমত অনুসারে ঈশ্বরের সাধন-ভজন করিয়াছেন। খ্রীস্টানরূপে, মুসলমানরূপে, অন্যান্য ধর্মীয় শাখা বা সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর-ভজনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই জগন্মাতার সন্ধান পাইয়াছেন। হিন্দু হইয়াও খ্রীস্টান বা মুসলমানরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করা যে সম্ভব তাহা তিনি দীর্ঘকাল আচরণ দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক ভাষায় বলিতে পারি দক্ষিণেশ্বরকে তিনি পরিণত করেন একটি ধর্মের লেবরেটরি বা পরীক্ষণাগারে। তিনি এইখানে এক-একটি ধর্মকে ও ধর্মীয় শাখাকে পরখ করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই সার সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে, ঈশ্বর সকল দেশ, জাতি ও ধর্মের মধ্যে, এক কথায় সর্বত্র বিদ্যমান। হিন্দু ছাড়া আর কেহ কি এমন ভাবে ভাবিতে সক্ষম? খ্রীস্টানরা মনে করেন যীশুখ্রীস্ট তাঁহাদের ত্রাণকর্তা, তাঁহাকে না মানিলে জীবের আদর্শ মুক্তি ও কল্যাণ নাই। মুসলমানদের ধারণা মহম্মদীয় ধর্ম অনুসরণ না করিলে জীবের অনন্ত নরক। এই রকম ইহুদিই বলুন, ইরানীই বলুন প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মুক্তিপথ আলাদা। খ্রীস্টান কি কখনও হিন্দুভাবে দেবতার ভজনা করিতে পারেন? মুসলমানও কি কখনও এরূপ কল্পনা মনে স্থান দেন? অন্যদের সম্বন্ধে কিছু নাই বলিলাম। পরমহংসদেব দেখাইলেন হিন্দু হইয়াও খ্রীস্টান বা মুসলমানরূপে জগন্মাতার আরাধনা করা যায়। তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ বা তন্ত্রের ধার ধারেন না। কিন্তু তিনি অবিরাম সাধন-ভজন ও সাধুসঙ্গ দ্বারা যে-সত্যে পৌঁছিয়াছেন তাহা উক্ত উন্নত শাস্ত্রগ্রন্থাদির নির্যাস। "যত্র জীব তত্র শিব"—এই তাঁহার বাণী। মানুষের ধর্ম কোন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ নয়। মানুষ-মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান। মানুষের ধর্ম—পরস্পরের কল্যাণসাধন। পরমহংসদেবের মুখে সরল সহজ ভাষায় ধর্মের এই মূল কথাগুলি শুনিয়া সকলেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বিষয় জানা-জানি হইবার অল্পকালের মধ্যেই আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী, নিরাকার ও সাকার উপাসক—যুবক বৃদ্ধ সকলেই জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ভিড় করিতে আরম্ভ করেন।

বিবেকানন্দের পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত, দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুগায়ক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত খুবই সংশয়পূর্ণ। এরূপ একজন যুবক কিরূপে পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন সে-সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রহিয়াছে, পুনরুক্তি এখানে অনাবশ্যক। তাঁহার মতো শিক্ষাভিমানী সন্দিগ্ধচিত্ত যুবক পরমহংসদেবের সহজ সরল তত্ত্বকথা শুনিয়া ক্রমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া পড়েন। পরমহংসদেব যে-ধর্মের কথা বলেন, তাহা দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই ধর্ম সর্বদেশের, সর্বকালের এবং সর্বলোকের। এই ধর্মই তো উপনিষদ্-ব্যাখ্যাত ধর্ম। ইহা একটি জাতির মুখে উচ্চারিত এবং একটি দেশের মধ্যে ইহা সঞ্জাত; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা শুধুমাত্র একটি জাতির বা একটি দেশের ধর্ম নয়। ইহার মূল মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র, ইহার বাণী বিশ্বজনীন ও সর্ব-জনীন অর্থাৎ এককথায় ইহা মনুষ্যমাত্রেরই ধর্ম। নরেন্দ্রনাথ তদীয় আচার্য পরমহংসদেবের মধ্যে উপনিষদে ব্যাখ্যাত বিশ্বজনীন ধর্মের অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয় বিকাশ দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া তিনি আচার্যের জীবন ও দর্শন আলোচনা ও অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। যতই এই কার্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন

ততই তাঁহার মনে হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ বিশ্বজনীন রূপ প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহা জাতি ও দেশের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সকল জাতির ও সকল দেশের মানুষেরই ধর্ম—এই সারসত্য তিনি উপলব্ধি করিলেন। পরমহংসদেবের জীবনে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে; তিনি এই পরীক্ষিত তত্ত্বকে কার্যে রূপ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করেন। সর্বত্র স্বদেশবাসীর সহজাত ধর্মবোধ দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপ্লুত হন। উপনিষদ্ ও বেদান্ত চর্চায় তিনি অভিনিবিষ্ট হইলেন। ইহার সর্বজনীন রূপ তাঁহার হৃদ্গত হইল। সকল মানুষের কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যেই যে ইহার সার্থকতা তাহাও তিনি উপলব্ধি করেন। এই দিক হইতে বিবেকানন্দ রাজা রামমোহন রায়ের সত্যকার উত্তর সাধক। উচ্চ-নীচ, উত্তম-অধম, অগ্রসর-অনগ্রসর কেহই এই ধর্মের আওতা হইতে বাদ যান না। ইহার কল্যাণমন্ত্রে সকলেই উদ্বোধিত হইতে পারেন।

বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে "ভ্রাতা ও ভগিনিগণ" বলিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করেন। ইহাতে কি করতালি ও হর্ষধ্বনি! অপরের নিকট এইরূপ সম্বোধন বাস্তবিকই বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল। কারণ, বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তিরা পরস্পরের তো আর ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া মনে করেন না। নিজ নিজ ধর্মের তথা জাতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্তই তো তাঁহারা সেখানে উপস্থিত; পরস্পরকে আপন বলিয়া গণ্য করিবেন কিরূপে? ভারতবাসীর পক্ষে মনুষ্যমাত্রকেই ভ্রাতা-ভগিনী মনে করা নিতান্তই স্বাভাবিক। হিন্দুরা মনে করেন সকল মানুষের মধ্যেই 'নারায়ণ' বিদ্যমান এবং নর-নারী মাত্রেই এক জগদীশ্বরের সন্তান, কাজেই ভ্রাতা ও ভগিনী। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সম্বোধন আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নহে। বিবেকানন্দ প্রথম হইতেই সকলের চিত্তে বেশ একটা স্থান করিয়া লইলেন।

বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হিন্দু তথা ভারত-ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যের সুধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পরখ করিয়া দেখিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিলেন—এই ধর্ম উদার ও প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা মানবজাতির অর্থাৎ বিশ্ববাসীর মুক্তি ও কল্যাণ চাহে, কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মাশ্রয়ী সম্প্রদায়ের নহে। ভারতবর্ষ স্মরণাতীতকাল হইতে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' আখ্যাদানের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীদেরও মিলনক্ষেত্র এই দেশ। হিন্দু-ধর্মের উচ্চাদর্শে সঞ্জীবিত হইয়াই ভারতবাসীরা স্বদেশকে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দ এই ভারতবর্ষেরই প্রতিনিধি। তাঁহার মুখে হিন্দুধর্মের সর্বজনীন মঙ্গলময় প্রকৃতির ব্যাখ্যা শুনিয়া বিশ্ববাসী বিমোহিত হইলেন। ধর্মমহাসম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীর প্রতিনিধিবর্গ এবং বাহিরের অগণিত জনসমষ্টি হিন্দুধর্মের এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে আর কখনও শোনেন নাই। ইতিপূর্বে যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকা পরিক্রমা করিয়াছেন তাঁহারা হিন্দুধর্মের এই সর্বজনীন রূপের কথা না বলিয়া নিজ নিজ বিশিষ্ট মণ্ডলী বা মতবাদের আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। এই সর্বপ্রথম তাঁহারা হিন্দুধর্মের প্রকৃত ও সর্বোচ্চ রূপের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন। পাশ্চাত্যবাসীরা তাঁহাদের পূর্বমত ও ধারণা পরিহার করিতে বাধ্য হইলেন। পশ্চিমের, বিশেষ করিয়া মার্কিনবাসীদের নিকট ভারতবাসীরা অতঃপর হিন্দুনামেই পরিচিত হইতে লাগিলেন। হিন্দু শুধু ভৌগোলিক নামই নহে, উপনিষদ বর্ণিত, বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত সর্বজনীন কল্যাণধর্মে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারাই হিন্দু—এইরূপ মনে করাও অযৌক্তিক নহে। মুসলমান, খ্রীস্টান, পার্শি, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম—তাঁহাদের নিকট ভারতের অধিবাসী মাত্রই হিন্দু। বিদেশে ভারত-ধর্মের কুৎসা প্রচার বন্ধ হইল, স্বদেশে হীনম্মন্যতা দূর হইয়া ভারতবাসীদের আত্মচেতনা ও আত্মপ্রত্যয় দেখা দিল। ইহার ফলেই বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিককার 'নিউ স্পিরিট' বা নব ভাবনার অভ্যুদয়। আমাদের জাতীয়তার পাকাপোক্ত ভিত্ত রচনাও ইহা দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে।* [সমাপ্ত]

* শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৭০

পরিক্রমা

মধু বৃন্দাবনে

[পূর্বানুবৃত্তি]

অমিতানন্দ চলে গেছে—আমি একা একাই বেড়াই যমুনার ধারে ধারে। শীত পড়তে শুরু করেছে। বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যায় না। সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ফিরছি, পানিঘাটের পাশ দিয়ে টিকারী রানীর মন্দির দর্শন করে। 'জ্ঞানগুদরী'র কাছে আসতেই কৃষ্ণদাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই 'রাধে রাধে' বলে হাতজোড় করে বললেন: "মহারাজ, আজ এই পথে?" আমারও কিছুদিন থেকে তাঁর কথাই মনে হচ্ছিল, সেকথা তাঁকে বলতেই তিনি বিনীত হয়ে বললেন তাহলে আসুন এইখানেই বসি। বলে আমাকে নিয়ে জ্ঞানগুদরীর বাঁধানো প্ল্যাটফর্মের মতো স্থানটিতে প্রণাম করে একপাশে বসলেন। বেশ অনেকখানি, প্রায় ডিম্বাকৃতি জায়গার চারিধার পাথর দিয়ে বাঁধানো। মাঝখানে বালি। একপাশে একটি পাথরের ফলকে এই স্থানটির মাহাত্ম্য লেখা। বাবাজীর কাছে জানতে চাইলাম, এই স্থানটির বৃন্দাবনে এত খ্যাতি কেন? তিনি বললেন: "বৈষ্ণবদের কাছে এটি অত্যন্ত পবিত্রক্ষেত্র। এখানেই বৃন্দাবনবাসীদের দীর্ঘ অদর্শনে-কাতর গোপীবল্লভ কৃষ্ণের ইচ্ছায় উদ্ধব এসে দর্শন পান প্রেম বিরহ-বিবস-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারানী ও অষ্টসখীর। উদ্ধব এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বার্তা নিয়ে তাঁদের কাছে কৃষ্ণ-অদর্শন-বেদনায় তাঁদের সান্ত্বনা দিতে।

এই জ্ঞানগুদরী অঞ্চল তখন যমুনার পাড়ে জঙ্গলে ঢাকা জায়গা ছিল। শ্রীমতীরা সেই জঙ্গলের গভীরে কৃষ্ণচিন্তার বিরহানলে দগ্ধ, মৃতপ্রায় অবস্থায় ভূলুণ্ঠিতা হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের দর্শন করে, তাঁদের বিরহ-সন্তাপের মহাভাবময় প্রেমোচ্ছ্বাস শুনে উদ্ধব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এঁদের ভক্তি-প্রেমের গভীরতার কাছে নিজের কৃষ্ণপ্রেম আর তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি যে কত তুচ্ছ তা বুঝতে পেরে তিনি নিজেকে এঁদের কাছে অত্যন্ত নগণ্য বোধ করতে লাগলেন। উদ্ধবের এই যে উপলব্ধি, তারই স্মরণে এই স্থানটির নাম 'জ্ঞানগুদরী'। 'গুদরী' মানে এদেশীয় ভাষায় লেপ বা আচ্ছাদন। তাঁর যে জ্ঞান, সেটি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ভক্তির আবরণে। এটি একদিক থেকে যেমন গোপিনীদের তপস্যাভূমি, তেমন এখানেই হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে উদ্ধবের সেই কথোপকথন, যা ভাগবতের 'ভ্রমরগীতা' নামে বিখ্যাত। সেই দিব্যপ্রসঙ্গের স্মরণে এই স্থল এক পবিত্র তীর্থ-ভূমি। এখনো বৃন্দাবনের কোন বৈষ্ণবের দেহত্যাগ হলে তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়। এই ঘেরা জায়গার পাশে তাঁর শরীর রাখা হয়। এই স্থানের পবিত্র রজঃ তাঁর অঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তার পরে সেই শরীর যমুনায় সলিল-সমাধি বা দাহ করা হয়। এছাড়া আষাঢ় মাসের রথযাত্রার সময় এই বৃন্দাবনের যত ছোট-বড় সমস্ত রথ শোভাযাত্রা করে এখানে আনা হয়। ক্ষেত্রটিকে বেষ্টন করে কিছুক্ষণ কীর্তন করে অপেক্ষা করার পর সেই রথগুলি আবার ফিরে যায় নিজ নিজ মন্দিরে। সেসময় এখানে বড় মেলাও হয়। বৃন্দাবনের যে রজঃ বৈষ্ণবদের পবিত্রতম বস্তু তা সাধারণতঃ কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান থেকেই সংগৃহীত হয়। সেই স্থানগুলির মধ্যে এই জ্ঞানগুদরী অন্যতম।"

তাঁর কথা শেষ হলে আমি জানতে চাইলাম: "সেই যে উদ্ধবের কাহিনী, সেটাও একটু বলুন এখানে বসেই।" তন্ময় হয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন: "অপ্রাকৃত মাধুর্যের মহামিলন-ভূমি

এই ব্রজধাম। ব্রজগোপীরা এই মাধুর্যের আকর। সেই মাধুর্য আস্বাদ করবার জন্যই শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ। ব্রজবল্লবরূপে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণ তাঁর নিজের মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়ে গোপিনী-শরীর সৃষ্টি করে কৃষ্ণরূপেই আবার সেই মধুর আনন্দ সত্তা উপভোগ করেন। বৃন্দাবন-লীলার বৈশিষ্ট্য এইখানে। "বল্লব্যো মে মদাত্মিকা"—ব্রজবল্লবীরা আমারই আত্মা। লীলারসাস্বাদনের জন্য দেহভেদ মাত্র।

গোপীদের কাছে অকৈতব প্রেম রসাস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অভিন্নতনু, জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলেন এখানে। বোধহয় তাঁর জ্ঞানের অহঙ্কারও চূর্ণ করবার জন্য। তার প্রমাণ এই দর্শনের ফলে জ্ঞানী উদ্ধবের পরজন্মে বৃন্দাবনের পথের পাশে লতাগুল্ম হয়ে জন্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। আর এটিই ভাগবতের অভিনব বার্তা। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হয়েও ভক্তের পদধূলি সর্বাঙ্গে মেখে ধন্য হতে চান উদ্ধব। ভাগবত রচনা না করা পর্যন্ত, পরব্রহ্মের মাধুর্যময় নরলীলার রসমাধুরী আস্বাদন না করা পর্যন্ত বেদান্তদর্শনাদি রচনা করেও ব্যাসদেবের অন্তরের অভাব মেটেনি। এও লীলাময়ের এক অদ্ভুত লীলা। ভক্তই শুধু ভগবানকে চান না, স্বয়ং ভগবানেরও প্রাণের ইচ্ছা ভক্তের হৃদয়মধু আস্বাদন করা। ভক্তের জন্য ভক্ত অপেক্ষা ভগবানই বেশি আকুল হন। আর সেই আকুলতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ উদ্ধবকে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে প্রেরণ। বৃন্দাবন ছেড়ে তিনি গিয়েছেন মথুরায়, কিন্তু তাঁর মনের একটা অংশ থেকে গিয়েছে সেখানে, যেখানে তাঁর প্রাণপ্রিয় ভক্তের নিত্যাধিষ্ঠান। এই অপ্রাকৃত-প্রেম-নিকেতন স্মরণেই তাঁর আনন্দ। সেই স্মরণকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার আকুলতায় অস্থির ব্রজেশ্বর পাঠিয়েছেন উদ্ধবকে। তাঁর সেই প্রিয়জনেরা কেমন আছেন জানতে, তাঁদের বিরহ-বেদনায় সান্ত্বনা দিতে, দিতে তাঁর ব্যক্তিগত সন্দেশ। তাঁর স্বপ্নের বৃন্দাবন বাস্তব বৃন্দাবনরূপে কেমন আছে তা জানবার জন্যই উদ্ধবের আগমন এখানে হয়েছিল।

"কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবের বৃন্দাবনের যে অভিজ্ঞতা, সে যে কত পৃথক হতে পারে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ উদ্ধব তা কল্পনাতেও আনতে পারেননি। জ্ঞানের অভিমান নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়া যে কত মূঢ়তা তা উদ্ধব হাড়ে হাড়ে টের পান মহাভাবাশ্রয়ী শ্রীমতী এবং অন্যান্য সখীদের দর্শন করে। আনুগত্যের সাধনাই এখানে একমাত্র সাধনা। গোপীর অনুগত না হয়ে স্বাধীনভাবে অপ্রাকৃত ব্রজভূমির মাহাত্ম্য কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। প্রেম ও বিরহের দিব্য-মূর্তি ভক্তিমতি গোপিনীদের আনুগত্যের সাধনার দর্শনে দৃষ্টি খুলেছিল উদ্ধবের, তখনই তিনি বুঝেছিলেন নিত্যসিদ্ধ গোপ-গোপীদের মাহাত্ম্য। এটি উপলব্ধি করার পর একটিই সাধ তাঁর মনে জেগেছিল, সেটি এই ভক্তদের পদধূলিপূত ক্ষেত্রে গড়াগড়ি দেওয়া। দশমাস এঁদের সঙ্গে ব্রজভূমিতে থেকে এঁদের মহাভাবের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে উদ্ধব নিজের জ্ঞানকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। ভক্তির জগতে জ্ঞানের সকল অহংকার এইভাবেই চূর্ণ হয়ে যায়। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আচার্য শংকরও কাশীতে এইভাবে ভক্তির শরণাগত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ

'ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাঽপি হৃদিমে।
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা ত্রিদিবসুখলিপ্সামি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননী জননং যাতু মম বৈ।
মৃড়াণী-রুদ্রাণী শিবশিব ভবানীতি জপতঃ।।'

"প্রেমময় গিরিধারীলাল প্রিয়তম উদ্ধবকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শন করানোর জন্যই এখানে পাঠিয়েছিলেন। জ্ঞানের চরমে যে অবস্থা, ভক্তির পরম অবস্থাও যে তাই সেটা বোঝানোর জন্যই উদ্ধবকে বৃন্দাবনের এই জ্ঞানগুদরীতে পাঠিয়েছেন। মহা-ভাবময়ী শ্রীমতী রাধারানী অষ্টসখী-পরিবৃতা হয়ে যে ভাবসমুদ্রে নিমজ্জিতা, সে ভাববস্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মুখের কথায় সে ভাবাবস্থা বোঝানো যায় না। তাই গোপীদের সেই মহাভাবের অবস্থা দর্শনে ধন্য উদ্ধব কৃতকৃতার্থ হয়ে মনের ভাব প্রকাশের কোন উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না পেয়ে নিজের দৈন্য ও আর্ত প্রকাশ করেছিলেন ঃ 'বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্'।—যাঁদের হরিকথা-গীত ত্রিভুবন পবিত্র করেছে সেই নন্দব্রজের দেবীদের চরণরেণু বারবার বন্দনা করি।"

এই জ্ঞানগুদড়ীর কথা শুনতে শুনতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। এবার বাবাজী উঠলেন—তাঁর কুঠিয়ায় যাবেন। যাওয়ার পথে বাঁদিকে একটি পুরাতন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "এই বৃন্দাবন কত যে বিচিত্র লীলার সাক্ষী তার তুলনা মেলা ভার। এই যে মন্দিরটি দেখছেন এটি তুলসীদাসের মন্দির। তুলসীদাসজী বৃন্দাবনে এসে নানা মন্দির ঘুরতে ঘুরতে একটি ত্রিভঙ্গমুরারী বিগ্রহ দেখে কিছুটা হতাশ হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেনঃ 'হে নারায়ণ, আমি যে আমার 'রাজীবলোচন' নবদূর্বাদল রাম রঘুমণিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না, তাঁকে না দেখে আর আমার এই তীর্থ ভাল লাগছে না। হয় তুমি আমায় শ্যামল ধনুর্ধারী মূর্তিতে দেখা দাও নইলে 'আমি তীর্থ ছেড়ে চললাম।' ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ ভগবান ভক্তের মান রক্ষার জন্য তাঁর ইচ্ছা পূরণ করে ধনুর্বাণ ধরেছিলেন, বাঁশী ছেড়ে। আসুন, ভিতরে গিয়ে দেখবেন সেই শ্রীবিগ্রহ।"

বাবাজীর নির্দেশে ভিতরে গিয়ে বহু প্রাচীন ফ্রেস্কো পেন্টিং ছবি আঁকা মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দর্শন করলাম সেই ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী, ত্রিভঙ্গ অথচ ধনুর্বাণধারী রাম-কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহকে। আনন্দে আপ্লুত হয়ে ভক্তরাজ তুলসী তাঁর এই আর্তি ও সেই আর্তিহারীর দিব্যদর্শনের কথা একটি দোঁহায় বেঁধে রাখলেন। সেই দোঁহাটি আজও দেওয়ালের গায়ে লিপিবদ্ধ হয়ে সেই অপূর্ব ঘটনাটির কথা সমাগত ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভক্তির মহিমা খ্যাপন করছে। রাম-কৃষ্ণের এক দেহে মিলিত বিগ্রহ দর্শন করতে করতে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীমহাবীরের বৈকুণ্ঠ-দর্শনের সময়ে সেই কথাই মনে পড়ছিল। স্বয়ং গোলকপতিকেও লক্ষ্মীসহ গরুড়ের পাখার আড়ালে চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি আবৃত করে রাম-জানকী-রূপে প্রকাশিত হতে হয়েছিল। মহাবীর মারুতির সেই রূপদর্শনকালে উচ্চারিত বিখ্যাত শ্লোক-বন্দনাটির কথা মনে পড়লঃ

> "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদপরমাত্মনি।
> তথাপি মম সর্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ॥"

ত্রেতার সেই মহাবীরের দর্শনের পুনরাভিনয় ঘটেছিল কলিতে তুলসীদাসের দর্শনে, এই মন্দিরেই। ভক্তরাজ তুলসীদাস ও ধনুর্বাণধারী কৃষ্ণের চরণে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। জ্ঞানগুদড়ীর চারিধারে আরও বেশ কয়েকটি মন্দির ও মঠ আছে, তার অনেক-গুলিই প্রাচীন। দু-একটি আধুনিক মন্দিরও হয়েছে। রামানুজ সম্প্রদায়ের একটি মন্দির আর শ্রীজগন্নাথের মন্দির বেশ প্রাচীন। আস্তে আস্তে জ্ঞানগুদড়ীর পবিত্র রজঃক্ষেত্রে সকলের অগোচরে গড়াগড়ি দিয়ে একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে নিত্য বিরহবিধুরা মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধারানীর ধ্যানমগ্না সমাধিস্থা মূর্তিকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে চললাম আশ্রমের পথে। জ্ঞানগুদড়ীর সংলগ্ন সমস্ত মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা-ঝাঁজ-খোল-করতাল বাজতে শুরু করেছে। [ক্রমশঃ]

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও প্রায় একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্ব-মুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের 'দেখছেন'? 'কলকাতা' মানে অবশ্য শুধু কলকাতা নামক ভূখণ্ডটিই নয়, কলকাতা এখানে একটি প্রতীক। সারা পৃথিবীর মানুষ এবং সারা পৃথিবীই এখানে উদ্দিষ্ট। সুতরাং কলকাতার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, কলকাতার মাধ্যমে সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের দৃষ্টি প্রসারিত—মা সারা জগৎ অর্থাৎ সারা জগতের লোককে 'দেখছেন'। কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক। আলোকচিত্রঃ স্বামী চেতনানন্দ

নিবন্ধ

তন্ত্র কি প্রাগ্‌বৈদিক যুগের 'অনার্য' সভ্যতার দান?

চিত্রলেখা মল্লিক

চিরন্তন জাগতিক দুঃখকষ্টকে জয় করিবার অদম্য আগ্রহই মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে উপনীত করিয়াছে। জাগতিক ভোগ মানুষের চরম শান্তি আনয়ন করিতে অসমর্থ, এই উপলব্ধি মানবের মনোজগতে কবে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। তবে অনাদি অতীত কাল হইতেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সচ্চিদানন্দলোকে বিচরণ করিবার ইচ্ছাই মানুষকে আধ্যাত্মিক পথ-প্রবেশের উপায় নির্ধারণে সচেষ্ট করিয়াছে।

এই জগৎ দুঃখময়। অতএব জাগতিক কোন কিছুই চিরস্থায়ী সুখ দিতে পারে না। জাগতিক বস্তুর মাধ্যমে যে-সুখ পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং এই ক্ষণস্থায়ী সুখ লাভ করিবার পরেই অধিকতর দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়—ইহা মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতি। সুতরাং এই দুঃখময় জগৎ হইতে মুক্তির ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক। সে চায় এমন এক লোকে অবস্থান করিতে, যে-লোকে দুঃখের কোন চিহ্ন নাই, নিত্যসুখ যেখানে সদা বিরাজিত। সেজন্যই আমরা উপনিষদে শুনিতে পাই—"তমসো মা জ্যোতির্গময়"—অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া চল; কিন্তু কিভাবে এই অন্ধকারময় জগৎ হইতে জ্যোতির্ময় লোকে গমন সম্ভব?—এই চিন্তাই মানুষকে একদিন মুক্তিলাভের পদ্ধতি নির্ধারণে সহায়তা করিয়াছে। এই মুক্তি-লাভের উপায়রূপেই মানুষের মনোজগতে একদিন শ্রুতি উদ্ভাবিত হইয়াছেন এবং মুক্তির উপায়স্বরূপ এই শ্রুতিরই দুই প্রবাহরূপে বেদ এবং তন্ত্রের আবির্ভাব।[১]

ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির সাহায্যে মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে বৈদিক এবং তান্ত্রিক যেকোন পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই সে দুঃখময় জগৎ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সচ্চিদানন্দময় লোকে বিচরণ করিতে সমর্থ। তাই মানুষকে দেখি, যুগে যুগে দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সে এই দুই পদ্ধতির যেকোন একটিকে অবলম্বন করিয়াছে।

চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত পরমার্থলাভ সম্ভব নয়। বৈদিক এবং তান্ত্রিক উভয় সাধনারই চরম লক্ষ্য আত্মসাক্ষাৎকার বা পরম শিবপ্রাপ্তি। সুতরাং তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি বা বৈদিক সাধনপদ্ধতি কেবল এক-একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি মাত্র। ইহার যেকোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই চিত্তশুদ্ধি এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার সম্ভব। এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

অনাদিকাল হইতে ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়াছে। সত্য জিজ্ঞাসা উদিত হইলে মানুষ কখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। সম্ভাব্য সমস্ত রকম পথ অনুসরণ করিয়াই সত্যকে জানিবার বা উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বৈদিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করিবার পূর্বে বেদ-নিরপেক্ষরূপে তন্ত্রসাধনা ভারতবর্ষের অন্ততঃ একাংশে প্রচলিত ছিল, ইহা ঐতিহাসিক প্রামাণিক তথ্য।[২] বিশেষতঃ বৈদিক সংস্কৃতির কালেও বৈদিক সাধনার সহিত তান্ত্রিক আচার ও সাধনা এবং মাতৃপূজার প্রচলন ছিল, বিভিন্নভাবেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে যাগযজ্ঞাদি বহুল বৈদিক পদ্ধতির পাশাপাশি তান্ত্রিক সাধনা ও সংস্কৃতির বিদ্যমানতা,

১ "শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্মঃ। শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"
—মনুসংহিতার ২।১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট উদ্ধৃত হারীতের বচন।

২ মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রাগ্‌বৈদিক যুগে যে শিবশক্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রাচীন[৩] এবং আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে যে-সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাগ্‌বৈদিকযুগে শক্তিপূজার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিষয়ে স্যার জন মার্শাল-এর প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ গ্রন্থ Mohenjo-daro and the Indus Civilization এবং ডঃ ডি. সি. সরকারের গবেষণামূলক গ্রন্থ The Sakta-pithas বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পৌরাণিক যুগের অনেক ঘটনাই এইরূপ ইঙ্গিত প্রদান করে যে, বৈদিক সভ্যতার পাশাপাশি বেদ-নিরপেক্ষরূপে তান্ত্রিক সভ্যতাও সমাজে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। রামায়ণে বর্ণিত রাবণকৃত শিব-শক্তির উপাসনা অতি প্রসিদ্ধ। অতএব অনাদিকাল হইতে বৈদিক ও তান্ত্রিক আচার পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে, ইহাই এখানে বক্তব্য।[৪]

এক শ্রেণীর গবেষক পণ্ডিতদের মতে বৈদিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রথম ভারতে সংঘটিত হয় মধ্য-প্রাচ্যের কোন এক স্থান হইতে আর্যদের ভারতে আগমনের পর হইতে।[৫] কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের মতে আর্যাবর্ত ভারতবর্ষেরই অপর নাম। আর্যরা

৩ সূতসংহিতার শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে বলা আছে—

"বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি শিবজ্ঞেন্দ্রাস্তান্ত্রিকী তু সা।
তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি।"

—পরশুরামকল্পসূত্র ১।১-এর রামেশ্বরী টীকায় উদ্ধৃত বচন।

ত্রিপুরার্ণবতন্ত্রেও বলা হইয়াছে :

"ত্রৈবর্ণিকৈর্বৈদিকান্তে তান্ত্রিকং ক্রিয়তেখিলম্ ॥"

—পরশুরামকল্পসূত্র ১।১-এর রামেশ্বরী টীকায় উদ্ধৃত বচন।

৪ 'বেদ' ও 'তন্ত্র'—উভয়ের মূলে আছে শ্রৌতজ্ঞান, ফলে তন্ত্রশাস্ত্র কখনও কখনও 'পঞ্চম বেদ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বেদের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রও অপৌরুষেয় বলিয়া উক্ত। (দ্রঃ ভারতকোষ, তৃতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা)

৫ 'আর্য' ও 'অনার্য'—এই দুই শব্দ আধুনিক কালে যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা এইরূপ :

মধ্যপ্রাচ্যের কোন এক স্থান হইতে শুভ্রবর্ণ দীর্ঘদেহী একদল মানব ক্রমশঃ গঙ্গাপ্রবাহের পথ অবলম্বন করিয়া ভারতের মধ্যে প্রবেশ করেন। হিমালয়ের দিক হইতে তাঁহাদের প্রথম আগমন ঘটে। ইঁহারা যে-সভ্যতার ধারক ও বাহক ছিলেন তাঁহার নাম বৈদিক সভ্যতা। হিমালয়ের উত্তর অঞ্চল হইতে দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করিয়া গঙ্গার গতি অনুসরণপূর্বক ইঁহারা ক্রমশঃ সমতলভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইঁহারা অশ্বচালনায় এবং অন্যান্য যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। ক্রমশঃ ইঁহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহাদের বলা হয় আর্য। ইঁহাদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁহারা বসবাস করিতেন, এক কথায় তাঁহাদের বলা হয় অনার্য। 'অনার্য' শব্দটি অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাদীক্ষাহীন সংস্কৃতি-সভ্যতাশূন্য মানবগোষ্ঠীকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আধুনিক গবেষকদের মত স্বীকার করিলে একথা বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা বৈদিক সভ্যতার ধারক ও বাহক ছিলেন না, তাঁহাদিগকেই যদি অনার্য বলা হয়, তাহা হইলে অনার্যদের সভ্যতা বা সংস্কৃতি অথবা শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, অনার্যরাজা নমুচিদানবের উপাখ্যান পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। হিমালয়ের কোন এক অংশে ইঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহার রাজ্যে ধনসম্পদ, সুরম্য প্রাসাদযুক্ত নগরী, পরিখা প্রভৃতি ছিল। ইহা কখনও শিক্ষাদীক্ষাবিহীন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিশূন্য জাতির পরিচায়ক নহে। রামায়ণের যুগেও লঙ্কেশ্বর রাবণ এবং কিষ্কিন্ধার রাজা বালি অনার্য নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের কিষ্কিন্ধানগরীর যে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে প্রত্যেককেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা শিক্ষাদীক্ষাবিহীন অসভ্য রাজার রাজ্য নহে। সুবিন্যস্ত হর্ম্যরাজি, প্রশস্ত রাজপথ, উদ্যানবাটিকা, জলাশয় প্রভৃতির যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাতে শিল্প এবং কারিগরি বিদ্যার অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রমাণিত হয়। সুতরাং অনার্যরাজা বালি কতকগুলি অসভ্য বর্বরদের লইয়াই

চিরদিনই ভারতবর্ষে বসবাস করিতেন।[৬] স্বামী বিবেকানন্দও এই অভিমতই পোষণ করিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে আর্যরা ভারতবর্ষে আসেন নাই। তিনি বলিয়াছেন ঃ "কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে?"[৭]

বৈদিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের যুগে যেকোন কারণেই হউক ভারতীয় ভূখণ্ডে পূর্বপ্রবর্তিত ঐতিহ্যময় একটি বিরাট সভ্যতার অবনতি ঘটিয়াছিল। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ প্রত্ন-তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, বৈদিক সভ্যতার বিস্তারলাভের পূর্ববর্তী কালেও পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে অশেষ কীর্তিমণ্ডিত একটি মহতী সভ্যতা বিরাজমান ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা হয় নাই। দুর্গম হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত শিব ও শক্তির অপূর্ব লীলাময় যে-সমস্ত নিদর্শন অদ্যাপি বর্তমান, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও তৎপরতার সহিত সে-বিষয়ে প্রত্ন-তাত্ত্বিক গবেষণা অনুষ্ঠিত হইলে হয়তো প্রাগ্‌বৈদিক যুগের[৮] ভারতভূখণ্ডে অবস্থিত একটি উন্নত সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ বিবরণ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

ভারতীয় সভ্যতার বর্ণনামূলক পুরাণ এবং রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নানা কারণে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এবং এই সংঘর্ষের ফলেই প্রাগ্‌বৈদিক যুগে অনার্যগণের অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত হয়। আর অনার্যগণের অবলুপ্তির ফলেই ক্রমশঃ প্রাগ্‌বৈদিক যুগে প্রচলিত সভ্যতা ক্ষয়োন্মুখ হয় এবং আর্যগণের প্রবর্তিত বৈদিক সভ্যতা ভারতে প্রাধান্য লাভ করে, ইহাই এখানে বক্তব্য। আর্য ও অনার্য সংঘর্ষে অনার্যদের অবলুপ্তি ঘটিলেও উভয় সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। কারণ, বিজয়ী জাতির সভ্যতা ও ভাবধারা পরাজিত জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিলেও অনেকক্ষেত্রে পরাজিত জাতির সভ্যতা এবং নিজস্ব চিন্তাধারা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় না। ফলে বহুস্থলেই পরাজিত জাতির সভ্যতার সহিত জয়লাভকারী জাতির সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটে এবং নূতন এক সভ্যতার আবির্ভাব হয়। ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণে যে নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রভাব অদ্যাপিও ভারতীয় হিন্দুসমাজে বিদ্যমান। ধর্মীয় উপাসনার ক্ষেত্রেই বিশেষতঃ এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ভারতবর্ষ চিরকাল ধর্মের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরশীল এবং বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই প্রবর্তিত হইয়াছে। যেহেতু ধর্মই ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, অতএব ধর্মীয় উপাসনার ক্ষেত্রে বেদ ও তন্ত্রের পারস্পরিক সংমিশ্রণ অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার প্রতিও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিশুদ্ধ বৈদিক উপাসনা কোনও কোনও স্থলে বিদ্যমান থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদিক উপাসনার মধ্যেও তান্ত্রিক রীতিনীতির সমাবেশ সুস্পষ্ট। উপাস্য দেবতাকে বিবিধ উপচারে পূজা করিবার পদ্ধতি বেদের মধ্যে দেখা যায় না। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে দেবতার উদ্দেশে স্তুতিগান এবং প্রজ্বালিত অগ্নিতে আহুতিপ্রদান প্রচলিত ছিল এবং ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ভাবের অধিষ্ঠাতৃ কয়েকজন দেবতাই প্রথমতঃ বৈদিক যুগে উপাস্যরূপে বিদ্যমান ছিলেন। সেই সমস্ত উপাসনার মধ্যেও দেবতার নিকট বল, বীর্য, স্বাস্থ্য, আয়ু, শস্য প্রভৃতি লাভ করিবার

রাজত্ব করিতেন, ইহা বলা যায় না। সুন্দরকাণ্ডে লংকাপ্রত্যাগত হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লংকার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতেও লংকা একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং সুদৃশ্য নগরী ছিল এবং কোন অংশে অযোধ্যা অথবা মিথিলা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না—ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। সুতরাং অনার্য হইলেই অসভ্য হইতে হইবে, এই ধারণা ভুল।

৬ "আর্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিংশা ভাবিনশ্চ যে।
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম॥" —বিষ্ণুপুরাণ, ২।৪।১৭

৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১০

৮ 'প্রাগ্‌বৈদিক' শব্দের দ্বারা এখানে বৈদিক সভ্যতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী যুগকে বুঝিতে হইবে।

প্রার্থনাই অধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রুনাশের জন্যও দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইত। মুক্তি বা মোক্ষলাভের প্রচেষ্টা বা তদনুযায়ী জ্ঞানতত্ত্বের পর্যালোচনা ঔপনিষদিক যুগে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার কোন স্থলেই পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি বিভিন্ন উপচারের সাহায্যে দেবতার অর্চনা করিবার ব্যবস্থা নাই। অন্যদিকে তন্ত্রের সর্বত্রই আরাধ্য দেবতাকে বিভিন্ন উপচারের সাহায্যে অর্চনা করিবার বিধি বিদ্যমান। পরবর্তী কালে উপাসনার মধ্যে এই দুইটি ধারার সমন্বয় ঘটিয়াছে। যাগ-যজ্ঞাদির মধ্যেও বিবিধ উপচারে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অর্চনা করিবার বিধান সন্নিবিষ্ট হয় এবং তান্ত্রিক উপাসনার মধ্যেও অনেক বৈদিক মন্ত্র ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এইভাবে বৈদিক ও তান্ত্রিক ধারার পারস্পরিক অনুপ্রবেশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমান ভারতীয় হিন্দুসমাজের মধ্যে এই সংমিশ্রিত উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে।

অনার্যদের সভ্যতা—প্রাগ্‌বৈদিক সভ্যতা, ইহা স্বীকার করিয়াই এই আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। প্রাগ্‌বৈদিক সভ্যতা বলিতে তান্ত্রিক সভ্যতাকেই বুঝাইতে অভিলাষী। তাহার কারণ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সুপ্রাচীন কাল হইতে যে দুইটি ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি বৈদিক ধারা এবং অপরটি তান্ত্রিক ধারা। কালক্রমে এই উভয় ধারার প্রামাণ্য স্বীকার করিবার জন্যই হারীতের বচন প্রবর্তিত হইয়াছিল, যেখানে হারীত 'শ্রুতি' শব্দের দ্বারা বেদ এবং তন্ত্র উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ভারতবর্ষে আর্যগণ মধ্যপ্রাচ্যের কোন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, অথবা বিষ্ণুপুরাণের মতানুযায়ী আর্য এবং অনার্যগণ চিরদিন ভারতেরই অধিবাসীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, এই উভয় মত মানিয়া লইলেও আর্য ও অনার্যদের দুইটি পৃথক ধারা পাশাপাশি প্রচলিত ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বেদ ও তন্ত্র—এই দুইটি ভারতীয় সভ্যতার মূল উৎস। এই উৎস হইতে বহির্গত ধারা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই দুইটি ধারা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া নিজ নিজ গতিপথে অগ্রসর হইয়াছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের মতোই ইহাদের পারস্পরিক মিলন ঘটিয়াছে। সুতরাং বেদ এবং তন্ত্র—এই দুইটি মূল উৎসকে আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতে পাশাপাশি বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

নিবন্ধ

শিব ও শিবরাত্রি

হরিপদ আচার্য

জীবমাত্রেই শিবের উপাসক। 'শিব' শব্দের অর্থ কল্যাণ বা মঙ্গল। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ থেকে আরম্ভ করে সকল প্রাণীই নিজ নিজ কল্যাণে সর্বদা নিরত। সৃষ্টির আদি কাল থেকেই মানুষ প্রার্থনা করে আসছে "শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ"[১]—প্রাণবায়ু ও অপানবায়ুর অধিদেবতা সূর্য এবং বরুণ আমাদের মঙ্গল করুন। আমরাও বলি "শিবঃ করোতু মঙ্গলম্" —কল্যাণের অধিষ্ঠাতা আমাদের কল্যাণ করুন। এভাবে সর্বত্র এবং সর্বদা চলছে শিবের উপাসনা, কল্যাণপ্রার্থনা আর মঙ্গলবিলাস—আরতি। কল্যাণের প্রতীক শিব। কল্যাণে রয়েছে প্রশান্তি, তাই তো শিব প্রশান্ত—শুভ্র রজতগিরিনিভ। তাঁর এক হাতে ত্রিশূল আর অন্য হাতে ডমরু। ত্রিশূলের তিনটি ফলার আঘাতে তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—তিন প্রকার অকল্যাণের বিনাশ করে ডমরু ধ্বনিতে এনে দেন নতুন প্রাণের স্পন্দন—করেন সকলকে নব নব ভাবে উদ্বোধিত। বাহন তাঁর বৃষভ। আচার্য সায়নের মতে 'বৃষভ'-এর অর্থ 'কামানাং বর্ষিতা' অর্থাৎ কামনার বস্তু প্রদানকারী। মানুষের সর্বোচ্চ কামনার বস্তু হলো সিদ্ধি বা মোক্ষ।

শিব প্রাগ্‌বৈদিক দেবতা। সিন্ধু এবং মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় পশুপতি শিবের উপাসনা হতো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া শিলমোহরগুলির মধ্যে একটি চতুষ্কোণ শিলমোহরে তিন মুখ, দুই শিঙ এবং দুই হাতবিশিষ্ট যোগাসনে বসা একটি মূর্তি দেখা যায় আর হরপ্পার শিলমোহরগুলির মধ্যে একটি পোড়ামাটির শিলমোহরের এক পিঠে নানা প্রাণী পরিবেষ্টিত ঊর্ধ্বহস্ত, যোগাসনে বসা একটি মূর্তি আর অপর পিঠে একটি বৃষ ও একটি ত্রিশূল আঁকা আছে। ঐতিহাসিকগণ এগুলিকে পশুপতি শিবের মূর্তি বলে মনে করেন।

বৈদিক যুগের প্রথমদিকে 'শিব' নামে কোন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ৪৩ সংখ্যক সূক্তে প্রথম রুদ্রদেবতার সন্ধান পাই। সেখানে রুদ্রের দুটি রূপ—শান্ত এবং উগ্র। উগ্ররূপী রুদ্র ধ্বংসকারক, শান্তরূপী রুদ্র কল্যাণদায়ক। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"[২]
—হে রুদ্র, যা তোমার কল্যাণময় রূপ (উৎসাহবর্ধক রূপ) তা দিয়ে আমাকে পরিত্রাণ কর—আমার কল্যাণ কর।

ঋগ্‌বেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে অগ্নি। প্রথম মণ্ডলের ২৭ সংখ্যক আগ্নেয় সূক্তে বলা হয়েছে, হে অগ্নি, তুমি স্তুতি দ্বারা জাগরিত হও।... তুমি রুদ্র, তোমাকে সুন্দর স্তোত্রে স্তুতি করছি—"স্তোমং রুদ্রায়।"[৩] শতপথ-ব্রাহ্মণে আরও স্পষ্টভাবে অগ্নিকেই রুদ্র বলা হয়েছে। "যিনি রুদ্র তিনিই অগ্নি"—"যো বৈ রুদ্রঃ সোঽগ্নিঃ।"[৪] পরবর্তী কালে শিবকে যে-সকল নামে সম্বোধন করা হয়েছে বৈদিক সাহিত্যের শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নিকেও সেসব নামে, যথা রুদ্র, শর্ব, পশুপতি, উগ্র, ভব, মহাদেব, ঈশান, ভীম প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

যজুর্বেদের বিখ্যাত রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রকে ও শিবকে ভব, শর্ব, পশুপতি, নীলগ্রীব, শিতিকণ্ঠ প্রভৃতি নামে নমস্কার করা হয়েছে—

"নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ
নমঃ শর্বায় চ পশুপতয়ে চ
নমো নীলকণ্ঠায় চ শিতিকণ্ঠায় চ"[৫]

সেখানেই শিব, শঙ্কর, শম্ভব, ময়োভব প্রভৃতি নামগুলির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে—

"নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ"[৬]

শিব যে কৃত্তিবাস, পিনাকপাণি, জটাজূটধারী তার

১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, শান্তিবচন, ১।১
২ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।২১
৩ ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১।২৭।১০
৪ শতপথ-ব্রাহ্মণ, ৬।২।৪।১৩
৫ যজুর্বেদ সংহিতা—রুদ্রাধ্যায়, ২৮ (বাজসনেয় সংহিতা, ১৬।২৮)
৬ ঐ, ৪১

সন্ধানও আমরা রুদ্রাধ্যায়েই পাই। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে—"কৃত্তিং বসান আচার পিনাকং।"[৭]

পূর্বে আলোচিত বৈদিক সাহিত্যে অগ্নি এবং রুদ্রকে যেসকল নামে অভিহিত করা হয়েছে, পরবর্তী কালে পুষ্পদন্তের লেখা শিবমহিম্নস্তোত্রে শিবকেও সেসকল নামে প্রার্থনা করা হয়েছে—

"ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং-
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্।"[৮]

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ৪।১।১১২ সংখ্যক "শিবাদিভ্যোঽণ্" সূত্রে 'শিব' এবং শিবের উপাসক 'শৈব' নাম দুটির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। পাণিনীয় বৈদিক ব্যাকরণের ৪।৪।১৪৩ সংখ্যক "শিবশমরিষ্টস্য করে" সূত্রেও আমরা 'শিব' নামের উল্লেখ পাই।

এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে উপনিষদ্ বলেছেন "সত্যং শিবং সুন্দরম্" এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"।[৯] পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তিনি শিবরূপ এবং পরম সুন্দর। শুধু তাই নয়, তিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত তাঁর রূপমাধুরী। শিবও জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানের দাতা শিব। শাস্ত্র বলেন: "জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ।"[১০] জ্ঞানস্বরূপ শিবের কৃপায় হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হলেই অকল্যাণের হয় বিনাশ এবং পরম ও চরম কল্যাণ এসে মানুষকে করে তোলে অমৃতের অধিকারী।

বর্তমানের হিন্দুধর্ম পুরাণের ত্রিত্ববাদ (Trinity of God)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত—এটি সমালোচকদের মত। সগুণ ব্রহ্মের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এ তিন গুণকে আশ্রয় করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কল্পনা এবং তাদেরই শক্তি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরীর উপাসনার ভিত্তিতেই বর্তমানের লোকায়ত হিন্দুধর্ম চলছে। কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে, যে-পুরাণশাস্ত্র ত্রিত্ববাদের স্রষ্টা, সেই পুরাণেই আবার একত্ববাদ স্বীকৃত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, ঋষিগণ তাঁকে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"[১১] পুরাণেও তেমনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের একত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। অবশ্য যজুর্বেদীয় উপনিষদ্গুলিতেই দেখা যায় ব্রহ্মের সাথে শিবের অভিন্নত্ব স্থাপন করে সর্বেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে—পরমপুরুষ হলেন সর্বব্যাপী, ষড়ৈশ্বর্যশালী এবং তিনি সর্বব্যাপক এবং শিব অর্থাৎ মঙ্গলরূপী: "সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ।"[১২] অথর্ববেদীয় কৈবল্য উপনিষদ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি বলেছেন:

"স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥"[১৩]

ত্রিত্ববাদের প্রচারক আঠারখানি পুরাণকে ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব ও শৈব নামে সমান তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, বায়ু, স্কন্দ ও অগ্নি পুরাণকে বলা হয় শৈব পুরাণ। এদের প্রত্যেকটিতেই শিববিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের বিন্যাস করা হয়েছে। কূর্মপুরাণের চতুর্দশ অধ্যায়ে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। বরাহপুরাণে বিষ্ণু ও শিবের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করে বরাহরূপী ভগবান বিষ্ণু বসুন্ধরাকে বলেছেন, হে বসুন্ধরে, আমি যেখানে শিবও সেখানে। শিব যেখানে আমিও সেখানে থাকি। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই—

"অহং যত্র শিবস্তত্র শিবো যত্র বসুন্ধরে।
তত্রাহমপি তিষ্ঠামি আবয়োর্নান্তরং ক্বচিৎ॥"[১৪]

কালিকাপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে এক পরব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এ তিন রূপে বিভক্ত হয়ে নিত্যলীলা করছেন—

"রূপত্রয়মিদং নিত্যং তস্যৈব জগতঃ পতেঃ।"[১৫]

সেখানেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন এজগতে দ্বিতীয় বস্তু নেই—তাও বলা হয়েছে—

৭ যজুর্বেদ-সংহিতা, ৫১
৮ শিবমহিম্নস্তোত্র, ২৮
৯ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।১ ; ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১।১।১৬
১০ কাত্যায়-সূত্র, ১।২।২
১১ ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬
১২ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩।১১
১৩ কৈবল্য উপনিষদ্, ৭-৮
১৪ বরাহপুরাণের 'শালগ্রামক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণন' অধ্যায়, ১৪৫।১০২
১৫ কালিকাপুরাণ, ১২।১

"একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"[১৬]

বিরাট পুরুষ পরব্রহ্মের অখণ্ড শরীরের ওপরের ভাগকে বলেছেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, মধ্যের ভাগকে বলেছেন পালনকর্তা বিষ্ণু আর নিচের ভাগকে বলেছেন সংহারকর্তা শিব। এক পরমেশ্বরই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—এই তিন কাজ অনুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন নামে পরিচিত হয়েছেন—

"সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণাদেক এব মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি সংজ্ঞামাপ পৃথক্ পৃথক্॥"[১৭]

তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন ধ্যানমন্ত্রে শিবের নানারকম রূপ কল্পনা করা হয়েছে। সেখানে কোথাও তিনি উমাক্রোড়ে উমাপতি, কোথাও মৃত্যুনিবারক মৃত্যুঞ্জয়, কোথাও ত্রিলোকের অধীশ্বর লোকনাথ, কোথাও কণ্ঠে গরলধারী নীলকণ্ঠ, কোথাও বা সর্বলোকের মহেশ্বর। তবে পঞ্চ আননবিশিষ্ট শিবের ধ্যানমূর্তিই সর্বজন-সমাদৃত। পঞ্চানন শিবেরও তিনটি ধ্যানরূপ পাওয়া যায়। বহুল প্রচারিত এবং বহুজন-স্বীকৃত মহেশ্বর শিবের ধ্যান-রূপে শুধু পাঁচটি মুখেরই উল্লেখ আছে। তাদের কোন বর্ণের উল্লেখ নেই। পঞ্চানন শিবের 'মুক্তাপীত-পয়োদ' ইত্যাদি[১৮] ধ্যানমন্ত্রে কিন্তু বলা হয়েছেঃ "মহাদেবের মুক্তাবর্ণ, পীতবর্ণ, মেঘবর্ণ, শুক্লবর্ণ ও জবাফুলের মতো বর্ণবিশিষ্ট পাঁচটি বদন। প্রতিটি বদনে তিনটি করে চোখ, কপালে অর্ধচন্দ্র। কোটি চন্দ্রের ন্যায় তাঁর দেহসৌন্দর্য, হাতে তাঁর শূল, টঙ্ক, খড়্গ, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা এবং তাঁর অঙ্গ নানা ভূষণে ভূষিত।" নীলকণ্ঠ শিবের 'বালার্কায়ুততেজসং'[১৯] ইত্যাদি ধ্যানমন্ত্রে বলা হচ্ছে—নীলকণ্ঠ শিবের দেহকান্তি প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ সূর্যের মতো, মাথায় তার জটা, কপালে অর্ধচন্দ্র, জটার ওপরে সাপের মুকুট, হাতে শূল, নরকপাল, খট্বাঙ্গ ও জপমালা, পাঁচমাথায় তিনটি করে চোখ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং পদ্মের ওপর বসা অতি সুন্দর তার মূর্তি। আর সুপরিচিত 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং'[২০] ধ্যানমন্ত্রে দেখি—শিবের দেহকান্তি রজতপর্বতের মতো, কপালে অর্ধচন্দ্র, রত্নের মতো সমুজ্জ্বল দেহ, হাতে কুঠার, মৃগ, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে প্রসন্নমুখে পদ্মের ওপর বসে আছেন। জগতের আদি, বিশ্বের বীজস্বরূপ, সর্বভয়হারী এবং সকল দেবতা তাঁর বন্দনারত। এখানে তিনটি ধ্যানমন্ত্রে শিবের তিনটি রূপ দেখা গেল। কিন্তু আমাদের চিরপরিচিত শিবের রূপটি নীলকণ্ঠ ও মহেশ্বরের মিলিত রূপের মধ্যে পাওয়া যায়। কল্যাণময় শিবের যেমন নানা রূপ, তেমনি তাঁর নামেরও প্রাচুর্য। শব্দরত্নাবলী গ্রন্থে শিবের ১১৪টি নামের, কবিকল্পলতা গ্রন্থে আরো ৫টি, মোট ১১৯টি এবং মহাভারতের অনুশাসন পর্বের সপ্তদশ অধ্যায়ে তাঁর সহস্র নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মঙ্গলময় শিবের পূজার বিধানও নানারকম। নিত্য আরাধিত শিবের বিশেষ পূজার বিধান দেওয়া হয়েছে অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে। শিবপূজায় আড়ম্বর এবং উপচারের বাহুল্য নেই, এতে উপবাসেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছেঃ যে-ব্যক্তি শিবপূজাপরায়ণ হয়ে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দশী তিথিতে উপবাস করে, তার যজ্ঞকারীর সমান পুণ্য এবং শিবলোক লাভ হয়—

"চতুর্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ।
যোঽব্দমেকং ন ভুঞ্জীত শিবার্চনপরো নরঃ॥"[২১]

ঈশান-সংহিতায় কিন্তু শিবপূজার জন্য মাঘ মাসের শেষার্ধে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে আদিদেব মহাদেব কোটি সূর্যের সমান দীপ্তিসম্পন্ন হয়ে শিবলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই মহানিশা-ব্যাপনী সে-চতুর্দশী তিথি শিবরাত্রিব্রতের জন্য গ্রহণযোগ্য—

"মাঘ কৃষ্ণচতুর্দশ্যামাদিদেবো মহানিশিঃ।
শিবলিঙ্গতয়োদ্ভূতঃ কোটিসূর্যসমপ্রভঃ।
তৎকালব্যাপনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিব্রতে তিথিঃ॥"[২২]

১৬ কালিকাপুরাণ, ৮২।৬০ ১৭ ঐ, ৮২।৩৭
১৮ বৃহৎ-তন্ত্রসার, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১৩১৬, পৃঃ ২০৬
১৯ ঐ, পৃঃ ২১১
২০ ঐ, পৃঃ ২১৩
২১ স্মৃতিচিন্তামণি, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ১৩৫৫, পৃঃ ৬৬
২২ ঐ, পৃঃ ৭৫

'মহানিশি' কথাটির ব্যাখ্যা স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, রাত্রিমানকে চারভাগ করে তার দ্বিতীয় ভাগের শেষ অংশ এবং তৃতীয় ভাগের প্রথম অংশকে মহানিশি বলা হয়। চতুর্দশী তিথি যদি দুই দিন মহানিশি পায় তবে দ্বিতীয় দিনও রাত্রিতে উপবাসাদি হবে, আর মহানিশি যদি একদিন পায় এবং পরদিন প্রদোষ (সূর্যাস্তকাল) পর্যন্ত পায়, তবে পরদিনই উপবাসাদি হবেঃ "প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রি-চতুর্দশী।"[২৩]

এখানে 'শিবরাত্রিচতুর্দশী' নামটি খুব তাৎপর্য-পূর্ণ। শিবচতুর্দশী নয়, শিবরাত্রিচতুর্দশী। 'শিব-চতুর্দশী' নামে অন্য একটি শিবব্রতানুষ্ঠান আছে। তা হয়ে থাকে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে। মৎস্যপুরাণে এ-ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে একাহারী এবং সংযমী হয়ে চতুর্দশী তিথিতে উপবাস করে দেবাদিদেব শিবকে প্রার্থনা করে তাঁর শরণাপন্ন হলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়—

"মার্গশীর্ষে ত্রয়োদশ্যাং সিতায়ামেকভোজনঃ।
প্রার্থয়েদ্দেবেশং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥
চতুর্দশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য চ শঙ্করম্।
সুবর্ণবৃষভং দত্ত্বা ভোক্ষ্যামি চ পরেঽহনি ॥"[২৪]

শিবচতুর্দশী হলো দিনের অনুষ্ঠান আর শিব-রাত্রিচতুর্দশী মহানিশার অনুষ্ঠান। দিনরাত উপবাস এবং জাগরণই এ-অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। স্কন্দ-পুরাণের নাগরখণ্ডে বলা হয়েছে, শিবরাত্রিচতুর্দশীতে উপবাস এবং জাগরণ করে ভক্তিসহকারে শিবপূজা করলে শিবের সাযুজ্য লাভ হয়—

"উপবাসপ্রভাবেন বলাদপি চ জাগরাৎ।
শিবরাত্রেস্তথা তস্য লিঙ্গস্যাপি প্রপূজয়া।
অক্ষয়ান লভতে শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥"[২৫]

এ-তিথিটি যদি রবিবার বা মঙ্গলবার হয় তবে উত্তম, আর যদি সেদিন তার সঙ্গে শিবযোগ পায় তবে এ-তিথিটি সর্বোত্তম ফলদায়ক হয়। ঈশান-সংহিতায় এবিষয়ে বলা হয়েছে—

"মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং রবিবারো যদাভবেৎ।
ভৌমো বাপি ভবেদ্দেবি কর্তব্যং ব্রতমুত্তমম্।
শিবযোগস্য যোগেন তদ্ভবেদুত্তমোত্তমম্ ॥"[২৬]

আগেই বলা হয়েছে 'শিবরাত্রিচতুর্দশী' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। রাত্রি শব্দটি 'রা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। পাণিনি ধাতু পাঠের ১০৫৭ সংখ্যক সূত্র অনুযায়ী যার অর্থ দান করা। যা শিব (কল্যাণ) দান করে তাই শিবরাত্রি। এ-কল্যাণ কিসের কল্যাণ? সবকিছুর কল্যাণ, পরম কল্যাণ —চরম কল্যাণ। যে-কল্যাণ লাভ করলে আর অন্য কল্যাণের অপেক্ষা থাকে না গীতায় ভগবান বলেছেনঃ "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"[২৭] যাঁকে লাভ করলে অন্যান্য সব চাওয়া পাওয়ার অবসান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, "মিছরির পানা পেলে চিটেগুড়ের পানা কে খেতে চায়?"[২৮] শিবরাত্রি পালনের উদ্দেশ্য হলো—পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার —এই চতুর্দশতত্ত্বকে লয় করে, সংযত করে, শিবভাবে ভাবিত করে শিবস্বরূপে স্থিতিলাভ করা। তাই তিথিটি চতুর্দশী। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের কাজ থেকে তখন পায়ু ও উপস্থকে সংযত রেখে মুখে শিবের গুণ-কীর্তন করা, হাতে তাঁর পূজার কাজ করা, পদব্রজে শিবস্থানে যাওয়া। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ হবে জিহ্বা ও ত্বক্‌কে সংযত রেখে চোখে শিবরূপ দেখা, কানে তাঁর নাম-গান শোনা, নাকে তাঁর দিব্য সৌরভ আস্বাদন করা। আর মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে শিবচরণ-সরোজে ও শিবরূপ সাগরে নিমজ্জিত করে রাখা। মাঘের শেষ বা ফাল্গুনের প্রথমে এ-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণ হলো, শীতের জড়তায় আবিষ্ট মানুষের মন এতদিন জড় দেহটাকে সুখ দেওয়ার জন্যই ব্যস্ত ছিল। শীতের অবসানে তার প্রাণে এল নতুন স্পন্দন, হলো নবীন বলের সঞ্চার। নতুনের আগমন-লগ্নই তো শিবের উপাসনার উপযুক্ত পরিবেশ। নবীনরাই তো চিরকাল বিশ্বের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। বিশ্বকল্যাণ চিন্তনই যে

২৩ স্মৃতিচিন্তামণি, পৃঃ ৭৬

২৪ মৎস্যপুরাণ, ৯৫।৬-৭ঃ উদ্ধৃত—শব্দকল্পদ্রুম, চৌখাম্বা, ১৯৬৭, পৃঃ ৯২

২৫ স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড, ২৬৬ অধ্যায়ঃ উদ্ধৃত— শব্দকল্পদ্রুম, পৃঃ ৯৫

২৬ উদ্ধৃত—শব্দকল্পদ্রুম, পৃঃ ৯৫

২৭ গীতা, ৬।২২

২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১০।৬

কল্যাণেশ্বর শিবের প্রকৃত আরাধনা।

এখন দেখা যাক উপবাসের তাৎপর্য কি? উপবাস অর্থ শুধু অনাহারে থাকা নয়। 'উপ' অর্থ সমীপে, 'বাস' অর্থ থাকা। উপবাস শব্দের অর্থ হলো—সমীপে বাস করা—নিকটে থাকা। অনন্যচিত্ত হয়ে আহারনিদ্রাদি সব ভুলে গিয়ে শিব-সান্নিধ্যে শিব-তত্ত্বে লীন হয়ে থাকা। সর্বদা তাঁরই শরণ-মনন করে জাগতিক সবকিছু ভুলে যাওয়া। তাঁর প্রেমে তন্ময় হয়ে থাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন: "ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিস ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়।"[২৯] তবেই শিবের অনুগ্রহলাভের উপযুক্ত হয়ে মানবজীবন সার্থক করে তোলা সম্ভব হবে।

শিবের অপর নাম আশুতোষ। অতি অল্পেই তিনি সন্তুষ্ট হন। গানে বলা হচ্ছে—"বেল পাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুশি।" এমন যে শিব, তাঁর পূজায় উপকরণের প্রয়োজন কি? উপকরণাদি শিবের জন্য নয়, সবই নিজের জন্য—আত্মশুদ্ধির জন্য। তাঁর জিনিস তাঁকেই ভক্তি-সহযোগে নিবেদন করা। পূজায় ভক্তিই প্রধান। পরমপ্রিয় কল্যাণস্বরূপে শিবের অনুকম্পালাভের জন্য প্রয়োজন তাঁর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। কারণ, পূজ্য বিষয়ে পরম অনুরাগই ভক্তি—"পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিরিত্যুপদেশঃ।"[৩০] দেবতা ভক্তের নিকট ভক্তিই চান—"ভক্তিম্ ইচ্ছন্তি দেবতাঃ।"

ভারতসংস্কৃতিতে পূজা তন্ত্রশাস্ত্রের এক শ্রেষ্ঠ দান। পৌরাণিক বিধানে, তন্ত্রের প্রক্রিয়ায় এবং বৈদিক মন্ত্রে হয় পূজার অনুষ্ঠান। অবশ্য বৈদিক মন্ত্রের সাথে কখনো কখনো তান্ত্রিক এবং পৌরাণিক মন্ত্রের যোগসাধন ঘটেছে। বৈদিক যুগে পূজা ছিল না, তখন ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞ কর্মপ্রধান। যজ্ঞের অগ্নিকে বলা হতো দেবতাদের মুখ। সেখানে দেবতাদের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত দ্রব্যাদি প্রার্থনা সহকারে অর্পণ করলেই অভীষ্ট লাভ হতো। তন্ত্রশাস্ত্র জোর দিলেন মন্ত্রজপের ওপর। জপ জ্ঞানপ্রধান মনন-ধর্মী। তন্ত্রশাস্ত্রকার বলেছেন, জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়: "জপাৎ সিদ্ধিঃ।" পুরাণের যুগে এলো ভক্তির প্রাবল্য। ভক্তিতে আছে ভগবানের পায়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদনের ভাব। আর পূজাতে ঘটেছে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়। পূজার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে জপের প্রাধান্য, যা তন্ত্রের বিধান। দেবতার উদ্দেশে উপচার নিবেদনের সময় রয়েছে ভক্তিসহকারে আত্মনিবেদনের সুর—যা পুরাণের বিধান আর সর্বশেষ হোম বা যজ্ঞতে রয়েছে বৈদিক বিধান।

গীতায়ও বলা হয়েছে: "পত্র, পুষ্প, ফল, জল—যে আমাকে ভক্তিভাবে অর্পণ করে, তা-ই আমি গ্রহণ করি।" শিবরাত্রিচতুর্দশীর পূজায় চার প্রহরে দুধ, দৈ, ঘি, মধু দিয়ে স্নান করাবার যে বিধি আছে, তাও নিত্যশুদ্ধ শিবের জন্য নয়। তার তাৎপর্য হলো নিজের আহার্য-বস্তুর মধ্যে যেগুলি সর্বসাধারণের খুব প্রিয় সেগুলি শিবের উদ্দেশে নিবেদন করে শিবভাবে ভাবিত হয়ে পরমানন্দ লাভ করা।

শিবরাত্রিচতুর্দশীর ব্রতকথায় আছে, সর্বদা পশুবধকারী মাংসভারবাহী ব্যাধেরও শিবের কৃপা লাভ হয়েছিল। তা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, শিবপূজায় জাতিধর্মনির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের সমান অধিকার। ঈশান-সংহিতায় বলা হয়েছে, শিবরাত্রিচতুর্দশীর ব্রত আচণ্ডাল সকল মানুষের সর্বপাপ বিনাশ করে এবং সকলকে ভোগ ও মোক্ষ দান করে:

"শিবরাত্রিব্রতং নাম সর্বপাপপ্রণাশনম্।
আচণ্ডালমনুষ্যাণাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥"[৩১]

পূর্বে বলা হয়েছে, শিব প্রাগ্বৈদিকদেবতা। তাই এ-পূজায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধিনিষেধ খুব বেশি আরোপিত হতে পারেনি—যেমন হয়েছে শালগ্রাম-শিলার পূজায়। শালগ্রাম-শিলার নারায়ণ পূজায় অব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক এবং উপনয়ন-সংস্কারহীন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে অধিকার দেওয়া হয়নি, কিন্তু শিবলিঙ্গ-শিলার পূজায় সকলের সমান অধিকার। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই কারণ, জীব মাত্রেই যে শিবপ্রাপ্তির অভিলাষী।

২৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৮।৩

৩০ দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম—'ভক্তি' শব্দের অর্থ।

৩১ স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড, ২৬৬ অধ্যায়: উদ্ধৃত—শব্দ-কল্পদ্রুম, পৃঃ ১৫; শ্লোকটি ঈশান-সংহিতাতেও পাওয়া যায়।

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

কর্মক্ষেত্রে যাহাতে ত্রুটি না ঘটে সেজন্য শিক্ষাকালে রিহারস্যাল (মহড়া) দেওয়া হইত ঝুড়ি, কোদাল প্রভৃতি হাতে লইয়া। কে কোথায় দাঁড়াইবেন, কি করিবেন, তাহা খুব ভাল করিয়া তালিম দেওয়া হইত যাহাতে কাজের সময়ে একটি সেকেন্ডও নষ্ট না হয় এবং কোন প্রকার বিশৃংখলা না ঘটে। ভাটা কোনদিন সকালে, কোনদিন মধ্যাহ্নে, কোনদিন অপরাহ্নে, আবার কোনদিন সন্ধ্যায়, কোনদিন বা মধ্যরাত্রে, কোনদিন বা শেষরাত্রেও হইত। সেইভাবে প্রত্যহ কর্মীদের আহার-বিশ্রামেরও সময় নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইত। আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সমস্ত গুছাইয়া পূর্বেই ঘাটের কিনারে জড়ো করিয়া রাখা হইত এবং ঘণ্টা পাড়িবামাত্র সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়া নীরবে আপন আপন নির্দিষ্ট কার্য আরম্ভ করিতেন। দীনু মহারাজের তত্ত্বাবধানে কাজ চলিত। মহারাজ নিজেও দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিতেন। এইভাবে সুশৃংখলে সেই পরম রমণীয় ঘাট অল্প খরচে অনায়াসে নির্মিত হইলে সকলের মনপ্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়াছিল।

মহারাজ যতদিন মর্ত্যধামে ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত সকল আশ্রমেরই (বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র অথবা ভক্তগণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত আশ্রম) বিশেষভাবে খোঁজখবর রাখিতেন। উন্নতির উপায়-বিধান ও প্রয়োজনানুসারে উপদেশও প্রদান করিতেন। আশ্রম ও সাধু-ভক্তদের উপর মহারাজের স্নেহদৃষ্টি সম্বন্ধে কত কথাই না মনে পড়ে। একদিনের কথা বলি। সন্ধ্যার পরে মহারাজ গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। সাধু-ভক্ত অনেকেই আছেন। শীঘ্রই ভুবনেশ্বর যাইবার ইচ্ছা। সে-সম্বন্ধেই কথা-বার্তা চলিতেছে ব্যাঙ্গালোরের বিশিষ্ট ভক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গারের সঙ্গে। মহারাজের ইচ্ছা যাইবার পূর্বে জামতাড়ার নূতন আশ্রম দেখিয়া যাইবেন। কিন্তু গ্রীষ্ম আরম্ভ হইয়াছে, দিনে প্রবল রৌদ্রে ঘরের বাহির হওয়া কঠিন। সেজন্য জামতাড়ার গরম আবহাওয়ায় ফাঁকা মাঠে নূতন আশ্রমে যাওয়া ও থাকা তাঁহার পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে। বিশেষতঃ ভুবনেশ্বর একদিকে, জামতাড়া অপরদিকে, রেলে যাতায়াতও কষ্টকর এবং অনেক সময়ও লাগিবে। নারায়ণ আয়েঙ্গারকে মহারাজ খুব স্নেহ করেন। তিনি খুব প্রাচীন ভক্ত, সঙ্ঘের বিশেষ অনুগত, সর্বপ্রকার কার্যে সহায়ক। তদুপরি অতি উচ্চপদস্থ সম্মানিত রাজকর্মচারী। তাই সকলে সম্মানও করিয়া থাকেন। জামতাড়া হইয়া ভুবনেশ্বর যাওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, এই সময়ে এইভাবে বিপরীত দিকে ঘুরিয়া যাওয়াতে ভুবনেশ্বর পেঁছিতেও দেরি হইবে এবং জামতাড়ার গরমে সেখানে থাকা, দেখাশুনা খুব কষ্টকর হইবে। অতএব এখন জামতাড়া যাওয়া স্থগিত রাখাই ভাল। মহারাজ আয়েঙ্গার মহাশয়ের যুক্তিপূর্ণ কথা ধীর-ভাবে শুনিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন (তাঁহাদের উভয়ের কথাবার্তা ইংরাজীতে চলিতেছিল): "আমাকে সেখানে যেতেই হবে, যতই অসুবিধা হোক, আর কষ্ট হোক। আমিই ছেলেটিকে (ভাব মহারাজ—স্বামী রামেশ্বরানন্দ) সেখানে পাঠিয়েছি, বলামাত্র কোন ওজর আপত্তি না করে সে সেখানে চলে গেছে। নতুন জায়গা, সেখানে সে কেমন আছে, খাওয়া-দাওয়া কিরূপ কি করছে সব আমাকে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে হবে। ভবিষ্যতে সেখানে কি কাজ হবে, কিভাবে কি করতে হবে, দেখেশুনে খোঁজখবর নিয়ে সব বলে দিতে হবে। টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমাকে নিজে গিয়ে না দেখলে কি চলে ?" আমরা উপস্থিত সকলে মহারাজের হৃদয়বত্তা, কর্মী ও আশ্রমের প্রতি

আন্তরিক দরদ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম।

পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ তখন স্বামীজীর মন্দিরের কাজ করাইতেছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কর্ম হইতে অবসর পাইয়া মহারাজের ঘরের পার্শ্বস্থিত তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় রেলিং-এর কাছে একটি টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। গঙ্গাদর্শন করিতেন কি দক্ষিণেশ্বরের দিকে চাহিয়া পূর্বস্মৃতি জাগরূক রাখিতেন বলা কঠিন। সেই সময়ে কেহ কেহ প্রণাম করিতে যাইত কিন্তু বিশেষ কথাবার্তার সুযোগ হইত না। আমিও একদিন তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অল্পদূরে স্বামীজীর দরজার নিকট দাঁড়াইতাম। কোনদিন একটি-দুইটি কথা বলিতেন. কোনদিন মৌনাবলম্বন করিতেন। একদিন এইভাবে দাঁড়াইয়া আছি। সেদিন তাঁহাকে খুব পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছিল। বোধহয় চৈত্র মাস, বেশ গরম ছিল। মহারাজের জনৈক সেবক বাহিরে আসিয়া বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "মহারাজ জানতে চেয়েছেন আপনি অমুক [একটি বিদঘুটে নাম] ফল খাবেন কিনা?" বিজ্ঞান মহারাজ 'হো-হো' করিয়া হাঁসিয়া উঠিলেন আর বলিলেন: "বাবা, বুড়ো হয়ে গেলুম, কই এতদিন তো ঐ ফলের নাম শুনিনি। তা মহারাজকে বলো তিনি যা দেবেন তাই খাব।" সেবক ঘরের ভিতরে মহারাজের কাছে গিয়া সব বলিলেন এবং একটু পরেই বেশ বড় একটি কমলালেবু উল্টাভাবে ধরিয়া লইয়া আসিয়া বিজ্ঞান মহারাজের হাতে দিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ সহাস্যে লেবুটি গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে খাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ আরও কোন কোন দিন নজরে পড়িয়াছে—মহারাজ কর্মক্লান্ত বিজ্ঞান মহারাজকে গ্রীষ্মোপযোগী ফল, সরবৎ প্রভৃতি পাঠাইতেছেন এক-একটি অদ্ভুত হাস্যকর নামকরণ করিয়া। অপর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন সন্ধ্যার পরে সকলে সমবেত হইয়াছেন। নানারূপ প্রসঙ্গ চলিতেছে—হাস্যরসই প্রধান। কিন্তু বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহার আসনে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এই সকল কথাবার্তা যেন তাঁহাকে স্পর্শই করিতেছে না। হঠাৎ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন: "বিজ্ঞান মহারাজ এরূপ চুপচাপ গম্ভীরভাবে বসে আছেন, কেন জানো? তিনি এখন 'ফোর্থ ডাইমেনশন' (fourth dimension) চিন্তা করছেন।" মহারাজের কথায় বিজ্ঞান মহারাজ ও অপরাপর সকলের হাস্য উদ্রেক করিল। সেই সময় আইনস্টাইনের নূতন আবিষ্কার ও গবেষণা সম্বন্ধে বিশ্বমণ্ডলে খুব আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। আমাদের মনে হইয়াছিল বিজ্ঞান মহারাজ উচ্চ গণিতশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার পক্ষে আইনস্টাইনের আবিষ্কার সম্বন্ধে চিন্তা করা স্বাভাবিক, কিন্তু মহারাজও যে সেই সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতেন তা কে জানিত!

মহারাজের সান্নিধ্যে যাঁহারা দীর্ঘকাল ছিলেন তাঁহারা তো বিশেষভাবেই জানিতেন, এমনকি আমরা যাহারা অল্পসময়ের জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটস্থ হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম, তাহাতেও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, তিনি পারমার্থিক রাজ্যেই অধিক সময় কাটাইলেও ব্যবহারিক জগতের ব্যাপারও তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির অগোচর থাকিত না। সেইজন্য দেশের, সমাজের, পৃথিবীর অবস্থা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক—সকল ব্যাপারেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত, এবং সঙ্ঘ-মঠ-আশ্রম ও সাধু ও গৃহী ভক্তগণের কল্যাণের জন্য—যাহার যে ক্ষেত্রে যেরূপ মঙ্গলকর হইবে, তাহাকে তদনুরূপ পরামর্শ দিতেন—কর্তব্যনির্দেশ ও সহায়তা করিতেন। সেই প্রবল রক্ষণশীলতা ও গোঁড়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকালে তিনি খ্রীস্টধর্মান্তরিত এক যুবককে পুনরায় হিন্দুধর্মাবলম্বী ও সঙ্ঘের সাধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার! সেই সাধু লখনৌ আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ হন। স্বদেশী যুগ, বিপ্লববাদ ও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনাকালে মঠ-মিশনকে কিরূপে তিনি সুপথে পরিচালনা করিয়াছিলেন ও আদর্শনিষ্ঠ রাখিয়াছিলেন তাহাও বিস্ময়কর। আবার বিপ্লবীদলের সদস্য এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিচিতগণকেও মঠে স্থানদান, তাঁহাদের দায়িত্বগ্রহণ ও সুপথে পরিচালনরূপ কঠিন কার্য তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি রাজরোষে পতিত, অপরের চক্ষে ভয়ানক, ত্যাগী যুবকদলের অন্তর স্নেহ-মমতায় জয় করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যমী অক্লান্ত কর্মীরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়া আমরা

বিস্মিত হইয়াছি। এই সম্বন্ধে অপর একটি বিষয়ও উল্লেখনীয়। স্বামী চিন্ময়ানন্দ (পূর্বে মানিকতলা বোমার মামলার আসামী শচীন সেন) মঠে যোগদান করিয়া আপনার মধুর স্বভাব ও সর্বকার্যে তৎপরতা, শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে গুরুজনের সেবা এবং ভগবদ্‌-ভজনে নিষ্ঠার জন্য মঠের সকলের প্রিয়পাত্র ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি একদিন আমাদিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে বলিয়াছিলেন: "মঠে এসে আমি আমার কর্মকুশলতার জন্য সকলেরই নিকট প্রশংসা-লাভ করেছি, এক মহারাজ ছাড়া। মহারাজ এইসব ব্যবহারিক বিষয়ে তৎপরতার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন না। তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল আমাদের যাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অনুরাগ, বিশ্বাস, ভক্তি ও সাধন-ভজনে নিষ্ঠা বাড়ে।" ত্যাগ, তপস্যার প্রতি তিনি তাঁহার আশ্রিতগণকে সর্বদাই উৎসাহিত এবং সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া সেই পথে পরিচালিত করিতেন। তাঁহার একান্ত অনুগত আশ্রিতগণকে যখন তপস্যার কষ্টকর পথে প্রেরণ করিতেন তখন সাময়িকভাবে তাহা কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরবর্তী কালে সেই সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের জীবনকে দিব্যভাবে পূর্ণ ও মধুময় করিয়াছিল।

বিশ্বরঞ্জন মহারাজ একটি ঘটনার কথা বলিয়া-ছিলেন। তিনি তখন ব্রহ্মচারী। মহারাজের সেবক-রূপে তাঁহার সঙ্গে কাশী সেবাশ্রমে গিয়াছেন। তাঁহার সেবা করেন, সেবাশ্রমেই খাওয়া-দাওয়া করেন। তিন দিন পরে মহারাজ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন: "সেবাশ্রমের অন্ন গরিব-দুঃখীর জন্য, তোমার এখানে খাওয়া ঠিক নয়। তুমি অদ্বৈতাশ্রমে ঠাকুরের প্রসাদ পাবে। এবং সেখানেও একেবারে কিছু কাজ না করে খাওয়া উচিত না। নিত্য সকালে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফুল তুলে দিয়ে আসবে।" এই প্রসঙ্গে বিশ্বরঞ্জন মহারাজ আরও বলিয়াছিলেন, তিনি যখন কাশীতে তপস্যার্থে যান ও মন্দিরের প্রসাদ-গ্রহণে জীবনধারণ করিতেন, সেই সময় কালীকৃষ্ণ মহা-রাজ তীর্থদর্শনে সেখানে যান এবং বিশ্বরঞ্জন মহা-রাজকে সেখানে দেখিয়া বিশেষ সুখী হন। কালীকৃষ্ণ মহারাজও তাহাকে বলেন, মন্দিরে বিনা সেবায় প্রত্যহ প্রসাদ গ্রহণে প্রতিগ্রহ হয় এবং দাতাদের পাপের স্পর্শ হইয়া থাকে। সেজন্য তাঁহার নির্দেশে বিশ্ব-রঞ্জন মহারাজ তদবধি মন্দিরে ঠাকুরের সেবার জন্য নিত্য ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিতেন। বিশ্বরঞ্জন মহারাজের অন্তরে মহারাজ ও প্রাচীন সাধুদের সদুপদেশ ও উন্নতভাবে জীবন পরিচালনার আদর্শ কিরূপ দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা আমরা ঢাকাতে তাঁহার সমীপে অবস্থান কালে পদে পদে পরিচয় পাইয়াছি।

বিভিন্নস্থানে নব-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমসমূহের উন্নতির জন্য মহারাজ কি করিয়াছেন তাহা সেই সকল স্থানের প্রাচীনগণের মুখে কিছু শুনিবার সুযোগ হওয়ায় বুঝিয়াছি মহারাজ সেই সকলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। জমি বাড়িঘর ও কাজকর্ম প্রত্যেকটি ব্যাপারে মহারাজ বিশেষভাবে খোঁজখবর রাখিয়াছেন ও আলোচনা অনুসন্ধানাদি করিয়া যথাযথ নির্দেশ দিয়াছেন, অর্থ ও লোক দিয়া সহায়তা করিয়াছেন। সকল আশ্রমেই জমিটি বৃহৎ ও মনোরম স্থানে হয় সেজন্য তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত এবং ঘরবাড়ি সুন্দর ও ফলফুলে আশ্রম সুশোভিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতেন। স্থানীয় ভক্তদের আশ্রমকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে উৎসাহিত করিতেন। কাশী সেবাশ্রমের প্রাচীনগণের নিকট শুনিয়াছি, সেবাশ্রমের জমি লওয়ার সময় মহারাজের বিশেষ ইচ্ছা ছিল আরও জমি লইবার। কিন্তু তখনকার সেবাশ্রম পরিচালক-গণ সাহস পান নাই। অবশ্য এর পর মহারাজের অভীপ্সিত জমির অনেকটা লইতে হইয়াছে। কনখল সেবাশ্রমের ক্ষেত্রেও মহারাজের উৎসাহ ও সহায়তাতেই সকল কার্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। কাশী, কনখল দুই স্থানেই সন্ন্যাসিগণের প্রধান কেন্দ্রস্থান। মহারাজ উভয় স্থানে বাস ও প্রাচীনপন্থী সাধু সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও মেলামেশা করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণকে প্রাচীনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। [ক্রমশঃ]

প্রবন্ধ

নববেদান্ত—বিশ্ববোধের একমাত্র ভিত্তি

সচ্চিদানন্দ ধর

মানবচেতনার নবজাগরণ

বিশ্বব্যাপী মানুষের একটা নবজাগরণ, একটা চাঞ্চল্য—বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিগত দুই শতাব্দীর বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার এই জাগরণের বিশেষ উত্তেজক। বস্তুবিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রার নব নব অভাবপূরণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় সম্ভোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে তার বহু যুগ অনুসৃত সামাজিক ও ব্যক্তিগত অভ্যাসকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। আমরা যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছি—দেখতে দেখতে সেই পরিবেশের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছায়ই হোক, অথবা অজানা কোন শক্তির প্রবাহেই হোক, আমরা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছি। এই চলমান গতিশীল পরিবর্তনই জাগরণের লক্ষণ। সুষুপ্তির পর আসে স্বাভাবিক নিদ্রাভঙ্গ। আবার, বাইরের ঘটনার আঘাত আমাদের নিদ্রাকে ভেঙ্গে দিলে আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেও কিছুক্ষণ না-নিদ্রা-না-জাগরণ অবস্থায় থাকি। বর্তমান বিশ্বে কোন কোন মানবগোষ্ঠী সুষুপ্তির পর জেগে উঠেছে, —আবার কেউ কেউ জেগেও তন্দ্রালু অবস্থায় আছে। কিন্তু কোন মানবগোষ্ঠীই আজ ঘুম-ঘোরে অচেতন নয়।

এই জাগরণের সাধারণ উদ্দেশ্য স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা

মানবচেতনার এই বিশ্বব্যাপী জাগরণকে অনেকে মনে করেন আত্মপ্রতিষ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ। বর্তমান বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যা যে ভোগ্যপণ্য উপহার দিচ্ছে তার মধ্য থেকে নিজের অংশ—এবং সম্ভব হলে পরের অংশ থেকেও কিছুটা আদায় করে নেবার প্রচেষ্টাই আধুনিক জাগরণের পরিচায়ক। ভোগাধিকারের সাম্যের দাবি নিয়েই জনজাগরণ বা গণজাগরণ। পাশ্চাত্যে যাকে 'রেনেসাঁ' বলা হয় তার পশ্চাতে আছে এক শ্রেণীর মানুষের ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। বিত্তহীন এবং ভূমিহীনেরা সবদেশেই ভোগ্যপণ্য ব্যবহারে কম অধিকার এবং সুযোগ পেয়ে থাকে। তাই বলে যে, স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীনেরা বিত্তবান অপেক্ষা কম সুখী বা অ-সুখী, তা বলা চলে না। তবু বিত্তবানের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদকে স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনেরা ঈর্ষা করে থাকে। সম্পদ অধিকারের এবং ভোগের তারতম্যের দ্বন্দ্বই রেনেসাঁর এবং আধুনিক জনজাগরণের একটি সাধারণ বাহ্য লক্ষণ। যন্ত্র ও কারিগরি যুগের আগে ভোগ-পার্থক্যটা এতটা প্রকট ছিল না। তাই স্বল্পবিত্ত এবং বহুবিত্তের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ববোধও তেমন প্রকট ছিল না।

যন্ত্রবিশেষ মানবগোষ্ঠীকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছে। যন্ত্র যেখানে মানুষ অপেক্ষা বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম, সেখানে যন্ত্রের প্রাধান্য হতে বাধ্য। এই যন্ত্রীরাই হলেন যন্ত্রহীন মানুষের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের পাত্র। কালক্রমে যন্ত্রীদের হাতে শাসনক্ষমতাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসে গেছে। শাসনক্ষমতা এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনক্ষমতা স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার বিপদ অবশ্যই আছে। অথচ উৎপাদনক্ষেত্রে এদের বুদ্ধিকৌশল, শ্রম এবং দক্ষতাকে উপেক্ষা করারও জো নেই। 'জাগ্রত জনগণে'র ক্ষুধা এবং অভাবকে দূর করতে এদের শুভবুদ্ধি এবং কার্যদক্ষতাকে উপেক্ষা করাও চলে না। অথচ এদের ক্ষমতা এবং লালসাকে প্রশ্রয় দিলেও বিপদ। এই সুবিধাভোগী মানুষের আগ্রাসী প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ এবং সংযত করার

জন্যই বিশ্বব্যাপী মানবচেতনা ক্রীয়াশীল।

বিত্তসম্ভোগের সাম্য ছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ, ধর্মাচরণের বাধা, শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার বঞ্চনা, নারীপুরুষের অধিকারের তারতম্য, বর্ণগত বৈষম্য প্রভৃতি কারণে দুর্বল ও বঞ্চিতরা নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই জেগে উঠছে। বাহ্যতঃ মনে হয় আত্মপ্রতিষ্ঠাই এই মহাজাগরণের উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যাপী মানবচৈতন্য জাগরণের অন্যতর হেতুও আছে।

সাধারণ মানবপ্রীতিও নবজাগৃতির উদ্দীপক

মানুষ শুধু স্বার্থপর পশুই নয়। তার ভিতর প্রেমময় দেবত্বও আছে। তার ভিতর সুকুমার দৈবী বৃত্তিও আছে, যার দ্বারা সে অপরের সঙ্গে নান্দনিক আনন্দকে সমানভাবেই গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এই স্বাভাবিক প্রেম এবং নান্দনিক প্রেরণাও মানুষকে অপরের সঙ্গে মিলিত হবার, নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করবার প্রেরণা দেয়। বর্তমান মানবচেতনার জাগরণের পশ্চাতে একটা বিশ্বজনীন প্রীতির প্রেরণাও কার্যকর নিঃসন্দেহে। এই দৈবী বিশ্ববোধের প্রেরণা—ভোগসাম্যের ঐক্যের প্রেরণা অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। এই সহজাত প্রীতিবোধই নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বমানবকে ভূকম্পন ও বন্যা-পীড়িত মানুষের সাহায্যের প্রেরণা দেয়, অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ করে, বিশ্বের মারণাস্ত্র নির্মাণ ও প্রয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, কোন মানব-গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদ করে, বিশ্বের দুর্বল ও বিত্তহীন মানুষের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য বিষয়ে সক্রিয় সহায়তা করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে। একদিকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, অপর দিকে মানুষের সহজাত মানবপ্রীতি বিশ্ব-মানবকে অমঙ্গলের দূরীকরণে এবং মঙ্গলপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করেছে, ভোগের অধিকারের তারতম্যের জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত করেছে—আবার তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনেরও সহায়তা করেছে। আজকের সমস্যা—মানুষ কিভাবে এই যন্ত্রদানবকে বিশ্বকল্যাণে নিযুক্ত করতে সক্ষম হবে? বিশ্ববোধই হবে বিশ্বকল্যাণের একমাত্র পন্থা।

পশুত্ব থেকে দেবত্বে উন্নয়নের প্রচেষ্টাই বিশ্ববোধের প্রথম সোপান

বিজ্ঞান মানুষকে প্রচুর—এমনকি প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ্যপণ্য দিয়েছে। বিশ্বের উৎপন্ন ভোগ্যবস্তু সমানভাবে বন্টিত হলে কারও ভালভাবে বাঁচার মতো অন্ন, বস্ত্র এবং গৃহের অভাব হতো না। অভাব-বোধ ব্যাপারটি আপেক্ষিক। হয়তো বাঁচার মতো ভোগ্যপণ্য পাবার পরই আরও ভালভাবে বাঁচার মতো ভোগ্যবস্তুর চাহিদা দেখা দিত। অভাববোধের অপূরণীয়তার কথা স্মরণে রেখেই বলা যায়, ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্য বিশ্বের উৎপন্ন ভোগ্যসামগ্রীই যথেষ্ট, যদি তা সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করা যায়। যাদের অভাব আছে তারা যেমন অপরের উদ্বৃত্ত থেকে একটা অংশ আশা করে, তেমনি যাঁদের ব্যক্তিগত অভাব নেই এমন বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও আছেন যাঁদের ইচ্ছা করে—বিশ্বের সম্পদ সকলের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হোক। বিশ্বে এমন মানুষেরও অভাব নেই যাঁরা নিজের সর্বস্ব পরার্থে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পান।

আধুনিক রাজনীতি মানুষের সাম্যবোধকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। বিশ্বের সব রাষ্ট্রই 'কল্যাণরাষ্ট্র'। জনগণের কল্যাণই শাসক-গোষ্ঠীর এবং শাসনতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তবুও প্রত্যেক দেশেই বিত্তবৈষম্য আছে, ভোগাধিকারের তারতম্যজনিত অশান্তি এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে। প্রাচুর্যের মধ্যেও বহুদেশ ভোগবৈষম্যের অশান্তিতে বিব্রত।

বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির শুভবুদ্ধির এবং পারস্পরিক কল্যাণকামনার পরিচয় বহন 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' (U. N. O.) নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই সংস্থা বিশ্বের সমগ্র মানব-গোষ্ঠীকে সহাবস্থানের আদর্শে "নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচতে দাও" নীতি অবলম্বন করে শান্তি-পূর্ণ, আনন্দময় জীবনযাত্রার সহায়তা করে চলেছে। কিন্তু এই সংস্থার মানবাদর্শ এবং পারস্পরিক

সহায়তার নীতিও সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হতে পারছে না—বিশেষ শক্তিমান স্বার্থলোভী কয়েকটি রাষ্ট্রের জন্য। তবু এই সংস্থার আদর্শ অভিনন্দনীয় এই জন্য যে, বিশ্বের সমগ্র মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের কথাই এই সংস্থা চিন্তা করে।

কল্যাণরাষ্ট্রের এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবকল্যাণব্রতের সূচীর বাইরেও আছে বহুধর্মীয় এবং সমাজসেবী সংস্থার সেবাব্রতের কর্মধারা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই সকল প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা এবং সংপ্রচেষ্টা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। যুদ্ধ, যুদ্ধভীতি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মীয় বিদ্বেষ, সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান, বর্ণ-বিদ্বেষ ইত্যাদি অশান্তিকর পরিস্থিতি বিশ্বের কোন-না-কোন স্থানে ভয়ঙ্করভাবেই বিরাজ করছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এবং শান্তিপ্রিয়। প্রয়োজনবোধে মানুষ পরার্থে স্বার্থ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু মানুষের মধ্যে যেহেতু একটা সুপ্ত পশুত্ব বা স্বার্থপর বৃত্তি আছে—ত্যাগের চেয়ে ভোগের প্রতিই বিশেষ অনুরক্তি আছে, সেই জন্যই এই বিশ্ববোধের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হতে পারছে না। মানুষকে এই পশুত্বের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হতে হবে, অসংযত ব্যক্তিগত ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সীমিত করতে হবে। পশুত্বকে জয় করবার, ভোগের ওপরে উঠবার সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকতে না পারলে আমাদের শুভবুদ্ধি যথাযথ কার্যকর হবে না। তাই সংযম এবং পরার্থপরতাই বিশ্ববোধের প্রথম সোপান।

বিশ্ববোধ একটি আধ্যাত্মিক অনুভব

বিশ্ববোধ একটি আধ্যাত্মিক অনুভব। আধ্যাত্মিক হলেও জাগতিকক্ষেত্রেও এর প্রয়োজন অধিকতর। বিশ্বকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে বিশ্বের মধ্যে অনুভব করা—'সর্বত্র সমদর্শী' হওয়া এবং সর্বভূতহিতে রত থাকাই বিশ্ববোধের লক্ষণ। আমরা যে মানবিক সহাবস্থান চাই, আমরা যে সকলকে সুখী করে নিজেকে সুখী করতে চাই, এর চেষ্টা তখনই সার্থক হবে যদি আমরা প্রত্যেকে একই ঐক্যভূমিতে দাঁড়াতে পারি। আমি পরের জন্য ত্যাগ করে আনন্দ পাব না, যতক্ষণ আমি পরকে 'পর' ভাবব। পরকে যখনই আপন ভাবতে পারব তখনই নিজের অপেক্ষা পরের জন্য ত্যাগ করে আনন্দ পাব। মাতা নিজের পুত্রকে পর মনে করেন না বলেই তার জন্য সর্বস্ব-ত্যাগ করে আনন্দ পান। অপর জননীর পুত্রের ওপর মায়ের 'আপন' বুদ্ধি না থাকায় পরের সন্তানের জন্য ত্যাগে কোন উৎসাহ পান না। একই মা সতীন-পুত্রকে বিপরীত দৃষ্টিতেও দেখতে পারেন। তাই পরের জন্য স্বার্থত্যাগের প্রেরণা হলো পরের মধ্যে নিজেকে অনুভব করা। রাজনৈতিক সাম্য, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, মানবীয় প্রেম সবকিছুই নির্ভর করছে ঐ পরের মধ্যে আত্মদর্শনের অনুভবে।

আধুনিক জড়বিজ্ঞান ও রাজনীতি এই ঐক্যের পথে এগিয়েছে

বর্তমান বিজ্ঞানসাধনার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হলো বিশ্বের পশ্চাতে একই সত্তার (সেটা শক্তি বা বস্তু যাই হোক) সন্ধানলাভ করা। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা—বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই বিশ্বকে বিশ্লেষণ করে করে শেষ পর্যন্ত এমন এক স্থানে উপনীত হয়েছে যেখানে সবকিছুই এক অনির্বচনীয় সত্তায় বিলীন। বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে উপলব্ধ এই ঐক্য আমাদের ধর্ম, দর্শন এবং রাজনীতির ঐক্য বিষয়ক ধারণাকে আরও দৃঢ় করেছে। রাজনীতি অপর ভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষের সাম্য এবং ঐক্যের কথা বলছে। বর্তমান রাজনীতি এবং অর্থনীতি এই সাম্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই মানবীয় সমস্যার সমাধান করতে চাইছে।

ঐক্যের ভিত্তি একমাত্র বেদান্ত

বেদান্তদর্শন ব্রহ্ম-জীব-জগৎ সবকিছুর মধ্যেই একত্বকে অনুভব করে জীবনসমস্যা সমাধানের পন্থার কথা বলে। বিজ্ঞানীর ও রাজনীতিবিদের 'ঐক্য'বুদ্ধির গণ্ডিতে আবদ্ধ। বেদান্তীর ঐক্য অনুভবে স্বয়ংসিদ্ধ। রাজনীতিবিদ্ এবং শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন জড়বিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানী সকলেই এই বুদ্ধিগ্রাহ্য একত্বের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই বিশ্বসমস্যার সমাধান করতে প্রয়াসী। বেদান্তীর সঙ্গে বিজ্ঞানীর

অভিনন্দনীয় মিল হলো—উভয়েই একসত্তায় বিশ্বাসী। এই ঐক্যানুভবের মাধ্যমেই বিশ্বসমস্যার সমাধান করতে হবে—এ-সম্পর্কেও মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু শুধু বুদ্ধির ভূমিতে এই ঐক্যসাধনা সম্ভব নয়। ঐক্যের অনুভূতির ভূমিতে আরূঢ় হলেই যথার্থ ঐক্যবোধ আসবে। এর জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক সাধনা।

ত্যাগ এবং সেবার দ্বারাই হবে যথার্থ বৈদান্তিক ঐক্যানুভব

বেদান্ত বা উপনিষদ্ যে ঐক্যবোধের কথা বলেছেন তার পন্থা হলো 'ত্যাগেন'—ত্যাগের দ্বারা। অন্য কোন পথ নেই—'নান্য পন্থাঃ'। বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ্ যদি ত্যাগে প্রতিষ্ঠ হতে পারেন তবেই তিনি যথার্থ ঐক্যানুভব করতে পারবেন। বর্তমান বিশ্বের অনৈক্য, অশান্তি এবং বৈষম্যকে দূর করতে গেলে আমাদের বৈদান্তিক ঐক্যভাবনা অপরিহার্য। আমাদের সেই ঐক্যানুভব একদিকে যেমন মানুষের দুঃখে কাতর হবে, তেমনি হবে একটি অভুক্ত কুকুরের জন্যও; তেমনি হবে দূর্বাঘাসের পদদলনের ব্যথায় সমব্যথী। এই সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে শুধুমাত্র রাজনীতির পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে ঐক্যের বুলি আওড়ালে, কখনো বিশ্বে সাম্য বা ঐক্য আসবে না। নিজের কথা যত কম ভাবা যায়, ততই পরের মঙ্গল হয়। ত্যাগের আর একটি ব্যবহারিক দিক হলো পরের দ্রব্যে প্রলুব্ধ হওয়ার প্রবণতা থেকে বিরতি। প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যসম্ভোগ থেকে বিরতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে যুগোপযোগী বেদান্ত-অনুভব

যে বৈদান্তিক ঐক্য অনুভবের দ্বারা পার্থিব সকল সমস্যারই সমাধান সম্ভব, সেই ত্যাগ এবং সেবার আদর্শ যুগ-প্রয়োজনে মূর্ত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনায়। তারই বিশ্বময় ব্যাপ্তি হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীমা সারদাদেবীর মাধ্যমে। ত্যাগের সঙ্গে সেবাভাবের সংযোজন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তভাবনার যে আদর্শটি স্থাপন করে গেছেন তাকেই বলা হয় 'নববেদান্ত'।

বর্তমান রাজনীতি এবং মানবতাবাদী দর্শন মানুষের সঙ্গে মানুষের সাম্য, ঐক্য এবং পারস্পরিক সহানুভূতি কামনা করে। এই বিশ্বকামনার বাস্তব রূপায়ণের অতি আধুনিক আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর 'জীবনে অসীমের লীলা পথে'—ব্রহ্মের সঙ্গে এবং অপর পক্ষে জীবের সঙ্গে ঐক্য অনুভব বহুভাবে বহুবার হয়েছে। এই বিশ্ব-ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর আগমন—তাঁর 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' সাধনা।

বিশ্ববোধ: শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে 'ফলিত বেদান্ত'

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ব্রহ্ম আর জীব এক হয়ে যে নব আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে তাকেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'ফলিত বেদান্ত'—প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিক্ষণে প্রতি বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন। প্রতিমার পূজারী হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার আরম্ভ। সেই প্রতিমাকেই তিনি নানাভাবে দর্শন করে আমাদের যে-ব্রহ্মের 'বিশ্বরূপ' দর্শন করিয়েছেন সেটাই আমাদের বিশ্বসমস্যা সমাধানে বিশেষ প্রয়োজন। 'মা বিরাজেন সর্বঘটে'—এই তাঁর অনুভব। বিশ্বের সঙ্গে বৃহৎ ঐক্য অনুভব করেই তিনি দূরস্থিত বিবদমান মাঝিদের আঘাতের বেদনা নিজ পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। দূর্বাঘাসের পাদপীড়ন, ছিন্নপত্র বিল্ববৃক্ষের বেদনা, দেওঘরের সাঁওতাল এবং কলাইঘাটার প্রজাদের দারিদ্র্য ও ক্ষুধাপীড়ন, তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যন্ত্রণায় কাতর হয়েছিলেন। রসিক মেথরের স্পর্শ তাঁর কাছে ছিল পবিত্র। কলকাতাবাসী, ভোগলিপ্ত, ঈশ্বরবিমুখ মানুষের পোকার মতো কিলবিল করা জীবনের প্রতি দিব্য সহানুভূতি তাঁর বিশ্ববোধেরই পরিচায়ক। দূর্বাঘাস থেকে আপামর মানুষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে এই ঐক্য অনুভবই ফলিত বেদান্ত। এই সর্বগ্রাহী মমত্ববোধই সাম্যবাদের দৃঢ় ভিত্তি।

আমেরিকা ও ইউরোপে বৈজ্ঞানিক হবার আগ্রহ কম

ব্রিটেনে আশির দশকে বিজ্ঞানক্ষেত্রের প্রধান সমস্যা ছিল অর্থ। কিন্তু নব্বই-এর দশকে অর্থব্যয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন গবেষণার কাজে যা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, তা খরচ করবার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এর কতকগুলি কারণ অন্য সব দেশের মতো, আবার কতকগুলি ব্রিটেনের নিজস্ব। এথেকে মনে হচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-বিভাগে নিয়োগের জন্য লোক পাওয়া দুরূহ হবে। রিসার্চ কাউন্সিলের পরামর্শ সমিতির চেয়ারম্যান স্যার ডেভিড ফিলিপস-এর মতেঃ "আগামী পাঁচ বছরে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াবে।"

লোকগণনা ও লোকনিয়োগের ধারা পরীক্ষা করলে এই অবস্থার কারণ সম্বন্ধে খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। প্রথমতঃ জনগণের মধ্যে ১৬—১৮ বছর বয়স্ক যুবকের অভাব। সমস্যাটি আরম্ভ হয়েছিল ১৯৮4 খ্রীস্টাব্দে। বর্তমানে তা আরও বেড়েছে এবং ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দে খুবই প্রকট হবে। এর ফলে ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে যেখানে ১০ জন ছাত্র স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়েছিল, ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দে সেই সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ জন। এরই কয়েক বছর পরে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক অবসর গ্রহণ করবেন। তাছাড়া এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে ভাল ছেলে পেতে শিল্প-পণ্যোৎপাদী গবেষণাগারগুলির সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। কারণ, শেষোক্ত জায়গাগুলিতে অধিকতর সংখ্যায় প্রযুক্তিবিদ্যা-বিশারদদের দরকার হবে। যেখানে পি. এইচ. ডি. ছাত্রদের বাৎসরিক কয়েক হাজার পাউন্ডে খরচ চালাতে হয়, সেখানে একজন সদ্য পাস করা অ্যাকাউন্ট্যান্ট অন্ততঃ ১২000 পাউন্ড বেশি পান। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজস্ব বিভাগে কর্মসন্ধানী ছিল রসায়নে সদ্য স্নাতক-উপাধি প্রাপ্তের ২৪·৩ শতাংশ, যা ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে ছিল ২৩·৬ শতাংশ; এই বিভাগে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক-উপাধি প্রাপ্তের অনুপাতও ১৫·৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭ শতাংশ হয়েছে। আমেরিকা ও ফ্রান্সের অবস্থা এইরকমই দাঁড়াবে; ইটালি, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডের অবস্থা আরও খারাপ। শিক্ষকদের অবসরগ্রহণ আর একটি সমস্যা। কারণ ষাটের দশক থেকে সমস্ত উন্নত দেশেই কলেজের সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছে। ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, আমেরিকাতে ২০০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ৬,৭৫,০০০ জন বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারের অভাব হবে; সেজন্য অন্যান্য বহু দেশের ইংরেজী-জানা গবেষকই ডলারের লোভে সেখানে আকৃষ্ট হবে। এর বিকল্পস্বরূপ অনেকে ইউরোপে চলে যাবে, কারণ ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের পর মুক্ত ইউরোপীয় মার্কেট স্নাতকদের নানা কাজের প্রস্তাব দেবে।

ব্রিটেনে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে কত লোক লাগবে? ইনস্টিটিউট অফ ম্যানপাওয়ার-এর অ্যাডভাইসারি বোর্ড ফর দি রিসার্চ কাউন্সিল (এ. বি. আর. সি.)-এর পক্ষ থেকে রিচার্ড পিয়ার্সনের হিসাব অনুযায়ী—যদিও হিসাব ভালভাবে রাখা নেই, তবুও দেখা যাচ্ছে যে, আশির দশকে, রিসার্চ কাউন্সিল ল্যাবরেটরি-গুলিতে, ইউনিভার্সিটিগুলিতে এবং পলিটেকনিক গুলিতে গবেষকদের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের কাছাকাছি। ব্রিটেনে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি এবং সোশ্যাল সায়েন্সে স্নাতক পর্যায়ের যে ১০ লক্ষ শ্রমজীবী আছেন, তাঁদের মধ্যে এই ৫০ হাজারকেই বিজ্ঞানভিত্তিক বলা যেতে পারে। এর অর্থ এই যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজ চালানোর জন্য বিজ্ঞানে স্নাতকের

চাহিদা কমই। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়োগকারীরা চান বুদ্ধিদীপ্ত সর্বোচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। পিয়ার্সনের হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ২০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ ৫০ শতাংশ বাড়বে। এর অর্থ হলো, সেখানে প্রতি বছরে ৪০০ জন নতুন শিক্ষাসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক এবং ২০০ জন ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদ্যা-বিশারদের দরকার হবে। সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় এ-সংখ্যা খুবই কম; কোন কোন কোম্পানি এই সংখ্যক বিজ্ঞানী নিযুক্ত করে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজির অধ্যাপক ও 'সেভ ব্রিটিশ সায়েন্স' (ব্রিটিশ বিজ্ঞানকে বাঁচাও) নামক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ডেনিস নোবলের মতে ভাল একজন স্নাতক যদি কারখানায় বা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে যোগদান না করে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকে তাহলে সে ৩০ বছর বয়সের মধ্যেই দশ লক্ষ পাউন্ড ক্ষতি করে। তিনি বলেছেন, "প্রথম শ্রেণীর মনীষার এই শোষণ যেকোন উন্নত সমাজে লজ্জাজনক ব্যাপার।" অবশ্য যেসব পরিসংখ্যানের কথা বলা হলো, সেগুলি যে একেবারে নির্ভুল এবং যোগান ও চাহিদার ভবিষ্যদ্বাণী যে সবসময় সত্য হয় তা নয়; তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নব্বই-এর দশকে অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাবে; কারণ এখন বিজ্ঞান পড়তে আসছে কম ছেলে এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মজীবন যাপন (technology-based career) করতে এখন বেশ অনীহা দেখা যাচ্ছে। ইংল্যান্ডে বর্তমানে স্কুলের বেশিরভাগ বিজ্ঞানের ছাত্রই যত শীঘ্র পারে বিজ্ঞান ছেড়ে দিচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা কারখানায় বৈজ্ঞানিক কাজে নিযুক্ত বিজ্ঞানে স্নাতক বা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রিধারীর সংখ্যা কমে আসছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পমেয়াদী গবেষণার কাজে যোগ্য ব্যক্তি পেতে অসুবিধা হচ্ছে। সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ কাউন্সিল ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি বেতন না বাড়ান হয়, তবে ১০।১৫ বছরে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিবিদ্যাতে শিক্ষাদান বা বৈজ্ঞানিক-গবেষণা প্রায় অচল হয়ে যাবে।

ব্রিটেনের সমস্যা সম্বন্ধে যা বলা হলো, ইউরোপের প্রধান দেশগুলিতে বা আমেরিকাতেও সমস্যা একই ধরনের। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ২০০০ এবং ২০১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ৭০ শতাংশ বৈজ্ঞানিক অবসর গ্রহণ করবে। ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১০,০০০ অধ্যাপকের প্রয়োজন হবে। আমেরিকায় ২০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতি ১০টি খালি পদের জন্য মাত্র ৮টি দরখাস্ত পড়বে। ব্রিটেনের দুশ্চিন্তা আরো বেশি, কারণ বহুদিন থেকে মগজ-চালান (ব্রেন ড্রেন বা প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দেশান্তরগমন) ব্যাপারটি রাজনৈতিক নেতাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার শিক্ষাবিদ্গণ বুঝতে পারছেন যে, তাঁদের বিজ্ঞানের কাজে নারী ও সংখ্যালঘুদের (কৃষ্ণকায়, স্প্যানিস ভাষাভাষী প্রভৃতি) নিযুক্ত করতে হবে। আমেরিকাকে বিদেশ থেকে ও বাজারদর দিয়ে (আমেরিকার নিজস্ব বেতনহারে নয়) লোক এনে নিযুক্ত করতে হবে। যথেষ্ট সংখ্যায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্ পাবার জন্য নানারকম ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, যেমন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান পড়তে উৎসাহিত করা, স্নাতক হবার পরে ছাত্রদের গবেষণা কাজে উৎসাহিত করা প্রভৃতি।

[New Scienticst, 7 April 1990, pp. 37—42]

এই প্রসঙ্গে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০, ওয়াশিংটন থেকে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেরিত একটি সংবাদ উধৃত করা যেতে পারে: "বহু ছাত্রই বিজ্ঞান বিষয়ে বই খুলতে কষ্টদায়ক ও একঘেয়ে বোধ করে। ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন একটি সমীক্ষায় দেখেছে যে, কলেজে সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভরতি হওয়ার এক বছর পর ৪২ শতাংশ ছাত্র কলেজ ছেড়ে যায় এবং ২৩ শতাংশ ছেড়ে যায় স্নাতক হবার আগেই। ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর রবার্ট ওয়াটসন বলেছেন যে, কলেজ ছেড়ে যাওয়াটা নতুন নয়, কিন্তু সে ব্যাপারটা যে "আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে তার নিশ্চিত সাক্ষ্য মিলছে।"

আপনি আর আমি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর। যত আমাকে কষ্ট দেবেন ততই আমার সুখ; কারণ, ততই আমি আপনাকে ডাকব, 'ত্রাহি ত্রাহি'। ভোগ আমার 'আমি-রোগ' বাড়িয়ে তুলবে। আমার হাম্বা হাম্বা রবে সবাই অতিষ্ঠ হবে। ঘোর তামসিকতায় আমি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হব। বিস্মৃত হব আপনাকে। মাঝে মাঝে আমার ভয় আসবে, এই বুঝি আমার ভোগের কাঠামো ভেঙে পড়ল। তাগা, তাবিজ পরব, মন্দিরে গিয়ে পুজো চড়াব সকাম প্রার্থনায়—'আমাকে আরো দাও, আরো দাও।' আমি হিসেবী হব, কৃপণ হব, নীচ হব, স্বার্থপর হব। মানুষকে ঘৃণা করতে শিখব। ঘৃণার বিনিময়ে আমি ঘৃণাই পাব। একদল স্বার্থান্বেষী স্তাবক আমাকে ঘিরে থাকবে। আমি তোষামোদ-প্রিয় হব। অহঙ্কারে লঘু-গুরু জ্ঞান হারাব। ক্রমশই আমি আপনার সান্নিধ্য থেকে দূরে, আরো দূরে সরে যাব। জীবনের প্রহরে প্রহরে নিঃসঙ্গ শৃগালের মতো চিৎকার করব—হুক্কা হুয়া, কেয়া হুয়া। আপনি হাসতে হাসতে বলবেন, 'কুছ নেহি হুয়া বেটা, ভবরোগের শিকার হয়েছ। সত্ত্বগুণ হারিয়েছ। তোমাকে তমো-শৃগালে ধরেছে। তুমি পালে ঢুকেছ। প্রহরে প্রহরে চিৎকার করতে করতে একদিন দেখবে জীবন ভোর হয়ে গেছে। তখন আর তুমি নেই। পড়ে আছে তোমার শেষ মুহূর্তের আক্ষেপ।' মায়ামৃগের পিছনে ছুটেছি। ধরতে পারিনি। ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চলে গেছি জন্মচক্রে। আবার ফিরতে হবে, কোথায়, কোনখানে, কি অবস্থায় তা তো জানি না। অতৃপ্তি নিয়ে গেছি, ফিরতে হবে অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে।

আপনি আমাকে যত রিক্ত করবেন, ততই আমি আপনার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর শুনতে পাব। শুনতে পাব করুণামাখা কণ্ঠে আপনি আমাকে বলছেন, "ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে, তার ঝাল লাগবে না? সেজবাবু (মথুরবাবু) বয়সকালে অনেক রকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানারকম অসুখ হলো। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাড়িতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হলে যত জল পেছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাঁচফোঁচ করে উনুন নিভিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ—এসব থেকে সাবধান হতে হয়। দেখ না, হনুমান ক্রোধ করে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়ল অশোকবনে সীতা আছেন, তখন ছটফট করতে লাগল, পাছে সীতার কিছু হয়।"

আমি অমনি সচেতন হব। প্রথম বয়সের অনাচার ডেকে আনবে শেষজীবনের যন্ত্রণাদায়ক যতেক ব্যাধি। কাম, ক্রোধ, লোভ যৌবনকে যেন সিক্ত কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত না করে। তখন আমি ফুরফুর করে জ্বলব ঠিকই, আর শেষ জীবনে দেখব, নিবু নিবু উনুনের চোখ জ্বালানো ধোঁয়া। যত বিত্ত, যত প্রতিপত্তি ততই কাম, ক্রোধ, লোভের বাড়াবাড়ি। তার চেয়ে বিত্ত যাক, সত্ত্ব থাক। আমার সদসৎ বিচার থাক। সৎ—নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎ পথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতি পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙশ মারে। সেই মাহুতরূপী বিচার যেন সদা জাগ্রত থাকে। ভোগে থাকলে বিচার শুয়ে পড়ে।

ঠাকুর। আমি কাঁদতে চাই। কেন জানেন? আপনি বলেছেন, "তাঁর কাছে কাঁদতে হয়।" দেহ, পরিবেশ, পরিস্থিতি যত আমাকে চাবকাবে আমি তখন সেই সীমাহীন শূন্যোতায় কেবলই কাঁদব।

নিত্যকে ধরার জন্যে আকুলি-বিকুলি করব। তখন আমার জীবনে হয়তো ফলতে পারে আপনার কথা—"তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনের ময়লাগুলো ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়। মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার ছুঁচ, ঈশ্বর চুম্বক-পাথর, মাটি না গেলে চুম্বক-পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে ছুঁচের মাটি ধুয়ে যায়। ছুঁচের মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি। মাটি ধুয়ে গেলেই ছুঁচকে চুম্বক-পাথরে টেনে লবে—অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে তবে তাঁকে লাভ হয়। জ্বর হয়েছে, দেহেতে রস অনেক রয়েছে তাতে কুইনাইনে কি কাজ হবে।"

এই চিত্তশুদ্ধির জন্যেই আমি জ্বালা-যন্ত্রণায় থাকতে চাই। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে চাই—আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই। আর তখনই আমার সেই চেতনা জাগবে—"বদ্ধ জীবেরা সংসারে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারে ঐতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে? আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, তেল পুড়ে যাবে সলতে কমিয়ে দাও। এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।"

এই হাত-পা বাঁধা অবস্থা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই। আমি জীবন্মুক্তির প্রয়াসী। আমার যেন সম্যক্ সেই বোধ হয়—"জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে; পিষে যাবে।" নিষ্কৃতির পথ? আপনিই তো বলে দিয়েছেন—"তবে যেকটি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কর তবে মুক্তি। তা না হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।" আপনিই আমার সেই খুঁটি।

মনের সেই অবস্থায় পৌঁছাতে চাই, যে-অবস্থায় মন মুক্তির অনুগামী হবে। সেটা কি? সেও তো আপনি বলেছেন, "ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে, আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে।" সে-বৈরাগ্য কেমন? "তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক—এসব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। মায়ের প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না।"

সে সংসারকে কি দেখে ঠাকুর?

"সংসারকে পাতকুয়া দেখে; তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও। বাড়ির বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বরচিন্তা করব—একথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোখ।"

সংসার যদি আদর-আপ্যায়ন করে আচারের মতো করে রাখে তাহলেই তো আমার সর্বনাশ। সংসার আমাকে যত ভাবে পারে চাবকাক। উঠতে কোস্তা, বসতে কোস্তা। আমার সব মোহ ঘুচে যাক। তীব্র ব্যাকুলতায় আমি যেন ছটফট করি। কিরকম? "কর্ম গেলে কেরানির যেমন ব্যাকুলতা হয়। সে যেমন রোজ অফিসে অফিসে ঘোরে, আর জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁগা কোনও কর্মখালি হয়েছে? ব্যাকুলতা হলে ছটফট করে—কিসে ঈশ্বরকে পাব।"

"গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোন ভাবনা নেই—এরূপ অবস্থা হলে ঈশ্বরলাভ হয় না।"

ঠাকুর, আপনি আমার আপাতসুখের কেল্লা ভেঙে চুরমার করে দিন। আপনার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ি। ধন নয়, জন নয়, শুধু আপনি আর আমি। নির্জন, নিঃসীম প্রান্তরে দুই পথিক।

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

রক্তে উচ্চচাপ কম করুন, বেশিদিন বাঁচুন

মারভিন মোসার*

স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক-এর সঙ্গে যুক্ত রক্তচাপ বৃদ্ধি, রোগনির্ণয় এবং তার চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এ-ব্যাপারে ভুল ধারণাও প্রচুর। বর্তমান নিবন্ধে সেগুলির আলোচনা করা হয়েছে।

উচ্চ রক্তচাপ কমানোর জন্য চিকিৎসা অনেক সময় রোগের চেয়ে কি হানিকর হয়ে পড়ে? রক্তচাপ সম্বন্ধে যেসব অবাস্তব কাহিনী প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে এটিই হলো সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর। রক্তচাপ বাড়ার কারণ কি বা কিভাবে এইসব রোগী-দের রোগমুক্ত করা যায়, তা আমরা জানি না; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীকে কষ্ট না দিয়ে এবং বড় রকম খরচের মধ্যে না ফেলে আমরা তাঁদের চিকিৎসা করতে পারি। বর্তমান কালে যেসব ফলপ্রসূ ওষুধ বেরিয়েছে, তার দ্বারা আমরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই রক্ত-চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং সেসব ওষুধের ক্ষতিকর পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া (side effects) সামান্যতম।

সামান্য রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য কোন চিকিৎসা লাগে না। একথা কি ঠিক? ছ-বছর আগে, আমার কাছে একজন ভদ্রলোক এলেন। তাঁর বয়স সাতচল্লিশ বছর এবং রক্তচাপের মাত্রা ছিল ১৪৫/৯৫; এটা খুব বেশি না হলেও তার চিকিৎসা করানো উচিত ছিল। কিন্তু তিনি পত্র-পত্রিকায় পড়েছিলেন যে, শরীর যদি ভাল থাকে, সামান্য রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। তিনি হানিকর ওষুধ থেকে দূরে থাকতে চান এবং আমার বলা সত্ত্বেও তিনি কোন ওষুধ খেতে অস্বীকার করলেন। পাঁচ বছর পরে সেই ভদ্রলোকের রক্তচাপ বেড়ে হলো ১৫৫/১০৫; এই চাপমাত্রাও অবশ্য খুব বিপজ্জনক নয়, কিন্তু তখন তাঁর বৃক্কে (কিডনিতে) দোষ দেখা দিচ্ছে এবং হৃৎপিণ্ডটি বড় (enlarged) হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি এখন ওষুধ খেতে রাজি হলেন। ছ-মাস ওষুধ (ডাই ইউরেটিক এবং বিটাব্লকার) খাবার পর, তাঁর রক্তচাপ কমল, হৃৎপিণ্ড ছোট হলো এবং বৃক্ক স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে লাগল। এথেকে এই শিক্ষা হয় যে, রক্তচাপ বৃদ্ধি সামান্য হলেও তার চিকিৎসা দরকার। হয়তো কোন কোন রোগীকে একটু ওজন কমাতে হবে, কাউকে বা লবণ খাওয়া কমাতে হবে এবং ব্যায়াম বাড়াতে হবে। আবার কারও কারও ওষুধ লাগতে পারে—সামান্য রক্তচাপ বৃদ্ধিতে দৈনিক একটি বড়ি থেকে চূড়ান্ত (extreme) ক্ষেত্রে দৈনিক কুড়িটি বড়িও লাগতে পারে।

বয়স্কদের আদর্শ রক্তচাপ হবে ১২০/৮০; তবে ১৪০/৯০ হলেও তা প্রায় স্বাভাবিকই ধরতে হবে। প্রায় ৭০ শতাংশ রক্তচাপের রোগী সামান্য রক্তচাপ বৃদ্ধির পর্যায়ে (১৪০/৯০ থেকে ১৬০/১০৪) পড়েন এবং অন্যান্যদের অধিকাংশ পড়েন মাঝামাঝি বৃদ্ধির পর্যায়ে (১৬০/১০৫ থেকে ১৮০/১১৫)। সাংঘাতিক (severe) রক্তচাপবৃদ্ধির (২২০/১১৫-এর বেশি) রোগী কমই দেখা যায়। এর কারণ হলো প্রথম দুই পর্যায়ের রোগীদের ফলপ্রসূ চিকিৎসা সম্ভব।

কেবল চড়া মেজাজের (tense) অথবা উদ্বিগ্নমনা (anxious) লোকেদেরই রক্তচাপ বাড়ে কি? হাইপার-টেনশন (hypertension) বা উচ্চ রক্তচাপবৃদ্ধি বলতে রক্তনালীর চাপকে বোঝায়, রোগীর ব্যক্তিত্বকে বোঝায়

* আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের ক্লিনিক্যাল প্রফেসর অব মেডিসিন এবং ন্যাশন্যাল হাই ব্লাডপ্রেসার এডুকেশন প্রোগ্রাম অব আমেরিকান ন্যাশন্যাল হার্ট, লাঙ্গস এ্যান্ড ব্লাড ইনস্টিটিউটের সিনিয়র কনসালট্যান্ট।

না। অনেক ধীর-মস্তিষ্ক লোকের রক্তচাপ বর্ধিত, আবার অনেক চড়া মেজাজের লোকের এবং স্নায়বিক দুর্বলতাগ্রস্ত লোকের রক্তচাপ স্বাভাবিক। সে যাই হোক, উত্তেজনা ও উদ্বেগ সাময়িকভাবে রক্তচাপ বাড়াতে পারে এবং জন্তুজানোয়ারের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, হাইপারটেনশন সৃষ্টিতে মানসিক উত্তেজনার কিছুটা ভূমিকা আছে।

বৃদ্ধদের রক্তচাপ কি বর্ধিত হওয়া দরকার? কারণ তাঁদের মস্তিষ্ক এবং শরীরাংশগুলিতে অধিক রক্তের প্রয়োজন। অসংখ্য অনুশীলনে দেখা গেছে যে, যেসব বৃদ্ধের রক্তচাপ স্বাভাবিক, তাঁরা বেশিদিন বাঁচেন এবং তাঁদের হৃদয়যন্ত্রের বৈকল্য বা মস্তিষ্কে স্ট্রোক, সামান্য মাত্রায় বর্ধিত রক্তচাপ থাকা বৃদ্ধদের চেয়ে কম হয়। বার্ধক্যে রক্তচাপ বাড়লে যে তাঁদের মস্তিষ্ক ভাল কাজ করে—এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং তার বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়, অর্থাৎ ছোট-খাট স্ট্রোক হয়ে তাঁদের মানসিক অবনতি ঘটায়।

বৃদ্ধদের কি রক্তচাপ বৃদ্ধি বেশি দেখা যায়? ৫৫—৬০ বছর বয়স হবার আগে হাইপারটেনশন না ধরা পড়তে পারে, কিন্তু এবিষয় পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রোগটি শুরু হয় ৩৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সে।

রক্তচাপ বৃদ্ধিজনিত রোগ নির্ণয় করতে গেলে কি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার। যেমন, ব্লাডপ্রেসার দেখা, ইকোকার্ডিয়োগ্রাম ইত্যাদি? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসবের কিছু লাগে না। কেবল কয়েক রকম রুটিন বা নিয়মমাফিক রক্ত পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা এবং কিছুকাল ধরে ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা করলেই রোগ যথার্থভাবে নির্ণীত হবে। রোগীরা অনেক সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার চাপে অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু রোগীরা যদি প্রশ্ন করতে থাকেন, 'কেন এতরকম টেস্ট? এতে আমার কি উপকার হবে?' তাহলে হয়তো এইসব পরীক্ষা কমতে পারে।

রক্তচাপ বৃদ্ধিতে খাদ্যের কড়াকড়ি প্রয়োজন?— যদিও ওষুধ না দিয়ে রক্তচাপ কমানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো শরীরের ওজন কমানো, তাবলে খাওয়া অস্বাভাবিকভাবে কমানোর প্রয়োজন নেই। অনেক রোগীই বেশি চর্বিযুক্ত খাবার বাদ দিয়ে বেশি করে ফল, সবজি ও কম ক্যালরির (calorie) খাবার দিয়ে প্রথমে আরম্ভ করতে পারেন। লবণ অর্ধেক করুন। আমরা সাধারণতঃ দৈনিক দুই চামচ লবণ খাই; ওটা এক চামচ করুন। অনেক সময়, রান্নায় লবণ না দিলে এবং খাবার সময় আলাদা লবণ না যোগ করলেই যথেষ্ট হবে।

এক ভদ্রমহিলা এলেন, যাঁর ওজন সাধারণ মাত্রার চেয়ে আঠারো কিলো বেশি; তাঁর রক্তচাপ সামান্য বর্ধিত ছিল। এক বছর আগে, তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক তাঁকে ছাপানো একটি খাদ্য-তালিকা দিয়েছিলেন এবং কি কি নোনতা জিনিস বারণ, তারও তালিকা দিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা কিন্তু রান্নায় এবং লোক খাওয়ানোয় খুব আনন্দ পেতেন। চিকিৎসাধীনে থাকাকালীন বসে বসে দেখাতেন যে, তাঁর পরিবারের সকলে মসলা দেওয়া ভাল ভাল খাবার, পেস্ট্রি ইত্যাদি খাচ্ছে আর সেই সময় তিনি সিদ্ধ সবজি ও স্বাদবিহীন মুরগির মাংস একটু একটু মুখে দিতেন। বেশিদিন না খেতেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল।

সেই মহিলার রক্তচাপ কমাবার জন্য আমি একজন খাদ্যবিশারদকে (dietitian) একটা তালিকা করতে বললাম যাতে মহিলার প্রিয় খাবারগুলি থাকে, তবে তাতে যেন লবণ ও তেল-ঘি কম থাকে। তাঁকে প্রতিদিন আধঘণ্টা তাড়াতাড়ি হাঁটতেও বললাম। তিন মাসের মধ্যে মহিলার ওজন সাড়ে পাঁচ কিলো কমে গেল এবং রক্তচাপও কমল। একবছরে তাঁর রক্তচাপ স্বাভাবিক হলো এবং ওজন সাড়ে তের কিলো কমল। কোন কোন দিন ওষুধ লাগত, কিন্তু এখন ওষুধ না খেয়েই ভাল আছেন।

বেশি ব্যায়াম করলে কি আপনি হৃৎপিণ্ডের আক্রমণ বন্ধ করতে পারেন এবং দীর্ঘায়ু হতে পারেন? নিয়মিত ব্যায়ামে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আরও ভাল হবে। মাঝামাঝি রকম ব্যায়ামে হৃৎপিণ্ডের অসুখ কমবে, তবে জগিং (jogging) করলে যদি কোমরে, হাঁটুতে ও পিঠে ব্যথা হয়, তাহলে তা করবেন না। সীমিত ব্যায়াম, কম লবণ খাওয়া এবং কম ক্যালরির খাবার

মাঝামাঝি রকমের রক্তচাপ বৃদ্ধির চিকিৎসার প্রাথমিক পদ্ধতি। ১৫—২৫ শতাংশ রোগীর রক্তচাপ এতেই ঠিক হয়ে যাবে। সপ্তাহে ৩-৪ দিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট দ্রুত হাঁটাই আদর্শ হবে, যেটা সবাই করতে পারেন। কাছাকাছি কোথাও যেতে হলে হেঁটে যান।

দীর্ঘকাল যাবৎ ধূমপান, হৃৎপিণ্ডের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। ফলে সেসব ক্ষেত্রে ধূমপান বন্ধ করলে কোন লাভই হবে না। তাই কি? হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য ক্ষতি করা ছাড়া বেশি ধূমপান রক্তচাপও বাড়ায়। আপনি যদি বিশ বছর যাবৎ দৈনিক দু-তিন প্যাকেট সিগারেট খেয়ে থাকেন, তাহলেও এক বছর ধূমপান বন্ধ করলে আপনার হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের আক্রমণ (হার্ট অ্যাটাক)-এর ঝুঁকি খুব কমবে, অথবা যাঁরা ধূমপান করেন না, তাঁদের সমান হয়ে যাবেন।

ধ্যান করা এবং ওষুধ ছাড়া যেসব চিকিৎসা আছে, সেগুলি ওষুধ খাওয়ার চেয়ে কি অনেক নিরাপদ? কয়েক মিনিট ধ্যান মানুষকে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মোকাবিলা করতে সাহায্য করে এবং কাজে উৎসাহ দান করতে পারে। তবে রক্তচাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রোগীদের ক্ষেত্রে তা রক্তচাপ সাময়িকভাবে কমায় মাত্র। যদি আপনার রক্তচাপ ১৪০-১৫৫/৯০-৯৫ এর মধ্যে থাকে তবে কয়েকমাস এইসব পদ্ধতির সাহায্য নিলে কোন ক্ষতি নেই, তবে সাংঘাতিক ধরনের রক্তচাপ বৃদ্ধি হলে বা ভিতরের কোন শরীরাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে, যেসব চালু চিকিৎসা আছে সেগুলি করাই ভাল।

সেদিন চলে গেছে যখন রোগীরা ডাক্তারদের হাতে তাঁদের চিকিৎসার ভার ছেড়ে দিতেন। এখন রোগীরা বোঝেন যে, তাঁদেরও দায়িত্ব আছে এবং এবিষয়ে বলবার অধিকার আছে। রক্তচাপ বৃদ্ধির মতো অসুখে, যেখানে চিকিৎসার ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হয়, সেখানে দীর্ঘ ও কর্মঠ আয়ু পাবার জন্য এটি আরও সত্য।*

* **Reader's Digest, October, 1990, pp. 63-66**

ভাষান্তর ঃ জলধিকুমার সরকার

ভ্রম সংশোধন

পৌষ, ১৩৯৭, পৃঃ ৭৬৮

মুদ্রিত—'আন্তর্জাতিক কন্যাসন্তান বর্ষ'

হবে—সার্কের ঘোষণা অনুযায়ী 'শিশুকন্যা বর্ষ'

বিনা মন্তব্যে

"মনোরম, ব্যঞ্জনাময় [উদ্বোধন-এর বর্তমান বর্ষের] প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদ-পরিচিতি শিল্প, সাহিত্য ও মানবিকতার ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটিয়েছে। অভিনন্দন।"

—শান্তি সিংহ, বিবেকানন্দনগর, পুরুলিয়া।

"উদ্বোধন-এর প্রচ্ছদ অপূর্ব। প্রকৃতির ভিতর থেকে মহাপ্রকৃতি যেন উঠছেন। চমৎকার!"

—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, হাওড়া।

সত্য এবং গল্প

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

তখন চীন আক্রমণ করেছে ভারতের উত্তর সীমান্তে। পৃথিবী জুড়ে সে-সংবাদে বিরাট হৈচৈ। কি হবে-না-হবে ভেবে সবাই উদ্বিগ্ন। এরই মধ্যে সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

গল্পটি শুনেছিলাম পরমশ্রদ্ধেয়া জনৈকা বৌদির কাছে।

বৌদির ছোট বোন থাকতেন দিল্লীতে। স্বামী 'মিলিটারি অ্যাকাউন্টস'-এ কাজ করতেন। চীনা-আক্রমণের সময় হুকুম এলো হিমালয়ের উঁচু সীমানায় সরকারি কাজে যেতে হবে। ভদ্রলোক চলে গেলেন সেই হুকুম পেয়ে। দিল্লীতে রইলেন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে বৌদির বোন।

কয়েকদিন পরে খবর এলো তাঁর স্বামী গুরুতর অসুস্থ। তারপর আর কোন খবর নেই। একসময় শোনা গেল ডাক্তারের পরামর্শে হিমালয়ের উচ্চতা থেকে সরিয়ে তাঁর স্বামীকে আনা হয়েছে দিল্লীর এক হাসপাতালে। মাথার ভিতরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা—বাঁচার আশা প্রায় নেই।

দিল্লীতে আত্মীয়স্বজনহীন একলা গৃহিণী চরম বিপদের সামনে নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করলেন। কে এই অসময়ে তাঁর সহায়তা করবে? ভাবতে ভাবতে দিনে স্বস্তি নেই, রাতে ঘুম নেই। বাড়িতে ঘরের দেয়ালে টাঙানো রামকৃষ্ণদেবের ছবি। এক রাতে হঠাৎ মনে হলো তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে দেখি না। দিদি তো বেলুড় মঠে নিয়ত যাতায়াত করেন। ঠাকুরের কাছেই প্রার্থনা করে দেখি না।

সেদিন সমস্ত রাত কেটে গেল ঠাকুরের কাছে প্রার্থনায়। 'স্বামী চলে গেলে কে দেখবে এই সংসার? ছোট-ছোট সন্তানদের কী দশা হবে? ঠাকুর, তুমি যদি দয়া না কর কে দেখবে?' একসময় কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন মহিলা দেখতে পেলেন ঠাকুর এসে বলছেন: "তুই ভাবিস না। মঠে নির্মল আছে, তার কাছে দীক্ষা নে। তোর স্বামী ভাল হয়ে যাবে।"

ঘুম ভাঙলে মহিলা ব্যাকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'কে এই নির্মল। আমি তো জানি না। দেখি দিদিকে লিখে।'

চিঠিতে স্বপ্নদর্শনের কথা জেনে দিদি উত্তর দিলেন: 'এখন বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ)। ঠাকুর বোধহয় তাঁর কথাই বলেছেন। তুমি সোজা বেলুড় মঠে তাঁর কাছে দীক্ষা চেয়ে চিঠি দাও।'

দিদির উত্তর পেয়ে ভদ্রমহিলা বেলুড় মঠে প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী মাধবানন্দের কাছে চিঠি দিলেন। স্বামী মাধবানন্দ চিঠি পেয়ে ভদ্রমহিলাকে দীক্ষার জন্য বেলুড় মঠে আসতে বললেন। দীক্ষা হয়ে গেল। মহারাজ অভয় দিলেন: "তোমার স্বামী ভাল হয়ে যাবে। কোন ভাবনা নেই।"

দীক্ষা নিয়ে নবজীবনের আশ্বাসে দিল্লীতে ফিরে গেলেন ভক্ত মহিলা।

দিল্লীতে গিয়ে দেখলেন, স্বামীর অবস্থা ভালর দিকে। কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

গল্পটি বলতে বলতে সরল প্রসন্নতায় সমুজ্জ্বল আমার সেই বৌদির উদ্ভাসিত মুখখানি আজও মনে পড়ে।

গ্রন্থ-পরিচয়

ভ্রমণকাহিনী যখন কাব্য হয়ে ওঠে

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

মহাতীর্থের শেষ যাত্রী—বিমল দে। প্রকাশক ঃ পরিব্রাজক প্রকাশনী, ১৫১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা ৭০০০৩৪। মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা।

বইটি লেখকের তিব্বতভ্রমণ-কাহিনী।

বইটি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না। লেখার স্টাইল অপূর্ব! ডিটেইলসের ছোঁয়ায় চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে পথ, গ্রাম, বাজার, আকাশ, মানুষ। পথে বারবার বিপদ। সহজ সরল তিব্বতী গ্রামবাসীদের সদয় ব্যবহার। রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পাহাড়ী পথ পেরনো। ভূতের গুহায় রাত কাটানো। বৌদ্ধ বিহারে লামাদের জীবন। চীনা সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে বুদ্ধির সাহায্যে উদ্ধার পাওয়া। লাসায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকের সঙ্গে কয়েকদিন থাকা। সাংপো নদীকে সাক্ষী রেখে মরুভূমির মতো রাস্তা পার হওয়া। মানস সরোবরের রাজহাঁস। শীতে হ্রদের জল জমে গেছে। তাই পায়ে হেঁটে গৌরীকুণ্ড পার হওয়া। সাদা বরফ পায়ে মাড়িয়ে কৈলাস পর্বতের দিকে এগিয়ে চলা।

সেইসঙ্গে আছে গুরুর কাছে শোনা ধ্যানের প্রক্রিয়া। বৌদ্ধতন্ত্রের কথা। লাসার ইতিহাস। আর্য-তারার ধ্যান। কৈলাসবাবার উপদেশ। পাহাড় চলার কৌশল। তিব্বতের ধর্ম। ইতিহাস।

যাত্রা শুরু হয়েছিল লামাদের দলে বাচ্চা লামা সেজে। চীনা সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে মৌনীবাবা। নাথু-লা পার হয়ে ইয়াটুং, সামাদা, সামদিং, চুসুল হয়ে লাসা। পথের বর্ণনা—"চারদিকে নিঃশব্দ, এ অঞ্চলে গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের সামনে-পেছনে ডানে-বাঁয়ে হালকা অন্ধকারের এক দেওয়াল। বড় বড় পাথরগুলো মাঝে মাঝে চোখে পড়ে আর ছোটগুলোতে হোঁচট খেতে খেতে আমরা এগিয়ে চলেছি। সেই নিঃশব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে লামাদের শ্বাস-প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বটে কিন্তু আকাশ পরিষ্কার, তারার অভাব নেই। আকাশের দিকে নজর দিয়ে চলেছি, অসংখ্য তারা দিয়ে যেন আমাদের পথটাকে আলোকিত করা হয়েছে।"

লাসা থেকে কৈলাস-মানস সরোবরের পথে একাকী যাত্রী। পথে একটা গ্রামের বর্ণনা—"থোকচেন গ্রামটা অনেকটা উচ্চ হিমালয়ের কোন ভুটিয়া পট্টির মতো। গরিব ধরনের কাঠের বাড়ি আর কাঠ-পাথরে মেশানো সরাইখানায় ভরতি। ছোট্ট খোলা বাজারটা বড় ভাল লাগল। বাজারটা আমাদের দেশের একটা বারোয়ারী মণ্ডপের সাথে তুলনা করব। সবাই সবাইকে চেনে।...বাজারের আড্ডাখানা হচ্ছে এখানকার চায়ের দোকান।...দোকানের ভিতরটা খুবই ছোট্ট, কাঠের একটি খুপরীঘর মাত্র। উচ্চতায় এক মানুষও হবে না...। উনুনের পাশেই রয়েছে এক বিরাট গামলায় গরম থুকপা... থুকপা হচ্ছে বার্লি ও মাংসের ঝোল।... এখানকার অধিকাংশ সেতুগুলোই স্থানীয় পাথর সাজিয়ে তার ওপর কাঠ ও দড়ির কেরামতিতে তৈরি। সেগুলি সবই প্রায় মান্ধাতা আমলের তৈরি...।"

মানব-চরিত্র আঁকতেও লেখক সিদ্ধহস্ত। চুশিবর চীনা সৈন্য-শিবিরে লোকদের হাবভাব, খাংমা গ্রামের তিব্বতী মেয়েটির করুণ ব্যথা, দ্রেপুং গুম্ফার লামা, সাংপোর ওঝা, দোংগলদাদা, কৈলাসবাবা এবং গুরুজী। এ চিরন্তন মানুষের কথা। মানুষের গড়া মানচিত্রকে অতিক্রম করে বেঁচে আছে অমৃতের পুত্র-পুত্রী সব দেশেই।

বইটিতে আছে আটটি ছবি, পনেরোটি ফটো, আর দুটি ম্যাপ।

এমন চমৎকার ভ্রমণকাহিনী বহুদিন পড়িনি। লেখকের মন একদিকে যেমন নিরাসক্ত, অন্যদিকে তেমনি দরদী। একটি পনেরো বছরের ছেলে লুকিয়ে তিব্বতে ঢুকেছে, হেঁটে লাসা পৌঁছেছে, সেখান থেকে একা হেঁটে তিব্বতের পূব থেকে পশ্চিমে গেছে, সেখান থেকে আবার দক্ষিণ পথে ভারতে এসেছে। পথে পদে-পদে ঝুঁকি, বিপদ। বইটি অসাধারণ। ছ-বছরের মধ্যে তৃতীয় প্রকাশ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৭ জানুয়ারি **বেলুড় মঠে** স্বামী বিবেকানন্দের ১২৯তম আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঐদিন মঠে সারাদিন ধরে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়েছিল। দুপুরে প্রায় ২০ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষিকা মারি লুইস বার্ক (সিস্টার গার্গী)।

আঁটপুর, রামকৃষ্ণ মঠে গত ২৩—২৫ ডিসেম্বর '৯০ বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভোগরাগাদি এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ধুনিমণ্ডপে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের ত্যাগব্রত সংকল্পের স্মরণে ধুনি প্রজ্বালন, বাইবেল পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী ধ্যানেশানন্দ বাইবেল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী নিত্যরূপানন্দ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন ও প্রণবেশ চক্রবর্তী ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাব ও শিক্ষা বিষয়ে বিশদ বক্তব্য রাখেন। স্বামী দেবদেবানন্দ 'কথায় ও গানে' কথামৃত পরিবেশন করেন। ২৫ ডিসেম্বর প্রায় ১২ হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর (বাঁকুড়া) গত ৮ ডিসেম্বর '৯০ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৮তম আবির্ভাব-উৎসব, ৭জানুয়ারি '৯১ স্বামী বিবেকানন্দের ১২৯তম আবির্ভাব-উৎসব এবং ১২—১৪ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করে। শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথির দিন বিশেষ পূজাদি, প্রসাদ-বিতরণ, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম-সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বামনানন্দ। স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথিতেও অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়। জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে ১২ জানুয়ারি বিভিন্ন সংস্থার ৩৩৫ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে এক যুবশিবির, ১৩ জানুয়ারি নানা প্রতি-যোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং ১৪ জানুয়ারি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। যুবশিবিরে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বামনানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী পূর্ণানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন ব্রহ্মচারী হরিপদচৈতন্য ও যুবপ্রতিনিধিগণ। ১৪ জানুয়ারি বিকালে পিয়ারলেস সংস্থার ডিরেক্টর এস. কে. রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় যুবশিবিরে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের প্রত্যেককে মানপত্র ও স্বামী বিবেকানন্দ-বিষয়ক বই উপহার দেওয়া হয়। যুবদিবসের অঙ্গ হিসাবে ১৯ জানুয়ারি এক প্রদর্শনী-মূলক ভলিবল প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

ভুবনেশ্বর আশ্রম গত ২৫—২৯ ডিসেম্বর '৯০ উড়িষ্যার ঢেনকানলে দশম জাতীয় সংহতি শিবির পরিচালনা করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ২০০ যুবপ্রতিনিধি এই শিবিরে যোগদান করেছিল।

কালাডি আশ্রম গত ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 'মলয়ালম মনোরমা' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক কে. এম. ম্যাথু। প্রধান অতিথি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল প্রার্থনা, ধ্যান, প্রশ্নোত্তর সভা, যোগব্যায়াম-প্রদর্শন ও জাতীয় সংহতির ওপর চলচ্চিত্র-প্রদর্শন। ১৬২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিল।

রাঁচি মোরাবাদী আশ্রম গত ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর এক যুবসম্মেনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে ৪১২ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল।

গত ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর **অরুণাচল প্রদেশে** রাজ্যস্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় **নরোত্তম-নগর আশ্রমে**। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ওয়াংফা লোয়াং। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং, শোমসাম ঙেমু, ওয়াংফা লোয়াং, টি. এল. রাজকুমার প্রমুখ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১৮ জানুয়ারি **মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোমের** কর্মীভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ। গত ২১ জানুয়ারি তিনি মাইলাপুরকার্নানীতে রন্ধনবিভাগ, কর্মীভবন, শয়নগৃহের ত্রিতল ও প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন করেন।

জাতীয় যুবদিবস

বেলুড় মঠে গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে জাতীয় যুবদিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। স্কুল-কলেজের প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, আবৃত্তি, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রভৃতি।

গদাধর আশ্রম (ভবানীপুর, কলকাতা) গত ১২ জানুয়ারি সকালে জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল। ভবানীপুর এলাকার ২০টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, ৮টি ক্লাব সহ ২ হাজারেরও বেশি মানুষ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। ব্যানার, ফেস্টুন, ট্যাবলো সহ সুসজ্জিত শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে হরিশ মুখার্জী পার্কে সমবেত হয়। সমাবেশে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সবিতাব্রত দত্ত। স্বাগত ভাষণ দেন অঞ্জন মণ্ডল এবং স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বক্তব্য রাখেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সমবেত সকলকে টিফিন-প্যাকেট দেওয়া হয়।

মালদা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মালদা শহর পরিক্রমা করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ প্রায় ৩ হাজার মানুষ শোভাযাত্রায় যোগদান করে। শোভাযাত্রার পর সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীতালেখ্য, শ্রুতিনাটক, নাটিকা অভিনয়, বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মালদা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য।

চিঙ্গেলপত্তু (তামিলনাড়ু) আশ্রমে জাতীয় যুবদিবসের অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০০ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল।

কালাডি আশ্রম (কেরালা) গত ১২ জানুয়ারি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, ছাত্র সমাবেশ, জনসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করেছে।

মাদ্রাজ মঠ জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে গত ১৯ জানুয়ারি এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। স্কুল-কলেজের ৭০০ জন ছাত্রছাত্রী এই সমাবেশে যোগদান করেছিল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ ঐ সমাবেশে আশীর্বাদসূচক ভাষণ দেন। প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা, ক্যুইজ, ভক্তিগীতি, হরিকথা প্রভৃতিও অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দিল্লী আশ্রম গত ১২ জানুয়ারি এক জনসভার মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করে। ৭০২ জন যুবক-যুবতী এবং কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন লোকসভার উপাধ্যক্ষ শিবরাজ ভি. পাতিল।

তাছাড়া নিম্নলিখিত আশ্রমসমূহেও **জাতীয় যুবদিবস** সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে ঃ

বারাসত, বেলঘরিয়া, কামারপুকুর, কান্তিপুরম, পুরী (মিশন), পুরুলিয়া, রায়পুর, রাঁচি (মোরাবাদী), রাজকোট ও শিকড়া-কুলীনগ্রাম।

উদ্বোধন

গত ৭ জানুয়ারি **বেলুড় মঠে** রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্মিত প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

চক্ষুশিবির

আগরতলা আশ্রম গত ২৫ ডিসেম্বর '৯০ থেকে ১ জানুয়ারি '৯১ পর্যন্ত বিনামূল্যে চক্ষুশিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে ৮২ জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার এবং ১২৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

ত্রাণ

উড়িষ্যা বন্যাত্রাণ ঃ গঞ্জাম জেলার ধারাকোতে এবং সোরদা ব্লকের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫টি গ্রামের ১০৭২টি পরিবারকে ১৬১০টি ধুতি, ১৭২৮টি

শাড়ি, ১৭০২ সেট শিশুদের পোশাক, ১৬৫ সেট এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র (প্রতি সেটে ৭টি বাসন) পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর চিকিৎসাত্রাণ ঃ গত ১০ থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগরে মকরসংক্রান্তি মেলায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা ও মনসাদ্বীপ আশ্রমের সহযোগিতায় চিকিৎসা-শিবির খোলা হয়েছিল।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার রাপলে মণ্ডলের লক্ষ্মীপুরম, চন্দ্রমৌলিপুরম এবং মুক্তেশ্বর গ্রামে গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে। বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামঞ্চিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম এবং ধর্মভরম গ্রামেও ৯৭টি বাড়ির নির্মাণকাজ চলছে।

গুজরাটের ভাবনগর জেলার গড়িয়াধর তালুকের ভামারিয়া গ্রামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২৮টি পাকা বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মন্দির উৎসর্গ

বিশাখাপত্তনম আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের নবনির্মিত মন্দির উৎসর্গ-উৎসব উপলক্ষে গত ২৯—৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৩০ জানুয়ারি বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের উপস্থিতিতে মন্দির উৎসর্গ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ সভায় আশীর্বাদসূচক ভাষণ দেন। সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী এই উৎসবের একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ধন্যবাদসূচক ভাষণ দেন বিশাখাপত্তনম পৌরসভার মেয়র। ৩১ জানুয়ারি সকালে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। অপরাহ্ণে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশাখাপত্তনম পোর্টট্রাস্টের চেয়ারম্যান পি. ভি. আর. কে. প্রসাদ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্য রাজস্ব সচিব কে. এস. আর. মূর্তি। উৎসবের তিনদিনই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ২০০ জন সাধু-ব্রহ্মচারী ও বহু ভক্ত এই অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করেন।

উৎসব

রামকৃষ্ণ মিশন, বরানগর গত ৭—১২ জানুয়ারি বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। ৭ জানুয়ারি স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথিতে বিশেষ পূজা, হোম, ভজনাদি ও পাঁচ সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বক্তা ছিলেন স্বামী অমলানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। ৯ জানুয়ারি আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, ১০ ও ১১ জানুয়ারি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করেন স্বামী গহনানন্দজী। প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা দেবব্রত ঘোষ। যুবদিবসের দিন ছাত্রছাত্রী সহ দুই সহস্রাধিক লোকের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় অংশ-গ্রহণকারী প্রত্যেককে টিফিনের প্যাকেট ও 'স্বামীজীর আহ্বান' পুস্তক দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় প্রাক্তন ছাত্রদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

গত ডিসেম্বর মাসে **পুরী রামকৃষ্ণ মঠের** পরিচালনায় অনুষ্ঠিত চক্ষুশিবিরে যে ৬৫ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, গত ১৭ জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে তাদের চশমা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে ৭০ জন দুঃস্থ বালক-বালিকাকে উলের সোয়েটার এবং প্লুতাকোটা নুলিয়াপাড়া সারদা সংঘকে এক হাজার টাকার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বই দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বইয়ের মূল্য দিয়েছেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এই অনুষ্ঠানে চক্ষুশিবিরে স্বেচ্ছাসেবকদের সার্টি-ফিকেটও দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরী মিউনিসিপ্যালিটির একজিকিউটিভ অফিসার এফ. চাঁদ, প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী শ্রীধরানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী দীনেশানন্দ।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো ঃ গত ৭ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা,

ভক্তিগীতি, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। গত ১৮ জানুয়ারি অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়। তাছাড়া জানুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি মাণ্ডুক্য উপনিষদের ওপর একটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং ৩১ জানুয়ারি 'মাইন্ড এ্যান্ড ইটস কন্ট্রোল' বিষয়ে একটি বিশেষ ভাষণ দেন দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির প্রধান স্বামী স্বাহানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন : জানুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে বেলা ১১টায় বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং মঙ্গলবারগুলিতে 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ৪ জানুয়ারি এবং ১৮ জানুয়ারি যথাক্রমে বালক-বালিকাদের জন্য ও বয়স্কদের জন্য দুটি বিতর্কের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া ৭ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি, বস্টন : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার বস্টনের বেদান্ত সোসাইটিতে বেলা ১১টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজা করেছেন স্বামী সর্বগতানন্দ এবং সংস্কৃতে স্তোত্রাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি থেকে কিছু অংশ পাঠ করেছেন স্বামী সর্বাত্মানন্দ। প্রায় দেড় শতাধিক ভক্ত উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। পূজা শেষে সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন ও আশ্রমে বসে প্রসাদ পেয়েছেন। পরদিন রবিবারে বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'The Message of Sri Ramakrishna'। বস্টনে সকাল ১১টায় এবং প্রভিডেন্সে বিকাল ৫টায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন স্বামী সর্বগতানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী শরণানন্দ (সন্তোষ) গত ২৫ জানুয়ারি '৯১ লখনৌ সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি হৃদ্‌যন্ত্র ও কিডনির রোগে ভুগছিলেন। গত ২৪ জানুয়ারি বিকালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যথাসাধ্য চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। অবশেষে তিনি রাত ২-৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী শরণানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তিনি ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে সারগাছি আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়াও তিনি কনখল সেবাশ্রমের কর্মী হিসাবে কাজ করার পর বেলুড় মঠে আসেন এবং মঠের ডিসপেনসারিতে দীর্ঘ কয়েক দশক কাজ করেন। এজন্য তিনি ডাক্তার মহারাজ বলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি লখনৌ সেবাশ্রমে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিরভিমানতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম আবির্ভাব-তিথি বিশেষ পূজা, হোম, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। গত ১৮ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, ২০ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী এবং ৩০ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ, স্বামী সত্যব্রতানন্দ ও স্বামী সনকানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর ধর্মালোচনা যথারীতি চলছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি গত ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর '৯০ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে পালন করে। উৎসবে প্রথম দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, বক্তব্য রাখেন যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী প্রভানন্দ ও নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। এদিন ৩ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে এবং ৩০০ জন ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয় এবং সমিতি পরিচালিত ফ্রি কোচিং ক্লাসের ছাত্রদের পোশাক এবং শিক্ষকদের সেবার স্বীকৃতি-স্বরূপ উপহার দেওয়া হয়।

ভাজড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘে, (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) গত ১ জানুয়ারি সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে ত্রয়োদশ বার্ষিক কল্পতরু উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। পূজা, পাঠ, নগরপরিক্রমা, ভক্তিগীতি, লীলাকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানসূচীর প্রধান অঙ্গ। সারাদিন উৎসবে প্রায় ২০ হাজার ভক্ত সমাগম হয়। সকলকেই বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ। বক্তা ছিলেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালক শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, স্বামী বলভদ্রানন্দ এবং স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নবব্যারাকপুর (**উত্তর ২৪ পরগনা**) গত ২১-২৭ ডিসেম্বর '৯০ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসবের তিনদিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে আলোচনা করেন স্বামী বন্দনানন্দজী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী শিবময়ানন্দ, প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা প্রমুখ। ২৬ তারিখের যুবসম্মেলনে ২০০ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী শিবময়ানন্দ, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী এবং দেবাশিস পাল। উৎসব উপলক্ষে ৭২ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে কাপড় ও কম্বল দেওয়া হয়। ২৬ ও ২৭ তারিখ সন্ধ্যার পর গীতিনাট্য পরিবেশন করেন হাওড়ার 'প্রফুল্লতীর্থ' এবং 'শিল্পীতীর্থ'-এর সদস্যাবৃন্দ।

গত ১২ জানুয়ারি **লেকটাউন এ্যাসোসিয়েশন** (**কলকাতা** '৮৯)-এর উদ্যোগে লেকটাউনে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষমূর্তির পাদদেশে স্বামীজীর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ৮টায় সদস্যগণের সমাবেশ, মূর্তিতে মাল্যদান, ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন, বক্তৃতা, রচনাবলী থেকে পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

কল্যাণী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘের যুবশাখার ব্যবস্থাপনায় স্বামী বিবেকানন্দের ১২৮তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে গত ২৪ নভেম্বর '৯০ চরসরাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে, ৯ ডিসেম্বর কাঠালতলা গ্রামে এবং ৩০ ডিসেম্বর ও ১২ জানুয়ারি '৯১ কল্যাণীস্থ সেবাসংঘে নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দ, স্বামী স্নেহময়ানন্দ, স্বামী পরিমুক্তানন্দ, স্বামী ব্রজেশানন্দ ও স্বামী সর্বগানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (**বোকারো ইস্পাত নগরী, বিহার**) গত ১৯ নভেম্বর '৯০ এই সঙ্ঘের পূজাকক্ষ-সমন্বিত সাধুনিবাসের উৎসর্গ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসর্গ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী

মহারাজ। ঐদিন সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ সহ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বহু ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। তারপর পূজা, হোম ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। স্বামী স্মরণানন্দ, বোকারো ইস্পাত নিগমের প্রবন্ধ নির্দেশক এস. আর. নায়ার, সঙ্ঘ-সম্পাদক এস. কে. নিয়োগী, কেয়া মুখার্জী প্রমুখ। এই উৎসব উপলক্ষে সঙ্ঘ-পরিচালিত বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়। বিতরণ করেন স্বামী স্মরণানন্দ।

গত ১৮ নভেম্বর '৯০ **সাহাপুর বিবেকানন্দ, সেবা সঙ্ঘের (বর্ধমান)** পরিচালনাধীন বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতনের নতুন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বারোদ্ঘাটন করেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি মহবুব জাহেদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সনাতনানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সিংহরায় প্রমুখ। গত ১২ জানুয়ারি '৯১ উক্ত বিদ্যালয়ে স্বামীজীর জন্মদিবস পালন করা হয়। এ-উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ ও শিশুদের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

গত ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর '৯০ **কল্যাণপুর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** (ত্রিপুরা) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অর্ধবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন আশ্রমের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। স্বামী শান্তিদানন্দ এবং স্বামী শিবময়ানন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে উক্ত দুই দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনের মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী শান্তিদানন্দ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী শিবময়ানন্দ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ভাবপ্রচার পরিষদের সম্পাদক সুধীর সাহা, সুশান্তকুমার চৌধুরী এবং কুলেশপ্রসাদ চক্রবর্তী। গত ৮ ডিসেম্বর এই আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে।

গত ৬ জানুয়ারি '৯১ স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে কলকাতার **টালিগঞ্জবাসীদের** উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সকাল ৭টায় গল্ফ ক্লাব রোড পল্লী থেকে শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। স্বামীজীর বাণী-সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও স্বামীজীর বাণী পাঠ করতে করতে শোভাযাত্রাটি টালিগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। বাগবাজার, রামকৃষ্ণ মঠ (উদ্বোধন)-এর অধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দ, উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভবেশ্বরানন্দ এবং আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই শোভাযাত্রা টালিগঞ্জবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **দেবীপ্রসাদ দাস** গত ২ অক্টোবর '৯০ তাঁর গুয়াহাটিস্থ নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। যৌবনেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের তিনি সঙ্গ করেছেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকার। তাঁর সংস্পর্শে অনেকে রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বেলুড় মঠের বহু সাধু-সন্ন্যাসী তাঁর গৃহে পদার্পণ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন পরাধীন ভারতের আই. জি. এন. স্টীমার কোম্পানির সাব-এজেন্ট। সিলেট, সুনামগঞ্জ ও গুয়াহাটি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের (খোকা মহারাজ) মন্ত্রশিষ্য **রমেশচন্দ্র ঘোষ** গত ২৮ নভেম্বর '৯০ দক্ষিণ কলকাতার নাকতলাস্থ নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি তাঁর পিতা যোগেশচন্দ্র ঘোষের (শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য) জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি আয়কর-সংক্রান্ত আইনজীবী ছিলেন। তাঁদের ঢাকার বাড়িতে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ পদার্পণ করেছেন।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

টিকটিকিজাতীয় প্রাণীর লাঙ্গুলবর্জন

একেবারে বাধ্য না হলে শরীরের কোন অংশকে কেউ বর্জন করে না। কিন্তু টিকটিকিজাতীয় সরীসৃপকে (lizard) শিকারীজন্তুর (predator) সম্মুখীন হয়ে জীবন-মরণের সমস্যা মেটাতে অনেক সময় তাদের লেজকে বিসর্জন দিতে হয়। এইসব সরীসৃপ ছাড়া অন্য জন্তুদেরও মাঝে মাঝে শরীরাংশকে ফেলে দিতে দেখা যায়; কয়েক রকমের কাঁকড়া এবং পোকা তাদের হাত বা পা ফেলে দেয়। এই রকম স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গচ্ছেদকে 'অটোটমি' (autotomy) বা আত্মচ্ছেদন বলে।

যারা টিকটিকি বা গিরগিটি ধরার কাজ করে, তাদের হাতে অনেক সময় লেজের অংশ থেকে যায়। এথেকে বোঝা যায় যে, আত্মচ্ছেদন এদের কাছে কত ফলপ্রসূ উপায়। আত্মচ্ছেদন শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার বড় উপায়। শিকারী পাখি, মাংসাশী প্রাণী বা সাপের পেটে অনেক সময় কেবল লেজের অংশ পাওয়া যায়। সত্তরদশকে আরিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় লেজ সমেত ৩০টি গিকো-(gecko) জাতীয় টিকটিকিকে কয়েকটি নিশাচর সাপের সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল; সাপগুলি এদের ১৯টিকে ধরেছিল, বাকি ১১টি লেজ বিসর্জন দিয়ে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু যখন সেই ১১টি লেজবিহীন গিকোকে আবার ছাড়া হয়, তখন তাদের সবগুলিই সাপের পেটে গিয়েছিল।

লেজ বিসর্জন দেওয়ার দুটি সুবিধা: (ক) লেজের দিকে আক্রান্ত হলে লেজটি ফেলে দিয়ে নিজে রক্ষা পেতে পারে, (খ) লেজ ফেলে দিলে শিকারী জন্তু তাকে ছেড়ে লেজের ওপর আকৃষ্ট হতে পারে; শিকারী জন্তু অনিশ্চিত পলায়মান টিকটিকির চেয়ে হাতে-পাওয়া লেজ খেতে পেয়ে খুশিই হয়। আর খাদ্য হিসাবে লেজ বিছু খারাপ নয়। টিকটিকিজাতীয় সরীসৃপের লেজ খসানো ব্যাপারটি বেশ খানিকটা জটিল। লেজের ভিতর যে শিরদাঁড়ার অংশ আছে, সেটির প্রথম একটু অংশ ছাড়া তাতে আড়াআড়িভাবে ভাঙবার জন্য বিভাগ করা আছে, যা সহজেই দেখা যায়। সেই বিভাজ্য জায়গাগুলির ওপরে মাংসপেশী, চর্বি ও ত্বকের অংশও খানিকটা দুর্বল, যাতে লেজ সেই অংশগুলিতে সহজেই খসে যেতে পারে। যখন শত্রু লেজে ধরে, তখন লেজের মাংসপেশীর সঙ্কোচন হয়, যার ফলে আক্রান্ত অংশের ঠিক আগের বিভাজ্য জায়গায় লেজের শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। খসে যাওয়া লেজের অংশ প্রায় পাঁচমিনিট ধরে খুব জোরে নড়াচড়া করে, যার ফল শত্রুর নজর টিকটিকিকে ছেড়ে এইদিকে পড়ে এবং টিকটিকি পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়। কোন কোন টিকটিকির লেজের মাংসপেশীর কর্মক্ষমতা বিনা অক্সিজেনে (anaerobically) বজায় থাকে, যার ফলে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও লেজ এতক্ষণ নড়'চড়া করতে পারে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লেজ আবার পূর্বের মতো গজিয়ে ওঠে। তবে ওপর ওপর দেখতে আগের মতো হলেও পুনর্গঠিত লেজ শিরদাঁড়ার হাড় দিয়ে গঠিত হয় না, কার্টিলেজ (cartilage) বা তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি হয়। নবগঠিত অংশ আর খসানো যায় না; প্রয়োজন হলে নবগঠিত অংশের ঠিক আগের অংশ খসে যায়।

যদিও টিকটিকিজাতীয় সরীসৃপের লেজ খসানো সাধারণ নিয়ম, তবে তারও ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন প্রজাতির টিকটিকিরা লেজ খসাতে পারে না; কারও লেজ খসে গেলে তা আর পুনর্গঠিত হয় না। লেজ খসাবার ক্ষমতা থাকা বা না থাকা, তার ক্রমবিকাশের (evolution) হিসাবে হয় না। দেখা গেছে, একই জীব ক্রমবিকাশের হিসাবে লেজ খসানোর ক্ষমতা হারিয়েছে অনেকবার—এমনকি আটবার

পর্যন্ত। এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার এমন সুন্দর উপায় (অর্থাৎ লেজ খসানোর ক্ষমতা) কেন চলে যায়। একটা কারণ হচ্ছে যে, লেজ সেই জন্তুর অনেক উপকারে আসে; সেটি হারালে তাকে খেসারত দিতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লেজ টিকটিকির চলাফেরার কাজে লাগে। সামনে এগিয়ে যাবার জন্য পিছনের পা দুটি বেশি দরকারী এবং এই ব্যাপারে লেজ মাথা ও শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে, বিশেষতঃ নরম মাটিতে—যেখানে পা ভাল করে মাটি ধরতে পারে না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সমগ্র বা আংশিক লেজ হারানোর পরে টিকটিকির গতি কমে যায় এবং সে তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে পড়ে। গাছের ডালে বা চারা-গাছে উঠবার সময় লেজ দিয়ে সে গাছকে জড়িয়ে ধরে। জলচর টিকটিকিদের লেজ সাঁতারে সাহায্য করে। সমস্ত শরীরে যত চর্বি থাকে তার অর্ধেকের বেশি থাকে লেজে। এর আংশিক হানিও খাদ্যাভাবের সময় ক্ষতিকর; শীতের দেশে জড় অবস্থায় থাকা (hibernation) কালে, যখন তারা চুপচাপ এক জায়গায় বহুদিন অবস্থান করে, লেজের চর্বি না পেলে তারা মারা যেতে পারে। চর্বির অভাবে স্ত্রী-টিকটিকির ডিমের সংখ্যা কমে যায়। এক রকমের টিকটিকি (side-bloched lizard) আছে যাদের লেজ হারানোর অর্থ হচ্ছে সামাজিক মানহানি; আরব দেশে এক ধরনের টিকটিকি (Arabian semaphore geckos) আছে যারা লেজের মাধ্যমে সংকেত প্রেরণ করে, লেজ না থাকলে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে না। শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে কোন কোন প্রজাতির লেজ চাবুকের কাজ করে। কারও কারও লেজে খুব কাঁটা থাকে। অস্ট্রেলিয়ায় এক ধরনের টিকটিকির লেজ থেকে বিষাক্ত তরল বস্তু নির্গত হয়।

বিভিন্ন প্রজাতির টিকটিকির লেজের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন। মোটামুটিভাবে, যাদের লেজ খুব প্রয়োজনীয়, তাদের লেজ খসাবার ক্ষমতা নেই; যাদের খুব প্রয়োজনীয় নয়, তাদের এই ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে থাকে। তবে এই রকম মত প্রকাশ করা সব সময় চলে না। বহুরূপী টিকটিকিদের (chameleon) সব প্রজাতিই লেজ খসাতে পারে না। হয়তো বহুযুগ আগে তাদের এই ক্ষমতা চলে গেছে। প্রাণে মরার চেয়ে লেজ হারানো যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই, তবে সবসময় লেজ হারিয়ে তত উপকার হয় না। বড় জাতীয় সরীসৃপ দাঁত বা থাবা দিয়ে লড়াই করতে পারে বলে তাদের লেজ খসাবার ক্ষমতা দরকার হয় না। যেসব জায়গায় টিকটিকিদের কম সংখ্যক শত্রুর সম্মুখীন হতে হয় তাদেরও এই ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। আবার কোন কোন জাতীয় টিকটিকির আত্মচ্ছেদন ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাদের লেজ খেতে খুব বিশ্রী বলে শত্রু তাদের তাড়া করে না। আবার খুব মন্থরগামী টিকটিকির এই ক্ষমতা নেই, কারণ তারা ধীরগামী বলে এই ক্ষমতা থাকলেও লেজ খসিয়ে তাদের কোন লাভ হয় না।

লেজ খসানোর ব্যাপারে স্নায়ু শিরার (nerve) খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আছে, কারণ সংজ্ঞাহীন টিকটিকির লেজ খসানো সহজ ব্যাপার নয়। বুনো টিকটিকির চেয়ে পোষা টিকটিকি লেজ খসায় কম। টিকটিকির মূল দেহে আক্রমণ করলে তারা লেজ খসায় না, কারণ তাতে লাভ কি? কেউ কেউ আবার শত্রুরা ভাল করে ধরবার আগে লেজ খসায় না। আমেরিকায় এক ধরনের টিকটিকি আছে, যারা শক্তি (energy) রক্ষার জন্য খসানো লেজটি খেয়ে ফেলে (যদি অবশ্য শত্রু ইতিমধ্যে লেজটিকে না খেয়ে থাকে।) কোন কোন টিকটিকির লেজ রঙিন হয় এবং তারা লেজ নাড়তে থাকে যাতে আক্রমণকারী শত্রুর নজর দেহ ছেড়ে লেজের ওপর পড়ে এবং এইভাবে তারা শত্রুকে লেজ ধরতে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচায়। বস্তুতঃ টিকটিকিজাতীয় সরীসৃপের লেজ খসানোর ব্যাপারটি বেশ জটিল।

[New Scientist, 3 February 1990, pp. 42—45]

সূচীপত্র

উদ্বোধন ৯৩তম বর্ষ বৈশাখ ১৩৯৮

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

আবির্ভাব-তিথি ও পূজাদির সূচী

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে)

বাঙলা ১৩৯৮ সন, ইংরেজী ১৯৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দ

১।	শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	৩ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	১৮ মে	১৯৯১
২।	শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	১৩ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	২৮ মে	”
৩।	গুরুপূর্ণিমা	আষাঢ় পূর্ণিমা	৯ শ্রাবণ	শুক্রবার	২৬ জুলাই	”
৪।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২২ শ্রাবণ	বৃহস্পতিবার	৮ আগস্ট	”
৫।	স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৮ ভাদ্র	রবিবার	২৫ আগস্ট	”
৬।	শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৫ ভাদ্র	রবিবার	১ সেপ্টেম্বর	”
৭।	স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২১ ভাদ্র	শনিবার	৭ সেপ্টেম্বর	”
৮।	স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১৫ আশ্বিন	বুধবার	২ অক্টোবর	”
৯।	স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২০ আশ্বিন	সোমবার	৭ অক্টোবর	”
১০।	স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৩ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	১৯ নভেম্বর	”
১১।	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৫ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার	২১ নভেম্বর	”
১২।	স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	২৯ অগ্রহায়ণ	রবিবার	১৫ ডিসেম্বর	”
১৩।	শ্রীযীশুখ্রীস্ট	—	৮ পৌষ	মঙ্গলবার	২৪ ডিসেম্বর	”
১৪।	শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১১ পৌষ	শুক্রবার	২৭ ডিসেম্বর	”
১৫।	স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১৫ পৌষ	মঙ্গলবার	৩১ ডিসেম্বর	”
১৬।	স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২৬ পৌষ	শনিবার	১১ জানুয়ারি	১৯৯২
১৭।	স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৫ মাঘ	রবিবার	১৯ জানুয়ারি	”
১৮।	শ্রীশ্রীস্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১২ মাঘ	রবিবার	২৬ জানুয়ারি	”
১৯।	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২২ মাঘ	বুধবার	৫ ফেব্রুয়ারি	”
২০।	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৫ মাঘ	শনিবার	৮ ফেব্রুয়ারি	”
২১।	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	৫ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	১৮ ফেব্রুয়ারি	”
২২।	শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২২ ফাল্গুন	শুক্রবার	৬ মার্চ	”
	(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২৪ ফাল্গুন	রবিবার	৮ মার্চ	”
২৩।	শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	৪ চৈত্র	বুধবার	১৮ মার্চ	”
২৪।	স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	৮ চৈত্র	রবিবার	২২ মার্চ	”
২৫।	শ্রীরামচন্দ্র	রামনবমী	২৮ চৈত্র	শনিবার	১১ এপ্রিল	”

১।	শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	২৭ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	১১ জুন	১৯৯১
২।	স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১২ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	২৭ জুন	”
৩।	শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২৮ আশ্বিন	মঙ্গলবার	১৫ অক্টোবর	”
৪।	শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১৯ কার্তিক	মঙ্গলবার	৫ নভেম্বর	”
৫।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৫ মাঘ	শনিবার	৮ ফেব্রুয়ারি	১৯৯২
৬।	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৮ ফাল্গুন	সোমবার	২ মার্চ	”
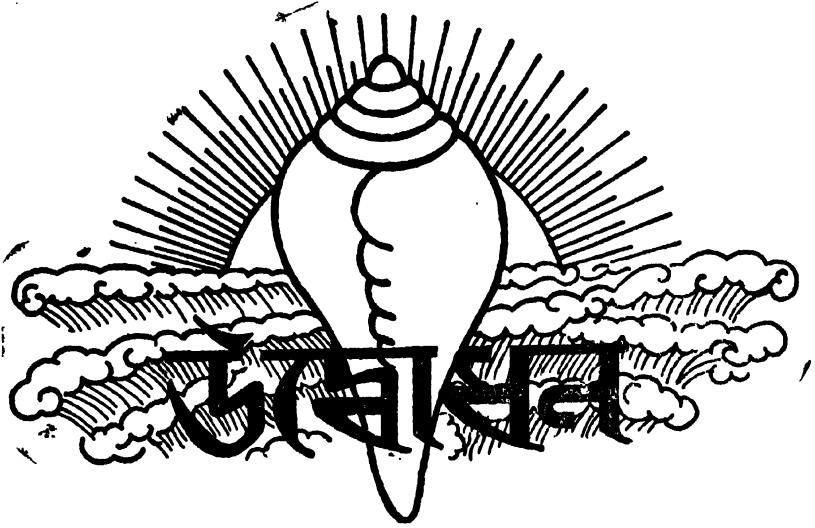
বৈশাখ, ১৩৯৮ এপ্রিল, ১৯৯১ ৯৩ তম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

দিব্য বাণী

আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। এতে বিশ্বাস স্থাপন কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন জন্মেছেন, সেদিন থেকেই সত্যযুগ এসেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

'রামকৃষ্ণ বিপ্লব'

'বিপ্লব' শব্দটির একটি চমক আছে। 'বিপ্লব' বলিলেই আমরা বুঝি অচলায়তনে আঘাত, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং প্রগতির প্রতিশ্রুতি। 'বিপ্লব' বলিলেই আমাদের মনে আসে সংঘর্ষ, হত্যা, রক্তপাত এবং ভাঙার ছবি। 'বিপ্লব' মানেই ওলট-পালট, 'বিপ্লব' মানেই চাঞ্চল্য। এহেন 'বিপ্লব' শব্দটি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন চমকাইয়া উঠিতেই হয়। 'রামকৃষ্ণ বিপ্লব' কথাটি শুনিয়া আমরাও তেমনই চমকাইয়া উঠিয়াছিলাম। কথাটি প্রথম শুনি ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম অগ্নিপুরুষ হেমচন্দ্র ঘোষের মুখে—রাসবিহারী ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('বাঘা যতীন') এবং সূর্য সেনের ('মাস্টার-দা') নামের সহিত বিপ্লবী মহলে যাঁহার নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। প্রথম যৌবনে স্বামীজীর বাণী ও প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য যাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথকে নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল, 'পথের দাবী'র বিপ্লবী নায়ক সব্যসাচীর কল্পনা যিনি শরৎচন্দ্রকে দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার জীবনের প্রান্তসীমায় (৯৫।৯৬ বৎসর বয়সে) এক সাক্ষাৎকারে পরম আবেগ ও প্রত্যয়ের সহিত বলিয়াছিলেন ঃ

"আমি বিপ্লবী। প্রাক্তন নই, আজীবন। আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে বিপ্লবের নেশা। সে-রক্ত স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শে সঞ্জীবিত। সুতরাং যতদিন এই দেহে সেই রক্ত বইবে ততদিন বিপ্লবের

নেশা আমার কাটবে না। আজও তাই যার মধ্যে বিপ্লবের গন্ধ পাই তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। এইভাবেই ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, কামাল পাশা, লেনিন, মার্কস, মাও সে তুঙ, সুভাষচন্দ্র—পৃথিবীর বিখ্যাত বিপ্লবীদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছি আমি। তাঁদের জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডীর জীবনী তো সেই কোন্ ছেলেবেলায় পড়েছি। আর এদেশের মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে তো খুব কাছে থেকেই দেখলাম। দেখলাম তাঁর আবির্ভাব এবং উত্থান। কিন্তু স্বামীজীর কাছে এঁরা সবাই শিশু। আর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বিপ্লবীর রাজা—বিপ্লবী-চূড়ামণি। এবং সেখানেও সারদাদেবী তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী।

"প্রশ্ন হবে—বিবেকানন্দের বিপ্লবী চরিত্র বোঝা যায়, কিন্তু রামকৃষ্ণ-সারদার মধ্যে আবার বিপ্লবের চিহ্ন কোথায়? আমার উত্তর—তাঁদের ঐ শান্ত সমাহিত নীরব জীবনের মধ্যেই রয়েছে অতি-বিপ্লবের বীজ। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ [যোদ্ধা-সন্ন্যাসীর বর্ম বিবেকানন্দের খোলসমাত্র, ধ্যানী-আচার্যের আসনই অর্থাৎ ধ্যান ও প্রজ্ঞার ভূমিই তাঁর প্রকৃত ক্ষেত্র।]—এই ত্রয়ী এক মহাবিপ্লবের প্রতীক। সারা পৃথিবীর চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এক বিরাট রেভলিউশন এনে দিয়েছেন এঁরা। এঁদের বিপ্লবে চাঞ্চল্য নেই, গতির চমক নেই। দু-একটা শতাব্দী হয়তো চলে যাবে এর বহিঃপ্রকাশ মানুষের চোখে ধরা পড়তে। কিন্তু এই বিপ্লব, যাকে 'রামকৃষ্ণ বিপ্লব' বলে আমি অভিহিত করতে চাই, তা থেমে নেই। নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে তার কাজ ঠিক চলেছে। মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়াই হলো এই বিপ্লবের প্রকৃতি। আগামীকালের মানুষ দেখতে পাবে যে, এই নীরব বিপ্লবের তরঙ্গ জগৎকে প্লাবিত করে দিয়েছে।" (স্বামী বিবেকানন্দ: মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে, ১৯৮৮, পৃঃ ৬৮-৬৯)

শ্রীরামকৃষ্ণ-সূচিত ভাবান্দোলনের মধ্যে যে বাস্তবিক 'অতি-বিপ্লবের' বীজ নিহিত তাহার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন অগ্নিযুগের মহানায়ক অরবিন্দ ঘোষও। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ২ মে আলিপুর বোমার ঘটনায় নেতৃত্বদানের অভিযোগে এক বিরাট পুলিস বাহিনী লইয়া পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রেগান সাহেব এবং ২৪ পরগনার ক্লার্ক সাহেব অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন তাঁহার ৪৮ নং গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে। বাড়ি অনুসন্ধান করিয়া আপত্তিকর কোন বস্তু পাওয়া গেল না। তবে অরবিন্দের শয্যায় বালিশের পাশে সযত্নে রাখা একটি কৌটা দেখিয়া পুলিস সাহেবদের গভীর সন্দেহ হইল। কৌটার মধ্যে মাটির মতো দেখিতে কিছু গুঁড়া পদার্থ ছিল। সাহেবরা ভাবিলেন উহা নিশ্চিতভাবেই বোমা তৈরির মশলা। আসলে উহা ছিল দক্ষিণেশ্বরের মাটি। অরবিন্দ স্বয়ং এ-সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ংকর তেজোবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না।" (কারাকাহিনী, ১৩২৮, পৃঃ ৫-৬) শোনা যায়, ক্লার্ক সাহেব অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন: "এই বস্তুটি কি?" অরবিন্দ নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেন: "দক্ষিণেশ্বরের মাটি।" ক্লার্ক সাহেব বোধকরি বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার সন্দেহ, অরবিন্দ সত্যগোপন করিতেছেন—উহা নিশ্চয়ই কোন "dangerous explosive material"—বিপজ্জনক বিস্ফোরক পদার্থ। অরবিন্দ তাই সাহেবকে বলিলেন: "আপনার সন্দেহ যথার্থ। উহা বাস্তবিকই tremendously explosive material—ভয়ংকর বিস্ফোরক পদার্থ। কারণ, পরমহংসদেবের পদ-পূত ঐ মৃত্তিকা হইতেই তো worldmover (জগৎ-আলোড়নকারী) বিবেকানন্দের উদ্ভব হইয়াছে।"

বাস্তবিক, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন এক মহাবিপ্লবের প্রতীক। এই আন্দোলন যেন একটি মহাসঙ্গীত। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সঙ্গীতের শুদ্ধ রাগ, শ্রীমা সারদাদেবী উহার স্বরলিপি এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ উহার পরিবেশিত রূপ। এবং সমস্তটুকু লইয়াই রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন। এই মহান ভাবান্দোলনকে কিভাবে জগতের কল্যাণে প্রায়োগিক রূপদান করিতে হইবে সেই উদ্দেশে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে [জাতীয় গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত

সহকারী গ্রন্থাগারিক নচিকেতা ভরদ্বাজ অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন, বাঙলা তারিখটি হইবে ১৩০৪ সালের (১৮১৯ শকাব্দ) ১৯ বৈশাখ শনিবার] স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান গৃহী-ভক্ত বলরাম বসুর বাসভবনে (যাহা বর্তমানে 'বলরাম মন্দির' নামে সুপরিচিত) শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দের এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। প্রারম্ভিক ভাষণে স্বামীজী সেদিন বলিয়াছিলেন: "আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি··· যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত···।" বলা বাহুল্য, 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে (১৩০৪ বঙ্গাব্দের ১৯ বৈশাখ) হইলেও মূল 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' কিন্তু উহার বহু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় কাশীপুরে অথবা দক্ষিণেশ্বরেই প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। ঠিক কবে উহার প্রতিষ্ঠা?—যে-মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাদেবীকে ভাবী সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অথবা জননী রূপে পূজা করিয়াছিলেন। উহাই ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যথার্থ জন্মক্ষণ। পরবর্তী সময়ে দক্ষিণেশ্বরে স্পর্শমাত্র নরেন্দ্রনাথের 'ব্রহ্ম-কুণ্ডলিনী'কে জাগ্রত করিয়া এবং কাশীপুরে মহাপ্রয়াণের প্রাক্-লগ্নে নরেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার অপর ত্যাগী সন্তানগণের ভার সমর্পণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তৎ-প্রবর্তিত সঙ্ঘ এবং ভাবান্দোলনকে নেতৃত্বদান করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকে যথাক্রমে উৎসর্গ ও চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। কাশীপুরে সেবাব্রতের মাধ্যমে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণকে একটি নিবিড় ভ্রাতৃত্ব ও সখ্যতা-সূত্রে বাঁধিয়া দিয়া ভাবী সঙ্ঘশক্তিকে তিনিই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা পূর্ববর্তী স্তরগুলিরই অনিবার্য ফলশ্রুতি মাত্র।

সে যাহাই হউক, প্রতিটি স্তরেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পরম আকূতিটি ক্রিয়াশীল থাকিয়াছে। তাহা হইল: "তোমাদের চৈতন্য হউক।" জগতের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের যে দুইটি প্রধান বাণী—"জীবই শিব" এবং "যত মত তত পথ" —তাহা নিঃসৃত হইয়াছে ঐ আকূতি হইতেই। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের, রামকৃষ্ণ বিপ্লবের, মূল ধ্বনিই হইল মানুষের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের জাগরণ, "মান হুঁশ" হওয়ার, ঈশ্বর হওয়ার আহ্বান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" এই 'ঈশ্বরলাভ' কথাটির অর্থ কি? শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভাইগণ বলিতেছেন: ঈশ্বরলাভের অর্থ ঈশ্বর হওয়া। রামকৃষ্ণবাদের শ্রুতি-প্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান এবং ন্যায়-প্রস্থানের সর্বাংশ জুড়িয়া ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ঐ মন্ত্র: "ঈশ্বর হও।"

প্রশ্ন হইবে ঈশ্বর হওয়ার অর্থ কি কোন বিশেষ দেবতা হওয়া অথবা 'ঈশ্বর' নামক অ-লৌকিক সত্তা বা রূপ গ্রহণ করা? 'রামকৃষ্ণ বিপ্লব'-এর মর্ম অনুসারে উহার অর্থ হইল: আমরা সকলেই দেখিতে মানুষ, কিন্তু অধিকাংশই আমরা মনুষ্যাকৃতি পশু। আমাদের আচার-আচরণে, কথা ও কর্মে তাহা আমরা প্রতি মুহূর্তেই প্রকট করিতেছি। অথচ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পশুভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেবভাবও নিহিত রহিয়াছে। 'রামকৃষ্ণ বিপ্লব' জগৎকে সেই বিজ্ঞান বা কৌশলের সন্ধান দিয়াছে যাহার সাহায্যে, যাহার প্রয়োগে মানুষের পশুত্ব নাশ হয়, মানুষ দেবতা হয়। স্বামীজী বলিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব হইল পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করা। দেবতার তুল্য মানুষের সেই বিকাশ যখন মানুষের মধ্যে সংঘটিত হয়, যেমন হইয়াছিল বুদ্ধের মধ্যে, খ্রীস্টের মধ্যে, চৈতন্যের মধ্যে, তখন আমরা বলি মানুষ ভগবান হইয়াছে, ঈশ্বর হইয়াছে। সে-মানুষ নরোত্তম—সে-মানুষ বিধাতার চাহিতেও বড়। রামকৃষ্ণ বিপ্লব হইল মানুষের 'মানুষ' হওয়ার প্রক্রিয়া, মানুষের 'ঈশ্বর' হওয়ার পদ্ধতি, ঈশ্বর হওয়ার সনদ। অন্য কথায়, উহা হইল জীবন ও মহা-জীবন, আকাশ ও পৃথিবী, লৌকিক ও লোকোত্তর, ভূমি ও ভূমাকে মিলাইবার নীরব আন্দোলন।

ইহাই যথার্থ বিপ্লব। চেতনার উন্মেষ, চেতনার ঊর্ধ্বায়নের মধ্যে নিহিত মানুষের বিবর্তন বা evolution-এর সকল রহস্য। বলা বাহুল্য, ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে, অন্য কোন মতবাদের মাধ্যমে, অন্য কোন শাসন-কৌশলের দ্বারা সেই বিবর্তন সম্ভব নহে। বিপ্লবের ইংরাজী প্রতি-শব্দ revolution, কিন্তু রামকৃষ্ণবাদ অনুসারে প্রকৃত

revolution হইল মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত মনুষ্যশক্তির (যাহার অপর নাম ঈশ্বরশক্তি) evolution বা প্রকাশ।

আজ সমগ্র জগতে রামকৃষ্ণবাদ প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা—সর্বত্র 'রামকৃষ্ণ বিপ্লব'-এর ধ্বজা উড়িতেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য-প্রশিষ্যমণ্ডলীর ভূমিকা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। উহা আপন শক্তিতেই সূর্যের কিরণের মতো, বাতাসের গতির মতো প্রসারিত। দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর অথবা বাগবাজারে যাহার অস্ফুট বা স্ফুট ধ্বনি শোনা গিয়াছিল তাহা ক্রমে বিশ্বপ্লাবী মহাসঙ্গীতের মহিমাও ঐশ্বর্য লইয়া দিকে দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। সমগ্র জগৎ আজ, অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভাষায়, 'রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যে' পরিণত হইতে চলিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে স্বামীজী 'সত্যযুগ'-এর ভাব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গুরুভাইদের তিনি বলিয়াছেন: "যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই সত্যযুগের আবির্ভাব। তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।" (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৭৫-৭৬) প্রশ্ন হইল, সত্যযুগ এবং উহার ভাবের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হইল, জড়ের উপর চৈতন্যের আধিপত্য স্থাপন। সহজ কথায়, আমরা ইতোপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, মানুষের অন্তরস্থ পাশবিক বা আসুরিক ভাবকে পদানত করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত দেবভাব বা ঈশ্বরভাবকে প্রস্ফুটিত করা। ঐ প্রস্ফুটিত করার জন্য যে সংগ্রাম বা প্রয়াস উহাই সত্যযুগের লক্ষণ। স্বামীজী বলিতেছেন: "মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal Kingdom (মানবেতর প্রাণি-জগৎ)-এ স্থূলদেহের সংরক্ষণে যে struggle পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানব-জীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব (গুণ) বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই সংগ্রাম চলছে।" (ঐ, ৯ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১২২) বুদ্ধ হইতে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত মানবের যে অভিযাত্রা তাহা ঐ মানসিক সংগ্রামেরই ইতিবৃত্ত। সেই অভিযাত্রা দেহের উপর মন অথবা আত্মার (spirit), বুদ্ধির উপর বোধির প্রভুত্বেরই কাহিনী। সত্যযুগ পৌরাণিক কল্পনা কিনা তাহা লইয়া বিচার চলিতে পারে, কিন্তু বিবেকানন্দের মতে, সত্যযুগ হইল একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য, সত্যযুগ আসলে মানুষের মনোজগতে বিবর্তনের একটি স্তর, মানববিকাশের একটি বিশেষ অবস্থা। যখনই বুদ্ধ অথবা খ্রীস্ট অথবা রামকৃষ্ণের তুল্য মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হন, তখনই পৃথিবীতে সত্যযুগের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে সেই যুগচক্রের পুনরাবর্তন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে 'সত্যযুগ'-এর অস্তিত্ব মানুষের অন্তরেই। মাতৃগর্ভে যে-শিশু ভ্রূণের আকারে থাকে, সেই ভ্রূণই তো একদিন অভিব্যক্ত হয় পূর্ণাঙ্গ মানবরূপে। বুদ্ধরূপে যাঁহার বিকাশ দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে, তাঁহার আদিরূপ তো ঐ ভ্রূণই। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের চরম সম্ভাবনা মানুষের সহজাত। স্বামীজী বলিতেছেন: "বুদ্ধ যদি ক্রমবিকশিত (evolved) জীবাণু হন, তবে ঐ জীবাণুও নিশ্চয়ই ক্রমসঙ্কুচিত (involved) বুদ্ধ।" (ঐ, ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩১২) বলিতেছেন: "যে ক্ষুদ্র জীবাণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, প্রকৃতপক্ষে তাহা সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকশিত হয়।" (ঐ, ২য় খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১১৪)

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অনুসারে বিপ্লব বা revolution-এর অপর নাম যেমন ক্রমবিকাশ বা evolution, তেমনই involution বা ক্রমসঙ্কোচও। দেহের ক্ষেত্রে বিবর্তনের প্রবক্তা পূর্বতন জীববিজ্ঞানী ডারউইনের সঙ্গে এইখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তার দূরত্ব যেমন প্রকট, মনোজগতে বিবর্তনের প্রবক্তা আধুনিক জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলীর মতবাদের নৈকট্যও তেমনই সুস্পষ্ট। অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার পথে মানুষের এই যে যাত্রা, ইহাকে পরিপুষ্ট করে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। উহার প্রেরণায় মানুষ ক্রমশঃ উন্নততর হইয়া পরিশেষে পূর্ণত্ব লাভ করে, ভূমির জীব ভূমার শিখরকে স্পর্শ করে—মানুষ দেবতা হইয়া যায়। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিকেই বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক দম্পতি উইল ও এরিয়েল ডুর‍্যান্ট 'যথার্থ বিপ্লব' ('real revolution') বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে ইহাকেই 'রামকৃষ্ণ বিপ্লব' বলিয়া চিহ্নিত করা হইতেছে। ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত জুড়িয়া শুধু মানুষের জয়গান, মানুষের সম্ভাবনার উদ্ঘোষণ। এবং ইহাতে প্রকৃতপক্ষে প্রতিধ্বনিত বেদান্তেরই দুন্দুভিধ্বনি।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

কালস্রোতে হিঁচড়ে গড়িয়ে ভেসে চলেছে বড়-মাঝারি-ছোট ঘটনার শিলাখন্ড। বড় শিলাখন্ড একস্থানে কিছুকাল অনড় হয়ে থাকে, বৃহৎ খন্ডের আড়ালে আটকে থাকে মাঝারি ও ছোট খন্ড ; আটকে পড়া এ-সকল ঘটনা-খন্ডকে অবলোকন করে আমরা ইতিবৃত্ত রচনায় উদ্যোগী হই। প্রায় নব্বই বছর আগেকার কিছু ঘটনাপুঞ্জ—তদানীন্তন ব্যারাকপুর মৌজার অন্তর্গত বেলুড় গ্রামের একাংশে সংঘটিত ঘটনাবলী আমরা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করব, উদ্দেশ্য—রামকৃষ্ণ মঠের বিকাশের ইতিহাসের একটি স্বল্পজ্ঞাত অধ্যায়ের অনুসন্ধান।

বেলুড় গ্রামে রামকৃষ্ণ মঠ নিজস্ব জমিতে সংস্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি। পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে সুস্পষ্ট চারটি পর্যায়। প্রথম পর্যায় কাশীপুরের বাগানবাড়িতে মঠ। স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত, সেটিই প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ। এই পর্যায়ে বাছাইকরা কয়েকজন ত্যাগী যুবকের গোষ্ঠীমানসে সঙ্ঘের বীজ বপন করেছিলেন সুদক্ষ সংগঠক শ্রীরামকৃষ্ণ। এর সঞ্চালক হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই নির্বাচিত যুবকগণ সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে বরাহনগরে একটি পোড়ো বাড়িতে সমবেত হয়েছিলেন। আত্মশুদ্ধি ও ভবিষ্যতে সঙ্ঘের কর্মের প্রস্তুতির জন্য ত্যাগী যুবকগণ তপস্যার বহ্নিতে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন। নেতা নরেন্দ্রনাথ এই তপস্যা তো করেছিলেনই, উপরন্তু পরিব্রজ্যার মাধ্যমে বৃহৎ ভারতীয় সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচয়লাভ করেছিলেন। বিদেশে ভারতগৌরব বেদান্তের প্রচার ও স্বদেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানের উপায় অনুসন্ধানের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন মার্কিন মুলুকে। ইতিহাসের আলোকে ধর্ম বনাম সঙ্ঘবদ্ধতা সম্বন্ধে যে সংশয়-দ্বিধা তাঁর মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তা অনেকটা দূর হয়েছিল পাশ্চাত্যের সমাজে সঙ্ঘশক্তির কার্যকারিতা দেখে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কার্যকরভাবে ভাবপ্রচারের জন্য সংগঠনের কোন বিকল্প নেই। তিনি গুরুভাইদের লিখে পাঠালেন : "একটা Organised society চাই।" আবার লিখলেন : "Organisation চাই—কুঁড়েমি দূর করে দাও ; ছড়াও, ছড়াও ; আগুনের মতো সব জায়গায়।" অবশ্য তিনি পুরোপুরি পাশ্চাত্যের ঢোলে সঙ্ঘ গড়তে চাননি। তাঁর বিচারে সঙ্ঘসৌধ গড়ে উঠবে তিনটি ভাবাদর্শ-স্তম্ভের ওপর। সে তিনটি হচ্ছে purity, patience ও perseverence—পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়।

ইতোমধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ স্থানান্তরিত হয়েছিল আলমবাজারে। রামকৃষ্ণ মঠ বিকাশের ইতিহাসে এটি তৃতীয় অধ্যায়। নেতা বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে উপদেশ-নির্দেশ ও কিছু অর্থ পাঠিয়ে সন্ন্যাসি-মন্ডলীকে সুনির্দিষ্টভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্বদেশে ফিরে এই উদ্যোগকে দ্রুত কার্যকর করতে তিনি ব্যগ্র হন। মঠের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যতের ভূমিকা সুনিশ্চিত করবার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। এ-উদ্দেশ্য সাধনের পথে একটি মধ্যবর্তী ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে প্রায় এগার মাসের জন্য রামকৃষ্ণ মঠের অবস্থিতি। এটাই মঠ-বিকাশের ধারায় চতুর্থ পর্যায়—এই অংশই আমাদের বর্তমানে আলোচ্য। সংক্ষেপে এই পর্যায়টিকে বলা যেতে পারে পরবর্তী পরম পর্যায়ের প্রস্তুতি-পর্ব বা স্প্রিং-বোর্ড। এই সংক্ষিপ্তকালেই ভবিষ্যৎ মঠের গতি-প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ধারিত হয়েছিল। সে-কারণে এই কালের ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ণমাত্র নয়, এইকালে দ্রুত সংঘটিত ঘটনাবৈচিত্র্য নতুন নতুন আলোকপাত করেছে, যার সাহায্যে মঠের পরবর্তী

কালের বিকাশ, গতিপ্রকৃতি, সাফল্যের স্বরূপ স্পষ্টতরভাবে বুঝতে পারা যায়।

আলোচ্যকালের পরিধি ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ থেকে ২ জানুয়ারি ১৮৯৯। গঙ্গার ধারে ৪৮, লালাবাবু সায়র রোডে অবস্থিত নীলাম্বর মুখার্জীর বাগান-বাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠের অবস্থিতি ঘটেছিল। গঙ্গার পূর্বপারের আলমবাজার থেকে মঠ এখানে উঠিয়ে আনা হয়েছিল। এর পিছনে কয়েকটি কারণ অতি স্পষ্ট। আমেরিকাতে থাকতেই স্বামীজী নানা কারণে আলমবাজারের বাড়িটির পরিবর্তনের জন্য বলেছিলেন। মঠবাসিগণের চিঠিপত্র থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, ঐ স্থানটি খুবই অস্বাস্থ্যকর, সেখানে ম্যালেরিয়ার দাপট অত্যধিক। স্বামীজী এক গুরুভাইকে লিখেছেন: "ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ জল। দুটো-তিনটে ফিলটার কর না কেন?"[১] আবার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন: "তুমি লিখিয়াছ যে, তোমার অসুখ আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু তোমাকে প্রথম হইতে অতি সাবধান হইতে হইবে। পিত্তিপড়া বা অস্বাস্থ্যকর আহার বা পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করিলে পুনশ্চ রোগে ভুগিবার সম্ভাবনা এবং ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচা দুষ্কর। প্রথমতঃ একটা ছোটখাট বাগান বা বাটী ভাড়া লওয়া উচিত, ৩০।৪০ টাকার মধ্যে হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ খাবার এবং রান্নার জল যেন ফিলটার করা হয়।"[২] মুখ্যতঃ অর্থাভাব এবং পছন্দমতো বাড়ির সন্ধান না পাওয়াতে বাড়ি পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয়নি। অতঃপর একটি ঘটনা বাড়ি পরিবর্তন অনিবার্য করে তোলে। ঘটনাটি হচ্ছে, ১২ জুন ১৮৯৭ তারিখ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আলমবাজারের বাড়িটির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। এবিষয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৫ জুন ১৮৯৭ তারিখে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখেছিলেন: "এখানেও গত শনিবার ঠিক পাঁচটার পর অতি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। আমাদের সম্মুখের বাটীর বহির্দেশের উপরিভাগ একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আমাদের মঠের যদিও কোনও স্থান একেবারে পড়িয়া যায় নাই, কিন্তু অনেক স্থানই ফাটিয়া বিশেষ জখম হইয়া (বাড়িটিকে) একেবারে বাসের অনুপযুক্ত করিয়াছে। আমরা পরদিন হইতেই বাটীর সন্ধান করিতেছি, কিন্তু সুবিধামতো পাওয়া যাইতেছে না। এমন বাটী নাই যাহা গত ভূমিকম্পে কোন আঘাত পায় নাই।" স্বামী ব্রহ্মানন্দের ১৪ জুন ১৮৯৭ তারিখের চিঠিতেও বাড়ি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "এ-বাড়ি শীঘ্রই ছাড়িতে হইবে। এই কারণেও আমরা সকলে বিশেষ চিন্তিত আছি। এই ভূমিকম্পে কলিকাতা শহরের প্রায় সকল বাড়ির কিছু-না-কিছু ক্ষতি হইয়াছে।" মঠ স্থানান্তরের জন্য ভাড়াবাড়ির অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব জমি ও বাড়িতে মঠ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং তজ্জন্য উপযুক্ত ভূমিখণ্ড সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে চেষ্টা চলতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই জমি সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। লক্ষ্য রাখা হয়েছিল জমিটি যাতে গঙ্গার ধারে হয়। এ-প্রসঙ্গে নেতা স্বামী বিবেকানন্দের আকুতি স্মরণযোগ্য। তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে ২৬ মে ১৮৯০ তারিখে লিখেছেন: "ভগবান রামকৃষ্ণের শরীর নানা কারণে অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব।... ভগবান রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর থেকেই এই চিন্তা স্বামীজীর হৃদয়কে পুনঃপুনঃ উদ্বেলিত করেছে। গঙ্গাতীরে কোনও উপযুক্ত স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতাস্থি সমাহিত করা এবং তাঁর ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলীর বসবাসের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তিনি মাথায় বহন করে চলেছিলেন।[৩]

মঠ বেলুড় গ্রামের যে-জমিটির ওপর অবস্থিত সেটি কেনার সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৯৭-এর ডিসেম্বরের

১ পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৫৭ ২ ঐ, পৃঃ ৩০১

৩ ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বেলুড়ে নিজস্ব জমিতে 'আত্মারামের কৌটা' সংস্থাপন করে স্বামীজী বলেছিলেন: "বার বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল।"

মধ্যভাগে স্বামী প্রেমানন্দ হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)-কে একটি চিঠিতে লিখেন: "প্রিয়তম ভাই হরিপ্রসন্নবাবু,... আজ (স্বামীজীর) চিঠি আসিল। তিনি এখনও জয়পুরে আছেন। মঠের জায়গার বায়না হইবে হইবে হইয়াছে। ওপারের সেই জমি। আপনি এ-সময়ে থাকিলে মাপ প্রভৃতি অনেক কার্যে আসিবেন। এইজন্য অন্যকে তোষামোদ করিতে হইতেছে। আমাদের ইচ্ছা আপনি শীঘ্রই এখানে আইসেন।" ১০০১ টাকা দিয়ে জমির বায়না করা হয় ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। নির্বাচিত জমির নিকটে দক্ষিণদিকে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ি। সেই বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হয় মাসিক ৮৫ টাকায়।[৪] পূর্বেও এই বাড়ির একাংশ ভাড়া নেওয়া হয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহারের জন্য। স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠের জন্য সংগৃহীত জমির প্রস্তুতি এবং নতুন জমিতে মঠের বাড়ি নির্মাণের জন্য জমিখণ্ডের কাছাকাছি মঠবাসিদের থাকা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

বোধ করি বেলুড়ের জমি সংগ্রহের পশ্চাৎপটের কাহিনীর এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বেলুড়ের জমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-এর প্রথম দিকেই। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ মঠ-কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল না। ১৩ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে স্বামীজী আলমোড়া থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন: "কাশীপুরের কেষ্টগোপালের বাগানটা নিলে ভাল হয় না? ... যদি ১৫।১৬ হাজারের ভিতরে হয় তো তৎক্ষণাৎ কিনিবে।" তিনি চিঠির খামের ওপর লিখেছিলেন: "কাশীপুরে বিশেষ চেষ্টা দেখ।... বেলুড়ের জমি ছেড়ে দাও।" প্যানিহাটিতে গোবিন্দ চৌধুরীর বাগানবাড়িও দেখা হয়েছিল।[৫] কোন্নগরে একখণ্ড জমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আলমবাজার মঠ থেকে সাধুব্রহ্মচারিগণ ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ তারিখে কোন্নগরের জমি দেখতে যান।[৬] দক্ষিণেশ্বরেও একখণ্ড জমির জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের আরোপিত শর্তগুলি মঠ-কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি।[৭] ইতোমধ্যে বেলুড়ে জমির জন্য প্রয়োজনীয় ৩৯০০০ টাকা হেনরিয়েটা মুলার দান করতে রাজি হন। ছোট দুটো বাড়ি সমেত বাইশ বিঘা জমি কেনা হয় পাটনানিবাসী ভাগবৎ নারায়ণ সিং-এর কাছ থেকে। সেদিনটি ছিল ৪ মার্চ ১৮৯৮। এই জমির একাংশ ব্যবহৃত হতো নৌকা মেরামতের জন্য। অসমতল জমিখণ্ডকে সমতল করবার জন্য এবং বাসোপযোগী বাড়িঘর নির্মাণের তদ্বারকির জন্য নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে মঠ অস্থায়িভাবে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত খুবই বাস্তবোচিত হয়েছিল।

নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ির খোলামেলা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে স্বামী বিবেকানন্দ খুবই খুশি হয়েছিলেন। তিনি ১১ মার্চ ১৮৯৮ তারিখে ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেলকে সানন্দে লিখেছিলেন: "We have changed our Math from the old nasty house to a house on the bank of the Ganga. This is much more healthy and beautiful."[৮] নতুন স্থানে রামকৃষ্ণ মঠ অল্প সময়ের মধ্যে জমজমাট হয়ে উঠেছিল। মঠ-সংগঠনের ইতিহাসে শুরু হয়েছিল নতুন একটি অধ্যায়।

রামকৃষ্ণ মঠ সন্ন্যাসীদের মঠ। মঠমাত্রই তপস্যা-ভূমি। কাশীপুরের মঠ, বরাহনগরের মঠ, আলমবাজারের মঠ, নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ির মঠ —প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মঠের জীবনধারা তপস্যার দ্বারা পরিশ্রুত ও পরিপুষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "তপস্যা একটি মানসিক যন্ত্রবিশেষ, যার দ্বারা সব কিছু করা যায়।" সকল শাস্ত্রেই তপস্যার মাহাত্ম্য গাওয়া হয়েছে। শাস্ত্রকার বলেছেন, ত্রিভুবনে এমন কিছুই নেই, যা তপস্যার দ্বারা লভ্য নয়। আবার বিপরীতমুখে বলেছেন: "নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি"[৯]—তপস্যা না হলে যোগাসাধ্য সম্ভব নয়।

৪ প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা স্বামী অখণ্ডানন্দের ৩ জুলাই ১৮৯৮ তারিখের চিঠি।

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৯৬৯, পৃঃ ১৬৮

৬ আলমবাজার মঠের ডায়েরী

৭ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা স্বামী ব্রহ্মানন্দের ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ তারিখের চিঠি।

৮ The Life of Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, Vol. II, 6th Edn. p. 310

৯ পাতঞ্জল যোগসূত্র, সাধনপাদ, প্রথম সূত্র: ব্যাসভাষ্য।

তপস্যার বিকল্প কিছু নেই। স্থান কাল ও সাধকের প্রয়োজনভেদে তপস্যার বাহ্যরূপের পরিবর্তনাদি ঘটেছে বটে কিন্তু তপস্যার মূল লক্ষ্য যে মনুষ্য-চিত্তের অনাদিকালের বাসনা ও অবিদ্যার ক্ষয়, সেটি অপরিবর্তিত থেকেছে। এবং তপস্যার এই মূল ভাবাদর্শটি সকল কালে সকল পর্যায়ে মঠবাসিগণকে সঞ্জীবিত করেছে।

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য এবং তা লাভের উপায় নির্দেশ করে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে বলেছিলেন : "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন।"[১০] মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞানলাভ। এ-উদ্দেশ্যলাভের জন্য ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ দান ও কামনার নিবৃত্তিরূপ তপস্যা আশ্রয় করে থাকেন। আচার্য শঙ্করের মতে 'অনাশক' শব্দটির অর্থ কামনাসমূহের নিবৃত্তি এবং 'অনাশকেন' শব্দটি নিঃসন্দেহে 'তপসা' পদের বিশেষণ। অবশ্য আচার্য শঙ্করের মতে তপস্যা সন্ন্যাস আশ্রমের প্রস্তুতি-স্বরূপ। সন্ন্যাসীর ধর্ম তপঃ শব্দবাচ্য নয়। তপস্বী বলতে বানপ্রস্থীকে বুঝায়। শঙ্করাচার্য লিখেছেন : "ভিক্ষোঃ তু ধর্মঃ ইন্দ্রিয়-সংযমাদিলক্ষণঃ নৈব তপঃ শব্দেন অভিলপ্যতে।"[১১] তপস্যার চতুরাশ্রম ভিত্তিক এরূপ অধিকারী-নির্ণয় আদর্শস্থানীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরমপ্রাপ্তব্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত সাধক তপস্যা বর্জন করতে পারে না। আবার দেখি তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুর তপস্যাপ্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর লিখেছেন : "তপঃ বাহ্যান্তঃকরণসমাধানম্" অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই তপস্যা। স্মৃতিকারও বলেছেন : "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।" মানসসম্পদের বিকাশের জন্য মনের একাগ্রতাই মানুষের প্রধান হাতিয়ার। মনের একাগ্রতা সাধনই পরম তপস্যা। তাছাড়াও এরূপ তপস্যার দ্বারা সম্পৃক্ত জপ-ধ্যান, সেবা-পূজা সাধকের অগ্রগতি সুগম করে তোলে। তপস্যার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে। সেকারণে তপস্যার মহিমা অকৃপণভাবে খ্যাপন করেছে সকল শাস্ত্র।

রামকৃষ্ণ মঠের প্রথমদিকে তপস্যা সীমিত ছিল মঠবাসিগণের উপবাস, দ্বন্দ্বসহন, সংযম, সততা, সরলতা, সৌমত্ব, মৌন, প্রাণায়াম, ধ্যান, জপ ইত্যাদির মধ্যে। ক্রমে মঠের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবর্তন এবং মঠের তাপসগণের যোগ্যতা ও প্রয়োজনের পরিবর্তনের ফলে তাদের তপস্যার অবয়বটি রূপান্তরিত হয়েছিল। রূপান্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মঠের নেতৃস্থানীয় তাপসগণের বিবৃতি থেকে। 'তপস্যা কাকে বলে' এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠের প্রারম্ভকালে বলেছিলেন : "তপস্যা নানা রকমের আছে।... আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সত্যাশ্রয়ী হতে হবে, সত্য খোঁটাটিকে ধরে থাকতে হবে জীবনের প্রত্যেক কাজে ; দ্বিতীয় কামজয়ী হতে হবে ; তৃতীয় বাসনাজয়ী হতে হবে।" মঠের তাপসগণ ক্রমে ক্রমে 'আসল তপস্যার' দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন।

আবার দেখি নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে ১০ মার্চ ১৮৯৮ তারিখের প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে 'তপস্যা কি ?' এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন কায়িক বাচিক মানসিক তপস্যার কথা। তিনি বলেছিলেন : "তপস্যা তিন প্রকারের। শরীরের তপস্যা, বাক্যের তপস্যা ও মনের তপস্যা। শরীরের তপস্যা করতে হয় অপর মানুষের সেবার দ্বারা ; বাক্যের তপস্যা হচ্ছে সত্যভাষণ ; আর মনের তপস্যা হচ্ছে মনের একাগ্রতার সাহায্যে মনের ওপর আধিপত্য স্থাপন।" এরূপ কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হবে। এধরনের তপস্যা অবলম্বন করে "নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে শিক্ষিত হওয়ার" জন্যই মঠের প্রতিষ্ঠা, একথা স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্ট ঘোষণা করলেন। আপাতবিরোধী আত্মমুক্তি ও জগতের হিত এ-দুটি ভাবের সমন্বয় করে রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের চলার পথ গড়ে তুলতে হবে। নেতা বিবেকানন্দ শুধুমাত্র আদর্শের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হননি, তিনি ভাবাদর্শকে বাস্তবে রূপদানের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং তা করেছিলেন মুখ্যতঃ আলোচ্য চতুর্থ পর্যায়ে। যুগ-প্রয়োজনে এবং

১০ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।২২

১১ ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।২০ : শাঙ্কর ভাষ্য।

সমকালীন বিবিধ সামাজিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে তপস্যার ভাবনা যে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তার প্রথম সার্থক প্রয়োগের প্রয়াস ঘটেছিল এই কালেই। বলা যেতে পারে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানে মঠের পর্বটি "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আদর্শ রূপায়ণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল। 'চ' এখানে সমুচ্চয়ার্থক। শুধুমাত্র আত্মমুক্তি বা শুধুমাত্র জগতের হিতসাধন নয়, উভয়ের সার্থক সমুচ্চয় হবে তাপসগণের সাধন। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে নিরূপিত হবে এই সাধনার ধারা।

সার্থক কোন ভাবান্দোলন গড়ে তোলার জন্য যেমন প্রয়োজন বলিষ্ঠ গম্ভীর তেজসম্পন্ন কল্যাণপ্রসূ ভাবনা, বোধ করি তেমনি একান্ত প্রয়োজন সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য নিবেদিতপ্রাণ ঐ ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক। কারণ, ভাবাদর্শের প্রযুক্তির ফলাফল দেখেই সমাজ তার গুণাগুণ বিচার করে থাকে। ভাবাদর্শের প্রায়োগিক সামর্থ্য ভাবান্দোলনের শক্তির জোগান দেয়। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সংগঠক স্বামী বিবেকানন্দ নিজে এবং তাঁর গুরুভাইদের অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, তাঁকে যন্ত্র করে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ যন্ত্রী ভাবান্দোলন পরিচালনা করছেন। এই ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁর গুরুভাইদের ভূমিকাও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এবিষয়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে এবং বেলুড়ে নিজস্ব জমিতে মঠ-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত ভগিনী নিবেদিতার মন্তব্যটি মূল্যবান। তিনি লিখেছেন: "**Meaningless as would have been the Order of Ramakrishna without Vivekananda, even so futile would have been the life and labours of Vivekananda, without behind him his brothers of the Order of Ramakrishna.**"[১২] আমাদেরও এই মত, কিন্তু এইসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যাতিরিক্ত নবাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের ভূমিকা। অবশ্য এই ভূমিকা পরিপূরকের। স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের উপনেতৃত্বে মঠবাসিগণের সুসংহত যৌথ প্রচেষ্টায় সার্থক হয়ে উঠেছিল নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্বকাল।

পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করবার মতো ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে বিজয়রথে আরোহণ করে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তিনি কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি। নিজ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে স্বামীজী ৫ মে ১৮৯৭ তারিখে ওলি বুলকে লিখেছিলেন: "সমস্ত জাতটা আমাকে একযোগে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতো হয়েছিল।... ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গিয়েছে।" এদিকে স্বামীজীর সুস্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। স্বাস্থ্যসমস্যা যথাসম্ভব অগ্রাহ্য করে তিনি মঠকে দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, দেশীয় নবাগত যুবক এবং বিদেশী শিষ্যগণকে শিক্ষাদানের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ত্যাগী ও গৃহী রামকৃষ্ণ-ভক্তদের নিয়ে গড়ে তুললেন **Ramakrishna Mission Associations** বা রামকৃষ্ণ প্রচার সমিতি। স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী সুরেশ্বরানন্দ প্রমুখ ত্যাগী সন্ন্যাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মুর্শিদাবাদের মহুলা, দেওঘর, দিনাজপুর, দক্ষিণেশ্বরে আর্তত্রাণ সংগঠিত হলো। স্বামী অখণ্ডানন্দ ক্রমে মহুলাতে অনাথাশ্রম গড়ে তোলেন, মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ হোম। স্বামীজী নিজে উত্তর ভারতে প্রচার কার্যে নিরত হন, স্বামী শিবানন্দকে বেদান্ত-প্রচারের জন্য পাঠান কলম্বোয়। এদিকে আমেরিকাতে বেদান্ত-প্রচার করতে থাকেন স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ। আলমোড়া রামকৃষ্ণ মঠ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংরেজী মাসিক পত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশিত হতে থাকে। ইতোপূর্বেই মাদ্রাজ থেকে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছিল 'ব্রহ্মবাদিন'। মূলকেন্দ্র আলমবাজার মঠ ব্যাপৃত হয়েছিল যাবতীয়

১২ **The Master as I Saw Him—Sister Nivedita, 1966, p. 84**

কর্মসূচী ও কর্মীদের মধ্যে সংযোগরক্ষা ও সাধারণভাবে পরিচালনায়। সংক্ষেপে বলতে হয়, নীলাম্বর মুখুজ্জে'র বাগানবাড়িতে মঠ স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন সংগঠনে একত্রিত হয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণিজন। ভারতবর্ষে এই ভাবান্দোলনে যোগদান করবার জন্য স্বামীজীর সঙ্গে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার। এসেছিলেন 'বিশ্বস্ত' গুডউইন। মিস হেনরিয়েটা মুলার এসেছিলেন কয়েকদিন পরে, মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এঁরা সকলেই ইংরেজ। তাছাড়া একাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমেরিকার মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড এবং আয়ারল্যাণ্ডের মিস মার্গারেট নোবল। বিদেশ থেকে ফেরবার পথে স্বদেশে উপরোক্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় যে কর্মযজ্ঞ সংগঠনের স্বপ্ন স্বামীজী বুনে চলেছিলেন তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন গুডউইন মিসেস বুলকে লেখা তাঁর ২০ নভেম্বর ১৮৯৬ তারিখের চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন: "I wonder if I can tell you of the Swamiji's biggest project in India.··· It is the building of the Monastery in Calcutta as a training ground for Vedanta teachers. Miss Muller··· has offered him £ 200 per annum towards its maintenance. Miss Souter, a wealthy lady here who has done an immense lot for him in a very quite and unostentatious way, is giving him £ 1000, Mr. Sturdy £ 500, and he has himself about £ 200 towards it. I am also writing to Miss Mcleod about this."[১৩] এদিনই গুডউইন মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন যে, স্বামীজী ভারতবর্ষে যাচ্ছেন মুখ্যতঃ তাঁর ঐ প্রিয় পরিকল্পনাটিকে রূপদানের জন্য। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য এসকল প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্যের অতি অল্পই জুটেছিল মঠ-সংগঠনের কাজে।

একদিকে স্বামীজীর পরিকল্পনাকে রূপদান করবার জন্য দেশ-বিদেশের অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন, অপরদিকে গতানুগতিক পরম্পরাগত চিন্তার টান, উদারতা ও দূরদর্শিতার অভাব ইত্যাদি ত্যাগী ও গৃহী রামকৃষ্ণানুরাগীদের একাংশের মনে দ্বিধা ও সন্দেহের জাল ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁদের মনে ফুটে উঠেছে; কেউ তা দ্বিধাচিত্তে কেউ বা নিঃসঙ্কোচে স্বামীজীকে জানিয়েছেন। দু-তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। একদিন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন: "দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে তো মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ—সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?" স্বামীজী চট্‌পট্‌ উত্তর দেন: "মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?"[১৪] ১ মে ১৮৯৭ তারিখে রামকৃষ্ণ প্রচার সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুষ্ঠিত সভার শেষে স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীর নিকট অনুযোগ করলেন: "তোমার এসব বিদেশী-ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরকম ছিল?" প্রত্যুত্তরে স্বামীজী আবেগমথিত কণ্ঠে বলতে থাকেন: "তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বন্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।··· প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।··· এবার এদেশে কিছু কাজ করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর, দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।" কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন: "তিনি (ঠাকুর) ···ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন, তা আমি কি করব—বল?"[১৫] স্বামী যোগানন্দ সেদিনের মতো ক্ষান্ত হলেন। সেদিনই

১৩ The Life of Swami Vivekananda. Vol. II, p. 165-66

১৪ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬

১৫ ঐ, ৯ম খণ্ড পৃঃ ৫৭-৫৮

স্বামী যোগানন্দ শুনতে পেলেন বিশ্বাসের বাদশা গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীকে বলছেন: "আমি দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখছি।" এসকল গভীর বিশ্বাসের কথা শুনেও স্বামী যোগানন্দ এবং আরও কয়েকজন গুরুভাইয়ের সংশয় দূর হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বলরামভবনেই অপর এক সন্ধ্যায় স্বামীজীর সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রমুখ কয়েকজন গল্পগুজব করছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অদ্ভুতানন্দ স্বামীজীকে বলেন: "ভাই! এতো ঝঞ্ঝাট কেনো আনছো? এতে যে ধ্যান-ধারণা সব ঘুলিয়ে যাবে।"[১৬] এই আসরেই এক গুরুভ্রাতা, খুব সম্ভবতঃ স্বামী যোগানন্দ অভিযোগ করেছিলেন, স্বামীজী কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন না, তাঁর প্রবর্তিত কার্যধারার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার সামঞ্জস্যই বা কোথায়?[১৭] এসকল অনুযোগ, প্রতিবাদ ইত্যাদির মুখে স্বামীজী তাঁর হৃদয়ের ভাব উচ্ছ্বসিত ভাষায় উন্মোচিত করতে চাইলেন। কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল, স্বর রুদ্ধপ্রায় হলো, শরীর মুহুর্মুহুঃ কাঁপতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে যোগাসনে বসে পড়লেন। দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরতে থাকল। গুরুভাইগণ আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ঘণ্টাখানেক পর স্বামীজীর ভাব প্রশমিত হয়। তিনি চোখ-মুখ ধুয়ে গুরু-ভাইদের মধ্যে এসে বসেন। সেসময়ে তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "ওঃ, এখনও আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাসানুদাস; তিনি আমার ঘাড়ে যে-কাজ চাপিয়ে গেলেন, যতদিন না সে-কাজ শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই।" এদিনকার এই ঘটনার পর কোন গুরুভাই বা নিকট-জন কেউই স্বামীজীর কোন চিন্তা বা কর্মসূচীর প্রতিবাদ করতে সাহস করেননি। কর্মক্ষেত্রে অবশ্য দেখা গিয়েছিল স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ ভিন্ন অপর সকল সন্ন্যাসী গুরুভাই এবং নবাগত সাধু-ব্রহ্মচারিগণ স্বামীজী-প্রবর্তিত কর্মযজ্ঞে সরাসরি যোগদান করেছিলেন।

এছাড়াও ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে আগত ভক্তদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদিক্ষাদিতে স্বামীজীকে এইকালে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। স্বামীজী ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ভারতবর্ষের কার্যধারা সুসংগঠিত করতে ব্যাপৃত হন। কিন্তু তাঁর সময় ও শক্তির অধিকাংশ তিনি এইকালে ব্যয় করেছিলেন রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু মঠটিকে দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। [ক্রমশঃ]

১৬ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, ১ম সং, পৃঃ ৩৩৪

১৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ ১৫-১৬

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও প্রায় একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্ব-মুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের 'দেখছেন'? 'কলকাতা' মানে অবশ্য শুধু কলকাতা নামক ভূখণ্ডটিই নয়, কলকাতা এখানে একটি প্রতীক। সারা পৃথিবীর মানুষ এবং সারা পৃথিবীই এখানে উদ্দিষ্ট। সুতরাং কলকাতার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, কলকাতার মাধ্যমে সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের দৃষ্টি প্রসারিত—মা সারা জগৎ অর্থাৎ সারা জগতের লোককে 'দেখছেন'। কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক। আলোকচিত্র: স্বামী চেতনানন্দ

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের মাড়োয়ারী ভক্ত

দেবব্রত বসুরায়

দক্ষিণেশ্বরের ভাগবত-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অবারিত দ্বার। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভক্তদের জন্য তাঁর করুণা-সাগর স্বতই উদ্বেলিত। কিসে মানুষের কল্যাণ হয়, মানুষ 'মান-হুঁশে' পরিণত হয়, তার জীবন ঈশ্বরাভিমুখী হয় এই ছিল ভালবাসার মূর্ত-প্রতীক ঠাকুরের সযত্ন প্রয়াস। প্রস্ফুটিত কমলের সন্ধান পেলে মৌমাছিরা তো ভিড় করবেই। তাঁর সর্বদা ঈশ্বরসাক্ষাৎকার, ঘন ঘন সমাধি, সর্বধর্ম-সমন্বয়, জ্ঞানের গভীরতা, ভক্তির মাধুর্য, অসাধারণ বৈরাগ্য, অভূতপূর্ব পবিত্রতা, শিশুর সারল্য ইত্যাদি কথা যতই লোকমুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ততই দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসমাগমও বাড়তে থাকে।

ভক্তসমাগমের প্রথম পর্যায় থেকেই মাড়োয়ারী ভক্তেরাও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসা-যাওয়া করতে থাকেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পাশেই ছিল সরকারের বারুদখানা। এই বারুদখানার পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন একদল শিখ সৈন্য। কোয়ার সিং তাঁদের হাবিলদার। এঁরা ঠাকুরকে নানকের অবতার বলে মনে করতেন এবং গুরুর মতো শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। বলা হয়, এঁদের মাধ্যমেই বড়বাজারের মাড়োয়ারীরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানতে পারেন। তাছাড়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধু-সন্ন্যাসীরা পুরীতে জগন্নাথদর্শন ও গঙ্গাসাগরে স্নানের জন্য এসে পথে দক্ষিণেশ্বরে কয়েকদিন থেকে যেতেন। তাঁদের কাছ থেকেও পরমহংসদেবের কথা মাড়োয়ারী ভক্তজনেরা শুনে থাকবেন। আবার, দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরাদি দর্শন করতে এসে মাড়োয়ারী ভক্তরাও ঠাকুরকে দেখে ও তাঁর সম্বন্ধে শুনে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে ঠাকুরের কথা বলে থাকবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠাকুরের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য নারায়ণ শাস্ত্রী, যিনি দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গ করেছিলেন, তিনিও ছিলেন রাজস্থানের লোক, জয়পুরের নিকট শেখাওয়াটির বাসিন্দা। মাড়োয়ারী মহলে ঠাকুরের কথা প্রচারে তাঁরও কিছু সক্রিয় ভূমিকা থাকা সম্ভব। যাই হোক, ঠাকুরের কথা যে মাড়োয়ারীদের মধ্যে ভালভাবেই প্রচারিত হয়েছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গুরুদাস বর্মন লিখেছেন: "এই সময়ে বড়বাজারের মাড়োয়ারীগণ দলে দলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিতেন।"[১]

প্রথম পর্যায়ের মাড়োয়ারী ভক্তদের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। 'কথামৃতে'র ব্যক্তিসূচীতে প্রথমাবস্থার ভক্তগণের মধ্যে তাঁর স্থান। গুরুদাস বর্মন এঁর নাম বলেছেন লছমিপৎ। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে লক্ষ্মীনারায়ণই বলতেন আর ঐ নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি শুধু ধনী ছিলেন না, শাস্ত্রাদিতেও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বেদান্ত অধ্যয়ন করে তিনি জ্ঞানমার্গী হয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসতেন আর ঠাকুরের সঙ্গে নানা প্রকার তত্ত্ব আলোচনায় আনন্দ পেতেন। ঠাকুরকে তিনি বিশেষ ভক্তি করতেন। পুঁথিকার বলেন: "সরল প্রকৃতি আর ধর্মতৃষ্ণাতুর। / সেই হেতু কৃপাচক্ষে দেখেন ঠাকুর॥"[২] কথামৃতে দেখি ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন —'বেদান্তবাদী' ও 'সূক্ষ্মবুদ্ধি'।[৩]

লক্ষ্মীনারায়ণের অনেকদিনের বাসনা ঠাকুরের সেবার জন্য কিছু টাকা দেবার। একদিন ঠাকুরের বিছানার চাদর ছেঁড়া দেখে তিনি প্রস্তাব করলেন ঠাকুরের নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনে দেবেন, যার সুদ থেকে ঠাকুরের সেবাদি চলবে,

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত—গুরুদাস বর্মন, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬৫

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, ৮ম সং, পৃঃ ২৩০

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২।১।৪

অন্য কারও মুখাপেক্ষী হতে হবে না। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রস্তাব শুনে ঠাকুরের কী প্রতিক্রিয়া হলো, তা তিনি নিজেই বলেছেনঃ "যাই ওকথা বললে, অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। চৈতন্য হবার পর তাকে বললুম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো তাহলে এখানে আর এসো না। আমার টাকা ছোঁবার জো নাই।"[৪] লক্ষ্মীনারায়ণ তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক হৃদয়ের কাছে টাকা দিতে চাইলেন। ঠাকুর সে-প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেনঃ "তাহলে আমার বলতে হবে 'একে দে, ওকে দে'; না দিলে রাগ হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। সেসব হবে না।"[৫]

তবুও লক্ষ্মীনারায়ণ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তখন ঠাকুর বালকের মতো কাঁদিতে লাগলেন। বললেনঃ "মা, এমন লোককে এখানে কেন পাঠাস মা, এরা যে তোর কাছ থেকে তফাৎ করে আমায় নষ্ট করতে চায় মা।"[৬] কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। অপ্রতিভ লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং সেদিন বিদায় গ্রহণ করেন। ঠাকুরও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট কথায় লক্ষ্মীনারায়ণকে সুস্থিত করে দেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ঠাকুরের অন্যতম রসদ্দার মথুরবাবুও একবার তাঁর নামে "সহস্র সহস্র মুদ্রার সম্পত্তি" লেখাপড়া করে দিতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর সে-প্রস্তাবও দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

যাই হোক, লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের কৃপা থেকে বঞ্চিত হননি। তাঁর সুতাপট্টীর বাসভবনে ঠাকুর পদধূলি দিয়েছিলেন।[৭]

লক্ষ্মীনারায়ণ যে পরবর্তী কালেও ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় কাশীপুরের একটি ঘটনার বিবরণ থেকে। কাশীপুরে ঠাকুর যখন রোগশয্যায়, গৃহীভক্তেরাই তাঁর সেবাকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতেন। একসময়ে ব্যয়াধিক্য, হিসাবপত্র ইত্যাদি নিয়ে গৃহী ভক্তদের সঙ্গে ত্যাগী সন্তানদের বিরোধ বাধে। ঠাকুর সব শুনে বিরক্ত হয়ে বলেন বড়বাজারের লক্ষ্মীনারায়ণকে ডেকে আনতে। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, ঠাকুর তারপরেই বলেনঃ "না, কাকেও ডাকার আর প্রয়োজন নাই। জগন্মাতা যা করেন তাই হবে।"[৮] পুঁথিকার কিন্তু বলেছেন যে, খবর পেয়েই টাকা নিয়ে হাজির হলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। ঠাকুর টাকা নিতে অস্বীকার করলেন। ঠাকুরের সেবায় অর্থদানে অতি ব্যাকুল লক্ষ্মীনারায়ণ সেই টাকা ওখানে রেখেই বাড়ি ফিরে যান।[৯]

লক্ষ্মীনারায়ণের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তাঁর একবার দিল্লীতে দেখা হয়েছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন পরিব্রাজক। দিল্লীতে এক পার্কের বেঞ্চে বসে আছেন। এই সময়ে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সন্ন্যাসী দেখে তাঁকে টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী টাকা নিলেন না দেখে তিনি বলেনঃ "দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখেছিলাম—কাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষ"। তখন পরিচয় নিয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ জানতে পারলেন ইনিই লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী। তিনি নিজেই বলেনঃ "একবার রামকৃষ্ণদেবকে দশ হাজার টাকা দিতে গিয়ে জব্দ হয়েছিলাম।" ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তিনি অখণ্ডানন্দজীকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গেলেন।[১০]

স্বামী সারদানন্দ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে ঠাকুরের নিকট মাড়োয়ারী ভক্তদের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে তিনি লিখেছেনঃ "কলিকাতা হইতে আমরা মেয়ে-পুরুষ অনেকে ঠাকুরকে যেমন দেখিতে যাইতাম অনেকগুলি মাড়োয়ারী মেয়ে-পুরুষও তেমনি সময়ে সময়ে

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২১।৪

৫ ঐ। স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (২য় ভাগ, ১৩৫৮, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৪০) গ্রন্থে লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ টাকা নিতে অস্বীকার করায় লক্ষ্মীনারায়ণ মায়ের নামে টাকা দিতে চান, কিন্তু মা-ও ঐ টাকা নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন।

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃঃ ১৬৫

৭ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ৪১৪

৮ আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ পৃঃ ১০২

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৬১৯

১০ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, পৃঃ ৭৪

দেখিতে আসিত। তাহারা সকলে অনেকগুলি গাড়িতে করিয়া দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিত এবং গঙ্গাস্নান করিয়া পুষ্পচয়ন ও শিবপূজাদি সারিয়া পঞ্চবটীতে আড্ডা করিত। পরে ঐ গাছতলায় উনুন খুঁড়িয়া ডাল, লেট্টি, চুরমা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে নিবেদনপূর্বক আগে ঠাকুরকে সেইসব খাবার দিয়া যাইত ও পরে আপনারা প্রসাদ পাইত। ইঁহাদের ভিতর আবার অনেকে ঠাকুরের নিমিত্ত বাদাম, কিশমিশ, পেস্তা, ছোয়ারা, থালা-মিছরি, আঙুর, বেদানা, পেয়ারা, পান প্রভৃতি লইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত। কারণ, তাহারা··· রিক্তহস্তে সাধুর আশ্রমে বা দেবতার স্থানে যে যাইতে নাই, একথা সকলেই জানিত এবং সেজন্য কিছু না কিছু লইয়া আসিতই আসিত।··· ঠাকুর নিজে ঐসকল জিনিস খাইতেন না।··· তবে, ডাল, রুটি ইত্যাদি রাঁধা খাবার, যাহা তাহারা ঠাকুর-দেবতাকে ভোগ দিয়া তাঁহাকে দিয়া যাইত, 'প্রসাদ' বলিয়া নিজেও তাহা কখন একটু আধটু গ্রহণ করিতেন ও আমাদের সকলকেও খাইতে দিতেন।"[১১]

মাড়োয়ারী ভক্তদের মিছরি, মেওয়া, মিষ্টান্নাদি "খাবার অধিকারী ছিলেন একমাত্র নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ)।"[১২] স্বামী অখণ্ডানন্দও লিখেছেন: "বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের উপাদেয় বিবিধ খাদ্য-দ্রব্য একা স্বামীজীই সবচেয়ে বেশি খেতেন।"[১৩] একবার সিদ্ধা সাধিকা গোপালের মাকেও ঠাকুর মাড়োয়ারী ভক্তদের দেওয়া সব মিছরি দিয়েছিলেন।"[১৪]

মহাপুরুষের কাছে মুমুক্ষু হয়ে আর কজন যায়? সংসারীরা অভ্যুদয়ের জন্যই লালায়িত। মুক্তির চেয়ে ভুক্তিই তাদের বেশি কাম্য। একথা সাধারণভাবে সব সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রতিই প্রযোজ্য। তবে ব্যতিক্রমও থাকে। বিরল বলেই তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বামী সারদানন্দ মাড়োয়ারী ভক্তদের মধ্যে 'দুই-একজন' ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দও এইরূপ উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কয়েকজন মাড়োয়ারী ভক্তের কথা বলেছেন, যাঁরা ঠাকুরের কাছে যথার্থ সাধুসঙ্গ-লাভ ও সৎপ্রসঙ্গ শোনার উদ্দেশ্যে আসতেন। 'স্মৃতি-কথাতে' তিনি লিখেছেন: "একদিন গিয়ে দেখি, ঠাকুরের ঘর বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের সমাগমে পূর্ণ। কয়েকজনের হাতে তুলসী মালা, এবং তারা ঠাকুরকে এক দৃষ্টে দেখতে দেখতে জপ করছে; আর ঠাকুরের সম্মুখেই নানা রকমের উৎকৃষ্ট মেওয়া (বেদানা, আঙুর, পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ, খোবানি ইত্যাদি)··· রেখেছে দেখলাম।···

"যারা জপ করছে তাদের আর অন্য দৃষ্টি নেই।··· তারা যে একমনে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে জপ করে যাচ্ছে, তাই দেখে তিনি বলছেন, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যখন বনবাসে, তখন একটি পাখি জল খাচ্ছে আর 'রাম, রাম, রাম' জপ করছে। তাই দেখে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন, 'লক্ষ্মণ, দেখ দেখ, জল খাচ্ছে আর ঠোঁটে বলছে রাম, রাম, রাম।' 'রাম' ভগবানের নাম।

ওহি রাম দশরথকা বেটা
ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।
ওহি রাম জগত বনায়া,
ওহি রাম সবসে নিয়ারা॥

রাজপুতানার ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর বড় আনন্দ করলেন, আর যাদের আমি দেখলাম তারাও ভক্ত-চূড়ামণি।"[১৫] দুর্ভাগ্যের বিষয় এইসব ভক্তদের নাম আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেল।

দক্ষিণেশ্বরে মাড়োয়ারী ভক্তদের বনভোজনের কথাও স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেছেন: "আর একদিন গিয়ে দেখি, রাজপুতানার (মাড়োয়ারী) অনেক ভক্ত পঞ্চবটী তলায় বনভোজনের আয়োজন করেছে। বাট্টী, চুরমা আর ডাল—এই তাদের বনভোজনের খাদ্য।

"প্রকাণ্ড ঘুঁটের পাঁজায় আগুনে আটার তাল পাকিয়ে দেয়, তারপর যখন ওপরটা ফেটে যায়, তখন ওপরের শক্ত অংশটি দিয়ে বাট্টী তৈরি হয়। ডাল দিয়ে খায়। আর ভেতরের নরম ভাগটিতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘি, চিনি, পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ ও

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, ১৩৫৮, পৃঃ ২১৮-২১৯
১২ ঐ, পৃঃ ২১৩
১৩ স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৭
১৪ লীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ২১৫
১৫ স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৬-৩৭

এলাচ ইত্যাদি মিশিয়ে দস্তুর মতো মেখে বড় বড় লাড্ডু পাকায়। তাকেই চুরমা বলে। তাহা অতি উপাদেয় এবং উহাদের বড় প্রিয় খাদ্যদ্রব্য। ঐ রকম লাড্ডু পরাত ভরে তারা ঠাকুরকে এনে দিলে। তিনি তা পেয়ে বড় আনন্দ করতে লাগলেন।"[১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ মাড়োয়ারী ভক্তদের কাছে যে গানগুলি গাইতেন স্বামী অখণ্ডানন্দ তার মধ্যে তিনটির উল্লেখ করেছেন ঃ

"হরিসে লাগি রহোরে ভাই,
তেরে বনত বনত বনি যাই।"
"দিল রামকো নেই জানা হৈ
তো যো জানা হৈ সো কেয়া রে।"

আর দাশরথি রায়ের গান—

"আমার কি ফলের অভাব
তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে।"[১৭]

একদা-বিষয়াসক্তের পক্ষে সম্পূর্ণ মালিন্যমুক্ত হওয়া সহজসাধ্য নয়। একবার এক ধনী মাড়োয়ারী ঠাকুরের কাছে এসে দুঃখ করে বলেন যে, তিনি সব ত্যাগ করেছেন কিন্তু তবুও ভগবান লাভ হচ্ছে না। ঠাকুর তাঁকে বললেন ঃ "যেমন তেলের কুপো, তেল বার করে নিলেও কুপোতে একটু একটু তেল থাকে ও গন্ধ ছাড়ে, তেমনি তোমাতে একটু একটু বিষয়ের গন্ধ ছাড়ছে।"[১৮]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাড়োয়ারী ভক্ত-সমাগমের কথা আমরা 'কথামৃত'তে তিনটি দিনের বিবরণের মধ্যে পাই ঃ ডিসেম্বর ১৮৮২, ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ এবং ২ অক্টোবর ১৮৮৪। আর পাই ২০ অক্টোবর ১৮৮৪ তারিখে বড়বাজারে ১২ মল্লিক স্ট্রীটে মাড়োয়ারী ভক্তদের গৃহে অন্নকূট উৎসবে ঠাকুরের যোগদানের কথা

অক্টোবর তারিখে যে মাড়োয়ারী ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন তাঁরাই যে ১২ মল্লিক স্ট্রীটের বাসিন্দা একথা স্পষ্ট করেই বলা আছে। কিন্তু অন্য দুটি দিনে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয়নি—শুধু প্রথম দিনটির ভক্তেরা যে কলকাতায় ব্যবসা করেন সেই সংবাদটি ছাড়া। অনুমান করা যায় ঐ দুটি দিনের ভক্তেরা ১২ মল্লিক স্ট্রীটের বাসিন্দা নন, তাঁরা অন্য লোক।

প্রথম দিন অর্থাৎ ১৮৮২-র ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটির মধ্যে যে একদল মাড়োয়ারী ভক্ত এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন তাঁদের বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল না। তাঁরা সাধারণভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁদের কিছু উপদেশ করতে। ঠাকুরও সহাস্যে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি সত্যনিষ্ঠার ওপর জোর দেন আর বলেন মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিস সাধুদের দিতে নেই।[১৯]

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারিতে উপস্থিত মাড়োয়ারী ভক্তেরা কিন্তু জিজ্ঞাসু হয়েই ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। তাঁদের প্রথম জিজ্ঞাসাই ছিল, উপায় কী। ঠাকুর তাঁদের দুটি পথের কথা বলেন —বিচার পথ আর অনুরাগ বা ভক্তির পথ। তাঁরা সাকার নিরাকারের অর্থও জানতে চান। ঠাকুর তাঁদের চমৎকার সব উপমা দিয়ে বিষয়টি প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেন।[২০]

পূর্বেই বলা হয়েছে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২ অক্টোবর যে মাড়োয়ারী ভক্তবৃন্দ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করতে এসেছিলেন তাঁদেরই একজনের ১২ মল্লিক স্ট্রীটস্থ বাড়িতে ঠাকুর ২০ অক্টোবর অন্নকূট উৎসবে শুভাগমন করেছিলেন। আফসোসের বিষয়, শ্রীম গৃহস্বামী মাড়োয়ারী ভক্তটির নাম উল্লেখ করেননি।

বর্তমানে মল্লিক স্ট্রীটে ১২ নম্বরের কোন বাড়ির অস্তিত্ব নেই। কলকাতা কর্পোরেশনের পুরনো খাতাপত্র থেকে জানা যায় ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মল্লিক স্ট্রীটের ১২ নম্বর বাড়ির নতুন নম্বর হয় ১৮। শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণের সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এ-বাড়ির মালিক ছিলেন গুরসীমল ও ঘনশ্যাম দাস। তখন এটি তিনতলা ছিল। পরবর্তী কালে বাড়িটিকে পাঁচতলা করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ নম্বর বাড়ি, বর্তমানে যার নম্বর হয়েছে ১৮, সেই প্রকাণ্ড বাড়িটিতে এখন নানা খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর গদি। বাড়ির ভিতরে বিরাট উঠান। চারদিকে চকমিলানো বারান্দা।

১৬ স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৭ ১৭ ঐ, পৃঃ ৩৬
১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশচন্দ্র দত্ত, ৮ম সং, পৃঃ ১৩৪
১৯ কথামৃত, ৫।৩।৩ ২০ ঐ, ৪।১।৫

চারতলার বারান্দা থেকে কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রশস্ত ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘরের পশ্চিম প্রান্তে কাঠের ধাপযুক্ত সিংহাসন। ওপরের ধাপে ছোট ছোট রূপার সিংহাসনে পাশাপাশি তিনটি অষ্টধাতুর ক্ষুদ্রাকার নাড়ুগোপাল বিগ্রহ। মধ্যের অপেক্ষাকৃত বড় বিগ্রহটির মাথার মুকুটে ময়ূরপুচ্ছ। শ্রীম সম্ভবতঃ এই বিগ্রহকেই 'ময়ূরমুকুটধারী' বলেছেন। বিগ্রহগুলির সেবাপূজার সুব্যবস্থা আজও অব্যাহত আছে। অন্নকূট মহোৎসব এখনো হয়।

অনুমান করা যায় যে, শ্রীম যাঁকে গৃহস্বামী মাড়োয়ারী ভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন তিনি জ্যেষ্ঠ গুরসীমল। ইনিই ২ অক্টোবর সদলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন আর মনে হয় সেই দিনই তাঁদের অন্নকূট মহোৎসবের জন্য ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের প্রশংসা করে বলেছিলেনঃ "আহা! এঁরা যে ভক্ত! সকলে ঠাকুরের কাছে যাওয়া—স্তব করা—প্রসাদ পাওয়া! এবার যাকে পুরোহিত রেখেছেন সেটী ভাগবতের পণ্ডিত।"[২১] ঠাকুরের কথায় বুঝতে পারা যায় এঁরা নবাগত নন, অনেকদিন থেকেই যাতায়াত করছেন।

গৃহস্বামী গুরসীমল যে একজন যথার্থ ভক্ত, পরমার্থলাভের জন্য ব্যাকুল, তা তাঁর ঠাকুরের কাছে প্রশ্নগুলি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। তাঁর দুঃখ—শাস্ত্র পড়েন কিন্তু ধারণা হয় না কেন? বিষয়ে বৈরাগ্য হয় না কেন? ঠাকুরের কাছে তাঁর একটিমাত্র প্রার্থনাঃ "আজ্ঞে এই আশীর্বাদ করুন, যাতে সংসারে মন কমে যায়।" ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেনঃ "কত আছে? আট আনা?"[২২]

শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরসীমল রামচন্দ্রের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন।

গৃহস্বামী (গুরসীমল)। মহারাজ, আপনিই রাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি, নদীরই হিল্লোল, হিল্লোলের কি নদী?

গৃহস্বামী। মহাত্মাদের ভিতরেই রাম আছেন। রামকে তো দেখা যায় না। আর এখন অবতার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কেমন করে জানলে অবতার নাই?··· অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন আর বললেন, আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মতো সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হব? আবার যখন সত্য-পালনের জন্য বনে গেলেন, তখন দেখলেন, রামের বনবাস শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ করে অনেকে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তা তাঁরা অনেকেই জানেন নাই।

গৃহস্বামী। আপনি সেই রাম।[২৩]

অন্নকূট মহোৎসব উপলক্ষে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মল্লিক স্ট্রীটের মাড়োয়ারী ভবনে যান তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাবুরাম মহারাজ, লাটু মহারাজ, রাম চাটুয্যে, ছোট গোপাল এবং মাস্টার মশাই। ঠাকুর ময়ূরমুকুটধারী বিগ্রহকে দর্শন করে প্রণাম করেন ও নির্মাল্য ধারণ করেন। বিগ্রহ দর্শন করে ঠাকুর ভাবে মুগ্ধ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ হলেন। মাড়োয়ারী ভক্তেরা সিংহাসনস্থ বিগ্রহকে বাহিরের ছাদে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভোগের আয়োজন হয়েছে। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ভোগের পর আরতি ও গান হলো। ঠাকুর চামর ব্যজন করলেন। পরে মাড়োয়ারী ভক্তদের অনুরোধে ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

ফেরার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের ভাব-ভক্তির প্রশংসা করে বলেনঃ "যথার্থই হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম। ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে। আনন্দ এই ভেবে যে ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে-সকল ধর্ম দেখছো এসব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে যাবে—থাকবে না। তাই আমি বলি, ইদানীং যেসকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।"[২৪]

এই মাড়োয়ারী ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের কাছে যাতায়াত পরেও রেখেছিলেন। আমরা দেখি ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২০ মার্চ এঁরা হোলির উৎসব উপলক্ষে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করতে এসেছেন কাশী-পুরে। ঠাকুর তখন মন্তব্য করেনঃ "আর আর (সবাই) অনেকদিন পরে এসেছে।" ঠাকুরের কাছে কিছুক্ষণ বসার পর "জয় সচ্চিদানন্দ", "জয় সচ্চিদানন্দ" বলে তাঁরা বিদায় গ্রহণ করেন।[২৫]

২১ কথামৃত, ৪।২১।৩ ২২ ঐ, ২।২১।২ ২৩ ঐ, ২৪ ঐ, ২।২১।৩

২৫ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৬

বোধিবৃক্ষ-তলে

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

সেদিন পৃথিবীর বর্ণ ছিল ধূসর,
মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত, অধীর, অসংযমী ;
অবলা পশুর দল ঘাতকের ভয়ে বিবর্ণ, পাণ্ডুর—
যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে পশু নয়,
বলিপ্রদত্ত মানুষের মনুষ্যত্ব।
স্বার্থপরতা, লোভ, হিংসা,
তন্ত্র-মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, তর্ক-বিচার,
শোষণ, নিপীড়ন, ভ্রষ্টাচারে
বাতাস হয়ে উঠেছিল গুরুভার.
নির্মল, নির্বাধ, উদার আলোর
পথ হয়েছিল রুদ্ধ।
অমানিশার রাত্রি যেন প্রভাত হতেই চায় না।

হলো, অবশেষে সূর্যোদয় হলো,
নতুন একটি দিনের আবির্ভাব হলো পৃথিবীতে।
এলো বৈশাখী পূর্ণিমার মায়াময় সেই রাত।
পৃথিবীতে খসে পড়ল
বুঝি ধ্রুবতারকা,
অথবা পৌর্ণমাসীর চন্দ্রমাই!
নবজাতকের নামকরণ হলো সিদ্ধার্থ।

দিন গেল, মাস গেল,
বছরের পর বছর গেল।
তারপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

সেদিনও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা,
আলোয় ভরা উজ্জ্বল রজনীর নিস্তব্ধ প্রহরে
নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিবৃক্ষ-তলে
সমাধিমগ্ন নিথর সিদ্ধার্থ
প্রজ্ঞার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন—
তাঁর চারদিকে জ্বলে উঠল জ্যোতির বলয়।
চোখ মেললেন তিনি—ধীরে, অতি ধীরে ;
স্ফুরিত হলো তাঁর ওষ্ঠাধর ঃ
"আমি বুদ্ধ, আমি তথাগত।
আমি দেব জগৎকে নতুন জীবনের সন্ধান।"

আসন থেকে উঠলেন বুদ্ধ।
দিব্য উপলব্ধির উন্মদ প্রেরণায়
সাত দিন, সাত রাত্রি
পাদচারণ করলেন—অবিরাম, অবিশ্রাম।
যতবার তাঁর চরণ ভূমিস্পর্শ করে,
ধরিত্রীর বুকে ফুটে ওঠে ততবার
নিটোল এক-একটি শ্বেতপদ্ম।
শেষ হলো সপ্তম রাত্রি।
পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠল।
উদিত সূর্যের কিরণ
এসে পড়ল বুদ্ধের ললাটে।
এগিয়ে চললেন তথাগত
গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর—
অবিশঙ্ক, অকম্পিত, অনন্যশরণ।

অপরাজেয় প্রত্যয়ে দীপ্ত, অনিকেত চারণসন্ন্যাসী
চলেছেন ক্লান্তিহীন পথ
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে
দুর্গের পর দুর্গ শঠতা আর ভ্রষ্টাচারের।
বোধিবৃক্ষ-তলে যে-সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তিনি
তাকে পৌঁছে দিলেন
মানুষের ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে।
জগৎকে দিলেন জাগরণের আহ্বান,
আত্মদীপের সঞ্জীবন-বার্তা।

পৃথিবীর বর্ণ আবার সবুজ হলো,
মানুষের মুখে ফুটল বিশুদ্ধ রক্তের আভা,
পশুমেধের রক্তবন্যায় পড়ল ছেদ।
নবজীবনের প্রতিশ্রুতিতে
পৃথিবী আবার নতুন করে বাসযোগ্য হয়ে উঠল।

তথাগত

মৃণালকান্তি দাস

ঐশ্বর্যের সৌরভে লুব্ধ নয় প্রাণমন তাঁর।
অন্তরেতে উথলিত সপ্ত সিন্ধু শুধু ভাবনার॥
অহিংসার বীজমন্ত্র রক্তে লেখা জন্মবেলা হতে।
করুণা-গঙ্গোত্রী ব্যথা হয়ে নামে আহতের সাথে॥
বোধিবৃক্ষ-তলে জলাঞ্জলি সর্ব ভোগ সুখ
দুঃখ শুধু দুঃখ—যেন উন্মুক্ত কার্মুক॥
নাগপাশ উন্মোচনে বৈরাগ্য-গরুড়ে ডাকা প্রাণের তাগিদে।
নির্বাণের শান্তি খোঁজা অহর্নিশি হৃদি-কোকনদে॥
জীবন-বেদের ব্যাখ্যা অনবদ্য নতুন ভাবের।
অহিংসার মন্ত্রে দান নবমন্ত্র জীবনলাভের॥
কত বর্ষ যাবে চলি, কত শত বর্ষ হলো গত।
বিশ্ব তোমা আজও খোঁজে, আজও তথাগত॥

মানুষকে ভালবেসে

নিভা দে

মানুষকে ভালবেসে বহুদূরে যেতে চাই—
যেতে যেতে হঠাৎ তীর এসে ছিঁড়ে নেয়
হৃৎরতনখণ্ড, প্রচুর রক্তজল উপচে পড়ে
ভিতরে ভিতরে চোখদুটো খাঁখাঁ করে
মধ্যাদিনের সূর্যের পাশাপাশি ক্রোধে—
ক্রোধ নয় ক্ষমার অভীপ্সায় তীর্যক বেদনাতীর
দাও ছুঁড়ে চারপাশে বৃক্ষহীন রুক্ষতার দিকে।
বৃক্ষের মতো মানুষ দু-চারজনই আছে
খুঁজে খুঁজে ফেরো তারে সহস্র গুল্মের ভিড়ে
যদি পেয়ে যাও—ছায়াতে দাঁড়িয়ে তার
অগ্নি ও অশ্রু সব জমা করে দিয়ো
মানুষকে ভালবেসে যদি যেতে চাও বহুদূরে—
এভাবেই খুঁজে খুঁজে থেমে থেমে যেয়ো।

আলোকের রাখিবন্ধন

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

চারিদিকে মনুষ্যত্বের নৃশংস সংহার,
দিকে দিকে হিংসার উন্মত্ত বিস্তার,
স্বার্থান্ধের হাতে হাতে হননের উন্মুক্ত সায়ক,
দলাদলি ভাগাভাগি হানাহানি—
ঘরে ঘরে মানুষ আজ প্রেমের কাঙাল।

এমনি দুর্দৈবের ক্ষণে
নিশ্ছিদ্র তারা-নেভা অন্ধকারে নৈরাশ্যের কালসমুদ্র
ভেঙে হেঁটে আসে কে?
ঐ শোনা যায় কার পায়ের ঘুঙুর?
মহাকালের ধ্বংসস্তূপের বুকে পা রেখে
কে কুড়িয়ে রাখে সৃষ্টির নব-জন্মবীজ?
হৃদয়-শ্মশানে জাগে কালি মুছে দিতে
কার ঐ বিহ্বল চোখ?...

অন্তবর্তী এই শুভ অন্ধকারে আজ তাই
আলোকের রাখিবন্ধন।

জয়নাল আবেদীন

আমার জীবন, কান্না দুঃখ
তোমার পায়ে দিলাম জমা
আপন ভেবে, এই আমাকে
প্রভু, তুমি দাও গো ক্ষমা।

পাপের শরীর কোথায় রাখি
তাই তো দিলাম তোমার পায়ে
গরম দেহে জল ঢেলে দাও
শান্ত কর চরণছায়ে।

জীবন জুড়ে ছড়িয়ে থাকো
আমার ভেতর কথা বল
যেথায় গেলে সুখ পাওয়া যায়
সেথায় আমায় নিয়ে চল।

লাগিয়ে রঙ আমার গায়ে
শিরায় শিরায় তুমি ভাসো
পাপের শরীর ধুইয়ে জলে
আমায় হাসাও, তুমিও হাসো।

কত মধু তব নামে

গোকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

হে রামকৃষ্ণ, হে রামকৃষ্ণ
কত মধু তব নামে,
যত জপি নাম তত অবিরাম
আঁখিতে অশ্রু নামে ॥
নাহি জানি আমি তোমার মহিমা
তোমার প্রেমের নাই কোন সীমা
তোমার প্রেমেতে অধরা অসীমা
ধরা দিল ধরাধামে ॥
তুমি কে জানি না, জানিতে চাহি না
জানিবার মতো নাহিক সাধনা,
হৃদয়েতে রহ—শুধু প্রার্থনা,
যেন প্রাণ যায় জপি নামে ॥

আগামী

মানসী বরাট

ছোবলের পর ছোবল হেনেছ,
ক্লান্ত শঙ্খচূড়—
অঙ্গ আমার বিষে হলো ভরপুর।
বিষহারা আজ নিঃসাড় কালকূট—
বিষে-ছাওয়া মোর নীল চোখে আজ
পৃথিবীর রংছুট।
সন্ধ্যা-সূর্য. বিরাট বহ্নি
জ্বলে দাউ দাউ চিতা,
কালরাত্রির আঁধার ঘনালো
শেষ কথা শোনো, মিতা।
বিষাক্ত মোর, বিষহারা তোর
দেহের ভস্ম ছুঁয়ে
শপথ করুক, চিতা-ধোওয়া জলে
হিংসা ফেলুক ধুয়ে।
যাহারা রহিল বাকি
আগামী প্রভাতে তাহারা
সবাই মেলিবে তাদের আঁখি।

শঙ্করাচার্যের প্রতি

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

কম্বুকণ্ঠে করেছ প্রচার
ভারতভূমে সবার কাছে ঃ
'শিব শুধু মন্দিরে নয়,
শিব যে সবার বুকেই আছে।
শিব আমি, শিব যে তুমি,
সকল জীবেই শিবের ছবি,
দেহ-মনের ঊর্ধ্বে ওঠ
হৃদয়মাঝে শিবকে লভি।'

প্রতিধ্বনি

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দের চেয়ে প্রতিধ্বনি
বড় মনে হয়,
শব্দের উৎস কোথায়
আমি তা জানি না।
কোন আদি অন্তহীন
চৈতন্যের শিখর থেকে
শব্দের সৃজন হয়
সে-কথা কে জানে।
আমি বুঝি প্রতিধ্বনি,
প্রতিফলনের দৃশ্য কখন
কোথায় প্রতিভাত হয়।
বিলগ্ন হয়ে থাকি
সেই প্রতিবিম্বিতের ধ্যানে।
বিমূর্ত চিন্তনগুলি
ক্রমশঃ সংহত হয়
এক অনাবিল অর্চনায়।
ধ্যানের অতলান্ত থেকে
উঠে আসে প্রত্যাশার
এক নম্র সুরধ্বনী।
হয়তো বা একদিন
শব্দের উৎসকে খুঁজে পায়।
প্রতিধ্বনি শব্দের চেয়ে
গভীর মনে হয়।

মহাসনদ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

দক্ষিণেশ্বরের চাতাল থেকে উদাত্ত ব্যাকুল কণ্ঠে
একদিন ডেকেছিলে তুমি যাহাদের
আঁটপুরের যজ্ঞকুণ্ড থেকে
দীপ্ত হোমশিখা জেবলে নিয়ে
দেবভূমি পুণ্যভূমি সোনার ভারতবর্ষ ঘুরে
দেখে এসেছেন তাঁরা জীবনের নগ্নরূপ :
নিপীড়িত নির্যাতিত সর্বরিক্ত বোবা মানুষের
কী যে ভয়াবহ রূপ !
কী বীভৎস চেহারা যে মানুষের হতে পারে !
দেবায়ত মানবতা সকরুণ পশুত্বে রূপান্তরিত !
আশাহীন ভাষাহীন মৃতের শ্মশান যেন
বিস্তৃত পড়ে আছে আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে—
ক্ষুধা-মৃত্যু-অপঘাত চারিদিকে—
লোভ-হিংসা-ষড়যন্ত্র ! খাচ্ছে কুরে কুরে
যক্ষ্মার কীটের মতো জাতির হৃৎপিণ্ড—
রক্ত-মজ্জা মাংস—যেন জীবন্মৃত
শতাব্দীর লাঞ্ছনার ভগ্নশেষ !
পরপাদপিষ্ট জাতি নিজ দেশে পরবাসী
পা'র নিচে দাঁড়াবার তিলমাত্র ভূমি
আর অবশিষ্ট নেই !—
এ মরু-প্রান্তরে কারা
নিয়ে আসবে নতুন মৌসুমী ?

তাঁরা তাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আজ সুতানুটি
নদীটির তীরে
সমবেত হয়েছেন । সূর্যের সৌরভ থেকে
বজ্রবিদ্যুৎ-বাণী নিয়ে
তাঁহাদের একজন—একালের নচিকেতা—
মৃত্যুমৌন জাতির জন্য নব সঞ্জীবনী
নিয়ে এসেছেন দেখ :
সূর্যোন্নত শ্বেতপদ্ম ঝরে যায়
বিধ্বস্ত বিপন্ন শিশিরে ;

সেই সুধা-পদ্মটিকে আবার জাগাতে হবে,
পাথরে ফোটাতে ফুল, মরুবালু দিয়ে
আবার বহাতে হবে প্রাণের প্রসন্ন নদী ।
সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির এক সম্ভ্রান্ত সরণী
নব-নির্মাণের দায় স্বেচ্ছায় নিলেন তাঁরা—
ত্রিশ কোটি মানুষের উজ্জ্বল উদ্ধার
ফিরিয়ে দিতে আজ তাঁরা কৃতসঙ্কল্প ।
মাথা উঁচু করে বাঁচবার এবং
বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি ।
নতুন ঘোষণাপত্র :
সকলের জন্য এক সার্বভৌম জীবন রচনা—
হৃদয়-মস্তিষ্ক-বাহু—যুগপৎ কর্ষণা চাই ।
শক্তির নিদিধ্যাসনা ।
আত্মার শাশ্বত গীত 'স্বাধীনতা'—
ভারতবাসীর জন্য নিয়ে আসতে হবে ।
সাহস-সাধনা-প্রেমে পঞ্চকোষী মানুষের
পূর্ণায়ত দেবরূপ
আবার স্থাপিত হবে এ-ভূমিতে পূর্ণের গৌরবে ।

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই' ;
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরমায়ু দেবহিতে নিত্য-নিবেদিত
সকলের জন্য সম-অধিকার ।
বিশেষ সুবিধাবাদ সেখানে কোথাও থাকবে না ।
জেলে-জোলা, মেথর, মুচি, চাষী-ডোম—
সকলেই অখণ্ড সে-জীবনের জয়ন্ত উৎসবে
সমবেত সকল ধর্মের লোক—সব জাতি—
সে অবাক পৃথিবীর স্বপ্ন-শান্তিসেনা ।
সকলের স্পর্শধন্য পবিত্র তীর্থ-নীরে
মাতৃ-অভিষেক, অর্চনার
মঙ্গল কলস আজ পরিপূর্ণ ।
একই সঙ্গে জীবন ও মহাজীবনের
আকাশ-মাটির গান রচনা করলেন তাঁরা ।
সকলের জন্য এক
সার্বিক মানুষের অখণ্ড উত্তরাধিকার
রেখে গেলেন ।
'রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের'* সংবিধান মহান্ সনদ
এভাবেই রচিত হলো—
আঠারোশ সাতানব্বই সালের পয়লা মে ।

* 'রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য' কথাটি অধ্যাপক বিনয় সরকারের ।

সেই থেকে এ-পথেই 'রামকৃষ্ণ-বিপ্লবের'*
দিগ্বিজয়ী রথ অবিরাম চলিয়াছে—
চলিতেছে—পার হয়ে গ্রাম-গৃহ,
দুর্গম পর্বত নদী।
দুস্তর অরণ্য মরু নগর বন্দর জনপদ।
বৃহতের অঙ্গীকারে ক্ষুদ্র-খণ্ড-ভগ্ন-ভ্রষ্ট—
সব কিছু অনায়াসে
অতিক্রম করে চলে যাওয়া।
'মানবজন্মের আদি উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ'
এবং 'ধর্ম হয় না খালি পেটে'
এ-দুইয়ের আলোকিত স্থির সমন্বয়
তারই নাম রামকৃষ্ণ মহাসঙ্ঘ।
সব চাওয়া—সব কিছু পাওয়া
একই সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া।
একদিকে পয়লা মে-র আগ্নেয় প্রতিশ্রুতি
মুক্তির ফরমান যেন নিয়ে আসে দুর্গতের-
জয় জনগণেশের জয়।

ক্ষুধারূপে তৃষ্ণারূপে সর্বভূতে যে দেবতা—
তাঁকেও অঞ্জলিদানে তৃপ্ত করতে হয়।
ভৌমনারায়ণের পূজা আদিকৃত্য।
কিন্তু তবু আরো এক অপরূপ হিরন্ময় দ্যুতি
আমাদের বুকের মধ্যে চমকায়।
আমাদের উচ্চকিত উদ্বেলিত করে বারবার।
মৃন্ময় এ-পথের প্রান্তে অন্য আরো কিছু আছে।
—সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-সাধ
আশা-ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অজস্র অনন্য বিভূতি
পার হয়ে আর এক বিজয়ী দেশ।
অন্য এক চিন্ময় অদৃশ্য দূরে দেবতার
সেইখানে পূজা হয়।
আমারই বুকের মধ্যে।

ডাক আসে তার।
এবং সে-ডাকে সাড়া দিতে হয়
সকলকেই একদিন।
জীবন-মৃত্যুর মোহনায়
নৌকা ভাসাতে হয়।

অচেতন-অবচেতন-অর্ধচেতন-অধিচেতনার
দরজা খুলে,
দরজা খুলে অন্বয় একক অধিমানসের
অতি অন্তঃপুরে
অপাবৃত হতে হয় অবশেষে।
এই দুই বিপরীত পৃথিবীর আশ্চর্য সন্ধান
এইখানে পাবে—
এই 'রামকৃষ্ণ বিপ্লবের' দক্ষিণাবর্ত বহ্নি—
নিজস্ব মুকুরে
তোমাকে দেখাবে পথ—দেখাচ্ছে।
এবং এভাবেই একদিন বিশ্বের নবজাগরণ
এবং ভারতমুক্তি সার্থক।
এভাবেই জীবনের সামগ্রিক সার্বিক উত্থান।
এভাবেই এই রূপনারাণের তীরে তীরে
জীবন ছাড়িয়ে অন্য
স্থায়ী মহাজীবনের অভিমুখে
যাত্রী হতে হয় সকলকে।

কবি-কথা মনে পড়ে
'রণ রক্ত সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়'—
'রামকৃষ্ণ বিপ্লবের' 'রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের'
পবিত্র এ সনদ, এ সংবিধান
'আমাদের সকলের অন্তর্গত রক্তের
ভিতরের বিপন্ন বিস্ময়'
মুছে ফেলে—
ঈশ্বরের নগরের অভিমুখে নিয়ে যায়।
কারণ আত্ম নয়, গণমুক্তি উদাত্ত ঘোষণা এবার।
'বহুজনসুখায়—বহুজনহিতায়'
অন্বিষ্ট এ আদর্শের দুর্গম পথের
অভিযাত্রী এই সঙ্ঘ—
এ-সঙ্ঘের পতাকায় লেখা আছে :
'বিবাদ সংঘর্ষ নয়, সহায়তা সহযোগিতার
প্রতিশ্রুতি ; বিনাশ বিনষ্টি নয়,
ভাবগ্রহণ পরস্পরের ;
মতান্তর মনান্তর নয় বন্ধু।
সমন্বয় শাশ্বত শান্তির যোজনা'—
আমাদের মাটির ঘরে
আনন্দ-নিকেতন নির্মাণের প্রকৃত প্রস্তাবনা।

* 'রামকৃষ্ণ বিপ্লব' কথাটি মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের। দ্রষ্টব্য : স্বামী বিবেকানন্দ : মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ১৯৮৮, কলকাতা, পৃঃ ৬৯

প্রবন্ধ

বুদ্ধপূর্ণিমা

স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ

আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে এক বৈশাখী পূর্ণিমায়, ফুলের সুগন্ধে আমোদিত রম্যকানন লুম্বিনী উদ্যানে এক প্রস্ফুটিত পুষ্পভারে নম্র শালতরুর পাদমূলে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্ম নিয়ে পণ্ডিতদের ভিতর মতদ্বৈধ আছে। কারও কারও মতে তিনি জন্মেছিলেন আষাঢ়ী পূর্ণিমায়। সে যাই হোক বিশ্বের জনসাধারণ বৈশাখী পূর্ণিমাকেই বুদ্ধের জন্মতিথি হিসাবে মেনে নিয়েছেন। কারণ, শালগাছের ফুল বৈশাখেই ফোটে, আষাঢ়ে নয়। বৈশাখী পূর্ণিমা সমগ্র বিশ্বে 'বুদ্ধপূর্ণিমা' নামে পরিচিত। চিরস্মরণীয় এই তিথি। তিনভাবে মহিমান্বিত এই তিথি। এই তিথিতে ভগবান বুদ্ধের জন্ম, তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ, এবং তাঁর মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তি। জগতের ইতিহাসে এমন একটি মহিমান্বিত দিন বিরল। এই বৈশাখী পূর্ণিমায় আর পাঁচজন জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের সঙ্গে পরবর্তী কালে বুদ্ধের নিকট সম্পর্ক ছিল। তাঁর স্ত্রী যশোধরা, সারথি ছন্দক, শিষ্য কালদায়িন ও আনন্দ এবং তাঁর অতি প্রিয় অশ্ব কণ্টক।

অপূর্ব ভগবান বুদ্ধের জীবন কাহিনী। শান্তিপূর্ণ রাজ্য, স্নেহময় পিতা, রূপেগুণে অতুলনীয়া যুবতী স্ত্রী, সদ্যোজাত শিশুপুত্র, রাজপ্রাসাদে বিলাসের অজস্র আয়োজন। এরই মধ্যে যুবক সিদ্ধার্থ সন্ধান পেলেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের মূল সমস্যার। জীবনের স্তরে স্তরে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর যে দুঃখ, সেই দুঃখের সত্য রূপ তিনি দেখলেন। প্রশ্ন জাগল রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে, সত্যই কি এর থেকে পরিত্রাণ নেই? দুঃখ আছে, দুঃখের নিরোধও নিশ্চয় আছে। কিন্তু কোন পথে? সেই মুক্তিপথের সন্ধানে রাজ্য ও রাজসিংহাসন, প্রিয়তমা পত্নী, নবজাত পুত্র সব পিছনে রেখে ২৯ বছর বয়সে তিনি নৈশ অন্ধকারে অভিনিষ্ক্রমণ করলেন।

আবার বৈশাখী পূর্ণিমা এল। বুদ্ধের বয়স তখন ৩৫ বছর। সুদীর্ঘ কঠোর সাধনা আজ সমাপ্ত হবে। গৌতম নৈরঞ্জনায় স্নান শেষ করে এসে বোধিবৃক্ষতলে বসলেন। তাঁর বিগত জীবন তিনি আলোচনা করতে লাগলেন, দেখলেন তখনো তাঁর মনে লালসার ছবি আছে, তবে তা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। তবে তিনি তাদের স্বরূপ চিনে নিয়েছেন এবং তাদের বেগ আর পূর্বের মতো দুর্দমনীয় নয়। মারের রাজ্য বা মায়ার রাজ্য তিনি অতিক্রম করবেন বলে মারও সুসজ্জিত হয়ে এসেছে। চলল তার আক্রমণের পর আক্রমণ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। তারা তাদের বল বিক্রম প্রভাব দেখাতে লাগল এবং উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হতে লাগল। এমন সময় গোপকন্যা সুজাতা বনদেবতার জন্য এক পাত্র অতি উৎকৃষ্ট পায়েস এনে দেখে, বৃক্ষমূল আলোকিত করে বসে আছেন সিদ্ধার্থ। সুজাতা তাঁকে বনদেবতা ভেবে সেই পাত্র দিয়ে গেল। বুদ্ধ তা গ্রহণ করলেন। তিনি তারপর এক অলৌকিক দৃশ্য দেখেন। তাঁর পিতা, তাঁর পালিকা মাতা, তাঁর পত্নী ও পুত্র এসে তাঁকে তাঁদের সঙ্গে ফিরে যেতে সানুনয় প্রার্থনা জানাচ্ছেন। তিনি বুঝলেন এখনো তাঁর ভিতর বাসনার বীজ মমতার মূর্তি ধরে ছলনা করছে। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি পরাজ্ঞান লাভের জন্য বসলেন। কঠিন সংকল্প গ্রহণ করলেন সিদ্ধার্থ—যতক্ষণ পর্যন্ত বোধিলাভ না করব ততক্ষণ আসন থেকে উঠব না।

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

—এই আসনে যদি আমার শরীর শুকিয়ে যায়, যদি আমার দেহচর্ম, অস্থি, মাংস, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবুও যতক্ষণ না বহুকল্প-দুর্লভ বোধিলাভ করছি ততক্ষণ আমি আসন পরিত্যাগ করব না।

গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ।

সন্ধ্যার পর পূর্ণিমার চাঁদ উঠল আকাশে, ধীরে ধীরে অন্ধকারের রাজ্য বিদূরিত হলো। আর গৌতমের হৃদয় থেকেও অন্ধকারের পর্দা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল, শেষে সব আলোকিত হয়ে গেল, কোথাও বাসনার বীজ রইল না। অন্ধকারের মূল বিনষ্ট হলো, জ্ঞানলাভ হলো। তিনি বোধিলাভ করলেন। মুক্তাত্মারা হর্ষিত হয়ে উঠল, দেবতারা তাঁর যশোগান করতে লাগলেন, পৃথিবী পুলকিত হয়ে উঠল। সিদ্ধার্থ জ্ঞানসমুদ্রে পরমানন্দে অবগাহন করলেন। তিনি বুদ্ধ হলেন।

ভগবান বুদ্ধ নির্বাণলাভের পর বললেন, আমি ঈশ্বর নই বা ঈশ্বরপ্রেরিত নই। আমি মানবসন্তান, সাধনাবলে জেনেছি জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য। জেনেছি দুঃখ কি, জেনেছি দুঃখের কারণ, সেই কারণ দূর করবার উপায়ও জেনেছি। তিনি সকলকে আহ্বান জানালেন জীবনের পথে, জীবনের প্রসারের পথে, নির্মল বিচারবুদ্ধির পথে। তিনি চারটি আর্য-সত্যের কথা বললেন। আর্যসত্যচতুষ্টয় হলো :

(ক) সংসার দুঃখের আগার। জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ, জরা দুঃখময়, অপ্রিয় বস্তুর সংযোগে দুঃখ, প্রিয়বিয়োগে দুঃখ, আর মৃত্যু তো পরম দুঃখ। (খ) তৃষ্ণা হলো বিষয়-বাসনায় দুঃখের আদি কারণ। (গ) আসক্তিত্যাগেই দুঃখনিবৃত্তি হয়। (ঘ) আসক্তি-ত্যাগের আটটি উপায় আছে—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সংকল্প, (৩) সম্যক্ বাক্য, (৪) সম্যক্ কর্ম, (৫) সম্যক্ আজীব বা জীবিকা, (৬) সম্যক্ ব্যায়াম বা সংযম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি বা ধারণা, (৮) সম্যক্ সমাধি। এই অষ্টাঙ্গযোগ সম্যক্-অভ্যস্ত হলে কাম-ক্রোধ-লোভের সংযোগ থেকে উৎপন্ন যাবতীয় দুঃখ দূর হবে। বস্তুতঃ এই ত্রিবিধ সংযোগ থেকেই উৎপন্ন হয় মানুষের যাবতীয় দুঃখ সুতরাং এই ত্রিবিধ দুঃখের পারে গেলেই মানুষ পরমা শান্তি—নির্বাণ লাভ করে। তাই বৈশাখী পূর্ণিমা হলো বুদ্ধ-আত্মার অভ্যুদয় তিথি।

প্রেম, মৈত্রী আর করুণার মূর্ত প্রতীক বুদ্ধ। সামান্য ছাগশিশুদের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন তিনি। সে-কাহিনী যদিও সবার জানা তবুও আবার বলি। বুদ্ধ চলেছেন মগধের পথে পথে। শুনলেন মগধের রাজধানীতে বিরাট উৎসব চলছে। উৎসব-ভূমিতে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ দেখলেন, অসংখ্য ছাগশিশুকে সেখানে বেঁধে রাখা হয়েছে। অপুত্রক মহারাজ বিম্বিসার সহস্র পশুবধ করে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছেন। বুদ্ধের প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি গেলেন মহারাজ বিম্বিসারের কাছে। কাতর মিনতি জানালেন :

"...করেছি কঠোর তপ—
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম-উপার্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ—
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ,—
বধ, রাজা, আমার জীবন—
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।"

বুদ্ধকে কেউ বলেন অবতার, কেউ বলেন মানব-শিক্ষক, কেউ বলেন লোকগুরু। আবার কেউ বলেন নির্বাণের মন্ত্রদাতা। তিনি এসবই। কিন্তু সবার আগে তিনি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং বিশ্ব-মানবের ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। বৌদ্ধদর্শনের আরম্ভ দুঃখ থেকে হলেও বুদ্ধ দুঃখবাদী ছিলেন না। সাধারণ মানুষ জীবন থেকে দুঃখকে বাদ দিতে পারে না। অথচ দুঃখের পারে যাওয়াই আধ্যাত্মিকতার অভিযান, আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্য। সাধারণ সাধকের অনিবার্য দুঃখানুভব থেকেই অধ্যাত্মিক যাত্রার আরম্ভ এবং নির্বাণে সেই যাত্রার পরিসমাপ্তি।

আবার বৈশাখী পূর্ণিমা এল। বুদ্ধের বয়স তখন আশি বছর। শালগাছে ফুল ফুটল, ভগবান বুদ্ধ শরীর ত্যাগের সময় জেনে আনন্দকে শালবৃক্ষমূলে শয্যা রচনা করতে বললেন। আনন্দ প্রিয়বিয়োগ আসন্ন জেনে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। বুদ্ধদেব তাঁকে শোক ত্যাগ করতে বললেন। সমাগত সকলকে শেষ উপদেশ দিয়ে সমাধিযোগে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, আসক্তি ও দুঃখের রাজ্যের পারে চলে গেলেন তিনি। আকাশে চন্দ্র দুঃখে ম্লান হলো, ধরিত্রী হলো নিস্তব্ধ, ভিক্ষুরা হলো মৌন, আর সকলের প্রিয় মহানির্বাণ-প্রাপ্ত বুদ্ধের মুখ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সকলে সমস্বরে বললেন : "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"।

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

হাড় কাঁপানো শীত পড়েছে কদিন। বৃন্দাবনে গরমও যেমন শীতও তেমনি। এবারে শীতের মাত্রা অন্যবারের তুলনায় একটু বেশি। তাই যমুনার ধারে আর যাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন তাই গেলাম বৃন্দাবনের শক্তিপীঠ কাত্যায়নী মন্দির দর্শন করতে। বৃন্দাবন মিউনিসিপ্যাল অফিস ডান হাতে রেখে একটা মোড় ঘুরেই ডানদিকে মন্দির দেখা গেল। এই স্থানটি রাধাবাগ অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে। বড় রাস্তা ছেড়ে একটু ছোট গলিপথে এগিয়ে মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে গেলাম। এই মন্দির সতীর একান্নপীঠের অন্যতম বলে পরিচিত। অবশ্য এই পীঠস্থান ছাড়া বৃন্দাবনের দক্ষিণ প্রান্তে শহরের বাইরে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার পথে আরও একটি ক্ষুদ্রায়তন মন্দির দেখা যায়। এটিতে প্রস্তরময়ী শিলার আকারে দেবী চামুণ্ডার বিগ্রহ আছে। এই দেবীকেও কেউ কেউ বৃন্দারণ্যের আদি শক্তিপীঠ বলে মনে করেন। যা হোক, আমরা সংশয়ের মধ্যে না গিয়ে আজ যে মন্দিরে এসেছি সেই মন্দিরেই ব্রজের আরাধ্যা দেবীর অধিষ্ঠান বিশ্বাস করে প্রবেশ করলাম। প্রবেশপথে সিংহচিহ্নিত তোরণ, তার পরেই একটু খোলা চত্বরের সংলগ্ন নাটমন্দির—পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। নাটমন্দিরের পূর্বপ্রান্তে ছোট্ট গর্ভমন্দির। সেখানে পশ্চিমমুখী দেবী কাত্যায়নীর অষ্টধাতু নির্মিত দশভুজা মহিষমর্দিনী বিগ্রহ। অপরূপ সুন্দর নিখুঁত মূর্তি।

মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করতেই মন্দিরের বর্তমান পরিচালক জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। স্থানীয় মিশনের সেবাশ্রমে চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে যেতে হয়। তাই মিশনের সাধুদের ইনি জানেন। মোহান্ত মহারাজ আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে গর্ভমন্দিরে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে দর্শন করালেন—দেবীর অষ্টধাতু নির্মিত অতি উজ্জ্বল দশভুজা বিগ্রহ। দক্ষিণ চরণ সিংহের পিঠের ওপর, বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি মহিষাসুরের দক্ষিণ স্কন্ধে। তিনটি মূর্তিই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। চালচিত্র সমেত বিগ্রহ চার ফুটের মতো মনে হলো। মাটি থেকে হাত দেড়েক উঁচু একটি আয়তাকার বেদি, তার ওপরে হাত খানেক উঁচু মূল বেদির ওপর দেবী অধিষ্ঠিতা। দেবীর একটি বিশেষত্ব—দশভুজা দুর্গামূর্তির দশ হাতের একটিতে অস্ত্রের বদলে একটি প্রস্ফুটিত কমল। সাধারণতঃ দেবী দুর্গার ধ্যানে এই কমল ধারণের কথা নেই। এখানে মায়ের বৈষ্ণবী-ভাব। তাই বোধ হয় তিনি একটি কমল হাতে নিয়ে এখানে বিরাজ করছেন। মোহান্তজী আরও দেখালেন—দেবীর ঠিক নিচে আয়তাকার বেদির ওপর একটি জায়গা কাচ দিয়ে ঢাকা। সেইটিই মূল পীঠস্থান। দক্ষযজ্ঞকালে সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব যখন সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে উন্মাদের মতো ভ্রমণ করছিলেন তখন বিষ্ণুচক্রে কর্তিত হয়ে সতীর দেহের নানা অঙ্গ নানা স্থানে পতিত হয়েছিল। লোকপ্রসিদ্ধি, সতীর কেশপাশ এখানে পড়েছিল। এখানে রক্ষিত সতীর প্রস্তরীভূত কেশকলাপ। সেই স্থানটিই কাচ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সকলের দৃষ্টির আড়াল করে। শুধু পূজারী নিত্যপূজার সময় কাচের আবরণ সরিয়ে মাকে ধুইয়ে মুছিয়ে সিন্দুর কুঙ্কুম দিয়ে ঢেকে দেন। কাচের ওপরেই পূজার অর্ঘ্যাদি দেওয়া হয়। বলা হয়—"ব্রজে কাত্যায়নী পরা"। এই স্থানটিই ব্রজাধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নীর মহাপীঠ।

দেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে নেমে এলাম। মোহান্ত মহারাজ আমাকে এনে বসালেন মন্দিরের

একপাশে বাগানের একটি বেঞ্চিতে। তিনি বললেনঃ "ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে এই কাত্যায়নী দেবীর প্রসঙ্গে এক অপার্থিব ঘটনার উল্লেখ আছে। এই ব্রজপুরীর গোপবৃন্দের আরাধ্য দেবতা মথুরার ভূতেশ্বর মহাদেব আর বৃন্দাবনের দেবী কাত্যায়নী। গোপালক জাতি আদিতে শক্তির উপাসক ছিল। মথুরাতে বা নন্দগ্রামে ভূতেশ্বর, নন্দীশ্বর এইসব নামে মহাদেব পূজিত হতেন, আর বৃন্দাবনের গোপকুমারীরা এই কাত্যায়নী পীঠের পূজা করতেন। হেমন্তকালে এক মাস ধরে অরুণোদয়-কালে যমুনার জলে স্নান করে হবিষ্য আহার করে বালির দুর্গামূর্তি তৈরি করে মহাশক্তির আরাধনা করতেন নানা পুষ্পপত্র ফলমূল ধূপদীপে গোপকুমারীরা। তাঁদের প্রার্থনা-মন্ত্র ছিলঃ কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরি! নন্দগোপসুতং দেবি। পতিং মে কুরুতে নমঃ।— হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে অধিশ্বরী দেবি, তুমি নন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি করে দাও। এই মন্ত্র জপ করে তাঁরা পূজা করতেন। "ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকা।" একমাস ধরে নিত্য কাত্যায়নী দেবীর এই মন্ত্রের জপ ও পূজায় একটি মাত্র প্রার্থনাই তাঁদের ছিল—"নন্দদুলাল আমাদের পতি হোন।" সে-বার দেবী কাত্যায়নীর কৃপায় একমাস পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দর্শন দেন। তাঁদের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে কথা দেন আগামী শরৎ পূর্ণিমায় তাঁদের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন।

"এই কাত্যায়নী দেবী বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শরৎ ও বাসন্তী নবরাত্রিতে এখানে মহা-ধুমধামে বিশেষ পূজা ও মেলা হয়। এছাড়া দীপান্বিতায় ও অন্যান্য বিশেষ তিথিতেও বিশেষ অনুষ্ঠানাদি হয়। দেবীর গর্ভমন্দিরে দেবীর উত্তর দিকের কোণে শিব ও দুই পাশের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে সূর্য, নারায়ণ ও গণেশের বিগ্রহ আছে। এই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠার মূলে আছেন এক বাঙালী সাধক, তাঁর নাম কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। হাওড়ার এক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। তিনি এই ব্রজধামে এসে নিজের সাধনায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মন্দিরস্থলী ও তীর্থস্থান সংস্কার করেন। কলকাতার এক কারিগরের দ্বারা একসঙ্গে অখণ্ডভাবে দেবী, তাঁর বাহন সিংহ ও মহিষাসুর অষ্টধাতুতে ঢালাই করে তৈরি হয়। জয়পুর থেকে প্রস্তরশিল্পীরা করে দিলেন ভৈরব চন্দ্রশেখর, বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তি। বাকি রইলেন গণপতির বিগ্রহ। গণপতি এলেন অদ্ভুতভাবে। এই সব মূর্তি যখন তৈরির কাজ চলছে সেই সময় স্বামী কেশবানন্দ স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেলেনঃ "আমার মূর্তি যখন কলকাতা থেকে আনবে তখন কেদারবাবুর কাছ থেকে সিদ্ধি-দাতা গণেশকেও নিয়ে আসবে।" এই কেদারবাবু ছিলেন কলকাতার এক ইংরেজ কোম্পানির কর্মী। তিনি এই স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্যও ছিলেন। কেদার-বাবুর কাছে অদ্ভুতভাবে এসেছিলেন গণেশের বিগ্রহটি। কাহিনীটি এই রকম—ডবলিউ. আর. ইউল নামে এক ইংরেজ কলকাতারই এক ইংরেজ রাজ-কর্মচারীর অধীনে কাজ করতেন। জার্ডিনস্কীনার এই কোম্পানির পার্টনার ছিল। ১৯১১/১২খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময় ইউলের স্ত্রী বিলেত যাওয়ার সময় জয়পুর থেকে একটি শ্বেত পাথরের গণেশ-মূর্তি কিনে দেশে নিয়ে গিয়ে তাঁর বৈঠকখানার তাকের ওপর রাখেন। একদিন ভোজের আসরে তাঁর বন্ধুদের ঐ মূর্তিটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা জানতে চান ওটি কি বস্তু। শ্রীমতী ইউল বলেন, এটি হিন্দুদের একটি দেবতা। এই কথা শুনে বন্ধুরা সেই পুতুলটিকে এনে তাদের খাওয়ার টেবিলে বসিয়ে নানা রঙ্গ-রসিকতা করতে থাকে। সেই রাত্রেতেই শ্রীমতী ইউলের কন্যা দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রলাপ বকতে থাকে—"একটা শুঁড় ওয়ালা পুতুল আমায় তেড়ে আসছে।" ডাক্তার বলে, মেয়ে জ্বরে প্রলাপ বকছে। সেইমত চিকিৎসা হয়। কিন্তু কোন ফল হয় না। একরাত্রে ইউল-পত্নীও স্বপ্নে দেখেন ষাঁড়ের ওপর চড়ে এক উলঙ্গ পুরুষ মাথায় রুক্ষ চুল, হাতে লম্বা একটি লাঠির মতো অস্ত্র নিয়ে তাকে বলছেনঃ "শিগ্‌গির ঐ মূর্তিটিকে যেখান থেকে এনেছ সেখানে ফিরিয়ে দাও। নইলে তোমাদের বিপদ হবে।" শ্রীমতী ইউল কলকাতায় স্বামীকে সব জানিয়ে জাহাজযোগে মূর্তিটিকে পাঠিয়ে দিলেন। মূর্তিটি তিনদিন ইউলের অফিসে ছিল। এই খবর আগেই সেখানে

ছড়িয়ে পড়ায় দর্শনার্থীর ভিড় সামলাতে অফিসের সাহেবরা হিমশিম খেয়ে মূর্তিটি তাঁদের অফিসের ব্রাহ্মণ কর্মচারী কেদারবাবুকে দিয়ে দেন। যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে। কেদারবাবু বিগ্রহকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সাধ্যমত পূজা অর্চনা করতে থাকেন। ইতোমধ্যে বৃন্দাবনের এই কাত্যায়নীর মন্দির ও মূর্তি নির্মাণের আয়োজন সাঙ্গ হতে স্বামীজী ও কেদারবাবু উভয়েই দৈবাদেশ পান। তার পরেই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার দিন কাত্যায়নী পীঠে অষ্টধাতুর বর্তমান দেবীমূর্তি, চন্দ্রশেখর মহাদেব, সূর্য, নারায়ণ ও গণেশ বিগ্রহ বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় বিধিমতেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই গণেশ বিগ্রহের কথা আমি আগেও অন্যত্র শুনেছিলাম। আজ চাক্ষুস করবার সৌভাগ্য হলো। ছোট্ট শ্বেত পাথরের চতুর্ভুজ লম্বোদর গণপতি ঠাকুরটি যে এত কাণ্ড-কারখানা করেছেন—তা দেখলে বোঝা যায় না, নিপাট ভাল মানুষের মতো শুঁড়টি ঝুলিয়ে বসে আছেন। বিলেতফেরত এই দেবতাকে এবং বৃন্দাবনের আদ্যাশক্তি দেবী কাত্যায়নী ও অন্যান্য দেবদেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে কাত্যায়নী পীঠ থেকে বেরিয়ে এলাম।

আজ সোমবার, ভাবলাম কাছেই তো গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির—বেলা যখন এখনো আছে, তাঁকে একবার দর্শন করে যাই।

কাত্যায়নীমন্দির থেকে বেরিয়ে রঙ্গনাথজীর মন্দির—যাকে বাঙালী দর্শনার্থীরা "সোনার তালগাছের মন্দির" বলে, সেটিকে বাঁদিকে রেখে, উত্তর দিকে এগিয়ে চললাম। সামনেই ডানদিকে লালাবাবুর বিগ্রহের মন্দির। লালাবাবু ছিলেন মুর্শিদাবাদের কান্দী ও কলকাতার পাইকপাড়ার জমিদার। বেলুড় অঞ্চলে গঙ্গাতীরে বাস করবার সময় এক রজককন্যার "মা বেলা যায়, বাসনায় আগুন দে" কথাটিকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অর্থে নেন। 'বাসনা' অর্থাৎ শুকনো কলাপাতা। লালাবাবু ভাবলেন, তাঁর নিজের জীবন-সায়াহ্ন সমাগত প্রায়। এখন তো ভোগ-বাসনায় আগুন দেবার সময়। তা-ই করলেন তিনি। রাজসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রজধামে এসে কৃষ্ণচিন্তায় নিজেকে সমর্পণ করলেন। রাজর্ষি লালাবাবুর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির জয়পুরী গেরুয়া পাথরের অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। মন্দিরাভ্যন্তরে রাধাগোবিন্দের নিত্যসেবার ও সাধু বৈষ্ণবের সেবার সুবন্দোবস্ত এখনো যথাসাধ্য চলছে। মন্দিরের প্রবেশপথের দক্ষিণে লালাবাবুর সমাধি। বাইরে থেকেই দেবতা ও দেবভক্তের প্রতি প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চললাম। ডানদিকে পড়ে রইল গোদাবিহার। কিছুদিন হলো পৌরাণিক কাহিনীর কিছু মূর্তি সাজিয়ে এখানে একটা প্রদর্শনীর মতো করা হয়েছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বেশ সুন্দর মূর্তি—প্রমাণ আকারের। মূলবিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণের। প্রবেশপথে কিছু দক্ষিণা দিতে হয় প্রবেশমূল্য হিসাবে।

বাঁদিকে ছেড়ে গেলাম ব্রহ্মকুণ্ড। ডানদিকের গোদাবিহারের সামনে দিয়ে যে গলি পশ্চিমদিকে গেছে সেই গলিতে একটু গেলেই এই ব্রহ্মকুণ্ড বা ব্রহ্মমোহন তীর্থ। এই স্থানেই চতুরানন ব্রহ্মা বৃন্দাবনবিহারীলালের অঘাসুর বধ-লীলা দর্শন করে বিস্ময়-পুলকিত হয়ে একটু পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন গোপাল-কৃষ্ণকে। তাই একদিন গোচারণকালে মায়াবলে সমস্ত গাভী-বৎস ও গোপবালকদের তিনি হরণ করে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাদের ফিরে না পেয়ে বুঝতে পারলেন কারসাজিটা। তিনিও মোক্ষম এক চাল দিলেন বৃদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মার ওপরে। নিজেই যোগমায়ার প্রভাবে ঐসব অপহৃত সবৎস গাভী ও গোপবালকদের রূপ ধারণ করলেন। অবশ্য এইভাবে নিজেকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করার আরও একটা উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। বৃন্দাবন শুধু মধুরভাবের দিব্যক্ষেত্র নয়, এখানে বাৎসল্য ও সখ্যভাবেরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছিল। বৃন্দাবনের গাভী ও গোপমাতাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল কৃষ্ণকে আপন সন্তানভাবে স্নেহ নিবেদন করা। এই লীলায় কৃষ্ণ নিজে সেই সব গোপমাতাদের ও গোমাতাদের কাছে নিজেকে মায়ায় পুত্ররূপে হাজির করেছিলেন।

প্রায় এক বছর এইভাবে তাঁদের মাতৃস্নেহকে কৃতার্থ করে তাঁদের দীর্ঘ সাধনায় সিদ্ধিপ্রদান করে ও ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করে তাঁর কাছ থেকে এইসব হৃত গোধন ও বালকদের ফিরিয়ে আনলেন গোপাল-কৃষ্ণ। [ক্রমশঃ]

সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক : স্বামী নিরাময়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজী ছিলেন অভয়ের প্রতিমূর্তি। তিনি বলতেন—ভয়ই মহাপাপ। মানুষকেই যদি ভয় করবি, জোর করে একজন মানুষের সামনে দাঁড়াতে না পারবি তো যমের সামনে দাঁড়াবি কি করে? যমের তো আর সময় নেই, এখনি হতে পারে। উপনিষদে আছে—নচিকেতা যমের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে—মৃত্যুর পর কি? যম বলছে—এ-প্রশ্ন ছাড়া অন্য কিছু প্রশ্ন কর, বর নাও। নচিকেতা বলছে—বর চাই না। অন্য প্রশ্নও আমার নেই। ঐটুকু ছেলের কি সাহস! যমের সামনে দাঁড়িয়ে এই কথা!

ভোরে ওঠা সম্বন্ধে বাবা বলছেন :

খেতড়ির মহারাজা দেরি করে উঠতেন। একদিন বললাম, 'যারা বেশি খায়, আর যারা দেরি করে ওঠে, তাদের লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।' সেই থেকে তাঁর ভোরে ওঠা—আমারও আগে। উঠে দেখি মহারাজা হাসছেন, কোনদিন ছাদে বেড়াচ্ছেন, কোনদিন বা আলো জেলে পড়ছেন—প্রকাণ্ড লাইব্রেরী।

ঠাকুর ও ঠাকুরের ছেলেদের সব ভোরে ওঠা। একদিন মঠে শরৎ মহারাজ ও আমি একঘরে শুয়েছি। মঙ্গলারতি হয়ে গেল। ঠাকুর উঠে পড়েছেন, আমি ঘুমোব? ছি ছি! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। একটু পরেই শরৎ মহারাজ উঠেছেন, ভেবেছেন আমি ঘুমিয়ে। জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই খড়খড়ি নাড়িয়ে মজা করে জানিয়ে দিই—আমি উঠেছি। পাছে ভোর ভোর উঠতে না পারি, তাই শোবার সময় বলে শুয়েছি—'এই অখণ্ডানন্দ, ঠিক তিনটের সময় উঠবি।' ঠিক তিনটের সময় কে যেন ডেকে তুলে দিচ্ছে—'এই অখণ্ডানন্দ, ওঠ্, তিনটে বাজে।' ঠাকুর কখন ঘুমোতেন, জানি না। স্বামীজীও তাই; রাত্রে যখন ডেকেছি—সাড়া পেয়েছি।

উন্নত জীবনে ঘুম কম। শরীরটা শক্ত সবল চাই। ভোর ভোর উঠবে। বিছানাতেই একটু চিন্তা—তখন শান্ত মন। তারপর বিছানা তুলে ঘরদোর ঝাঁট দেবে, পরিষ্কার করবে, চৌকাঠে জল দেবে। সব কাজে একটা ভাব চাই।

একজন চিঠি লিখেছে : মনে বৈরাগ্যের উদয় হচ্ছে। কি করবে—উপদেশ চেয়েছে।

বাবা শুনেই বলছেন :

ওর বৈরাগ্য-টৈরাগ্য বাজে কথা—ঠিক ঠিক হলে আবার কেউ লেখে নাকি? চুপচাপ বেরিয়ে পড়। জান তো ঠাকুরের সেই চাষার গল্প—যেই বৈরাগ্য হলো, কাঁধে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার স্ত্রী বলেছিল, তার দাদা একটু একটু করে সংসার ত্যাগ করছে। চাষা বললে—পাগলী, যার বৈরাগ্য হয়, সে কি আর একটু একটু করে সংসার ছাড়ে? সে একেবারে বেরিয়ে পড়ে—এই এমনি করে!

এক চাষা রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে—তার সাত ছেলে। ঘুম ভেঙে দেখে কোথায় কি? এদিকে সেদিনেই জাগ্রতের এক ছেলে মারা গেছে! কার জন্যে কাঁদবে? —এই এক ছেলের জন্যে, না ঐ সাত ছেলের জন্যে? স্বপ্ন সত্য, না জাগ্রত সত্য? স্বপ্নের সাত ছেলে যদি মিথ্যা হয়, জাগ্রতের এক ছেলেও মিথ্যা হোক—ভাবতে ভাবতে বৈরাগ্য এল, বেরিয়ে পড়ল।

আর একজন লিখেছে : বিয়ে করবে কিনা?

বেটা! আমি যেন বলব—তুমি বিয়ে কর! 'মা বলছে, দাদা বলছে'—ওর যেন একটুও ইচ্ছে নেই। ও ঠিক বিয়ে করবে, নইলে আবার লেখে! আমায় লেখা কেন? আমি 'না' বললেই যেন উনি আর বিয়ে করবেন না!...

মালা আর কত ঘোরাবে? ডাকো ব্যাকুল হয়ে। ডাকতে ডাকতে সব স্থির হয়ে যাবে, হাতের মালা হাতেই থেকে যাবে, আর ঘুরবে না, কাপড়েরই

খেয়াল থাকবে না—খসে পড়বে। নাম করতেই ইষ্টরূপ দর্শন হবে—তখন কত হাসি, কত কান্না, কত কথা, 'কেন দেখা দাওনি এত দিন ?'—এইসব। ব্যাকুল হও। এত জপ করতে হবে, এত তপ করতে হবে, এসব কিছু না। ব্যাকুল হয়ে, কাতর হয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকবে, বলবে—'দেখা দাও, দেখা দাও ; কত জনকে দেখা দিয়েছ, আমায় কেন দেবে না ? তুমি তো বলেছ—যে তোমার জন্য কাঁদবে তাকেই দেখা দেবে। তবে কেন দেখা দিচ্ছ না ?' 'দেখা দাও, দেখা দাও' বলে ব্যাকুলভাবে কাঁদবে। ঠাকুর আমাদের জিজ্ঞেস করতেন—'কিরে, কেঁদে কেঁদে ডেকেছিলি ?' যদি বলতুম, 'হ্যাঁ', তো খুব খুশি হতেন। আবার জিজ্ঞেস করতেন, 'চোখের কোন্ কোণ দিয়ে জল পড়েছিল ?' নাকের ডগার কাছ দিয়ে অনুতাপাশ্রু, আর কানের দিকের কাছে হলে বলতেন প্রেমাশ্রু।

ঠাকুরের কাছে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সবারই এসব কিছু-না-কিছু দেখা যেত—অষ্টসাত্ত্বিক বিকার—স্বেদ কম্প পুলক অশ্রু হাসি কান্না নৃত্য গীত, ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। স্বামীজীরও হতো, তবে খুব চাপা। আর ঠাকুরের তো লেগেই আছে। লেগে যাও। কেঁদে কেঁদে জানাও—কেন আমার কিছু হচ্ছে না ? কেন তোমার দেখা পাচ্ছি না ? কেন তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল ইচ্ছা হচ্ছে না ?

Hand, head and heart (হাত, মাথা ও হৃদয়) তিনটিরই culture (অনুশীলন) করতে হবে ; হাতের কাজ শারীরিক কাজকর্ম, মাথার কাজ বিদ্যা-বুদ্ধির অনুশীলন আর হৃদয়ের কাজ সেবা ভালবাসা। স্বামীজী আমায় লিখেছিলেন, 'It is the heart that conquers, not the brain' (হৃদয়ই জয়ী হয়, মস্তিষ্ক নয়)। প্রত্যেক প্রাণীই হৃদয়ের ভাষা বুঝতে পারে। স্বামীজীর ভিতর তিনটিই ফুটেছিল। আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রথমটি থেকে। স্বামীজীর মতো spiritual (আধ্যাত্মিক) আমরা না হতে পারি, তাঁর মতো heart (হৃদয়) বা intellect (বুদ্ধি) আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু হাতের কাজের দিক দিয়ে তো আমরা তাঁর অনুসরণ করতে পারি। মঠে তিনি বড় বড় হাণ্ডা মেজেছিলেন—এক ইঞ্চি পুরু ময়লা। আমরা কি একটা বাটিও পরিষ্কার করতে পারি না ? তিনি মঠের পায়খানা পরিষ্কার করেছেন—তা জানো ? একদিন গিয়ে দেখেন—খুব দুর্গন্ধ। বুঝতে আর বাকি কিছু রইল না, স্বামীজী গামছাটা একটু মুখে বেঁধে দুহাতে দুটো বালতি নিয়ে যাচ্ছেন। তখন সব দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে, বলছে, 'স্বামীজী, আপনি !' স্বামীজীর হাসি হাসি মুখ, বলছেন, 'এতক্ষণে স্বামীজী, আপনি !'

হাস-মুখ তেরা করল কি গুল।
অংদর জনাস রহ ইস্‌ক্ আগুন।

ইস্‌ক্ মানে Love (প্রেম)। এ-গানটা গাইছিল অবশ্য একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে, পশ্চিমে এক শহরে। আমার কানে যখন এল, তখন আমার মনে অন্যভাবই উঠল। ভাবলাম—সত্যি তো হাসিমুখ আর কার আছে ? এক তাঁরই (ঠাকুরের) হাসিমুখ দেখেছি।

তিব্বতে যাওয়া কেন ? তাঁর অদর্শনের পর কোথাও কিছু ভাল লাগত না। সর্বদা ভাবতাম—কোথায় গেলে আবার তাঁকে পাবো ? মনে হতো—হিমালয়ে গেলে নিশ্চয় পাবো, হিমালয় দেবস্থান। কৈলাস, মানস সরোবর, কেদারবদরী—ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে মনে হতো—বড় হলে ঐখানেই চলে যাবো। আরও শুনেছিলাম তিব্বতে এখনও সব বড় বড় বৌদ্ধ মঠ আছে। দেখবার খুব ইচ্ছে হতো। হিমালয়—পাহাড়ের পর পাহাড়, চির-তুষারাবৃত। সারা বছরে কখনো সেখানকার বরফ গলে না—সাদা ধবধব করছে, নির্মল নিস্তব্ধ। কতদিন বরফের ওপরেই কেটে গেছে। বেশ লাগত, চারদিক দেখতুম আর মনে হতো যেন কতদিনের পরিচিত পরিত্যক্ত স্থান !

তিব্বতে বৌদ্ধ মঠে আমাকে নিয়ে যায় বরফ থেকে তুলে প্রায় নগ্ন অবস্থায়। হিমে জমে যাচ্ছিলাম। তোমরা শিষ্য সন্তান, তোমাদের বলতে আর কি। শরীরের লক্ষণ দেখে তারা বলে ওঠে—'গে-লাম' অর্থাৎ আকুমার ব্রহ্মচারী। ওদের দেশে গে-লামের ভারি সম্মান। আমাকে বলে—'এইখানেই থাকো।' ঠাকুরের ছবি আমার কাছ থেকে নিয়ে বেদিতে বুদ্ধের কাছে রেখে আরতি করে, বলে 'এ কে ? এচোখ তো মানুষের নয়। এ ভগবান, এ

বুদ্ধ।' শেষে ছবি দেয়। এক এক মঠে ৪০০০, ৭০০০ সাধু। চায়ের জল চড়ানোই আছে। এ পাতা-চা নয়—ট্যাবলেট-চা। গরম জলে নিয়ে যখন ইচ্ছে, যত ইচ্ছে খাও। চা না খেলে জমে যেতে হয়। মাঝখানে আগুন জ্বলছে—চায়ের জল ফুটছে আর চারদিকে সব দেয়ালে গাঁথা চেয়ারের মতো ধ্যানের আসন। চা খেয়ে নিচ্ছে, একটু মাংস-টাংস খেয়ে নিচ্ছে। আবার ধ্যানে বসে যাচ্ছে।

তিব্বতী ভাষা শিখে ফেলেছিলাম। সেখানে মেয়েরা বলে, 'তোমার কি মা বোন কিছু নেই? বেশতো, এখানে বিয়ে কর না।' আমি বলি, 'তোমরা সবাই তো আমার মা। কাকে বিয়ে করব বল না? আমি সন্ন্যাসী যে।' তাসি লামা political head (রাষ্ট্রপ্রধান), দলাই লামা spiritual head (ধর্মগুরু)। ও-জাতিটাই spiritual (আধ্যাত্মিক)। কোন লামা যখন মরে ওরা খবর রাখে—তিনি কোথায় জন্মাচ্ছেন, খোঁজ করে তাঁকে নিয়ে আসে এবং লামাপদে বরণ করে—সে যত ছোটই হোক। একজন 'অছি' থাকে—সেই সব করে, তাকে সব বলে। একবার ব্রিটিশ রিজেন্ট-এর সঙ্গে কথা হচ্ছে, অছি সব বুঝিয়ে দিচ্ছে। আঠারো মাস বয়সের লামা ঘাড় নেড়ে approval (সম্মতি) বা dis-approval জানাচ্ছে। ওরা জাতিস্মর হয়—পূর্ব-জন্মের সব কথা মনে থাকে।

তিব্বতী পোশাক পরে ফিরছি। কাশ্মীরে আটকালে, নজরবন্দী করে রাখলে, গভর্নমেন্টের ধারণা—আমার বুঝি কোন political (রাজনৈতিক) উদ্দেশ্য। তিব্বতী ভাষা শুনে আরো সন্দেহ, বলে —কেন ওরা তোমায় অত ভক্তি করে? আমি বলি— সেকথা ওদের জিজ্ঞেস কর না। আমি বাঙালী সন্ন্যাসী, বরানগরে আমাদের মঠ। আমায় ছেড়ে দাও। নতুবা আমি অনশন আরম্ভ করব। জেলে কিছু খেতুম না। হাবিলদার চেষ্টা খুব করছিল—যাতে ছেড়ে দেয়। হাবিলদারের স্ত্রী কত বলে—'মহারাজ, খান; নইলে আমাদের অকল্যাণ হবে। এই তো ছেলেমানুষ। আমাকে মা মনে করে আমার কথা শুনুন।' কান্নাকাটি করে। আমি বলি, 'গর্ভধারিণী মাকে কাঁদিয়ে এসেছি। তোমার চোখের জল টলাতে পারবে না মা, তেমন সাধু নই।'

শেষে তাদের ছোট্ট ছেলেটি যখন বিকেলবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে জানালা দিয়ে তার আধলা দিয়ে কেনা চা ও আপেল নিয়ে এল, তখন আর পারলুম না। সে বলতে লাগলো—সাধুজী, দাদাজী, খাও। চোখে জল এল, তার দেওয়া জিনিসগুলো খেলুম। খোঁজ-খবর নিয়ে ওরা জানলো—রাজনীতিক কোন কিছুর সঙ্গে আমার যোগ নেই। তখন মুক্তি—তবে পুলিশ সঙ্গ ছাড়েনি। বালিতে নামতেই পুলিশ বরানগর মঠে পৌঁছে দিলে।

'গহনা কর্মণো গতিঃ'—বুঝলে কর্মযোগ বড় শক্ত পথ, ধ্যান জপ তো তার তুলনায় ঢের সহজ। কি ধ্যান-জপ কর—সবই বুঝি, ও কেবল ফাঁকির পথ। যা ধ্যান-জপ হয়, তা আমার জানতে বাকি নেই। কাজ কর, কাজ কর। Positive something—যার ফল হাতেনাতে দেখা যায়। তোমারও ভাল, অপরেরও ভাল—'সা চাতুরী চাতুরী।' Work, work (কাজ কর, কাজ কর), তবে as worship (উপাসনার ভাবে)—এইটুকুই যোগ। যার ধ্যান-জপ ভাল হবে, তার কর্মের শক্তি ও কর্মের কৌশল বেড়ে যাবে, সে কখনো tired (শ্রান্ত) হয় না, কারণ তার শক্তির বাজে খরচ হয় না; সে কখনো বিরক্ত হয় না, কারণ তার কিছুতে আসক্তি নেই, সর্বদা শান্ত, অক্লান্তভাবে কাজ করে। এই তো test (পরীক্ষা)—মন ঠিক চলছে কিনা, তা এই থেকেই বেশ বোঝা যায়।

খুঁটিনাটি সব কাজ নিখুঁতভাবে করতে হবে—বাইরের কাজ যা-তা করে করলুম তা নয়। সব কাজ যত্ন নিয়ে করতে হয়। যখন যেটা করবে তখন সব মনটা তাতে থাকবে, আর মনে করতে হয় সেটাই সাধন—তাঁকে পাবার উপায়—সহায়ক। ঢাকার ডাঃ গাঙ্গুলী বাগান কোপায়, ফুলগাছে জল দেয়, আর ভাবে: এই ঠাকুরের বাগান, জল দিচ্ছি, গাছ হবে, ফুল হবে, সেই ফুলে ঠাকুরের পূজা হবে। সর্বদা এই চিন্তা। এই তো জপ-ধ্যান, এই তো সাধন-ভজন। [সমাপ্ত]

মাধুকরী

স্বামী বিবেকানন্দ ও বেদান্ত

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য

আধিব্যাধি-প্রপীড়িত মানবের সমস্যাসঙ্কুল জীবনে পরম শান্তির অমৃতময় স্পর্শ প্রদান করিবার জন্য যুগে যুগেই মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। প্রতিপদে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং হতাশার ভারে মানুষ যখন বিহ্বল হইয়া সমস্যা সমাধানের পথ অন্বেষণ করিতে থাকে, লোকোত্তর প্রতিভাশালী মহামানব তখন জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধানের পথের নির্দেশ দিয়া জগতের পরমকল্যাণ সাধন করেন। মহামানব প্রবর্তিত সেই নূতন পথে অগ্রসর হইতে অনেকের মনে প্রথমতঃ সংশয় ও দ্বিধা উপস্থিত হয়, কিন্তু মঙ্গলবিধানের সেই পথ নিজের প্রভাবেই সমস্তের নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে। যুগদেবতারূপী মহামানব নিজের অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অপরিসীম ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যুগোচিত যে-ধর্মের প্রবর্তন করেন তাহার গভীরতা ও উপযোগিতা কালপ্রভাবে আপামর সকলের নিকট প্রতিভাত হয় এবং মানব ঐ ধর্ম অনুসরণ করিয়া আত্মিক উন্নতি-বিধানে যত্নবান হয়। এইরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা অবশ্য বেশি নহে কিন্তু সমাজের প্রয়োজনেই ইঁহাদের আবির্ভাব ঘটে। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁহার উত্তরসাধকরূপী স্বামী বিবেকানন্দ এই স্তরের মহামানব।

পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার যুগে যখন শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল যে, ধর্ম কি মানুষের সামাজিক কল্যাণ ও সার্বজনীন মৈত্রী স্থাপনে সক্ষম? মানব-জাতির জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের পথে ধর্মের কি কোন অবদান আছে? এই প্রশ্নের সংশয়াতীত সমাধানের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ যুগাবতার পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। লোকাতীত সাধনার সাহায্যে দার্শনিক বিচার ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের কাছে অতি সহজ ও সরলভাবে প্রতিপাদন করিয়া পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা যুক্তিমূলক, নীতিমূলক এবং পরমার্থপ্রদ। নবযুগের প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবর্তিত ধর্ম ও উপদেশ শুধু মানুষে মানুষে নহে, সমগ্র বিশ্বের মহামিলনের সেতুরূপে ইহা সর্বত্র সুধীজন-কর্তৃক সমাদৃত। মানবসমাজের দিব্য সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিতে এই ধর্ম এমন এক পথের উদ্ভাবন করিয়াছে, যেই পথ মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধিকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া এক অমৃতলোকে পৌঁছাইয়া দেয়। এই ধর্মের সার্থক রূপদান করিবার জন্যই গৈরিকমাত্র সম্বল পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিকের মতোই ভারত যখন নানারূপ অবিবেক ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণ করিতে অসমর্থ ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল তখন স্বামী বিবেকানন্দ অবতীর্ণ হইলেন জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা হাতে লইয়া ভারতকে পথনির্দেশ করিতে। সেদিন ধর্মকলহে বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক তর্কে বিভ্রান্ত, আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধিতে শতধা-বিভক্ত দুর্বল ভারতের এক মহাদুর্দিন। সামাজিক দুর্নীতি, পক্ষাঘাত-প্রাপ্ত বর্ণাশ্রমধর্ম ব্যর্থ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের দুঃসহ বাহ্যিক আড়ম্বর, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যস্বাতন্ত্র্যবাদের কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে সামাজিক ধর্মজীবনের কৃত্রিমতা, শুষ্ক তর্কপ্রধান চিন্তার সঙ্কীর্ণতা এবং নবাগত বৈদেশিক সভ্যতার চাকচিক্যময় প্রলোভনের ফলে সর্বস্তরের মানুষের মনে এক সর্বনাশা বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার উপক্রম। মনীষী রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের দুর্নিবার আকর্ষণে হিন্দুসমাজের শিকড়েই সেদিন টান পড়িয়াছিল। সেই জাতীয় দুর্দিনে দক্ষিণেশ্বরের অলৌকিক যুগন্ধর মহামানবের প্রাণপ্রিয় মন্ত্রশিষ্য বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন ভারতের

মর্মবাণী। সমস্ত বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা জয় করিবার মহামন্ত্রস্বরূপ অদ্বৈত বেদান্তের পরম সত্য সমগ্র বিশ্ব নূতন করিয়া শুনিতে পাইল মহামহিমময় সন্ন্যাসীর মুখ হইতে। ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মুখ হইতে মহামিলনের ঐ অভয় বাণী সমগ্র বিশ্ব প্রকম্পিত করিয়া উচ্চারিত না হইলে মৃতকল্প ভারত বিশ্বসভায় স্থান পাইত না, সভ্যতার মদগর্ববাহী পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের দাম্ভিকতার বিজয় ডিণ্ডিমনাদে ভারতের ক্ষীণস্বর চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইত। সেইদিক দিয়া চিন্তা করিলে স্বামীজীর মতো দেশগৌরবরক্ষী আর দ্বিতীয় কেহ নাই। কেবল বিশ্বের দরবারে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াই বীরসন্ন্যাসী ক্ষান্ত হন নাই, মেরুদণ্ডহীন পরপদানত দুর্বল ভারতবাসীকেও তিনি অমৃতের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন, বেদান্তের চরম তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া ব্যবহারিক জীবনের সহিত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধনের দ্বারা দেশবাসীকে সবল করিয়াছেন। পরপদানত স্বধর্মভ্রষ্ট অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যে-জাতি মরণের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, আসুরবলসম্পন্ন বিদেশীর দাসত্ব ব্যতিরেকে যে-জাতি বাঁচিবার উপায় দেখিতে পায় নাই, সেই জাতির মৃত্যুকল্প দারুণ দুর্দশা দূর করিবার পথ উদ্ভাবন করিয়া স্বামীজী এক নূতন যুগের প্রবর্তন করিলেন। দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইবার মতো খাদ্য যাহাদের জুটে না, নিজের আত্মরক্ষার শক্তি যাহাদের নাই, অশনে বসনে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিপদেই যাহাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় সেই জাতির সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলীয়ান হওয়া। নিজের ভিতরে অনন্তশক্তির প্রস্রবণ লুক্কায়িত রহিয়াছে—এই বোধ জাগ্রত করিতে না পারিলে কেবলমাত্র বাহিরের শক্তি সঞ্চয় করিয়া কখনও কেহ প্রকৃত বলশালী হইতে পারে না। সমষ্টিগতভাবে জাতীয় সমুন্নতিসাধন ব্যতীত কখনও কোন দেশ প্রকৃত বড় হইতে পারে না। আর ঐ জাতীয় সমুন্নতি নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজের আত্মসত্তায় উদ্বুদ্ধ হইবার উপর। যে-জাতির মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে শতকরা আশিজনেরও অধিক সদস্য বিবেকের অনুকূল উদার মনোভাবসম্পন্ন হইতে পারে না, ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক। সুতরাং সেই অবহেলিত মূঢ় জনসাধারণের উন্নতির জন্য তাহাদের মধ্যে জাতীয় সঙ্ঘশক্তির সঞ্চার করা একান্ত প্রয়োজন। আত্মশক্তির বিকাশসাধন ব্যতিরেকে জাতীয় সঙ্ঘশক্তি জাগ্রত হয় না। ত্যাগ, বৈরাগ্য, সহনশীলতা জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আত্মশক্তিও জাগ্রত হয় না। বিলাস বাসনা, আত্মসুখ, পরতন্ত্রতা, নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিজনদিগকে চাকচিক্যময় বসন-ভূষণে সজ্জিত করিবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দূর করিতে না পারিলে প্রকৃতপক্ষে উদারহৃদয় হওয়া যায় না এবং উদারতার প্রসার না ঘটিলে জাতীয় সংকীর্ণতা সঞ্জাত দুর্বলতাও দূর হয় না; এই জন্যই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সর্বতোভাবে বেদান্তের বাণী ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ মানুষ যদি বুঝিতে পারে যে, সে অমৃতের সন্তান, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্তার সহিত নিজের সত্তার ঐক্য যদি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে আর আত্মপর ভেদবুদ্ধির বশীভূত হইয়া মানুষে মানুষে সঙ্ঘাতের সৃষ্টি হইতে পারে না, সংকীর্ণতা হইতে উদ্ভূত হিংসার যূপকাষ্ঠে মানুষ আর আত্মবলি দিতে পারে না।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে প্রত্যেক সুধী-ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, বেদান্তজ্ঞানই ভারতের স্থিতির মূল ভিত্তি। উপনিষদ্-প্রবাহিত বেদান্ত-জ্ঞানের শত-সূর্য-সমুজ্জ্বল দিব্য আলোকে শুধু ভারত কেন, সমগ্র জগৎই যে উদ্ভাসিত হইয়া, অস্বীকার করা সম্ভবপর নহে। মনুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে :

> এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
> স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥

ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে—জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ধর্ম প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইলে সর্ববিদ্বৎশিরোমণি ত্যাগব্রতী জ্ঞান-তপস্বীদের নিকট হইতেই উহা শিখিতে হইবে। অক্ষয় সম্পদ্-স্বরূপ অম্লান পারিজাত-কুসুমের মতো নিত্য দেদীপ্যমান উজ্জ্বল চারিত্রিক উৎকর্ষ একমাত্র ভারতীয় ঋষিদের মধ্যেই বর্তমান। সুতরাং অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকার দূর করিতে হইলে তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে।

উপনিষদ্-প্রবর্তিত ভারতের অক্ষয়সম্পদসদৃশ বেদান্তজ্ঞানই ভারতীয় চরিত্রের তথা জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। জীবনের সর্বস্তরে পরিপূর্ণ বিকাশলাভের মূল উৎসস্বরূপ বেদান্তজ্ঞানের প্রসারণশীল বিশ্লেষণের মাধ্যমেই জাতীয় সমুন্নতি, হিতকর প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে। ভোগপ্রবণ বিলাস-চঞ্চল জাতির বহুমুখী প্রবৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিবার জন্য বেদান্তজ্ঞানের সরল বিশ্লেষণ এই জন্যই একান্ত আবশ্যক। এই পরম সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াই বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে সর্বত্র তাঁহার নিজস্ব সাবলীল ভঙ্গিতে বেদান্তের প্রচার করিয়াছেন, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া বেদান্তের গূঢ় মর্মবাণী সাধারণ-জনগ্রাহ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর শুধু ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, তিনি নিজেই ছিলেন মূর্তিমান বেদান্ত।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যাহা কিছু আছে—তাহা সকলই সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ। ভিতরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে—যেখানে যাহা কিছু দেখিতে পাই, অনুভব করি—তাহা সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বাদ দিলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল অস্তিত্বই থাকে না। "সন্মূলাঃ সৌম্য ইমাঃ প্রজাঃ, নেদমমূলং ভবতি"—হে সৌম্য! পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ সমস্তই সেই সচ্চিদানন্দময় সংবস্তুকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত, ইহার মূলে সেই সত্তাই বিদ্যমান—ইহা মূলশূন্য নহে। ইহাই বেদান্তের চরম কথা। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে—বেদান্তের এই মহাবাণী তাঁহার ভিতর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, সমস্ত ভেদ, সকল সংকীর্ণতা নিঃশেষে পরিহার করিয়া বিমল আনন্দের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে তিনি চির-উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন।

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ইহাই অদ্বৈতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই মহাবাণী কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি নিজেই মূর্তিমান বেদান্ত ছিলেন।* [ক্রমশঃ]

* বিবেকানন্দ শত-দীপায়ন, বিবেকানন্দ সংঘ, বজ বজ, ২৪ পরগনা, জানুয়ারি, ১৯৬৩, পৃঃ ২০৫-২০৮

সংগ্রহ ঃ সতীপদ চট্টোপাধ্যায়

THE STATESMAN

MAY 5, 1883

CALCUTTA

THE SHAMBAZAAR BRAHMO SOMAJ.—This Somaj celebrated its 20th anniversary at the residence of Baboo Srinath Mittra and brothers in North Circular road on Wednesday last. The prayer-hall was modestly and tastefully decorated with flowers and evergreens. From early morning hymns were sung till 7, when divine service commenced. In the afternoon Ramkisto Parankrisna [sic], the sage of Dukhineswar, discoursed on morality and religion. The evening service commenced at 7-30, the Pundit Sivanath Sastri M. A., and Baboo B. C. Benerjee officiating. The choir was led by Baboo Rabindra Nath Tagore.

সংগ্রহ ঃ পীযূষকান্তি রায়

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সামাজিক ছবি

"খ"

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরদিন দুপুরবেলা দ্বারে একখানি গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতে বৌ দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "কেওয়াড় খোল দেও, সরলা দিদি আয়া।"

সরলা ভিতরে আসিয়াই "মণি, মণি" বলিয়া চারুবাবুর ভগিনীকে ডাকিতে লাগিল। বৌ তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "মণির ভাসুর এসেছে, সে বেরুবে না, তুমি যদি পার এসে বার কর।" দুজনে মণির ঘরে গিয়া দেখে, সুহাস মণির কাপড় ধরিয়া টানিতেছে এবং বলিতেছে, "আয় না, সরলা পিসি এসেছে।"

সরলা সুহাসকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিল এবং মণির পিঠে একটা কিল মারিল।

মণি বলিল, "আমি যাব না, লজ্জা করে।"

"তোমাকে ইচ্ছা করে যেতে হবে না, আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি," বলিয়া সরলা মণির হাত ধরিয়া বৈষ্ণবীর ঘরে লইয়া গেল। বৈষ্ণবী মণিকে বলিল, "কেন বোন, আমাকে এত লজ্জা কেন?" সরলা বলিল, "এবার লজ্জা ভেঙ্গে গেছে।"

বৈষ্ণবী গাহিল,—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং।
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং॥"

সরলা চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আপনি তো অতি সুন্দর গাইতে পারেন! মনে হয় যেন নিয়ম মতো কোন ওস্তাদের কাছে শিখেছেন।"

বৈষ্ণবী বলিল, "যথার্থই আমি একজন ভাল গায়িকার কাছে গান শিখিয়াছি।" গান শুনিয়া পিসিমা আসিলেন এবং সরলাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

সরলা বৈষ্ণবীকে বলিল, "রামপ্রসাদী গান জানেন?" বৈষ্ণবী কয়েকটি রামপ্রসাদী গাহিল, গান শেষ হইলে বৌ বৈষ্ণবীর দিকে দেখাইয়া বলিল, "সরলা, ইনিও তোমার মতো বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী।"

সরলা। "বটে, কিন্তু আমার মত কিছু বদলে গেছে ভাই। আমি বলি, বিধবাদের বিবাহ দেবার জন্য হাঙ্গামা না করে, স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার করা হোক। শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীনতা পেয়ে মেয়েরা আপনাদের ইচ্ছামতো বিবাহ করবে বা করবে না। যদি উচ্চ শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা বুঝতে পারে, বিবাহই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, তা ছাড়া আরও বড় জিনিস আছে, তাহলে জবরদস্তি সমাজে বিধবা বিবাহ চালানো একটা মহাভুল হয়ে যাবে।"

বৈষ্ণবী। "কিন্তু যতদিন মেয়েরা ঐ শিক্ষা ও স্বাধীনতা না পায়, ততদিন কি হবে?"

সরলা। "ততদিন বিশেষ করে বিধবাদের পড়া-শুনা ও কাজকর্ম শেখানো হোক, যাতে তাদের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট ও অপর মনোকষ্ট না হয়।"

বৈষ্ণবী। "আপনি ঐ কথা বলে কুমারীদের জবরদস্তি বিবাহ বন্ধ করতে পারবেন কি? তা যদি না পারেন, তবে বিধবাবিবাহ না হয় কেন? যখন শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রভাবে বিবাহ বন্ধ হবে, তখন একসঙ্গে দুই বন্ধ হবে।"

সরলা। "কি কুমারীর, কি বিধবার জবরদস্তি বিবাহ দেওয়া যদি খারাপ বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে খারাপের যত কম হয় ততই ভাল না?

মনে করুন, গোড়াতেই কুমারীর জবরদস্তি বিয়ে বন্ধ করা গেল না, বিধবার যদি পারা যায় তাহলে মন্দের ভাল হলো না? কতকটা লাভ হলো তো?"

বৈষ্ণবী। "ওকথা বুঝতে পারি না। জবরদস্তি বিবাহ আর বিবাহ না হওয়ার মধ্যে প্রথমটি আমার ভাল বোধ হয়। অবশ্য আমার মতে স্বয়ম্বর বিবাহই ঠিক, যাতে স্ত্রী-পুরুষ স্বাধীনভাবে পরস্পরকে মনোনীত করে, যতদিন ইচ্ছা বিবাহবন্ধন রাখতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে ততটা উন্নতি হওয়ার এখন অনেক বিলম্ব আছে। বর্তমান সময়ে যেমন কুমারীর বিবাহ হয়, তেমনি বালবিধবারও হওয়া উচিত।... অবসর দুজনকে সমান দেওয়া উচিত।"

সরলা। "কেন, বালবিধবারা একবার অবসর পেয়েছিল তো?"

পিসিমা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সরলা, তুমি ঠিক বলেছ, মা। এই দেখ, আমি নয় বছরে বিধবা হয়েছি। আমার মন বোঝে, আমি পতি পেয়েছিলুম, কপালের দোষে হারিয়েছি। এতে সমাজের দোষ দিতে পারি না। কিন্তু দুষ্ট লোকে যদি আমার বিবাহ হতে দিলে না, ওর পতিলাভের অবসরই হলো না, এতো পুরোমাত্রায় সমাজের দোষ।"

সরলা বৈষ্ণবীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার ও আমার মনে কি হয় তা দেখলে তো হবে না। সমাজে, সাধারণতঃ বিধবা ও কুমারীদের এ-সম্বন্ধে কি মনের ভাব দেখতে হবে। পিসিমা যা বললেন, তাই সমাজের—" সরলার কথা শেষ হইতে না হইতে মাণ উঠিয়া গেল। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। সরলা বলিল, "এ-বিষয়টি মাণর সম্মুখে আলোচনা করা ঠিক হয়নি।

কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বোধ হয় যাদের সন্তান হয়নি, সেই সমস্ত বিধবাদের কুমারীর মতো মনে করা উচিত। যাদের সন্তান হয়েছে তাদের না হয় বিয়ে না দিবেন।"

সরলা। "ও কথাটা বড় পাকা নয়। যাদের সন্তান হয়েছে, তাদের পতির আবশ্যক বেশি। একবার বিধবাবিবাহ চলে গেলে, বয়সের গণ্ডি বা সন্তানের গণ্ডিতে বাগ মানবে না। যার ইচ্ছা হবে, সেই বিয়ে করবে।"

বৈষ্ণবী। "তাতেই বা ক্ষতি কি? সংসারে সব বিষয়ে কম্পিটিশন আছে, বিবাহেও হবে। যেমন ইউরোপে আছে।"

বৌ। "কি বললে, বাঙলায় বল। আমরা যে ইংরেজী জানি না।"

সরলা। "উনি বলছেন, সংসারে যেমন সব বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, পরস্পর লড়ে, টক্কর দিয়ে, যে বলবান বা কৌশলী, সে-ই যেমন জেতে বিবাহতেও তাই হোক। কিন্তু এ-প্রশ্নটি অতি গুরুতর। ইউরোপে ঐ প্রথা আছে বলে এদেশেও যে তাই করতে হবে, তার মানে কি?"

বৈষ্ণবী। "মানে আর কিছু নয়, সকলকে সমান অধিকার দেওয়া হচ্ছে। ন্যায়, সব বিষয়ে সকলের সমান অধিকার আছে, যার ইচ্ছা চেষ্টা-চরিত্র করে সে লাভ করুক। কতকগুলো কুসংস্কার,... লোকের স্বাধীনতা বা সুখে বাধা দেয় কেন?"

সরলা। "স্ত্রী-পুরুষ সকলে সমান অধিকার, স্বাধীনতা পায়, এই তো সভ্যসমাজের লক্ষ্য ও গতি। তবে এক রকম জবরদস্তি স্বাধীনতা দেওয়া আছে, যা পরাধীনতার চেয়ে অনিষ্টকর। স্বাধীনতা সামর্থ্যের সঙ্গে যায়, অসমর্থের স্বাধীনতা অশেষ কষ্টজনক। মেয়েদের লেখাপড়া, উচ্চভাব, উচ্চ আদর্শ প্রভৃতি শেখালে তারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারলে আপনাদের সমস্যা আপনারা মীমাংসা করতে পারবে। কান্নে কি দুর্বলকে বলবান করতে পারে?"

"তোমরা বস মা, আমি ওদিকে যাই।" বলিয়া পিসিমা উঠিলেন।* [ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩১১, পৃঃ ৪৬-৫১

পরমপদকমলে

হনুমান

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চায়। জীব-জগতের অন্য প্রাণী তা চায় না। তারা বাঁচে, সংগ্রাম করে, কালে মরে যায়। কারণ, তাদের স্থিতি, অস্থিতি আছে; কিন্তু কোন প্রশ্ন নেই। আমরা সবাই কালের অধীন—

'কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥'

কাল খেলা করছেন। মহাকাল। খেলা করছেন আমাদের জীবন নিয়ে। আমরা আছি বলেই কালের গতি। নশ্বর আছে বলেই অবিনশ্বরের অনুভূতি। আসলে কাল হলো স্থির। তার নিজস্ব কোন গতি নেই। আজ-কাল-পরশু আপেক্ষিক শব্দ। কালের আজ, কালের পরশু নেই। আমার আছে। 'আজ' আমার; কারণ আমার অবস্থিতি সময়ের অনুভূতিতে বাঁধা। দৃশ্য জগৎ সেই অনুভূতির স্রষ্টা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত আবার সূর্যোদয়—মানুষ ভাবে চলে গেল একটা দিন। আমার জীবনের একটা দিন। ভাবনার কারণ—আমি অমর নই। আমার জীবন দিনের সংখ্যায় বাঁধা। সেই সংখ্যা আমার জানা নেই। ব্যাঙ্কে আমার কিছু পুঁজি আছে; কিন্তু পাসবই আমার হাতে থাকলেও আপ-টু-ডেট হিসাব আছে আমার ব্যাঙ্কারের কাছে। আমি রোজ চেক কাটছি, কবে বাউন্স করবে আমি জানি না। জানি, আমি একটা ঘড়ি। টিক্‌টিক্ করে চলছি। কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। কবে দম ফুরোবে আমি জানি না। আমার চলাটাই কাজ। তাই চলছি। বা আমার নিয়তি হলো—থামা চলবে না। থামতে দেবে না আমাকে। দম ফুরোবে, তবেই আমি থামব। আর তার নামই হলো আমার মৃত্যু। মোমবাতির সঙ্গে তুলনীয় আমি। আমি জ্বলব, আমি গলব। গলতে গলতে নিঃশেষ হয়ে যাব একদিন। জ্বলাটাই আমার ধর্ম, গলাটাই আমার নিয়তি।

মৃত্যুই যদি আমার ভবিষ্যৎ, তাহলে ভবিষ্যৎ নিয়ে এত উদ্বেগ কেন? কেন আমার এত মৃত্যুভয়। কারণ, আমি মানুষ। আমি চিন্তাশীল। আমার মৃত্যুভয় চাপা পড়ে যায় আমার অস্তিত্ব রক্ষার ভয়ে। এই মরণশীল সংসারে আমি মূর্খের মতো বাঁচতে চাই অনন্তকাল। আর এই ইচ্ছাই তৈরি করে আমার অহঙ্কার। 'আমি'-র অহঙ্কার। বড় আমির পাশে ছোট আমি। জীবের আমি। তামসিক আমি। আর এই আমি আবার মায়ার বশীভূত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই। ঠাকুর বলুন, আমার 'আমি' কবে 'তুমি' হবে? ঠাকুর বলছেন, শোন, শোন। অত সহজ নয় যে, এক ঝাড়ফুঁকে তোমার 'আমি' চলে যাবে। যে জানতে পারে তাকে ভূতে ধরেছে, তার ভূত ছেড়ে যায়। সে তো জানতেই পারবে না। 'আমি' সেইরকম এক ভূত। "কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহ বুদ্ধি যায় না। এ-অবস্থায় সোঽহং বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার আমিই ব্রহ্ম বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ-অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।"

ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান-অস্ত্র দিয়েও 'আমি'-কে কাটা যায়। কি রকম? "জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পোঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী, যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে-জিনিসে তৈরি—সেই ইঁট, চুন, সুরকিতে সিঁড়িও তৈরি। নেতি নেতি করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হচ্ছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন।

বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ। ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। আমি যায় না, তখন দেখে, তিনি আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।"

তাহলে আমি কি করব ঠাকুর?

তুমি কি করবে? তাই না! 'আমি' কি করবে? তাই তো? শোন তবে। "জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিযোগও সত্য—সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ আমি রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।"

কিছু অস্ত্র তোমার হাতে তুলে দি:

এক নম্বর—"সেব্য-সেবক ভাব। সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' তো যাবার নয়। তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। হনুমান হও। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান তুমি আমায় কিভাবে দেখ? হনুমান বললে, সে ভারি মজা। রাম! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি প্রভু, আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।" তাহলে তুমি হনুমান হও।

দুনম্বর—"মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি—কলকাতায় কর্ম করতে আসা।"

তিন নম্বর—"হাম্বা, হাম্বা করো না। কর তুঁহু তুঁহু। গরুকে স্মরণে রাখ। গরু হাম্বা হাম্বা করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদবৃষ্টি গায়ের ওপর দিয়ে যায়। আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয় তখন খুব পেটে। তবুও নিস্তার নেই। শেষে নাড়িভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরির যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না; তখন বলে তুঁহু, তুঁহু। তখন নিস্তার।"

তুমিও বল, হে ঈশ্বর, আমি দাস তুমি প্রভু, আমি ছেলে তুমি মা। আগেই বল। শমন এসে ধরার আগেই বল।

প্রবন্ধ

জগদীশচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডল

অসীম মুখোপাধ্যায়

জাতি হিসাবে ভারতবাসীর পরাধীনতার ইতিহাস কেবলমাত্র দুশো বছরের নয়। খ্রীষ্টাব্দ প্রচলন হবার হাজার বছরের পর থেকে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটি অবশ্যস্বীকার্য সত্য ছবির মতো ফুটে ওঠে। তা হলো—একের পর এক বহিরাগত জাতি ভারত-ভূখণ্ডকে আংশিক বা সামগ্রিকভাবে তাদের শাসনে রেখেছে। যদিও কালক্রমে ভারতীয় জীবনযাত্রার মূলস্রোতে সেইসব বহিরাগত জাতিকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন-না-কোন ভাবে মিশে যেতে দেখা গেছে, তবু অতি সহজেই শাসিত হবার অভ্যাস ভারতবাসীর বহুকালের। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনকে 'পরাধীনতার শৃংখল' বা 'দেশ ও জাতির কলঙ্ক' ইত্যাকার নিন্দনীয় বিশেষণ দিয়ে ভূষিত করার আগে তাই কিছুটা পূর্ব-ইতিহাস স্মরণ করাটা যথার্থ হবে।

দুশো বছর ধরে ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করেছে। সময় ও সভ্যতার পালে যে হাওয়া লেগেছে সে-হাওয়ায় তাদের এই শাসন হয়তো বহু ক্ষেত্রেই পীড়ন, অত্যাচার ও দমননীতির নিদর্শন হয়ে উঠেছে। আর যেহেতু দুশো বছরেরও আগে থেকে কৃষি ও শিল্পের বিপ্লব সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে ঘটে গেছে, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব হয়েছে, তাই সেই সময়সীমার পার্শ্বফল হিসাবে পরাধীন দেশ ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানিও বিস্তারলাভ করছে অতি সহজে।

দীর্ঘ ক্লান্তিকর অপেক্ষার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতমাতার কতিপয় কৃতী সন্তান পাশ্চাত্যের দরবারে মাতৃভূমির গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন। সভ্যতার ধাত্রীভূমি ভারতবর্ষের জীবনসত্যকে উদ্ঘাটনের এই শুভ প্রচেষ্টার সূচনা ঘটে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে। শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর ভাষণের ফল হিসাবে পাশ্চাত্যবাসী যেমন নতুন করে, নতুনভাবে ভারতবর্ষের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তেমনি মৃতপ্রায় ভারতবাসীর মধ্যে বয়ে যায় নতুন জীবনের স্পন্দন। মাতৃভূমিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ অনুভূত হয় দেশের সর্বত্র। জাতীয় জীবনের এই নবতম উদ্দীপনার আরেক প্রকাশ ঘটে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে। এই বছর কুমার রনজিৎ সিংজী (রনজি) ক্রিকেটক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে অপরাজেয় ইংরেজকে তাদের জাতীয় খেলায় অতিক্রম করা সম্ভব। এই বছরেই অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পুনরায় প্রমাণ করেন ভারতবাসীর কীর্তির কথা। এই বছরের সবচেয়ে উৎসাহজনক ঘটনা হলো যন্ত্র সহযোগে লিভারপুলে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বক্তৃতা। জগদীশচন্দ্রের এই বক্তৃতা ভারতবাসী সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের বিশেষতঃ ইংরেজদের তথাকথিত ধারণা—"আইন-কানুন, সংস্কৃতচর্চা, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় ভারতীয়গণ উৎকর্ষের পরিচয় দিলেও তাদের মানসিক গঠন বিজ্ঞানচর্চার একান্ত অনুপযোগী"[১]—যে অমূলক তা প্রমাণ করে। এইভাবে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বহির্বিশ্বে জাতীয় ভাবধারা তথা সম্মান পুনরুদ্ধারের যে শুভ সূচনা ঘটে তা ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে বিস্তৃত হয় এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাপকতর সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টা শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্বের দরবারে ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাবধারা তুলে ধরার যে প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু হয়, তাতে উপরোক্ত চারজন ব্যক্তি সফলতম ভূমিকা গ্রহণ করলেও, সাফল্যের স্থায়িত্ব বা গুরুত্ব বিচারে স্বামী বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রকে অতি সহজেই তাঁদের মধ্যে থেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে কর্মগত ও মতাদর্শগত

১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—মনোজ রায় ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ২৪

পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যপূরণের আন্তরিক তাগিদে জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মেরুতে বসবাসকারী এই দুই মনীষী পরস্পরের কাছে এসেছিলেন এবং উত্তরকালে শ্রদ্ধা ও প্রীতির মেলবন্ধনে নিজেদের আবদ্ধ করেছিলেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্য বা ক্ষেত্রটি হলো তাঁদের গভীর স্বদেশপ্রেম। স্বামীজীর কর্মমুখর ধর্মজীবন যেমন স্বদেশপ্রেমের এক অখণ্ড দলিল, তেমনি জগদীশচন্দ্রের অক্লান্ত বিজ্ঞানচর্চাও একই ধরনের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম।[২] বস্তুতঃ এই অপ্রতিরোধ্য দেশপ্রীতি ভিন্নপথের যাত্রী দুই মহামানবকে একই ভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছিল। (জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি সম্পর্কে 'উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ বর্তমান লেখকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।)

সাক্ষাতের পূর্বে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজী

সমকালীন সময়ের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জগদীশচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে কর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ মিল থাকায় স্বাভাবিকভাবেই যে-প্রশ্ন মনে আসে তা হলো সমসাময়িক কালের এই দুই মনীষী উভয়ে উভয়ের সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন অথবা তাঁদের পারস্পরিক মনোভাবই বা কেমন ছিল? তদানীন্তন সময়ের বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কতখানি সচেতন ছিলেন তা আলোচনা প্রসঙ্গে এ-বিষয়টি উল্লেখ্য যে, "ধর্মাচার্য হলেও বিজ্ঞানের প্রতি স্বামীজীর এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল।"[৩] বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি এই স্বাভাবিক আকর্ষণবশতই স্বামীজী সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও জামসেদজী টাটার পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙ্গালোরে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ' নামক একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।[৪] বিবেকানন্দের কাছে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জাতীয় মুক্তির পথ হিসাবে বিবেকানন্দ যেহেতু বিজ্ঞানশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন তাই এই অনুমান অমূলক নয় যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম সফল বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। যদিও স্বামীজীর এই সচেতনতার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে নিবেদিতার পত্রগুলির উল্লেখ করা যায়। কারণ, বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র এই দুই শ্রেষ্ঠ মনীষীর মধ্যে মধ্যস্থতার যে ভূমিকা নিবেদিতা ("নিবেদিতার ধারণা, সন্ন্যাস ও বিজ্ঞানের সহাবস্থানের ওপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল")[৫] গ্রহণ করেছিলেন তার পরিচয় আমরা নিবেদিতার পত্রে যেমন পাই, তেমনি পাই বিজ্ঞান এবং জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে স্বামীজীর বিরাট আগ্রহের কথাও।

নিবেদিতার লেখা বিভিন্ন চিঠির মধ্য দিয়ে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজীর যে মনোভাব প্রকাশ পায় তা এক মিশ্র অনুভূতির। অর্থাৎ একদিকে যেমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জগদীশচন্দ্রের নিরলস বৈজ্ঞানিক সাধনাকে তিনি উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদ জানিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মসংক্রান্ত ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজীর এই বিরূপ মনোভাবের পরিচয় মেলে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৯ এপ্রিল ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠিতে। গুরুপূজা ও সম্প্রদায় পত্তনের বিরোধী ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিবেদিতা এই চিঠিতে ম্যাকলাউডকে লেখেন: "স্বামীজী বললেন, তথাপি 'খোকাটি' তিন দিন ধরে আমাকে প্রায় পূজা করছে—এক সপ্তাহের মধ্যে সে আমাদের লোক হয়ে উঠবে।" এই চিঠিরই পরবর্তী অংশে স্বামীজীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে নিবেদিতা লেখেন: "এরাই ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে হৈচৈ করে। এরা নিজেদের চেনে না। যা নিয়ে তাদের অন্তঃসংঘাত, অপরকে তাই করতে

২ ভারতবর্ষ (দিনপঞ্জী: ১৯১৫-৪৩)—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদক: অবন্তীকুমার সান্যাল, ১৯৭৬, পৃঃ ২১৩

৩ নিবেদিতা লোকমাতা—শংকরীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১৩৭৫, পৃঃ ৫৯

৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শংকরীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, ১৩৮৮, পৃঃ ২৪৩

৫ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮১

দেখলে তাদের ঘৃণা করে।...[৬] উল্লেখ্য যে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আগে পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজীর এই মিশ্র অনুভূতি বর্তমান ছিল।

সাক্ষাতের পূর্বে স্বামীজী সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র

প্রত্যক্ষ আলাপের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে যেটুকু ভাবের আদান-প্রদান ঘটে সেক্ষেত্রে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেন নিবেদিতা। তাই স্বামীজী সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের এই সময়কার মনোভাব জানার জন্য পুনরায় আমাদের নিবেদিতার পত্রের ওপরই নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন সময়ে লেখা নিবেদিতার পত্রগুলির মধ্য দিয়ে স্বামীজী সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের তদানীন্তন মনোভাবের যে ছবিটি ফুটে ওঠে তাতেও দুটি বিরোধী ধারণার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। একদিকে জগদীশচন্দ্র যেমন এই সময় স্বামীজীর সুতীব্র দেশপ্রেমের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, নতুন উৎসাহে গবেষণার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে স্বামীজীর ধর্মসংক্রান্ত আচার-আচরণ সম্পর্কে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ভারতবাসী সম্পর্কে ইউরোপীয় জনসাধারণের তথাকথিত হীন ধারণার (ভারতবাসী 'দুর্বল') বিরুদ্ধে জেহাদ হিসাবে স্বামীজী ঘোষণা করেন, আমার জীবনোদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে পৌরুষ আনা। স্বামীজীর এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী ঘোষণা জগদীশচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ এপ্রিল ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার একটি পত্রের মধ্য দিয়ে স্বামীজীর উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা জগদীশচন্দ্র কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রকাশ মেলে: "কি বিরাট শিহরণের সঙ্গে তিনি স্বামীজীর উক্তি শুনেছিলেন··· এবং একই শিহরণের সঙ্গে ইংল্যান্ডে থাকতে স্বামীজীর কলকাতার ভাষণগুলি পড়েছিলেন, দেখেছিলেন মানবের যথার্থ কল্যাণ ও সত্যের জন্য কি গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তিনি (স্বামীজী) নিজের জনপ্রিয়তা ছিঁড়ে টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।"[৭]

স্বামীজীর দেশাত্মবোধের দ্বারা যে-জগদীশচন্দ্র গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, তিনিই আবার স্বামীজীর ধর্মাচরণ বিশেষতঃ তাঁর গুরুদেবের ওপর দেবত্বারোপ ও সম্প্রদায় গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। ব্রাহ্মধর্মমতে বিশ্বাসী জগদীশচন্দ্র যে স্বামীজীর গুরুপূজাকে কোন মতেই মেনে নিতে পারেননি তা লক্ষ্য করা যায় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ এপ্রিল ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার উক্ত চিঠিতে। এই চিঠিতে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের ক্রোধান্বিত মন্তব্য: "সংকীর্ণ ছাঁচে গড়া একটি মানুষ যিনি নারীকে প্রায় শয়তানী মনে করতেন, যে কারণে নারী দেখলে মূর্চ্ছা যেতেন !!!" অবতারবাদ সম্বন্ধেও জগদীশচন্দ্র যে বিরূপ ভাব পোষণ করতেন তা এই একই চিঠির পরবর্তী অংশে লক্ষ্য করা যায়: "ভারতের বর্তমান প্রয়োজন এমন ধর্ম, যা সকলকে আলিঙ্গন করবে, সকল সম্প্রদায়কে একত্র করবে, অবতারবাদ তা পূরণে অসমর্থ।...এর দ্বারা নতুন ধর্মের উদয় প্রমাণিত হয় না।" নিবেদিতার কালীবক্তৃতা ও তাতে স্বামী বিবেকানন্দের সমর্থন লক্ষ্য করে স্বামীজী সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের ধারণা যে অপরিবর্তিত ছিল নিবেদিতার উক্ত চিঠিই তার প্রমাণ। "যে মানুষ ছিলেন বীর, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন নতুন সম্প্রদায়ের ব্যাপারী।"[৮] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, স্বামীজীর আচরিত ধর্ম সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের বিরূপ মনোভাব থাকলেও স্বামীজীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

স্বামীজীর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয়

সমসাময়িক কালের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় বা আলাপ কোন্ সময়ে হয়েছিল সেই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না থাকায় বিষয়টি আজও বিতর্কিত। এই দুই মনীষীর প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্বন্ধে যে-সমস্ত পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলি পর্যালোচনা করলেও এই সম্পর্কে পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজীর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় প্রসঙ্গে বসু বিজ্ঞানমন্দির থেকে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র জন্মশত-

৬ Letters of Sister Nivedita—Ed. Sankari Prasad Basu, Vol. I, 1982, pp. 112-113

৭ Ibid., p. 103

৮ Ibid., p. 102

বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে (১৯৫৮) সম্পাদক অমল হোম লেখেন : শ্রীমতী অবলা বসুর (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী) কাছ থেকে তিনি একাধিকবার শুনেছেন, "স্বামীজী তাঁর বহির্ভ্রমণের মধ্যকালে তাঁর এই বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলকাতায় আসতেন এবং বাইরের নানা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলে বসুকে আমোদিত করতেন, আর মহানন্দে পূর্ববঙ্গীয় রান্না খেতেন, খুব ঝাল দেওয়া চাই তাতে—যত ঝাল তাঁর তত স্ফূর্তি। এক বিশেষ আগমনের কথা লেডি বসু স্পষ্ট স্মরণ করতে পারেন : শীতের এক উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় পুরো ইউরোপীয় পোশাকে বেলুড় থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে সোজা হাজির হয়ে কিভাবে তিনি সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন।"[৯] জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় প্রসঙ্গে অমল হোম যে-মত ব্যক্ত করেছেন, পরবর্তী কালে তার বিরোধিতা করে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন : "ডঃ বসুর বাড়িতে স্বামীজীর যাতায়াত সম্বন্ধে যে সময় দেওয়া আছে, তাতে কিছু ভুল হয়েছে বলেই মনে হয়। স্বামীজী তাঁর নানা বিদেশযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে কলকাতায় থাকাকালে ডঃ বসুর বাড়িতে যেতেন, এটা ঠিক হতে পারে না। তিনি যেতে পারেন মাত্র একটি বিদেশযাত্রার ফাঁকেই—পাশ্চাত্যদেশ থেকে প্রথম প্রত্যাবর্তন (১৮৯৭) ও দ্বিতীয় পাশ্চাত্যযাত্রার (১৮৯৯-এর জুন) মধ্যেই। কারণ, স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশ থেকে ফেরার পর জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি। যেহেতু ডঃ বসু তখন বিদেশে রয়ে গেছেন।"[১০] অমল হোমের পূর্বোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বক্তব্যের যে অমিল তা উভয়ের সাক্ষাতের সময় নিয়ে। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই সম্বন্ধে উভয়েই একমত। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, উভয়ের সাক্ষাতের সময় সম্পর্কে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অভিমত (১৮৯৭ ও ১৮৯৯-এর জুনের মধ্যে) যুক্তির বিচারে সঠিক হতেও পারে, নাও হতে পারে।

স্বামীজীর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সাক্ষাতের সাক্ষ্য মেলে শৈলেন্দ্রনাথ ধরের রচনাতেও। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : "He (Swamiji) also met Dr. Bose pretty often. …(He was) very proud of his achievements in Science and success in Paris."[১১] স্বামীজীর জীবনীর মধ্যেও উভয়ের সাক্ষাৎকারের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : "He (Swamiji) met Dr. Bose frequently and he would point out to his numerous acquintances the greatness of this Indian Scientist."[১২] স্বামীজীর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল তার পরিচয় মেলে রোমাঁ রোলাঁর লেখনীতেও : "বসু ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দকে জানতেন এবং খুব ভালবাসতেন।"[১৩]

স্বামীজী ও আচার্যের সম্পর্ক : প্যারিস বিশ্বমেলার ভূমিকা

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে জগদীশচন্দ্র বসু আমন্ত্রিত হন এবং তদানীন্তন লেফটন্যান্ট গভর্নর জন উডবার্নের সহায়তায় তিনি তাতে যোগদান করেন।[১৪] এই সময়ে প্যারিসের ধর্মেতিহাস সভায় যোগদানের জন্য স্বামীজীও আমেরিকা থেকে প্যারিসে আসেন। ধর্মের মূল সত্য বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষিত সত্যরূপে গৃহীত হবে—যেহেতু এটাই ছিল স্বামীজীর বিশ্বাস, তাই অপরাপর বিশিষ্ট অতিথিদের মতো স্বামীজীও উপস্থিত হন প্যারিসের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে। প্রকৃতপক্ষে, এই সম্মেলনেই স্বামীজী বৈজ্ঞানিক

৯ আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৫৮-১৯৫৮)—সম্পাদক : অমল হোম, ১৯১৮, পৃঃ ৫০
১০ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৪
১১ A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda—S. N. Dhar, Vol. II, 1976, p. 1296
১২ The Life of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, 6th edn., 1960, p. 687
১৩ ভারতবর্ষ (দিনপঞ্জী), পৃঃ ২৪২
১৪ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫

জগদীশচন্দ্রকে তাঁর নিজস্ব আকারে দেখলেন।[১৫] ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের অনবদ্য বক্তৃতা স্বামীজীকে মুগ্ধ করে। স্বদেশবাসীর সাফল্যে গর্বিত ও আনন্দিত স্বামীজী লেখেন : "আজ ২৩শে অক্টোবর (১৯০০); কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহা-প্রদর্শনী। নানা দিগ্দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহা কেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন-সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি —এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালি প্রভৃতি বুধ-মণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভ-মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির —আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। এক যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!"[১৬] জগদীশ-চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাফল্যে স্বামীজী যে কতখানি আনন্দিত ও গর্বিত হয়েছিলেন তার পরিচয় মেলে অন্য ক্ষেত্রেও : "Once at a distinguished gathering, when a disciple of a certain celebrated English scientist laid claim to the fact that her master was experimenting on the growth of a stunted lily, the Swami replied humorously, "O, that's nothing! Bose will make the very pot in which the lily grows respond!"[১৭]

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর মধ্যে দেশপ্রেমিকের প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করার পর তাঁর সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণার যে আমূল পরিবর্তন ঘটে তা উভয়ের ঘনিষ্ঠতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুন মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর চিঠিতে জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় : "তুমি যদি মনে করে থাক যে হিন্দুরা বসুদের পরিত্যাগ করেছ, তাহলে সম্পূর্ণ ভুল করেছ। ইংরেজ শাসকগণ তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে ঐ ধরনের উন্নতি তারা কোন মতেই চায় না। তারা তাঁর পক্ষে জায়গাটা অসহ্য করে তুলেছে। সেই জন্যই তিনি অন্যত্র যেতে চাইছেন।"[১৮] তাঁদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার পরিচয় মেলে মিসেস ওলি বুলের কাছে স্বামীজীর দুটি চিঠিতে (৬ জানুয়ারি, ১৯০১ ও ২৬ জানুয়ারি, ১৯০১)। ইংল্যান্ডে অসুস্থ জগদীশচন্দ্রের অপারেশনের পর তাঁর নিরাময় সম্পর্কে ব্যাকুল হয়েছেন স্বামীজী। একদিকে যেমন অসুস্থ জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে স্বামীজী উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন, তেমনি সমসাময়িক কালের প্রবহমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জগদীশচন্দ্র বসুর সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে তাঁর আরাধ্য বিজ্ঞানসাধনায় বিঘ্ন হবে এই ভেবে স্বামীজী চিন্তিত হয়েছেন। স্বামীজীর এই চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় রোমাঁ রোলাঁর রচনায় : "তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা দেখতে পাচ্ছেন মনে করে একসময় বিবেকানন্দ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন ভারতীয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি নিয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞানেই জাতীয়তাবাদকে দেখান।"[১৯] এইভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক

১৫ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৫ ১৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১২৪

১৭ The Life of Swami Vivekananda, p. 667 ১৮ পত্রাবলী : স্বামী বিবেকানন্দ, ১০৪৪, পৃঃ ৭৩৩

১৯ ভারতবর্ষ (দিনপঞ্জী), পৃঃ ২১০

দিয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে গড়ে ওঠা স্বামীজীর অন্তরঙ্গতা তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষিত হয়।

স্বামীজী সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের ধারণার পরিবর্তন

প্যারিসের আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান কংগ্রেসে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (Response of Inorganic and Living Matter) ব্যাপক স্বীকৃতি যেমন তাঁকে নবোদ্যমে গভীরতর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে আত্ম-নিয়োগের অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনি অন্যদিকে স্বামীজীর আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁর পূর্ববর্তী ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। স্বামীজীর ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিরূপ ধারণা থাকলেও স্বামীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ঘাটতি যে কোনদিনই ছিল না তা পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে। এক্ষেত্রে প্যারিস সম্মেলনের পর স্বামীজীর সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের পূর্বের শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয় ভক্তি। স্বামীজীর মধ্যে দেশাত্মবোধের মহান ছবিটি প্রত্যক্ষ করার পর ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর পূর্বের সংকীর্ণ ধর্মীয় বিরোধ ভুলে স্বামীজীর একজন অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন। স্বামীজী জগদীশ-চন্দ্রের চোখে শ্রদ্ধার এক জীবন্ত মূর্তিতে পরিণত হন। স্বামীজীর প্রতি জগদীশচন্দ্রের এই আন্তরিক শ্রদ্ধার প্রকাশ লক্ষ্য করে রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন: "স্বামীজীর সেই মোহিনী শক্তির কথা (জগদীশচন্দ্র) বলছিলেন যে-মোহিনী শক্তি, জীবন-শক্তি ও বুদ্ধিতে উপচে পড়া ঐ ব্যক্তিত্ব তিনি বিস্তার করতেন।"[২০] স্বামীজীর প্রতি জগদীশচন্দ্রের শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ধারণা প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ পরবর্তী কালে লিখেছেন: "বসু বিবেকানন্দের বিস্ময়কর শক্তি ও প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করলেন।"[২১] স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিবেদিতা ও মিসেস ওলি বুলকে লেখা জগদীশচন্দ্রের দুটি পত্রের মধ্যেও স্বামীজীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৯ জুলাই নিবেদিতাকে একটি পত্রে তিনি লেখেন: "কী নিদারুণ শূন্যতা এনে দিয়েছে এই মৃত্যু। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কী সব বিরাট কাজ সম্পন্ন হলো। এই সমস্ত কিছু কিভাবে একজন মানুষ সম্ভব করল। আবার কিভাবে এখন সবকিছুর উপর স্তব্ধতা নেমেছে। কিন্তু তবু যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়েন তাঁর নিশ্চয় বিশ্রাম চাই। আমি এখনো যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, যেমন দুবছর আগে প্যারিসে তাঁকে দেখেছি, সেই শক্তিধর পুরুষ—তাঁর বিরাট আশা, তাঁর মধ্যে সবকিছুই বিরাট সন্দেহ নেই।"[২২] অন্য একটি চিঠিতে তিনি মিসেস ওলি বুলকে লিখেছেন: "হারিয়ে যায়নি কিছুই। যে-সকল চিন্তা, কর্ম, সেবা ও আশা সুমহান, তারা মূর্ত হয়ে থাকে তাদের উৎসভূমির ভিতরে ও বাহিরে। সেই মহান আত্মা মুক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে তাঁর মহা বীরকর্ম এখন সমাপ্ত। সেই কর্ম কি যথাযথ তা অনুমান করার মতো সামর্থ্য কি আমাদের আছে? একজন মানুষ একলা কি করে এ-সকল কিছু সম্ভব করল তা কি আমরা উপলব্ধি করতে পারি? যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে তাকে ঘুমোতে দাও, সেই ভাল। কিন্তু জানি তাঁর কীর্তি, তাঁর শিক্ষা এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করবে—তাকে জাগিয়ে তুলবে—শক্তি দেবে।"[২৩] এইভাবে দুই মনীষী শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন।

জগদীশচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে স্বামীজীর প্রভাব

প্রাথমিকভাবে নিবেদিতার মাধ্যমে ও পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের পর স্বামীজীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুবাদে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর চিন্তাধারায় বিশেষতঃ তাঁর কর্মধারণার আমূল না হলেও লক্ষণীয় কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরি-বর্তনের ফলে স্বামীজীর অনুসৃত ধর্মপথের যথার্থতা যেমন তিনি উপলব্ধি করেন, তেমনি তাঁর মহত্ত্বেরও হদিশ পান।

সংকীর্ণতার যে দোষারোপ আচার্য জগদীশচন্দ্র একসময় শ্রীরামকৃষ্ণকে করেছিলেন, তাঁর যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা হওয়ার পর তাঁর সেই ত্রুটি তিনি স্খালন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম

২০ ভারতবর্ষ (দিনপঞ্জী), পৃঃ ২১৩
২২ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৮
২১ ঐ, পৃঃ ২৪২
২৩ ঐ, পৃঃ ৫১৮

শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা। নিবেদিতার পত্র, বিশেষ করে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ৯ মে লেখা পত্রটি, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আচার্য জগদীশচন্দ্রের শ্রদ্ধার সাক্ষ্য বহন করে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে নিবেদিতার ঘরোয়া বক্তৃতা চলাকালীন এক তরুণ ব্রহ্মচারী অত্যুৎসাহে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিরক্ষর বলায় আচার্য জগদীশচন্দ্র দারুণ ক্রোধান্বিত হন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যা বলেন তা উদ্ধৃত করে নিবেদিতা লিখেছেন: "ওরা কি বোঝেনি যে, দিনের পর দিন গঙ্গাতীরে বসে এক হাতে সোনা অন্য হাতে মাটি নিয়ে বদলা-বদলি করে (উভয়ের সমত্ববোধে উন্নীত হয়ে) তাদের উভয়কেই গঙ্গাগর্ভে ছুঁড়ে ফেলার অর্থ কি? এই নির্বোধরা কি দেখতে পায় না মনের কোন্ দারুণ শক্তি ওখানে বর্তমান? ওরা কি জানে না ঐ শক্তি গণিতে, পদার্থবিদ্যায়, গ্রীক্ ভাষা শিক্ষায় কিংবা ধর্মে যেখানেই প্রকাশ পাক, কোনই পার্থক্য নেই। ওরা কি জানে না ঐ হলো শিক্ষার সারবস্তু?"[২৪] বিবেকানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর আন্দোলনের প্রতি উত্তরোত্তর আকর্ষণ বৃদ্ধিবশতঃ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সপরিবারে কয়েকবার মায়াবতীতে রামকৃষ্ণ মিশনের অদ্বৈত আশ্রমে গেছেন। এক্ষেত্রে ১৯০৪, ১৯০৭ ও ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে যাওয়া বিশেষভাবে স্মরণীয়: "The great scientist, Dr. J. C. Bose, C. S. I. passed his summer holidays every year in the precincts of the Ashrama and greatly enjoyed the calm and the salubrious climate, returning to the fi ld of his work fully refreshed in health and vigour."[২৫]

প্রথমদিকে নিবেদিতার সঙ্গে ও পরবর্তী কালে অর্থাৎ নিবেদিতার মৃত্যুর পর তিনি একাকীই মায়াবতীতে গেছেন। এইভাবে বারবার যাওয়া-আসার ফলে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটি স্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই প্রীতি যে একপক্ষীয় ছিল না তা প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত আচার্য বসু সম্পর্কিত একাধিক সংবাদে প্রমাণিত হয়।[২৬] মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থাকার সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উপস্থিত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের কাছে ভাষণ দিতেন। প্রবুদ্ধ ভারত লিখেছে: "It has become a custom with Dr. Bose, when visiting Mayavati, to give at least one lecture to the assembled monks."[২৭] মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্জন পরিবেশ যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিশেষ পছন্দ ছিল তা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে অদ্বৈত আশ্রমের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত 'Reminiscences of Mayavati Ashrama' নামক প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়: "Sir Jagadis Chandra Bose, the famous scientist, who had been to Mayavati four or five times, used to say, 'when I am at M yavati, ideas rush into my mind, but when I am in Calcutta, everything seems to dry up'."[২৮]

বিভিন্ন সময়ে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে যাওয়া-আসার ফলে আশ্রমের সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রের একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে আচার্য বসুর এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় মেলে ডঃ বসুর মৃত্যুর পর প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত সংবাদে। আচার্য বসুর মৃত্যুকে বর্ণনা করা হয়েছে: "It has also been felt as a personal loss by us."[২৯] মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর এই আন্তরিক প্রীতির সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে মায়াবতীর একটি পায়ে হাঁটা পথ, যেটি 'বসু পথ' ('Bose's Walk') নামে চিহ্নিত।[৩০] কেবলমাত্র

২৪ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, 1982. pp. 1201-1202 ২৫ Prabuddha Bharat, December, 1913

২৬ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর; ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের মে, জুন; ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট; ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি, মার্চ; ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট প্রভৃতি সংখ্যায় আচার্য বসু সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

২৭ Prabuddha Bharat, August, 1911

২৮ Ibid., January, 1950

২৯ Ibid., January, 1938

৩০ Ibid., January, 1950

মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গেই নয়, কাশীর সেবাশ্রমের সঙ্গেও যে তাঁর সংযোগ ছিল এবং সেবাশ্রমের কাজকর্মের ওপর তাঁর বিশেষ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল তার প্রমাণ মেলে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের নিজস্ব মন্তব্যেই: "এই প্রতিষ্ঠান মানুষের যাতনা দূর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সেবা করে যাচ্ছে।" স্বার্থের সম্ভাবনা না রেখে তিনি বলেন: "এর থেকে সুষ্ঠুতর কিছু এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমি অন্যত্র দেখিনি।"[৩১] নিবেদিতার সাহচর্যে পরবর্তী কালে বেলুড় মঠের সঙ্গেও আচার্য বসুর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের ফলেই তিনি ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বেলুড়ে বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সভায় যোগ দেন।[৩২] আচার্য বসু এবং তাঁর পত্নী শ্রীমতী অবলা বসু শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি বসু পরিবারের এই বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশ হিসাবেই আচার্য বসু শ্রীমতী অবলা বসুকে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম জানাবার জন্য।[৩৩]

স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের ন্যায় ভিন্ন পথের পথিক দুই মনীষীর পারস্পরিক মনোভাব ও কর্মধারা আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি চিরন্তন সত্য পুনরায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো মহাবিশ্বের নিয়মে দুটি বিশাল গ্রহ যত দূরেই থাকুক না তারা পরস্পরকে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি জাগতিক জীবনেও দেখা যায়, মনীষীদের ক্ষেত্রেও সেই নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটে না।

৩১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৮৭, পৃঃ ১৫৫ ৩২ উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩১১

৩৩ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 990

বাতায়ন

সোভিয়েত শিল্পীর চোখে ভারতীয় দেব-দেবী

'সোভিয়েত দেশ'-এর জানুয়ারি, ১৯৯১ সংখ্যায় মস্কোর শিল্পী আলেকজান্ডার রেকুনেনকোর আঁকা অনন্যসাধারণ দুখানি চিত্র 'লক্ষ্মী' (প্রচ্ছদে) এবং 'সরস্বতী' (৩২-৩৩ পৃষ্ঠায়) মুদ্রিত হয়েছে। যদিও ছবিদুটির বিষয় ও ভাব প্রতিটি ভারতীয়দের ছেলেবেলা থেকে জানা ব্যাখ্যা থেকে বহুলাংশেই আলাদা এবং কিছু নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়তো এই দুই প্রাচীন দেবীর পোশাক আর বিষয় উপস্থাপনাতে আপত্তি করতেও পারেন, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে চিত্রকর যে গভীরভাবে আগ্রহী এবং শ্রদ্ধাশীল একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আলেকজান্ডার রেকুনেনকো (জন্ম ১৯৫৫) পাস করেছেন মস্কোর শিল্পকলা-প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউট থেকে। দীর্ঘকাল থেকেই যাঁর নাম ও ক্রিয়াকলাপ, ভারতের সঙ্গে যুক্ত সেই মাদাম ওয়াই ব্লাভাতস্কায়ার ধর্মতত্ত্বের তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি আদিয়ার ও মাদ্রাজে থিওসোফিক্যাল সোসাইটির সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি প্রায় ৫০খানি চিত্র অঙ্কন করেছেন, যেগুলি এখন হেলসিঙ্কি, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, রোম, রাবাত, মিউনিখ এবং অন্য বহু শহরে দেখতে পাওয়া যাবে।

আলেকজান্ডার রেকুনেনকোকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "আপনার সব ছবিই কেন হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে আঁকলেন? ব্লাভাতস্কায়া তো হিন্দু ছিলেন না।"

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "এঁরা তো শুধু হিন্দু দেবতা নন, এঁরা গ্রহদেবতা। আমরা মনে করি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দৈবীসত্তা একটাই, কিন্তু প্রতিটি জাতি তাদের নিজেদের ঐতিহ্যের ত্রিশির কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকে আলাদা আলাদা দেখে এবং আলাদা আলাদা নামে—যীশুখ্রীস্ট, বিষ্ণু, জুজেউস, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। তা যাই হোক, তারা এক দেবতার কথাই বলে। এই দেবতা আমার কাছে আবির্ভূত হন হিন্দু দেব-দেবীর রূপে এবং আমাকে দিয়ে সেইভাবে চিত্র করিয়ে নেন।"

[সোভিয়েত দেশ, জানুয়ারি, ১৯৯১, পৃঃ ৫৭]

ধারাবাহিক নিবন্ধ

বলরাম মন্দির : পুরনো কলকাতার ঐতিহাসিক বাড়ি

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাপ্রাপ্ত তারক মুখার্জীর (বেলঘরের তারক) বিধবা পুত্রবধূ রানী তাঁর ভায়ের সঙ্গে এসেছেন বলরাম মন্দিরে মহারাজের দর্শনে। রানী মহারাজের খুবই স্নেহের পাত্রী। বিভিন্ন সময়ে তিনি রানীকে সদুপদেশ দিতেন। মহারাজ সেদিন রানীকে খুব আশীর্বাদ করলেন। স্বামী শিবানন্দকেও ডেকে পাঠালেন রানীকে আশীর্বাদ করার জন্য। স্বয়ং মহারাজ আশীর্বাদ করেছেন বলে প্রথমে শিবানন্দজী আসতে রাজি হননি। পরে মহারাজের আদেশে এসে তিনিও রানীকে আশীর্বাদ করলেন।[৭১]

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। রামলালদা বলরাম মন্দিরে এসেছেন মহারাজকে ইংরেজী নববর্ষের প্রণাম জানাতে। জলযোগ হলো। মহারাজ রামলালদাকে অনুরোধ করলেন: "আজ সন্ধ্যার পর ঢপওয়ালী সেজো; ঠাকুরের সময়কার গান সবাইকে শোনাতে হবে।" গৃহস্থ-বাড়ি বলে প্রথমে একটু সংকোচ বোধ করলেন রামলালদা। কিন্তু রাজা মহারাজের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। রামলালদাকে ঢপওয়ালীর বেশে সাজানো হলো—শাড়ি, অলঙ্কার ইত্যাদি পরিয়ে। হলঘরে লোক আর ধরে না। রামলালদা নেচে নেচে কীর্তন ধরলেন: 'একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মতো।' নাচের তালে তালে গায়ক গান গাইছেন। আসর জমজমাট। মহারাজকে লক্ষ্য করে রামলালদা বার-বার আখর দিচ্ছেন—'আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ' পদটির ওপর। হাস্যদীপ্ত রাজা মহারাজের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো। তিনি গভীর ভাবে ভাবস্থ। রামলালদারও ভাবান্তর হলো। হলঘর থমথমে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সকলেই অনুভব করলেন এক ঈশ্বরীয় আবেশ।[৭২]

বলরাম মন্দিরে মহারাজের একবার একটি দর্শন হয়েছিল। মহারাজের শয়ন খাটটির পাশেই থাকত আর একটি ছোট খাট। একদিন গভীর রাত্রিতে মহারাজ দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। মহারাজকে কোন কথা না বলে অন্তর্ধান করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এর তাৎপর্য কি হতে পারে, ভেবে রাজা মহারাজ চিন্তান্বিত হলেন। ঘরের মেঝেতে শায়িত সেবকের ঘুম গেল ভেঙে। দেখলেন মহারাজের উদাস ভাব। সেবককে সব বললেন। চারদিকে রাত্রির নিস্তব্ধতা। দুজনেই নীরব। রাজা মহারাজ গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন: "এখন আমার মনে আর কোনও বাসনা নেই, এমন-কি তাঁর নাম করবারও আর বাসনা নেই—শুধু শরণাগত শরণাগত।"[৭৩]

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ২২ মার্চ বলরাম মন্দিরে এলেন মহারাজ। কয়েকদিন পরে তিনি আক্রান্ত হলেন বিসূচিকা রোগে। ডাঃ চন্দ্রশেখর কালীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ায় ১ এপ্রিল অন্নপথ্য করলেন রাজা মহারাজ। তাঁর ইচ্ছানুসারে হলঘরে আছেন মহারাজ। হঠাৎ বহুমূত্র রোগের উপসর্গ দেখা দিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশবাবু 'মাসিক বসুমতী' প্রকাশের জন্য তাঁর কাছে আশীর্বাদ চাইতে এসেছেন। মহারাজ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মহারাজ মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে চললেন। ব্যাধি-যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে চৈতন্যময় ভূমিতে মনকে তুলে রাখতেন তিনি। অবশেষে ১০ এপ্রিল সোমবার বলরাম মন্দিরেই মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। সাধু, ভক্ত ও গুরুভাই শিবানন্দজী, অভেদানন্দজী, সারদানন্দজী গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।[৭৪]

৭১ মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৮৮, পৃঃ ১২০-১২১

৭২ ব্রহ্মানন্দচরিত, পৃঃ ৪১১-৪১২ ৭৩ ঐ, পৃঃ ৪১২-৪১৩ ৭৪ ঐ, পৃঃ ৪২২-৪২৬

১০।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলরাম মন্দিরে ছিলেন। সেসময় তাঁর পায়ে অস্ত্রোপচার করেন বিখ্যাত সার্জন সুরেশ ভট্টাচার্য। তাঁকে দেখতে এসেছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রসিদ্ধ ইংরেজ সার্জন মেজর বার্ড সাহেব।[৭৫]

এখানে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ একদিন স্বামী নির্বেদানন্দকে বলেছিলেনঃ "স্বামীজী একবার আমাদের বললেন, তোমরা আগে আমাকে বোঝ, তারপর তাঁকে (ঠাকুরকে) বোঝবার চেষ্টা করবে।" তখন জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করলেনঃ "কেন মশায়, স্বামীজীকে না বুঝলে কি ঠাকুরকে বোঝা যায় না?" উত্তরে তুরীয়ানন্দজী বলেছিলেনঃ "দেখ, স্বামীজী আর কিছু না হলেও একটা সম্পূর্ণ (perfect) মানব। এইরূপ সম্পূর্ণ মানবের ধারণাই যদি না করা যায় তবে ভগবানের ধারণা করা কি সম্ভব? তাই স্বামীজী বলতেন, আগে আমাকে বোঝ, পরে ঠাকুরকে বুঝবে।"[৭৬]

অসুস্থ স্বামী প্রেমানন্দ বলরাম মন্দিরের হলঘরে আছেন। তাঁর মহাসমাধির পূর্বদিন তুরীয়ানন্দজী দেখতে যান বাবুরাম মহারাজকে। বাবুরাম মহারাজও হরি মহারাজকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হরি মহারাজ ওপরে গিয়ে বাবুরাম মহারাজের খাটে বসলেন। তিনি বাবুরাম মহারাজের হাত দুটি ধরে রইলেন। দুজনেই নির্বাক। হরি মহারাজের জন্য চেয়ার আনা হলেও তিনি তাতে বসলেন না। বাবুরাম মহারাজ অনুচ্চস্বরে বললেনঃ "কৃপা, কৃপা, কৃপা!" এভাবে সাত-আট মিনিট অতিক্রান্ত হলো। বাবুরাম মহারাজ সেবককে বললেন হরি মহারাজকে নিয়ে যেতে। হরি মহারাজ গম্ভীর হয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। কে বলবে কি গভীর অন্তর্দাহ এই নির্বাক অবস্থা এনেছিল! পরের দিন ৩০ জুলাই, ১৯১৮ মঙ্গলবার বেলা দুটোয় বাবুরাম মহারাজ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন।[৭৭]

স্বামী সারদানন্দ একবার বলরাম মন্দিরে আছেন। সেসময় তিনি খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রন্থাদি ও ইউরোপীয় দর্শন পড়তেন। স্বামীজীর পাশ্চাত্যের বক্তৃতাবলীর কপি সারদানন্দজীর কাছে এলে বলরাম মন্দিরে হ্যারিকেনের আলোয় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তা পাঠ করতেন। অপর সকলে শুনতেন। বসু পরিবারের পুরোহিতবংশ ফকিরের (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য) একবার সংক্রামক যক্ষ্মা হয়। বলরাম মন্দিরে সারদানন্দজী এবং যোগানন্দজী তাঁর চিকিৎসাদির ব্যবস্থা শুধু নয়, সেবাও করেছিলেন।[৭৮]

সারদানন্দজীর নির্দেশে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভয়ঙ্কর ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত স্বামী অখণ্ডানন্দকে চিকিৎসার জন্য সারগাছি থেকে বলরাম মন্দিরে আনা হয়। ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষের তত্ত্বাবধানে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তখন তিনি প্রায় সাত মাস বলরাম মন্দিরে ছিলেন। তাঁর সেবাব্রতের কথা শুনে অখণ্ডানন্দজীকে দেখতে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইসময় বলরাম মন্দিরে আসেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন ওখানে ছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ঘরে গেলেন। সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র শরৎবাবু বললেনঃ "দেখুন, আমি সাধু-সন্ন্যাসী দেখতে আসিনি। শুনেছি, আপনি মানুষকে ভালবাসেন; চাষার কুটিরে গিয়ে তাদের সেবা করেন, লেখাপড়া শেখান, তাই আপনাকে দেখতে এসেছি। আপনি যে-ভাব নিয়ে কাজ করছেন, আমি সেই ভাব নিয়ে কয়েকটি বই লিখেছি, গল্প লিখেছি।" পরে শরৎবাবু তাঁর অনেক বই সারগাছি আশ্রমে উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দেন।[৭৯]

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে দুর্গাপূজার পর অখণ্ডানন্দজী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। অসুখ খুব বাড়াবাড়ি হওয়ায় সারদানন্দজী তাঁকে জোর করে বলরাম মন্দিরে নিয়ে আসেন। এসময় অখণ্ডানন্দজী এখানে পাঁচ মাস ছিলেন। পরের বছরও আবার অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য তাঁকে বলরাম মন্দিরে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেসময় এখানে তাঁকে আড়াই মাস থাকতে হয়। দুবারেই তাঁর চিকিৎসক ছিলেন

৭৫ স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৯৮৬, পৃঃ ১৬৭ ৭৬ ঐ, পৃঃ ১৬৮-১৬৯ ৭৭ ঐ, পৃঃ ১৬৯-১৭০
৭৮ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় প্রকাশ, পৃঃ ৮৫, ১৩৬, ৩৯
৭৯ স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ২২৭

ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ। এই সময়ে বলরাম মন্দিরে কৌতুককর অথচ ভালবাসা-মাখা এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। নিচের তলায় জোরগলায় মিহিসুরে তিনবার ডাক শোনা গেল : "শ্রীশ্রী ১০৮ পরমহংস পরিব্রাজক স্বামী অখণ্ডানন্দজী—সারগাছির মণ্ডলীশ্বর—দণ্ডীঠাকুরের দর্শনার্থী বান্দা শরৎ মহারাজ হাজির।" বাড়ির ভিতর প্রবাহিত হলো হাসির হিল্লোল। যে যেখানে ছিলেন, সবাই দৌড়ে আসছেন শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতে। অসুস্থ অখণ্ডানন্দজীও ঘরের বাইরে এলেন। সেবক তাঁকে ধরে আছেন। শরৎ মহারাজকে দেখে বললেন, "দাদা, দেখ তো তোমার এই কাণ্ড!" দুই গুরুভ্রাতার সেই মিলনদৃশ্য সকলে উপভোগ করলেন।[৮০]

এই সময় একদিন কলকাতার এক হিন্দি পত্রিকার সম্পাদক খেতড়ি-নিবাসী পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মা বলরাম মন্দিরে এসে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। অখণ্ডানন্দজীর শারীরিক অসুস্থতার কথা বলা সত্ত্বেও শর্মাজী বললেন যে, তাঁর বিশেষ দরকার ও অল্প সময়ের কাজ। অখণ্ডানন্দজীকে প্রণাম করে শর্মাজী তাঁর রচিত খেতড়িরাজ অজিত সিংহের জীবনচরিতের জন্য প্রস্তাবনা লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। অখণ্ডানন্দজী খেতড়িতে ছিলেন ও রাজার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তাঁর অনুরোধে অখণ্ডানন্দজী তখনই হিন্দিতে একটি প্রস্তাবনা লিখে দিলেন। তা দেখে শর্মাজী বললেন, প্রস্তাবনাটি অতি সুন্দর হয়েছে। কিছুদিন পরে 'খেতড়ি নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' পুস্তকে ঐ প্রস্তাবনা প্রকাশিত হয়।[৮১]

বলরাম মন্দিরে থাকাকালীন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা অখণ্ডানন্দজীর কাছে আসতেন। ছাত্ররা তাঁর উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনে স্বামীজীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হতো। এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেছিলেন : "শিক্ষিত যুবকেরাই স্বামীজীর ভাবধারা বহন করে নিয়ে যাবে।"[৮২]

স্বামী প্রেমানন্দের ভাই শান্তিরাম ঘোষের একান্ত অনুরোধে স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলরাম মন্দিরে একাদিক্রমে বহু বছর বাস করেছিলেন। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে তাঁরই অবস্থানকাল সবচেয়ে বেশি। প্রথমে লাটু মহারাজ বসু পরিবারে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট হবে বলে ইতস্ততঃ করেছিলেন। তখন শান্তিরামবাবু বললেন : "আমাদের এত বড় সংসার, এত খরচ হচ্ছে। একপোয়া চালের অন্ন আর একপোয়া আটার রুটি না হয় ফেলাই যাবে। আপনি কিছু ভাববেন না। আপনার ঘরে দুপুরে ও রাত্রে খাবার রেখে আসবো—যখন ইচ্ছা হয়, খাবেন।" লাটু মহারাজ পরে বলেছিলেন : "আর তাঁর কথা এড়াতে পারলুম না। শান্তিরামবাবু ঠিক ভায়ের মতো ভালবাসা দেখালেন। তাঁর ভালবাসায় আটকে পড়ে সেইখানেই রয়ে গেলুম।" এসব ১৮৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দের কথা। এখানে থাকাকালীন তিনি সদ্য বিদেশ থেকে প্রত্যাগত স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।[৮৩]

যেদিন বেলুড় মঠে স্বামীজীর দেহত্যাগ হয়, সেদিন রাত্রে লাটু মহারাজ বলরাম মন্দিরে ছিলেন। মঠে তাঁর না যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে লাটু মহারাজ বলেছিলেন : "আরে উঠতে দাও। কথা তুলে আর কি দুঃখু দেবে? বিবেকানন্দ-ভাই হামাকে যে কতো ভালবাসতো, তা ওরা কি বুঝবে? এমন ভালবাসা হারালুম! তাঁর (ঠাকুরের) পর যাও বা বিবেকানন্দের ভালবাসা পেলুম, সেও চলে গেলো!" এমন করুণস্বরে লাটু মহারাজ কথাগুলি বললেন যে প্রশ্নকর্তার চোখেও জল এসেছিল।[৮৪]

বলরাম মন্দিরে থাকাকালীন লাটু মহারাজ তাঁর ঘরে নিয়মিত সৎপ্রসঙ্গাদি করতেন। একদল ভক্ত তাঁর নিত্য পুণ্য সঙ্গলাভ করতেন। চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, শশধর গাঙ্গুলী, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, রায় বাহাদুর বিহারীলাল সরকার প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[৮৫] ডাঃ চুনীলাল বসু, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, ডাঃ নিতাই হালদার প্রভৃতি ডাক্তাররাও বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজের কাছে নিয়মিত আসতেন। [ক্রমশঃ]

৮০ স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ২৩৬-২৩৭ ৮১ ঐ, পৃঃ ২৩৭ ৮২ ঐ, পৃঃ ২৩৮

৮৩ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৪১ ৮৪ ঐ, পৃঃ ২৮৬

৮৫ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় অন্যান্যদের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করে 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা' রচনা করেছেন। এই পুস্তকে বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজের সৎপ্রসঙ্গের জন্য দ্রষ্টব্য : পৃঃ ১৬৬, ১৭৫, ২১৪, ২৮৮, ২৯২-৩৫০

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

কনখলে কল্যাণ মহারাজের (স্বামী কল্যাণানন্দের) নিকট মহারাজের সম্বন্ধে একটা সুন্দর ঘটনা যেমনটি শুনিয়াছিলাম তেমনটি বলিতেছিঃ "পূজনীয় মহারাজ তখন কনখলে নূতন সেবাশ্রমে বাস করিতেছেন। তাঁহারই নির্দেশমতো সেবাশ্রমের জমি নির্বাণী আখড়ার নিকট হইতে সবে ক্রয় করা হইয়াছে। বর্তমান লাইব্রেরি-ঘরের উত্তরে এখন যেখানে প্রাঙ্গণ, সেই স্থানে একটি ফুলের চালাঘর মাত্র সাধুদের আশ্রয়স্থান। সেই ঘরের একপাশে একখানা খাট, মহারাজ তাহাতে শয়ন করেন। অপর পাশে ওপর-ওপর রাখা প্যাকিং বাক্সে ঔষধ, ডিস্পেনসারির অন্যান্য সামগ্রী। মাঝখানে মাদুর বিছাইয়া মহারাজের খাটের পাশে আমরা শয়ন করি। এই ঘর হইতে একটু দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে একটি কুশের বেড়া দেওয়া ছোট একটি কুটির, তাহাতে রান্না-খাওয়া, ভাঁড়ার আর পাচক থাকে। রান্নার সময় যে পাচক, অন্য সময় সে মালী—আবার ডিস্পেনসারির প্রয়োজনে যখন দরকার, সে-ই সব কাজ করে। মহারাজের একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়াছি। ভাল খাবার অথবা খারাপ খাবার যখন যেমন হউক সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই খাইয়া স্বচ্ছন্দে সুখে দিন কাটাইতেন। চাকরটি মোটা মোটা রুটি করিত, আর শীতের সময় তখন মুলার তরকারি হইত। মহারাজ তাহা দিয়াই অম্লান বদনে পেট ভরিয়া খাইতেন। তখন এইসব জায়গায় ভাল সবজি-তরকারি কিছুই পাওয়া যাইত না। শীতের সময় সেদিন বাদলা হইয়াছে, দিনের বেলা অন্ধকার, চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, লোকজন ঘরের বাহিরে বড় একটা নাই। প্রবল শীতে ঔষধ লইতেও সেইদিন খুব কম লোক আসিয়াছিল। আমরা দুপুরের খাওয়া শিগ্‌গির শিগ্‌গির খাইয়া ঘরে শুইয়া পড়িয়াছি। পাচকটি গম ভাঙ্গিতে কি অন্য কোথাও কোন কাজে গিয়াছে। মহারাজের দিনে কি রাত্রিতে ঘুম বড় একটা ছিল না। খানিক শুইয়া, উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন খাটের উপরে। পাচকটি রান্নাঘরের নিকটে খানিকটা জমিতে সরিষার শাক বুনিয়াছিল। মহারাজ জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন, বড়বড় দাঁতওয়ালা একটি প্রকাণ্ড জংলী হাতি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই সরিষার শাক খাইতেছে। মহারাজ খুব আস্তে আস্তে আমাদের জাগাইয়া তুলিয়া সেই হাতি দেখাইলেন। দেখিয়াই আমরা ভয়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। জংলী হাতি হিংস্র জানোয়ার—সহজেই রাগিয়া যায়। ভয় হইল হয়তো আমাদের চালা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। মহারাজ আমাদের আশ্বস্ত করিয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া চুপচাপ করিয়া থাকিতে বলিলেন। যেন হাতি বুঝিতে না পারে এখানে কোন মানুষ আছে। আমরা তাঁহার নির্দেশমতো কাঠের পুতুলের মতো বসিয়া রহিলাম। কিন্তু ভয়ে বুক কাঁপিতে লাগিল। মহারাজ কুশের বেড়ার ফাঁক দিয়া হাতির গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরেই হাতিটি মাথা তুলিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া সোজা পিছনের দিকে বাহির হইয়া গেল। তখন আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলাম।"

কনখলে তখন ভাল জাতের ফলের গাছ ছিল না। মহারাজের চেষ্টাতেই আশ্রমে ভাল আম, বেল, লিচু ও অন্যান্য ফল-ফুলের গাছ লাগানো হয়। পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে উৎকৃষ্ট আমের কলম আনা হইয়াছিল এবং আমের ফলন খুব ভাল হওয়ায় কল্যাণ মহারাজের বাগানের প্রতি খুব মনোযোগ হইয়াছিল। আমরা কনখলে মহারাজের লাগানো একটি সুন্দর লাল রঙের লতানো ফুলের

গাছ দেখিয়াছিলাম যাহা বড় আম গাছে বিস্তৃত হইয়া আশ্রমের শোভাবর্ধন করিত। আর একটি ঝোপাকৃতি পুষ্পবৃক্ষ দেখিয়াছি যাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগন্ধী সাদা রঙের অসংখ্য ফুল ফুটিয়া দর্শকদের মনোরঞ্জন করিত। মহারাজ উত্তরভারতের বৃক্ষাদি দক্ষিণদেশে,আবার দাক্ষিণাত্যের গাছপালা আর্যাবর্তে আনিয়াছিলেন। ঢাকার প্রাচীন ভক্ত যতীন্দ্রমোহন দাস (স্বামীজীকে পূর্ববঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের অন্যতম) স্বামীজী ও মহারাজের কয়েকটি স্বহস্তলিখিত পত্র আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজ তাঁহাকে এক পত্রে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, নূতন (বেলুড়) মঠে লাগাইবার জন্য ঢাকার নবাবের বাগান হইতে দুর্লভ 'পদ্মকোষ' কাঁঠালের বীজ সংগ্রহ করিয়া দিতে। যতীনবাবু সেই বীজ পাঠাইয়াছিলেন। মঠে সেই বৃক্ষ ও ফল আমরা দেখিয়াছি। বর্তমানে মঠে যেখানে মাতাঠাকুরানীর মন্দির নির্মিত হইয়াছে —তাহারই সন্নিকটে কাঁঠাল গাছটি ছিল। ছোট ছোট গোলাকার কাঁঠাল। গাছটিতে কত ফল যে ধরিত! কাশী সেবাশ্রমেও মহারাজের বাগানের জন্য আগ্রহ ও বৃক্ষাদি লাগাইবার কথা শুনা যায়। এই সম্বন্ধে জনৈক প্রাচীন সাধু আমাদের বলিয়াছিলেন: "একসময়ে মহারাজ কাশী সেবাশ্রমে রহিয়াছেন। সেখানে ফুলবাগানে ভাল ফুল হয় না বলিয়া বাগানের তত্ত্বাবধায়ক আপসোস করিতেছেন। মহারাজ তাঁহাকে দুটি খালি ড্রাম সংগ্রহ করিয়া রান্নাঘরের বাসন যেখানে মাজা হয় তাহার নিকটে রাখিয়া উচ্ছিষ্ট ডাল-ভাত-তরকারি প্রভৃতি তাহাতে ঢালিয়া ভর্তি করিতে বলিলেন। কয়েক দিনেই ড্রাম দুইটি ভর্তি হইল ও পচা দুর্গন্ধ বাহির হইল। তখন উহা ভাল করিয়া ঢাকা দেওয়াইয়া, সরাইয়া বাগানে নিয়া রাখিতে বলিলেন। আরও কিছুদিন পরে উহা যখন সম্পূর্ণ পচিয়া মিশিয়া গেল, তখন ফুলের বাগানে সার হিসাবে ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিলেন। সেই সারের গুণে সে-বৎসর চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া প্রভৃতি এমন চমৎকার হইল যে, সকলেই দেখিয়া মোহিত হইলেন। ভুবনেশ্বর মঠের বর্তমান পরিবেশ নানা জাতীয় বৃক্ষ ফল-ফুল-সুশোভিত বাগান দেখিয়া এখন কেহই অনুমান করিতে পারিবেন না কিরূপ মরুভূমি-সদৃশ জমি উহা ছিল। মহারাজের রাজবুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, অ-লৌকিক শক্তিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় ভুবনেশ্বর মঠ। জনবসতিবিরল, ধ্বংসাবশেষপূর্ণ, শ্বাপদসঙ্কুল অঞ্চলে বিস্তৃত জমি গ্রহণ ও বহু অর্থব্যয় ও কায়শ্রমে এই মঠ নির্মাণ তখন অনেকেই ভাল চোখে দেখেন নাই। কারণ, কাহারও কল্পনাতেও আসে নাই যে, ঐ স্থান ভবিষ্যতে উড়িষ্যার সুরম্য রাজধানীতে পরিণত হইবে।"

মহারাজ কাশী, বৃন্দাবন, কনখল প্রভৃতি স্থানে থাকাকালে অধিকাংশ সময় উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবেই কাটাইতেন সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের দিকেও তাঁহার সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিত। এই সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনা যায়। আর মহারাজের অমোঘ ইচ্ছাও আশ্চর্যরূপে পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে। শুনিয়াছি ব্রজভূমে কুসুমসরোবরে তিনি যখন তপস্যা করিতেন তখন ব্রজের এসব অঞ্চলের ত্যাগি-তপস্বী ভজননিষ্ঠ বাবাজীগণের ভিক্ষার কষ্ট দেখিয়া তাঁহার মনে খুব দুঃখ হইত এবং তাঁহাদের ভিক্ষার সহায়তার জন্য একটি ছত্র (অন্নসত্র) প্রতিষ্ঠার কথাও তাঁহার মনে হইত। তাঁহার সেই শুভ সঙ্কল্পের ফল তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যাইবার কিছুকাল পরেই ফলিয়াছিল। কুসুমসরোবর ও রাধাকুণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে গোয়ালিয়রের মহারাজের ভাই এক সুবৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্রজবাসী ভিক্ষাজীবী সাধুদের সেবার জন্য বহু টাকার স্থায়ী তহবিল তৈরি করিয়া দেন। তাহার আয় হইতে বহু সাধু নিয়মিত সাহায্য পাইয়া থাকেন। মহারাজের আনুকূল্যেই বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ঐ অঞ্চলের নিরাশ্রয় অসুস্থ সাধুগণেরও সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। [ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

প্রসঙ্গ তৈলদূষণ

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড়। যে বিশাল জলভূমিতে জীবনের প্রথম স্পন্দন জেগেছিল, যার বক্ষে আশ্রিত শতশত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী—যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের পরিবেশ, জীবন ও জীবিকাকে পুষ্ট করে চলেছে—সাগরভূমির সেই জীব ও উদ্ভিদ আজ সংকটের দোরগোড়ায়। কলকারখানার ময়লা ও বিকিরণ-জনিত অন্যান্য দূষণে এই সমুদ্রের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ক্রমশই দূষিত হয়ে উঠছে, যা সামুদ্রিক জীবের বেড়ে ওঠা ও বেঁচে থাকার পক্ষে প্রতিকূল। তার ওপর সাম্প্রতিক কালে উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে সংযোজন হলো সাগরবক্ষে অশোধিত খনিজ তৈলপতন। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ-বিশারদ ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ চিন্তায় আকুল কিভাবে তাঁরা এই সর্বনাশা অবস্থা থেকে মানুষকে পরিত্রাণের সঠিক পথ দেখাবেন? কারণ, এ-বিপদ কোন একটি দেশের নয়—এর খেসারত দিতে হবে তামাম বিশ্বের জনগণকে—হয়তো-বা একাধিক প্রজন্ম ধরে। বর্তমান প্রবন্ধে দেখানো হবে যে, মানবসভ্যতার সঙ্গে সাগরজীবনের সম্পর্ক, সমুদ্র-দূষণের উৎস, দূষণের প্রকৃতি ও তাথেকে মুক্তির সম্ভাব্য রূপরেখা।

মানুষের সঙ্গে সামুদ্রিক জীবের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবুজ উদ্ভিদের (green plants) বিকল্প আমরা এখনো ভাবতে পারিনি। স্থলজ উদ্ভিদ অপেক্ষা সামুদ্রিক উদ্ভিদ সংখ্যায় বহুগুণে বেশি। শুধু শর্করা খাদ্যই নয়—সামুদ্রিক শৈবালে যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ খাদ্য (প্রোটিন), ভিটামিন ও লবণের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা গেছে। সেই কারণে আমাদের পরিচিত খাদ্যবস্তু চাল-গমের সঙ্গে সামুদ্রিক শৈবালকে বিকল্প খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বহু দেশে। জাপানে ব্যাপক হারে সামুদ্রিক শৈবালের চাষ চালু হয়েছে। কেবল জাপান নয়, চীন, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়াতেও ঐ চাষের কাজ আরম্ভ হয়েছে। কেবলমাত্র মানুষের খাদ্যই নয়—সামুদ্রিক উদ্ভিদ মুরগী, ঘোড়া ও অন্যান্য গবাদি পশুরও উৎকৃষ্ট বিকল্প খাদ্য। নরওয়ে, গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানিতেও সামুদ্রিক শৈবাল পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জাপানে ব্যবহৃত সামুদ্রিক শৈবাল পরফাইরা (porphyra), জাপানে যাকে নোরি (nori) বলা হয়, তার প্রতি ১০০ গ্রামে থাকে ১১'৪ গ্রাম জল, ৩৬'৬ গ্রাম প্রোটিন, ০'৭ গ্রাম চর্বি, ৪৫'৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট এবং লবণ ও বিভিন্ন ভিটামিন খাদ্য মিলিয়ে ৭'০ গ্রাম। (Science Reporter, July, 1979) জাপানের সামুদ্রিক শৈবালের চাহিদা বিভিন্ন দেশে বেড়েই চলেছে।

খাদ্যসম্পদগুণে সামুদ্রিক প্রাণিজ খাদ্য সামুদ্রিক উদ্ভিদের চেয়ে বেশি মর্যাদা পায়। সমুদ্রজাত-পণ্যের সিংহভাগ আয় আসে মৎস্যজাতীয় দ্রব্য থেকে। আন্তর্জাতিক গণনার হিসাব অনুসারে এই পণ্য যোগানের শীর্ষে প্রশান্ত মহাসাগর, তারপর আটলান্টিক মহাসাগর এবং তারপরে ভারত মহাসাগর। কেবল ভারত মহাসাগর থেকেই বছরে ২৫ লক্ষ টন মৎস্য শিকার করা হয়। সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে চিংড়িজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে কড, হাঙ্গর, সার্ডিন, ম্যাকেরেল, টুনা, ইলিশ, পমফ্রেট প্রভৃতি অনেক মাছই আছে। উপাদানগুণে ও ক্যালরীমূল্যে সামুদ্রিক মাছ কোন অংশেই মিঠাজলের মাছের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলো যে, আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার শতকরা ৭০ ভাগ মাছ আসে সমুদ্র থেকে।

কেবল খাদ্য হিসাবেই নয় সমুদ্রের জীবসম্পদ বিচিত্রভাবে মানুষের অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সামুদ্রিক শৈবাল থেকে 'আগার' জাতীয় বাণিজ্যিক পণ্য প্রস্তুত হয় যা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগে। ভিটামিনপূর্ণ লিভার অয়েলের ব্যাপক ব্যবহার আমাদের সকলেরই জানা।

এই লিভার অয়েল কড, টুনা, হ্যালিবার্ট, হাঙ্গর ও অন্যান্য মাছ থেকে পাওয়া যায়। মাছের চামড়া, পাখনা ও আঁশের বাণিজ্যিক মূল্যও কম নয়। শুকনো মাছের গুঁড়োও (নাইট্রোজেন—৫-৭%, ফসফরাস—৪-৬% ও ক্যালসিয়াম—৪-৬%) উত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক প্রবাল এক বিশেষ মূল্যবান সামগ্রী। বহুমূল্যে রত্নহিসাবে গৃহীত মুক্তা এক বিশেষ সামুদ্রিক ঝিনুকের (পিঙ্কটাডা ফুকাটা) ক্ষরণজাত দ্রব্য। সমুদ্রের অতিকায় প্রাণী—কচ্ছপ, ডলফিন ও তিমি কেবল বিশেষ প্রাণিজ সম্পদ হিসাবেই গণ্য নয়—খাদ্য, তৈল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক উপাদান সরবরাহেও তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাণিজ সম্পদের আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান হলো দুরোরোগ্য ক্যান্সার রোগ প্রতিষেধক ওষুধ সরবরাহ। অধুনা গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে, ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধকারী বহু রাসায়নিক দ্রব্য সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহে বর্তমান। এরূপ উপাদানগুলির মধ্যে স্পঞ্জ-দেহজাত হ্যালিটক্সিন (Halitoxin), প্রবাল-দেহজাত সিমুলারিন (Simularin) ও সমুদ্রশশক-জাত অ্যাপ্লাইসিসটাইন (Aplysistain) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (Science Reporter, July, 1986)

সাগরের জীব-সম্পদ ও তৈলদূষণ

সাগরের বহুমূল্য জীব-সম্পদ আজ তৈলদূষণে সঙ্কটের প্রহর গুনছে। সাগরের তৈলদূষণ তাই আজ বিশ্ববাসীকে এক চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তৈলদূষণ যে কেবল উপসাগরীয় যুদ্ধের এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তাই নয়—এই দূষণ শুরু হয়েছে অনেক আগেই, তবে সাম্প্রতিক উপসাগরীয় যুদ্ধ তার মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়েছে। নানান উৎস থেকে সমুদ্রজল তৈলদূষণে দুষ্ট হচ্ছে। অধিকাংশ তৈলখনিই সমুদ্রসংলগ্ন। কাজেই সেখান থেকে তেল সংগ্রহ করায় অশোধিত তেলের অনেকাংশই জলে মেশে। অনেক সময় ঐ সমস্ত তৈলখনি থেকে তেল ও গ্যাসের চাপে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অশোধিত তেল এসে পড়ে সমুদ্রজলে। এই ঘটনাকে বলে 'ব্লো-আউট'। কয়েক বছর আগে মেক্সিকো উপসাগরে এক তৈলখনি থেকে প্রায় চার লক্ষ টন তেল বেরিয়ে এসে সাগরজলে পড়েছিল। বম্বে হাইয়ের তৈল-দূষণে আরব সাগরের জলের রঙ পরিবর্তিত হতে চলেছে। কেবল খনিজ পতনই তৈলদূষণের একক উৎস নয়—তৈলবাহী জাহাজ-দুর্ঘটনা এর এক বিশেষ উৎস। বহু অশোধিত তৈলপূর্ণ জাহাজ দুর্ঘটনায় সাগরবক্ষে তলিয়ে যায়। জাহাজে-জাহাজে সংঘর্ষেও তেল ছিটিয়ে পড়ে সমুদ্রের ওপর। অনেক সময় তেলশূন্য জাহাজের ট্যাঙ্কার জলপূর্ণ করা হয় জাহাজের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য। পরে তেল ভরার সময় ঐ জল ট্যাঙ্কার থেকে ফেলে দিতে হয়; তার মাধ্যমেও কিছু তেল সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও এইভাবে যে তেল সমুদ্রজলে পড়ে তার পরিমাণও কম নয়—বছরে প্রায় ৩৯ লক্ষ থেকে ৬৬ লক্ষ টন। এই পরিমাপ পরবর্তী গণনায় যে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে তা অনায়াসে বলা যায়। কারণ, উপসাগরীয় যুদ্ধে রাশি রাশি ট্যাঙ্কার, তৈল-উৎপাদন ক্ষেত্র ও তৈলশোধনাগার ধ্বংস হয়েছে এবং সেই তেল অবিরাম সাগরজলে এসে পড়েছে। তার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে সাগরে তেল ফেলা হয়েছে বলেও সংবাদপত্রে প্রকাশ।

তৈলদূষণে প্রথমেই যা ঘটে তা হলো জলের ওপর তেলের এক আস্তরণ রচনা। কারণ, তেল জলের চেয়ে ওজনে হালকা। স্বভাবতই তেল জলের উপরিতলে ভাসে। এই আস্তরণের জন্য জলের মধ্যে আলোর প্রবেশ রোধ হয় এবং জলে অক্সিজেন মিশ্রণের বিঘ্ন ঘটে। অথচ সামুদ্রিক জীব ও উদ্ভিদের ঐ দুটি জিনিসই অতীব জরুরী। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, সমুদ্রে অসংখ্য ভাসমান উদ্ভিদ আছে যারা সূর্যের আলোর সাহায্যে খাদ্য উৎপন্ন করে কেবল যে নিজেরাই বেঁচে থাকে তা নয়, তারা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ঐ উদ্ভিদকুল যদি আলোর অভাবে বিনষ্ট হয় তাহলে অন্যান্য প্রাণীরাও বিপন্ন তো হবেই, এমনকি তাদের বিলুপ্তির পথও হবে প্রশস্ত। কারণ, জীবজগতের জীবনপ্রবাহ সুনির্দিষ্ট খাদ্যশৃংখলে আবদ্ধ। এই শৃংখল ভঙ্গ হলো পৃথিবী থেকে কিছু জীব ও উদ্ভিদের বিলুপ্তির পূর্বশর্ত। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সামুদ্রিক পণ্যের বাণিজ্যিক বিন্যাসের সঙ্গে মানুষের

জীবন ও জীবিকা বিশেষভাবে জড়িত। সামুদ্রিক জীবকুলের বিনাশে সেই সম্ভাবনাও বিপন্ন হওয়ার পথে। তাছাড়া আলোর অভাবে বিচিত্র ব্যাধির কবলে পড়বে অগণিত সামুদ্রিক প্রাণী। জলে তেলের আস্তরণ বেশি হলে এবং তা ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হলে জলে অক্সিজেন সংযোগের পথ বিঘ্নিত হবে। ফলে মাছ ও অন্যান্য ফুলকাধারী প্রাণীদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে। কাজেই এ দূষণ যদি স্থায়িত্ব পায় তাহলে অদূরে ভবিষ্যতে মাছের মড়ক এড়ানো যাবে না। তার ওপর তারা হবে টিউমার ও অন্যান্য ক্ষয়রোগের অনিবার্য শিকার। এমনকি অশোধিত তেল মাছের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন চর্মরোগের সম্ভাবনাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে। সাম্প্রতিক তৈলদূষণ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলেছেন যে, এই তৈলদূষণে সিন্ধুঘোটক, ডুগং, ডলফিন প্রভৃতি বিরল প্রাণীরাও হয়তো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে।

এই বিপর্যয়ের শিকার পক্ষীকুলও। উপসাগরীয় তৈলদূষণে নানা প্রজাতির অসংখ্য পাখির মৃতদেহ জোয়ারের জলে তীরে ভেসে এসেছে। বর্ণবাহারী পাখিদের দেহ কালো আঠালো তৈলাক্ত আস্তরণে ক্লিষ্ট। বস্তুতঃ খনিজ তৈল পাখিদের পালকে ঢুকলে তার আর জল ঠেকানোর ক্ষমতা থাকে না। তাই তৈলাক্ত সমুদ্র থেকে উঠে আসার জন্য বারবার তারা ঠোঁট দিয়ে ডানা ঝাড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। অবশেষে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

তৈলদূষণের পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই পড়বে স্থলভাগের পরিবেশমন্ডলে। সেখানের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের সাম্য রক্ষিত হবে না। আন্তর্জাতিক পরিবেশতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করছেন, পারস্য উপসাগরের বর্তমান তৈলদূষণের প্রকোপে কুয়েতের নিকটবর্তী কারুহ প্রবালদ্বীপটি বোধ হয় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে।

তৈলদূষণ রোধের উপায়

যে-সমস্ত শহরে সমুদ্রজল শোধন করে পানীয় জল রূপে সরবরাহ করা হয় সেখানে তৈলদূষণ ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেই সমস্ত জায়গায় সমুদ্রের ওপর নিরাপদ দূরত্বে নিরাপত্তা-বেড়া বা 'বুম' দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক উপসাগরীয় তৈলদূষণে সৌদি আরবের জুবেল শহরে এরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা দ্বারা জলশোধনাগারকে সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে। জলে ভেসে থাকা তেলকে তুলে ফেলার জন্য বড় বড় বেল্টের ব্যবহার করা হয়। ঐ বেল্টগুলোতে তেল-শোষক পদার্থের প্রলেপ লাগানো থাকে। মাঝে মাঝে বেল্টগুলোকে জল থেকে তুলে ঐ তেলের আস্তরণ মুছে ফেলা হয়। অনেক বৈজ্ঞানিক ভাবছেন 'কোরেক্সিট' নামক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ। ঐ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈলাস্তরণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সাগরবক্ষে ভাসমান তৈলস্তরে আগুন ধরিয়ে তৈলবিনষ্টের উদ্যোগও উপসাগরীয় যুদ্ধে আমরা লক্ষ্য করেছি। এই উদ্যোগ আংশিক কার্যকরী হলেও এর সীমাবদ্ধতা যথেষ্টই। আর একটি ব্যাপক প্রচেষ্টা স্মরণ করা যায়, যদিও এখনো তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা (তাঁদের মধ্যে বাঙালী বিজ্ঞানীও আছেন) এক-ধরনের সঙ্কর ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন, যারা সমুদ্রের ভাসমান তেলকে (হাইড্রোকার্বন যৌগ) অনায়াসে হজম করতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই জীবাণুর নাম দিয়েছেন 'মাইক্রোরিয়াল সারফ্যাক-ট্যান্ট'। এরা 'সুপার বাগ' (super bug) নামেও পরিচিত। এরা যে কেবল দূষণ রোধ করে তাই নয়, পরে ঐ সমস্ত দূষকদ্রব্যকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানে রূপান্তরিত করার ক্ষমতাও রাখে।

তবে তৈলদূষণ প্রবণতার তুলনায় তার নিয়ন্ত্রণ-কৌশল যেমন অপ্রতুল তেমনি তা জটিল। আরো ভয়ঙ্কর বিষয় হলো—এই দূষণকে মানুষ বাড়িয়ে তুলেছে নিজেদের স্বার্থে ও অশুভ বুদ্ধির প্ররোচনায়। বোধ হয় আমাদের এই অপরিণাম-দর্শিতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে জনৈক বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন: "এ-যুদ্ধে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি ছাপিয়ে যাবে অন্যসব ক্ষতিকে।" কিছু শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি বা কয়েকটি গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় এই ব্যাপক বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রতিরক্ষা-উদ্যোগ—দূষণবিরোধী বিশ্বজনমত গড়ে তোলা। তবেই হবে মানবসৃষ্ট এই অপরাধের মানবকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

গ্রন্থ-পরিচয়

রোগ চিকিৎসায় গাছ-গাছড়া ও মন্ত্র-তন্ত্র

জলধিকুমার সরকার

চিকিৎসা বিধানে তন্ত্রশাস্ত্র ঃ
ঠাকুর। প্রথম খণ্ড, ১৩৯৪। প্রাচী পাবলিকেশনস, ৩/৪ হেয়ার স্ট্রীট (তেতলা), কলিকাতা-৭০০০০১। মূল্য ঃ তিরিশ টাকা।

'তন্ত্র' কথাটি শুনলেই প্রথমেই মনে আসে তান্ত্রিক সাধনা। কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে এবং বাঙলা অভিধানে 'তন্ত্র' কথাটির অর্থ বিভিন্ন এবং সংখ্যায় তিরিশেরও অধিক। এই অর্থগুলির মধ্যে আছে ঃ ধর্মসাহিত্যবিশেষ, সিদ্ধান্ত, উপকরণ, শাসন-পদ্ধতি, রাষ্ট্র, সামাজিক বিধি, সুতো, তাঁত, চিকিৎসায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ফলপ্রদ বিধান প্রভৃতি। আলোচ্য গ্রন্থে শব্দটি মোটামুটিভাবে শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়ুর্বেদ, বিভিন্ন পুরাণ (যেমন গরুড়-পুরাণ, মৎস্য-পুরাণ প্রভৃতি) তন্ত্রগ্রন্থ (যেমন কুমার-তন্ত্র, যোগিনী-তন্ত্র প্রভৃতি) এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে চিকিৎসা ব্যাপারে যেগুলি বিভিন্ন রোগে উপকারী বলে মনে করেছেন, লেখক সেগুলিকে মূল সংস্কৃত সূত্র এবং তার বাঙলা অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী সহ উপস্থাপিত করেছেন এই গ্রন্থে।

গ্রন্থে আলোচিত চিকিৎসা-পদ্ধতিকে মোটামুটি-ভাবে দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) গাছ-গাছড়ার মূল, রস বা পাতা প্রভৃতি দ্বারা রোগ চিকিৎসা, যাকে সাধারণ লোক কবিরাজী (এক্ষেত্রে টোটকা) চিকিৎসা বলে এবং (খ) মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা।

(ক) বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার যে রোগ সারানোর ক্ষমতা আছে তা সর্বদেশেই বিশেষতঃ ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগ থেকে স্বীকৃত। বর্তমানে অ্যালোপ্যাথির যুগে সেই বিশ্বাস খানিকটা ম্লান হলেও একেবারে মুছে যায়নি এবং অনেক বাড়িতেই কিছু কিছু টোটকা চিকিৎসা হিসাবে এগুলি এখনো ব্যবহৃত হয়। বিশ্বাস ম্লান হবার একটা কারণ হচ্ছে যে, রোগ প্রতিরোধক-দ্রব্য গাছ বা পাতার রসে থাকলেও তা বিশুদ্ধ ঘনী-ভূত আকারে (অর্থাৎ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাদ দিয়ে কেবল কার্যকরী অংশটুকু ঘনীভূত করে) তৈরি না করায় এগুলি অ্যালোপ্যাথি ওষুধগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে কর্মব্যস্ত লোক রোগের প্রশমনও তাড়াতাড়ি চায়। এই কারণে লোকে আয়ুর্বেদোক্ত ওষুধ ব্যবহার পছন্দ করে না। পছন্দ না করার আর একটি কারণ হলো উপাদান ও ভেষজদ্রব্যগুলি যোগাড় করার অসুবিধা। তা ছাড়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্র গবেষণার অভাবে পুরাতন অবস্থাতেই রয়ে গেছে। গ্রন্থকার প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করায় মতটির প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকতা উপস্থাপিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তার দ্বারা লোকের আস্থা ফিরে পাবার মতো কিছু পাওয়া যায় না। পুরাতন মতামতকে কি সবসময় আঁকড়ে থাকা চলে? আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ বহু সত্য পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে নবলব্ধ সত্যকে স্থান ছেড়ে দেয়। পৃঃ ৬৫ তে মসু-রিকা (বসন্ত বা smallpox) সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ "পিত্ত কফের বিকার থেকে এমন রোগ হয় যার নাম মসুরিকা।" এখন সকলেই জানে যে, বসন্ত রোগের কারণ ভাইরাস বা জীবপরমাণু এবং এই ভিত্তিতেই সারা পৃথিবী থেকে বসন্ত রোগকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। কাজে কাজেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যদি আজও আগের বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকে, তাহলে তার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা মুস্কিল হয় না কি? আবার অন্যদিকে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় দুটিপ্রধান অন্তরায় দেখা দিয়েছে—একটি হলো এই চিকিৎসার ব্যয়বাহুল্য, যার জন্য এই চিকিৎসা গরিবের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে; দ্বিতীয়টি হলো ওষুধ ব্যবহারে শরীরে কুফল সৃষ্টি হওয়া। এই দুটি কারণে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা অ্যালোপ্যাথি সম্বন্ধে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন এবং পৃথিবীর বহুদেশে যে পুরনো চিকিৎসা-পদ্ধতি (traditional medicine) চালু আছে সেগুলির দিকে নজর দেওয়াতে উৎসাহ দিচ্ছে।

এইরকম পরিস্থিতিতে লেখক যে বহু পরিশ্রমে তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত ভারতীয় ভেষজের দিকটা তুলে ধরেছেন, সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ ও টীকা দিয়েছেন, গাছ-গাছড়ার পরিচিতি দিয়েছেন এবং ওষুধ প্রস্তুত-প্রণালী দিয়েছেন, এর জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

(খ) পুস্তকটির অন্য বৈশিষ্ট্য হলো ভেষজের সঙ্গে জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক পদ্ধতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ। "রবিবারে রক্ত বেড়েলার মূল রোগীর বিছানায় কলায় (কালো?) সুতো দিয়ে বেঁধে দিলে সর্বপ্রকার জ্বর··· সেরে যায়।" (পৃঃ ১৪৩), "সর্বপ্রকার জ্বর বন্ধ করার একটি মন্ত্র—'হ্রীং হ্রীং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ (পৃঃ ১৪৩), "পুষ্যা নক্ষত্রে প্রশস্ত দিনে ভৃঙ্গরাজ গাছ তুলতে হবে" (পৃঃ ৪), "হুতুম পেঁচার ডানদিকের পাখনার হাড়সহ পালক এনে সাদা সুতো দিয়ে জড়িয়ে রোগীর বাঁদিকের কানে বেঁধে দিলে···"(পৃঃ ১৩৭) ইত্যাদি ইত্যাদি। এধরনের চিকিৎসা-পদ্ধতি গ্রহণ করা মূলতঃ বিশ্বাসের ব্যাপার, তবে সেই বিশ্বাস সৃষ্টি করার মতো কিছু পাওয়া যায় না এই পুস্তকে। আশা করি, আয়ুর্বেদীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এধরনের ভাবধারার শিক্ষা দেওয়া হয় না। তবে তান্ত্রিক চিকিৎসা-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য লেখক নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এ-ধরনের প্রামাণিক গ্রন্থ খুব বেশি নেই বলে মনে হয়।

প্রাচীন ভারতের পত্রলিখন-শৈলী

নিখিলেশ চক্রবর্তী

পত্রকৌমুদী—বররুচি। সম্পাদনা—বলরাম মণ্ডল। প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯। এভারেস্ট পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্যঃ দশ টাকা।

সমাজ যত বড় ও জটিল হয় ততই সামাজিক মানুষের একের সঙ্গে অন্যের যোগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ-যোগ প্রত্যক্ষতঃ সম্ভব হলেও কখনো কখনো তাতে ব্যাঘাতও ঘটে। এভাবে কালক্রমে মৌখিক কথাবার্তার চেয়ে পত্রলেখার ওপর গুরুত্ব বাড়ে। বর্তমান জীবনে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ অপরিহার্য বিষয় বলে পরিগণিত। প্রাচীনকালে পত্রলেখার গুরুত্ব বিভিন্ন কাব্য-সাহিত্যে, শিলা-লিপিতে দেখতে পাই।

সংস্কৃত পত্রকৌমুদীর রচনাকার প্রাকৃতভাষার বৈয়াকরণ বররুচি অতি প্রসিদ্ধ একটি নাম। পত্রলেখায় যে কৌমুদী চন্দ্রিকা বা জ্যোৎস্না আসে তার বিন্যাস ঘটিয়েছেন বররুচি। পত্রের বা পত্রগুলির কৌমুদী পত্রকৌমুদী। সার্থক নাম। পত্রের লেখনপদ্ধতি নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা এতে রয়েছে। রাজদপ্তর থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছেও এ-গ্রন্থকে উপযোগী করে তোলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। কাব্যে যেমন রসবোধ, ভাববোধ, ইত্যাদি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিচার পায়, তেমনি বররুচি পত্রের বিন্যাসপ্রকারে দেখিয়েছেন রসভাবাদি পরিবহনের ক্ষেত্রে এ-গ্রন্থের গুরুত্ব কতখানি। বস্তুতঃ তিনি দেখিয়েছেন পত্রলেখাও এক ধরনের শিল্প।

কোন্ পদ্ধতিতে পত্র লেখা হবে, পত্রের রঙ কেমন হবে, পত্র কত মাপের হবে, পত্রের ভাষা কেমন হবে, প্রশস্তি রচনা কেমনভাবে করতে হবে ইত্যাদি আলোচনায় পত্রকৌমুদী গ্রন্থ সমৃদ্ধ। পুঁথির মধ্যে নিবদ্ধ এই গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলে সম্পাদকের মনে। ধীরে ধীরে পত্রকৌমুদীর একটি পুঁথি থেকে আরও দুটি পুঁথির সন্ধান মেলে। এভাবে তিনটি পুঁথি মিলে কাজ করে প্রাচীনকালের আরেকটি ঐতিহ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্পাদক ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। তিনটি পুঁথির সন্ধানে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এশিয়াটিক সোসাইটির দপ্তরে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত ছিল। তিনটি পুঁথির গঠন-প্রকৃতি সংক্ষেপে বলে তিনি মূল পুঁথিটি নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন। সম্পাদক একটিকে মূল ধরে অন্যান্য দুটি পুঁথির পাঠ-ভিন্নতা উল্লেখ করেছেন। এভাবে গ্রন্থটিকে রুচি-সম্মত করে ভাবী গবেষকদের কাছে তিনি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। এত পরিশ্রম সার্থক হতো যদি মুদ্রণে কিছু ভুল না থাকত।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি '৯১ **বেলুড় মঠে** নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঐদিন দুপুরে প্রায় ২৫ হাজার ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। সভায় ভাষণ দেন বিশিষ্ট সোভিয়েত পণ্ডিত ডঃ আর. বি. রিবাকভ। ২৪ মার্চ সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে সারাদিন ধরে বহু ভক্তসমাগম হয়। দুপুরে প্রায় ৩০ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

দিল্লী আশ্রমে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় পৌরোহিত্য করেন ভারতের প্রধান বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র।

হায়দ্রাবাদ আশ্রম গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এক যুব-সম্মেলনের আয়োজন করে। ঐ সম্মেলনে স্কুল-কলেজের মোট ৮০০জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল।

কোয়েম্বাটোর বিদ্যালয় (তামিলনাড়ু) গত ১ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করেছিল। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। ঐ সম্মেলনে বহু যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। সম্মেলনে বিদায়ী ভাষণ দেন কোয়েম্বাটোর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে. এম. মারিমুথু।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদা গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম জন্মতিথি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা, রামায়ণ গান, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠান-সূচীর প্রধান অঙ্গ। প্রথম দিনের ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর জীবন ও বাণীর আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং স্বামী গিরিজাত্মানন্দ, দ্বিতীয় দিন 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং অধ্যাপক বদরীপ্রসাদ ব্যানার্জী। স্বামী গিরিজাত্মানন্দের পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ; রামায়ণ গান পরিবেশন করেন বেতারশিল্পী ধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন বেতারশিল্পী পরিতোষ সেন ও সহশিল্পিবৃন্দ। উৎসবের প্রথম দিন দুপুরে ৩ হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের উপকেন্দ্র শেলা আশ্রমে গত ৮ ডিসেম্বর '৯০ ও ৭ জানুয়ারি '৯১ যথাক্রমে শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়। ঐ দুই দিন বিশেষ পূজা, ভজন-কীর্তন, পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দুদিনের উৎসবে বহু খাসী, গারো ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের ভক্ত যোগদান করেছিল।

গত ১১ জানুয়ারি **রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে** প্রাক্‌ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার বিতরণ, ১২ জানুয়ারি যুবদিবস এবং ১৩ জানুয়ারি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী জয়ানন্দ, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শিশু-সাহিত্যিক শৈলেন ঘোষ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক (খড়দহ সার্কেল) জয়িতা ব্যানার্জী। ১২ জানুয়ারি আবৃত্তি, যন্ত্রসঙ্গীত ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস ও জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৩ জানুয়ারি সঙ্গীত বিভাগের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে কিছু বিশিষ্ট বেতার এবং দূরদর্শন-শিল্পীও অংশ-গ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানান্তে কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী জয়ানন্দ।

জাতীয় যুবদিবস

রাজকোট আশ্রম গত ১২ জানুয়ারি এক যুব-সম্মেলনের আয়োজন করে। ঐ যুবসম্মেলনে মোট ৩৭২জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সিতাংশু মেহতা ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় ভাদোদারাতেও গত ১৭ জানুয়ারি এক যুব-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

সালেম আশ্রম (তামিলনাড়ু) জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, একক অভিনয়, ক্যুইজ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৫০জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

রাঁচি স্যানাটোরিয়াম গত ১২ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি, প্ল্যাকার্ড প্রভৃতি নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল।

ভুবনেশ্বর আশ্রম গত ১২ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি যুবসপ্তাহ পালন করে। এই উপলক্ষে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে এই আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় যুব-সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ভুবনেশ্বর আশ্রমেও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা, ক্যুইজ, জনসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উড়িষ্যার ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের মন্ত্রী শরৎকুমার কর।

গত ১২ জানুয়ারি **আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের** উদ্যোগে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে স্থানীয় শিশু-উদ্যানে স্বামীজীর প্রতিমূর্তির সম্মুখে এক যুবসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ২ হাজার তরুণ-তরুণী এতে যোগদান করে। সভায় স্বামীজীর প্রতিমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, স্বামীজী সম্পর্কে পাঠ, আলোচনা, বক্তৃতা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শান্তিদানন্দ। সভার শেষে এক শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে। অনুষ্ঠান-শেষে প্রত্যেকের হাতে প্রসাদ ও 'সবার স্বামীজী' বইটি দেওয়া হয়।

অপরাহ্ণ ২টায় বিবেকনগর (আমতলী) রামকৃষ্ণ মঠে স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় সহস্রাধিক বিদ্যার্থীর সমাবেশে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে প্রত্যেকের হাতে প্রসাদ ও 'স্বামীজীর আহ্বান' বইটি দেওয়া হয়।

জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১২ জানুয়ারি সকালে এক শোভাযাত্রার পর প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও চিত্রাঙ্কন। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেক বিভাগের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যেক প্রতিযোগীকেই অভিজ্ঞানপত্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বই দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীত ও যাদুবিদ্যা প্রদর্শন। দুই দিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। যাদু প্রদর্শন করেন দেবাশিস সাহারায় ও স্বপন ভট্টাচার্য।

ছাত্র-কৃতিত্ব

গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় যে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সায়েন্স ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে **রামকৃষ্ণ মিশন নরোত্তমনগর (অরুণাচলপ্রদেশ)** বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র তার প্রদর্শনীর জন্য এন. সি. এস. এম. স্কলারশিপ লাভ করেছে।

ত্রাণ

বন্যাত্রাণ

উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার ধারাকোট এবং আস্কা ব্লকের তালাপাটনা, চামপল্লী, গঙ্গাপুর ও অন্যান্য তিনটি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৫০০টি পশমের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

চিকিৎসাত্রাণ

এলাহাবাদ আশ্রম মাঘ মেলা উপলক্ষে জানুয়ারি—ফেব্রুয়ারি মাসে একটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে মোট ১৭,০২২জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। ঐ সময় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ওপর একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের লক্ষ্মীপুরমে নির্মিত আশ্রয়-গৃহের প্লাস্টারিং ও দরজা-জানালা লাগানোর কাজ চলছে। তাছাড়া চন্দ্রমৌলিপুরম ও মুক্তেশ্বরমে দুটি আশ্রয়-গৃহের নির্মাণ কাজ চলছে। কোঠাপালেমে আরেকটি আশ্রয়-গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ও সেজন্য সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ইল্লামাঞ্চিলি এবং এস. রায়ভরম মণ্ডলে কোঠাপালেম এবং ধর্মভরম গ্রামে ১০৫টি গৃহনির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মালকানগুমটিতে নির্মিত আশ্রয়-গৃহ সহ বিদ্যালয়গৃহের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর সেটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি **গুজরাটের** ভাবনগর জেলার গড়িয়াধর তালুকের ভামারিয়া গ্রামে আবাসন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই বেদান্ত সোসাইটিতে মঙ্গলবারগুলিতে 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ১৫ ফেব্রুয়ারি ও ২২ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে বালক-বালিকা ও বয়স্কদের জন্য দুটি বিতর্কের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া ১২ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো ঃ গত ১২ ফেব্রুয়ারি ধ্যান, পূজা, আলোচনা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিবরাত্রি পালন করা হয়েছে এবং অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-তিথিও পালন করা হয়েছে। উৎসবের দিনগুলিতে ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবার, বুধবার ও শনিবারগুলিতে প্রবচন ও সৎপ্রসঙ্গ যথারীতি হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা) ঃ গত ১২ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রি পালন করা হয়েছে এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৭ ফেব্রুয়ারি পূজা, ধ্যান, পাঠ, ভক্তিগীতি, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিশুদের দ্বারাও একটি বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মার্চ মাসের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রবিবারগুলিতে (ইস্টার সার্ভিস সহ) বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এবং শনিবারগুলিতেও ছান্দোগ্য উপনিষদ্, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের ক্লাস হয়েছে।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার ঃ ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার যথাক্রমে মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ও গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর ক্লাস নিচ্ছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস ঃ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে সঙ্গীত, ধ্যান, পূজা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে স্বামী চেতনানন্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, মঙ্গলবারগুলিতে কঠ উপনিষদ্ ও বৃহস্পতিবারগুলিতে 'রামকৃষ্ণ ঃ দি গ্রেট মাস্টার' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-তিথি ও ৪ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, মাসের অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কৃষ্ণনগর, নদীয়া) গত ৭ জানুয়ারি পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৯তম জন্মতিথি-উৎসব পালন করে। স্বামীজীর আবির্ভাব স্মরণে ১৩ জানুয়ারি রক্তদান শিবির এবং ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ধর্মসভা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবরাজানন্দ এবং উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ও নদীয়ার বিদ্যালয় (মাধ্যমিক) পরিদর্শক। বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতায় প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের সকলকেই 'সবার স্বামীজী' বইটি দেওয়া হয়।

দুর্গাপুর স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী ও জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন পূজা, পাঠ, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী লোকনাথানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। বক্তব্য রাখেন স্বামী গিরিশানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা ছিল এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। মোট ৬০জন যুবপ্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। কুইজ পরিচালনা করেন স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এই উৎসব উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল এবং সেবামূলক তিনটি প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের পুস্তক দান করা হয়।

পানচেৎ শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (বিহার) গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৯তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন ও রচনা-প্রতিযোগিতা এবং ২৪ জানুয়ারি আলোচনা-সভার আয়োজন করেছিল। আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন স্বামী গিরিশানন্দ (আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক) এবং স্বামী ঈশ্বরাত্মানন্দ। এই অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকেই পুরস্কার দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (স্যাণ্ডেলের বিল, উত্তর ২৪ পরগনা)-এর পরিচালনায় গত ২৭ জানুয়ারি কনকনগর সৃষ্টিধর বিদ্যালয়ে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ঐদিন ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পাঁচটি বিদ্যালয়ের মোট ১০০জন প্রতিযোগী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সৌজন্যে 'স্বামী বিবেকানন্দ স্লাইড শো' দেখানো হয়।

বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) গত ৮ ডিসেম্বর '৯০ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-তিথি, ৭ জানুয়ারি '৯১ স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি, ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস এবং ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালন করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসবে পূজা, হোম, পাঠ, আলোচনা, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা, রামায়ণ গান প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। তিথি-পূজার দিন প্রায় আড়াই হাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লীর সারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং জাতীয় যুবদিবস চারটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, ১২ জানুয়ারি শোভাযাত্রা, স্বদেশমন্ত্র পাঠ, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রভৃতি পরিবেশন; ১৩ জানুয়ারি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং ২০

জানুয়ারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় ভাষণ দেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক নাটক অভিনীত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ত্রিগুণাতীত সেবাশ্রমে (নাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) গত ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ারি '৯১ এই সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব এবং জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উৎসবের প্রথম দিন বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রী সহ বহু যুবক-যুবতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী পুরাতনানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী এবং নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালক শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবতী মণ্ডল। ৫৫৩জন ছাত্র-ছাত্রীকে 'সবার স্বামীজী' বইটি দেওয়া হয়। বিকালে যাদু প্রদর্শন করেন প্রদীপ দত্ত। ৯ জানুয়ারি পাঠ, কীর্তন, নগর পরিক্রমা, ব্রতচারী নৃত্য, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন সেবাশ্রমের সহ-সভাপতি জগৎজীবন চক্রবর্তী, বক্তা ছিলেন স্বামী সৎপ্রভানন্দ এবং সেবাশ্রমের সভাপতি সনৎ চট্টোপাধ্যায়।

গত ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত **ভুবনেশ্বরে শ্রীসারদা সঙ্ঘের** সর্বভারতীয় ২৭তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের ২২টি শাখাকেন্দ্র থেকে ১৩২জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। অধিবেশন পরিচালনা করেন সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভানেত্রী স্নেহময়ী মহাপাত্র। অধিবেশনে শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ, গীতি-আলেখ্য, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা পদ্মিনী ত্রিপাঠী।

চিকিৎসা-শিবির

শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪ পরগনা) গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ৯ম চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। এই চিকিৎসা-শিবিরে শল্য, নাক-কান-গলা, চক্ষু, চর্ম ও স্ত্রীরোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ রোগীদের পরীক্ষা করেন ও ব্যবস্থাপত্র দেন। মেডিক্যাল চিকিৎসা সহ বিভিন্ন বিভাগে মোট ২০২জন রোগীকে বিনা মূল্যে পরীক্ষা, ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ দেওয়া হয়। কয়েকজন রোগীকে জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি ও অস্ত্রোপচারের সুযোগ করে দেওয়া হয়। চিকিৎসাকার্যে অংশগ্রহণ করেন ডাঃ কমলকুমার দাঁ, ডাঃ অমিয়কুমার আঢ্য, ডাঃ দিলীপ রায়, ডাঃ পার্থ সেন, ডাঃ তুষার মিত্র, আশ্রম-সভাপতি ডাঃ সুধীরকুমার রাহা ও ডাঃ নির্মল কর্মকার।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **শশরী সোয়েট** গত ১৮ ডিসেম্বর '৯০ প্রায় ৮০ বছর বয়সে এবং শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **কল্যাণী দেবী** গত ৮ ডিসেম্বর ৬৬ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। প্রয়াতা শশরী সোয়েট ও কল্যাণী দেবী চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শশরী দেবীর স্বামী স্বর্গত গৌরীচরণ রায়ের সহায়তায় স্বামী প্রভানন্দ শেলা গ্রামে প্রথম সেবাব্রতের সূচনা করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **বীণাপাণি** রায় গত ১৪ ডিসেম্বর '৯০ রাত ১০-১০ মিনিটে কসবা বোসপুকুর রোডের বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তাঁর স্বামী প্রয়াত লাবণ্যকুমার রায় অধুনা বাংলাদেশস্থ ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ছিলেন এবং কিশোরগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনিও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের সঙ্গে বীণাপাণি দেবীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

প্রসঙ্গ ভিটামিন

প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ লোক যদি বিনা প্রয়োজনে ভিটামিন খায়, তাহলে কি তাদের উপকার হবে?

বিশেষজ্ঞগণ সেরকম মনে করেন না—অন্ততঃ বিত্তশালী দেশের জনগণের ক্ষেত্রে তো নয়-ই। 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন' এবং 'সোসাইটি ফর ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন' সুপারিশ করেছে: "সুস্থ শিশু ও বয়স্করা খাদ্য থেকে তাদের পুষ্টি গ্রহণ করবে। খাদ্যের সঙ্গে অন্য কিছু যোগ না করে খাদ্যদ্রব্যের হেরফের করলে পুষ্টির অভাব বা পুষ্টির আধিক্যজনিত অসুখ হবে না। খাদ্যের সঙ্গে অন্য কিছু যোগ করবে কিনা তা ডাক্তাররা ঠিক করবেন।" 'দি ইউনাইটেড স্টেট্স ন্যাশানাল রিসার্চ কাউন্সিল' বলেছে: "প্রতিদিনের পর্যাপ্ত খাবারের সঙ্গে মাল্টিভিটামিন বা মাল্টিমিনার্যাল যোগ করার উপকারিতা বা ক্ষতি করা বিষয়ে কোন প্রমাণিত তথ্য পাওয়া যায় না।" এরকম নেতিবাচক সুপারিশ অসম্পূর্ণ, কারণ 'পর্যাপ্ত' খাবার বলতে কি বোঝায় তা বলা দরকার। তবে এবিষয়ে সবাই একমত যে, সুস্থ বয়স্কলোক এবং সুস্থ মহিলারা (যাঁরা গর্ভবতী বা স্তন্যদানরতা নন), যাঁরা সাধারণ খাদ্য (গমজাত দ্রব্য, চাল, ডাল, সব্জি, ফল, মাছ বা মাংস) খান তাদের আলাদা করে ভিটামিন খাবার দরকার নেই।

লোকেরা যখন নিজে ভিটামিন দ্বারা নিজের চিকিৎসা করে, তখন তিনটি কারণে তা অনুচিত। প্রথমতঃ, যারা ভাল খাবার খেতে পায় তারা, যারা ভিটামিন-স্বল্পতা রোগে ভোগে তাদের চেয়ে নিয়মিত ভিটামিন বেশি ব্যবহার করে। দ্বিতীয়তঃ, তারা যে ভিটামিন খায়, তাদের খাদ্যে সেটির স্বল্পতা নাও থাকতে পারে। তৃতীয়তঃ তারা যে পরিমাণে ভিটামিন খায় সেটা পর্যাপ্ত না হতে পারে অথবা তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে। ভিটামিন 'এ', 'বি৬', ও 'ডি' ছাড়া অন্য ভিটামিনের আধিক্য হেতু কুফল অবশ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। মোট কথা, প্রায়ই দেখা যায় যে, ঠিক লোক ঠিক (অর্থাৎ তাদের দরকারী) ভিটামিন খাচ্ছে না কিম্বা ঠিক পরিমাণে খাচ্ছে না।

অন্যদিকে ভাল খাওয়া-দাওয়া পাচ্ছে এরকম লোক বিধিমাফিক মাত্রায় (অর্থাৎ অতিমাত্রায় নয়) যদি ভিটামিন খায়, তাতে তাদের ক্ষতি হয় না। চিকিৎসকদের উচিত, কোন্ কোন্ ব্যক্তির ভিটামিনের অভাব হতে পারে তাদের চিহ্নিত করা। নবজাতকদের ভিটামিন 'কে' দরকার। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান-কালে ফোলিক অ্যাসিড, লৌহ ও ক্যালসিয়াম দরকার। যারা ধর্মীয় বা অন্য কারণে কম ক্যালরির খাদ্য খায়, যারা ওজন কমানোর জন্য খাওয়া কমাচ্ছে, যারা ক্ষুধামান্দ্যে ভুগছে, যারা বৃদ্ধ, যারা খাওয়ার ব্যাপারে বাতিকগ্রস্ত, অর্থাৎ 'এটা খাব না, ওটা খাব না' করে, পাগলামির কারণে যারা ঠিকমতো খাবার খায় না এবং যারা অর্থনৈতিক কারণে উপযুক্ত ক্যালরির খাবার পায় না—তাদের মাল্টিভিটামিন খাওয়া দরকার। তবে সব সময়েই তা খাওয়া উচিত চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে।

এখন চেষ্টা চলছে, আগে থেকে ভিটামিন খাইয়ে অপুষ্টিজনিত রোগ বন্ধ করা যায় কিনা। এই ব্যাপারে একদিকে দেখা হচ্ছে নবজাতকের বিশেষ ধরনের অসুখ মাকে ভিটামিন খাইয়ে বন্ধ হয় কিনা, অন্যদিকে দেখা হচ্ছে ভিটামিন 'এ', বিটা ক্যারটিন এবং ভিটামিন 'ই' খাইয়ে বিশেষ ধরনের ক্যান্সার রোধ করা যায় কিনা। এখন ব্যাপারটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে; সুনিশ্চিত মত দেওয়া সম্ভব নয়।

[British Medical Journal,
21 July 1990, p. 135]

সূচীপত্র

উদ্বোধন ৯৩তম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন

☐ নতুন এবং পুরনো গ্রাহকদের কাছ থেকে আমরা প্রতিদিনই এই মর্মে অনেক চিঠি পাচ্ছি যে, তাঁরা মনি অর্ডার করে বর্তমান বর্ষের (৯৩ তম বর্ষ, ১৩৯৭-৯৮ ঃ ১৯৯১) গ্রাহকমূল্য পাঠিয়েছেন, কিন্তু মাসাবধিকালের মধ্যেও মনি অর্ডার অ্যাকনলেজমেন্ট কুপন ফেরৎ পাননি। তাই আমাদের কাছে তাঁরা অনুরোধ করছেন যে, টাকাটি আমরা পেয়েছি কিনা অন্ততঃ এই খবরটি জানিয়ে যেন তাঁদের নিশ্চিন্ত করি। গ্রাহকদের এই উদ্বেগ যে খুবই স্বাভাবিক সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু উদ্বোধন-এর হাজার হাজার গ্রাহককে আলাদাভাবে পত্র দিয়ে গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তি-স্বীকার করা বাস্তবে বিশেষ অসুবিধাজনক তা সহৃদয় গ্রাহকগণ আশা করি বুঝবেন। দ্বিতীয়তঃ এর একটি আর্থিক দিকও আছে। তবে যে-সমস্ত গ্রাহক তাঁদের চিঠির সঙ্গে প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠান এবং তাঁদের চিঠি আমাদের কাছে পৌঁছালে তাঁদের আমরা অবশ্যই প্রাপ্তি-সংবাদ জানিয়ে দিই। প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড সঙ্গে না পাঠালে আমাদের পক্ষে আলাদাভাবে পত্র দিয়ে প্রত্যেক গ্রাহকের কাছে প্রাপ্তি-স্বীকার করা সম্ভব নয়।

মনি অর্ডার অ্যাকনলেজমেন্ট কুপন পেতে গ্রাহকদের যে দেরি হয় সেজন্যে ডাক বিভাগ তৎপর না হলে আমরা যে অসহায় তা নিশ্চয়ই গ্রাহকরা বুঝবেন। ইদানীং মনি অর্ডার করার এক মাসের মধ্যেও আমাদের কাছে এসে তা পৌঁছাচ্ছে না, এ রকম ঘটনা বহু ঘটছে। **তবে বছরের প্রথম চারটি সংখ্যা (মাঘ-বৈশাখ সংখ্যা) ডাকে পেলে গ্রাহকরা বুঝবেন গ্রাহকমূল্য আমাদের কাছে পৌঁছেছে।**

☐ প্রায়ই দেখা যাচ্ছে গ্রাহকরা পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যা সেই মাসের (বাঙলা) ১৫/২০ তারিখের মধ্যে ডাকে না পেলে চিঠি দিয়ে অথবা কার্যালয়ে এসে অতিরিক্ত সংখ্যা (ডুপ্লিকেট কপি) দিতে বলছেন। তাঁদের বলা অযৌক্তিক নয়; তবে ডাক ব্যবস্থার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতটি স্মরণ রেখে সহৃদয় গ্রাহকদের আমরা **একমাস অপেক্ষা করতে** অনুরোধ করি। অর্থাৎ **পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত অথবা পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যা না পেলে** (যেমন জ্যৈষ্ঠ / মে মাসের পত্রিকা আষাঢ় মাসের ১০ তারিখ অথবা জুন মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত না পেলে) সরাসরি অথবা চিঠি দিয়ে আমাদের অবশ্যই জানাবেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত বা ডুপ্লিকেট কপি পাঠিয়ে দেব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আমরা **বাঙলা মাসের ৮/৯ তারিখ অর্থাৎ ইংরেজী মাসের ২৩/২৪ তারিখে** পত্রিকা ডাকে দিয়ে থাকি। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকরা পত্রিকা পেয়ে যান বলে জানি। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পৌঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরে পত্রিকা পেয়েছেন বলে আমরা খবর পেয়েছি। সে-কারণেই সহৃদয় গ্রাহকদের আমরা **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা** করতে অনুরোধ করি।

☐ গ্রাহকদের ডাকে নিয়মিত পত্রিকা না পাওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে আমরা ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করি। তাঁরাও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

☐ ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে, আগের ঠিকানা উল্লেখ করে নতুন ঠিকানা কার্যালয়ে জানাতে হবে। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাবার সময় এবং পত্রিকা সংক্রান্ত **যেকোন যোগাযোগের সময় গ্রাহক-সংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করবেন।**

☐ উত্তরের জন্য চিঠির সঙ্গে **রিপ্লাই-কার্ড অথবা প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট** অবশ্যই পাঠাবেন।

১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩
১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন
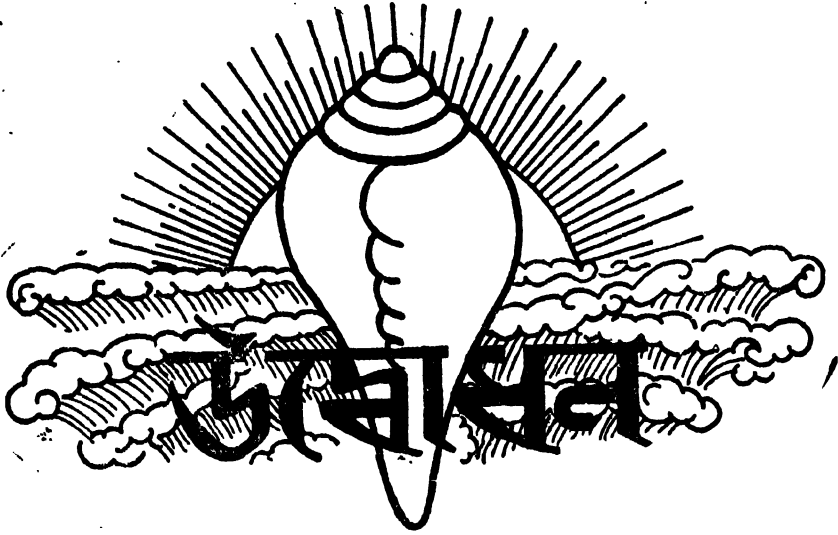
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮ মে, ১৯৯১ ৯৩ তম বর্ষ—৫ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

"বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র—আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্ছে, কলসী করে—বলছে 'জল'। মুসলমানরা আরেক ঘাটে জল নিচ্ছে, চামড়ার ডোলে করে—তারা বলছে 'পানি'। খ্রীষ্টানরা এক ঘাটে জল নিচ্ছে—তারা বলছে 'ওয়াটার'। যদি কেউ বলে, না, এ জিনিসটা 'জল' নয়, 'পানি'; কি 'পানি' নয়, 'ওয়াটার'; কি 'ওয়াটার' নয়, 'জল'; তাহলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মন্বান্তর, ঝগড়া; ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি, এসব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে, আন্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্ম-সমন্বয়

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবিলে অনিবার্যভাবে আমাদের মনশ্চক্ষে একটি ছবি ভাসিয়া উঠে: শ্রীরামকৃষ্ণ, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ এবং দক্ষিণেশ্বর-পীঠাধিষ্ঠাত্রী মা ভবতারিণী ('ভবতারিণী' নামটি সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া, মন্দিরের দেবোত্তর দলিলে দেবীর নাম 'জগদীশ্বরী'।)। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ এবং মা ভবতারিণী যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। মা ভবতারিণী তো সংযুক্ত হইবেনই, কারণ তিনিই তো শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধ্যা—তাঁহার মৃন্ময়ী প্রতিমা শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব সাধনাতেই চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আজ যে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে নিত্য অগণিত নরনারীর আগমন তাহা তো ঐ মহাশক্তি-সাধকের অসামান্য মাতৃ-অভিষেকের সূত্র ধরিয়াই। পাথরের নিষ্প্রাণ বিগ্রহ যে জীবন্ত ও জাগ্রত হইতে পারে, আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সূচনাপর্বে ঐ ভক্তসাধক তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরের সাধনা যে একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তাহা দেখাইয়া ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়-

সূত্রটিও তিনি জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু কালীর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ কি কালী-সাধনার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের একটি সম্প্রদায়বিশেষের সহিত যুক্ত হইয়া যান নাই? না, যান নাই এবং সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের কালী-উপাসনার অভিনবত্ব এবং সেখানেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণের বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে একদিকে দ্বাদশ শিবমন্দির এবং অন্যদিকে কালীমন্দির ও বিষ্ণুমন্দিরের (বা কৃষ্ণমন্দির বা গোবিন্দজীর মন্দিরের) অবস্থান বাস্তবিকই একটি অভাবনীয় ব্যাপার। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের অঙ্গ বা শাখা হিসাবে বৈষ্ণব, শাক্ত এবং শৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভব কবে হইয়াছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বলা দুষ্কর হইলেও, ইতিহাসে যখন হইতে উহাদের সুস্পষ্ট অস্তিত্ব অনুভূত হইয়াছে তখন হইতেই উহাদের পরস্পরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষও প্রকট হইতে শুরু করিয়াছে তাহা বুঝা যায়। তাহার পর যত দিন গিয়াছে সেই অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষ তীব্রতর হইতে হইতে চরম আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের সুবিশাল পৌরাণিক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়িয়া এই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার প্রতিফলন দেখা যায়। পুরাণ ও উপপুরাণগুলি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিন বৃহৎ ধারায় যেন বিভক্ত হইয়া গিয়াছে এবং এক এক ধারায় প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট দেবতা বা দেবীর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হইয়াছে। অবশ্য পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি প্রবাহও কখনও স্পষ্টভাবে, কখনও-বা অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং শিব, শক্তি ও বিষ্ণু যে একই পরম শক্তির বা পরম সত্তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও শিব, শক্তি ও বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়া সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা ও অসহিষ্ণুতা হিন্দুধর্মে ক্রমেই শক্তিশালী হইয়াছে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিকে বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কতদূর গভীরে যাইতে পারে সেবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প উপমা হিসাবে ব্যবহার করিতেন। গল্পটি হইল ঃ

শিবের এক পরম ভক্ত ছিলেন। শুধু শিবকেই তিনি মানেন, অন্য কোন দেবতা তাঁহার পছন্দ নহে। তাঁহার ভক্তির জোরে শিব তাঁহাকে দর্শন দিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বলিলেন ঃ 'দেখ বাপু, তোমার ভক্তিতে আমার দর্শন পেলে বটে, কিন্তু যত দিন না অন্য দেবতার প্রতি তোমার বিদ্বেষ ভাব যাবে, ততদিন আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হব না।' শিবভক্ত এই কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কথাগুলি বলিয়া শিব অন্তর্ধান করিলেন।

ভক্তটি সাধনা করিয়া চলিলেন। অন্য দেবতার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ যেন আরও বাড়িয়া চলিল। তবে তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ বিষ্ণুর প্রতি। ভক্তের সাধনায় আবার শিব আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। কিন্তু এবার শিব আসিলেন হরি-হর মূর্তিতে—অর্ধেক হরি অর্থাৎ বিষ্ণু এবং অর্ধেক হর অর্থাৎ শিব। ভক্তটি অর্ধ-হরকে দেখিয়া অর্ধ-আনন্দিত এবং অর্ধ-হরিকে দেখিয়া অর্ধ-নিরানন্দ হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতার পূজা শুরু করিলেন। দেবতাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিবার সময় তিনি শুধুমাত্র শিবের পা-টিই ধুইয়া দিলেন, বিষ্ণুর পায়ের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। বিষ্ণুর মুখের দিকে না তাকাইয়া শুধু শিবের মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি পূজা করিয়া চলিলেন। শিব দেখিলেন, ভক্তটির পোড়া গোঁড়ামি কোনভাবেই যাইবার নহে। বিরক্ত হইয়া শিব তাঁহাকে বলিলেন ঃ 'তোমাকে আমার হরি-হর মূর্তি দেখালাম, হরি ও আমি যে অভিন্ন তা-ই বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আহাম্মক! তুমি তা বুঝতে পারলে না।'

উহাতেও ভক্তটির চৈতন্যোদয় হইল না। এদিকে সকলে জানিয়া গিয়াছে যে, লোকটি অন্ধ শিবভক্ত, বিষ্ণু বা অন্য দেবতাকে একেবারেই তিনি পছন্দ করেন না। ফলে ভক্তটি পথে বাহির হইলেই সকলে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিবার জন্য হাততালি দিয়া 'হরি হরি' বলিতে শুরু করে। ভক্তটি তাহাতে যতই চটেন, লোকেরা ততই বেশি করিয়া 'হরি হরি' বলিয়া তাঁহার পিছনে লাগে। ভক্তটি তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহার দুই কানে দুটি ঘণ্টা ঝুলাইয়া লইলেন। লোকেরা যখন 'হরি হরি' বলে তখন তিনি ঘণ্টাদুটি নাড়ান যাহাতে হরিনাম তাঁহার কানে না যায়। তখন হইতে লোকটির নাম হইয়া গেল 'ঘণ্টাকর্ণ'।

শুধু শিবভক্তরাই নহেন, বিষ্ণুভক্ত অথবা কালী-ভক্ত—কেহই এবিষয়ে কম যান না। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারি সুন্দর করিয়া বলিতেছেন ঃ "বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ 'ভক্তমাল'।... এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে!... শ্রীমদ্‌ভাগবত—তাতেও নাকি ঐরকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভব-সাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহা-সমুদ্র পার হওয়াও তা।' সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে। শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো

করবার চেষ্টা করে। [বৈষ্ণবরা বলে] শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন। শাক্তেরা বলে, 'তা তো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার করবেন?—ঐ কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য'।" (কথামৃত, ৪।১৫।১)

ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা একদেশদর্শিতা শুধু যে হিন্দুধর্মের বা উহার শাখা-প্রশাখার মধ্যেই রহিয়াছে তাহা নহে, আমরা জানি, উহা পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যেই বিদ্যমান। একবার একজন পাশ্চাত্য-দেশীয় খ্রীস্টান ধর্মযাজক রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জনৈক সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন: 'If a Moslem goes to Heaven, he goes definitely without the knowledge of the gatekeepers of the Kingdom of God." (যদি কোন মুসলমান স্বর্গে যায়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্যের দ্বাররক্ষকগণের অজ্ঞাতসারেই।)। যেন মুসলমানদের স্বর্গে বা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের কোন অধিকার নাই, সেখানে প্রবেশের অধিকার শুধু খ্রীস্টানদেরই। গোঁড়া মুসলমানগণও একইভাবে বিশ্বাস করে, বেহেস্ত বা স্বর্গে কাফের বা অমুসলমানদের কোন স্থান নাই, সেখানে মুসলমানদেরই একচ্ছত্র প্রবেশাধিকার।

এই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখিলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ যে বাস্তবিক একটি মহা-গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী ভূমিকা পালন করিয়াছে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। হিন্দুদের অনুদার ও একদেশদর্শিতার কথা মনে রাখিলে একই ক্ষেত্রে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবদের মন্দিরের অবস্থান একটি অভাবনীয় ব্যাপার। শুধু হিন্দুদের দিক হইতেই নহে, খ্রীস্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধদের দিক হইতেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। যে-বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর দেবায়তন প্রতিষ্ঠা করেন, উহার বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে জনৈক ধনাঢ্য ইংরাজ ভদ্রলোক। দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়িতেই তিনি বাস করিতেন। বাকি অংশের অনেকখানি জুড়িয়াছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। স্থানটি দেখিতে ছিল কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি। হিন্দুতন্ত্রমতে কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি ভূমি শক্তি-সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত। বৌদ্ধতন্ত্রমতেও ঐরূপ ভূমি সাধনার জন্য পরম বাঞ্ছিত ক্ষেত্র। নির্বাচিত ভূমি-খণ্ডের এহেন বৈশিষ্ট্যসকল প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরবর্তী কালে বলিতে শুনা গিয়াছে: "রানী যেন দৈবাধীনা হইয়াই উক্ত স্থানটি মন্দির-নির্মাণার্থ মনোনীত করেন।" বাস্তবিক, এই অভাবনীয় যোগাযোগকে দৈবনির্দিষ্টই বলা উচিত। কারণ, এই সাধনপীঠ হইতেই তো এবারের যুগাবতার পরবর্তী সময়ে মহা-সমন্বয়ের উদার বাণী প্রচার করিবেন। রানী রাসমণি পরম যত্নে সমন্বয়াচার্যের সাধনক্ষেত্রটি প্রস্তুত করিয়া দিয়া গেলেন। শুধু হিন্দুর জন্য নহে, শুধু মুসলমানের জন্য নহে, শুধু খ্রীস্টানের জন্য নহে, শুধু বৌদ্ধের জন্য নহে,—পৃথিবীর সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল পথের মানুষের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগে সমন্বয়ের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন: "যত মত তত পথ।"

সকল ধর্মের লক্ষ্য এক, মর্ম এক; ধর্মমত ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক—এই তত্ত্বটি শাস্ত্রে নহে, আপন জীবনের বিচিত্র সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতে (দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, সাকার, নিরাকার, তন্ত্র, বেদান্ত, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব) তিনি যেমন সাধনা করিয়াছেন, তেমনই খ্রীস্টান ও ইসলাম মতেও সত্য অনুসন্ধানে, ঈশ্বর অন্বেষণে তিনি ব্রতী হইয়াছেন এবং পরম নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক গবেষকের ন্যায় তাঁহার অধ্যাত্ম-গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ধর্মমতগুলির মধ্যে সমন্বয়ের স্বর্ণসূত্রটি আবিষ্কার করিয়া তাঁহার বহু-প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। অজস্র উপমায়, প্রাত্যহিক আলাপচারিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার সমন্বয়ের বার্তাকে সহজ-সরল ভাষায় উপ-স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সকল পাঠকই সেগুলির সহিত এত বেশি পরিচিত যে উহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী দৃষ্টিতে ধর্মের সারতত্ত্বটি উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি কোন ধর্মকে—সে-ধর্ম অন্যের চোখে যত নিন্দিতই হউক না কেন—অস্বীকার করেন নাই। উহার সম্পর্কে তিনি বলিতেন: "দ্বেষবুদ্ধি করবি কেন? জানবি ওটাও একটা পথ, তবে অশুদ্ধ পথ।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীর কথা) স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন: "আমার বেশ মনে আছে, একদিন এক ব্যক্তি ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেছেন, এই সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান নীতি-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কিন্তু তাহাদেরও নিন্দা করিতে প্রস্তুত

নহেন—স্থিরভাবে কেবলমাত্র বলিলেন, 'কেউ বা সদরদরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকে, কেউ বা আবার ময়লাফেলার বা খিড়কির দোর দিয়েও ঢুকতে পারে। এদের মধ্যেও ভাল লোক থাকতে পারে। কাকেও নিন্দা করা উচিত নয়'।" (বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯; The Master as I Saw Him, 11th Edn., p. 197)

বস্তুতঃ তিনি কোন কিছুকেই অস্বীকার করেন নাই, কোন কিছুকেই বর্জন করেন নাই। তিনি সমস্ত কিছুকেই স্বীকার করিয়াছেন, সমস্ত কিছুকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে তাই দেখি তিনি যেমন 'হাঁচি-টিকটিকি'ও মানিতেছেন, তেমনই আবার অদ্বৈতবাদকেও মানিতেছেন। তিনি বলিতেছেন: হাঁচি-টিকটিকিতে বিশ্বাস কুসংস্কার হইতে পারে, কিন্তু একশ্রেণীর মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের উহা একটি স্তর—হইতে পারে প্রাথমিক স্তর। একই ভাবে সাকার-নিরাকার, দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি মতগুলিও মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের এক-একটি স্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থা সাপেক্ষ।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, সাধকভাবের শেষ কথা) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সাকার-নিরাকার, দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি মতে বিশ্বাসীদের মধ্যে বাদবিতণ্ডা, দ্বেষ-বিদ্বেষ হিন্দুসমাজকে কম দুর্বল করে নাই।

ধর্মীয় অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা জাত যে এক-দেশদর্শিতার মনোভাব, তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন 'মতুয়ার বুদ্ধি' (dogmatism)। এই মতুয়ার বুদ্ধি মহা অনর্থকারী। তিনি বলিতেন, বস্তুতঃ জগতে যত হানাহানি, রক্তপাত, বিদ্বেষ, তাহার মূলে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার একটি প্রধান ভূমিকা রহিয়াছে। ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বেষাদ্বেষি এই মনোবৃত্তি হইতেই সঞ্জাত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন: "যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী (অর্থাৎ ব্রাহ্ম), শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব—সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম, তাঁর হাজার নাম।" (কথামৃত, ২।১৩।৩)

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথা ছিল না, তাঁহার জীবনই হইয়া উঠিয়াছিল সামঞ্জস্যের প্রতীক, তিনি স্বয়ং হইয়া উঠিয়াছিলেন সমন্বয়-মূর্তি। বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের যে মন্দির স্বামীজীর নির্দেশ ও পরিকল্পনায় পরবর্তী কালে নির্মিত হইয়াছে তাহা যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের ভাব ও আদর্শের প্রস্তর-ভাষ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিভিন্ন ধর্মের সাধনা করিয়াছেন এবং সর্বধর্মের সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহার সচেতন ও পরিকল্পিত প্রয়াস ছিল? না। শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও সচেতনভাবে, পরিকল্পনা করিয়া কোন কিছু করেন নাই। তিনি নিজেকে 'মায়ের' (অর্থাৎ ঈশ্বরের) যন্ত্র ভাবিতেন। তিনি কুণ্ঠাহীনভাবে বলিতেন, মা যেমন তাঁহাকে চালান তিনি তেমনই চলেন, যেমন বলান তেমনই বলেন। তাঁহার নিজের ইচ্ছায় কোন কর্ম তিনি করেন না। তাঁহার সমন্বয়-দর্শন সম্পর্কেও উহা একইভাবে প্রযোজ্য। সারদাদেবী বলিয়াছেন: "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যে সমন্বয়ভাব প্রচার করার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন তা কিন্তু আমার মনে হয়নি।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, পৃঃ ২৪২) বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এক অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব অসচেতন জীবনের অ-লৌকিক ইতিবৃত্ত। স্বামীজী বলিতেছেন: "তিনি স্বয়ং ছিলেন তাঁহার কার্যের পদ্ধতি—সেই অদ্ভুত অসচেতন পদ্ধতি। তিনি কি বলিতেছেন, কি করিতেছেন তাহার তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না।... তিনি শুধু সেই মহান জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।" (The Master as I Saw Him, p. 197)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সমন্বয় বিভিন্ন ধর্মের শুধু ভাল দিকগুলিকেই স্বীকার বা গ্রহণ করিয়া একটি নূতন ধর্ম উপস্থাপনের প্রয়াস নহে; ভাল-মন্দ সহ, মূল এবং শাখা-প্রশাখা সহ সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া স্বীকার এবং গ্রহণ করিবার আহ্বানই তিনি জানাইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের সঙ্গে আকবরের 'দীন ইলাহী' অথবা রামমোহন রায় বা অন্যান্য আধুনিক সংস্কার-পন্থী নেতাদের ধর্মীয় আন্দোলনের এখানেই পার্থক্য এবং এখানেই উহার অনন্যতা। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শে বিদ্বেষের কোন স্থান নাই, বর্জনের কোন স্থান নাই, উপেক্ষা বা অবজ্ঞার কোন স্থান নাই, নিন্দার কোন স্থান নাই; সেখানে শুধু সশ্রদ্ধ গ্রহণ, সাদর স্বীকার, সসম্মান মর্যাদাদান। কবীরের কথা উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো—দোনো পাল্লা ভারি।"

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

'গঙ্গার পশ্চিমকূলে বারাণসী সমতুল'। গঙ্গা তথা ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বেলুড় গ্রামে সংস্থাপিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের মূলকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মঠ। যে-ভূমিখণ্ডের ওপর রামকৃষ্ণ মঠ, সেটি সেসময়ে হাওড়া জেলার অধীনে ছিল না—হুগলী জেলার কৃষ্ণচন্দ্রপুর মৌজার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারাকপুর থেকে প্রাচীন বেলুড্যা বা বালুড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কৃষ্ণচন্দ্রপুর মৌজা।

ভাগীরথী নদীর প্রবাহ পূর্বদিকে বেশ কিছুটা সরে যাওয়াতে নদীগর্ভ থেকে উদ্ভূত জমির ওপর বেলুড় ও আশপাশের কয়েকটি গ্রামের পত্তন হয়েছিল। অতীতে কোন এক সময় বেলুড় গ্রামের দক্ষিণে একটি খাল সংযোগ করেছিল ভাগীরথী ও সরস্বতী নদীকে। কালক্রমে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যায়, সে-খালটিও মজে যায়। মজে যাওয়া খালটির চিহ্ন এখনো এখানে-সেখানে বিদ্যমান।

বালী পৌরসভা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল ১ এপ্রিল ১৮৮৩। পরের জানুয়ারিতে এই পৌরসভার অঙ্গীভূত হয়েছিল বেলুড় গ্রাম। পাইকপাড়া রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। তাঁদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বেলুড় গ্রামের বিস্তৃত অঞ্চল আলোচ্যকালেও ছিল বেশ অনুন্নত। গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর নামেই বেলুড় গ্রামের কতকাংশের নাম হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্রপুর। বৈরাগ্যের প্লাবনে ভাসমান কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহত্যাগের কাহিনী একটি সুপ্রচলিত উপকথা। 'লালাবাবু' নামে পরিচিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতি বহন করছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে গঙ্গার তীর পর্যন্ত লালাবাবু সায়র রোড।

বেলুড় গ্রামে গঙ্গার ধারে ছিল নেপালের রাজার কাঠের টাল[১৮] বা ডিপো (depot)। নেপাল-রাজার প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ছিলেন শ্রীরাম-কৃষ্ণের কৃপাধন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্নেহভরে 'কাপ্তেন' বলে ডাকতেন। কাপ্তেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন এই কাঠগোলায়। সে-কাঠগোলার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ অবস্থান করছে অতীতের কাঠগোলা লেনের একটি খণ্ডিতাংশ। এই গলির এ অংশের নামান্তর হয় শরৎ আটা লেন। পৌরসভার প্রাক্তন সভাপতি (১৯৪৫-৪৭) শরৎচন্দ্র আটার নামে এই নামকরণ হয়েছিল ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে।

৪৮ নং লালাবাবু সায়র রোডে অবস্থিত দুটি বড় থামওয়ালা গেট ছিল 'শান্তিকানন'-এর প্রবেশ পথ। 'শান্তিকানন' ছিল আলুপোস্তা রাজাদের বাগানবাড়ি। বাগানবাড়িটির একটি জনপ্রিয় নাম 'রাজার বাগান'। এই বাগানবাড়িটি কস্তুরীমঞ্জরী দাসী কিনেছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের থেকে। কস্তুরীমঞ্জরীর স্বামী কুমার রাধাপ্রসাদ রায় মারা যান ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে। কস্তুরীমঞ্জরীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর একমাত্র কন্যার দ্বিতীয় সন্তান কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়কে তিনি পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ সরকার কুমার বিষ্ণুপ্রসাদকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বাগানবাড়িটি কিনে আনুমানিক ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে কস্তুরীমঞ্জরী বাগানবাড়ির দক্ষিণ-প্রান্তে একটি কাছারিবাড়ি তৈরি করেছিলেন এবং বাগানটি সাজিয়েছিলেন। কস্তুরীমঞ্জরী মারা যান ১৫ মে ১৯১৩। কিন্তু বাগানবাড়ির সৌকর্য ও সাজসজ্জার পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন রাজা বিষ্ণু-প্রসাদ। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ছয় মাস ইউরোপ ভ্রমণ-কালে ফ্লোরেন্সের মর্মরশিল্পের কলানৈপুণ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেখানে কয়েকটি শিল্প-মূর্তির তিনি ফরমাস দিয়ে আসেন। সেগুলি

১৮ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েকবার এ-অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন : "গঙ্গার পাদাড়ে নেপালীদের বড় বড় শালকাঠ বরাবর কিনারাময় পাতা ছিল, কারণ বেলুড় গ্রাম তখন শালকাঠের আড়ৎ।" (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৬২)

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত একে একে এদেশে এসে পেঁছেছিল। বাগানবাড়ির দক্ষিণের বিরাট চত্বরটি তিনদিক-ঘেরা রাস্তা, তৃণাবৃত মসৃণ জমি এবং বিভিন্ন রকমের মর্মরমূর্তি দিয়ে তিনি সাজিয়েছিলেন। কিছু পরিবর্তন ও নানাবিধ অঙ্গসজ্জার ফলে বাড়িটির সৌষ্ঠববৃদ্ধি ঘটেছিল। পরিবর্তনসকলের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে, জানালা-দরজাগুলির আয়তনবৃদ্ধি ও তাতে ভেনিসিয়ান সাটারের ব্যবস্থা, দোতলার পূর্বদিকের খোলা ছাদের ওপর লোহার থাম ও টালির ছাদ দিয়ে ঢাকা বারান্দার সংযোজন এবং নিচতলায় বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দু-স্তবকের টানা সিঁড়ির সংযুক্তিকরণ। ফুল-ফলের গাছের সুবিন্যাসের ফলে বাগানটি অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। রাজা বিষ্ণুপ্রসাদ মারা যান ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি।[১৯]

যেসময়ে কস্তুরীমঞ্জরী দাসী বাগানবাড়িটি কিনেছিলেন সেসময়ে বাগানবাড়ির দক্ষিণে ছিল সাগরচন্দ্র প্রামাণিকের বাড়ি, লালাবাবু সায়র রোড ও রামদাস মোহন্তর ঠাকুরবাড়ি। পূর্বদিকে গঙ্গা। উত্তরে ছিল প্রায় মজে যাওয়া একটি সরু খাল।[২০] অতীতে এই খাল দিয়ে জল ও পলি নিয়ে যাওয়া হতো পশ্চিমদিকে, যেখানে চালু ছিল ইট ও টালির কারখানা। তার উত্তরে ছিল পাইকপাড়ার সিংহদের দোতলা বাড়ি। বর্তমানে সেখানে পড়ে রয়েছে ভাঙা ইট-পাথরের একটি বড় স্তূপ। আর পশ্চিমদিকে ছিল সাগরচন্দ্র প্রামাণিকের বাড়ি, কাঠগোলা লেন এবং বাগানবাড়ির সম্প্রসারিত অংশে পুষ্করিণী ও মাঠ। এই জমিসকলের অধিকাংশের পত্তনীদার ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বসবাস করতেন তাঁর বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে। দলিল-দস্তাবেজে দেখা যায় তাঁর পেশা ছিল ওকালতি। এছাড়া ছিল তাঁর তেজারতির কারবার। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের প্রধান বিচারপতি এবং পরে সে-রাজ্যের রাজস্ব-সচিব, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। সেখানে ২০ বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৮ বছর সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যেসময়ে বাগানবাড়িটির মৌরসী পাট্টা লাভ করেছিলেন, সেসময়ে (বিগত শতকের সত্তর দশকে) বাড়িটি ছিল মুখ্যতঃ একতলার, সংলগ্ন জমির পরিমাণও ছিল সামান্য। নীলাম্বরবাবু আশপাশের জমি ক্রয় করতে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, তিনি লালাবাবু সায়র রোডের উত্তরাংশে রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের থেকে ১ বিঘা ১৫ কাঠা ৪ ছটাক জমি কিনেছিলেন ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি। শোনা যায়, বাগানবাড়িটির মূল অংশ ছিল একটি ছোট একতলা বাড়ি, সেটি তৈরি করেছিলেন প্রাগুক্ত ইট ও টালির কারখানার ইংরেজ মালিক।

বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা, গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত উপাদান, স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে[২১] বোঝা যায় যে, এই দোতলা বাড়িটি মুখ্যতঃ পাঁচটি পর্যায়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। (ক) সর্বপ্রথম এটি ছিল একটি ছোট একতলা বাড়ি, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দক্ষিণে ছিল দুখানা ঘর ও উত্তরে ছিল স্নানাদি ঘর। পূর্বদিকে ছিল চওড়া রোয়াক। কিছুকাল পরে মধ্যকার ঘরে বৃহৎ অংশ জুড়ে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছিল। দোতলায় সিঁড়ির দক্ষিণপাশে তৈরি হয়েছিল নিচতলার সর্বদক্ষিণের ঘরটি

১৯ প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ও কয়েকটি ফটো দিয়ে সাহায্য করেছেন রাজা বিষ্ণুপ্রসাদ রায়ের পুত্র জিতেন রায়। তাঁর জন্ম ১৯২৫ খৃস্টাব্দে। ঠিকানা : ২৭।১, দরমাহাটা স্ট্রীট, কলকাতা।

২০ প্রায় মজে যাওয়া খালটি তখন একটি নালামাত্র। যাতায়াতের জন্য তার ওপর তৈরি হয়েছিল একটি সাঁকো। নতুন জমি থেকে 'আত্মারামের কৌটা' কাঁধে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজী তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন : "দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড পৃঃ ১১৩)। এ-সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন : "One ravine, crossed by a doubtful-looking plank made out of half of the stem of a palm tree." (Complete Works of Sister Nivedita Vol. I, 1st. Edn., 1967, pp. 50-51)

২১ ভগ্নপ্রায় বাড়িটি বেলুড় মঠের অধীনে আসার পর তার মেরামতি ইত্যাদি (renovation) কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মে বিশেষজ্ঞ স্বামী শঙ্করূপানন্দ। তাঁর কাছে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সমপরিমাণ একটি ঘর। সিঁড়ি ও এই ঘরের মাঝে ছিল একটি বড় মাপের জানালা। দোতলায় স্নানাদির ঘর ছিল না। এ-বাড়িটি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "তখন বাড়িখানি এক-তলা, শুধু সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিবার স্থানটিতে একখানি ছোট ঘর এবং নিচেতে কয়েকটিমাত্র ঘর ছিল।... স্থানটি গঙ্গার ধারে, সামান্য ঘাসওয়ালা উঠান, পিছনে কিছু কলাগাছ ও সুপারিগাছ ছিল। ... স্থানটি অতি নিরিবিলি ও সুরম্য।"[২২] তিনি আরও লিখেছেন: "তখন সামান্য একটি বাগান। ... ঘাসের উঠানেতে একটা ঘাসকাটা রুল-কল ছিল। যোগেন মহারাজ মাঠের দিকের রকটিতে বসিয়া থাকিতেন। আমি মাঝে মাঝে সেই ঘাসকাটা কলটা দিয়া ঘাস কাটিয়া বেড়াইতাম।"[২৩] সেসময়ে এই বাগানবাড়িতে ঢোকার পথ ছিল কাঠগোলা লেন দিয়ে।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমায়ের ব্যবহারের জন্য এ-বাড়িটি ভাড়া পাওয়া যায়নি। তাঁকে থাকতে হয়েছিল বেলুড়ে রাজু গোমস্তার বাড়িতে এবং পরে ঘুসুরিতে শ্মশানঘাটের নিকট একটি বাড়িতে। অনুমান, সেসময়ে এই বাড়িটিতে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছিল। নিচতলাতে স্নানাদির ঘরের ওপরে অনুরূপ একটি ঘর তৈরি করা হয়। প্রায় এই সময়েই বাড়িটির পশ্চিমে ইংরেজী 'এল' (L) আকারে সংলগ্ন পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি একতলা বাড়ি নির্মিত হয়। ২৪´×৮´ মাপের লম্বা ঘর এবং তার সম্মুখে ঢাকা বারান্দা। এই ঘরটির ছাদে শ্রীমা পঞ্চতপা সাধন করেছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমা এ-বাড়িতে বাস করেছিলেন কয়েক মাস। এ-বাড়ির সমকালীন বর্ণনা অতি সামান্যই পাওয়া যায়। সামান্য ছিটেফোঁটা পাওয়া যায় স্বামী বিরজানন্দের স্মৃতিকথাতে। তখন তিনি কালীকৃষ্ণ। জুলাই মাসে এ-বাড়িতে তিনি দু-রাত্রি বাস করেছিলেন। শ্রীমায়ের নিকট তিনি এখানেই মহা-মন্ত্র লাভ করেছিলেন। ম্যালেরিয়াতে পর্যুদস্ত তাঁর ভগ্ন শরীরখানি সারাবার জন্য শ্রীমা তাঁকে বাড়িতে গিয়ে বাবা-মায়ের কাছে কিছুদিন থাকবার জন্য আদেশ করেছিলেন। বিদায়কালীন দৃশ্যখানি বর্ণনা করে স্বামী বিরজানন্দ লিখেছেন: "সন্ধ্যাবেলা—অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, টিপ্ টিপ্ করে জল পড়ছে। ...বিদায় নিয়ে পাশের খেয়াঘাটে নৌকায় চড়লুম। বরাহনগর ঘাটে পাড়ি মারবার জন্য নৌকা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ির সমুখ দিয়ে উত্তরদিকে চলল। সন্ধ্যার আলো-আবছায়ায় মায়ের ঘরের দিকে চেয়ে দেখতে পেলুম মা ছাদের ওপর থেকে গঙ্গার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।"[২৪] শ্রীমা তাঁর ঘরের সম্মুখে ছাদে দাঁড়িয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমায়ের এ-বাড়িতে থাকাকালীন বাড়িটির কোন বর্ণনাই পাওয়া যায়নি।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে নিচতলায় দক্ষিণে আরও দুখানি ঘর এবং সম্মুখে অর্থাৎ পূর্বে একটি ঘর সংযোজিত হয়েছিল। কড়িকাঠের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল রেলওয়ের লোহার লাইন।

(গ) তৃতীয় পর্যায়ে নিচতলায় বর্তমানের সর্ব-দক্ষিণের ঘরখানি এবং পূর্বদিকে সমস্ত বাড়িটি জুড়ে বারান্দা নির্মিত হয়েছিল। দোতলায় দক্ষিণ-দিকে তিনখানি ঘর সংযুক্ত হয়েছিল। নিচে ও ওপরে কড়িকাঠের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল ইস্পাতের জয়েস্ট। ওপরের নতুন তিনটি ঘরের প্রতিটির উচ্চতা ছিল ১৩´ ১১´´, অথচ পূর্বেকার নির্মিত দোতলা ঘরগুলির উচ্চতা ছিল মাত্র ১০´ ৫´´ থেকে ১০´ ৮´´। ইঞ্জিনীয়ার বিষম উচ্চতার ঘরগুলির মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে বাড়িটির একটি সুন্দর বাহ্যরূপ দিয়েছিলেন।

(ঘ) চতুর্থ পর্যায়ে পূর্বে উল্লিখিত স্নানাদির ঘরটির সংলগ্ন পূর্বাংশে সংযোজিত হয়েছিল ১৩´ ৬´´ ×১১´ ৬´´ মাপের একখানি ঘর, যার উচ্চতা ছিল ১২´ ৪½´´। এর ওপরেই সমান মাপের একটি ঘর নির্মিত হয়েছিল। উত্তরদিক থেকে দেখলে মনে হবে আলোচ্য পুরনো ও নতুন অংশ ছিল অখণ্ড। কিন্তু দুটি অংশের সংযোগস্থলে উল্লম্ব ফাটল, দুটি অংশের গঠন-ভিন্নতা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, দুটি অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্মিত। পূর্বাংশটুকু সংযুক্ত হয়েছিল পরবর্তী কালে। এই

২২ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ-স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৬১ ; ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১৮৭

২৩ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১৩৫৫, পৃঃ ১০১

২৪ অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ৫৬

অংশে ইস্পাতের জয়েন্ট ব্যবহৃত হয়েছিল। এই অংশের দোতলার ঘরটি ইদানীং 'শ্রীমায়ের ঘর' বলে পরিচিত। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনবার দিনের বেলা শ্রীমা এ-ঘরে অবস্থান করেছিলেন। এবং ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে দুর্গাপূজার সময় তিনি একনাগাড়ে কয়েকদিন বাস করেছিলেন।

মোটামুটি ওপরে উল্লিখিত আকার-প্রকারের দোতলা বাড়িটিতে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে সাড়ে দশ মাসের জন্য মঠে অবস্থিতি ঘটেছিল। সেসময়ে গঙ্গার ধারে পোস্তাটি ছিল বাড়ির আরও নিকটে। তার ওপর কোন রেলিং ছিল না। গাছ-গাছড়ায় ভরা জমিটি ছিল একটি মনোহর উদ্যান।[২৫] আর গঙ্গার ধারে বাড়িটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল খুব বড় একটি নিমগাছ। বাড়ির মাসিক ভাড়া স্থির হয়েছিল ৮৫ টাকা। এই কালে বাগানবাড়িটির প্রধান প্রবেশ পথ ছিল লালাবাবু সায়র রোডের ওপর।

(ঙ) পরবর্তী পর্যায়ে বাড়ি ও প্রাঙ্গণের পরিবর্তন, বিশেষ করে নানাবিধ অলংকরণের দ্বারা সৌষ্ঠববৃদ্ধি ঘটেছিল ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের পরে, যা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় মঠ-থাকাকালীন এই বাড়ির কোন্ অংশে কি ছিল। এবিষয়ে সুলিখিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবুও বিভিন্ন সূত্র ধরে কয়েকটি বিষয় নির্ণয় করা যায়। পূব-পশ্চিমে প্রসারিত একতলাটি ছিল রান্নাঘর, ভাঁড়ার ইত্যাদি। দোতলায় সর্ব দক্ষিণের ঘরখানি ছিল স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট। শ্রীমায়ের ব্যবহৃত ঘর সম্বন্ধে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এবিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন মঠের ঘর-বাড়ি সম্পর্কে স্বামীজীর নিজস্ব কোন পরিকল্পনা ছিল কিনা। বিদেশ থেকে ২৭ এপ্রিল ১৮৯৬ তারিখে লেখা চিঠিতে স্বামীজীর এক সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেনঃ "মঠের জন্য একটা যথেষ্ট স্থান সহিত বাটী ভাড়া লইবে, অথবা বাগান, যাহাতে প্রত্যেকের জন্য এক-একটি ছোট ঘর হয়। একটা বড় হল পুস্তকাদি রাখিবার জন্য, এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর—সেখানে লোকজনের সহিত দেখাশুনা করিবে। যদি সম্ভব হয়—আরও একটা বড় হল ঐ বাটীতে থাকার আবশ্যক, যেখানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা সাধারণের জন্য হইবে।···একটা ছোট ঘর অফিস হইবে। যিনি সেক্রেটারি, তিনি সেই ঘরে থাকিবেন ও সেই ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি, লেখবার সরঞ্জাম ইত্যাদি সমস্ত থাকিবে।···একটি ছোট ঘর থাকিবে তামাক খাইবার জন্য।" দেখা যায়, তার এই চিঠিতে উম্ঘাটিত বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুসরণ করেই বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামীজী আলমবাজারের মঠ-জীবনটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে মঠ স্থানান্তর হওয়ার পূর্বে ঘরদোর সম্পর্কিত স্বামীজীর কোন চিন্তা-ভাবনা বাস্তবে রূপদান করা সম্ভবপর হয়নি। মনে হয় এই বাড়িতে মঠ স্থানান্তরের পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা সম্মুখে রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন। নিচতলায় ছিল বৈঠকখানা ঘর।[২৬] নিচে বারান্দার ওপর পূর্বদিকে প্রলম্বিত ঘরখানি খুব সম্ভবতঃ এ-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। মনে হয় দোতলায় বৈঠকখানা ঘরের ওপরের ঘরখানি গ্রন্থাগার, সকালে ও দুপুরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের ক্লাস ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হতো। মনে হয় সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তরের আসরটি বসত নিচের বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে দেশী-বিদেশী অতিথিগণও যোগদান করতেন। ভজন-কীর্তন, কনসার্ট ইত্যাদির আসর বসত প্রার্থনা-ঘরে বা নিচে পূর্বদিকের বারান্দায়। মনে হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ছোট এক-একটি ঘর। বিদেশ থেকে প্রত্যাবৃত্ত স্বামী সারদানন্দকে মঠবাসিগণ বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। অপর সাধু-ব্রহ্মচারিগণ থাকতেন বিভিন্ন ঘরে ও বারান্দায়। আর স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঘরই ছিল মঠের অফিস। তামাক-সেবনের জন্য কোন্ ঘরটি ব্যবহৃত হতো তা জানা যায়নি।

নিবেদিতার রচনা থেকে জানা যায়, ঠাকুরঘর ছিল

২৫ প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের ১৪।২।১৮৯৮ তারিখের চিঠি।

২৬ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৮০

নিচতলায় কোন স্থানে। তিনি লিখেছেন : "On the second morning of the visit…in the worship room was held a little service of initiation, where one was made a Brahmacharini…After the service we were taken upstairs."[২৭] এখন প্রশ্ন, নিচতলার কোথায় ছিল ঠাকুরঘর? ঐ দোতলা বাড়ির নিচের কোন ঘরে ঠাকুরঘর থাকা অসম্ভব, কারণ তার ওপর দোতলার ঘরে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ বাস করতে চাইবেন না। এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন ব্রহ্মানন্দ-শিষ্য হরিচরণ মল্লিক। তিনি তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন : "এই বাগানে ঠাকুরঘর ছিল ছপ্পর ও গোলপাতার চালা। মেঝে ও দেওয়াল পাকা সিমেন্ট করা।"[২৮] আরও একটি বাড়তি তথ্য পাওয়া যায় প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতিকথা থেকে বৌদ্ধধর্মের নেতা ধর্মপালকে নিয়ে একদিন ঝড়-জলের মধ্যে স্বামীজী গিয়েছিলেন নতুন মঠের জমিতে শ্রীমতী বুলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। ফেরার পথে ধর্মপাল নৌকাতে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এদিকে "মঠে এসে স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসি-শিষ্যদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে ধ্যান করতে গেলেন এবং ঠাকুরঘরে ও তার পূর্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন হলেন।"[২৯] এই টুকরো টুকরো তথ্যগুলি একত্রিত করলে বোঝা যায়, দোতলা-বাড়ির পশ্চিমে ছোট খোলা মাঠের ওপর ছিল ছপ্পর ও গোলপাতার ছাউনির ঠাকুরঘর। তার পূর্বদিকের ঘর অর্থাৎ সর্বদক্ষিণের একতলার ঘরটি ব্যবহৃত হতো ধ্যানঘর রূপে। এই ঘরের পশ্চিমমুখী বড় দরজাটি খুললেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পট ইত্যাদি সুন্দরভাবে দেখা যেত। খুব সম্ভবতঃ ঠাকুরঘরের সমস্যার জন্যই ১ ফেব্রুয়ারির (১৮৯৮) পরিবর্তে এ-বাড়িতে মঠ স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৩ ফেব্রুয়ারি। [ক্রমশঃ]

২৭ The Complete Works of Sister Nivedita, Vol. I. p. 284

২৮ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ১৯৯০, পৃঃ ২৬১ ২৯ ঐ, পৃঃ ১৪০

পথের ডাক

পামেলা মুখোপাধ্যায়

বিষণ্ণ দুপুরে ক্লান্ত শ্রান্ত
সংসারকে পিছনে ফেলে,
কোথায় যেন চলে যাই।
এ-যাত্রা বুঝি কোন নিরুদ্দেশের পানে,
সকল ভাল-মন্দ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব
পড়ে থাকে পিছনে,
চোখের সামনে যেন দেখতে পাই,
এক অফুরন্ত পথ।
সে-পথ যেন ডাক দেয়
আমায় নিরুদ্দেশের পানে।
চির-অতৃপ্ত, চিরতৃষিত
হৃদয়ের চিরকালের চলা।
বুকভরা বিষণ্ণতা মাখানো
তৃষ্ণা নিয়ে ইচ্ছা করে
হারিয়ে যেতে
সে-পথের টানে।
যে-পথের শেষে আছে
পরমতৃপ্তি, চিরশান্তি।
এ-পথ কি নেবে আমায়,
সেই পরমপথের প্রান্তে?

রামকৃষ্ণ নাম

সুধাংশুভূষণ নায়ক

পড়ন্ত বিকেলে
শুশুনিয়া পাহাড়ে উঠবেন বলে
পাহাড়ের পাদদেশে
তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সভয়ে।

ধীর মন্থর পদ-বিক্ষেপে
হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলা
ক্লান্ত বৃদ্ধ থমকে দাঁড়িয়ে একবার
পিছনের দিকে তাকালেন।
বিষণ্ণ মুখখানি তাঁর প্রসন্ন হয়ে উঠল।

দেখলেন হাসি খুশিতে ভরা এক শিশু
দুরন্ত দামাল, সারল্যে সুন্দর
মায়ের হাত ধরে টাল-মাটাল
পা ফেলে এগিয়ে চলেছে।
দেখলেন একটি চপল চঞ্চল
কিশোর হৈ হৈ করে উঠে যাচ্ছে
শুশুনিয়া পাহাড়ে।
দেখলেন এক বলিষ্ঠ যুবক
কাঁধে এক বিরাট ভার নিয়ে
তরতর করে পাহাড় থেকে নামছে।

সূর্য ডুবু ডুবু—
এক পা এক পা করে
তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন অতি সন্তর্পণে,
মুখে বিড় বিড় করে জপ করছেন যেন
একটি নাম।
কান পেতে শোনার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ
অনাহত সেই ধ্বনি—
'রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ'
সূর্যদেব জপছেন অবিরাম।
সেই নামের জোরেই
বুঝি তিনি চষে বেড়াচ্ছেন
এই বিশ্ব-চরাচর।

না, আর কিছু ভাবলেন না বৃদ্ধ,
দৃঢ়মুষ্ঠিতে লাঠিটি ধরলেন,
সূর্য পাটে নামার আগে
পাহাড়ে কিছুটা উঠবেনই তিনি।

মধু বাতা ঋতায়তে

সতী তামলী

সারি সারি দেওদার বুকে নিয়ে
মায়াময় ঐ মায়াবতী—
পাইনের পত্রপুটে সুধারসখানি
ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে নাহি ছেদ যতি।
হিমাদ্রির বুকে নিত্য উচ্ছ্বসিয়া ওঠে
নাভিমূল হতে যেন অনাহত ধ্বনি ॥
দূরে দূরে দেখা যায় গিরিশৃঙ্গরাজি,
মরি মরি কিবা রূপ, অপরূপ জ্যোতিঃ!
অনন্ত বিথার জুড়ি' হৃদয়নন্দন
ধ্যানাসনে সমাহিতা যেন হৈমবতী,
দিগন্ত-বিস্তৃত ঐ গিরিমালাবুকে
ধ্যানমৌন যোগীশ্বর ধবলবরণ ॥
হোথা ঐ ওক বৃক্ষতলে
ধ্যানলীন হয়েছেন ব্রহ্মবিদ্‌ ঋষি,
দিব্যানন্দে মগ্নতনু সমাধি অভঙ্গ
হৃদয়েতে জ্যোতিঃ জ্বলে, কাটে মহানিশি
পুণ্য সেই বৃক্ষবেদিতলে
আজও যেন খেলে যায় চৈতন্যতরঙ্গ ॥

সমর্পণ

অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য

সুখের পশরা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরি
প্রত্যাশার সব মুখগুলি হাসি দিয়ে ভরাবার
ব্যর্থ সাধনায়।
অবশেষে দিনপ্রান্তে রিক্ত হয়ে ফিরি
সর্বস্বের বিনিময়ে
অবজ্ঞাত, প্রত্যাখ্যাত, পরিত্যক্ত
একা।
তখন দাঁড়াই এসে
চুপি চুপি তোমার সম্মুখে।
নিয়ে আসি একান্ত গোপনে
দুচোখের অঞ্জলিতে ভরে
দুফোঁটা অশ্রুর অর্ঘ্য।

জানি, যা কেউ নেয়নি,
কেউ নেয় না,
তুমি তা গ্রহণ করবে হাসিমুখে,
ভোরের আলোর মতো
অম্লান প্রসন্নতায়।

বাউলের দল

প্রদ্যুৎ রায়চৌধুরী

বাউলের দল এল গেল,
দেখল সবাই চিনল না,
চিনল যারা সঙ্গ নিল
আর ঘরেতে রইল না ॥

সঙ্গ পেলে আপনজনার
কেউ তো ঘরে থাকে না আর,
কপাল পোড়া এখন আমার
তাঁদের দেখা হলো না ॥

বাউল রাজার কত ছেলে
ছড়িয়ে আছে দেশে-দেশে
রাজার ছেলে তাঁরাও রাজা
চিনল বা কেউ চিনল না ॥

সঙ্গ পেলে তাঁদের তবে
হয়তো প্রভুর দেখা হবে
বলে গেছেন নিজেই প্রভু
শুনল বা কেউ শুনল না ॥

রানী মদালসা

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

পুরাকালে শত্রুজিৎ নামে এক মহান রাজা ছিলেন। বহু বছর সুখে রাজত্ব করার পর মহারাজ শত্রুজিৎ পুত্র ঋতধ্বজকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। ঋতধ্বজ পিতার মতোই নানা সদ্‌গুণের অধিকারী। প্রজাদের কল্যাণার্থে পিতা যেসব কাজের ভার তাঁর ওপর অর্পণ করতেন, অতি কঠিন হলেও ঋতধ্বজ তা হাসিমুখে ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। তাছাড়া ব্রাহ্মণ এবং মুনি-ঋষিদের প্রতিও তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। এসব গুণের জন্য প্রজারা ঋতধ্বজকে খুব ভালবাসতেন। মহারাজ ঋতধ্বজের পত্নী ছিলেন গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসা। মদালসা ছিলেন বিদ্যা-বুদ্ধিতে অতুলনীয়া। যেন পূর্বজন্মের সুকৃতিবলেই অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারিণী হয়ে জন্মেছিলেন তিনি। এমন রাজা-রানীর রাজত্বে প্রজারা যে সুখে-শান্তিতে বাস করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই ঋতধ্বজের রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার সংবাদে সকল প্রজাবৃন্দই খুশি হলেন।

রাজার সুশাসন-ক্ষমতা ও রানীর বুদ্ধি-পরামর্শের ফলে রাজ্য ভালই চলছে। কালে মদালসার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। পুত্রের জন্মে আনন্দিত রাজা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও বহু দান-দক্ষিণা করে যথাসময়ে পুত্রের নাম রাখলেন বিক্রান্ত। 'বিক্রান্ত'—এই নাম শুনে রানী মদালসা হাসতে লাগলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। এই হাসির মধ্যে কোন রহস্য আছে—একথা রাজা বুঝতে পারলেও প্রকাশ্যে রানীকে কিছু বললেন না।

শিশুটি যখন দোলনায় শুয়ে কাঁদত, মদালসা তাকে দোলনায় দোল দিতে দিতে বলতেন: "হে পুত্র। তুমি শুদ্ধ আত্মা, তুমি নামহীন। এখন যে তোমার নাম দেওয়া হয়েছে, তা কল্পনামাত্র। তোমার এ-দেহ কেবল পঞ্চভূতের সমষ্টি। এই দেহের সঙ্গে তুমি যেমন সংশ্লিষ্ট নও, তেমনি এ-জগতে কেউই তোমার নয়। অতএব কাঁদ কেন? তোমার সুখ নেই, দুঃখও নেই। তোমার এ-দেহ আচ্ছাদন-মাত্র; তা এক সময় শীর্ণ হয়ে যাবে। অতএব, হে পুত্র! কি জন্য কাঁদ? শুভাশুভ কর্মবশে এই শরীররূপ আচ্ছাদনে নিবদ্ধ হয়েছ। পিতা, মাতা, পুত্র, দয়িতা, আত্মীয়, অনাত্মীয় কেউ কারুর নয়। তুমি তাদের সুখে সুখী ও তাদের দুঃখে দুঃখী হয়ো না। যারা মূঢ়চিত্ত তারাই সুখ-দুঃখে অভিভূত হয়। যারা অবিদ্যান্ধ তারাই ভোগ্য-বস্তুকে সুখের হেতু মনে করে তা পাওয়ার চেষ্টা করে। এসব মোহান্ধরাই সুখলাভের উদ্যোগ ও দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা করে। তুমি শুদ্ধ আত্মা; তোমাতে সুখ-দুঃখ কিছুই নেই।"

মায়ের এরূপ উপদেশের মধ্য দিয়েই রাজকুমার বিক্রান্ত বড় হতে লাগল। ইতোমধ্যে মদালসার আরেক পুত্রের জন্ম হলো। মহারাজ ঋতধ্বজ মহা খুশি। এবারও আনন্দোৎসব করে তিনি পুত্রের নাম রাখলেন সুবাহু। নাম শুনে রানী মদালসা এবারও হাসলেন। রানীর হাসিতে রাজা অবাক হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। এই পুত্রকেও পূর্বের মতো উপদেশ দিতে লাগলেন মদালসা। তারপরে আরেক কুমারের জন্ম হলো। এবার রাজা পুত্রের নাম রাখলেন শত্রুমর্দন। এই নাম শুনে রানী অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। এবার রাজার একটু রাগ হলো বটে, কিন্তু রানীর জ্ঞান ও বুদ্ধিকে রাজা সমীহ করতেন বলে এবারও কিছু বললেন না।

ভাবলেন, নামকরণে হয়তো কোথাও ভুল হচ্ছে অথবা এসব নাম রানীর পছন্দ হচ্ছে না, তাই হাসেন। এই পুত্রকেও মদালসা একই রকম শিক্ষা দিতে লাগলেন।

ক্রমে তিন রাজপুত্র শিশুকাল অতিক্রম করে কৈশোরে পড়ল। রাজা ঋতধ্বজ ভাবলেন, এবার পুত্রদের রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া দরকার। তিনি সেরূপ ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

এদিকে মায়ের মুখে ক্রমাগত জ্ঞানের কথা শুনতে শুনতে তিন রাজকুমারের বুদ্ধি খুব মার্জিত হলো। মায়ের শিক্ষায় কৈশোর বয়সেই তাদের নিত্য-অনিত্য বস্তুর জ্ঞান জন্মাল। ফলে তারা কিছুতেই রাজনীতি শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করল না। পার্থিব সুখের প্রতি তাদের মন একেবারেই বীতস্পৃহ হয়ে পড়ল।

অবশেষে চতুর্থ পুত্রের জন্ম হলো। এবার নামকরণের সময় রাজা রানীকে বললেন: প্রিয়ে, এবার তুমি পুত্রের নামকরণ কর। আমি যতবারই নাম রেখেছি, তুমি কেবল হেসেছ। আমি এমন কি খারাপ নাম রেখেছি? পুত্রগণের যে বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুমর্দন নাম রেখেছি; তা আমার বিবেচনায় সর্বপ্রকারেই সঙ্গত হয়েছে। কারণ, ক্ষত্রিয়গণের শৌর্য ও দর্পযুক্ত নাম রাখাই যুক্তিযুক্ত। যা-হোক, এই তিনটি নাম যদি তোমার বিবেচনায় উত্তম না হয়, তুমি স্বয়ং এই পুত্রের নামকরণ কর।

রানী তনয়ের নাম রাখলেন অলর্ক। 'অলর্ক' শব্দের অর্থ ক্ষিপ্ত কুকুর। পুত্রের এই অসম্বন্ধ নাম শুনে রাজা হাসতে হাসতে পত্নীর কাছে এই নামকরণের তাৎপর্য জানতে চাইলেন। মদালসা বললেন: হে মহারাজ! নামকরণ লোকাচার ও কল্পনামাত্র। নাম রাখতে হয় বলেই একটি নাম রাখলাম। তার কোন তাৎপর্য নেই। আপনি যেসব নাম রেখেছেন, তারও কোন অর্থ নেই। কারণ, যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরা আত্মাকে সর্বব্যাপী বলে জানেন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াকে ক্রান্তি বলে। আত্মা সর্বগত। সুতরাং তার গতি সম্ভব নয়। এজন্য আমার বিবেচনায় 'বিক্রান্ত' নাম অর্থহীন। আবার, আত্মা মূর্তিহীন। আত্মার হাত-পা ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। সুতরাং দ্বিতীয় পুত্রের যে 'সুবাহু' নাম রেখেছেন, তারও কোন অর্থ হতে পারে না। তৃতীয় পুত্রের যে 'শত্রুমর্দন' নাম রেখেছেন, তা-ও আমার মতে নিরর্থক। সকল শরীরে একই আত্মা বিরাজমান। সুতরাং তার শত্রুই বা কে আর মিত্রই বা কে? ভূতের দ্বারা ভূত (অর্থাৎ এক প্রাণীর দ্বারা অন্য প্রাণী) মর্দিত (হত) হয়। যিনি মূর্তিহীন, তাঁর মর্দন কিরূপে সম্ভব? আসলে নামহীন, গোত্রহীন আত্মাকে নাম দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে আপনার 'বিক্রান্ত' ইত্যাদি নামে যেমন অর্থ আছে, আমারও সেরূপ 'অলর্ক' নাম রাখার সার্থকতা আছে।

রানীর উত্তর শুনে রাজা ঋতধ্বজ বিস্মিত হলেন। বললেন: প্রিয়ে! যেসব কথা বলেছ তা সবই যথার্থ। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ, তুমি এই পুত্রটিকে এমনভাবে শিক্ষা দাও যাতে সে গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করে রাজকার্যে মনোনিবেশ করে। তোমার শিক্ষার গুণেই আগের তিনটি পুত্র যেমন আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান, তেমনি তোমারই শিক্ষায় অলর্ক যেন আদর্শ নৃপতি হয়—এই আমার ইচ্ছা।

পতির অনুরোধে রানী মদালসা কুমার অলর্ককে বাল্যকাল থেকেই গার্হস্থ্যধর্ম ও রাজধর্ম শিক্ষা দিতে লাগলেন। যথার্থ গার্হস্থ্যাশ্রমী হিসাবে সে কিভাবে মাতা-পিতা-পত্নী-পুত্র ও ভৃত্যাদির প্রতি কর্তব্য করবে এবং একজন রাজা হিসাবে সে কিভাবে রাজ্যশাসন করবে, তা যথাশাস্ত্র শিক্ষা দিলেন। মায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কুমার অলর্ক যৌবনে রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে একজন ধর্মাত্মা নৃপতিরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়।" রানী মদালসার উপাখ্যান থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়ে থাকি।

পরিক্রমা

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মা অবনত মস্তকে নিজের তুচ্ছতা ও কৃষ্ণের বিরাট মহিমা বুঝতে পেরে তাঁর কাছে এই ব্রহ্মকুণ্ডে প্রার্থনা করেন ঃ

"পশ্যেশ ! মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি ।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ ।"

—হে জগদীশ্বর ! আমার বোকামিটা দেখ ! মায়াবিদেরও মায়াচ্ছন্নকারী, মায়ার অধীশ্বর, সর্বব্যাপী, সকল কারণের কারণ—সর্বনিয়ন্তা যে তুমি, সেই তোমার ওপরও আমি গিয়েছিলাম মায়াজাল বিস্তার করে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে। আগুনের কাছে তার একটি স্ফুলিঙ্গ যেমন, তোমার কাছে আমিও তেমনি তুচ্ছ। "অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত !"—অতএব হে নিত্যমূর্তি ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। "অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিতমেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।"—আজ তোমার বিমোহন লীলায় তুমি দেখালে, তুমি ছাড়া এই জগৎ শুধুই মায়া। প্রথমে তুমি এক ছিলে, তারপরে ব্রজবালক, গোবৎসাদি সমস্ত তুমিই হলে, অতএব "নৌমীড্য তে"—হে জগৎপূজ্য, তোমাকে প্রণাম। পরাভূত ব্রহ্মার বন্দনা গ্রহণ করে কৃষ্ণও নিজের মায়া সংহরণ করেনিলেন।

এই সেই দিব্যস্থলী, যা আজ একটি পরিত্যক্ত কুণ্ডের আকারে বর্তমান। চারিধারে জীর্ণ সোপানের ভগ্নাবশেষ। কাছে একটি ছোট ঘরে ব্রহ্মা, গোবৎস, গোপবালক ও গোপালের মূর্তি।

গোদাবিহার ছাড়িয়ে ডানদিকে ভূতগলি। এই গলিতে দিনাজপুরের রাজবংশের শ্যামরায়ের মন্দির। এই শ্যামরায় বিগ্রহ ও মন্দির-সংলগ্ন একটি প্রাচীন তালগাছ নিয়ে বৃন্দাবনে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সে-কাহিনী স্থানান্তরে বলা যাবে। আজ লক্ষ্য গোপেশ্বর মহাদেব। তাই আমরা উত্তরদিকে আরও এগিয়ে চললাম। বৃন্দাবনের পুরনো অঞ্চল এটি। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে গোপেশ্বর শিবের শুভ্র মন্দিরশীর্ষ।

অবশেষে এসে পেঁছালাম বৃন্দাবনের বিখ্যাত শিবমন্দির গোপেশ্বর মন্দিরে। ছোট মন্দির, চারিধারে পরিক্রমার জন্য বাঁধানো বারান্দা। নাটমন্দির বলে কিছু নেই। ঐ পরিক্রমারই উত্তর-পশ্চিম কোণে ছোট্ট একটি ঘরে দাক্ষিণাস্যা দেবী অন্নপূর্ণার ছোট বিগ্রহ। মাকে প্রণাম জানিয়ে গোপেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করলাম। গৌরীপট্ট থেকে এক হাতের মতো উঁচু লালচে পাথরের স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। ইনিই বর্তমান বৃন্দাবনের প্রাচীনতম দেবতার বিগ্রহ। মুসলমান আমলে অন্য অনেক বিগ্রহ স্থানান্তরিত হলেও এই শিবলিঙ্গ যেমনটি ছিলেন তেমনিই আছেন। অন্ততঃ এই মন্দির ধ্বংস হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মন্দিরটিও অত্যন্ত সাধারণ। দিল্লীর সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ বোধহয় করেনি সে-যুগে। চারিপাশের দোকান, বাড়িঘরের মাঝে প্রচ্ছন্নভাবেই তিনি আছেন। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন বিহারীজী, রাধাবল্লভ ও রাধারমণ প্রভৃতি বিখ্যাত সুবিশাল দেবালয়ের মতো কিছুই এখানে নেই। অতি সাধারণ ছোট সাদা মন্দির। তবে পূর্বদিকের দেওয়ালে কিছু জীর্ণাবশেষ ও প্রাচীন মূর্তির নিদর্শন এখনও এই বিগ্রহের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই গোপেশ্বর মহাদেবের নাম কেউ কেউ বলেন গোপীশ্বর। বৃন্দাবনে এঁর অধিষ্ঠানের পিছনে আছে এক পৌরাণিক কাহিনী। এই মন্দিরের সামান্য উত্তরদিকেই 'বংশীবট' এলাকা, যেখানে হয়েছিল বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলার সর্বোত্তম ঘটনা 'মহারাস'।

"আনন্দরসৈকমূর্তিঃ" শ্রীভগবান তাঁর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছিলেন এই রাসরঙ্গে। সাক্ষাৎ ভূমাস্বরূপ যিনি, তিনি ভূমিতে অবতরণ করেছিলেন নরলীলায়। তাঁর অপার্থিব যোগমায়াশ্রিত নানা অঘটন-ঘটন-ক্রিয়াসমূহের মধ্যে রাসলীলার তত্ত্ব সর্বাপেক্ষা দুরবগাহ। সাধারণ মানুষ সেই তত্ত্ব উপলব্ধিতে অনধিকারবশতঃ ও অজ্ঞতাজনিত বিকৃত ব্যাখ্যা করে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'সন্ন্যাসীর গীতি'তে বলেছেন : "তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়, / অ-তত্ত্বজ্ঞ তোমা হাসিবে নিশ্চয়।" যিনি অ-তত্ত্বজ্ঞ, এই লীলারসাস্বাদন তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। লীলার কদর্থ করে তিনি নিজে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হয়ে অন্যকেও বিভ্রান্ত করেন। শ্রীভগবান নিজেও এই ভাবেই বলেছেন :

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।"
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥"

—সর্বভূতের ঈশ্বর-স্বরূপ আমার পরম তত্ত্ব মূঢ় লোকেরা বুঝতে না পেরে আমাকে অবজ্ঞা করে। আমাকে সাধারণ মানুষেরই মতো মনে করে।

অখিল রসামৃত বিগ্রহ—রাসরসতাণ্ডবীর রাস-তাণ্ডবের বিবরণ দিতে গিয়ে পরমহংসাগ্রণী ত্যাগীশ্রেষ্ঠ শুকদেব ভাবে বিভোর হয়ে যান, এবং আসন্নমৃত্যু রাজর্ষি পরীক্ষিৎও অতি আগ্রহের ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই দিব্য ঘটনার বর্ণনা শোনেন। তাঁর মনে ব্যক্তিগত ভাবে কোন সংশয় না থাকলেও অনাগত কালের শ্রোতা ও পাঠকের মনে এ-সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তি পাছে আসে তাই কয়েকটি প্রশ্ন তিনি করেন শুকদেবের কাছে এবং শুকদেবও এই প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝে এর উত্তর দেন। তাতেই বোঝা যায় এই রাসের উদ্দেশ্য কি। এই রাসক্ষেত্রে গোপী-গোবিন্দের যে নৃত্যাভিনয় সেটি জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। বহির্দৃষ্টিতে গোবিন্দ গোপীদের আলিঙ্গন করছেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে অনুভূত হবে—যিনি সকলের অন্তরে নিত্য বিরাজিত তিনিই সকলকে পর সাজিয়ে আবার বুকে টেনে নিচ্ছেন। এই আলিঙ্গন-বিহার সব আত্মতত্ত্ব লাভেচ্ছু ভক্ত সাধকের অন্তরের চরম প্রার্থনা। তাইতো তাঁরা বলেন :

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু,
তবু হিয়া জুরণ না গেল।"

সেই অন্তরের সম্পদ 'প্রাণকৃষ্ণ' বাইরে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনিই আত্মার আত্মা। "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।" তাঁর এই রাসলীলা আত্মার সঙ্গে আত্মার বিহার। নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলা। "যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ"—যেন নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে বালকের খেলা।

শরৎ পূর্ণিমার সেই অভিনব মহারাস নৃত্য দর্শনের আনন্দে সে-রাত্রে সমগ্র বৃন্দাবন মেতে উঠেছিল। বৃন্দাবনের পশুপাখি, গোপাঙ্গনারা আকুল হয়ে নিজের পৃথক অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে সে-রাত্রে তাদের অন্তরতম অন্তরাত্মার সঙ্গে মিলনের আনন্দে নিজেরা হারিয়ে গিয়েছিল : "নভস্তাবদ্ বিমানশতসঙ্কুলম্। দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎ-সুক্যভৃতাত্মনাম্ ॥" সেই জগৎ ভোলানো নৃত্য-উৎসব দর্শনের বাসনায় স্বর্গলোকবাসী দেবতারা সস্ত্রীক বৃন্দাবনের এই যমুনা পুলিনের আকাশে বিমানে চেপে হাজির হয়েছিলেন। "যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন" অর্থাৎ অনন্ত যোগশক্তিধারী যিনি, সর্ববৃত্তি-নিরোধকারী যোগীদেরও ঈশ্বর যিনি, সর্বজীবের চিত্তকে আকর্ষণকারী যে কৃষ্ণ, তিনিই এই মহারাসের মূল অভিনেতা; তাঁর সেই লীলা-নাটক দেখবার জন্য সে-রাত্রে সকল দেব-দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মদনান্তক যোগীশ্বর নটরাজ মহাদেব আর স্থির থাকতে না পেরে এই লীলার রসাস্বাদের ও কৃষ্ণ-অঙ্গ স্পর্শ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে গোপিনীর ছদ্মবেশে রাসমণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অখিলরসামৃতবিগ্রহ কৃষ্ণ মহেশ্বরের এই গূঢ় অভিলাষ বুঝতে পেরে রাসনৃত্য অন্তে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন এই লীলার সাক্ষী হিসাবে বৃন্দাবনে তাঁকে থাকতে হবে। দেবাদিদেব কথা দিয়েছিলেন। আর সেই সাক্ষীর মূর্তবিগ্রহ বর্তমানের গোপেশ্বর মহাদেব। ভক্তিনতচিত্তে তাঁকে প্রণাম জানালাম :

"ব্রহ্মমুরারি-সমর্চিতলিঙ্গং,
নির্মল-ভাসিত-শোভিতলিঙ্গম্।
জন্মজদুঃখ-বিনাশকলিঙ্গং,
তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥

দেবমুনি-প্রবরার্চিতলিঙ্গং,
কামদহং করুণাকরলিঙ্গম্।
রাবণদর্পবিনাশনলিঙ্গং,
তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥"

মন্দির প্রদক্ষিণ করে বাইরে বেরিয়ে এসে আবার এগিয়ে চললাম ডানদিকের গলিপথে। বাঁদিকে বল্লভাচার্যের প্রাচীন মঠ। শোনা যায় বিখ্যাত বৈষ্ণবসাধক শ্রীমৎ বল্লভস্বামী এখানে কিছুকাল সাধন করেছিলেন। তাঁর সিংহাসন এখানে আছে, বিগ্রহও আছে। সেখানে প্রণাম জানিয়ে পথে নামতেই বাঁদিকে ছোট্ট একটি তোরণ পেরিয়ে প্রাচীরঘেরা 'বংশীবট' ক্ষেত্র। এখানেই বৃন্দাবনবিহারীলাল মধুর বেণুনাদে আকৃষ্ট করে বৃন্দারণ্য-বিহারিণী গোপাঙ্গনাদের আকর্ষণ করে এনেছিলেন। ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি প্রাচীন বেদি, তৎসংলগ্ন একটি প্রাচীন বটগাছ। গাছের গোড়ায় একটি অপূর্ব সুন্দর রাজস্থানী অঙ্কন-শৈলীর আঁকা রাসমণ্ডলীর পট, বেশ পুরনো ছবি। সেই দিব্যলীলার স্মরণে এই পটটি পূজিত হচ্ছে এখানে। বৃক্ষ ও বেদিতে প্রণাম জানিয়ে পিছনের নাটমন্দিরে এসে দাঁড়ালাম। প্রাচীরের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে নানা দেবমূর্তির বিগ্রহ খোদাই করা। তার মধ্যে একটি কোণে নটরাজ মহাদেবের গোপীবেশে নারী সাজে একটি দণ্ডায়মান মূর্তি পূর্বের গোপেশ্বর মহাদেবের লীলাকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নাটমন্দিরে তখন গান চলছে:

"কাঁহা জীবনধন বৃন্দাবন প্রাণ,
কাঁহা মেরী জীবন কী রাজা।
শূন্য হৃদয় পুরী আও আও,
মুরারিমোহন বাঁশরী বাজা।"

এই সেই স্থান, যেখানে এই বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে ভুবনমোহন মূর্তিতে নওলকিশোর তাঁর বাঁশিতে তান তুলেছিলেন, যে-তানে যমুনা উত্তাল হয়ে উঠেছিল—বৃন্দাবনের গাছপালা পশুপাখি উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিল সেই সুর। যে-মধুর ধ্বনির টানে সংসারের সকল আকর্ষণ ছেড়ে, জীবনের সর্বপ্রকার মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তিমতী সাধিকা গোপীরা লজ্জা-ঘৃণা-ভয় দূরে ফেলে দিয়ে ছুটে এসেছিল এই বৃক্ষমূলে রাসবিহারীর চরণপ্রান্তে। সেই দিব্য রাসমঞ্চের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমি ভুলতে চেয়েছিলাম বর্তমান পরিবেশ। প্রার্থনা একটাই ছিল:

"মম মানস মাধবী কুঞ্জে শ্যাম বিহর গো নিশিদিন
আমার পরাণ রাধারে পাগল করিয়া বাজাও
মোহন বীণ।
তব বেণুর ছন্দে জাগিবে হিয়া
উঠিবে মর্ম গুঞ্জরিয়া
মম নয়ন সলিলে যমুনা বহিবে,
লহরী তুলিবে ক্ষীণ।
যবে দিনশেষে নামিবে নিশি,
নিবিড় জলদে ঘেরিবে দিশি।
যবে আঁখির পলকে আলোকে মিশি
নিমেষে হব বিলীন।"

বংশীবটের এই অঞ্চলেই প্রাচীনকালে একটি মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহ। এই রাসক্ষেত্রের লীলাস্মরণে বিগ্রহের নামও তিনিই দিয়েছিলেন 'গোপীনাথ'। বৃন্দাবনে প্রচলিত প্রবাদ এই: গোপীনাথের বক্ষঃস্থল সাক্ষাৎ বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বুকের মতোই দেখতে ছিল। কারণ, ঐ বক্ষেই যে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপাঙ্গনাদের। তাই যে ভাস্কর এই গোপীনাথ বিগ্রহ তৈরি করেছিলেন, তিনি অলৌকিকভাবেই এই গোপীনাথজীর বক্ষঃস্থল সেই আসলের মতোই তৈরি করে ফেলেছিলেন। যাই হোক কালক্রমে এই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বিগ্রহ আশ্রয় নেন ভূগর্ভে। তার পরেও কেটে যায় কত কাল। চৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে তাঁর ভক্ত মধুপণ্ডিত বৃন্দাবনে আসেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য পরমানন্দ ভট্টাচার্য এই স্থানে বংশীবটমূলে এই বিগ্রহ উদ্ধার করেন ও ভক্ত মধুপণ্ডিতকে এই বিগ্রহের সেবার ভার দেন। পরবর্তী কালে বৃন্দাবনের প্রধান বিগ্রহত্রয়ের অন্যতম হিসাবে এক লাল পাথরের বিশাল মন্দিরে গোপীনাথজী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন বর্তমানের প্রাচীর-ঘেরা অঞ্চলে। এখান থেকে একটু দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি গলিতে সেই লাল পাথরের বিশাল মন্দির ছিল। এই মন্দিরও মুসলমান আমলে দিল্লীর সম্রাটের বিষদৃষ্টির ফলে ধ্বংস হয়।

অনেকদিন পরে এক বাঙালী জমিদার নন্দকুমার বসু ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে একটি নতুন মন্দির করে তাতে নতুন করে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করেন। কারণ, পূর্বের শ্রীবিগ্রহ মুসলমান আমলেই কলুষিত হওয়ার ভয়ে সেবাইতরা রাজস্থানে স্থানান্তরিত করেন। সেখান থেকে ঐ প্রাচীন বিগ্রহ আর ফিরিয়ে আনা যায়নি। এই সব পুরনো কথা স্মরণ করতে করতেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ স্থানীয় এক স্বামীজী বললেনঃ "যে গোপেশ্বর মহাদেব দর্শন করে এলেন, তাঁকে বছরে একদিন এখনো গোপীবেশে সাজিয়ে দেওয়া হয়। রাসপূর্ণিমার রাত্রে ঐ শিব-লিঙ্গকে নিচের দিকে ঘাগরা পরিয়ে মুখে রূপার মুখোস দিয়ে তাতে নাকে নথ, মাথায় মুকুট ও কপালের ওপর দিয়ে জরির কাজ করা ঘোমটা টেনে পিছনের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মনে হয় যেন কোন দেবীমূর্তি হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। শিব-লিঙ্গের এই নারীমূর্তির সাজ সম্ভবতঃ এই এক জায়গাতেই হয়।" প্রমাণ হিসাবে সামনের একটি ফটোর দোকানে দেখিয়েও দিলেন সেই গোপীর সাজে সজ্জিতা গোপেশ্বর মহাদেবের বিশেষ শৃঙ্গারের আলোকচিত্র। লোভ সামলাতে না পেরে এই দুর্লভ ছবি একখানি কিনেও ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। এই গোপেশ্বর প্রসঙ্গে আরও একটি কথা তিনি শোনালেন। সাধক-চূড়ামণি সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে বিরাজ করছেন—সেই সময় তাঁর 'আদিত্যটিলার' কুঠিয়া থেকে নিত্য এই মহাদেবের দর্শন করতে তিনি আসতেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন শরীর ধীরে ধীরে অসমর্থ হয়ে পড়ল তখন মনে দারুণ দুঃখ তাঁর—কিভাবে এই এতদূরে এসে দেবাদিদেবের দর্শন সম্ভব হবে। ভক্তের এই আকুল প্রার্থনায় গোপেশ্বর তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিলেন তাঁর ভজনস্থলীর কাছেই বনমধ্যে তিনি প্রকট হয়েছেন। সেখানেই তিনি তাঁর দর্শন পাবেন। এতদূরে আর আসার দরকার নেই। সেই বনমধ্যস্থিত মহাদেবের নামই 'বনখণ্ডীর মহাদেব'। ঘটনাটি শুনে বড় ভাল লাগল। বৈষ্ণবপ্রধান এই সাধকের কি উদার মনোভাব। নিত্য কৃষ্ণসেবার সঙ্গে সঙ্গে শিবদর্শনেও বাধা পড়ত না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে চৈতন্য মহাপ্রভু ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ বিগ্রহ দর্শনকালে একটি অপূর্ব শিবস্তোত্র রচনা করেছিলেন। স্তোত্রটি আমাকে বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠের এক প্রাচীন বাবাজী শুনিয়েছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় সনাতন ঠাকুর প্রত্যহ ঐ বনখণ্ডীর মহাদেব দর্শনে এসেছেন। আজও শহরের মধ্যস্থলে একটি সুন্দর মন্দিরে তিনি নিত্য সেবিত। অন্য একদিন তাঁর দর্শন হবে এই কথা বলে ঐ স্বামীজীর কাছে বিদায় নিলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আজ আবার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। যেসব পুণ্যক্ষেত্র আজ দর্শন হলো তাদের মধুর স্মৃতি বুকে নিয়ে ফিরে চললাম নিজের ডেরায়।

[ক্রমশঃ]

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও প্রায় একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্বমুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের 'দেখছেন'? 'কলকাতা' মানে অবশ্য শুধু কলকাতা নামক ভূখণ্ডটিই নয়, কলকাতা এখানে একটি প্রতীক। সারা পৃথিবীর মানুষ এবং সারা পৃথিবীই এখানে উদ্দিষ্ট। সুতরাং কলকাতার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, কলকাতার মাধ্যমে সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের দৃষ্টি প্রসারিত—মা সারা জগৎ অর্থাৎ সারা জগতের লোককে 'দেখছেন'। কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক। আলোকচিত্র : স্বামী চেতনানন্দ

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, অধুনা দুষ্প্রাপ্য, স্বামী বাসুদেবানন্দের ডায়েরী থেকে সংকলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন লোকান্তরিত এই সন্ন্যাসী একসময় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার দায়িত্বেও ছিলেন (২২তম বর্ষ—২৪তম বর্ষ, ২৯তম বর্ষ—৩৭তম বর্ষ)। —যুগ্ম সম্পাদক]

ব্যবহারিক ধর্ম

প্রশ্ন : কার্ল মার্কসের তত্ত্বগুলো আপনি স্বীকার করেন ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : সবটা না হলেও অনেকটা। সকলের সুখে জগতে থাকবার অধিকার, খাওয়া, পরা, গৃহ, আচ্ছাদন, চিকিৎসা, শিক্ষা সকলেরই দরকার। খেয়ে মরা বা না খেয়ে মরা দুই পাপ, একথা কে না স্বীকার করবে। এর জন্য বিদেশের স্বারস্থ হবার প্রয়োজন কি ? আমাদের বুড়ো ঋষিরা এসব সমাজতত্ত্ব নিয়ে বহু হাজার বছর ধরে ভেবেছেন, তবে তাৎকালিক অবস্থা ও উপায়ের ভিতর দিয়ে।

প্রশ্ন : কিন্তু আমরা শুনেছি, তারা শূদ্রদের ওপর অত্যাচার করত, আর রাজার খোসামোদ করে মন্ত্র, কাব্য সব লিখে—গো, অশ্ব, স্বর্ণ সব সংগ্রহ করত।

স্বামী বাসুদেবানন্দ : ঠিক তা নয়, তাঁরা কৌশল করে ধনিকদের দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই কৌশলটা হচ্ছে ধর্ম। যেমন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দান করতে হতো। মানুষের সম্পদের একটা সীমা ছিল, তার বেশি রাখতে পারবে না।

প্রশ্ন : কিন্তু সেসব কোন মান্ধাতার আমলের কথা, তার কোন ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, সত্য মিথ্যা কিছুই বোঝা যায় না।

স্বামী বাসুদেবানন্দ : কেন ? এই সেদিনও তো সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে ছত্রদণ্ড ব্যতিরেকে সর্বস্ব দান করতেন। মুসলমান রাজত্বকালেও হিন্দুদের মধ্যে 'দানসাগর' ব্রতের ছায়াটাও অবশেষ ছিল। ইষ্টাপূর্ত তখনকার গৃহস্থদের মধ্যে একটা মস্ত করণীয় ব্যাপার ছিল—আজকাল যাকে 'পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট' বলে। আবার পঞ্চমহাযজ্ঞও দৈনিক করণীয় ছিল, তার মধ্যে নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ—মনুষ্য ও প্রাণীদের সেবা। এদের খেতে দিতে হবে, এদের জন্য যারা রন্ধন না করে, যারা কেবল নিজেদের দেহ তৃপ্তির জন্য রন্ধন করে, তাদের পাপ অন্ন। তারপর দানযজ্ঞ—অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যাদান ও ধর্মদান। আজকালকার হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি, ইস্কুল, কলেজ সব এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু তারা সব জিনিসে ধর্মের ছাপ মারত—তাদের সব জিনিসের মূলে ছিল ইহলোক ও পরলোকের কাজের খতিয়ান।

প্রশ্ন : আচ্ছা দুর্গাপূজো করে লোকে পয়সা নষ্ট করে কেন ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : পয়সা নষ্ট হবে কেন ? —গরিব লোকজন খায়, মুচি ঢাক বাজিয়ে পয়সা, কাপড় পায়, কুমোর প্রতিমা গড়ে রোজগার করে। সেসব মূর্তি-শিল্পে আবার কত প্রতিযোগিতা ছিল, তারপর পোটো আজকাল যাকে 'পেন্টার' বলে, ডাকের সাজওয়ালা আছে, ছুতোর, কামার, চাষা, মজুর, যাত্রা, গান, সানাইওয়ালা প্রভৃতি সকলেরই পাওনা আছে। আগে ধনীর পয়সা 'আনএমপ্লয়মেন্ট', অর্থাৎ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এমনি করে দশের মধ্যে ছড়িয়ে

পড়ত। এখন হয়তো লোকে সেটা অন্যভাবে করতে চায়। এখনকার জমা কেবল দৃশ্যজগতে, আর প্রাচীনেরা তার জের টানত পরলোকের পরিণামে। আজকাল পরলোকের ভয় নেই, সেই জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যে জুয়াচোর অসুরটি অতি প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। প্রাচীনদের শুধু সমালোচনা করলে চলবে না, তাদের উপদেশ শোনবারও যথেষ্ট আছে।

[১৬।৫।১৯৪২]

শক্তিসঞ্চার

প্রশ্ন : শক্তিসঞ্চার কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : মানুষের মধ্যে সদসৎ সর্ববিধ সংস্কারই আছে। একজন লোক আর একজনের ভিতর নানা উপায়ে তা উদ্বুদ্ধ করে দিতে পারে। এরকম তো দেখাই যায়, একটা ভাল মানুষের ভিতর যে অসৎ সংস্কার ঘুমিয়ে ছিল কতকগুলো দুষ্ট লোক নানা প্ররোচনা ও হাবভাবের মধ্য দিয়ে সেই ভাল লোকের অসৎ সংস্কারগুলো জাগিয়ে তুলল। শিশুর ভিতর সদসৎ সংস্কারগুলো সুপ্ত থাকে, শিক্ষা ও পরিবেশ তার সংস্কারগুলোকে জাগিয়ে তোলে। সংস্কারগুলোর দুটি অবস্থা। একটা অবস্থায় তার প্রকাশ হবার কোনও আয়োজনই থাকে না ; আর একটা অবস্থায় তা কোনও দৃশ্যের পৌনঃপুনিকতা বা সঙ্গই হোক বা অপরের প্রবল ইচ্ছাতেই হোক, বাসনাময় হয়ে ওঠে। তখন ঐ সংস্কারগুলো শক্তিভাব প্রাপ্ত হয়। তারপর বাসনা যখন ঐ শক্তিগুলোকে আরও উত্তেজিত করে তোলে তখন শক্তি তার উন্মুখীভাব থেকে ক্রিয়াভাব প্রাপ্ত হয়। তখন তাকে বলে বৃত্তি। গুরুর ইচ্ছা শব্দ (মন্ত্র)-শক্তির ভিতর দিয়ে শিষ্যের চিত্তে আঘাত করে। জপের পুনঃপুনঃ আঘাতে সুপ্ত সৎ সংস্কার শক্তিময় হয়ে ওঠে ; ক্রমে সেটা বাস্তব জীবনে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। আবার দেখুন, ইচ্ছাটা যেমন পৈশিক শক্তি অর্থাৎ 'মাসল পাওয়ারে' পরিণত হয়, সেইরূপ অপরের শরীর স্পর্শমাত্র শক্তিমানের ইচ্ছাশক্তি তার চিত্তে স্পন্দন সঞ্চার করতে দেখা যায়, অর্থাৎ সংস্কারকে প্রবুদ্ধ করে তোলে। 'হিপনোটিজম' বা মোহিনীবিদ্যা এই শক্তিসঞ্চারের একটা নিকৃষ্ট দিক। আবার দেখা যায় স্পর্শও করতে হয় না, মহাশক্তিমানেরা একবার তাকালেই সব সংস্কার ওলোট-পালট হয়ে যায়। যেমন উত্তেজিত শিশুর দিকে মা তাকালেই সে আর এক রকম হয়ে যায়। তার ওপরও আছে, দর্শন বা স্পর্শনও দরকার হয় না, শুধু তীব্র শুভ ইচ্ছা অপরের শুভ সংস্কারকে জাগ্রত করে—এর নিকৃষ্ট অবস্থা স্বপ্নপ্রবেশ, দূর-দর্শন, দূরশ্রবণ, চিত্তপাঠ প্রভৃতি। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি-অন্তঃকরণের সহিত সকল ব্যক্তি-অন্তঃকরণ একটি সমষ্টি-অন্তঃকরণে সম্বন্ধিত হয়ে আছেই। অনেকের এগুলি আপনি স্ফুরিত হয়, অথচ বুঝতে পারে না কেন। যথা, দেহ-স্পন্দন।

প্রশ্ন : আচ্ছা, যারা মোহিনীবিদ্যা-বিশারদ, তারা ইচ্ছা করলেই তো সকলকেই আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চার করে দিতে পারে ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : না। তা পারে না, কারণ, ঐ সকল সংস্কার তাদের মধ্যেই উদ্বুদ্ধ নেই, তা তারা আবার অপরে কি করে সঞ্চারিত করবে। তাদের যেটুকু সদসৎ সংস্কার প্রবুদ্ধ আছে, সেইটুকু তারা অপরের মধ্যে পরিচালিত করতে পারে। আবার দেখা যায়, সতের কাছে থাকতে থাকতে সেই রকম চালচলন হয়ে যায়—সেই রকম আচার-ব্যবহার হয়ে পড়ে। তার কারণ হচ্ছে, উত্তাপ যেমন নিরন্তর বিকীর্ণ হচ্ছে, ঠিক তেমনি প্রত্যেক জীবের অবচেতন ভূমির সংস্কারগুলো বুদ্ধ্যারূঢ় হয়ে যখন ক্রিয়াভাব প্রাপ্ত হয়, তখন সেগুলোও জীব-শরীর থেকে ক্রমাগত বিকীর্ণ হতে থাকে ; সেগুলো আবার উপযুক্ত ধারণকারী পেলেই তার ওপর কাজ আরম্ভ করে দেয়। অথবা ধূপের গন্ধ যেমন পূজারীর বস্ত্রকে সুবাসিত করে তোলে, অথবা সমুদ্রের লবণাক্ত হাওয়া যেমন নিকটস্থ বাড়ির লোহার কল-কব্জাকে জীর্ণ করে তোলে, ঠিক তেমনি আমাদের পরস্পরের বিচ্ছুরিত চিন্তা পরস্পরের অন্তঃকরণে নিরন্তর প্রতিক্রিয়া করছে। সেই চিন্তার মন্দ, মধ্যম ও তারতা অনুযায়ী শক্তিসঞ্চারের তারতম্য আছে।

[২।৭।১৯৪২]

[ক্রমশঃ]

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সামাজিক ছবি

[পূর্বানুবৃত্তি]

"আজ এই পর্যন্ত থাক, আমি একবার মণিকে দেখি" বলিয়া সরলাও উঠিয়া গেল। মণির ঘরে গিয়া দেখিল, সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বলিল, "পোড়ার মুখি উঠে এলি-যে ?"

"পিসীমা কাঁদছিলেন, আমি ভাবলুম, আমি উঠে এলে, তিনিও উঠে আসবেন।"

"এ বৈষ্ণবী কে বল দেখি ? এর বিষয় কিছু শুনেছিস ?"

বৈষ্ণবী বৌকে নিজের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিল, মণি সরলাকে বলিল।

সরলা শুনিয়া বিস্মিত হইল,—"তাইতো, মেয়েটিকে আশ্চর্য বলতে হবে তো। কথাবার্তা কয়ে, এর সব মনের ভাব, জীবনের কি উদ্দেশ্য করেছে, জানতে হবে। যদি আজ একে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাই, তোর দাদা কিছু মনে করবে কি ?"

"দাদা কিছু মনে করবে না। কিন্তু ওকে তোমার বুড়ো কর্তাটির মনে না ধরে যায়।"

"যার সমুদ্রে বাস, তার শিশিরে কি ভয় ? ওকে সঙ্গে নিয়েই যাই, সব জানব এখন।"

"শেষ কালে আমাদের দোষ দিও না যে, আর একটি সতীন দিয়েছি।"

"তোকে দোষ দোবো না। এখন আয়, যাবার কথা বলিগে।"

বৈষ্ণবী যাইতে সম্মত হইল।

কিছু জলযোগের পর সরলা বিদায় লইল এবং বৈষ্ণবীকে লইয়া গাড়িতে বসিল। গাড়ি চলিল।

"ধর্ম বিষয়ে অপনার কি মত" সরলা জিজ্ঞাসা করিল।

"কোন মতই নাই। অতীন্দ্রিয় কিছু আছে কিনা জানি না। তবে বর্তমান সভ্যতার অবস্থায় সমাজে বোকা লোকদের জন্য একটা ধর্মবন্ধন দরকার, বোধ হয়।"

"আপনি একজন এগনস্টিক দেখছি," সরলা হাসিয়া বলিল।

"এগনস্টিক এবং ফিলাস্স," বৈষ্ণবী হাসিয়া উত্তর দিল।

"আপনি এতদিন এদেশ ওদেশ ঘুরছেন, এমন কোন লোক দেখেননি, যে ভগবান সাক্ষাৎকার করেছে ?"

"না। অধিকাংশ লোকই ধর্ম করতে সেলফ-হিপনোটিজম করে বসে আছে। কতকগুলো আছে জুয়াচোর, ধর্মের নামে নিজের স্বচ্ছন্দ করে, যার মধ্যে আমি একজন ; অবশিষ্টগুলো ভেড়া। ফিল-জফিতেও যেমন ভগবান পেয়েছে, ধর্মেও তেমনি পেয়েছে। তবে দেখুন, যেদিন আমি প্রথম এখানে আসি, স্টেশনের কাছে ধর্মশালায় একজন পরমহংসকে দেখেছিলুম, সে লোকটা একটু ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে।"

"কি রকম বলুন দেখি ?"

"অল্পক্ষণ তার সঙ্গে কথা কয়েছিলুম, কিন্তু লোকটার জ্ঞান ও তেজ যেন আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। এক-একবার মনে হয়, লোকটার সঙ্গে দেখা করি ও কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আবার সন্দেহ আসে, হয়তো সে বড় ফাঁকিদার। কিন্তু

লোকটার রকম সকম দেখে বোধ হলো যেন কিছু পেয়েছে।"

"কোন দেশী লোক, কত বয়স, বলুন দেখি? আমাদের কর্তার একটি বন্ধু একজন পরমহংসকে নিজের বাগানে এনে রেখেছেন। তাঁর সম্বন্ধে খুব ভাল রিপোর্ট শুনেছি। কাল বেলা দুটোর সময় সেই বাগানে সন্ন্যাসীর লেকচার হবে, পরে গাওয়া বাজনা হবে। আমাদের কর্তাও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

"তাহলে সেই পরমহংসই হবে। লোকটির বয়স ৩৫।৩৬, কোন দেশের লোক বুঝতে পারিনি। আমি তার সঙ্গে বাঙলায় কথা কইলুম, বুঝতে লাগল। কিন্তু আমাকে হিন্দিতে জবাব দিলে। বাঙালী হলে হতেও পারে।"

গাড়ি থামিল। সইস আসিয়া দ্বার খুলিল। সরলা নামিয়া বৈষ্ণবীকে হাত ধরিয়া নামাইল। বৈষ্ণবী দেখিল, একটি বৃহৎ প্রাসাদে আসিয়াছে।

সমস্ত সিঁড়ি ও মেঝে মার্বেল পাথরের, বড় বড় হল ও সুসজ্জিত ঘরের শ্রেণী, কতকগুলি দেশী ভাবে সাজানো, কতকগুলি বিলাতি ভাবে, সম্মুখে শোভমান উদ্যান, বাটীর ভিতর যাইতে বৈষ্ণবী চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল এবং সরলাকে বৈভবশালিনী জানিল।

সরলা অন্দরমহলে একটি সজ্জিত কামরায় বৈষ্ণবীকে লইয়া গেল, বলিল, "এই ঘরে আপনি থাকবেন" এবং একটি দাসীকে ডাকিয়া বৈষ্ণবীর সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিল ও জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি চা খান? আমি এই সময়ে চা খেয়ে থাকি।"

বৈষ্ণবী। "পেলেই খাওয়া যায়।"

দাসীরা চা আনিল। একখানি ছোট গোল মেহগনির মেজের উপর দুধের মতো সাদা গোল টেবিল-ক্লথ বিছাইয়া উত্তম চীনে বাসনের টী-সেট সাজানো হইল। দুখানি গদি-আঁটা গোল চৌকি পাশে পড়িল। সরলা ও বৈষ্ণবী কোচ হইতে উঠিয়া চৌকিতে বসিল।

সরলা। "আপনি চায়ের সঙ্গে চিনি খান?"

বৈষ্ণবী। "খাই।"

চা খাইতে খাইতে সরলা বলিল, "মরালিটি সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

"মরালিটি নামে এ্যাবসলিউট কোন পদার্থ নেই, তবে কুসংস্কার আছে। আমার মতে ইনটেমপারেট না হয়ে আর ঢাক না বাজিয়ে সব রকমের আনন্দ ভোগ করা যেতে পারে। সমাজের পায়ের ফোসকা না মাড়ালেই হলো—"

"বাবু ভিতরে আসছেন," একটি দাসী আসিয়া বলিল।

সরলা। "কর্তাকে এখানে ডাকতে পারি?"

বৈষ্ণবী। "স্বচ্ছন্দে।"

সরলা আগু বাড়িয়া দুর্গাদাসবাবুকে সেই ঘরে ডাকিয়া আনিল। বৈষ্ণবীকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ আমাদের বাড়িতে কে এসেছেন।"

"কে ইনি?"

"ইনি এক উচ্চশিক্ষিতা ও লিবারেল আইডিয়ার ভদ্রমহিলা, এঁর সঙ্গে আলাপ করে আমি আশ্চর্য হয়েছি। সঙ্গীতবিদ্যাতেও ইনি খুব পটু। চারুবাবুদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেখানে ইনি ছিলেন, আমি ধরে এনেছি।"

দুর্গাদাসবাবুর জন্য আর একখানি চৌকি আসিল, তিনি সেইখানেই চা খাইতে বসিলেন, "তা বেশ। আমাকে এখনি একটা মিটিং-এ যেতে হবে। সকাল সকাল আসতে পারি তো এঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করব। তুমি একবার এস" বলিয়া দুর্গাদাসবাবু সরলাকে লইয়া গেলেন।"* [ক্রমশঃ]

*উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩১১, পৃঃ ৪৯-৫২

স্বামী বিবেকানন্দ ও বেদান্ত

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

'সচ্চিদানন্দময়ং ব্রহ্ম'—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা কিছু সৎ বা অস্তিত্বশীল, 'আছে' বলিয়া যাহার অনুভব হয়, আমরা তাহাকেই 'বস্তু' নামে অভিহিত করি। যাহা অসৎ বা অলীক—তাহা বস্তু নহে, তাহা কিছুই নহে। আকাশকুসুম বলিলে কোন কিছুই বুঝায় না, সুতরাং উহা বস্তু নহে। আবার বস্তুমাত্রই প্রকাশস্বভাব। বস্তু আছে—এই কথা বলিতে হইলে বা অনুভব করিতে হইলে বস্তুর প্রকাশ ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। 'ইহা একটি বস্তু' এইভাবে বস্তু নির্দেশ ও বস্তুর জ্ঞান সাপেক্ষ। যে-বস্তু কেহ কখনও জানে না—সে-বস্তু আছে—ইহাও প্রমাণিত হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, বস্তু প্রকাশস্বভাব। পক্ষান্তরে প্রকাশ বা জ্ঞান বস্তুকে বাদ দিয়া সম্ভব না। বস্তুর যাহা স্ফুরণাত্মক অভিব্যক্তি তাহাই তো জ্ঞান। কোন বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া নিরবলম্বন জ্ঞান হইতে পারে না। অশ্বডিম্বের জ্ঞান কখনও হয় না, কারণ অশ্বডিম্ব বস্তু নহে। অতএব দেখা যায় যে, যাহা সৎ—তাহাই জ্ঞান, আবার যাহা জ্ঞান—তাহাই সৎ। ইহাই বেদান্তের ভাষায় সৎ ও চিৎ। বস্তুর আর একটি স্বরূপ আছে—তাহা আনন্দ। প্রত্যেক বস্তুই কোন-না-কোন ভাবে আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। যাহা একজনের কাছে দুঃখদায়ক – তাহাও অপরের কাছে আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। রূপযৌবন-শালিনী নারী স্বামীর আনন্দদায়িনী, আবার সপত্নীর দুঃখদায়িনীও বটে। কিন্তু বস্তু নিজে যদি আনন্দস্বভাব না হইত অর্থাৎ বস্তুটির স্বরূপের মধ্যে যদি আনন্দ না থাকিত—তাহা হইলে সে অপরের আনন্দদায়ক হইতে পারিত না, তাহার কাছ হইতে অপরে আনন্দ আহরণ করিতে সক্ষম হইত না। নির্গন্ধ পুষ্পের কাছ হইতে গন্ধ আহরণ করা যায় না, নীরস বস্তু হইতে কেহ রস আস্বাদন করিতে পারে না। সুতরাং বস্তু যেমন সৎ ও চিৎস্বরূপ, তেমনই আনন্দস্বরূপও বটে। প্রত্যেক বস্তুর এই যে মৌলিক স্বরূপ ইহাই বেদান্তের ভাষায় সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম। অর্থাৎ যেখানে যাহাকিছু আছে—তাহা সমস্তই ব্রহ্ম। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ 'বস্তু' বলিলে কোন একটি নির্দিষ্ট আকৃতি এবং নামের মাধ্যমেই বুঝিয়া থাকি। এই নাম ও রূপ বা আকৃতিই প্রত্যেকটি বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ করে, অপর হইতে তাহার পৃথগত্ব নির্দেশ করে। সুতরাং মূলীভূত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ এক হইলেও নাম ও রূপের গণ্ডির ভিতরে থাকিয়া প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। এই নাম ও রূপ বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে কল্পিত মাত্র, উহা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নহে। সুতরাং আমরা যাহাকিছু অনুভব করি তাহা মূলতঃ ব্রহ্মানুভব হইলেও সসীম ধারণার আওতায় পড়িয়া উহা খাঁটি ব্রহ্মানুভব নহে। যদি সমস্ত বস্তুর নাম ও রূপকে অতিক্রম করিয়া কিছু অনুভব করা যায় —তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে, সমস্ত বস্তুর স্বরূপতঃ একই সত্তা, একই ভাব। তখন আর আমি-তুমি ভেদবুদ্ধি থাকিবে না—কোন দেশ বা কাল বস্তু নির্ণয়ের পরিমাপক হইবে না। জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়বিশেষের ব্যবধান ঘুচিয়া সমস্তই তখন এক মহাজ্যোতির্ময় স্বরূপে প্রতিভাত হইবে। বেদান্তের এই চরম সিদ্ধান্তের মাপকাঠিতে স্বামীজীর জীবন বিশ্লেষণ করিলেই তাহার প্রকৃত পরিচয় জানা যাইবে।

প্রত্যেক মানুষের জীবন বিশ্লেষণ কেবলমাত্র তাহার কর্মের দ্বারাই সম্ভব। কারণ, কর্মই জীবনের প্রতিচ্ছায়া। অন্তরে যেই ভাব দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বাহিরের কর্মের ভিতর দিয়া তাহাই জগৎসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কোন একটি ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে বাহিরে তাহার অন্য রকম অভিব্যক্তি সাময়িকভাবে সম্ভবপর হইলেও জীবনের সমগ্র কর্মধারার মধ্যে উহা রূপায়িত হইবেই। কাজেই যেকোনও মানুষের সামগ্রিক কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণই প্রকৃতপক্ষে মানুষটিকে ঠিক ঠিক বুঝিবার উপায়।

স্বামীজীর কর্মধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বহুর মধ্যে ঐক্য দর্শনই তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির এমন পরিষ্কার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কোন দেশ বা জাতিবিশেষের প্রতি পক্ষপাতহীন মনোবৃত্তির ফলে স্বামীজীর কর্মধারা বিশ্বমানবের কল্যাণ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইয়াছিল—পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিরলসভাবে কল্যাণের মন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বীরসন্ন্যাসী বিশ্ববাসীর মনে এক আশ্চর্য ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিকল্প অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন সর্বত্যাগী এই মহাবৈরাগী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে, কাঞ্চনকৌলীন্য লোলুপতা, ঈশ্বরবিশ্বাসহীন পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রচর্চা, প্রকৃত ধর্মের সংস্রবশূন্য আচারপ্রধান ধর্মশ্রেয়ী সমাজের মধ্যে অবসাদকর বিভেদ, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা ও ঈর্ষার ফলে ব্যক্তিগত তুচ্ছ স্বার্থের প্রবল প্রেরণায় সমগ্র সমাজ ও জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। মানবতার অবমাননাকর এই অধঃপতনের সর্বনাশা পরিণাম হইতে উদ্ধার করিয়া এক সবল, উদারহৃদয় ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের অমোঘ শক্তিতে মহামহীয়ান মানবসমাজ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী মানবদরদী স্বামীজী বেদান্ত প্রতিপাদ্য অমৃতরসে সিঞ্চিত করিয়া এই ক্ষয়িষ্ণু মানবজাতিকে রক্ষা করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন।

মহামনীষী স্বামীজী ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, রোগের প্রতিকার করিতে হইলে রোগের মূল কারণ বিনষ্ট করিতে হইবে। সুতরাং পারস্পরিক বিদ্বেষ, ঘৃণা, আত্মাভিমান, দাম্ভিকতা এবং প্রবল ভোগতৃষ্ণার হাত হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে উহার মূল কারণ কি তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং সর্বতোভাবে তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। নিজেকে অপর সকলের কাছ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দেখার ফলেই মনের মধ্যে সংকীর্ণতা দানা বাঁধিয়া উঠে এবং সংকীর্ণতার ক্রমবর্ধমান পরিণতির বিকাশ ঘটে ভোগলিপ্সা প্রভৃতির মাধ্যমে। ভোগাভিলাষ যত প্রবল হইবে নিজের স্বার্থরক্ষার প্রয়াসও তত‌ই বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তাহারই পরিণামস্বরূপ বিস্তৃতি লাভ করিবে। নিজের সুখ লাভ করার জন্য, দুঃখের অবসান ঘটাইবার জন্য অনাদিকাল হইতে মানবসমাজ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে উহা যেমন তেমনই রহিয়াছে, বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমবিবর্তনের নিয়মানুসারে মানুষ উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে অনেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছে, এমন কি এই পৃথিবীর পরিদৃশ্যমান অংশটুকু পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করিয়া তাহার যাবতীয় রহস্য করায়ত্ত করিয়াও মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে নাই মহাকাশের অনন্ত রহস্যের সন্ধান লাভ করিবার উগ্র লালসায় গ্রহান্তরে যাত্রার জন্যও অনেক বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সর্বদা নিয়োজিত রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা এখন পর্যন্ত সমান ভাবেই চলিয়াছে। মৃত্যুর করালগ্রাসের কাছে অসহায়ভাবে মানুষ আজও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দুঃখ নিবৃত্তির নব নব উপায় যতই আবিষ্কৃত হইতেছে ততই জগতে আরও অনেক দুঃখের স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখ প্রতিকারের উপায় কি—ইহাই তো প্রধান জিজ্ঞাসা। মানবের এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তরই বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য। বেদান্ত বলেঃ 'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে জান, নিজের স্বরূপ উপলব্ধি কর, তাহা হইলে সমস্ত দুঃখ চিরতরে দূর হইবে—অসীম আনন্দের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে। নিজের স্বরূপে উপলব্ধি করিলেই দেখিতে পাইবে যে, উহা বিশ্বভুবনের স্বরূপ হইতে অভিন্ন, উহা অসীম, উহাই একমাত্র আনন্দময়। ঐ আনন্দময়ের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিলেই পরম পরিতৃপ্তি, সমস্ত দুঃখের চিরনিবৃত্তি ঘটিবে, আর তাহা করিতে না পারিলে বাহিরের কোন কিছুর সাহায্যেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ সম্ভব হইবে না।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

স্বামীজী এই সত্যই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেনঃ সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে, জগতে যে অশুভ দুঃখ আছে তাহার দিকে না চাহিয়া মিছামিছি সবই মঙ্গলময়, সবই সুখময় বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য,

এরূপ ভ্রান্ত সুখবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর দর্শন করিয়া।" (জ্ঞানযোগ, পৃঃ ২৬২)

এইভাবে সমস্ত বস্তুর ভিতরে অসীম আনন্দময় ঈশ্বরের অনুভূতি ঘটিলে সমস্ত ভেদবুদ্ধি দূর হইয়া যায়, সমস্ত সংকীর্ণতা উচ্ছিন্ন হওয়ায় হৃদয় নির্মল ও উদার হয় তখন সে মানুষকে কেবলমাত্র রক্তমাংস-অস্থি-মজ্জাবিশিষ্ট দেহধারী হিসাবেই দেখে না, বরং সচ্চিদানন্দময় ভগবানের একটি মূর্তিরূপেই অনুভব করে। বিশ্বহৃদয়ের সহিত একাত্মতা অনুভবের এই আদর্শ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল স্বামীজীর মধ্যে। সকলের মধ্যেই তিনি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—তাই তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বেদান্তশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করিবার ফলে বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জগৎকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন নাই, বরং সমগ্র জগৎই যে ব্রহ্মস্বরূপ ইহাই তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং জাগতিক মানবগোষ্ঠীর কল্যাণকামনা করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ কাজ করিয়াছেন।

বাস্তবিক অদ্বৈতবেদান্ত পরিদৃশ্যমান জগৎকে একেবারে আকাশকুসুমের মতো অসৎ বা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন নাই। "সম্মূলাঃ সোম্য ইমাঃ প্রজাঃ নেদং অমূলং ভবতি"—অর্থাৎ যাহাকিছু অনুভব করি—তাহার মূলে সদ্বস্তুই বিদ্যমান, এই বিশ্বসংসার একেবারে অমূলক নহে—ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। তবে যেই নাম ও রূপের সংমিশ্রণাত্মক অবস্থা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, তাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত হই—জীব-জগতের সেই রূপটিই বস্তুর একমাত্র রূপ নহে, উহা নশ্বর ও অপারমার্থিক—ইহাই বক্তব্য। জাগতিক বস্তুর এইরূপ যথার্থ পরিচয় দৃঢ়ভাবে জানিতে পারিলে বস্তুর অর্থাৎ নামরূপের সংমিশ্রণাত্মক অবস্থার অসারতা হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং পরম বৈরাগ্য উদিত হইয়া দেহমনের পরম শান্তি উপস্থিত হইবে, ইহাই বেদান্তের উদ্দেশ্য। কিন্তু এইরূপ পরম বৈরাগ্যের অর্থ সবকিছুকে অসৎ বলিয়া জানা নহে, নিজেকে তিলে তিলে শুষ্ক করিয়া আত্মহত্যা এই বৈরাগ্যের তাৎপর্য নহে। স্বামীজী বেদান্তের এই অর্থই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন: "বেদান্তের উদ্দেশ্যই এই সমুদয় বস্তুতে ভগবান দর্শন করা, তাহারা যেরূপ আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না দেখিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃতস্বরূপে জ্ঞাত হওয়া।" (জ্ঞানযোগ, পৃঃ ৩৭১) বেদান্তের এই পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার ফলে স্বামীজী বিশ্বভুবনে সমস্ত কিছুকেই ভালবাসিয়াছিলেন, বিশ্বজনহিতের জন্য অক্লান্তভাবে সমগ্র জীবনব্যাপী বেদান্তধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। এইভাবে স্বামীজীর সমগ্র জীবনধারা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন বহুমুখী কর্মপদ্ধতির মূলে রহিয়াছে অদ্বৈত বেদান্তের পরিপূর্ণ অনুভূতি, যাহার ফলে জগৎকে ত্যাগ করিয়া নহে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত যাবতীয় জগৎকে গ্রহণ করিয়া—পৃথিবীর বিচিত্র রূপ-রসের মধ্যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিয়াই তিনি অসীম বলে বলীয়ান হইয়াছিলেন। আচণ্ডাল সকলের মধ্যে এক পরিপূর্ণ আনন্দময়ের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়াই তিনি সমস্তকে পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই গ্রহণাত্মক মনোবৃত্তিরই পূর্ণবিকাশ তাঁহার মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠার ভিতরে। চিরযৌবনের পূর্ণপ্রতীক হইয়া তাই তিনি বিশ্ববাসীর অন্তরে রাজাধিরাজরূপে বিরাজমান। কবিগুরুর ভাষায় আজ তাই বলি—

"রাজা নহ তুমি হে মহাতাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়,
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিও,
রাজা নহ তুমি হে মহাতাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়॥"*

[সমাপ্ত]

* বিবেকানন্দ শত-দীপায়ন, বজবজ, ২৪ পরগনা, জানুয়ারি, ১৯৬৩, পৃঃ ২০৮-২১৩

সংগ্রহ: সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়

বেদান্ত-সাহিত্য

প্রসঙ্গ জীবন্মুক্তি

স্বামী অলোকানন্দ

ভারতীয় ঋষিগণ মুক্তিকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছেন। কারণ, মুক্তিতেই মানুষের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় এবং সে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হয়। তাছাড়া এই মায়িক জগৎ সুখ-দুঃখ মিশ্রিত। এ-জগতে সুখ এবং দুঃখ দুটোই জীবের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মানুষ কখনো দুঃখ চায় না। সে চায় দুঃখকে অতিক্রম করতে। আর মুক্তিলাভেই মানুষ সকল দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করতে পারে—এই হলো ঋষিগণের উপলব্ধি। এই জন্য মুক্তিই মানুষের পরম লক্ষ্য।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও সে-কথাই উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন: "মুক্তিই মানুষের চিরন্তন লক্ষ্য। যতদিন না মানুষ ঐ মুক্তিলাভ করিতেছে, ততদিন সে মুক্তি খুঁজিবেই। তাহার সমগ্র জীবনই এই মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র।" মুক্তি বলতে কি বুঝি? এবং সেই মুক্তিলাভের উপায় কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় মুক্তি হলো দেহেন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। কিন্তু অজ্ঞানবশে সে নিজেকে ক্ষুদ্র, জড় দেহ, মন, বুদ্ধির একটি পিণ্ড মনে করে। এই ভাবনার মধ্য দিয়েই তার ঔপচারিক সুখ বা দুঃখ-ভোগ। প্রকৃতপক্ষে সে নিত্যমুক্ত ব্রহ্মানন্দময়। অজ্ঞানবশতঃ জীব তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে না। এই অজ্ঞান থেকে অব্যাহতি লাভই মুক্তি।

শাস্ত্রে 'মুক্তি' শব্দটি দুটি পর্যায়ে দুটি নামে আখ্যায়িত। প্রথম—জীবন্মুক্তি অর্থাৎ ইহজীবনে বেঁচে থেকেই মুক্তির রসাস্বাদন। দ্বিতীয়—বিদেহ-মুক্তি অর্থাৎ দেহপাতানন্তর স্বরূপে বিলীন হওয়া।

মৃত্যুর পর কি হলো না হলো তা বলা যায় না। সুতরাং 'লভিতে মুক্তির স্বাদ' মুমুক্ষুর প্রচেষ্টা জীবন্মুক্তি সাধন। আচার্য শংকরও বলেছেন:

"জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারিতম্।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া॥"

জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী তুরীয়ানন্দ এই শ্লোকের অবতারণা করে একটি চিঠিতে লিখেছেন: "তখন বুঝিলাম যে, মনুষ্য-দেহধারণের উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—জীবন্মুক্তি-সুখপ্রাপ্তিই ইহার একমাত্র প্রয়োজন। বাস্তবিকই নিত্যমুক্ত আত্মা আর কোন কারণেই এই দেহধারণ করিতে পারেন না। দেহধারণ করিয়াও যে তিনি মুক্ত এই ভাব লাভ করিবার জন্যই তাঁহার দেহধারণ।" (স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ১৩৭০, পৃঃ ২৪১) সুতরাং এই সকল পরম জ্ঞানীদের বাক্য থেকে আমরা সহজেই জীবনের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি।

গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ বা গুণাতীতের লক্ষণ জীবন্মুক্ত পুরুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের বিবৃতিমাত্র। বাহ্য আকার আকৃতিতে বিশেষ ভিন্নতা না থাকলেও ব্যবহারে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা ভিন্নতা দেখা যায়। দেহেন্দ্রিয়ের আকর্ষণ না থাকায়, সমস্ত বাসনাগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তখন সেই মুক্তপুরুষের দেহখানি প্রারব্ধবশে পরিচালিত হয়। জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলতে 'বেদান্তসারঃ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: "জীবন্মুক্তঃ নাম স্বস্বরূপাখণ্ড(শুদ্ধ)-ব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞান-সাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে (সতি) অজ্ঞান-তৎকার্য-সঞ্চিতকর্ম-সংশয়-বিপর্যয়াদীনামপি বাধিতত্বাদ্ অখিল-বন্ধরহিতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।"

শ্রুতিও বলেন:

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"
(মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৮)

মুক্তিলাভের সাধন

এই মুক্তিলাভের উপায় কি? তার উত্তরে বলা যায়—সাধনা। এই জগতে সাধনা ব্যতীত কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না; সুতরাং মুক্তিরূপ

পরম পুরুষার্থ যে সাধনা ব্যতীত লভ্য নয় তা বলাই বাহুল্য।

জীবের মনে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সেই ক্ষুদ্র ইচ্ছা নিত্য আকাঙ্ক্ষার বারিসিঞ্চনে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়ে এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয় এবং জীবকে নিত্য-নতুন বন্ধনে আবদ্ধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: "শেঁকুল কাঁটার মতো এক ছাড়ে তো এক জড়ায়।" এই ইচ্ছাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় 'বাসনা' বলা হয়েছে। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য এই বাসনা-ক্ষয় প্রয়োজন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি" প্রভৃতি মন্ত্রে এষণাত্রয়-সন্ন্যাসের ওপর জোর দিয়েছেন। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণের উপশমপ্রকরণে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলছেন:

"বাসনাক্ষয়বিজ্ঞানমনোনাশা মহামতে।
সমকালং চিরাভ্যস্তা ভবন্তি ফলদায়িন।"

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ছোট একটি কথা "নির্বাসনা হলে এক্ষুণি হয়" বলে বেদান্তের সুউচ্চ বাসনাক্ষয়-তত্ত্ব আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন।

কিন্তু এই বাসনা তো একটি আধারে স্থাপিত। বাসনা যদি বুদ্বুদ হয় তবে তার আধার জল থাকবেই। আধার না থাকলে শূন্যে বুদ্বুদের অস্তিত্ব থাকে না। বাসনার আধার কি? বাসনার আধার হলো মন। মনে ক্ষুদ্র ইচ্ছার উদয় হয়। সুতরাং বাসনাক্ষয় করতে গেলে মনোনাশের প্রয়োজন। বৃক্ষের সম্ভাবনা যে-বীজে, সেই বীজ যদি দগ্ধ হয় তাহলে তাতে বৃক্ষের সম্ভাবনা থাকে না। তাই বাসনাক্ষয়ের জন্য মনোনাশ আবশ্যক। কিন্তু প্রশ্ন আসে, মনকে আমরা কিভাবে বিনাশ করব? পতঞ্জলি প্রভৃতি মহান মনোবিজ্ঞানীরা মনের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দিয়েছেন। চিত্তের বিবিধ বৃত্তিকে একমুখী করে অবশেষে "তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ।" এবং এই সাধনের জন্য তিনি নিত্য 'অভ্যাস ও বৈরাগ্যে'র কথা বলেছেন। উপনিষদে বিবিধ রূপকের মাধ্যমে মনের সংযমের কথা বলা হয়েছে। সর্বত্রই এই মনের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা জানানো হয়েছে। সুতরাং মনের শুদ্ধিতাই হলো মনের বিনাশ। অসংস্কৃত মন আমাদের অসার বস্তুর চিন্তায় নিমজ্জিত করে। শাস্ত্র ও আচার্যবাক্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা মন শোধিত হয় ও মন সদ্‌বস্তুর ভাবনা করে। পরব্রহ্মবিষয়ক চিন্তার দ্বারা জীবের মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক অপসৃত হয়। কঠ উপনিষদ্‌ (২।৩।১০) বলেছেন: যখন মন সহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্যভাবে অবস্থান করে, বুদ্ধিও বিচলিত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলেন।

এইভাবে মনোনাশের ভিত্তিতে বাসনাক্ষয় হলে জীব যে-অবস্থা লাভ করে তা-ই শাস্ত্রে 'পরমহংসত্ব' নামে আখ্যায়িত। 'পরম' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং 'হংস' শব্দের অর্থ আত্মা। সুতরাং পরমহংস হলো শ্রেষ্ঠ আত্মা। জীব অজ্ঞানবশে নিজেকে ক্ষুদ্র ভেবে নিত্য দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়েছিল, সাধনার সূত্রে সেই অজ্ঞানের খোলসকে ঝেড়ে ফেলে তখন তার স্বস্বরূপ-সিদ্ধি ও পরমানন্দ লাভ হলো। এই পরমানন্দ ইহজীবনে নিঃশেষে লাভ করে যে অবস্থিতি তা-ই জীবন্মুক্তি। এই জীবন্মুক্তির সুখলাভের জন্যই নিত্যমুক্ত আত্মার দেহধারণ।

জীবন্মুক্তি, পরমমুক্তি, ক্রমমুক্তি ও নির্বাণমুক্তি

শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় মুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। যদিও সকল স্থলেই মুক্তি শব্দটি দেখা যায়, তথাপি তাদের ক্রিয়াতে পার্থক্য রয়েছে। এই হিসাবে চার প্রকার মুক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়—জীবন্মুক্তি, পরমমুক্তি বা বিদেহমুক্তি, ক্রমমুক্তি ও নির্বাণমুক্তি।

জীবন্মুক্তি

মুমুক্ষুর হৃদয়স্থ জন্মান্তরীণ সংস্কাররাশি যখন সমূলে উৎখাত হয়, সাধক যখন নিঃশেষে দেহে অহং-মমতা পরিত্যাগ করেন তখন তিনি শরীরবান হয়েও অশরীরত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শাস্ত্রে বলা হয়: "তদ্‌ যথা অহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবমেবেদং শরীরং শেতে, অথ অয়ম্‌ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ ব্রহ্ম এব তেজঃ এব"—যেমন প্রাণহীন সাপের খোলস উইঢিবিতে পড়ে থাকে তেমনই ব্রহ্মজ্ঞের এই দেহ পড়ে থাকে। অতঃপর ইনি অশরীর, অমৃত, প্রাণ, ব্রহ্মস্বরূপ, তেজঃ-

স্বরূপই হয়ে থাকেন। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।৭) শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: "পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হয়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু তাতে তরবারের কাজ আর হয় না।" (কথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ১৩৮) জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর থাকলেও শরীরে আত্মাভিমানরাহিত্য-হেতু অশরীরত্বই সম্পাদিত হয়। আচার্য শঙ্কর এরূপ পুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

"বিস্মৃত্য স্থূলসূক্ষ্মপ্রভৃতিবপুরসৌ
সর্বসঙ্কল্পশূন্যো
জীবন্মুক্তস্তুরীয়ং পদমধিগতবান্
পুণ্যপাপৈর্বিহীনঃ।"
(বেদান্তকেশরী ৪৪)

—স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি শরীর বিস্মরণপূর্বক, সর্ব-সঙ্কল্পবিযুক্ত, পাপপুণ্যবিহীন জীবন্মুক্ত পুরুষ তুরীয়পদপ্রাপ্ত হন।

পরমমুক্তি

পরমমুক্তি অর্থে শাস্ত্রে বিদেহমুক্তিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। জীবন্মুক্ত সাধক দেহপাতানন্তর প্রারব্ধের অন্তর্গত দেহ থেকে বিমুক্ত হয়ে চরমতম মুক্তিলাভ করেন। কঠ উপনিষদেও এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

"পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥"
(২।২।১)

—জন্মরহিত নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মার একাদশ দ্বার-যুক্ত একটি নগর আছে। সেই নগরস্বামীর ধ্যান দ্বারা লোক শোকাতীত হয় এবং এই দেহে মুক্তিলাভ-পূর্বক দেহপাতান্তে পুনর্জন্মরহিত হন।

ক্রমমুক্তি

নিত্য, একরস আত্মা সাত্ত্বিক অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিফলিত হন। তিনি দেহমাত্রাবৃত হলেও দেহের ধর্ম বাল্যবার্ধক্যাদি দ্বারা অনভিভূত থাকেন এবং উত্তম গতিলাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। এইরূপ সত্যসঙ্কল্প, সুনিপুণমতি এবং দেবত্বলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণের সহিত ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন। এই বিষয়ক শ্রুতিবচনও আছে—"যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি। সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।"

নির্বাণমুক্তি

জীবন্মুক্ত সাধকের কামনারাশি অস্তগত হওয়ায় তিনি অকাম হন এবং নিরতিশয় সুখলাভের নিমিত্ত কেবলমাত্র আত্মারই কামনা করেন। অতঃপর আত্মার প্রাপ্তিবশতঃ আপ্তকাম অবস্থায় অবস্থান করেন। এরূপ সাধকের শরীর ত্যাগ হলেও তাঁর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। তিনি নির্বাণমুক্তি লাভ করেন। তখন তাঁর কি গতি হয়? তদুত্তরে আচার্য শঙ্কর বলেন—"জীবো বিলীনো লবণমিব জলেঽখণ্ড আত্মৈব পশ্চাৎ॥"—জীব জলে লবণের ন্যায় বিলীন হয়ে যায় এবং অখণ্ড আত্মাই বিদ্যমান থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় এই তত্ত্ব জ্ঞাপন করে বলেছেন: "একটা নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল।" (কথামৃত, পৃঃ ১১২)

জীবন্মুক্তের ব্যবহার

চারপ্রকার মুক্তির কথা আলোচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রধান ও দুঃসাহসিক লাভ হলো জীবন্মুক্তি। গীতায় অর্জুনোক্ত "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা"র উত্তরে শ্রীভগবান যা বলেছেন তা অল্পবিস্তর সর্বজনবিদিত। আচার্য শঙ্কর 'বেদান্তকেশরী' প্রকরণ গ্রন্থে জীবন্মুক্তের আচরণ সম্বন্ধে বলেছেন:

"কঞ্চিৎ কালং স্থিতঃ কৌ পুনরিহ
ভজতে নৈব দেহাদিসঙ্ঘং
যাবৎ প্রারব্ধভোগং কথমপি স সুখং
চেষ্টতেঽসঙ্গবুদ্ধ্যা।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যশুদ্ধো
বিগলিতমমতাহংকৃতির্নিত্যতৃপ্তো
ব্রহ্মানন্দস্বরূপঃ স্থিরমতিরচলো
নির্গতাশেষমোহঃ॥" (৯৬)

—জীবন্মুক্ত কিছুকাল পৃথিবীতে অবস্থান করেন, কিন্তু দেহাদিতে অভিমানী হন না। যতকাল প্রারব্ধভোগ থাকে ততকাল অসঙ্গভাবে সুখে ব্যবহারাদি করে থাকেন। কারণ তিনি দ্বন্দ্বরহিত, নিত্যশুদ্ধ, অহং-মমাভিমানরহিত, নিত্যতৃপ্ত, ব্রহ্মানন্দ-

স্বরূপ, স্থিরমতি, অচল এবং নিঃশেষে সকলপ্রকার মোহশূন্য হয়েছেন।

জীবন্মুক্তিবিবেকঃ : গ্রন্থ ও রচয়িতা

জীবন্মুক্তের লক্ষণ, সাধনাদি বিবিধশাস্ত্রে ছড়িয়ে ছিল। মুমুক্ষু সাধকের সুবিধার্থে পণ্ডিতপ্রবর, বিদগ্ধসাধক, বিদ্যারণ্য মুনি সযত্নে সেগুলি সংগ্রহ করে একটি মালার আকারে যে-গ্রন্থে উপস্থাপিত করেন তাই 'জীবন্মুক্তিবিবেকঃ' নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটি শুধুমাত্র শাস্ত্রবাক্যের সংগ্রহ নয়, তাঁর সাধনানুভূতির রসেও সঞ্জীবিত। প্রতিটি বাক্য যুক্তি ও প্রোজ্জ্বলা অনুভূতির সংমিশ্রণে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠেছে।

জীবন্মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে তিনি এককথায় সন্ন্যাসকেই নির্দেশ করেছেন। সন্ন্যাসের দুটি বিভাগ নির্দেশ করে গ্রন্থারম্ভে তাদের হেতুও ব্যাখ্যা করেছেন। "বক্ষ্যে বিবিদিষান্যাসং বিদ্বন্ন্যাসং চ ভেদতঃ। হেতু বিদেহমুক্তেশ্চ জীবন্মুক্তেশ্চ তৌ ক্রমাৎ॥"—অর্থাৎ বিবিদিষা ও বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রভেদ বলছি। এদের মধ্যে বিবিদিষা সন্ন্যাস বিদেহমুক্তির এবং বিদ্বৎসন্ন্যাস জীবন্মুক্তির হেতু।

সাধনপথে অণিমাদি সিদ্ধি মোক্ষের পক্ষে প্রতিবন্ধক—এ-কথা পতঞ্জলি প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করেছেন। বিদ্যারণ্য তাঁর 'জীবন্মুক্তিবিবেকঃ' গ্রন্থে মোক্ষ ব্যতীত সকল প্রকার সিদ্ধিকে হেয় করেছেন। তিনিও এগুলিকে সাধনপথের অন্তরায় বলে স্বীকার করে তাদের প্রতি বৈরাগ্য অবলম্বনের জন্য সাধককে উৎসাহিত করেছেন।

বিদ্যারণ্য স্বামী জীবন্মুক্তিসিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করতে পাঁচটি প্রয়োজন উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হলো—(১) জ্ঞানরক্ষা, (২) তপঃ, (৩) সার্বজনীন প্রেম, (৪) দুঃখত্রয়ের বিনাশ, (৫) আত্যন্তিক সুখ ও আনন্দপ্রাপ্তি।

গ্রন্থটিতে পাঁচটি প্রকরণ রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রকরণই বিবিধ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রবাক্যে সমৃদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ। এই পাঁচটি প্রকরণ হলো: (১) জীবন্মুক্তি-প্রমাণপ্রকরণ, (২) বাসনাক্ষয়প্রকরণ, (৩) মনোনাশপ্রকরণ, (৪) স্বরূপসিদ্ধিপ্রয়োজন-প্রকরণ, (৫) বিদ্বৎসন্ন্যাসপ্রকরণ।

এই গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত শাস্ত্রবাক্যসমূহের আকর গ্রন্থতালিকা এখানে পাঠকের সুবিধার জন্য দেওয়া হলো: পরাশরস্মৃতি, মনুস্মৃতি, যমস্মৃতি, বশিষ্ঠস্মৃতি, দক্ষস্মৃতি, বিষ্ণুস্মৃতি, শঙ্খস্মৃতি, আপস্তম্বস্মৃতি, অত্রিস্মৃতি, বৌধায়নস্মৃতি, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ছান্দোগ্য উপনিষদ্, কঠ উপনিষদ্, মুণ্ডক উপনিষদ্, মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, জাবাল উপনিষদ্, পরমহংস উপনিষদ্, আরুণি উপনিষদ্, বাজসনেয়ী উপনিষদ্, গীতা, গৌড়পাদাচার্যের মাণ্ডুক্যকারিকা, যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, উপদেশসাহস্রী, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, মহাভারত, ভাগবত, যোগসূত্র, বেদান্তসূত্র, সূতসংহিতা, মেধাতিথি, বিষ্ণুপুরাণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, আর্যপঞ্চাশী, কাবষেয়গীতা, বাল্মীকি-রামায়ণ, যোগবার্তিক, লীলোপাখ্যান।

গ্রন্থকারের জীবনকাহিনী নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় তিনি বিজয়নগররাজ বুক্কের মন্ত্রী ছিলেন। কোন কোন মতে তাঁর পূর্বনাম সায়ন, আবার কোন মতে মাধব। কোন মতে তাঁর ভ্রাতার নাম বেদব্যাখ্যাকার সায়ন, তাঁর নাম মাধব। মাধব উত্তরকালে ৮৫ বছর বয়সে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ বিদ্যাতীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিদ্যারণ্য মুনি নামে পরিচিত হন। তিনি ১৩৭৭-১৩৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। অবশেষে ১৩৮৬ খ্রীস্টাব্দে ৯১ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর অপূর্ব মনীষা, গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞাসমুজ্জ্বল সাধনজীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে। যদিও তাঁর রচনা নিয়ে মতভেদ রয়েছে তথাপি এতাবৎকাল পর্যন্ত পঞ্চদশী, জীবন্মুক্তিবিবেক, শঙ্করদিগ্বিজয়, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ এবং অপরোক্ষানুভূতির টীকা তাঁর নামেই প্রচলিত।

পরের সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যারণ্য মুনির 'জীবন্মুক্তিবিবেকঃ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হবে। অনুবাদক: স্বামী অলোকানন্দ।—যুগ্ম সম্পাদক

চাকা

একটা চাকা। মাঝখানে একটা গোলাকার বেড়। সেখান থেকে চারপাশে ছড়িয়ে গেছে তিরিশটা স্পোক বা দণ্ড। কেন্দ্রের ঐ শূন্য গোলাকার অংশটাই কিন্তু সব। কিছুই নেই অথচ চাকার সমস্ত আকার, উৎস, শক্তির নির্ভরস্থল। ওটা না থাকলে চাকাটাই নেই। এইবার আসি মাটিতে। মাটি থেকে কুম্ভকার তৈরি করলেন বিশাল এক জালা। ভিতরটা শূন্য। কিছুই নেই। অথচ ঐ শূন্য স্থানটুকুই জালার সব—জালার প্রয়োজনীয় অংশ। ঐ শূন্যতাটুকুর জন্যেই জালার নির্মাণ। এখন একটা ঘর। তার একটা দরজা ও দুটো জানালা। শূন্যস্থান। অথচ ভয়ংকর প্রয়োজনীয়। দরজা না থাকলে ঘরে ঢোকাও যাবে না, বেরনোও যাবে না। জানালা না থাকলে বাতাস আসবে না। ঘর হয়ে যাবে কফিন। লাওৎসের কথায়ঃ

> Therefore profit comes from
> what is there ;
> Usefulness from what is not there.

যা নেই সেইটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। আমার লিভার আছে, পিলে আছে, ফুসফুস আছে, আছে হৃদয়। এদের দ্বারা আমি লাভবান। খাই-দাই, হজম করি, শ্বাস-প্রশ্বাস চলে অবিরত। আমি বাঁচি। কিন্তু আমার ভিতরে যে-শূন্যতা, সেই শূন্যতাই আমার প্রয়োজনীয় অংশ। সেখানেই বসে আছেন আমার ঠাকুর। সেখানেই ওঠে চিন্তার তরঙ্গ। ঐটাই আমার ধর্ম। আমার নিরাকার ঈশ্বর।

ঠাকুর বললেনঃ 'আমি ঘট'। বাইরের পাতলা আস্তরণটি হলো মায়িক অহংকার। তার একটা নাম আছে। নামরূপ। সামাজিক পরিচয় আছে। অমুকের বাবা, অমুকের ছেলে। অবস্থা-ভেদ আছে। বড় লোক, গরিব লোক। উপাধি আছে। 'আমি-ঘট'-এর এই হলো মৃত্তিকা-আবরণ। 'আমি'-র ভঙ্গুর আবরণ ভেঙে দাও। কি রইল? এই প্রশ্নই ঐ শূন্যতা। ঠাকুরই এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন—অনন্ত এই প্রশ্নের। ঠাকুর নিজেই একদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন। শ্রীম লিখছেনঃ "হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে দেখাইয়া নিজের বুকে হাত দিয়া মণিকে বলিতেছেন, 'আচ্ছা এতে কিছু আছে, তুমি কি বল?' তিনি অবাক হইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন।" নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিচ্ছেন বড় করে, ব্যাপক করে, সর্বজীবোপযোগী করে—"যেমন অনন্ত জলরাশি, ওপরে নিচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে জলপরিপূর্ণ। সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল; কিন্তু তবুও কুম্ভটি আছে। 'আমি'-রূপ কুম্ভ।" তারপর। "ব্রহ্ম যেন সমুদ্র—জলে জল। কুম্ভের ভিতরে বাহিরে জল। জলে জল। তবু কুম্ভ তো আছে। ঐটি ভক্তের আমির স্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে, আমি তুমি আছে; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত, তুমি প্রভু, আমি দাস; এও আছে।"

ঠাকুর অহংকারী 'আমি'-টাকে সরিয়ে নিয়ে 'ভক্ত আমি', 'দাস আমি'কে বসালেন। তবেই না বোঝা যাবে, শূন্যতা শূন্যতা নয়। দেহ-যন্ত্রের ঊর্ধ্বে সেইটাই সব। এইবার ঠাকুর ঘটটিকে ভেঙে

দিলেন। প্রথমে জাগালেন বোধ। আমি-তুমির বোধ। লীলা আস্বাদন। "সচ্চিদানন্দ সাগর। তার ভিতর 'আমি' ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল —ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে এক ভাগ। ঘট ভেঙে গেলে—এক জল—তাও বলবার জো নাই।—কে বলবে?"

কেন এই প্রশ্ন? কারণ, ঠাকুর বলছেন: 'আমি' গেলে জীবের রইলটা কি? স্মৃতি-শ্রুতি-বোধ সবই তো চলে গেল। ঐ অনুভূতিটুকু নেবে কে। সমাধিস্থ হলে 'আমি' মুছে যায়। সাধারণ মানুষ সমাধি থেকে ফিরে আসতে পারে না। নেমে আসতে পারেন একমাত্র অবতার পুরুষ। ঠাকুরের সেই গল্প —খাড়া একটা পাঁচিল, ওপাশে কি আছে, সকলেরই ভীষণ কৌতূহল। পাঁচিল বেয়ে এক-একজন উঠছে আর হাহা করে হাসতে হাসতে ওপাশে লাফিয়ে পড়ছে। কেউই ফিরে এসে বলছে না, সে কি দেখেছে।

সংসার-প্রান্তরে আমাদের জীবনের চাকা গড়িয়ে চলুক। কেন্দ্রগত শূন্যস্থানটিই যে চাকার নির্ভরতা সেই বোধটুকু যেন থাকে। সেইটাই হলো বিশ্বাস, যা চোখে দেখা যায় না। আত্মগত এক অনুভূতি। এই যে গাড়ির টায়ার। ভিতরের বাতাসটুকুই তার শক্তি। ভালভ খুলে দিলেই তা ফুস করে বেরিয়ে যাবে। মিশে যাবে প্রকৃতিতে। টায়ার হয়ে যাবে ফ্ল্যাট। নেতিয়ে পড়বে। বিশ্বাস হলো জীবন-টায়ারের বাতাস। শক্তি। চালিকা-শক্তি। মানুষকে ধরে রেখেছে। কিছুই নয়। কোন দামও নেই, অথচ সর্বকিছু। জীবনের চাকায় কর্মের স্পোক, কেন্দ্রে বৃত্তাকার শূন্যতা। সেইটাই হলো বিশ্বাসের পীঠস্থান। ভগবৎ বিশ্বাস। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ্বাস। নিরাকার উপস্থিতি।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বলরাম মন্দির ঃ পুরনো কলকাতার একটি ঐতিহাসিক বাড়ি

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজের একটি অনুপম ছবি এঁকেছেন চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ঃ "বলরাম মন্দিরে বাস করিবার সময়ও তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই একাকী থাকিতেন। কেবল সকাল ও সন্ধ্যার পর ভক্তসঙ্গে নানাবিধ আলাপ ও আলোচনা করিতেন। আলাপ ও আলোচনার সময় লাটু মহারাজকে প্রায়ই আলাদা মানুষ বলিয়া বোধ হইত। সেসময় তিনি অত্যন্ত মুখর হইয়া উঠিতেন—একবার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তিনি অপরকে কথা বলিবার আর সুযোগ দিতেন না। কিন্তু যেদিন তিনি কথা বলিতে চাহিতেন না, সেদিন অপরে হাজার প্রশ্ন করিলেও তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। সেই সময় তাঁহাকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বলিতেন যে, লাটু মহারাজ বড় dull and grave—অর্থাৎ অসম্ভব গম্ভীর প্রকৃতির সাধু। কিন্তু অপর সময় যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে, লাটু মহারাজের মতন প্রাণখোলা দরদী সাধু বিরল। আপনভাবে বিভোর থাকিলে লাটু মহারাজ গম্ভীর হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কেহ সেই গাম্ভীর্যের বর্ম ভেদ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিতেন, তিনি লাটু মহারাজের অন্তরের প্রীতি ও করুণায় অভিস্নাত হইবার সুযোগ পাইতেন।"[৮৬]

বলরাম মন্দিরে থাকাকালীন কয়েকটি ঘটনায় লাটু মহারাজের অদ্ভুত মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার এক মাতাল লাটু মহারাজের কাছে এসে জনৈক ভক্তকে খুব গালাগাল দেয়। তাতে ভক্তটির সঙ্গী খুব উত্তেজিত হয়ে মাতালকে মারতে উদ্যত হয়। তা দেখে লাটু মহারাজ ভক্তগণকে বলেছিলেন ঃ "দেখ! ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছে, আর তোমরা যে মদ না খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছ! কার শাস্তি হওয়া উচিত বলতো। ওকে আর তোমরা কি মারবে, মদই ওকে মেরে রেখেছে, ওর বিবেকের নাশ করে দিয়েছে। দু-এক ঘা মারলেই কি মারা হলো? আসল মারে ও তো মরে আছে! আবার কি মারবে?"[৮৭]

রোমের এথিস্ট সম্প্রদায়ের দুটি মেম বলরাম মন্দিরে এসেছেন। তাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী নন, কিন্তু পরোপকারে বিশ্বাস করেন। শুনেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের পরোপকার-ব্রতের কথা। এই আলোচনা করতে তাঁরা এসেছেন বলরাম মন্দিরে। লাটু মহারাজের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা হলো। দোভাষীর কাজ করেছিলেন চন্দ্রশেখরবাবু। মেমদের বক্তব্য ঃ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁরা একমত। তাঁদের আপত্তি—মিশন পরোপকারের চেয়ে ভগবানকে বড় করেন। তাঁদের ধারণা—ভগবান অদৃশ্য, আছেন কিনা প্রমাণ নেই। এরূপ অজানা পদার্থে কেন বিশ্বাস রেখে মিশন পরোপকার করতে যান? লাটু মহারাজের উত্তর ঃ ভগবানকে বাদ দিয়ে পরের উপকার লোকে বেশিদিন করতে পারে না। দু-চার বছরের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে, পরের উপকারে কি লাভ? আর প্রশ্ন উঠলেই উপকার করতে বেজার লাগে। পরের উপকারে কর্মীকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ভগবানকে না মানলে পরের জন্য ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্তি আসে না।

মেম-দুটি লাটু মহারাজের যুক্তি হেসে উড়িয়ে দিলেন। তখন লাটু মহারাজ মেমদের তাঁর কথায়

[৮৬] শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৯৩

[৮৭] ঐ, পৃঃ ২৯৯

অবিশ্বাস দেখে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন তাঁদের: পরের উপকার কেন করে? পরের কল্যাণে কাদের লাভ? কর্মী কেন পরের জন্য খাটবে? কর্মীর স্বার্থ কোথায়? মেমদের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে লাটু মহারাজ বললেন: "আপনারা যা বলছেন তার চেয়েও বড় কর্তব্য হচ্ছে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা। ভগবানলাভই হচ্ছে জীবের একমাত্র মহান উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যে চেষ্টা করে সেই তো বাহাদুর। পরের উপকার করা, এত সমাজ-ব্যাপারের কথা। এখানে ভগবান লাভের ব্যেপার কৈ? আবার দেখুন, পরের উপকার যে করবেন, তাতে পরেরই লাভ হবে, নিজের লাভ কুথায়? আপনার কল্যাণ হোলে হামার মঙ্গল হবে, এমন যুক্তি কেমন কোরে দিচ্চেন, বুঝিয়ে দিতে পারেন?" এই শুনে মেম দুটি অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তখন লাটু মহারাজ তাঁদের "ভগবানকে মানলেই আর আপন-পর ভেদ থাকে না, তখন পরও যে আপন—এ বিশ্বাস এসে যায়" কথাটি সুন্দর-ভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

তখনো বড় মেমটির সন্দেহ থেকে গেল কিভাবে সকলে ভগবানের অংশ হয়। লাটু মহারাজ বললেন: এ যুক্তি নয়, এটা সত্য। নাম ও রূপে ফারাক মাত্র। উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন—একই সোনাতে ঘট, থালি ও আঁটি হচ্ছে। এতে বড় মেম প্রমাণের প্রশ্ন তুললেন। উত্তরে লাটু মহারাজ জোর দিয়ে বললেন যে, প্রমাণ পেয়েছেন। বললেন: "ভালবাসা কি কেউ অপর কাউকে বুঝাতে পারে? যে ভালবাসে সে বুঝে, আর যাকে ভালবাসে সেও বুঝতে পারে—বাহিরের লোক বুঝতে পারে কি?" তখন বড় মেমটি লাটু মহারাজের যুক্তি মানলেন। ছোট মেমটি প্রশ্ন করলেন: "ধরুন। কেউ ভগবান মানলে না, কিন্তু পরোপকার করে গেল, এতে তার কল্যাণ হবে তো?" লাটু মহারাজ বললেন: "দেখুন। যেকোন একটা কাজ করলেই তার কর্মফলের সৃষ্টি হতে থাকে, সেই (পরোপকারের) কর্মফলে জীবের সামাজিক কল্যাণ হয়, বাকি জীবের অহংকার থাকার জন্যে তার আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় না। কেনো না, অহংকারের ব্যেপারে শুভ কর্মফলও বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়। সকাম সেবা করে কেউ কর্মচক্র হোতে রেহাই পেতে পারে না, বাকী নিষ্কাম সেবা করলে কর্মের বন্ধন থাকে না—তাতে জীব মুক্তি পায়।" এতে ছোট মেম বললেন: নিষ্কামভাবে সেবা করতে কাউকে দেখা যায় না। সকলেই সকামভাবে পরোপকার করে। তাতে লাটু মহারাজ যুক্তি দিয়ে মেমকে বোঝানোর পর বললেন: "যে পরকে ভাল-বাসে সে সেই ভালবাসার সেবাকে অবলম্বন কোরেই ভগবানের কৃপা পেয়ে যায়। পরও যে ভগবানেরই সন্তান।" লাটু মহারাজের কথাগুলি মেমদের মনে দাগ কেটেছিল। পরে তাঁরা চন্দ্রশেখরবাবুকে এ-বিষয়ে চিঠি লিখেছিলেন। বিদায়কালে লাটু মহারাজ তাঁদের দুটাকার আম কিনে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।[৮৮]

একবার কামপাল মিশ্র নামে এক উড়িয়া যুবক আইন পরীক্ষা দেবার জন্য বলরাম মন্দিরে এসেছিল। বি. এ.-তে কামপাল দর্শনশাস্ত্র পড়েছিল। সে প্রায়ই স্পেনসার, কান্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত উত্থাপন করে তর্ক করত। একদিন বলরামের পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর সঙ্গে তার ঘোরতর তর্ক বাঁধে। মীমাংসার জন্য উভয়েই লাটু মহারাজের কাছে এল। লাটু মহারাজ দু-একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে তর্কের মীমাংসা করে দেন। সেদিন থেকে কামপাল লাটু মহারাজের ওপর আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[৮৯]

॥ ১১ ॥

বহু পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত ভগবৎলীলাক্ষেত্র বলরাম মন্দিরের ভবিষ্যৎ রক্ষণের ব্যবস্থা করে যান বলরামের সুযোগ্য ভক্তিমান পুত্র রামকৃষ্ণ বসু। তিনি তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে (রামকৃষ্ণ বসুর দেহত্যাগ হয় ১৪ মে ১৯২০) একটি উইল তৈরি করে বলরাম মন্দির বেলুড় মঠকে দিয়ে যান। সেই উইলে তিনি নির্দেশ দিয়ে যান একটি ট্রাস্ট ডীড গঠন করার। উইলে তিনি উল্লেখ করেন যে, যতদিন না তাঁর (রামকৃষ্ণ বসুর) পত্নী সুশীলাবালা দেবীর মৃত্যু হয়, ততদিন পর্যন্ত তাঁকে বলরাম মন্দিরে থাকতে দিতে হবে। আর সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও

৮৮ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩১০-৩১৩

৮৯ ঐ, পৃঃ ৩৩০

মিশনের সাধুরাও থাকবেন এবং তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও করতে পারবেন। এই উইলের শর্তানুযায়ী একটি ট্রাস্ট ডীড তৈরি হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ। ট্রাস্টীরা ছিলেন রামকৃষ্ণ বসুর বিধবা পত্নী সুশীলাবালা, রবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, সুধাংশুশেখর কর, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ। এই ট্রাস্ট ডীড রেজেস্ট্রিকৃত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই।[১০] ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ছিল : (১) বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের স্মৃতিরক্ষণ ; (২) বেলুড় মঠের যেকোন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা ধার্মিক ভক্তের বলরাম মন্দিরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ; (৩) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সংগঠন করা।

এই শর্তানুযায়ী বলরাম মন্দিরের সামনের অংশটি মঠ-মিশনের সাধুরা ব্যবহার ও ধর্মীয় পাঠ-আলোচনাদি করতেন। কিন্তু ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুশীলাবালা দেবীর পোষ্যপুত্র পার্থসারথিবাবু (রামকৃষ্ণ বসু-সুশীলাদেবীর একমাত্র পুত্র হৃষীকেশ অল্প বয়সে মারা যান) বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা করেন। তিনি বলরাম মন্দিরের পূর্ণ অধিকার ও কর্তৃত্বের দাবি করেন। এই দীর্ঘমেয়াদী মামলার নিষ্পত্তি হয় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি। হাইকোর্টের রায় বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে যায়। বলরাম মন্দিরের অধিকার বেলুড় মঠের অধীনে আসে। বর্তমানে বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক হলেন যথাক্রমে বলরাম মন্দির ট্রাস্টের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক। বেলুড় মঠের আরো দুজন ট্রাস্টী হলেন বলরাম মন্দির ট্রাস্টের ট্রাস্টী।[১১]

॥ ১২ ॥

বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপনের প্রস্তুতি-পর্বের একটি অধ্যায় সংগঠিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুর্দম বেগশালী নব ধর্মস্রোতের অনুশীলন পর্বের পীঠভূমি বলরাম মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের নবপ্রাণ প্রকাশের প্রচার-ক্ষেত্র বলরাম মন্দির। স্বয়ং ভগবানের লীলাভূমি বলরামের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ-জননী শ্রীমা সারদাদেবীর 'আপনঘর' বলরাম মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদবৃন্দের দিব্য ভাব ও প্রসঙ্গের স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়েছিল এখানে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের আশ্রয়স্থল বলরাম মন্দির। বলরাম মন্দির আজ সারা দেশ ও জাতির গৌরবের ধন ; বলরাম মন্দির আমাদের জাতীয় সৌধ, ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু।

বলরামবাবুর পুত্রবধূ এবং রামকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী সুশীলাবালা দেবী বলেছেন : "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্য ও গৃহী ভক্তগণের পূত সংস্পর্শে বলরাম মন্দির মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই ঠাকুরের সন্তানদের অপার স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহারাজরা দীর্ঘকাল এ-বাড়িতে থাকায় আমরা এখানে বসিয়াই তাঁহাদের কত ভজন, কীর্তন ও সদুপদেশ শোনার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি। তখন মনে হইত যেন আনন্দধামেই সর্বদা বাস করিতেছি। আজ বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে।"[১২]

[সমাপ্ত]

১০ Registered in Book I, Volume No. 76, pages 160 to 175 being No. 2958 for the year 1922 by the District of Assurance, Calcutta.

১১ ক. বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ : শতবর্ষের আলোকে, পৃঃ ৩৮

খ. বলরাম মন্দির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষিত ফাইল থেকে প্রাপ্ত।

গ. বলরাম মন্দির ট্রাস্টের বর্তমান ট্রাস্টীগণ—স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী গহনানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ এবং স্বামী সত্যঘনানন্দ।

ঘ. বর্তমানে বলরাম মন্দিরের নিচের পুরো অংশ ও সামনের দোতলার অংশটি সম্পূর্ণ বেলুড় মঠের অধীন। ওপরের দোতলার অংশে এখনো বসু-পরিবার বাস করেন। পার্থবাবুকে পোষ্যপুত্র নেন রামকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী সুশীলাবালা দেবী। সুশীলাবালা দেবীর মৃত্যু হয় ২৩।১১।১৯৭০ তারিখ।

১২ বলরাম মন্দিরে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৭৩-৭৫

জগদম্বার বালক

প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রীমা সারদাদেবী বলছেন: "পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি। সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। কখনও বাপু নিরানন্দ দেখিনি।"[১] "হাসি, কথা, গল্প, কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকত।"[২] "আমায় আর কি [ঠাট্টা করতে] দেখছ, ঠাকুরকে তো দেখেছ! তাঁর কথা আর ফুরুতে চাইত না, এত কথাও জানতেন।"[৩] এত সুন্দর করে আর কোন ভাষাতেই আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা বোধকরি দেওয়া যায় না। সরসতা ও কৌতুকে পরিবেশকে তিনি করে তুলতেন প্রাণোচ্ছল, আধ্যাত্মিকতার গুরুগম্ভীর বিষয়কে সহজ ও মাধুর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপিত করতেন ভক্তজনের কাছে। অশ্বিনীকুমার দত্ত একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন: "আপনি মজার লোক, আপনার কাছে মজা খুব।"[৪] সত্যি কথাই বলেছেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নিজে মজা করতে জানতেন, তেমনই মজায় মাতাতেনও সকলকে। কথায় তাঁর সাথে পারা যেত না। প্রত্যুত্তরে প্রচণ্ড প্রত্যুৎপন্নমতি। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের কাশি হয়েছে। ডাক্তার সরকার দেখতে এসেছেন। বললেন: "আবার কাশি হয়েছে? (সহাস্যে) তা কাশীতে যাওয়া তো ভাল।" হাসিমুখে শ্রীরামকৃষ্ণের তৎক্ষণাৎ উত্তর: "তাতে তো মুক্তি গো। আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই।"[৫]

আর একটি চিত্র: "একজন হিন্দুস্থানী ভিখারি গান গাইতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা দুই একটি গান শুনিলেন। গান নরেন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেন, 'আবার গাও।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ—থাক্ থাক্। আর কাজ নাই, পয়সা কোথায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই তো বল্লি!

"ভক্ত (সহাস্যে)—মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন—(সকলের হাস্য)।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।"[৬]

ব্যক্তিচরিত্রের অসঙ্গতি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্য করেন। সে-রসিকতা উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে কৌতুকের স্পর্শ দিয়ে যায়। বিষয়ী লোকের কার্পণ্য প্রসঙ্গে তাঁর সরস মন্তব্য: "এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদু'র মা তাই বলে, 'অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে; বাবা, তোমার উটি নাই।' বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়।

"এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের বসে শোনবার ভারী ইচ্ছা। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখলে যে, আসরে প্যালা পড়ছে, তখন সেখান থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান করে জানতে পারলে যে, এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারী ভিড় হয়েছে। সে দুই হাতে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত।

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ (১৩৮৫), পৃঃ ৪৬

২ ঐ, ১ম ভাগ, ১৩৮৭, পৃঃ ১00

৩ শ্রীমা—আশুতোষ মিত্র, কলকাতা, ১৯৪৪(?), পৃঃ ৫0

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১। পরিশিষ্ট।২ ৫ ঐ, ৩।২১।৩ ৬ ঐ, ৩।১৫।১

আসরে ভাল করে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল।"[৭]

অন্য এক প্রসঙ্গে: "সাধুকে টাকা দিতে হলেই তাকে আর ভাল লাগে না। রাজেন্দ্র মিত্র—আটশ টাকা মাইনে—প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কেমন গো, মেলায় কেমন সব সাধু দেখলে?' রাজেন্দ্র বললে—'কই তেমন সাধু দেখতে পেলাম না। একজনকে দেখলাম বটে কিন্তু তিনিও টাকা লন।'"[৮]

অর্থ মানুষকে কিভাবে পরিবর্তিত করে সে-প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন: "এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করতো। সে বাইরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যেই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, 'কি ঠাকুর! বলি—আছ কেমন?' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বললুম, 'ওরে হৃদে। ও লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এই রকম কথা।' হৃদে হাসতে লাগল।"[৯]

স্বার্থপর লোকের বিচিত্র স্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় অদ্ভুত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে: "স্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোতে বললে মুতবে না, পাছে তোমার উপকার হয়। (সকলের হাস্য) এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুষে চুষে এনে দেবে।"[১০]

তাঁর সহজ নির্মল কৌতুক কাউকে আঘাত করে না, সৃষ্টি করে হাস্যমুখর পরিবেশ। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলছেন: "মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়।... দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড় তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট (সকলের হাস্য)। আবার পায়ে বুটজুতা, শিস দিয়ে গান করা; এইসব এসে জুটবে, আবার যদি পণ্ডিত হয়—সংস্কৃত পড়ে, অমনি শোলোক ঝাড়বে।"[১১]

নিজের সাজ-পোশাক অপরকে দেখানোর ব্যাকুলতা মানুষকে কতটা হাস্যকর করে তোলে সে-প্রসঙ্গে বলছেন: "দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, প্লেটওলা জামা পরা। চলবার যে ঢং, প্লেটটা সামনে রেখে সেইখানটার চাদর খুলে দেয়—আবার এদিক-ওদিক চায়,—কেউ দেখছে কিনা। চলবার সময় কাঁকাল ভাঙা। (সকলের হাস্য) একবার দেখিস না।"[১২]

ভক্তদের নিজ নিজ মত নিয়ে অহঙ্কার এবং সে-ব্যাপারে বিবাদ প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনা হাস্যরসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: "বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই—ভক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে।... শ্রীমদ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐরকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা।'... শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন,—শাক্তেরা বলে, 'তা তো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার করবেন?—ঐ কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য'।"[১৩]

আবার অন্যত্র এ-প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনা: "বিদ্বেষ-ভাব ভাল নয়—শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়, পদ্মলোচন বর্ধমানের সভা-পণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল—শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল—আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই।"[১৪]

তাঁর ছোট ছোট গল্প একদিকে যেমন সরস অপরদিকে তেমনই বাস্তবধর্মী। স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মতো তা শ্রোতার মুখে আনে স্মিত হাসির রেখা।

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১৪।৪ ৮ ঐ, ৪।১২।২ ৯ ঐ, ১।৪।৬
১০ ঐ, ১।৩।৬ ১১ ঐ, ১।২।৬ ১২ ঐ, ৩।২০।৫
১৩ ঐ, ৪।১৫।১ ১৪ ঐ, ৫।৫।৪

(সহাস্যে)—একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরি দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে। (সকলের হাস্য) তখন মাদুর বগলে করে বাড়ি ফিরে গেল। (হাস্য)"[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার এসেছিলেন দেবেন্দ্রের বাড়িতে। সেখানে তাঁকে কেন্দ্র করে ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। কথামৃতে তার বর্ণনা: "দেবেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। দেবেন্দ্র বৈঠকখানার দক্ষিণ উঠানে আসিয়া দেখেন যে, তক্তপোশের উপর তাঁহার পাড়ার একটি লোক তখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'ওঠ, ওঠ'। লোকটি চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বলিতেছেন, 'পরমহংসদেব কি এসেছেন?' সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। লোকটি ঠাকুরের আসিবার আগে আসিয়াছিলেন, ঠাকুরকে দেখিবার জন্য। গরম বোধ হওয়াতে উঠানের তক্তপোশে মাদুর পাতিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন।"[১৬]

পুরনো সংস্কার প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনা: "পুরনো সংস্কার কি এমনি যায়? একজন হিন্দু বড় ভক্ত ছিল—সর্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম করত। মুসলমানদের যখন রাজ্য হলো তখন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান করে দিল, আর বললে, 'তুই এখন মুসলমান হয়েছিস, বল আল্লা। কেবল আল্লা নাম জপ কর।' সে অনেক কষ্টে 'আল্লা, আল্লা' বলতে লাগল, কিন্তু এক-একবার বলে ফেলতে লাগলো 'জগদম্বা'। তখন মুসলমানেরা তাকে মারতে যায়। সে বলে, দোহাই শেখজী। আমায় মারবেন না, আমি তোমাদের আল্লা নাম করতে খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার কণ্ঠা পর্যন্ত রয়েছেন, তোমাদের আল্লাকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন।"[১৭] (সকলের হাস্য)

ডাক্তার সরকার ভাব-টাব ভালবাসেন না। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে নরেন্দ্রনাথ গান গাইছেন:

"চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী,
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।
মহাযোগে সব একাকার হইল,
দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে,
এখন আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু তুলিয়া
বল রে মন হরি হরি।"

ডাক্তার সরকার একমনে গান শুনছিলেন। গান সমাপ্ত হলে ডাক্তার সরকার বললেন: "চিদানন্দ সিন্ধুনীরে, এটি বেশ।" ডাক্তারের আনন্দ দেখে ঠাকুর বললেন: "ছেলে বলেছিল, 'বাবা, একটু (মদ) চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বল তা ছাড়া যাবে।' বাবা খেয়ে বললে—'তুমি বাছা ছাড় আপত্তি নাই কিন্তু আমি ছাড়ছি না'।" (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)[১৮]

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরের মেঝেতে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এক চাঙারি জিলিপি—কোন ভক্ত নিয়ে এসেছেন। তিনি একটু জিলিপি ভেঙে খেলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি, সহাস্যে)—দেখছো আমি মায়ের নাম করি বলে—এই সব খেতে পাচ্ছি। (হাস্য)...

"ঘরে একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকাবস্থা। একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখে—পাছে সে খাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও ঠিক সেই অপূর্ব বালকবৎ অবস্থা হইতেছে। তিনি জিলিপির চাঙারি হাতে ঢাকা দিয়া লুকাইতেছেন। ক্রমে তিনি চাঙারি এক-পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া দিলেন।"

পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে কথামৃতের বর্ণনা পাঠককে অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ দেয়। প্রাণকৃষ্ণের সাথে ধর্মালোচনা করছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। করতে করতে "বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়া মিষ্টান্ন লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।"[১৯]

১৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।৩।১ ১৬ ঐ, ৩।১৩।৪ ১৭ ঐ, ৩।৯।৫
১৮ ঐ, ৪।৩০।২ ১৯ ঐ, ৪।১।১

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের আলোয় 'উপলব্ধি'*

ফ্রিটজফ কাপরা

ভাষান্তর : হরিপদ চক্রবর্তী

মানবসমাজের প্রায় সর্বস্তরে ও সর্ববিষয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সবিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পদার্থবিজ্ঞান প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভিত্তি এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের সমন্বয় আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারারও আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছে—কি কল্যাণমূলক, কি ধ্বংসমূলক উভয় ভাবেই। আজকের দিনে এমন কোনও আধুনিক শিল্প প্রায় নেই যেখানে আণবিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার ফলাফলের প্রয়োগ হয়নি। আবার এইসব গবেষণা-প্রসূত আবিষ্কারের প্রভাবেই সারা পৃথিবীতে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। সেক্ষেত্রে আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। একথা সবারই জানা। তবে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব শুধু প্রকৃতিবিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার বাইরেও, মানুষের মনের ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই প্রভাব দেখা যায় এবং এই কারণে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণা ও তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও বদলে দিচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীতে পারমাণবিক আবিষ্কার আমাদের অনেক মৌলিক মূল্যবোধের অসন্দিগ্ধ সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছে এবং প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এইসব মৌলিক ধারণা বা মূল্যবোধের অনেকাংশের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে পদার্থের যে ধারণা তা পদার্থবিজ্ঞানের পদার্থের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একই কথা বলা যেতে পারে মহাকাশ, সময় ও কার্য-কারণ সম্পর্কেও। এইসব ধারণা ও মতবাদ মৌলিক এবং আমাদের চারপাশের জগৎকে জানা ও চেনার সহায়ক। কিন্তু মৌলিক সব চিন্তাধারা ও মতবাদের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আমাদের জীবনদর্শন, মতবাদ ও চিন্তাধারাতেও পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাবে এসব পরিবর্তন গত কয়েক দশক ধরে পদার্থবিদ্ ও দার্শনিকদের মধ্যে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে; কিন্তু এবিষয়ে কখনো এরূপ মনে করা হয়নি যে, এসব পরিবর্তন এক নতুন মতবাদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। জাগতিক ব্যাপারে প্রায় একইরকম মতবাদ বহু শতাব্দী যাবৎ প্রাচ্যদেশীয় নানা ধর্মে ও দর্শনে দেখা যায়, ইংরেজী পরিভাষায় এর নাম 'Eastern Mysticism' বা প্রাচ্যদেশীয় অতীন্দ্রিয়বাদ। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানেও এক আশ্চর্য রকম সমান্তরাল ধারণা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, যা প্রাচ্যদেশীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে তুলনীয়। যদিও এই সমান্তরাল অতীন্দ্রিয়বাদ এখনো সম্যগ্‌ভাবে আলোচিত হয়নি, তবুও পাশ্চাত্যদেশের এই শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ্ তাঁদের কোন কোন বক্তৃতা-সফরে দূরপ্রাচ্যের ভারত, চীন ও জাপানে এসে সেসব দেশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং এই অতীন্দ্রিয়বাদের প্রভাব লক্ষ্য করেন। এইপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত তিনটি উদ্ধৃতি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

আণবিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনের ক্ষমতার বা বুদ্ধির যে সাধারণ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় তা আমাদের সংস্কৃতিতে একেবারে অপরিচিত বা অশ্রুত বা অভিনব নয়। এর একটা

* বর্তমান নিবন্ধটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ ফ্রিটজফ কাপরার সুপরিচিত ইংরেজী গ্রন্থ **The Tao of Physics** (গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার। ইতিমধ্যে এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়েছে, ৬ লক্ষেরও বেশি কপি এপর্যন্ত বিক্রি হয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে)-এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধের ('Modern Physics : A Path with a Heart') বঙ্গানুবাদ।

ইতিহাস আছে। বৌদ্ধধর্ম বা হিন্দুধর্মের ধারণায় ও চিন্তায় এর আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় স্থান আছে। [বর্তমানে] আমরা যা দেখি, তা ঐসব চিন্তারই সম্প্রসারণ, জ্ঞানের অগ্রগতি এবং প্রাচীন জ্ঞানের আধুনিক সংস্করণ।"

জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমার

["The general notions about human understanding ···which are illustrated by discoveries in atomic physics are not in the nature of things wholly unfamiliar, wholly unheard of, or new. Even in our own culture they have a history, and in Buddhist and Hindu thought a more considerable and central place. What we shall find is an exemplification, an encouragement and a refinement of old wisdom."

Julius Robert Oppenheimer]

পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের সমান্তরাল জ্ঞানের সূত্র দেখতে হলে··· [আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে] সেই সব সমস্যার দিকে, বুদ্ধ ও লাওৎসের (Lao Tse) মতো চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই পৃথিবীতে জীবননাট্যের অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতা হিসাবে আমাদের অস্তিত্বের সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়ে যেসব জ্ঞানসংকট বা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

নীয়েলস বোর

["For a parallel to the lesson of atomic theory···(we must turn) to those kinds of epistemological problems with which already thinkers like the Buddha and Lao Tse have been confronted, when trying to harmonize our position as spectators and actors in the great drama of existence."

Niels Bohr]

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাপানের বিশেষ বৈজ্ঞানিক অবদান দূরপ্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্বের দার্শনিক বিষয়বস্তুর এক বিশেষ সম্পর্কের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ

["The great scientific contribution in theoretical physics that has come from Japan since the last war may be an indication of a certain relationship between philosophical ideas in the tradition of the Far East and the philosophical substance of quantum theory."

Werner Heisenberg]

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে দূরপ্রাচ্যের দার্শনিক মতবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পরম্পরার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা দেখব, বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের দুই প্রধান স্তম্ভ যথা কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতাবাদ কিভাবে পৃথিবীর বিষয়ে আমাদের হিন্দু, বৌদ্ধ ও তাও মতাবলম্বী চীনাদের মত সমভাবে দেখার নির্দেশ দেয় এবং কিভাবে এই সাদৃশ্য প্রভাবিত হয়। কারণ, আমরা দেখি এই দুই তত্ত্বের বিশ্লেষণে আধুনিক পারমাণবিক জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শুধু অনুভবযোগ্য পদার্থের বর্ণনা এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বা কার্য-কারণ সম্পর্ক, আর এইসব পদার্থের অংশগুলি সমষ্টিগত ও আলাদা-ভাবে পদার্থ।

এখানে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাচ্যদেশীয় পরমার্থবাদের এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং আমাদের প্রায়ই এইসব বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হবে। কারণ, এটা বলা সম্ভব নয় কে এই মতবাদের উদ্ভাবক—পদার্থবিদেরা, না প্রাচ্য-দেশীয় অধ্যাত্মবাদীরা। যখন আমরা "প্রাচ্যদেশীয় অধ্যাত্মবাদের" ("Eastern Mysticism") কথা বলি, তখন হিন্দু, বৌদ্ধ বা তাও মতের ধর্ম ও দর্শনের কথা মনে করেই একথা বলি। যদিও এইসব ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে অনেক অঙ্গাঙ্গীভূত পরমার্থবাদ ও দার্শনিক মতবাদ আছে, তবুও এইসব তত্ত্বের জাগতিক মূলসূত্র একই। এই মতবাদ শুধু প্রাচ্য-দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, অধ্যাত্মবাদ-প্রভাবিত সব দেশেরই দর্শনে কমবেশি এর প্রভাব দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য বিষয়, সাধারণভাবে বলা যায় যে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যে জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করে তা চিরন্তন ও বিভিন্নরকমের অধ্যাত্ম

মতবাদের সমতুল। অধ্যাত্মবাদ সব ধর্মেই আছে এবং পরমার্থ বিষয়ক চিন্তাধারা অনেক পাশ্চাত্য দর্শনেও দেখা যায়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সমান্তরাল মতবাদ শুধু হিন্দুদের বেদের মধ্যে বা চীনাদের (I Ching) মধ্যে অথবা বৌদ্ধ সূত্রের মধ্যেই নেই, এই মতবাদ হেরাক্লিটাসের অংশবিশেষে, আরবী সুফি মতবাদের মধ্যে এবং ইয়াকি যাদুকর ডন জুয়ানের শিক্ষাক্রমের মধ্যেও দেখা যায়।...

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদের পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্যদেশে অধ্যাত্মবাদ সবসময়ই অন্যতম একটি ধারণা বা মতবাদ হিসাবে সমাজে প্রচলিত, আর প্রাচ্যদেশে এই অধ্যাত্মবাদ ধর্ম ও দর্শনের প্রধান স্তম্ভ হিসাবে সমাজে স্বীকৃত এবং সমাজকে এই ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে।

বর্তমানে যদি পদার্থবিজ্ঞান প্রধানতঃ অধ্যাত্মবাদের দিক নির্দেশ করে, তবে আমাদের ফিরে যেতে হবে এর শুরুতে প্রায় ২৫০০ বছর আগে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বন্ধুর পথ ধরে এই পরিবর্তন বা বিবর্তন প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। এর শুরু প্রাচীন গ্রীকদের অধ্যাত্মবাদ সমন্বিত দর্শনের মধ্য দিয়ে। এই গ্রীকদর্শন জ্ঞানিজনের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে ক্রমশঃ বিকশিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু ক্রমে এই দর্শন প্রাচ্যদেশীয় অধ্যাত্মবাদ থেকে স্বতন্ত্র এক দর্শনে পরিণত হয়। বর্তমান সময়ে আবার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পুরাতন সেই প্রাচীন গ্রীক-দর্শন ও প্রাচ্য দর্শনের পথে ফিরে যেতে শুরু করেছে। এবং বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শুধু অনুভূতি বা কল্পনার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং নানারকম সূক্ষ্ম নির্ভুল পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং কঠিন ও সুসমঞ্জস গাণিতিক সূত্রসমূহ এর উপাদান।

পদার্থবিজ্ঞানের মূল বা সমস্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল দেখা যায় খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে—প্রথম পর্বের গ্রীকদর্শনের মধ্যে, যে-গ্রীকদর্শনে বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন কোনও আলাদা বিষয় ছিল না। আইওনিয়ার মাইলেসীয় (Milesian) জ্ঞান-তপস্বীরা এইসব বিভিন্নতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পদার্থের প্রয়োজনীয় উপাদান অথবা সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কার করা, যাকে বলা হতো "physis"। Physics (পদার্থবিজ্ঞান) শব্দটি উক্ত গ্রীকশব্দ physis থেকে উদ্ভূত। আদিতে এর মানে ছিল—পদার্থ কোন্ প্রয়োজনীয় উপাদানে সৃষ্ট বা তার প্রকৃতি কি তা জানার চেষ্টা।

সব অধ্যাত্মবাদীদের মূল উদ্দেশ্য অবশ্য এই রকম এবং মাইলেসীয় দর্শনে ঐ অধ্যাত্মবাদের প্রভাব ছিল বেশি। মাইলেসীয়দের বলা হতো হাইলো-জোয়িস্ট (Hylozoist) অর্থাৎ যারা পদার্থকে চেতন মনে করত। এটা পরবর্তী পর্যায়ের গ্রীকদের মত। কারণ, তাঁরা অচেতন ও চেতনের মধ্যে বা শক্তি ও পদার্থের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা দেখতেন না। প্রকৃতপক্ষে তাদের পদার্থ (Matter) বলে কোনও শব্দই ছিল না। তাঁরা সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব দেখত physis-এর প্রকাশরূপে, যার জীবন ও দর্শন আছে। থেলেস (Thales) বলেছিলেন, সমস্ত পদার্থই ভগবানের প্রকাশ এবং এ্যানাক্সিমেন্ডার (Anaximander) দেখেছিলেন সমস্ত পৃথিবী যেন একটা ইন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রাণী (Organism), যা নাকি Pneuma বা Cosmic Breath, অর্থাৎ বায়ু ও বাষ্প দ্বারা গঠিত মানুষের শরীর যেমন বায়ুর দ্বারা রক্ষিত।

মাইলেসীয়দের এই একত্ববাদ এবং চেতন জগতের মতবাদ প্রাচীন ভারতীয় ও চীনদেশীয় দর্শনের অতি ঘনিষ্ঠ মতবাদ এবং প্রাচ্যদেশীয় দর্শনের বরং অধিকতর সমান্তরাল চিন্তাধারা আছে ইফিসাস (Ephesus) ও হেরাক্লিটাসের (Heracletus) দর্শনের মধ্যে। হেরাক্লিটাস বিশ্বাস করতেন অবিরত পরিবর্তনশীল এই জগৎকে—এক অনন্ত শক্তিকে। তাঁর মতে সব পদার্থই মায়া এবং তাঁর জাগতিক আদর্শ ছিল অগ্নি, যা কিনা অবিরত প্রবাহের এবং সবকিছুর পরিবর্তনের প্রতীক। তিনি শিখিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে সমস্ত পরিবর্তনই আসে দুই বিভিন্ন শক্তির—dynamic ও cyclic—গতি ও আবর্তের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে। তিনি দেখেছিলেন, এই দুই বিভিন্ন বিপরীতধর্মী শক্তিই হচ্ছে ঐক্যের মূল। এই ঐক্য সমস্ত বিপরীত শক্তিকে ধারণ করে এবং অতিক্রম করে—যাকে তিনি বলেছিলেন 'Logos' বা যুক্তি।

এই ঐক্যের বিভাজন শুরু হয় পরে—যখন ইলিয়াটিক দর্শন (Eleatic School) বলেছিল,

সকল মানুষ ও দেবতার ঊর্ধ্বে এক ঐশী শক্তির অস্তিত্ব আছে। এই মতবাদ প্রথমে সমস্ত জগতের ঐক্য প্রচার করে এবং পরে সমস্ত জগতের ঊর্ধ্বে এক সগুণ ও অব্যক্ত পরমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যিনি বিশ্বনিয়ন্তা। এইভাবে একটি মতবাদ সৃষ্টি হলো যার ফলে অবশেষে ঐশী শক্তি ও পদার্থ আলাদা বলে স্বীকৃত হলো এবং এই দ্বৈতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনের বৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

এই বিষয়ে শক্ত পদক্ষেপ নিলেন ইলিয়ার পারমেনাইডিস (Parmenides), যিনি হেরাক্লিটাসের প্রবল বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনি মূল আধারকে বললেন পরমপুরুষ (Being), যিনি অতুলনীয় ও অপরিবর্তনীয়। তিনি বলেছিলেন, তাঁর পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং এও বলেছিলেন যে, জগতে আমরা যে পরিবর্তন বোধ করি তা মায়া বা বুদ্ধির বিভ্রমমাত্র। এই অব্যয় পুরুষের ধারণা, যিনি পদার্থের অংশগুলিরও পরিবর্তন করেন, তা পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারারও মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিকরা পারমেনাইডিস ও হেরাক্লিটাসের চরম বিপরীতধর্মী দুই মতবাদের সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করেন। পারমেনাইডিসের অপরিবর্তনীয় পরমপুরুষ ও হেরাক্লিটাসের পরিবর্তনশীল চেতন প্রাণীর বা প্রকৃতির মতবাদের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাঁরা বললেন যে, অপরিবর্তনীয় পরমপুরুষ কখনো কখনো কোন পদার্থের মধ্যে প্রকাশিত হন—যাঁর মিশ্রণ ও বিভাজনের জন্য এই পৃথিবীতে পরিবর্তন আসে। এর থেকে পরমাণুবাদের সৃষ্টি—যা নাকি পদার্থের অতি ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ। এ-ধারণা আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, লুসিপ্পাসের (Leucippus) এবং ডেমোক্রিটাসের (Democritus) দর্শনে। গ্রীক পরমাণুতাত্ত্বিকেরা শক্তি ও পদার্থের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে বলেন যে, পদার্থ কতকগুলি প্রাথমিক নির্মীয়মাণ অংশের সমষ্টি। এগুলি গতিহীন ও একেবারে জড় অংশ, যা নাকি মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদের শক্তির কোনও কারণ দেখান হয়নি। তবে এগুলি যে বাইরের কোনও শক্তির দ্বারা চালিত হচ্ছে তা বলা হয়েছে। সেই শক্তির উৎস প্রকৃতি বলে মনে করা হয় এবং এগুলি পদার্থ থেকে সাধারণভাবে স্বতন্ত্র। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এই চিন্ন পাশ্চাত্য চিন্তাধারার এক বিশিষ্ট উপাদান রূপে পরিগণিত হয়। কল্পনা করা হয় মন ও পদার্থ বা শরীর ও আত্মার মধ্যে এই দ্বৈতভাব আছে।

যখন প্রকৃতি ও পদার্থের এই পার্থক্যের ধারণা পরিপক্ব হয়ে দাঁড়াল তখন দার্শনিকরা তাঁদের দৃষ্টি জাগতিক ব্যাপার থেকে অধ্যাত্মবাদের দিকে বেশি দিতে চাইলেন—মানুষের আত্মা বা মনের দিকে বা ধর্ম ও নীতি সমস্যার দিকে। এই জিজ্ঞাসা পঞ্চম ও চতুর্থ খ্রীস্টপূর্বাব্দে গ্রীকদর্শন, বিজ্ঞান বা সংস্কৃতির চরম অগ্রগতির পর থেকে প্রায় দু-হাজার বছর পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অব্যাহত ছিল। এ্যারিস্টটল প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাকে সুসংহত বিধিবদ্ধ আকার দিলেন এবং দু-হাজার বছর যাবৎ তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি জাগতিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ভিত্তিমূল বলে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু এ্যারিস্টটল নিজে বিশ্বাস করতেন যে, মানব-মন এবং ঈশ্বরের পূর্ণত্ব সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার প্রশ্নটি জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। জগৎ সম্পর্কিত এ্যারিস্টটলের মতবাদের কোনও প্রতিবাদ এতদিন না হওয়ার কারণ জাগতিক ব্যাপারে উৎসাহের অভাব। খ্রীস্টীয় ধর্মগুরুগণ এবং প্রতিপত্তি ও প্রভাব সম্পন্ন চার্চ সমস্ত মধ্যযুগেই এ্যারিস্টটলের মতবাদকে সমর্থন করায় এই অবস্থা অব্যাহত ছিল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরবর্তী উন্নতির অধ্যায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা সংস্কৃতি-বিপ্লব পর্যন্ত। তখন মানুষ এ্যারিস্টটলের মতবাদকে এবং চার্চের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে নিজেদের স্বাধীন চিন্তাপ্রকাশ করে ও নতুন করে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষ প্রথম প্রকৃতির রহস্য চর্চা শুরু করে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, অনুমান স্তর থেকে সত্য নির্ণয় পর্যন্ত। এই উন্নতি সমান্তরালভাবে গণিতের প্রতি আকর্ষণেও দেখা গেল এবং অবশেষে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সূত্রের ভিত্তি স্থাপিত হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গাণিতিক ভাষায়। গ্যালিলিওই প্রথম অবৈজ্ঞানিক

জ্ঞানকে গণিতের জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করেন। অতএব তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বললে অত্যুক্তি হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার হওয়ার আগে দার্শনিক চিন্তাধারার অগ্রগতি হওয়ার জন্য শক্তি ও পদার্থের চরম দ্বৈতভাব প্রকাশ পেল। এই প্রকাশ দেখা গেল সপ্তদশ শতাব্দীতে রেনে ডেকার্টের (Rene Descarte) দর্শনে যিনি তাঁর প্রকৃতি বিষয়ে মতবাদের ভিত্তি করেছিলেন এই দুই প্রাথমিক ও পৃথক দ্বৈত অথচ স্বাধীন সত্তাকে—মন (Res cogitans) এবং পদার্থ (Res extensa)। এই কার্টেসিয়ান বিভাজন (ডেকার্টের মতবাদ) পদার্থকে জড় অথচ নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক বলে স্বীকার করতে বৈজ্ঞানিকদের শেখাল এবং এই প্রাকৃতিক জগৎকে ঐ সমস্ত বিভিন্ন পদার্থসমন্বিত এক বিশাল যন্ত্রের মতো মনে করতে শেখাল। আইজ্যাক নিউটন (Issac Newton) এই পৃথিবী যে এক বিশাল যন্ত্রের মতো—এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যন্ত্রবিদ্যা (Mechanics)-এর ধ্যান-ধারণা ঐ মতবাদের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল—যেখানে প্রাচীন পদার্থবিদ্যার মূল প্রোথিত। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই নিউটনিয়ান মতবাদ পৃথিবী-তত্ত্ব সম্পর্কিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। ঠিক সমান্তরালভাবে জগতের অধিপতিস্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়েছিল—যিনি বিশ্বনিয়ন্তা, সকল পদার্থের ঊর্ধ্বে ঐশী শক্তি দ্বারা জগৎকে শাসনে রাখেন। বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানযোগ্য প্রাথমিক প্রকৃতির অনুশাসন এই ভাবে অবিনশ্বর ও অনন্ত পরমপুরুষের অনুশাসন বলে স্বীকৃত হলো—জগৎ যাঁর বশবর্তী।

ডেকার্টের দর্শন শুধু প্রাচীন পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির জন্য উল্লেখযোগ্য নয়, তা বর্তমান কাল পর্যন্ত সমস্ত সাধারণ পাশ্চাত্য ভাবনা ও চিন্তা-ধারাকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করেছিল। ডেকার্টের বিখ্যাত বাক্য—"Cogito ergo sum"—I think, therefore I exist—আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি—পাশ্চাত্যবাসীদের এই ধারণা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, মানুষের অস্তিত্ব মনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সমস্ত শরীরের সঙ্গে নয়। ডেকার্টের দ্বৈতবাদের (Cartesian Division) ফলে বেশির ভাগ ব্যক্তিই মনে করত তাদের শরীরের মধ্যে একটি ভিন্ন সত্তা রয়েছে—মন। শরীরের মধ্যে এই মন যেন বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে এবং শরীরকে আয়ত্তে রাখার নিষ্ফল চেষ্টাও তার কাজ। এইভাবে এক আপাতদৃষ্ট বিবাদ দেখা যায়—চেতন ইচ্ছাও স্বেচ্ছাধীন নয় এমন অনুভূতির মধ্যে। প্রত্যেক মানুষই আবার আপন কর্ম, বুদ্ধি, অনুভূতি বা বিশ্বাস অনুযায়ী—যা ছড়িয়ে রয়েছে চিরন্তন দ্বন্দ্বে, সৃষ্টি করছে প্রবহমান পার্থিব সমস্যা ও হতাশা—তার শরীরের মধ্যে বহু সংখ্যক অংশে বিভক্ত।

শরীরের মধ্যে এই বিপরীত অংশের ভাবনা যেন দর্শনে প্রতিফলিত বহির্জগতের চিত্র, যাতে দেখা যায় অসংখ্য বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার সমষ্টি। প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধারণা করা হয় যেন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত বিভিন্ন রকমের মানুষের কার্যের অনুকূলে। আবার এই বিপরীত অংশের ভাবনা সমাজের মধ্যেও প্রসারিত, যা কিনা বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী বা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীরূপেও বিভক্ত। এই যে আমাদের বিপরীত অংশের বিশ্বাস—আমাদের শরীরে, পরিবেশে এবং সমাজে সত্যিই বিভিন্ন, এই বিশ্বাসই আমাদের সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতির সংকটের কারণ। এই বিপরীত বিশ্বাস আমাদের প্রকৃতি ও সহযোগী মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বন্টন-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ও সংগঠনগত ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক ঘটনাবলী এক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যেখানে মানুষের জীবন শারীরিক ও মানসিকভাবে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।

কার্টেসিয়ান দ্বৈতবাদ ও জগৎ সম্বন্ধে যান্ত্রিক মতবাদ, যা একই সঙ্গে উপকারী ও ক্ষতিকারক, এই দুই মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি প্রাচীন পদার্থবিদ্যার ও যান্ত্রিক কুশলতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে অধিকতর সফল হয়েছে, তবে আমাদের সভ্যতার পক্ষে অনেক বিপদ ঘটিয়েছে। আনন্দের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান—যা এই কার্টেসিয়ান বিভাজন ও জগৎ সম্বন্ধে যান্ত্রিক মতবাদ থেকে উদ্ভূত এবং

যা সম্ভব হয়েছে কেবল এই দুই তত্ত্বের জন্য—এখন এই অংশতত্ত্বকে পরিহার করে আবার প্রাচীন গ্রীকদের ও প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিকদের ঐক্যতত্ত্বে (idea of unity) ফিরে এসেছেন।

পাশ্চাত্য যান্ত্রিকতাবাদের বিরোধিতা করে জগৎ সম্বন্ধে প্রাচ্যদেশীয় মতবাদ এই যে, এই জগৎ চেতন বস্তু। প্রাচ্যদেশীয় পরমার্থবাদীদের মতে এই জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বস্তু ও ঘটনা পরস্পর সম্পর্কিত ও সংযুক্ত এবং কেবলমাত্র এক পরম সত্তার বিভিন্ন রূপে প্রকাশ। আমাদের অনুভূত জগৎকে বিভিন্ন সত্তা ও বস্তু হিসাবে বিভাগ করার চেষ্টা এবং মানুষকে এই পৃথিবীতে এক বিচ্ছিন্ন আত্মবাদী বলে ভাবা শুধু মায়া, যা আমাদের পরিমাপ ও শ্রেণীবিভাগের মানসিকতা থেকে এসেছে। একে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলে বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়, এবং মানসিক অস্থিরতা থেকেই এই বিভ্রম আসে—যা মানুষকে অতিক্রম করতে হবে।

যখন মন অস্থির হয় তখন বস্তুর বিভিন্নরূপ দেখা যায়। কিন্তু মন যখন কেন্দ্রীভূত ও শান্ত হয় তখন বস্তুর ঐ সব বিভিন্ন রূপ অদৃশ্য হয়।

যদিও প্রাচ্যদেশীয় পরমার্থবাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নানারকম পার্থক্য আছে, তবুও তাদের প্রতিপাদ্য মূল সূত্রটি একই—ঐক্য, একের মধ্যে বহু। এই মতবাদের অনুগামীদের—তাঁরা হিন্দু, বৌদ্ধ বা তাও মতাবলম্বী যিনিই হন না কেন—চরম ও পরম উদ্দেশ্য হলো সমস্ত বস্তুর ঐক্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধ জানা এবং শরীরের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা বা আত্মবাদের মতকে অতিক্রম করে পরম সত্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। এই জ্ঞানের অনুভূতি বা আলোক প্রাপ্তি শুধু বুদ্ধির ব্যাপার নয়, বরং এক অভিজ্ঞতা যা মানুষের সমস্ত শরীর ও মন আচ্ছন্ন করে এবং এর প্রকৃত স্বরূপ ঐশ্বরিক। এই কারণে প্রায় সমস্ত প্রাচ্যদেশীয় দর্শনই প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবাদী দর্শন।

প্রাচ্যমতে প্রকৃতির বিভিন্ন পদার্থের বিভাজন মৌলিক নয়। এবং এইসব পদার্থের যে-কোনটিরই তরল ও নিত্য পরিবর্তনশীল স্বভাব।...

অতএব প্রাচ্যমতে জগতের চরিত্র একান্তভাবে গতিশীল এবং সময়ে পরিবর্তন এর প্রকৃতি। তখন যে-শক্তি এই গতির সঞ্চার করে, তা কখনই পদার্থের বাইরে নয়, যা প্রাচীন গ্রীকেরা মনে করতেন; বরং এই শক্তি পদার্থেরই অন্তর্নিহিত গুণ। সমান্তরালভাবে প্রাচ্যমতে ঐশী শক্তি কখনই শাসকের মতো জগৎকে সকলের ঊর্ধ্বে থেকে শাসন করেন না বরং একটি নিয়ম মেনে সব নিয়ন্ত্রণ করেন—বিশ্বনিয়ন্তারূপে।

"তিনি সবার মাঝে থাকেন,
তবু সবার থেকে আলাদা।
যাঁকে সকলে জানে না,
অথচ সবই তাঁর শরীরের অংশ।
যিনি সবার মধ্যে থেকে সকলকে
নিয়ন্ত্রণ করেন—তিনি তোমার আত্মা,
তোমার নিয়ন্তা, অক্ষয়, অব্যয়।"

["He who, dwelling in all things
Yet is other than all things,
Whom all things do not know,
Whose body all things are,
Who controls all things from within—
He is your Soul, the Inner Controller,
The Immortal."]

এইসব চিন্তাধারার ফলে প্রাচ্যদেশীয় ধারণা বা সাধারণভাবে অধ্যাত্মবাদের ধারণা সমকালীন বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির ঐক্য সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদের মূল, একথা বলা যায়। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিরও এই পৃথিবীর সম্পর্কে ধারণাগুলির সঙ্গে পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সমান চিন্তাভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। এই ধারণার দুটি প্রধান মৌলিক সূত্র হচ্ছে—জগতের সব বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগ ও সম্পর্ক রয়েছে, যা সব বস্তুরই ঐক্যের প্রকাশক এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে জগৎ—একান্তভাবে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। যতই আমরা পরমাণুতত্ত্বের গভীরে যাব, ততই আমরা অনুভব করতে পারব, কিভাবে আধুনিক পদার্থবিদেরা প্রাচ্যদেশীয় অধ্যাত্মবাদীদের মতোই অনুভব করেছেন যে, আমাদের এই জগৎ এক অবিভাজ্য পদ্ধতিতে পদার্থের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও গতি বজায় রেখে চলেছে, এবং বৈজ্ঞানিক নিজেও সেই পদ্ধতিরই এক অংশ।

প্রাচ্যদেশীয় দর্শনে, জগৎ ও তার সব বস্তুই যে সচেতন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং তার পরিবেশ সহ সব কিছুই গতিশীল—এই মতবাদই তাকে পাশ্চাত্য সমাজে বর্তমানে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে এখনো যান্ত্রিক ও বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত জগতের ধারণা প্রবল এবং সমাজের গরিষ্ঠ শ্রেণী এই জন্যেই মনে করেন সব সামাজিক অন্যায়, অসন্তোষ এবং মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার এটাই কারণ। তাই তাঁরা প্রাচ্যদর্শনের মুক্তি বা মোক্ষলাভের পথের সন্ধান করতে আগ্রহী হয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, যাঁরা এই বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা আই চিং-এর (I Ching-এর) অধ্যাত্মবাদ অনুসরণ করেন, যোগ বা ধ্যানের অনুশীলনে তাঁরা আসক্ত এবং তাঁদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিরাগ দেখা যায়। তাঁরা মনে করেন, বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান, সংকীর্ণ ও কল্পনাহীন এক বিষয় যা আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার সবকিছু কুফলের জন্য দায়ী।

এই আলোচনার উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং প্রমাণ করা যে, প্রাচ্যদর্শন ও অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত ভাবের একটা সামঞ্জস্য আছে এবং আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানকে শুধু যন্ত্রবিদ্যাই নয়, এর বাইরেও তাকে অনেক দূরে যেতে হবে—সে-পথ (Tao) হলো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পথ, অন্তঃকরণের নির্দেশে চলার পথ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথ বা আত্মোপলব্ধির পথ।

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাগানে চাষবাস সম্বন্ধে মহারাজের আগ্রহ ও উৎসাহ সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা মনে পড়িতেছে। একবার কামারপুকুর হইতে আসিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে রোপিত গাছের কতকগুলি আম নিয়া আসি। যতদূর মনে পড়ে তখন বৈশাখের শেষ কিংবা জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ হইবে। শ্রীশ্রীমা তখন উদ্বোধনে, তাঁহারই জন্য আম আনা। আম তখনো ঠিক পাকে নাই; গাছের উপরের ডালে কয়েকটি আমে একটু রং ধরিয়াছিল। গাছে চড়িয়া স্বহস্তে আমকয়টি পাড়িয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। আসিবার সময় কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কেশবানন্দ তাঁহাদের চাষের নূতন পটলও কিছু আমার হাতে দিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের জন্য। উদ্বোধনে পৌঁছিবার পর শ্রীশ্রীমাকে প্রণামানন্তর আম, পটল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দিলাম। তিনি আমার নিকট সকলের কুশল সমাচার পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। পরদিন অপরাহ্নে গোলাপ-মা আমার হাতে একটি পুঁটলিতে কয়েকটি আম ও কিছু পটল দিয়া আমার সঙ্গে বলরাম মন্দিরে মহারাজকে দর্শন করিতে চলিলেন। মাতাঠাকুরানীই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। বিকালে সেখানে ভিড় জমে বৈঠকখানা ঘরে। গোলাপ-মার সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হইল বারান্দার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। মহারাজ সেখানেই দাঁড়াইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলাম। গোলাপ-মার সঙ্গে হাসিমুখে মহারাজের কুশল বিনিময় হইল ও মহারাজ শ্রীশ্রীমা, শরৎ মহারাজ, রাধু ও উদ্বোধনের সকলের খোঁজখবর লইতেছিলেন। আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া নীরবে তাঁহাদের সুমধুর প্রীতিপূর্ণ কথাবার্তা শুনিয়া খুব আনন্দ পাইতেছিলাম তৎপরে গোলাপ-মা আমার পরিচয় করাইয়া মহারাজকে বলিলেন: "ছেলেটি কামারপুকুরের ঠাকুরের গাছের আম নিয়ে এসেছে, কোয়ালপাড়া আশ্রম থেকেও তাদের নিজেদের চাষের পটল পাঠিয়েছে। মা তোমার জন্য পাঠিয়েছেন।"

আমি পুঁটলিটা খুলিয়া মহারাজের সম্মুখে ধরিলে মহারাজ আগ্রহান্বিত হইয়া স্বহস্তে আমকয়টি হাতে তুলিয়া লইয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলেন। একটু পরে প্রসন্নচিত্তে সেবককে ডাকিয়া আমের অম্বল রান্না করিবার জন্য বলিলেন। আমগুলি তখনো ভাল পাকে নাই, টক হইবে, সেইজন্যই অম্বল করিতে বলিলেন, মনে হইল। পটলগুলিও বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "আশ্রমের জমিতে ওরা নিজেরা চাষ করে এমন সুন্দর পটল ফলিয়েছে?" আমি বলিলাম: "আমার সাক্ষাতেই তাঁরা খেত থেকে তুলে দিয়েছেন। এখনো ভাল ফলেনি। সবে ধরতে আরম্ভ করেছে, তাই পুষ্ট হয়নি, সেইজন্য বেশি দিতে পারেনি।" সেই ছোট্ট ছোট্ট অপুষ্ট পটলও মহারাজের নিকট চিত্তাকর্ষক ও পরমাদরণীয় হইয়াছিল। সে-সময়ে কলিকাতায় কত ভাল ভাল পটলের প্রচুর আমদানি হইত। আশ্রমের সাধুদের হাতে ফলিয়াছে বলিয়া মহারাজ কোয়ালপাড়ার আশ্রমের সাধুদের আশীর্বাদ ও তাঁহাদের চেষ্টা, উদ্যম ও কর্মতৎপরতার প্রশংসা করিলেন।

কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের অনুকম্পা সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান বিষ্ণুপুরে প্রাচীন কালে অতি উৎকৃষ্ট একপ্রকার তামাক প্রস্তুত হইত। তাহার নাম ছিল অমৃত তামাক। কত দূর-দূরান্তরে এই তামাকের নাম প্রচার ও ধনী ধূম্রপায়িগণের নিকট পরমাদরের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে বিষ্ণুপুরের তামাকব্যবসা জমিয়া উঠিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজাগণের রাজত্বনাশ, রাজ্যের পতন হইতে থাকিলে অন্যান্য শিল্প-ব্যবসার সঙ্গে তামাকের ব্যবসারও অবনতি হইতে থাকে। তৎপরে বিলাতী সিগারেটের আমদানী ও প্রচলন বাড়িলে উহা একপ্রকার বিলুপ্তই হইয়া যায়। মহারাজ তামাক খান জানিয়া স্বামী কেশবানন্দ বহু অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে সেই তামাক প্রস্তুত-প্রণালী সংগ্রহ করেন এবং কষ্ট ও আয়াস স্বীকারপূর্বক নানাস্থান হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘকালের চেষ্টায় সেই তামাক স্বহস্তে প্রস্তুত করেন এবং মহারাজের জন্য নিজে মঠে তামাক লইয়া যাইবেন স্থির করেন।

সেই সময়ে ঐ আশ্রমে দেবু নামে কোয়ালপাড়ার একটি চাষী-বালক সর্বদা যাতায়াত ও কাজকর্মে বিশেষ সহায়তা করিত। দেবু লেখাপড়া জানিত না। কিন্তু সাধুগণের সাহচর্যে সে ঠাকুর ও মায়ের উপর বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল এবং বেলুড় মঠ ও মহারাজের দর্শনের জন্য তাহার আগ্রহ বাড়িয়াছিল। মহারাজ তখন মঠে রহিয়াছেন। স্বামী কেশবানন্দ তাঁহাকে দর্শনের জন্য মঠে যাইতেছেন জানিয়া দেবুও অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইল। দেবু গরিব লোক, মহারাজকে কি দিবে? একটি সিকি সে আঁচলে বাঁধিয়া লইল মহারাজকে প্রণামী দিবার জন্য। তাঁহারা বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়া রাজা মহারাজকে দর্শন করিলেন। মহারাজ স্নেহাদর প্রদর্শনপূর্বক কেশবানন্দ স্বামীকে নিকটে বসাইয়া খোঁজখবর লইতেছেন। উভয়ের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ তামাক পাইয়া মহারাজ খুব প্রসন্ন। দেবু প্রণামান্তর কেশবানন্দের পাশে বসিয়া মহারাজকে একদৃষ্টে দর্শন ও তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে লাগিল। কিন্তু মঠের ঐশ্বর্য ও মহারাজের মান-সম্মান দেখিয়া তাহার মন একটু ভীত সংকুচিত হইয়া পড়িল। সে সাহস করিয়া তাহার পরমাগ্রহে আনীত সিকিটি বাহির ও মহারাজের পদে সমর্পণ করিতে পারিতেছিল না। মনে মনে কেবল সিকিটি এখন সে কি করিবে ভাবিয়া চলিতেছিল। ইতোমধ্যে মহারাজের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। দুই-একটি কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কাপড়ের দিকে মহারাজ দৃষ্টিপাত করিলেন। অকস্মাৎ তিনি দেবুকে বলিলেন: "তোমার খুঁটে কি বাঁধা?" অগত্যা সে বাষ্পপূর্ণ লোচনে খুঁট হইতে অতি সংকোচে সিকিটি বাহির করিয়া কম্পিত হস্তে মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল: "আমি গরিব লোক, আপনাকে প্রণামী দেব বলে বাড়ি থেকে এই সিকিটি নিয়ে এসেছি।" মহারাজ অতীব প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহাকে স্নেহাশীর্বাদ করিলেন। দীনহীন ভক্তের উপর মহারাজের অহৈতুক কৃপাতে দেবুর অন্তরে বিস্ময় ও পুলক জন্মে। যতদিন সে বাঁচিয়াছিল, অতীব বিমুগ্ধ চিত্তে মহারাজের সেই ভক্তকৃপার কথা সে সকলকে শুনাইত। [ক্রমশঃ]

গ্রন্থ-পরিচয়

ভারতীয় মনোবিদ্যার মৌলিকত্ব
হারানিচন্দ্র ভট্টাচার্য

Aspects of Indian Psychology : Dinesh Chandra Bhattacharya, Shastri. Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, 24 Parganas (South). Rupees : 50·00

ব্যক্তিজীবনে মনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনের শক্তিকে সংহত করে মনকে একাগ্র করতে পারলে অসাধ্য-সাধন করা সম্ভব ; পক্ষান্তরে মনের শক্তি বিক্ষিপ্ত হলে অতি সাধারণ কাজও সুসম্পন্ন করা অসম্ভব। এই মনকে বশে আনা খুবই কঠিন। কারণ, মন সদা চঞ্চল। গীতায় অর্জুন শ্রীভগবানকে বলেছেন ঃ "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ "মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত"—অর্থাৎ জীবের বন্ধন অথবা পরমার্থলাভ মনের ক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করে। আবার মন সুনিয়ন্ত্রিত না হলে নানাবিধ মানসিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। এইজন্যই আমাদের মনের স্বরূপ ও ক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য চিন্তায় আত্মা ও মন সমার্থক বলে বিবেচিত হয়। প্রাচীন যুগে মন সম্বন্ধে আলোচনা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করা হতো ; কিন্তু পরবর্তী কালে মনোবিজ্ঞান পৃথক শাস্ত্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে। আধুনিক কালে মনের ক্রিয়ার বিভিন্ন দিক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলোচিত হচ্ছে এবং আলোচনালব্ধ তত্ত্বকে শিক্ষা, মানসিক ব্যাধি নিরাময় ইত্যাদি ব্যবহারিকক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীদের মনঃসমীক্ষণ-এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে দার্শনিক সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে পৃথগ্‌ভাবে মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিশেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচীতে মনোবিজ্ঞান বলে যা পঠন-পাঠন হয়ে থাকে —তা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য চিন্তা। অথচ ভারতে মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়নি, এমন নয়। বিভিন্ন উপনিষদ্ ও দর্শনে এইরূপ আলোচনা দৃষ্ট হয়। এইসব চিন্তাকে সংকলিত করে 'ভারতীয় মনোবিজ্ঞান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এইদিক থেকে আলোচ্য ইংরেজী গ্রন্থখানিকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। গ্রন্থখানির লেখক ও প্রকাশকের কাছে মন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু-পাঠকবর্গ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রখ্যাত পণ্ডিত দীনেশ-চন্দ্র ভটাচার্য শাস্ত্রী-কৃত মনের স্বরূপ ও ক্রিয়া বিষয়ক তেরটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রবন্ধ-গুলি বিভিন্ন দর্শন-সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মন সম্বন্ধীয় যেসব তত্ত্ব আমরা অতি আধুনিক ইউ-রোপীয় বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার বলে মনে করি—তা প্রাচীন ভারতের মনীষীদের অজ্ঞাত ছিল না। বস্তুতঃ মনের ক্রিয়া—স্বভাবী ও অস্বভাবী মনের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা, স্বপ্ন বিশ্লেষণ এবং মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও নিরাময় ইত্যাদি—ভারতের প্রাচীন মনীষীরা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। অবশ্য এখনকার মতো নানাবিধ যন্ত্র সহযোগে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তখন সম্ভব ছিল না। গ্রন্থখানি আমাদের সম্পদ সম্বন্ধে অবহিত করে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আকর গ্রন্থসমূহ পাঠে উৎসাহিত করবে ; এটাই গ্রন্থখানির সবচেয়ে বড় অবদান।

মনের তাত্ত্বিক স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকরা একমত নন। পাশ্চাত্যে প্রাচীন যুগে প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকরা আধিবিদ্যা সত্তা হিসেবে মনের

আলোচনা করেছেন ; পরবর্তী কালে ডেভিড হিউম, উইলিয়াম জেমস প্রমুখ দার্শনিকরা মন বলতে কোন দ্রব্য স্বীকার না করে মনের ক্রিয়াকেই বুঝিয়েছেন ; আধুনিক কালে ওয়াটসন প্রমুখ ব্যবহারবাদী বৈজ্ঞানিকগণ মন বা চেতনা বলে কোনকিছু স্বীকার করেননি যেহেতু তা পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বিভিন্ন উপনিষদ্, দর্শন ও প্রামাণ্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিসহ মনের স্বরূপ ও ক্রিয়া সহজবোধ্য ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে মনের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। যজুর্বেদে ঋষি প্রার্থনা জানিয়েছেন: 'আমার মনে শুভ সঙ্কল্প উদয় হোক' ("তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু")। মনকে বলা হয়েছে—'সকল আলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলো, যা ব্যতিরেকে কোন জ্ঞান ও ক্রিয়া সম্ভব নয়, যা সর্বত্র বিচরণক্ষম এবং যা হৃদ্দেশে অবস্থিত। মন উত্তম সারথির ন্যায় মানুষকে অভীষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে।' কঠোপনিষদে অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছাকে (হৃদ্, মনীষ, মনস্) মনের প্রধান ক্রিয়া বলা হয়েছে যার দ্বারা পরমপ্রাপ্তি সম্ভব। এখানে মনের গুরুত্ব সুস্পষ্ট।

পরবর্তী কালে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে মনকে জ্ঞাতা আত্মার করণ বলা হয়েছে। মন আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগসাধনকারী মাধ্যম—আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগে আত্মার জ্ঞান হয়। কিন্তু সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শনে মন কেবল করণমাত্র নয়—আত্মার চেতনা প্রতিফলিত হওয়াতে বুদ্ধিরূপে কর্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব লাভ করে। মন প্রধানতঃ সাত্ত্বিক হওয়াতে স্বরূপতঃ শুদ্ধ এবং সত্য নির্ধারণে বা তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মনের জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে 'স্বপ্ন', 'অচেতন' এবং 'আয়ুর্বেদে মনোবিজ্ঞান' বিষয়ক প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে ; কারণ এইসব বিষয়ে প্রাচীন ভারতে কোন বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়েছিল বলে আমরা অনেকেই অবহিত নই। সাধারণের ধারণা এইসব বিষয়ে আধুনিক ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামী য়ুঙ ও এডলার প্রমুখই সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় উক্ত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের অনেক পূর্বেই আমাদের দেশের মনীষীরা এই সব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা যেমন স্বপ্নকে স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের জীবনেরই কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন এবং স্বপ্নপ্রতীক নির্ণয় করেছেন—ভারতের প্রাচীন মনীষীরাও তেমনি স্বপ্নকে স্বপ্নদ্রষ্টার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের কোন ঘটনার ইঙ্গিতবহ বলে বর্ণনা করেছেন এবং স্বপ্নপ্রতীকের কথাও বলেছেন। ফ্রয়েডীয় ধারণা—অচেতন এবং প্রাক্‌চেতন—অদৃষ্ট এবং সংস্কার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যা কেবল বর্তমান জীবনে নয়—অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। লেখক চরকসূত্রস্থান, চক্রপাণি-টীকা প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন মনোরোগের কারণ বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের বিষয় সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন: "একটু আত্মবিশ্লেষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ধ্যান ইত্যাদি অভ্যাস করলে নানাবিধ মানসিক বিপর্যয় এড়ানো যেতে পারে।" ("স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ")। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা মনের ক্রিয়াকে বর্তমান জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের পরিধিতে সীমিত রেখেছেন, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা আধ্যাত্মিকতার পটভূমিতে মনের মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছেন এবং সংযত মনের ক্রিয়াকে পরমার্থলাভের উপায় বলেছেন।

গ্রন্থখানিতে লেখকের একটি সুন্দর ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। এই ভূমিকা পাঠে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হয়। ইংরেজী ভাষায় লিখিত হলেও সাধারণ পাঠকের পক্ষে ভাষা প্রতিবন্ধক হবে না। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে সুমুদ্রিত এই ইংরেজী গ্রন্থটির মূল্য যথাসম্ভব স্বল্পই রাখা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২ মার্চ ১৯৯১ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাবের ১৫৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে **গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের** বিবেকানন্দ হলে সন্ধ্যা ৬টায় এক ধর্মসমন্বয় সম্মেলন হয়। শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, রেভারেন্ড ডঃ কে. পি. আলিয়াজ, অধ্যাপক সীতানাথ গোস্বামী, অধ্যাপক ওসমান গণি, সরণ সিং যথাক্রমে বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম এবং শিখধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। সকলেই বলেন, ভালবাসা ও সম্প্রীতিই ধর্মের মূল শিক্ষা।

এছাড়া মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক বরিস ইভানভ, মস্কো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আলেকজান্ডার এম. দুবিয়ানস্কি, সুপ্রিম সোভিয়েতের পিপলস ডেপুটি মেম্বার মারিনা জি. কস্টেনেটস্কায়াও ভাষণ দেন এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকার ওপরে সকলেই বিশেষ গুরুত্ব দেন। সূচনায় বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল (জুনিয়ার)-এর সভ্যবৃন্দ উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে এবং ইনস্টিটিউটের সহ-সম্পাদক স্বামী চিদানন্দ বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র থেকে পাঠ করেন। পরিশেষে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সারথি চট্টোপাধ্যায় এবং সেতার বাজান এল. অ্যান্টনি। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে (বাঁকুড়া) গত ৫, ৬ ও ৭ এপ্রিল '৯১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। নবনির্মিত ছাত্রাবাস ও উৎসব উদ্বোধন করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী মঙ্গলানন্দ, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী এবং মোহন সিংহ। কালীকীর্তন, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ছৌ নৃত্য, বাউল গান, সঙ্গীতালেখ্য, নাটক, যাত্রা ও পদাবলী-কীর্তন প্রভৃতি ছিল উৎসবের নানা অঙ্গ। আন্তর্বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি আশ্রম থেকে প্রকাশিত একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করেন। উৎসবে প্রায় পনের হাজার নরনারী বসে প্রসাদ পায়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় কয়েক হাজার যুবক-যুবতী, ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবক এবং গ্রাম ও শহরের মানুষ যোগ দেন।

গত ৯ ও ১০ মার্চ '৯১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৫৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে **সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে** দুদিনব্যাপী আনন্দোৎসব সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রথমদিন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, আবৃত্তি, আলোচনা ও ভাষণ প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত প্রায় আড়াইশো জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দ, স্বামী সত্যাত্মানন্দ এবং স্বামী সর্বগানন্দ। দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ঊষা-কীর্তন, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ গ্রাম পরিক্রমা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও সারাদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুপুরে প্রায় পনের হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নির্জরানন্দ। বেলুড় মঠ ও অন্যান্য কেন্দ্রের বহু সন্ন্যাসী, প্রাক্তন ছাত্র, ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

ভুবনেশ্বর আশ্রম গত ৯—১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কটক জেলার বিলাসুনীতে একাদশ জাতীয় সংহতি শিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে দুশো জন যুব-প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল।

বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার

গত ২৯ মার্চ '৯১ **নরেন্দ্রপুর আশ্রমের** বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী হল-এ ইন্ডিয়ান এপিক কালচার সেন্টার তাদের এ-বছরের 'বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার ঃ ১৯৯১' প্রদান করলেন রামকৃষ্ণ

মিশন লোকশিক্ষা পরিষদকে। পরিষদের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দ এবং লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালক শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। পুরস্কারের অর্থমূল্য দশ হাজার টাকা এবং তৎসহ স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি সম্বলিত একটি ট্রফি ও মানপত্র। ইন্ডিয়ান এপিক কালচার সেন্টারের পক্ষ থেকে পুরস্কার তিনটি প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি দীপ্তিবিকাশ সেন, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত এবং সহ-সভাপতি সুনীলকান্তি রায়। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী অসক্তানন্দ, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুনীলকান্তি রায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত বছর এই পুরস্কার উদ্বোধন পত্রিকাকে প্রদান করা হয়েছিল।

উদ্বোধন

মাদ্রাজ মিশন আশ্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়-গৃহের দ্বিতল উদ্বোধন করা হয়েছে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি।

পরিদর্শন

গত ১ এপ্রিল কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ভক্তচরণ দাস **পুরী রামকৃষ্ণ মঠ** পরিদর্শন করেন। ঐ সময় তিনি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত নুলিয়া পল্লীতে ত্রাণকার্যের জন্য পুরী মঠকে সাহায্যদানের আশ্বাস দেন।

চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির

কোয়েম্বাটোর আশ্রম গত ১৭ মার্চ মাদুরাই অরবিন্দ চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় এক চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে তিনশো চব্বিশ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং বিয়াল্লিশ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

বস্ত্র বিতরণ

জয়রামবাটী মাতৃমন্দির গত ১৯৯০-এর নভেম্বর মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে ১৮টি গ্রামের দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে ২০১০টি শাড়ি ও ৭২১টি ধুতি বিতরণ করেছে।

ত্রাণ

উড়িষ্যা অগ্নিত্রাণ

গত ২২ মার্চ **পুরী রামকৃষ্ণ মঠ** থেকে দুই কিলোমিটার দূরে পেন্টাকোটা গ্রামের নুলিয়া পল্লীতে অগ্নিকাণ্ডে ৬৫০টি পরিবার গৃহহীন হয়। ২৪ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ক্ষতিগ্রস্ত ৩,৩০০ জনকে অন্ন বিতরণ করেছে। বর্তমানে অন্যান্য সাহায্যের প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ ত্রাণ

বেলুড় মঠ থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার লালপল্লী গ্রামের দারিদ্র্য-পীড়িত ৫৫টি আদিবাসী পরিবারের মধ্যে ৪৪টি ধুতি, ২২টি শাড়ি ও ৭৬টি শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া হাওড়া জেলার বেলুড় গ্রাম ও তার আশপাশের ৬১টি দরিদ্র পরিবারকে ১২২ কিলোঃ চাল ও ১৭·৫ কিলোঃ ডাল দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ

গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের লক্ষ্মীপুরম, চন্দ্রমৌলিপুরম, মুক্তেশ্বরম এবং কোটাপালেম গ্রামে চারটি আশ্রয়গৃহ-সহ সমাজগৃহের কাজ চলছে। কোটাপালেম ৮৫টি গৃহ-সম্বলিত একটি পল্লী-নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। পল্লীটির নতুন নাম দেওয়া হয়েছে রামকৃষ্ণপুরম। গত ৯ মার্চ এই পল্লীটির উদ্বোধন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যসচিব ভি. পি. রামা রাও।

গুজরাট

ভাবনগর জেলার গিরিধর তালুকের ভামরিয়া গ্রামে ৮টি বাড়ির ছাদ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে এবং আরও ২২টি বাড়ির নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে।

বহির্ভারত

ঢাকা আশ্রম (বাংলাদেশ) গত ১৬—২২ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম আবির্ভাব-তিথি উৎসব ও বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। বিভিন্ন দিনে উৎসবে যোগদান করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দুই পরামর্শদাতা অধ্যাপক জিল্লুর রহমান ও বি. কে. দাস, কবি বেগম সুফিয়া কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মণিরুজ্জমান মিঞা,

বিচারপতি রণধীর সেন, ডঃ পরেশচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ। উৎসবের শেষ দিনে প্রায় চোদ্দ হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো: গত মার্চ মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ এবং ডঃ মার্গারেট বেড্রোসিয়ান। বুধবার এবং শনিবারগুলিতে যথাক্রমে 'বিবেকচূড়ামণি'র ক্লাস ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা হয়েছে। ২০ মার্চ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মাণ্ডুক্য উপনিষদের একটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন। তাছাড়া ২৪ মার্চ রামনবমীর দিন সন্ধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি পূজা, ভক্তিগীতি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে।

সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটি: গত মার্চ মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা, মঙ্গলবারগুলিতে কঠ উপনিষদ্ ও বৃহস্পতিবারগুলিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ : দ্য গ্রেট মাস্টার' পাঠ ও আলোচনা করেছেন স্বামী চেতনানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো): স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের প্রতি রবিবার ও বুধবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং শনিবারগুলিতে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ২৩ মার্চ ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রি এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, সঙ্গীত, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন: মার্চ মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং ১৯ ও ২৬ মার্চ 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ২৪ মার্চ ও ২৯ মার্চ যথাক্রমে বালক-বালিকা ও বয়স্কদের জন্য দুটি বিতর্কের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক: মার্চ মাসের প্রতি রবিবার ধর্মীয় ভাষণ, প্রতি শুক্রবার 'বিবেকচূড়ামণি' এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি তাঁদের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে, গত ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত সোসাইটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উৎসব ছাড়াও বুদ্ধজয়ন্তী, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, যিশু খ্রীস্টের জন্মদিন ও ইস্টার উৎসব পালিত হয়েছে। তাছাড়া এই সোসাইটির উদ্যোগে 'বার্ষিক ৪ জুলাই' অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। সাপ্তাহিক ধর্মালোচনায় প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং প্রতি শুক্রবার ভগবদ্গীতার ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী তথাগতানন্দ। তাছাড়া প্রতি শনি ও রবিবার ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দ অন্যান্য বছরের মতো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে আমন্ত্রিত হয়ে ভাষণ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, তিনি গত দশ বছর যাবৎ নিউইয়র্কের প্রোটেস্ট্যান্ট সেমিনারিতে আমন্ত্রিত হয়ে হিন্দুধর্ম বিষয়ে আলোচনা-সভা করছেন এবং গত ছয় বছর ধরে এস. কানেক্টিকাট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রিত হয়ে হিন্দুধর্মের ওপর ভাষণ দিচ্ছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা): গত মার্চ মাসে যথারীতি অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ করেছেন স্বামী প্রমথানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, মাসের অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্যান্ডেলের বিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ১০ ফেব্রুয়ারি '৯১ স্বামী বিবেকানন্দের ১২৯তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদিন ব্যাপী এই উৎসবের অঙ্গ ছিল পূজা, গোষ্ঠী আলোচনা, ধর্মসভা ও শিশু-নাটিকা। অপরাহ্নে অধ্যাপক তপনকুমার ঘোষ রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা' নামক একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। বিকালে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ শশাংকশেখর মণ্ডল, ডঃ সুরেশকুমার কুইতি, অধ্যক্ষ শক্তিপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্যামল সরদার। পৌরোহিত্য করেন স্বামী দিব্যানন্দ। সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন রামগোপাল বিশ্বাস। সন্ধ্যায় স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দের লেখা শ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কীয় দুটি শিশু-নাটিকা পরিবেশন করে কনকনগর সৃষ্টিধর ইনস্টিটিউশনের ছাত্রছাত্রীরা। প্রায় দেড় হাজার ভক্ত নরনারী অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বসে প্রসাদ পান।

পাইকর, বীরভূম রামকৃষ্ণ সারদা-বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব সমিতির উদ্যোগে ৩ এবং ৪ ফেব্রুয়ারি—দুদিনের ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, ভজন ও কথামৃতপাঠের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দেবরাজানন্দ। দ্বিতীয় দিন ভাষণ দেন স্বামী কৃষ্ণানন্দ। প্রতিদিন অনুষ্ঠানশেষে রামকৃষ্ণ ও সারদা বাল্যলীলা-পালাকীর্তন করেন কীর্তনীয়া রতন রায় ও সম্প্রদায়। বিগত ছয় বছর ধরে এই স্মরণোৎসব পালিত হয়ে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ (গোয়াবাগান, কলকাতা-৬) গত ১৬—১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের প্রথম দিন বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন দুপুরে প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক অমিয় মজুমদার ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ঐ দিন দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করা হয়। বিতরণ করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। উৎসবের শেষদিন সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী ভক্তি-গীতি পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুচিত্রা মিত্র। এই উৎসব উপলক্ষে ১০ ফেব্রুয়ারি এক শোভাযাত্রারও আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, কাঁচড়াপাড়া (উত্তর ২৪ পরগনা) গত ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণোৎসব কাঁচড়াপাড়া হরিসভা প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপন করেছে। উৎসবের প্রথম দিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, গীতিনাট্য, ভাগবতপাঠ, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খাতাপত্র ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ও অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় দিন সকালে শোভাযাত্রা ও নগর-সঙ্কীর্তন, পূজা, হোম, ভক্তি-গীতি, বস্ত্র বিতরণ, গীতি-আলেক্ষ্য এবং দুপুরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ ও ডঃ পার্থদেব ঘোষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভগোদ্যান, গড়বালিয়া (হাওড়া) গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম আবির্ভাব-তিথি উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে পালন করেছে। প্রথম দিন বিশেষ পূজা, গীতাপাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি এবং মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় কর্তৃক 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃতপাঠ, 'ডোমজুর প্রেমিকতীর্থ' কর্তৃক ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং দুপুরে দুই সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সনাতনানন্দ ও দুলালচন্দ্র নায়েক। সন্ধ্যারাত্রির পর 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছায়াছবি দেখানো হয়।

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘে গত ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। যুবসম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বীরবাণী থেকে কবিতা আবৃত্তি এবং স্বামীজী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রীকেই স্বামীজীর বই উপহার দেওয়া হয়। যুব-সম্মেলনে ২০০জন প্রতিনিধি যোগদান করে। দ্বিতীয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে উপনিষদ্ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সর্বদেবানন্দ এবং স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং বক্তা ছিলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উভয়দিনের অনুষ্ঠানশেষে শিক্ষামূলক ও ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। দ্বিতীয় দিন ৫০০০ লোককে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন: গত ৮, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ, মাল (জলপাইগুড়ি) আশ্রমে উত্তরবঙ্গ (সমগ্র), আসাম (আংশিক), বিহার (আংশিক) ও নেপাল (আংশিক) অঞ্চলের রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলি দ্বারা গঠিত উত্তরাঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পরিষদে অন্তর্ভুক্ত তেত্রিশটি আশ্রমের মধ্যে সাতাশটি আশ্রমের প্রায় দুশো জন প্রতিনিধি এবং এক হাজার ভক্ত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন তিনটি করে অধিবেশনে বিভিন্ন আশ্রমের কার্য-বিবরণী পাঠ, যুবসম্মেলন, ধর্মসভা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দ (সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, জলপাইগুড়ি), স্বামী মঙ্গলানন্দ (সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, মালদহ) ও স্বামী রুদ্রেশ্বরানন্দ (সম্পাদক, রামকৃষ্ণ আশ্রম, মেখলিগঞ্জ)। তাছাড়া স্থানীয় বক্তা এবং প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় ও প্রশ্নোত্তরপর্বে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মসভাশেষে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙড় (দঃ ২৪ পরগনা) গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস পালন করে। ঐ দিন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী কমলেশানন্দ।

সারদা-রামকৃষ্ণ সেবক সংঘ, শ্রীরামপুর গত ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রথম দিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অমর পাড়ুই ও সম্প্রদায়। দ্বিতীয় দিনের ধর্ম-সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। সভার শেষে গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা **শ্রীমতী কাশীশ্বরী বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ২৪ জানুয়ারি ১৯৯১, ৭৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। আজীবন ব্রহ্মচারিণী কাশীশ্বরী দেবী সিঁথিতে থাকতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীগুরুর স্মরণ-মনন-পূজন ও সাধুসঙ্গই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। বাঙলা সাহিত্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বিষয়ক পঠন ও চিন্তন তাঁর যথেষ্টই ছিল। স্বজন, প্রতিবেশী, ভক্ত, ছাত্র—বিশেষতঃ দেওঘর বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ—সকলে তাঁর প্রীতি ভালবাসা ও স্নেহ লাভ করত। তিনি সর্বদা সকলের কল্যাণ কামনা করতেন।

উল্লেখ্য, প্রয়াতা কাশীশ্বরী দেবী স্বামী নিরাময়ানন্দ ও কলকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসাবে পেট্রলের বিকল্প

ইউক্রেন বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ইঞ্জিনীয়ারিং সেন্টারের খারকভ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত কো-অপারেটিভের ডিজাইনাররা মোটরগাড়ির জন্য বাষ্পীয় শক্তিকে সার্থকভাবে কাজে লাগাবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যুক্তভাবে এক নতুন ধরনের ইঞ্জিনের ডিজাইন তৈরি করেছেন যাকে বলা হচ্ছে স্টীমার।

এই ইঞ্জিনে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হবে গ্যাস, তরল প্রোপেন, মিথাইল অ্যালকোহল, কেরোসিন কিংবা নিম্নমানের গ্যাসোলিন। প্রচলিত ইন্টারন্যাল কমবাশ্চন ইঞ্জিনের মতো এর জ্বালানীতে অগ্নি-প্রজ্বালন হয় না, রাসায়নিকভাবে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে তাপ উৎপাদন করে। উচ্চচাপে উৎপাদিত এই অতিরিক্ত তাপ তৈরি করে এক ধরনের ফ্লুইড। এরই কিছুটা চেম্বারে পরিচালিত করে বাষ্পে পরিণত করা হয়। উচ্চচাপে ঘনীভূত এই বাষ্পশক্তি চাকা ঘোরাতে সাহায্য করে।

এই নতুন ইঞ্জিনের সুবিধা কি? প্রথমতঃ এর ওজন। প্রচলিত কমবাশ্চন ইঞ্জিনের ওজন যেখানে ২০০ কিলোগ্রাম, সেখানে এই নতুন ইঞ্জিনের ওজন মাত্র ৮০ কিলোগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ জ্বালানী খরচ তুলনামূলকভাবে প্রতি ১০০ কিলোমিটারে ৮-৯ লিটারের পরিবর্তে এর জ্বালানী খরচ ৪ লিটার। আর তৃতীয়তঃ পরিবেশগত নিরাপত্তার দিকটি। দহনক্রিয়া না হবার ফলে ঝুল-কালি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং ক্ষতিকারক নাইট্রিক অক্সাইড ইত্যাদি দ্বারা বায়ুদূষণেরও কোন সম্ভাবনা নেই।

[সোভিয়েত দেশ, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃঃ ৪৭]

এইডস রুখতে সূর্যের আলো

সূর্যের বর্ণালী যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তবে তাতে বেশ কিছু কালো দাগ আমাদের নজরে আসবে। বিজ্ঞানীরা একে বলেন ফ্রনহোফার লাইন। এই দাগগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এরা সবসময় এক জায়গায় স্থির থাকে, কখনো স্থান পরিবর্তন করে না। এই ফ্রনহোফার লাইনের সঙ্গে মানুষের জৈব প্রক্রিয়াগুলির ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়েই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন এইডস রোগ প্রতিরোধের উপায় বার করতে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন মানুষ বা উদ্ভিদ যেমন এই সৌরবর্ণালীর ফ্রণহোফার লাইন দিয়ে প্রভাবিত হয় ঠিক তেমনি ভাইরাসের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনাটা একই রকমের। প্রত্যেক ভাইরাসের দেহেই আছে ডি. এন. এ. বা আর. এন. এ.। আবার ডি. এন. এ. বা আর. এন. এ.-তে থাকে ম্যাগনেসিয়াম অণু। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, সৌরবর্ণালীর সাহায্যে যদি এইডস ভাইরাসের ম্যাগনেসিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন সেলকে বিক্রিয়া করানো যায় তবে এদের সক্রিয়তা অনেক কমে যাবে।

চুল দেখে রোগ নির্ণয়

চুলের মধ্যে থাকা রাসায়নিক মৌল পদার্থগুলি বিশ্লেষণ করেই বলে দেওয়া যাবে কোন মানুষের শরীরে কি ধরনের বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই পদ্ধতির আবিষ্কারক সোভিয়েত ইউনিয়নের মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার 'এলিমেন্ট'-এর বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন মানুষের চুলে কয়েকটি মৌল ধাতুর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়া বা কমা প্রকৃতপক্ষে শারীরিক অসুস্থতার সংকেত। যেমন চুলে যদি কপারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে, আর সেই সঙ্গে জিংক আর ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ কমে যায়, তবে বোঝা যাবে রোগী নার্ভাস টেনশনের শিকার। শুধু জিংক-এর পরিমাণ কমলে ধরতে হবে যে, রোগীর ইমিউন সিস্টেম কাজ করছে না।

[বর্তমান, ২৩ এপ্রিল, ১৯৯১, পৃঃ ৬]

সূচীপত্র

উদ্বোধন ৯৩তম বর্ষ আষাঢ় ১৩৯৮

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধনঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৮ সংখ্যা

☐ নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারের 'উদ্বোধন'-এর **আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য ঃ **চব্বিশ টাকা**।

☐ **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি **আঠারো টাকায়** পাবেন; **৩১ আগস্ট** '৯১-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে তাঁরা প্রতি কপি **পনেরো টাকায়** পাবেন।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **৩১ আগস্ট** '৯১-এর মধ্যে **সেই সংবাদ** কার্যালয়ে **অবশ্যই** পৌঁছানো প্রয়োজন। **৩১ আগস্ট** '৯১-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে পত্রিকা **সাধারণ ডাকেই** যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ **সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে** আমাদের পক্ষে **দ্বিতীয়বার** দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে **রেজেস্ট্রি ডাকেও** আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজেস্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ **সাত টাকা ৩১ আগস্ট** '৯১-এর মধ্যে **কার্যালয়ে পৌঁছানো** প্রয়োজন। **ঐ তারিখের পরে** টাকা কার্যালয়ে পৌঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের **আগামী বছরের** ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর** পর্যন্ত কার্যালয় থেকে আশ্বিন **সংখ্যাটি** দেওয়া হবে। গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই **সময়ের মধ্যে** তাঁদের পত্রিকা অবশ্যই সংগ্রহ করে নেন।

☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত **খোলা** থাকে, রবিবার **বন্ধ**। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকেল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। **৭ অক্টোবর মহালয়া উপলক্ষে এবং ১৫ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।**

মুখ্য সম্পাদক
উদ্বোধন

১ আষাঢ় ১৩৯৮

উদ্বোধন

আষাঢ়, ১৩৯৮ | জুন, ১৯৯১ | ৯৩তম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

দিব্য বাণী

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥

কঠ উপনিষদ্

আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে বল্গা বলিয়া জানিবে।

জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়সমূহকে অশ্ব বা রথের গমনপথ বলেন। ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত আত্মাকেই তাঁহারা ভোগকর্তা বলেন।

কথাপ্রসঙ্গে

প্রসঙ্গ রথযাত্রা

'রথযাত্রা' হিন্দুদের জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন ভারতবর্ষে বিষ্ণু, শিব, সূর্য, ভগবতী প্রভৃতি দেব-দেবীকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুদের মধ্যে রথযাত্রা উৎসব প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যেও বুদ্ধ এবং পার্শ্বনাথ ও মহাবীরকে লইয়া রথযাত্রা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। হিন্দু অথবা জৈন অথবা বৌদ্ধ—কোন্ সম্প্রদায় সর্বপ্রথম রথযাত্রা প্রবর্তন করিয়াছিল তাহা লইয়া নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, হিন্দুরাই উহার প্রথম প্রবর্তক, কেহ জৈনদের, কেহ-বা বৌদ্ধদের ঐ কৃতিত্ব দানের পক্ষপাতী। প্রবর্তন যাহারাই করুক না কেন, বর্তমানে ভারতবর্ষে 'রথযাত্রা' বলিতে আমরা পুরীর জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রাকেই বুঝি। অন্য সমস্ত রথযাত্রা উৎসব জগন্নাথের রথযাত্রায় যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, অথবা বলা যায় জগন্নাথের রথ অন্য সমস্ত রথকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পুরীতে জগন্নাথের মূল রথযাত্রা মহাসমারোহে প্রতি বৎসর উদ্‌যাপিত হইলেও ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ঐ একই তারিখে এই উৎসব যথেষ্ট উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথের রথযাত্রার প্রবর্তন-কাল জানা না যাইলেও উহা যে অন্ততপক্ষে দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহা-পুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে সুস্পষ্টভাবে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বা পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রার উল্লেখ ও বর্ণনা হইতে আমরা ঐ সিদ্ধান্তে আসিতে পারি।

উপাস্য বা দেববিগ্রহকে লইয়া রথযাত্রা উৎসব প্রবর্তনের পশ্চাতে কি কারণ থাকিতে পারে? মন্দিরে তো বিগ্রহ নিত্য পূজিত হইতেন, কখনও কখনও তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানাদিও পালিত হইত। তাহার উপর আবার বিগ্রহকে লইয়া রথভ্রমণ কেন? আমাদের মনে হয়, প্রথমতঃ উপাস্যকে ভক্ত ও সাধকগণের নানাভাবে সম্ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই বিচিত্র উৎসবটির সূচনা হয়। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ তিথিতে বা পর্ব উপলক্ষে মন্দিরে সমারোহ ও পূজার্চনার ব্যাপকতা নিশ্চয়ই থাকিত, কিন্তু উহা ছিল দৈনন্দিন পূজার্চনা ও আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধতারই সম্প্রসারণ-মাত্র। আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধতা ও প্রাত্যহিক পূজার্চনা হইতে ভক্ত ও উপাসকদের মনে অবসাদ ও একঘেয়েমি আসা স্বাভাবিক। রথযাত্রা সেক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল বৈচিত্র্য সংযোজন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ প্রাত্যহিক পূজার্চনা এবং মন্দিরকেন্দ্রিক অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি অপেক্ষা রথযাত্রার মধ্যে একটি ভিন্ন ধরনের চমৎকারিত্ব ও জাঁকজমকের ব্যাপার রহিয়াছে। সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করিবার পক্ষে উহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

চতুর্থতঃ রথযাত্রার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে ব্যষ্টির আনন্দকে সর্বজনীন আনন্দে বিস্তৃত করিবার একটি আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল বলিয়া মনে হয়। মন্দিরে যে নিত্য পূজার্চনা, তাহাতে পূজক ও মুষ্টিমেয় ভক্ত অংশগ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে উহা নিছকই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের অনুষ্ঠান। বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে যে মন্দির-কেন্দ্রিক উৎসব-অনুষ্ঠানের সমারোহ হইত, তাহাতে অধিক সংখ্যায় মানুষ অংশগ্রহণ করিলেও উহাতে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় এবং উচ্চবর্ণেরই ছিল অংশগ্রহণের অধিকার। পূজা ও মহোৎসবের অঙ্গনে গণমানুষের কোন স্থান ছিল না। রথযাত্রায় রাজাধিরাজ ও ব্রাহ্মণ হইতে শুরু করিয়া দীনদরিদ্র, অন্ত্যজ মানুষ সকলেই উৎসবের আনন্দ সমভাগে ভাগ করিয়া লইত। স্বার্থপরতার গণ্ডিকে ভাঙিয়া অপর সকলের মধ্যে আনন্দকে প্রসারিত করিয়া দিবার যে বাসনা আমাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল রথযাত্রার মধ্যে তাহাকে রূপদান করিবার একটি সচেতন প্রয়াসই আমরা লক্ষ্য করি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে সমাজে ধর্মীয় বিশেষ অধিকারের অবসান চাহিতেন এবং উচ্চ-নীচ সকলকে লইয়া একটি মিলিত সমাজের স্বপ্ন দেখিতেন রথযাত্রার মধ্যে তাহার ইঙ্গিত আমরা পাই। উৎসবকে সর্বজনীন করিবার এই যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখি, উহা সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রাচীনত্বের দাবি করিতে পারে কিনা পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়া দেখিতে পারেন। সেইসঙ্গে তাঁহারা ইহাও অনুসন্ধান করিতে পারেন যে, ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া, ধর্মকে মাধ্যম করিয়া ভারতবর্ষের মানুষ সাম্যকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করিবার এই যে চিন্তা-ভাবনা ও পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল, উহা অপেক্ষা প্রাচীনতর কোন চিন্তা-ভাবনা ও পন্থতির সংবাদ পৃথিবীর অন্যত্র রহিয়াছে কিনা।

পঞ্চমতঃ রথযাত্রার মতো একটি জনপ্রিয় উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ধর্মকে সরলীকৃত ও সহজগ্রাহ্য করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষকে বুঝানো হইয়াছিল: রথ হইল ভ্রাম্যমাণ মন্দির। যে মন্দির অচল, যে বিগ্রহ স্থাণু—সেই মন্দির এবং সেই বিগ্রহ যেন মানুষের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত। সেই ভ্রাম্যমাণ মন্দির ও সচল বিগ্রহকে দেখিয়া ধন্য হও, কৃতার্থ হও। জনারণ্যে, প্রকাশ্য জনপথে ঈশ্বরের আগমন উপলক্ষে আনন্দ কর। এই উৎসবে অংশগ্রহণে বর্ণের কোন ভেদ নাই, অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠারও কোন স্থান নাই। দেবতার এই আনন্দযজ্ঞে আসাধারণের নির্বিচার নিমন্ত্রণ। শুধু ইহাতে অংশগ্রহণেই তোমরা পরম গতির অধিকারী হইবে, রথস্থ দেববিগ্রহকে শুধু দর্শনেই যাবতীয় সাধনার লক্ষ্য যে ঈশ্বরের পদস্পর্শ লাভ, তাহা তোমরা সুনিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত হইবে।

এই ভাবটি রথযাত্রার মতো জনপ্রিয়, বর্ণময়, দৃষ্টি-আকর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুব সহজে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করানো যে সম্ভব হইয়াছিল, পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব দর্শন করিয়া দুই হাজার বৎসর পরেও আমরা বুঝিতে পারি। ধর্ম যে একটি সহজ বিষয়, দার্শনিক জটিলতা-কণ্টকিত দুর্বোধ্য কোন ব্যাপার নহে, ইহা সাধারণ মানুষকে বুঝানোর প্রয়োজন—এই বিষয়টি অনুভব করিয়াছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষগণ। তাঁহারা জানিতেন, ধর্মকে দুর্বোধ্য করিয়া, সাধারণের নাগালের বাহিরের ব্যাপার করিয়া রাখিলে সমাজই দুর্বল হইয়া পড়িবে। কারণ, ধর্মই তো মানুষকে ধারণ করিয়া রাখে, ধর্ম সমাজকে পুষ্টি যোগায়, পরিবারকে শাশ্বত মূল্যবোধের উপর স্থাপন করিয়া মহাবিনষ্টি হইতে উহাকে রক্ষা করে। ধর্মের মূল হইল ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস; এই জগৎ-সংসাররূপ রথ যে প্রতিনিয়ত যথাযথ গতিবান রহিয়াছে সে তাঁহারই অঙ্গুলি-হেলনে—উহাতে বিশ্বাস। তাঁহাকে জানিলে, তাঁহাকে পাইলে, মানুষ সকল দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। ধর্মভাবনা ও ঈশ্বরভাবনাকে এবং তৎসম্পর্কিত আনন্দ-উৎসবকে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-যুবা-বৃদ্ধ, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমবেতভাবে সম্ভোগ করিবার অপর কোন কার্যকরী পদ্ধতি রথযাত্রা ভিন্ন হিন্দুধর্মে আর নাই। খ্রীস্টানধর্মে এবং ইসলামধর্মে সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্মে ঐরূপ কোন অনুষ্ঠান নাই। মনে হয়, সমবেত প্রার্থনার প্রয়োজন মিটাইতে রথযাত্রার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। [পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নাম-সংকীর্তন আনুষ্ঠানিকভাবেই হিন্দুধর্মে সমবেত প্রার্থনা সংযোজিত করিয়াছিল।]

রথ যেন ভ্রাম্যমাণ মন্দির এবং রথস্থ বিগ্রহ যেন চলমান মন্দির-বিগ্রহ—এই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে গভীরভাবে প্রোথিত হইয়াছে। রথকে স্পর্শ করিবার জন্য, রথস্থ বিগ্রহকে দর্শন করিবার জন্য বিশেষ করিয়া পুরীতে রথযাত্রাকালে অগণিত মানুষ

যে উদগ্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। পদ্মপুরাণের রথযাত্রা প্রকরণে বলা হইয়াছে :

রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদী-মহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে ॥

—রথযাত্রার মহোৎসবে রথে গমনশীল তাঁহাকে (অর্থাৎ জগন্নাথদেবকে) যাঁহারা প্রীতি ও ভক্তির সহিত দর্শন করেন তাঁহারা হরি-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

পূজার্চনার প্রয়োজন নাই, ব্রত-উপবাসের প্রয়োজন নাই, ধ্যান-ভজনেরও প্রয়োজন নাই। শুধু রথস্থ দেববিগ্রহকে দর্শন করিলেই হইল। শুধু একটি শর্ত—দর্শনের সহিত যেন প্রীতি ও ভক্তি সংযুক্ত থাকে। ভক্তজনবাঞ্ছিত হরির পাদপদ্মে বাস উহাতেই নিশ্চিত। শুধু কি হরির পাদপদ্মে বাস? জীবনের লক্ষ্য যে মুক্তিলাভ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পুনরাবর্তনের নিঃশেষ বিরতি—উহাও সম্ভব হয় রথস্থ বিগ্রহকে দর্শন করিলে। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে বলা হইয়াছে : "রথস্থং (পাঠান্তরে 'রথে তু'/'রথে চ') বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"—রথস্থিত বামন অর্থাৎ বিষ্ণুকে (অর্থাৎ জগন্নাথদেবকে) দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

কিন্তু বাস্তবিক কি ইহা হইতে পারে? এত অনায়াসে ঈশ্বরের নিত্যসান্নিধ্য প্রাপ্তি এবং সুদুর্লভ মুক্তিলাভ সম্ভব? রথের মধ্যে বিগ্রহকে দেখিলেই যদি বৈকুণ্ঠবাস ও মুক্তিলাভ সম্ভব হইত তাহা হইলে তো প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মানুষের মুক্তি ও পরম গতি লাভ হইয়া যাইত। অবশ্য সত্যকারের ভক্তি-দৃষ্টি থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব। তবে রথযাত্রার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উহা নহে। উহা তবে কি?

রথ ও রথস্থ বিগ্রহ হইল প্রকৃতপক্ষে প্রতীকী এবং উহার মাধ্যমে বেদান্তের একটি গভীর দার্শনিক ভাবনা ও একটি সমুচ্চ ধর্মীয় তত্ত্বকে সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। কঠ উপনিষদে (১৷৩৷৩) বলা হইতেছে : "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।" (হৃদিস্থিত আত্মাকে রথী এবং দেহযন্ত্রকে রথ বলিয়া জানিবে।) দেহরূপ রথে ভগবানকে বসাও, দেহের মধ্যে দেহিরূপ আত্মাকে দর্শন কর, তুমিই যে তিনি তাহা উপলব্ধি কর। সেই অভিজ্ঞতার আনন্দই হইল প্রকৃত রথযাত্রার আনন্দ। সেই অভিজ্ঞতা লাভ হইলে ভক্তিমার্গের সাধক ভগবানের দর্শন পাইবেন, ভগবানের নিত্যসান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইবেন; জ্ঞানমার্গের সাধক আত্মসাক্ষাৎকার করিবেন, মুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। ঘটাকাশ ভাঙিয়া চিদাকাশে বিলীন হইয়া যাইবে, লবণের পুত্তলিকা সমুদ্রে আপনার আকার হারাইয়া সমুদ্রের সহিত একীভূত হইয়া যাইবে।

স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—দেহ হইতে আত্মার এই যাত্রাকে রথের গতি যেন প্রতীকায়িত করিতেছে। ধর্ম মানুষকে গতির মন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ করে। ধর্ম মানুষকে বলে—তুমি চল, চল, চল—চলিতেই থাক। "চরৈবেতি"। যতক্ষণ তুমি সীমার বন্ধন হইতে বাহির হইতে না পারিতেছ, যতক্ষণ তুমি অসীমকে স্পর্শ করিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি থামিবে না। অসীমকে যখন পাইবে তখনই—শুধু তখনই, তোমার জীবনরথের যাত্রা শেষ হইবে. তখন তুমি উপলব্ধি করিবে তুমিই তিনি—"তত্ত্বমসি", আমিই তিনি—"সোঽহম্"। উপলব্ধি করিবে—সকল বস্তুতেই তিনি বিরাজিত—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"; "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়"। উপলব্ধি করিবে—"হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। / হরিতো জগতো নহি ভিন্নতনুঃ॥" —হরিই জগৎ, জগতই হরি। হরি এবং জগৎ এক এবং অভিন্ন। *উপনিষদের ঋষির মতো তোমারও* মর্মমূল হইতে উৎসারিত হইবে সেই মহা-উদ্ঘোষণ :

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

—যিনি সকল প্রাণীকে নিজের মধ্যে এবং সকল প্রাণীর মধ্যে নিজেকে দেখেন, তিনি তাহার পর আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

সত্যই তো। কে আর তখন কাহাকে ঘৃণা করিবে, কে আর কাহাকে হিংসা করিবে, কে আর কাহাকে আঘাত করিবে? আমি কি আমাকে ঘৃণা করি, আমি কি আমাকে হিংসা করি, আমি কি নিজেকে আঘাত করি? সকলের মধ্যেই যে আমি, আমার মধ্যেই যে সকলে! এই উপলব্ধিতেই জীবনের চরিতার্থতা, সাধনার পরিপূর্ণতা। চারণ-সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য পুরীর পথে পথে হাঁটিতেছেন। গৃহ-পথ, বৃক্ষ-লতা, মানুষ-পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, সরোবর-সমুদ্র—যাহা দেখিতেছেন তাহার মধ্যেই তিনি জগন্নাথকে দেখিতেছেন, দেখিতেছেন তাঁহার প্রিয়তম কৃষ্ণকে। বলিতেছেন : "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে

দেখি—চোর, সাধু সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতেছেন। একজন মানুষকে, একটি পতঙ্গকে কেহ আঘাত করিলে তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করিতেছেন, ঘাসের উপর কেহ হাঁটিলে তিনি ব্যথা পাইতেছেন। শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের দৃষ্টিকে নিজেদের সীমিত দৃষ্টির বাহিরে লইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা সর্বত্র দেখিতেছেন পুরুষোত্তমকে এবং স্বয়ংও হইয়া উঠিয়াছেন পুরুষোত্তমের জীবন্ত বিগ্রহ।

শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপলব্ধিতে আমরা রথযাত্রার তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হইতে দেখি। বস্তুতঃ, অদ্বৈত-অনুভূতিতেই রথযাত্রার সমাপ্তি।

মরণজয়ী যে জীবন

গত ২১ মে ১৯৯১ ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম বরেণ্য জননায়ক রাজীব গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত। সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেভাবে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় ভারত এবং পৃথিবীর নিকট তিনি শুধু একজন বিশিষ্ট জননেতা হিসাবেই প্রতিভাত হন নাই, তদপেক্ষা অনেক মহত্তর মহিমায় তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহিত নেহরু-গান্ধী পরিবারের চার-পুরুষের সম্পর্ক। মতিলাল-স্বরূপরানীর সময় হইতে যে সম্পর্কের সূচনা হইয়াছিল, কমলা-জওহরলাল ও ইন্দিরার সময়ে যাহা সুগভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, রাজীব তাহা সর্বতোভাবেই অটুট রাখিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণ ও বাক্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা তিনি অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিতেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ সম্পর্কে তাঁহার বিনম্র ও সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় আমরা বারবার পাইয়াছি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী রাজীব বেলুড় মঠে আসিয়াছেন, ভূতপূর্ব সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ এবং স্বামী গম্ভীরানন্দের দেহরক্ষার সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহাদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রেরণ করিয়াছেন, সেবা প্রতিষ্ঠানে অসুস্থ স্বামী অভয়ানন্দের (ভরত মহারাজের) শয্যাপার্শে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার দেহান্তে তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধাবার্তা পাঠাইয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণের স্বল্পকালের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস ১২ জানুয়ারিকে 'জাতীয় যুবদিবস' এবং ১২ জানুয়ারি হইতে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত কালসীমাকে 'জাতীয় যুবসপ্তাহ' হিসাবে ঘোষণা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁহার সমুচ্চ শ্রদ্ধা এবং স্বামীজীর ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তাঁহার সুদৃঢ় প্রত্যয়কে প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি যেমন গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমনই গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ভারতের সুমহান ও সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ঐতিহ্য সম্পর্কেও। 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পর্কেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। 'উদ্বোধন'-এর গত ১৩৯৬ সালের আষাঢ় (১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের জুন) সংখ্যায় 'অগ্নি'র সফল উৎক্ষেপণ উপলক্ষে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রীর শত ব্যস্ততার মধ্যেও অত্যন্ত দ্রুত স্বহস্তে স্বাক্ষরিত একটি অভিনন্দন-বার্তা তিনি ঐসময় আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

দেশের এক ভয়ানক সঙ্কটমুহূর্তে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়াছিলেন। এমন একটি সময়ে শোচনীয় অকালমৃত্যু তাঁহাকে বরণ করিতে হইল যখন শুধু ভারতবর্ষই নহে, সমগ্র পৃথিবীই সাগ্রহে তাঁহার পরিণত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রত্যাশা করিতেছিল। এই মৃত্যু অশুভশক্তি, সংকীর্ণতা ও হিংসার নিকট তাঁহার পরাজয় অবশ্যই, কিন্তু নির্ভীক লোকনায়কের সেই পরাজয় যে আজ সহস্র জয় অপেক্ষা মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও পরম সত্য। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার প্রতি দেশ ও বিদেশের অগণিত মানুষের সহিত আমাদেরও গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৩ ॥

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে মঠ স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই শ্রীমা এই বাড়িটিতে কয়েকবার এসে বসবাস করেছিলেন। শ্রীমায়ের অনেক পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এ-বাড়ি ও এখানকার প্রাঙ্গণ। স্থানটি ছিল শ্রীমায়ের বিশেষ প্রিয়। পরবর্তী কালে তিনি বলেছিলেন : "আহা! বেলুড়েও কেমন ছিলুম। কি শান্ত জায়গাটি, ধ্যান লেগেই থাকত। তাই ওখানে একটি স্থান করতে নরেন ইচ্ছা করেছিল।"[৩০] স্বাভাবিকভাবে আমাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, শ্রীমা এ-বাড়িতে কবার এবং প্রতিবারে কদিন করে ছিলেন? সেসময়ে শ্রীমায়ের থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করতেনই বা কে বা কারা? কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমা একদিন বলেছিলেন : "আর (গিরিশবাবু) আমাকে দেড় বছর রেখেছিল বেলুড়ে নীলাম্বরের বাড়িতে।"[৩১] ভক্ত গিরিশচন্দ্রের বিশেষ আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও তিনি শ্রীমায়ের বাড়িভাড়া ও অন্যান্য খরচ সেসময়ে বহন করেছিলেন।

প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি থেকে জানা যায়, শ্রীমা এ-বাড়িতে প্রথম বাস করেছিলেন ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে। এবছরের প্রথমদিকে বলরাম-গৃহিণী কৃষ্ণভাবিনী ও তাঁর গর্ভধারিণী মাতঙ্গিনী অকস্মাৎ কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। সেখানে শ্রীমায়ের অতীব অভাবগ্রস্ত জীবন দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং কলকাতায় ফিরে এসে ভক্তদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। ভক্তগণ উদ্যোগী হয়ে শ্রীমাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীমা মে মাসের মাঝামাঝি কোন দিন থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস এ-বাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে কলকাতায় বলরাম ভবনে এসেছিলেন এবং কয়েকদিন পরেই ৫ নভেম্বর জাহাজে চড়ে পুরী যাত্রা করেছিলেন।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িটি ভাড়া পাওয়া যায়নি। শ্রীমাকে থাকতে হয়েছিল বেলুড়ে ও ঘুষুড়িতে ভাড়াবাড়িতে। তিনি দ্বিতীয়বার এ-বাড়িতে বাস করেছিলেন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের আষাঢ় মাস থেকে জগদ্ধাত্রীপূজার কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস। সে-বছর জগদ্ধাত্রীপূজার তারিখ ছিল ১৮ নভেম্বর। তিনি তৃতীয়বার[৩২] নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের প্রায় দুর্গাপূজা পর্যন্ত আনুমানিক তিনমাস কাল। সে-বছর দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী পড়েছিল ২১ আশ্বিন ১৩০১ অর্থাৎ ৬ অক্টোবর ১৮৯৪। পূজাতে শ্রীমা আঁটপুর গিয়েছিলেন মাতঙ্গিনীদেবীর আমন্ত্রণে। চতুর্থবার তিনি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে এ-বাড়িতে কয়েকদিন বাস করে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত প্রথম দুর্গাপূজায় যোগদান করেছিলেন। তাছাড়া ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনদিন—২৮ মার্চ, ১২ নভেম্বর ও ২০ ডিসেম্বর—তিনি এ-বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন। সেসময় মঠ ছিল এ-বাড়িতেই। এভাবে দেখা যায় শ্রীমা নীলাম্বর ভবনে প্রায় দেড়বছর বাস করেছিলেন।

এই মনোরম পরিবেশে শ্রীমা তীব্র সাধনভজনে ডুব দিয়েছিলেন। গঙ্গার পশ্চিমকূলে শ্রীমা আর

৩০ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৪৭

৩১ ঐ, পৃঃ ৮৯

৩২ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৯৪ এবং শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ৮ম সং, পৃঃ ৬৯ দ্রষ্টব্য। এ-দুটি সূত্রেই জানা যায় শ্রীমা কৈলোয়ার থেকে ফিরে এসে জয়রামবাটী গেছিলেন। কিছুকাল পরে ফিরে এসে বেলুড়ে বাস করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি থেকে আমাদের নিশ্চিত ধারণা যে, শ্রীমা এইবার নীলাম্বর-ভবনেই বাস করেছিলেন।

পূর্বকালে বরাহনগরে এবং পরে আলমবাজারে ত্যাগী সন্তানগণ একই ভাবাদর্শে অনুরঞ্জিত হয়ে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের সাধনার ফসলরূপ পলি বহন করে পবিত্র গঙ্গা যে অধিকতর ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে উঠেছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। নীলাম্বর-ভবনে শ্রীমা কখনো গভীর ধ্যানে স্থির হয়ে থাকতেন, কখনো-বা সমাধিস্থ হতেন, আবার বুত্থিত অবস্থায় বলে উঠতেন: "ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?" এ-বাড়িতে শ্রীমা দ্বিতীয়বার থাকাকালীন রান্নাঘরের ছাদের ওপর মাটি ফেলে 'পঞ্চতপা'র যোগাড় করা হয়েছিল। তিনি পঞ্চতপা সাধন[৩৩] করে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরহের দাবাগ্নি নির্বাপিত করেছিলেন। এইকালে তাঁর নানাবিধ দিব্যদর্শন ঘটেছিল। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, দেখতে পেয়েছিলেন নীল জ্যোতি, লাল জ্যোতি, আরও কত কি। এ-সকলের মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ প্রাসঙ্গিক একটি দিব্যদর্শন। সেটি ঘটেছিল এখানে, চন্দ্রালোকিত এক সন্ধ্যায়। স্নানের ঘাটে শ্রীমা একাকী বসেছিলেন। তিনি অকস্মাৎ দেখতে পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তর তর করে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। তাঁর দিব্যতনু মিশে গেল গঙ্গার জলে। আর সেই জল নরেন্দ্রনাথ চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে অগণিত মানুষকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। শ্রীমায়ের এই অত্যাশ্চর্য দর্শনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মঠ ও মিশনের ইতিহাস-প্রণেতা স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন: "This to her symbolised the future of the Ramakrishna Order. It was to save the world with the Masters' message."[৩৪]

এ-বাড়িতেই কথামৃতকারের স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী ২ জুলাই ১৮৮৮ তারিখে শ্রীমায়ের পাদপূজা করেছিলেন। শ্রীমা তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন ৩০ অক্টোবর ১৮৮৮। রথযাত্রার দিন শ্রীম কথামৃতের পাণ্ডুলিপির কতকাংশ শ্রীমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুমোদন ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। এ-কালেই স্বামী অভেদানন্দ 'প্রকৃতিং পরমাম্ অভয়াং বরদাং' ইত্যাদি বিখ্যাত সারদাস্তোত্রটি শ্রীমাকে শুনিয়েছিলেন। প্রসন্ন হয়ে শ্রীমা তাঁকে বলেছিলেন: "তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসবেন।" এই কালে শ্রীমায়ের সঙ্গিনী ছিলেন মুখ্যতঃ গোলাপ-মা ও যোগীন-মা। প্রথমবার মায়ের বাড়ির দ্বারী ও সেবক ছিলেন স্বামী যোগানন্দ। দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে যোগদান করেছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। বরাহনগর মঠে স্থানাভাবের জন্য স্বামী অদ্ভুতানন্দ কিছুদিন এখানে বাস করেছিলেন। তৃতীয়বারও তাঁর সেবক ছিলেন স্বামী যোগানন্দ।

এ-বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য দুর্গাচরণ নাগ শ্রীমায়ের বিশেষ কৃপালাভ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেছিলেন: "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।" আগেই বলা হয়েছে, এখানেই মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ শ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। শ্রীম প্রমুখ ঘনিষ্ঠ কোন কোন পুরুষ ভক্ত ছাড়াও মহিলা ভক্ত এবং স্থানীয় কয়েকজন মহিলা শ্রীমায়ের নিকট আসতেন তাঁর কৃপামধু সংগ্রহের আশায়। তাছাড়াও বরাহনগর মঠ এবং পরবর্তী কালে আলমবাজার মঠ থেকে সাধুরা কখনো কখনো আসতেন শ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করতে।

মঠবাসিগণের সাদর আমন্ত্রণে শ্রীমা নীলাম্বরবাবুর বাগানের মঠবাড়িতে শুভ পদার্পণ করেছিলেন সোমবার, ২৮ মার্চ ১৮৯৮ (১৫ চৈত্র, ১৩০৪)।[৩৫] বাসন্তীপূজার শুভারম্ভে তখন দেশবাসী মেতে

৩৩ শ্রীমা নিজমুখে বলেছিলেন: "পঞ্চতপার যোগাড় করা হলো। তখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। চারদিকে ঘুঁটের আগুন, ওপরে সূর্যের প্রখর তেজ। প্রাতে স্নান করে কাছে গিয়ে দেখি আগুন গম গম করে জ্বলছে। প্রাণে বড়ই ভয় হলো, কি করে ওর ভিতর যাব, আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে বসে থাকব। পরে ঠাকুরের নাম করে ঢুকে দেখি আগুনের কোন তেজ নেই। এভাবে সাতদিন কাজ করি। কিন্তু বাবা, শরীরের বর্ণ কাল ছাই হয়েগিছল।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭৯-২৮০)

৩৪ The History of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, 2nd Edn., p. 49

৩৫ সেদিন পূর্বাহ্ণে ছিল বাসন্তীপূজার ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ আর সন্ধ্যায় ছিল আমন্ত্রণ ও অধিবাস। এই তারিখ মঠের ডায়েরী থেকে প্রাপ্ত। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৭) লিখেছেন যে, দিনটি ছিল এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের এক দিন। এই তথ্যের আকর আমাদের জানা নেই।

উঠেছে, আর এদিকে করুণাময়ী শ্রীমায়ের শুভ উপস্থিতিতে মঠবাসিগণের মধ্যে আনন্দের তুফান উঠেছে। শ্রীমায়ের নৌকা নীলাম্বরবাবুর বাগানের ঘাটে লাগতেই মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল। মায়ের সঙ্গে এসেছিলেন স্বামী যোগানন্দ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল ও গোলাপ-মা। শ্রীমা অবতরণ করলে সন্ন্যাসিগণ তাঁর শ্রীচরণ ধুয়ে দিলেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখের দালানে তিনি আসন গ্রহণ করলে মঠবাসিগণ একে একে তাঁকে প্রণাম করলেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে শ্রীমা নিজহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগ নিবেদন করেন এবং সর্বশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন দেন। মধ্যাহ্নে আহার ও বিশ্রামের পর শ্রীমা নৌকায় কলকাতা ফিরে যান। যাবার আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সানুনয় অনুরোধে শ্রীমা নৌকাতে চড়ে মঠের নতুন জমি দেখতে অগ্রসর হন। সেবক স্বামী যোগানন্দ নদীর পার ধরে হেঁটে চললেন। এই জমিতে অবস্থিত পুরনো একতলা বাড়িতে বাস করছিলেন মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড এবং ভগিনী নিবেদিতা। তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নতুন জমিখণ্ড দেখান।[৩৬] দেখে-শুনে শ্রীমায়ের খুব আনন্দ। ক্রমে নতুন জমিতে মঠের ঘরবাড়ি উঠতে শুরু হয়। মায়ের প্রার্থনার ফলেই শেষে তাঁর 'ছেলেদের' 'নিজেদের' ঠাঁই হলো।

উপরোক্ত ঘটনাপ্রবাহের তাৎপর্য বিচার করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে দেড় বছর অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে তন্মত শ্রীমা তাঁর সর্বকল্যাণদাত্রী ভবিষ্য-ভূমিকায় ক্রমে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন। তাঁর আচরণ-বিচরণের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘজননীর রূপটিও ক্রমোন্মোচিত হচ্ছিল।

এখন প্রশ্ন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে থাকাকালীন মঠের নাম কি ছিল? সে-সময়ে রামকৃষ্ণ মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশন নাম ব্যবহার হতো কি? আলমবাজার মঠের শেষ পর্যায়ে মঠবাসিগণের মধ্যে এ-প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। ১৩ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে স্বামীজী একটি চিঠিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন: "মঠের নাম কি হইবে একটা স্থির তোমরাই কর।" প্রকৃতপক্ষে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে অবস্থানকালে মঠের নাম সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সে-কারণে দেখা যায় স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রমুখ সকল মঠবাসী নিজ নিজ চিঠিতে ঠিকানা লিখেছেন: 'The Math, Beloor', 'Math, Beloor' বা 'মঠ, বেলুড় পোস্ট অফিস'।

মঠবাসীদের নিয়ে মঠ। আলোচ্যকালে মঠে কে কে স্থায়িভাবে বাস করেছেন, কেই বা অস্থায়িভাবে বাস করেছেন; আর শ্রীশ্রীঠাকুরের সব ত্যাগী সন্তানই কি এখানে একত্রে বাস করেছিলেন?

বলাবাহুল্য মঠবাসিগণের মধ্যমণি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন যাদু ছিল যে, তাঁর উপস্থিতিতে মঠজীবন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠত; মঠবাসিগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত হতো মহৎ ভাবের প্রেরণা। ফলে ঐহিক যাবতীয় অসুবিধা অগ্রাহ্য করে তাঁরা এক মহৎ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হতেন। আলোচ্য সময়ের মধ্যে ৩০ মার্চ পর্যন্ত স্বামীজী প্রধানতঃ নীলাম্বরবাবুর বাগানে বাস করেছিলেন, মাঝে কোন কোন দিন কলকাতায় গিয়ে বলরাম-ভবনে বাস করেছেন। ৩০ মার্চ ১৮৯৮ স্বামীজী দার্জিলিং যান। সেখান থেকে ফিরেছিলেন ৩ মে। কয়েকদিন মঠে কাটিয়ে ডাক্তার ও গুরুভাইদের পরামর্শে তিনি ১১ মে যাত্রা করেছিলেন নৈনীতালের উদ্দেশে। উত্তরভারতের কয়েকটি স্থান এবং কাশ্মীর পরিভ্রমণ করে অকস্মাৎ মঠে ফিরেছিলেন ১৮ অক্টোবর। সঙ্গে ছিলেন স্বামী সদানন্দ। তাঁর স্বাস্থ্যের পুনরায় বিশেষ অবনতি ঘটাতে তিনি দেওঘর গিয়েছিলেন ১৯ ডিসেম্বর। আর দেওঘর থেকে নবনির্মিত বেলুড় মঠে ফিরে এসেছিলেন ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। অর্থাৎ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে স্বামীজী বাস করেছিলেন মোট ৩ মাস ২৮ দিন। তাঁর অনুপস্থিতিতে মঠ-জীবনে নেমে আসত বিষাদ ও উৎসাহের অভাব। একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক। ১১ মে স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ,

[৩৬] মঠের ডায়েরীতে লেখা রয়েছে: "Mother comes with company; visits the American ladies and departs after taking prasad."

স্বামী সদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, শ্রীমতী ওলি বুল, শ্রীমতী প্যাটারসন, শ্রীমতী ম্যাকলাউড ও ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামীজী হাওড়া থেকে ট্রেন ধরেন নৈনীতালের উদ্দেশে। সেদিনকার মঠের ডায়েরীতে লেখা হয়েছিল ঃ "The Math which had been all gay and alive wore an air of solemn dryness and vacancy having lost the gracious and sacred companionship of Swamiji and Turiyanandaji."

আলোচ্যকালে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকাতে বেদান্ত-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ আমেরিকাতে বেদান্ত-প্রচার শেষ করে কলকাতায় পেঁীছেছিলেন ১৪ ফেব্রুয়ারি। স্বামী শিবানন্দ কলম্বোতে সাত মাস বেদান্ত-প্রচার করে মঠে ফিরেছিলেন ১৩ ফেব্রুয়ারি। স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদের মহুলা গ্রামে একটি অনাথাশ্রম পরিচালনা করছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে একটি রামকৃষ্ণ মঠ গড়ে তুলেছিলেন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির মঠ-জীবনে তাঁর অনুপস্থিতি অনেকেই তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। বরাহনগর মঠ ও আলমবাজার মঠ-জীবনে তিনিই ছিলেন খুঁটি। স্বামী অখণ্ডানন্দ মঠে এসে ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেসময়ে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "ভাই। তুমি নাই—আমাদের মতো দীনহীনগুলোকে তোমার মতো তেমন করে কে দেখে বল? তোমার অভাবে আমি বাস্তবিকই মঠে যেন মাতৃহীন শিশুর মতো পড়ে আছি। তোমার অভাবের যে দুঃখ তাহা কেবল আমি কেন এবার তাহা অনেককেই অনুভব করিতে দেখিলাম।"[৩৭] মঠে যাঁরা বাস করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (তাঁর সন্ন্যাস হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে)। স্বামী অদ্ভুতানন্দ কলকাতাতেই থাকতেন, কদাচিৎ তিনি এই মঠে এসে বাস করেছেন। স্বামী যোগানন্দ কলকাতাতে বাস করতেন। এ-মঠে তিনি দুই কি তিন রাত্রি মাত্র বাস করেছেন। কিন্তু আলোচ্যপর্বে তিনি অন্ততঃ ১৫ দিন এই মঠে এসেছিলেন।

তাছাড়া মঠে বাস করেছেন স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী সোমানন্দ, ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ, ব্রহ্মচারী বিমল/বিমলানন্দ, ব্রহ্মচারী হরিপদ, ব্রহ্মচারী সহজানন্দ, ব্রহ্মচারী সোমসূর্যানন্দ, ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল, ব্রহ্মচারী নন্দলাল, ব্রহ্মচারী দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতি। ওপরে উল্লিখিত মঠবাসিগণের মধ্যে কেউ ছিলেন শ্রীমাতাঠাকুরানীর মন্ত্রশিষ্য, আবার কেউ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ বা তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মন্ত্রশিষ্য।

নীলাম্বরবাবুর বাগানে ২৯ মার্চ স্বামীজী দুজন যোগ্য যুবককে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন। অজয়হরি ও সুরেন্দ্রের নাম হয়েছিল যথাক্রমে স্বামী স্বরূপানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দ। এখানেই কোনও এক সময় দক্ষিণারঞ্জন ও শুকুল বা গোবিন্দ একত্রে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস লাভ করেছিলেন।[৩৮] তাঁদের নাম হয়েছিল যথাক্রমে স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ। এছাড়াও, এই মঠে স্বামীজী হরিপদ ও কৃষ্ণমূর্তিকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। তাঁদের নাম হয়েছিল যথাক্রমে স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী সোমানন্দ। এইকালে ঘর-সংসার ছেড়ে মঠে এসে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ অজয়হরি, ব্রহ্মচারী সহজানন্দ, হরিপদ, ব্রজেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মচারী সোমসূর্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী বিমল/বিমলানন্দ।[৩৯] আলোচ্যকালে মঠবাসিগণের অনেকেই তীর্থভ্রমণে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেছেন, কয়েকজন নির্জনে তপস্যায় কাটিয়েছেন।

স্বামীজী চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মঠটি ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। একদিকে মঠের অঙ্গ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ শিক্ষাগ্রহণ করবে, অপরদিকে অপর বালকেরাও শিক্ষাগ্রহণ করবে।

৩৭ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি থেকে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লেখা চিঠি।

৩৮ স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ, পৃঃ ২১৬

৩৯ কাগজপত্রে ব্রহ্মচারী বিমল ও ব্রহ্মচারী বিমলানন্দ, দুই-ই দেখা যায়।

শিক্ষা সমাপ্তির পর এসকল বিদ্যার্থিগণের বিবাহ করা বা না করা তাদের ইচ্ছাধীন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ভিন্নও কয়েকজন বালক বিদ্যার্থীরূপে মঠে বাস করত। এদের সুস্পষ্ট তালিকা জানা যায়নি। শুধুমাত্র সম্বংশজাত হিন্দু বালকগণই বিদ্যার্থিরূপে সেসময়ে গৃহীত হতো। এদের একজন আশুতোষ মিত্র—পূর্বাশ্রম সম্পর্কে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের ভাই। আরেকজনের নাম জানা গিয়েছে—হরি পর্বত। সম্ভবতঃ নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে মঠ থাকাকালীন দার্জিলিঙের মহেন্দ্র ব্যানার্জীর দুই ছেলে বলেন ও বরেণ এখানে বিদ্যার্থিরূপে যোগদান করেছিল।

আবার মঠের অঙ্গগণ ছিলেন দু-ভাগে বিভক্ত: সন্ন্যাসী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আকুমার ব্রহ্মচারী—যাঁরা আজীবন ব্রহ্মচর্যপালনের সংকল্প গ্রহণ করতেন, তাঁরা ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।' এ-বিষয়টি ব্যাখ্যা করে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী অচলানন্দ লিখেছেন: "স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল মঠে দুই শ্রেণীর সাধু থাকবে। একদল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আর একদল সন্ন্যাসী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আজীবন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী থাকবে। তারা দাড়ি গোঁফ রাখবে, আত্মপাকী হবে, পঠন-পাঠন করবে এবং খুব নিষ্ঠার সঙ্গে চলবে। আর একদল সন্ন্যাসী থাকবে, তারা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এবং 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবন যাপন করবে।"[৪০] তাঁর রচনাতে পাওয়া যায় আরও একটি মূল্যবান নির্দেশ। তিনি লিখেছেন: "কোন নূতন ব্রহ্মচারী মঠে প্রথম এলে তিনি (স্বামীজী) তাকে বেলুড় গ্রাম ও তার নিকটবর্তী স্থানে ভিক্ষা করতে পাঠাতেন। তাকে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল নিজে পাক করে ঠাকুরকে ভোগ দিতে হতো এবং পরে তা প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে হতো। সন্ন্যাসীদের মাঝে মাঝে তিনি মাধুকরী অন্নগ্রহণ করতে বলতেন। 'আমরা সাধু'—এই ভাবটা সব সময় রাখতে বলতেন।"[৪১] আলোচ্যকালে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রতধারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভগিনী নিবেদিতা। মার্গারেট নোবল নীলাম্বরভবনে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মার্চ ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম হয়েছিল 'নিবেদিতা'। ঠিক এক বছর পরে ২৫ মার্চ ১৮৯৯ বেলুড় মঠের পুরনো ঠাকুরঘরে একটি ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজী তাঁকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য দান করেছিলেন।[৪২]

২৭ এপ্রিল ১৮৯৬ তারিখে লেখা চিঠিতে স্বামীজীর একটি নির্দেশ ছিল: "যে কেউ সন্ন্যাসী হতে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মচারী করিবে—এক বৎসর মঠে, এক বৎসর বাহিরে—তারপর সন্ন্যাসী করিয়া দিবে।" অবশ্য মঠের নিয়মাবলী রচনাকালে স্বামীজীর এই বিধিটি বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিধি অনুসরণ করেই যুবক সুধীর (ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ) ১৫ মে ১৮৯৮ তারিখে যাত্রা করে কাশী হয়ে আলমোড়াতে গিয়েছিলেন। তপস্যার কঠোরতায় তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। তিনি ২ ডিসেম্বর মঠে ফিরে এসেছিলেন।

সাধু-ব্রহ্মচারীদের নাম সম্পর্কেও একটি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মতো ছিল। দশনামী সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে পুরী সম্প্রদায়ের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের নাম যথাক্রমে 'চৈতন্য' ও 'আনন্দ' যুক্ত। এই নিয়ম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আজও পালিত হচ্ছে। কিন্তু নীলাম্বরবাবুর বাগানে মঠের পর্বে এই নিয়মের কিছুটা ব্যত্যয় দেখা যায়। সুধীর সঙ্ঘে যোগদান করবার কিছুকাল পরে ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হন। খগেনের নাম হয় ব্রহ্মচারী বিমলানন্দ, সুরেন্দ্রের নাম হয় স্বামী সুরেশ্বরানন্দ ইত্যাদি। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর প্রথম দুজনের নামে 'ব্রহ্মচারী'র পরিবর্তে 'স্বামী' যুক্ত হয়েছিল মাত্র।

এছাড়াও মঠের অন্তেবাসী হয়ে ১ এপ্রিল ১৮৯৮ যোগদান করেছিলেন বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু, ২ জুলাই যোগদান করেছিলেন শশিভূষণ। এঁদের পরিচয় বা ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাছাড়াও মঠে অতিথি হিসাবে বিভিন্ন সময়ে বাস করেছেন শ্রীম, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, ছোকো গোপাল, ডাঃ নিতাই হালদার, হাবুবাবু, প্রিয়নাথ সিং (লেবার কন্ট্রাকটর), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। [ক্রমশঃ]

৪০ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ৫৯ ৪১ ঐ

৪২ The Letters of Sister Nivedita—Ed. Sankari Prasad Basu, Vol. I, 1982, p. 93

কবিতা

শান্তির সন্ধানে

মেরী দাস

শান্তির সন্ধানে ফিরেছি।
শহরে, গ্রামে, বিভিন্ন লোকালয়ে,
গেছি গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে, গুরুদ্বারে-
কোথায় যেন একটা সীমার বন্ধন—
একটা ধর্মান্ধতা, স্পর্শকাতরতা—
আশাহীন হয়ে ফিরে এসেছি
রিক্ত চিত্ত নিয়ে।
কোথায় শান্তি, সব কি ভ্রান্তি ?
মন ভরে গেছে দীনতায়।
পথের শেষ হলো ঠাকুরের মূর্তির
সামনে এসে—
সন্ধ্যারতির সাথে সাথে চলছে স্তব—
"খণ্ডন ভববন্ধন..."
সাধু-ভক্তরা সব উপবিষ্ট
ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে ;
মন্দির কাঁপছে যেন থর থর মদিরতায়
সুন্দর সন্ধ্যা, মধুর পরিবেশ ;
মনের পাখি গান গেয়ে উঠল ;
অজানিতে হাত জোড় হয়ে এল—
ভূমিষ্ঠ হয়ে করলাম প্রণাম।
আকণ্ঠ ভরে করলাম পান
শান্তির স্রোতোধারা।

আমি খ্রীস্টান, সকলের সাথে
এক করে আমাকে কোলে তুলে নিল
কে এই মহামানব।
হে রামকৃষ্ণ, তোমার চরণে এসে
পেলাম পরিপূর্ণ শান্তির সন্ধান ॥

প্রতীক্ষায় আছি

তাপস রায়চৌধুরী

তব শান্ত সৌম্য মুখে সুশোভন হাসি
বিকশিত পুষ্পসম উঠেছে উদ্ভাসি
ধরণীর ভালে।
সেই তালে তালে
অগণন তারাপুঞ্জ তোমারে ঘেরিয়া
উপগ্রহসম ছোটে এ-বিশ্ব প্লাবিয়া।

তুমি মোর আত্মার অতি কাছে থাকি
কহিতেছ বারবার কর্ণে মুখ রাখি—
'তোরে আমি ভালবাসি,
তাই কাছে আসি,
পাসনি শুনিতে তুই মোর কণ্ঠস্বর,
বারবার কেন মোরে ভাবছিস পর ?'

তোমারে দেখেছি আমি অগ্নিতে অম্বুতে
ভ্রমিয়া ফিরিছ তুমি এ-ক্ষিতিতলেতে
রয়েছ বনস্পতিতে তুমি,
আছ লতা-গুল্মদলে চুমি।
নয়ন মুদিয়া দেখি অন্তরের তলে
তোমার অম্লান জ্যোতিঃ দীপসম জ্বলে।

জ্বালিয়া বিবেক-শিখা মানব-অন্তরে
টানিয়া এনেছ তুমি ছিল যারা ঘরে
আপনারে গিয়া ভুলি
তাহাদের ধরি তুলি,
দেখালে বিশ্বের কাছে সেই সত্যখানি
শাশ্বত সে ভারতের চিরন্তন বাণী।

তাই তোমা বারবার স্মরি অহরহ
সহে না সহে না আর তোমার বিরহ
এ পোড়া অন্তরে।
এস নাথ ঘরে—
ভক্তি-অশ্রু দিয়া তব চরণকমল
বন্দিয়া বরিয়া লব, হইব সফল।

যৎ লব্ধ

ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ পথ চলে এসেছি।
অকারণ পরিশ্রমে যে-সময়টা ব্যয় করেছি
ভিন্ন সময়ের ভিন্ন লক্ষ্যের পিছনে ছুটতে—
কিছু পেয়েছি, বেশিই পাইনি।
যা পেয়েছি তৃপ্ত করেনি, আর
যা পাইনি সেটা আরো কাম্য মনে হয়েছে।
ঘনায়মান আজ প্রায় সন্ধ্যা-লগ্নে
নিশ্চিন্তে বুঝেছি এরা কিন্তু
কেউ-ই ছিল না আমার সত্যকারের লক্ষ্য।
যা আমার একান্ত নিজস্ব,
যা নাকি আমাতেই বর্তমান
আর যার প্রাপ্তিতে অসীম তৃপ্তিতে
ভরিয়ে দিতে পারে আমাকে—
তার অস্তিত্বের কোনদিন কেন
হদিশ পাইনি এতদিন ?
আমার সব চাওয়া-পাওয়ার শেষ পাওয়া।

প্রকৃষ্ট সময়

রতনকুমার নাথ

ভোরের সোনাঝরা আলোয়
শিউলি গাছটা এখন রঙীন ;
দখিনা বাতাসে ভাসে
অনন্তের গন্ধ,
সদ্যফোটা ফুলগুলো
একরাশ ভালবাসা ছড়ায়।
এখনই আত্মমগ্নতার
প্রকৃষ্ট সময়,
এসো, শিউলিতলায় বসি ;
চোখ বুজে অনুভব করি
তিনি এসেছেন,
প্রশান্ত হাসিতে
মাথায় রেখেছেন অভয় হস্ত।
আর সেই হাত থেকে ঝরে পড়ছে
ভালবাসা
প্রতিটি স্নায়ুতে, প্রতিটি ধমনীতে।

আয়নায় হায়েনায় এক হয়ে

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতা, তোমার মুখ চাইনি কখনো,
চাইনি, পাইনি তাই শতদল-সখা,
পদতলে রুক্ষ মাটি
হাঁটি হাঁটি পার হই দুঃখ মরু-মাঠ।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বুকে,
পাথরে গাঁইতি ঠুকে, গন্ড বেয়ে ঘাম—
এই ঘাম, এই মুক্তো নিয়ে
ফুঁড়ে ফুঁড়ে সূর্য নামে নিকানো উঠানে

কে যেন দূরে ঐ নাড়ে
কালো কালো হাত,
আমার রাতের কান্না চুনি হয়ে জ্বলে
যত ফুল তত দুঃখ রাতের আকাশে।

আর কি সময় আছে যাব পরবাসে ?
স্বর্গভূমে নিমন্ত্রণ, অমৃতের ভাগ—
সবকিছু ছেড়ে দিতে পারি। শুধু
ছাড়ে না মাঠের বেড়া—
স্নেহ-প্রেম-প্রীতি ধান্যকণা।

সুখ নয়, যন্ত্রণা চাই, আরো যন্ত্রণাই
হৃৎকম্প, অগ্ন্যুৎপাত,
না হলে নিজের মুখ
আয়নায় হায়েনায় এক হয়ে যায়।

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বৃন্দাবনের শীত এখন কমতে আরম্ভ করেছে। এই সময়টা এখানে বড় মনোরম। গরম নেই, ঠাণ্ডাও কম। ভোরবেলায় বেরিয়ে এসেছি আশ্রম থেকে, সূর্য উঠবার আগেই। সঙ্গে কোন সঙ্গী নেই। পথে লোকজনও নেই বললেই চলে। হাঁটতে হাঁটতে কালাবাবুর কুঞ্জের পাশ দিয়ে যমুনার পারে চলে এসেছি। যমুনার জল কমে যাচ্ছে, বালির চড়া ক্রমশই বাড়ছে। যমুনার ধার দিয়ে উত্তরদিকে এগুচ্ছি। বাঁদিকে ছেড়ে এলাম 'ধীর সমীর'। প্রবাদ, শ্রীমতীর সঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্ণের বিহার হতো তখন সেই দিব্যলীলায় পাছে বিঘ্ন হয় সেজন্য বাতাসও মৃদু-মন্দভাবে এখানে প্রবাহিত হতো। তাই এই স্থানের এমনি নাম।

এইসব প্রাচীন লীলার স্মরণ করতে করতেই হাঁটছি, হঠাৎ কানে এল মৃদু কণ্ঠের অস্ফুট স্বর ঃ

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহুঁ সাঁজ সবেরে।
কৃষ্ণ নাম সব দুঃখ হারে,
কৃষ্ণহী ভবসাগর পারে
পার লাগানেওয়ালা॥
কোই কহত হ্যায় হরে কৃষ্ণ মুরারি,
কোই কহত হ্যায় রাসবিহারী,
কোই কহত হ্যায় হরে মুরারি।
জপে তুলসীমালা॥"

তাকিয়ে দেখি কিছু দূরে এক ন্যুব্জ দেহ, যষ্টি-নির্ভর, বৃদ্ধ বাবাজী এই নামগান করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অজান্তে তাঁকে অনুসরণ করে এসে পৌঁছালাম কেশিঘাটে। ধীরে ধীরে তিনি বাঁধানো ধাপ বেয়ে যমুনার ধারে গেলেন, একটু জল স্পর্শ করে তিনবার আচমন করে উঠে এসে বসলেন গোলাকৃতি বেদির মতো বাঁধানো জায়গায়। তার একটু দূরে আর একটি বাঁধানো বেদিতে আমিও বসলাম যমুনার জল স্পর্শ করে। আকাশের রঙ ক্রমেই বদলাচ্ছে। গোলাপী আভায় ভরে গেছে পূর্ব দিগন্ত। সূর্যকন্যা যমুনার জলের রঙও পালটে যাচ্ছে। নীল যমুনার বুকে লালচে ছোট ছোট ঢেউ। ঠিক এই রকমই দেখেছিলাম যমুনোত্রীতে সূর্যোদয়ের পরে। তবে সেখানকার ক্ষীণাঙ্গী তপন-তনয়ার উচ্ছল তরঙ্গ উদীয়মান সূর্যের ছটায় আরও যেন সুন্দর মনে হয়েছিল। আদরিণী কন্যার পিতৃস্নেহের চঞ্চল মধুর রূপ। আর এখানে যেন কৃষ্ণপ্রিয়া কালিন্দীর লাস্যময়ী তনু কৃষ্ণ-অনুরাগের আবেগে রক্তিমাভ। মনে পড়ছিল জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করের যমুনাষ্টক ঃ

"মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি
জাহ্নবি-সঙ্গিনি সিন্ধুসুতে,
মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি
গোকুলভীতিবিনাশকৃতে।
জগদঘমোচিনি মানসদায়িনি
কেশব-কেলি-নিদান-গতে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি
সংকটনাশিনি পাবয় মাম্॥"

দূরে সবুজ গাছপালা ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। সেই গাছের আড়াল থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে এলেন রক্তাম্বুজাসন জবাকুসুমসংকাশ এক বিরাট স্বর্ণ গোলক। লালে আর হলুদে ছেয়ে গেল পূর্ব দিগন্ত। প্রণাম করে বাঁদিকে চোখ ফেরাতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। আমার পাশের সেই বাবাজী দেখি তাঁর গায়ের উত্তরীয় নিয়ে অদৃশ্য কাউকে যেন মুছিয়ে দিচ্ছেন। বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবাজী তন্ময়। কয়েক মিনিট এই রকমই চলল। ক্রমে স্থির হলেন তিনি। কৌতূহলী মন আমার, সসংকোচে উঠে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। উৎসুক চোখে তাঁর দিকে চাইতে, তিনি কি ভাবলেন জানি না—উঠে পড়লেন। আমিও তাঁর সঙ্গ নিলাম। এসে দাঁড়ালেন কেশি-ঘাটের ছোট্ট মন্দিরের সামনে। যেখানে ছোট শ্বেত-পাথরের কূর্মবাহিনী যমুনাজীর বিগ্রহ আছে আর

আছে কেশীবধের পট। খানিকক্ষণ নতমস্তকে সেখানে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে গিয়ে তাঁর পূর্বস্থানে বসলেন। আমি এবার তাঁর খুব কাছে গিয়ে বসে তাঁকে "রাধে, রাধে" বলে নমস্কার করলাম। বৃদ্ধ তাপস এবার প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে মেলে ধরলেন তাঁর জলভরা দুটি চোখ। দন্তহীন মুখে ছোট্ট শিশুর মতো মৃদু হাসি। হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার করে বললেন: "দেখে ফেললেন তো এইসব পাগলামি! এই ভয়েই তো অন্ধকার থাকতে আসি। আমার এই খেলা আর কেউ দেখুক তা চাই না। এ যে আমার একান্ত আপনার।" এবার আমার প্রশ্ন: "খেলা বলছেন কেন—আর যদি তাই হয়, কার সঙ্গে সে খেলা? আর কিরকম খেলা?" অশীতিপর বৃদ্ধ বৈষ্ণব কিছুক্ষণ থামলেন, আমাকে খুব মন দিয়ে দেখলেন। তারপর আপন মনেই বলতে লাগলেন: "জানেন বাবাজী, আমাদের সাধনে লীলাস্মরণ এক বিশেষ অঙ্গ। আমার ভাল লাগে তাঁর বিশেষ লীলার ক্ষেত্রে গিয়ে সেই লীলার অনুসরণ অথবা অনুস্মরণ করতে। আমার কৃষ্ণ যে জীবন্ত। নিত্য বৃন্দাবনে তাঁর নিত্য অধিষ্ঠান—নিত্য নব নব লীলায় তিনি আমার মন-প্রাণ ভরিয়ে দেন। তিনি আমার ঘরকে করেছেন বাহির। আর বাহিরকে করেছেন ঘর। তাই নির্দিষ্ট কোন মন্দিরে আমার বেশিক্ষণ মন বসতে চায় না। এই চিন্ময় ধাম শ্রীবৃন্দাবন তাঁর কত কত লীলার সাক্ষী, এর গাছ-লতা-পাতা, এর ধূলিকণা, এই নীল যমুনা, এখানকার আকাশ-বাতাস কত না মধুর লীলার কথা মনে করিয়ে দেয়। শুধু কি আমার ব্রজেশ্বর আর রাই-কিশোরী, এখানে এসেছে কত সাধু-সন্ত। যুগ যুগ ধরে কত আর্তি আকুলতা, কত কঠোর তপস্যায় প্রাণবন্ত এই মধু বৃন্দাবন। তাইতো আমি ছুটে বেড়াই, খুঁজে বেড়াই, মনের অতলে ডুব দিয়ে ধরবার চেষ্টা করি সেইসব প্রাচীন লীলার হারানো সূত্র। এই-ই আমার সাধন—লীলা অনুধ্যান। এই যে আমরা যেখানে বসে আছি এই জায়গাটিতেই এগারো বছরের কিশোর কৃষ্ণ বধ করেছিলেন কেশী দৈত্যকে। একে ক্ষত্রিয়ের সন্তান তার ওপর গয়লাদের আদরের ধন, তাদের সবচেয়ে ভাল মানের দুধ, ছানা, মাখন খেয়ে খেয়ে শরীরটি যা তৈরি করেছিলেন তাতে তাঁকে বয়সের তুলনায় একটু বেশি বড় বলেই মনে হতো, গায়ে জোরও হয়েছিল প্রচণ্ড। ষড়ৈশ্বর্যবান সেই চিরকিশোর কংসের অনুচরদের একে একে বধ করতে থাকলেন গোকুল-নন্দগ্রামে ও এই বৃন্দাবনে। মনোহারী ভুবনভোলানো রূপ, অসাধারণ পৌরুষ, বীর্যবত্তা ও অলৌকিক দৈবী শক্তিতে বৃন্দাবনের সকল শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের নিত্য আরাধনার বিষয় হিসাবে তখন তিনি চিহ্নিত। সমগ্র বৃন্দাবনে তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন সকলের একমাত্র আকর্ষণের বিষয়। তখন মথুরাতে কংসের বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, এই সেই ছেলে যে তাঁর মৃত্যুর কারণ। দেবর্ষি নারদের কথায় তা নিশ্চিত জেনে তাঁকে মথুরায় নিয়ে এসে বধ করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। তার আগে শেষবারের মতো কেশী ও অরিষ্টকে পাঠালেন বৃন্দাবনে যদি তাদের দিয়েই শত্রুনিপাত হয়ে যায়। এই স্থানেই কেশিনিসূদন-মূর্তিতে সেই লীলা হয়েছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম সেই দৃশ্য। কেমন জানেন?

"একটা বিরাট ঘোড়া দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে, কেশী দৈত্য এই ঘোড়ার রূপ ধরে আসছে। তার ঘাড়ের কেশর ফুলে ফেঁপে চারিদিকে উড়ছে, পায়ের খুরের চাপে মাটি কেটে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। হ্রেষাধ্বনিতে চারিদিক কাঁপছে, সে আসছে। তার কাল পূর্ণ হয়েছে, মহাকাল কৃষ্ণরূপে সামনে দাঁড়িয়ে। সেই আকর্ষণে বহ্নিমুখী পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিতে সে আসছে মৃত্যুমুখে। আর দূরে দাঁড়িয়ে সেই কালো কিশোর, হলদে কাপড় মালকোঁচা দিয়ে পরা, তার ওপর একটি গামছার মতো উত্তরীয় শক্ত করে কোমরে বাঁধা। মাথায় কোঁকড়া চুল চূড়া করে বাঁধা, তার ওপরে কয়েকটি ময়ূরপুচ্ছের পাখা লাগানো, ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে লতিয়ে নেমেছে কিছু কোঁকড়া কালো চুল। সুন্দর কপালে শ্বেতচন্দনের তিলক, টানাটানা বড় দুটি কাজল-কালো চোখে আর পাতলা গোলাপী ঠোঁটে রহস্যময় এক হাসির ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। চওড়া বুকে সুন্দর পদক দেওয়া হার, তার ওপর শ্বেতকুন্দফুলের মালা। বেণুটি কোমরে গোঁজা। কালো বুকের ওপর এই সাদা মালায় কি শোভাই না হয়েছে! দুটি হাত বুকের কাছে সংলগ্ন রেখে অপেক্ষা করছেন ঐ কেশীর জন্য। দুটি চরণে

যেন পদ্মফুলের মতো গোলাপী আভা। কালান্তক-সদৃশ ধাবমান এই ঘোড়াকে দেখে শ্রীমান গোপালের মুখে কিন্তু এতটুকু চাঞ্চল্য বা উদ্বেগ দেখতে পাচ্ছি না। বরঞ্চ যেন ব্যাপারটা খুব মজার কিছু একটা হতে যাচ্ছে এমনি মুখের হাসির ভাব। আমার ধ্যানই যেন মূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি প্রাণভরে সেই রূপসুধা পান করছি। দেখতে দেখতে কেশী ছুটে এল আর বনমালী মধুসূদন চোখের নিমেষে তার সামনে এসে পড়ল। কৃষ্ণ একটু পাশ কাটিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার পিছনের পা-দুটি চেপে ধরলেন—"তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ। সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ।" তারপর দু-হাতে সেই দুরন্ত ঘোড়াকে মাথার ওপর তুলে পাক দিয়ে ঘোরাতে লাগলেন, আর গরুড় পাখি যেমন সাপকে ছুঁড়ে ফেলে তেমনি করে চারশো হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সে ব্যাটা কিন্তু আবার লাফ দিয়ে উঠে এল, আরও জোরে 'চিঁহি চিঁহি' করতে করতে বিরাট হাঁ করে তেড়ে এল শ্রীকৃষ্ণের দিকে। এবারে ঠাকুর আমার যে কাণ্ডটি করলেন, আমি তো ভয়েই মরি। তাঁর ঐ অমন কচি সুন্দর বাঁ-হাতখানি চট করে ঐ বিশাল দাঁতওয়ালা হাঁ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আশ্চর্য কাণ্ড! দেখতে দেখতে কেশী ঘোড়ার চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল। সে ছটফট করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।—"সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্ প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লেণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ।" তার মুখের মধ্যে কৃষ্ণের ঐ নরম কচি হাতখানিই তপ্ত লোহার মতো গরম হয়ে বাড়তে বাড়তে তার দমবন্ধ করে দিয়েছিল। আর তাতেই কৃষ্ণ-অঙ্গ স্পর্শে সে দৈত্যজন্ম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। আর তখনই আমি স্থির থাকতে না পেরে নিজের গায়ের চাদরখানি দিয়ে আমার নয়নানন্দ বালক কৃষ্ণের স্বেদসিক্ত শরীর একটু মুছিয়ে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারিনি। চোখের সামনে না মনের মধ্যে, তা তখন মনেই আসেনি। এই দৃশ্য, এই কেশিবধ লীলা যেন সামনেই হচ্ছে তাই মনে হচ্ছিল। এই স্থানই প্রভুর সেই লীলাক্ষেত্র। দেখুন আপনাকে বলতে বলতে আমার আবার সেই লীলা স্মরণ হলো। আপনাকে আমার প্রণাম।"

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম সত্যি কি অপূর্ব সাধনপন্থা! হাতজোড় করে বাবাজীর কাছে অনুরোধ করলাম যদি তাঁর আপত্তি না থাকে তবে দু-একদিন এই সময় আমি তাঁর কাছে আসতে চাই। তিনি গম্ভীর হলেন, অস্ফুটে বললেন: "'আপন সাধনকথা না কহিবে যথা-তথা।' আমার সঙ্গে এসে কি হবে? আমি তো এই ক্ষ্যাপা পাগল মানুষ, কখন কোথায় থাকি কিছুই ঠিক নেই।" আমি একটু আন্তরিকভাবেই জানালাম: "তবু বলুন, কোথায় গেলে অন্ততঃ কিছুক্ষণ আপনাকে পাব।" হয়তো আমার কথায় তাঁর মনের ভাব পালটালো। তিনি বললেন: "দেখুন বাবাজী, আমি কালীয়দমন ঘাটের কাছেই থাকি। সেখানে কাল বিকেলের দিকে গেলে আমাকে পেলেও পেতে পারেন।" বলেই উঠে পড়লেন। আমিও উঠলাম। নমস্কার বিনিময়ের পরে তিনি কেশিঘাটের পার ধরেই উত্তরদিকে রওনা দিলেন। আমি আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম সেইখানেই। এই পাথরের ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন ভরতপুরের রাজারা। বৃন্দাবনের মধ্যে বর্তমানে এই ঘাটই সবচেয়ে সুন্দর। আর এখানেই নিত্য সন্ধ্যায় যমুনা-মায়ের আরতি হয়। এখানে জলের বুকে ভেসে বেড়ায় অসংখ্য কচ্ছপ। স্নানার্থীদের স্নানের সময় বেশ সতর্ক হয়েই স্নান করতে হয় এখানে, নইলে যেকোন সময়ে কচ্ছপদের খাদ্য হিসাবে শরীরের দু-একটি ছোটখাটো অংশ কেটে বেরিয়ে যেতে পারে। ধীরে ধীরে আমিও উঠলাম, কারণ এবারে পুণ্যস্নানার্থীরা একে একে আসছেন। ভিড় বাড়বে, উঠে নেমে এলাম যমুনার জলের কাছে, কচ্ছপদের তাড়িয়ে দিয়ে এক অঞ্জলি পবিত্রবারি হাতে তুলে মাথায় নিয়ে প্রণাম জানালাম:

"সদৈব নন্দিনন্দ-কেলিশালিকুঞ্জ-মঞ্জুলা
তটোত্থফুল্ল-মল্লিকা-কদম্বরেণুসুজ্জ্বলা।
জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাব্ধিসিন্ধুপারদা
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥"

[ক্রমশঃ]

মাধুকরী

কথাশিল্পী, কবি ও সন্ন্যাসীর সমাবেশে

গিরীন্দ্রনাথ সরকার

ইংরেজী ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ফাল্গুন মাসে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ-সেবক-সমিতির উদ্যোগে যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) রেঙ্গুন শহরে আসিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচরদিগের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; ঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে ভক্ত হনুমান মনে করিত। তাঁহার ন্যায় বৈদান্তিক পণ্ডিত ও ত্যাগী যোগিপুরুষের ব্রহ্মদেশে এই প্রথম পদার্পণ। তিনি বৌদ্ধপ্লাবিত ব্রহ্মদেশে সর্বপ্রথম ঠাকুরের বাণী প্রচার করিয়া যান। ইহার ফলে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে রেঙ্গুন শহরে স্বামী শ্যামানন্দ মহারাজের উদ্যোগে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে দেড়শত রোগী থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে পারে, এইরূপ একটি বিরাট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও সম্প্রতি একটি বৃহৎ রামকৃষ্ণ মঠের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়াছে। সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রামকৃষ্ণানন্দের নৈষ্ঠিকী ভক্তির জীবন্ত সৌম্য মূর্তিখানি দেখিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া জ্ঞান-পিপাসার শান্তি হইতে পারে ভাবিয়া যে কয়দিন স্বামীজী রেঙ্গুনে ছিলেন, প্রতিদিন সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া শরৎচন্দ্র নির্জনে আত্মকাহিনী জ্ঞাপন করিতেন ও তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেন।

স্বামীজী কয়েকদিন বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া সাধারণ সভায় ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচার করিতেন না। শুধু ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ধর্মমতের সার সত্যটুকু নিজ সাধনার দ্বারা যেরূপ উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ওজস্বিনী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার ভাষায় ও ভাবে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব না থাকায় উহা সকল সম্প্রদায়ের শ্রোতার উপর মন্ত্রশক্তির মতো কার্য করিত। যেদিন সাধারণ সভায় বক্তৃতা থাকিত না, সেদিন স্বামীজী নিজে নির্দিষ্ট বাসায় বসিয়া সন্ধ্যা-কালে সমবেত ভক্তবৃন্দকে ধর্ম-উপদেশ দিতেন। অনেক মাদ্রাজী ভক্ত এই সান্ধ্য-সম্মেলনীতে যোগদান করিতেন। শরৎচন্দ্র এসময় উপস্থিত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গাহিতে অনুরোধ করিতেন। শরৎচন্দ্র সহজে কোথাও গান গাহিবার পাত্র ছিলেন না; কিন্তু এক্ষেত্রে সাধুসঙ্গদের পুণ্যময় প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই-একখানি রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইতেন। একদিন শরৎ-চন্দ্র গাহিলেন:

এস সবে মিলে গাই কুতূহলে রামকৃষ্ণ-গুণগান।
রামকৃষ্ণ-নামামৃত প্রেমানন্দে আজি করিব পান॥
সত্যনিষ্ঠ সাধকশ্রেষ্ঠ, পরমহংস রামকৃষ্ণ,
ভাবিলে যাঁহারে ভবের কষ্ট মুহূর্তে হয় অবসান॥
কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্তি, সর্বধর্মে যাঁর সমভক্তি,
সর্বজীবে সমপ্রীতি দীনজনের ভগবান॥
সমাধিমগ্ন মূরতি চারু, ধর্মোপদেষ্টা জগৎ-গুরু,
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হও মম হৃদে অধিষ্ঠান॥

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সর্বদাই রামকৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন, রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন কথা তাঁহার ভাল লাগিত না; রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা ছিল না। রামকৃষ্ণই তাঁহার সর্বস্ব ধন, রামকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ। যে কেহ রামকৃষ্ণ নাম করিত বা রামকৃষ্ণের গান গাহিত, সেই তাঁহার পরম আত্মীয়

হইয়া যাইত। কণ্ঠ-সঙ্গীতে শরৎচন্দ্র সকলকেই বশীভূত করিতে পারিতেন। তাঁহার এই প্রাণ-মাতানো রামকৃষ্ণ-সঙ্গীতগুলি শুনিয়া স্বামীজী মুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং শরৎচন্দ্রের অনেক অন্যায় আব্দার সহ্য করিতেন।

শরৎচন্দ্রের হিন্দু-দর্শনশাস্ত্র কিছু পড়া ছিল কি না জানি না, কিন্তু দেখিয়াছি, রেঙ্গুনের Bernand Free Library হইতে অনেক ইংরেজী সমাজনীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পড়িতেন। তিনি বিখ্যাত দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার, আগস্ট কোমত প্রভৃতির মতামত লইয়া অনেক কূট প্রশ্নের অবতারণা করিয়া স্বামীজীর সহিত তর্ক ও বাদানুবাদ করিতেন। স্বামীজী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী অবলম্বনে ঐ সকল সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়া দিলে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হইয়া শ্রদ্ধাবিস্ফারিত-নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকতেন।

যেদিন রেঙ্গুন শহরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অভ্যর্থনা হয়, ঐ অভ্যর্থনা-সভায় বহু সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তির সহিত স্বয়ং কবিবর নবীনচন্দ্র আসিয়াছিলেন শুনিয়া স্বামীজী কবিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি স্বামীজী ও শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে কবিবরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কবিবর অকস্মাৎ স্বামীজীর সহিত শরৎচন্দ্রের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং বিশেষ সমাদরের সহিত আমাদের বসাইয়া স্বামীজীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর প্রতি কবিবরের এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম এবং কবিবরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়িয়া গেল। ইহার পূর্বে অজ্ঞতাবশতঃ আমরা কেহই স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি নাই ভাবিয়া মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ যুগাবতার ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ও প্রচারকার্যের আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার পর শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া কবিবর বলিলেন—"আপনার গান শোনবার আশায় আমি তৃষিত চাতকের মতো লালায়িত হয়ে আছি।" উত্তরে শরৎচন্দ্র বলিলেন, "আজ আমি গান শোনাতে আসিনি, আপনার পুত্র সুকণ্ঠ নির্মলচন্দ্রের গান শুনতে এসেছি।" কবিবর বলিলেন—"শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলচন্দ্রের তুলনা হতে পারে না।" স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন—"আজ এখানে একত্রে নবীনচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উদয় হয়েছে বটে, কিন্তু আমি শরৎ-সুধাই পান করতে চাই।" কবিবরের আদেশে প্রথমে নির্মলচন্দ্র একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিলেন। ইহার পর আর বলিতে হইল না, শরৎচন্দ্র অর্গানের সম্মুখে বসিয়া আপন মনে প্রাণের আবেগে ভাব-বিভোর হইয়া গাহিলেন ঃ

আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা। বাকি কিছু নাই।
ও দাও বাঁচিবার মতো তার বেশি নাহি চাই।
তুমি ঘুচায়েছ আমার যা ছিল পুঁজি।
(তাই) দু'হাত তুলে শূন্যপানে তোমারে খুঁজি ॥
ভাবি তুমিই দিয়েছ, তুমিই নিয়েছ, তুমিই দিবে
তা ফিরে।
আবার তুমিই আসিবে সুধা লয়ে হাতে
রিক্ত আমারি তরে ॥
আমি সেই পথ চাহি সময় নিরখি
যেন দাঁড়ায়ে থাকিতে পারি।
(শুধু তোমারই আশায়)
শেষে অজানা সময় নিকটে আসিলে
যেন তোমারি চরণ পাই ॥

এই স্বর্গীয় সঙ্গীত-ধ্বনি স্বামীজীকে ভাবে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল এবং কবিবরের হৃদয়তন্ত্রীর অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিবামাত্র তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই সঙ্গীতের রস-মাধুর্য আস্বাদন করিয়া বলিলেন—"আপনার গানের ভাব উদ্দীপনায় সেই চিরসুন্দরকে মনে করাইয়া দেয়, রেঙ্গুন শহরে এমন রত্ন লুকান ছিল জানতাম না, আমি আজ আপনাকে 'রেঙ্গুনরত্ন' উপাধি দিলাম।"*

* 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', শরৎ-স্মৃতি—সম্পাদনা ঃ বিশ্বনাথ দে, ১৯৭০, পৃঃ ১৫৩-১৫৭

সংগ্রহ ঃ স্বামী গোপেশানন্দ

শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

জীবন্মুক্তিপ্রকরণম্

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা
যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে
বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়

বেদাঃ (বেদসমূহ), যস্য (যাঁর), নিঃশ্বসিতং (নিঃশ্বাস থেকে উৎপন্ন), যঃ (যিনি), বেদেভ্যঃ (বেদ থেকে), অখিলং জগৎ (সমগ্র জগৎ), নির্মমে (নির্মাণ করেছেন), অহং (আমি), তম্ (সেই), বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্ (মহেশ্বরের সহিত অভিন্ন বিদ্যাতীর্থগুরুকে), বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ

বেদসমূহ যাঁর নিঃশ্বাস থেকে উৎপন্ন, যিনি বেদ থেকে (অর্থাৎ বেদোক্ত জ্ঞানানুযায়ী) সমগ্র জগৎ নির্মাণ করেছেন ; আমি সেই মহেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন-সত্তা বিদ্যাতীর্থগুরুকে বন্দনা করি ॥১॥

বিবৃতি

প্রতি কর্মের সূচনায় ইষ্টদেবতার মঙ্গলাচরণ, আশীর্বাদ প্রার্থনা অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায়ও প্রারম্ভিক কর্ম হিসাবে মঙ্গলাচরণ বিধেয়। আচার্য শঙ্কর প্রতিটি ভাষ্য ও প্রকরণগ্রন্থ প্রণয়নের প্রারম্ভে এই মঙ্গলাচরণ করেছেন দেখা যায়। এখানে বিদ্যারণ্য মুনি জীবন্মুক্তিবিবেকঃ গ্রন্থের প্রারম্ভে গুরুকে বন্দনা করে মঙ্গলাচরণ করছেন। আচার্য শঙ্করের ন্যায় তন্মতাবলম্বী বিদ্যারণ্য মুনির মঙ্গলাচরণে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। আচার্য তদীয় বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থের প্রারম্ভে 'গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরু প্রণতোঽস্ম্যহম্' বাক্যের মাধ্যমে পরমেশ্বর ও স্বীয় গুরু গোবিন্দপাদের শ্রীচরণবন্দনা করেছেন। বিদ্যারণ্যও এখানে স্বীয় গুরু বিদ্যাতীর্থের সহিত অভিন্ন মহেশ্বরের বন্দনা করেছেন।

বক্ষ্যে বিবিদিষান্যাসং
বিদ্বন্ন্যাসং চ ভেদতঃ।
হেতু বিদেহমুক্তেশ্চ
জীবন্মুক্তেশ্চ তৌ ক্রমাৎ ॥২॥

অন্বয়

[অতঃ অহং—অতঃপর আমি] বিবিদিষান্যাসং (বিবিদিষাসন্ন্যাস), চ (এবং), বিদ্বন্ন্যাসং (বিদ্বৎ সন্ন্যাস), ভেদতঃ (ভেদবিষয়ে), চ (এবং), তৌ (তাদের) ক্রমাৎ (ক্রমানুযায়ী), বিদেহমুক্তেঃ (বিদেহমুক্তির), চ (এবং), জীবন্মুক্তেঃ (জীবন্মুক্তির), হেতুঃ (কারণ) বক্ষ্যে (ব্যাখ্যা করছি)।

অনুবাদ

(অতঃপর আমি) বিবিদিষা সন্ন্যাস এবং বিদ্বৎ সন্ন্যাসের ভেদ এবং তাদের ক্রমানুযায়ী বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তির হেতুবিষয়ে ব্যাখ্যা করছি ॥২॥

বিবৃতি

বেদান্তশাস্ত্র অনুসারে, সন্ন্যাস ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভ অসম্ভব। আচার্য বিদ্যারণ্য তাই এখানে আত্মজ্ঞানলাভের উপায় সন্ন্যাসের প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন গ্রন্থের সূচনায়।

সন্ন্যাস দ্বিবিধ। বিবিদিষা ও বিদ্বৎ। 'বিবিদিষা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয় জানবার ইচ্ছা। 'জানা' অর্থে 'বিদ্' ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে 'সন্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন এই শব্দ। সেই পরম তত্ত্বকে জানবার ইচ্ছায় যে সন্ন্যাসগ্রহণ করা হয় তা 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' নামে অভিহিত। মহাবাক্যাদি শ্রবণ করে তার বিধিবদ্ধ শোধন ও সাধনাদির দ্বারা পরম তত্ত্বকে জানবার জন্য

এই পথের সাধক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ইহ ও পূর্বজন্মানুষ্ঠিত সাধনপ্রভাবে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য অথবা বাণপ্রস্থাশ্রমে অপরোক্ষব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান পুরুষ যে-সন্ন্যাসগ্রহণ করেন তা 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' নামে খ্যাত। এই অধিকারীর পক্ষে 'শ্রবণাদেব জ্ঞানম্'—শ্রবণমাত্র জ্ঞান হয়, এরূপ শাস্ত্রবাক্য রয়েছে।

এছাড়া আছে মর্কট সন্ন্যাস এবং আতুর সন্ন্যাস। স্বামীজী বলছেন: "সংসারের তাড়না, স্বজনবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ-বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম 'মর্কট সন্ন্যাস'।··· আর একপ্রকার সন্ন্যাস আছে, যেমন মুমূর্ষু রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নেই, তখন তাকে সন্ন্যাস দেবার বিধি আছে। সে যদি মরে তো পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মরে গেল—পরজন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি বেঁচে যায় তো আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে কালযাপন করবে।··· ঐরূপে সন্ন্যাসগ্রহণে ('আতুর সন্ন্যাস') তার উচ্চ জন্ম হবে।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৫০)

সন্ন্যাসহেতুর্বৈরাগ্যং যদহর্বিরজেত্তদা।
প্রব্রজেদিতি বেদোক্তেস্তদ্ভেদস্তু পুরাণগঃ ॥৩॥

অন্বয়

যৎ (যে), অহঃ (দিন), বিরজেৎ (বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়), তদা (সেই দিন), প্রব্রজেৎ (প্রব্রজ্যা করা উচিত), ইতি (এরূপ), বেদোক্তেঃ (বেদে উক্ত হয়েছে), [অতঃ—অতএব], বৈরাগ্যম্ (বৈরাগ্য), সন্ন্যাসহেতুঃ (সন্ন্যাসের কারণ), তৎ ভেদঃ তু (কিন্তু তার বিভাগ), পুরাণগঃ (পুরাণসমূহে প্রসিদ্ধ)।

অনুবাদ

যেদিন বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, সেইদিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত—এরূপ বেদে উক্ত হয়েছে। অতএব বৈরাগ্যই সন্ন্যাসের কারণ। পুরাণ থেকেও বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের বিভাগ জানা যায় ॥৩॥

বিবৃতি

সন্ন্যাসের ক্ষণ নিরূপণের জন্য এই শ্লোকে শ্রুতি উদ্ধার করে বলা হয়েছে 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' (জাবাল উপনিষদ্, ৪)—যখনই বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। অতএব প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসের মূল সূর হলো বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ব্যতীত প্রব্রজ্যা সম্ভব নয়। প্রব্রজ্যার বাক্য মুখের সুখসম্পাদনের জন্য উচ্চারিত হলেও অন্তরে বৈরাগ্য ব্যতীত তার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। একটু একটু করে ত্যাগ হয় না। যখনই বৈরাগ্য তীব্র হয় তৎক্ষণাৎ সাধক সকল বাধা অতিক্রমপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তীব্র বৈরাগ্য প্রসঙ্গে বলছেন: "তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুরের ধার—মায়াপাশ কচ কচ করে কেটে দেয়।" উদাহরণস্বরূপ একটি গল্পের অবতারণা করে তিনি বলছেন: "একজনের পরিবার বললে, 'অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হলো না!' যার বৈরাগ্য হয়েছে সে লোকটির ষোলজন স্ত্রী—এক-একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।

"সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা,—বললে, 'ক্ষেপী! সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ করতে পারব। এই দেখ,—আমি চললুম।'

"সে বাড়ির গোছগাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গামছা—বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেল।—এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।" (কথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৪৯১) উপনিষদ্ 'বিরজেৎ' পদে এই ধরনের বৈরাগ্যের কথাই বলছেন এবং ফলস্বরূপ মুমুক্ষু যে অবস্থায় বিদ্যমান সেই অবস্থায় সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

বিরক্তির্দ্বিবিধা প্রোক্তা
তীব্রা তীব্রতরেতি চ।
সত্যামেব তু তীব্রায়াং
ন্যসেদ্ যোগী কুটীচকে ॥ ৪ ॥

অন্বয়

বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য), দ্বিবিধা (দুই প্রকারের), প্রোক্তাঃ (কথিত হয়েছে), তীব্রা (তীব্র), চ (এবং), তীব্রতরা (তীব্রতর), ইতি (এইরূপ), তু (কিন্তু), তীব্রায়াম্ সত্যাম্ এব (তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হলেই), যোগী (যোগী), কুটীচকে (কুটীচক), ন্যসেৎ (সন্ন্যাস অবলম্বন করেন)।

অনুবাদ

বৈরাগ্য দুই প্রকারের কথিত হয়েছে—তীব্র এবং তীব্রতর। তীব্র বৈরাগ্য হলেই যোগী কুটীচক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ॥ ৪ ॥

শক্তো বহূদকে তীব্রতরায়াং হংসসংজ্ঞিতে।
মুমুক্ষুঃ পরমে হংসে সাক্ষাদ্বিজ্ঞানসাধনে ॥ ৫ ॥

অন্বয়

[তীব্রায়াম্—তীব্র বৈরাগ্য হলে], শক্তঃ (সমর্থ পুরুষ), বহূদকে (বহূদক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন), তীব্রতরায়াম্ (তীব্রতর হলে), হংসসঞ্জিতে (হংস নামক সন্ন্যাস), মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকামী), সাক্ষাৎ-বিজ্ঞানসাধনে (অপরোক্ষবিজ্ঞানের সাধনভূত), পরমে হংসে (পরমহংস সন্ন্যাস স্বীকার করেন)।

অনুবাদ

তীব্র বৈরাগ্যবানসমর্থ পুরুষ বহূদক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তীব্রতর বৈরাগ্য হলে হংস নামক সন্ন্যাস এবং তীব্রতর বৈরাগ্যবান মুক্তিকামী পুরুষ অপরোক্ষবিজ্ঞানের সাধনভূত পরমহংস নামক সন্ন্যাস স্বীকার করেন ॥ ৫ ॥

বিবৃতি

এখানে চার প্রকারের সন্ন্যাসের কথা বলা হয়েছে—কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। যে-সাধকের তীব্র বৈরাগ্য রয়েছে, কিন্তু শারীরিক অসামর্থ্য হেতু তীর্থযাত্রাদি সম্ভব নয়, তিনি কুটীচক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তিনি কোন এক স্থানে অবস্থানপূর্বক ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন ও ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করেন। আর তীব্র বৈরাগ্যবান যে-পুরুষের তীর্থযাত্রাদি পরিভ্রমণ করার মতো শারীরিক সামর্থ্য আছে তিনি বহূদক সন্ন্যাসী। বিবিধ তীর্থ পরিভ্রমণ ও ব্রহ্মচিন্তায় তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। বহূদক ও কুটীচক সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "যোগী দুই প্রকার—বহূদক আর কুটীচক। যে-সাধু অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছে—যার মনে এখনও শান্তি হয় নাই, তাকে বহূদক বলে। যে-যোগী সব ঘুরে মন স্থির করেছে, যার শান্তি হয়ে গেছে—সে এক জায়গায় আসন করে বসে—আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। তার তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায়, সে কেবল উদ্দীপনের জন্য।" (কথামৃত, পৃঃ ৮৬)

তীব্রতর বৈরাগ্যবান পুরুষ হংস সন্ন্যাসী এবং যিনি প্রত্যাগাত্মজ্ঞানলাভে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিষয়ে বিতৃষ্ণ হয়েছেন তিনি পরমহংস সন্ন্যাসী নামে খ্যাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "পরমহংস দুইপ্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হলো।' যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোক-শিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়।" (কথামৃত, পৃঃ ৮৩২)

অন্যত্র বলছেন: "পরমহংস—নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। এঁরা আপ্তসার—নিজের হলেই হলো।

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী তারা লোক-শিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরি-পূর্ণ হলো, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি করছে।

"এঁরা যেসব সাধনা করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে—তাদের হিতের জন্য। জল পানের জন্য অনেক কষ্টে কূপ খনন করলে—ঝুড়ি-কোদাল লয়ে। কূপ হয়ে গেল, কেউ কেউ কোদাল, আর আর যন্ত্র কূপের ভিতরেই ফেলে দেয়—আর কি দরকার। কিন্তু কেউ কেউ কাঁধে ফেলে রাখে, পরের উপকার হবে বলে।

"কেউ আম লুকিয়ে খেয়ে মুখ পুঁছে। কেউ অন্য লোককে দিয়ে খায়—লোকশিক্ষার জন্য আর তাঁকে আস্বাদন করবার জন্য। 'চিনি খেতে ভালবাসি'।

"গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে ঈশ্বরকে সম্ভোগ করতে চাইত।"

(কথামৃত, পৃঃ ৬০৬-৬০৭)

[ক্রমশঃ]

নিবন্ধ

মহাপুরুষ মহারাজের পত্রাবলীর অনুধ্যান

অনিলকুমার চক্রবর্তী

'মহাপুরুষ' স্বামী শিবানন্দের পত্রাবলী পাঠ করলে হৃদয়ে স্বতই ভক্তি-বিশ্বাস জাগ্রত হয়। তাছাড়া তাঁর পত্রাবলীর অনুধ্যানে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর লোকাতীত মহিমা সম্পর্কে ধারণা দৃঢ়তর হয়। মহাপুরুষজীর পত্রাবলীতে, সংসারে থেকেই কিভাবে সাধনায় অগ্রসর হতে হবে, যথার্থ নিষ্কামকর্ম কিভাবে সাধিত হতে পারে, সাধন-ভজন কিভাবে করা প্রয়োজন এসব বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশ লাভ করা যায়।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা ॥

গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন, যুগ-প্রয়োজনে তিনি বারবার ধরায় অবতীর্ণ হন। বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই একটি অবতরণ—একটি আবির্ভাব। এবিষয়ে মহাপুরুষ মহারাজের* বক্তব্য আমাদের সংশয়-কণ্টকিত অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে দেয়। আলমোড়ার চিল্কাপেটা থেকে একটি পত্রে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক ভক্তকে জানিয়েছেন: "ঈশ্বর তো নিত্যই আছেন, বেদাদি শাস্ত্রও নিত্য আছে, তীর্থাদিও চিরকাল বর্তমান, তথাপি ধর্মের গ্লানি হয়। লোক-সকলের, জাতিসকলের বুদ্ধি মলিনতাপ্রাপ্ত হয় এবং সেই সময়ে প্রভু অহৈতুকী করুণায় অবতীর্ণ হন; তাহা না হইলে জগতের উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই। ইহাই জগতের ইতিহাসসিদ্ধান্ত এবং এই বর্তমান যুগে করুণার অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার নিজশক্তি শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ তাঁহার পার্ষদগণ জগতের কল্যাণের জন্যই আসিয়াছেন।"[১]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই আবির্ভাব সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য এবং সে-কল্যাণ অবশ্যই সাধিত হবে এরকম প্রতীতি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন মহাপুরুষ মহারাজ: "প্রভু জগতে আসিয়াছেন, যেরূপেই হউক জগতের কল্যাণ হইবেই হইবে, নিশ্চয় জানিও।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরাবতার, তিনি সূর্যের মতো স্বপ্রকাশ। সূর্যের অবস্থিতি এবং আলোকময় ব্যাপ্তির কোন পরিচিতির প্রয়োজন হয় না। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবও তেমনই এক ঘটনা। তাঁর জগতে আসা এবং তাঁর ভাব জগতে ছড়িয়ে পড়াটা ঘটেছে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক ভক্তকে লিখেছেন: "কাহাকেও সাজিয়ে-গুজিয়ে খাড়া করে কি ভগবান করা যায়! যে ভগবান সে ভগবানই আছে—তাঁহাকে লিখেপড়ে কাহারও খাড়া করিতে হয় না। সূর্যকে প্রকাশ করিতে আলোর দরকার হয় না—সূর্য নিজ আলোকেই নিজে প্রকাশবান।"[৩]

মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণকে যথার্থই বুঝেছিলেন। আমাদের মতো সাধারণজনের মন শিথিল বিশ্বাসে দোদুল্যমান, সংশয়ে কণ্টকিত। মহাপুরুষের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ যখন তাঁর কথা আমাদের জানান তখন আমরা সাময়িকভাবে হলেও আন্তরিকভাবে আশ্বস্ত বোধ করি। তাঁর কথায় আশ্রিতজনের অন্তরে ইহকাল ও পরকালের জন্য একটা নির্ভরতার নিশ্চিন্ততা জেগে ওঠে।

* রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে 'মহারাজ' বা 'রাজা মহারাজ' বলতে যেমন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বোঝায়, তেমনি 'মহাপুরুষ' বা 'মহাপুরুষ মহারাজ' বলতে স্বামী শিবানন্দকে বোঝায়। প্রসঙ্গতঃ, 'মহাপুরুষ' শব্দটি স্বামী শিবানন্দ সম্পর্কে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন স্বামীজী স্বয়ং।—যুগ্ম সম্পাদক

১ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, উদ্বোধন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৭, পত্র সংখ্যা—৬৪

২ ঐ, ৬০ ৩ ঐ, ৫১

বেলুড় মঠ থেকে মহাপুরুষজী ২১।৪।১৯ তারিখে যে পত্রখানা লিখেছেন তাতে তাঁর দীনতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তি অকুণ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব যে জীবকল্যাণের এক মহা-ঘটনা তাও আমরা জানতে পারি এই পত্রটি থেকে। মহাপুরুষজী লিখেছেন: "আমার জীবনসর্বস্ব প্রভু রামকৃষ্ণ, আমি তাঁহার চিরদাস, সন্তান, শিষ্য; সুতরাং আমি কখনই কাহারও গুরু হইতে পারি না। যদি কেহ আমাকে গুরু বলিয়া মানে সে প্রভুকেই মানে; কারণ, আমার সর্বস্বধন ঠাকুর এবং তিনিই একমাত্র জগদ্গুরু এযুগে।... এযুগে গুরু একমাত্র প্রভু ছাড়া আর কেহই নাই—ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। কেবল গুরু নন—তিনি পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা এবং জীবের তিনিই সমস্ত। তাঁহার পাবন নাম 'রামকৃষ্ণ' জীবের ভবসংসার পার হইবার একমাত্র মন্ত্র, তাঁহার মধুর জীবন্ত মূর্তিই জীবের ধ্যেয়, তাঁহার পবিত্র চরিত্রের পাঠ-আলোচনাই শাস্ত্রাধ্যয়ন, তাঁহার গুণগান করাই কীর্তন, তাঁহার ভক্তসঙ্গ করাই সাধুসঙ্গ—এই আমার মন্ত্রদান, এই আমার শিক্ষা।"[৪]

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ভিন্ন দেহ-ধারী হলেও একই শক্তির প্রকাশ। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন এবং তাঁদের এই আবির্ভাবের তাৎপর্যও অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর মহিমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজ এক পত্রে জানাচ্ছেন: "তিনি (শ্রীশ্রীসারদা-দেবী) সাধারণ মানবী নন, সাধিকাও নন বা সিদ্ধাও নন। তিনি নিত্যা সিদ্ধা, সেই আদ্যাশক্তির এক অংশ-প্রকাশ; যেমন ৺কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি তেমনি।"[৫]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার। তাঁর আবির্ভাব বিশ্বের মানবসমাজের পরিত্রাণের জন্য। যাঁরা সৌভাগ্য ও সুকৃতিবান তাঁরাই এযুগে, এজীবনে তাঁর আশ্রয় লাভ করবেন। আর যাঁরাই তাঁকে যথার্থ আশ্রয় করবেন তাঁদের ভুক্তি মুক্তি সবই হবে করামলকবৎ। মহাপুরুষ মহারাজ অকৃত্রিম বিশ্বাসে সহৃদয়তার সঙ্গে এবিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। তাঁর এই জ্বলন্ত-বিশ্বাস-প্রণোদিত উক্তি আমাদের অন্তরের সংশয় নিঃশেষে নাশ করে দেয়। তাঁর এই বাণী গৃহী সন্ন্যাসী সকলেই অসংশয়ে গ্রহণ করে পরম নির্ভরতায় পরমার্থ লাভ ও জাগতিক শান্তির পথে অগ্রসর হতে পারেন। বেলুড় মঠ থেকে ১১।১৭।২২ তারিখে তিনি জনৈক সৌভাগ্যবান ভক্তকে লিখছেন: "এযুগে সেই দয়াময়, প্রেমময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ও নামে সভক্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমরা বহু পুণ্যফলে তাঁহার আশ্রয় পাইয়াছ। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি তোমরা তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হও। তোমাদের মুক্তির জন্য কোন চিন্তা নাই। মুক্তি তোমাদের করতলা-মলকবৎ। খুব তাঁহার নাম কর, খুব প্রার্থনা কর—শান্তি পাইবে, মানবজীবন সফল হইবে; কোন চিন্তা নাই, আমি বলিতেছি।"[৬]

॥ সংসার ও সাধন ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ভক্তদের সংখ্যা গৃহস্থ ভক্তদের তুলনায় খুবই কম। যাঁরা সন্ন্যাসীর কঠোর কঠিন ত্যাগব্রত গ্রহণ করতে পারেন না তাঁরা যোগ-ভোগের যুগ্ম ক্ষেত্রে, সংসারে থেকেই সর্বত্যাগের পথযাত্রার সাধনায় নিযুক্ত রয়েছেন। এঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সঙ্ঘের কাজে নিজেদের যুক্ত রেখে সঙ্ঘকে বিশ্বময় গতিশীল ও জাগ্রত রাখতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছেন। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ গৃহস্থ ভক্তদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা। তাঁর অমৃতকথার অধিকাংশই এই গৃহস্থ ভক্তদের প্রতি অনুকম্পান্বিত হয়ে উক্ত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম করুণার ধারা যেন প্রবাহিত হয়েছিল এই গৃহস্থ মানুষগুলির মানসিক শক্তি ও ভগবদ্ভক্তি লাভের কথা ভেবে। গৃহস্থদের ভালবেসেই তিনি বলেছিলেন, যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা তো তাঁকে ডাকবেই, গৃহস্থরা যে মাথায় বিশ মন বোঝা নিয়ে তাঁকে ডাকে।

গৃহস্থাশ্রমে থেকেও যে ঈশ্বর-সাধনা সম্ভব এবং শেষ পর্যন্ত গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস লাভ করে অন্তরে পরিপূর্ণ ত্যাগ ও ঈশ্বরোপলব্ধির আনন্দ লাভ করা সম্ভব তা শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন। মানব-

৪ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা—১০১ ৫ ঐ, ১১৩ ৬ ঐ, ১৪৫

জীবনের উদ্দেশ্যই ঈশ্বরলাভ, তা যেকোন আশ্রমেই সে থাকুক না কেন। কর্ম ও ভোগ অনুসারে দ্রুত অথবা মন্থর গতিতে মানবগণ সেই পরমের পথেই চলেছে।

নিরভিমানতা সকল আশ্রম-জীবনেই আচরণীয়। সংসারীদেরও নিরভিমান হতে বলেছেন মহাপুরুষজী। সংসার-পথযাত্রায় নিঃশঙ্কতা এবং নিরভিমানতা আসতে পারে একান্ত ঈশ্বর-নির্ভরতায়, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে। মহাপুরুষজী সংসারে থেকেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ভাবটি সাধনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আলমোড়া থেকে তিনি একজন ভক্তকে লিখছেন: "তিনিই জীবন-মরণে সর্বস্বধন। তাঁহারই আবার এই সংসার—তিনিই তাঁহার মায়ার সংসারে রেখেছেন—তাই আছি এবং যেমন করাইতেছেন তাহাই করিতেছি। ক্রমে এই ভাব তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে, ভালবাসিতে ভালবাসিতে দাঁড়াইবে। ... জীবনটা যাহাতে পবিত্রভাবে চলে সেদিকে দৃষ্টি সর্বদাই থাকা চাই। কামকাঞ্চনেরই সংসার—প্রলোভন চতুর্দিকে। প্রভুর চরণে সর্বদা প্রার্থনা করিবে, 'প্রভু, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই। তোমার চরণে যেন অহেতুকী ভক্তি-বিশ্বাস থাকে।' এইরূপে প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই প্রভু তোমায় ঠিক পথে চালাইবেন—নিশ্চয় জানিও।"[৭]

সংসারাশ্রমের অন্যতম কর্তব্য মাতাপিতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করা। বৈদিক যুগের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ ও গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণের পূর্বের উপদেশেও রয়েছে—'মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবোভব'। জনৈক ভক্তকে মহাপুরুষজী পত্রে নির্দেশ করেছেন: "সংসারে পিতামাতার সেবা অতি মহৎ কর্তব্য কার্য; ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই এবং আমাদের উহা বিশেষ অনুমোদনীয়। যতদিন সম্ভব তুমি তাহা করিয়া যাও।"[৮]

সংসারী মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব পরনিন্দা আর পরচর্চা করা। শ্রীশ্রীমা এবিষয়ে বারবার আমাদের সাবধান করেছেন। পরের দোষ দর্শন না করে তিনি প্রত্যেককে নিজের দোষ দেখে আত্ম-সংশোধনে যত্নবান হতে বলেছেন, সকলকে ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিতে বলেছেন। মহাপুরুষ মহারাজও এবিষয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দান করেছেন। বেলুড় মঠ থেকে ১৭।৮।২২ তারিখে মহাপুরুষজী একজন স্ত্রী-ভক্তকে লিখছেন: "একটা বিষয় তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি—যখন লোকের সহিত কথাবার্তা কহিবে, কাহারো নিন্দাবাদ কখনই করিবে না বা শুনিবে না। যদি কখনো শুনিবার অবকাশ হয়, তখন চুপ করিয়া থাকিবে এবং নিজে উহা কখনো করিবে না। এই দিকে তুমি বিশেষ নজর রাখিও। পরনিন্দা করিলে বা শুনিলে মন অত্যন্ত মলিন ও নিম্নগামী হয় এবং ভগবানে ভক্তি হয় না।"[৯]

সংসার দুঃখ-যাতনাময়। যাঁরা দীর্ঘকাল সংসারে রয়েছেন তাঁরাই ভালভাবে বুঝেছেন অঘটনঘটন-পটীয়সী মহামায়া সংসারে কেমন দুঃখ-যাতনার জাল বিস্তার করে রেখেছেন। এখানে রয়েছে ব্যাধি, মৃত্যু এবং আরো কত শোক-সন্তাপ, বার্ধক্যের বেদনা। দীর্ঘজীবী প্রতিটি সংসারীই বলে থাকেন, সংসার বড়ই যন্ত্রণাময়। স্বামীজী তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতায় সংসারের যথার্থ চিত্রটি তুলে ধরে বলেছেন: "হেথা কোথা শান্তির আকার?" গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সংসারকে অনিত্য এবং দুঃখময় বলেছেন। কিন্তু এই অনিত্যতা ও অশুভের মধ্য থেকেই ঈশ্বর-সাধনার নির্দেশ দিয়েছেন ভগবান: "অনিত্যমসুখং লোকমিমংপ্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" (৯।৩৩) মহাপুরুষ মহারাজও তাঁর বিভিন্ন পত্রে ভক্তদের একথাই বলেছেন। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন: "দুঃখ তো তাঁর (ভগবানের) দয়ার দান।" দুঃখ আঘাত ভক্তকে আরো ঈশ্বরমুখী করে তোলে। সংসার সেক্ষেত্রে হয়ে ওঠে সাধনের সহায়, সাধনার ক্ষেত্র। তখন 'হৃদয় শ্মশান' হলেও সেখানে শ্যামা মায়ের নৃত্যাঙ্গন প্রস্তুত হয়।

মহাপুরুষজী ২৩।৮।১৩ তারিখে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম থেকে একজন ভক্তকে লিখছেন: "সংসার তোমায় যতই যাতনা দিবে ততই প্রভুর পাদপদ্ম তোমার স্মরণ হইবে; যত প্রভুর স্মরণ-মনন হইবে ততই তিনি তোমার বন্ধন কাটিয়া দিয়া নিজের

৭ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা—৫৬

৮ ঐ, ১৪১

৯ ঐ, ১৪৪

পাদপদ্মের নিকটবর্তী করিয়া লইবেন—ইহাই নিশ্চয় জানিবে। সংসারের এইসকল তাড়না ভগবদ্ভক্তির হেতু হয় ; ভক্তেরা এইরূপেই তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়।"[১০] ভুবনেশ্বর মঠ থেকে ২০।৪।২৩ তারিখে অন্য একজন ভক্তকে মহাপুরুষ মহারাজ এই একই বিষয়ে লিখছেন : "বিপদ আসিলেই ভক্তের প্রভুর চরণে বিশ্বাস ভক্তি আরও বৃদ্ধি হয়—কমে না। বিশ্বাস ভক্তি বাড়াইবার জন্যই প্রভু ভক্তকে বিপদে ফেলেন।"[১১]

শরীর ধারণ করিলেই শরীরে রোগ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর কথামৃতে বলেছেন, ঘরে থাকলে যেমন 'ট্যাক্স' দিতে হয়। দেহরূপ ক্ষেত্রে থাকলে ক্ষেত্রজ্ঞ হলেও মাসুল দিতে হবেই। শারীরিক অসুস্থতা সংসারী মানুষদের দেহাত্মবোধ থেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। কিন্তু শোকে মুহ্যমান হওয়া যেমন বাঞ্ছিত নয়, তেমনি রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করে মনকে দেহ থেকে সরিয়ে দেহীতে নিবিষ্ট রাখার সাধনও একান্ত প্রয়োজন। যে তিতিক্ষায় অপ্রতিকারপূর্বক চিন্তা-বিলাপ রহিত হয়ে সর্বদুঃখ সহ্য করার কথা, সে তিতিক্ষা গৃহস্থদের সম্ভব না হলেও, আন্তরিক জপ-ধ্যান অভ্যাসের দ্বারা রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁরা মনকে ঈশ্বরাভিমুখী রাখার প্রচেষ্টা করতে পারেন। মহারাজ এবিষয়ে ৯।২।১১ তারিখে একজন ভক্তকে লিখছেন : "রোগ সকলের শরীরেই হয়—কি সাধু কি অসাধু। মহা কঠিন কঠিন রোগও সাধুদের শরীরে হয়, তজ্জন্য দুশ্চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্মরণ-মনন, ধ্যান-জপ আনন্দে ও আশার সহিত খুব করিয়া যাও ; এই জীবনেই পরম জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিবে, নিশ্চয় জানিও।"[১২]

সংসারে থেকে সংসারের সঙ্গে প্রলিপ্ত হলেই বেদনা। ঠাকুর তাই বলেছেন, সংসারে থাক, কিন্তু সংসারী হয়ো না। জীবনতরণীকে সংসার-প্রবাহের মধ্য দিয়েই ওপারে নিয়ে ভেড়াতে হবে ; তবে প্রবাহের বারি তরণীতে উঠলেই সে ডুবে যেতে পারে। সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করে, অসম্পৃক্ত সম্পৃক্ততায় বৈরাগ্যবান হতে পারলেই সংসারে থেকেও পরাজ্ঞান, পরাভক্তি লাভ করা সম্ভব। আসলে বৈরাগ্য না এলে মন সংসারভাবনা ছেড়ে ঈশ্বরাভিমুখী হয় না, সংসারের স্বরূপজ্ঞানই বৈরাগ্যের উদয় করে। যাঁরা সৌভাগ্যবান, সুকৃতিবান তাঁরাই গুরু ও ঈশ্বরকৃপায় বৈরাগ্যবান হন। মহাপুরুষজী এবিষয়ে বেলুড় মঠ থেকে ১২।৮।২৫ তারিখে একজন ভক্তকে জানাচ্ছেন : "সহস্র সম্পদের ভিতরে সংসারে থাকিয়া যে মনে করে 'আমি বেশ আছি', সে বড় ভ্রান্ত।... কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় বা বহুজন্মের সুকৃতিফলে যাহার উপর গুরুকৃপা হইয়াছে, সে কখনই, যে-কোন অবস্থায়ই হউক, সংসারকে কখনও সুখময়, শান্তিময় স্থান মনে করিতে পারে না এবং সততই সেইজন্য সে মোহের পার ভগবৎ-নিকেতনে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে।"[১৩]

ভগবৎ-কৃপা লাভ করতে হলে সংসারে থেকেও সংগ্রাম করতে হবে। ভোগবাসনার রাজ্যে থেকেও সংসারী মানুষকে হতে হবে সংযমী, প্রার্থনাপরায়ণ। মহাপুরুষ মহারাজ এবিষয়ে স্বামীজীর একটি বাণী উদ্ধৃত করে, দক্ষিণ ভারতে অবস্থানকালে ১১।৯।২৬ তারিখে একজন ভক্তকে লিখছেন : "সংযম একমাত্র উপায় এবং ঠাকুরের নাম-জপ ও ধ্যান-পূজা, যে কাজ করিতেছ তাহা ঠিক ঠিক করা, সংসারের অন্য সব কর্তব্য কাজ যা আছে তাহা করা, ঠাকুরের কাছে অন্তরের সহিত বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান বিবেক বিচার ও পবিত্রতা অর্থাৎ সংযম—এই সকলের জন্য প্রার্থনা করা। অন্তঃসংগ্রাম করিতেই হইবে, তাঁহার কৃপায় জয়ী হইবে, ভয় নাই। 'সংগ্রামই জীবন—যেখানে সংগ্রাম নাই তাহা মৃত্যুতুল্য (স্বামীজী)'।"[১৪]

॥ নিষ্কাম কর্ম

কোন প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, সর্বভূতস্থ ঈশ্বরের সেবা করার আদর্শে যে-কর্ম, তা-ই নিষ্কাম কর্ম এবং এরকম কর্ম ঈশ্বর-সাধনারই অন্যতম অঙ্গ। সন্ন্যাস এবং সংসার এই উভয় আশ্রমেরই কর্মাদর্শ নিষ্কাম, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ জীবন সুরক্ষার ভাবনা না থাকাতে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান

১০ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা—৪২
১১ ঐ, ১৫৬
১২ ঐ, ১২৪
১৩ ঐ, ১৭১
১৪ ঐ, ১৮৪

সহজ। কিন্তু সংসারাশ্রমে কর্মের সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক ভাবটি প্রবল হওয়াতে প্রতিটি কর্মের সঙ্গেই ফলাকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে যায়। তবে একান্ত ফলাকাঙ্ক্ষাহীন না হলেও, ব্যক্তিগত লাভালাভ বড় করে না দেখে পরহিতার্থ কর্ম করলে তা অনেকটা নিষ্কাম কর্মই হয়ে যায়। মহাপুরুষজী বেলুড় মঠ থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর জনৈক ভক্তকে লিখছেন: "বাস্তবিক কিছু শুভ কার্য, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কিছু কাজ করা প্রত্যেক মানবেরই উচিত। নিজের উদরপোষণ বা আত্মীয়স্বজন-প্রতিপালন তো সকলেই করিয়া থাকে। শুভ কার্য বা নিষ্কাম কর্ম মানে গরিব-দুঃখীকে যথাসাধ্য সাহায্য করা। বাস্তবিক একটি গরিবকে অন্ন দিয়া যদি প্রতিপালন করিতে পার বা একটি দুঃখী বালককে আহারাদি দিয়া লেখাপড়া শিখাইতে পার তাহা হইলেও যথেষ্ট হইল। তারপর নিজে একলা যাহা করিবার সামর্থ্য নাই, দু-চারটি বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিয়াও ঐরূপ কিছু শুভ কার্য করিতে পার। ...এইরূপ জনহিতকর অনেক কাজ তোমার অতি নিকটেই পড়িয়া আছে। যদি সেরূপ প্রাণ হয় তাহা হইলে অনায়াসেই করিতে পার। আর ঐরূপ কিছু করিতে পারিলেই দেখিবে যে, জীবন আর তত বিষময় বলিয়া বোধ হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের ধ্যান জপ গুণগান ইত্যাদিও করিতে হইবে; করিলে শান্তি পাইবে।"[১৫]

ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে মহাপুরুষ মহারাজ ১১।৯।৩১ তারিখে জনৈক ভক্তকে লিখছেন: "মানবজীবনে জীবসেবা করা ছাড়া উচ্চ কর্ম আর কি আছে? চিত্ত শুদ্ধ করিবার অমন প্রশস্ত উপায় আর কি আছে? নিঃস্বার্থ পরসেবায় ভগবানের বিকাশ হৃদয়ে সহজে উপলব্ধ হয়।"[১৬] আবার বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম থেকে ২৮।১১।১৬ তারিখের এক পত্রে কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট জানিয়েছেন: "কর্মের উদ্দেশ্য কেবল তাঁহার চরণে দৃঢ় ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া।"[১৭]

ঠাকুর, স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রবর্তিত বর্তমান যুগ-জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করে মহাপুরুষ মহারাজ স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আসক্তিহীন হয়ে নিষ্কাম কর্মযজ্ঞ সম্পাদনই বর্তমান যুগ-জীবনের আদর্শ। গৃহত্যাগী হয়ে একমাত্র ঈশ্বর-সাধনায় কালাতিপাতের প্রচেষ্টা বর্তমানের যুগ-জীবনাদর্শ নয়। এবিষয়ে তিনি বেলুড় মঠ থেকে এক ভক্তকে ১৯।৮।২৩ তারিখে লিখছেন: "কর্ম করিতে গেলে আসক্তি আসে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা ঠিক বটে; কিন্তু ঠাকুর, স্বামীজী ও মা-ঠাকুরানীর এরাজ্য অন্যপ্রকার। এ যুগধর্ম-সংস্থাপনের কার্য—ইহা কেবল সাধন-ভজন, ধ্যান-জপ ও ত্যাগ-তপস্যার রাজ্য নয়। এরাজ্যে সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে কার্য করা চাই। আমাদের (প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের) আদেশে যাহারা কর্ম করিবে, তাহারা কখনই কর্মে আসক্ত হইবে না। প্রভু স্বয়ং তাহাদের জন্য দায়ী হন। তাহারা কখনই কর্মে আসক্ত হইবে না।"[১৮]

মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। এই ধর্মানুমোদিত শাশ্বত কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন। জীবনের উদ্দেশ্য আত্মদর্শন বা ঈশ্বর-লাভ। গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস, জীবনধারণ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় কর্মাদি সবই উপায় মাত্র—উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সব মিলিয়ে জীবনধারণই সাধনা। মোহাবিষ্ট যে জীবনযাপন তাও সাধনারই নামান্তর। উপনিষদের বাণী—'কালেনাত্মনি বিন্দতি'। আত্মদর্শন বা স্বরূপ-চৈতন্যে পৌঁছানোর পথ পরিক্রমাই জন্ম-জীবন-মৃত্যু-চক্র। তবে জীবনের কর্ম যখন সজ্ঞান সাধনা বলে প্রতীত হয় তখনই ঘটে যথার্থ অগ্রগতি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আদিষ্ট এবং বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' জপ-ধ্যানের মতোই তপস্যার অঙ্গ। গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীর পরার্থে কর্ম নাম যশ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, ঈশ্বরলাভের সাধনারই নামান্তর। বেলুড় মঠ থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে এ-বিষয়ে মহাপুরুষ মহারাজ লিখছেন: "সাধন-ভজন এবং সেবাকার্য দুই-ই সঙ্গে সঙ্গে চলা চাই। সেবাকার্যও সাধনের মধ্যে পরিগণিত, ইহা নিশ্চয় ধারণা করা দরকার। সাধন-ভজনের সঙ্গে যে সেবাকার্য চলিবে না, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।...তোমাদের

১৫ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা—৩৮
১৬ ঐ, ১২৯
১৭ ঐ, ৮৬
১৮ ঐ, ১৬০

মধ্যে এরূপ ভাব যেন কখনই না হয় যে, সেবাকার্য এবং সাধন-ভজন দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। এই দুই একত্র করিয়া চলিলে তবে প্রভুর রাজ্যে পৌঁছিতে পারিবে।"[১৯]

॥ ভক্তি-বিশ্বাস ॥

জন্মান্তরীণ সংস্কারবশে আমাদের মন সর্বদা সংশয়ী, ভগবদ্বিশ্বাস দৃঢ় হয় না কিছুতে। তাই শ্রীশ্রীমা বলেছেন: "বাবা, বিশ্বাস তো শেষের কথা।" ঠাকুরও বলেছেন: "বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো।" মহাপুরুষ মহারাজের পত্রাবলী পাঠ করলে ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণময়, রামকৃষ্ণগতপ্রাণ। তাঁর প্রতিটি কথাই উপলব্ধিসঞ্জাত সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণে আশ্রয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস দৃঢ় হলে মনুষ্যজীবন হবে কৃতকৃতার্থ, এ-কথা তিনি বহু পত্রে ভক্তদের দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন। ১০৷৬৷২৬ তারিখে উতকামণ্ডের শ্রীহাতীরামজী মঠ থেকে একজন ভক্তকে লিখেছেন: "বিশ্বাসেই সব—বিশ্বাসেই শান্তি।" বেলুড় মঠ থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে লিখছেন: "...আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁর এ ভবসংসার পার হইবার আর চিন্তা নাই।"[২০] কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম থেকে ৩৷৪৷১২ তারিখে এক পত্রে মহাপুরুষজী লিখছেন: "যে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছে, সে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেও তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না—ইহা নিশ্চয় জানিও।"[২১] একই ব্যক্তিকে কনখল থেকে ১৫৷৭৷১২ তারিখে আবার লিখছেন: "প্রকৃত শরণাপন্ন ভক্তের ভয় নাই; প্রভু তাহাদের বিপদ হইতেও রক্ষা করিয়া ঠিক পথে আনিয়া দিবেন।"[২২]

তবুও বিশ্বাস দৃঢ় হয় না আমাদের। যারা জানি 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' তারাও মনে প্রাণে বিশ্বাসে দৃঢ় হতে পারি না। মহাপুরুষ মহারাজ দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে থেকে, তাঁর লোকোত্তর মহিমা সম্যক্ অবধারণ করে আমাদের জানাচ্ছেন তাঁর কথা। তাই মহাপুরুষ-বাক্য ক্ষণিকের জন্য হলেও, আমাদের বিশ্বাস জাগিয়ে দেয়, হৃদয়ে নতুন করে বল পাই আমরা। আলমোড়া থেকে ১২৷৭৷১৩ তারিখে একটি পত্রে মহাপুরুষজী লিখলেন: "জীবন্ত, জ্বলন্ত, জাগ্রত যুগাবতার, যিনি এই কলির জীব উদ্ধার করিতে নরদেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার উদ্ধারিণী শক্তির কার্য পৃথিবীর চারিদিকে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, এখনও কতকাল হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই—সেই ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছ, ভাল থাকিবে নিশ্চয়ই।... নির্ভর করিতে পারিলেই আনন্দ। 'আমি তাঁর শরণাগত, তাঁর দাস, তাঁর সন্তান, আমার আবার চিন্তা কি—আমি তো উদ্ধার হয়েছি, যখন রামকৃষ্ণের আশ্রয় পেয়েছি, আমার আর ভাবনা কি?' —এইভাব মনে খুব জাগরিত রাখিবে।"[২৩] ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং নির্ভরতাতেই জগৎ-সংসারের সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এবিষয়ে মহারাজ জনৈক ভক্তকে জানাচ্ছেন: "সমস্ত তাঁহার উপর নির্ভর করিবে। নির্ভরের ন্যায় আনন্দ ও শান্তি কিছুতেই নাই।"[২৪] ঈশ্বর-নির্ভরতায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসে জীবনক্ষেত্রে ভ্রান্তি আসে না, কখনো ভ্রান্ত পথে বিচরণ করতে গেলেই তিনিই সে-পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন তাঁর ভক্তকে। এবিষয়ে বেলুড় মঠ থেকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের এক চিঠিতে একজন ভক্তকে তিনি লিখছেন: "প্রভু ভক্তদের রক্ষা করেন, ভ্রমবশতঃ বিপথে যাইয়া পড়িলেও তিনি কৃপা করিয়া পিতার ন্যায় আবার ঠিক পথে তুলিয়া দেন; তাহা না হইলে ভক্তের আর উপায় কি?"[২৫]

মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন বিশ্বাস আর নির্ভরতার পূর্ণ প্রতীক। বহু পত্রে বারবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের বিশ্বাসের বাণী শুনিয়ে অভয় দান করেছেন। বারাণসী থেকে ২০৷১১৷১৬ তারিখে একটি পত্রে লিখেছেন: "উপদেশ এই একমাত্র জানিবে যে, যুগাবতার, পরমদয়াল, পতিতপাবন, ভক্তবৎসল, দীনের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়াছ, আর কোন চিন্তা নাই।"[২৬]

আরেকটি পত্রে বেলুড় মঠ থেকে ৪৷১৷১৮ তারিখে লিখছেন: "প্রভু জীবন্ত জ্বলন্ত পাবকসদৃশ।

১৯ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা—১৪০
২০ ঐ, ৩৯
২১ ঐ, ৪০
২২ ঐ, ৪১
২৩ ঐ, ৪৪
২৪ ঐ, ৬২
২৫ ঐ, ৭৯
২৬ ঐ, ৮৫

তাঁহার শ্রীচরণে কাতরে প্রার্থনা করিলে মনের সব অজ্ঞান দগ্ধ হইয়া যায়।”[২৭] বৈদ্যনাথ ধাম থেকে ১৪।৭।১৮ তারিখে লিখছেন: “তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা; তাঁহার কাছে সরলভাবে কাতরে প্রার্থনা করিলেই তাহার ফল নিশ্চয় পাইবে জানিও।”[২৮]

সংসারে যেমন শোকের সন্তাপ, তেমনি রোগের যন্ত্রণা। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তবুও আমাদের সকাম মানসিকতা এইসব অবশ্যম্ভাবী পরিণতিগুলিও প্রত্যাশা করে না। মৃত্যু কেউ কামনা করে না। যুধিষ্ঠির বকরূপী যক্ষকে বলছেন: “শেষাঃ স্থিরত্ব-মিচ্ছন্তি”। মহাপুরুষজী তাঁর একটি পত্রে আশ্রিত ভক্তদের অভয় দান করে লিখছেন: “দেহ ধারণ করিলে তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী, অগ্রেই হউক বা পরেই হউক। দেহধারণ-উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় প্রভু তাহাই করুন অর্থাৎ ভগবৎ-চরণে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস দিন। সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হইবে, কিন্তু প্রভু নিত্যই আছেন, তাঁহার ভক্তেরাও নিত্য আছেন, ইহা পরম সত্য। স্থূল শরীর নাশ হইলেও প্রভু ও তাঁহার ভক্তদের সূক্ষ্ম শরীর নাশ হয় না বা তাঁহারা নির্বাণমুক্তি চান না।”[২৯]

পরম নির্ভরতাই ঈশ্বরকৃপার হেতু হয়। ভক্তি-বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করলে তিনিই তরঙ্গাবিক্ষুব্ধ ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করে নেন, তিনিই ‘খণ্ডন ভববন্ধন’। পরম নির্ভরতাই চরম নির্ভাবনা দান করে ভক্তকে। ভুবনেশ্বর থেকে ১।১২।২১ তারিখে মহাপুরুষজী জনৈক ভক্তকে লিখছেন: “তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই তিনি কৃপা করিবেনই করিবেন। কথায় বলে, ‘বড় মানুষের আস্তাকুড়ও ভাল।’ তাঁহার অপেক্ষা বড় আর কে আছে? তাঁহার দ্বারে পড়িয়া আছ, কোন ভাবনা নাই।”[৩০]

বেলুড় মঠ থেকে একজন ভক্তকে ২১।৬।২৩ তারিখে তিনি লিখছেন: “তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, নিশ্চয় জানিবে। প্রভু যুগাবতার, যুগগুরু, ঈশ্বরাবতার; তিনি সকলের অন্তরাত্মা, তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে ডাকিলেই হৃদয় চৈতন্যময় হইয়া যায়। …তিনি কাহাকেও বিমুখ করেন না, যে ডাকে সেই তাঁহাকে পায়।”[৩১] তিন বছর পরে ১০।৯।২৬ তারিখে দক্ষিণভারতের উতকামণ্ড থেকে ব্রহ্মচারী প্রবোধচৈতন্যকে লিখছেন: “তাঁহাতে অচল অটল হিমাচলের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাস চাই। তিনি যুগাবতার—জীবের অশেষবিধ কল্যাণের জন্য তাঁহার সাঙ্গো-পাঙ্গ অবতার। তিনি সত্যসত্যই যুগ-অবতার।” পরবর্তী বছর ৩।১।২৭ তারিখে বম্বে থেকে একজন ভক্তকে তিনি লিখছেন: “তাঁহাকে ঠিক ঠিক ধরিয়া থাকিলে আবশ্যকীয় আভ্যন্তর ও বাহ্যিক সমস্ত অভাবই পূর্ণ হয়, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ঠাকুর পরম দয়াল—অহৈতুকী-কৃপাপরবশ হইয়া জগতের উদ্ধারের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার হইয়াছেন।”[৩২]

॥ সাধন-ভজন ও কৃপা ॥

ব্যাকুলতাকে ‘কথামৃতে’ ঠাকুর ঈশ্বরলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। ব্যাকুলতা আসে বৈরাগ্য থেকে। এই ব্যাকুলতারই নামান্তর ‘রাগভক্তি’, যা বৈধীভক্তির পরিণতি। জগতের দুঃখ-যাতনার আঘাতেও বৈরাগ্য এবং ব্যাকুলতার উদ্ভব হতে পারে। দুঃখ আঘাত এক অর্থে তাঁর দান, মায়া কাটানোর চৈতন্য-শক্তি। শ্রীশ্রীমা তাই বলেছেন: “দুঃখই তো তাঁর দয়ার দান।” কনখল সেবাশ্রম থেকে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের একটি পত্রে মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন: “বৈধীভক্তি অপেক্ষা রাগভক্তি শ্রেষ্ঠ। …তাঁহার কৃপালাভ হইতেছে না, এজন্য মনে অশান্তি থাকা খুব ভাল; নতুবা মানুষ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে কি করিয়া? …তাঁহার বিরহে অশান্তি—ভক্তের তাঁহার রাজ্যে অগ্রসর হইবার কারণ বা হেতু।”[৩৩] আলমোড়া থেকে ২৭।৬।১৫ তারিখে মহাপুরুষজী লিখছেন: “বিঘ্ন-বাধা না পাইলে মানুষ অগ্রসর হইতে পারে না এবং এইজন্যই বড়লোকেরা, মহাত্মারা সকলেই বিঘ্ন-বাধাকে বড়ই উপকারী বন্ধু বলিয়াছেন।”[৩৪]

মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক অনুসারে ভক্তের যথার্থ আচরণ ও সাধনপন্থার কথাও নির্দেশ করেছেন মহাপুরুষজী এই একই পত্রে। তিনি লিখেছেন:

২৭ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা—৯২
২৮ ঐ, ৯৫
২৯ ঐ, ১১২
৩০ ঐ, ১০০
৩১ ঐ, ১৫৮
৩২ ঐ, ১৮৮
৩৩ ঐ, ৪০
৩৪ ঐ, ৫৮

"ভক্তের স্বভাব—তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু হওয়া, অমানীকে পর্যন্ত মান দেওয়া, মানীর তো কথাই নাই। এমন হইলে তবে প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায়।" আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী উল্লেখ করে লিখেছেন: "ঠাকুর বলিতেন, তিনটে 'স' আছে—অর্থাৎ সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর—তিনটে 'স' অর্থাৎ শ, ষ, স। বিরুদ্ধাচারীরা যত নির্যাতন করিবেন, ভক্তেরা তত তাঁহাকে ডাকিবেন এবং যত তাঁহাকে ডাকিবেন ততই তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি-বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে—যত ভক্তি-বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে ততই শান্তি ও আনন্দ। ভক্তদের সেই শান্তি, আনন্দ দেখিয়া বিরোধীদের মনও প্রভুর শ্রীচরণের দিকে ধাবিত হইবে—আর বিরোধ থাকিবে না।"[৩৪]

ঈশ্বরকে কেমন করে ডাকতে হবে তা বলতে গিয়ে ঐ পত্রেই তিনি লিখেছেন: "নির্জনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিবে, লোকে যেন না জানিতে পারে—গোপনে গোপনে তাঁহাকে খুব ডাকিবে। লোক-জানাজানি হইলে ভক্তি বা অনুরাগের ক্ষতি হয়। সাবধানে গোপনে তাঁহাকে ডাকিবে।"[৩৪]

শুধু একান্তে নয়, অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মিলে বহিরঙ্গ সাধনেরও নির্দেশ দিয়েছেন মহাপুরুষ মহারাজ। ১২।৭।১৩ তারিখের এক পত্রে তিনি লিখছেন: "বৎসরে একবার উৎসব করা ভালই, তবে আমার মনে হয়, বেশ মনের মতো দু-চারজন ভক্ত মিলিত হইয়া নিত্য না হয়, দু-চারদিন অন্তর অন্তর প্রভুর বিষয় চর্চা বা অন্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, আলোচনা, কিছু কিছু ভজন, কীর্তন, গান, কখন কিছু ভোগ দিয়া সকলে মিলিয়া প্রসাদ পাওয়া—এই করিলে আরও ভাল হয়।"[৩৫] ২৫।৯।১৫ তারিখের আর একটি পত্রে লিখছেন: "মধ্যে মধ্যে, অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন সমস্ত ভক্তেরা মিলিয়া প্রভুর বিষয় কিছু পাঠ, আলোচনা এবং তাঁর গুণকীর্তন করা খুব ভাল।"[৩৬]

বিবেক-বৈরাগ্য হলেই হলো। তাঁকে পেতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই তাঁর কৃপালাভের কারণ হয়। ভক্তের এই ভগবৎ-কৃপাই সম্বল। এবিষয়ে মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠ থেকে ১৭।৭।১৯ তারিখের এক পত্রে জানাচ্ছেন: "ভক্তদের অধিক বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না। ঠিক ঠিক বিবেক-বৈরাগ্য থাকিলেই তাহার সবই রহিল।...এক নামেতেই সব হইয়া যায়। তাহার উদাহরণও শাস্ত্রে বহু আছে।... তাঁহার কৃপাই ভক্তের ভরসা, তাঁহার কৃপা হইলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। সর্বশাস্ত্র তাহার হৃদয়ে সদা জাগরিত থাকে। যাঁর পাদপদ্ম যাহার হৃদয়ে সর্বদা প্রস্ফুটিত থাকে তাহার আর অভাব কি? 'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ'—সব বিদ্যাই তিনি, সব শাস্ত্রই তিনি। পূর্ণ মন তাঁহার পাদপদ্মে রাখিতে পারিলেই আর কোন অভাবই ভক্তের থাকে না।"[৩৭]

এই ভাবটিই আবার তিনি আরো জোর দিয়ে বলেছেন ১২।১০।১৯ তারিখের পত্রটিতে। তিনি লিখেছেন: "ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে হইলে অনেক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে পণ্ডিত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান জগতে অনেক আছে; তাহারাই অগ্রে তাঁহাকে লাভ করিত। কিন্তু ভগবৎ-কৃপাতেই বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি, পবিত্রতা লাভ হয় এবং তাহাই মানবজীবনে দুর্লভ। বিদ্যাবুদ্ধি সহজেই লাভ হয়।"[৩৮]

সাধনক্ষেত্রে সাধকের প্রচেষ্টা আর ঈশ্বরকৃপা এই দুই-ই সিদ্ধির হেতু। তথাপি সর্বোপরি ঈশ্বর-কৃপা। বেলুড় মঠ থেকে ৯।৪।২০ তারিখে জনৈক ভক্তকে লেখা মহাপুরুষ মহারাজের পত্রখানা এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভক্তটিকে লিখছেন: "...সমস্তই তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করে। তিনি যদি দয়া করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মনকে প্রেম দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া রাখেন, তবেই মন সেখানে থাকিতে সমর্থ হয়। অতি অল্প সময়ের জন্যও যদি তাঁহাতে মগ্ন করিয়া রাখেন, সেও অতি সৌভাগ্য বলিয়া জানিবে।...একটি গানে আছে—'তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায়। তুমি না ডাকিলে কাছে, সহজে কি চিত ধায়॥'...তাঁহার

৩৫ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা- -৪৪
৩৬ ঐ, ৬০
৩৭ ঐ, ১০৫
৩৮ ঐ, ১০৯

কৃপায় প্রার্থনাতেই সব পাইবে। 'বালানাং রোদনং বলম্'—বালকের রোদনই বল; 'মা দাও, মা দাও' বলিয়া কেবল কান্না ছাড়া তাহার আর কোন শক্তি নাই।"[৩৯]

সাধন-ভজন কিভাবে করতে হবে, কখন সাধনের প্রকৃষ্ট সময় সেসকল বিষয়েও মহাপুরুষ মহারাজ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন অনেক ভক্তকে। ভুবনেশ্বর মঠ থেকে ১।১২।২১ তারিখে একটি পত্রে তিনি লিখছেন: "শেষ রাত্রে তিনটার সময় নিয়মিতরূপে উঠিয়া ভজন করিবে। ঐ সময় সাধনের বড়ই অনুকূল। ব্রাহ্মমুহূর্ত—দিনের সকল সময় অপেক্ষা শেষ রাত্রি সাধনের অতি অনুকূল সময়।"[৪০]

সাধন-প্রক্রিয়া সম্পর্কেও মহাপুরুষজী সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন ভক্তদের। বেলুড় মঠ থেকে ১৬।৬।২২ তারিখে একখানি পত্রে জনৈক ভক্তকে বলছেন: "মনকে স্থির করিবার একমাত্র প্রধান ও সহজ উপায় এই—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তির সম্মুখে বসিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার নাম জপ করা এবং এই মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা চাই যে, ঠাকুর তোমার দিকে দেখিতেছেন ও তুমি যে তাঁহার নাম জপ করিতেছ তাহা শুনিতেছেন এবং তোমায় কৃপা করিবার জন্য বসিয়া আছেন। এইরূপ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে, প্রভুতে দৃঢ় বিশ্বাস হইবে এবং শান্তি পাইবে।...তিনি মানুষ নহেন, তিনি ঈশ্বরাবতার, জীবন্ত জাগ্রত প্রভু। যে তাঁহার শরণ লইবে, যে কাতরে প্রার্থনা করিবে, তাহাকেই তিনি দয়া করিয়া থাকেন।"[৪১]

ধ্যান সম্পর্কে মহাপুরুষ মহারাজের বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে বেলুড় মঠ থেকে ১০।৭।২২ তারিখে লেখা একটি পত্রে। তিনি জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে লিখছেন: "জপ করিতে করিতে ধ্যান আপনি আসিবে, প্রভুর শ্রীমূর্তি হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, আনন্দ ও প্রেম অনুভব করিবে; তিনি যে তোমার হৃদয়ের দেবতা, পরমাত্মীয়—এই ধারণা হইবে।...ধ্যানের সময় এইরূপ চিন্তা করিবে যেন তোমার হৃদয়পদ্মে ঠাকুর তোমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন এবং তুমিও তাঁহার দিকে প্রেম-ভক্তিভরে দেখিতেছ—এইরূপ চিন্তা করাই ধ্যান। ইহার দ্বারা তুমি হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিবে ও আশায় প্রাণ সর্বদা ভরিয়া থাকিবে।...তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই তোমার জীবনের সর্বস্ব—এই ভাব সর্বদা মনে রাখিবে, তাহা হইলে ধ্যানের সময় মন খুব একাগ্র হইবে। মোট কথা, তাঁহাকে আপনার করিয়া লওয়া, আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয় করিয়া লওয়া। প্রেম বিনা তাঁহাকে পাওয়া যায় না; যত তাঁহাকে ভালবাসিবে ততই ধ্যান হইবে, ততই আনন্দ হইবে।"[৪২]

বেলুড় মঠ থেকে ১৬।১২।২২ তারিখে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক ভক্তকে লিখছেন: "খুব প্রভুর নাম কর। নামে হৃদয় ভরিয়া যাক, তাহা হইলে আর কোনরূপ অভাব বোধ করিবে না—কি আর্থিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক। কেবল ভগবানে বিশ্বাস-ভক্তি-প্রীতির অভাবেই পূর্বোক্ত অভাবসকল বোধ হয়। সন্তোষ পরম ধন। তাঁহাতে প্রীতি হইলে সন্তোষ আপনিই আসে।"[৪৩]

স্বামীজী বলতেন: "ঠাকুর ছিলেন আমাদের মাতৃস্বরূপ"। স্বামী ব্রহ্মানন্দও ঠাকুরকে 'মা' বলেই ভাবতেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশ ঠাকুরকে বলেছিলেন: "আপনি প্রকৃতি কি পুরুষ তাই আমি বুঝি না।" তাছাড়া তিনি শ্যামপুকুরবাটীতে শ্যামাপূজার দিন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজো করেছিলেন। স্বামী শিবানন্দও ঠাকুরকে মাতৃস্বরূপই মনে করতেন। ব্যাঙ্গালোর আশ্রম থেকে ৩।১০।২৪ তারিখে একজন ভক্তকে তিনি পত্রদ্বারা জানিয়েছিলেন: "ঠাকুরকে জাগতিক সম্বন্ধে মা-ভাবে ডাকিতে পারিলে খুব ভাল। বাস্তবিক তিনি ও মা-জগদম্বা কালী অভেদ; তিনিই গায়ত্রী। তোমার যেমন ভাল লাগে তাহাই করিও। মা-সম্বন্ধ বড়ই মধুর এবং খুব পবিত্র—খুব ধ্যান হয় এবং খুব অগ্রসর করিয়া দেয়।"[৪৪]

৩৯ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা—১১০
৪০ ঐ, ১৩৩
৪১ ঐ, ১৩৬
৪২ ঐ, ১৪০
৪৩ ঐ, ১৫১
৪৪ ঐ, ১৬৩

সামাজিক ছবি

"খ"

[পূর্বানুবৃত্তি]

"এখানকার স্কুলের ফন্ড বাড়াবার জন্য কমিশনার মিটিং করবেন। সম্ভবতঃ মিটিং-এতেই চাঁদা দিতে হবে। চেকবইখানি বার করে দাও।"

সরলা লোহার সিন্দুক খুলিয়া চেকবহি বাহির করিতে লাগিল। দুর্গাদাসবাবু বলিলেন,—

"এ বৈষ্ণবীর চেহারা দেখে মহা চতুরা বলে বোধ হয়, এর রকম কি বল দেখি?"

সরলা বৈষ্ণবী সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিল, বলিল। দুর্গাদাসবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে কোচ, সোফা, গদিআঁটা চৌকি অনেকগুলি, মাঝখানে একখানি টেবিলে ফুলদানে মস্ত একটি ফুলের তোড়া, মার্বেলের মেঝেতে বহুমূল্য কার্পেট, উপরিভাগ হইতে একটি বৃহৎ ল্যাম্প ঈষৎ নীলাভ ঘরভরা আলো দিতেছিল, দেওয়ালে রূপ, যৌবন, হাব-ভাব ও প্রণয়ব্যঞ্জক বড় বড় ছবি। সন্ধ্যার পর সরলা বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া আনিল। দুর্গাদাসবাবু একখানি সোফাতে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, অল্পক্ষণ হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন, বলিলেন, "তুমি একটু হারমোনিয়ম বাজাবে, উনি গাইবেন?"

সরলা বৈষ্ণবীর দিকে চাহিল। বৈষ্ণবী বলিল, "বেশ তো।" সরলা টেবিলে হারমোনিয়মের নিকট বৈষ্ণবীকে লইয়া বসিল, বলিল, "আমি কি এঁর সঙ্গে বাজাতে পারব?"

বৈষ্ণবী গাহিল।

গান শুনিয়া দুর্গাদাসবাবু অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং আর একটি গাহিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাজাইবার জন্য সরলাকেও বাহবা দিলেন। এই প্রকারে গানের পর গানে প্রায় এক ঘণ্টার উপর হইয়া গেল। দুর্গাদাসবাবুর বাহবা আর ধরে না। পরে "তোমরা একটু বিশ্রাম কর, আমি আসছি" বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন। তাঁহার ফিরিতে বড় বিলম্ব হইল না। হুইসকি রসে রসিক হইয়া আবার আসিয়া আপনার জায়গায় বসিলেন এবং বৈষ্ণবীকে বলিলেন,—

"আপনাদের বৈষ্ণবধর্মকে প্রেমের ধর্ম বলে, এ প্রেমের মানে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"প্রেম মানে অনেকে অনেক কথা বলেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের অনুষ্ঠান ও ভিতরের ভাব দেখে একপ্রকার ফ্রি-লাভের ডিইফিকেসন বলে মনে হয়। রূপ, যৌবন, প্রণয়ের পূজা বৈষ্ণবধর্ম; অন্ততঃ প্র্যাকটিক্যালি তাই।"

সরলা। "আপনি কি বলেন, সাধারণতঃ স্ত্রী-পুরুষের প্রেম বললে যা বোঝায়, বৈষ্ণবধর্মে প্রেমও তাই?"

"তাছাড়া আর কি? মধুর ভাবের ভিত্তি হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ। হাজার সূক্ষ্ম করা যাক, জিনিস থাকে তাই।"

"কেন, বৈষ্ণবেরা বলেন, কামগন্ধ থাকতে সে প্রেম নয়?"

"ওটা তো কাজের কথা নয়, কেবল লোক-দেখানো, প্ররোচনা মাত্র।"

দুর্গাদাসবাবু। "তবে ধর্ম কি হলো?"

"তা তো এ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।"

"কিছু আছে বলে মনে হয়?"

"কৈ? কখনো সামান্যরূপ খেয়াল হয়, কিছু আছে সেটা আবার মনে করি হয়তো হেরিডিটির শক্তি। বাস্তবিক কিছু ঠিক করতে পারিনি, তবে না-র দিকে পনের আনা।"*

[ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩১১, পৃঃ ৫২-৫৩

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রশ্ন : বহু সাধুই সাধুজীবন যাপন করেন, কিন্তু কি করে বুঝব কে জীবন্মুক্ত ঠিক ঠিক ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : স্বামীজী জীবন্মুক্তের একটা উপমা দিয়েছেন। যারা মরুভূমিতে চলাফেরা করে তারা মরুমরীচিকায় জল, গাছপালা সব দেখতে পায়। যারা তার স্বরূপ জানে না, পিপাসায় সেই দিকে ধাওয়া করে। কেউ কেউ তার বৃথানুসন্ধানে মারাও যায়। আবার কেউ দু-একবার ঠেকেই ঐ মায়ার স্বরূপ বুঝতে পারে, সে আর পিপাসার নিবৃত্তির জন্য সেদিকে যায় না। তার কাছে জয়পুরে গোবিন্দজীর দর্শনপথে এরূপ মায়ার আবির্ভাব হলেও আর সে সেদিকে তাকায় না, কারণ তার তাৎপর্য নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো বা ঔৎসুক্যবশতঃ প্রথম প্রথম দু-একবার তাকালে, কিন্তু উদাস ; কারণ জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞানহেতু তার চারুতা ও প্রিয়তা জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। তখন তাঁদের জড়োন্মত্তপিশাচবৎ লক্ষণ দেখা যায়। আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর বালকভাব নিয়েছিলেন—এই কোট গায় দিয়ে, জুতো মোজা পায় দিয়ে, কান ঢাকা টুপী পরে বেড়াচ্ছেন, পর মুহূর্তে কাপড়খানা কোলে করে ঘুরতে লাগলেন। 'মদিরান্ধবৎ' কোন জিনিসে আঁট নেই। তত্ত্বদর্শনের পর ব্যবহারিক সৎ ও অসৎ সবই মিথ্যা বলে বোধ হয়, শাস্ত্রীয় সামাজিক বিধি-নিষেধের কোনও তাৎপর্যজ্ঞানই থাকে না। যখন বোঝা গেল খেলা, তখন খেলার আইন-কানুন, হারজিতের কোনও তাৎপর্যই থাকে না, কেবল থাকে আনন্দ। ছেলেপুলের সঙ্গে খেলতে গিয়ে যেমন বড় ভাই-বোনে আনন্দ পায়। আমরা এই খেলাটিকে সত্য ভেবে গুলিয়ে ফেলেছি। 'মোহনবাগান যদি না জেতে তো আত্মহত্যা করব।' কেউ কেউ আবার খেলাও করে না, জড়বৎ মূকবৎ অবস্থান করে, বলবার কইবার কিছু নেই। কেউ কেউ ঈশ্বরাদেশে প্রারব্ধটা লোকশিক্ষার ভিতর দিয়ে ক্ষয় করে। তখন কিন্তু তাঁরা সাধুকর্ম ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না, কেননা যে সাধনা সারা-জীবন তাঁরা অভ্যাস করেছেন, প্রারব্ধ ক্ষয়কালে তারই অবশেষের অনুবর্তন তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। দণ্ডের যে শক্তি নিয়ে চক্র ঘোরে, দণ্ড ছেড়ে গেলেও ঐ চক্র তার প্রাবধ (মোমেন্টাম)-শক্তিরই অনুবর্তন করে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন : "নর্তকীর সাধা পা বেতালে পড়ে না।" আবার পিশাচবৎ অবস্থাও দেখা যায়—প্রভু দেখেছিলেন একজন কুকুরের পাশে বসে খাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করায় বললে : "বিষ্ণূপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ, বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে। কথং হসসি রে বিষ্ণো! সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥" সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর 'বেদান্তসারে' পিশাচভাবটি স্বীকার করেননি। জীবন্মুক্তের যে সাধুকর্ম সেটা সাধন নয়, কারণ তাঁর সাধন শেষ হয়ে গেছে ; এখন সেই সাধনার প্রারব্ধটা স্বভাবের মতো স্বারসিক বৃত্তির মতো প্রকাশ পাচ্ছে ; এতে তাঁদের কোনও চেষ্টা—অহংতা বা মমতা নেই। ঠাকুর শ্রীশ্রীতোতা-পুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি ধ্যানাভ্যাস কর কেন?" তোতা বললেন : "ঘটি না মাজলে কলঙ্ক পড়ে।" প্রভু বললেন : "যদি সোনার ঘটি হয়?" তোতা বললেন : "তাহলে আর দরকার করে না।" (২৬।৭।১৯৪২)

ব্রহ্মমায়া

প্রশ্ন : অদ্বৈত বেদান্তীরা মায়া বলতে কি বোঝেন?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : মায়াও ব্রহ্মের মতো, মুখে কিছু বলার যো নেই—অনির্বাচ্যা। যে বুঝেছে

সেই বুঝেছে। এই আছে এই নেই, কিন্তু চিরকাল আছে ভাবেও থাকে না, চিরকাল নেই এরূপ অভাব-পদার্থও নয়।

প্রশ্ন: তাহলে মায়া কি মিথ্যা?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: একেবারে মিথ্যা কি করে বলব, যদি একেবারে মিথ্যা হতো, তাহলে লোকের মনে মায়ার প্রসিদ্ধি আছে কি করে?

প্রশ্ন: যদি বলি মিথ্যা কল্পনা লোকপরম্পরা চলে আসছে?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: কল্পনা জিনিসটারও যদি বাস্তবতা না থাকে, তাহলে লোকের মনে তা ওঠে কি করে? তবে মায়াকল্পিত বিষয়গুলি যে কল্পনাকাল পর্যন্ত স্থায়ী—একথা বেদান্তীরা স্বীকার করেন। এরই নাম ব্যবহারিক সত্তা। এই ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে আমাদের উভয়ের প্রশ্নোত্তরাদি চলছে।

প্রশ্ন: তাহলে ব্যবহারিক সত্তা তো সত্যই?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: একেবারে সত্য, তা কি করে বলব? প্রত্যেক ব্যবহারিক জ্ঞানই বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায় উৎপত্তি, স্থিতিক্ষণ ব্যাপী, তার পরক্ষণে তার নাশ হয়। ব্যবহারিক মানে উপাধিগত জ্ঞান। উপাধি মানে যা নিকটস্থ ভিন্ন পদার্থে নিজ ধর্মের আধান বা আরোপ করে থাকে। মায়া কল্পনা-ময়ী, কল্পনা দেশ-কাল-নিমিত্তাত্মিকা। এই দেশ-কাল-নিমিত্তাত্মিকা উপাধির মধ্য দিয়ে এক অখণ্ড জ্ঞানকে যখন উপলব্ধি করি, তখনই ব্যবহারিক সত্তা। প্রত্যেক উপাধিজ্ঞানের যখন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে তখন তাকে পারমার্থিক নিত্য, যাকে তোমরা 'এ্যাবসলিউট' বল, বলা চলে না।

প্রশ্ন: তাহলে মায়াকে উৎপত্তি-বিনাশশীলা মধ্যকালভাবিনী একটা পদার্থ বলা চলে?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: খণ্ড মায়িক জ্ঞানকে তা বলা চলে। কিন্তু প্রত্যেক মধ্যভাবী কালিক বা 'টেম্পোরারী' পদার্থের একটা প্রাগভাব বা অপ্রকটাবস্থা আছে। যেমন ঘটরূপ মধ্যভাবী বস্তুর প্রাগভাব মৃৎপিণ্ড। কিন্তু সমষ্টি মায়ায় সেরূপ প্রাগভাব নেই, প্রবাহাকারে অনাদি অনন্ত। কিন্তু এই দেশ-কাল-নিমিত্তাত্মিকা প্রবাহের খণ্ডভাবগুলি প্রাগভাব-বিশিষ্ট।

প্রশ্ন: আচ্ছা, তাহলে প্রত্যেক খণ্ডজ্ঞানের প্রাগভাব যখন মূলামায়া, তখন ঐ সমষ্টি মায়াকে প্রাগভাবরূপা বলা চলে?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: না, তা বলা চলে না। কেননা, প্রাগভাব অনাদি বটে, কিন্তু প্রত্যেক কার্যোৎপত্তির সঙ্গে তা সান্ত অর্থাৎ 'লিমিটেড' হয়ে যায়। যেমন এই মৃত্তিকায় ঘটের প্রাগভাব অনাদিকাল ধরে রয়েছে, কিন্তু তাতে ঘটোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রাগ-ভাব নিরস্ত হলো। অতএব কোন মধ্যভাবী বস্তুর প্রাগভাব অনাদি কিন্তু সান্ত বলতে হয়। কিন্তু মূলামায়াকে আমরা অনাদি অনন্ত বলি।

প্রশ্ন: যদি বলি প্রত্যেক মায়িক পদার্থই উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল এবং ধ্বংসের আরম্ভ আছে, যেমন ঘট ভাঙলে ঘট ধ্বংসের আরম্ভ হলো, কিন্তু তার শেষ নেই। কাজে কাজেই মায়াকে ঐ প্রধ্বংসা-ভাবের মতো সাদি অর্থাৎ যার আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নেই, এইরূপ সাদি অনন্ত লক্ষণান্বিত করা যায় না কেন?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: তা যেতে পারে না, কারণ প্রত্যেক উৎপত্তিই প্রাগভাববিশিষ্ট।

প্রশ্ন: তাহলে বলব, মায়া এক অনাদি অনন্ত অভাব অর্থাৎ অত্যন্তাভাব।

স্বামী বাসুদেবানন্দ: মায়া যদি অনন্ত অভাব হয়, আর 'এ্যাবসলিউট' অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্তা হয়, তাহলে এই দেশ-কাল-নিমিত্তাত্মক জগতেরও আত্যন্তিক অভাব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে সেরূপ অভাবের অনুপলব্ধি আমাদের হচ্ছে। পরন্তু জগৎ সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি 'রিলেটিভ' অর্থাৎ একেবারে সত্য বা মিথ্যা নয়—সত্য বটে কিন্তু আপেক্ষিক, সাবয়ব ও কালাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তার অংশ-গুলি একটা বিশিষ্ট দেশে ও কালে থাকে এবং তার সত্যতা অপর বস্তুর সত্তার ওপর নির্ভর করে। এই উৎপত্তি-স্থিতি-নাশবিশিষ্ট খণ্ড সত্যগুলি প্রবাহকারে অনাদি অনন্তরূপে চলেছে। অতএব সমষ্টি জগৎ এবং লক্ষণান্বিত কোন পদার্থ, অতএব তাকে ভাব-রূপই বলতে হবে, পরন্তু অভাবরূপ নয়। যদি জগৎ খ-পুষ্পের মতো অত্যন্ত-অভাব হতো, তাহলে তার আপেক্ষিক সত্তা কখনো আমাদের শব্দার্থ প্রত্যয়রূপে জ্ঞানারূঢ় হতো না; পরন্তু খ-পুষ্প

একটা 'শব্দমাত্র বস্তুশূন্য বিকল্প' অর্থাৎ অভাব জ্ঞান। এইজন্য বেদান্তীরা একে তুচ্ছ-সত্তা বলেন। স্বপ্নেরও একটা পূর্ব সংস্কারের জন্য প্রাতিভাসিক মূল্য আছে, কিন্তু ঐ তুচ্ছ-সত্তার শব্দ ভিন্ন আর কিছু দাম নেই, কারণ তা অর্থ ও প্রত্যয়হীন।

প্রশ্ন: আচ্ছা, ব্যবহারিক জাগ্রত সত্তাটি যদি মায়া হয়, তবে তার অন্তর্ভুক্ত 'রজ্জু-সর্প' ভ্রান্তিটি কি?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: শাস্ত্রকারেরা একে প্রাতিভাসিক সত্তা বলেছেন—এ অল্পকালস্থায়ী অর্থাৎ দেশ-কাল-নিমিত্তাত্মক। এক অতিদীর্ঘকালস্থায়ী, পূর্বদৃশ্যবস্তুর সংস্কারোত্থ জাগ্রত ব্যবহারিক সত্তার ওপর আর একটা অল্পকালস্থায়ী কোন পূর্বদৃষ্ট ব্যবহারিক স্মৃতির মতো খণ্ড সংস্কারের আরোপ-জন্য আধ্যাসিক তদাত্ম্যহেতু প্রতীয়মানতা।

প্রশ্ন: আচ্ছা, ভ্রান্তি ও স্মৃতিতে তফাৎ কি?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: স্মৃতিকালে ইন্দ্রিয়বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ (কন্ট্যাক্ট) থাকে না। অর্থাৎ কেউ কখনো স্মৃতিটা বাইরে দেখে না। কিন্তু ভ্রান্তিকালে ইন্দ্রিয়বাহ্য রজ্জুর সামান্য জ্ঞান—একটা লম্বা সত্তা মাত্র বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থাকে।

পূর্ব প্রত্যক্ষ সংস্কার যখন বুদ্ধ্যারূঢ় হয় তখন তাকে স্মৃতি বলে। এই স্মৃতি কখনো একক বুদ্ধ্যারূঢ় হয় না, উহা উহার কোন-না-কোন পরিবেশের (এনভায়রনমেন্টের) সহিত বুদ্ধ্যারূঢ় হয়। যেমন যখন আমরা আপেলের কথা স্মরণ করি, তখনই তার সঙ্গে ডালপালা, ঝুড়ি, প্লেট প্রভৃতি বিশিষ্ট পরিবেশে বুদ্ধ্যারূঢ় হয়। কিন্তু ভ্রান্তিকালে রজ্জুর কিয়দংশ মাত্র সর্পাকৃতি ধারণ করে, কিন্তু অপর পারিপার্শ্বিক অংশ যেমন তেমনই থাকে। ভ্রান্তি যদি স্মৃতির বহিঃক্ষেপ হয়, তাহলে সর্প ভ্রান্তিকালে পূর্বদৃষ্ট সর্পের পারিপার্শ্বিক অবস্থান-গুলিও রজ্জুর চারপাশে দেখা দিত।

প্রশ্ন: যদি বলি, অল্পালোকে ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ও রজ্জুর সাদৃশ্য হেতু পূর্বদৃষ্ট সর্পের স্মরণ হয় মাত্র।

স্বামী বাসুদেবানন্দ: ইন্দ্রিয়ের অপটুতা হলে পার্শ্ববর্তী অপর পদার্থও একটা বিকৃত কিছু দেখাত, কিন্তু তা দেখায় না। কোন আলো না নিয়ে এসেও যদি কেউ বলে 'ওটা দড়ি' অমনি সেই চোখ দিয়েই তৎক্ষণাৎ ঐ কল্পিত সাপটি দড়িরূপে প্রতিভাত হবে—অমনি 'পারস্পেক্টিভ' অর্থাৎ দৃষ্টি-ভঙ্গি বদলে যাবে। এই ভ্রান্তি যে কেবল ভিতরে উঠে বুদ্ধিকে বিকল করে তা নয়, বাইরে উঠেও সুস্থ ইন্দ্রিয়দেরও ঠকিয়ে দেয়। সর্প-স্মৃতিতে লোকে ভয় পায় না। পরন্তু 'রজ্জুসর্প' ভ্রান্তিতে লোকে ভয় পায়, পালায়, অর্থাৎ লোক-ব্যবহার সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মশক্তি এই অনির্বচনীয়া, অচিন্ত্যা, অভিনবা। মহামায়াকে যে নমস্কার করে, সে-ই এই জগৎ প্রহেলিকা থেকে নিস্তার পায়। (১৬।৮।৪২)

জগতের উপকার

প্রশ্ন: জগৎ মিথ্যা হলে জগতের উপকার করে কি হবে?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: লোকে কি উপকার করবে? সে তো নিজেই পরাধীন। যদি বুঝতাম, 'খেতে, শুতে, যেতে' তোমার কোন স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহলে এক কথা ছিল। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতি, প্রভুই তাকে অন্তরাত্মারূপে পরিচালিত করেছেন। দেখে বোধ হয়েছিল যেন বীজটা জড় প্রাণশক্তিহীন, কিন্তু দেখ কেমন তার ভিতর থেকে সবুজ অঙ্কুর মাথা তুলে উঁকি মারছে। কেমন পুরাতন খোলটা জীর্ণ হয়ে নতুনের অভ্যুত্থান হচ্ছে। অণুপরমাণু থেকে জীব-ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত, কেউ বোঝে না যে, তিনি সকলকে চালাচ্ছেন। তিনি লোকের প্রাণে দয়া দেন, মায়ের বুকে দুগ্ধ সঞ্চার করেন। তিনিই মহাবিধান—লোকের কর্মানুযায়ী তিনিই নিষ্ঠুর ও স্নেহরূপা। এই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের নেই বলে আমরা মনে করি আমরা লোকের উপকার করি। আবার উপকার করতে গিয়ে ঘা খেয়ে ফিরে আসি। ভিতরে থাকে নাম, যশ, অর্থ, ভোগ—এরাই ধর্মের একটা ছাপ লাগিয়ে পরোপকাররূপে প্রকাশ পায়। সেই জন্য পরোপকাররূপ নিজ স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এইসব দেখে-শুনেই স্বামীজী বলেছিলেন: "মানুষ অনেক সময় অতি দুর্বলতাটাকে অতিমঙ্গল ও সামর্থ্য বলে ভুল করে।"...(১৪।৭।১৯৪২) [ক্রমশঃ]

পরমপদকমলে

সরষে পেষাই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর আপনি বলুন, দুটি দিকের সমন্বয় কি-ভাবে সম্ভব? ধর্ম আর কর্ম। একালের কর্ম আর কর্মস্থল আপনি জানেন। জানেন সেখানকার পরিবেশ কেমন। একালের মানুষের মানসিকতা আপনার অজানা নয়। চরম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মানুষ রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছে। ভোগবাদ চরম আকার ধারণ করেছে। শান্ত, সুস্থ জীবনের ছবি হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে সদ্ভাব আর থাকছে না। সমাজের চালচিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে। মানুষের আধ্যাত্মিকতা অবিশ্বাসে তলিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করব ঠাকুর? আমরা যারা আপনাকে ধরে আছি। আমাদের আঘাত যে বড় প্রবল হয়ে উঠছে।

আপনি বলেছেন, "সহ্য করো। যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।" সহ্য করতে করতে আমরা এখন এমন জায়গায় এসে পড়েছি যখন আর নিজেকে সহনশীল বলে মনে হয় না, মনে হয় অত্যাচারিত, নিপীড়িত। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি একটা মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপ। আপনি আপনার সাপকে বলেছিলেন, হিংসা করিস না, যাকে তাকে তেড়ে ছোবল মারতে যাসনি। নিরীহ সাপ যখন অত্যাচারিত হতে হতে প্রায় মরো মরো, আপনি তখন বললেন, তোকে তো আমি ফোঁস করতে বারণ করিনি। 'ফোঁস' মানে প্রতিবাদ। আমরাও প্রতিবাদের চেষ্টা করে দেখেছি। কোন লাভ নেই। সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একক কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। আজকাল ফ্যাশান হয়েছে প্রতিবাদকারীকে ধরাধাম থেকে নির্দ্বিধায় সরিয়ে দেওয়া। সব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হলেও মানুষের জীবনের মূল্য প্রায় নেই বললেই হয়। অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনের মতো অখণ্ড অসভ্যতায় দেশ ভেসে যাচ্ছে। আমরা এখন কি করব ঠাকুর? ফোঁস করলেও যে বিপদ।

আপনি বলেছিলেন: "তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।" ঠাকুর, এখন দেখছি জগৎ-সংসারে অন্য তেলের কারবার চলেছে। তোষামোদের তেল! বড় মানুষ, ক্ষমতাশালী মানুষকে কখনো চাটুকারিতার তেল, কখনো উপ-ঢৌকন দিতে পারলে পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করতে পারে। বিষয়কে তো আর 'বিষ' বলছে না কেউ, বলছে অমৃত। ক্ষমতাশালীকে তৈল মর্দন করতে পারলে বিষয়ামৃত পাওয়া যায়। আত্মার শক্তি, বিদ্যার শক্তি, জ্ঞানের শক্তির চেয়ে দেহের শক্তির ভয়ংকর কদর। বলের মধ্যে পশুবলই শ্রেষ্ঠ বল। সভ্যতার সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে। অসভ্যতাই সভ্যতা হচ্ছে। ত্যাগের বদলে গ্রহণই হচ্ছে নীতি। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের ঝাণ্ডাটি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড় মৃগয়ায়। কে মরল, কে বাঁচল তোমার দেখার দরকার নেই। তুমি নিজে সুখভোগের চেষ্টা কর। এই নীতি যদি তুমি পরিত্যাগ কর, লোকে তোমাকে বোকা-হাঁদা বলবে। পরিবার-পরিজন বলবে অপদার্থ। ঈশ্বরে ভক্তির অর্থ করবে—ভণ্ডামি। মুখের ওপর স্পষ্ট বলবে, সংসারে কেন? সংসার করেছ কেন? সন্ন্যাসী হলেই পারতে। নিজে মরছ মর, আর পাঁচজনকে মারার অধিকার তোমার নেই। আমরা চাই। আধুনিক জীবনের সবরকমের ভোগ-সুখ আমরা চাই। তোমার ঈশ্বর নিয়ে তুমি থাক, আমাদের ঈশ্বর হলেন আধুনিক জীবনের সাজ-সরঞ্জাম। আমাদের ভবিষ্যৎ তোমার ঐ তত্ত্বকথায় নেই, আছে তোমার ব্যাঙ্ক-

ব্যালান্সে। আত্মোপলব্ধির পথে তুমি কতটা এগোলে আমাদের জানার দরকার নেই। আমরা জানতে চাই, চাকরিতে কতটা উন্নতি করলে? ক্ষমতা কতটা বাড়ল। আমাদের বৈষয়িক সুখ তুমি কতটা বাড়াতে পারলে। তোমার জ্ঞান আমরা চাই না। তোমার অর্জিত ঐশ্বর্যই আমরা ভোগ করতে চাই।

ঠাকুর, অতিশয় প্রকট হয়ে উঠেছে আমাদের আত্মিক সংগ্রাম। যারা আপনার ভাবে ভাবিত, সংসার থেকে ক্রমেই তারা আরো দূরে সরে যাচ্ছে। ব্যবধান বাড়ছে। বাড়ছে নিঃসঙ্গতা। মনে হয় ভালই হচ্ছে। আগে ছিল আপনার জন্যে কখনো-সখনো দু-এক ফোঁটা চোখের জল। এখন অহরহ ক্রন্দন। বনের পথে সেই জটিল বালকের মতো—কোথায় আমার মধুসূদনদাদা। তুমি এসো। আগে আপনাকে ডাকার মধ্যে হয়তো শৌখিনতা ছিল। অ্যামেচার রামকৃষ্ণানুরাগী। এখন সেই ডাক অনেক আন্তরিক। অনেক কাতর। সেই ডাকে 'তিন টান' এক হতে পেরেছে। বুঝেছি চারপাশে যা ঘটছে সবই আপনার ইচ্ছায়। এই পরিস্থিতিতে না পড়লে আমাদের মোহ-নাশ হতো না।

আপনি বলেছিলেন: 'নাক তেরে কেটে তাক' বোল মুখে বলা সহজ, হাতে বাজানো কঠিন। সেইরকম ধর্মকথা বলা সোজা, কাজ করা বড় কঠিন। আগে ঠাকুর, আপনাকে সাধতুম মুখে। এখন সাধি অন্তরে। আপনি বলেছিলেন, ঈশ্বর মন দেখেন। আপনি আমাদের মন দেখুন। মন আর মুখ এক হয়েছে কিনা। মুখের বোল মনের আঙুলে ফুটছে কিনা। আপনার অসীম কৃপা আমাদের আজ এই পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে। মোহনাশ, তমোনাশ। এইতো পেয়েছি সাধন-পরিমণ্ডল। আপনি বলেছিলেন: "দীঘিতে বড় বড় মাছ আছে, চার ফেলতে হয়। দুধেতে মাখন আছে, মন্থন করতে হয়। সরিষার ভেতর তেল আছে, সরিষাকে পিষতে হয়। মেথিতে হাত রাঙা হয়, মেথি বাটতে হয়।" জীবনের ওপর সেই প্রক্রিয়াই চলেছে। কি আনন্দ।

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও প্রায় একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্বমুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের 'দেখছেন'? 'কলকাতা' মানে অবশ্য শুধু কলকাতা নামক ভূখণ্ডটিই নয়, কলকাতা এখানে একটি প্রতীক। সারা পৃথিবীর মানুষ এবং সারা পৃথিবীই এখানে উদ্দিষ্ট। সুতরাং কলকাতার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, কলকাতার মাধ্যমে সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের দৃষ্টি প্রসারিত—মা সারা জগৎ অর্থাৎ সারা জগতের লোককে 'দেখছেন'। কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি সংখ্যায়, 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক। আলোকচিত্র: স্বামী চেতনানন্দ

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মহারাজ সাধুগণকে একান্তে তপস্যা, অনন্যচিত্তে ভগবদ্ভজনে উৎসাহ ও প্রেরণাদান করিতেন। তবে তাহা সকলের জন্য সমান ছিল না, অধিকারী-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। এই সম্বন্ধে তাঁহার সেবক বিশ্বরঞ্জন মহারাজের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম। বেলুড় মঠে তখন অল্প সাধু-ব্রহ্মচারী। মহারাজ সকলের খোঁজ-খবর রাখেন, প্রয়োজনমতো তাহাদের কল্যাণের জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশও দিয়া থাকেন। কয়েকদিন হইতে তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীর চালচলনে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারীটি খুব ভক্তিমান, ভজনশীল, স্বভাব-চরিত্রও চমৎকার, কাজকর্ম নিষ্ঠা সহকারে সুসম্পন্ন করেন। সেই সময় সন্ধ্যার পরে সকলেই মহারাজের ঘরে সমবেত হইতেন। মহারাজ সকলের কুশল সমাচার লইতেন, কাজকর্মের খবর শুনিতেন ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। মহারাজ দু-চারদিন হইতে উক্ত ব্রহ্মচারীকে অনুপস্থিত থাকিতে দেখিয়া একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তিনি নির্জন স্থানে বসিয়া আপনার ভাবে ডুবিয়া জপ-ধ্যান করিতেছিলেন। মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তর উপবেশন করিলে, মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "তুমি আজকাল সন্ধ্যার পরে এখানে আসো না কেন?" ব্রহ্মচারী বিনীতভাবে বলিলেন: "এখানে আসলে কথাবার্তায় অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য আর আসি না, একান্তে ভজন করি।" মহারাজ তাহার ভজননিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন: "তা একটু সময় নষ্ট হয় হোক; তুমি রোজ এখানে এই সময়ে আসবে। আমাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলবে। তাতে তোমার ভালই হবে। মনের অনেক বাঁক কেটে যাবে, হতাশা চলে যাবে। একা একা থাকলে অনেক বিপরীত চিন্তা মনে আসে। সবার সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনায় সেগুলি আসতে পারে না। এতে মনেও আনন্দ পাবে। সাধন-ভজনে আরও বেশি করে মন বসবে।"

পরদিন সকালবেলা সেই ব্রহ্মচারীকে মঠে দেখা গেল না। ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে খোঁজা হইল, কিন্তু কোন সন্ধান মিলিল না। সকলে খুব দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। কলকাতা ও কলকাতার বাহিরে সন্ধান চলিল। দিনকয়েক পরেই চন্দননগরের ভক্ত ভূষণ পালের বাড়ি হইতে খবর আসিল, ঐ ব্রহ্মচারী সেখানে রহিয়াছেন এবং তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি একটি নির্জন ঘরে সর্বদা সাধন-ভজনে নিরত থাকিতেন। একদিন দেখা গেল সর্বাঙ্গে বিষ্ঠা মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছেন। সব শুনিয়া মহারাজ গম্ভীর ও চিন্তিতমুখে বলিলেন: "আমি ওর মস্তিষ্ক বিকৃতির আশঙ্কাই করেছিলাম। সেইজন্যই ওকে আমার কাছে অন্য সকলের মতো আসতে বলেছিলাম। কিন্তু সে বুঝল না।" মহারাজ তাঁহাকে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ চন্দননগরে লোক পাঠাইলেন এবং মঠে আনিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা, ঔষধপত্র ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া সদুপদেশ ও সহানুভূতির দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। মহারাজের স্নেহ-মমতাপূর্ণ ব্যবহার তাহাকে বশীভূত করিল এবং মহারাজের নির্দেশে তিনি ক্রমে উৎকট তপস্যার আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া যথাযথভাবে অধ্যাত্মপথে চলিতে শিখিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি খুব ভাল সাধু বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন।

সমাজে যাহারা ঘৃণ্য পতিতা বলিয়া পরিচিতা, মাতৃশ্রেণীর সেইরূপ কোন কোন ভাগ্যবতীর জীবন শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, স্বামীজী ও মহারাজের কৃপাকটাক্ষে পরিবর্তিত হইয়া ভগবদ্ভক্তিলাভে

ধন্য হইয়াছিল। আমরা ঢাকাতে সেইরূপ এক ভক্তিমতীকে দর্শন করিয়াছিলাম, যিনি মহারাজের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ যেসময়ে ঢাকাতে গিয়াছিলেন সেই সময়ে এই মহিলা তাঁহাকে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রথম দর্শনেই তিনি মহারাজের প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ বোধ করেন এবং রোজ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। মহারাজকে দর্শনের পূর্বে তাঁহার অন্তরে ভোগ-লালসাই প্রবল ছিল, ভক্তিভাবের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। মহারাজের কৃপাকটাক্ষে তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি অঙ্কুরিত হইয়া দিনে দিনে বাড়িয়া চলিল। পূর্বের চালচলন, জীবনের ধারা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ত্যাগ-তপস্যার ভাব তাঁহার অন্তরে এমন প্রবল হইল যে, ঐশ্বর্য-তৃষ্ণা, ভোগবিলাস বর্জন করিয়া তিনি দীনহীনা তপস্বিনীর ভাবে জীবন কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। আমরা যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখন তিনি প্রৌঢ়া, ক্ষীণ মলিন দেহ। উৎসবপর্ব উপলক্ষে আশ্রমে আসিয়া ভক্তিভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণামান্তর নাটমন্দিরের এককোণে বসিয়া থাকিতেন। ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন দীনহীনার মতো। প্রসাদের ঘণ্টা পড়িলে মেয়েদের পঙ্‌ক্তির একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া ভক্তিভাবে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সাধুদের প্রণামান্তর সকলের অলক্ষিতে চলিয়া যাইতেন। প্রাচীন কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্বল্পকথায় উত্তর দিতেন, বেশি বাক্যালাপ করিতে চাহিতেন না। আমাকে জনৈক প্রাচীন ভক্ত তাঁহার কথা বলিয়াছিলেন। আমি তখন ঢাকা আশ্রমের কর্মী, মন্দিরে ঠাকুরসেবার কাজে ছিলাম। শেষ বয়সে তিনি ঢাকা ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের সন্নিকটে একটি কুটিরে বাস করিয়া একবেলা সামান্য আহার করিয়া, নিত্য নিয়মিত গঙ্গাস্নান, জপ, ধ্যান, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ-মননে কাল কাটাইতেন। যেন প্রাচীন কালের কোন তপস্বিনী। তাঁহার নাম ছিল রাধারানী। প্রথম যৌবনে তিনি পরমা রূপসী ছিলেন। ঢাকার এক ধনী জমিদারের রক্ষিতা থাকিয়া অগাধ ঐশ্বর্য অর্জন ও ভোগ-বিলাসের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহার ভক্তিভাব এবং গভীর ও উন্নত অধ্যাত্ম-জীবন দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। এই অসাধারণ রূপান্তরের মূলে ছিল মহারাজের সান্নিধ্য ও উপদেশের যাদু।

মঠের ভক্তগৃহে নিমন্ত্রণে, তাঁহাদের আয়োজিত উৎসবানুষ্ঠানেও সাধুদের যোগ দিবার জন্য তাঁহার নির্দেশ ছিল এবং সেবিষয়ে যাহাতে অন্যথা না হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপাত্রী ভক্তপ্রবর মণিলাল মল্লিকের ভক্তিমতী বিধবা কন্যা নন্দিনী, মহারাজ ও মঠস্থ সকল সাধু ব্রহ্মচারিগণকে নিমন্ত্রণ করেন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য। মণিলাল মল্লিকের কন্যার পক্ষ হইতে যাঁহারা নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের আন্তরিক আদর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিয়া মহারাজ বলিয়া দেন তাঁহার নিজের পক্ষে এই বয়সে আর নিমন্ত্রণে যাওয়া সম্ভব নহে, তবে মঠের অপর সাধুরা যাইবেন। নির্ধারিত দিনে সকালে খবর দিয়া শুনিলেন যে, অনেকেই যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সময় মঠেও দু-একদিনের মধ্যে উৎসব-ভাণ্ডারার আয়োজন চলিতেছিল। মহারাজ নির্দেশ দিলেন রুগী, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং মঠের কাজের জন্য যাহাদের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন তাহারা ছাড়া বাকি সকলকেই নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। তখন আর গত্যন্তর রহিল না। মঠ হইতে নৌকাতে করিয়া আমরা অনেকে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ-রক্ষায় রওনা হইলাম। বাড়িটি গঙ্গা হইতে অল্প দূরে বাগানে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। সেখানে সেই পরম ভক্তিমতী ও ঠাকুরের স্নেহ কৃপালাভে ধন্যা বর্ষীয়সী মহিলাকে দর্শন করিয়া আমরা অতীব প্রীত হইয়াছিলাম। নীরবে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধুদের ভোজন ও পরিবেশনের তদারক করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স অনেক হইলেও মুখখানি বালিকার মতো, গায়ের রং তখন বেশ উজ্জ্বল গৌর-বর্ণ, দীর্ঘদেহ, বেশ সুঠাম সবল মনে হইয়াছিল। সেই দিনের দৃশ্য এখনও চক্ষে ভাসিতেছে। সাধুরা খাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার চোখে-মুখে আনন্দ ও তৃপ্তি যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। মঠে প্রত্যাবর্তনের পর সাধুদের মুখে সব খবর শুনিয়া মহারাজও খুব প্রফুল্ল হইয়াছিলেন। [ক্রমশঃ]

নিবন্ধ

প্রসঙ্গ হোমাপাখি

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে একাধিকবার হোমাপাখির প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি বলেছেন: "বেদে আছে হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেক দিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয় আর উঁচুতে উঠে যায়।"[১] এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'বেদ'-এর বিবরণ অনুযায়ী হোমাপাখির প্রকৃতি। হোমাপাখিকে কিছু বিশেষ বিশেষত্বের প্রতিভূ হিসাবে সাধারণতঃ তিনি বিবৃত করতে চেয়েছেন। কথামৃতের প্রথম হোমাপাখির উল্লেখে (৫ মার্চ, ১৮৮২) আমরা লক্ষ্য করি নরেন্দ্রনাথের (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের) বিশেষত্ব বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ হোমাপাখিকে স্মরণ করেছেন। সেদিন নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে উপস্থিত ভক্তদের কাছে তিনি বলেছিলেন: "এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনো বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়।"[২] কথামৃতে হোমাপাখির দ্বিতীয় উল্লেখ (১১ মার্চ, ১৮৮৩) রাখালচন্দ্র (পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রসঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের বাবা ও অন্যান্যদের কাছে বলছেন: "এসব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক—ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদে হোমাপাখির কথা আছে।... এসব ছোকরারা ঠিক সেইরকম। ছেলেবেলায় সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।"[৩] কথামৃতে তৃতীয়বার হোমাপাখির প্রসঙ্গ এসেছে (৩০ জুন, ১৮৮৪) শ্রীরামকৃষ্ণ হোমাপাখির উপমা দিয়ে বললেন: "নিত্যসিদ্ধ হোমাপাখির ন্যায়। তার মা উঁচু আকাশে থাকে। প্রসবের পর ছানা পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে।... কিন্তু মাটির গায়ে আঘাত না লাগতে লাগতে মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। কোথায় মা, কোথায় মা। দেখ না প্রহ্লাদের 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা!"[৪] এখানে উদ্দিষ্ট কে? কোন বিশেষ ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে এখানে উদ্দিষ্ট নন। তবে কথামৃতকার লিখছেন: "হোমাপাখির দৃষ্টান্তের দ্বারা [শ্রীরামকৃষ্ণ] কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন?" প্রাসঙ্গিক আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবৃত হোমাপাখির উপমায় কতকগুলি প্রায়োগিক তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ ঊর্ধ্বচেতন মানসিকতা, বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরপ্রাণতার গভীরতা বোঝাবার উদ্দেশ্যেই তিনি ঐ উপমা ব্যবহার করেছেন। তাঁর যুবক শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্র এবং তিনি স্বয়ং ছিলেন এগুলির সাকারমূর্তি।

বেদের কোন অংশে হোমাপাখির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (যা 'বৃহত্তর বেদ' বলে কথিত) হোমাপাখির প্রসঙ্গ বর্ণিত:

"অন্তরীক্ষেঽপি জায়ন্তে আকাশবিহগাদয়ঃ।
বনবীথিষু জায়ন্তে সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাদয়ঃ॥"[৫]

—যেমন বনে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুগণ জন্মগ্রহণ করে তেমনি অন্তরীক্ষেও আকাশ-পক্ষীসকল জন্মগ্রহণ করে।

হোমাপাখির কিংবদন্তী বিশ্বজোড়া। এই পাখির বিচিত্র রূপকথার গল্প শুনিয়েছেন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর বিবিধার্থ-সংগ্রহে 'হোমা' প্রবন্ধে: "ঐ বিহঙ্গমের (হোমা) পক্ষ রাজমুকুটে ধারণ করা বহুকালাবধি

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত, কথামৃত ভবন, কলকাতা, ১।১।৭

২ ঐ, ১।১।৭ ৩ ঐ, ২।২।৬ ৪ ঐ, ৩।১।৪

৫ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উপশম প্রকরণ, ৫।১৪।৩১

প্রথা থাকায় এই মনোহর জীবের প্রশংসাসূচক নানাবিধ মিথ্যা গল্প প্রচার হইয়াছে। মুসলমানদিগের বিশ্বাস আছে যে, তাহারা [হোমাপাখিরা] শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আহার করে না, এবং কদাপি ভূমিতে বাস করে না; আজন্মকাল অন্তরীক্ষে থাকিয়া অণ্ডপ্রসবাদি তাহাদের জীবনের তাবৎ কর্ম সেই স্থানে নিষ্পন্ন করে; অধিকন্তু যে-কোন ব্যক্তির শরীরে এই পক্ষীর ছায়ার স্পর্শ লাগলে সে অচিরাৎ রাজা হয়। প্রাচীন ইউরোপীয় ব্যক্তিদিগের সাহায্যে এই গল্প শাখাপল্লবিত হইয়া বিজ্ঞাতেও বহুকালাবধি প্রচারিত ছিল। তত্রস্থ লোকেরা কহিত হোমাপাখী শিশির পানকরতঃ জীবন ধারণ করে এবং পদ না থাকা প্রযুক্ত উহারা ভূমি স্পর্শকরণে অশক্ত; কাহারও মতে ইহারা দগ্ধ হইলে পুনরায় ভস্ম হইতে আপন রম্য পক্ষ ধারণকরতঃ গাত্রোত্থান করে।"[৬]

হোমাপাখির এই রূপকথা ব্যাপ্তিতে কিরূপ বিশাল ছিল, কয়েকটি ঘটনা তার প্রমাণ দেয়। ষোড়শ শতকের প্রাণিতত্ত্ববিদ্ অ্যান্টনিও পিগাফেটা[৭] হোমাপাখির প্রাণিতত্ত্বগত পরিচয় দিলে সকলে তাঁকে উপহাস করেছিলেন। পরবর্তী কালে অপর দুই বিজ্ঞানী মার্ক গ্রেব ক্লুসিয়াস ও বেন্টিয়স[৮] ঐ পাখির পক্ষিবিজ্ঞানসম্মত তথ্য প্রচারে ব্যর্থ হন এবং সাধারণের কাছে তাঁরা উপহাসাস্পদও হন। কারণ, সমকালীন ব্যক্তিরা ঐ পাখির রম্যগল্পে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, দুই-একজন যুক্তিবাদীর বক্তব্যকে তাঁরা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। আমরা আরও বিস্মিত হই যখন দেখি প্রাণিবিজ্ঞানী কনরাড গেসনারের বিবরণেও ঐ পাখির অলৌকিকতা বিধৃত ঃ এই পাখিদের পুরুষের পিঠে গর্ত থাকে—উড়নকালে জননী পাখি পুরুষের পিঠের গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। উড়ন্ত অবস্থায় জননী পাখি ডিমে তা দেয়। আকাশেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।[৯] মালাক্কা (মালয়) দ্বীপের অধিবাসীরা এই পাখিকে বলত 'মানুকো-দেবতা' অর্থাৎ 'দেবতার পক্ষী'। অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা থেকে জানা যায় যে, হোমাপাখির রূপকথা ভিত্তি করে সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লিনিয়াস এই পক্ষীর জাতিবিশেষের নাম দেন 'নিষ্পদ স্বর্গীয় পক্ষী' (Apodous Paradise Bird)।[১০] হয়তো লৌকিক বিশ্বাসকে ইতিহাস করতে চেয়েছিলেন এই প্রাণিবিজ্ঞানী। তাই পক্ষিবিজ্ঞানের নথিতে হোমা হয়ে গেল 'প্যারাডিসিয়া অ্যাপোডা' (Paradisea Apoda)।[১১]

হোমা তথা রূপকথার স্বর্গীয় পাখি এবং বাস্তবের হোমা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'Paradise bird' বলে চিহ্নিত হলো। অলৌকিকতা-ভরা হোমাপাখির সত্য-সন্ধানে একাধিক অভিযানের কথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে নথিভুক্ত আছে। ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ্ ওয়ালেশের[১২] জাহাজ নিউগিনি দ্বীপে ভিড়েছিল স্বর্গীয় পাখির সন্ধানে। সেখানে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেও তিনি ঐ পাখির রূপকথার বৈশিষ্ট্য মেলাতে পারেননি। কিন্তু তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ঐ পাখিদের 'বাহারি ডানার বিলাস' দেখে। ঐ পাখিকে বর্তমানে প্রাণিবিদ্‌গণ বলেন 'Paradise flycatcher'।[১৩] বাঙলায় এর নাম 'শাহ্‌বুলবুল'।[১৪] রেশমী ওড়নার মতো এদের লেজে থাকে লম্বা পালক; স্বভাবে চঞ্চল, খাদ্য-প্রকৃতিতে সর্বভুক, মাথায় ঝুঁটি, পালকে থাকে বিচিত্র বর্ণবাহার, আর ডানায় থাকে অপরূপ

৬ বিবিধার্থ-সংগ্রহ (সম্পাদনা ঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র), 'হোমা'—অক্ষয়কুমার দত্ত, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮৫১, পৃঃ ৩-৫

৭ The Cambridge Natural History (Vol. : Birds) Edited by S. F. Harmer and A. E. Shipley, reprint edition, Wheldon & Wesley Ltd., Codicote, England, 1968, p. 543.

৮ বিবিধার্থ সংগ্রহ ('হোমা')' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮৫১, পৃঃ ৩-৫

৯ The Sex life of the Animals—Herbert Wendt, Arthur Barker Limited, London, 1965, pp. 259-260

১০ বিবিধার্থ-সংগ্রহ ('হোমা'), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮৫১, পৃঃ ৪

১১ The Cambridge Natural History (Vol. : Birds), p. 543.

১২ The Sex life of the Animals, p. 260.

১৩ Common Birds—Salim Ali and L. Futehally, National Book Trust of India, New Delhi, 1967, p. 93.

১৪ রঙিন পাখিরা—ইউ. সি. চোপড়া, চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লী, ১৯৮৪

উজ্জ্বলতার দ্যুতি। বিজ্ঞানী হার্মার ও সিপলি হোমাপাখির প্রজাতি ভেদে রঙের বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন: "বাদামী হোমার নাম প্যারাডিসিয়া অ্যাপোডা, রক্তিম হোমার নাম প্যারাডিসিয়া রুব্রা এবং হলুদ হোমার নাম প্যারাডিসিয়া র‍্যাগিয়ানা।"[১৫] কাজেই হোমাপাখির রূপকথা বিজ্ঞাননির্ভর না হলেও হোমাপাখির অস্তিত্বে বৈজ্ঞানিক সত্যতা বর্তমান।

এখন আমরা দেখব শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত 'হোমাপাখি' উপমার সঙ্গে বাস্তব হোমাপাখির সাদৃশ্য কিরূপ এবং তাঁর উপমা নির্বাচনের প্রায়োগিক তাৎপর্য কতখানি? শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ধৃতির মধ্যে হোমাপাখির যে দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় তা হলো তাদের স্থায়ী আকাশচারী প্রবণতা ও সদ্যোজাত পাখির উড়ন ক্ষমতা। হোমার প্রথম বৈশিষ্ট্যে বিশেষজ্ঞদের সমর্থন পাওয়া যায়। হার্মার ও সিপলি উল্লেখ করেছেন: "হোমাপাখিরা উঁচু পর্বতশীর্ষে ও সুদীর্ঘ বৃক্ষের শাখায় থাকতে পছন্দ করে; অনেক প্রজাতির ডিম ও বাসার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি।"[১৬] ভারতীয় পক্ষিবিশারদ্ সালিম আলি লক্ষ্য করেছেন: "হোমাপাখি উড়ন্ত অবস্থায় ডানার সাহায্যে পতঙ্গ শিকার করে খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা মেটায়।"[১৭] দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির সমর্থন অবশ্য জীববিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "অনেক দিন ধরে ডিম পড়তে থাকে··· পড়তে পড়তে চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয় এবং ছানা মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়।" তবে এই বক্তব্যের মধ্যে পরিস্ফুট যে, এই পাখির ইনকুবেশন কাল (incubation period) বা 'তা'-দেওয়ার সময় অল্প এবং প্রথমে শিশুপাখির চোখ ও ডানা থাকে না—ক্রমে সেগুলি ওদের দেহে গজায়। "মা'র দিকে চোঁচা দৌড়" বক্তব্যে 'প্রসূতি পাখির শিশুপ্রযত্নের' (parental care of young one's) কথা ব্যক্ত। এই সমস্ত লক্ষণই পক্ষিবিজ্ঞানসম্মত। ভারতীয় পক্ষিবিজ্ঞানী জামাল আরার বিবরণ থেকে জানা যায়: "হোমা-পাখিদের তা-দেবার কাল অন্যান্য বৃহদায়তন পাখিদের তুলনায় অনেক কম।"[১৮] এদের শিশু-প্রযত্ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আন্ত-র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পক্ষিবিজ্ঞানী ও হোমাপাখি বিশেষজ্ঞ ব্রুশ. এম. বিহ্লার।[১৯] কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত হোমাপাখির বিবরণ অলৌকিকতার ঊর্ধ্বে বৈজ্ঞানিক তথ্যেরও সন্ধান দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যতা এই উপমার নির্বাচন দক্ষতায়। হোমাপাখির প্রাণিবিজ্ঞানগত প্রকৃতি নিঃসন্দেহে অভিনব। আকৃতি ও প্রকৃতিতে সে অপূর্ব সৌন্দর্যের দাবিদার। পক্ষিবিজ্ঞানীরা হোমা-পাখির সৌন্দর্য বর্ণনায় মুখর। কেউ বলেছেন: "অপরূপ স্বর্গের দেবদূত"[২০] কেউ বলেছেন: "অতুলনীয় সৌন্দর্যের আধার"[২১]; আবার কেউ হোমাকে অভিহিত করেছেন "স্বতন্ত্র সুন্দর"[২২] বলে। নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ তিন ব্যক্তিত্ব। দৈহিক সৌন্দর্য তাঁদের তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল তাঁদের জগতের ঊর্ধ্বে বিচরণকারী অত্যুচ্চ অনুভূতিসম্পন্ন মন ও মানসিকতা। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপমার সার্থ-কতা। আবার অতীন্দ্রিয়বাদ এবং বিজ্ঞান—দুয়ের মিলন দেখি শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রসিদ্ধ উপমায়।

১৫ The Cambridge Natural History (Vol. : Birds), p. 543.

১৬ Ibid., pp. 550-551. ১৭ Common Birds, p. 93.

১৮ Watching Birds—Jamal Ara, National Book Trust of India, New Delhi, 1970, pp. 30-31.

১৯ 'The Birds of Paradise'—Bruce M. Beehler, Scientific American (published from New York), December, 1989, pp. 67-73.

২০ Text Book of Zoology : Vertebrates (Vol. II)—T. Jeffery Parker and William A. Haswell (Revised by J. Marshall), Mac Millian & Co. Ltd., London, seventh edition, 1962, p. 563.

২১ The Sex life of the Animals, p. 260.

২২ Scientific American, December, 1989, p. 70.

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

যেসব খাবার বার্ধক্যকে বাধা দেয়

ক্যারল অ্যান রিনজ্লার

(Carol Ann Rinzler)

বর্তমানে বার্ধক্যকে কেন্দ্র করে বহু চিন্তাভাবনা চলছে। এসম্বন্ধে উদ্বোধন ৮২তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যাতে অনুবাদকের লেখা 'বার্ধক্যের সমস্যা' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

"আজকাল বহুদেশে বার্ধক্য একটা সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রেও এটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। সামাজিক সমস্যা হিসাবে এই সমস্যা আগেও কমবেশি ছিল, কিন্তু নানা কারণে এর গুরুত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। অবশ্য সব দেশে সমস্যাটি সমানভাবে প্রকট নয়, অথবা এটিকে জরুরী বলে ধরা হয় না, কারণ অনেক জায়গায় অন্যান্য জরুরী সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে এটি পিছনে পড়ে গেছে। প্রাচ্য দেশগুলির বেশিরভাগই এই পর্যায়ে পড়ে।...

"১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, তখন পৃথিবীতে ষাটের ঊর্ধ্ব ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ৮'৪ ভাগ (প্রায় ৩০ কোটি), যেটি ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়াবে শতকরা ৯'৩ ভাগ (৫৮ কোটি)। এই ৩০ বছরে জনসংখ্যা বাড়বে শতকরা ৭৩ ভাগ, কিন্তু ষাটের ঊর্ধ্বরা বাড়বেন শতকরা ৯১ ভাগ এবং আশির ঊর্ধ্বরা বাড়বেন শতকরা ১১৯ ভাগ।...

"স্বাভাবিক নিয়মে বার্ধক্যে যেসব পরিবর্তন হয় তাদের অনেকগুলির উল্লেখ না করলেও চলে, যেমন লোলচর্ম, মাথায় টাক পড়া, দাঁত পড়া, অনিদ্রা, কম শুনা প্রভৃতি। এইসবের জন্য এবং শরীরে প্রাণরাসায়নিক (biochemical) পরিবর্তনের কারণে শরীরের কর্মক্ষমতা সাধারণভাবে হ্রাস পায়। ফলে বৃদ্ধদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপখাওয়ানোর ক্ষমতা কমে যায়। বয়স সত্তর হবার আগেই অনেকের রক্তনালীর দেওয়াল পুরু হওয়ার (atherosclerosis) ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, যার জন্য মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির রক্তসরবরাহ কমে যায়। ফুসফুসের একটি উপাদান 'ইলাস্টিক ফাইবার' (elastic fibre) কমে যাওয়ায় এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধরা ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হন; অস্থির (bone-এর) খনিজপদার্থ কমে যাওয়ার ফলে এর ভঙ্গ-প্রবণতা বাড়ে... হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে বা রক্তনালীতে পরিবর্তনের ফলে হার্ট ব্লক বা করোনারি অসুখ-এর সম্ভাবনা বাড়ে।"—যুগ্ম সম্পাদক

আপনার বয়স যা-ই হোক না কেন, আপনি বার্ধক্যকে পিছিয়ে দিতে পারেন। বার্ধক্যের ওপর বংশানুগতিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব যথেষ্ট আছে বটে, তবে বৈজ্ঞানিকদের মতে এ ব্যাপারে খাদ্যের প্রভাবও কম নয়। যথাযথ খাদ্য খেলে বার্ধক্যের লক্ষণগুলিকে (লোলচর্ম, শুষ্কচর্ম এবং বার্ধক্যজনিত অন্যান্য রোগ) কমিয়ে ফেলতে পারেন এমনকি বন্ধ করতেও পারেন। খুব দেরি কিছু হয়নি, এখনিই আপনি আরম্ভ করতে পারেন।

দেহের ওজন বাড়তে দেবেন না

বারবার যদি ওজন বাড়ে এবং তা কমিয়ে ফেলেন, তাহলে ত্বককে ধরে থাকার যে নমনীয় ফাইবার বা তন্তুগুলি আছে সেগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে। ত্বক যদি নমনীয়তা হারিয়ে ফেলে তখন সে আর সঙ্কুচিত হয়ে সরু হওয়া দেহের ওপর মানানসই হয়ে লেগে থাকবে না, ত্বকে ভাঁজ পড়বে। দেহের ওজন বারবার পরিবর্তিত হলে মুখে অকালে বার্ধক্যের চিহ্ন দেখা দেবে। বিশেষ কোন খাদ্য মুখের কুঞ্চনকে সারাতে পারবে না বা কুঞ্চন বন্ধ করবে না। তবে যথোপযুক্ত খাদ্য খেয়ে চামড়ার নিচে চর্বির স্তর পুরু রেখে মুখের দীপ্তি বজায় রাখতে পারেন। ভাল খাদ্য প্রতিদিন যথেষ্ট ক্যালরি সরবরাহ করে আপনার দেহের ওজন যথাযথ রাখবে। ক্যালরি আসে পুষ্টিকর খাদ্য থেকে। একটি মিঠা (রাঙা) আলু ভাজা, এক গ্লাস কমলালেবুর রস অথবা ১০টি আলু ভাজা প্রায় ১০০ ক্যালরি দেয়। তবে মিঠা আলু ও কমলার রস বেশি পরিমাণ ক্যালরি দেয়।

মিঠা আলুতে প্রচুর ভিটামিন 'এ' আছে, যার প্রভাবে ত্বকের কোষগুলি সুষ্ঠুভাবে খসে পড়ে, লেবুর রসে ভিটামিন 'সি' আছে যা 'কোলাজেন' তৈরি করতে সাহায্য করে, যার ফলে ত্বক যৌবন-সুলভ নমনীয়তা পায়। আর যেসব দ্রব্যে প্রচুর ভিটামিন 'এ' আছে, সেগুলি হলো—ঘন সবুজ রঙের সবজি, গাজর প্রভৃতি ঘন হলুদ রঙের সবজি এবং কমলা রঙের ফল। অম্ল ফলে প্রচুর ভিটামিন 'সি' আছে

প্রচুর জল পান করুন

বিশ-এর দশক পার হয়ে গেলে, শরীরের যেসব স্বাভাবিক গ্রন্থি আর্দ্রতা রাখে, তাদের অনেকগুলির (যেমন, ঘর্ম ও তৈল গ্রন্থি) কাজ কমে যায়, যার ফলে ত্বকের ওপরের স্তরগুলি পাতলা হয়ে যায়। তাতে ত্বক আর আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে না। তাছাড়া আপনার শরীর থেকে প্রস্রাব, ঘর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে যে জলীয় বস্তু হারায়, তা যদি জল পান করে প্রতিস্থাপন না করেন তাহলে শরীর তার প্রয়োজনে অন্যান্য কোষ থেকে সেই জল টেনে নেবে, যার ফলে চামড়া শুষ্ক ও বৃদ্ধদের মতো হবে। এই শুষ্কতা কমাবার জন্য প্রতিদিন অন্ততঃ ৮-১০ গ্লাস জল পান করুন। চা, কফি বা কোকা কোলা ইত্যাদি এর মধ্যে (অর্থাৎ ৮-১০ গ্লাসের মধ্যে) ধরবেন না; এগুলিতে 'কেফিন' থাকে, যাতে প্রস্রাব বাড়ায়, যেমন বাড়ায় সুরা বা অ্যালকোহল।

শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান

শরীরের অসুস্থতা নিবারণ করে বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ালে ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, বৃদ্ধদের জীবাণু-সংক্রমণ হলে তা ভাল হতে চায় না, কারণ তাঁদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। বয়স হলে লিম্ফোসাইট নামে যে রক্তের শ্বেতকণিকা আছে (যারা রোগ প্রতিরোধ করে) তাদের কর্ম-ক্ষমতা কমে যায়। ভিটামিন 'ই' রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেও এই তথ্য সমর্থিত হয়েছে। যেসব খাদ্যে ভিটামিন 'ই' আছে, সেগুলি হলো—ঘন সবুজ পাতা-যুক্ত সবজি, শুঁটিকলাই, বাদাম এবং গোটা শস্য।

খাদ্যব্যাপারে সদভ্যাস বার্ধক্যজনিত অনেক ধরনের শারীরিক অসুস্থতা নিবারণ করে ঃ

(ক) হৃৎপিণ্ডের অসুখের ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রতিদিনের খাবারে কোলেস্টেরল-এর পরিমাণ ৩০০ মিলিগ্রামের কম রাখুন এবং সমগ্র ক্যালরির ৩০ শতাংশের বেশি যেন চর্বি থেকে না আসে। খাদ্যে পলি আনস্যাচুরেটেড অথবা মোনো আন-স্যাচুরেটেড* ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত চর্বি এবং দ্রবণীয় ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার বাড়াবেন; এগুলি রক্তে কোলেস্টেরল কমায়।

(খ) বেশিরভাগ মহিলাই জানেন যে, জীবনের প্রথম তিন দশকে দুধ এবং বেশি ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খেলে রজোনিবৃত্তি পর্যন্ত দুর্বল, ছিদ্রযুক্ত হাড় (অস্টিওপোরোসিস) হয় না। এবিষয়ে আপেল, বাদাম, কিশমিশ, আঙুরের রস এবং সবুজ সবজি খাওয়া যথেষ্ট সাহায্য করে।

মনে রাখা দরকার যে, বার্ধক্যের তাৎক্ষণিক ওষুধ হিসাবে খাদ্যকে ধরা চলবে না। তবে ওপরে যেসব খাবারের কথা বলা হয়েছে—যথেষ্ট পরিমাণে জল, ভিটামিন, ঘন রঙের ফল ও সবজি এবং ফাইবারযুক্ত খাবার স্বাস্থ্য ভাল রাখে এবং দেহসুষমা বজায় রাখে।

* তেল বা চর্বিজাতীয় পদার্থে যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, তা স্যাচুরেটেড (পরিপূর্ণ অর্থাৎ তার অন্য রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত হবার খালি জায়গা নেই) বা আনস্যাচুরেটেড (অপরিপূর্ণ, অর্থাৎ অন্য দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত হবার খালি জায়গা আছে) অবস্থায় থাকে। শেষোক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডকে, অন্য দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত হবার শক্তি অনুযায়ী, পলি (বেশি) বা মোনো (কম) আনস্যাচুরেটেড বলা হয়। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্ত থেকে কোলেস্টেরল বিদূরিত করে, অর্থাৎ রক্তে কোলেস্টেরল কমায়। এখানে উল্লেখ্য যে, তেলে স্যাচুরেটেড বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকার ওপর নির্ভর করে কোন্ তেল উচ্চ-কোলেস্টেরল রোগীর পক্ষে উপকারী বা অনুপকারী।—অনুবাদক

সৌজন্য ঃ Reader's Digest, February, 1991, pp. 45-46

ভাষান্তর ঃ জলধিকুমার সরকার

সহজ কথায় সাধকজীবন

পলাশ মিত্র

সাধকপ্রসঙ্গ ঃ নির্মল দাশগুপ্ত। প্রকাশক ঃ তপন দাশগুপ্ত, ২৮ রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, কলকাতা-২৮। মূল্য ঃ পনের টাকা।

রামকৃষ্ণদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং গম্ভীরনাথের পবিত্র জীবনকাহিনী নিয়ে এই সাধকপ্রসঙ্গ। সহজ-সরল বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এই তিন সাধকের মহাজীবনের অনুপম কথা পাঠ করার গভীর তৃপ্তি আছে। লেখক সন-তারিখের দিকে বড় একটা গুরুত্ব দেননি। সর্বশ্রেণীর পাঠক যাতে এই সব প্রাতঃস্মরণীয় সাধকবৃন্দের বিষয়ে মোটামুটি ভাবে কিছুটা ধারণা পেতে পারেন, লেখক সেই প্রয়াসই করেছেন এই গ্রন্থে। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-কথায় তিনি তাঁর শিষ্য-ভক্তদের কথাও সামান্য হলেও লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ'র সাহায্য নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে তাঁর রচনায় প্রামাণিকতা এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক উক্তি তিনি ব্যবহার করে লেখার মধ্যে দিব্য ও অন্তরঙ্গ মুহূর্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিজয়কৃষ্ণের জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পাঁচ বছর পরে। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের প্রসঙ্গ পাঠকের অবিদিত নেই। ঠাকুরের প্রতি বিজয়কৃষ্ণের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। ঠাকুরও স্নেহ করতেন বিজয়কৃষ্ণকে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন আলোচনায় লেখক কুলদা ব্রহ্মচারীর 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ' থেকে নানা কাহিনী ও তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর রচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। গম্ভীরনাথের ক্ষেত্রেও লেখক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুখ্যাত বইটির সহায়তা নিতে ভোলেননি। ফলে সবসময়েই লেখকের বক্তব্যে এমন একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে, শ্রদ্ধাশীল পাঠকের কাছে যার মূল্য অপরিসীম। গল্পের ঢঙে লেখক তাঁর বর্ণনাকার্য সমাধা করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা—যার জন্য কোন রচনাই পড়তে ক্লান্তি আসে না। বরং পাঠ শেষে এক অমল প্রশান্তিতে মন ভরে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং এই দুই সাধক সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে গিয়ে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে-বাণী প্রচার করেছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে সেই সব বিষয়ও উজ্জ্বল আলোকশিখার মতো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। আজকের এই হিংসা ও হানাহানির যুগে এইসব পরম বরেণ্য অধ্যাত্মশিল্পী ও মানবপ্রেমিকের অমৃতসমান জীবনকথা যত বেশি লিখিত ও পঠিত হয় ততই মঙ্গল। 'সাধকপ্রসঙ্গ'র লেখককে অভিনন্দন জানাই।

সুধীন্দ্রনাথের কবিমানস

ক্ষুদিরাম দাস

আধুনিক কবিতা ও সুধীন্দ্র-কবিমানস ঃ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্যতীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬। মূল্য ঃ দশ টাকা।

লেখক ও সাহিত্যরসিক রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের 'আধুনিক কবিতা ও সুধীন্দ্র-কবিমানস' পড়লাম। তথ্যে, কাব্য-বিচারে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে ঠাসা নব্বই পৃষ্ঠার এই পুস্তকটি লেখকের আধুনিকতার প্রতি অনুরাগ ও সুধীন্দ্র-নিষ্ঠার

জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে। এই গ্রন্থের প্রথম চারটি অধ্যায়ই সুধীন্দ্রনাথের কবিকৃতি-বিষয়ক আলোচনার পটভূমি নির্মাণে লেখক ব্যয় করেছেন। কাকে আধুনিক কবিতা বলব অর্থাৎ আধুনিকতা ও আধুনিক কবিত্বের সমন্বয়ী অনুভবের বিশ্লেষণ নিয়ে তিনি রবীন্দ্র-অভিমতকে কেন্দ্র করেছেন। এবং সেই কেন্দ্র ঠিক রেখে তার চারপাশে ইংরেজ সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ, বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথের অধ্যয়নকে আবর্তিত করে প্রথমেই একটি পরিমাপ ও পরিমণ্ডল ঠিক করে নিয়েছেন এবং তারপর সুধীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক মনোভাবের মধ্যেই দার্শনিক মনন ও বৌদ্ধিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গতি নির্ণয় করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য রচনা থেকে আহরিত উদ্ধৃতিসমূহকেও তাঁর বক্তব্যের প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ তিরিশোত্তর এক অসামান্য নিঃসঙ্গ কবি। তাঁর সঙ্গে সমকালীন বিষ্ণু দে বা বুদ্ধদেব বসুর কাব্যিক সাম্য মেলে না। তাঁর পরিশীলিত বিদগ্ধ কর্ষণক্ষেত্র তাঁরই অনন্যতায় সমৃদ্ধ এবং তিনি রবীন্দ্র-অনুসারী হলেও তিনি শিল্পের সঙ্গে মননের যোগে রবীন্দ্র-অতিক্রমী। এসব দিক রমেন্দ্রনাথের বিচারে যথাযথভাবে স্থান পেয়েছে দেখতে পাই। সুধীন্দ্রনাথের মননমুখী বিদগ্ধতা তাঁকে অবশ্য জনপ্রিয় করেনি এবং নিরবধি কালও তাঁকে স্মরণের দায়িত্বে নেয়নি। কিন্তু তা না করলেও স্টাইলের স্বমহিমায় তিনি আজও ভাস্বর। বিদগ্ধ লেখনের রসগ্রাহী স্বরূপ হওয়া কেবল স্বাভাবিকই নয়, সমুচিতও। সুতরাং সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকর্ষের বহু আলোচনা চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে আধুনিকতা-প্রবণ যুবমানসে অনায়াসে ঘটে থাকলেও মুষ্টিমেয় রসিকের সংখ্যা কালে কালে হ্রাস বৃদ্ধি পায় বলে যুগ পরিবর্তনের মধ্যেও তাঁর স্বরূপ-দ্রষ্টার অভাব ঘটছে না। প্রকৃত বিদগ্ধই বিদগ্ধতাকে আয়ত্ত করতে পারেন, অন্যের পরাঙ্মুখতা সত্ত্বেও। এই অর্থে সুরসিক সমালোচক রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের গ্রন্থটি অভিনন্দনযোগ্য। সেকালের আধুনিকতা নিয়ে কোলাহলের পটভূমির পরিবর্তন ঘটলেও ইতিবৃত্তে কাব্যিক বিরাগ-সংরাগ সর্বত্রই একটা জাতীয় ও সাময়িক লক্ষণ। রমেন্দ্রনাথের গ্রন্থ সেকালের সেই অধ্যয়নের ইতিবৃত্তীয় প্রয়োজনকে চরিতার্থ করার দায়বাহী হয়েছে বলে সকলের সাধুবাদ তার প্রাপ্য।

কম কথায় পথচারীর তাৎক্ষণিক অনুভবের কবিতা

তরুণ সান্যাল

Whispers and Footfalls : পূর্বাভাস ও পদধ্বনি ঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী। প্রকাশক ঃ আত্ম-প্রকাশ, ১৭৮ দমদম পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৫৫। মূল্য ঃ দশ টাকা।

কবিতা, কেউ কেউ মনে করেছেন, স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি। কেউ বা ভেবেছেন তা আবেগ অভিজ্ঞতার প্রকাশ। আবার কেউ কেউ সংজ্ঞা দিয়েছেন—যা নির্জনে ফিরে মনে পড়া আবেগ। আমাদের দেশের ধ্রুপদীরা কবিতাকে চিহ্নিত করেছেন রসাত্মক বাক্য হিসাবে। এছাড়া কবিতার কতই না ব্যাখ্যা করার দিক রয়েছে—রয়েছে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু পূব বা পশ্চিম গোলার্ধ, বা দেশ মহাদেশ যেখানেই হোক না কবিতা কবিতাই। আমরাও বুঝতে পারি কোনটা কবিতা, কোনটা কবিতা নয়।

এক-একটি মহাকাব্য তো বেশ বড় মাপের। কিন্তু সেগুলির মধ্যেও আছে স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তি। বৈদিক সূক্তগুলি তো শ্রুতিই—ছোটখাট মাপ তাদের—স্মরণযোগ্য সেসব মন্ত্র। এমনি রয়েছে গাথা ও হৃপ্তপদি উদাহরণে। আছে লোকজীবনের গান, ছড়া বা অভিজ্ঞতার জ্ঞানী উচ্চারণ। 'এপিগ্রাম' যেমন ওদেশে, আমাদের দেশেও তেমনি আছে 'বয়েত'। উর্দু, হিন্দী কবিতার বিশিষ্টতার মধ্যেও রয়েছে ঘনপিনদ্ধ স্বল্পভাষণের 'শায়েরি', যেমন আছে জাপানের 'হাইকু'।

রবীন্দ্রনাথ 'কণিকা'র কবিতাগুলিতে এমনি বহু চিন্তা ও অনুভবের দাক্ষিণ্য রেখে গেছেন—রেখেছেন

বিশেষ করে 'লেখন' ও 'স্ফুলিঙ্গ'-তেও। তবে সাম্প্রতিক কালে বাঙলা ভাষায় ছোটমাপের কবিতা লেখার খুব একটা চল নেই। কবি অনিলেন্দু চক্রবর্তী এমনি ছোটমাপের বহু কবিতা লিখেছেন কৈশোর কাল (১৯৩৩) থেকেই। এখানে ১৯৩৭ থেকে ১৯৮৬—এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে লেখা ছোট কবিতা থেকে নির্বাচিত হয়েছে ঊনআশিটি। বইটির নাম 'Whispers and Footfalls': 'পূর্বাভাস ও পদধ্বনি'। বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় বাঁয়ে ও ডানে রয়েছে একই বয়ানের ইংরেজী ও বাঙলা কবিতা। কোন কোনটির প্রথম রচনা ইংরেজীতে, পরে রূপান্তরণ বাঙলায়। এটি অনিলেন্দু চক্রবর্তীর চতুর্থ কাব্য-গ্রন্থ। তাঁর প্রাক্-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো প্রবাহ (১৯৪২), স্বপ্নজাগর (১৯৫৪), কাছেই জানালা (১৯৬২)। স্বপ্নজাগর কাব্যগ্রন্থটি কবির গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত এবং আলোচ্য কবিতার বইটি কবি অমিয় চক্রবর্তীর নামে।

অনিলেন্দু চক্রবর্তী ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। কবি অমিয় চক্রবর্তী অনিলেন্দুর কাব্যপ্রতিভাকে উচ্চস্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্র-গবেষক হিসাবেও তিনি খ্যাতকীর্তি ডক্টরেট—বহু রবীন্দ্র-প্রবন্ধকার। সাহিত্য-অধ্যাপনার সুদীর্ঘ কর্ম-জীবনপ্রান্তে তাঁর নানারূপ তাৎক্ষণিক মনন ও অনু-ভবের স্মরণযোগ্য বেশ কিছু দিক তিনি এই ছোট-মাপের বইটির (পকেট কবিতার) ছোট কবিতা-গুলিতে প্রকাশ করেছেন—বিশিষ্ট শৈল্পিক রীতিতে। কবিতাগুলি বই আকারে পেয়ে বহু পাঠকই উপকৃত ও আনন্দিত হবেন।

'পূর্বাভাস ও পদধ্বনি', যার ইংরেজী অংশটির নাম 'Whispers and Footfalls'—এই দুই মিলিয়ে বইখানি দ্বি-ভাষিক, বাইলিঙ্গুয়াল। বলা যায় ছোট বইখানি, অনিলেন্দু চক্রবর্তীরই একটি কবিতার মতো :

হাতের মুঠোয় বাচ্চা চড়ুই
এইটুকু তার বুক
তারি মাঝখানে—
এত বড় ধুক্ ধুক্।

সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার বিজড়িত ব্যক্তি-মানুষের অভিজ্ঞতাগুলি বইখানির কাব্যবিষয়। প্রেম ও প্রকৃতি, আনন্দ ও বিষাদ, সাফল্য ও অসাফল্য, যুদ্ধ ও শান্তি—সব কিছুর অনুভবের গভীরতাকে ছোট্ট মাপের রচনায় প্রকাশ করেছেন তিনি। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও গদ্য—কোন ছন্দকেই তিনি বাদ দেননি। যে অনুভবধারার যেমন আঙ্গিক, তেমনি তা তিনি নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, অনু-ভবের সঙ্গে আঙ্গিকও হয়েছে স্বতঃউৎসারিত। পথ চলতে জীবনপথিকের চোখ পড়েছে যাতে, বা অনু-ভবে যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কবিতায় তাই তিনি লিখেছেন। "বৃদ্ধ এক পথিক সময়মতো আশ্রয় খুঁজেছে / আমাদের উষ্ণ ঘরের মধ্যে, / তার পিঠের যাদু-ঝুলিতে / আগাম বসন্তের কাকলি।" সে পথিকই দেখছেন :

"দূর থেকে হরিবোল আর জিন্দাবাদ
—দুই ধ্বনি একাকার খুঁজে পায় মিল,
কাছে এসে দেখি মৃত্যু তীরহীন খাদ
তার উপরে এ জীবন উদ্দাম মিছিল।
(মৃত্যু ও জীবন)

কবি অনিলেন্দু চক্রবর্তী মানুষের জীবনের মহিমাকে ভোলেন না। প্রকৃতির সৃজনশীল ঘটনা-পুঞ্জকে অবলীলায় তিনি মিলিয়ে দেন মানুষের জীবনপ্রস্থানের সঙ্গে।

অনেক সময় মনে হয়েছে, কোন কোন ইংরেজী অনুবাদেই ব্যঞ্জনা বেশি। আবার কোথাও বেশি বাঙলা কবিতায়। ধরা যাক উপরের কবিতাটি। শেষ অংশটির অনুবাদ হয়েছে : "Death is a bank-less void, and / Life is a bold procession / Over the hanging bridge." ঐ bankless void-এর ওপর hanging bridge এক অন্যতর ব্যঞ্জনা এনেছে।

অনিলেন্দুবাবুর কাব্যগ্রন্থটির সমাদর প্রত্যাশা করি। আমাদের বর্তমান কবিতায় অতিকথনের যুগে নৈঃশব্দের প্রবল বাঙ্ময়তা আবিষ্কারের প্রয়াস আছে এই বইখানিতে। তাই তা গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে। "ধসে পড়া ফাটলের গায়ে / হা হা করে বড় এক ফাঁকে, / ছোট্ট লতার মাথাটিতে / নীলফুল দেখে তো অবাক।"

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

বলরাম মন্দিরে গত ১ মে '৯১, সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে সকালে ভজন, আরাত্রিক, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ভাবগম্ভীর পরিবেশে এক ধর্মসভা আয়োজিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে যে-স্থানে বসে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী ও গৃহীদের উপস্থিতিতে 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেই ঐতিহাসিক হলঘরটিতেই বিকাল ৪টায় উক্ত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। স্বাগত ভাষণ দেন বলরাম মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু। শঙ্কর বসু-মল্লিক স্বামীজীর 'সখার প্রতি' কবিতা আবৃত্তি করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ কমল নন্দী। উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐদিন সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামশেদপুর গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মেশানন্দ। উৎসব উপলক্ষে ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে টিসকোর শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা এবং স্বামী অচ্যুতানন্দ। দুদিনই সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন হাওড়ার শিবপুর প্রফুল্লতীর্থের শিল্পিবৃন্দ।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি (মুর্শিদাবাদ): গত ১৫—১৭ মার্চ বহরমপুর শহরে এই আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, স্বামী অমলানন্দ ও স্বামী অচ্যুতানন্দ। প্রতিদিন সভাশেষে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ভক্তি-গীতি পরিবেশন করেন।

গত ২৩ এপ্রিল **চেরাপুঞ্জি আশ্রমের** বর্ষব্যাপী হীরকজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল মধুকর দিঘা। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। ২৪ এপ্রিল চেরাপুঞ্জি আশ্রমের শাখাকেন্দ্র শেলা আশ্রমের পুনঃসংস্কৃত মন্দির ও নাটমন্দিরের উদ্বোধনও করেন স্বামী গহনানন্দজী। মেঘালয়ের শ্রমমন্ত্রী এস. পি. সোয়ের ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ দোর্ন কুপার রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৫ ও ১৬ এপ্রিল ইটানগরে আলং **রামকৃষ্ণ মিশন** পরিচালিত বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং। অর্থ-মন্ত্রী আর. কে. খিরমে, বনমন্ত্রী মুকুট মিথি, পূর্তমন্ত্রী টোডক বাসার উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ছাত্রগণ কর্তৃক আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল এস. এন. দ্বিবেদী।

গত ১৪ এপ্রিল **ইটানগর আশ্রম** পরিচালিত হাসপাতালের বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং নার্সদের ক্যাপিং সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের অর্থমন্ত্রী আর. কে. খিরমে।

জাতীয় সংহতি-শিবির

ভুবনেশ্বর আশ্রম গত ১৬—২০ মার্চ উড়িষ্যার বালাসোর জেলার ধামনগরে দ্বাদশ জাতীয় সংহতি-

শিবির পরিচালনা করে। এই শিবিরে পশ্চিমবঙ্গের ৬জন প্রতিনিধি সহ উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ১৮০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে।

আলোচনাচক্র

গত ১৮ মার্চ ১৯৯১ গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে অপরাহ্নে 'ভারতবর্ষ ও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক" সম্বন্ধে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রিম সোভিয়েতের পিপল্স ডেপুটি মেম্বার ম্যাডাম মারিনা জি কন্স্টেনেট্স্কায়া আলোচনাচক্রের সভানেত্রীত্ব করেন।

লেলিনগ্রাদস্থিত সোভিয়েত রেরিক সোসাইটির কাউন্সিল মেম্বার এবং সোভিয়েত রেরিক ফাউন্ডেশানের কো-অর্ডিনেটর মাইকেল টিরাটেভ, লেলিনগ্রাদ স্টেট ইউনিভার্সিটির লিয়োনিদ কোলিয়াদা, মস্কো টি.ভি. টিমের প্রধান সম্পাদিকা ইরিনা ক্লিয়োনস্কয়া ও পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিনিধি আন্দ্রেয়ী লেভচেনকো, জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির বারসিভিলি আন্দ্রেয়ী ভটনগোভিচ, ক্রীমিয়াস্থিত সিমফারোপল স্টেট ইউনিভার্সিটির জাইটসভ ভ্রাশিতমির, লিথিয়োনিয়া রেরিক সোসাইটির সভানেত্রী ইরিনা জালেকিকিনে এবং সভ্য ও লেখক ভিতানতাস ওমরেসাস প্রভৃতি বক্তাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় ভূমিকার কথা। তাঁরা বলেন যে, লেনিনগ্রাদ শহরের অদূরে বিবেকানন্দ সোসাইটির আসন্ন উদ্বোধনের জন্য বহু লোক উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে। ইরিনা জালেকিকিনে বলেন: "ভারত আমাদের কাছে সর্বধর্মের জননী।" মাইকেল টিরাটেভ বলেন: "বেদান্তের দ্বারা বিজ্ঞান অধ্যাত্মরসে রঞ্জিত (spiritualised) হবে।" আলেক গোডস্টোভ বলেন: "ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মসাধনার শাশ্বতকেন্দ্র (immortal centre)।" এঁরা সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রচারের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্বন্ধে একটি ডকুমেন্টারী ভিডিও ফিল্ম প্রস্তুত করছেন। ইতিমধ্যে এঁরা রাশিয়ান ভাষায় রোমাঁ রোলাঁর লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বইটি অনুবাদ করেছেন। শিশুদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এঁরা এখন একটি লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্যোগও নিচ্ছেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন, হাজার বছর আগেও রাশিয়ানরা ধর্মের পূজারী ছিলেন। রাশিয়ায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় দেখা যায় যে, আজও এঁরা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের ছাত্রগণ ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বি.এ., বি.এসসি. ও বি.কম., এম.এ. এবং এম.এসসি. পরীক্ষায় নিম্নলিখিত স্থানগুলি অধিকার করেছে:

বি. এ.: অর্থবিদ্যা—১০ম স্থান; দর্শনশাস্ত্র—১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৯ম স্থান; ইংরেজী—৩য় স্থান; সংস্কৃত—১ম স্থান।

বি. এসসি.: রসায়নবিদ্যা—৭ম ও ১০ম স্থান; প্রাণিবিদ্যা—১ম স্থান।

বি. কম.: ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থান।

এম. এ.: দর্শনশাস্ত্র—১ম স্থান; সংস্কৃত—১ম, ২য় ও ৪র্থ স্থান।

এম. এসসি.: উদ্ভিদবিদ্যা—৭ম স্থান (দু-জন)।

১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজের ছাত্রগণ প্রথম বিশজনের মধ্যে ১ম, ৩য়, ৭ম, ১০ম, ১৫শ, ১৭শ, ১৯শ ও ২০শ স্থান লাভ করেছে।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ: গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের লক্ষ্মীপুরমে আশ্রয়গৃহ-সহ-সমাজগৃহের নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে এবং চন্দ্রমৌলিপুরম, মুক্তেশ্বরম ও কোঠাপালেমে এরূপ গৃহনির্মাণ কার্য চলছে। তাছাড়া আদাবিপালেমে একটি রামালয়ম-এর সংস্কারের কাজ চলছে।

কোঠাপালেমে ৮৫টি বাসগৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামঞ্চিলি এবং এস রায়ভরম মণ্ডলের লাকাভরম ও ধর্মভরমে আরও ৭৯টি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে।

গুজরাট: ভাবনগর জেলার গিরিধর তালুকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ৩০টি বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছে।

বহির্ভারত

বাগেরহাট (বাংলাদেশ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২ ও ৩ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম শুভ

জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন বিকাল ৪টায় আশ্রমের নবনির্মিত 'ভবনে' গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উদ্বোধন করেন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ. স. ম. মোস্তাফিজুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাগেরহাটের জেলা-প্রশাসক এম. এ. মান্নান, এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলীবাবু, অধ্যাপক দিলীপকুমার দে এবং সংসদ সদস্যা সৈয়দা নার্গিস আলী।

৩ এপ্রিল সকাল ৫-৩০ মিঃ-এ মঙ্গলারতি ও বেদপাঠের মাধ্যমে উৎসবের শুভ সূচনা হয়। সকাল ৯টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা এবং পূজান্তে ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকাল ৫-৩০ মিঃ-এ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দের সভাপতিত্বে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন খুলনা আযমখান বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অসিতবরণ ঘোষ, স্বামী পরিমুক্তানন্দ, এ্যাডভোকেট বিনোদবিহারী সেন এবং অধ্যাপক দিলীপকুমার দে। সভাশেষে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের বেতারশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো: গত এপ্রিল মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী গণেশানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বুধবার ও শনিবারগুলিতে যথাক্রমে বিবেকচূড়ামণি ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর ক্লাস নেওয়া হয়েছে। ২৪ এপ্রিল মাণ্ডুক্য উপনিষদের একটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন: এপ্রিল মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ১২ এবং ২৬ এপ্রিল বালক-বালিকা ও বয়স্কদের জন্য দুটি বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ এপ্রিল বিকালে স্বামী ভাস্করানন্দ যুবক-যুবতী-দের জন্য বেদান্ত বিষয়ক একটি ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো): এপ্রিল মাসের রবিবার ও বুধবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ এবং প্রতি শনিবার শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা করেছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়েছে। ওয়েবস্টার স্ট্রীটে অবস্থিত এই বেদান্ত সোসাইটির পুরনো মন্দিরে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ পাতঞ্জল যোগ-সূত্রের ক্লাস নিচ্ছেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক: গত এপ্রিল মাসের প্রতি রবিবার ধর্মীয় ভাষণ, প্রতি শুক্রবার 'বিবেকচূড়ামণি' ও প্রতি মঙ্গলবার 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা) এবং সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটি (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র): গত এপ্রিল মাসে যথারীতি অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ করেছেন যথাক্রমে স্বামী প্রমথানন্দ এবং স্বামী চেতনানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ১৮ মে ভগবান শঙ্করাচার্য ও ২৮ মে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গগনানন্দ প্রত্যেক সোমবার কথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ লীলাপ্রসঙ্গ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিধাননগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রে গত ১ মার্চ থেকে ৩ মার্চ দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-জয়ন্তী এবং কেন্দ্রের ষষ্ঠদশ বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-জয়ন্তী এবং দোল উৎসব ও কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসবের অঙ্গ হিসাবে পালিত হয়েছে। বার্ষিক উৎসবের সূচনা হিসাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ একটি প্রভাতফেরী সল্টলেক উপনগরীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

১ মার্চ থেকে ৩ মার্চ তিনদিন যথাক্রমে স্বামীজী, শ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-জয়ন্তী পালিত হয়। তিনদিনই সারাদিন ব্যাপী মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ধর্মসভা এবং গীতি-আলেখ্য ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১ মার্চ ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নির্জরানন্দ। স্বামীজীর জীবন ও বাণীর তাৎপর্য বিষয়ে ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ২ মার্চ ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মস্থানন্দ। বক্তব্য রাখেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ এবং অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩ মার্চ ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং বক্তা ছিলেন অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী। প্রতিদিনই ধর্মসভায় বিপুল সংখ্যক ভক্তসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। ৩ মার্চ মধ্যাহ্নে প্রায় ৩০০০ ভক্ত মন্দিরের চত্বরে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ঐদিন সন্ধ্যায় আরও প্রায় ১৫০০ ভক্তের মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সেবাশ্রম (গাঁড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা): গত ৩ মার্চ এই আশ্রমের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। বিকালে স্বামী কমলেশানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন দেউলী-২ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপকুমার রঞ্জিত। সভায় বক্তব্য রাখেন হবিবুর রহমান সর্দার। সভার পর রামায়ণ গান পরিবেশন করেন কৃষ্ণা বক্সী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, হালিসহর কর্তৃক গত ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণোৎসব নাম্না প্রাথমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি উৎসবের উদ্বোধন করেন ও ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সর্বগানন্দ। তাছাড়া ঐদিন ভক্তিমূলক সঙ্গীত, লীলাকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, প্রসাদ বিতরণ, পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (চিত্তরঞ্জন) গত ২ ও ৩ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের দুদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও ভাষণ দিয়েছেন স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন কারখানার মহা প্রবন্ধক সুজিত ভট্টাচার্য, হিন্দুস্থান কেবলস-এর চেয়ারম্যান ডি. কে. গুপ্ত, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর কল্যাণ ঘোষ প্রমুখ। তাছাড়া প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। দু-দিনই গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী-প্রচার সংঘ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ, কল্যাণী (নদীয়া) গত ৭—১০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে। উৎসবের বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ওপর আলোচনা করেছেন প্রব্রাজিকা অজেয়াপ্রাণা, স্বামী অম্বিকেশানন্দ, স্বামী ব্রজেশানন্দ ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। তাছাড়া আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল স্লাইড শো প্রদর্শন ও বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত গীতি-আলেখ্য 'মহানাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ'। উৎসবের শেষদিন প্রায় ৫০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ **কাঁন্দী মা সারদা পাঠচক্রের** নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এই উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালক শিবশঙ্কর চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অসামরিক প্রতিরক্ষামন্ত্রী সৈয়দ ওয়াহেদ রেজা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সারগাছি সেবাব্রতের সম্পাদক মৃদুল ভট্টাচার্য। পাঠচক্রের সম্পাদিকা মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠচক্রের কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং পাঠচক্রের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সমিতির সদস্যা ও পৃষ্ঠপোষকগণ অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ রায় রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত একটি মনোজ্ঞ গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। সমিতির সভানেত্রী শীলা দত্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় উপস্থিত প্রায় ৫০০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ, রামপাড়া (হুগলী) গত ১৬ ও ২৩ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব পালন করে। ১৬ মার্চের ধর্মসভায় সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা ও বক্তা ছিলেন প্রব্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণা। ২৩ মার্চ সকালে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং দুপুরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন ডঃ কমল নন্দী। উভয় দিনের সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির, ডোমজুড় (কালীতলা, হাওড়া) গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৬তম জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে পালন করেছে। বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, শোভাযাত্রা, ধর্মসভা, গীতিনৃত্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। উৎসবের প্রথম দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পরমেশ্বরানন্দ ও বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভার সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা ও বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় দিন দুপুরে সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে এই অঞ্চলের তিনজন কৃতি ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং ৫৫ জন দুঃস্থকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উৎসবে পরশমণি দাসের অঙ্কিত চিত্রপ্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ১৫—১৭ মার্চ '৯১ **তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (তেলো-ভেলোর চটি)** বাৎসরিক উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা, হোম, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা, যাত্রাগান, মেলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ১৫ মার্চ বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সমাত্মানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী পরমাত্মানন্দ। ১৬ মার্চ সকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহামিছিল ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি ও তাঁদের বাণীসম্বলিত পোস্টারসহ পাঁচটি গ্রাম পরিক্রমা করে। ঐদিন বেলা ১০টা থেকে শুরু হয় আলোচনা শিবির। আলোচনা শিবিরের প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ী প্রতিনিধিদের পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী সনাতনানন্দ। ঐদিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তাগণ ছিলেন স্বামী সনাতনানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, ডঃ হোসেনুর রহমান, রেভাঃ সোমেন দাস ও ব্রজমোহন মজুমদার।

১৭ মার্চ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবাশ্রম কর্তৃক আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং তাদের পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়।

প্ল্যাটিনাম জুবিলী

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে ৭৫তম বার্ষিকী উৎসব ১১—২০ জানুয়ারি '৯১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

১১ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী উৎসবের সূচনা করেন। তিনি আশ্রমের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ৭৫ বছরের যোগসূত্রের কথা বর্ণনা করেন। তিনি এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। বিশেষ পূজা করেন স্বামী দিব্যানন্দ। ৮০ জন সন্ন্যাসী এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দ ও কমল মল্লিক (সরোদ)।

১২ জানুয়ারি 'আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ' সম্বন্ধে বলেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী এবং সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন মহারাষ্ট্র হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দ ও প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী প্রভানন্দ। এই দিন আশ্রমের ইতিবৃত্ত (১৯১৬-১৯৯০) প্রকাশিত হয়।

১৩ জানুয়ারি সারদা মঠের প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার সভানেত্রীত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সভা হয়। বক্তৃতা করেন প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। স্তোত্রপাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা। সকালে ঠাকুরের মন্দিরে ৬০ জন সন্ন্যাসিনী সমবেত হয়ে ভজন পরিবেশন করেন।

১৪—১৮ জানুয়ারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিবেশিত ভক্তিমূলক সঙ্গীত, দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশিত রামায়ণ গান, শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির কর্তৃক 'শ্রীগৌরাঙ্গ' যাত্রাভিনয় এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ছাত্রদের গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি।

১৯—২০ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় ছাত্র, যুবক ও সাধারণ প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়েকটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সভায় বিষয়গুলি উপস্থাপনা করেন অধ্যাপিকা সুজাতা রাহা, অজিত পতি, অসীম মুখোপাধ্যায় এবং হর্ষ দত্ত। সভাগুলিতে পর্যবেক্ষক ছিলেন ব্রজমোহন মজুমদার, সুদীপ বসু, অধ্যাপিকা মীনাক্ষী সিংহ, অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী সুপর্ণানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং ডঃ নিমাইসাধন বসু।

২০ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ। বিভিন্ন দিনে সভায় বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন ডঃ নিমাইসাধন বসু, প্রফুল্লকুমার রায়, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, বিমলকুমার ঘোষ, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণ সরকার, অমিত ঘোষ এবং অসীম দত্ত।

পরলোকে

শ্রীমা সারদাদেবীর আশ্রিতা **শান্তিময়ী ঘোষ** গত ৩০ নভেম্বর '৯০ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুরানব্বই বছর। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহিভক্ত হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর নিবাসী নবগোপাল ঘোষের খুড়তুতো ভাই প্রয়াত আশুতোষ ঘোষের পত্নী। তাঁর পিতৃগৃহ ছিল বেলুড়ে। মাত্র দশ বছর বয়সে শ্রীশ্রীমা তাঁকে কৃপা করেছিলেন। তাঁর 'শান্তিময়ী' নামও শ্রীশ্রীমা-ই দিয়েছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর ৯১তম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় (পৃঃ ২১৮) শ্রীশ্রীমা প্রমুখ সম্পর্কে তাঁর একটি স্মৃতি-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বর্ধমান জেলার শাকারী গ্রাম নিবাসী **দীনেশচন্দ্র মজুমদার** গত ২৮ নভেম্বর '৯০ পরলোক গমন করেন। তিনি উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **শান্তিলতা দেবী** গত ২৪ নভেম্বর '৯০ আসানসোলের ৮৪ নং নেতাজী সুভাষ রোডস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাশি বছর।

চিনি না দিয়ে মিষ্টি করার রাসায়নিক দ্রব্য

কৃত্রিম মিষ্টতাকারক দ্রব্যগুলি যে নিরাপদ এবং শর্করার বিকল্প—এই সংবাদ কিভাবে প্রচার করা যায়, তা আলোচনার জন্য ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে কৃত্রিম মিষ্টতাকারক (sweetner) ব্যবহারকারী ব্রাশেলস শহরে মিলিত হয়েছিলেন। ইণ্টারন্যাশনাল সুইটনার্স অ্যাসোসিয়েশন (আই. এস. এ) এই আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। মূল বক্তব্যটি পেশ করেছিলেন কোকাকোলা কোম্পানীর ইউরোপীয় শাখার ডাইরেক্টর। মিটিং-এ যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে, মিষ্টতাকারী ব্যবসায়ীরা লোকচক্ষে তাদের ভাবমূর্তি সম্বন্ধে কতটা উদ্বিগ্ন। ব্যবসায়ের প্রতিনিধিরা স্বীকার করলেন যে, এই মিষ্টতাকারী দ্রব্যগুলি যে খুব ক্ষতিকারক, এই ধরনের দাবি ওঠায় জনসাধারণ খুব উদ্বিগ্ন। কোন কোন কোম্পানী বিভ্রান্ত—মিষ্টতাকারী দ্রব্যগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নয়, তাদের ওপর জটিল নিয়মকানুনের বন্ধনীর জন্য। এই ব্যবসায়ীরা ও দ্রব্যগুলি যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁরা আরো বিভ্রান্ত হবেন যখন একমাসের মধ্যে ইউরোপীয় কমিশন ফতোয়া জারি করবেন যার ফলে ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে আরো বেশি সংখ্যায় মিষ্টতাকারী দ্রব্যগুলি বাজারে আসবে।

ব্রিটেনে চারটি অনুমোদিত ক্যালরি-বিহীন মিষ্টতাকারক দ্রব্য হলো—স্যাকারিন, অ্যাসপার্টেম (নিউট্রাসুইট), এসিসালফেম-কে এবং থমেটিন। সাইক্লামেট নামক দ্রব্যটি ইউরোপের অধিকাংশ দেশে অনুমোদিত হলেও, ব্রিটেন ও ইউনাইটেড স্টেটস-এ অনুমোদিত নয়। আমেরিকায় ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষোক্ত দ্রব্যটি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে, ইঁদুরের শরীরে টিউমার সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে। পরে অবশ্য এই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। ব্রিটেনের এক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, দ্রব্যটি যেভাবে ইঁদুরের শরীরে টিউমার সৃষ্টি করে, তা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডাল্টারেশন থেকে বলা হয়েছে যে, সাইক্লামেটে ক্যান্সার হয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি ঐ দেশের অনুমোদন পায়নি।

কয়েকটি মিষ্টতাকারক দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

স্যাকারিন—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত, চিনির চেয়ে ৩০০গুণ বেশি মিষ্টি, খাওয়ার পরে একটু তিক্ততা বোধ আসে।

অ্যাসপার্টেম—চিনির চেয়ে ২০০গুণ বেশি মিষ্টি এবং খাওয়ার পরে কোন খারাপ স্বাদ আসে না। উচ্চ তাপে এর ক্রিয়া নষ্ট হয় বলে পাঁউরুটির কারখানায় ব্যবহৃত হয় না।

এসিসালফেম-কে—চিনির চেয়ে ৩০০গুণ বেশি মিষ্টি ; কোমল পানীয় (soft drinks), পুডিং ও অন্যান্য মিষ্টান্নে ব্যবহৃত হয়।

থমেটিন—ব্রিটেনে এক শতাংশের কম লোক এটি ব্যবহার করে। চুইংগাম, জ্যাম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাজারে আসতে পারে :

সাইক্লামেটস—চিনির চেয়ে ৩০ গুণ বেশি মিষ্টি, নানা খাবার ও পানীয়তে ব্যবহৃত হয়। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে।

এখন মিষ্টতাকারক দ্রব্যগুলির বাজারে বিক্রয় বাড়ছে—আমেরিকাতে বছরে ১৫ শতাংশ হারে এবং ব্রিটেনে ১০ শতাংশ হারে। 'কৃষি, মৎস্য ও খাদ্য' মন্ত্রকালয় মনে করে যে, ব্রিটেনে অ্যাসপার্টেম ও এসিসালফেম-কে-এর ব্যবহার বেড়ে চলবে। এদের

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, নতুন মিষ্টতাকারক-দ্রব্যগুলির স্বাদ যে স্যাকারিনের চেয়ে ভাল, এইটাই এদের বাজার দখল করার কারণ নয়। নতুন নতুন লোক এগুলি ব্যবহার করছে; শুধু ডায়াবেটিস রোগীরাই নয়, নানা কোমল পানীয় (soft drinks), বা অ-মদ্য পানীয়, দই, আলু-স্যালাড, instant soup প্রভৃতিতে এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার প্রচুর বেড়ে গেছে। অ্যাসপার্টেমের ফিনিল অ্যালানিন অংশটুকুর মস্তিষ্কের ওপর বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া নিয়ে নানা বাকবিতণ্ডা হয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, খুব বেশি পরিমাণে না থাকলে ফিনিল অ্যালানাইন মস্তিষ্কের কোন ক্ষতি করে না।

লোকে কত পরিমাণে মিষ্টতাকারক দ্রব্যগুলি খাচ্ছে, এ-সম্বন্ধে সম্প্রতি হিসাব-নিকাশ হয়েছে। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে আই. এস. এস.-এর হিসাবে পাওয়া গেছে যে, ব্রিটেনে ৬১ শতাংশ লোক এই সব দ্রব্য খেয়েছে, পশ্চিম জার্মানীতে খেয়েছে ৩৬ শতাংশ লোক। এই হিসাবে বলা হয়েছে যে, এক পঞ্চমাংশ জনসাধারণ অ্যাসপার্টেম খেয়েছে। তবে এই সব কৃত্রিম মিষ্টতাকারক দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ার জন্য শর্করার ব্যবহার কমেনি। সুইজারল্যাণ্ডের নেশলস রিসার্চ সেণ্টার জানাচ্ছে যে, ব্রিটেনে ব্যবহৃত চিনিজাত ও চকোলেটজাত দ্রব্যের কিলো-ক্যালরি ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে জনপ্রতি ১৩৬ ছিল, সেটা ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে বেড়ে ১৭০ হয়েছে। বাজারে যেসব নতুন নতুন মিষ্টতাকারক দ্রব্য আসবে তারা আরো বেশি উত্তাপেও তাদের মিষ্টতা হারাবে না; এর ফলে পাউরুটি, বিস্কুট এবং শস্যজাত প্রাতরাশের খাবারে এদের ব্যবহার বেড়েই চলবে। শীঘ্রই যেসব মিষ্টতাকারক দ্রব্য বাজারে আসছে, তাদের একটি হলো ফাইজার কোম্পানীর অ্যালিটেম, যেটি 'টাটে অ্যাণ্ড লিলে' এবং 'জনসন অ্যাণ্ড জনসন' কোম্পানীর সুক্রালোজ জাতীয়। সুক্রালোজের মিষ্টতা চিনির চেয়ে ৬০০ গুণ বেশি। খাদ্য প্রস্তুতকারকগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ মিষ্টতাকারক দ্রব্য তৈরি করছে, যেগুলি পরে বাজারে আত্মপ্রকাশ করবে। তবে যে যাই করুক, সকলকেই 'ইউরোপিয়ান কমিশনস সায়েন্টিফিক কমিটি ফর ফুড'-এর আইন মেনে চলতে হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এক কিলোগ্রাম আইসক্রিম-এ ৪০০ মিলিগ্রাম অ্যাসপার্টেম দিতে পারবে এবং এক লিটার কোমল পানীয়তে ৬০০ মিলিগ্রাম অ্যাসপার্টেম দিতে পারবে। তবে মজা হচ্ছে, দুটি মিষ্টতাকারক মিশালে তাদের প্রত্যেকের পরিমাণ কি হবে, (যেমন স্যাকারিন ও অ্যাসপার্টেম একত্রে) সে-সম্বন্ধে আইনে কিছু বলা নেই। অন্যদিকে আবার এব্যাপারে উপরিউক্ত সায়েন্টিফিক কমিটিই শুধু হিসাব বাতলে দেবে তা নয়; ব্রিটেনে কমিটি অন টক্সিসিটি, ফুড অ্যাডভাইসারি কমিটির মাধ্যমে সরকারকে তাদের মতামত জানিয়ে দেয়। অর্থাৎ ইউরোপিয়ান কমিটি ছাড়া নানারকম জাতীয় কমিটি আছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা মুশকিলে পড়েন। উদাহরণ হিসাবে—গত আগস্ট মাসে ব্রিটেন দৈনিক স্যাকারিনের ব্যবহার (অ্যাকসেপ্টেবল ডেলি ইনটেক, বা এ. ডি. আই) শরীরে কিলোগ্রাম প্রতি ২.৫ মিলিগ্রাম থেকে বাড়িয়ে ৫ মিলিগ্রাম করেছে। এটা কিন্তু উপরোক্ত ইউরোপীয় সায়েন্টিফিক কমিটির পরিমাণের দু-গুণ। এদিকে খাদ্যমন্ত্রী কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের বেশি স্যাকারিন ব্যবহার সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন। স্যাকারিনের এ. ডি. আই ২.৫ মিলিগ্রাম স্থিরীকৃত হয়েছিল ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে।

মিষ্টতাকারক দ্রব্য ব্যবহারের নিয়মকানুন সম্বন্ধে বিভিন্ন কোম্পানীর বিভ্রান্তির যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্বোক্ত ইউরোপীয় কমিটি ও বিভিন্ন জাতীয় কমিটি ছাড়া আর একটি প্রভাবশালী জয়েন্ট এক্সপার্ট কমিটি অন ফুড অ্যাডিটিভস (জে. ই. সি. এফ. এ) আছে। সেটি ফুড অ্যাণ্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। এর একজন বিশেষজ্ঞ রন ওয়াকার বলেন, সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অধিক স্যাকারিন খাওয়ার জন্যই পুরুষের মূত্রস্থলীতে যে বেশি ক্যান্সার হয়, সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পুরুষ-ইঁদুরের মূত্রস্থলীতে যে ক্যান্সার পাওয়া গিয়েছিল, তাতে স্যাকারিনই যে একমাত্র দায়ী, তাও না হতে পারে।

[New Scientist, 22 September, 1990, pp. 28-29]

সূচীপত্র

উদ্বোধন ৯৩তম বর্ষ শ্রাবণ ১৩৯৮

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলংকরণ ও মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধনঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৮ সংখ্যা

☐ নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারের **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য **ঃ চব্বিশ টাকা।**

☐ **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি **আঠারো টাকায়** পাবেন ; **৩১ আগস্ট '৯১**-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে তাঁরা প্রতি কপি **পনেরো টাকায়** পাবেন।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **৩১ আগস্ট '৯১**-এর মধ্যে **সেই সংবাদ** কার্যালয়ে **অবশ্যই** পোঁছানো প্রয়োজন। **৩১ আগস্ট '৯১**-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পোঁছালে পত্রিকা **সাধারণ ডাকেই** যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ **সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে** আমাদের পক্ষে **দ্বিতীয়বার** দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে **রেজেস্ট্রি ডাকেও** আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজেস্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ **সাত টাকা ৩১ আগস্ট** '৯১-এর মধ্যে **কার্যালয়ে পোঁছানো** প্রয়োজন। **ঐ তারিখের পরে** টাকা কার্যালয়ে পোঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের **আগামী বছরের** ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ **ব্যক্তিগতভাবে** যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর** পর্যন্ত কার্যালয় থেকে **আশ্বিন সংখ্যাটি** দেওয়া হবে। গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই **সময়ের মধ্যে** তাঁদের পত্রিকা **অবশ্যই** সংগ্রহ করে নেন।

☐ **ব্যক্তিগতভাবে** অথবা **রেজেস্ট্রিডাকে** সংগ্রহের জন্য **নাম ও গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ একান্ত জরুরী।**

☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত **খোলা** থাকে, রবিবার **বন্ধ**। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকেল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। **৭ অক্টোবর মহালয়া উপলক্ষে এবং ১৫ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত** দুর্গাপূজা **উপলক্ষে** কার্যালয় **বন্ধ থাকবে।**

১ আষাঢ় ১৩৯৮

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন

শ্রাবণ, ১৩৯৮   জুলাই ১৯৯১   ৯৩ তম বর্ষ—৭ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে বারম্বার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম—সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে। অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে জীবনপ্রদ বারির প্রয়োজন, তাহা এখানেই রহিয়াছে।... বিশ্বাস করুন, ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে প্লাবিত করিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

জগতের গুরু ভারত

পাশ্চাত্যের মানুষ ভারতবর্ষের মানুষকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন, ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস নাই। 'ইতিহাস' বলিতে উঁহারা বুঝেন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত। কোন্ সম্রাট কত পরাক্রান্ত ছিলেন, কত রাজ্য বা দেশ তিনি বাহুবলে জয় করিয়াছেন, কত সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন, কত মানুষকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিয়াছেন, পররাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কত ধন-রত্ন ও নারীতে স্বরাজ্য পূর্ণ করিয়াছেন অথবা কোন্ রাজা বা সেনানায়ক কতবার বিজিত হইয়াছেন, কতবার যুদ্ধে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন সেই 'গৌরব' বা 'অগৌরবের' যে লিপিবদ্ধ গাথা, পাশ্চাত্যের বিচারে উহারই নাম 'ইতিহাস'।

একথা সত্য যে, ইতিহাসের ঐ সংজ্ঞা অনুসারে প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। তবে ব্যতিক্রমও যে একেবারেই নাই তাহা নহে। রামায়ণ ও মহাভারতকে প্রাচীন ভারতীয়গণ 'ইতিহাস' নামেই অভিহিত করিতেন। পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতেও রাজারাজড়াদের কাহিনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' এবং বানভট্টের 'হর্ষচরিত' জাতীয় গ্রন্থগুলিতে 'ঐতিহাসিক' উপাদান যথেষ্টই

রহিয়াছে। তবে পাশ্চাত্যে 'ইতিহাস' রচনা যেমন গুরুত্ব সহকারে অনুশীলিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে কখনও সেভাবে হয় নাই এবং কলহন, বানভট্ট প্রমুখের রচনাদি ভারতের ঐ ধারায় ব্যতিক্রমই বলা যায়। রামায়ণ এবং মহাভারত 'ইতিহাস' হিসাবে অভিহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেক্ষেত্রে 'ইতিহাস'-এর পরিধি নিছক রাজারাজড়াদের কীর্তিকাহিনী অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নহে। 'ইতিহাস' বলিতে প্রাচীন ভারতীয়গণ তাহাকেই বুঝিতেন, যাহার মধ্যে থাকিবে একটি মহাকাব্যিক মহিমা, মানব-আদর্শের সমুচ্চ মহিমার ব্যাখ্যান এবং সর্বোপরি মানবের সম্মুখে সর্বজনীন ও সর্বকালীন এক বা একাধিক মহান আদর্শকে উপস্থাপন।

পাশ্চাত্যবাসীরা যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এবং ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাতে ব্যক্তি প্রাধান্য পাইয়াছে, ভারতীয়গণ যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এবং ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাতে ব্যক্তি প্রাধান্য পায় নাই, ব্যক্তি অপেক্ষা প্রাধান্য পাইয়াছে আদর্শ, নীতি এবং ভাব। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্যবাসী এবং ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পার্থক্য শুধু ইতিহাস রচনার পদ্ধতিকেই নহে, উভয় সভ্যতার জীবনাদর্শের মৌলিক পার্থক্য-কেও সূচিত করে। ভাল অথবা মন্দ—ফল যাহাই হউক না কেন ভারতবর্ষ কখনই ব্যক্তিকে আদর্শ, নীতি ও ভাব অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দান করে নাই। যাহার ফলে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সাহিত্য বলিয়া স্বীকৃত বৈদিক সাহিত্যে আমরা বেদমন্ত্রগুলির রচয়িতাদের বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের নাম প্রায়ই পাই না। সেকারণে বেদকে বলা হয় 'অপৌরুষেয়'—কোন ব্যক্তি তাহার স্রষ্টা বা প্রণেতা নহেন। বেদ যাহার ভিত্তি বলিয়া কথিত সেই সনাতন ধর্মও—যাহাকে আধুনিক কালে "হিন্দুধর্ম" বলিয়া অভিহিত করা হয়—একইভাবে অপৌরুষেয়। কোন বা কয়েকজন ব্যক্তি ইহার প্রবর্তক বা নির্মাতা নহেন। এমন কাহারও নাম কেহ বলিতে পারিবে না যিনি সনাতন ধর্মের আদি স্রষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। পৃথিবীর সকল ধর্মেরই একজন প্রবর্তক বা আদিস্রষ্টা রহিয়াছেন। যেমন বৌদ্ধধর্মের বুদ্ধ, জৈনধর্মের ঋষভদেব (এবং সর্বশেষ ও সর্বপ্রসিদ্ধ আচার্য মহাবীর), খ্রীস্টধর্মের যীশুখ্রীস্ট, ইসলামধর্মের মহম্মদ, জরথুস্ট্রীয় ধর্মের জরথুস্ট্র, ইহুদীধর্মের মোজেস এবং শিখধর্মের নানক। ইঁহাদের জীবন এবং বাণীর উপরেই সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলি দাঁড়াইয়া আছে। ইঁহাদের বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলি অস্তিত্বহীন হইয়া যায়। হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে—কেহ জানে না। কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, ব্যাস, শঙ্করাচার্য প্রমুখ হিন্দুধর্মের বহুপ্রসিদ্ধ আচার্য মাত্র, উঁহাদের কেহই উহার প্রবর্তক বা স্থাপয়িতা নহেন। 'হিন্দু-ধর্ম" নামক সনাতন ধর্মের প্রসিদ্ধ অভিধাটির সহিতও উঁহাদের কাহারও পরিচয় ছিল না। আচার্য শঙ্করেরও কয়েক শতাব্দী পর উহা সনাতন ধর্ম সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে শুরু করিয়াছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ মুসলমান শাসনে আসিবার পর এবং প্রধানতঃ ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠার পর হইতে সনাতন ধর্মকে হিন্দুধর্ম নামে চিহ্নিত করা শুরু হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সনাতন ধর্মের হিন্দুধর্মে নামান্তর গ্রহণ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের কোন তথ্য-নিষ্ঠ বিবরণ জানিবার আজ আর কোন উপায় নাই। অথচ সনাতন ধর্মের এই ইতিহাসটি জানা খুবই জরুরী নিঃসন্দেহে।

সে যাহা হউক, পাশ্চাত্যবাসীরা যে ভারতীয়-গণকে ইতিহাস প্রণয়নে অক্ষম বলিয়া অবজ্ঞা করেন তাহাতে কিন্তু তাঁহারা প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের জীবনাদর্শের মূল বৈশিষ্ট্য বা মহিমাকেই স্বীকৃতি দান করেন। সেই বৈশিষ্ট্য বা মহিমা হইল ভারত-বর্ষের নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক-গণ যে ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন বা পরবর্তী কালে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে যেসব ইতিহাস-প্রণেতা ইতিহাস প্রণয়নে পাশ্চাত্যের পারদর্শিতা বা অগ্রগণ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নাম আজ কয়জন সাধারণ পাশ্চাত্যবাসী জানেন? উঁহাদের আজ স্থান হইয়াছে পরবর্তী কালের ইতিহাসগ্রন্থের পৃষ্ঠায়, উঁহারা পাশ্চাত্যের গণ-মানুষের হৃদয়ে কোন স্থান পান নাই। ফলে, যদি মহাকালের নিয়মে কোন দিন ইতিহাসগ্রন্থগুলির বিলুপ্তি ঘটে তাহা হইলে উঁহারাও চিরতরে বিস্মৃত হইবেন। তখন পাশ্চাত্যের আর 'ইতিহাস' লইয়া গর্ব করিবার কিছু থাকিবে না। পক্ষান্তরে, ভারত-বর্ষের ক্ষেত্রে মহাকালকেও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি লোপ পাইতে পারে, কিন্তু যে আদর্শ, যে নীতি, যে ভাব উহাদের দ্বারা এবং ভারতের অগণিত অজানিত (কয়জন ঋষি বা আচার্যের নামই বা

আমরা জানি?) আচার্যগণের মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছে তাহা পুরুষানুক্রমে সংস্কাররূপে ভারত-বাসীর রক্তের মধ্যে, ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। উহাদের মৃত্যু নাই, উহাদের অবলুপ্তি বিধাতারও অসাধ্য।

ভারতবর্ষের এই যে নৈর্ব্যক্তিকতা—ইহার উৎস কি? ইহার উৎস ভারত স্বয়ং। বিধাতা মনে হয় ভারতকে বিশ্বের সকল ভূখণ্ড অপেক্ষা অনুপম বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়া পৃথকভাবে নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যটি হইল ভারতের অপার্থিবতা। বিশ্বের সকল সভ্যতা, সকল দেশ যেখানে ঐহিকতাকে বড় করিয়া দেখে, ভারত সেক্ষেত্রে পারমার্থিকতাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে চাহে। সেই পারমার্থিকতা কি? তাহা হইল এই: মানুষ দেহ, মন, বুদ্ধি সমন্বিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণি-মাত্রই নহে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ দিব্যত্ব। মানুষ 'মানুষ' নহে, মানুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব—মানুষ স্বরূপতঃ ঈশ্বর। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন: "কী দেশ।...দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যাকিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা রক্ষা করিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্ম-মৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মারূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সেই সবকিছুরই পুণ্যভূমি।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪)

এই উপলব্ধি ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ দুইটি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে: ত্যাগ এবং প্রেম। উপনিষদের ঋষিগণ নিজেদের অপরোক্ষ উপলব্ধিতে জানিয়া-ছিলেন—জগৎ অনিত্য, জীবন অনিত্য, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সম্পদ-দারিদ্র্য সব অনিত্য। সুতরাং লোভ অপরাধ, ভোগলোলুপতা নির্বুদ্ধিতা। আত্ম-তৃপ্তিতে নহে, আত্মব্যাপ্তিতেই সুখ। এই সংসার অনিত্য, নিত্য শুধু ঈশ্বর যিনি এই বিশ্বসংসারের প্রতিটি বস্তুতে, প্রতিটি জীবে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। বিশ্বের সর্ববস্তুর, সর্বজীবের তিনি সমষ্টিস্বরূপ। সেই পরমনিত্যকে অন্তরাত্মারূপে উপলব্ধিই হইল মানবজীবনের চরিতার্থতা। ব্যষ্টি এবং সমষ্টির এই সম্পর্ক সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বন্ধনের প্রেরণা যোগাইয়াছে। ভারতীয় ঋষিগণ উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক জীবের প্রতিটি স্পন্দন তাঁহাদের আপন নাড়ীর স্পন্দন। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ তাঁহাদের পরম আত্মীয়, ভ্রাতা অথবা ভগ্নী—সকলেই এক পরিবারের সদস্য—"যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ম্"—বিশ্ব যেখানে একটি আবাসে পরিণত (তৈত্তিরীয়, আরণ্যক, ১০।১।৩)। এই প্রেমের উপলব্ধি হইতেই বৈদিক ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল সহিষ্ণুতার সেই মহাবাণী: "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"।

মানবাত্মার দিব্যত্ব, আত্মত্যাগ, আত্মবিস্তার এবং সহিষ্ণুতার এই আদর্শই ভারতবর্ষের শাশ্বত আদর্শ। সহস্র বিপর্যয়, নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থান-পতনের মধ্যেও ভারতবর্ষ সেই আদর্শকে কখনও বর্জন করে নাই এবং জগৎকে চিরকাল সে সেই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছে। দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্নদান মহৎ কর্ম, মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান-দান মহত্তর কর্ম, কিন্তু আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ধর্মদান মহত্তম কর্ম। জড়বাদী পাশ্চাত্য প্রথমটি এবং বড় জোর দ্বিতীয়টি পর্যন্ত সমাধান করিয়া থামিয়াছে; ভারতবর্ষ পারুক না পারুক প্রথমটির সমস্যা সমাধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, দ্বিতীয়টির উপর অধিকতর গুরুত্ব দান করিয়াছে, কিন্তু সে জীবনপণ করিয়াছে শেষেরটির সমাধানে। দেহ বা মন কাহাকেও সে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করে নাই, কিন্তু উহাদের চাহিদার নিবৃত্তিকেই জীবনের লক্ষ্য ভাবিতে সে চাহে নাই। তাহার লক্ষ্য সর্বোপরি আত্মার চাহিদার নিবৃত্তি। এই হিসাবে জগতে ভারতবর্ষ অনন্য, অদ্বিতীয়। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিতেছেন: "জাতির পর জাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং বাসনার জগতে থাকিয়া জগৎ-রহস্য সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা সকলেই ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাচীন জাতিসমূহ (সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক) ক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে জাত অসাধুতা ও দুর্দশার চাপে বিলুপ্ত হইয়াছে, —নূতন জাতিসমূহ পতনোন্মুখ। শান্তি অথবা যুদ্ধ, সহনশীলতা অথবা অসহিষ্ণুতা, সততা অথবা খলতা, বুদ্ধিবল অথবা বাহুবল, আধ্যাত্মিকতা অথবা ঐহিকতা—এগুলির মধ্যে কোনটির জয় হইবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা [অন্যত্র] এখনও বাকি।

"বহুযুগ পূর্বে আমরা [ভারতবর্ষে] এ সমস্যার সমাধান করিয়াছি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া সেই সমাধান অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছি, শেষ অবধি ইহাই ধরিয়া রাখিতে চাই। আমাদের সমাধান—ত্যাগ, অপার্থিবতা।

"সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবনসাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬)

ভারতবর্ষ সেই আদর্শ হইতে যে বিচ্যুত হয় নাই, তাহা উহার নিজের জন্যই নহে—জগতের জন্যও। জগৎব্যাপী কোলাহল ও বিশৃংখলার মধ্যে ভারতবর্ষই শুধু বিশ্বের জীবনপ্রদীপে তৈল যোগাইয়া চলিয়াছে। সমগ্র জগৎ ভোগের পিছনে ছুটিতেছে, যে-জীবন অনিত্য তাহাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেছে, যাহা পরিণামে দুঃখদায়ক সেই জীবনতৃষ্ণাকে সাগ্রহে অবলম্বন করিতেছে। আপাত সুখ, আপাত শান্তি এবং আপাত তৃপ্তি জগতের কর্ম ও চিন্তাকে, স্বপ্ন ও সাধনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শুধু ভারতই জগৎকে স্থায়ী সমৃদ্ধি ও শাশ্বত শান্তির সন্ধান দিবার জন্য ভোগের পথকে আশ্রয় করে নাই। সেকারণে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, ভারত বাঁচিয়া আছে জগতের জন্য। 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' কবিতায় স্বামীজী বলিতেছেন ঃ

"তব তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
তব মৃত্যু নাহি কদাচন।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

"ভারত কি মরিয়া যাইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; চরিত্রের মহান আদর্শসকল বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ভাবুকতা বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবী-রূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ সে পূজার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা তাহার বলি।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬২)

ভারতবর্ষ মরিবে না। ভারতবর্ষ অমর। জড়ের জগতে চৈতন্যের বার্তা প্রচার করিবার জন্য সে দৈবনির্দিষ্ট। ভারত জগতের পথপ্রদর্শক। প্রশ্ন হইতে পারে, বর্তমানে ভারতবর্ষ নিজেই তো তাহার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে হারাইতে বসিয়াছে, আধ্যাত্মিক উচ্চ মূল্যবোধের অভাবনীয় অবক্ষয় ভারতের সর্ব-ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইতেছে। সেক্ষেত্রে সে জগতের আচার্যের ভূমিকা কিভাবে লইবে? বর্তমানে ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম-মানসিকতার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য, যে অস্থিরতা, যে অবক্ষয় আমরা দেখিতেছি, উহা সাময়িক। প্রাচীন ঋষিদের ভারত, সন্ত-সাধক-গণের ভারত, যুগাবতারগণের ভারত কখনও মরিয়া যাইতে পারে না। শীঘ্রই সূর্যোদয় হইবে, এখন শুধু প্রভাতের অপেক্ষা। উহার জন্য আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে আমরা সুসংবদ্ধ করিব। আমাদের উহা করিতেই হইবে। ভারতের ইতিহাসে এরূপ সংকট পূর্বেও আসিয়াছে। তখনও আমাদের ভিতর হইতে শক্তি জাগ্রত হইয়াছে, ভারত আবার তাহার চিরায়ত পথে চলিয়াছে এবং জগৎকে পথ দেখাইয়াছে। এই চলা এবং এই পথপ্রদর্শন রণবাদ্য বাজাইয়া বা সৈন্যবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হয় নাই। ভারতবর্ষ বারম্বার বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও পররাজ্য আক্রমণ করে নাই। তবুও সে বহির্ভারতকে অধিকার করিয়াছিল। সেই অধিকার তাহার চিন্তার দ্বারা, আদর্শের দ্বারা, তাহার আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা। বস্তুতঃ, ভারতের পদ্ধতিই হইল আধ্যাত্মিক, তাহার কার্যপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য হইল নীরবতা। স্বামীজী বলিতেছেন ঃ "ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম কুসুমগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬)

সেই শাশ্বত ভারত আজ আবার পৃথিবীকে পথ দেখাইবে। তাহার গৈরিক পতাকাতলে জগতের মানুষকে সমবেত হইতে হইবে। ইহাই ভারতের ভূমিকা। ইহাই ভারতের ইতিহাস। স্বামীজী বলিতেছেন ঃ "আমি নিশ্চিত জানি, লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যেক সভ্য দেশে সেই বাণীর জন্য অপেক্ষ-মাণ, যে-বাণী আধুনিক যুগের অর্থোপাসনা যে ঘৃণ্য বস্তুবাদের নরকাভিমুখে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬)

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৪ ॥

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই উদ্দ ..ীন শান্ত আলমবাজার মঠ-জীবনে অনুভূত হচ্ছিল পরিবর্তনের হাওয়া। তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শে সন্ন্যাসি-সংস্থা সংগঠন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে। সাথে এনেছিলেন পাশ্চাত্যদেশে অর্জিত কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা। তাঁকে এদেশে অনুসরণ করেছিলেন সাত-আটজন বেদান্ত-অনুরাগী ইংরেজ ও আমেরিকান। এর ফলে, দশ বছর ধরে যে-ধারায় মঠ চলেছিল সে-ধারা পরিবর্তিত হয়েছিল, মঠবাসিগণের জীবনে চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। সন্ন্যাস-জীবনের লক্ষ্য ও উপায় সম্বন্ধে নতুন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। মঠে যদিও নবাগতদের জীবন নিয়মিত করবার জন্য বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হয়েছিল, স্বাভাবিক কারণে তার অধিকাংশ প্রযুক্ত হয়েছিল সকলের জন্য। মঠবাসিগণের দৈনন্দিন জীবন একটা নির্দিষ্ট সময়সূচীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মঠের পরিচালনব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সবল করা হয়েছিল। এসকল পরিবর্তনাদি নবীনগণ সাদরে বরণ করেছিলেন, প্রবীণদের অধিকাংশই চেষ্টা করেছিলেন নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে, আবার কেউ বা সন্দেহ করছিলেন যে, ঐসকল পরিবর্তনাদি পাশ্চাত্য-ভাবনার দ্বারা পুষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার বিরোধী। স্বামী শিবানন্দ 'হিমালয়ে চিরপ্রস্থানের' সংকল্প করেন; স্বামী অদ্ভুতানন্দ মঠ-ত্যাগের কথা ভাবেন। নেতা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদুগুণে ও তাঁর বলিষ্ঠ ভাবনা দিয়ে গুরুভাইদের মন জয় করেন। প্রতিবাদ স্তিমিত হয়, প্রতিরোধের প্রাচীর ভেঙে পড়ে।

নীলাম্বরবাবুর বাগানে মঠ-জীবন গড়ে উঠেছিল আলমবাজার মঠের শেষ বছরটির আদলে। মঠের নিয়মাবলীতে আরো কিছু নিয়মকানুন সংযোজিত হয়েছিল। নিয়মশৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যা এতদিন ঠাকুরঘরের মধ্যে সীমিত ছিল, তা সম্প্রসারিত হয়েছিল মঠ-জীবনের বিভিন্ন পাদে। সমষ্টির স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সামগ্রিক কল্যাণ গুরুত্ব পেয়েছিল। পানীয় জলের অপ্রতুলতা, মশার উৎপাত, ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক প্রায় অপ্রতিরোধ্য একটি সমস্যার আকার ধারণ করেছিল। মঠবাসিগণের অসুখ-বিসুখে দেখাশুনা করতেন বরানগরের ডাঃ মতিলাল ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ মজুমদার। আর রোগের বাড়াবাড়ি হলে ডাকা হতো কাশীপুর নর্থ সুবারবন হাসপাতালের ডাঃ এম. এন. মুখার্জীকে।

পরিবর্তিত মঠ-জীবনের আবহটি বুঝতে সাহায্য করবে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠির অংশ। তিনি লিখেছিলেনঃ "নতুন মঠে নদীতীরে বাস করিতে হওয়ায় এবং যে-পরিমাণ বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে অভ্যস্ত না থাকায় এখানে ছেলেরা অনেকটা হয়রান হইয়া পড়িতেছে। সারদা দিনাজপুর হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া আসিয়াছে।...হরিরও একটু হইয়াছিল।...এখন আমাদের কিছু কিছু ভাল আসবাব হইয়াছে—ভাবো দেখি, সেই পুরানো মঠের চাটাই ছাড়িয়া সুন্দর টেবিল, চেয়ার ও তিনখানি খাট পাওয়া কত উন্নতি।"[৪৩]

৪৩ স্বামী বিবেকানন্দ : পত্রাবলী, ১৯৭৭, পৃঃ ৬২২-৬২৩

মঠবাসিগণের দৈনন্দিন কর্মসূচী ছিল আলমবাজার মঠের শেষ বছরের কর্মসূচীর প্রায় অনুবৃত্তি। সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ, প্রাতে ও সন্ধ্যায় একঘণ্টা করে জপ-ধ্যান এবং প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন ও নৈশ-ভোজনের ঘণ্টা সকলের জন্যই উদ্দিষ্ট ছিল। সকালে জপ-ধ্যানের পর ধারাবাহিকভাবে এক-একজন এক-একদিন স্তব পাঠ করতেন। তারপর নবীনেরা 'ডেল সার্ট' (Del Sarte) নামক শরীরচর্চা করতেন। মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের পর স্বাধ্যায় নবীনদের জন্য ছিল বাধ্যতামূলক। সন্ধ্যারতির পর নিয়মিত জপ-ধ্যান হতো, তারপর বসত প্রশ্নোত্তরের আসর, সকল মঠবাসী তো বটেই, অতিথিগণও সময় সময় এতে যোগদান করতেন। ঠাকুরঘরে নিত্যপূজা করতেন স্বামী প্রেমানন্দ এবং তার অনুপস্থিতিতে[৪৪] স্বামী বিরজানন্দ প্রমুখ নবীনেরা। রান্নাঘরের পরিচালনা, বাজার করা, ঘরদোর ও প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অতিথি-সংকার ইত্যাদির দায়িত্ব বহন করতেন নবীনেরা। তাঁদের বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন মুখ্যতঃ স্বামী সারদানন্দ, কখনো-বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ। মঠের তহবিল, হিসাবপত্র, জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয় দেখাশুনা করতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। নতুন জমির উন্নয়ন সাধন ও চাষবাসের দায়িত্ব ছিল স্বামী অদ্বৈতানন্দের ওপর। আর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (তখনো তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি) ব্যস্ত ছিলেন নতুন জমিতে ঘরবাড়ি তৈরির কাজে। এই কালে কয়েকজন বেতনভোগী কর্মী নিযুক্ত হয়েছিল। পাচকের নাম ছিল কৃপা। মালী ছিল প্রথমে গোপী, পরে জয়রাম।

নিত্যপূজিত 'শ্রীশ্রী' তথা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো মঠ-জীবন। দীর্ঘ এগারো বছর ধরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিষ্ঠা-কাষ্ঠার পূজা ও সেবা ছিল যেমন নয়নাভিরাম তেমনি প্রেরণা-প্রদ। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী বোধানন্দ লিখেছেন: "শশী মহারাজের সেবা দেখিলে মনে হইত ঠাকুর যেন সশরীরে সর্বদাই তাঁহার সমক্ষে বিরাজমান হইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেছেন।"[৪৫] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে চলে যাওয়ার পর থেকেই আচারানুষ্ঠান একটু-আধটু সংক্ষিপ্তকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এর কারণ হিসাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, নতুন পূজারী স্বামী প্রেমানন্দের স্বাস্থ্য তেমন পটু ছিল না।[৪৬] নীলাম্বরবাবুর বাগানে মঠ স্থানান্তরের পর অবস্থার পরিবর্তন এবং স্বামীজীর অভিমত অনুযায়ী আচার-অনুষ্ঠানের কাট-ছাঁট করা হয়। এবিষয়ের উল্লেখ করে স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পূর্বোক্ত চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমরা পূজার কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছি। তোমার 'ক্লীং-ফট্', ঝাঁজ ও ঘণ্টার যেভাবে কাটছাঁট করা হইয়াছে, তাহাতে তুমি মূর্ছা যাইবে। জন্মতিথি-পূজা শুধু দিনের বেলায় হইয়াছে এবং রাত্রে সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে।" এ-জাতীয় সকল পরিবর্তনের মধ্যে পাশ্চাত্যদেশ-ফেরৎ স্বামীজী ও স্বামী সারদানন্দের উদার মনোভাবের প্রভাব সুস্পষ্ট এবং এসকল পরিবর্তনাদি প্রভাবিত করেছিল নবীনগণের মানসিকতা ও আচার-ব্যবহারকে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-পরিচালিত সন্ধ্যারতি ছিল একটি দেখবার জিনিস—যেমন ভাবৈশ্বর্যপূর্ণ, তেমনি প্রেরণাপ্রদ। কিন্তু তিনি দক্ষিণদেশে চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যারতির জাঁকজমক অনেকটা কমে যায়। ঠাকুরের জন্মতিথির দিন স্বামীজী তাঁর নব-রচিত 'খণ্ডন-ভববন্ধন জগবন্দন' আরাত্রিক ভজনটি চালু করেছিলেন। একালের স্মৃতিচারণ করে স্বামী শিবানন্দ পরবর্তী কালে বলেছিলেন: "স্বামীজী নিজে 'খণ্ডন-ভববন্ধন' এই স্তবটি রচনা করলেন, তাতে সুর দিলেন এবং সকলকে নিয়ে গাইতে শুরু করলেন। তিনি নিজেই পাখোয়াজ বাজিয়ে গান

৪৪ আলোচ্যকালের অধিকাংশ সময়ই স্বামী প্রেমানন্দ মঠের বাইরে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি ৪ এপ্রিল ১৮৯৮ তারিখে কেদারনাথের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন এবং মঠে ফিরে এসেছিলেন ১০ ডিসেম্বর।

৪৫ উদ্বোধন, ৫২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, পৃঃ ৫৭৫

৪৬ স্বামী প্রেমানন্দ ৯মে, ১৮৯৭ তারিখের একটি চিঠিতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন: "ভাই, ঠাকুরপূজা বড় কঠিন কাজ দেখিতেছি।"

গাইতেন। সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! একে তো তাঁর ভৈরবের মতন দিব্যকান্তি শরীর; তার উপর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে যখন গাইতেন, সে যে কি ব্যাপার তা আর কি বলব!"[৪৭] অতঃপর সন্ধ্যারতির সময় গান, স্তব-স্তোত্র ইত্যাদির ক্রম নিয়ে কিছুটা এলোমেলো ভাব দেখা দিয়েছিল। ৩০ জুলাই মঠবাসিগণের একটি সভাতে আলোচনার পর এবিষয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, স্বামীজী এবছর নভেম্বর মাসেই 'ওঁ হ্রীং ঋতং' ইত্যাদি স্তবটি রচনা করেছিলেন[৪৮] এবং তা সন্ধ্যারতিতে সংযোজিত হয়েছিল। বরানগর মঠে সন্ধ্যারতির অন্যতম আকর্ষণ ছিল মঠবাসিগণের তাল-লয়-সংযুক্ত নৃত্য। আলমবাজার মঠের শেষের দিকে এই নৃত্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে সন্ধ্যারতির নৃত্য পুনরায় প্রবর্তিত হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে স্বামীজী লিখে জানান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকেঃ "ভাল কথা, আমরা এখানে আবার আমাদের নাচের ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছি। হরি, সারদা ও স্বয়ং আমাকে ওয়ালট্জ (waltz) নৃত্য করিতে দেখিলে তুমি আনন্দে ভরপুর হইতে। আমি নিজে অবাক হইয়া যাই যে, আমরা কিরূপে টাল সামলাইয়া রাখি।"

মঠবাসিগণের অনেকেরই নব-প্রবর্তিত সময়-সূচীর সঙ্গে ধাতস্থ হতে সময় লাগে। প্রাচীনদের কেউ কেউ তা মেনে নিতেই পারেন না। এই সময়-সূচী অনুযায়ীভোর চারটায় উঠে সকলকে ধ্যান করতে:হতো। ঘণ্টা বাজিয়ে সকলের ঘুম ভাঙানো হতো। এনিয়ম স্বামী অদ্ভুতানন্দ মেনে নিতে পারেননি। তিনি মঠ ত্যাগের সংকল্প করেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেনঃ "তুমি ওদেশ থেকে এসেছো, কতো নতুন নিয়ম করছো, হামনে ওসব মানতে পারবে না। হামার মন এখনও এমন ঘড়ি-ধরা হয়নি যে, তুমি ঘণ্টা বাজাবে আর হামার মন অমনি ধ্যেনে বসে যাবে? ধ্যেনে মন কখন বসবে তা কে জানে?..."[৪৯] স্বামীজী তাঁকে এই নিয়ম থেকে মুক্ত করে দেন। নিয়ম করা হয়েছিল, ভোরে ঘণ্টা বাজলে যে বিছানা থেকে উঠবে না তাকে মাধুকরী করে খেতে হবে। নিয়মভঙ্গকারী ব্যক্তি তাঁর কোন গুরুভ্রাতা হলে স্বামীজী কর্তৃত্বের ক্ষমতা না দেখিয়ে সুকৌশলে অবস্থার সামাল দিতেন, কিন্তু মঠের নিয়মকানুন পালনের বিষয়ে তিনি ছিলেন কঠোর। স্বামী অখণ্ডানন্দ কথিত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। একদিন রাত্রি-ভোজনের পর বেদান্ত-আলোচনা জমে উঠেছিল। মানবাত্মার অধোগতি হয় কিনা? পুনর্জন্ম আছে কিনা? এসব আলোচনা হতে থাকে। স্বামীজী মধ্যস্থ হয়ে মাঝে মাঝে হাসছেন, কখনো-বা দুর্বল পক্ষকে নতুন নতুন যুক্তি দিয়ে উসকে দিচ্ছেন। রাত দুটোর পর তিনি আলোচনা ভেঙে দিলেন। সবাই নিশ্চিন্তমনে ঘুমুতে গেলেন। কিন্তু চারটা বাজতে না বাজতেই স্বামীজী স্বামী অখণ্ডানন্দকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললেন ঘণ্টা বাজাতে। স্বামী অখণ্ডানন্দ পরিশ্রান্ত মঠবাসিগণের পক্ষ নিয়ে দুটো কথা বলতেই স্বামীজী কঠোর স্বরে বলে ওঠেনঃ "কি? দুটোর সময় শুয়েছে বলে ছটার সময় উঠতে হবে নাকি? দাও আমাকে, আমিই ঘণ্টা দিচ্ছি। আমি থাকতেই এই, ঘুমোবার জন্য মঠ হলো না কি?" স্বামী অখণ্ডানন্দ কি আর করেন, স্বামীজীর আদেশ পালন করেন। সবাই ধড়মড় করে উঠে ঘণ্টাবাদককে দু-কথা শোনাবার জন্য এগিয়ে গিয়ে দেখে বাদকের পিছনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং স্বামীজী মুচকি মুচকি হাসছেন। তখন সবাই চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানা ছেড়ে ওঠে।[৫০] মঠের নিয়ম-পালনের ব্যাপারে স্বামীজী প্রয়োজনবোধে তাঁর গুরুভাইদের ওপরেও কঠোর হতেন। কিন্তু সে-কঠোরতার পশ্চাতে ছিল গুরুভাইদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। তাঁর প্রতি গুরুভাইদেরও কিরূপ বিশুদ্ধ ভালবাসার মনোভাব গড়ে উঠেছিল তার কিছুটা আভাস স্বামী প্রেমানন্দের ২৩ জুন ১৯১৪ তারিখের চিঠির এই অংশ থেকে পাওয়া যাবেঃ "শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রচারের জন্য ঐশ্বর্যভাব থাকলেও আমাদের কাছে [তিনি] কেবল মাধুর্যময় ছিলেন।

৪৭ শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭

৪৮ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩

৪৯ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, ১ম সং, পৃঃ ৩৪০

৫০ স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ, ১৯৭৬, পৃঃ ৫০-৫১

আহা কি সুন্দর!" তিনি চাইতেন তাঁর গুরুভ্রাতাগণ হবেন মঠজীবনের আদর্শপুরুষ, নবাগতদের প্রেরণাস্থল। সেকারণে গুরুভাইদের কারও প্রত্যাশিত আচরণ থেকে কোনরকম বিচ্যুতি দেখলে স্বামীজী অধৈর্য হয়ে পড়তেন।

॥ ৫ ॥

এককালে সন্ন্যাসজীবনে সঙ্ঘের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর সংশয় ছিল। কিন্তু নানা দেশ ঘুরে তাঁর ধারণা হয়েছিল সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। আলমবাজারের মঠ-জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য স্বামীজী আমেরিকা থেকে নানা পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্বদেশে ফিরে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মঠ-পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মাবলী তৈরি করে দিয়েছিলেন। নিয়ম রচনার পূর্বে তিনি ভূমিকা করে বলেছিলেন: "নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কুনিয়ম রয়েছে—সুনিয়মের দ্বারা সেই কুনিয়মগুলি দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে—যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।" দার্জিলিং যাবার আগেই নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে বসে স্বামীজী আর এক প্রস্থ নিয়মাবলী রচনা করেন। এই দুই প্রস্থ নিয়মাবলী একত্র করে গড়ে ওঠে 'বেলুড় মঠের নিয়মাবলী'। তাতে বলা হয়েছে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমন্বয়ে মঠবাসিগণের চরিত্রগঠন করাই উদ্দেশ্য। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের ক্লাসে নিয়মাবলী বারংবার পাঠ ও আলোচনা করা হয়।

স্বামীজীর উপস্থিতিতে নিয়মাবলী অনুযায়ী মঠ সুন্দরভাবে পরিচালিত হতো। তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হতো স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের ওপর। আলোচ্যকালে স্বামী প্রেমানন্দ দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ নতুন জমি ও বাড়িঘর তৈরির তদারকিতে ব্যস্ত থাকতেন। ফলতঃ মঠ-পরিচালনার অধিকাংশ দায়িত্ব বহন করতেন স্বামী সারদানন্দ। স্বামীজী ১১ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখে মরী থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন: "শরতের উপর তাঁর (মিসেস বুলের) একান্ত বিশ্বাস। শরতের পরামর্শ নিয়ে মঠের সকল কাজ করো, যা হয় করো।" সেকারণে দেখা যায় নিবেদিতা প্রমুখ অনেকেই তাঁদের কথাবার্তায় ও চিঠিপত্রে স্বামী সারদানন্দকে উল্লেখ করতেন 'Swami II' বলে।[৫১] বলা নিষ্প্রয়োজন, 'Swami I' স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।

যদিও শ্রীম তাঁর ১মে ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন: "The Math has been placed under strict discipline and the brothers are doing good work." নথিভুক্ত স্বল্প তথ্যাদি দেখে মনে হয়, মঠ-পরিচালনায় কিছুটা ঢিলেঢালা ভাব এসে গিয়েছিল। পরিচালন-ব্যবস্থা অধিকতর সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে স্বামী সারদানন্দ ১৭মে সন্ধ্যায় সাধু-ব্রহ্মচারিগণের একটি সভা ডাকেন। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অতঃপর মঠের দৈনন্দিন সকল কর্মসূচী নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী নিষ্ঠার সহিত পালিত হবে। মঠের বিভিন্ন কাজকর্মের দায়িত্ব নবীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। সমাপ্তি মন্তব্যে স্বামী সারদানন্দ বলেন, প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার মানসিকতা পরিহার করে প্রত্যেককেই প্রয়োজনমতো অপরকে সাহায্য করতে হবে। মতানৈক্যসকল সমাধান করতে হবে সুস্থির আলোচনার মাধ্যমে। আর নিয়মকানুনের খুঁটিনাটির ওপর জোর না দিয়ে হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিসকল বিকাশসাধন লক্ষ্য হবে।

স্বামীজী নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীদের দেখিয়ে বলতেন: "ওদেরও একটু স্বাধীনতা থাকা চাই, ওদেরও দায়িত্ববোধ হওয়া চাই। না হলে এরপরে বড় বড় কাজ করবে কি করে?" স্বাধীন চিন্তাভাবনার বাতাবরণেই অন্তর্নিহিত শক্তির সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব। তরুণ মঠবাসিগণকে নিয়ে গঠন করা হলো একটি সমিতি। সমিতির নাম দেওয়া হয় 'Brothers' Union'। তাতে অধিকাংশের মতানুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া

৫১ একটা উদাহরণ তুলে ধরা যাক। নিবেদিতা লিখেছেন:
"Yesterday Swami II [Swami Saradananda] turned up at last. So we shall soon have the King's merching order." (Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 130)

হতো। খুব সম্ভবতঃ আলমবাজার মঠে প্রবর্তিত প্রতি সন্ন্যাসীর দুটি ও প্রতি ব্রহ্মচারীর একটি ভোটের পদ্ধতি এখানেও চালু ছিল। প্রতি মাসে একজন সভাপতি নির্বাচিত হতেন। যেমন সেপ্টেম্বর মাসে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন স্বামী প্রকাশানন্দ, নভেম্বরে ব্রহ্মচারী হরিপদ। ইউনিয়নের সদস্যগণ প্রতিমাসের শেষে সকালে বা সন্ধ্যায় পরবর্তী মাসের জন্য সমিতির কর্মকর্তাদের নির্বাচন ও কর্মসূচী আলোচনার জন্য মিলিত হতেন। উপরন্তু তাঁরা মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের পর মাঝে মাঝে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হতেন। ৩০ জুলাই সকালে অনুষ্ঠিত সমিতির সভায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রত্যেক সদস্যের প্রতিবেদন এবং প্রস্তাবাদি সাগ্রহে শোনেন এবং সর্বসম্মত কয়েকটি উপনীতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সঙ্ঘজীবনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বনাম আজ্ঞাবহতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ১৭ মার্চ সান্ধ্য আসরে একদিন আলোচনা হয়। স্বামী প্রকাশানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী শিবানন্দ বলেছিলেনঃ "The highest independence lies in implicit obedience. The main (true) independence comes from the independence of the ties of desire. This is achieved by thorough obedience to the orders of superiors." আজ্ঞাবহতার নীতি পালন করেও স্বাধীনতার ভাব আয়ত্তীকরণ হয় মঠবাসিগণের অন্যতম সাধন।

উপরোক্ত যে-ধারাতে মঠ পরিচালিত হচ্ছিল তার পশ্চাতে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের কিছু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তিনি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১ আগস্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেনঃ "হাজারই theoretical knowledge থাকুক—হাতে-হেতড়ে না করলে কোনও বিষয়ে শেখা যায় না। Election, টাকা-কড়ির হিসাব এবং discussion-এর জন্য বারংবার আমি বলি, যাতে সকলে কাজের জন্য তৈয়ার হয়ে থাকে। একজন মরে গেলে অমনি একজন (দশজন, if necessary) should be ready to take it up। দ্বিতীয় কথা—মানুষের interest না থাকলে কেউ খাটে না; সকলকে দেখানো উচিত যে, everyone has a share in the work and property, and a voice in the management—এই বেলা থেকে। Alternately, প্রত্যেককেই responsible position দেবে with an eye to watch and control, তবে লোক তৈয়ার হয় for business। এমন machine-টি খাড়া কর যে, আপনা-আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে।"[৫২] স্বামীজীর এই ভাবনার আলোকে মঠ-প্রশাসনের কাঠামো গড়ে ওঠে।

শুধু তা-ই নয়। স্বামীজী এইকালে মঠের সাপ্তাহিক কার্য-বিবরণী বিশ্লেষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১১ জুলাই ১৮৯৮ তিনি লিখেছিলেনঃ "এখন মনে হচ্ছে—মঠে একসঙ্গে অন্ততঃ তিনজন করে মোহান্ত নির্বাচন করলে ভাল হয়; একজন বৈষয়িক ব্যাপার চালাবেন, একজন আধ্যাত্মিক দিক দেখবেন, আর একজন জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষাবিভাগের উপযুক্ত পরিচালক পাওয়াই দেখছি কঠিন। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ অনায়াসে অপর দুটি বিভাগের ভার নিতে পারেন।"

মঠ-প্রশাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মঠের আর্থিক সঙ্গতি ও অর্থের হিসাব-নিকাশ রাখার প্রশ্ন। এই সময়কার মঠের আর্থিক অবস্থা বরানগর মঠের দুরবস্থা বা আলমবাজার মঠের অভাব-অনটনের দিনগুলির চেয়ে নিঃসন্দেহে ভাল ছিল। মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, মিসেস ওলি বুল মঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক হাজার ডলার দান করেছিলেন। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী অনুসারে নতুন জমিতে মঠবাড়ি তৈরি ও মঠ-পরিচালনার জন্য তাঁর প্রদত্ত দানের পরিমাণ ছিল একলক্ষ টাকা। তিনি যেসময়ে এই অর্থ দান করেছিলেন তা থেকে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানে অবস্থিত মঠ অবিলম্বে কোন উপকারলাভ করেনি। খেতড়ি-রাজ অজিত সিং প্রদত্ত মাসিক একশো টাকার অনুদান মঠের একমাত্র নিয়মিত আয় ছিল। সেকারণে মঠ-পরিচালনার জন্য এবং লক্ষ্মী-দিদি, কিরণশশী প্রমুখকে নিয়মিত অর্থসাহায্যের জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। মঠের

৫২ পত্রাবলী, পৃঃ ৬৩৭-৬৩৮

জন্য বিপিন জামাই, গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি অল্প-স্বল্প অর্থসাহায্য করতেন। 'ফেমিন রিলিফ ফান্ড', 'বিল্ডিং ফান্ড' থেকে অথবা রাঙ্গমোহন মোদক, শরৎ সরকার প্রমুখ মঠের বন্ধুজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ অতি কষ্টে মঠের খরচপত্র মেটাতেন। আলোচ্য সময়ের অন্তেই দেখছি স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে লিখেছেন: "অর্থাভাবই হচ্ছে প্রধান অসুবিধা।" স্বাভাবিক কারণেই আর্থিক অনটন মঠ-জীবনে কৃচ্ছ্রতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল।

জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের সঠিক হিসাব রাখা সম্বন্ধে স্বামীজী ছিলেন খুবই সচেতন। লন্ডন থেকে ১০ আগস্ট ১৮৯৯ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী লিখেছিলেন: "লোকে টাকা দিলেই একদিন না একদিন হিসাব চায়—এই দস্তুর। প্রতিপদে সেটি তৈয়ার না থাকা বড়ই অন্যায়।" অপর একটি চিঠিতে স্বামীজী দিয়েছিলেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ এপ্রিলের চিঠি। তিনি দার্জিলিং থেকে লিখেছিলেন: "রামকৃষ্ণ মিশনের একটি anniversary meeting করা উচিত এবং মঠেরও একটা হওয়া উচিত। তাহাতে দুই জায়গায়ই famine relief-এর হিসাব submit করিতে হইবে এবং famine relief-এর হিসাবটা publish করিতে হইবে।" ইতোপূর্বে আলমোড়া থেকে ১১ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "আমরা চাই, যতদূর সম্ভব অল্প-খরচে যত বেশি সম্ভব স্থায়ী সংকার্যের প্রতিষ্ঠা।" বলা বাহুল্য, স্বামীজী যে-ছক বেঁধে দিয়েছিলেন যথাসম্ভব তদনুযায়ী মঠ-মিশনের কাজকর্ম পরিচালিত এবং টাকা-পয়সার হিসাবপত্র রাখা হতে থাকে।

একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে সকলের সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত মঠ মঠবাসিগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। আজ প্রায় একশো বছর তফাতে তদানীন্তন ঘটনাবলী আলোচনা করলে এটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মূল আদর্শ থেকে সন্ন্যাসিগণের বিচ্যুতির আশঙ্কা নেহাৎই অমূলক ছিল। সন্ন্যাসের শাশ্বত আদর্শের মূল ভাবগুলি আশ্রয় করেই সন্ন্যাসিগণের মঠ-মিশন পরিচালিত হচ্ছিল। বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে গিয়ে আদর্শের নতুন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল। মঠবাসিগণের ঐকমত্য করবার জন্য মূল আদর্শসকল পুনঃপুনঃ আলোচিত হচ্ছিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীমা ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে ছিলেন। সেসময় বাগানবাড়ির চেহারা।
শিল্পী: বিমল সেন

নিবন্ধ

ভারত-সভ্যতা

সন্তোষকুমার অধিকারী

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

উত্তরে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে আরব সাগর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগর—এই পরিবেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে যে বিরাট ভূখণ্ড, আয়তনের বিশালতায় যা একটি উপমহাদেশ হিসাবে গণ্য, সেই ভারতভূমি জুড়ে কোন্ স্মরণাতীতকালে গড়ে উঠেছে যে মহান ও সুবিস্তৃত এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সেই ভারত-সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি কালের প্রবাহকে অতিক্রম করে আজও জীবিত। এর মধ্যে অনেক দেশ ও সংস্কৃতির উত্থান-পতন ঘটেছে। রাজনৈতিক পরিবেশে ভারতবর্ষও বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত হয়েছে। তবুও ভারত-সভ্যতার বিনাশ ঘটেনি।

'ভারত-সভ্যতা' বলতে আমরা একশো বছর আগে বুঝতাম আর্যসভ্যতাকে। কিন্তু এই আর্যসভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতর[১] এবং সমৃদ্ধ এক সভ্যতার—পণ্ডিতরা যার নাম দিয়েছেন 'সিন্ধুসভ্যতা' বা 'ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন'—আবিষ্কার হওয়ার পর ভারত-সভ্যতার সংজ্ঞা পালটেছে। সিন্ধু-সভ্যতার, যাকে দ্রাবিড়সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে, উজ্জ্বল নিদর্শন মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলে এক বিরাট সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গেই তুলনীয়।

ঐতিহাসিকদের মতে সিন্ধুসভ্যতার চরম উৎকর্ষ ঘটেছিল খ্রীস্ট-জন্মের তিনহাজার বছর আগে।[২] একথা মেনে নিয়ে বলা যায় যে, সিন্ধু-সভ্যতাকে এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছাতে অন্ততঃ আরো একহাজার বছর অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। এই সভ্যতাই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা, সেকথা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। নগর-কেন্দ্রিক এই সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে উন্নত পথ ও পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার ও বাসগৃহ নির্মাণের অপূর্ব কৌশল এবং সুশৃঙ্খল নগর-পরিচালনা পদ্ধতিতে। পোড়ামাটির পুতুল ও তৈজসপত্র দ্রাবিড়দের আগে কেউ ব্যবহার করেছে বলে জানা যায় না। দ্রাবিড়গণ শিল্পবোধে, স্থাপত্যে এবং ধর্মচেতনায় নিঃসন্দেহে ভারত-সভ্যতাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতারূপে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা নগর গড়ে তুলেছিলেন, মূর্তি বানিয়েছিলেন এবং বাণিজ্যপোত নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তবুও সিন্ধুসভ্যতা একদিন আকস্মিকভাবেই ধ্বংস হয়ে গেল সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগে। আর তার পাশাপাশি, কিংবা বলা যায়, সিন্ধুসভ্যতার সমাধিবেদি থেকে যেন জেগে উঠল নবীনতর আর একটি সভ্যতা, যাকে আর্যসভ্যতা বলে জেনেছি এবং যা আজও বর্তমান।

১ অবশ্য ঐতিহাসিক এ. ডি. পুশলকার লিখেছেন ঃ
"Unless universally accepted decipherment of the Indus script furnishes some definite clue, the priority of the Indus Valley Civilization to the Rig-Veda cannot be said to have been definitely established." (Preface to the Cultural Heritage of India, Vol I, 1958, p. XLVii)

২ নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ১৯৭১, ২২ নভেম্বর বিশেষ সংখ্যায় এ. বি. কীথ লিখেছেন ঃ "প্রাচীন ভারতবর্ষ সর্বাঙ্গীণ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল আজ থেকে পাঁচহাজার বছর আগে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তার সমান কেউ ছিল না।"

দ্রাবিড়সভ্যতা যেমন পুরোপুরি নগরকেন্দ্রিক ছিল, আর্যসভ্যতা তেমনি আরণ্যক পরিবেশকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছিল। অরণ্যে, আশ্রমে বসেই লেখা হয়েছে আর্যসভ্যতার উৎস ও ধারক বৈদিক সাহিত্য—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। জনৈক বিশেষজ্ঞ লিখেছেন: "The Rig-Vedic Aryans lived a pastoral and agricultural life, scattered about in small villages; the people of the Indus Valley lived a highly organised life in thickly populated cities."৩ (ঋগ্বেদের আর্যগণ ছিলেন পশুপালক এবং কৃষিজীবী। এখানে-ওখানে ছড়ানো ছোট ছোট গ্রামে তাঁরা বাস করতেন। সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীরা খুবই সংঘবদ্ধভাবে থাকতেন, থাকতেন ঘনবসতিপূর্ণ নগরে।)

আর্যসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে বেদকে ঘিরে। ঋগ্বেদই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ—এবিষয়ে এখন আর মতভেদ নেই। কিন্তু যে-যুগে বেদের সৃষ্টি, সে-যুগে লিখন-পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। ঋগ্বেদের প্রথম ১০২৮টি শ্লোক লিখিত ছিল না, কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে আবৃত্তি এবং স্মৃতির মাধ্যমে ধরে রাখা হয়েছিল। তিলক নাক্ষত্রিক গণনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শতপথ ব্রাহ্মণের রচনা অন্ততঃ সাড়ে চারহাজার বছর আগে হয়েছে। 'ব্রাহ্মণ'-এর আগে রচিত হয়েছে 'সংহিতা'। যাঁদের দ্বারা এই মন্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল, তাঁদের চিন্তাতেও নিশ্চয়ই দীর্ঘদিনের অনুশীলন ছিল। তাই একথা ভাবা অসঙ্গত নয় যে, পাঁচহাজার বছর আগে প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে দ্রাবিড়সভ্যতা ও আর্য-সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলিতে এমন অনেক জিনিস পাওয়া গিয়েছে, যা আর্যসভ্যতাপ্রসূত বলে মনে করা হয়।

ভারতভূমির আদিমতম মানুষদের মধ্যে 'অস্ট্রিক' জাতীয় মানুষেরই যে প্রাধান্য ছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ নেই। কলিঙ্গ, বঙ্গদেশ, বর্মা, মালয়, ইন্দোচীন, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই অস্ট্রিকরাই আদিবাসী। সাঁওতাল, কোল, ভীল, ওঁরাও, শবর, নাগ, কিরাত প্রভৃতি অস্ট্রিক, অস্ট্রোলয়েড ও অস্ট্রোএশিয়াটিক মানুষেরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন বোর্নিয়ো, মলাক্কাস, তাসমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। এঁরা চাষের কাজ জানতেন, গাছ ও জীবজন্তুর মধ্যে ঈশ্বরকে কল্পনা করে পুজো করতেন। এঁদের কাছ থেকেই হয়তো হিন্দুধর্মে এসেছে সর্পদেবতা, বরাহ অবতার বা নরসিংহ অবতার ইত্যাদি।

অনেক উন্নত চিন্তাধারা নিয়ে অস্ট্রিক মানবগোষ্ঠীর পাশাপাশি জেগে উঠেছিল দ্রাবিড় সমাজ। দ্রাবিড়রা মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করতেন, জগদ্ধাত্রী মাতৃমূর্তির কল্পনা তাঁদেরই। যিনি জগদ্ধাত্রী, তিনিই জগৎ-প্রসবিত্রী—পার্বতী, উমা বা অম্বিকা। এই দ্রাবিড়-সভ্যতা আত্মসাৎ করেছিল অস্ট্রিকদের ধর্মচেতনা ও সংস্কৃতিকে। বট, অশ্বত্থ ও তুলসী গাছের পুজোর পাশাপাশি লিঙ্গ ও যোনিপুজো, কালী ও শিবের উপাসনা আর্যসমাজে এসেছে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-সভ্যতার পথ বেয়েই। কিভাবে, কবে যে একই নদীস্রোতে এসে মিশেছে আর্য, দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক (বা অনার্য) সংস্কৃতি, ইতিহাস তার হিসাব রাখেনি।

মননশীলতা ও ধর্মচেতনায় আর্যরা অনেক উন্নত ও পরিশীলিত ছিলেন। দ্রাবিড়সভ্যতার যখন মধ্যাহ্নকাল, যখন তারা নগর উন্নয়ন এবং বাণিজ্যের প্রসারে ব্যস্ত, তখন আর্যরা বনান্তরালে আশ্রমে বসে ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনায় মগ্ন। গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার) থেকে পাঞ্জাব অবধি বিস্তৃত ভূভাগে আর্যসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। আর্যদের বৃত্তি ছিল মূলতঃ পশুচারণ; অশ্বারোহণে তাঁরা দক্ষ ছিলেন। আর্যরা লৌহাস্ত্র ব্যবহার করতে শিখে-ছিলেন, দ্রাবিড়রা যা শেখেননি।

কে জানে, কবে কিভাবে আর্য, অনার্য ও দ্রাবিড়-দের মধ্যে মিলন ঘটেছিল। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেন, আর্যরা মহেঞ্জোদাড়ো আক্রমণ করে ধ্বংস করেছিলেন; কিন্তু রবার্ট হাইন গেলন্ডার্ন বলেছেন যে, দ্রাবিড় বা সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস হয় কোন প্রাকৃতিক

৩ 'Indus Valley Civilization'—Madho Sarup Vats, The Cultural Heritage of India, Vol. I, p. 127

দুর্যোগে।[৪] আর্যরা অনার্য বা দ্রাবিড়দের কোনভাবেই বিনষ্ট করতে চাননি, বরং অনার্য, দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক সংস্কৃতিকে তাঁরা গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেছেন। আর্য-দ্রাবিড়-অস্ট্রিক সংস্কৃতি চেতনার স্রোতে পরবর্তী কালে আরো অনেক সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটেছে। ভারতবর্ষের গৌরব—ভারতভূমি বহু মানুষ ও বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ভূমি।

॥ ২ ॥

আর্যরা কোথা থেকে এল

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় কোন ভারতীয় অগ্রণী হয়নি। এবিষয়ে প্রচলিত মতবাদ অনুসারে আর্যরা বহিরাগত। কেউ বলেন, আর্যরা এসেছেন মধ্য এশিয়া থেকে, কেউ বা যুক্তি দেন—তাঁরা ইউরোপ থেকে একই সঙ্গে গ্রীস, সুমেরু ও ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েন। এই মতবাদের উদ্গাতা ম্যাক্সমুলার মূলতঃ জার্মান হলেও তরুণ বয়স থেকেই আজীবন ইংল্যান্ডবাসী।[৫] এঁদের যুক্তি অনুমান সাপেক্ষ; কোন তথ্য প্রমাণ এঁরা কেউ দেননি। অথচ ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এই অনুমান-নির্ভর বক্তব্যকে ঐতিহাসিক তথ্যরূপে গ্রহণ করেছেন।

ম্যাক্সমুলার, জোন্স ও ফ্র্যান্জ বপ, মর্টিমার হুইলার প্রমুখের অনুমান ভাষার ভিত্তিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উইলিয়াম জোন্স প্রথম বলেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাগুলির মধ্যে শব্দবিন্যাস ও ব্যাকরণের পদ্ধতিতে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাতে একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, এই তিনটি ভাষারই উৎস এক। ভাষাতত্ত্বের বিচারে বিশেষজ্ঞ বপ বলেন, ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি ভাষা বিভিন্ন পরিবেশে এবং সময়ের ব্যবধানে বদলে গেলেও, তারা যে একটি সাধারণ উৎস থেকে এসেছে একথা অনুমান করা যায়। ইউরোপের এই ভাষাগোষ্ঠীতে পড়ে গ্রীক, ইটালিয়ান, জার্মান, কেলটিক ইত্যাদি; এশিয়ার ভাষাগোষ্ঠীতে ধরা হয়েছে স্লাভিক, সংস্কৃত ও অবেস্তা (বা ইরানীয়) ভাষাগুলিকে।

একটি সাধারণ উৎস থেকে ভাষাগুলি প্রবাহিত—এই অনুমান-সাপেক্ষ সিদ্ধান্তের ওপরে ম্যাক্সমুলার লিখলেন সংস্কৃতভাষী আর্যরা এসেছে মধ্য ইউরোপের কোন অঞ্চল থেকে। কোন্ অঞ্চল থেকে বা কবে —তা কেউ বলেননি। কোন নির্দিষ্ট তথ্যও এর সপক্ষে নেই। কিন্তু এই উক্তিকে অনেকে মেনে নেওয়ায় ধারণা হয়েছে যে, আর্যরা কোন এক সময়ে ইউরোপ থেকে গান্ধার বা কান্দাহার হয়ে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

ম্যাক্সমুলারের এই অনুমান-নির্ভর মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন: "ঐ যে ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেছেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরে কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন—ওসব আহাম্মকের কথা··· কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে কোথায় দেখেছ যে আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে?"[৬] স্বামীজীর কথার প্রতিধ্বনি পাই এ. ডি. পুশলকারের লেখায়: "According to the traditional history as recorded in the Puranas, India itself is the home of the Aryans and it was from here that they expanded in different directions to various countries of the world." (পুরাণে লিপিবদ্ধ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারতই হলো আর্যদের মূল ভূমি এবং এখান থেকেই নানা দিকে এবং পৃথিবীর নানা দেশে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন।)[৭] ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন: "Discussion concerning the original seat or home of the Aryans is omitted purposely, because no

৪ Man, October, 1956

৫ ব্রিটিশপদানত ভারতকে উচ্চতর গৌরবের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করলে ইংরেজ অহমিকা আহত হবে, আজীবন ব্রিটিশ বেতনভোগী এবং ইংল্যান্ডবাসী ম্যাক্সমুলার এবিষয়ে সম্ভবতঃ সচেতন ছিলেন।

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ২১০

৭ The Cultural Heritage of India, Vol. 1, p. 144.

hypothesis on the subject seems to be finally established." (আর্যদের মূল ভূখণ্ড বা নিবাস কোথায় ছিল এই আলোচনা উদ্দেশ্যমূলক-ভাবেই উহ্য রাখা হয়, কারণ সম্ভবতঃ এপর্যন্ত ঐ সম্পর্কে কোন অনুমানই সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।)[৮]

ঋগ্বেদের সূক্তগুলি যদি সাড়ে চারহাজার থেকে পাঁচহাজার বছর আগে লেখা হয়ে থাকে, তাহলে দ্রাবিড়সভ্যতার সমসাময়িক সেই আর্যচেতনায় এই আর্যাবর্ত বা ভারতভূমির রূপই পুরোপুরি উদ্ভাসিত। বাইরের কোন দেশের কোন উল্লেখ কোথাও নেই। তাঁদের স্মৃতিতে কোনভাবেই, কোন চিহ্নই থাকবে না সেই দেশ ও সমাজের যেখান থেকে তাঁরা এসেছেন,—তাও কি সম্ভব? অন্যদিকে ইউরোপের কোন্ স্থানে এই ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠীর জন্মস্থান খুঁজে বার করার কোন চেষ্টা সফল হয়নি।

প্রাচীন পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে বেদ রচিত হয়েছিল আর্যদের হাতে ব্রহ্মাবর্ত ভূমিতে। সরস্বতী এবং তার শাখানদীগুলির অববাহিকায় এই ব্রহ্মাবর্ত। আর্যদের এই বাসভূমির নাম ছিল 'সপ্তসিন্ধু'। অবেস্তায় বলা হয়েছে, 'হপ্তহিন্দু'ই হলো আর্যদের বাসভূমি। এই সপ্তসিন্ধু হলো বর্তমান পাঞ্জাব।[৯]

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি

ভারতসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতি-চেতনার সম্মিলন ও সমন্বয়ে। বিচ্ছিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এই সুদৃঢ় ঐক্যের ভিত্তি কেমন করে গড়ে উঠল, তার ইতিহাস কৌতূহলজনক।

দ্রাবিড়সভ্যতার সমাধিস্তূপ থেকেই বিকীর্ণ হয়েছে আর্যসভ্যতা ও ধর্মের দিগ্বিজয়ী রূপ। আর্যরা বিজিত দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের (বা অনার্যদের) ধ্বংস করার চেষ্টা করেননি। দ্রাবিড় শিল্পকলা, স্থাপত্যও একসময়ে আর্য-সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আর্যধর্মে দেবতারূপে বিভাসিত প্রাকৃতিক মহাশক্তিগুলিকে সূর্য, চন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মরুৎ ইত্যাদি নাম দিয়ে তেত্রিশজন দেবতার কল্পনা করেছেন আর্যরা। মূর্তিপূজার কোন রীতি ছিল না আর্যদের মধ্যে; হোমাগ্নিতে তাঁরা পূজার উপচার উৎসর্গ করতেন। আগেই বলা হয়েছে, দ্রাবিড়রা ছিলেন মূর্তি-পূজক। সৃষ্টিরূপিণী জননীকে তাঁরা জগজ্জননী বলে জেনেছেন। সৃষ্টির প্রতীকরূপে যোনি ও লিঙ্গ-পূজা প্রাধান্য পেয়েছিল দ্রাবিড়-রীতিতে।

আর্যরা অনার্য (যাঁরা আর্য নন) নারীকে বিয়ে করেছেন। মহাভারতে অনুলোম বিবাহের অগণিত উদাহরণ পাওয়া যাবে। অনার্য পত্নীর সঙ্গে অনার্য দেবতা ও সংস্কার প্রবেশ করেছে আর্য-সমাজে; এসেছে মূর্তিপূজা, লিঙ্গপূজা। বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মহেশ্বরের পাশে, গড়ে উঠেছে ত্রিমূর্তি। বিষ্ণুর পাশে এসেছেন লক্ষ্মী, ব্রহ্মার পাশে সাবিত্রী এবং মহাদেবের সঙ্গে দুর্গা, চণ্ডী ও কালী। আর্য ও অনার্যের সম্মিলনে গড়ে উঠেছে এক নতুন ধর্মচেতনা, পরবর্তী কালে মুসলমান ও ইংরেজ আমলে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বলে। আর্যধর্ম নয়, দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক ধর্ম নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ধর্মচেতনা—হিন্দুধর্ম। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ লিখছেন: "The most essential fundamental Indian unity rests upon the fact that the diverse people of India have developed a peculiar type of culture or civilization utterly different from any other type in the world. That civilization may be summed up in the term Hinduism. India primarily is a Hindu country." (ভারতের পরম গভীর ঐক্যের মূলে রয়েছে এই ব্যাপারটি যে, ভারতের বিভিন্ন মানুষ পৃথিবীর অন্য যেকোন সংস্কৃতি ও সভ্যতার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বিচিত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। এই সভ্যতাকে এককথায় বলা যেতে পারে হিন্দুধর্ম। ভারত হলো মূলতঃ হিন্দুরাষ্ট্র।)[১০]

৮ Oxford History of India, London, 4th Edn., 1981, p. 51, Foot note.

৯ 'The Aryan Question'—J. N. Talukdar, The Journal of the Asiatic Society, Vol. XVI. 1974. p. 20

১০ The Oxford History of India, p. 7

রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন ঃ "The transcendental thought of the Aryan by its marriage with the emotional and creative art of the Dravidian, gave birth to an offspring which was neither fully Aryan, nor Dravidian but Hindu". (আর্যদের উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্রাবিড়দের আবেগময় সৃষ্টিমূলক শিল্পভাবনার সঙ্গে মিলনের ফলে যা প্রসূত হলো তা পুরোপুরি আর্যও নয়, নয় পুরোপুরি দ্রাবিড়ও —তা হলো হিন্দু।)[১১]

এখানে 'হিন্দু' কথাটি সাম্প্রদায়িক অর্থে ধরলে কিন্তু ভুল হবে। কারণ, 'হিন্দু' শব্দটির জন্ম হয়েছিল ভৌগোলিক কারণে, তার সঙ্গে জাতিগত তাৎপর্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। 'হিন্দু' বলতে আমরা এখন যা বুঝি তার সমর্থন কোন প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে বা অন্যত্র পাই না, আচার্য শঙ্করও 'হিন্দু' শব্দ কোথাও ব্যবহার করেননি। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ঃ "যে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন কিন্তু তাহার আর সার্থকতা নাই। কারণ, ঐ শব্দের অর্থ— 'যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত'। প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে 'সিন্ধু' শব্দই 'হিন্দু' রূপে পরিণত হয়। তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীরবাসী সকলকেই হিন্দু বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমানশাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।··· বর্তমান কালে সিন্ধুনদের এই দিকে সকলে আর প্রাচীন কালের মতো এক ধর্ম মানেন না। [এবং প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী একটি নির্দিষ্ট ধর্ম পালন করত না।] সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দু বুঝায় না, উহাতে মুসলমান, খ্রীস্টান, জৈন এবং ভারতের অন্যান্য অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে।"[১২] অর্থাৎ 'হিন্দু সংস্কৃতি' বলতে এখন 'ভারতীয় সংস্কৃতিকে'ই বোঝায়। বস্তুতঃ বর্তমান ভারত-সভ্যতা ও ভারত-সংস্কৃতি শুধু আর্য, দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক জাতিদের অবদান নয়, তার সঙ্গে পরবর্তী কালে যুক্ত হয়েছে মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি অন্যান্য গোষ্ঠীর অবদানও। এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে।

॥ ৩ ॥

ভারতের বাইরে ভারত-সংস্কৃতি

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়গুলি একজন ধর্মগুরুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ইতিহাস আমাদের তাই বলে। বৌদ্ধধর্ম যেমন বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে প্রসারিত, খ্রীস্টধর্ম তেমনি খ্রীস্টের কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মুসলমানধর্মের সৃষ্টি সপ্তম খ্রীস্টাব্দে, হজরত মহম্মদ যার স্রষ্টা। কিন্তু হিন্দুধর্ম যেমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আসেনি, তেমনি তার নির্দিষ্ট জন্মক্ষণও নেই।

প্রাচীন ভারতে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্যদের সাংস্কৃতিক সম্মিলনের ফলে এক নতুন ধর্ম ও দার্শনিক চেতনা গড়ে উঠল। তাদের সঙ্গে মিলিত হলো মঙ্গোলয়েড—শক, হূন প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষেরা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "উত্তর ভারতে গঙ্গার উপত্যকায় এই মিশ্রণকার্য ঘটল; আর মিশ্রণের পরে··· ইতিহাসে প্রাচীন ভারতীয় এই ধর্ম আর সংস্কৃতি, ভারতের আর্যভাষা সংস্কৃত যার প্রধান বাহন হলো, সেটি একটি প্রভাবশালী শক্তি হয়ে দাঁড়াল।··· এইরূপে উত্তর ভারতে হিন্দুজাতির আর হিন্দুধর্মের—ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ আর জৈন মতের দর্শনের উদ্ভব হলো।"[১৩] তার পর কি হলো?

"তারপর এই নতুন সভ্যতার ধারা ভারতবর্ষ থেকে বাইরের পথে পা দিল।"[১৪] সে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার ঘটনা। খ্রীস্টের জন্ম তার পাঁচশো বছর এবং হজরত মহম্মদের জন্ম হাজার বছর পরে। কিন্তু এ তো হলো গঙ্গোত্রী থেকে প্রবাহিত, পরিণত ও উন্নত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সম্মিলিত ধারা। ভারত-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে তার অনেক আগে—অন্ততঃ আরও আড়াই হাজার বছর

১১ A Vision of India's History, Visva-Bharati, 1951, p. 32

১২ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৫-১৬

১৩ দ্বীপময় ভারত—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বুক কোম্পানী লিঃ, কলকাতা, ১৯৪০, পৃঃ ১৭৪ ১৪ ঐ

আগে। বৈদিক যুগ পার হয়ে আমাদের পেঁছাতে হবে পৃথিবীর প্রাচীনতম সেই গৌরবময় ইতিহাসের কালে, যা গড়ে উঠেছিল সিন্ধুসভ্যতাকে ঘিরে।

প্রাচীন ভারতের বন্দর ও সমুদ্রপথ

প্রাচীন ভারতবর্ষ সমুদ্রযাত্রায় যে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় তার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রসারে। ঋগ্বেদে (১।৫৬।২) প্রাচীন আর্যদের সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে —ধনার্থী ব্যক্তিরা বা বণিকেরা সমুদ্রের সকলদিকে সঞ্চরণ করে। অধ্যাপক উইলসন ঋগ্বেদের অনুবাদ-গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন: তাঁরা (আর্যরা) সমুদ্রযাত্রায় অভিজ্ঞ ও বাণিজ্যে দক্ষ ছিলেন। সমুদ্র-ভ্রমণ করত যে বণিকরা, ঋগ্বেদে তাদেরকে পণি বলা হয়েছে। শত ক্ষেপণীযুক্ত অর্ণব-পোতের কথাও বলা হয়েছে (১।১১৬।৩)। ভারতের তখন উল্লেখ্য বন্দর ছিল—কেরালায় ত্রিবান্দ্রাম, তামিলনাদে পাণ্ড্য ও কাঞ্চী, অন্ধ্রে বিজয়নগর, বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্ত।

আর্যদের নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা এবং সমুদ্র-পরিক্রমার প্রেরণা এসেছে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকগোষ্ঠীর মানুষদের কাছ থেকে। বৈদিক যুগ আরম্ভের পূর্বেই ছিল সিন্ধুসভ্যতার যুগ। পৃথিবীর প্রাচীনতম এই সভ্যতার ধ্বজা বহন করে পাঁচহাজার বছর আগে ভারতবর্ষের মানুষ সুমেরিয়া, উর, ব্যাবিলন, বাহরিন ও মিশরের পথে গিয়েছে। সিন্ধু-সভ্যতার মানুষদের সঙ্গে সুমেরিয়া, ক্রীট, ইজিপ্ট এবং কাস্পিয়ান উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলির ও ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলির বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ও যোগাযোগ ছিল। উল্লেখ্য বন্দর ছিল সিন্ধুনদের কূলে মহেঞ্জোদাড়ো, আরব-সাগরের কূলে সুটকাজেন ডোর এবং গুজরাটে লোথাল। স্থলপথ ছিল বালুচিস্তান পর্বতমালার গিরিপথে, ডাবরকোট, কোয়েটা ও কান্দাহারে। তক্ষশিলা থেকে পুরুষপুর (বা পেশোয়ার) হয়ে খাইবার গিরিপথ ধরে বালখ (বাহ্লীক বা ব্যাকট্রিয়া) পৌঁছাত ভারতীয় বণিকেরা। এই বালখ থেকে তারা পশু ও চক্রযুক্ত শকটে তাদের বাণিজ্যিক দ্রব্য বয়ে নিয়ে যেত পূর্বদিকে চীন ও মধ্য এশিয়ায় এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী নগরগুলিতে।[১৫]

সভ্যতার আরম্ভ থেকেই সিন্ধু উপত্যকার মানুষের সঙ্গে সুমেরিয়া (অর্থাৎ ইরান, ইরাক, মেসোপটেমিয়া) দেশের মানুষের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ধর্মচেতনা, শিল্পকলা ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধের এই নৈকট্য লক্ষ্য করে কোন কোন ঐতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতাকে ইন্দো-সুমেরিয়ান নামে অভিহিত করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত স্থলপথ এবং সমুদ্রপথ ধরে এই সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।

ভারত ও চীনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল স্থলপথে ও জলপথে—প্রথমটি হলো হিন্দুকুশ গিরিপথ হয়ে ব্যাকট্রিয়ায় এবং তারপর মধ্য এশিয়ার পথে চীনের সিংকিয়াং প্রদেশে। দ্বিতীয় পথটি ছিল আসাম-মণিপুরের পথে উত্তর বর্মা হয়ে দক্ষিণ চীনে প্রবেশ। তৃতীয়টি হলো জলপথ—ভারতমহাসাগর হয়ে মালয় পেনিনসুলা ঘুরে ইন্দোচীন পার হয়ে চীনে।

বাংলায় তাম্রলিপ্ত (তখন সমুদ্রের কূলে ছিল) ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ বন্দর ছিল। ঋগ্বেদের (৭।৮৮।৩) ঋষি বশিষ্ঠের মুখে তাম্রলিপ্ত থেকে চীন যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ততে দুবছর ছিলেন। সেখান থেকে যবদ্বীপ (জাভা) হয়ে তিনি চীনে ফিরে যান।[১৬]

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বাংলার বিজয় সিংহ তাম্রলিপ্ত থেকে সাতটি অর্ণবপোতে তাম্রপর্ণীতে[১৭] পৌঁছান এবং 'সিংহল' রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন বলে লোকপ্রসিদ্ধি।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের পুত্র ও কন্যা—মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা এই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই সিংহলে যান বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য।

১৫ প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭, পৃঃ ১২, ৩১

১৬ Oxford History of India, p. 169

১৭ Ibid., p. 119 ; প্রাচীন সিংহল তাম্রপর্ণী নামে পরিচিত ছিল।

মধ্য প্রাচ্যের সর্বত্রই একসময় হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। সিংহল, মালদ্বীপ ও মাদাগাস্কারে গিয়ে পৌঁছেছে নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ। আগেই বলা হয়েছে যে, সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সিংহলে যান। মহেন্দ্র ও তাঁর অনুচরদের হাতে সিংহলে বৌদ্ধ শিল্পকলার বিকাশ। কিন্তু তাঁদের অনেক আগেই সিংহলে (তখন নাম ছিল তাম্রপর্ণী) গিয়েছিলেন বিজয় সিংহ।

থর হেয়েরডাল তাঁর বইতে লিখেছেন: শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা প্রচলিত কাহিনী ও প্রবাদ সংগ্রহ করে সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৮] তাঁদের সেই সংগ্রহ থেকে জানা যায় যে, আর্য যোদ্ধারা খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সমুদ্রপথে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন।[১৯] এই যোদ্ধৃদলের নেতা ছিলেন বিজয় সিংহ, যিনি নিজেকে সিংহবংশীয় বলেছেন। পিতার সঙ্গে কলহ হওয়ায় বিজয় সাতশ জন অনুচর নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে শ্রীলঙ্কা পৌঁছান এবং পশ্চিম উপকূলে পুত্তলম নামক শহরে ঘাঁটি করেন। বিজয় সিংহের সিংহলে অবতরণের সময় থেকে সেখানে বছর গণনা আরম্ভ হয়। সিংহলের সময়ে এখন ২৫৩৪ সাল (১৯৯১-তে)। অর্থাৎ সিংহবংশীয় এই আর্যরা সিংহলে পৌঁছেছিলেন খ্রীস্টপূর্ব ৫৪৩. অব্দে। সিংহবংশীয়েরা সেখানে পৌঁছাবার আগে সিংহলে বাস করত যক্ষ, নাগ ও রাক্ষসেরা। এই কাহিনী সিংহলের 'মহাবংশ' কাহিনী-পঞ্জীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, সিন্ধু উপত্যকার বাণিজ্যরত মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সুমেরিয়ানদের। ভারত থেকে বণিকরা গিয়ে ক্রীট দ্বীপ, ব্যাবিলন, বাহরিন, উর প্রভৃতি শহরের অধিবাসী হয়ে গিয়েছে এমন অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। "So many Indus seals with Indus pictographs have been excavated archaeologically from ancient Sumeria that Kramer found good reasons to assume that Indus traders were settled more or less permanently in several of the Sumerian cities."[২০] (প্রত্নতাত্ত্বিক খননক্রিয়ায় প্রাচীন সুমেরিয়া থেকে ভারতীয় চিত্রমূর্তি সম্বলিত বহুসংখ্যক শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। এতে কিছু কিছু সুমেরীয় শহরে যে ভারতীয় বণিকগণ মোটামুটি স্থায়িভাবে বসবাস করতেন সে-সম্পর্কে ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে ক্র্যামার মনে করেন।) মেসোপটেমিয়া ও ব্যাবিলনে ভারত থেকে কাঠ যেত, আর যেত মশলা। খ্রীস্টপূর্ব দশম শতকেও আরব বণিকরা ভারতবর্ষ থেকে মূল্যবান পাথর, মুক্তা ও বস্ত্র নিয়ে যেত সিরিয়া ও মিশরে। গ্রীসের সঙ্গেও ভারতবর্ষের যোগাযোগ ঘটেছিল আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের অনেক আগে। সমুদ্রপথে তখন ভারতের বণিকরা আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে পৌঁছেছে। মালদ্বীপপুঞ্জে সেই প্রাচীন কালেই সিন্ধুসভ্যতার ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছিল। তারপর গুজরাট ও সিংহলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মালদ্বীপপুঞ্জের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে বুদ্ধমূর্তি এবং ব্রোঞ্জের বিষ্ণুমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

থর হেয়েরডাল স্পষ্টই লিখেছেন যে, মালদ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন অধিবাসীরা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এসেছিল। তাদের ভাষা 'দিবেহি'তে প্রচুর তামিল শব্দের মিশ্রণ দেখা যায়। মালদ্বীপের মানুষের রীতি-নীতিতেও প্রাচীন আর্য-ভারতের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। জাতকের গল্পগুলি থেকেও পাওয়া যায় যে, গুজরাটের ভারুচ থেকে এই দ্বীপে আসেন সেখানকার এক রানী।[২১]

হেয়েরডাল তাঁর গ্রন্থে জাতকের যে কাহিনীগুলি উদ্ধৃত করেছেন, তার প্রথমটি (২১৩ নম্বর)

১৮ The Maldive Mystery—Adler & Adler, Bethesda, U. S. A., 1986, pp. 242-243

১৯ হেয়েরডাল লিখেছেন, এই সিংহবংশীয় আর্যরা গুজরাটের কাম্বে উপসাগর থেকে যাত্রা করেন। কিন্তু বাংলার প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বিজয় সিংহ সপ্তগ্রামের রাজা সিংহবাহুর পুত্র। তিনি তাম্রলিপ্ত থেকে পোত ভাসান।

২০ Early Man and the Ocean—Thor Heyerdahl, Doubleday & Co., New York, pp. 364-365

২১ Maldive Mystery, pp. 272-278

এরূপ ঃ ভারুকচ্ছ (ভারুচ) দেশের রাজা ছিলেন ভারু। তপস্বীদের সঙ্গে ঝগড়া করে তাদের রাগিয়ে দেন তিনি। ফলে সমুদ্র উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এসে ভারুকচ্ছ (বা ভারুচ)-কে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অধিবাসীদের মধ্যে যারা রাজা ভারুর সঙ্গে যোগ দেয়নি, তারাই বেঁচে রইল এবং নারকেলগাছ ভরা একহাজার দ্বীপের মধ্যে স্থান পেল। মহাসমুদ্রে এই হাজার দ্বীপের নামই মালদ্বীপ।

আর একটি কাহিনী (জাতক, নম্বর ৩৬০) ঃ ভারুকচ্ছের এক রানী সুস্যান্দি সমুদ্রের জলে ভেসে গিয়েছিল। নাগদ্বীপ 'খোরুমা'তে সেই রানী নাগরাজের কাছে আশ্রয় পেল। এদিকে রাজা তাঁর রানীকে খুঁজে বার করার জন্য সাগ্গা নামের এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন। সাগ্গা একটি পোতে অনেক লোক নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ল; কিন্তু মাঝসমুদ্রে জাহাজডুবি হলো। সাগ্গা একটি তক্তা আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে সেই নাগদ্বীপেই গিয়ে পেঁছাল। সমুদ্রকূলে সাগ্গাকে দেখে চিনতে পারল সেই রানী। সাগ্গাকে সে নিয়ে গেল তার গৃহে। সেখানে সাগ্গার সঙ্গে কিছুদিন বাস করল সে। কিন্তু ভারুচে ফিরে যেতে রানী রাজি নয়। ইতিমধ্যে আর একদল বণিক এসে জল ও কাঠের সন্ধানে ঐ দ্বীপে নেমেছিল। তারা বারাণসীর লোক। সাগ্গা তাদের সঙ্গেই ফিরে এল।

এই নাগদ্বীপ মালদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

মালদ্বীপের প্রচলিত লোকগাথার একটি কাহিনী ঃ ভারতবর্ষের এক রাজা শিকার করতে ভালবাসতেন। শিকার করতে গিয়ে তিনি একটি প্রাণীকে দেখলেন, যা চারপায়ে হাঁটে কিন্তু মানুষের মতোই দেখতে। রাজা জাল পেতে অনেক কৌশলে প্রাণীটিকে ধরে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে এলেন। প্রাসাদে এসে রাজার কাছে প্রাণীটি সে দেশের ভাষা শিখল এবং রাজাকে অরণ্যে লুকানো ধনসম্পদের সন্ধান দিল। এই মনুষ্যাকৃতি প্রাণীটির প্রেমে পড়ল রাজকুমারী। রাজা তাদের দুজনকে একটি নৌকায় তুলে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন। ভাসতে ভাসতে তারা এসে পেঁছাল মালদ্বীপে।

এসব কাহিনীগুলি থেকে বোঝা যায় যে, মালদ্বীপে প্রথম সভ্যতার শুরু ভারতবর্ষের মানুষের হাতে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলি থেকে ভারতের বণিকরা যেমন পারস্য উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরস্থিত দেশগুলিতে পেঁছাত, তেমনি তাম্রলিপ্ত থেকে তারা তাম্রপর্ণী (বা সিংহল) এবং ভারত-মহাসাগরে দ্বীপগুলিতে, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ হয়ে ইন্দোচীনে এবং আরও দূরে দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বঙ্গবাসী বণিকগণ তাম্রলিপ্ত মহানগরের বিপুল বন্দর হইতে বিরাট মাস্তুল ও বিশাল পাল সমন্বিত—ময়ূরপঙ্খী অর্ণব পোত ভাসাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে সসম্মানে বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন।"[২২]

প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপগুলির মধ্যে বোর্নিয়ো, সুলাওয়েস্ট, মলাক্কাস ও নিউগিনি এবং ফিলিপাইন ও জাপান পড়ে। হিন্দু বণিকেরা যেমন বর্মা, শ্যাম, মালয়, কম্বোজ ও চম্পাতে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, তেমনি ভারত মহাসাগরের সুবর্ণদ্বীপ ও অন্য দ্বীপগুলিতে এবং তারপর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে-দ্বীপেও তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একদা রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে 'বৃহত্তর ভারত'-এর এই দ্বীপপুঞ্জ পরিক্রমার পর লিখেছেন ঃ "বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা যেমন গিয়েছে সিংহলে, শ্যাম ও বার্মায়, তেমনি ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও রাজারা পূর্বভারতের দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ বিস্তার করেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলি প্রভৃতি দ্বীপেও ছড়িয়েছে নতুন সভ্যতার উন্মাদনা।"[২৩]

২২ দেবায়তন ও ভারতসভ্যতা—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৭০

২৩ দ্বীপময় ভারত, পৃঃ ১৭৪

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সামাজিক ছবি

"খ"

[পূর্বানুবৃত্তি]

দুর্গাদাসবাবু। "মানুষের কিছু কর্তব্য আছে ?"

বৈষ্ণবী। "কর্তব্য, যাতে মনের ও শরীরের সুখ হয়, তাই করা। কুসংস্কার দূর করা, সকলকে সমান অধিকার দেওয়া, সর্বতোভাবে স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রচার করা যাতে দেশের সকলের ও নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ হয়, সেইরূপ কাজ করাটা কর্তব্য, আর কি ?"

"আপনি মদ খাওয়া খারাপ বলেন ?"

"অতিরিক্ত খাওয়া খারাপ। নিয়মমতো খাওয়ায় দোষ কি ?"

"আপনি খেয়ে থাকেন ?"

"আমরা বৈষ্ণব, আমাদের খেতে নেই।"

"আমি আসছি, তোমরা বস," বলিয়া দুর্গাদাস-বাবু উঠিলেন।

সরলাও উঠিয়া বলিল, "না, আমরা আর বসব না, ইনি ক্লান্ত হয়েছেন, এঁকে খাওয়াইগে, আবার কাল কথাবার্তা কয়ো।"

দুর্গাদাসবাবু অতি কষ্টে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া "আচ্ছা" বলিলেন এবং পুনরায় মদ্যপানে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতে চারুবাবু ও স্থানীয় একটি ভদ্রলোক, নাম লালা রামপ্রকাশ, দুর্গাদাসবাবুর বাটীতে আসিলেন। রামপ্রকাশবাবু নিজের বাগানে পরমহংসকে রাখিয়াছিলেন। ধর্মশালার কারিন্দার মুখে বৈষ্ণবীর বহু প্রশংসা শুনিয়া সেদিনের মিটিং-এ তাহাকে নিমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে চারুবাবুর বাটীতে আসেন। বৈষ্ণবী সেখানে নাই শুনিয়া চারুবাবুকে সঙ্গে লইয়া ওখানে আসিলেন। খবর পাইতেই বৈষ্ণবী বাহিরে আসিল। আগন্তুকেরা নমস্কার করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইলেন।

বৈষ্ণবী। "আমি যেতে পারি, কিন্তু তাতে ফল কি ?"

চারুবাবু। "এঁর অভিপ্রায়, লোকে ধর্ম বিষয়ে আপনাকে প্রশ্নাদি করবে, আপনি তাদের সদুত্তর দিয়ে সন্দেহ দূর করবেন।"

"ধর্ম বিষয়ে আমারই কিছু স্থির হয়নি, আমি পরের সন্দেহ মেটাব কেমন করে ?"

চারুবাবু তাঁহার সঙ্গীকে বৈষ্ণবীর কথা বুঝাইয়া বলাতে তিনি বলিলেন, মায়ির বিনয় অসামান্য। যাহা হউক, মায়ি সেখানে উপস্থিত থাকিলে তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইবেন। আর সঙ্গীতেরও কিছু আয়োজন হবে, মায়ি দয়া করে দু-একটি গীত গাহিলে তিনি বাধিত হইবেন।

চারুবাবু ঐ কথাগুলি বৈষ্ণবীকে বাঙলায় তর্জমা করিয়া শুনাইলেন। বৈষ্ণবী বলিল, "হাঁ, যা জানি, তাতে রাজি আছি। কখন যেতে হবে ?"

"আমাদের সঙ্গে এখনই আসবেন না ? সকালে মেয়েরা পরমহংস বাবাকে দর্শন করতে আসবে, আপনাকেও দর্শন করবে।"

বৈষ্ণবী সরলার কাছে বিদায় লইয়া আসিয়া চারুবাবু ও রামপ্রকাশবাবুর সহিত তাঁহার গাড়িতে উঠিল। গাড়ি বাগানে গেল।

বাগানটি সুবৃহৎ। লাল খোয়ার সুন্দর রাস্তা। অসংখ্য ফুল-ফলের গাছ। বাগানের তিনদিকে তফাতে তফাতে তিনখানি দোতালা বাড়ি। একখানি বাড়ি নানাপ্রকার সবজি ও ফুলে সেদিন সাজানো হইয়াছিল। গাড়ি সেই বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে নামিয়া বাড়ির উপরের তলায় উঠিলেন এবং একটি ঘরে, যেখানে একখানি কম্বলে একটি মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন।

রামপ্রকাশবাবু সহাস্যে সন্ন্যাসীকে বলিলেন। "মায়িকো লে আয়া হুঁ।"

সন্ন্যাসীও তাঁহাদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বৈষ্ণবী চারুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনিই পরমহংস ?"

চারুবাবু। "হাঁ।"

বৈষ্ণবী একদৃষ্টে সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল। বড় বড় চুল দাড়ি ছিল বলিয়া সেদিন চিনিতে পারে নাই। এ যে তাহার বাল্যের পরিচিত, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের ছেলে সুরেন। অল্প বয়স হইতে ধর্ম ধর্ম করিত, জোর করিয়া বিবাহ দেওয়াতে মাস খানেক পরেই কোথায় চলিয়া গেল, আর খবর পাওয়া যায় নাই। লোকে ভাবিয়াছিল, মারা গিয়াছে। চৌদ্দ পনের বছরে চেহারার পরিবর্তন হয়েছে বটে কিন্তু এ তো সেই। বৈষ্ণবী চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেল। চারুবাবু বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। রামপ্রকাশ-বাবু সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "আউরতেঁ আপকো দর্শন করনা চাতি হেঁ।" সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে আসিতে অনুমতি দিলেন। রামপ্রকাশবাবু চলিয়া গেলেন। ১৮।১৯টি স্ত্রীলোক আসিয়া ফুল, চন্দন, কর্পূর, খড়ুলি নারিকেল, কত প্রকারের ফল, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ প্রভৃতি সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিল, পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করিল। সন্ন্যাসী শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাহাদের কত উপদেশ দিলেন। বৈষ্ণবীকে তাহারা প্রণাম করিল, কত কথা জিজ্ঞাসা করিল, বৈষ্ণবী শূন্যদৃষ্টিতে দেখিল মাত্র। বৈষ্ণবী কি ভাবিতেছিল ?

ভাবিতেছিল সুরেন আজন্ম শুদ্ধস্বভাব। ১৯।২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিদ্যোপার্জন করিয়াছিল, চরিত্র ও বিদ্যাতে পাড়ায় তাহার সমান কেহ ছিল না। বৈরাগ্যবান হইয়া সে সংসার ত্যাগ করে। আজ ১৪।১৫ বৎসরের কথা। তাহার সঙ্গে ধর্মশালায় আলাপে বুঝিয়াছিল যে, ধর্ম তাহার কাছে আন্দাজ বা যুক্তির বিষয় নহে, পরন্তু অনুভবসিদ্ধ। সে বলিয়াছিল, পরমানন্দরূপী আত্মা প্রামাণিক বস্তু। সন্দেহ করাতে তীব্র তিরস্কার করিয়াছিল, "আদার ব্যাপারির জাহাজের খবর কি সাজে।" সুরেন তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল কি ? তাহার গুপ্ত প্রণয়, পিত্রালয় হইতে পলায়ন প্রভৃতি সে শুনিয়াছে কি ? বৈষ্ণবী সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিল। তাহার বোধ হইল যেন সন্ন্যাসী তাহার মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাসিতেছে। আর চাহিতে সাহস করিল না, সেখানে বসিতেও পারিল না। "সুরেন অত শুদ্ধ ও শান্ত স্বভাব হইয়া তাহাকে ঘৃণা করিবে কি ?" বৈষ্ণবী সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেল। বৈষ্ণবী ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, "দেখাই যাক ও কিছু বলে কিনা, আমি কেন ধরা দেব ?" কিন্তু একবার যেন শুনিল, কে তাহাকে তাহার পূর্বের নামে "অনুপ" বলিয়া ডাকিল। শিহরিয়া সন্ন্যাসীর ঘরের দিকে দেখিল, কিছু দেখিতে পাইল না। ভাবিল, "আমার মনের ধোকা। মন চঞ্চল হয়েছে। স্নানটা করে ফেলা যাক।" একটি কুয়ার দিকে গেল, কেহ নাই দেখিয়া স্নান করিল এবং আপনার কাপড় শুকাইতে লাগিল। ওদিকে রামপ্রকাশবাবু ফিরিয়া আসিয়া বৈষ্ণবীকে না দেখিয়া চতুর্দিকে খুঁজিতে লাগিলেন এবং প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর তাহাকে কুয়ার ধারে পাইলেন। প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপকো বহুত দেরসে ঢুঁড়তা হুঁ। প্রসাদ তৈয়ার হেঁ, আইয়েগা।"

সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবীকে এক স্থানেই ভোজন করিতে বসাইল। বৈষ্ণবীর খাওয়া হইল না, মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী একটি কথাও কহিলেন না।

আহারান্তে সন্ন্যাসী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। রামপ্রকাশবাবু বৈষ্ণবীকে একটি দাসী সঙ্গে দিয়া নিচের তলার একটি নিভৃত কামরা দেখাইয়া তাহাতে থাকিতে বলিলেন। বৈষ্ণবী দাসীকে বিদায় দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল এবং তাহার জন্য প্রস্তুত শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তার সাগরে ভাসিতে লাগিল।*

[ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩১১, পৃঃ ৫৩-৫৬

আজ দরিয়ায় তুফান ওঠে

শেখ সদরউদ্দীন

আজ দরিয়ায় তুফান ওঠে,
সূর্য ডোবে আসমানে—
কালো মেঘের করাল ছায়া
ছড়িয়ে পড়ে সবখানে।
যাত্রী বোঝাই তরীখানি
টলমলিয়ে ছুটছে রে।
তলিয়ে গিয়ে ঢেউয়ের তলে
আবার ঠেলে উঠছে রে।
মরণ-বাঁচন ঝড়ের নাচন
ভীতি জাগায় সব প্রাণে—
আজ দরিয়ায় তুফান ওঠে,
সূর্য ডোবে আসমানে।
কোন্ দিকেতে যেতে হবে
পাই না কোন নিশানা—
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে
পাই যে কোন দিশা না।
কে আছ আজ দক্ষ মাঝি—
কে আছ আজ নাইয়া রে—
ভুলে গিয়ে সব ভেদাভেদ
ধরো না হাল ভাইয়া রে।
ভরাডুবি রুখতে হবে
শক্ত হাতের হাল-টানে—
আজ দরিয়ায় তুফান ওঠে,
সূর্য ডোবে আসমানে।

মৃত্যু

শেফালিকা দেবী

ঘন কৃষ্ণ আবরণ টানি মুখ 'পরে
আমন্ত্রণ-লিপি লয়ে করে
শব্দহীন ধীর পায়
সে আসি দাঁড়ায়
মানবের দ্বারে—
কহে তারে—
সকলের অগোচরে,
অতি মৃদু স্বরে—
"ওপারে অজানা দেশে দিতে হবে পাড়ি
সময় হয়েছে এবে তার-ই।"
চকিত মানবমন নিমেষে বিহ্বল,
আঁখি তার করে ছল ছল।
চির পরিচিত এই শ্যাম বসুন্ধরা
বর্ণে গন্ধে রসে রূপে ভরা,
আলোক উজ্জ্বল
সুখ স্পর্শ বায়ু সুশীতল
স্নেহ প্রীতি মমতার ডোর—সব ছাড়ি
দিতে হবে পাড়ি।
ঊর্ধ্বে নয়ন তুলি ডাকে অসহায়ঃ
"কে আছ কোথায়,
ধর আসি হাতে,
অজানা আঁধার পথে লয়ে চল সাথে।"
অতীতের কথা পড়ে মনে
শুনেছিল কবে যেন কোন শুভক্ষণে
কাহার আশ্বাসবাণীঃ
"জানি আমার সন্তানে
লইতে আসিতে হবে অন্তিম লগনে।"
সহসা আঁধার মাঝে জাগে জ্যোতির্ময়
মাতৃমূর্তি দিতেছে অভয়
তুলি দুই কর।
শান্তিতে নয়ন মুদি কহে নরঃ
"আর ভয় নাই,
অজানা আঁধার পথে চল এবে যাই।"

স্ব-প্রকাশ

জয়ন্ত বসু চৌধুরী

জন্ম-মৃত্যু আমার অঙ্গবাস
সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নায়,
চেতনার উল্লাস ॥

ভালমন্দের দ্বন্দ্বে ছন্দ নিয়ে
কম স্পর্শ করে পুতুল নাচাই,
আলোক আঁধার দিয়ে
সন্দেহ ভয় আর সংশয়ে
রঙ্গ করি প্রকাশ ॥

মায়া-আবরণ অঞ্চল দিয়ে,
চঞ্চল করি মন
মোহ-অঞ্জনে করি রঞ্জিত,
জীবের জ্ঞান-নয়ন ॥

আমিই আমাকে করেছি স্ববশে বন্দি,
সংস্কারের বৃত্তিকারায় আবার করি যে সন্ধি
অন্তর্মুখী ধ্যানের গভীরে
মুক্তির উদ্ভাস ॥

তোমার পদচিহ্ন দেখি

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

আমার চেতনার অঙ্গনে
তোমার অস্তিত্ব সূর্যের মতো সনাতন।
প্রতিকূল মেঘের সঞ্চারে
যখন আমার মনের আকাশ নীলহীন,
সবটুকু আলো শুষে নিয়ে
অন্ধকারের পাহাড়টা যখন ঘোষণা করে
তামসিকতার জঙ্গী শাসন,
তখন তোমার 'উত্তিষ্ঠত' আহ্বান
আমার ঘুমন্ত চেতনার দুচোখে ছোঁয়ায়
উদ্বোধনের সোনার কাঠি,
অন্ধকারের পাহাড়টা ঠিক তখনই ভেঙে খানখান,
প্রতিকূল মেঘের সামিয়ানা ছিঁড়ে গিয়ে
আমি আমার ঈপ্সিত আকাশের
নীলকান্তমণি স্বরূপ আবিষ্কার করি,
বোধের মোহনা থেকে উড়ে আসে
শুভ্র চিন্তার সামুদ্রিক পাখিরা,
আমার সামনের ধুলোভরা পথটায়
তোমার পদচিহ্ন দেখি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

দেবী রায়

তুমি নাকি সেই একমাত্র
ত্রিকালের ভগবান।

এসেছিলে জানি—নেমে এ পৃথিবীতে
হাতে ধরে নিতে
ঘুচাতে ক্লেদ, ঘুচাতে গ্লানি।

তুমি নাকি সেই একমাত্র
ত্রিকালের ভগবান।

তুমি আছ, এর চেয়ে বেশি নিশ্চয়তা
অঙ্গারের মতো তেজ কাজ করে,
প্রদীপের আত্মায়, প্রদীপের শিখায়
ভিতরে ভিতরে।

যে অঙ্গার জ্বলে-জ্বলে একদিন
পুড়ে—হয়ে যাবে ছাই
তবু আমরণ জ্বালার মতো—জ্বালানোর মতো
প্রচন্ড জোর—সেই শক্তি চাই

তুমি-ই তো সেই একমাত্র
কাঙালের ভগবান
তবে কেন আজো ঘোচে না
এ মূঢ় অভিমান।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

কর্ম

প্রশ্ন : কর্মফল কি করে ত্যাগ করা যেতে পারে? এটাকে আমি কোনও একটা যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। ধরুন, আমি একটা সৎকর্ম করলুম যার ফল স্বর্গ এবং একটা অসৎ কর্ম করলুম যার ফল নরক; এবং এই উভয় কর্মের ফল আমি ভগবানে সমর্পণ করলুম। যার জন্য তিনি আমার হয়ে স্বর্গ ও নরক ভোগ করবেন এবং আমি মুক্ত হয়ে যাব—এ-সিদ্ধান্ত কি ঠিক?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : ভগবান গীতায় বলেছেন, "যে বুদ্ধির শরণ নেয় সেই ঠিক ঠিক কর্মযোগী হতে পারে।" কর্মের পিছনে যে অকর্ম রয়েছে সেটিকে না জানলে কর্মযোগ বা 'ফিলসফি অব কর্ম' বোঝা যায় না। প্রত্যেক কর্মের পিছনে একটা করে চিন্তা থাকে। অনর্থক কর্ম বলে এজগতে অল্পই আছে। সেই জন্য শাস্ত্রে বলেছে যে, ক্রিয়ার পূর্বে জ্ঞান। আবার এই জ্ঞান যা প্রত্যেক কার্যের প্রয়োজন চিন্তা করে, তারও পিছনে রয়েছে ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই পূর্ণ হবার জন্য উপাদান চিন্তা করে। সেই ইচ্ছাই পূর্ণ হবার জন্য সক্রিয় হয়। এই ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াই হচ্ছে বিশ্বের প্রকৃতি। এই সদাসদাত্মিকা ইচ্ছার পিছনে রয়েছেন ঈশ্বর, যিনি সর্বব্যাপী বিভু। তাঁর মূল-ঈক্ষণই সর্ব ব্যষ্টি-ইচ্ছার কেন্দ্রস্থান। তাঁর সত্তা ও ইচ্ছার অতিরিক্ত জীব ও জগতের অধিষ্ঠান ও নিয়োজক আর কিছু নেই। তিনিই প্রকৃতি-সহায়ে জীব-জগৎ হয়ে খেলা করছেন। স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য-কারণ, সৎ-অসতের প্রভু তিনি। এই তত্ত্বের যতদিন না জীবের সাক্ষাৎকার হয় ততদিন জীবের ব্যক্তিত্ব, প্রয়োজন, কর্ম ও ফলরূপ ভ্রান্তি থাকবেই। কিন্তু বুদ্ধিতে যখন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বকর্তৃত্ব দৃঢ় হয়, তখন কর্মফলে আর ব্যক্তির কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকে না, সকল কর্মের প্রভু যিনি, তাঁতেই সর্বকর্ম সমর্পিত হয়। ব্যক্তিতে মহাকারণের লীলাভিনয়ের এক-একটা মাত্র ফুট উঠছে—এইটে বুঝতে হবে। "কত চতুরানন মরি মরি যাওয়ত, নতুয়া আদি অবসান। / তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত, সাগর লহরী সমান॥" "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। / ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" কিন্তু যখন অহংকে ত্যাগ করতে পারছি না, তখন সকলের অন্তর্বর্তী সেই প্রভুকে ভাবনা করে সমস্ত কর্মের ভিতর দিয়ে তাঁর সেবা করাই ভাল। আর এই কর্মযোগরূপ সাধনের সহায় হচ্ছে প্রীতি এবং এর ফল সর্বকর্মে ব্রহ্মচিন্তা হেতু চিত্ত-প্রসাদ। এই চিত্ত-প্রসাদ মানে বৈকুণ্ঠস্বরূপ প্রাপ্তি;—চিত্তে আর কোনও কুণ্ঠা বা উদ্বেগ বা উপদ্রব থাকে না এবং সেই বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়। (৩০।৮।১৯৪২)

রামের অযোধ্যা

প্রশ্ন : মায়ের জন্য সংসারে আছি, নইলে এতদিনে কবে বেরিয়ে পড়তাম। আপনি কি বলেন?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : আমি আর কি বলব বল, এই ভীষণ যুদ্ধের দুর্যোগ, আবার এই অসুস্থ শরীর, দেখ তবুও আমায় এখানে থাকতে হয়েছে। একবার অনেকদিন আগে এই কর্মের উৎপাতে ঠিক করলাম হৃষীকেশে চলে যাব—কারো কথা শুনব না; কারণ, সৎ কর্মের নামে এই যে জটিলতা এবং চিত্তের উদ্বেগ, এ সর্বদা ধ্যান-জপ থেকে সাধককে চ্যুত করে, এ কি করে মোক্ষধর্ম হতে পারে? সেসময় কেবলই গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শাঙ্করভাষ্যের প্রথমকার কথাটাই মনে পড়তে লাগলো—ইতি-মার্গ কর্মযোগ—বহিরঙ্গ সাধন। গৃহস্থের কর্তব্য। চিত্তের উদ্বেগকর। আর অন্তরঙ্গ সাধন ধ্যান-

যোগ, যমনিয়মাদি নেতি-মার্গ-কর্মযোগ বিবিদিষা সন্ন্যাসীর কর্তব্য। তাঁদের সুবিধার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা হৃষীকেশাদি সুভিক্ষ স্থান নির্দেশ করে দিয়ে গেছেন। 'আরূঢ়ের' 'আরুরুক্ষে'র কর্তব্য করতে গেলেই গোল হবে। আরূঢ়ের জন্য 'শমঃ কারণমুচ্যতে'—সর্ববহিরঙ্গ কর্মত্যাগ করে নিরোধমূলক অন্তরঙ্গ সাধন কর্তব্য। ব্যুত্থান-মূলক কর্মযোগ ওসব গৃহস্থাশ্রমেই সেরে বেরনো উচিত, না হলে মোক্ষমার্গও অবলম্বন করব আবার চিত্তের উদ্বেগকর কার্যও করব—এ আদা-কাঁচকলার সংযোগ হতে পারে না। সিদ্ধের কথা বলছি না, সাধকের কথা বলছি।

মনে বড় অশান্তি, হঠাৎ একদিন কথামৃতের একটা জায়গা খুব ভাল লাগলো। দেখলাম ঠাকুরের মহিমাচরণের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, "সংসারে থাকবে না তো যাবে কোথায়? কোথায় তিনি নেই, আর কোথায় তিনি আছেন যে সেখানে যাবে? আমি দেখি রামের অযোধ্যায় বাস করছি। জীব যদি বুঝতে পারে, তো সর্বত্র অযোধ্যা দর্শন হয়! সর্বং রামময়ম্। রামের বৈরাগ্য হলো, সংসার ছেড়ে যাবেন। বশিষ্ঠ বললেন, রাম, তুমি যাও, যদি বুঝে থাক যে সংসার ঈশ্বর ছাড়া। সংসারে কাম-ক্রোধের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নইলে শক্তি বাড়বে কেন? সংসারে থাকো ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। কলিতে অন্নগত প্রাণ, অন্নের জন্য সাত জায়গায় ঘোরার চাইতে এক জায়গায় ভাল। এখন এক জায়গায় রেখেছেন, ভাল, এখন সেখানেই থাকতে হবে। আবার যখন ভাল জায়গায় দেবেন তখন সেখানে থাকব।"

আবার দু-এক পাতা পরে দেখি ঠাকুর বলছেন, "কেরানী যদি জেলে যায় তো জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে আর কি করবে? ধেই ধেই করে নাচবে? না যা আগে করত তাই করবে?"

যে জীবন্মুক্ত সংসার-গারদ থেকে বেরিয়েছে, সে সেবা ভজন নিয়েই থাকবে। পচা মড়া নিয়ে যারা মারামারি করে করুক। যীশুর কথাটা মনে রেখ, "মৃতেরা মৃতের সৎকার করুক, তুমি আমায় অনুসরণ কর।" (২৪।৯।১৯৪২)

বেদান্তের মায়া

প্রশ্ন ঃ বেদান্তে মায়া বলতে কি বোঝায়?

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ অদ্বৈতবেদান্তে মায়াকে সত্য এবং মিথ্যা উভয়াত্মিকা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যতক্ষণ মায়ার কাজ চলছে, ততক্ষণ সত্য বলে ভান হয়, কিন্তু যেই তার খেলা বন্ধ হলো, ব্যাস আর কোথাও কিছু নেই। যেমন, যতক্ষণ ভ্রান্তিহেতু দড়িতে সাপ দেখছি ততক্ষণ সেটা সাপ, কিন্তু যেই দড়ির জ্ঞান হলো অমনি সাপ কোথায় উবে গেল—আর তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। এই বিচিত্র মায়ার একটা বিশিষ্ট শক্তি জীবকে এই ভ্রান্তিময় সংসারে আসক্ত করান। কেন যে একটা বিশিষ্ট অনিত্য পদার্থে আসক্তি আসে তা কেউ বলতে পারে না। অকস্মাৎ বা সংসর্গ হেতু ধীরে ধীরে এই আসক্তি উপস্থিত হতে পারে। 'প্রথম দর্শনেই ভালবাসা' যে কেবল মানুষেতেই খাটে তা নয়, প্রায় সব জিনিসের বেলায়ই ঐ একই শক্তির প্রকাশ। কোনটা মঙ্গলকর এবং কোনটা অমঙ্গলকর তা ঐ মোহকালে জীব বুঝতে পারে না। মনের অনুকূল হলেই যে তাতে আসক্তি হয় তা নয়, যা বিরক্তিকর দুঃখদায়ক তাও মানুষ ছাড়তে চায় না। যতক্ষণ ঐ আসক্তি চলছে, ততক্ষণ ভোগ্য বিষয়টি না হলে প্রাণ বাঁচে না, কিন্তু যেই কোন একটা অবস্থায় পড়ে অনির্বাচ্যাশক্তিটির তিরোধান হলো, ব্যাস আর কিছুই নেই, তখন ভোগ্যের স্বরূপ বেরিয়ে পড়লো—সাংখ্যের পলায়-মানা অভিনায়িকার মতো।

একবার যার মরীচিকার জ্ঞান হয়েছে, আর কখনো সে সেখানে পিপাসা মেটাতে যায় না। অথবা কাজ হাসিল হয়ে গেলে যেমন কোন মানুষ বা বস্তুর প্রতি উদাস দৃষ্টি আসে। অথবা খোসা-মুদেরা বড়লোকের পয়সা ফুরিয়ে গেলে যেমন তার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে তাকায়।

যতক্ষণ এই আসক্তি, মায়া, ততক্ষণ মনের কত জ্বালা-যন্ত্রণা। কিন্তু ছুঁড়ে ফেললেই নিশ্চিন্ত। প্রভু বলতেন, "একটা চিল একটা মাছ মুখে করে যাচ্ছিল, আর যত চিল তাকে তাড়া করে ঠোকরাতে লাগল। অবশেষে যখন চিলটা মাছের টুকরোটা ফেলে দিলে, তখন তারা তাকে রেহাই দিলে। ব্যাস নিশ্চিন্ত।"

যতক্ষণ মায়ার খেলা চলে ততক্ষণ 'অমুক নইলে আমি বাঁচব না'। কিছু কাল পরে হয়তো সে মরে গেল, খুব কষ্ট। কিন্তু আবার মহামায়া হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বেশ দিন চলতে লাগলো। অথবা আর একটা কিছুতে মন গেল, আগেরটা পড়ে রইল, ভুলেও তার কথা মনে পড়ে না।

কিন্তু সকল আসক্তির মূলে রয়েছে নিজসুখ ও জীবিতুমিচ্ছা অর্থাৎ যেন না মরি, যেমন করে হোক বাঁচতে হবে। এই দুটোর জড় যখন চিত্ত থেকে নির্মূল হবে, তখনই জীবের দুঃখের অবসান হবে। (৪।১০।১৯৪২)

নিরপেক্ষ কর্মী

স্বামী বাসুদেবানন্দ : নিরপেক্ষ কর্মী হতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই শীতাতপসহ্য ও ভিক্ষা অভ্যাস করা উচিত। এ অভ্যাস না থাকলে কর্মীর স্বাধীনতা গেল। স্বাধীনতা গেলে ধ্যান, জপ, বেদান্তাভ্যাস, গীতাভ্যাস সবই নিরর্থক হয়ে পড়বে। কেবল স্বার্থ-সঞ্চয়ের জন্য পরের খিদমত খাটতে খাটতে প্রাণ বেরুবে। ওসব সমিতি-টমিতি জীবনের প্রথমটা খুব সাহায্য করে, যেমন চারাগাছের বেড়া, কিন্তু শেষে বেড়া বাড়ের বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়; দেখনি, বেড়া ঠিক রাখবার জন্য ডালগুলো মাঝে মাঝে কেটে দেয়। যম, নিয়মাদি পালনের জায়গায় পার্টি, ক্লাব, সমিতি প্রভৃতির আইন-কানুনই গজিয়ে ওঠে; তবে সাধারণ বুদ্ধি 'মিডিওকার'দের পক্ষে ওসব মন্দ নয়।

আমরা সর্ববিষয়ে পরাধীন—দেহের দুর্বলতা, মনের দুর্বলতা; কোনটা ঈশ্বরীয় কর্ম, কোনটা স্বার্থজনিত কর্ম আমাদের পক্ষে বোঝা বড় কঠিন। দেখ, কর্মযোগ বল, জ্ঞানযোগ বল আর ভক্তিযোগই বল সবই নিঃস্বার্থ প্রেমিক স্বাধীন মানবের জন্য। পরাধীনের কোন ধর্মই নেই। এই আমার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা।

পয়সা জোগাড় করতেও মানুষকে অনেক কৃচ্ছ্রতা সহ্য করতে হয়। পরন্তু সেই কৃচ্ছ্রতাগুলো যদি ঈশ্বরের জন্য হয়, তো অনেক কাজ এগিয়ে থাকে। কাম-কাঞ্চনের জন্য কৃচ্ছ্রতা তো মানুষ সর্বদাই ভোগ করছে। যার 'সর্বভূতময়' ঈশ্বরে প্রীতি নেই, তার 'ফিলনথ্রপিক ওয়ার্ক' করার জন্য লোক-সেবকের ভেক নেওয়া উচিত নয়, নইলে পরে খুব মনঃকষ্ট পাবে—'ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ'। কর্ম বড় জটিল ও উদ্বেগকর—'গহনা কর্মণো গতিঃ'।

(৬।১০।১৯৪২)

গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রশ্ন : শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলি বেশ গীতার সঙ্গে মেলে, তাই না?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : গীতা হলো একটা অপূর্ব দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর হলেন তার দৃষ্টান্ত। গীতাতে বিশ্লেষণ করে নানাবিধ চিত্ত-ভাবানুযায়ী আধ্যাত্মিক পথের নির্দেশ করা হয়েছে। ঠাকুর সেই সব পথের ভিতর দিয়ে গিয়ে চরমস্থানে পৌঁছে দেখালেন গন্তব্য বস্তু এক। তিনি হলেন চলমান জীবন্ত গীতা। সেইজন্য তিনি পুঁথিগত বিদ্যাটা একেবারে পছন্দ করতেন না। তাঁর উপদেশ যৎসামান্য মাত্র আমরা পাই। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি পুঁথি তাঁর জীবনের সামান্যাংশ মাত্র। উপদেশের চাইতে তাঁর সাধনাময় জীবনই আজ বিজ্ঞানের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আধ্যাত্মিকতা প্রচার করছে। গীতার 'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন'কে বিশ্বাস করত যদি ঠাকুরের জীবনালোকে স্বচক্ষে না দেখত? নির্বিকল্প সমাধি, মহাভাব প্রভৃতির লক্ষণ, জীবন্মুক্তের আচরণ তাঁর জীবনে প্রকট দেখে তবে লোকে গীতাতে বিশ্বাসী হচ্ছে। সাধনপথ সব লুপ্ত হয়ে সেই জায়গায় উচ্ছৃংখল মতবাদের কাঁটাগাছে সঙ্কুল হয়ে ওঠায় সাধনা কথার কথা হয়ে পড়ে। তিনি বহু জীবনের বহু সাধকের আবিষ্কার পুনরাবিষ্কৃত করলেন একটা মাত্র জীবনের মধ্যে—ভেবে দেখুন একবার, কি অদ্ভুত শক্তিশালী আধ্যাত্মিক শক্তি। একটা সাধনার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছাতে জীবের কত জীবন কেটে যায়, আর সেই সব সাধনা-গুলোকে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করলেন, অনুশীলন করলেন এবং তাদের সিদ্ধি ও ঐক্য দর্শন করলেন। এক শরীরে তিনি অর্জুনকে গীতা বললেন, আবার আর এক শরীরে তিনিই তার দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে এলেন। (১৮।১০।১৯৪২)

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমহারাজ ছিলেন সর্ববিষয়েই বিচক্ষণ। ব্যবহারিক বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির জন্য বহু ভক্তকে সাংসারিক ব্যাপারেও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। জনৈক ভক্ত-যুবক ডাক্তারি পাস করিবার পর চাকুরি করিবেন, কি স্বাধীন ব্যবসা করিবেন নিজে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তর অতি বিনীতভাবে তাঁহার পদতলে বসিয়া স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহারাজ প্রথমে কিছুই বলিতে চাহিলেন না। কিন্তু যুবকটি নাছোড়বান্দা, কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার জন্য বারবার মহারাজের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ তাঁহাকে কি নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা স্বকর্ণে শুনিবার সুযোগ হয় নাই, কারণ কর্তব্যব্যপদেশে আমাকে সেস্থান তখনই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি মহারাজের ইঙ্গিতেই তিনি কলিকাতায় স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন ও পরে প্রভূত প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠাকুরের ভাবে ভাবিত এবং মঠের আশ্রিত থাকিয়া সাধু-ভক্তগণের যথেষ্ট সেবা করিয়া ধন্য হন।

খুঁটি-নাটি সব বিষয়েই মহারাজের দৃষ্টি ছিল। একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। দূরস্থান হইতে রেল-গাড়িতে বরফে ঢাকিয়া কোন ভক্ত মঠে একটি প্রকাণ্ড রুই মাছ পাঠাইয়াছিলেন। মাছ মঠে আসিলে পর মহারাজ ও অন্যান্য সাধুগণ দেখিয়া খুব প্রীত হইলেন। তখন বেলা ৯৷১০টা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মাছ কাটিয়া রান্না করিতে দেওয়া হইল মহারাজের নির্দেশে। ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইবে। কাটা মাছ ধুইয়া রান্না ঘরে পেঁছাইবামাত্র পাচক ভাজিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছু মাছ ভাজা হইবার পর পাচকের সন্দেহ লাগিল মাছ খারাপ হইয়া গিয়াছে, খারাপ গন্ধ তাহার নাকে লাগিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডারী মহারাজকে খবর দিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন। তাঁহারও মনে শঙ্কা জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উপরে মহারাজের ঘরে গিয়া সব জানাইলেন। মহারাজ আদেশ করিলেন ভাজা মাছ খানকয়েক লইয়া আসিবার জন্য। মহারাজ ভাজা মাছ হাতে লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, মাছ খারাপ হইয়া গিয়াছে—উহা ঠাকুরের ভোগে চলিবে না এবং এমনিতেও খাওয়া চলিবে না। ভাজা ও কাটা মাছ সমস্তই নষ্ট করিয়া দিতে বলিলেন। বাহির হইতে কিছু টের পাওয়া যায় নাই যে মাছ ভিতরে খারাপ হইয়া গিয়াছে।

মাছের সম্বন্ধে আরও একটি কথা মনে পড়িতেছে। এক সময়ে কয়েকদিন আমাকে মঠের বাজার করিতে হইয়াছিল। বাজার সামান্যই, শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার জন্য মিষ্টি, টাটকা শাক, তরকারি ও মাছ। সেই সময় শনি ও মঙ্গলবারে আট আনার মাছ আসিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য। মহারাজের নির্দেশ-মতো আমাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল কই-মাগুর প্রভৃতি মাছ যাহা কাদাজলে থাকে, তাহা যেন না আনি। কারণ তখন শীতকালের শেষ, খাল-বিলের জল কমিয়া গিয়াছে, ঐসকল মাছে এইসময় পোকা হয় এবং এইসময় ঐসব মাছ খাইলে অসুখ হয়। পরে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বেশিদিন হাঁড়িতে বা ডোবাতে জিয়াইয়া রাখা এবং গেঁড়ে ডোবার কাদাজলের মাছে সত্য সত্যই পোকা হয়।

মহারাজের খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও জ্ঞানের কথা প্রাচীনগণের নিকট তখন কতই না শুনা যাইত। তাঁহার সংসর্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের আচার-ব্যবহারেও ঐসকল সুশিক্ষার পরিচয় সর্বদা মিলিয়াছে।

মহারাজের লিখিত পত্রাবলী কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে মঠের বা সঙ্ঘের প্রথমাবস্থায় তাঁহার কর্মতৎপরতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যখন দেখিয়াছি তখন তিনি বেলুড় মঠের বাহিরে অনেক সময় থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার মঠের সকল সাধু-ব্রহ্মচারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টার পরিচয় জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। মঠে পানীয় জলের অসুবিধা দূর করিবার জন্য কলের জল আনা, রান্না-খাওয়ার স্থান বাড়ানো, সাধু ও অতিথিদের থাকার জায়গা, মঠের জন্য জমি ক্রয়, রিলিফের কাজ, আশ্রমাদির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে মহারাজের চিন্তা, পরিকল্পনা ও প্রয়াসের সংবাদ তখন কানে আসিত।

নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজের কয়েকটি তীর্থস্থানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মহারাজের ঐসকল তীর্থে বিশেষ উপলব্ধি ও ভাবাবেশ হইয়াছিল। সেজন্য ঐসকল জাগ্রত পীঠে সাধু ও ভক্তগণের অবস্থান ও ভগবদ্ভজনের সুবিধার জন্যই তিনি মঠ-আশ্রম করিতে চাহিতেন। এই সম্বন্ধে অনেকের অজানা একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ অযোধ্যাতে অতি আনন্দে প্রভুর দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থানে একটি আশ্রম স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছিলেন জানিয়া স্বামী জগদানন্দ ও স্বামী সম্পূর্ণানন্দ এক সময়ে কাশী অদ্বৈতাশ্রম হইতে সেখানে আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। অযোধ্যাতে সরযূতীরে গড়বেতার জমিদারের একটি বাড়ি ছিল। তাঁহারা ঐ বাড়িটি আশ্রমের জন্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামী জগদানন্দ ও স্বামী সম্পূর্ণানন্দ অযোধ্যায় উপস্থিত হইবার পর স্বামী সম্পূর্ণানন্দ আমাশয় রোগে আক্রান্ত ও বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। দুই-চারিদিন অপেক্ষা করিয়াও তাহার শরীর সুস্থ না হওয়ায় এক সপ্তাহ পরে জগদানন্দ মহারাজ রুগীকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরে ঐবিষয়ে আর কোন চেষ্টা উদ্যম হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। মহারাজের বিশেষ অনুগত শিষ্য ও মালাবার-ভ্রমণের সময়ের সঙ্গী ও সেবক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ বলিতেন: "মহারাজ কন্যাকুমারী-দর্শনে ও সেই স্থানের মনোরম পরিবেশে এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, ওখান ছেড়ে আসতে চাইছিলেন না। অনেক সাধ্য-সাধনা করে তাঁকে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে রাজি করানো গিয়েছিল। মহারাজ বলতেন: 'এই শান্তিপূর্ণস্থানে একটি কুটির করবে। আমি শেষকালে এখানে এসে নির্জনে আনন্দে থাকব।'" পরবর্তী কালে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের বিশেষ প্রিয়পাত্র কেরলের জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক কন্যাকুমারীতে একটি ছোট আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মহারাজের ইচ্ছার স্মরণে তাহার নামকরণ হইয়াছে 'শান্তিকুটির'।

মহারাজের দাক্ষিণাত্যের তীর্থদর্শনের ও উচ্চ উপলব্ধি এবং ভাবাবস্থার সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের ভক্তগণের নিকট অনেক কথা শুনা যাইত। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে মাদ্রাজ হইতে তিরুপতি দর্শন করিতে যাই। দর্শনান্তে পাহাড়ের নিম্নদেশে আসিয়া সেখানে অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণান্তে দ্বিপ্রহরের পর একটি পোস্টকার্ড কিনিবার জন্য পোস্ট অফিসে চলিয়াছি। রাস্তায় জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: "পোস্ট অফিস কোথায়?" তিনি দূরে হইতেই আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মৃদু হাস্যে বলিলেন: "এখন পোস্ট অফিস বন্ধ, সেখানে কি প্রয়োজন?" তদুত্তরে আমি জানাইলাম: "আমার একটি পোস্টকার্ড চাই।" তখন তিনি সাগ্রহে আমার পরিচয় লইয়া নিকটস্থ নিজের বাড়ি দেখাইয়া বলিলেন: "আসুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে পোস্টকার্ড দেব।" আমার বিশেষ জরুরী প্রয়োজন বলিয়া পোস্টকার্ড লইতে আমি তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি অতি সমাদরে বৈঠক-

খানাতে বসাইয়া আমাকে পোস্টকার্ড দিলেন এবং ভক্তিগদগদ চিত্তে বলিলেনঃ "আপনাদের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়েছে। তিনি যখন তিরুপতি দর্শনে এসেছিলেন আমি তখন সেখানে ডাক্তার ছিলাম। তিনি অসুস্থ বোধ করায় আমাকে ডাকা হয়। আমি তাঁকে পরীক্ষা করে ঔষধের ব্যবস্থা করি। সেই ঔষধে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং কয়েকদিন থেকে পরমানন্দে দর্শনাদি করেন। আমি নিত্যই তাঁকে দেখতে যেতাম। তিনিও আমায় খুব স্নেহ করতেন। তিরুপতিমন্দিরে শ্রীমূর্তি দর্শন করে তিনি ভাবাবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁর দিব্যমূর্তি দর্শন করে আমি মোহিত হয়েছিলাম। অতঃপর তাঁকে প্রণাম করি। তখন থেকে আমার জীবনে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। সাধনভজনে নিষ্ঠা বেড়েছে। কিছু কিছু অলৌকিক শ্রবণাদিও হয়েছে। সকলই তাঁর স্নেহ কৃপার ফল বলে মনে করি। আরও আশ্চর্যের কথা যে, আমরা গোঁড়া বৈষ্ণব, একমাত্র নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন ঈশ্বরবিগ্রহ বা নামে আমাদের বিশ্বাস-ভক্তি নেই। কিন্তু আমার অন্তরে এখন শক্তি উপাসনার প্রতি টান জন্মেছে, স্যর জন উড্রফের বই পড়ছি এবং আমার মধ্যে ঐ ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হচ্ছে।"

মাদুরাতে মহারাজের মীনাক্ষীদর্শন সম্বন্ধে মাদ্রাজের জনৈক প্রাচীন ভক্তের নিকট শুনিয়াছিঃ "মহারাজ নাটমন্দিরে প্রবেশ করেই ভাবাবিষ্ট হন এবং শিশু যেমন জননীর নিকট দৌড়ে যায় ঠিক সেইরকম গর্ভগৃহে মহারাজ দেবীর দিকে ছুটে চলেন। সঙ্গী পূজনীয় শশী মহারাজ আগে থেকেই সাবধান ছিলেন। দ্বারের সম্মুখেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। গভীর ভাবাবেশে মহারাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবাবেশে তাঁর উজ্জ্বল কান্তি, অপূর্ব মুখশ্রী আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। বিস্মিত পুলকিত দর্শকগণ চারদিকে ভিড় করতে লাগল।"

মহীশূরের যাদবগিরিতে 'মেলকোট'-এ মন্দির দর্শনে গিয়াও মহারাজ সেই স্থানের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহে এমন আকৃষ্ট হন যে, সেস্থান তিনি সহজে ছাড়িতে চাহেন নাই। ব্যাঙ্গালোরে প্রাচীন ভক্তদের মুখে মহারাজের সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা শুনিয়াছি। বর্তমান ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সময় মহারাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ প্রথমবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সেইখানে গিয়াছিলেন। মহারাজের অভিপ্রায় মতো অভেদানন্দ মহারাজই ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করেন। তদুপলক্ষে তথায় এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। নগরীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা মহারাজ অভেদানন্দ মহারাজকে সেখানে পরিচিত করাইবার জন্য একটি বক্তৃতা করেন। আমরা কখনও কোথাও মহারাজের বক্তৃতার কথা শুনি নাই। সেইজন্য বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ নিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রায় কুড়ি মিনিট মহারাজ সেদিন ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতাদের খুব হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ সরল সুন্দর ইংরাজীতে ঠাকুর স্বামীজীর ভাবাদর্শ, আমেরিকাতে বেদান্ত প্রচার এবং স্বামী অভেদানন্দের প্রচারকার্যে সফলতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

মহারাজের কন্যাকুমারী দর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাদের বলিয়াছিলেনঃ "তীর্থস্থানে দেবমন্দিরে কোন মহাপুরুষের সঙ্গে যাবার সুযোগ হলেই সেই ক্ষেত্রমহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়।

"মহারাজের সঙ্গে আমরা যখন কন্যাকুমারী দর্শন করি তখন মনে হয়েছে সাক্ষাৎ জীবন্ত বালিকা যেন মধুর হাস্যে ভক্তদের মনপ্রাণ ভরে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু মহারাজের সঙ্গ ছাড়া অন্য সময়ে যখন নিজেরা গিয়েছি তখন কিন্তু সেই সজীব ভাব দেখিনি, মনেপ্রাণে তেমন সাড়াও দেয়নি।"

মাদ্রাজ মঠে প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের মুখে শুনিয়াছিলাম, মহারাজ নটরাজমূর্তি দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলেন,

যখন ভাবাবেশে নৃত্য করিতেন তখন পায়ের ভঙ্গি ঠিক ঠিক নটরাজের পায়ের ভঙ্গির মতোই দেখা যাইত।* মাদ্রাজ মঠের নিকটস্থ কপালেশ্বর মন্দিরে একদিন জনৈক ভক্ত একটি স্থান দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ কপালেশ্বর দর্শনান্তে দেবালয় প্রাঙ্গণের অন্যান্য মন্দিরসমূহ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শেষে চণ্ডেশ্বরের মন্দির দর্শন করিয়া, নিকটবর্তী বিল্ববৃক্ষের তলায় জপ করেন এবং স্থানটি ভালরূপে পরিষ্কার না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, এইসকল স্থান বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিল্ববৃক্ষমূল বাঁধাইয়া রাখিতে হয়, যাহাতে ভক্তগণের বসিয়া জপধ্যান করিতে সুবিধা হয়। পরে এই কথা মন্দির কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ায় তাহারা স্থানটি পরিষ্কার ও বিল্বমূলটি বাঁধাইয়া দিয়াছেন। [ক্রমশঃ]

* শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁড়ানো সমাধি অবস্থার (কেশবের বাড়িতে) চিত্রে তাঁহার হস্তদ্বয়ে 'বরাভীতি' মুদ্রা দেখা যায়, তাহা ঠিক যেন শিবের হস্তের 'মৃগমুদ্রা' ("মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং..." শিবের ধ্যান)।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীগুরুমূর্তিরূপে 'ঐং' বীজে পূজা ও 'হর হর', 'শিব শিব' বলিয়া আরাত্রিক করা হয় (সর্বত্রই দক্ষিণামূর্তি শিব শ্রীগুরুমূর্তি বলিয়া পরিচিত)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তবে স্বামীজী 'ওঁ হ্রীং' বলিয়া শুরু করিয়া সশক্তিক শ্রীগুরুদেবের (শিব-শক্তি অভেদ) 'শরণ' প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠাকুরের আরাত্রিকে "ধে ধে ধে লঙ্গ... বাজে মৃদঙ্গ" শিবের তাণ্ডবনৃত্যের তাল এবং স্তবের 'মোহংকষং' অজ্ঞানতিমিরহারী শ্রীগুরুমূর্তি স্মরণ করায়।

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও প্রায় একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্ব-মুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের 'দেখছেন'? 'কলকাতা' মানে অবশ্য শুধু কলকাতা নামক ভূখণ্ডটিই নয়, কলকাতা এখানে একটি প্রতীক। সারা পৃথিবীর মানুষ এবং সারা পৃথিবীই এখানে উদ্দিষ্ট। সুতরাং কলকাতার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, কলকাতার মাধ্যমে সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের দৃষ্টি প্রসারিত—মা সারা জগৎ অর্থাৎ সারা জগতের লোককে 'দেখছেন'। কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক।

আলোকচিত্র : স্বামী চেতনানন্দ

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরদিন বিকেলের অনেক আগেই বেড়িয়ে এসেছি আশ্রম থেকে। কেশিঘাট পার হয়ে এসেছি, কিন্তু সেই বাবাজীর দেখা পাইনি। তাঁর নামও জানা হয়নি সেদিন। তিনিও আমার পরিচয় জানতে চাননি। 'বাবাজী' বলেই তিনি আমাকে সম্বোধন করছিলেন। কিন্তু আমার গেরুয়া কাপড় আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালার দিকে কয়েকবার তাকালেও আমি কোন্ সম্প্রদায়ের সে-প্রশ্ন তিনি করেননি। অথচ এই প্রশ্নের উত্তর এখানকার অনেক প্রাচীন ও নবীন বৈষ্ণব বাবাজীদের কাছেই দিতে হয়েছে, যখন আমি তাঁদের কাছে তাঁদের সাধনপন্থা ও মন্দির-বিগ্রহাদির সম্পর্কে খুঁটি-নাটি বিষয় জানতে চেয়েছি। শুধু এই বৃদ্ধ সাধুটিকে দেখলাম ব্যতিক্রম। অনর্থক কোন কৌতূহল নেই। নিজের আনন্দেই নিজে মশগুল।

যমুনার ধারে ধারে উত্তরদিকে এগিয়ে চলেছি। বালির চড়া বাড়ছে, যমুনা ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে। বাঁদিকে চীরঘাট দেখা যাচ্ছে, এগিয়ে গেলাম সেদিকে। একটি কেলিকদম্বের প্রাচীন গাছ, তার ডালে শ্রীকৃষ্ণের একটি মাটির মূর্তি। নিচে বস্ত্রহরণের দৃশ্য স্মরণে কিছু গোপিনীর মৃন্ময়ী মূর্তি; আর গাছের ডালে ভক্ত দর্শনার্থীদের বেঁধে দেওয়া নানা রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো। ঘাটটি একসময় ভালই বাঁধানো ছিল। এখন যমুনা দূরে সরে যাওয়ায় ঘাট বলে মনে হয় না। নিচ দিয়ে ধুলোর রাস্তা। এখানেই ব্রজের অন্তরঙ্গ সাধিকাদের চরমতম পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেনঃ "লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।" এখানে লজ্জানিবারক নারায়ণ সর্বপাশ বিমুক্ত করে সেই পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ করিয়ে নিয়েছিলেন তাঁদের। কেউ কেউ বলেন, বড় পরিক্রমার পথে বস্ত্রহরণ ঘাটটি রয়েছে। আমার অত সংশয় নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছা নেই। এখানেই সেই দুরন্ত, সর্বস্বহরণকারী কালো ছেলেটির কদমগাছের ডাল থেকে যে রাঙাচরণ দু-খানি ঝুলে ছিল সেই শ্রীচরণ-দুটিকে স্পর্শ করে প্রণাম জানালাম। আর প্রণাম জানালাম সেই দিব্য-লীলার সাথী মহাতেয়াগিনী তপস্বিনীদের।

পথে নেমে এসে আরো এগিয়ে চলার সময় বাঁ-দিকে আবার রাস্তা ছেড়ে একটু উঠে আসতে হলো 'ইমলীতলায়'। এখানে এখনো রয়েছে সেই প্রাচীন তেঁতুলগাছ। যেখানে "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-কৃষ্ণস্বরূপ" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু "কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বৃন্দাবনে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তখন এই স্থান ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। তাঁর মহাভাবময় দিব্যজীবনের সাক্ষী হিসাবে সেই প্রাচীন গাছটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় ফাঁপা হয়ে গিয়েছে; শুধু বাকলের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে সেটি। গাছের গোড়া শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো, তাতে চরণচিহ্ন খোদাই করে দেওয়া আছে। এই গাছের একটি ডাল পাশের বাড়ির দেওয়াল বেয়ে ছাতের দিকে চলে গিয়েছে। প্রবাদ এই রকম, পাশের বাড়ির মালিক এই ডালটিকে একটু ছেঁটে দিতে গেলে দেখা যায় সেখান থেকে লাল রঙের রস গড়িয়ে পড়ছে। ভয় পেয়ে ডাল কাটা স্থগিত রাখেন তিনি। এখনও সেই ডাল সেই ভাবেই ঐ বাড়ির দেওয়ালের দিকে রয়ে গিয়েছে। এই পবিত্র গাছটি প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলাম মহাভাবের মূর্তবিগ্রহ সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীজীকে। চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁর বৃন্দাবন-বাস প্রসঙ্গে আছে ঃ

"অন্য দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে।
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নান ভিক্ষাদি নির্বাহ করেন অভ্যাসে।"

এখন এই স্থানটির দেখাশোনার ভার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠীর হাতে। তাঁরা সেবাদি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই করছেন। পিছনদিকে একতলা মন্দির, তার তিন প্রকোষ্ঠে রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই ও ষড়ভুজ গৌরাঙ্গবিগ্রহ পূজিত হচ্ছেন। সর্বদাই এখানে নামকীর্তন হচ্ছে। খুব সুন্দর লাগল এই তীর্থস্থানটিকে। 'ইমলীতলা' থেকে নেমে এসে একটু এগিয়েই 'শৃঙ্গার বটের' প্রাচীন স্থান। এখানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর 'সেবা-বিগ্রহ' আছেন। নাটমন্দিরের চত্বরের ডানদিকে একটি বহু প্রাচীন তমালগাছের গুঁড়িটুকু মাত্র এক বিশেষ ঘটনার সাক্ষী হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। তার পাশে একটি ঘেরা জায়গায় কিছু বালি ছড়ানো আছে, আর মন্দিরের মতো খুব ছোট একটি ঘরের দেওয়ালে একটি প্রাচীন পটে চিত্রিত আছে—শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গারবেশে পুষ্পাভরণে সাজিয়ে দিচ্ছেন। নিত্যানন্দের বংশধরেরা এখনো এখানকার সেবাপূজা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে প্রণাম জানিয়ে নেমে এলাম আবার পথে।

যমুনা ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। পরিক্রমার বর্তমান পথটি অতীতের যমুনার খাত মাত্র। এখন যমুনার প্রবাহ আর এই রাস্তার মাঝে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে নানা শাকসবজীর খেত। বাঁদিক ছেড়ে গেলাম আদিত্যটিলা ও মদনমোহনের মন্দির।

দূরে থেকেই দেখা যাচ্ছে ঝাঁকড়া একটি প্রাচীন কদমগাছ। অনেক শাখা-প্রশাখা নিয়ে পরিক্রমার রাস্তার ওপর সেটি ঝুঁকে পড়েছে। ক্রমে এসে পৌঁছালাম সেই গাছের নিচে। আগে যমুনার ধারা এই গাছের নিচ দিয়েই বয়ে যেত। আর এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক সেখানেই ছিল একটি গভীর দহ। যমুনার জল খানিকটা তার প্রবাহ ছেড়ে ভিতরে চলে এসে এই গাছের নিচে গভীরতর একটি দহের সৃষ্টি করেছিল। আজ যমুনা অনেক দূরে সরে গেলেও বর্ষাতে এই স্থানটিতে এখনো কিছু জল জমে। রাস্তায় জমা জলের মতো। গাছের গা দিয়ে নেমে এসেছে ধাপে ধাপে বাঁধানো লালপাথরের সিঁড়ি। বেশ বড় ঘাট।

ঘাটের দুই প্রান্তে গোলাকৃতি উঁচু বেদির মতো বাঁধানো। সেখানে বসা যায়। এইসব দেখে বেশ বোঝা যায়, এককালে এখানে রীতিমতো স্নানের ঘাটই ছিল। একটি বেশ বড় ডাল এখনো অনেকখানি বেঁকে নেমে আছে সামনের দিকে। প্রবাদ, এই ডাল থেকেই বৃন্দাবনের সেই দুর্ধর্ষ দস্যি কিশোরটি ঝাঁপ দিয়ে নেমে এসেছিল কালিয় দহে কালিয়নাগকে দমন করার জন্য। আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে এই কেলিকদমগাছের গোড়ায় প্রণাম করে, ডালটিকে একটু স্পর্শ করে পাশের বাঁধানো গোল বেদির ওপর বসলাম। সূর্যদেব তখন পশ্চিম আকাশে। এখানে সূর্যোদয় হয় দেরিতে, অস্তও যায় দেরিতে। এখনো সূর্যাস্তের দেরি আছে। সমস্ত গাছ কদমফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরা। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একটি ফুল তুলতে, কিন্তু তার পরেই মনে হলো এই পবিত্র গাছটির কোন অঙ্গহানি করা আমার উচিত নয়। কি অপূর্ব লীলার সাক্ষী এই গাছ। এই সময় ঝটপট শব্দ শুনেই তাকিয়ে দেখি মাথার ওপরেই একটা ডালে একটা ময়ূর বসে আছে। আমার মনে এলো দুশ্চিন্তা ঃ এই রে, ওপর থেকে ময়লা না পড়ে আমার মাথায়। কিন্তু আমার দুর্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়ে ময়লার বদলে ওপর থেকে পড়ল দুটি কচি পাতা সমেত একটি ছোট্ট কদম-ফুল। ময়ূরটি ঠোঁটে কেটে তা ফেলে দিল আমারই সামনে। সারা শরীর-মন পুলকিত হয়ে উঠল এই বিচিত্র ঘটনায়। ফুল তোলার ইচ্ছাটি এইভাবেই মিটিয়ে দিলেন কালীয়মর্দন গিরিধারীলাল তাঁর নিত্য অনুচর ময়ূরকে দিয়ে। চোখে জল এসেছিল এই অভিনব প্রাপ্তিতে। সাদরে মাথায় তুলে নিলাম ফুলটি। ঠিক এই সময়েই গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে এলেন সেই বৃদ্ধ বাবাজী।

দেখে মনে হলো স্নান সারা হয়ে গিয়েছে। সাদা কাপড় হাঁটু পর্যন্ত, গায়ে একটি সাদা উত্তরীয়। আজ হাতে এক জোড়া ছোট্ট মন্দিরা। অস্ফুট স্বরে গাইতে গাইতে এগিয়ে এলেন :

"নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি
অথবা যেদিকে ফিরাই আঁখি।
ভিতরে বাহিরে যেন হে নিরখি
তব রূপ মনোহর ॥
এই কর হরি দীন দয়াময়,
তুমি আমি যেন দুটি নাহি হয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়,
চিদ্ঘনশ্যামসুন্দর।
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর ॥"

তাঁকে আসতে দেখে আমি বেদি থেকে দাঁড়িয়ে উঠতেই তিনি মন্দিরাটি মাথায় ঠেকিয়ে ঐ গানের কলিটি গাইতে গাইতেই এই গাছটিকে একবার প্রদক্ষিণ করে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন। মন্দিরা দুটি একহাতে নিয়ে অন্যহাতে আমার গলায় হাত দিয়ে বললেন : "বাবাজী, ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন। এর পিছনেই ঐ যে দেখা যাচ্ছে ভাঙাঘর দু-তিনখানি, ওরই একটিতে আমার গোপাল থাকেন, আর তাঁর কাছে আমি থাকি।" বলেই বসে পড়লেন। এখন তাঁর লীলাস্মরণ হবে ভেবে বললাম : "গোপাল তো যমুনাতীরের কোন গাছের তলায় এখন বিকেলের বিশ্রাম সেরেছেন। এখন হয়তো এই কালীয়দমন ঘাটে তিনি এসেছেন তাঁর সখাদের নিয়ে। এবারে কি হবে বলুন তো?" আমার কথা শুনে বৃদ্ধ তাপস খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন : "হ্যাঁ, এইতো সেই জায়গা। এই সামনের জমা জলের জায়গাটাই ছিল কালিয় হ্রদ, সেখানে কালিয়নাগ সপরিবারে থাকত। গরুড়ের ভয়ে সমুদ্রমধ্যস্থ রমণক দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু দুষ্ট নাগের স্বভাব যাবে কোথায়! তার তীব্র বিষের জ্বালায় বৃন্দাবনের পশুপাখি যে ঐ হ্রদের কাছে আসত সে পুড়ে মরত। ভাগবতের দশম স্কন্দের ষোড়শ অধ্যায়ে বলা হচ্ছে, এই বিপদ থেকে বৃন্দাবন ও কালিন্দীকে রক্ষা করবার জন্য একদিন—

'তং চণ্ডবেগবিষবীর্যমবেক্ষ্য তেন
দুষ্টাং নদীঞ্চ খলসংযমনাবতারঃ।
কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গ-
মাস্ফোট্য গাঢ়রশনো ন্যপতদ্ বিষোদে।'

"সেই প্রচণ্ড বিষধর কালিয়নাগের বিষে বিবর্ণ যমুনাকে দেখে নিজের পীত বসনখানি কোমরে শক্ত করে মালকোঁচা মেরে বেঁধে এই কদমগাছে উঠে, বুঝলে কিনা ভাই, ঐ যে ঝুলে পড়া ডালটি দেখছ ওটি বেয়ে জলের ধারে নেমে গিয়ে, ডান করতল দিয়ে বাম বাহুতে আঘাত করে চিৎকার করে আমার শ্রীহরি প্রাণকৃষ্ণ, যিনি দুষ্টদমনে অবতীর্ণ, তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন বিষের হ্রদে। তারপরে কি হলো একটু চোখ বন্ধ করে ভাবুন দেখি ভাই। শুরু হলো খেলা। খেলাই বলব। লীলাময় খেপিয়ে তুলতে লাগলেন সাপকে—যাতে সে কৃষ্ণ-অঙ্গ স্পর্শ করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়। একটা জিনিস জানবেন, এইসব রাক্ষস অসুর দৈত্যেরা কেউই সাধারণ নয়। বহুজন্ম তপস্যার ফলে এরা এইসব শরীর পেয়ে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর তাঁর কৃপাস্পর্শে কেউ মুক্ত হয়েছে, কেউ কৃতার্থ হয়ে নবজীবন লাভ করে ভক্তরূপে পরিচিত হয়েছে। এইভাবে কালিয়কে খেপিয়ে তুলে কৃষ্ণ টেনে আনলেন কাছে। তারপরে,

'তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং
শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিত-সুন্দরাস্যম্।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং
সন্দশ্য মর্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ ॥'

—"সেই ঘন কালো মেঘের মতো শ্যামবর্ণের কিশোর, বক্ষে যাঁর শ্রীবৎসচিহ্ন, পীতাম্বর যাঁর পরিধানে, মুখে মৃদু হাসি, পদ্মের ভিতরের রঙটির মতো লালিমা যাঁর শ্রীচরণে, সেই অপূর্ব শোভন শ্রীকৃষ্ণকে ঐ ভয়ানক সাপ জড়িয়ে ধরে ছোবল মারল। উঃ, কি ভীষণ কাণ্ড! আর আমি ভাবতে পাচ্ছি না। যেন আমারই বুকে ছোবল দিল। ভয়ে আমি সিঁটিয়ে আছি, যেমন তখন সমস্ত বৃন্দাবনের সকলের মনের অবস্থা। সবাই খবর পেয়ে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে ছিল এখানেই। হা-হুতাশ করছিল, আমার মতোই—কি সর্বনাশ হলো! কিন্তু পারবে কেন আমার

গোপালের সঙ্গে ? একটু পরেই শুরু হলো উল্টো খেলা—জলের ওপর ভেসে উঠল বিশাল শতশির নাগ। আর তার মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ঠাকুরটি। শুধু কি দাঁড়িয়ে। তাঁর দুষ্টুমির তো শেষ নেই। আমাদের জন্য একটু ভাবনামাত্রও নেই। ঐ ভয়ঙ্কর সাপের বিরাট ফণার ওপর দাঁড়িয়ে নৃত্য-গীতাদি চতুঃষষ্ঠী কলার আদি গুরু নাচতে লাগলেন তাণ্ডব নৃত্য। আহা মরি মরি সে কি নাচ ভাই, কি বলব। সেই দুষ্টদমনকারী দনুজমর্দক কৃষ্ণ কালিয়ের, শতশিরের যে যে ফণাটি উদ্ধত ছিল, সেগুলি নৃত্যের তালে তালে বিমর্দিত করে দিতে লাগলেন। শেষে তার এই মরণোন্মুখ রক্তবমনকারী অবস্থায় তার পত্নী-পুত্ররা জল থেকে উঠে এসে আমার ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইল। আহা, নাগপত্নীদের সেই প্রার্থনা-স্তুতি কি অপূর্ব। তারা বলল ঃ 'এই কালিয়ের কত জন্মের তপস্যার ফলে জানিনা আজ লক্ষ্মীরও প্রার্থনীয় আপনার এই দুর্লভ চরণ স্পর্শলাভ হলো।'

'ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ।'

"যে-চরণরজঃ লাভ করে ভাগ্যবান ভক্তেরা স্বর্গ-বাসের ইচ্ছা, পৃথিবীর আধিপত্য, ব্রহ্মপদ, পাতালের অধিকার, যোগসিদ্ধি, এমন-কি মুক্তি পর্যন্ত কামনা করে না সেই চরণরেণু কি করে কালিয় পেল আমরা জানি না। যখন এত কৃপা সে পেয়েছে তখন তাকে এবার দয়া করে ক্ষমা করুন। কালিয়কে বধ করলে আমরা পুত্রকন্যা নিয়ে বিধবা হব। আমার দয়াল কানু সেই প্রার্থনায় ছেড়ে দিলেন কালিয়নাগকে। সে ভগবানের চরণে প্রণাম জানিয়ে ছেড়ে গেল এই হ্রদ। কিন্তু তার নাম রয়ে গেল আজও। তাই এই জায়গা আজও 'কালিয়দমন ঘাট' বলেই খ্যাত। তারপরে যা হলো তা আরও সুন্দর। এতক্ষণ এই ঠান্ডা জলে এত কাণ্ড-কারখানা করার ফলে আমার গোপালের দারুণ শীত করতে লাগল। তিনি গিয়ে উঠলেন ঐ যে দেখছ দক্ষিণদিকের উঁচু টিলা, সেখানে, যেখানে মদনমোহনের মন্দির এখন হয়েছে। তাঁর শীত কাটিয়ে দিতে সূর্যদেব তাঁর দ্বাদশ অনুচর নিয়ে ছড়িয়ে দিলেন প্রচণ্ড তাপ। তাঁর শরীরের শীত কমল, ঘামতে লাগলেন তিনি। গা বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল। নতুন তীর্থ জন্ম নিল সেখানে—প্রস্কন্দনতীর্থ। আর টিলাটির নাম হলো আদিত্যটিলা। এই তো হলো তাঁর লীলাধ্যান। এবার চলুন বাবাজী একটু আমার কুঞ্জে—গোপালের বৈকালিক ভোগের প্রসাদ ধারণ করবেন।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতক্ষণ তাঁর লীলা অনুধ্যান শুনেছিলাম—তাঁর এই প্রসাদ গ্রহণের অনুরোধে ফিরে এলাম বাস্তব জগতে। আমার হাত ধরে তিনি নিয়ে চললেন তাঁর কুঠিয়ায়। কিন্তু গুন্‌গুন্ করে গান চলছেই ঃ

"কৃষ্ণ কেশিসূদন, কংসারি জয়, কালিয়দমন।
কল্পপাদপ কেশব, কমলেশ কমললোচন।
শ্রীহরি নমো নারায়ণ—নারায়ণ নারায়ণ।"

ঘাটের কাছেই তাঁর জীর্ণ কুটীর, কিন্তু ঘরের ভিতরে কি অপূর্ব পরিবেশ। ঘরের মেঝেতে একটি কাঠের তক্তার ওপরে একটি চটের বস্তা, তার ওপর একখানি কাঁথা। এই হলো বাবাজীর শয্যা। বাসন বলতে দু-তিনটি মাটির থালা ও হাঁড়ি-সরা। এছাড়া ঘরে আছে একটি জলের কলসী, একটি মাটির প্রদীপ। বিছানায় মাথার দিকে একটি ছোট কাঠের চৌকির মতো আছে। তার ওপরে নামাবলীর আসনে ছোট্ট বালগোপালের বিগ্রহ। তাঁর সামনে কাঁচা পাতার ঠোঙায় কিছু মিছরি ও ছোট একতাল মাখন, একটি পাতা দিয়ে ঢাকা দেওয়া। গোপালের গলায় মল্লিকাফুলের মালা, সমস্ত আসনে তুলসী আর মল্লিকাফুলে সুন্দর করে সাজানো। ছোট্ট ঘরের এই অনাড়ম্বর চেহারা হলেও ঘরে একটা মন্দিরের পরিবেশ। হাল্কা ধূপের গন্ধ। বাবাজীর সাধন-কুটির। গোপালের প্রসাদ নিয়ে তাঁকে প্রণাম জানালাম। বাবাজীকে নমস্কার জানিয়ে ফিরে চললাম আমার ডেরার দিকে। বৃন্দাবনের পথে সন্ধ্যা অনেক আগেই নেমেছে। [ক্রমশঃ]

শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পুত্রদারগৃহাদীনাং নাশে
তাৎকালিকী মতিঃ।
ধিক্ সংসারং ইতীদৃক্
স্যাদ্বিরক্তের্মন্দতা হি সা ॥ ৬ ॥

অন্বয়

পুত্রদারগৃহাদীনাম্ (পুত্র, স্ত্রী, গৃহাদি), নাশে (ধ্বংস হলে), ধিক্ সংসারং ইতি (এই সংসারকে ধিক্), ঈদৃক্ (এই প্রকার), তাৎকালিকী (তৎকালীন), মতিঃ (বুদ্ধি), স্যাৎ (উৎপন্ন হয়), সা হি (তা-ই), বিরক্তেঃ (বৈরাগ্যের), মন্দতা (মন্দভাগ)।

অনুবাদ

স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদির ধ্বংস হলে 'এই সংসারকে ধিক্' এই প্রকারে যে তৎকালীন (সাময়িক) বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাকেই মন্দবৈরাগ্য বলে ॥ ৬ ॥

বিবৃতি

ইহামুত্রফলভোগে বিরাগকে বৈরাগ্য বলা হলেও, অধিকারীভেদে তার প্রকারভেদ দেখা যায়। যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার ভেদে চারপ্রকার বৈরাগ্যের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এদের মধ্যে যতমান, ব্যতিরেক ও একেন্দ্রিয় নিম্নাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেবলমাত্র বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যই পরবৈরাগ্য বলে কথিত। পরবৈরাগ্যই তীব্রবৈরাগ্য ও তদ্ব্যতিরিক্ত সকল প্রকার বৈরাগ্য মন্দবৈরাগ্য। এই শ্লোকে গ্রন্থকার মন্দবৈরাগ্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলছেন, যিনি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদির ধ্বংস প্রত্যক্ষ করে তৎক্ষণাৎ সংসারের প্রতি বৈরাগ্যসম্পন্ন হন সেই ব্যক্তি মন্দবৈরাগ্যবান। কারণ, হঠাৎ সিদ্ধান্তের ফলে পরক্ষণেই জগতের কোন সৌন্দর্য অথবা চিত্তসুখকর জগৎ-সামগ্রীর দর্শনে পুনরায় জগতের সত্যতা তাঁর মনে উদিত হয়। ফলে পূর্বোদিত বৈরাগ্য স্থিতিলাভ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ তিন প্রকারের বৈরাগ্যর কথা বলেছেন—তীব্র, মন্দ ও মর্কট বৈরাগ্য। তীব্রবৈরাগ্য প্রসঙ্গে তাঁর কথা আমরা ৩নং শ্লোকের বিবৃতিতে উল্লেখ করেছি। এক-একটি করে যে ত্যাগ করছে সেই মন্দবৈরাগ্যবানের কথাও বলা হয়েছে সেখানে। 'মন্দবৈরাগ্যের' কথা বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "মন্দবৈরাগ্য—হচ্ছে হবে—ঢিমে তেতালা।" মর্কটবৈরাগ্য প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি : "আর-একরকম বৈরাগ্য তাকে বলে মর্কটবৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেকদিন সংবাদ নাই। তারপর একখানা চিঠি এল—'তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম হইয়াছে'।"

(কথামৃত, পৃঃ ৪৯১)

অস্মিন্ জন্মনি মা ভূবন্
পুত্রদারাদয়ো মম।
ইতি যা সুস্থিরা বুদ্ধিঃ সা
বৈরাগস্য তীব্রতা ॥ ৭ ॥

অন্বয়

অস্মিন্ জন্মনি (এই জন্মে), মম (আমার), পুত্রদারাদয়ঃ (পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি), মা ভূবন্ (না হোক), ইতি (এইরকম), যা (যে), সুস্থিরা (সুদৃঢ়), বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), বৈরাগ্যস্য (বৈরাগ্যের), সা (তা-ই), তীব্রতা (তীব্রতা)।

অনুবাদ

'এই জন্মে আমার পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি না হোক' এইপ্রকার যে সুদৃঢ় বুদ্ধি, তা-ই বৈরাগ্যের তীব্রতা ॥ ৭ ॥

পুনরাবৃত্তিসহিতো লোকো
মে মাঽস্তু কশ্চন।
ইতি তীব্রতরত্বং স্যান্মন্দে ন্যাসো
ন কোঽপি বা ॥ ৮ ॥

অন্বয়

পুনরাবৃত্তিসহিতঃ (পুনর্জন্মসহ), কশ্চন (কোন), লোকঃ (লোক), মে (আমার), মা অস্তু (না হোক), ইতি (এইপ্রকার), [বৈরাগ্য], তীব্রতরত্বং (তীব্রতর), স্যাৎ (হয়), মন্দে বা (কিন্তু মন্দবৈরাগ্যে), কঃ অপি (কেউই), ন ন্যাসঃ (সন্ন্যাসে অধিকারী হয় না)।

অনুবাদ

'পুনর্জন্মসহ কোন লোক আমার না হোক' এইরূপ যে বৈরাগ্য তা-ই তীব্রতর বৈরাগ্য। মন্দ-বৈরাগ্যবান কেউই সন্ন্যাসে অধিকারী হয় না ॥ ৮॥

বিবৃতি

তীব্রবৈরাগ্য উৎপন্ন হলে ঐহিক ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ হয়। কিন্তু তীব্রতর বৈরাগ্য হলে ঐহিক ও পারত্রিক এবং জন্মান্তরের বাসনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ হয়। এই শ্লোকের শেষাংশে সন্ন্যাসে অনধিকারী বক্তব্যদ্বারা প্রকারান্তরে অধিকারীও জ্ঞাপন করা হয়েছে। মন্দবৈরাগী অনধিকারী, তীব্র ও তীব্রতর বৈরাগীই সন্ন্যাসের অধিকারী। তীব্রবৈরাগীর মধ্যে সমর্থ ও অসমর্থ ভেদে দুই অধিকারীর পক্ষে দুই প্রকারের সন্ন্যাস বিধান করে পরবর্তী শ্লোকে কুটীচক ও বহুদকের কথা বলছেন:

যাত্রাদ্যশক্তিশক্তিভ্যাং তীব্রে ন্যাসদ্বয়ং ভবেৎ।
কুটীচকো বহূদশ্চেত্যুভাবেতৌ ত্রিদণ্ডিনৌ ॥৯॥

অন্বয়

তীব্রে (তীব্রবৈরাগ্যে), যাত্রাদি (পর্যটনাদির), অশক্তি-শক্তিভ্যাং (অসামর্থ্য-সামর্থ্যভেদে), কুটীচকঃ (কুটীচক), চ (এবং), বহূদঃ (বহূদক), ইতি (এইপ্রকার), ন্যাসদ্বয়ং (দুই প্রকারের সন্ন্যাস), ভবেৎ (হয়), এতৌ উভৌ (এই উভয়প্রকার সন্ন্যাসীই), ত্রিদণ্ডিনৌ (ত্রিদণ্ডী হয়ে থাকেন)।

অনুবাদ

তীব্রবৈরাগ্যে পর্যটনাদির অসামর্থ্য-সামর্থ্যভেদে সন্ন্যাসী দুই প্রকার—কুটীচক এবং বহূদক। এই উভয়প্রকার সন্ন্যাসীই ত্রিদণ্ডী হয়ে থাকেন ॥ ৯ ॥

বিবৃতি

কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ড ধারণ করে থাকেন। ত্রিদণ্ড হলো শিক্য (শিকে), জলপবিত্র (জল ছাঁকবার বস্ত্র), কৌপীন ও কাষায়বেশ।

দ্বয়ং তীব্রতরে ব্রহ্মলোকমোক্ষবিভেদতঃ।
তল্লোকে তত্ত্ববিদ্ধংসো লোকেঽস্মিন্
পরমহংসকঃ ॥১০॥

অন্বয়

তীব্রতরে (তীব্রতর বৈরাগ্যে), ব্রহ্মলোকমোক্ষ-বিভেদতঃ (ব্রহ্মলোকলাভ ও মোক্ষলাভ বিভেদহেতু), দ্বয়ং (দুই প্রকার [দৃষ্ট হয়]), তৎলোকে (সেই ব্রহ্ম-লোকে), তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু), হংসঃ (হংসাখ্য), [সন্ন্যাস অবলম্বন করেন], অস্মিন্ লোকে (ইহলোকেই), [তত্ত্ববিৎ—তত্ত্বজ্ঞ], পরমহংসকঃ (পরমহংসাখ্য) [সন্ন্যাস অবলম্বন করেন]।

অনুবাদ

তীব্রতর বৈরাগ্যেও ব্রহ্মলোক লাভ ও মোক্ষলাভ এই দুই প্রকার ফলের বিভেদ দেখা যায়। ব্রহ্মলোকে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হংসাখ্য সন্ন্যাস এবং তত্ত্বজ্ঞ ইহলোকেই পরমহংসাখ্য সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ॥ ১০ ॥

বিবৃতি

কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসীর বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এখানে হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসের বিভেদ প্রদর্শন করা হয়েছে। উভয়ের ভিত্তি একই—তীব্রতর বৈরাগ্য, কিন্তু উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা আছে—ব্রহ্ম-লোকলাভ ও মোক্ষলাভ। হংসাখ্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মলোক-লাভ করে ক্রমমুক্তির স্তরে মোক্ষলাভ করে থাকেন। কিন্তু ইহজন্মেই যিনি মোক্ষাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভেচ্ছু, তিনি পরমহংস সন্ন্যাসের অধিকারী।

'হংস' সন্ন্যাসী একদণ্ডী, শিখারহিত, যজ্ঞোপবীত-ধারী, শিক্য ও কমণ্ডলু-হস্ত, গ্রামে একরাত্রিনিবাসী এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত অনুষ্ঠানে তৎপর। 'পরমহংস' সন্ন্যাসী একদণ্ডী, মুণ্ডিতমস্তক, শিখাযজ্ঞোপবীতরহিত, সর্বকর্মপরিত্যাগী ও এক-মাত্র আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন।

এতেষাং তু সমাচারাঃ প্রোক্তাঃ
পারাশরস্মৃতৌ।
ব্যাখ্যানেঽস্মাভিরত্রায়ং পরহংসো
বিবিচ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়

—এতেষাং তু (এই সন্ন্যাস-সকলের), সমাচারাঃ (বিবরণ), পারাশরস্মৃতৌ (পারাশরীয় স্মৃতিতে) প্রোক্তাঃ (কথিত হয়েছে), অত্র (এখানে), অয়ং (এই বিষয়ে), ব্যাখ্যানে (ব্যাখ্যাকল্পে), অস্মাভিঃ (আমাকর্তৃক), পরহংসঃ (পরমহংস সন্ন্যাস), বিবিচ্যতে (বিবেচিত হয়েছে)।

অনুবাদ

এই সন্ন্যাস-সকলের বিবরণ পারাশরীয়স্মৃতিতে কথিত হয়েছে। এখানে এখন ব্যাখ্যাকল্পে পরমহংস সন্ন্যাস বিবেচিত হয়েছে ॥ ১১॥

জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানংশ্চেতি
পরহংসো দ্বিধামতঃ।
প্রাহুর্জ্ঞানায় জিজ্ঞাসোর্ন্যাসং
বাজসনেয়িনঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

জিজ্ঞাসুঃ (জিজ্ঞাসু), চ (এবং), জ্ঞানবান (জ্ঞানী), ইতি (এইপ্রকারে), পরহংসঃ (পরমহংস সন্ন্যাসী), দ্বিধা (দুই প্রকার), মতাঃ (কথিত)। জ্ঞানায় (জ্ঞানলাভার্থ), জিজ্ঞাসোঃ (জিজ্ঞাসুর), ন্যাসং (সন্ন্যাস), বাজসনেয়িনঃ (বাজসনেয়িগণ), প্রাহুঃ (বলে থাকেন)।

অনুবাদ

পরমহংস সন্ন্যাসী দুই প্রকার—জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। বাজসনেয়িগণ (বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লিখিত), জিজ্ঞাসুর সন্ন্যাস জ্ঞানলাভার্থই বলে থাকেন ॥ ১২ ॥

প্রব্রাজিনো লোকমেতমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি হি।
এতস্যার্থস্তু গদ্যেন বক্ষ্যতে মন্দবুদ্ধয়ে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়

প্রব্রাজিনঃ (প্রব্রাজিগণ), হি (যেহেতু), এতম্ লোকম্ (এই ব্রহ্মলোক), ইচ্ছন্তঃ (আকাঙ্ক্ষা করে), প্রব্রজন্তি (প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন), এতস্য (এই শ্রুতির), অর্থঃ (অর্থ), তু (ও), মন্দবুদ্ধয়ে (মন্দবুদ্ধিগণের জন্য), গদ্যেন (গদ্যব্যাখ্যায়) বক্ষ্যতে (বলব)।

অনুবাদ

'প্রব্রাজিগণ এই ব্রহ্মলোক লাভের ইচ্ছায় প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন'[১] —এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ মন্দবুদ্ধিগণের জন্য গদ্যব্যাখ্যায় বলব ॥ ১৩ ॥

[ক্রমশঃ]

১ 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি'—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।২২

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি শিষ্যগণ ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেন। তৎসম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার লিখিত একখানি বহি[১] অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি বেশি অবসর না থাকায় মনে করিয়াছিলাম বহিখানির দুই-চারি পাতা পড়িয়া দুই-চারি ছত্র লিখিয়া দিব। কিন্তু একবার পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম। বহিখানি পড়িয়া মনে হইল, এরূপ একজন অসামান্য ব্যক্তির সহিত ভারত-ভ্রমণ কি সৌভাগ্য! একটিও তুচ্ছ বিষয়ক কথা নাই, সমস্তই উচ্চ জীবনের কথা। অথচ বহিখানি নীরস নয়। নির্মল আনন্দে ভরা। যেমন সুন্দর ভাষা, ভাবে চিন্তায় তেমনি বিচিত্র। সচরাচর এইরূপ দেখা যায় যে, মানুষ মনে করে যে যাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ মতের মিল নাই, কেমন করিয়া তাহাকে প্রীতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেওয়া যায়? কিন্তু একজন মানুষের সঙ্গে কোনও আর একজনের সব বিষয়ে মত এক হইবে, ইহা অসম্ভব। ইহা আশা করাই অনুচিত। সত্য শিব সুন্দরের অনন্ত রূপ, শক্তির অনন্ত বিকাশ; ইহার সমস্তটা কোন মানুষই দেখিতে পায় না; সকলে ঠিক একই অংশও দেখে না। তাই বাস্তবিক যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা, কর্মী ও ভাবুক, তাঁহারা মতের মিল না থাকিলেও অপর সত্যদ্রষ্টা কর্মী ও ভাবুকদের মর্যাদা বুঝেন ও সম্মান করেন। এইজন্য দেখিতে পাই, বিবেকানন্দ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে ক্রিয়াশীল, অধর্মের সহিত সমরপন্থী এবং দীক্ষা দ্বারা অহিন্দুকেও নিজ ক্রোড়ে আশ্রয়-দানে যত্নবান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে মুসলমানের, সকল জাতির অন্ন ও জল গ্রহণ করিতেন এবং স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন।[২]

বুদ্ধদেব তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই মর্মে উপদেশ দিয়াছিলেন, 'তোমরা নিজেই নিজের আলোক হও। নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজের মোক্ষ সাধন কর।' বিবেকানন্দও ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা বিফল হয় নাই।*

১ 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' by Sister Nivedita, Udbodhan Office, Bagbazar, Calcutta,

২ "He spoke of the inclusiveness of his conception of the country and its religions; of his own distinction as being solely in his desire to make Hinduism active, aggressive, a missionary faith; of 'don't-touch-ism' as the only thing he repudiated." (p. 155)

* প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২০, ১৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ), পৃঃ ১১৩—১১৪

সংগ্রহঃ প্রদ্যোৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

“চাঁদামামা সকলের মামা”

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যেকোন মুহূর্তে যেকোন অবস্থায় তাঁর কাছে যাওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আসর সাঙ্গ হয়নি। দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে কালের চিরপ্রবাহে ভাসমান। হাঁটাচলারও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই যানবাহনে গুঁতোগুঁতির। শুধু মনটাকে একটু ঠেলে দেওয়া —এঘর থেকে ওঘরে। ভোগের ঘর থেকে ভাবের ঘরে। নিমেষে সেই পূতসঙ্গ। ভক্তজন পরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথের কোলে তানপুরা। তিনি সুর বাঁধছেন। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন: “এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটা ভেঙে ফেলি। কি টংটং—আবার তানা নানা নেরে নুম্ হবে।” সেই বিনোদ, বিনোদবিহারী সোম, মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র, যাঁর আর এক নাম ছিল পদ্মবিনোদ, তিনিও বসে আছেন। রসিকতা করে বলছেন: “বাঁধা আজ হবে, গান আর-একদিন হবে।” দেখছি একপাশে বসে আছেন ভবনাথ। তিনি বলছেন: “যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্তি হয়।” নরেন্দ্রনাথ তানপুরাটি কাঁধে তুলছেন। আঙুলে সুর ছাড়তে ছাড়তে। খল্লজের জোয়ারি এদিক-ওদিক করতে করতে গম্ভীর মুখে বলছেন: “সে না বুঝলেই হয়।” ঠাকুরের মুখে সেই স্নেহের হাসি। একটি হাত তুলে বলছেন: “ওই আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।”

সেদিনের আসরে আমি ছিলাম না। আজ আমি আছি। এখন আমার নিরঙ্কুশে ঠাকুরের লীলা। আমি যখন খুশি যেখানে খুশি ঢুকে পড়তে পারি। একপাশে বসে পড়তে পারি আসন পেতে।

গিরিশ বলছেন: “আপনার কথা আর কি বলব। আপনি কি সাধু?”

ঠাকুর প্রসন্ন মুখে বলছেন: “সাধু-টাধু নয়। আমার সত্যই তো সাধুবোধ নেই।”

গিরিশ বলছেন: “ফচকিমিতেও আপনাকে পারলাম না।”

আমার মুখেও হাসি ফুটবে। আমার ঠাকুর সাধু হতে যাবেন কেন? তিনি যে অবতার। অবতার-বরিষ্ঠ। ঠাকুর কি বলছেন শুনি। তিনি গিরিশ-চন্দ্রকে সমর্থন করছেন। ফচকিমির রাজা আমি। আমি তো সবাইকে নিয়ে আনন্দের হাটবাজার বসাতে এসেছিলাম। শুনবে তাহলে কেমন ফচকে— “আমি লাল পেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বললে, আজ বড় যে রঙ, লালপাড়ের বাহার। আমি বললুম, কেশবের মন ভুলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।”

খুব জমে গেছে আজ। একটু আগে বাইরের বারান্দায় নরেন্দ্রনাথ আর গিরিশচন্দ্রে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। আমার ঠাকুরের তো আবার শিশুর মতো কৌতূহল। জানতে চাইলেন: “কি কথা হচ্ছিল?”

নরেন্দ্রনাথ বললেন: “আপনার কথা। আপনি লেখাপড়া জানেন না, আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা হচ্ছিল।”

ঠাকুর শিশুর মতো মুখের ভাব করে বললেন: “সত্য বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার, ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা’। আবার গীতার সার কি? গীতা দশবার বললে যা হয়: ‘ত্যাগী ত্যাগী’।”

আমি তো ঠাকুরের মুখে এই সার কথাটি শুনব বলেই বসেছিলাম। শাস্ত্রের অভাব নেই। অভাব নেই তর্ক-বিতর্কের। ন্যায়, শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য, বেদ, বেদান্ত। যুগ যুগ ধরে কত পণ্ডিতের কত

চুলচেরা বিশ্লেষণ। তিনি কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন। তিনি এক না দুই। তিনি পুরুষ না প্রকৃতি। তিনি সাকার না নিরাকার। শ্বাস কোন নাসায় টানতে হবে, ছাড়তে হবে কোন পথে, ধরে রাখতে হবে কতক্ষণ ইত্যাদি বহুতর পন্থা ও পদ্ধতি সমন্বিত শাস্ত্রের পাহাড় জমে গেছে। এক জীবনে পড়ে শেষ করা যাবে না। আর পড়তে পড়তেই যদি জীবন শেষ হয়ে গেল তাহলে তাঁকে আর কাছে পাব কিভাবে। আমবাগানে ঢুকে যদি ডালে ডালে আমের হিসাব নিয়েই মেতে থাকি তাহলে আস্বাদন হবে কখন। সেই অনুভূতিতে পেঁছাতে চাই। কোন অভিনয় নয়, কোন ভণ্ডামি নয়। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই মিথ্যাকে, এই স্বপ্নকে আশ্রয় করে যে-ভাবে থাকা উচিত সেই ভাবে থাকব। ঠাকুরকে ধরে ঠাকুরের লীলায় থাকব।

শুনি, এইবার ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে কি বলছেন? ঈশ্বরকে কিভাবে পাওয়া যায়? ঠাকুর এই মুহূর্তে তরল থেকে গভীর ভাবে চলে গেছেন। ঠাকুর বলছেন: "সরল হলে শীঘ্র ঈশ্বরলাভ হয়।" আর কাদের হয় না, কিছুতেই হয় না—সেকথাও বলছেন তিনি: "প্রথম যার বাঁকা মন, সরল নয়; দ্বিতীয় যার শুচিবাই; তৃতীয়, যারা সংশয়াত্মা।"

নিজের ভিতরের দিকে তাকাই। বেদ-বেদান্ত কি করবে? ভড়ং দেখিয়ে কয়েকদিনের জন্যে কয়েক-জনকে ধোঁকা দেওয়া যায়। আগে নিজের স্বরূপ খুঁজি। আমি কি সরল? না আমি কুচুটে। আমার কি উকিলে বুদ্ধি? আমি কি বিষয়ী, কৃপণ? রক্ত পরীক্ষার মতো আত্মবিশ্লেষণ করি। যদি পরীক্ষায় দেখা যায় আমি কুটিল তাহলে আমাকে সরল হতে হবে। তা না হলে ঠাকুর আমাকে এই আসর থেকে দূর করে দেবেন। বলবেন—যাও, তুমি তোমার জগৎ নিয়ে মেতে থাক। এই আসরকে কলঙ্কিত করো না। তোমার এলাকা ভিন্ন। ঠাকুর শুচিবাই বললেন কেন? ওটা মনের বিকার। বিকারগ্রস্ত মন ঈশ্বরের কি ধারণা করবে? তার জীবন তো শুচি-অশুচির বিচারে হারিয়ে গেছে। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না করে সে তো নিজেই অচ্ছুৎ। আর সংশয়াত্মা। যার সবেতেই সংশয়, সে তো কারোর কথা বিশ্বাস করবে না। সে শুদ্ধ বিচার করবে। সংশয়ের জালে বিষয়ভুক মাকড়সার মতো বসে থাকবে। তার সঙ্গে ঠাকুরের কি সম্পর্ক। একপাশে বসে বসে ভাবছি—আমি হব। আমি সরল হব। সমস্ত সংশয় ঝেড়ে ফেলব।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলছেন, আমি শুনছি: 'আর একটি কথা।" কি কথা? "জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও। অনেকে বলে অমুক বড় জ্ঞানী, বস্তুতঃ তা নয়। বশিষ্ঠ এত বড় জ্ঞানী, পুত্রশোকে অস্থির হয়েছিল। তখন লক্ষ্মণ বললেন, 'রাম এ কি আশ্চর্য! ইনিও এত শোকার্ত!' রাম বললেন, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে; যার আলোবোধ আছে, তার অন্ধকারবোধও আছে, যার ভালবোধ আছে, তার মন্দবোধও আছে; যার সুখ-বোধ আছে, তার দুঃখবোধও আছে। ভাই, তুমি দুই-এর পারে যাও, সুখ-দুঃখের পারে যাও, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও।' তাই বলছি, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও।" ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলছেন। আমি শুনছি। যাঁকে বলছেন, আমি তাঁর পদনখের যোগ্য নই; কিন্তু আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। হয় তো পারব না, ব্যর্থ হব, তবু চেষ্টা করব।

ঠাকুর আমার মনের কথা শুনতে পেলেন। গিরিশচন্দ্র যেই বললেন: "আপনার কৃপা হলেই সব হয়। আমি কি ছিলাম কি হয়েছি।" ঠাকুর অমনি বলছেন: "ওগো তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খাও। তারপর রোগ ভাল হলো। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হলো, না আপনি ভাল হলো, কে বলবে?"

ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন: "লক্ষ্মণ লব-কুশকে বললেন, তোরা ছেলেমানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা-পাষাণী মানবী হয়ে গেল। লব-কুশ বললে, ঠাকুর সব জানি, সব শুনেছি। পাষাণী যে মানবী হলো সে যে মুনিবাক্য ছিল। গৌতমমুনি বলেছিলেন যে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন; তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে না মুনিবাক্যে কে বলবে বল।"

ঠাকুর আর একটু যোগ করলেন ঃ "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এখানে যদি তোমার চৈতন্য হয় আমাকে জানবে হেতুমাত্র। চাঁদামামা সকলের মামা। ঈশ্বর ইচ্ছায় সব হচ্ছে।"

সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র হাসতে হাসতে ঠাকুরকে প্যাঁচে ফেলে দিলেন ঃ "ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো। আমিও তো তাই বলছি।" সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন। পাশ কাটাতে চেয়েছিলেন ঠাকুর। গিরিশ ধরে ফেলেছেন, ঠাকুরই তো ঈশ্বর।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি বিখ্যাত নটের দিকে। মনে মনে বললুম, আমিও আপনার মতো সংশয়শূন্য হব। বিশ্বাস, পরিপূর্ণ বিশ্বাস। বিশ্বাস থেকে টলব না। সংস্কার আছে কিনা জানি না। না থাকে এবারে সংস্কার তৈরি হবে। পরের বারে হবে। না হয় তারও পরের বার। আশা ছাড়ছি না।

ঠাকুর বলছেন ঃ "শাস্ত্রের সার গুরুমুখে জেনে নিতে হয়। তারপর সাধন-ভজন। একজন চিঠি লিখেছিল। চিঠিখানি পড়া হয় নাই, হারিয়ে গেল। তখন সকলে মিলে খুঁজতে লাগল। যখন চিঠিখানি পাওয়া গেল, পড়ে দেখলে পাঁচসের সন্দেশ পাঠাবে আর একখানা কাপড় পাঠাবে। তখন চিঠিটা ফেলে দিলে, আর পাঁচসের সন্দেশ আর একখানা কাপড়ের যোগাড় করতে লাগল। তেমনি শাস্ত্রের সার জেনে নিয়ে আর বই পড়বার কি দরকার? এখন সাধন-ভজন।"

আপনিই তো গুরু। আপনার মুখেই তো শুনছি। সুরেন্দ্রকে বলছেন। সিমুলিয়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। ডফ্ট কোম্পানীর মুৎসুদ্দি। প্রথম জীবনে ঘোর নাস্তিক। বন্ধু রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে ঠাকুরকে দেখতে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, অত্যন্ত অবিশ্বাসী মন নিয়ে। আর তো ফেরা হলো না অবিশ্বাসে। আটকে গেলেন অমৃতরসে। সেই মিত্রমশাই বসে আছেন ঠাকুরের পাশটিতে। ঠাকুর তাঁকে বলছেন ঃ "সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ; তোমাদের পক্ষে তা নয়। তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।"

এই তো আমার পথ। আমি তো সন্ন্যাসী নই। গৃহী। গৃহীর পথ তো ঠাকুর বলে দিলেন। একটু নির্জনতা খুঁজে নেব। কোথাও না পাই, নিজের মনে পাবো। সেইখানেই সরে গিয়ে আকুল হয়ে ডাকব ঠাকুরকে। আর বিষয় থেকে মন তুলে নেব। তাহলেই তো ত্যাগ হলো। মনে ত্যাগ।

ঠাকুর আবার সুরেন্দ্রকে বলছেন ঃ "মাঝে মাঝে এসো। ন্যাংটা বলত।" 'ন্যাংটা' হলেন সেই তোতাপুরী, ঠাকুরের অদ্বৈত বেদান্ত সাধনার গুরু, পাঞ্জাবের লুধিয়ানা মঠের পুরীনামা দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত অদ্বৈতবাদী নাগা সন্ন্যাসী। ঠাকুর বলছেন ঃ "ন্যাংটা বলত, ঘটি রোজ মাজতে হয়; তা না হলে কলঙ্ক পড়বে। সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার।"

মাঝে মাঝে কেন? সর্বসময়েই যদি আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকি! তাহলে! মনের একটি দরজা, ভাবের দরজা খুললেই তো দেখতে পাব, তিনি বসে আছেন সপার্ষদ শেষ তো হয়নি। ক্ষণকাল থেকে মহাকালে চলে গেছেন। ঘর থেকে গেছেন ভাবের ঘরে।

নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগ

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

বিভিন্ন রাগরাগিণীকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। কি কাব্য রচনায়, কি সঙ্গীত রচনায় এই মানসিকতা তাঁর সৃষ্টিকর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও কাব্যে রাগসঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সঙ্গীতকেও সেইরূপ দেখিতে চাই। সঙ্গীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগরাগিণী।" সৃষ্টি-সাধনায় রাগরাগিণীর ভাবের রসের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলেই প্রকৃতির বর্ণনায়, বিশেষ সময়ের বর্ণনায় এবং মানবমনের বিশেষ অবস্থার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণীর উল্লেখ করেছেন। 'সঙ্গীতের মুক্তি' নামক প্রবন্ধে তিনি রাগরাগিণীর সঙ্গে মানবমনের গভীর সম্পর্কের কথা বলেছেন। তাঁর লিখিত রচনাগুলি পড়লে মনে হয় ভৈরবী রাগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর বেশকিছু গান ভৈরবীতে নিবদ্ধ। যেমন 'তুমি একটু কেবল বসতে দিও' অথবা 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো'। এই গানগুলির মধ্যে ভৈরবী রাগের ভাবমূর্তিটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। ধ্রুপদী গানগুলির মধ্যে ভৈরবীতে নিবদ্ধ। 'কেমনে ফিরিয়া যাও' গানটি অথবা সুরফাক তালে রচিত 'আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি' গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভৈরবী রাগের নির্বাচন তাঁর সঙ্গীতকে শুধু যে সুরসৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করেছে তা নয়, অসীমের সঙ্গেও যুক্ত করেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন: "মোট কথা, রসানুভূতি লাভ করে রসোত্তীর্ণলোকে উপনীত হওয়ার জন্যই তাঁর সঙ্গীতের রচনা ও প্রতিফলন। তারই জন্য তাঁর সঙ্গীত লৌকিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় ধারার অনুসারী হয়ে আরাধ্য জীবন-দেবতার সঙ্গে ছিল নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। তাঁর সঙ্গীতের সার্থকতাও ছিল তাই।" ভৈরবী বিরহ, পূজা ও অধ্যাত্মভাবের উদ্বোধক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগ-শোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি, ভৈরবী রাগিণী সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয় —আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যিই তো আমাদের কিছুই স্থায়ী নয়, কিন্তু প্রকৃতি কী এক অদ্ভুত মন্ত্র-বলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে। সেইজন্যই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে পারি। ভৈরবীতে সেই চিরসত্য, সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে।" ভৈরবীর করুণ সুরের বিচিত্র ভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখিত কয়েকটি চিঠিতে জানিয়েছেন এবং ভৈরবীর মিড়ের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের গভীর সম্পর্কের কথা বলেছেন। রাগসঙ্গীতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বহুবার বিভিন্ন রচনায় ভৈরবীর উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাও ভৈরবী রাগের ভাবাশ্রয়ী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তিনি সর্বান্তঃকরণে ভালবেসেছিলেন। কবিতার মধ্যে রাগরাগিণীর ব্যবহারের এটিও একটি বিশেষ কারণ। 'তপোভঙ্গ' কবিতায় ভৈরবী রাগের উল্লেখ তাৎপর্য-পূর্ণ। রাগরাগিণীর ভাবাশ্রয়ী বলে তাঁর বহু কবিতা তাঁর কাব্যরচনার মৌলিকতাকে প্রমাণ করে। ভৈরবীর

ভাবটি করুণ। এতে আছে প্রভাতের কল্পনা। কবির ভাষায় "ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির বিরহ-ব্যাকুলতা।" এই ভাবটি 'ভৈরবী গান' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি আর উদাস মনে বিষাদের সুরে গান শুনতে চান না। করুণ সুরের মোহে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পথিক-পরাণ যেতে যেতেও পিছনে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু তিমির রাত্রির মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হবে। তিনি জগতের দুঃখ-মোচনের জন্য ব্যাকুল। তাই তাঁর সঙ্কল্প ঃ

ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি
বিষাদশান্ত শোভাতে।
ওই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই প্রভাতে—
মোর গৃহছাড়া এই পথিকপরাণ
তরুণ হৃদয় লোভাতে॥

*

যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষবার—
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল কেশভার।
যারা গৃহছায়ে বসি সজলনয়ন
মুখ মনে পড়ে সে-সবার॥

হায়, অতৃপ্ত যত মহৎবাসনা
গোপন মর্মদাহিনী,
এই আপনা-মাঝারে শুষ্ক জীবনবাহিনী।
ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশাকাহিনী॥

*

ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রুসজল ভৈরবী আর গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়নবাষ্পে ছেয়ো না॥

'তুমি প্রভাতের শুকতারা' কবিতায় দুটি রাগ—'সাহানা' ও 'ভৈরবী' একত্রিত হয়ে কবিতাটিকে ভাব-সমৃদ্ধ করেছে ঃ

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।
সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে
রক্ত অবগুণ্ঠনের নিচে
শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার জ্বালো
সাহানার সুরে।
সকালবেলায় বিরহের আকাশে
শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্ছনা।

'ভৈরবী' বিরহ বিষাদের। 'সাহানা' বিবাহ-উৎসবের। এই দুটি ভাব স্পষ্টভাবে কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে।

এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 'গীতাঞ্জলি'র ১৪৭ নং গান 'জীবনে যত পূজা হলো না সারা' 'ভৈরবী'তেই নিবদ্ধ। কবি জীবনের জয়-পরাজয় সম্পর্কে সচেতন। জীবনের দুঃখ-আঘাত-বেদনাকে ছাড়িয়ে উচ্চতর এক জীবনাদর্শের কথা এই গানেতে পাই। শুধু অধ্যাত্মসাধনা নয়, সকল প্রকার জীবন-সাধনার মর্মকথাটি এখানে ধ্বনিত হয়েছে। অসম্পূর্ণতার বেদনাই তাঁকে নিয়ে যাবে পরম অমৃতময়ের কাছে। তাই কবি বলেছেন ঃ

জীবনে যত পূজা হলো না সারা,
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

অবশেষে কুষ্ঠরোগ নিরাময় সম্ভব হলো

রাউল টুনলে

(Roul Tunley)

একজন সুইজারল্যান্ডের ডাক্তার দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রাম 'কারিগিরি'র হাসপাতালে ঢুকলেন। অঞ্চলটিতে খুব আখের চাষ হয়। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা রোগীদের অধিকাংশই কাছাকাছি মাঠে কাজ করে। এদের মধ্যে একজনের অভিযোগ হচ্ছে যে, তার হাতে যেন পিঁপড়ে চলে বেড়াচ্ছে। ডাঃ আর্নেস্ট ফ্রিটস্কি একটি পেনসিলের ডগা লোকটির হাতের ওপর আস্তে আস্তে চালিয়ে গেলেন, রোগীটি টেরই পেল না। তার পা-দুটিও ঐরকম অসাড়। লোকটি এমনিতে স্বাভাবিক, তার কোন যন্ত্রণা নেই, কিন্তু ডাক্তার বুঝলেন যে, তার লক্ষণগুলি হচ্ছে সবচেয়ে ভীতিকর অসুখ কুষ্ঠের। ফ্রিটস্কি লেপ্রসি (কুষ্ঠ) মিশনের ডাক্তার, তিনি 'ভীতিকর' রোগটির নাম বললেন না; বললেন ঃ "তোমার নার্ভের (স্নায়ুশিরার) অসুখ হয়েছে। আমি তোমায় ভাল করে দেব, তবে তোমায় কয়েক মাস ধরে নিয়মিত ট্যাবলেট খেতে হবে। তুমি তা করবে তো?" লোকটি আগ্রহের সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিলে। ডাক্তার খুশি হলেন এই ভেবে যে, তিনি আর একজন লোককে দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে পারলেন।

ডাঃ ফ্রিটস্কি নতুন ধরনের চিকিৎসা করেন। তাঁর চিকিৎসা কয়েকটি ওষুধের সংযোগে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সমর্থিত এই চিকিৎসায় রোগীকে সুস্থ করতে খরচ বেশি পড়ে না এবং হাজার হাজার রোগীকে অসীম দুর্ভোগ থেকে তা রক্ষা করেছে। মাদার টেরেসা এই চিকিৎসার সুফল দেখে খুবই উৎসাহিত। "সুইজারল্যান্ডের নতুন ধরনের চমকপ্রদ ওষুধগুলি অনেক রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছে"—বললেন তিনি। ভেনিজুয়েলার এক কুষ্ঠরোগের চিকিৎসাকর্মী বললেন ঃ "এ যেন দীর্ঘ অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলো দেখতে পাওয়া।"

নিঃশব্দ আক্রমণ

সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। ডাঃ রঙ্গরাজ, যিনি বহু বছর যাবৎ ভারতে ও আফ্রিকায় এই রোগের চিকিৎসায় রত আছেন, বললেন ঃ "রোগটি ধীরে ধীরে অজান্তে কোন যন্ত্রণা না দিয়ে রোগীকে পঙ্গু করে ফেলে।" কোন রকম জ্বালা-যন্ত্রণা না থাকায় রোগী জানতেই পারে না যে তার রোগ হয়েছে; কিন্তু রোগের সংক্রমণ অজান্তে ত্বক ও হাত-পায়ের স্নায়ুশিরাকে আক্রমণ করে, যার ফলে হাত-পায়ের সাড় থাকে না। এর ফলে ছোটখাট কাজ (যেমন চাবি ঘোরানো, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা প্রভৃতি) করার সময় রোগীর হাতে ও পায়ে অজান্তে চাপ পড়ে। বারবার আঘাত (যেমন পুড়ে যাওয়া, থেঁতলেযাওয়া, জীবাণু-সংক্রমণ প্রভৃতি) পাওয়ায় হাড় সঙ্কুচিত হয়। চিকিৎসা না হলে রোগী অন্ধও হতে পারে।

দুই-একজন ছাড়া, কুষ্ঠরোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গরিবদেরই হয়। ঘেঁষাঘেঁষি করে বহু লোকের সঙ্গে বাস, গৃহাভাব, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা না থাকা—এসবগুলিই রোগ-বৃদ্ধির সহায়ক। লুইসিয়ানার কার্ভিলে শহরের বিখ্যাত কুষ্ঠ হাসপাতালের পুনর্বাসন বিভাগের ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান, কুষ্ঠরোগবিশেষজ্ঞ পল ব্র্যান্ড বলেছেন ঃ "আমরা যদি দারিদ্র্য দূর করতে পারি, তবে হয়তো সকল জায়গা থেকে কুষ্ঠরোগকেও হঠাতে পারব।" ১৯৮০-র দশকের শুরু পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কুষ্ঠরোগ বেড়ে চলছিল। ভারতবর্ষে তালিকাভুক্ত কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ২৫ লক্ষ ছিল। পরের বিশ বছরে তা বেড়ে ৪০ লক্ষে দাঁড়ায়। এই বাড়ার

কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং উন্নততর রোগনির্ণয় পদ্ধতির প্রয়োগ। বর্তমানে এই সংখ্যা ৩০ লক্ষ। সংখ্যা হিসাবে ব্রেজিল ২,৩২,০০০ রোগী নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে, যদিও আফ্রিকা মহাদেশের কতকগুলি ছোট ছোট দেশে রোগের হার আরও বেশি। এমন-কি ইউরোপে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে আগত অধিবাসীদের (immigrants) জন্য রোগীর সংখ্যা খুব কম নয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কুষ্ঠবিভাগের প্রধান ডাঃ এস. কে. নুর্ডিন বলেন: "এমন কোন দেশ নেই, যেখানে কুষ্ঠরোগী নেই, এমন-কি সুইজারল্যান্ডেও আছে।" তিনি মনে করেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে এক কোটি থেকে এক কোটি বিশ লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে।

নতুন ধারণার জন্ম

প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে লোকে ধরে নিয়েছিল যে, কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয় না। বিংশ শতাব্দীতে নরওয়ের ৩২ বছর বয়স্ক ডাঃ জেরহার্ড হেনরিক আর্মর হ্যানসেন আবিষ্কার করলেন যে, কুষ্ঠরোগের কারণ হচ্ছে এক ধরনের জীবাণু 'মাইকোব্যাকটিরিয়াম লেপ্রি' যা খুব সম্ভব নাকের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। যেহেতু পূর্বে রোগটি বংশগত, অথবা পাপ করার জন্য ভগবান প্রদত্ত শাস্তি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেজন্য ঐ আবিষ্কারকে বহুদিন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতস্থ এক ব্রিটিশ চিকিৎসক ডাঃ রবার্ট ককরেন জার্মানির তৈরি রাসায়নিক ওষুধ 'ড্যাপসোন' দিয়ে এই রোগের চিকিৎসা শুরু করেন, যা প্রথমে অদ্ভুত রকম ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিন্তু কুষ্ঠরোগের জীবাণু এই ওষুধের বিরোধিতা করার ক্ষমতা (resistance) শীঘ্রই অর্জন করায় ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের আগেই কোন কোন দেশে ৪০ শতাংশ রোগীর পক্ষে এই চিকিৎসা কার্যকরী হলো না। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে সুইজারল্যান্ডের 'সিবা অ্যান্ড গাইগি' নামক ওষুধের কারখানা, নতুন দুটি অত্যন্ত কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কার করল—রিফাম্পিসিন ও ক্লোফাজিমিন। ওষুধ-দুটির ড্যাপসোন-বিরোধী জীবাণুকে মারার ক্ষমতা প্রচুর, কিন্তু এদের দাম অত্যন্ত বেশি। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে সিবা-গাইগিতে কর্মরত এক ভারতীয় কুষ্ঠরোগ-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শান্তারাম ইয়লকার-এর মাথায় এল যে, রোগীকে প্রতিদিন ড্যাপসোন খাইয়ে এবং মাসে একদিন রিফাম্পিসিন খাওয়ালে হয়তো ব্যয়সমস্যার সমাধান হতে পারে। সিবা-গাইগি সেনেগালের ডাকারে এবিষয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা (trial) করে দেখেছে যে, আবেক্ষিতভাবে (supervised) মাসে একদিন রিফাম্পিসিন খাওয়ানোতে অনাবেক্ষিতভাবে প্রতিদিন খাওয়ানোর তুলনায় খরচ শতকরা এক দশমাংশ কম পড়ে, কিন্তু ফল একই হয়।

আশ্চর্যরকম ফল

যখন ডাক্তার ইয়লকার ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল ঘোষণা করলেন, তখন বেশ খানিকটা হৈ চৈ হলো। এর পরে ভারতের সিবা-গাইগি, ব্রেজিলে এবং ফিলিপাইনসে এইভাবে পরীক্ষা চালিয়ে একই ফল পেল। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সারা বিশ্বে এই 'বহু ঔষধসংযুক্ত চিকিৎসা' (Multiple drug therapy, MDT) অনুমোদন করল এবং কমজীবাণুগ্রস্ত (paucibacillary) রোগীদের (যারা অন্যকে সংক্রামিত করে না এবং যাদের রোগ শরীরের মাত্র একাংশে) জন্য ড্যাপসোন ও রিফাম্পিসিন, এবং জটিল বহু জীবাণুগ্রস্ত (multibacillary) রোগীদের (যাদের স্নায়ুশিরা বা শরীরের আভ্যন্তরিক কোন অংশ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে), তাদের তিনটি ওষুধ (ওপরের দুটির সঙ্গে ক্লোফাজিমিন) ব্যবহার করতে অনুমোদন করল। ডাঃ নুর্ডিন বলেছেন: "এই প্রথম কুষ্ঠরোগীকে সত্যসত্যই আরোগ্য করা হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীরা নিজেদের বাড়িতে বাস করে সাধারণ কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবে।"

যেখানে যেখানে এই 'বহু ঔষধসংযুক্ত চিকিৎসা' করা হয়েছে, সেখানে সেখানে ফল হয়েছে অভূতপূর্ব। সিয়েরা লিওন-এ ছয় বছরে রোগীর সংখ্যা কমে গিয়ে ১১,১৭০ থেকে ১৬৮০-তে দাঁড়িয়েছে;

শ্রীলঙ্কায় তিন বছরে এদের সংখ্যা ৮০ শতাংশ কমেছে। এমন-কি ইথিয়োপিয়া, যেখানে চিকিৎসা কার্য চালানো খুব কঠিন, সেখানেও রোগীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা অচিরেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করলেই হবে না, রোগের কলংকচিহ্নও দূর করতে হবে। অনেক রোগীই চিকিৎসার জন্য নিজে থেকে আসে না। তাদের খুঁজে বের করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটে একটি ২০ বছরের সুন্দরী মেয়ের কুষ্ঠরোগ হওয়ায় তাকে গোয়ালঘরে বাস করতে দেওয়া হয় এবং অন্যের সঙ্গে মিশতে বা কোন সামাজিক কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ স্বাস্থ্যকর্মীরা তার খোঁজ পেয়ে তাকে পূর্বোক্ত নতুন চিকিৎসার আওতায় এনেছেন; এবং আশা করা যায় মেয়েটি শীঘ্রই তার সাধারণ জীবন ফিরে পাবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে লোকের ভীতি এত বেশি যে, রোগীরা তাদের আত্মীয়-স্বজন বা সমাজের কাছ থেকে সহানুভূতি প্রায় আশা করতেই পারে না। একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সিয়েরা লিয়োন-এ জিম নামে একটি যুবকের হাতের কতকটা লাল দেখে, পরীক্ষা করে ডাক্তার জানতে পারলেন যে, সেটা কুষ্ঠরোগ। ছেলেটি ট্যাবলেট খেতে রাজি হলো, কিন্তু বাড়ির লোক তাকে বাড়িতে রাখতে রাজি হলো না। ছেলেটিকে হয়তো ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হতো, কিন্তু ডাক্তার তাকে তাঁর হাসপাতালে রেখে ছয়মাসে তাকে ভাল করে ফেললেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া গেল না। স্কুলে পড়াশুনা করে ছেলেটি এখন শিক্ষক হয়েছে এবং বিয়ে করে সংসারী হয়ে সুখে আছে।

এছাড়া আরও সমস্যা আছে। যাদের এই রোগ হয়েছে, তাদের যন্ত্রণা না হওয়া পর্যন্ত কেউ ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না। তাছাড়া, দূরত্বের জন্য এই রোগের বিশেষজ্ঞের কাছে গরিব লোকের পক্ষে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এর ওপর গরিব দেশগুলিও এই রোগ-চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেয় না। তবে টিভির মাধ্যমে প্রচারের ফলে কিছু কিছু সুবিধা হয়েছে। একটি এগার বছরের ছেলেকে তার স্কুলের শিক্ষক যখন তার কুষ্ঠরোগের জন্য স্কুল ছাড়তে বলেছিল, ছেলেটি তখন উত্তর দিয়েছিল: "আপনার আরও ভাল করে জানা উচিত ছিল। আমার ডাক্তার বলেছেন যে, কুষ্ঠরোগ সেরে যায় এবং আমি স্কুলে আসতে পারি।" অসুখ সম্বন্ধে ভয় সব দেশে সমান নয়। ইন্দোনেশিয়ায় চীনা রোগীদের রাত্রে চিকিৎসা করা হয়, কারণ কুষ্ঠকেন্দ্রে দিনের বেলায় তারা আসতে চায় না। পশ্চিম জাভাতে ভয় ততটা নয়; কুষ্ঠরোগীদের কাছে লোকে মাছ ইত্যাদি কেনে।

সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সমর্থনে কুষ্ঠরোগ-জীবাণু স্বারা আক্রান্ত আর্মাডিলো নামক জন্তু থেকে জীবাণু সংগ্রহ করে, উত্তাপের সাহায্যে তাদের মেরে রোগ-নিবারক টিকা তৈরি হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই রোগের জীবাণুকে ল্যাবরেটরিতে চাষ করে বংশবৃদ্ধি করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এই জীবাণুর সমগোত্রীয় জীবাণু (যাদের ল্যাবরেটরিতে চাষ করা সম্ভব) দিয়ে টিকা তৈরি করে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহু লোককে ঐ টিকা প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এইসব টিকা গ্রহণ-কারীদের কুষ্ঠরোগ হয় কিনা, তা দশ বছর ধরে দেখতে হবে। যেসব রোগী রোগজনিত অঙ্গহানি হয়ে পঙ্গু হয়েছে, তাদের অস্ত্রোপচার বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে; এর ফলে অনেকের বেঁকে যাওয়া আঙ্গুল (claw hand) ঠিক হয়ে যাচ্ছে। অনেকের পঙ্গু হওয়া হাত-পাকে কর্মক্ষম করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

সৌজন্য: **Reader's Digest, March, 1991, pp. 151-156**

ভাষান্তর: জলধিকুমার সরকার

গ্রন্থ-পরিচয়

পত্র-সাহিত্যে একটি সংযোজন

স্বামী চৈতন্যানন্দ

স্বামী প্রেমেশানন্দজীর পত্র-সংকলন : সংকলক : সচ্চিদানন্দ ধর। পরিবেশক : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০০০৩। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শকে যাঁরা জীবনের ধ্রুবতারা করে জীবনযাপন করেন, তাঁরা কখনো একঘেয়ে হন না, এক সুরে পোঁ পোঁ করে বাজেন না। তাঁদের জীবনে নানাভাবের সমন্বয় দেখা যায়। তাঁদের জীবনে প্রকটিত হয় জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের লক্ষণসকল। এই চারভাবের সমন্বিত আদর্শের একটি জীবন স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের। তিনি নিজের জীবনকে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আদর্শে গঠন করে হৃদয়াকাশকে প্রজ্বলিত করেছিলেন। সেই প্রজ্বলিত দীপশিখা দিয়ে তিনি কত যে মুমুক্ষু মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারকে দূরীভূত করেছিলেন তার হিসাব কে রাখে! তাঁর সংস্পর্শে বহু মানুষ এসেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে বহু চিঠি লিখে বা ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তাঁরা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থে বেশ কিছু মূল্যবান চিঠি সংকলক সচ্চিদানন্দ ধর সংগ্রহ করতে পেরেছেন। চিঠিগুলি সংগ্রহ করতে যে তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই চিঠিগুলির মধ্যে নানা বিষয় ও ভাবের সমাবেশ ঘটেছে। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক সেগুলি পড়ে উপকৃত হবেন। চিঠিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য—তিনি আচার্যের আসনে বসে উপদেশ দিয়ে লেখেননি। তিনি অতি আপনজনের মতো, বন্ধুর মতো নানা জটিল প্রশ্নের সহজ সরলভাবে উত্তর দিয়েছেন। কি সাংসারিক, কি দার্শনিক, কি ছাত্রের কর্তব্য সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর কখনো হাসি-ঠাট্টা বা কখনো কৌতুকের মধ্য দিয়ে দিয়েছেন। যে যেমন ব্যক্তি, যাঁর সঙ্গে তাঁর যেমন সম্পর্ক ঠিক সেই-ভাবেই তাঁকে তিনি উত্তর দিয়েছেন।

সংসারের মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়ে জীবননির্বাহ করা বর্তমানে মানুষের পক্ষে দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। এই সব সমস্যা এবং সংকট উত্তীর্ণ হয়ে সুন্দর ও আদর্শ জীবনযাপনের একটি যথার্থ পথ নির্দেশ করেছে এই সংকলন গ্রন্থটি।

স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ একজন সাহিত্য-চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কাজেই তাঁর ভাষা যে সাহিত্যগুণধর্মী হবে তাতে আর সন্দেহের কি আছে! চিঠির ভাষা প্রচণ্ড গতিশীল। একটি চিঠি পড়তে আরম্ভ করলে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায়। সব চিঠিগুলি না পড়ে থামা যায় না। ভাষার মধ্যে উপমার ছড়াছড়ি। সুতরাং ধর্মপিপাসু ব্যক্তি ছাড়াও নিছক সাহিত্যরসিক ব্যক্তিরাও চিঠিগুলি পড়ে আনন্দ উপভোগ করবেন। নমুনাস্বরূপ একটি চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

"আমি বহু বৎসর ধরিয়া পাদ্রীগিরি করিতেছি। কত চমৎকার সুযোগ্য লোকের নিকট 'রামকৃষ্ণ' প্রচার করিয়াছি। কিন্তু অতি অল্প লোকই রামকৃষ্ণ চায়। দেবতুল্য লোক দেখিয়া সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি, কিন্তু হায় 'বুকে চাকু মাইর‍্যা চইলা গেল। হায় রে রে বেইমান।' কত যে গেল কি বলিব। শোন আর একটি ফক্কড়ী গান—'জঙ্গলা কখনো পোষ না মানে। / সাধ করে আমি পোষেছিলাম টিয়ে।/ ধান ছোলা দিতাম কটোরা ভরিয়ে। / পড়াবার কালে প্রাণে দাগা দিয়ে / উড়ে গেল জঙ্গলা বন যেখানে ॥/ জঙ্গলা কখনো পোষ না মানে।' আবার আমার কি সেই গান গাইতে হবে?" [পৃঃ ২৭০-২৭১]

সংকলিত গ্রন্থের যথাস্থানে পত্র-প্রাপকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকায় রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অনেক পাঠক তাঁদের খুবই পরিচিত সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তকে দেখতে

পাবেন। তাঁদের অতীতের জীবনধারা সম্পর্কে জেনে খুশি হবেন।

প্রারম্ভে স্বামী প্রেমেশানন্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থে কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে, যা না থাকলে ভাল হতো। সাধারণ পাঠকের কথা স্মরণ করে গ্রন্থের মূল্য কিছু কম করলে ভাল হতো।

সব ধর্মের একই মূলসূত্র

জলধিকুমার সরকার

ধর্ম ও জীবনঃ রণজিৎ কুমার সেন। নায়ক বুক হাউস, ৮১/১ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬। মূল্যঃ কুড়ি টাকা।

একশ কুড়ি পৃষ্ঠার এই বইটি ১৯টি প্রবন্ধের সমষ্টি; তাছাড়া এতে আছে 'সুভাষিত' শিরোনামায় ৩৮টি ছোট লেখা যেগুলি লেখকের ভাষায় 'দৈব-প্রেরণায় এই দীন সেবকের নিজস্ব উক্তি বা প্রকৃত অর্থে মূল দৈব উক্তি'। সব প্রবন্ধগুলিই বিভিন্ন সময়ে প্রণব, বিশ্ববাণী, গায়ত্রীমাতা, আভা, প্রবর্তক প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলির বিষয়গুলি, যেমন ধর্ম ও জীবন, চতুঃশ্লোকী ভাগবত, প্রার্থনার রূপ, সপ্তশ্লোকী চণ্ডী, যোগদর্শন, জৈন ও বৌদ্ধদর্শন, বৌদ্ধতন্ত্র ও চড়ক, গুরুগ্রন্থ সাহিব, কোরাণে ধৈর্য ক্ষমা ও সম্প্রীতির বাণী, বাউল সাধনা, ত্রিনাথের পাঁচালী প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে খাপছাড়া লাগে। এর কারণ হয়তো এই যে, এগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার জন্য লেখা হয়েছিল। লেখকের মতে তিনি "এই গ্রন্থে হিন্দু, মুসলমান ও শিখধর্মের নানা শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ আলোচনার মাধ্যমে সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি সূত্র আবিষ্কার করার প্রয়াস" করেছেন। লেখক আরও বলেছেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রতিটি প্রবন্ধে লেখকের জ্ঞানের গভীরতা ও পড়াশুনার বিস্তৃতি প্রকাশ পেয়েছে। এর ফলে এই পুস্তকে পাঠক পাবেন বেদে কি কি উপবেদ ও বেদাঙ্গ আছে; চতুঃশ্লোকী ভাগবত বা সপ্তশ্লোকী চণ্ডী বলতে ঠিক কি বুঝায়, তন্ত্রসাধনার বৈজ্ঞানিক দিক, জৈন ও বৌদ্ধদর্শনের, শিখধর্মের ও ইসলামধর্মের মূলকথা, বৌদ্ধতন্ত্র ও বাউল সাধনার ইতিহাস, সন্ধ্যামন্ত্রের অর্থ প্রভৃতি। এগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে যেকোন পাঠককে বেগ পেতে হতো। একখানি পুস্তকে এতগুলি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা পাঠকের দিক থেকে খুবই লাভজনক সন্দেহ নেই। লেখক সংস্কৃতজ্ঞ এবং পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি অন্যূন ষাটটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

'সুভাষিত' শিরোনামায় লিখিত বিষয়গুলিতে (ঈর্ষা, তপস্যার ধন, স্বার্থ পরার্থ ও পরমার্থ, চলা, সিম্ফোনী, ভারতকথা প্রভৃতি) লেখক নিজস্ব চিন্তা-ধারাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন, তবে তাঁর ভাষার কুহেলিকা থেকে ভাব উদ্ধার করা সহজ ব্যাপার নয়। বইটি তথ্যবহুল হলেও লেখকের প্রকাশভঙ্গির প্রশংসা করা যায় না। পুস্তকের সর্বত্র ভাষার এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি জায়গা তুলে ধরা হচ্ছেঃ "মন্দ্রিত বীণার তারে তারে এই জিজ্ঞাসার বাণী ধ্বনিত হতে হতে তার সমগ্র সত্তা জুড়ে যে অনিন্দ্য সিম্ফোনীর সৃষ্টি হয়, সেই সুরই তার জীবনের মূলগত সুর" (পৃঃ ১১১); "সাধক হচ্ছে তার সাধনার স্তরে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যে অনির্বচনীয় জ্যোতিচ্ছন্দের অবিকল্প স্থিতিস্বরূপতায় আচ্ছন্ন হয়, সেটিই অহংশূন্যে আত্মোপলব্ধি" (পৃঃ ৪৮); "বিজ্ঞানালোককে প্রাণ-কেন্দ্রে নামিয়ে এনে প্রাণের পরিশুদ্ধির দ্বারা প্রাণকে স্বচ্ছ করে সমষ্টির ভিতর একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠা করাই তন্ত্রসাধনার লক্ষ্য" (পৃঃ ৫১)। পুস্তকের বিষয়-বস্তুগুলির অধিকাংশই দুরূহ; সে-ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সরল হলে বইটি পাঠকের আরও উপভোগ্য হতো।

তবে একথা স্বীকার্য যে, পুস্তকে যেসব বিভিন্ন ধরনের তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তাতে এইরূপ একটি বই ঘরে থাকলে প্রয়োজনে, বিশেষতঃ ধর্ম-আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

পরিদর্শন

মেঘালয়ের রাজ্যপাল মধুকর দিঘে গত ১৩ মে চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন করেন।

ত্রাণ

বাংলাদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ

বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে ত্রাণকার্য আরম্ভ হয়েছে। এপর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে বনসখালি, সীতাকুণ্ডু, আনুয়ারা, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম জেলার সদর ও পটিয়া উপজেলার ৩১৯৪টি পরিবারের মধ্যে ১২,৭২২ কিলোঃ চাল, ৩২৯৪ কিলোঃ ডাল, ২০৫০ কিলোঃ চিড়া, ১৫০০ দেশলাই বাক্স, ২৫০০ বাসনপত্র, ২৪৬২টি শাড়ি, লুঙ্গি ও ধুতি, ৩৬২৯টি সাবান এবং ৩৮৪টি পলিথিনের সীট বিতরণ করা হয়েছে।

আসাম বন্যাত্রাণ

শিলচর আশ্রম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ-কার্য আরম্ভ করেছে। শিলচরের আশপাশের অঞ্চল চাতলা, বারুয়া এবং শ্রীকোনা অঞ্চলে বন্যাপীড়িত রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করছে। করিমগঞ্জ আশ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচশো শিশুকে দুধ ও বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ৩৫০ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ, ১১০ কিলোঃ শিশুখাদ্য, প্রচুর সংখ্যক ধুতি, শাড়ি এবং পোশাক-পরিচ্ছদ শিলচর আশ্রমে পাঠানো হয়েছে।

বিহার অগ্নিত্রাণ

জামশেদপুর আশ্রমের মাধ্যমে সিংভূম জেলার নিমডি ব্লকের ফারাঙ্গা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১৯টি পরিবারকে ৫০০ কিলোঃ চাল, ৩৭টি ধুতি, ৪৯টি শাড়ি ও ১১৩টি গামছা দেওয়া হয়েছে।

উড়িষ্যা অগ্নিত্রাণ

পুরী মঠের মাধ্যমে পুরীর পেন্টাকোটার নুলিয়া পাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে গৃহহীন ৬৪১টি পরিবারকে গত ১৬ মে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শাড়ি, ধুতি ও শিশুদের পোশাক মিলিয়ে মোট ২৪৩২টি বস্ত্র এবং উড়িষ্যা সরকার প্রদত্ত ৬৪১ সেট বাসনপত্র দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন

বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম জেলায় ঝড়ে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য ঢাকা আশ্রম একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ

বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামঞ্চিলি মণ্ডলের লাক্কাভরম গ্রামে ও এস. রায়ভরম মণ্ডলের ধর্মভরম গ্রামে ১১৩টি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে।

গুণ্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের লক্ষ্মীপুরম ও চন্দ্রমৌলিপুরমে আশ্রয়গৃহ-সহ সমাজগৃহের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এগুলিকে শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। মুক্তেশ্বরম ও কোঠাপালেমে অনুরূপ দুটি গৃহের নির্মাণকার্য চলছে এবং আদাবিপালেমে একটি রালালয়মের পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে।

গুজরাট

ভাবনগর জেলার গোরধর তালুকে ভামরিয়া গ্রামে বন্যায় গৃহহীনদের জন্য ২৮টি বাড়ির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে এবং বাড়িগুলি তাদেরই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রামটির নতুন নাম হয়েছে 'রামকৃষ্ণনগর'। এই গ্রামে সমাজগৃহ নির্মাণের কাজ চলছে।

বহির্ভারত

সিঙ্গাপুর আশ্রম গত ২৭ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। জনসভা, সাধন-শিবির, প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ, প্রশ্নোত্তর সভা, ধর্মসমন্বয় সভা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। এই উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের 'মদীয় আচার্যদেব' (My Master) পুস্তিকার চীনা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। ৪ মে এক অনুষ্ঠানে অনূদিত পুস্তকটি প্রকাশ

করেন সিঙ্গাপুরের সংসদ সদস্য চাও উই খিয়াং। উৎসবে প্রভূত জনসমাগম হয়েছিল।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো): মে মাসের প্রতি বুধবার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি শনিবার শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা করেছেন। ওয়েবস্টার স্ট্রীটে অবস্থিত এই বেদান্ত সোসাইটির পুরনো মন্দিরে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ পাতঞ্জল যোগসূত্রের ক্লাস নিচ্ছেন। এই আশ্রমের পরিচালনায় ২৫ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত ওলেমা-তে এক সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচী এই সাধন-শিবিরের অঙ্গ ছিল। প্রতিদিনই বেদান্তবিষয়ক আলোচনা হয়েছে। বিশেষ আলোচনার দিন ছিল ২৭ মে। ঐদিনের বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ হোসেন নাসার। স্বামী অপর্ণানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ এবং স্বামী প্রবুদ্ধানন্দও ভাষণ দেন।

সোসাইটির পরিচালনায় গত ৪ মে সানফ্রান্সিস্কোর শান্তি আশ্রম একদিনের বার্ষিক তীর্থযাত্রার আয়োজন করেছিল। ঐদিন শান্তি আশ্রমে ভক্তিগীতি, ভজন, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই তীর্থযাত্রায় বার্কলে কেন্দ্র থেকে স্বামী অপর্ণানন্দ ও স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্র থেকে স্বামী প্রপন্নানন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন: মে মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ১৭ ও ৩১ মে বালক-বালিকা ও বয়স্কদের জন্য দুটি বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ মে স্বামী ভাস্করানন্দ যুবক-যুবতীদের জন্য বেদান্তবিষয়ক একটি ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো: গত মে মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী গণেশানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বুধবারগুলিতে 'বিবেকচূড়ামণি'র ক্লাস নিয়েছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ। ১৫ মে মাণ্ডুক্য উপনিষদের ওপর একটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। শনিবারগুলিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর ক্লাস হয়েছে। গত ২৮ মে পূজা, ভক্তিগীতি, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি পালিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো: মে মাসের শনি ও রবিবারগুলিতে বিভিন্ন অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ১২ ও ২৬ মে রবিবার-দুটিতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ভাষণ দিয়েছেন যথাক্রমে ব্রোক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডঃ জন ময়ের এবং স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির প্রধান স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। গত ৪ এবং ১৯ মে যথাক্রমে আচার্য শঙ্কর ও ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী প্রমথানন্দ। তাছাড়া প্রতি শুক্রবার ও রবিবার সন্ধ্যায় স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, ভজন, শান্তিপাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক: গত মে মাসের প্রতি রবিবার ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ। ২৬ মে রবিবারে ভগবান বুদ্ধের জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর বাণীর ওপর আলোচনা হয়। প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার 'বিবেকচূড়ামণি' ও 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার কথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ লীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মজঃফরপুর (বিহার) : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম আবির্ভাব-তিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আশ্রমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। দুপুরে প্রায় তিন হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী স্মরণানন্দ ও স্বামী গিরিশানন্দ।

গত ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি '৯১ খানাকুলের অন্তর্গত **রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠ-চক্রের** উদ্যোগে **হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন স্বামীজীর স্মরণে যুবদিবস পালিত হয়। এদিন সকালে প্রভাতফেরী, ব্রতচারী প্রদর্শনী, জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা-সভা। সভার শেষে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন রামশংকর গুপ্ত ও সম্প্রদায় এবং বেহালার সুরপীঠ গোষ্ঠী। পরে রামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুরের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এদিন প্রায় বারশো ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্রের নতুন জমিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, পূজা, পাঠ, প্রতিনিধিগণের সভা, ধর্মসভা, দুর্গাদাস বাউল কর্তৃক বাউল সঙ্গীত এবং স্বামী দেবদেবানন্দের পরিচালনায় 'সঙ্গীতে কথামৃত' পরিবেশিত হয়। উভয়দিনের সভাতেই সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দ। উভয়দিনই বক্তব্য রাখেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, স্বামী দেবদেবানন্দ, রামসিংহ পাল এবং বিশ্বনাথ পাল। দ্বিতীয় দিন বক্তব্য রাখেন শেখ হাসান ইমাম এবং খগেন্দ্রনাথ বেরা।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) : গত ৯ ও ১০ মার্চ এই আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম, সঙ্গীতানুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ১০ মার্চ সকালে এক বর্ণাঢ্য নগরপরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছিল। নগরপরিক্রমা পরিচালনা করে ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদল। দুপুরে প্রায় দুই হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী দেবদেবানন্দ এবং স্বামী কমলেশানন্দ। সভাশেষে 'কথা ও গানে কথামৃত' পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং, হুগলী : গত ১০ মার্চ এই আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সারাদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় দেড় হাজার ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী জিনানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী মেধসানন্দ, অধ্যাপক দীপক গুপ্ত ও আশ্রমের সভাপতি তামসরঞ্জন রায়। সভার পর সলিল দাসের পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ, মুলাজোড়, শ্যামনগর (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম জন্মতিথি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রভাত ফেরী, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, শ্যামাসঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। উল্লেখ্য, গত ৮ ডিসেম্বর '৯০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি ও গত ৭ জানুয়ারি '৯১ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে।

যুবসম্মেলন

গত ৩ মার্চ ১৯৯১ **রামেশ্বরপুর** ইউনিয়ন আদর্শ বিদ্যালয় (উত্তর ২৪ পরগনা) প্রাঙ্গণে **স্বামী বিবেকানন্দ পাঠচক্রের** পরিচালনায় ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব

কালচার-এর সংযোগিতায় সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন উদ্‌যাপিত হয়। স্থানীয় ৯'১০টি বিদ্যালয়ের প্রায় দুই-শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করেন। সকাল ৯ ঘটিকায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবেশকুমার কুইতি। সম্মেলনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বামী সর্বদেবানন্দ, স্বামী নকুলেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্যামলকুমার সরদার, (বসিরহাট মহাবিদ্যালয়) প্রমুখ। স্বামীজীর ছেলেবেলা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ৫ম শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী ভিত্তিক কুইজ, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। সম্মেলনে বিবেকগীতি ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন আশুতোষ মণ্ডল ও সন্তোষকুমার ঘোষ।

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (উত্তর ২৪ পরগনা): গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি যুবদিবস ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন সারাদিনব্যাপী বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, আলোচনা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান হয়। দুপুরে দু-হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী অমলানন্দ, স্বামী পুরুষানন্দ এবং স্বামী বিশ্বনাথানন্দ।

গত ২৪ মার্চ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে স্বামী জয়দেবানন্দের সভাপতিত্বে ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের তারাপদ বসু পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন উপাচার্য মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তীকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সর্বজনীনতা বিষয়ে তারাপদ বসু স্মারক বক্তৃতা করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইসাধন বসু, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রফুল্লকুমার রায়। পুরস্কার-ফলকটি নির্মাণ করেছেন নিত্যানন্দ ভকত।

বহির্ভারত

উৎসব-অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার কাকাইলছেও গ্রামে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে গত বছরের ন্যায় এবারও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব বিগত ৫ চৈত্র ১৩৯৭ বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন ভোর পাঁচটায় মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি ও বেদমন্ত্র সহকারে উৎসবের শুভ উদ্বোধন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, কথামৃত পাঠ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিকাল তিনটায় ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামেন্দ্ররঞ্জন চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক অজিতকুমার পাল। সভায় জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদক ডাঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র দেব, প্রহ্লাদ দাস মোহন্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ধর্মসভাশেষে ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ননীদেবী চট্টোপাধ্যায় গত ৯ ফেব্রুয়ারি '৯১ দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার বারুইপুরের নিকটবর্তী কুন্দরালী গ্রামে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর। তিনি সারদা মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষিকা হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। উল্লেখ্য যে, তাঁর স্বামী প্রয়াত মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

পুষ্টির স্বল্পতা ও বুদ্ধিমত্তা

পুষ্টির স্বল্পতার (undernutrition) সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকাশের সম্পর্ক সম্বন্ধে মতবিরোধ এখনো আছে এবং সারা পৃথিবীতে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। শিশুদের মানসিক বিকাশের সঙ্গে পুষ্টির কোন সম্পর্ক আদৌ আছে কিনা অথবা সেই বিকাশ পুষ্টির পরিমাপ অনুযায়ী হয় কিনা, এই নিয়ে কয়েকটি গবেষণা হয়েছিল; কিন্তু প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি; কেবল এইটুকু জানা গিয়েছিল যে, পুষ্টির স্বল্পতায় মানসিক বিকাশের বিঘ্নতা ঘটে। কিন্তু আরো যা জানা গিয়েছিল, তা হলো পরিবেশ সামগ্রিকভাবে শিশুর বুদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ওপর প্রভাব ফেলে। পরিবেশে থাকা নানা কারণগুলি হলো: পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক মান—যার মধ্যে পড়ে শিক্ষা, মাথাপিছু আয়, পেশা প্রভৃতি। অন্যান্য হেতুগুলির মধ্যে আছে মা ও শিশুর পরস্পরের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শিশুর প্রতিপালন—যার মধ্যে পড়ে শিশুর খাওয়া, স্তন্যপান বন্ধ করা, মলমূত্রত্যাগ শিখানো প্রভৃতি।

সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কয়েকটি গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, যে-কারণগুলি শিশুর বুদ্ধিকে ব্যাহত করে, সেগুলি হচ্ছে পুষ্টির স্বল্পতা, ঘনঘন জীবাণু-দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, পিতামাতার অবহেলা, সন্তানের সঙ্গে না মেশা, স্বাস্থ্যাবস্থার দৈন্যতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি। গবেষণাগুলিতে আরও জানা গেছে যে, উপরি উক্ত হেতুগুলি সম্মিলিতভাবে শিশুর মানসিক বিকাশের ওপর প্রভাব ফেলে। তার কারণ পুষ্টির স্বল্পতা বা অন্যান্য হেতুগুলি এককভাবে তা করতে পারে না। এরা সামগ্রিকভাবে শিশুর পরিবেশকে দূষিত করে তার মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—শৈশবকালে পুষ্টির স্বল্পতা এককভাবে কি বয়স্কদের বুদ্ধিমত্তাকে বিপরীতভাবে প্রভাবিত করে? অথবা শৈশবকালে পুষ্টির স্বল্পতাজনিত ভগ্নস্বাস্থ্যহেতু শিশুকে পরিবেশের সুযোগ নেওয়া থেকে অর্থাৎ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা কি তার বুদ্ধির বিকাশকে ব্যাহত করে? এবিষয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন-এ একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, যার ফলাফল নিচে আলোচিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই জানা দরকার যে. বুদ্ধিমত্তা (intelligence) বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে তার পরিমাপ করা যায়। বহুকাল থেকে বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে—ভাবমূলক (abstract) বিতর্ক করার ক্ষমতা, শিখবার ক্ষমতা, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি। কিন্তু সবসময় এই সংজ্ঞা মেলে না। বুদ্ধিমত্তার অনেক দিক আছে এবং তা অনেকভাবে নির্ণীত হয়; শুধু একটি বিষয়ে দক্ষতা ধরলেই হয় না। বরং বলা যায়, বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গীন দক্ষতা যার দ্বারা জগৎকে বোঝা যায় এবং সফলতার সঙ্গে তার বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে পারা যায়। বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করার যেসব পরীক্ষা আছে, সেগুলি পাশ্চাত্যে স্থিরীকৃত হয়েছে; তাদের সবগুলিই যে পাশ্চাত্যের কৃষ্টিঘেঁষা তা নয়। তাদের অনেকগুলি এদেশের পরিবেশে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—বিনেত-কামাত (Stanford Binet-Kamat) ওয়েসলার ইন্টেলিজেন্স স্কেল (Wechsler Intelligence Scale) প্রভৃতি। শেষোক্ত প্রথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরীক্ষায় ১৮০ জন ২০—৩০ বছর বয়স্ককে নেওয়া হয়েছে, যারা ৫ বছর বয়স থেকে গত ১৮ বছর পরীক্ষাধীন ছিল।

পরীক্ষায় মোটামুটিভাবে জানা গেছে যে, শিশুকালে পুষ্টির মান এককভাবে তাদের বড় বয়সের বুদ্ধিমত্তাকে প্রভাবিত করে না। বড় বয়সে মাপা পুষ্টির মান অর্থাৎ উচ্চতা ও ওজন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে—বিশেষভাবে শৈশবের পুষ্টির মানের সঙ্গে সম্পর্কিত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক আছে, তবে শৈশবকালের পুষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এইসব থেকে সঙ্গতভাবে ধরে নিতে পারা যায় যে, পুষ্টির স্বল্পতা বুদ্ধিমত্তাকে ব্যাহত করার একটি বিশিষ্ট কারণ, তবে এককভাবে তার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক আছে কিনা, তা স্থির করা দরকার।

[Nutrition News, September, 1990]

সূচীপত্র

উদ্বোধন ৯৩তম বর্ষ ভাদ্র ১৩৯৮

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধনঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৮ সংখ্যা

☐ নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারের 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য ঃ চব্বিশ টাকা ।

☐ 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি আঠারো টাকায় পাবেন ; ৩১ আগস্ট '৯১-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে তাঁরা প্রতি কপি পনেরো টাকায় পাবেন।

☐ সাধারণ ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ৩১ আগস্ট '৯১-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ৩১ আগস্ট '৯১-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ সাধারণ ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে রেজিস্ট্রি ডাকেও আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ সাত টাকা ৩১ আগস্ট '৯১-এর মধ্যে কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন। ঐ তারিখের পরে টাকা কার্যালয়ে পৌঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের আগামী বছরের ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত কার্যালয় থেকে আশ্বিন সংখ্যাটি দেওয়া হবে। গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই সময়ের মধ্যে তাঁদের পত্রিকা অবশ্যই সংগ্রহ করে নেন।

☐ ব্যক্তিগতভাবে অথবা রেজিস্ট্রি ডাকে সংগ্রহের জন্য নাম ও গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ একান্ত জরুরী।

☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকেল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। ৭ অক্টোবর মহালয়া উপলক্ষে এবং ১৫ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।

১ ভাদ্র ১৩৯৮

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন

উদ্বোধন

ভাদ্র, ১৩৯৮ আগস্ট, ১৯৯১ ৯৩ তম বর্ষ—৮ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

হে পার্থ, ক্লীবতা আশ্রয় করিও না। এইরূপ কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

"শ্রীভগবান্ উবাচ"

"শ্রীভগবান্ উবাচ"। শ্রীভগবান বলিলেন।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হইতেছে। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যাহা ঘটিতেছে তাহার বিবরণ উপস্থাপন করিতেছেন। ইতোপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, অর্জুন শস্ত্রনিক্ষেপে উদ্যত হইয়াও অকস্মাৎ জ্ঞাতিগণের প্রতি গভীর মমতা দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন। রাজ্যলোভে জ্ঞাতিগণের উপর অস্ত্রপ্রয়োগকে অত্যন্ত ঘৃণিত কর্ম বিবেচনা করিয়া তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং রাজ্যলোভে এই কুলক্ষয়কর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত মনস্তাপগ্রস্ত হইয়াছেন। প্রথম অধ্যায় এই অবস্থায় শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় সঞ্জয় রণাঙ্গনের পরবর্তী অগ্রগতি (development) সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রকে অবহিত করিতেছেন :

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥

—ঐ প্রকারে [পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত] মমতার দ্বারা অভিভূত, দর্শনে অসমর্থ গলদশ্রুনেত্র বিলাপরত তাঁহাকে অর্থাৎ অর্জুনকে মধুসূদন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বাক্য বলিলেন।

ইহার আগে সঞ্জয়ের নিকট হইতে ধৃতরাষ্ট্র যাহা শুনিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি মনে মনে খুবই আহ্লাদিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি প্রায় ধরিয়াই লইয়াছেন যে, বিনাযুদ্ধেই বিজয়লক্ষ্মীর জয়মাল্য তাঁহার প্রিয়পুত্র দুর্যোধনের কণ্ঠদেশে শোভা পাইবে। যে রাজসিংহাসনের জন্য এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের আয়োজন এবং যে-যুদ্ধে কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রমুখ মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধাদের এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য-সমাবেশ সত্ত্বেও অতুলবিক্রম অর্জুনের রণনৈপুণ্য হেতু দুর্যোধনের শোচনীয় পরাজয় এবং সবান্ধব বিনাশপ্রাপ্তি প্রায় অবধারিত ছিল—সেই রাজসিংহাসন অর্জুনের যুদ্ধ-পরিত্যাগের সংকল্পে বিনা আয়াসেই দুর্যোধনের হাতের মুঠির মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে এবং সেই যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে—ইহা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? অধিকন্তু বোধ হইতেছে যে, জ্ঞাতিনাশকারী এই যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজনে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা লইবার জন্য অনুশোচনায় বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিবেন। স্বয়ং অর্জুনই যদি যুদ্ধে ঐরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়া যান তাহা হইলে ধর্মাশ্রয়ী যুধিষ্ঠির তো যুদ্ধের অভিলাষী হইতেই পারেন না। উঁহার পর অগ্রজবৎসল অপর পাণ্ডবগণও যে যুদ্ধে এবং রাজসিংহাসনে অধিকার প্রয়োগে অনাগ্রহী হইয়া যাইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব, দুর্যোধনের পক্ষে রাজ্য এখন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইয়া যাইতেছে। অন্ধ নৃপতি বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র এই আশায় পুলকিত

হইয়া সঞ্জয়ের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া জানিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। কারণ, ভয় তাঁহার তো ঐ কৃষ্ণকে লইয়াই। এই নাটকীয় উৎকণ্ঠার মুহূর্তে সঞ্জয় বলিলেন: "শ্রীভগবান্ উবাচ"—শ্রীভগবান বলিলেন।

এইবার ভগবান মুখ খুলিবেন এবং তিনি যাহা বলিবেন তাহাতেই নির্ধারিত হইয়া যাইবে অর্জুনের সমগ্র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি-স্থাপনের ভূমি, নির্ধারিত হইয়া যাইবে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের বিস্তার ও গতি, নির্ধারিত হইয়া যাইবে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধনের নিয়তি এবং সেইসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র তথা কৌরবপক্ষের চূড়ান্ত ভাগ্যবিড়ম্বনার ক্ষেত্র, নির্ধারিত হইয়া যাইবে ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রামে ধর্মের অনিবার্য বিজয়ের অবিসংবাদী লগ্ন।

সঞ্জয়ের ঐ দুটি শব্দের ক্ষুদ্র বাক্যটি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা-বাক্য এবং ভগবানের প্রারম্ভিক ভাষণের মধ্যে যেমন একটি অন্তর্বর্তী বাক্য হিসাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, তেমনই উপস্থাপিত হইয়াছে একটি মহাসন্ধিভূমি হিসাবেও। বস্তুতঃ, ঐ মুহূর্তটি ছিল এক মহাসন্ধিক্ষণই।

কোন্ অর্থে উহা ছিল মহাসন্ধিভূমি অথবা মহাসন্ধিক্ষণ তাহা আলোচনার পূর্বে আমরা উল্লিখিত বাক্যটির অব্যবহিত পূর্বে উচ্চারিত সঞ্জয়-কথিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিতে ফিরিয়া যাই। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিব, জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্নেহান্ধতাবশতঃ আপন পুত্রগণের আসন্ন সৌভাগ্যের স্বপ্নিল কল্পনায় মগ্ন হইলেও, সূক্ষ্মবুদ্ধি সঞ্জয় কিন্তু তাঁহার প্রথম শ্লোকবচনেই অর্জুনের উদ্দেশে ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী কি ঘটাইতে যাইতেছে—ভগবান যে তাঁহার ঐ বাণীর দ্বারা মোহগ্রস্ত ও ক্লীবতাবিষ্ট অর্জুনের চিত্তজাগরণ ঘটাইবেন এবং ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রকৃত নিয়ন্তারূপে অল্পক্ষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাহার ইঙ্গিত দিয়া দিয়াছেন। আমাদের এইকথা বলিবার কারণ সঞ্জয়ের 'মধুসূদন' শব্দটির ব্যবহার। "শ্রীভগবান্ উবাচ" বাক্যটি উচ্চারণের পূর্বে কৃষ্ণের 'মাধব', বিশেষতঃ 'হৃষীকেশ' নাম উল্লেখ (যাহা সঞ্জয় ইতোপূর্বে একাধিকবার করিয়াছেন) না করিয়া কৃষ্ণকে সঞ্জয়ের 'মধুসূদন' নামে উল্লেখ অনর্থক বা আকস্মিক নহে। উহার বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। গীতার জনৈক আধুনিক টীকাকার লিখিয়াছেন: "'মধুসূদন' পদ দ্বারা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, মধু নামক দৈত্যহন্তা ভগবান চিরদিনই দুষ্টগণের দমন করেন। অর্জুন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে কি হইবে? যিনি দৈত্যদলদলনার্থ স্বয়ংই মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি রণভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন। যাহাতে তোমার দুর্যোধনাদি দুর্বৃত্ত পুত্রগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ভূভারহারী ভগবান অর্জুনকে তদ্বিষয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র করিবেন। [অতএব হে পুত্রস্নেহান্ধ অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র।] তুমি পুত্রগণের বৃথা জয়াশা করিও না, কেননা তাহাদের মরণের ব্যবস্থা ভগবান পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছেন।"

স্বাভাবিকভাবে এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মধু দৈত্যকে তো কৃষ্ণ বধ করেন নাই, তাহা হইলে কৃষ্ণকে কেন 'মধুসূদন' বলা হইল? ঠিকই, মধু দৈত্যকে কৃষ্ণ বধ করেন নাই, তাহাকে বধ করিয়াছিলেন বিষ্ণু। পুরাণাদি (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভারত, হরিবংশ) হইতে জানা যায় যে, প্রলয়শেষে ভগবান বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু এবং কৈটভ নামে দুই ভয়ংকর অসুর উৎপন্ন হয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে ঐ দুই অসুর আক্রমণ করিলে বিষ্ণু উহাদের নিধন ('সূদন') করেন। এইকারণে বিষ্ণুর এক নাম 'মধুসূদন'। 'মল' শব্দের একটি অর্থ আবিলতা। যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর কর্ণের অর্থাৎ দেহের আবিলতা হইতে মধু এবং কৈটভের জন্ম। সেই আবিলতা-জাত অসুরদ্বয় যখন আসন্ন নূতন সৃষ্টির পক্ষে সমূহ বিপজ্জনকরূপে প্রতীয়মান হইল, তখন ভগবান নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া উহাদের বিনাশ করিয়াছিলেন। সঞ্জয় বলিতে চাহিতেছেন, বর্তমানে অর্জুন মোহনিদ্রামগ্ন হইয়াছেন এবং মমতা ও অহিংসার ছদ্মবেশে তাঁহার মনে দুটি আবিলতা উৎপন্ন হইয়াছে—যুদ্ধে পরাজয়ের ভয় এবং তৎসম্পর্কিত হতাশা। এই দুই আবিলতা প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের দেহ-মনের দুর্বলতা-সঞ্জাত। কিন্তু মধুসূদন যেমন তাঁহার দেহমলজাত অসুরদ্বয়কে নাশ করিয়াছিলেন, এখানেও তেমনই শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত অর্জুনের দেহ-মনোজাত উল্লিখিত দুই আবিলতা বা দুর্বলতা নাশ করিয়া জগৎকে রক্ষা করিবেন।

'মধুসূদন' শব্দের অপর একটি অর্থ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১১১।৩৪) আছে:

> পরিণামাশুভং কর্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
> করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ॥

—যেসব কর্ম পরিণামে অশুভকর, ভ্রান্ত বা মূর্খদের নিকট সেগুলি মধুবৎ বা শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি সেই অশুভ কর্ম বা সংস্কারকে নাশ করেন বা নির্মূল করেন তিনি মধুসূদন।

'মধুসূদন' শব্দের এই অর্থ করিলেও সঞ্জয়ের 'মধুসূদন' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য একই থাকে। কৃষ্ণ জানেন, যাহাকে দুর্বলতাগ্রস্ত অর্জুন 'মধু' অর্থাৎ শ্রেয় বলিয়া, ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছেন উহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভ্রান্তি অথবা আত্মমত প্রতিষ্ঠার প্রলেপে আত্মপ্রতারণা। কিন্তু যেহেতু তিনি 'মধুসূদন', তিনি অর্জুনের অন্যায়কে ন্যায়ের মোড়কে স্থাপন করিবার প্রয়াসকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অকল্যাণকর পরিণাম হইতে রক্ষা করিবেন।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল, 'মধুসূদন' যখন কৃষ্ণ নহেন তখন কৃষ্ণকে কেন মধুসূদন বলা হইল? 'মধুসূদন'-এর প্রথম অর্থের দিক হইতে বাচ্যার্থে কৃষ্ণ মধুসূদন নহেন, কিন্তু লক্ষ্যার্থে কৃষ্ণই মধুসূদন। কারণ, মধুসূদন বা বিষ্ণুই তো দেবকী-বসুদেবের সন্তানরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, কৃষ্ণ মানবদেহে বিষ্ণু-ই। সুতরাং তিনিই মধুসূদন। কৃষ্ণ যে বিষ্ণু স্বয়ং, তাহা তো ভীষ্ম এবং বিদুরের প্রমুখাৎ ধৃতরাষ্ট্রও অবগত আছেন। আর যদি অর্জুনের মনোজাত দুর্বলতার, যাহা ভয় ও হতাশারূপে অর্জুনকে আবিষ্ট করিয়াছে, প্রতীকরূপে মধু ও কৈটভকে গণ্য করা হয়, তাহা হইলে পরবর্তী পর্যায়ে কৃষ্ণ তাহার ধ্বংসসাধন করিবেন বলিয়া রূপক-অর্থে কৃষ্ণ অর্জুনের ক্ষেত্রে তো মধুসূদনই হইতেছেন। সুতরাং 'মধুসূদন' শব্দের দ্বিতীয় অর্থের দিক হইতে বিচার করিলেও রূপক-অর্থে কৃষ্ণ যে অর্জুনের ক্ষেত্রে 'মধুসূদন'-এর ভূমিকা গ্রহণ করিবেন তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পরোক্ষভাবে এই সমস্ত তাৎপর্য উপস্থাপন করিবার মানসে সঞ্জয় বলিলেন: "ইদং বাক্যম্ উবাচ মধুসূদনঃ"—মধুসূদন এইরূপ বলিলেন। সঞ্জয় প্রকারান্তরে বুঝাইতে চাহিলেন, নরদেহে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু যখন পাণ্ডবপক্ষে সারথি বা পরিচালকরূপে অবস্থান করিতেছেন তখন ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে তাঁহার পুত্রগণের জয়াশা শুধু দুরাশাই নহে, অলীক কল্পনাও। ইহার পরেও যদি অবিবেকী ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যের নিহিত তাৎপর্য ধরিতে না পারেন সেইহেতু সঞ্জয় সুস্পষ্টভাবে কৃষ্ণের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন: "শ্রীভগবান্ উবাচ"। কৃষ্ণ আর কেহই নহেন, তিনিই 'ভগবান'—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র তাঁহারই ইচ্ছায় এবং নির্দেশে গতিমান। "উবাচ মধুসূদন"-এর পরেই "শ্রীভগবান্ উবাচ" যেন স্বতঃসিদ্ধরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সঞ্জয় জানেন, 'ভগবান্' শব্দের অর্থ ধৃতরাষ্ট্র সম্যক্‌ভাবে অবগত আছেন। 'ভগ' শব্দের সহিত মতুপ্ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'ভগবান্' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ভগ' যুক্ত যিনি তিনিই 'ভগবান্'। 'ভগ' শব্দের অর্থ কি?

> ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
> জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
>
> (বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৪)

—সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টি বিভূতির একত্ব 'ভগ' বলিয়া কথিত।

অতএব যাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে এই 'ভগ' বা ছয়টি বিভূতির সমষ্টি অব্যাহতভাবে নিত্য বিদ্যমান, তিনিই অর্থাৎ সেই 'সর্বৈশ্বর্যময়' পুরুষই 'ভগবান্' পদবাচ্য। আবার বলা হইতেছে:

> উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
> বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥
>
> (বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৮)

—যিনি ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু, 'আগতি' বা ইহলোকে আগমন অর্থাৎ জন্ম এবং 'গতি' বা পরলোকে গমন অর্থাৎ মৃত্যু বা দেহান্তরপ্রাপ্তির পরবর্তীকালের রহস্য এবং বিদ্যা অর্থাৎ পরাজ্ঞান এবং অবিদ্যা অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞানের সূক্ষতত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই অর্থাৎ সেই 'সর্বজ্ঞ' পুরুষই 'ভগবান' পদবাচ্য।

অতএব হে স্বল্পদর্শী বৃদ্ধ অন্ধ নৃপতি! (সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে চাহিতেছেন) অর্জুনের রণে পরাঙ্মুখতার কথা শুনিয়া বৃথা উল্লসিত হইও না। উহা নিছকই সাময়িক। স্বয়ং ভগবান যেখানে ধর্মরক্ষাহেতু ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের বল্গা ধরিয়াছেন, সেখানে অর্জুনের যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হওয়া যেমন কদাপি সম্ভব নহে, তেমনই যুধিষ্ঠির সহ অপর পাণ্ডুপুত্রগণেরও যুদ্ধ পরিত্যাগ করাও অসম্ভব। 'কৃষ্ণ' সম্পর্কে 'শ্রীভগবান্' পদ ব্যবহার করিয়া সঞ্জয় ইহাই ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইলেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় সঞ্জয়-কথিত প্রথম বাক্য এবং শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত প্রথম বাক্যের মধ্যস্থ সঞ্জয়-কথিত "শ্রীভগবান্ উবাচ"

বাক্যটি বস্তুতপক্ষে একটি মহাসন্ধিভূমি এবং মুহূর্তটি একটি মহাসন্ধিক্ষণ। কেন—তাহাই এখন বলিব। যে-কৃষ্ণকে অর্জুন তাঁহার রথের সারথি, দ্বারকাধীশ, সখা ইত্যাদি ভাবিয়াছেন, তিনি একদিকে রহিয়াছেন; আর অন্যদিকে রহিয়াছেন যে-কৃষ্ণ মানুষ নহেন, যে-কৃষ্ণ 'মধুসূদন' বিষ্ণু, যে-কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর এবং যে-পরিচয় ইহার পরেই অর্জুনের নিকট উন্মোচিত হইবে। এই উভয় সত্তার সন্ধিভূমি হিসাবে অর্জুনের নিকট "শ্রীভগবান্ উবাচ"-এর অবতারণা।

মুহূর্তটি সন্ধিক্ষণ নানা অর্থে। প্রথমতঃ, অর্জুনের কাছে ইহা সন্ধিক্ষণ। বাস্তবিক তিনি একটি সন্ধিক্ষণে অবস্থান করিতেছেন। কয়েকমুহূর্ত পূর্বে তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার রথের সারথিজ্ঞানে অথবা সখাজ্ঞানে আদেশ বা অনুজ্ঞা করিয়াছেন: "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত"—হে অচ্যুত, উভয়পক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। কৃষ্ণ তখন অর্জুনের নিকট তাঁহার প্রিয় সখা, তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (মা কুন্তী এবং স্ত্রী সুভদ্রার দিক হইতে), তাঁহাদের পরম শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ। সে-কৃষ্ণ মানুষ, সমকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু এখন যে-কৃষ্ণের পরিচয় অর্জুন পাইতে চলিয়াছেন, তিনি নরদেহে স্বয়ং ঈশ্বর। কয়েক মুহূর্ত পরেই অর্জুন জানিবেন, যে-যুদ্ধ হইতে তিনি পরাঙ্মুখ হইতে চাহিতেছেন সে-যুদ্ধ হইয়াই রহিয়াছে, উহার ফলও নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণই উহার নিয়ামক—ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, কর্ণাদি বীরগণ এবং উভয়পক্ষের আরও অগণিত বীর ও সৈন্যবাহিনী নিহত হইয়াই রহিয়াছে কৃষ্ণের হাতে। অর্জুন শুধু তাঁহার হাতের ক্রীড়নক, তাঁহার যন্ত্র; তিনি 'নিমিত্তমাত্র'। অর্জুন উপলব্ধি করিবেন, আপাতদৃষ্টিতে অর্জুন যুদ্ধের নায়ক, কিন্তু প্রকৃত নায়ক কৃষ্ণ; কৃষ্ণ শুধু তাঁহার রথেরই রজ্জুধর নহেন, বিগত এবং অনাগত সকল ঘটনার রজ্জু তাঁহারই হাতে। সুতরাং ঐ মুহূর্তটিতে অর্জুন যে একটি মহাসন্ধিমুহূর্তে অবস্থান করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

বাস্তবিক, ঐ মুহূর্তটি ছিল ন্যায় ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক ক্রান্তিলগ্ন। ধর্ম বুঝি যায় যায়, ন্যায়ের পতাকা বুঝি হয় ভূলুণ্ঠিত। অর্জুন যদি পশ্চাৎপদ হন তাহা হইলে ন্যায় ও ধর্মের সাকার বিগ্রহ পাণ্ডুপুত্রগণের পরাজয় অনিবার্য, সেই সঙ্গে অনিবার্য ন্যায় ও ধর্মের পরাজয়ও। কিন্তু না, শ্রীভগবান তাঁহার বাণীতে শুনাইবেন মাভৈঃ মন্ত্র। সেই মন্ত্রে সমস্ত দুর্বলতা-মুক্ত হইয়া গাণ্ডীবী যুদ্ধার্থ উত্থিত হইবেন। ন্যায় ও ধর্মের বিজয়-পতাকা প্রদীপ্ত প্রভায় আবার উড্ডীন হইবে। বস্তুতঃ ঐ মুহূর্তটি ছিল এক হিসাবে অর্জুনের জন্মান্তর-মুহূর্তও—তাঁহার দ্বিজত্বপ্রাপ্তির লগ্ন। যে-অর্জুন ক্ষাত্রধর্ম বিসর্জন দিয়া আত্মিক মৃত্যুবরণ করিতে যাইতেছিলেন, ভগবানের বাণীতে তাঁহার শুধু নব-জন্মই নহে, নূতন 'আবির্ভাব' ঘটিবে।

ঐ মুহূর্তটি ছিল এক মহৎ দর্শনের, এক মহৎ আদর্শের আত্মপ্রকাশের মাহেন্দ্রলগ্ন। আত্মা অবিনশ্বর, উদ্যোগী মানুষই তাহার নিজের ভাগ্যনির্মাতা, ঈশ্বরার্থ সকল কর্মই 'যোগ' এবং সমত্ববুদ্ধি বা একত্বদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠালাভ মানবজীবনের পরম চরিতার্থতা—এইসকল অপূর্ব দর্শন ও অনুপম আদর্শের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা শ্রীভগবান যে করিবেন তাহার মূলে রহিয়াছে সঞ্জয়ের ঐ সংক্ষিপ্ত বাক্যটি।

পরিশেষে, ঐ মুহূর্তটি ছিল গীতার জন্ম-মুহূর্তের অব্যবহিত প্রাক্‌লগ্ন। সভ্যতার ইতিহাসে, ধর্মের ইতিহাসে ঐ মুহূর্তটি ছিল যথার্থই দেবলগ্ন। "অর্জুন উবাচ" হইলে তাহা 'গীতা' হইত না, অন্য কাহারও সহিত 'উবাচ' যুক্ত হইলে 'গীতা' হইত না। "শ্রীভগবান্ উবাচ"—স্বয়ং ভগবানের মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই তো উহা 'গীতা'—"যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।"

গীতার জন্মের সহিত জন্মমুহূর্ত প্রত্যাসন্ন 'জন্মহীন'-এর সেই মহা অঙ্গীকারের, সেই পরম উদ্ঘোষণের:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥(৪।৭-৮)

এবং জন্মমুহূর্ত প্রত্যাসন্ন সেই পরম আশ্বাসের, সেই পরম অভয়েরও: "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" (৯।৩১)—হে কৌন্তেয়, তুমি নিশ্চিত-ভাবে জানিয়া রাখ, আমার আশ্রিতজনের বিনাশ নাই। অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং সংগ্রাম কর—"তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।" (৮।৭)

এবং এ-সমস্তই সঞ্জয়ের সেই একটি বাক্যের সূত্র ধরিয়াই—"শ্রীভগবান্ উবাচ"।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৬ ॥

নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির মঠে প্রবর্তিত নিয়মাবলীতে তো বটেই, তদানীন্তন মঠ-জীবনের মধ্যেও দেখা যায় বিদ্যাচর্চা, ত্যাগ ও তপস্যা এবং আদর্শ প্রচারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব। উদ্দেশ্য ছিল, গোষ্ঠী-মানুষের পুষ্টিবর্ধন এবং গোষ্ঠীর প্রতিটি অঙ্গের আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট অবধারণ ও আদর্শ বাস্তবায়িত করার যোগ্যতা অর্জন। কিন্তু এ-সকল যাবতীয় আয়াস-প্রয়াসের মূলে ছিল প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি নিশ্ছিদ্র আনুগত্য, অফুরন্ত প্রীতি ও তাঁর উপদেশ বাস্তবে রূপায়িত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

পরিচালক স্বামীজী মঠবাসিগণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেনঃ "বিদ্যার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নীচদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদা বিদ্যার চর্চা থাকিবে।" স্বামীজীর ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারেই মঠে ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থাদির সঙ্গে ইতিহাস, সাহিত্য, পাশ্চাত্যদর্শন, ভৌতবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান ইত্যাদিও পঠন-পাঠন হতো। তাছাড়া সঙ্গীত, রন্ধনকাজ, বাগানের কাজ, গো-পালন ইত্যাদিও শেখানো হতো। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো-সেলাই পর্যন্ত সবকিছুই ছিল শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে জপ-ধ্যান বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। অন্যতম শিক্ষার্থী স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁর 'অস্ফুট স্মৃতি'তে লিখেছেনঃ "স্বামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া সাধন-ভজন শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'প্রথম সকলে আসন করে বস্; ভাব্—আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সাহায্যেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হবো।' সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করিলে তারপর বলিলেন, 'ভাব্—আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ, বজ্রের মতো দৃঢ়—এই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে যাব।' এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, 'এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি; অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমূর্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ—এইটি আধঘণ্টা আন্দাজ করবি।' সকলেই স্বামীজীর উপদেশমতো চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল।... স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশে নতুন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া বহুকালযাবৎ 'এইবার এইরূপ চিন্তা কর, তারপর এইরূপ কর' বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামীজী-প্রোক্ত সাধনপ্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।"[৫৩]

স্বামীজীর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব, বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার ও আকর্ষণীয় শিক্ষাপদ্ধতি বিদ্যার্থীদের কাছে ছিল শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ প্রভৃতি বিদ্যাচর্চার পরিমণ্ডল সযত্নে রক্ষা করতেন। সকালে শাস্ত্রচর্চা হতো প্রায় দুঘণ্টা। আলোচ্য-কালে ভাষা-পরিচ্ছেদ, শাঙ্করভাষ্য সমেত গীতা, শাঙ্করভাষ্য সমেত বেদান্তসূত্র, রামানুজভাষ্যের কিয়দংশ এবং ভাষ্যসমেত কয়েকটি উপনিষদ্ পাঠ করা হতো। স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে স্বামী সারদানন্দ অধিকাংশ শাস্ত্রের ক্লাস নিয়েছিলেন। আলোচ্যকালের শেষাংশে স্বামী নির্মলানন্দ কয়েকটি উপনিষদ্ পড়িয়েছিলেন। নবাগতদের 'বেদান্তসূত্র' কঠিন বোধ হওয়াতে তাদের জন্য স্বামী নির্মলানন্দ 'আত্মবোধ' পড়িয়েছিলেন। মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর মঠবাসিগণের ব্যক্তিগত পাঠের ব্যবস্থা ছিল। যে-সকল গ্রন্থ তাঁরা পড়তেন সে-সকলই মঠের ডায়েরীতে লিখে

৫৩ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০-৩৫১। আলমবাজার মঠে এই শিক্ষাপ্রণালী শুরু হয়েছিল, চলেছিল নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির মঠপর্ব পর্যন্ত।

রাখা হতো। সন্ধ্যায় জপ-ধ্যানের পর বসত প্রশ্নোত্তরের আসর; সেটি ছিল খুবই জনপ্রিয়। বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হতো। কখনো বা প্রশ্নোত্তরের আসরে কিছু বৈচিত্র্য দেখা দিত। যেমন স্বামী বিরজানন্দ ৯ সেপ্টেম্বর 'দৃশ্য ও অদৃশ্য' শীর্ষক একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দের নির্দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন, বক্তা সে-সকলের উত্তর দিয়েছিলেন। আবার দেখি ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় স্বামী সোমসুখানন্দ অদ্বৈত-তত্ত্বের ওপর লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন। ব্রহ্মচারী বিমলানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। ১৯ মার্চ স্বামী প্রকাশানন্দ 'মঠের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে অতি মনোজ্ঞ একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

আবার সান্ধ্য আসরে বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ওপর ভাষণ দিতেন। ডাঃ নিতাই হালদার পরিপাকপদ্ধতি (digestion), হৃদ্‌যন্ত্রের গঠন ও রক্তসঞ্চলন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ শারীরবৃত্ত (physiology) সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছিলেন। ডাঃ মিল কয়েকটি বক্তৃতা করেছিলেন 'মানসিক রোগের চিকিৎসা' বিষয়ে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন 'দৈহিক গঠনতন্ত্র' (anatomy) বিষয়ে; অপর একজনের বিষয় ছিল 'আলোকচিত্রবিদ্যা'। সান্ধ্য আসরের কোন কোন দিনের বিদ্যাচর্চা নবাগতদের অনেকেরই মনে হয়েছিল দুর্বোধ্য। সেজন্য ২৯ আগস্ট থেকে প্রাগ্রসর ও অনগ্রসরদের জন্য দুটি ভিন্ন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এসকল পঠন-পাঠন, প্রশ্নোত্তর, বিচার, ভাষণ, প্রদর্শন (demonstration) ইত্যাদির মাধ্যমে মঠে ব্যাপক বিদ্যাচর্চার পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। মঠের উদ্দেশ্য ছিল মঠবাসিগণ শুধুমাত্র তথ্যসংগ্রহ-মাত্রে আগ্রহী না হয়ে যেন জ্ঞানোৎসাহী হয়।

মঠ-জীবনের দ্বিতীয় ধারাটি হলো—ত্যাগ ও তপস্যা। ত্যাগের আদর্শের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্ম-জীবন। তপস্যাতে অনুস্যূত ত্যাগেরই আদর্শ। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।" ঠিক ঠিক ত্যাগীর শ্রেষ্ঠ তপস্যা পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞানের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও বাণীর আলোকে পরম তত্ত্ব জানবার ও বুঝবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং তদ্ভাবে ভাবিত জীবন ছিল মঠের তপস্বীদের অভীপ্সিত। পবিত্রতালাভ ও 'কাঁচা-আমি' ত্যাগরূপ দুটি ডানাতে ভর করে তপস্বিসকল পরম সত্যের নীলাকাশে উড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে কায়িক বাচিক মানসিক তপস্যার কথা বলেছেন। এই ত্রিবিধ তপস্যা স্বামী বিবেকানন্দ যুগোপযোগী করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে এক প্রশ্নোত্তর উপলক্ষে স্বামীজী বলেছিলেন, কায়িক তপস্যা করতে হবে মানুষ-নারায়ণের সেবাপূজা করে। বাচিক তপস্যার সারকথা সর্বাবস্থায় সত্যভাষণ। আর মানসিক তপস্যার লক্ষ্য গভীর মনঃসংযম, আয়ত্তী-করণের জন্য মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ। অপর একদিন এই মঠে বসেই স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে বলেছিলেন, পরার্থে কর্ম করলেই তপস্যা করা হয়। বিস্তার করে বলেছিলেন,"তপস্যা করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম করায়, তেমনি আবার পরের জন্য কাজ করতে করতে পরাতপস্যার ফল চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।"[৫৪]

শ্রীশ্রীমায়েরও অভিমত, এই যুগে ঠাকুরের ত্যাগই প্রধান বিশেষত্ব। 'রামকৃষ্ণ-ময়ূ'য় চরিত্র গড়ে তুলতে হলে তার বনিয়াদ হবে ত্যাগের আদর্শ। সেকারণে স্বামীজী ত্যাগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন অত্যধিক। সবকিছু ত্যাগ করে সবকিছু পাওয়ার সাধনাই সঙ্ঘের অঙ্গগণের অবলম্বন। যেহেতু অটুট ব্রহ্মচর্য ভিন্ন আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব, সেকারণে ব্রহ্মচর্য পালন এবং ত্যাগ-তপস্যার সাধন তাঁরা জীবনব্রত-রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বামীজী নবাগত মঠবাসিগণের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করার বিষয়ে ছিলেন সর্বদা সজাগ। বৈদ্যনাথধামে যাওয়ার আগেই ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীজী তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন তপস্যার ওপর জোর দেবার জন্য। বলেছিলেন, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। রাতের খাওয়া ক্রমে ক্রমে কমিয়ে ফেলতে হয়। নতুবা ভাল মানের জপ-ধ্যান হওয়া দুঃসাধ্য। স্বামীজী আরও

৫৪ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৮১

বলেন, আহারে নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত চিত্তসংযম অসম্ভব। অতিভোজন থেকে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়। সাধনের প্রথমাবস্থায় বিভিন্ন জাতির স্পৃষ্ট অন্নগ্রহণ ক্ষতিকারক। গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা ভাল নয় বটে, তবে সাধন-ভজনের প্রথম দিকে নিষ্ঠাবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। মঠে প্রত্যেক বিদ্যার্থীর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্যপালন কর্তব্য। সন্ন্যাসের উচ্চ আদর্শ ও কঠোর ত্যাগের জীবনের জন্য যোগ্য বিদ্যার্থী পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করবে, অথবা ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট কয়েক বছর ব্রহ্মচর্য পালনের পর গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করবে।[৫৫] স্বামীজীর মুখে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের এই বাণী মঠবাসিগণকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল।

মঠ-জীবনের সংহতি-শক্তি সুদৃঢ় করবার জন্য প্রয়োজন মঠের আদর্শের প্রচার। স্বামীজীর নির্দেশ: "প্রচারের দ্বারায় সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচারকার্য হইতে কখনও বিরত থাকিবে না।" এ ভাবনা ছিল মঠবাসিগণের নিকট নতুন। নতুন এই ভাবটির গুরুত্ব বুঝে প্রবীণ-নবীন মঠবাসিগণ সচেতনভাবে প্রচারকার্যে সচেষ্ট হন। প্রচারের অন্যতম মাধ্যম ছাপানো পত্র-পত্রিকা। মাদ্রাজ থেকে পাক্ষিক ইংরেজী পত্রিকা 'ব্রহ্মবাদিন' প্রকাশিত হচ্ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ থেকে। এর সম্পাদক ছিলেন ডাঃ নাঞ্জুণ্ডা রাও। মাদ্রাজ থেকে ইংরেজী মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' রাজম আয়ারের সম্পাদনায় জুলাই ১৮৯৬ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। রাজম আয়ারের অকাল মৃত্যুতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশনা কয়েকমাস বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীজীর প্রচেষ্টায় আলমোড়া থেকে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পুনঃপ্রকাশিত হয়। মিঃ সেভিয়ার ছিলেন ম্যানেজার এবং স্বামী স্বরূপানন্দ ছিলেন সম্পাদক। আলোচ্যকালে বিশেষ চেষ্টার ফলে বাঙলা পাক্ষিক 'উদ্বোধন' পত্রিকা জন্ম নেয় ১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯। সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।

ভাষণ, ক্লাস ইত্যাদির মাধ্যমেও বেদান্তপ্রচারের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছিল। বলরাম-ভবনে 'রামকৃষ্ণ মিশন এ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হওয়ার পর থেকে প্রতি রবিবারে সেখানে শাস্ত্রপাঠ ও ভাষণের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্লেগরোগীদের মধ্যে সেবাকাজ সংগঠনের জন্য পাঠ-ভাষণ ইত্যাদি কয়েক সপ্তাহ বন্ধ ছিল।[৫৬] ১১ মার্চ ১৮৯৮ অমৃতবাজার পত্রিকা ঘোষণা করে, সেদিন সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে স্টার থিয়েটারে মিস মার্গারেট নোবল 'The Spiritual Thoughts of India in England' বিষয়ে বলবেন। ১৮ মার্চ ১৮৯৮ স্বামী সারদানন্দ এমারেল্ড থিয়েটারে 'Our Mission in America' শীর্ষক বক্তৃতা করেন। দুটি সভাতেই সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথম সভাটিতে জগদীশচন্দ্র বসু, আনন্দ চার্লু প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন। ২ এপ্রিল মহাকালী পাঠশালাতে পুরস্কার বিতরণ উৎসবে ভগিনী নিবেদিতা সভাপতিত্ব করেন। কলকাতার আলবার্ট হলে স্বামী সারদানন্দ ১ আগস্ট 'The Future Role of Religion in India and Outside' এবং ১৭ সেপ্টেম্বর 'Problem Universal' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বালীর রিপন হলে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Vedanta as Related to Students' Life'। অবশ্য আলোচ্য সময়ের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন সঙ্ঘের প্রধান প্রচারক। তাঁর কাছে সমুপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়ত ভাবসঞ্চারণ ছাড়াও তিনি এই সময়ে আলমোড়া, মারী, লাহোর, জম্মু, শিয়ালকোট, খেতড়ি ইত্যাদি স্থানে ভাষণদান করে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে মঠ আরম্ভ হবার মুখেই স্বামী সারদানন্দ আমেরিকাতে এবং স্বামী শিবানন্দ সিংহলে বেদান্তপ্রচার করে ফিরছিলেন। স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী নিত্যানন্দ (পূর্বনাম যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং কিছু প্রার্থীকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন।[৫৭] এসময়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ শহরের পাঁচটি স্থানে—ট্রিপ্লিকেন, মায়লাপুর,

৫৫ ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৮ তারিখের মঠ-ডায়েরী থেকে গৃহীত।

৫৬ দ্রঃ Brahmavadin, 15 August, 1898, p. 921

৫৭ স্বামী নিত্যানন্দ এ-যাত্রায় ৫০।৬০ জনকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। (স্বামী প্রেমানন্দের ৬।৩।১৮৯৮ তারিখের চিঠি)

ইয়ং মেনস হিন্দু এসোসিয়েশন, চিন্তাদ্রিপেট ও পুরুসওয়াকসে গীতা, উপনিষদ্, যোগসূত্র বিষয়ে ক্লাস নিতে থাকেন। তিনি মাদ্রাজ শহরের কয়েকটি স্থানে বক্তৃতাও করতেন।[৫৮] এদিকে মার্কিন মুলুকে বিভিন্ন শহরে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তবিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজী-শিষ্যা স্বামী অভয়ানন্দ (পূর্বনাম Madame Marie Louise) শিকাগোতে Mesonic Temple-এ বেদান্ত প্রচারকার্যে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন।

আজকের দিনে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, পত্রপত্রিকা বা জনসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের আদর্শের জন্য বিবরণী লিখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাঁর চোখের জলে লেখার কাগজ ভেসে যায়। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করে তিনি মানসনয়নে দেখেন, ঠাকুর তাঁকে বলছেন: "তুই আমাকে চাস, না পাবলিককে চাস?... পাবলিককে যদি চাস, তাহলে খবরের কাগজে দস্তুরমতো লিখতে হবে। এখন দ্যাখ, একদিকে পাবলিক, একদিকে আমি।"[৫৯] তাঁর আর পত্রপত্রিকায় লেখা হলো না। অবশ্য পরবর্তী কালে প্রচারবিমুখ সন্ন্যাসিগণ মেনে নিয়েছিলেন যে, সঙ্ঘের স্বার্থে কর্মে পরিণত বেদান্ত আদর্শের প্রচার একান্ত প্রয়োজন।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমা নীলাম্বর-ভবনে ছিলেন। ঐ সময় সেখানে তিনি পঞ্চতপা করেন। সে-সময় বাড়িটির চেহারা।
শিল্পী: বিমল সেন

বা তার কাজকর্মের প্রচার সকল মঠবাসী মেনে নিতে পারেননি। একটা উদাহরণ তুলে ধরা যাক। কয়েকমাস পূর্বের ঘটনা। স্বামীজী চেয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে ত্রাণকার্য চলাকালীন সেবাকার্যের সংবাদ পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত হোক। তদনুযায়ী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ত্রাণকার্যে নিযুক্ত স্বামী অখণ্ডানন্দকে বারম্বার চিঠি দিয়েছিলেন। নির্দেশ পেয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ পত্রিকার

ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর উপায় ঐ ভাবাদর্শ অনুযায়ী আদর্শ জীবন-যাপন। সন্ন্যাসের আদর্শ জীবন গড়ে তোলার জন্য একান্ত প্রয়োজন অটুট ব্রহ্মচর্যপালন। এরূপ আদর্শ চরিত্রের সন্ন্যাসী তাঁর কথা, চিন্তা ও আচরণ দ্বারাই সে-আদর্শের মহিমা সর্বাবস্থায় প্রকাশ করে থাকেন। সন্ন্যাসিসঙ্ঘের জন্য স্বামীজী প্রচারের এ-মাধ্যমটির ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। [ক্রমশঃ]

৫৮ Brahmavadin, 1 July, 1898, p. 810

৫৯ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ২৫৯

রাধাকৃষ্ণ

মঞ্জুভাষা মিত্র

'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্'

ধীর ও ললিতভাবে ঈশ্বরের আলিঙ্গিত সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ স্বরূপ
বংশীর বাদনরত দেবতার কাছে এসে পরিপূর্ণ সমর্পণকারী
আহ্লাদিনীপ্রেমসার মহাভাব ভক্তিরানী আনন্দের স্নিগ্ধ কুটম্বিনী
বেতসনিকুঞ্জতলে ও বৃন্দাবিপিনে রটে দুজনের মিলনকাহিনী
যমুনার নীলতীরে রতিসুখসার-ভাষা জ্যোৎস্নাবতী শুক্ল অভিসার
হরির রভসে ভোর গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা-তনু থরো থরো লাবণ্য বিথার
পুরুষের কাছে এসে মধুর প্রচেষ্টা করে সে-পুরুষ উৎকর্ষে পরম
চিন্তার অতীত স্তরে ভাবঘন সু-বর্ষার গদগদ কদম্বের রূপ
অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গনে নারীর লাবণ্য যেন কৃষ্ণদেহ ঢেকে দিতে চায়
গোপীকুলতিলোত্তমা প্রেয়সীস্বরূপ হয়ে পৃথিবীতে প্রেম জিজ্ঞাসায়
ঈশ্বর আসেন নেমে, ফাল্গুনী পূর্ণিমাচাঁদ পদাবলী কীর্তন ছড়ায়
শতচন্দ্রে স্বরধ্বনি রঙে মত্ত গোপাঙ্গনা আনন্দের উৎফুল্ল জোয়ার
ছন্দোময়ী কাব্য আনে, ভাবময়ী গীতিগানে হৃদয়ের উৎস খুলে যায়
রাধাকৃষ্ণভাবমূর্তি কবিতার রজঃস্থলী নিরন্তর প্রভাবিত করে।

আমার প্রভু তুমি

নন্দিনী মিত্র

দুঃখ যতই দাও না প্রভু, সেই তো তোমার দয়ার দান,
জীবনবীণার তন্ত্রীতে তাই বাজে সদাই গভীর তান।
ডাকতে যাতে ভুলে না যাই, তাই তো তুমি আপন হাতে—
আঘাত করে যত্নে রাখো হৃদয়খানি তোমার সাথে।
তুমিই আমার আনন্দ, সুখ, দুঃখ ব্যথার উৎস তুমি,
সুখের মাঝে তোমায় দেখি দুখেও আছ অন্তর্যামী।
দিতেও তুমি নিতেও তুমি—রয়েছ মোর জীবন জুড়ে,
সারা জনম কাটুক আমার সুর মেলাতে তোমার সুরে।
তোমায় জানা কঠিন, তবু সারাৎসার যে তুমিই প্রভু।
নিবিড় করে ধরব চরণ, পাছে তোমায় হারাই কভু।
আমার বলে যা জেনেছি তোমায় দিয়ে নিঃস্ব হওয়া—
স্মরণ মনন তোমার নামে হোক্ না চোখের জলে ছাওয়া।
তোমার নামেই বাঁচা আমার, তোমার নামে আমার মরণ,
শেষবেলাতে পাই যেন গো 'ঠাকুর' তোমার অভয় চরণ।

সাহারা

বিভুপ্রসাদ বসু

পিছনে আমারি ছায়া ছায়া মূর্তি আমি
আজীবন অকারণ তারি পিছে ধাই ঃ
কি ভয় কি জানি মনে বুঝি বা হারাই
যা বুঝি না বুঝি বোঝে বুঝি অন্তর্যামী।
দেউলে দালানে রাখি কি ভেবে প্রণামী—
কি ভেবে রাখি যে তুলে যেখানে যা পাই
গোপনে কখন রণে বুঝে বুঝি নাই
নিরস্ত্র নিহত পড়ে এ মন সংগ্রামী।

আজও ধাই ছায়া পিছে ছদ্মছায়া নিজে,
নিশীথ কখন শেষ নেভে শুকতারা ঃ
নিতল এ বুকে আছে যা কিছু মণি যে
আতুর রেখেছে চোখ কি মগ্ন পাহারা।
বাঁধিব ছায়ারে ছলে সে ছায়া আমি যে—
দগ্ধ এক বালুকণা, দিগন্তে সাহারা।

অভয়

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বন্যার বিস্তার ভেবে আগাম বর্ষায়
ত্রস্ত হয় বুক ভরা বিগত শিক্ষায়
গৃহদাহে গোবৎস সিঁদুরের মেঘে
ভেবেছে পুনরাবৃত্তি সবিশেষ বেগে।

একথা বলার মতো এবারো ভাবার
যা হয়, তা হয় যেন কিছু কিছু আর ;
একটা কি দুটো বুঝি চিন্তার স্বরাজ—
এনে দেয় মানসিক স্বতন্ত্র সমাজ।

আমাদের চারপাশে আছে যারা ভালো
সময়ে সময়ে শুধু সচেতন আলো
ফেলে যায় বিবেকের কেন্দ্রবিন্দুটিতে
তাই বলা চলে জানি—জাগৃতির মিতে।

ঘুমন্ত বা অজানার অনাগত ভয়
জানিয়ে দিয়েছে যবে—বুকেতে অভয়।

ওঁ শান্তি

নিভা দে

নাবালক অনাবিল হাসি থাক যতই ওই
কোমল শুভ্র মুখে, ভুলের ক্ষমা নেই জেনো।
ভুল করে অনেকেই নামাবলী গায়ে দিয়ে
দল বদলে বদলে ফেরে ফেউয়ের মতো।
তুমি কেন জানোনি সেই সব শিবালিক
রীতি আর পদ্ধতি!
নিষ্পাপ হাসিতে কি উপেক্ষা করতে
শয়তানদের ভ্রুকুটিকে?
সটান খ্রীস্টের মতো আবারো মৃত্যুর মালাখানি
তুলে নিলে হেসে হেসে
গলায়, নত মস্তকে।
মানুষের প্রিয়তার জন্য অনেক রক্তের অঞ্জলি
দিয়ে গেলে তুমি—
তার সাথে নিজের পলাশ হৃৎপিন্ড।
হে নাবালক প্রেমিক,
এবার ফুল আর মাটিতে মাখামাখি হয়ে
শান্তিতে ঘুমোও।

শুধু লজ্জার ইতিহাস

বিজয়কুমার দাস

বারবার শুধু লজ্জার ইতিহাস…

হিংসার আগুনে পোড়ে দেশপ্রেম,
একতার পবিত্র স্বপ্ন
ভাসে রক্তের সমুদ্রে।

সাম্যের শপথ ছিল, মৈত্রীর গান
বুকের ভিতরে ছিল
আমাদের পবিত্র স্বদেশ—

তবু হিংস্র হাত
বারবার রক্তে ভরে ওঠে,
কেড়ে নেয় অমূল্য জীবন।

শ্বাপদের চোখে নাচে সর্বনাশ,
বারবার শুধু লজ্জার ইতিহাস।

'সকল তীর্থ তোমার চরণে'

স্বামী ব্রহ্মানন্দ*

মহারাজ। (জনৈক গৃহীভক্তের প্রতি) বাড়ির গোলমালে মন বসে না, তাই বুঝি শ্মশানের আগুনের পাশে চিৎকার কান্নার মধ্যে ধ্যানে মনস্থির করতে চেষ্টা করছ? এটা কি রকম জানো? 'Jumping out of the frying pan to the fire'-এর মতো অবস্থা। ঠাকুর এরকম ব্যবস্থা গৃহীভক্তদের দেননি; কিন্তু তাঁর কথা সকলের মনে ধরে না। একদল গৃহীভক্তকে তিনি বলেছিলেন: "সংসারত্যাগী উদাসী সাধুরাই শ্মশানে বসে জপধ্যান করবার অধিকারী। সংসারে থেকে তোমাদের এতো বাড়াবাড়ি করবার কী দরকার? ওতে তোমাদের ভাব নষ্ট হয়ে যাবে—না হবে যোগ, না হবে ভোগ। বৈরাগ্য কি শ্মশানে বসলেই আসবে? অবসর পেলে কোন নির্জন জায়গায় বসে ঈশ্বরচিন্তা করবে—[সুযোগ] হলে মাঝে মাঝে এখানকার পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করলে, ওখানে অনেক সাধু ধুনি জ্বালিয়ে তপস্যা করেছে।"

ঠাকুরের এই ইঙ্গিতটুকু পেয়ে কার না প্রাণে আগ্রহ হয় পঞ্চবটীতে বা বেলতলার সিদ্ধভূমিতে বসে আত্মকল্যাণ চিন্তা করতে? দক্ষিণেশ্বরের ঐ পুণ্য তপোভূমিতে ঠাকুর যে spirituality-র fire জেবলে রেখে গেছেন, তাতে ওই জায়গা আজও গরম আছে। অমন পবিত্রতীর্থ বর্তমান কালে whole world-এর (সমস্ত পৃথিবীর) মধ্যে কোথাও খুঁজে পাবে না। পাঁচহাজার বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবনের রজের মাহাত্ম্য আজও ভক্তে উপলব্ধি করে, আর এই সেদিন করুণাবতার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সর্বধর্মসমন্বয় সাধনলীলা করে গেলেন—ওখানকার প্রত্যেক ধূলিকণাতে তাঁর পদধূলি মাখানো রয়েছে। ঐ পবিত্রতীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের মুখের কথা: "ভগবান লাভের আশায়, যে কেউ ইখানকে আসবে, তার আশা পূর্ণ হবে। এর পরে ইখানকার পঞ্চবটীর আর কামারপুকুরের মাটি থাকবে না—কতো দূরদূরান্তর থেকে ভক্তেরা এসে নিয়ে যাবে।"

অমন মহাতীর্থ ছেড়ে তোমরা চারদিকে ছুটে বেড়াও কেন? ওখানে একহাজার জপ করলে, দশহাজার জপের ফল হয়, দশহাজার জপ করতে পারলে লাখো জপের ফল হয়—স্থানমাহাত্ম্যে। অতো জপ করতে যদি নাও পার, তবে শুধু ধ্যান করলেও প্রাণে শান্তি পাবে। আমি রামলাল-দাদাকে বলে দেব ঠাকুরের ঘরের চাবি তোমার হাতে দিতে। শনিবার রাত্রে তাঁর ঘরে কিম্বা পঞ্চবটীতে বসে যতো পারো জপধ্যান করবে। জপ করতে করতে যখন মালা হাত থেকে কখন পড়ে গেছে সে খেয়াল থাকবে না—তখন জপের তন্ময়তায় ধ্যানের অবস্থা আসে! ধ্যান করতে করতে অন্তর মালিন্যমুক্ত হয়, শক্তি অনেক বেড়ে যায়।

ভক্ত। মহারাজ! রামলাল-দাদা আমায় খুবই স্নেহ করেন! তিনি ঠাকুরের ঘরের চাবি রাত্রে বাসায় যাবার আগে আমার হাতে দিয়ে যান, তাঁকে বলবার আপনার দরকার হবে না।

মহারাজ। তবে কি শ্মশানে তুমি আর যাও না?

ভক্ত। আজ্ঞে না। ইতিপূর্বে লাটু মহারাজ

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখের সঙ্গে লাটু মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দের) শিষ্য চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের যেসব আলাপাদি হতো, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় তা ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। বর্তমান প্রসঙ্গটি চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।—যুগ্ম সম্পাদক

আমায় রামবাবুর প্রতি ঠাকুরের উপদেশ বলে সাবধান করে দিয়েছেন। ঠাকুরের কথা, সাধুগুরুর নির্দেশ, আপনাদের কথা ঠেলে নিজের গোঁভরে চললে না হবে এদিক, না হবে ওদিক—'ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট' হয়ে যাবে।

মহারাজ। বাঃ! এটা যে তুমি বুঝেছ এতে তোমার কল্যাণ হবে। দ্যাখ, যার যা অধিকার সেই jurisdiction-এর ভেতরে কাজ করবে। বেশি হাঁকপাক করলেই যে double promotion পাবে—মনেও করো না—শনৈঃশনৈঃ এগোতে হবে। একটা routine মতো কাজ করবে। মাসে একটি শনিবার কিম্বা রবিবার মঠে আসবে কিম্বা কাঁকুড়-গাছি যোগোদ্যানে যাবে। কোন এক শনি বা রবিবার সোজাসুজি চলে যাবে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে। সেখানে পঞ্চবটীতে ধ্যান করবে, বাকি দুটি শনি রবিবারে হেথা সেথা ছুটোছুটি না করে তোমাদের বাড়ির কাছে গঙ্গার ধারে নির্জনে বসে জপধ্যান করবে—যা ল্যাটু মহারাজ তোমায় বলে দিয়েছেন। সাধুর কথা মেনে চললে উন্নতি হবে, ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করতে পারবে।

আর এক কথা—দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে ও বেলতলায় সারারাত থাকতে ঠাকুর আমাদেরও মানা করতেন। বলতেন : "ঐ সাধনক্ষেত্র রক্ষা করেন একজন ভৈরব। ভারি রাত্রিতে কেউ সেখানে বসলে, তাকে ভয় দেখিয়ে তুলে দেন তিনি।" তুমি যখন বারবার ভয় পেয়েছ, তখন আর ওখানে সারারাত থেক না। রাত দশটা পর্যন্ত সেখানে থাকতে পার। তারপরে ঠাকুরের ঘরে বসে জপধ্যান করবে। ঐ ঘরে ঠাকুরের কতো ভাব, সমাধি, কীর্তনানন্দ হয়েছে তার impression এখনো রয়েছে—ওকি কম তীর্থ! ওখানে সকল তীর্থের সমাবেশ! যার ভ্রম ঘুচেছে, সে আর চারিদিকে ভ্রমণ করতে চায় না—সে বুঝেছে—'সকল তীর্থ তোমার চরণে, মুই বদরী যাব কি কারণে!'*

* বিশ্ববাণী, অষ্টম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৫৩, বৈশাখ, পৃঃ ৫১-৫২

সংগ্রহ : নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও প্রায় একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্বমুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের 'দেখছেন'? 'কলকাতা' মানে অবশ্য শুধু কলকাতা নামক ভূখণ্ডটিই নয়, কলকাতা এখানে একটি প্রতীক। সারা পৃথিবীর মানুষ এবং সারা পৃথিবীই এখানে উদ্দিষ্ট। সুতরাং কলকাতার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, কলকাতার মাধ্যমে সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের দৃষ্টি প্রসারিত—মা সারা জগৎ অর্থাৎ সারা জগতের লোককে 'দেখছেন'। কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক।

আলোকচিত্র : স্বামী চেতনানন্দ

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সামাজিক ছবি

"খ"

[পূর্বানুবৃত্তি]

অপরাহ্নে ক্রমশঃ বাগানের নিস্তব্ধতা কোলাহলে পরিণত হইল। গাড়িতে, বাইসিকলে, পদব্রজে কত লোক আসিল। দাসী বৈষ্ণবীর দ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে উঠাইল। দ্বার খুলিতেই রামপ্রকাশবাবু বলিলেন : "সব লোক আপকো ঠহর রহা হৈ, আপ আইয়ে।" বৈষ্ণবী গিয়া দেখিল, একটি বৃহৎ হল লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক পার্শ্বে একখানি টেবিলের কাছে একখানি চৌকিতে সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, একখানি চৌকি খালি রহিয়াছে। রামপ্রকাশবাবু সেই চৌকিতে বৈষ্ণবীকে বসাইলেন এবং নিজে একটু তফাতে গিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলেন। বিষয় "আত্মার অস্তিত্ব"। তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর স্বরে হল ভরিয়া গেল। তীক্ষ্ণ সারবান যুক্তিরাশি সন্দেহসমূহ ভেদ করিতে লাগিল। বল ও আশাপ্রদ বাক্যাবলী দুর্বল ও নিরাশকে নবজীবন দিতে লাগিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিল, বক্তৃতার শেষে বহুক্ষণব্যাপী করতালি বাজিল। কেহ কেহ প্রশ্ন করিল, সন্ন্যাসী প্রীতিপূর্ণস্বরে তাহাদের সদুত্তর দিলেন। পরে দুর্গাদাসবাবু উঠিয়া সন্ন্যাসীকে বহুতর ধন্যবাদ দিলেন এবং জ্ঞাপন করিলেন, "এক্ষণে স্থানীয় অবৈতনিক নাট্যশালার যুবকদিগের গীতবাদ্য হইবে।"

হলের মধ্যস্থলে আপন আপন বাদ্যযন্ত্র লইয়া যুবকেরা বসিয়াছিল। দুর্গাদাসবাবু বসিতেই বাজনা শুরু হইল। একটি তান বাজিল। রামপ্রকাশবাবু বৈষ্ণবীর কাছে উঠিয়া গিয়া বলিলেন : "মায়ি, সবকো প্রার্থনা কি আপ পহলে এক ভজন শুনাওঁয়ে।"

বৈষ্ণবী গাহিল, সঙ্গে বাজনা বাজিতে লাগিল।

"প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো।
সমদরশী হৈ নাম তুমহারো॥
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নহি হোয়,
দুহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী, এক নহর, বহত মিলি নীর ভরো।
যব মিলিহে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো॥
এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥

গীতে একটি উন্মাদ ভাবলহরী বহিতেছিল, যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ মগ্ন হইল এবং বৈষ্ণবীর স্বর, সুর, লয় বোধ, নিপুণতা প্রভৃতি অলক্ষ্য হইয়া গেল। যেন বৈষ্ণবীর প্রাণ একটি জীবন্ত আর্তনাদের প্রবল ঝড়ে পরিণত হইয়া সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মন্ত্রসৃষ্ট দেবতার মতো, একটি সকরুণ প্রার্থনা মূর্তিমতী হইয়া সকলের মনশ্চক্ষু ভরিয়া ফেলিল, গীত শুনিতে দিল না। কাহারও চক্ষের একবিন্দু জলও সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল না।

গান শেষ হইলে প্রথমে সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন, বৈষ্ণবী চৌকিতে ঢলিয়া পড়িয়াছে, নিস্পন্দ, সংজ্ঞাহীন। তখনি রামপ্রকাশবাবুকে ইশারা করিয়া ডাকিয়া দুজনে পশ্চাৎদিক দিয়া চৌকি ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। দুর্গাদাসবাবু ও আর কয়েকটি লোক বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবীর মুখে চোখে জল দিতে ও হাওয়া করিতে বলিয়া সন্ন্যাসী হলে ফিরিয়া আসিলেন এবং ইংরেজীতে বলিলেন : "চিন্তার কারণ নাই, সম্ভবতঃ উৎকট চেষ্টার নিমিত্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এখনি সুস্থ হইবেন, সঙ্গীত

আরম্ভ হউক।" সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং রামপ্রকাশবাবু ব্যতীত অন্য সকলে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি, বৈষ্ণবী সংজ্ঞালাভ করিলে দাসীর সাহায্যে বৈষ্ণবীকে তাহার কামরায় রাখিয়া, দুগ্ধাদি পান করাইয়া, তবে ফিরিলেন।

সভা ভাঙ্গিয়া গেলে দুর্গাদাসবাবু ও চারুবাবু উভয়েই বৈষ্ণবীকে নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বৈষ্ণবী গেল না, সেখানেই সে-রাত্রি থাকিবে বলিল। সন্ধ্যা হইতে রামপ্রকাশবাবু চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী নিচে আসিয়া দাসীকে বলিলেন: "মায়িকি তবিয়ৎ আচ্ছা হৈ তো য়ঁহা বোলায় লাও।" দাসী খবর দিতেই বৈষ্ণবী আসিল, দেখিল সন্ন্যাসী তাহার অপেক্ষায় বাটীর সম্মুখে পথে পাইচারি করিতেছেন।

"দেখ অনুপ!" বৈষ্ণবী চমকিয়া উঠিল, বলিল: "তুমি আমায় চিনতে পেরেছ?"

"আমি তোমাকে ধর্মশালাতেই চিনেছি—সে যা হোক, আমি তোমাকে দু-চারটি কথা বলতে ইচ্ছা করি।"

"সেই জন্যই তো আজ এখানে রইলুম।"

"আমার মনে হয়, তুমি এখনো ইচ্ছা করলে তোমার জীবন বদলে ফেলতে পার। বুঝে দেখ, তুমি জানবার চেষ্টা না করেই 'অতীন্দ্রিয় কোন ধর্ম বা আত্মা বলে পদার্থ নাই', 'ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া অন্য নিত্য সুখ কেবল মস্তিষ্কের বিকার মাত্র' প্রভৃতি বলে থাক। অতীন্দ্রিয় কোন অবস্থা বা সুখ আছে কিনা, তুমি বিধিমতে জানতে চেষ্টা করেছ কি? তুমি বুদ্ধিমতী, বিবেচনা কর, সব বিষয় শিখতে গেলেই অধিকারী হওয়া চাই। তুমি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী হতে যত্ন করেছ কি? শমদমাদি সাধন করেছ? কোন একটি সামগ্রী পাবার জন্য যাওয়া চাই উত্তরে, কোন লোক অনবরত দক্ষিণেই যদি যায়, আর বলে, সে-সামগ্রী নাই, তার কথা কি কাজের? এপর্যন্ত তোমার অবস্থা কি ঠিক তাই নয়? কোন জিনিস না দেখলে, না অনুভব করলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় না। এবং কোন জিনিস দেখবার বা অনুভব করার চেষ্টা না করলেও জানতে পারা যায় না। সাংসারিক সুখই সব, এই উপদেশ তুমি লোককে দিয়ে বেড়াও, স্ত্রীপুরুষে বাধারহিত স্বেচ্ছাধীন প্রণয়, ইন্দ্রিয়সম্ভোগ, সমাজবন্ধনের অপসারণ প্রভৃতি শেখাও। তোমার জড়বাদ সত্য ও আত্মবাদ মিথ্যা হলে একদিন ওসব কথা বলা চলত। কিন্তু তুমি একটিকে সত্য, অপরটিকে মিথ্যা প্রমাণ করবার কি করেছ?"

"তুমি এসব কথা বলবে, আমি মনে করিনি। ঘৃণা করে দশটা কটু-কাটব্য শোনাবে, ভেবেছিলুম। যা হোক, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বলবে কি?"

"বল।"

"তোমাকে ছেলেবেলা থেকে শুদ্ধ ও সত্যবাদী ব্রাহ্মণসন্তান বলে জানি। তুমি আমাকে ঠকাবে না। আমাকে বল, তুমি নিজে অনুভব দ্বারা জেনেছ কি যে অতীন্দ্রীয় আত্মা আছেন এবং সে আত্মানুভব সুখদুঃখাতীত আনন্দময়?"

"হাঁ, আমি অনুভব দ্বারা জানি যে, আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ।"

বৈষ্ণবী সন্ন্যাসীর পদতলে পড়িল। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিল: "তুমি আমার গুরু, আমার ত্রাণকর্তা পিতা, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে এই আত্মবস্তু জানবার উপায় বলে দাও।"

সন্ন্যাসী তাহাকে অভয় দিলেন।

* * *

পাঠক বৈষ্ণবীকে চিনিলেন কি? ইনি আমাদের প্রথম ছবির পূর্ণবাবুর বিধবা কন্যা।*

[সমাপ্ত]

* উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩১১, পৃঃ ৫৬-৫৯

শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

লোকো হি দ্বিবিধঃ, আত্মলোকোঽনাত্মলোকশ্চেতি। তত্রাত্মলোকস্য ত্রৈবিধ্যং বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রূয়তে—

"অথ ত্রয় বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি। সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্মণা, কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইতি।

অন্বয়

লোকঃ হি (যেহেতু লোক), দ্বিবিধঃ (দুই-প্রকার), আত্মলোকঃ ইতি (আত্মলোক), চ (এবং), অনাত্মলোকঃ (অনাত্মলোক), তত্র (তার মধ্যে), আত্মলোকস্য (আত্মলোকের), ত্রৈবিধ্যং (তিনপ্রকার), বৃহদারণ্যকে (বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণের), তৃতীয়াধ্যায়ে (তৃতীয় অধ্যায়ে), শ্রূয়তে (শোনা যায়)—

অথ (বাক্যারম্ভসূচক অব্যয়), ত্রয়ঃ বাব (মাত্র তিনটি), লোকাঃ (লোক), মনুষ্যলোকঃ (মনুষ্য-লোক), পিতৃলোকঃ (পিতৃলোক), দেবলোকঃ (দেব-লোক), ইতি (বাক্যশেষার্থসূচক অব্যয়), সঃ (সেই), অয়ম্‌ (এই), মনুষ্যলোকঃ (মনুষ্যলোক), পুত্রেণ এব (পুত্রদ্বারাই), জয্যঃ (সাধ্য), অন্যেন কর্মণা (অন্য কর্মদ্বারা), ন (নহে), কর্মণা (কর্মদ্বারা), পিতৃলোকঃ (পিতৃলোক), বিদ্যয়া (উপাসনাদ্বারা), দেবলোকঃ (দেবলোক) ইতি।

অনুবাদ

লোক দুইপ্রকার—আত্মলোক ও অনাত্মলোক। আত্মলোক তিনপ্রকার, বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ১।৫।১৬) এইরূপ শোনা যায়—

মাত্র তিনটি লোক (বিদ্যমান)—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। তার মধ্যে মনুষ্যলোক পুত্রদ্বারা জয় করা যায়, অন্য কর্মের দ্বারা নয়। কর্মদ্বারা পিতৃলোক এবং উপাসনার দ্বারা দেবলোক জয় করা যায়।

আত্মলোকশ্চ তত্রৈব শ্রূয়তে—

"যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্টা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইতি।

অন্বয়

আত্মলোকঃ চ (আত্মলোকও), তত্র এব (সে-স্থলেই), শ্রূয়তে (শোনা যায়)। যঃ হ বৈ (যে-কোন ব্যক্তি), স্বম্‌ লোকম্‌ (আত্মাখ্য স্ব-স্বরূপকে), অদৃষ্টা (অনুভব না করে), অস্মাৎ লোকাৎ (ইহ-লোক থেকে), প্রৈতি (প্রয়াণ করে), অবিদিতঃ সঃ (অননুভূত সেই আত্মা), এনম্‌ (একে অর্থাৎ এই অবিদ্বানকে), ন ভুনক্তি ইতি (পালন করেন না)।

অনুবাদ

সেই স্থলেই (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ১।৪।১৫) আত্মলোক সম্বন্ধেও শোনা যায়—কোন ব্যক্তি যদি আত্মলোক দর্শন না করে (অর্থাৎ আত্মাখ্য স্ব-স্বরূপকে অনুভব না করে) ইহলোক থেকে প্রয়াণ করেন, সেই অজ্ঞাত আত্মা তাঁকে পালন করেন না অর্থাৎ শোকমোহাদি থেকে রক্ষা করেন না।

"আত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম ক্ষীয়তে" ইতি।

অন্বয়

আত্মানম্‌ এব লোকম্‌ (কেবল আত্মরূপলোককেই), উপাসীত (উপাসনা করিবে), সঃ যঃ (যে কেহ), আত্মানম্‌ এব লোকম্‌ (আত্মরূপ লোককেই), উপাস্তে (উপাসনা করেন), অস্য হ কর্ম (তাঁর কর্ম), ন ক্ষীয়তে (ক্ষয় হয় না), ইতি চ (এইরূপ আছে)।

অনুবাদ

এইরূপ আছে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ১।৪।১৫) যে, আত্মলোকেরই উপাসনা করবে। যে-ব্যক্তি আত্মলোকেরই উপাসনা করে থাকে, তার কর্ম ক্ষয় হয় না।

এখন প্রথম শ্রুতিবাক্যের ("য হ বা অস্মাল্লোকাৎ … ন ভুনক্তি)"-এর তাৎপর্য বলা হচ্ছে—

যো মাংসাদিকপিণ্ডলক্ষণাৎ স্বলোকং পরমাত্মখ্যমহং

ব্রহ্মাস্মীত্যবিদিত্বা ম্রিয়তে স স্বলোকঃ পরমাত্মাঽবিদিতোঽবিদ্যয়া ব্যবহিতঃ সন্নেনমবেত্তারং প্রেত্যং মৃতং ন ভুনক্তি শোকমোহাদি-দোষাপনয়নেন ন পালয়তি।

অন্বয়

যঃ (যে), মাংসাদিকপিণ্ডলক্ষণাৎ (মাংসাদির পিণ্ডস্বরূপ ইহলোক থেকে), পরমাত্মাখ্যম্ স্বলোকং (পরমাত্মস্বরূপ নিজলোককে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপকে), অহং (আমি), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), অস্মি (হই), ইতি (এইরূপ), অবিদিত্বা (না জেনে), ম্রিয়তে (দেহত্যাগ করে), সঃ (সেই) স্বলোকঃ (আত্মলোক), পরমাত্মা (পরমাত্মা), অবিদিতঃ (অজ্ঞাত), অবিদ্যয়া (অবিদ্যাদ্বারা), ব্যবহিতঃ সন্ (বিচ্ছিন্ন হয়ে), এনম্ (এই) অবেত্তারং (অজ্ঞানীকে), মৃতং প্রেত্যং (মৃত্যুর পর), ভুনক্তি ন (রক্ষা করে না), শোকমোহাদিদোষাপনয়নেন (শোকমোহাদি দোষ দূরীকরণ দ্বারা), পালয়তি ন (পালন করেন না)।

অনুবাদ

যে-ব্যক্তি মাংসাদির পিণ্ডস্বরূপ এই লোক থেকে পরমাত্মা নামক স্বরূপকে না জেনে অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' —এইরূপ না জেনে দেহ ত্যাগ করে, [তার নিকট] আত্মলোক বা পরমাত্মা অজ্ঞাত থাকে অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বারা [ব্রহ্ম] বিচ্ছিন্ন থেকে সেই অজ্ঞানীকে (আত্মলোক-জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে) মৃত্যুর পর পালন করে না অর্থাৎ শোকমোহাদি দোষ দূর করে তাকে রক্ষা করেন না।

এখন দ্বিতীয় শ্রুতিবাক্য ("আত্মানমেব লোকমুপাসীত··· কর্ম ক্ষীয়তে")-এর তাৎপর্য বলা হচ্ছে—উপাসকস্য হ নিশ্চিতং কর্ম ন ক্ষীয়তে একফলদানেনোপক্ষীণং ন ভবতি। কামিতসর্বফলং মোক্ষং চ দদাতীত্যর্থঃ।

অন্বয়

উপাসকস্য হ (উপাসকের), কর্ম (কর্ম), নিশ্চিতং (নিশ্চয়রূপে), ক্ষীয়তে ন (ক্ষয় হয় না), একফলদানেন (একটিমাত্র ফলদানে), উপক্ষীণং (ক্ষয়যোগ্য), ভবতি ন (হয় না)। কামিতসর্বফলং (বাঞ্ছিত সকল কর্মফল), চ (এবং), মোক্ষং (মুক্তি), দদাতি (প্রদান করে) ইতি অর্থঃ (এইরূপ অর্থ)।

অনুবাদ

সেই [আত্মলোক] উপাসকের কর্ম নিশ্চিতরূপে ক্ষয় হয় না অর্থাৎ একটি মাত্র ফলদান করে বিনাশ হয় না, অর্থাৎ বাঞ্ছিত সকল কর্মফল এবং মোক্ষও প্রদান করে থাকে।

ষষ্ঠেঽধ্যায়েঽপি—

"কিমর্থং বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থং বয়ং যক্ষ্যামহে।"
"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক" ইতি।

"যে প্রজামীশিরে তে শ্মশানানি ভেজিরে। যে প্রজা নেশিরে তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে।"

অন্বয়

ষষ্ঠেঽধ্যায়ে অপি (বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায়েও কথিত আছে)—কিম্ অর্থং (কি নিমিত্ত), বয়ম্ (আমরা), অধ্যেষ্যামহে (বেদাধ্যয়ন করব), কিমর্থং (কি নিমিত্ত), বয়ম্ (আমরা), যক্ষ্যামহে (যজন করব), যেষাম্ নঃ (যে আমাদিগের), অয়ম্ আত্মা (এই আত্মাই), অয়ম্ লোকঃ (অভিপ্রেত এই লোক), প্রজয়া (সন্তানাদি দ্বারা), কিম্ (কি), করিষ্যামঃ (করব), যে (যাহারা), প্রজানাম্ (সন্তানাদির), ঈশিরে (আকাঙ্ক্ষা করে), তে (তাহারা), শ্মশানাণি (শ্মশানকে), ভেজিরে (ভোগ করে), যে (যাহারা), প্রজা (সন্তান), ঈশিরে ন (আকাঙ্ক্ষা করে না), তে (তাহারা), অমৃতত্বং হি (মোক্ষকেই), ভেজিরে (ভোগ করে)।

অনুবাদ

উক্ত বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত আছে—

"কি নিমিত্ত আমরা বেদাধ্যয়ন করব? কি নিমিত্ত আমরা যজ্ঞ করব?"

"যে আমাদের এই আত্মাই অভিপ্রেত লোক, সেই আমরা সন্তানাদির দ্বারা কি করব?"

"যারা সন্তানাদির আকাঙ্ক্ষা করে তারা শ্মশানকে ভোগ করে, যারা সন্তান আকাঙ্ক্ষা করে না তারা মোক্ষকেই ভোগ করে।"

বিবৃতি

উপরোক্ত তিনটি বাক্যের মধ্যে আত্মকামী ও অনাত্মকামী সাধকের ফলের বিভিন্নতা শাস্ত্রবাক্য থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় বাক্যের আকর পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র দ্বিতীয় বাক্যটি (কিং প্রজয়া··· অয়ং লোক) বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৪।২২ মন্ত্রে পাওয়া যায়। [ক্রমশঃ]

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

উদ্বোধনের ডাক্তার মহারাজের (স্বামী পূর্ণানন্দের) মুখে শুনিয়াছি, তিনি একসময়ে রাজা মহারাজের সঙ্গে পুরীতে শশীনিকেতনে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, সেই সময় মহারাজের মন সর্বদাই খুব উচ্চভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি বলিয়াছিলেন : "একদিন আকাশ খুব পরিষ্কার, পূর্ণিমা রাত্রি। জ্যোৎস্নায় চারিদিক যেন হাস্যময়। মহারাজের নির্দেশে রাত্রে প্রাঙ্গণে বিছানা করা হয়েছে। মহারাজ শুয়ে শুয়েই কথা-বার্তা বলছেন। আমরা যারা আছি সবাই শুনছি। কথাপ্রসঙ্গে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আমাদের ঘুম পাচ্ছে। হঠাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা, তাঁর নীলাচলে বাসের স্মৃতি মহারাজের অন্তরে জাগরূক হলো। মধুর স্বরে তিনি খুব আবেশের সঙ্গে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলেন, 'এরূপ সুন্দর পূর্ণিমার রাত্রে মহাপ্রভুর ঘুম হতো না। ভগবদ্‌বিরহের স্ফূর্তিতে অস্থিরভাবে ছটফট করতে করতে তাঁর রাত্রি অতিবাহিত হতো। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলাম না বলে রোদন আর্তি প্রলাপে নিশি ভোর হয়ে যেত।' এইসব কথা, মহাপ্রভুর ভগবদ্‌বিরহের বিষয় বর্ণনা করতে করতে মহারাজেরও ঐরূপ বিরহ ভাবের উদয় হলো। তিনিও বিছানায় ছটফট, এপাশ ওপাশ করছেন আর বারবার বলছেন, 'তিনি এমন সুন্দর নিশিতে ঘুমোতে পারতেন না; কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করতেন, আর আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটাব? ছিঃ আমাদের!' বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।" পূর্ণানন্দজী শ্রীশ্রীমহারাজের সেই অপূর্ব ভাবাবেশের কথা স্মরণ করিয়া ভক্তি গদগদ চিত্তে বলিলেন : "তাঁর সেই অপূর্ব ভাবাবেশ দেখে আমাদের চোখ থেকেও নিদ্রাদেবী পালিয়ে গেলেন। আমরা বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে সারারাত বিনিদ্র মহারাজের পাশে বসে সেই বিনিদ্র রাত্রি কাটালাম।"

তাঁহার প্রতি মহারাজের অতুলনীয় স্নেহ কৃপার কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ডাক্তার মহারাজ আরও বলিয়াছেন : "তখন ডাক্তারি পড়ি। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভের জন্য অন্তরে ইচ্ছারও উদ্রেক হয়েছে। মহারাজ বলরাম মন্দিরে আসার সংবাদ পেলেই সেখানে এসে তাঁকে দর্শন করি ও নিজের অন্তরের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। মহারাজও খুব স্নেহের সঙ্গে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে কাছে বসতে বলতেন। কিন্তু বসবার পর আর বিশেষ কিছু বলতেন না। তাঁর স্বাভাবিক গম্ভীরভাবে তিনি বসে থাকতেন, গড়গড়ার নল হাতে থাকত, কখনো টানতেন কখনো টানতেন না। আবার কখনো আমাকে ঘরে বসিয়ে রেখে বারান্দায় বেড়াতেন। কখনো কোন আগন্তুক এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। আমি উঠতে চাইলে বলতেন, 'বসো, আর একটু।' আমিও আশা করে বসে থাকতাম, হয়তো এবার কিছু বলবেন। কিন্তু কোন কথাই তিনি বলতেন না। আগ্রহ দেখালে বলতেন, 'আজ থাক, আর একদিন হবে।' এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে কতদিন নিরাশ হৃদয়ে ফিরে আসতাম। মনে হতো মিছিমিছি আর ঘোরাফেরা করব না। কিন্তু না গিয়েও থাকতে পারতাম না। এক-একদিন ঐভাবে নিঃশব্দে প্রায় দুঘণ্টা কেটে গিয়েছে। মনে কত তোলপাড় করতাম। সময় যেন কাটতে চাইত না। মহারাজ ঘরে থাকলে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতাম, কখনো বা কাছে বই পড়ে থাকলে তার এক-একটি পৃষ্ঠা বারবার পড়তাম। এইভাবে তখন মহা অশান্তিতে কাটত, কিন্তু ফেরার মুখে মহারাজের প্রসন্ন মুখ এবং মধুর বাণী 'আবার এসো' শুনে আনন্দে মন ভরে যেত। 'কর্তব্য কি?' জানার

জন্য কতদিন ব্যাকুলভাবে অনুনয় করতাম কিছু উপদেশের জন্য। কিন্তু রোজ একই উত্তর, 'আজ থাক, আর একদিন হবে।' এইভাবে প্রায় দু-বছর যাতায়াতের পর মহারাজ কৃপা করেন। নিজের আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ হয়।" মহারাজের স্নেহ-মমতার কথা স্মরণপূর্বক ডাক্তার মহারাজ অতিশয় নম্রভাবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতেন: "আমাদের চঞ্চল মন স্থির করবার জন্য, ধৈর্য তিতিক্ষা বাড়াবার জন্য, অজ্ঞাতসারে মহারাজ কি চেষ্টা যত্ন করেছেন—এখন তা ভাল করেই বুঝেছি।" মহারাজের দীক্ষাদান বিষয়ে আর একটি কথাও শুনিয়াছিলাম তাঁহার (ডাক্তার মহারাজের) মুখে। মহারাজ তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন রোজ সন্ধ্যাকালে সংখ্যা রাখিয়া দশহাজার জপ করিবার জন্য। যদি কখনও সংখ্যা ভুল হয় তবে আবার প্রথম হইতে জপ করিতে হইবে, নতুবা জপের ফল রাক্ষসে খাইয়া ফেলিবে। মহারাজের আদেশ অনুযায়ী ডাক্তার মহারাজ নিষ্ঠা সহকারে একাগ্র চিত্তে নিত্য জপ করিতেন। কিন্তু কোন কোন দিন ভুল হইয়া পড়িত। তখন আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতেন। এক-একদিন এমন হইত যে, সংখ্যা পূর্ণ হইতে অল্প বাকি, তখন ভুল হইয়া গেল; কাজেই আবার প্রথম হইতে পুনরায় জপ আরম্ভ করিতেন। সেই সকল দিনে রাত্রে ঠিক সময়ে খাইতে যাইতে পারিতেন না—দেরি হইয়া যাইত। এইরূপ কয়েকদিন অত্যন্ত দেরি হওয়ায় সকলেই বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। উদ্বোধনে তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও রহিয়াছেন। তিনি একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া জানিতে চাহিলেন, "রাত্রে খাওয়ার সময় আসিতে দেরি হয় কেন বাবা, তোমার?" শ্রীশ্রীমার স্নেহ ও বাৎসল্যপূর্ণ বাক্যে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। মায়ের প্রবোধবাক্যে একটু শান্ত স্থির হইয়া মহারাজের দশহাজার জপের সংখ্যা পূর্ণ না করিলে জপের ফল রাক্ষসে খাইয়া ফেলিবে, সেই ভয়-ভাবনার কথা নিবেদন করিলেন। সব শুনিয়া মাতাঠাকুরানী 'হো', 'হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ও রাখাল বলেছে—'রাক্ষসে জপের ফল সব খেয়ে নেবে'।" তৎপরে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাদের চঞ্চল মন স্থির ও একাগ্র করবার উদ্দেশ্যেই রাখাল এরূপ বলেছে। আমি তোমাকে বলছি এখন থেকে তুমি আর ঐজন্য কোন ভয় করো না, খাবার ঘণ্টা পড়লেই এসে খেয়ে নিও, ঐজন্য কোন দোষ হবে না।" মায়ের আশ্বাস ও অভয়বাণী শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন এবং তদবধি সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলে সকল অসুবিধা ও গোলমাল মিটিয়া যায়।

মঠে জনৈক প্রাচীন সাধুর মুখে শুনিয়াছি, পূজ্যপাদ মহারাজের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, সঙ্ঘের কার্যের প্রসার ও দীক্ষাদি দান করিবার সময় হইতেই তাঁহার এতটা বাহ্যিক বিভূতির প্রকাশ ও লোকাকর্ষণের শক্তি বিস্তার হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু পূর্বে এমন গুপ্তভাবে থাকিতেন যে, তাঁহাকে দেখিলে লোকে কিছুতেই তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিত না। [ক্রমশঃ]
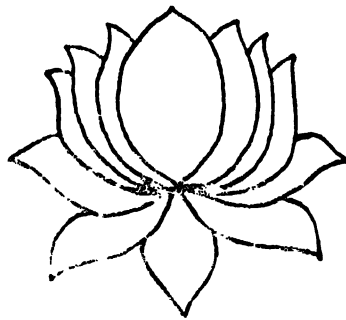
পরিক্রমা

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাবাজীর কাছে আদিত্যটিলার কথা শুনে পরদিন বিকেলে সেখানে আসব—বাবাজীকে বলে এসেছিলাম। তাই আদিত্যটিলায় এসেছি পরের দিন। তখনো সূর্যাস্তের দেরি আছে। তবে আকাশ তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁকে সোনালী রেখা লম্বালম্বিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। দূর দিগন্তে যমুনার নীল জলের প্রবাহ, তার পরে ঘন সবুজের মেলা, তার ওপরেই মেঘের গায়ে ঐ সোনালী আঁকিবুঁকি। দেখতে ভারি সুন্দর লাগছে। আদিত্যটিলা বৃন্দাবনের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গা। এখান থেকে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আগের দিন বাবাজীর ঘরে তাঁর গোপালের বৈকালিক ভোগের মাখন-মিছরি প্রসাদ পেয়ে ফেরবার সময় পরদিন আদিত্যটিলায় আসব বলায় এখানকার একজনের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দেবেন বলেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর কাছে বর্তমান বৃন্দাবনের যাঁরা আবিষ্কর্তা সেই গৌড়ীয় সপ্ত গোস্বামীদের আরাধ্য দেবতাদের সম্বন্ধে কিছু জানা যেতে পারে।

টিলার কাছে এসে পৌঁছে বাবাজীকে দেখতে পেলাম না। এই টিলাতেই সাধকপ্রবর সনাতন গোস্বামীজীর প্রাণধন মদনমোহনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই টিলার নিচেই আছে গোস্বামীজীর সমাধি। এখনো এই অঞ্চলে বেশ কিছু প্রাচীন বৈষ্ণব বাবাজী ছোট ছোট কুঠিয়ায় সাধন-ভজন করেন।

আমি বসেছিলাম টিলার প্রান্তে, পিছনে দুটি প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের জীর্ণাবশেষ। তার দক্ষিণে এক বৈষ্ণব সাধকের আশ্রম। টিলার নিচ দিয়ে আগে যমুনা প্রবাহিতা ছিলেন। এখন দূরে সরে গেছেন। বর্তমানে সেই খাতই পরিক্রমাকারীদের রাস্তা। কালিয়দমনের লীলায় নটরাজ গোপালের ক্লান্তি দূর করেছিল এই পবিত্র টিলা, সেকথা আগে বলেছি। এই ভূমি তাঁর চরণরজঃ ও গাত্র-স্বেদে আজ পবিত্র তীর্থ। এই কথাই ভাবছিলাম বসে বসে।

এমন সময় বাবাজীর গলার আওয়াজ পেলাম—ভারি মিষ্টি কণ্ঠ তাঁর। ভজন এঁদের সাধনের অঙ্গ। নবধা ভক্তির অন্যতম সাধন—'কীর্তন'। সমস্ত প্রাণমন ঢেলে এঁরা কীর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের অন্তরের অনুরাগ ও আর্তি নিবেদন করেন প্রাণপ্রিয় ইষ্টের চরণে।

সন্ধ্যার মুখে বাবাজীর স্মরণে এসেছে—রাই অভিসারে যাচ্ছেন। তাই সম্ভবতঃ তাঁর কণ্ঠে শুনছি অপূর্ব একটি পদাবলী কীর্তন—

"...কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরি অনঙ্গ
কিঙ্কিণি করকঙ্কণ মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী ॥
নাচত যুগভুরু ভুজঙ্গ
কালিয়দমন দমনরঙ্গ
সঙ্গিনীসব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিন নীল শাড়ি ॥"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন বাবাজী, গলার শব্দ জোরে হচ্ছে। ছন্দের তালে মন্দিরার মৃদু শব্দে পরিবেশ মধুময় হয়ে উঠেছে। তিনি গাইতে গাইতে উঠে এসেছেন—দুলে দুলে, চোখ বন্ধ করে গাইছেন—

"...ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহদীপতি তিমির নাশ
নিরখি রূপ রসিক ভূপ
ভুলল গিরিধারী ॥"

আনন্দে আপ্লুত বাবাজী চোখ খুললেন। দু-চোখে টলটল করছে জল, কিন্তু মুখে এক অপূর্ব

আনন্দের ছটা। রাই-কিশোরের মিলনানন্দের দৃশ্য বোধহয় তিনি ধ্যানে উপভোগ করলেন। অধ্যাত্ম-পথের পথিকের কাছে এই লীলাস্মরণ বাস্তবিকই মনকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁর কাছে জগৎ ভুল হয়ে যায়। আর সেই দিব্য আনন্দের স্মৃতি মনে জাগিয়ে রাখতে পারলে, নিরবচ্ছিন্ন সেই আনন্দসমুদ্রে ডুবে গিয়ে সাধকের, ভক্তের পরমপ্রাপ্তি লাভ সম্ভব হয়।

আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন বাবাজী। আমি সংকোচের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু তাঁর ভাব নষ্ট করে কিছু বলতে ইচ্ছা হলো না। তিনিই কাছে এসে বললেনঃ "তাইতো, তিনি এখনো আসেননি। আপনি ভাই কতক্ষণ বসে আছেন—দেখুন দেখি কি কাণ্ড। আচ্ছা চলুন আমিই দেখাই, আমার তো বেশি বিদ্যেবুদ্ধি নেই। সেই গোপাল যদি দয়া করে কিছু বুঝিয়ে দেন, তবেই বুঝবেন।" আমিও মনে মনে তাই চাইছিলাম, এই ভাবুক সাধক নিজেই তাঁর অনুভূতি দিয়ে যা দেখাবেন তার তুলনা কোথায় পাব?

এবার গান থেমে গেল। প্রথমেই ভূমিষ্ঠ হয়ে এই টিলাকে প্রণাম করে, যমুনার উদ্দেশে আর একটা প্রণাম জানিয়ে দু-হাত জোড় করে বাবাজী আবৃত্তি করতে লাগলেনঃ

"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥
অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকং স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চনাৎ॥"

"বুঝলেন দাদা, নারায়ণের পূজা পূর্ণ হয় না যদি তাঁর ভক্তের পূজা না করা হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত গোপিকারা। আর পরের যুগে এই মহাপবিত্র ধামে কৃষ্ণপ্রেম-সুধা পানের আশায় যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে অদ্ভুত তপস্যায় কাটিয়েছেন সেই সব বৈষ্ণব সাধকেরা ঐ গোপিনীদেরই অংশে আবির্ভূত। তাই তাঁদের বন্দনা—তাঁদের দিব্য লীলার স্মরণই নারায়ণের শ্রেষ্ঠ পূজা। আসুন আমরা ভক্ত-ভগবানের লীলামাধুরী এখান থেকেই আস্বাদন করতে শুরু করি।"

এই বলে আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন একটি লাল পাথরের বিরাট পরিত্যক্ত মন্দিরের দিকে। এই টিলাটি যমুনার খাত থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। ওপরে উঠবার প্রাচীন ইঁটের তৈরি খাড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে একটি তোরণ, সেটিও বহু প্রাচীন। তারপরেই সমতল ক্ষেত্র এই আদিত্যটিলা বা প্রস্কন্দন তীর্থ। বৃন্দাবনে পরবর্তী যুগে যেসব সাধু-মহাত্মার ভজনস্থলী এই তীর্থকে মহিমান্বিত করেছে তার মধ্যে এই স্থানটি অগ্রগণ্য। এটি ষড় গোস্বামীর অন্যতম অসাধারণ ত্যাগী সাধক সনাতন গোস্বামীজীর ভজনস্থলী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপালের অধিষ্ঠান-ভূমি। বাবাজী আমাকে এনে দাঁড় করিয়েছেন সেই ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন মন্দিরের দ্বারদেশে। চোখে এক অদ্ভুত আবেশ, হাত জোড় করে বললেনঃ "জানেন বাবাজী, এই মন্দির ও তার বিগ্রহ প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

'বৃন্দাবন পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার।
শ্রীরাধা ললিতা সঙ্গে রাসবিলাস।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ।'

"এই যে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখছেন, এখানেই সনাতন গোস্বামীর প্রাণধন শ্রীমদন-গোপালজী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন সম্ভবতঃ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঘমাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এই বিগ্রহপ্রাপ্তি সম্পর্কে সুন্দর কাহিনী আছে। প্রভুপাদ সনাতনের কথা তো জানেন নিশ্চয়ই। গৌড়বঙ্গের তখনকার শাসক হুসেন শাহের রাজদরবারের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন এঁরা দুই ভাই। এঁদের বাবা কুমারদেব যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ, বর্তমান মালদহের কাছে বাস করতেন। মায়ের নাম রেবতীদেবী। এঁদের অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে তিনজনই প্রসিদ্ধ। অমর, সন্তোষ ও অনুপম। পরবর্তী কালে এঁরাই যথাক্রমে সনাতন, রূপ ও বল্লভ নামে খ্যাত হন। অমর ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং সন্তোষ ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ

করেন। এঁদের জন্মসাল সম্পর্কে ভিন্ন মতও আছে। অনুপম ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তিনি বিবাহিত ছিলেন। তবে রূপ ও সনাতনের বিবাহ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সনাতন রাজদরবারের প্রধানমন্ত্রী বা 'সাকরমল্লিক', রূপ 'দবীরখাস' বা রাজস্ব বিভাগের কর্তা ও অনুপম টাঁকশালের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করতেন। এই অনুপম বা বল্লভের পুত্রই হলেন শ্রীজীব গোস্বামী। এইসব কর্মাধ্যক্ষতা কালেই দৈববিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সপারিকর উত্তরবঙ্গ পর্যটনকালে মালদহ শহর থেকে ১০ মাইল দূরে রামকেলি গ্রামে আগমন করেন ও তাঁর এই চিহ্নিত পার্ষদদের দর্শনদানে কৃপা করেন। অমর ও সন্তোষের নতুন নামকরণ তিনিই করেন। তারপর থেকেই রূপ-সনাতনের মনে পার্থিব বিষয়ের প্রতি বিরাগ বাড়তে থাকে। নবাব হুসেন শাহ কোনভাবে তাঁদের এই মানসিক অবস্থার কথা জানতে পেরে তাঁদের মন ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে সনাতনের মনে প্রবল নির্বেদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করেন। অনেক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অশেষ রাজকীয় নির্যাতন ভোগ করে, কৌশলে রাজকারাগার থেকে পালিয়ে ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার তীর ধরে পদব্রজে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। এর আগেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপও অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে কৌশলে পালিয়ে গিয়ে মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেন এবং সেই বৃত্তান্ত পত্রের আকারে গোপনে সনাতনকে জানিয়ে দিয়ে আসেন। রূপই সর্বপ্রথম প্রয়াগ-তীর্থে (এলাহাবাদ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হয়ে তার কৃপালাভ করেন। প্রয়াগের গঙ্গাতীরের দশাশ্বমেধ ঘাট নামক স্থানটি আজও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে 'শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলী' বলে পরিচিত। প্রয়াগের বেণীমাধব মন্দিরের কাছেই এই স্থান।

"রূপের নির্দেশমতো সনাতন একাকী গঙ্গার তীর ধরে বারাণসীতে এসে উপস্থিত হন। এখানেই চন্দ্রশেখরের গৃহে তাঁর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনলাভ হয়। ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের ফাল্গুনের শেষে এই দর্শন হয়। বৈরাগ্য-প্রেরণার উদ্দীপক সেই মিলনলীলা বড়ই মর্মস্পর্শী। এখানেই মহাপ্রভুর নির্দেশমতো সনাতন সর্বত্যাগীর বেশে মস্তক মুণ্ডন করে ডোর, কৌপীন ও গেরুয়া অঙ্গবাস ধারণ করেন। অবিমুক্ত পুরী, বিশ্বনাথের আনন্দকানন কাশীধামেই সনাতন একে একে মহাপ্রভুকে নানা প্রশ্ন করে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও ভক্তিরস ইত্যাদি বিষয়ের সিদ্ধান্তগুলি জেনে নেন। কাশীতে গঙ্গাতীরের দশাশ্বমেধ ঘাটে দুইমাস কাল ধরে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমল প্রাপ্তির উপায় হিসাবে মহাপ্রভু সনাতনকে যে উপদেশ দেন সেইগুলিই বৈষ্ণবসমাজে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' নামে বহুখ্যাত।

"এইভাবে সনাতনকে বৈষ্ণবতত্ত্বের গূঢ়রহস্য উপদেশ করে মহাপ্রভু তাঁকে বলেন: 'তোমার ভাই রূপকে আমি প্রয়াগে শ্রীকৃষ্ণ-রসের কথা বলেছি। এখন তুমি বৃন্দাবনে যাও। তোমাকে আমি চারটি কাজের ভার দিচ্ছি—প্রথম, জগতে শুদ্ধাভক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন। দ্বিতীয়, মথুরামণ্ডলের লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার ও স্থান নিরূপণ। তৃতীয়, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রকটন। চতুর্থ, বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলন, বৈষ্ণব সদাচার প্রবর্তন ও প্রচার।' কথা-গুলি বলে তাঁর মাথায় হাত রেখে মহাপ্রভু আশীর্বাদ করে বললেন: 'তোমার দ্বারা এই সকল সিদ্ধান্ত স্ফূর্তি লাভ করুক।' মহাপ্রভু তাঁকে আরও বলেছিলেন, 'তুমি বৃন্দাবনে যাও সেখানে—কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ, বৃন্দাবনে আইলে তাদের করিহ পালন। অতএব তুমি বৃন্দাবন যাত্রা কর।' মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি লাভ করে ও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবার সঙ্কল্প নিয়ে শ্রীসনাতন বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। যথাসময়ে মথুরাতে পৌঁছে তিনি সুবুদ্ধি রায়ের দেখা পেলেন। এই সুবুদ্ধি রায়ই মহাপ্রভুর প্রেরিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি ব্রজে এসে তপস্যা শুরু করেন। তারপরেই আসেন লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ গোস্বামী প্রমুখ। এঁদের পরে আসেন রূপ ও বল্লভ। এঁরা সনাতনের খোঁজে বৃন্দাবনে আসেন কিন্তু তাঁকে না পেয়ে নীলাচলের পথে মহাপ্রভুর দর্শনে চলে যান। সেখান থেকে মহাপ্রভুর কৃপালাভ করে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন বৃন্দাবনের পথে। ইতোমধ্যে সনাতন বৃন্দাবনে পৌঁছে মহাপ্রভুর নির্দেশমতো 'শ্রীমথুরা মাহাত্ম্য' বলে একখানি বহু প্রাচীন শাস্ত্র

সংগ্রহ করে লীলাধ্যানে তন্ময় হয়ে বনে বনে ঘুরে ঘুরে লুপ্ততীর্থ নির্ণয় করতে শুরু করেন। কিছুদিন পরে সনাতনের মনে মহাপ্রভুর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়ায় তিনিও দুর্গম পথ ধরে জীর্ণশীর্ণ দেহে নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে গিয়ে হাজির হন। এখানে এসেই তিনি জানতে পারেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ (অনুপম) দেহত্যাগ করেছেন। নীলাচলে থাকাকালে তিনি হরিদাস গোস্বামীর কুঠিয়ায় থাকতেন ও দৈন্যভাবে জগন্নাথ-মন্দিরের ভিতরে না গিয়ে মন্দিরের চূড়া ও চক্রদর্শন করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাতেন। এই নীলাচলে বাসকালেই মহাপ্রভু তাঁকে পুনর্বার বহু উপদেশদানে কৃতার্থ করে পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। সেটি ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। তখন সনাতনের বয়স সাতাশ বছর। এই সময় রূপও প্রায় এক বছর পর গৌড়দেশ থেকে বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হন। দুই ভাই মিলে নানা স্থান থেকে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ এনে ও নিজেদের ধ্যানে তা মিলিয়ে নিয়ে লুপ্ততীর্থসমূহ উদ্ধার করতে থাকেন। এর কিছুদিন পরেই নীলাচল থেকে মহাপ্রভুর নির্দেশে জগদানন্দ বৃন্দাবনে আসেন এবং মাস দুয়েক আদিত্যটিলায় সনাতনের সঙ্গে বাস করেন। মহাপ্রভু তাঁর মাধ্যমে খবর দিয়েছিলেন: 'আমি শীঘ্রই বৃন্দাবন যাব। আমার জন্য সনাতন যেন থাকার ব্যবস্থা করে রাখে।' এই আদিত্যটিলাতেই সনাতন মহাপ্রভুর থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, কিন্তু স্থূল শরীরে তাঁর আর এখানে আসা হয়নি।"

এত কথা বলতে বাবাজীর সময় খুব বেশি লাগল না। ঘুরে ঘুরে অতি মৃদু কণ্ঠে যেন কতকটা স্বগতভাবেই তিনি সেই সাধকপ্রবরের জীবন-কাহিনী অনুধ্যান করছিলেন। এবারে প্রাচীন মন্দিরের চৌকাঠের পাশে প্রণাম করে বসলেন ও আবার বলতে আরম্ভ করলেন: "এই আদিত্যটিলা ও সমগ্র বৃন্দাবন তখন ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা ছিল। উঁচু-নিচু পাথুরে জমি, তমাল, কেলিকদম্ব, নিম ও ছোট-বড় নানা গাছের জঙ্গল। জনবসতিও ছিল বিরল। বিগ্রহশূন্য কিছু-কিছু ভগ্ন জীর্ণ মন্দিরের অবশেষ, একমাত্র প্রাচীন গোপেশ্বর বিগ্রহ আর চিরপ্রবাহিতা কালিন্দী—এই ছিল তখনকার বৃন্দাবন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পর্ণকুটির, সেখানে কোন সাধকের একান্ত সাধন-ভজন। এই অবস্থায় বৃন্দাবনে আসেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবপ্রধান সনাতন ও রূপ। অবশ্য এঁদের আগেই এসেছিলেন লোকনাথ গোস্বামী। ইনি মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিলেন ও মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ গমনকালে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করবেন—এই খবর শুনে তাঁর দর্শনের ইচ্ছায় তিনি নবদ্বীপে আসেন ও তাঁরই ইচ্ছায় গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ইনি বয়সে মহাপ্রভুর থেকে দুই বছরের বড় ছিলেন। বৃন্দাবনে এসে অত্যন্ত নিভৃতে কৃষ্ণলীলাস্মরণে এঁরা কালাতিপাত করতে লাগলেন। এই কৃষ্ণলীলা-স্থান অনুসন্ধানের কালে ছত্রবনের কাছ উমরাও গাঁয়ের কিশোরীকুণ্ড থেকে একটি ছোট্ট বিগ্রহ তিনি পান। এই বিগ্রহটি হলো রাধাবিনোদ বিগ্রহ। এই বিগ্রহকে তিনি সর্বদাই একটি ঝোলায় করে গলায় নিয়ে ঘুরতেন। রাত্রে গাছতলাতেই শয়ন করতেন। সেসময় বিগ্রহকে সেই গাছের কোটরে সযত্নে রেখে দিতেন। পরে রূপ-সনাতনাদি গৌড়ীয় সাধকেরা বৃন্দাবনে এলে তিনিও বৃন্দাবনে আসেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রায় একশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। রূপ-সনাতনের দেহত্যাগের পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন এবং ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে বৃন্দাবনের খদির বনে তিনি দেহত্যাগ করেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ও গরানহাটি পদকীর্তনের স্রষ্টা নরোত্তমদাস ঠাকুর এঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন। ভূগর্ভ গোস্বামীও একইভাবে সাধন-ভজনে এঁর সঙ্গে ব্রজবাস করেন। তাঁর সমাধি শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে আছে।"

বাবাজীর এত স্মরণশক্তি দেখে আমি অবাক। এমন অনর্গলভাবে বলে যাচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে কিছু ভাবতেও হচ্ছে না তাঁকে। শ্রীভগবানের লীলাস্মরণ আর তাঁর ভক্তের লীলাচিন্তন দুই-ই তাঁর প্রিয়। তাই এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই ভক্তকথা তিনি স্মরণ করছেন সোচ্চারে। সময় মিলিয়ে পরপর স্মরণ করছেন সেই আদি যুগের বৈষ্ণবপ্রধানদের অনিন্দ্য জীবনকথা। লোকনাথ-ভূগর্ভ প্রসঙ্গ শেষ করে আবার তিনি ফিরে এলেন আদিত্যটিলায় সনাতন গোস্বামীর জীবন-প্রসঙ্গে। [ক্রমশঃ]

নিবন্ধ

জন্মাষ্টমী

স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে ভগবান বিষ্ণু নরদেহে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আবির্ভাব-তিথি 'জন্মাষ্টমী' নামে পরিচিত। যতদিন সনাতন হিন্দু-ধর্ম থাকবে ততদিন এই পুণ্য তিথিটি ভারতবর্ষের মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতামুখে বলেছেন, যখন ধর্মের পতন এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের রক্ষার জন্য, দুষ্টদের বিনাশের জন্য, ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি জন্মগ্রহণ করি। তাঁর সেই অঙ্গীকার পালনের জন্য কৃষ্ণরূপে তাঁর অন্যতম আবির্ভাব। যখন শিশুপাল, নরকাসুর, কংস, দুর্যোধন প্রমুখের অত্যাচারে মানুষ প্রপীড়িত, তাদের উৎপীড়ন আর ভ্রষ্টাচারে সাধারণের মধ্য থেকে যখন ধর্মভাব নষ্ট হতে চলেছে, তখন এল তাঁর আবির্ভাবের লগ্ন। ধর্মপরায়ণতার অভাবে ভোগবাসনার বৃদ্ধি ও অজ্ঞানতার রাজত্ব। তাই প্রয়োজন হয়েছিল নতুন করে ধর্মরক্ষার, জীবনের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির তাৎপর্য নির্ণয়ের। আবশ্যক হয়েছিল ভোগ ও ত্যাগ, হিংসা ও অহিংসা, কর্ম ও সন্ন্যাস—এই সমস্ত আপাতবিরুদ্ধ ভাব ও আদর্শের সমন্বয় সাধনের। তাছাড়া খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাও তো চাই। এইসব কারণে প্রয়োজন হয়েছিল ভগবানের আবির্ভাবের।

ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। নিশীথ রাত্রি। ঘোর অন্ধকারে ধরণী সমাচ্ছন্ন। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ঊর্ধ্ব, অধঃ—দশ দিকই হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সর্বত্রই আনন্দের তরঙ্গ। ভাদ্রে ভরা বর্ষা। কানায় কানায় পূর্ণ নদীগুলি তাই আবিল, কিন্তু সে-আবিলতা ক্ষণমধ্যেই যেন কোথায় অন্তর্হিত হলো। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী হলো স্বচ্ছতোয়া। সরোবরগুলিতে শত শত পদ্ম ফুটতে লাগল। বনের বৃক্ষলতায় ফুটে উঠল অসংখ্য ফুল। ফুলে ফুলে মধুমক্ষিকা মধুপানরত। ভ্রমরের গুঞ্জনে চারিদিক মুখরিত। পবিত্র সমীরণ কি সুখস্পর্শ। ব্রাহ্মণগণের নির্বাপিতপ্রায় যজ্ঞাগ্নি সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। দেবলোকে বেজে উঠল দুন্দুভি।

আনন্দের পরিপ্লাবন স্বর্গ ও মর্ত্যভূমিকে উদ্বেল করে তুলল। সাধু-মহাত্মাদের অন্তরে অকস্মাৎ অভূতপূর্ব আনন্দের হিল্লোল বইতে শুরু করল। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ত্রিলোকেই অপ্রত্যাশিত আনন্দানুভূতি। স্বর্গে দুন্দুভি-নিনাদের সঙ্গে দেবতা ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। মুহুর্মুহু মেঘগর্জন শোনা গেল। সর্বান্তর্যামী ভগবান বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করলেন দেবরূপিণী জননী দেবকীর কোল আলো করে। বসুদেব দেখলেন এক অপূর্ব শিশু। পদ্মপলাশনেত্র, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন, গলায় কৌস্তুভমণি, পীতাম্বর, নবীনমেঘের মতো শ্যামবর্ণ, মাথায় মণিখচিত মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল। অলকারাজির কি শোভা। উজ্জ্বল চন্দ্রহার এবং নানা অলংকারে সর্বাঙ্গ সুশোভিত।

বসুদেব ভুলে গেলেন অপত্যস্নেহ, তিনি ভগবৎ-ভাবে বিভোর হয়ে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন, হে ভগবান, আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনি আনন্দস্বরূপ, চিদ্‌ঘনমূর্তি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ রজোগুণে আপনারই মায়াবলে সৃষ্ট, সত্ত্বগুণে বিশ্বপালন আপনিই করছেন আর তমোগুণে লয়-কার্য আপনার দ্বারাই হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর

আপনারই বিভিন্ন রূপ। আপনি অত্যাচারী ও পাপাচারীদের হাত থেকে সকল লোককে রক্ষা করতে স্বেচ্ছায় জন্ম নিয়েছেন।

বিশুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিতা জননী দেবকীও নবজাতকে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখে বুঝলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণুই তাঁর পুত্ররূপে অবতীর্ণ। তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, হে সর্বেশ্বর, প্রলয়কালে সমুদয় চরাচর বিনষ্ট হলে একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। মরণশীল মানুষের মৃত্যুভয় স্বাভাবিক, সকলের আশ্রয় আপনি ছাড়া তার আর কোন নির্ভয় স্থান নেই। ক্রূরস্বভাব উগ্রসেনপুত্র কংসের ভয়ে আমরা ভীত। আমার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হচ্ছে। পাপিষ্ঠ কংস যেন জানতে না পারে যে, আপনি আমার গর্ভজাত। আপনি ভয়হারী, আপনার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশোভিত চতুর্ভুজান্বিত ধ্যানাস্পদ অলৌকিক ঐশরূপ সম্বরণ করুন।

দেবকী কংসরোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন, অন্তর্যামী হরি তাই জননীকে আশ্বাস দিতে চান পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে। অপূর্ব শিশুর মুখ থেকে অপূর্ব বাণী নির্গত হলো—মা, এই জন্মেই আমি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছি তা তো নয়, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরেও আমি তোমার পুত্র ছিলাম। জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার জননী, বসুদেব আমার জনক। তুমি নিজেকে অত দীনহীন মনে করো না, তুমি তো সাধারণ মানবী নও। এবারেও আমি তোমাদের কাছেই এসেছি, কারণ তোমাদের মতো সুকৃতিপরায়ণ আর কে আছে? আমার কথা সত্য বলে জেন। আমার পূর্ব পূর্ব জন্ম স্মরণ করাবার জন্যে আমি আমার চতুর্ভুজ মূর্তি তোমাদের দেখালাম, দ্বিভুজ প্রাকৃত মানুষের মতো আকার দেখে তোমরা আমাকে চিনতে পারতে না। তোমরা দুজনে আমার ওপর স্নেহবশতঃ পুত্রভাবেই হোক আর ব্রহ্মভাবেই হোক একবার মাত্র চিন্তা করলেই পরমগতি প্রাপ্ত হবে।

এইকথা বলে শিশুরূপী ভগবান নীরব হয়ে আত্মমায়ার দ্বারা দ্বিভুজ বালকে পরিণত হলেন। যেন অতিসাধারণ অসহায় মানবশিশু। মাতাপিতার সামনেই এই অলৌকিক দৃশ্য সংঘটিত হলো।

'আমাকে নন্দগোপগৃহে নিয়ে চল। সেখানে আমার মায়া আদ্যাশক্তি যশোদার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমাকে যশোদার শয্যায় রেখে তাঁকে নিয়ে এস।' এই ভগবদ্‌বাক্যে প্রেরিত হয়ে বসুদেব সযত্নে শিশুকে কোলে নিয়ে কারাগারগৃহ সূতিকাগার থেকে নির্গমনের ইচ্ছা করলেন। অচিন্ত্য যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপালগণের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত, তারা জাগ্রত থেকেও অচেতনপ্রায়, পুরবাসীরাও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

কারাকক্ষের বৃহৎ কপাট লৌহশৃঙ্খলে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। বসুদেব পুত্রহস্তে দরজার কাছে এলেন। আপনা হতেই দরজা খুলে গেল। একি দৈবী মায়া! বসুদেব নিঃশব্দে অগ্রসর হতে লাগলেন। আকাশে গুরুগুরু মেঘগর্জন, হচ্ছে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। মহাপ্রলয় হবে নাকি? অনন্তদেব শেষ নাগ নিজের ফণা বিস্তারে জল নিবারণ করতে করতে পিছনে যেতে লাগল। পথে পড়ল যমুনা। ভীষণ বারিপাতে গভীর জলরাশির বেগে যমুনা আরও তরঙ্গক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তরঙ্গসংকুল নদীও বসুদেবের যাওয়ার পথ করে দিতে চায়। সবাই যে আজ ভগবানের স্পর্শব্যাকুল।

শৃগালরূপধারিণী মায়ার নির্দেশিত পথে বসুদেব অক্লেশে দুস্তর যমুনা পার হয়ে ব্রজে নন্দপুরে উপনীত হলেন। সেখানে দেখলেন সকলেই সুষুপ্তিতেই মগ্ন। তখন তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে নিজের পুত্রকে যশোদার শয্যায় রেখে তাঁর নবজাত কন্যাটিকে নিয়ে অন্ধকার লৌহময় কারাকক্ষে ফিরে এলেন। তারপর দেবকীর শয্যায় শিশুকন্যাটিকে দিয়ে নিজের পদদ্বয়ে লৌহশৃঙ্খল বদ্ধ করে পূর্ববৎ অবস্থান করতে লাগলেন।

নন্দরানী যশোদা পরিশ্রান্তা, নিদ্রাভিভূতা ও অপগতস্মৃতি হওয়ায় তাঁর নবজাত সন্তানটি পুত্র কি কন্যা তা জানতে পারেননি।

রজনী প্রভাতে সূর্যের আলোয় পৃথিবী ঝলমল করে উঠল। যশোদার সুকুমার পুত্রের জন্মসংবাদে ব্রজবাসীরা এসে নন্দগৃহকে আনন্দমুখর করে তুলল।

কৃষ্ণসখা সুদামা

ব্রহ্মচারী সনৎকুমার

সুদামার সংসারে বড়ই অভাব। দুবেলা দুমুঠো অন্নও জোটে না। সুদামার স্ত্রী স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী। এমন দারিদ্র্য, তবুও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কোন অভিযোগ নেই; বরং আছে সহমর্মিতা, আছে সহানুভূতি। কেনই বা অভিযোগ করবেন? তাঁরা জানেন, ভগবানই তাঁদের দুঃখ দিয়েছেন। আর দুঃখ দিয়েছেন বলেই তো তাঁরা অহর্নিশ তাঁকে স্মরণ করতে পারছেন। ঐশ্বর্য হলে ভগবানকে ভুল হয়ে যায়। হোক দুঃখ-কষ্ট, তবু ভগবানকে যেন তাঁরা না ছাড়েন, ভগবানও যেন তাঁদের ছেড়ে না যান।

সুদামা আর তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীকে দেখে সবাই অবাক হয়। ভাবে, এঁরা মানুষ না দেবতা? এত কষ্ট, এত দুঃখ, তবু মুখে কি প্রশান্তি! বিশেষ করে সুদামা—পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণার ব্যথা যেন তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারছে না। সত্যিই তাই। সুদামা গৃহস্থাশ্রমে আছেন বটে, কিন্তু তিনি 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট' যোগী। তিনি 'প্রশান্তাত্মা'। আবার নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়। তাই তাঁর আর দুঃখ কিসের? জাগতিক সুখ-দুঃখে নির্বিকার তিনি। তাঁর সংসারে অভাব আছে সত্য, কিন্তু আন্তর ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান তিনি। তাই তাঁর সংসার 'বিদ্যার সংসার'—'অবিদ্যার' নয়। সংসারে দুঃখ যেমন আছে, সুখও তেমনি আছে। শান্তি আছে আবার অশান্তিও আছে; কিন্তু সুদামার সংসারে দারিদ্র্য যেন স্থায়িভাবে আসন পেতেছে।

একদিন বাড়িতে এমন অভাব যে, সেদিন সুদামার স্ত্রী তাঁর স্বামীকে যে আহারের জন্য কিছু দেবেন তারও সংস্থান নেই। সেদিন নিরুপায় হয়ে সুদামাকে তাঁর স্ত্রী বললেন: "বাড়িতে আজ একটি তণ্ডুলকণাও নেই। তোমাকে বা পরিবারের অন্যান্য-দের মুখে কি দেব বুঝতে পারছি না। আমি দেখছি, পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন করতে তুমি হিম-সিম খাচ্ছ; তাছাড়া অতিথি-অভ্যাগতরাও আসেন। ভিক্ষুকও আসে দুটি ভিক্ষার আশায়। গৃহস্থ হিসাবে আমাদের কর্তব্য তাঁদের যথোচিত সেবা করা, অথচ আমরা তা করতে পারি না। এতে কি আমাদের অমঙ্গল হবে না? অনুগ্রহ করে যদি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর তবে আমি কৃতার্থ হব।" উদ্বিগ্ন সুদামা জানতে চান কি সেই অনুরোধ। সুদামা-পত্নী বললেন: "শুনেছি দ্বারকাধিপতি, ভক্তজনের প্রতিপালক শ্রীকৃষ্ণ তোমার বাল্যসখা। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে যদি তোমার এই সাংসারিক প্রতিকূলতার কথা নিবেদন কর, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করবেন অথবা দারিদ্র্য-উপশমের কিছু ব্যবস্থা করবেন। তিনি যেমন ভক্তবৎসল, তেমনি বন্ধুবৎসলও। আর তুমিও ত্যাগ-বৈরাগ্যাদি বিবিধ গুণে গুণবান, শ্রীহরির পরম ভক্ত, আবার তাঁর বাল্যসখা। আমার বিশ্বাস, তিনি কখনই তোমাকে হতাশ করবেন না।"

চিন্তিত সুদামাকে সচেতন করে তিনি আরও বললেন: "তুমি ভেব না। না হয়, একবার তাঁর দর্শনলাভ করেই ফিরে আসবে; তাতে তো কোন ক্ষতি নেই। ভক্তবৎসল শ্রীহরি তোমাকে রিক্ত-হস্তে ফেরালেও রিক্ত হৃদয়ে তো নিশ্চয়ই ফেরাবেন না! তাহলে দ্বিধা কেন?

পরমভক্ত সুদামা একমাত্র ভগবদ্‌পদে শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনা করেননি। ঐহিকে সম্পদের প্রার্থনা কি তিনি করতে পারবেন? তথাপি কেবল ভার্যার অনুরোধ রক্ষার্থেই তিনি একটি

বস্ত্রখণ্ড স্বল্প চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে একদিন চললেন দ্বারাবতীর রাজপ্রাসাদ অভিমুখে। সেই চিঁড়ে আবার তাঁর স্ত্রী ভিক্ষে করে এনে দিয়েছেন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের বাড়ি থেকে। চলেছেন বটে, কিন্তু চলতে চলতে মাঝে মাঝে থমকে পড়েন তিনি। নানা চিন্তার ঢেউ এসে থামিয়ে দেয় তাঁকে। কি ভাবছেন তিনি? ভাবছেন, তিনি দরিদ্র, শরীরে তাঁর অন্নাভাবের ছাপ স্পষ্ট। দেহের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে দারিদ্র্যক্লিষ্টতা; নগ্ন দেহে শিরাগুলি অনায়াসদৃশ্য, পরণে জীর্ণ পরিচ্ছদ—তাও আবার নিতান্তই মলিন। পাদুকাবিহীন তাঁর পা ধুলায় ধূসরিত। এই অবস্থায় তিনি চলেছেন দ্বারকাধিপতির সন্দর্শনে।

মনে তাই খুবই সংকোচ সুদামার। আবার মনে পড়ল, রাজদর্শনের জন্য তিনি উপহার নিয়েছেন সামান্য কয়েক মুষ্টি চিঁড়ে—দ্বারকাধিপতির জন্য উপহার! দুঃখের মধ্যেও নিজের কথা ভেবে হাসলেন সুদামা। ভাবলেন, একি তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ? হায়! এ আমি কোথায় চলেছি? প্রাসাদে আমাকে প্রবেশ করতে দেবে তো? রাজকর্মচারীরা অবজ্ঞায় ঠেলে ফেলে দেবে না তো? হা ভগবান! আমার এ দুর্মতি হলো কেন?

ক্ষণিক দাঁড়িয়ে সুদামা কি যেন ভাবলেন। তারপর মনে মনে বিচার করলেন, তিনি তো দ্বারকাধিপতির কাছে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন সখাসন্দর্শনে। আবার ভক্ত তিনি। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। ভগবান ভক্তের আশ্রয়; তিনি চলেছেন ভক্তবৎসল ভগবানের কাছে। তাহলে আজ কোন্ অপুণ্যে তাঁর মনে এই সংশয় উঁকি মারল? না, কোন সংশয় নয়, দ্বিধা নয়, তিনি যাবেনই।

দ্বারাবতী রাজপুরীর সুউচ্চ স্বর্ণময় শীর্ষদেশ যেন মেঘমালাকে স্পর্শ করেছে। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সুবিশাল হর্ম্যরাজির সে কী অপরূপ শোভা! মনোমুগ্ধকর এই দৃশ্য দেখে সুদামা পুলকিত হলেন। তাঁর মনে হলো, এই পরম রমণীয় প্রাসাদে যিনি আছেন, তিনিও এক মহিমময় ব্যক্তিত্ব, এক আশ্চর্য পুরুষ। মহাবুদ্ধিমান, মহাতেজস্বী, মহাপরাক্রান্ত, যুগন্ধর পুরুষোত্তম। রূপে, গুণে, বহুবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি এক অতুলনীয় মহামানব। তিনি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ—সুদামার বাল্যসখা। আজ তিনি চলেছেন তাঁরই সকাশে।

অনেক কষ্টে প্রাসাদে প্রবেশের সুযোগলাভ করলেন সুদামা। কোনক্রমে অন্তঃপুরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুরম্য কক্ষদ্বারে উপস্থিত হয়ে দ্বারীকে নিবেদন করলেন তাঁর আগমনোদ্দেশ্য। বাসুদেব তখন স্বকক্ষে প্রধানা মহিষী রুক্মিণীদেবীর সঙ্গে আলাপচারিতায় রত ছিলেন। দূর থেকে দেখেই তিনি চিনেছেন তাঁর প্রিয় বাল্যসখাকে। সঙ্গে সঙ্গে শয্যা থেকে উঠে এসে পরম আদরে নিজের কক্ষে নিয়ে এলেন সুদামাকে। গভীর প্রেমে আলিঙ্গন করে বক্ষে ধারণ করলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ক্ষীণ তনুখানি। অপাপবিদ্ধ ব্রাহ্মণের দেহ-স্পর্শে তিনিও বুঝি অনুভব করলেন ঐশী শিহরণ। ভগবান মিলিত হলেন ভক্তের সঙ্গে।

সুদৃশ্য বিশাল কক্ষে মণিময় পর্যঙ্কে বসে ছিলেন রুক্মিণীদেবী। রত্নশোভিত অসংখ্য মূল্যবান আসবাবে পূর্ণ গৃহের অপরূপ শোভা দেখে দরিদ্র সুদামা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বাসুদেব সুদামাকে পরিচয় করালেন স্বীয় মহিষীর সঙ্গে। সাদরে এনে বসালেন রত্নখচিত পর্যঙ্কের দুগ্ধফেননিভ শয্যায়। শশব্যস্তে রুক্মিণীদেবী স্বয়ং তত্ত্বাবধান করে স্বীয় পরিচারিকাদের তৎক্ষণাৎ নিয়োজিত করলেন ব্রাহ্মণের সেবায়। যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও সেবায় তৎপর হলো তারা। ব্রাহ্মণের জন্য তারা নিয়ে এল মনোহর বস্ত্র ও উত্তরীয়। এল নানাবিধ সুস্বাদু আহার্য ও পানীয়। আবার পরম নিষ্ঠায় স্বয়ং রুক্মিণীদেবী পথশ্রান্ত সুদামাকে চামর ব্যজন করলেন; চন্দন আর অগুরুর দিব্য গন্ধে আমোদিত রাজপুরীর অন্তঃপুরে দরিদ্র সুদামা তাঁর প্রতি এই আচরণে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। আবার বাসুদেব তাঁকে পরিয়ে দিলেন দিব্যমালা, আর স্বয়ং ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করে সেই পবিত্র বারি মস্তকে ধারণ করলেন পরম নিষ্ঠায়। সব দেখে সুদামা ভাবলেন, যাঁর চিন্তায় তিনি দিবানিশি থাকেন মগ্ন, যাঁর ক্ষণিকের স্মরণ-মননেই তাঁর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় গভীর প্রেম, যাঁকে কায়মনোবাক্যে তিনি

সমর্পণ করেছেন যথাসর্বস্ব—সেই পরম আরাধ্য শ্রীহরি স্বয়ং কিনা লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীসহ স্বয়ং তাঁর সেবায় আজ তৎপর? একি তিনি স্বপ্ন দেখছেন? একি ভ্রম না সত্য?

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ পরম আনন্দে বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলির স্মৃতিচারণ শুরু করলেন। নানা কথা, নানা ঘটনার সুখস্মৃতিতে দ্বারকাধীশ তখন যেন ফিরে গিয়েছেন তাঁর ফেলে আসা সুদূরের দিনগুলিতে। হঠাৎ সুদামাকে বললেন বাসুদেব: "কই সখা, আমার জন্য কি এনেছ, দেখি।" সুদামা তো মহাসংকোচে সঙ্গের চিঁড়ের পুঁটলিটি লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। কিন্তু কৃষ্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা লুকানো চিঁড়ের পুঁটলিটি সুদামার কাছ থেকে প্রায় জোর করেই বের করলেন। "এই তো, আমার প্রিয় বস্তুই এনেছ দেখছি!" পরমানন্দে সেই সামান্য শুকনো চিঁড়ে মুখে দিলেন কৃষ্ণ। মহাসঙ্কুচিত সুদামা ঐ দৃশ্য দেখে অভিভূত। দুচোখ বেয়ে তাঁর গড়িয়ে পড়ছে আনন্দাশ্রু।

স্মিত হাসি হেসে সুদামার দিকে তাকিয়ে কমললোচন কৃষ্ণ বললেন: "সখা, ভক্তিভরে বা আমাকে ভালবেসে যে যা নিয়ে আসে, আমি তা-ই সানন্দে গ্রহণ করে তৃপ্ত হই। তোমার এই আহার্য আমার কাছে পরম প্রীতিকর।"

সেই রাত্রে সুদামা কৃষ্ণের সঙ্গে উত্তম আহার গ্রহণ করে বিশ্রাম নিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্ব-গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে আরও কয়েকদিন সেখানে থেকে যেতে বললেও সুদামার অন্তর তখন এতই পরিপূর্ণ যে, তিনি আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। বাসুদেব নিজে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বিদায় জানালেন। মধুর ও দুর্লভ এক স্মৃতি সুদামার মনকে দিব্যভাবে ভাবিত করল। পথে চলতে চলতে তিনি ভাবতে লাগলেন—আমার সখা, পরম প্রেমময় শ্রীহরি আজ আমাকে কি অতুলনীয় সম্পদের অধিকারীই না করেছেন! তিনি পূত-সান্নিধ্য ও অহৈতুকী ভালবাসায় আমাকে কৃতার্থ করেছেন, আমাকে পরম প্রেমে বক্ষে ধারণ করে আলিঙ্গন করেছেন, আমার জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেছেন, প্রধানা মহিষীর সঙ্গে আমাকে পরম যত্নে সেবা করেছেন। আবার যেহেতু আমার ব্রাহ্মণ-শরীর তাই পরম শ্রদ্ধায় আমার পাদপ্রক্ষালন করে সেই জল মাথায় ধারণ করেছেন। তিনি রাজাধিরাজ, দ্বারকাধিপতি। আর আমি অতি সামান্য, দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। তথাপি বাল্যসখা বলে তিনি আমাকে অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। অতিশয় সুস্বাদু ও সুপক্ক আহার্যই যাঁর খাদ্য, তিনি পরম সন্তুষ্ট হয়েছেন আমার শুষ্ক ও স্বাদহীন চিঁড়ে গ্রহণ করে। এত প্রাপ্তির পরে আমার আর কি কিছু অপ্রাপ্য থাকতে পারে? আমার মতো এহেন সৌভাগ্য কজনেরই বা হয়? আজ আমার প্রতি তাঁর এমন আচরণে আমি এই শিক্ষাই লাভ করেছি যে, মহতের কাছে অতি ক্ষুদ্র, অতি দীনও যথোচিত সম্মান লাভ করে থাকেন। প্রতি সাধারণ কাজেই মহতের মহিমা প্রকাশিত হয়। যেতে যেতে সুদামা ভাবছিলেন—স্ত্রী যে অর্থসাহায্যের জন্য কৃষ্ণকে বলতে বলেছিলেন, তা তো আর বলা হলো না! বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে কি বলবেন তিনি? সে-নিয়ে কিছুটা ভারাক্রান্ত হলেন সুদামা। কিন্তু কৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দে তিনি পুনরায় ভারমুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর মন আবার এক অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। গতদিনের পরম সুখস্মৃতি তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে আপ্লুত করে দিল। সুদামা ভাবতে লাগলেন—দীন-দরিদ্রের সখা কৃষ্ণ বুঝেছেন যে, আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব মানুষ। অকস্মাৎ ধন-সম্পদ পেলে বিপথগামী হয়ে তাঁকে যদি আমি ভুলে যাই, সেজন্য তিনি আমাকে ধন-সম্পদের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেননি এবং সঙ্গে ধনরত্নাদি উপহারও দেননি।

এইসব ভাবতে ভাবতে সুদামা পথ চলেছেন। ক্রমে তিনি নিজ বাসস্থানের সম্মুখে এসে পড়লেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাঁদের সেই জীর্ণ পর্ণকুটিরটি কোথায়? না, কোথাও তো দেখতে পাচ্ছেন না সেটিকে! সেই স্থানে দেখছেন এক সুরম্য প্রাসাদ! তাহলে কি তাঁর ভুল হয়েছে? তিনি কি পথ ভুল করে

অন্য কোথাও এসে পড়েছেন? ভাল করে দেখলেন সুদামা। না, এই তো তাঁদের সেই গ্রাম। হ্যাঁ, এখানেই তো ছিল তাঁর কুটিরখানি। হঠাৎ দেখলেন তাঁর স্ত্রী পরিচারিকাগণ সহ সেই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

বিস্ময়বিমুগ্ধ সুদামা বুঝলেন, এসমস্ত সম্ভব হয়েছে তাঁর পরম সুহৃৎ কৃষ্ণের করুণায়। তাঁর কৃপাদৃষ্টিতেই তাঁর এই অযাচিত সমৃদ্ধি। সঙ্কোচবশে যা তিনি বলতে পারেননি দ্বারকাধীশকে, অন্তর্যামী ভগবান বন্ধুর আগমন-উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে সহস্রগুণে তাঁকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। দরিদ্র বন্ধু সঙ্কুচিত হবেন বলে কৃষ্ণ একবারও বন্ধুর সাংসারিক অবস্থার খোঁজ নেননি। পরম প্রেমময় সেই সুহৃদের কথা ভেবে সুদামার চোখ জলে ভরে গেল।

আজ সুদামা পার্থিব সমৃদ্ধির শিখরে। সস্ত্রীক ও সপরিজন সর্বতোভাবে সুখের সংসারে তিনি বাস করতে লাগলেন। কিন্তু প্রাজ্ঞ ও বিবেকসম্পন্ন সুদামা জানতেন যে, ঐহিক ঐশ্বর্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে সহজে ভগবানের দিকে এগোতে দেয় না; ভগবানকে ভুলিয়েই দেয়। ঐহিক সম্পদ অনিত্য। একমাত্র নিত্য বস্তু হলেন ভগবান। তিনি শাশ্বত, তিনি অবিনশ্বর। তাই ঐহিকের চিন্তায় মনকে নিমগ্ন না রেখে শ্রীভগবানের চিন্তায়, নিত্যবস্তুর আরাধনায়, পারমার্থিক বস্তুর অন্বেষণে জীবনকে নিয়োজিত করাই দুর্লভ মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া উচিত। তাই সব সম্পদ লাভ করেও সুদামা সেই সম্পদের মোহে আবদ্ধ হলেন না। শ্রীভগবানের আরাধনা, ধ্যান-ভজন, স্মরণ-মনন আর শাস্ত্রপাঠ করে তিনি ও তাঁর পতিব্রতা সাধ্বী সহধর্মিণী সংসার-জীবন যাপন করতে লাগলেন। তাঁরা 'ভগবানের দাস-দাসী' এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করে 'ভগবানের সংসার' জ্ঞানে দিব্য জীবনযাপন করে অন্তিমে পরমপদ প্রাপ্ত হলেন।*

* শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, ৮০ ও ৮১তম অধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সপ্তশতীর বিভিন্ন দিক

প্রশ্ন : চণ্ডীতে গল্প ছাড়া আর কিছু আছে কি?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : চণ্ডীমাহাত্ম্য পুঁথিখানি একটু কঠিন। ওর তিনটে দিক এবং অর্থ আছে। একটা লৌকিক সাধারণ ভক্তিমূলক বহিরঙ্গ অর্থ। দ্বিতীয়টি যাজ্ঞিক পক্ষে অর্থ, অর্থাৎ ঐসব শ্লোকের মধ্য থেকে মন্ত্রোদ্ধার—যে-অর্থ সপ্তশতী হোমকালে স্মরণ করে সপ্তশত আহুতি দিতে হয়। আর একটি আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় অর্থ। এই যেমন ধরুন—

'এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু।
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥
দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম।
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্ ॥
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ।
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥
খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ।
শূলাগ্রকান্তি-নিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্ ॥
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥'

এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে, এই অসুরগণ নিহত হলে জগৎ সুখপ্রাপ্ত হবে এবং এই অসুরেরা চিরকাল নরকজনক পাপ করলেও সাধনসংগ্রামে মৃত্যু লাভ করে দিব্যলোকে গমন করবে। নিশ্চয় এরূপ মনে করে হে মাতঃ! ব্রহ্মবিদ্যে! তুমি অহিত অসুরগণকে বধ কর। তুমি দর্শনমাত্রই তো অসুরগণকে ভস্ম করতে পার, তথাপি তুমি তাদের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ কেন কর? না, তারা 'শস্ত্র-পূত হয়ে ঊর্ধ্ব-লোকে গমন করুক'—এই তোমার ইচ্ছা। তোমার তাদের প্রতি এই যে মতি, এ অতি সাধ্বী। তোমার বিস্ফুরিতা খড়্গপ্রভানিকর এবং শূলাগ্রকান্তি দেখে অসুরগণের দৃক্‌শক্তি যে বিলয়প্রাপ্ত হয়নি, তার কারণ এই যে, অংশুমৎ ইন্দুখণ্ডতুল্য তোমার আনন তারা দেখেছিল বলে। অর্থাৎ তোমার বদনচন্দ্র-সুধায় তারা জীবিত ছিল।

আবার এরূপ মানেও হয়—'ইচ্ছা করলেই তো সেই মহাশক্তি অসুরভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়দের নিরোধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না; পরন্তু তাদের সাধনসংগ্রামের ভিতর দিয়ে, জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে দেবভাবপ্রাপ্ত করালেন। অর্থাৎ চক্ষু আর কামজ রূপ দেখে না, এখন তার ঈশ্বরীয় মূর্তিতেই প্রীতি হয়েছে—এই রকম সব ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বুঝতে হবে। তিনি দৃষ্টিমাত্র তাদের ভস্ম বা জড়ীভূত করে দিতে পারতেন, কিন্তু তাদের শস্ত্র-পূত করে তাদের পশুত্বকে দেবত্বে উন্নীত করলেন। শস্ত্রের দ্বারা পূত কিরূপ?—শস্ত্রদুটি হলো—খড়্গ অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক নেতি-মূলক বিচার এবং শূল হলো অগ্রাবুদ্ধি অর্থাৎ সূক্ষ্ম যৌগিক দৃষ্টি। তিনি জড়বুদ্ধিদের কেবল বেদান্তের বিচার-জাল এবং যোগৈশ্বর্যের দ্বারা জড় এবং আপাতদৃষ্টিকে স্তম্ভিত করে দেননি, পরন্তু পরমানন্দ সুধারূপ চন্দ্রবদনে দর্শন দিয়ে তাদের দৃষ্টিশক্তিকে দিব্যভাবে আরূঢ় করালেন। (১২।১০।৪২)

চিত্তজয়

প্রশ্ন : ধ্যান হয় না কেন?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : চিত্ত রজঃ ও তমঃ দ্বারা কলুষিত বলে ধ্যান হয় না। রজোগুণের ফল চাঞ্চল্য এবং তমোগুণের ফল জড়তা।

প্রশ্ন ঃ এরা দেহেতে কিভাবে প্রকাশ পায় ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ প্রথম ব্যাধি, দ্বিতীয় স্ত্যান অর্থাৎ উদ্যমরাহিত্য ; ফলে সাধন জানা থাকলেও করতে ইচ্ছা হয় না। তৃতীয়, সংশয় অর্থাৎ সাধন ও তত্ত্ব সম্বন্ধে উভয় দিক্‌স্পর্শীভাব—এটা না ওটা করব—এই মতটা ঠিক, না ঐ মতটা ঠিক। চতুর্থ, প্রমাদ অর্থাৎ জীবনে কোন্‌টি সত্য, আর কোন্‌টি অসত্য বুঝতে না পেরে অসত্য সংসারপথের পথিক হওয়া। পঞ্চম, আলস্য অর্থাৎ দেহের জড়তা। কাজ-কর্মে পরিশ্রমবোধ হলো দেহের জড়তা, আর কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব বোঝাবার সময় কাঠিন্য হেতু যে অস্বস্তি বোধ সেটা হলো চিত্তের জড়তা। ষষ্ঠ, অবিরতি অর্থাৎ ভোগে অতৃপ্তি। সপ্তম, ভ্রান্তিদর্শন অর্থাৎ বিচারকালে বিপরীত বুদ্ধি—প্রত্যক্ষ অনুমান ও বেদ সর্বত্রই বিপর্যয় জ্ঞান।—এরাই হচ্ছে চিত্ত বিক্ষেপকারক এবং ধ্যানযোগের অন্তরায়। যতদিন না যোগের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ভূমি-সকল লাভ না হয় ততদিন চিত্তবিক্ষেপ থাকবেই। আবার শুধু লাভ হলেই হলো না, তাতে অবস্থিত হওয়া চাই, তবে শান্তি। কাজে কাজেই অষ্টম, অলব্ধ-ভূমিকত্ব এবং নবম, অনবস্থিতত্বকেও পতঞ্জলি যোগান্তরায় বলেছেন।

তারপর যতদিন এই চিত্তবিক্ষেপের হেতুগুলো থাকবে তার সহভুঃ ফলগুলোও থাকবে—(১) দুঃখ= আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। (২) দৌর্মনস্য=ইচ্ছার ব্যাঘাত ঘটলে চিত্তের ক্ষোভ। (৩) অঙ্গমেজয়ত্ব=দেহের চাঞ্চল্য। (৪) শ্বাস-প্রশ্বাস-অসমানতা=নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের চাঞ্চল্য ও অসমানতা।

যদি দুঃখ জয় করতে চাও তাহলে 'এক' ব্রহ্ম-'তত্ত্বের অভ্যাস কর ; অর্থাৎ আমি দেহ নই আত্মা। দুঃখের হেতু দেহাত্মবুদ্ধি। ব্রহ্মবিচারের দ্বারা যত দেহাত্মবুদ্ধি নাশ হবে, ততই আর দুঃখে দুঃখবোধ থাকবে না। অবিবেকবশতঃ দেহের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করেই যত দুঃখ। জবাফুলের ধর্ম স্ফটিকে আরোপ করে স্ফটিককে লাল বলা।

দৌর্মনস্য জয়ের উপায়—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অভ্যাস। (১) মৈত্রী=সুখী লোকের সহিত মৈত্রী ; (২) করুণা=দুঃখীকে করুণা ; (৩) মুদিতা=পুণ্যাত্মার কর্মে আনন্দ ; এবং (৪) উপেক্ষা=অপুণ্য কর্মকারীকে উপেক্ষা করা।

অঙ্গমেজয়ত্ব বা দেহচাঞ্চল্য জয় করতে হলে আসন অভ্যাস করা উচিত। আসন হলো কোন একটা বিশিষ্ট ভাবে শরীরকে স্থিরভাবে ধারণ করবার চেষ্টা। কখনো বা সর্বাঙ্গ শিথিল করে দিয়ে স্থিরভাবে অবস্থান করবে। কখন স্থির হয়ে বসে মনে করবে দেহের ভিতর দিয়ে আকাশ চলে যাচ্ছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত করতে হলে প্রাণায়ামের অভ্যাস করতে হয়। দেখা যায় যখনই আমরা কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করি তখনই নিঃশ্বাস সূক্ষ্ম, স্থির, দীর্ঘ এবং অল্পবার পড়তে থাকে। আর মনের উদ্বেগ ও চঞ্চল অবস্থায় দেখবে, নিঃশ্বাস ছোট এবং খুব তাড়াতাড়ি পড়ছে। যেসব পশুর নিঃশ্বাস তাড়াতাড়ি পড়ে তাদের শরীরের উত্তাপ বেশি এবং অল্পায়ু। আর যাদের নিঃশ্বাস যত দীর্ঘ তাদের শরীর তত শীতল এবং দীর্ঘায়ু। মানুষের নিঃশ্বাসের পরিমাণ দেখে আয়ুর পরিমাণ, মনের স্থৈর্য নির্ণয় করা যায়। (২৩।১১।১৯৪২) [ক্রমশঃ]

বিশেষ রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার*

অরবিন্দ সামন্ত

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস শেষ হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের জানালেন, তাঁর গলায় ব্যথা। গলার ভিতরে ঘা হয়েছে। ডাক্তাররা বললেন: বেশি কথা না বলাই ভাল। আর ঘন ঘন সমাধিও তাঁর শরীরের পক্ষে ভাল নয়। সমাধিস্থ হলে গলায় রক্তসঞ্চালন বেড়ে যায়। তাতে ব্যথা আরও বাড়তে পারে। ওষুধ দেওয়া হলো; কিন্তু রোগের কোন উপশম হলো না। আরও মাস দুয়েক কাটল। জুলাই মাসের মাঝামাঝি। গলার ব্যথা বেড়েই চলল। গলা এত ফুলে উঠল যে, শক্ত খাবার খাওয়াই মুশকিল হলো। দুধ আর খুব পাতলা রুটি ছাড়া ঠাকুর কিছুই খেতে পারছেন না। এক-সময় ঠাকুরের গলা দিয়ে রক্ত বের হলো। নরেন্দ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র, মাস্টার প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আলোচনা-পরামর্শ করে স্থির হলো, খুব শিগ্‌গির কলকাতায় একটি বাড়ি ভাড়া করে ঠাকুরকে এনে ভাল করে চিকিৎসা করাতে হবে।

বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটে একটা বাড়ি স্থির করা হয়েছিল। বাড়িটি ঠাকুরের পছন্দ না হওয়ায় তিনি বলরাম মন্দিরে এসে ওঠেন। বাড়ির খোঁজ অবশ্য চলতে থাকল। ইতিমধ্যে ভক্তরা কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তারদের ডেকে ঠাকুরের অসুখ সম্বন্ধে মতামত নিলেন। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় কোন উপকার হলো না। তাই শিষ্য ও ভক্তরা ডেকে আনলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত কবিরাজদের। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারকানাথ, নবগোপাল প্রমুখ আরও অনেক কবিরাজ ঠাকুরকে পরীক্ষা করলেন। তাঁরা বললেন, ঠাকুরের দুরারোগ্য ক্যান্সার হয়েছে। ঠিক হলো, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই শ্যামপুকুর স্ট্রীটে গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা ভবনটি ভাড়া নেওয়া হবে এবং ঠাকুরকে সেখানে রেখে কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে চিকিৎসা করানো হবে। অ্যালোপ্যাথি ওষুধে কাজ হচ্ছে না; উপরন্তু কড়া ডোজের ওষুধে ঠাকুরের শরীরে কষ্টই বাড়ছে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধে মাত্রা কম। ঠাকুরের শরীরে তা সইলেও সইতে পারে।

তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার এই সময় বেশ নামডাক হয়েছিল। বিদ্যাসাগর নানা রোগে ভুগছিলেন। তখনকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়েছিল। কোন চিকিৎসাতেই কিছু হচ্ছিল না। শেষে রাজেনবাবুর চিকিৎসায় তিনি নিরাময় হন। রাজা ২৫০০০ টাকা পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, রাজেনবাবু নিতে রাজি হননি। বলেছিলেন: 'হোমিওপ্যাথির গুণের পরিচয় হলো। তাই-ই তাঁর পুরস্কার।' ফলে বর্ধমানের মহারাজা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ হোমিওপ্যাথিতে অনুরক্ত হয়ে উঠলেন; অনুরক্ত হলেন লর্ড রিপন, স্যার বারনেশ পিকক, স্যার

* ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সম্বন্ধে উদ্বোধন পত্রিকায় ইতিপূর্বে চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে (শেষটি আশ্বিন, ১৩৯৫ সংখ্যায়)। এগুলিতে বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্যের অধিকাংশই আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া, উদ্বোধন কার্যালয় থেকে জলধিকুমার সরকার প্রণীত সম্প্রতি প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার' গ্রন্থে (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) মহেন্দ্রলালের জীবনী ও চরিত্র এবং ডাক্তার ও শ্রীরামকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের হেতু আরও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ সেগুলি দেখে নিতে পারেন।—যুগ্ম সম্পাদক।

হেনরী কটন, স্যার উইলিয়ম হান্টার, স্যার স্টুয়ার্ট হগ, স্যার রবার্ট বিজাল, মিস্টার রবার্ট নাইট ও আরও অনেকে।

যাই হোক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা করতে। দুঃখের বিষয়, হাজার চেষ্টা করেও ডাক্তার সরকার সারাতে পারেননি ঠাকুরের গলরোগ। হার মেনেছিলেন ডাক্তার। কিন্তু জিতেছিলেন এই 'আধপাগল' রোগীটি। সবার অলক্ষ্যে ঠাকুর বিজ্ঞাননিষ্ঠ ডাক্তারেরই আধ্যাত্মিক চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছিলেন। মানিয়েছিলেন তিনি, যা ডাক্তার মানতে চাননি। বুঝিয়েছিলেন তিনি, যা ডাক্তার চাননি বুঝতে।

মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় এম. ডি.। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ। ছাত্রদের জন্য সেকালে যতগুলো পুরস্কার ছিল তার প্রায় সবই ছিল তাঁর একচেটিয়া দখলে। অধ্যাপকরা খুব ভালবাসতেন প্রতিভাবান এই ছাত্রটিকে। পাশ করে বের হবার (১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের একটি শাখা খোলার জন্য ২৭ মে, ১৮৬৩ স্বর্গত ডাক্তার গুডিভ-এর বাড়িতে একটি প্রারম্ভিক সভা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার দিনে ডাক্তার সরকার একটি বক্তৃতা করেন। তাঁর বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলতায় বড় বড় ডাক্তাররা মুগ্ধ হন। তবে তাঁর বক্তৃতার গুরুত্ব অন্য একটি ঐতিহাসিক কারণে। ঐ বক্তৃতায় তিনি হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসাকে অবজ্ঞা করে হাতুড়ে চিকিৎসা-গুলির অন্যতম বলে নিন্দা করেন। সাহেব ডাক্তাররা হাততালি দেন। কিন্তু কথাগুলি তখনকার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ রাজেন্দ্রনাথ দত্তের কানে বড় বাজে। তিনি ডাক্তার সরকারকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। উভয়ের বিচার-বাদানুবাদ চলল বহুদিন ধরে।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে। মহেন্দ্রলালের এক বন্ধু তাঁকে অনুরোধ জানান মরগ্যান-এর 'ফিলসাফি অফ হোমিওপ্যাথি' বইটির একটি সমালোচনা লিখে দিতে। সেটি বের হবে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায়। বাধ্য হয়েই ডাক্তার সরকার মর্গ্যানের বইটি পড়তে শুরু করলেন।[১] পড়তে পড়তে বইয়ের মধ্যে এমন কিছু কিছু কথা পেলেন, যেবিষয়ে অভিজ্ঞতা ছাড়া মত প্রকাশ করা কঠিন। স্থির করলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল কিছুদিন না দেখে তিনি মত প্রকাশ করবেন না। তিনি রাজেন্দ্রনাথ দত্তের শরণাপন্ন হলেন। রাজেন্দ্রনাথের চিকিৎসাপদ্ধতি দেখতে দেখতে ডাক্তার সরকারের মতটাই বদলে গেল। হ্যানিম্যান প্রবর্তিত পন্থা যে যুক্তিসঙ্গত, তাতে তাঁর স্থির বিশ্বাস হলো।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার চতুর্থ বার্ষিক অধি-বেশন বসল। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর পরিবর্তিত প্রতীতি প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠে-ছিলেন। সুযোগও পেয়ে গেলেন; ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলেন। বিষয়ঃ 'চিকিৎসাবিজ্ঞানে তথা-কথিত অনিশ্চয়তা এবং রোগ ও তার ওষুধের সম্পর্ক'। বক্তৃতায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসার কতক-গুলি দোষ-ত্রুটি তিনি তুলে ধরলেন; অপরদিকে, হ্যানিম্যান আবিষ্কৃত চিকিৎসাপদ্ধতির যৌক্তিকতার সমর্থনে তিনি বক্তব্য রাখলেন।[২]

এর ফল হলো মারাত্মক। সাহেব-ডাক্তাররা তো চটে লাল। ডাঃ ওয়ালার নামে এক ডাক্তার তো বলেই উঠলেনঃ "ডাক্তার সরকার! থামো! আর একটা যদি কথা বল তো তোমাকে এখান থেকে বের করে দেব।" সভার সমস্ত ডাক্তার একজোটে ডাঃ সরকারকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু ডাক্তার সরকার স্বমতে অটল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বললেনঃ "আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব তাতে আর কি? যা সত্যি তা তো বলতেই হবে, করতেই হবে।"[৩]

১ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২৬১

২ Calcutta Journal of Medicine, July 1902, p. 42

৩ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৬২

এদিকে কাগজে কাগজে এই খবর রটে গেল। মেডিকেল মিশনারী ডাক্তার রবসন বক্তৃতার মাধ্যমে ডাক্তার সরকারের মুণ্ডপাত করলেন। ডাক্তার ইওয়ার্ট খবরের কাগজে কলম ধরলেন। সমস্ত দেশী-বিদেশী অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, ডাক্তার সরকারের নিন্দায় শহর তোলপাড় করে ফেললেন। ডাক্তার সরকারের পশার মাথায় উঠল। ছমাসের মধ্যে একটি রোগীও তাঁর ঘরমুখো হলো না। কিন্তু ডাক্তার সরকার ছিলেন অন্য ধাতের, ভিন্ন ধাতুর মানুষ। জীবনে যা সত্য বলে জেনেছেন কোনভাবেই তাকে বিসর্জন দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি বের করলেন 'ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন'। লোকে বুঝল, এত বিরোধিতা সত্ত্বেও মানুষটিকে দমানো শক্ত। চরম অবজ্ঞা ও অর্থকষ্ট মানুষটিকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। মহেন্দ্রলাল নিজেই লিখেছেন:

"যা সত্য তা শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হবেই, এই বিশ্বাসেই আমি সবল ছিলাম। ইতিমধ্যেই পীড়ন শুরু হয়ে গেছে। আমার পেশার লোকেরা আমার বিরুদ্ধে ভয়ানক জোটবদ্ধ হয়েছে এবং সম্ভবতঃ আরও বেশি করে হবে। সকলেই আমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে, কিন্তু আমার একমাত্র সান্ত্বনা আমি কারুর বিরুদ্ধাচরণ করিনি, করবও না। সম্ভবতঃ আমার রুজিরোজগার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু আমি মহানুভব যীশুর কথা ভুলব না যে, যুক্তিবাদী এবং ঈশ্বরের প্রতিরূপ মানুষ হিসাবে আমরা শুধুমাত্র খেয়ে-পরেই বাঁচি না, ঈশ্বরের কথা মতো চলেই বাঁচব।"[৪]

জীবনের এমন সংকটময় মুহূর্তেও ডাক্তার সরকার বিনা পারিশ্রমিকে দিনের পর দিন লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা করেছেন। মানুষকে ভালবেসেছেন হৃদয় দিয়ে। সুতরাং এমন মানুষকে কেউ কি হেয় করে রাখতে পারে চিরকাল। আবার মহেন্দ্রলালের পশার ফিরে এল। হোমিওপ্যাথিও লোকচক্ষে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলো। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হয়েও বিপুল অর্থশালী হয়ে উঠেছিলেন। সেই বারো আনা মণ চালের আমলেও ধীরে ধীরে তাঁর ফি হয়েছিল বত্রিশ টাকা। সুনামও হয়েছিল প্রবাদপ্রতিম। সেকালের বিখ্যাত হোমিও ডাক্তার বেরিনি সাহেব ছিলেন মহেন্দ্রলালের গুণমুগ্ধ। বেরিনি সাহেব যখন এদেশ ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর শুভার্থী বন্ধুরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সেই বিদায়-অভ্যর্থনা সভায় ডাঃ বেরিনি বললেন: "আমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই। সূর্য উঠলে চন্দ্রের অস্তগমনই শোভা পায়। মহেন্দ্র বাংলার আকাশে উদিত হয়েছেন। এখন আমার অস্তগমনের সময়।"[৫]

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রধান উদ্যোগ ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন', যার বর্তমান নাম 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশান অব সায়েন্স'। পরের বছর তিনি হলেন কলকাতার অন্যতম অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সম্মানিত করলেন সি. আই. ই. উপাধিতে। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি হয়েছিলেন ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। আর ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারি ডি. এল. উপাধি দিয়েছিল।

এই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা করতে। ঠাকুর বলরাম বসুর বাড়ি থেকে তখন শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে উঠে এসেছেন। ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে মথুরবাবুর সময় থেকেই জানতেন। মথুরবাবুর বাড়িতে মথুরবাবুর বা তাঁর বাড়ির লোকেদের চিকিৎসা করতে গিয়ে মহেন্দ্রলাল ঠাকুরকে নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। তাছাড়া ঠাকুরকে তাঁর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সরকারের শাঁখারিটোলার বাড়িতে একবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যাই হোক, এবার ডাক্তারকে আনা হলো, তাঁর ভিজিটের ব্যবস্থা হলো।

৪ Calcutta Journal of Medicine, July 1902, p. 45

৫ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২০০

ঠাকুরকে দেখে ডাক্তার সরকার বললেন : "তুমি যে এখানে ?" ঠাকুর জানালেন চিকিৎসার জন্য তাঁকে আনা হয়েছে। ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে দেখলেন, ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করে নিচে নেমে এলেন। তাঁকে ভিজিটের টাকা দেওয়া হলো। তিনি নিলেন না। তিনি জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'মথুরবাবুর পরমহংস'। কিন্তু ডাক্তার সরকার যখন শুনলেন যে, তাঁর পারিশ্রমিকের টাকা ভক্তরা যোগাড় করেছেন, তখন কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন কারা তাঁর ভক্তমণ্ডলী। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গিরিশ ঘোষেরও নাম শুনে তিনি অবাক হলেন। গিরিশের পরিবর্তন হয়েছে জেনে তিনি আরও বিস্মিত হলেন। ঘোষণা করলেন : "পরমহংসদেব সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, অতএব আমি টাকা নেব না।" ভক্তরা পীড়াপীড়ি করলেন, বললেন—ঠাকুরের ভক্তেরা ধনী না হলেও কেউ অক্ষম নন, তাঁরা অর্থ-ব্যয় করে চিকিৎসা করবার জন্যই ঠাকুরকে কলকাতায় এনেছেন। সুতরাং টাকা নিতে দ্বিধা করার কোন কারণ নেই। ডাক্তার সরকার হাসলেন। বললেন : "আমাকে সেই পাঁচজনের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লউন। আমি বিশেষ যত্নপূর্বক চিকিৎসা করিব। যতবার প্রয়োজন হইবে, আমি আপনি আসিব। আপনারা মনে করিবেন না যে, আপনাদের সন্তুষ্ট করিতে আসিব। আমার নিজের প্রয়োজন আছে, জানিবেন।"[৬]

না, প্রয়োজন বোধহয় ডাক্তারের নয়, প্রয়োজন ছিল ঠাকুরের। একজন বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে ঠাকুরই আকর্ষণ করেছেন। ডাক্তার সরকার দেখলেন ভক্তরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পুজো করে। বিজ্ঞাননিষ্ঠ ডাক্তারের মন এতে ক্ষুব্ধ হলো। "অবতার আবার কি ! যে মানুষ হাগে-মোতে তার পদানত হবো ! তবে reflection of God's light মানুষে প্রকাশ হয়ে থাকে, তা মানি।"[৭] ঠাকুর বোঝান, জ্ঞানবিচার হলো বিকারের রোগীর খেয়াল। যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। তাই জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হতে হবে। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানলে সেই অবস্থা হয়। তারই নাম বিজ্ঞান। পূর্ণ জ্ঞান।

ডাক্তার হার মানতে নারাজ—"পূর্ণ জ্ঞান থাকে কই ? সব ঈশ্বর ! তবে তুমি পরমহংসগিরি করছ কেন ? আর এরাই বা তোমার সেবা করছে কেন ? চুপ করে থাকো না কেন ?" শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলেন : "জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, তরঙ্গ হলেও জল।"[৮]

মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞানের মানুষ। পাথুরে-প্রমাণ ছাড়া কোন জিনিস মানতে নারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের মাঝে মাঝে ভাবসমাধি হতো। রোগীর ক্ষতি হবে বলে ডাক্তার এতে বিচলিত হতেন, বাধা দিতেন। ধর্মসঙ্গীত বা তদ্গত ধর্মালোচনা শুনে ভক্তরা যখন ধ্যানস্থ হয়ে যেত বা ভাবাবেশে অশ্রুমোচন করত, মহেন্দ্রলাল তখন অবিচল স্থির থাকতেন। এরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে মহেন্দ্রলাল এদের তিরস্কার করতেন। এমন-কি অপরের গায়ে পা দেওয়ার জন্য ঠাকুরও ডাক্তারের কাছে কম গঞ্জনা পেতেন না। গান শুনে একদিন দুজন ভক্তের ভাবসমাধি হলো। ডাক্তার সরকার তাদের নাড়ি দেখলেন ; বুঝতে পারলেন তাদের সত্যি সত্যিই বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে। মূর্ছা গেলে তবেই তো মানুষের এমন অবস্থা হয় ! রামকৃষ্ণদেব তাদের বুকে হাত রেখে কি যেন বললেন। আবার তাদের বাহ্য-জ্ঞান ফিরে এল। ডাক্তার সরকার বললেন : "বুঝলাম, সবই তোমার খেলা।" কিন্তু এ কোন্ খেলা ! ভেল্‌কি, নাকি পারঙ্গম ঠাকুরের দেবতনুর ক্ষণিক দিব্যধাম ভ্রমণ ! দুর্গাপুজার সময় শ্রীরাম-কৃষ্ণের হঠাৎ ভাবসমাধি হলো। ডাক্তার সরকার তাড়াতাড়ি স্টেথোস্কোপ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত, পৃঃ ১৬৭। ডাক্তার সরকার প্রথমদিন পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন, এরূপও শোনা যায়।

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ১০২৯

৮ ঐ, পৃঃ ১০৩০

করতে লাগলেন। কোন হৃৎস্পন্দন শুনতে পেলেন না। ডাক্তার সরকার আঙুল দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চোখের মণি পরীক্ষা করলেন, কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ডাক্তার সরকারের বুদ্ধি-বিবেচনা হার মানল। বিজ্ঞাননিষ্ঠ ডাক্তার এর কোন ব্যাখ্যা পেলেন না। বৈজ্ঞানিক মনে প্রশ্ন জাগল: তবে কি বিজ্ঞানের যুক্তির বাইরেও কিছু আছে? তবুও যুক্তিনিষ্ঠ ডাক্তার অযৌক্তিক ভক্তি গদগদ কৃতাঞ্জলিপুটে আত্মসমর্পণ করেননি। মহেন্দ্রলালের এই স্থৈর্য সকল ভক্তদের বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "তুমি গম্ভীরাত্মা।... যদি ডোবাতে হাতি নামে তাহলেই তোলপাড় হয়ে যায়, কিন্তু সায়ের দীঘিতে নামলে তোলপাড় হয় না। কেউ হয়তো টেরও পায় না।"[৯]

রামকৃষ্ণদেব তাঁর সমসাময়িক বহু গুণিজন ও প্রতিষ্ঠানের খবরাখবর নিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যেতেন, এশিয়াটিক সোসাইটিতেও তাঁর পদার্পণ হয়েছে। মহেন্দ্রলালের 'বিজ্ঞান সভা'র খবরও তিনি পেয়েছিলেন। একদিন 'বিজ্ঞান সভা'য় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মহেন্দ্রলালকে বলেছিলেন। মহেন্দ্রলাল টিপ্পনী কাটার সুযোগ ছাড়েন না, বলেন: "তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য সব কাণ্ড দেখে।" ঠাকুর মৃদু হাসেন, বলেন: "বটে?"[১০] একদিন ডাক্তারকে বললেন: "তোমাকে এই বলা, রাগ করো না; ওসব তো অনেক করলে—টাকা, মান, লেকচার; এখন মনটা দিনকতক ঈশ্বরেতে দাও।"[১১]

রামকৃষ্ণদেব ডাক্তার সরকারকে কম ভালবাসতেন না। একদিন হঠাৎ তিনি ডাক্তার সরকারের কোলে পা তুলে দিলেন। তারপর বললেন: "তুমি খুব শুদ্ধ। তা না হলে (তোমার কোলে আমি) পা রাখতে পারি না।" ঠাকুর বললেন, তিনি মায়ের কাছ থেকে জেনেছেন ডাক্তার অনেক জ্ঞান অর্জন করবেন—কিন্তু সব শুষ্ক জ্ঞান। সহাস্যে পরে বলেন: "কিন্তু তুমি রসবে।"[১২]

ডাক্তার 'রসেছিলেন'। মহেন্দ্রলালের ধারণা ছিল জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞানী মানুষ ঈশ্বরের লীলা দেখে অবাক হয়; কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকদিন কথাবার্তা বলে বুঝলেন জ্ঞানার্জনের চেয়ে ভক্তির পথে ধ্যানের দ্বারা অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত হয়। ডাক্তারের উপলব্ধির স্বগতোক্তি: "বই পড়লে এ-ব্যক্তির এত জ্ঞান হতো না। প্রকৃতিকে ফ্যারাডে নিজে দর্শন করত। তাই অত scientific truth discover করতে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হলে অত হতো না। Mathematical formulae only throw the brain into confusion—original enquiry-র পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়।"[১৩]

ধীরে ধীরে ডাক্তার সরকার ধর্মসঙ্গীতেরও ভক্ত হয়ে পড়েন। নিজের বাড়িতে ধর্মসঙ্গীতের আসর বসাতেন, অন্যত্রও শুনতে যেতেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি এই সঙ্গীতের প্রতি দুর্বলতার জন্যই। নরেন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতের সুধাকণ্ঠ ও ভাবতন্ময়তা মহেন্দ্রলালকে মুগ্ধ করেছিল। মাঝে মধ্যেই নরেন্দ্রনাথকে তিনি বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনতেন। রামকৃষ্ণদেবের কাছেও শুনতেন ধর্মসঙ্গীত। আর সেখানেই তাঁর আলাপ হয়েছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। সেই আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল। গিরিশের 'বুদ্ধদেব' নাটক দেখে ডাক্তার খুব খুশি হয়েছিলেন। তাই রহস্য করে বলতেন: এখন 'অনেক কষ্টে' ভাব চাপি। রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসা করতে এসে আমার চিকিৎসা-ব্যবসা মাটি হলো; এখন 'বদলোক' গিরিশের পাল্লায় পড়ে থিয়েটার দেখি।[১৪]

রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তারের ছিল অতিরিক্ত সতর্কতা। মহেন্দ্রলাল নিজে আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পরীক্ষা করতে। ওষুধ দিতেন,

৯ কথামৃত, পৃ: ১০৬৩
১১ ঐ, পৃ: ১০৮৩
১৩ ঐ, পৃ: ১০৪০
১০ ঐ, পৃ: ১০৮৪
১২ ঐ, পৃ: ১১০৫
১৪ ঐ, পৃ: ১০৫১, ১০৪৪, ১০৫৭, ১০৬৩

ফি নিতেন না। কোন কোন সময় মাস্টার মশায় বা অন্য কোন ভক্ত যান ডাক্তারের বাড়ি, রোগীর লক্ষণ জানিয়ে ওষুধ নিয়ে আসেন। ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে দেখতে এসে কখনো কখনো ছ-সাত ঘণ্টা কাটিয়ে যান। তিনি ভাল করেই জানতেন ঠাকুরের রোগ সারানো কঠিন। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। তাঁর ধারণা ছিল, রোগ সারতেও পারে যদিও তা বড় শক্ত আর সময়সাপেক্ষ।

ঠাকুরের পথ্য সম্বন্ধে ডাক্তারের ছিল কড়া নিয়মনিষ্ঠা। রামকৃষ্ণদেবের অবস্থা একদিন খুব খারাপ হয়ে পড়ল। সতর্কতা সত্ত্বেও ডাক্তার বুঝতে পারছিলেন ঠাকুর ধীরে ধীরে চিকিৎসার বাইরে চলে যাচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হতেই থাকে। ডাক্তার সরকারের স্থির বিশ্বাস হলো, কলকাতার দূষিত বাতাস রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক। আর একবার স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন তিনি। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর বাড়ি মিলল—৯০ নং কাশীপুর রোড। ভাড়া একটু বেশি—মাসে ৮০ টাকা। কাশীপুরে আসার পর ঠাকুর একটু-আধটু হাঁটতে পারতেন বাগানে। ভক্তরা খুশি হলেন। ভাবলেন, এতে ঠাকুরের স্বাস্থ্য ভাল হবে। কিন্তু তা আর হলো না—ঠাকুর ক্রমেই আরও রুগ্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

রামকৃষ্ণদেব গভীর কথাকে বলতেন সহজ করে। কত কঠিন দার্শনিক উপলব্ধি দৈনন্দিন জীবনের গল্পগাথার আধারে পরিবেশন করতেন অত্যন্ত সরস ও সরল ভঙ্গিতে। এজন্য অনেকসময় তিনি কৌতুককর উপমা দিতেন। সে-উপমার মনোহর চমৎকারিত্ব সকলকে এত মুগ্ধ করত যে, কেউ কল্পনাই করতে পারত না তার কোন বিকল্প হতে পারে। কিন্তু মহেন্দ্রলাল ডাক্তার মানুষ। তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বিচারকে অত সহজে নিস্তেজ করে দেওয়া যেত না। তিনি প্রতিবাদ করতেন মাঝে-মধ্যেই আরও কৌতুককর আবহ রচনা করে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন: "যে-গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। যে-গরু শাক-পাতা, খোসা, ভুষি, জাব যা দাও গব গব করে খায় সে হুড় হুড় করে দুধ দেয়।" সমবেত সহাস্য ভক্তদের সঙ্গে মহেন্দ্রলালও যোগ দিলেন। অবশ্য ডাক্তারের অত্যন্ত-গম্ভীর চোখের কোণে স্নিগ্ধ কৌতুক নেচে উঠল। ডাক্তার বললেন: "গরুর কিন্তু যা-তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম। অনেক অনেক অনুসন্ধান করে টের পেলুম গরু খুদ (বোধহয় দূষিত), আরো কি কি খেয়েছিল।... পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের একটি মেয়ের ঘুংড়ী কাশি—আমি দেখতে গিছলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি নাই। শেষে জানতে পারলুম, গাধা ভিজেছিল, যে-গাধার দুধ সেই মেয়েটি খেত।" রামকৃষ্ণদেব সব শুনে হেসে ফেলেন, বলেন: "কি বলে গো! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ি গিয়েছিল, তাই আমার অম্বল হয়েছে!"[১৫]

মহেন্দ্রলালের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের আলাপচারিতা এমনই সরল, সরস ও কৌতুকপূর্ণ। একদিন ডাক্তার ঠাকুরের জন্য ওষুধ দিলেন। বললেন: "এই দুটি গুলি দিলাম—পুরুষ আর প্রকৃতি।" ঠাকুরও কম যান না, বলেন: "হ্যাঁ, ওরা একসঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ, সেখানেই প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি, সেখানেই পুরুষ।"[১৬]

রোগের প্রকোপ আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট রামকৃষ্ণদেব দেহ রাখলেন।

কিন্তু এই কয়েকমাসের সাহচর্য মহেন্দ্রলালের মনে ঢেউ তুলেছিল। কাউকে মিথ্যে তোষামোদ মহেন্দ্রলালের ধাতে ছিল না। ঠাকুরকেও তিনি ছেড়ে কথা বলেননি: "ওহে, তুমি কি ভাব কেবল তোমারই

১৫ কথামৃত, পৃঃ ১০৪০

১৬ ঐ পৃঃ ১০৬২

জন্য আমি এখানে এতটা সময় কাটাইয়া যাই? ইহাতে আমারও স্বার্থ রহিয়াছে।... কি জান, তোমার সত্যানুরাগের জন্যই তোমায় এত ভাল লাগে।... মনে করিও না, তোমার খোশামুদি করছি, এমন চাষা আমি নই; বাপের কুপুত্র!—বাপ অন্যায় করলে তাঁকেও স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না।..."[১৭]

স্পষ্ট কথা তিনি সেইসব ভক্তদের উদ্দেশ্যেও বলেছেন, যাঁরা ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ডাক্তারবাবুর অপরাবিদ্যার আপেক্ষিক (relative) সত্য-আবিষ্কারের দিকেই ঝোঁক, ঠাকুরের পরাবিদ্যার দিকে নয়। উত্তেজিত মহেন্দ্রলাল তর্ক করেছেন: "ঐ তোমাদের এক কথা। বিদ্যার আবার পরা, অপরা কি? যাহা হইতে সত্যের প্রকাশ হয়, তাহার আবার উঁচু-নিচু কি? আর যদিই একটা ঐরূপ মনগড়া ভাগ কর, তাহা হইলে এটা তো স্বীকার করিতেই হইবে, অপরা-বিদ্যার ভিতর দিয়াই পরাবিদ্যা লাভ করিতে হইবে—বিজ্ঞানের চর্চা দ্বারা আমরা যেসকল সত্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতেই জগতের আদি কারণ বা ঈশ্বরের কথা আরও বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। আমি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের ধরিতেছি না। তাহাদের কথা বুঝিতেই পারি না—চক্ষু থাকিতেও তাহারা অন্ধ। তবে একথাও যদি কেহ বলেন যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সবটা তিনি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—তাঁহার জন্য পাগলাগারদের ব্যবস্থা করা উচিত।" ঠাকুর প্রসন্ন স্নেহে বললেন: "ঠিক বলিয়াছ, ঈশ্বরের 'ইতি' যাহারা ক'র, তাহারা হীনবুদ্ধি, তাহাদের কথা সহ্য করিতে পারি না।" ডাক্তার বললেন, ঈশ্বরকে যারা 'ইতি' করেন, তারা স্বল্পবুদ্ধি। "ওটা হইতেছে বিদ্যার গরম বা বদহজম —ঈশ্বরের সৃষ্টির দুই-চারিটা বিষয় বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করে, দুনিয়ার সব ভেদটাই তাহারা মারিয়া দিয়াছে। যাহারা অধিক পড়িয়াছে, দেখিয়াছে, ও দোষটা তাহাদের হয় না। আমি তো ঐ কথা কখনও মনে আনিতে পারি না।"[১৮]

বিদ্যার অহঙ্কার মহেন্দ্রলাল মনে আনেননি। সুপণ্ডিত সুবিজ্ঞানী ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি নিয়েছেন, নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কিন্তু মুখে কখনও প্রকাশ করেননি ঠাকুরের প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা ছিল তাঁর।

ডাক্তার সরকারকে তাঁর এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন: "মশায়, শুনতে পাই পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখছেন, আপনার কি বোধ হয়?" ডাক্তার বললেন: "As man I have the greatest regard for him." (মানুষ হিসাবে তাঁর প্রতি আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা।) একদিন শ্রীম গিয়েছেন ডাক্তারের বাড়ি ঠাকুরের স্বাস্থ্যের অবস্থা জানাতে। শ্রীম জিজ্ঞাসা করলেন: "আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে?" ডাক্তার বললেন: "বন্দোবস্ত আমার মাথা আর মুণ্ডু! আবার আজ [আমাকে] যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত! তোমরা জান না যে আমার কত টাকা রোজ লোকসান হচ্ছে!"[১৯] লোকসান—তবু যাওয়া চাই! কে যেন জোর করে তাঁকে নিয়ে যায়!

নরেন্দ্রকে অন্তরঙ্গে একদিন বলছেন: "...নিজের ভাব চাপতে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝলে না। My best friends (যারা আমার পরম বন্ধু) আমায় কঠোর নির্দয় মনে করে। ...আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্যন্ত—আমায় মনে করে hard-hearted (স্নেহ-মমতাশূন্য), কেননা, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারু কাছে প্রকাশ করি না।" গিরিশচন্দ্রকে বলছেন: "তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked-up হয় (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)।" অবশেষে নরেন্দ্রনাথের কাছে করেছেন অকপট আত্মসমর্পণ, আত্ম-উন্মোচন: "I shed tears in solitude—(আমি একলা একলা বসে কাঁদি)।"[২০] 'গম্ভীরাত্মা' ডাক্তার সরকার, যিনি অন্যের 'ভাব' প্রকাশ হওয়া পছন্দ করেন না, 'ভাব' ইত্যাদি স্নায়বিক দুর্বলতা বলে যাঁর ধারণা, তিনি জনান্তিকে স্বীকার করেছেন: "আমি একলা একলা বসে কাঁদি!"

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, ১৩৭৯, 'ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান', পৃঃ ৩১৯
১৮ ঐ, পৃঃ ৩২০-৩২৩ ১৯ কথামৃত, পৃঃ ১০৫৭-১০৫৮ ২০ ঐ, পৃঃ ১০৮৫

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

ডেঙ্গুজ্বর

সন্দীপকুমার চক্রবর্তী

গত ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিক থেকে শুরু করে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতা শহরে, বিশেষ করে মধ্য কলকাতার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ডেঙ্গুজ্বরের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই জ্বরে শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েরাই বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ কলকাতায় এই প্রথম নয়, কিন্তু এবারের বিশেষত্ব এই যে, আক্রান্ত ব্যক্তি, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়ের একাংশের মধ্যে জ্বরের সঙ্গে বা তার অব্যবহিত পরেই দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখা গিয়েছিল, যার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কলকাতায় ডেঙ্গুরোগাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সঠিক জানা না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, কমপক্ষে চার থেকে পাঁচশো ব্যক্তি এই রোগের শিকার হয়েছিল। কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরোলজি বিভাগ এই রোগের অনুসন্ধান করার প্রয়াসে প্রায় দুশো রোগীর (বেশির ভাগই কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন) রক্ত পরীক্ষা করে কয়েকটি ডেঙ্গুভাইরাস বের করে তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করেন। উপরোক্ত রোগীদের বেশির ভাগই (শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি) ছিল শিশু ও কম বয়সের বালক-বালিকা, যাদের গড় বয়স ছিল ১ থেকে ১৫ বছর। এদের মধ্যে শতকরা ৩২জনের মধ্যে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তক্ষরণের লক্ষণ ছিল এবং মৃত্যুহার হয়েছিল ২.৯ শতাংশ। বর্তমান লেখাটির উদ্দেশ্য এই রক্তক্ষরণী ডেঙ্গুজ্বর সম্বন্ধে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক আলোচনা।

ডেঙ্গুজ্বরের ব্যাপারটি দুশো বছরের আগেই জানা গিয়েছে। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। ভাইরাসের নাম ডেঙ্গুভাইরাস। ভারতবর্ষেও শতাধিক বছর থেকে এই রোগের কথা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকাতে উল্লেখ আছে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঐ সময় থেকেই ডেঙ্গুজ্বরের নজির আছে। প্রতি বছর বর্ষার পরেই এই রোগ দেখা যায় এবং কয়েক বছর অন্তর এর ব্যাপকতা (epidemic) লক্ষ্য করা গিয়েছে। সমীক্ষা করে দেখা যায় যে, পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে (tropical zone) অবস্থিত দেশগুলি ডেঙ্গু-কবলিত অঞ্চল রূপে গণ্য। এই রোগের বাহক হিসাবে তিন বা চারটি প্রজাতির মশাকে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ইডিস ইজিপ্টাই (Aedes aegypti) ও ইডিস এ্যালবোপিক্টাস-ই (Aedes albopictus) প্রধান। এইসব প্রজাতির মশা ডেঙ্গুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তপান করার সময়ে রক্তে অবস্থিত ডেঙ্গু-ভাইরাস গ্রহণ করে এবং ৭ থেকে ১২ দিন পর্যন্ত সময়ে মশার দেহে এদের বংশবৃদ্ধি হয়। ডেঙ্গু পূর্বে না-হওয়া ব্যক্তিকে এই ভাইরাসদুষ্ট মশা দংশন করে রোগসৃষ্টি করে থাকে। এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ডেঙ্গুরোগ সহজেই জনসাধারণের মধ্যে মশার মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকে। সুতরাং বর্ষাকালে যখনই মশার বংশবৃদ্ধি হয়, তখনই ডেঙ্গুরোগের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। ডেঙ্গুরোগ সংক্রমণকারী মশাগুলি শহরাঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়; তাই ডেঙ্গুরোগ প্রধাণতঃ শহরাঞ্চলেই সীমিত। বর্ষার পর বসতবাড়ির আশেপাশে জমা বদ্ধজলে এই মশা ডিম পাড়ে। টিনের পাত্র, কলসি, অব্যবহৃত চৌবাচ্চা প্রভৃতি যেকোন পাত্রে সঞ্চিত জলে এদের বংশবৃদ্ধি হয়। এছাড়া বাড়ির ভিতরেও ফুলদানিতে বেশ কয়েকদিন রাখা জলে অথবা জালের আলমারী বা খাটের পায়া, যা পিঁপড়ের উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অনেক সময়ে জলভর্তি কাঠের বাটির ওপর বসানো থাকে, সেইসব স্থানেও মশার

ডিম দেখা যায় এবং এইগুলিও ডেঙ্গুরোগ ছড়াতে সাহায্য করে।

আক্রান্ত হবার ৫ থেকে ৮ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু-জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শীতভাব সহ হঠাৎ প্রবল জ্বর ও তার সঙ্গে মাথা ব্যথা, গায়ে ব্যথা ও গাঁটে গাঁটে তীব্র বেদনা রোগীকে সাময়িকভাবে শয্যাশায়ী করে রাখে। এই জ্বর ও বেদনা ৪ থেকে ৬দিন পর্যন্ত থাকতে দেখা যায়। এছাড়া জ্বরের দু-একদিন পরেই রোগীর মুখে, গায়ে ও পিঠে লালচে বা গোলাপী রঙের ছোট ছোট দানার মতো দাগ (rash) দেখা যায়, যা দুদিন পর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর ঘাড়ের পাশে দু-একটি লসিকাগ্রন্থি (lymph gland) স্ফীত হয়ে উঠতেও দেখা যায়। সাধারণ রক্ত পরীক্ষায় শ্বেতকণিকা সমেত লিম্ফোসাইটের (lymphocyte) সংখ্যা সাময়িকভাবে হ্রাস পেতে পারে। কয়েকদিন পর রোগী আরোগ্যলাভ করলেও দুর্বলতা-বোধ কিছুদিন ধরেই থাকে। ডেঙ্গুরোগের এই সাবেকী লক্ষণগুলিকে সাবেকী ডেঙ্গুজ্বর (Classical Dengue) বলে। গত কয়েক দশক ধরে বেশকিছু ডেঙ্গু-কবলিত দেশে এই সাবেকী ডেঙ্গুজ্বর ছাড়াও বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এই জ্বরের সঙ্গে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখা গেছে এবং এই লক্ষণযুক্ত রোগকে রক্তক্ষরণী ডেঙ্গুজ্বর (Dengue Haemorrhagic Fever) নাম দেওয়া হয়েছে।

গত ১৯৯০খ্রীস্টাব্দে এই রক্তক্ষরণ-জনিত ডেঙ্গুজ্বর কলকাতায় দেখা দেয়। এর আগে ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম এই রোগ কলকাতায় দেখা যায়।[১] কলকাতা ও তৎসংলগ্ন হাওড়া শহরে ব্যাপকভাবে এই রক্তক্ষরণী ডেঙ্গুজ্বর শিশু থেকে শুরু করে বয়স্কদের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল; অবশ্য শিশু ও কমবয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই এর প্রকোপ ছিল বেশি। মৃত্যুহারও ছিল শতকরা তিন ভাগের ওপর। এরপর ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দেও বর্ষার ঠিক পরেই এই ধরনের রোগ কলকাতা শহরে দেখা দিয়েছিল। এর পরবর্তী বছরগুলিতে এই জাতীয় ডেঙ্গুজ্বরের ঘটনা ইতস্ততঃ ভাবে দেখা গেলেও ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের মতো ব্যাপকতা ছিল না। এবারের ডেঙ্গুজ্বরে যে রক্তক্ষরণ উপসর্গ ছিল তার ব্যাপকতা শিশু ও ছোটদের মধ্যেই অর্থাৎ ৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যেই ছিল সর্বাধিক।

প্রকৃতপক্ষে রক্তক্ষরণী ডেঙ্গুজ্বরের বিশ্বে প্রথম আত্ম প্রকাশ হয় ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে ফিলিপাইনস দ্বীপ-পুঞ্জে এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে থাইল্যান্ডে। এই দুটি দেশে রোগটি শুরু হবার পর প্রতি বছরই শতশত শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের আক্রান্ত হতে দেখা যায় এবং মৃত্যুহারও নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। প্রথমদিকে রোগটির সঠিক কারণ জানা না থাকায় এর নামকরণ হয় যথাক্রমে ফিলিপাইন হেমোরেজিক ফিভার (PHF) ও থাই হেমোরেজিক ফিভার (THF)। পরবর্তী কালে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, ভারতবর্ষ (কলকাতা ও দক্ষিণভারতের কয়েকটি স্থান), চীন (দক্ষিণাংশে) ও কিউবাতে ব্যাপকরূপে এবং বার্মা, শ্রীলঙ্কা ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইতস্ততঃ ভাবে এই রক্তক্ষরণী ডেঙ্গুজ্বরের কথা জানা যায়। এখন সর্বত্র এই রোগটিকে স্থানীয় নাম না করে শুধু রক্তক্ষরণী ডেঙ্গুজ্বর বা 'ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার' (Dengue Haemorrhagic Fever বা DHF) বলা হয়।

সাবেকী ডেঙ্গুজ্বর (Classical Dengue) ও রক্তক্ষরণী ডেঙ্গুজ্বর (DHF)—এই দুই শ্রেণীর রোগের মূল কারণ কিন্তু একই ডেঙ্গুভাইরাস। এখন প্রশ্ন এই যে, এতাবৎকাল ধরে জানা সাবেকী ডেঙ্গুজ্বরে হঠাৎ কয়েক দশক ধরে কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণের লক্ষণ দেখা দিল কেন? ডেঙ্গুজ্বরে রক্তপাতের রহস্য কি বিশেষ ধরনের ডেঙ্গুভাইরাসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত, না ডেঙ্গুরোগাক্রান্ত ব্যক্তিবিশেষের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কাছে এখনো অস্পষ্ট। রক্ত-ক্ষরণ লক্ষণযুক্ত রোগীর রক্ত ও বিভিন্ন ধরনের দেহকোষ পরীক্ষা করে এবং গবেষণাগারে রক্ষিত বিভিন্ন জীবজন্তুকে বিভিন্ন ডেঙ্গুভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করে ডেঙ্গুরোগের রক্তক্ষরণের কারণ সম্পর্কে

১ ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে উদ্বোধন-এ ১০৮১ বঙ্গাব্দের (১৯৭৪ খ্রীঃ) আশ্বিন সংখ্যায় পৃষ্ঠা ৪৩৫-৪৩৮ জলধিকুমার সরকারের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক

বিছু তথ্যের আভাস পাওয়া গিয়াছে। এই তথ্য-গুলির ভিত্তিতে জানা যায় যে, ভাইরাসের গঠনগত পার্থক্য না থাকলেও প্রকৃতিগত বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধক (immunological) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ডেঙ্গু ভাইরাসগুলিকে চারটি শ্রেণী বা টাইপে (ডেঙ্গু-টাইপ ১—৪) ভাগ করা হয়। প্রতিটি টাইপ দ্বারা রোগাক্রান্তের রোগলক্ষণ অভিন্ন হলেও রোগ আরোগ্যের পর দেহে টাইপভিত্তিক স্বতন্ত্র ধরনের অ্যান্টিবডি (antibody) তথা প্রতিরোধশক্তির সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে অপর কোন টাইপের ডেঙ্গু-ভাইরাস মশার দংশন মারফৎ দেহে প্রবেশ করলে আবার ডেঙ্গুরোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কারণ, পূর্বোক্ত টাইপের অ্যান্টিবডি অধুনা আক্রান্ত ডেঙ্গু-ভাইরাস টাইপের সঙ্গে আংশিকভাবে যুক্ত হলেও ভাইরাসগুলিকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে না। অপর-পক্ষে এই ভিন্ন টাইপধর্মী ভাইরাসের অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির যোগ অনেক সময়ে রক্তক্ষরণ সংক্রান্ত বিপদের সংকেত বহন করতে পারে। এই যোগ মিলনের ফলে দেহের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অবাঞ্ছিত যোগ রাসায়নিক তথা প্রতিরোধভিত্তিক (immuno-logical) বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়, বিশেষ করে রক্তবাহক সূক্ষ্মনালী (capillaries) ও রক্তের বিশেষ কয়েকটি উপাদানের মধ্যে। এই সূক্ষ্মনালীগুলির স্বাভাবিক জল-নিরোধক ক্ষমতা কমে যায় এবং রক্তের তরল পদার্থের সঙ্গে দ্রবীভূত লবণ (বিশেষ করে সোডিয়াম) ও লোহিত কণিকাগুলির নিষ্ক্রমণ ঘটে। এছাড়া রক্তে অবস্থিত অনুচক্রিকার (platelets) (যা আঘাতজনিত রক্তপাত স্বাভাবিক নিয়মে বন্ধ করতে সাহায্য করে) সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। সুতরাং রক্তনালী থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের উপাদানগুলি স্বাভাবিক নিয়মে জমাট বাঁধতে পারে না, যার ফলে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে—যথা, অন্ননালী থেকে (haemate-mesis), শ্বাসনালী থেকে (haemoptysis), মলের সঙ্গে (malena), নাসারন্ধ্র থেকে (epistaxis), প্রস্রাবনালীর মধ্যে (haematuria) ইত্যাদি। এই রক্তক্ষরণ মাঝে মাঝে হতে থাকে এবং অত্যধিক মাত্রায় হলে রোগীর অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে উঠে। অস্থিরভাব (restlessness), নাড়ির গতি দ্রুত ও ক্ষীণ এবং রক্তচাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এটাই রক্তক্ষরণী ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ। এই অবস্থা কয়েক ঘণ্টা থেকে দু-একদিন চলতে থাকলে রোগীর অবস্থা আরও সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছায়। রোগীর নাড়ির গতি অনুভূত হয় না ও রক্তচাপ মাপা যায় না, দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং রোগীকে ডাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাড়া পাওয়া যায় না। এই মৃতপ্রায় অবস্থার নামকরণ করা হয়েছে—ডেঙ্গু শক সিনড্রোম (Dengue Shock Syndrome or DSS)। রক্তক্ষরণ অবস্থায় বা শক অবস্থায় রোগীকে সত্বর হাসপাতালে পাঠিয়ে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা করালে মৃত্যু এড়ানো যেতে পারে। স্যালাইনের জল, প্লাজমা (রক্তের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ) সঞ্চালন ও অনেক সময়ে অধুনা ব্যবহৃত বিভিন্ন প্লাজমা প্রসারক (Plasma Expanders) পদার্থ ও রোগলক্ষণ অনুযায়ী বহু ধরনের জীবনদায়ী ঔষধ প্রয়োগ এবং বিরামহীন তদারকির (continuous monitoring) মাধ্যমে বহু রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। শিশুদের মধ্যেই আক্রান্তের হার সর্বাধিক, সেজন্য এই সকল রোগীর চিকিৎসাব্যবস্থায় আরও তৎপরতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

ডেঙ্গু ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট ঔষধ এখনো জানা নেই। রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণই একমাত্র উপায়। মশা-বাহিত রোগ বলেই মশার বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ইডিস মশা যেভাবে বংশবৃদ্ধি করে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন ডেঙ্গু-কবলিত দেশে 'ইডিস উচ্ছেদ অভিযানের' ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আজকাল মশা মারার জন্য বহু ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে; বাড়ির মধ্যে ও আশপাশে স্প্রে (spray) দ্বারা এবং খোলা মাঠে ফগিং (fogging) যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকায় মশা ও তার ডিম ধ্বংস করা হয়ে থাকে। বর্ষাকালে মশারি ব্যবহার, বিশেষ করে ছোটদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। রোগ নিবারণের ব্যাপারে জনচেতনা বৃদ্ধির ও বিভিন্ন সংবাদ ও জনসংযোগ মাধ্যমের সদ্ব্যবহার দরকার; এবিষয়ে রেডিও এবং

টেলিভিশনের বিশেষ ভূমিকা আছে।

ডেঙ্গুজ্বর সন্দেহে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে, চিকিৎসকের পরামর্শ অপরিহার্য। ডেঙ্গুজ্বরে রক্তক্ষরণের সামান্য ইঙ্গিত থাকলেই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের নজরে আনা এবং তাঁর পরামর্শমতো রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত। কোন রোগী 'শক' (shock) অবস্থায় পৌঁছাবার আগেই যথাযথ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

অধুনা ডেঙ্গুভাইরাস প্রতিরোধক টিকা বা ভ্যাকসিনের (vaccine) কথা বেশ কিছুদিন থেকেই চিন্তা করা হচ্ছে এবং এবিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। থাইল্যান্ডে ডেঙ্গুভাইরাসের ১, ২ এবং ৪—এই তিনটি টাইপের একটি টিকা বয়স্কদের প্রয়োগ করে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করা গেছে। টাইপ ৩-এর ডেঙ্গুভাইরাসটি এখনো টিকার উপযুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতির পথে। আশা করা যায় যে, অচিরেই চারটি টাইপের ডেঙ্গু-টিকা অন্যান্য ভাইরাস প্রতিরোধক টিকার সঙ্গে সংযোজিত হয়ে এই মারাত্মক রক্তক্ষরণী ডেঙ্গুজ্বর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

পরোক্ষ ধূমপানে কি হৃৎপিণ্ডের অসুখ হয় ?

হৃৎপিণ্ডের অসুখের একটি প্রধান কারণ হলো ধূমপান (active smoking বা প্রত্যক্ষ ধূমপান)। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইউনাইটেড স্টেট্স-এর সার্জন জেনারেল অপ্রত্যক্ষ ধূমপান (passive smoking বা অন্যের ধূমপানকালে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই ধোঁয়া শরীরে ঢোকা)-কে ফুসফুসে ক্যান্সারের একটি কারণ বলে চিহ্নিত করলেন এবং সেইসঙ্গে অপ্রত্যক্ষ ধূমপানের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ও রক্তনালীর অসুখের কি সম্পর্ক আছে সেবিষয়ে আরও গবেষণার আহ্বান জানালেন। সেই আহ্বানের ফলশ্রুতিতে গোষ্ঠীগতভাবে পরীক্ষা হয়েছিল ইউনাইটেড স্টেট্স, স্কটল্যান্ড এবং জাপানে। কতক্ষণ ধরে ধূমপানকারীর ধোঁয়াতে থাকতে হয়েছিল, তা অধিকাংশক্ষেত্রে জানা হয়েছিল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে; একটি ক্ষেত্রে ধোঁয়ার উপস্থিতি মাপা হয়েছিল। লোকেদের হৃৎপিণ্ডে করোনারি অসুখের সাক্ষ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং সেই অসুখের অন্য কোন কারণ থাকতে পারে কিনা তাও দেখা হয়েছিল।

গোষ্ঠীগতভাবে পরীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে, অপ্রত্যক্ষ ধূমপানের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের অসুখের সম্পর্ক আছে; অসুখ হবার ঝুঁকি বাড়ে ১·২ থেকে ২·৭ গুণ। তবে এই ফল পাওয়ার মধ্যে কতকগুলি সম্ভাবনা থাকতে পারে: হয়তো এটা ঘটনাচক্রে হয়েছে (by chance); পরীক্ষাকারীদের ফল প্রকাশ করার ঝোঁক থেকে হয়েছে (bias); এক-একবার এরকম হয়তো হতে পারে (casual); কিংবা সমীক্ষাকালে হিসাব মিশে যাওয়া ফলের জন্য (confounding)। এইসব সম্ভাবনা যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার করেও বলা যায় যে, হৃৎপিণ্ডের করোনারি অসুখের একটি কারণ হচ্ছে অপ্রত্যক্ষ ধূমপান। তবে আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে ব্যাপারটি দেখতে হবে, বাড়িতে ও কর্মস্থলে বর্তমানে ও পূর্বে ধূমপানের ধোঁয়ায় কতক্ষণ রোগী থাকে বা ছিল; এবং সেই সঙ্গে রোগীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাও দেখতে হবে। অপ্রত্যক্ষ ধূমপান বন্ধের পর করোনারি অসুখে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর অংশবিশেষ যাদের অকর্মণ্য হয়েছে (myocardial infarction), তাদের পরে কতটা উন্নতি হয় তার পরীক্ষাও করতে হবে।

জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই পরীক্ষা প্রয়োজনীয়, কারণ হৃৎপিণ্ডের করোনারি অসুখ শ্বাসযন্ত্রের অসুখের থেকে বেশি হয়। ইউনাইটেড স্টেট্স ও নিউজিল্যান্ডে অধিকাংশ অপ্রত্যক্ষ ধূমপানজনিত মৃত্যুর কারণ হৃৎপিণ্ডের অসুখ।

[British Medical Journal, 15 December, 1990, pp. 1343-1344]

রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশে চুর হয়ে আছি ঠাকুর। অহরহ দোলা দিয়ে যাচ্ছে। কোদলানো পথে গাড়ি করে গেলে যেমন হয়। লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, টাল খাচ্ছে, টোল খাচ্ছে। স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এ কেমন ভ্রমণ। কবে একটু মসৃণ পথে আমার হাওয়া-গাড়ি ফুরফুর করে চলবে? নাকি এইভাবেই সারাটা পথ চলবে?

"এ-প্রশ্ন তোমার একার নয়। সব সংসারীরই এক প্রশ্ন। ঢেউ আসছে, ঠেলে তুলছে, মারছে সপাটে আছাড়। তটভূমি, সোনালী বালি খামচে ধরার চেষ্টা করছে। আর জলে নয়। অপসৃয়মান বালি আবার হড়কে ফেলে দিচ্ছে লোনা জলে। নাকানি-চুবানি। অসহায়। একরাশ ডাবের খোলার মতো দুলতে দুলতে ভাসছে একা তুমি নও, আরও সবাই। এক একজনের এক এক নাম। এই তোমার ভবসংসার।

"যতক্ষণ নিজে হাঁচড়-পাঁচড় করবে ততক্ষণ মুক্তি নেই। কারণ, মুক্তি তোমার হাতে নেই। শরীরে নেই। সক্রিয় চেষ্টায় নেই। আছে তোমার মনে। আছে তোমার প্রশ্নে ও আমার উত্তরে। যেমন, আমিও জানি, 'প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগেই আছে, সূর্য দেখা যায় না।' এই তো সংসার। 'দুঃখের ভাগই বেশি।' কেন? সে দুঃখ তোমার নিজের তৈরি। তোমার মোহ। জেনে রাখো, কামকাঞ্চন-মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না।' এই মেঘমুক্তির উপায় কি? কোন্ বাতাসে এই মেঘ উড়ে যাবে? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

"অতি সহজ বিধান, আবার অতি কঠিন। কঠিনতমও বলা চলে। ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে? আসবে ধাক্কা খেতে খেতে। আহত ক্ষত বিক্ষত হতে হতে। তখন আপনিই মন বলবে—

'মন-মাঝি তোর বইঠা নেরে।
আমি আর বাইতে পারলাম না॥'

"অসহায়বোধ থেকেই আসে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা। যতক্ষণ ভোগ, যতক্ষণ কাম-কাঞ্চন, সংসারে আসক্তি, যতক্ষণ আস্বাদনের ইচ্ছা, আহা দেখি না একটু নেড়েচেড়ে, বিড়ালের আরশোলা ধরা, ততক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা। হবে না। সুতো—মনসুতো ঈশ্বর-ছুঁচে ঢুকবে না। কামনার ফেঁসো বেরিয়ে আছে। ভক্তি-লালায় মসৃণ করে নিতে হবে। সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্যে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়; যখন কাম-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায় তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। ভোগ না করলে ত্যাগ অনেকের হয় না।

"অনেক ছটফটানির পর হঠাৎ বিচার আসে। কি ভোগ সংসারে করবে? কাম-কাঞ্চন ভোগ? সে তো ক্ষণিক আনন্দ—এই আছে, এই নেই। আমি বললে হবে না, নিজে পরখ করে দেখ। মনে একটা খাতা খোলো। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বুকের মতো। একপাশে ডেবিট, আর একপাশে ক্রেডিট। যত বাতি গলে গেল, খেলা কি তত জমল? জ্বালা যত পেলে, আনন্দ কি সেই পরিমাণ হলো? বুঝতে পারছ না? তুমি অজ্ঞান। যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়। তাদের হাতে আতসকাচ তুলে দিয়ে লাভ কি। আতসকাচের ওপর সূর্যের কিরণ পড়লে কত জিনিস পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতসকাচ নিয়ে গেলে ওটি হয় না। ঘর ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। তোমার হাতে আমি আতসকাচ দিয়েছি। মনের চোরকুঠরি ছেড়ে বেরিয়ে এস। কাম-কাঞ্চনের খুপরি পরিত্যাগ কর।

"জ্ঞানের পৃথিবী বাইরে নেই। জ্ঞান দিয়ে পৃথিবী সাজাও। বাইরে থেকে ভিতরে নয়। ভিতর থেকে বাইরে যাও। নিশ্চেষ্ট হয়ে সমর্পণ কর। সে কি রকম? তাহলে শোন:

"একটি পাখি জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখির চটকা ভাঙল।

"ছিলে মায়ের কোলে, পিতার নিরাপদ আশ্রয়ে, জননী জাহ্নবীতে, পিতার অর্ণবপোতে, পৌগণ্ড-লীলায়। হঠাৎ দেখলে কেউ নেই। সময়ের স্রোতে ভেসে গেছ মহাসমুদ্রে। তখন পাখির চটকা ভাঙল, সে দেখলে চতুর্দিকে কূলকিনারা নেই। তখন ডাঙায় ফিরে যাবার জন্যে উত্তরদিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল, তবু কূলকিনারা দেখতে পেল না। তখন কি করে, ফিরে এসে মাস্তুলে আবার বসল।

"পাখি পূবে গেল, পশ্চিমে গেল, পাখি দক্ষিণে গেল। অকূল পাথার! "যখন দেখলে কোথাও কূলকিনারা নেই, তখন সেই যে মাস্তুলের ওপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল।

"শরণাগত। এই শরণাগতি এলে ভবার্ণব হয়ে যাবে কৃপাসমুদ্রে। সংসার-পোত হয়ে যাবে নির্ভর, নির্ভার তরণী। তখন মনে আর কোনও ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোন চেষ্টাও নেই।"

এই তো আমার রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুল ॥

বিদায় 'আলেখ্য' ! 'পুনরাগমনায় চ'

দিলীপকুমার দত্ত

আলেখ্য (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)। সম্পাদক : ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল। ৫০ সন্তোষপুর এ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০৭৫

ঠিক 'বিনামেঘে বজ্রপাত' হয়তো বলা যাবে না, কেননা কালো ঈশানী মেঘের পূর্বাভাস সম্পাদকীয় বার্তায় পূর্বাহ্নেই গোচর হয়েছিল। তবু আজকের রঙবাহারী চটকদারি সাহিত্য-পসরার বাণিজ্যিক যুগে যাঁরা যথার্থই রসগভীর সৃজন ও মননধর্মী সাহিত্যকে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে একান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ জিজ্ঞাসার ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'আলেখ্য'র বিদায়। আন্তরিক শুভকামনার সঙ্গে তাঁরা তাই একান্ত আশা পোষণ করেছিলেন হয়তো মেঘ কেটে গি'য় বিপদ থেকে মুক্ত হবে যথার্থই উচ্চমানের এই পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ। কিন্তু তাঁদের অন্তর বিদীর্ণ করে 'আলেখ্য'র ২০শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৯৭) সম্পাদকের কলমে ঘোষিত হলো :

"'আলেখ্য' এবার পাঠকদের কাছে বিদায় নিচ্ছে। এসংখ্যাই 'আলেখ্য'র বিদায়ী সংখ্যা। বিশ বছর একাদিক্রমে চলার পর কোন পত্রিকা যদি ক্লান্তি বোধ করে ও বলে যে আর চলার শক্তি নাই, আশা করি পাঠকসমাজ তার এই অক্ষমতা মার্জনা করবেন। ...ক্লান্তির অপরাধ নাই।"

না, ক্লান্তি স্বাভাবিক। ক্লান্ত দুর্বল শরীরকে আবার প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে ওঠার জন্য বিশ্রামের সুযোগ করে দিতেই হয়। কিন্তু বিশ্রাম যদি চির-বিদায় হয়ে দাঁড়ায় তখন প্রিয়জনদের হতাশা কতখানি হয় তা-ও অনুমেয়।

আজ থেকে দীর্ঘ দুটি দশক আগে খ্যাত-অখ্যাত অসংখ্য পত্র-পত্রিকার ভিড়ে 'আলেখ্য' অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় দ্বৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে অল্পসময়ের মধ্যেই উঠে এসেছিল প্রথম সারিতে। স্বপ্ন ছিল মাসিক করে তোলার, কিন্তু সম্পূর্ণ একক প্রয়াসের সীমিত সঙ্গতি হেতু সে-স্বপ্নকে তো বলি দিতেই হলো, উপরন্তু এর প্রকাশ আরও বিলম্বিত করে সম্পাদক বাধ্য হলেন ত্রৈমাসিক করে তুলতে। আর সেই হিসাবেই আজ 'আলেখ্য' তার কুড়িটি বসন্তের শেষ প্রান্তে এসে তার যাত্রা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে।

'আলেখ্য'র আর্থিক সঙ্গতি সীমিত সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষয়-গৌরবে এর সমতুল পত্রিকা আজকের সাহিত্যাঙ্গনে সত্যিই দুর্লভ। লঘু উত্তেজক রচনার অসারচিত্ত বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির বাসনাকে মনের কোণে বিন্দুমাত্র স্থান না দিয়ে 'আলেখ্য' সীমিত সংখ্যক হলেও সুরুচিশীল পাঠকসমাজের আত্মার ক্ষুধায় এই দীর্ঘ কুড়িটা বছর রসের যোগান দিয়ে এসেছে। সাহিত্যকে কেন্দ্রমূল করে 'আলেখ্য' ছড়িয়ে দিয়েছে একদিকে বৈচিত্র্যের, অপরদিকে গভীরতার ভাণ্ডার। সাহিত্যের সঙ্গে দর্শন, শিল্প, সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাষ্ট্রচিন্তা, শিক্ষা, ইতিহাস, শাস্ত্রালোচনা, কৃষি-বিজ্ঞান ইত্যাদির সমন্বয়ে 'আলেখ্য' সত্যিই ছিল সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির এক পরিপূর্ণ ধারক। এর লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে একদিকে যেমন দেখি প্রমথনাথ বিশী, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, নারায়ণ চৌধুরী, হরপ্রসাদ মিত্র, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ইত্যাদি বহু খ্যাতনামা প্রাবন্ধিককে, তেমনই এই পত্রিকায় লেখা শুরু করে মননশীল লেখকসমাজের খ্যাতি কুড়িয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এমন লেখকের সংখ্যাও কম নয়। গত এক দশকে প্রকাশিত বহু উচ্চপ্রশংসিত সমালোচনা-গ্রন্থের প্রাথমিক প্রকাশের বাহক ছিল এই 'আলেখ্য'ই। এতে ধারাবাহিকভাবে

প্রকাশিত হয়েছে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'বঙ্কিমচন্দ্র: প্রাচ্যবিদ্যা ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত', নারায়ণ চৌধুরীর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র', চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত বিভূতিভূষণ', দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের 'মধুসূদন প্রতিভার মূল্যায়ন', বিশ্বপতি চৌধুরীর 'শরৎ প্রদক্ষিণ', ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বামী বিবেকানন্দ * সময় ও ইতিহাস' এবং উপন্যাস 'অন্ন-নাশ', স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 'ধর্ম সাহিত্য ও সংস্কৃতি', পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের 'শিল্প ও সংস্কৃতি', গৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব' ইত্যাদি বহু মূল্যবান রচনার সম্ভার।

'আলেখ্য'-তে প্রকাশিত অন্যান্য অজস্র মূল্যবান প্রবন্ধমালার অতি সামান্য অংশের উল্লেখ করতে গেলেও এই প্রতিবেদন সুদীর্ঘ হয়ে পড়বে। তবু কয়েকটির উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন অবনীন্দ্র-নাথ সম্পর্কে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ', প্রভাসচন্দ্র চৌধুরীর 'অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব' ও 'ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ ও অবনীন্দ্রনাথ', শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে হরপ্রসাদ মিত্রের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রসঙ্গ', নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিতের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও নবজাগরণ', 'শ্রীরামকৃষ্ণের সুখদুঃখ', কেশব সেন সম্পর্কে মনোজ্ঞ রচনা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সমাজচিন্তা', রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পরিচিত বিষয় ছাড়াও ভিন্ন স্বাদের নানা রচনা, যেমন—আনন্দগোপাল ঘোষের 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কোচবিহারের রাজপরিবার', অরবিন্দ সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের গাছ-পালা', সোমদেব শর্মার 'সংগ্রামের সাথী রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিও ছিল এককথায় অসাধারণ।

ইতিহাসের বিষয় নিয়েও যে মনোরম প্রবন্ধমালা উপহার দেওয়া যায়, 'আলেখ্য'র পাতায় তার নজির রেখেছেন পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য তাঁর 'ঔরঙ্গজেবের পুনরুত্থান', 'দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ', 'কোহিনুর কাহিনী' ইত্যাদি নানা রচনায়। অনুরূপভাবে ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বৈদ্যনাথ মুখো-পাধ্যায়ের 'বেদান্তদর্শন: পাশ্চাত্যদর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে', 'বিজ্ঞান ও ধর্ম', 'বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রামন', নারায়ণ চৌধুরীর 'সাহিত্য বনাম বিজ্ঞান-চেতনা' কিংবা সমালোচক মোহিতলাল সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের 'রবীন্দ্রসমালোচনায় মোহিত-লাল' প্রভৃতি বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। তীর্থরেণু দাসের 'বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা', 'শান্তি চাই', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'অশান্ত পাঞ্জাব', 'স্বাধীনতাসংগ্রামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি', 'লালন ফকির', নিবারণচন্দ্র প্রতিহারের 'সন্ত্রাসবাদের ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যতের সন্ত্রাসবাদ', প্রফুল্লচন্দ্র সেনের 'নির্দল গণতন্ত্র ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ' প্রভৃতি রচনাগুলিও প্রাসঙ্গিকতার বিচারে খুবই মূল্যবান।

প্রচলিত ধারার বাইরেও 'আলেখ্য' তার পাতায় নানা কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে তার উন্নত মানকে সর্বদা বজায় রেখেছে। যেমন রামজীবন ভট্টাচার্যের 'কালিদাস-সাহিত্যে বনৌষধি ও ভেষজপ্রসঙ্গ', হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'বাঙালীর সেক্সপীয়র চর্চা', রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'আচার্য সুনীতিকুমারের বিশ্বসাহিত্যচিন্তা', জগদীশনারায়ণ সরকারের 'আচার্য যদুনাথের ইতিহাসদর্শন' ইত্যাদি। 'আলেখ্য' এক মূল্যবান সঙ্কলনে পরিণত হয়েছে তার ১৮শ বর্ষের (১৯৮৮) চারটি সংখ্যা মিলে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্ধশততম জন্ম-জয়ন্তী স্মারকপত্র হিসাবে।

'আলেখ্য'র বিভিন্ন সংখ্যায় স্বদেশ ও বিদেশের নানা বরণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণী আলোক-পাত, নানা সুনির্বাচিত অনুবাদকর্ম, সম্পাদকীয়, সমাজ-সাহিত্যবিচিন্তা, বিভিন্ন সংখ্যায় সুবিশ্লেষণী অন্তরঙ্গ রচনা 'পঞ্চভূতের আসর'; এছাড়া রম্যরচনা, গল্প, কবিতায় 'আলেখ্য' ছিল বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান প্রবাহের এক মুখ্য অবলম্বন। অতিশয়োক্তি মনে হলেও একথা সত্য—বিশেষ করে যাঁরা পত্রিকাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে ছিলেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর মতোই 'আলেখ্য' ছিল অজস্র বৈচিত্র্যে পূর্ণ। 'আলেখ্য'র সুযোগ্য সম্পাদক সাম্প্রতিককালের সর্ববিষয়ে দুর্মূল্যের বাজারে পত্রিকার উচ্চমান বজায় রাখতে পত্রিকার পাতায় অক্লান্ত উৎসাহ ও পরিশ্রমে বহুমুখী রচনা পাঠকবর্গকে উপহার দেবার চেষ্টা করেছেন।

এজন্য অজস্র সাধুবাদ ও সৎ সাহিত্য-পাঠকের কৃতজ্ঞতা 'আলেখ্য'র সম্পাদকের অবশ্যই প্রাপ্য।

"'আলেখ্য' তার বিশবছরের প্রকাশনায় প্রায়শ আমাদের উল্লেখযোগ্য এবং সংগ্রহযোগ্য প্রবন্ধ উপহার দিয়েছে।"—'আলেখ্য'র বিদায়ী ঘোষণায় তাকে এই যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকা তার রবিবাসরীয় 'টুকরো খবর'-এ (৯. ৬. ৯১)। সাহিত্য পত্রিকার দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনের গুরুত্ব স্বীকার্য, 'আলেখ্য' সে-কাজটি করে উঠতে পারেনি। একটি পত্রিকার উন্নতমান এবং আদর্শনিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখাও যে একটি বিরল কৃতিত্ব, তা-ও অনস্বীকার্য। 'আলেখ্য' সেই গৌরব ও কৃতিত্বেরও বিরল অধিকারী।

শুধু 'আলেখ্য'-প্রেমীদের কাছেই নয়, সুস্থ সংস্কৃতি-প্রেমিক সকলের কাছেই আবেদন—তাঁদের সকলের মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে মুক্ত-হস্তের সহায়তায় 'আলেখ্য'র ব্যাহত গতি আবার যেন সজীব হয়ে ওঠে। 'আলেখ্য'র একজন গুণগ্রাহী বলছিলেন: "অনেক খ্যাতনামা বাঙলা পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার পর নতুন উদ্যমে আবার প্রকাশিত হয়েছে। 'আলেখ্য'রও যেন তাই হয়।" কামনা করি একথা আমাদের সকলেরই যেন প্রাণের কথা হয়। বিদায় 'আলেখ্য'। 'পুনরাগমনায় চ'।

একটি আলাদা ধরনের কাগজ

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)। সম্পাদক: ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়। সি. ডি. ৩২৭, সল্টলেক সিটি। কলকাতা-৬৪।

বহু পত্র-পত্রিকার ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়ে 'স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' পত্রিকাটি। এখনকার অধিকাংশ পত্রিকাই বাণিজ্যিক স্বার্থে পরিচালিত। তাই রং-চং সেখানে বেশি। মনভোলানোর আয়োজনও অগণ্য। 'স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' একেবারেই বিপরীত মেরুর একটি কাগজ। সাদা-মাটা প্রচ্ছদ, রং বলতে শুধু সবুজ। সবুজ একটা মস্ত বড় গাছ। তার ডালে দোলনা বেঁধে মহানন্দে দুলছে দুটি শিশু। চোখ-ধাঁধানো নয় কোন অর্থেই। তবু চোখে পড়ে। এখানে স্বাস্থ্য সম্পর্কে মৌলিক কথাগুলি বলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। নানা রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যগুলি জানানো হয়। পরিবেশ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলবার বিশেষ প্রয়াস আছে এঁদের। মানুষ একটি প্রাকৃতিক সত্তা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মাতৃ-সম্পর্ক এবং ধাত্রী-সম্পর্ক। কিন্তু আজ মানুষ সেটিকে ক্রমেই শত্রু-সম্পর্কে রূপান্তরিত করছে। মানুষ ও প্রকৃতির ভারসাম্য আজ বিপন্ন। প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর বিশুদ্ধ বায়ু কমছে। প্রাণের শ্বাসরোধ হচ্ছে। তাই নানা দিকে আজকাল প্রায়ই আর্তনাদ শোনা যায়—'পৃথিবী বাঁচাও'। কার হাত থেকে বাঁচাতে হবে পৃথিবীকে? কে তার প্রধান শত্রু? শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্য এই যে, প্রধান শত্রু মানুষ নিজেই। পৃথিবীর প্রাণের সবচেয়ে বড় ঘাতক মানুষ। আজকের মানুষের সভ্যতা লোভী ও ভোগবাদী। তার নানা কিছুর কলকারখানা চাই। চাই পারমাণবিক চুল্লী। যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণাগার চাই। এইসব জায়গা থেকে বেরোয় দূষিত ময়লা জল, ধোঁয়া, গ্যাস। অপরিমিত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে মাটি, শস্য, খাদ্য। ভূগর্ভের জল মানুষ শোষণ করে নিচ্ছে নিঃশেষে। নির্বিচারে ধ্বংস করছে বনজঙ্গল, জলাভূমি। শুষ্ক জিহ্বা নিয়ে মরুভূমি এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে। ভূমিক্ষয় ঘটছে ব্যাপকভাবে। অবাধ প্রত্যক্ষ সূর্য-কিরণের প্রখরতা থেকে রক্ষা করবার জন্য ওজনের (Ozone) যে প্রাকৃতিক বেষ্টনী বা ঘের আছে, সেই রক্ষামূলক ঘেরকে ভেঙেচুরে দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতিজগতের স্বাভাবিক প্রাণ-লালনী শক্তিকে নষ্ট করা মানে আত্মহত্যা করা। মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষ প্রতিনিয়ত সেই আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করে চলেছে। নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করছে।

মনে হতে পারে, এর জন্যে দায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অথবা এগুলির সাহায্য নিচ্ছে শিল্প-পতিরা। হয়তো এটা সত্য। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য হচ্ছে, এ-সবই করছে মানুষ। আমরা সবাই তাই

এব্যাপারে দায়ী। আমরাই এসব করছি, করতে দিচ্ছি। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমরা এর মধ্যে আছি। আমাদের লোভ আছে। যেকোন মূল্যে সুখ-ভোগের আগ্রহ আছে। এর কিছু গুনাগারও এখন আমাদের দিতে হচ্ছে। আরও দিতে হবে সতর্ক না হলে। শরীরে ও মনে ক্ষয়ের ঘুণপোকা ধীরে ধীরে কাজ করছে প্রতিটি নিশ্বাসে, অন্নের প্রতিটি গ্রাসে। আপাতসুখের সন্ধানে আমরা আসল সুখ হারাচ্ছি। আয়ু কমছে, রোগক্ষয় বাড়ছে। প্রতিটি আপাতসুখের জন্যে মস্ত মূল্য দিতে হচ্ছে আমাদের, আরও হবে, যদি না বদলাই আমরা।

কী বদলাতে হবে আমাদের? বদলাতে হবে আমাদের স্বভাব, আমাদের জীবনাদর্শ, জীবনের আচরণ। মনে রাখতে হবে আমরা প্রকৃতির সন্তান, মানুষ প্রাকৃতিক সত্তা। তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে আমাদের চলে না। একটা মাত্রা পর্যন্ত হয়তো প্রকৃতি কিছুটা ক্ষমা করে। মাত্রা ছাড়ালে ক্ষমা নেই। প্রকৃতি থেকে আমরা শক্তি পাই। সেই শক্তি ব্যবহার করি, খরচ করি। প্রাকৃতিক ঋতুচক্রের পথে ব্যয়িত শক্তি প্রকৃতিতে পুনর্নবীকৃত হয়। এই ছন্দের সঙ্গে আমাদের চলার ছন্দ মেলাতে হবে। সহজ-সরল জীবন চাই। প্রকৃতিসম্মত জীবন কাম্য। শৃঙ্খলাবিহীন যাত্রার সর্বতোভাবে রাশ টানা দরকার।

এই বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে চান 'স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' পত্রিকাটি। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটি তিন বছর ধরে চলছে। প্রতিটি সংখ্যাতেই নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখা থাকে। তার বৈচিত্র্যের মধ্যেও মূল সুর একটা—'পৃথিবী বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। এই পত্রিকা পরিবেশ সম্পর্কিত চেতনাবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বোধ বাড়াতে পত্রিকাটি আগ্রহী। শুধু লেখা নয়, সাংগঠনিক উদ্যোগে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাধ্য-মতো কিছু কাজও করতে চান তাঁরা। ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সামাজিক মত যাঁর যেমনই থাক, তাঁরা তাঁদের সেই মত বজায় রেখে এই কাজগুলি করতে পারবেন। কারণ, একাজগুলি কোন বিশেষ ধর্মের বা বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, কাজগুলি মানুষের —সকল মানুষের।

পত্রিকাটি বিষয়ের দিক থেকে বিশিষ্ট। কিন্তু ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে সর্বজনবোধ্য। অর্থাৎ বিশিষ্ট বিষয়ের কাগজ হলেও এটি বিশেষজ্ঞদের কাগজ নয়, সর্বসাধারণের কাগজ। সাধারণের আগ্রহও জাগণার কথা এই কাগজে। পৃথিবীর সব মানুষই বাঁচতে চায়। এ তো আমাদের নিজেদেরই বাঁচানো। আত্মরক্ষার কথা, এর বিরুদ্ধতা কে করবে? আত্মহনন কে চায়? সোজা সত্যি কথা। কিন্তু আজকের জীবন এত সরল নয়। আজকের বহু মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থে বন্ধ, তাৎক্ষণিক স্বার্থে অন্ধ। বৃহত্তর স্বার্থ, ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত স্বার্থ অনেকে দেখতে পায় না এবং দেখতেও চায় না। তাছাড়া অনেক মানুষ অনেক বিষয়ে অজ্ঞ বা অচেতন। এখানেই এই কাগজটির কাজ। বৃহৎ দৃষ্টিতে, ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত দৃষ্টিতে এঁরা সমস্যাগুলিকে দেখতে চান, মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলিত ক্ষেত্রে বাঁচার পথ খুঁজতে চান। তাঁদের এই শুভ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

উল্লেখযোগ্য মুখপত্র

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

দিব্যায়ন (বার্ষিক মুখপত্র)। সম্পাদনা: হর্ষ দত্ত। যুগ্ম সম্পাদক: কৌস্তুভ গুপ্ত। রহড়া (উত্তর ২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম প্রাক্তন ছাত্র-সংসদ, চতুর্থ বর্ষ সংখ্যা, ১৯৯১।

লেখকসূচীতে রয়েছেন স্বামী রমানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, হর্ষ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌতম রায় প্রমুখ। কয়েকটি লেখা বেশ ভাল, চিন্তার খোরাক জোগায়। সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'মা আমাদের মানুষ কর' সুলিখিত। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজীর আশীর্বাণী সংখ্যাটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররা কয়েকবছর ধরে একটি পত্রিকা চালিয়ে যাচ্ছেন—এই সংবাদ হয়তো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রদের উৎসাহিত করবে। অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের আরও কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা জানি, যেখানকার প্রাক্তন ছাত্ররা এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও
রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ছাত্র-কৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নারায়ণপুর (বস্তার, মধ্যপ্রদেশ) পরিচালিত বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রগণ বস্তার বিভাগের বোর্ড পরিচালিত ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল করেছে। পঞ্চম শ্রেণীর মোট ১৯জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল এবং তাদের সকলেই উচ্চ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ৯ম থেকে ১৫শ, ১৭শ, ২০শ ও ২৪শ স্থান তারাই অধিকার করেছে। তার মধ্যে দুজন করে ছাত্র লাভ করেছে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান।

৮ম শ্রেণীর মোট ৭জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্থান সহ সকলেই উচ্চ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার অবুঝমাড় পার্বত্য অঞ্চলের ৩৫জন উপজাতি ছাত্র নিয়ে এই বিদ্যালয় ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৬০। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৪০। আরও উল্লেখ্য যে, অবুঝমাড় পার্বত্য অঞ্চলটি ভারতের সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির অন্যতম। এবারের এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ উভয় শ্রেণীর মোট ২৬জন ছাত্রের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। শুধু পরীক্ষার ফলাফলেই নয়, বর্তমানে বিভিন্ন খেলাধুলা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সাধনশিক্ষা, টাইপ, মুদ্রণ, কাঠের কাজ, মৌমাছি-পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গোটা বস্তার অঞ্চলে বিদ্যালয় 'শ্রেষ্ঠ স্কুল-ব্যাণ্ড'-এর স্বীকৃতি পেয়েছে।

ত্রাণ

বাংলাদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বরিশাল জেলায় ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩১০৪টি পরিবারকে ৭৩৫৬ কিলোঃ চাল, ১৭৭৪ কিলোঃ ডাল, ৩১০ কিলোঃ চিঁড়ে, ৪৩০ কিলোঃ গুড়, ৬২৩৫টি বিভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ৪১১টি পলিথিনের সীট পুনরায় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম জেলার তিনটি উপজেলায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধপত্রাদি দেওয়া হয়েছে। ত্রাণকার্য বৃদ্ধি করার জন্য আরও ১০০০ লুঙ্গি বেলুড় মঠ থেকে পাঠানো হয়েছে।

অসম বন্যাত্রাণ

শিলচর আশ্রমের মাধ্যমে কাছাড় জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৬টি গ্রামের ২০৪১টি পরিবারকে ১৮৪৬টি শাড়ি, ১৮৫৫টি ধুতি, ২৬৬৫ পুরনো কাপড়-চোপড় এবং ৩২৫ কিলোঃ শিশুখাদ্য দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ

গত ২৬ জুন বিশাখাপত্তনম জেলার ইলামঞ্চিলি মণ্ডলের লাক্কাভরম গ্রামে ৩৪টি নতুন বাড়ির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের মুখ্য রাজস্বসচিব কে. এস. আর. মূর্তি। গ্রামটির নতুন নাম দেওয়া হয়েছে সারদাপুরম।

গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের লক্ষ্মীপুরম ও চন্দ্রমৌলিপুরমে দুটি আশ্রয়গৃহ-সহ-সমাজগৃহ শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। মুক্তেশ্বরপুরম ও কোঠাপালেম-এ দুটি আশ্রয়গৃহ-সহ-সমাজগৃহের নির্মাণকার্য ও একটি রামালয়মের পুনর্নির্মাণ-কার্য চলছে।

গুজরাট

ভাবনগর জেলার গিরিধর তালুকের ভামরিয়া গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের জন্য গৃহ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। গত ২৯ জুন এই গৃহপ্রকল্পের উদ্বোধন করেন গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গণেন্দ্রনারায়ণ রায়। গ্রামটির নতুন নাম হয়েছে রামকৃষ্ণনগর।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো)ঃ জুন মাসের প্রতি বুধবার এবং প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি শনিবার শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা করেছেন। ২২ জুন সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়েছে। ওয়েবস্টার স্ট্রীটে অবস্থিত এই বেদান্ত সোসাইটির পুরনো মন্দিরে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ বেদান্ত-বিষয়ক ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটনঃ গত ২ ও ৯ জুন রবিবার রাজযোগের ওপর এবং ৩০ জুন তন্ত্রশাস্ত্রের ওপর ভাষণ দিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ১৬ জুন শ্রীশ্রীমায়ের ওপর ভাষণ দিয়েছেন স্যাক্রামেন্টো আশ্রমের স্বামী প্রপন্নানন্দ। তাছাড়া ৪ ও ১৮ জুন মঙ্গলবার 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ১৫ ও ১৬ জুন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে। ২৯ জুন স্বামী ভাস্করানন্দ যুবক-যুবতীদের জন্য একটি বেদান্ত-বিষয়ক ক্লাস নিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্কঃ জুন মাসের প্রতি রবিবার ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার যথাক্রমে 'বিবেকচূড়ামণি' ও 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টোঃ গত জুন মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী গণেশানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বুধবারগুলিতে 'বিবেকচূড়ামণি' ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের ওপর ক্লাস নিয়েছেন যথাক্রমে স্বামী প্রপন্নানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং প্রতি শনিবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ক্লাস হয়েছে। তাছাড়া ৮ জুন সন্ধ্যায় হাওয়াই-এর 'জয় মা মিউজিক্যাল গ্রুপ' কর্তৃক একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা)ঃ গত ৯, ১৬ ও ২৩ জুন রবিবারগুলিতে যথাক্রমে রাজযোগ, শঙ্করাচার্য এবং ভগবদ্গীতার ওপর আলোচনা, ৮ ও ১৫ জুন শনিবার জ্ঞানযোগ ও 'রামকৃষ্ণ দ্য গ্রেট মাস্টার'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী প্রমথানন্দ। ২৯ জুন থেকে ১ জুলাই এই বেদান্ত সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় অন্টারিও-তে তিনদিনের এক সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সাধন-শিবির পরিচালনা করেন স্বামী প্রমথানন্দ। ঐ শিবিরে জপ-ধ্যানাদির সঙ্গে নানা শাস্ত্রালোচনাও হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী বৈদ্যানন্দ (কিশোরী) গত ২৬ জুন মস্তিষ্কে রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে কলকাতার ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল উনসত্তর বছর।

স্বামী বৈদ্যানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেওঘর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। দেওঘর আশ্রমের পর তিনি ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেলুড় মঠের কর্মী ছিলেন। তারপর কয়েকমাস তিনি বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমে ছিলেন। গত একবছর ধরে তিনি বারাসত আশ্রমে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। পরিশ্রমী এই সাধুর জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও কঠোর।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনাঃ সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার কথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ লীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ পাঠচক্র (রামকৃষ্ণ আশ্রম, পান্ডু, অসম) গত ১৬ ফেব্রুয়ারি এবং ৮, ৯ ও ১০ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি বিশেষ পূজা, চন্ডীপাঠ, ভজন, সঙ্গীতালেখ্য, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন প্রায় পাঁচহাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। ৮, ৯ ও ১০ মার্চ বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে আশ্রম পরিচালন সমিতির সভাপতি এস. সুব্রহ্মণ্যম, অধ্যক্ষ কে. ডি. ক্রোড়ী এবং স্বামী স্মরণানন্দ। সভাগুলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্বামী রঘুনাথানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ, কালীপদ গাঙ্গুলী, মন্মথ ডেকা প্রমুখ। ৮ ও ৯ মার্চ সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন কলকাতার 'সুরপীঠ'-এর অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ।

বেড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ১৮ ও ১৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। উৎসবের প্রথমদিন প্রায় তিন-হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে স্বামী সংপ্রভানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্ম-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের রাসবিহারী গায়েন ও অধ্যাপক অরুপরঞ্জন প্রধান। সভার শেষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উৎসবের দ্বিতীয়দিন নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপর এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্ষিতীশ-চন্দ্র মন্ডল এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বিপুলকুমার রায়। এদিন এক চিকিৎসা-শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছিল। দন্ত ও চক্ষুরোগ সহ মোট ১২৬৫জন রোগীকে বিনামূল্যে পরীক্ষা ও ঔষধ দেওয়া হয়। দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ রাধাপদ মন্ডল, ডাঃ তরুণ মল্লিক (সাধারণ) এবং এ. সি. এম. টি. আই.-এর চিকিৎসকবৃন্দ চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করেন। এদিন উপস্থিত সকলকে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রাপ্ত 'সবার স্বামীজী' পুস্তকটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। উৎসবের উভয়দিনই নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ২ ও ৩ মার্চ **প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, পুরুনিয়া (বাঁকুড়া)** শাখায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিগীতি, যুবসম্মেলন ও ধর্মসভার মাধ্যমে পালন করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, চকমাণিক (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) গত ৩১ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে রক্তদান-শিবির, ভক্তসম্মেলন, ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। এদিন প্রচুর ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সকাল ৯টায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এক রক্তদান-শিবির খোলা হয়। শিবিরে ১৩জন মহিলা ও ৪জন প্রতিবন্ধী সহ মোট ৭৫জন রক্ত দান করে। ভক্তসম্মেলনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন ও তাঁদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। বিকালে স্বামী নির্জরানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী গোপেশানন্দ, স্বামী চেতসানন্দ, স্বামী শিবনাথানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাধারমণ দেব প্রমুখ।

কলাবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের (মেদিনীপুর) পরিচালনায় গত ২৯ মার্চ '৯১ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৫৬তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিনামূল্যে একটি চিকিৎসা-শিবির খোলা হয়। এই চিকিৎসা-শিবিরে স্থানীয় ৯৭জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। তাছাড়া বৈকালিক এক ধর্ম-

সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভবেশ্বরানন্দ এবং প্রধান অতিথি ও বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী একরূপানন্দ ও অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম। সভায় প্রায় একহাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ধর্মসভার শেষে ২৩জন দুঃস্থ পুরুষ ও মহিলাকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। তাছাড়া এই উপলক্ষে প্রায় পাঁচশতাধিক ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ২৯ মার্চ, শুক্রবার সাহাপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব কমিটির পরিচালনায় 'শিবধাম' মন্দিরে প্রভাতফেরী, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, ধর্ম-সভা, গীতি-আলেখ্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন প্রায় একহাজার ভক্তকে বসিয়ে ভোগ প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গোপেশানন্দ। ঐদিন স্বামী গোপেশানন্দ শিবধামে একটি ধর্মীয় পাঠাগারের উদ্বোধন করেন।

বিজয়গড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (যাদবপুর): শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভাবির্ভাব স্মরণে বিগত ৩০ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত সেবাশ্রমে বার্ষিক সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ৩০ মার্চ সকালে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ ঐ অঞ্চল পরিক্রমা করা হয়। বিকালে দুঃস্থ ব্যক্তিদের নিকট সেবাশ্রমের পক্ষে বস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ৩১ মার্চ, রবিবার সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজা, হোম এবং পূজান্তে দুইসহস্রাধিক নরনারীকে বসিয়ে এবং হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবের তিনদিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভাগুলিতে আলোচনা করেন স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, স্বামী ভৈরবানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

উৎসবের আনন্দানুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল সেবাশ্রমের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত শ্রুতিনাটক ও গীতি-আলেখ্য এবং আমন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি কর্তৃক নিবেদিত গীতিনাট্যাভিনয়, কীর্তনানুষ্ঠান ও ভক্তি-গীতিসমূহ।

তেঁতুলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (মুর্শিদাবাদ) গত ১৪ ও ১৫ এপ্রিল, '৯১ বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, ভজন, শোভাযাত্রা, ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতা, রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। ঐ দুদিন বিকালের ধর্মসভায় স্বামী ভৈরবানন্দ, স্বামী দেবরাজানন্দ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও সমীরকুমার ঘোষ ভাষণ দেন। ভজন পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল, করুণাসিন্ধু মণ্ডল ও চলোর্মি বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মসভায় তিনহাজারেরও বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম জন্মতিথি-উৎসব দাঁতন (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়েছে। সকালে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ প্রভাতফেরী দাঁতন শহর পরিক্রমা করে। মেদিনীপুর, গড়বেতা ও কামারপুকুর আশ্রম থেকে আগত সন্ন্যাসিগণ এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। মধ্যাহ্নে প্রচুর ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। স্বামী দেবদেবানন্দ 'সঙ্গীতে কথামৃত' পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় 'ভক্ত কবীরদাস' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, পাঁশকুড়া (মেদিনীপুর): গত ১০ মার্চ তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের সহযোগিতায় এই পাঠচক্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। সারাদিনব্যাপী উৎসবের অঙ্গ ছিল পূজা, চণ্ডীপাঠ, কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি। বিকালে স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী একরূপানন্দ, স্বামী গঙ্গাধরানন্দ, স্বামী হরিদেবানন্দ, পরমানন্দ সাহু, ডঃ সৌরেন্দ্র সরকার প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শচীকান্ত বেরা ও ভরতকুমার জানা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির, রাধামোহনপুর (মেদিনীপুর)ঃ গত ৩ মার্চ, '৯১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। সারাদিনব্যাপী এই উৎসবের অঙ্গ ছিল বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও আলোচনা, ভজন, গীতাপাঠ ও ধর্মসভা। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী হরিদেবানন্দ ও দীপককুমার দত্ত। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সারদাত্মানন্দ। দুপুরে প্রায় দেড়হাজার ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পূর্ণিয়া (বিহার)ঃ গত মার্চ মাসে এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গে বাসন্তীপূজাও সমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। উৎসবে স্বামী মঙ্গলানন্দ, স্বামী শশাঙ্কানন্দ, জেলা বিচারক বিদ্যানন্দ পণ্ডিত, শ্রীধর প্রসাদ, পুষ্প মিত্র প্রমুখ ভাষণ দেন। উৎসবে মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

গত ৭ এপ্রিল, ১৯৯১ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য শিষ্য, ভক্তকবি, পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের জন্মস্থান ময়নাপুর (বাঁকুড়া) অক্ষয়-স্মৃতি পাঠচক্রের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, স্তোত্রপাঠ, চণ্ডীপাঠ এবং অপরাহ্ণে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সমাত্মানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে স্বামী জুষ্টানন্দ এবং স্বামী রুদ্রেশানন্দ।

গত ১২ জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলার ভাদুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন করা হয়। ঐদিন সকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় এবং আবৃত্তি, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০ ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এ-উপলক্ষে স্থানীয় চারটি বিদ্যালয়ের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মোট ৭২জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন শান্তিময় সিংহ।

বহির্ভারত

নতুন কেন্দ্র

বিগত ২৫ চৈত্র '৯৬, রবিবার বাংলাদেশের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার কাকাইলছেও গ্রামে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য একটি সাংগঠনিক সভায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র মহৎ আদর্শ অবলম্বনে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি গঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ব্রজগোপাল রায়কে সভাপতি এবং ডাঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র দেবকে সাধারণ সম্পাদক করে পঁচিশ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। ঐদিনই স্থানীয় দরিদ্রদের মধ্যে ছায়ারানী দাসকে একটি কাপড় এবং সন্তোষকুমার ঘোষকে একটি চাদর দান করে সেবামূলক কার্যের উদ্বোধন করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ শুক্রবার রাত ৯-৩০ মিনিটে কলিকাতাস্থ বিড়লা হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। জ্ঞান হারাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইষ্টমন্ত্র জপে রত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আয়কর আধিকারিক।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ ভুবনমোহন দে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ রাত ১-৩৫ মিনিটে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। কর্মজীবনে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিভাগের অধীনে বিভিন্ন হাসপাতালে পদস্থ কর্মচারীরূপে যুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল উদ্বোধন পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন।

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, বিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচিপত্র ৯৩তম বর্ষ আশ্বিন ১৩৯৮ | ৯ম সংখ্যা

[পরের পৃষ্ঠায়]

যুগ্ম সম্পাদক

স্বামী সত্যব্রতানন্দ   স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা

প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা ☐ আশ্বিন সংখ্যা ☐ চব্বিশ টাকা

কবিতা

নিয়মিত বিভাগ

প্রচ্ছদ □ মহিষাসুরমর্দিনী □ শিল্পী □ নন্দলাল বসু

উদ্বোধন

আশ্বিন, ১৩৯৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ ৯৩তম বর্ষ—৯ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥

ব্রাহ্মণবিদ্বেষী হিংস্র-প্রকৃতি ত্রিপুরাসুর-বধার্থ রুদ্রের ধনুকে আমিই জ্যা সংযুক্ত করি। ভক্তজনের কল্যাণার্থ আমিই যুদ্ধ করি এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে অন্তর্যামিনীরূপে আমিই প্রবেশ করিয়াছি।

দেবীসূক্ত

কথাপ্রসঙ্গে

শক্তির সেই মহা-জাগরণ

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-লগ্নের শতবর্ষে পদার্পণের প্রত্যুত্ত-বর্ষে বিশেষ সম্পাদকীয়।

শক্তির পূজা তো আমরা স্মরণাতীত কাল হইতেই করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু শক্তির পূজা কি ঘট, পট, মূর্তি অথবা প্রতীকের পূজো ? না, উহার তাৎপর্য হইল উহাদের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে নিজের পূজা, আত্মপূজা—অবশেষে আত্মজ্যোতিঃ হওয়া।

মানব-সভ্যতার ঊষালগ্নের কাল-নিরূপণ এখনও হয় নাই, কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবী জুড়িয়া পণ্ডিতগণ অবশ্য তাই বলিয়া থামিয়া নাই। গবেষণার পর গবেষণা চলিতেছে, অগণিত মত উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইয়াই চলিবে। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে, কোন মতই অবিসংবাদিতরূপে গৃহীত হইতেছে না। গৃহীত হইবেই বা কিরূপে, এক্ষেত্রে সবই যে অনুমান-নির্ভর! যাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবার এখন তো আর কোন উপায় নাই। একজন বা একদল পণ্ডিত হয়তো কোন সূত্র হইতে একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন, তৎক্ষণাৎ অথবা কিছুকাল পরে অপর একজন বা একদল পণ্ডিত অপর একটি সূত্র আবিষ্কার করিয়া পূর্ববর্তী পণ্ডিত বা পণ্ডিত-বর্গের দাবিকে নস্যাৎ করিয়া দিলেন! সুতরাং স্থির-সিদ্ধান্ত আমরা আর পাইতেছি না, এবং যাহা পূর্বেই বলিয়াছি, পাইবার আশাও নাই। কারণ, কে না জানে—"নানা মুনির নানা মত!" নানা মতের ঐকমত্য হওয়া যে কঠিন এবং এইরূপ সুগভীর একটি বিষয়ে যে তাহা অসম্ভব তাহা মহাভারতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। বকরূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠির সেই কবেই বলিয়াছিলেন : "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" (পাঠান্তর : "নৈক ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্")--তিনি মুনিই নহেন যদি তাঁহার মত অন্য মুনির মত হইতে ভিন্ন না হয় (পাঠান্তর অনুসারে : একজনও ঋষি নাই যাঁহার মত একক-প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত)।

মানব-সভ্যতার ঊষালগ্নের কাল-নিরূপণ না হইলেও একটি বিষয় কিন্তু অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার্য যে, মানব-সভ্যতার সূচনা হইয়াছে সেই ক্ষণে যখন আদি মানব-মানবী আপন শক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছে এবং সেই শক্তিকে প্রকাশ বা বিকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মানুষের আত্মশক্তির উপলব্ধি ও উহার বিকাশের প্রেরণা ও প্রয়াস হইতেই মানব-সভ্যতার উন্মেষ। আমরা মনে করি উহা যেমন সভ্যতার সূচনা, তেমনই সূচনা ধর্মেরও, যাহা কিনা সভ্যতার প্রকৃত ধারক ও নিয়ামক। যমজ সন্তানের মধ্যেও অগ্রজ থাকে;

সভ্যতা ও ধর্মের মধ্যে কে অগ্রজ তাহা লইয়া বিচার চলিতে পারে, তবে আমরা উভয়কে একই মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠদেশ বলিয়াই মনে করি। ধর্ম এবং সভ্যতার অজস্র সংজ্ঞা রহিয়াছে এবং তাহা লইয়াও বাক্‌বিতণ্ডার শেষ নাই। তবে আমাদের বিশ্বাস, এইবিষয়ে শেষ কথাটি বলিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলিতেছেন ঃ যে যত পরিমাণে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সে তত পরিমাণে ধর্মের নিকটবর্তী, যে যত পরিমাণে ধর্মের সমীপবর্তী সে তত পরিমাণে সভ্য। অর্থাৎ, সভ্যতা ও ধর্মের মূলকথা হইল আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং সেই শক্তির জাগরণ ও বিকাশ-সাধন। জগতের সকল সভ্যজাতির ইতিহাস এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবন আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সে ইতিহাস মায়া, মিশর, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতারই হউক, অথবা গ্রীক, রোমান, ভারতীয় বা চৈনিক সভ্যতারই হউক ; যদি ব্যক্তি হিসাবে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মোজেস, মহম্মদ, লাওৎসে, কনফুসিয়াসের জীবন পর্যালোচনা করি, তাহা হইলেও আমাদের সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইবে। আলেকজান্ডার হইতে শুরু করিয় আব্রাহাম লিঙ্কন পর্যন্ত সেই একই ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তি।

আজ হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বুকে একটি নূতন সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যাহা বিগত দুই শতক ধরিয়া পৃথিবীর চিন্তা ও আদর্শকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়া চলিয়াছে। সেই নূতন নাম মার্কিন বা আমেরিকান সভ্যতা। পাঁচশত বৎসর পূর্বে একজন অপরিসীম আত্মবিশ্বাসী মানুষ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। সেই মানুষটির নাম কলম্বাস। বহু বাধা-বিঘ্ন, প্রতিপদে জীবনহানির আশঙ্কা কোন কিছুই স্পেনদেশীয় ঐ অসীমসাহসী মানুষটিকে টলাইতে পারে নাই। তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সুদৃঢ় সংকল্পের নিকট প্রতিবন্ধকের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইয়াছিল। নূতন মহাদেশ আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এবং উহার ফলে কলম্বাস ইতিহাসের নায়ক হইয়াছিলেন।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে 'ওয়ার্লডস কলম্বিয়ান এক্‌সপোজিশন' অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঃ মানুষ তাহার সভ্যতার সাম্প্রতিকতম অগ্রগতি পর্যন্ত স্থূলজগতে যতপ্রকার উন্নতিসাধন করিয়াছে তাহার সকল নিদর্শন সমবেত করা। সেখানে পাশ্চাত্য কৃষ্টির নিদর্শনগুলি তো অবশ্যই স্থান পাইয়াছিল, অনুন্নত দেশগুলির, যাহাদের বর্তমান পরিভাষায় 'তৃতীয় বিশ্ব' বলিয়া অভিহিত করা হয়, সংস্কৃতির সাক্ষাৎ নিদর্শনও সেখানে প্রতীকাকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। অতঃপর সংগঠকগণের মনে হইল, মনোজগতে মানবের উন্নতির নিদর্শনেরও সেখানে স্থান না থাকিলে মানবসভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসকে উপস্থাপন করা হইবে না। সেই উদ্দেশ্যে কুড়িটি 'কংগ্রেস' বা মহাসম্মেলন বা মহাসভার আয়োজন করা হয়। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মে হইতে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত এই সমস্ত 'কংগ্রেস'-এর অধিবেশন চলে। সামাজিক উন্নতি, আইন ও সমাজ-সংস্কার, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি ছিল এক-একটি 'কংগ্রেস'-এর শিরোনাম। তবে 'কংগ্রেস অব রিলিজন' বা ধর্মমহাসভাটিই ছিল সমস্ত 'কংগ্রেস'-এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রচার, জনপ্রিয়তা এবং বর্ণাঢ্যতায় ধর্মমহাসভা শিকাগো তথা আমেরিকার জনসাধারণের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ধর্মমহাসভার সূচনা হইয়াছিল ১১ সেপ্টেম্বর এবং সমাপ্তি হইয়াছিল ২৭ সেপ্টেম্বর।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় সেই ঐতিহাসিক 'পার্লামেন্ট' বা 'কংগ্রেস'-এর অধিবেশন শুরু হইল। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রশস্ত 'হল অব কলম্বাস'-এ যে কয়েক সহস্র মানুষ প্রবল উহার অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাঁহারা তখনও জানিতেন না যে, পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন এক ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রলগ্ন সমাগত—সমাগত নূতন ইতিহাসের জন্মমুহূর্ত—সমাগত নূতন সভ্যতার আত্মপ্রকাশের পরম মুহূর্ত—সমাগত নূতন পৃথিবীর আবিষ্কারের প্রার্থিত প্রহর। নূতন ইতিহাসের স্রষ্টা সেই নব-কলম্বাসের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। মানব-শক্তির কোন্ চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভব, মানব-ভাষণ কোন্ উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করিতে পারে, সেদিনের অধিবেশনের শ্রোতৃবৃন্দ তাহার সাক্ষী হইয়া রহিলেন।

ইতিহাসেরও একটি ইতিহাস থাকে, সূচনারও থাকে সূচনা। আত্মবিশ্বাসের সাকার মূর্তি, আত্মশক্তির মূর্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ তখনও শিকাগোতে আসেন নাই, যাত্রার আয়োজন চলিতেছে। অজ্ঞাত, অপরিচিত, তরুণ কপর্দকহীন সন্ন্যাসী ভারতত্যাগের পূর্বে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের

সহিত গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন: "হরিভাই, ধর্মমহাসভাটা এরই (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) জন্য হচ্ছে। আমার মন তাই বলছে। শিগ্‌গিরই এর প্রমাণ দেখতে পাবে।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় সং, ১৩৭৬, পৃঃ ২৬)

বাস্তবিকই তাহাই হইল। সমগ্র ধর্মমহাসভার প্রধান আকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শুধু স্বামী তুরীয়ানন্দই নহেন, সমগ্র পৃথিবীর কাছেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল যে, শিকাগো ধর্ম-মহাসভা কলম্বাসের কৃতিত্বের স্মরণোৎসব বা অন্য কিছুই না হইয়া বিশ্বের বুধমণ্ডলী ও জনগণের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশের পাদপীঠ এবং তাঁহার বিশ্বাচার্যের ভূমিকার প্রতিষ্ঠাভূমি হিসাবেই যেন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ধর্মমহাসভার বিবরণ ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদন ও মন্তব্য হইতে তাহা বুঝা যায়।

'শিকাগো ইন্টার ওসান' পত্রিকায় বলা হইল: "ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের তুল্য মনোযোগ আর কেহই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই।" 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' লিখিল: "বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভার সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব।" 'আইওয়া স্টেট রেজিস্ট্রারে' বলা হইল: "দুর্ভাগ্য তাহার, যে এই সন্ন্যাসীর সহিত... লড়াই করিতে যায়।... তাঁহার উত্তরগুলি ঝলসিয়া উঠে বিদ্যুতের মতো। ফলে দুঃসাহসিক প্রশ্নকর্তা নির্ঘাত ভারতীয় মানুষটির উজ্জ্বল ধারালো বুদ্ধির বর্শায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। তাঁহার মনের ক্রিয়াশক্তি এমনই সূক্ষ্ম ও দীপ্তিমান, এমনই সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত...।" রাশিয়ার প্রতিনিধি প্রিন্স উলকন্স্কির মন্তব্য যাহা 'সেন্ট লুইস রিপাবলিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল: "ধর্মমহাসভার মহৎ মূল্য এইখানে—উপস্থিত মানুষেরা একজন মানুষকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিল। একজন ব্যক্তিই সেখানে ছিলেন—আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি!"

প্রত্যক্ষদর্শী অ্যানি বেশান্তের লেখনীতে এই অপূর্ব কথাগুলি আমরা পাইতেছি:

"শিকাগোর ঘন আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত ওষ্ঠ, চকিত দ্রুতগতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোশাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব—স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়ার রূপ।... সন্ন্যাসী—তাঁহার পরিচয়? নিশ্চয়ই। কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী তিনি, প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চাহিতে সৈনিকই বেশি মনে হয়। মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, দেশ ও জাতির গর্ব ফুটিয়া আছে দেহের রেখায় রেখায়—পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি, পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন কৌতূহলী অর্বাচীনদের দ্বারা, যাহারা কোনমতেই নিজেদের দাবি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে, যাহারা যেন বলিতে চাহে, তিনি যে সুপ্রাচীন ধর্মের প্রতীকপুরুষ সেই ধর্ম আশেপাশে সমবেত ধর্মসমূহের মহিমার চাহিতে হীনতর। কিন্তু না, তাহা হইবার ছিল না। ধাবমান ও উদ্ধত পাশ্চাত্যদেশের সম্মুখে ভারত, যতক্ষণ তাহার এই বাণীবাহক সন্তান বর্তমান আছেন ততক্ষণ লজ্জিত থাকিবে না। ভারতের বাণীকে তিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন--ভারতের নামে তিনি দাঁড়াইয়াছেন।...

"মঞ্চের উপর অপরপক্ষও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; মর্যাদা, যোগ্যতা ও শক্তির দ্যোতনা সেখানেও ছিল; কিন্তু সবকিছুই আচ্ছন্ন হইয়া গেল বিবেকানন্দের দ্বারা আনীত অধ্যাত্মবাণীর অপরূপ সৌন্দর্যের কাছে; নিষ্প্রভ হইয়া গেল সমস্তই যখন তাঁহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল ভারতের জীবনস্বরূপ পরমাশ্চর্য আত্মতত্ত্ব; জ্বলিয়া উঠিল প্রাচ্যের দিব্যবাণীর অতুলনীয় মহিমা। মোহিত ও অভিভূত সেই বিরাট জনমণ্ডলী উৎকর্ণ হইয়া রহিল তাঁহার প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের জন্য, অপেক্ষা করিয়া রহিল রুদ্ধশ্বাসে—যে-ধ্বনিতরঙ্গ আছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহার কিছুই যেন হারাইয়া না যায়! 'ঐ মানুষটিকে আমরা পৌত্তলিক বলিয়াছি!' বিশাল সভাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতে আসিতে একজন বলিয়া উঠিলেন—'আর উঁহার দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠাইতেছি! এদেশে উঁহাদেরই ধর্মপ্রচারক পাঠানো উচিত'।"

সমকালীন আমেরিকার বিখ্যাত কবি হ্যারিয়েট মনরো শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "কমলারঙের পোশাক-পরিহিত সুদর্শন সন্ন্যাসীই নিখুঁত ইংরাজীতে আমাদের সর্বোত্তম বস্তু দিলেন।... মানব-ভাষণের উহাই ছিল সর্বোচ্চ শিখর।"

ধর্মমহাসভার বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মারউইন মেরী স্নেল লিখিয়াছেন: "...শিকাগোয় অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনকে নানা কারণে ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ-চিহ্নিত ঘটনা বলা যাইতে পারে। উহার অন্যতম প্রধান অবদান হইল যে, খ্রীস্টানজগৎ বিশেষতঃ আমেরিকার মানুষ এই মহৎ শিক্ষা পাইয়াছে—পৃথিবীতে এমন সব ধর্ম আছে, যেগুলি খ্রীস্টধর্ম অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধেয়; দার্শনিক গভীরতায়, আধ্যাত্মিক

ব্যাকুলতায়, চিন্তার মুক্ত বীর্যপূর্ণ প্রকাশে, মানবতার প্রতি সহানুভূতির ব্যাপক নিষ্ঠায় সেইসকল ধর্ম খ্রীস্টধর্মকে অতিক্রম করিয়াছে, অথচ সেই সঙ্গে নীতির সৌন্দর্য এবং কার্যকারিতাকে এক চুলের জন্যও তাহারা হারায় নাই।... কিন্তু ইহার সহিত এই সত্যটিও স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্মই ধর্মমহাসভায় এবং আমেরিকার জনগণের উপর অনুরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।... তবে [হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের নাম উল্লেখ করিয়া মিঃ স্নেল লিখিয়াছেন] যেকোন বিচারে, হিন্দু-ধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজস্ব ('typical') প্রতিনিধি হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ছিলেন প্রশ্নাতীতভাবে ধর্মমহাসভার সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।"

উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়াইয়া লাভ নাই। কারণ, উহাদের প্রত্যেকটিতেই রহিয়াছে আমেরিকার প্রধান-অপ্রধান পত্র-পত্রিকা এবং ধর্মমহাসভায় উপস্থিত সাধারণ-অসাধারণ ঐদেশীয় ব্যক্তিবর্গের সেই এক এবং অদ্বিতীয় স্বীকৃতি যে, স্বামী বিবেকানন্দ নামক মহাশক্তিধর এক তরুণ সন্ন্যাসী, প্রায় অখ্যাত এক ভারতীয় যুবক নূতন ইতিহাস নির্মাণ করিয়াছেন, সমগ্র পৃথিবীর বিদগ্ধ দৃষ্টিকে অনিবার্যভাবে তাঁহার এবং তাঁহার দেশ ও ধর্মের মহিমার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন, সমগ্র সভ্য সমাজের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। শিকাগোর ধর্মমহাসভার এক দশক পূর্বে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিতেন, "উহার মধ্যে জগৎ-আলোড়নকারী মহাশক্তি রহিয়াছে"—তখন উহা কয়জনই বা বিশ্বাস করিতেন ? নরেন্দ্রনাথ নিজেও কি তখন উহাকে তাঁহার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহান্ধতা-প্রসূত অতিশয়োক্তি বলিয়াই বিবেচনা করেন নাই ? কিন্তু আদ্যাশক্তির বরপুত্র যে যথার্থই বলিয়াছিলেন শিকাগোর ধর্মমহাসভা তাহা বর্ণে বর্ণে প্রমাণ করিয়া দিল। ইতোমধ্যে অনেক ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছিল এবং সমস্তই সকলের অশ্রুতে, লোকলোচনের অলক্ষ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণের পূর্বে তাঁহার 'মায়ের' নিকট তাঁহার 'নরেন্দ্র'কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মনুষ্যশক্তির যে চরম প্রকাশকে তিনি আপন হৃদয়ে সংহত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাকে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে উজাড় করিয়া দিয়া ভাবীকালের বিশ্বাচার্যকে তিনি জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সহজাত পৌরুষ, আত্মশক্তি এবং ব্রহ্মতেজকে সঞ্জীবিত করিয়া তাঁহার কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের নবজন্ম হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হইয়াছিলেন বিবেকানন্দে, হইয়াছিলেন, অরবিন্দের ভাষায়, "জগৎকে দুই হাতে ধরিয়া পাল্টাইয়া দিবার মতো মহা-শক্তিধর পুরুষ।"

বাস্তবিক, স্বামী বিবেকানন্দের যে সাফল্য, সে সাফল্য কোন ব্যক্তিবিশেষের নহে, উহা নিখিল মানবাত্মারই সাফল্য। মানুষের ভিতর যখন তাহার অন্তরস্থিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন তখন পৃথিবী তাহার পদতলে মাথা লুটায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, ঐরূপ জাগ্রত মানুষই হইল যথার্থ মানুষ। বলিতেন, পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিব, জগতের ইতিহাস ঐরূপ কয়েকজন মানুষেরই ইতিহাস —যাঁহারা আত্মবিশ্বাসী যাঁহারা আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়াছেন। ভারতবর্ষ যে স্মরণাতীত কাল হইতে শক্তির আরাধনা করিয়া আসিতেছে উহার তাৎপর্য হইল মানুষের ভিতরের পশুকে অর্থাৎ দুর্বলতাকে পদদলিত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত দেবতাকে অর্থাৎ নিজ শক্তিকে প্রবুদ্ধ করা—স্বয়ং শক্তিস্বরূপ হওয়া। মানুষের ভিতরের পশুকেই ঋষি-মুনিরা বলিয়াছেন 'মহিষাসুর' এবং দেবস্বভাবকে অভিহিত করিয়াছেন 'মহিষাসুরমর্দিনী' বা 'দুর্গা' নামে। সুতরাং দুর্গাপূজা করার তাৎপর্য হইল নিজের দুর্বলতাকে বিনাশ করিয়া অন্তরস্থিত মহাশক্তিকে প্রকট করা, স্বয়ং দেবতা হওয়া।

স্বামী বিবেকানন্দ তাহাই হইয়াছিলেন। ঐ যেন আমরা মানসনেত্রে দেখিতেছি, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বর্ণাঢ্য মঞ্চে প্রবেশ করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারীর বিমুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি পতিত হইল সূর্য-সঙ্কাশ সেই 'নরকেশরী'র উপর। মিস লরা এফ. গ্লেনের (পরবর্তী কালে ভগিনী দেবমাতার) স্মৃতিঃ

"শ্ শ্ শ্—চুপ! শান্ত পদক্ষেপে বিবেকানন্দ আগাইয়া আসিতেছেন ; মর্যাদায় উন্নত আকার লইয়া মধ্যবর্তী সিঁড়ির উপর দিয়া মঞ্চে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এইবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—আর বিগলিত হইয়া গেল স্মৃতি, কাল, স্থান, মানুষ—সমস্তই। কিছুই নাই, কেবলমাত্র শূন্যের মধ্যে ধ্বনিত কণ্ঠস্বর। মনে হইল যেন আমার সম্মুখে দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, আমি তাহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি কোন অসীম লক্ষ্যে। শেষ প্রান্ত এখনও অগোচর। কিন্তু কী আছে সেখানে, তাহার আলোকিত বার্তা রহিয়াছে উঁহার চিন্তায়, ঐ ব্যক্তিত্বে, যিনি ঐ পথে আমাদের আহ্বান করিতেছেন। ঐ তিনি দাঁড়াইয়া আছেন—অনন্তের দিব্য দিশারী!"

ভাষণ

বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন গ্রামে। গ্রামেই তাঁর শৈশব, বাল্য, কৈশোর কাটে। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁর লীলাক্ষেত্র হলো কলকাতা। সেসময় তাঁকে কেন্দ্র করে যে একটা বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছিল তা হয়তো আমরা এখনো ভাল করে বুঝতে পারিনি। তবে যত দিন যাচ্ছে তত আমাদের কাছে তা বোধগম্য হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ শুধু আমাদের দেশের জন্য নয়, শুধু একটি গোষ্ঠী বা সমাজের জন্য নয়, সারা জগতের সর্বজনের জন্য কল্যাণকর—একথা আমরা ক্রমশঃ বুঝতে পারছি। সারা পৃথিবীতেই এখন শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। বহু পণ্ডিত তাঁদের গবেষণায় ও আলোচনায় বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ ভূমিকায় আবির্ভূত, সেবিষয়ে এক-একটি চিত্র তুলে ধরছেন। সবগুলি মেলালে আমরা একটি প্রায়-পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখতে পাই। সেই চিত্রটিও ক্রমশঃ পরিস্ফুট হচ্ছে। নানা রঙে, নানা শিল্পীর তুলিতে নানা চিত্র দেখছি বটে, তবে সম্পূর্ণ চিত্রটি কবে যে সম্পূর্ণ হবে এবং আদৌ সম্পূর্ণ হবে কিনা তা আমরা জানি না।

আমরা দিনের পর দিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে চেষ্টা করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে অনেক সময় তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করতেন : "আচ্ছা, তোমার আমাকে কি মনে হয়?" "আমার কতখানি জ্ঞান হয়েছে?" "ক-আনা জ্ঞান হয়েছে?" "ক-আনা ভক্তি হয়েছে?" ইত্যাদি। এগুলি কেন জিজ্ঞেস করতেন? এথেকে তিনি বুঝতে চেষ্টা করতেন তাঁর সমকালের মানুষ তাঁকে কতখানি ধারণা করতে পারছে, শ্রীরামকৃষ্ণরূপ ভাবসমুদ্র থেকে কতটুকু রত্ন সংগ্রহ করতে পেরেছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা পরীক্ষা করতে পারি না, কিন্তু আমরা পরীক্ষিত হতে পারি। আমাদের জীবনে কতটুকু প্রগতি হয়েছে তার মূল্যায়ন হবে শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা কতটুকু বুঝতে পারি তার নিরিখে। তিনি কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির জন্য এসেছিলেন, তা নয়। তিনি বিশ্বের সকলের জন্য এসেছিলেন। অবতারদের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তাঁদের জীবৎকালে তাঁদের মহিমা কি, তাঁরা কি করছেন, জগতে তাঁদের অবদান কি—জগৎ তা প্রায় বুঝতে পারে না। যত দিন যায় ক্রমশই তাঁদের ভূমিকা স্পষ্ট হতে থাকে। আমরা ইদানীং কালে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও এটি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস, জগতের উদ্ধারের প্রধান উপায় হবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ। জগতের প্রধান সমস্যা হলো মানুষের বস্তুতান্ত্রিকতা, মানুষের ভোগলোলুপতা। যতদিন এথেকে জগৎ মুক্ত না হচ্ছে ততদিন বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'ত্যাগ' ছাড়া কিছু হবে না। 'ত্যাগ' মানে কেবল ব্যক্তিবিশেষের কতগুলি সুখ-সুবিধা ত্যাগ নয়, 'ত্যাগ' মানে স্বার্থপরতা ত্যাগ, সংকীর্ণতা ত্যাগ। এই ত্যাগ নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। এই ত্যাগ মানে জগতের সমস্ত আদর্শকে নিজের জীবনে ঢেলে সাজানো। জগতের মানুষ যখন এই ত্যাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, তখন আমরা দেখব জগৎকল্যাণ সত্যি সত্যি হচ্ছে এবং তিনি এই জগৎকল্যাণের জন্যই এসেছেন। এই যে বিরাট যজ্ঞ চলছে, তিনি এর হোতা। তিনিই আবার এই যজ্ঞের উপাস্য দেবতা। তাঁর আদর্শ জগৎকে উদ্ধার করবে—এ-বিশ্বাস আমরা রাখি। তবে শুধু এই বিশ্বাস রাখলেই হবে না, আমাদের কিছু করণীয়ও আছে। এই কথাটি মনে রাখতে হবে। আমরা এখানে নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র থাকব না। তাঁর আদর্শকে আমাদের ব্যক্তিজীবনে, পরিবারজীবনে রূপায়ণ

করার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান যখন আসেন তখন কেবল একটি ভাব, একটি আদর্শ সকলকে দিয়ে যান তা নয়, সকলের জীবনকে পরিবর্তিত করার পথও দেখিয়ে দিয়ে যান, প্রেরণা যুগিয়ে যান। 'অবতারবরিষ্ঠ'-প্রদর্শিত সেই 'ত্যাগের' পথ ধরে আমাদের চলতে হবে। তাঁর প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে আমাদের জীবন গড়তে হবে।

এখন সবেমাত্র রামকৃষ্ণযুগের প্রারম্ভ। দেড়শো বছর বেশি কিছু সময় নয়। আশা করা যায় তাঁর কৃপায় জগৎকল্যাণ-কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে যদি আমরা এই ভাবান্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করি। আমরা তাঁর ভাব প্রচার করছি—এই অভিমান আমাদের থাকবে না। কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের দিকে তাকিয়ে যেন বলতে পারি যে, আমরা কেবল নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হয়ে ছিলাম না, আমরা আমাদের সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। আমাদের সাধ্য হয়তো সীমিত, কিন্তু সেই সীমিত শক্তি দিয়েও আমরা যথাসম্ভব এই আদর্শকে ধারণ করার চেষ্টা করেছি। স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জগন্নাথের রথ তার নিজের শক্তিতেই চলে, তাঁর শক্তিই রথকে নিয়ে যায়। কিন্তু জগন্নাথের রথের রশি যারা ছুঁতে পারে, তারাই ধন্য হয়। রথকে আমরা টেনে নিয়ে যাই না, আমরা সেই রথের রজ্জু স্পর্শ করে নিজেরা ধন্য হই। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন তার নিজের শক্তিতেই এগিয়ে চলবে। যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারবে তারা ধন্য হবে। শুধু এদেশের মানুষই নয়, সারা জগতের মানুষই ধন্য হবে।

'জগৎ' কথাটা বলে আমরা অতিশয় উক্তি করছি না। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ বাস্তবিক জগৎকল্যাণের জন্য। একটি আদর্শকে গ্রহণ করতে হলে, সেই আদর্শ জীবনে রূপায়িত করতে হলে কেবল বুদ্ধির সাহায্য নিলে হবে না। বুদ্ধির সাহায্যে হয়তো একরকম করে বুঝলাম, কিন্তু সেই বোঝার ভিতরে ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। সেই বোঝার সার্থকতা বেশি থাকে না। কারণ, দুদিন পরই তাতে অবিশ্বাস আসতে পারে। অথবা আর একজন বুদ্ধিমান এসে আমার সিদ্ধান্তগুলিকে সব ওলট-পালট করে দিতে পারে। সেজন্য জীবনের দ্বারা আদর্শকে অনুভব করতে হয়। তা না করলে হবে না। 'অনুভব' মানে আমাদের জীবনকে সেই আদর্শে রূপায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি ছাঁচ তৈরি করে গেলাম। তোরা নিজেদের এই ছাঁচে ঢেলে নে। আমি আগুন জেলে গেলাম, তোরা সেই আগুন পোয়া। আমি রান্না করে গেলাম, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা।'—কথাগুলির প্রত্যেকটি গভীর অর্থপূর্ণ। তিনি হচ্ছেন ছাঁচ, যাতে আমাদের ঢাললে আমাদের কল্যাণ হবে। সমগ্র বিশ্বেরই ছাঁচ তিনি। সমগ্র বিশ্ব যদি তাঁর ছাঁচে নিজেদের ঢালতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে, তবে সকলে যে যার নিজেদের গড়ন নিখুঁত করে নিতে পারবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে যতটুকু পারে, তাকে ততটুকুই চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য সেই চেষ্টা যেন আন্তরিক হয়। তাহলে জগৎ পরম কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি যখন সকলেই ভাবছে 'এক' জগতের কথা। জগৎ এখন ছোট হয়ে গেছে। এখন আমাদের কেবল নিজেদের কথা ভাবলে চলবে না, সকলের কথা ভাবতে হবে।

অবতার যখন আসেন তখন কেবল একটি বিষয়ে উন্নতি হয় তা নয়, সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে উন্নতি হয়। তাই আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের যে অবদান তাতে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ কিভাবে লাভবান হচ্ছে, প্রভাবিত হচ্ছে এবং সেই প্রভাবের ফলে জগতের কল্যাণ কিভাবে সাধিত হচ্ছে—এটা আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে। কারণ, এই ভাবে চিন্তা করলে আমরা আমাদের নিজেদের অপূর্ণতা, নিজেদের সীমা, নিজেদের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারব। এইভাবে চিন্তা করলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে কোন একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবার অপচেষ্টা করব না। আমরা বুঝব, তিনি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝেছি, তা নয়। কেউই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে না। কারণ, 'অনন্ত-ভাবময়' তিনি—স্বামীজী বলছেন। সকলে যে যার মতো তাঁকে বুঝবে, বোঝার চেষ্টা করবে। তবে এই বোঝার ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে—কারো ভাবের যেন হানি না হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই। যার যা ভাব আছে তাকে অক্ষুন্ন রেখে কি করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করা যায়, কি করে তার ত্রুটিগুলি অপসারিত করা যায়, আমরা তাঁর জীবন থেকে তার সূত্র পাব। তাঁর জীবন জগৎকে এমন একটা অদ্ভুত দিকদর্শন করাচ্ছে, যাতে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে নিতে পারি। যেমন কম্পাস দিয়ে আমরা দিক নির্দেশ করি, সেই রকম তাঁর জীবন দিয়ে আমরা আমাদের আসল লক্ষ্যকে বুঝতে পারব।

শ্রীরামকৃষ্ণ আর যা-কিছু হোন না কেন, সর্বোপরি তিনি অসীম—কোন জায়গায় তিনি সীমিত নন। তাঁর সর্বাবগাহিতা কখনো আমরা যেন না ভুলি। তাঁর উপদেশ—"ভগবানের ইতি করা যায় না"। ভগবানের যেমন ইতি করা যায় না, তেমনি ভগবানের অবতারেরও ইতি করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ এইটুকু—আমরা এ যেন কখনো না বলি। তিনি বিশাল, তিনি অসীম, তিনি সমুদ্র। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র আধারে যতটুকু সম্ভব সেই সমুদ্রের অমৃতবারি নিয়ে ধন্য হব। এতে আমাদের জীবন ধন্য হবে। তাঁর অনন্ত জ্যোতিতে আমাদের জীবন আলোকিত হবে। তাঁর অসাধারণ জীবন আমাদের প্রেরণা যোগাবে।*

*** ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৭ উদ্বোধন কার্যালয়ের সারদানন্দ হলে 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণ।**

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ কেবলমাত্র সাধু-ব্রহ্মচারীদের আদর্শ নয়, সমগ্র জাতি, পৃথিবীর সকল মানুষ এই জীবনাদর্শ অনুসরণ করলে লাভবান হবে। কারণ, বেদান্তের আলোকে তিনি জীবন-গঠনের কথা বলেছেন। বনের বেদান্তকে কিভাবে ঘরে আনতে হবে, কিভাবে বেদান্তকে কার্যকরী করতে হবে তিনি তার কৌশল শিখিয়ে গিয়েছেন।

ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগত—সর্বদিকেই ভারতবর্ষ আজ গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলছে। ক্রান্তদর্শী ঋষি বিবেকানন্দ এই নির্মম সত্যটি বহু-দিন পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর সমস্ত ভাষণে এবং সাধারণ কথাবার্তায় বারম্বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, যা আজ ইংরেজী ও বাঙলায় প্রকাশিত তাঁর 'বাণী ও রচনা'তে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষতঃ কলম্বো থেকে শুরু করে মাদ্রাজ, কলকাতা, লাহোর, শিয়ালকোট, আলমোড়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন যার সংকলন 'ভারতে বিবেকানন্দ' অথবা 'Lectures from Colombo to Almora' গ্রন্থদুটি, তাতেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা পাই। বেদান্তের আলোকে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন কিভাবে গঠন করা যাবে, কিভাবে ভারতবর্ষ আবার ধর্মে ও কর্মে মহান হবে তার রূপরেখা অঙ্কিত রয়েছে এই অমূল্য গ্রন্থদুটিতে এবং তাঁর 'পত্রাবলী'তে।

ভারতের বর্তমান সমাজব্যবস্থা তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ, নারী-জাতির অসম্মান, জাতপাতের বৈষম্য, শোষকশ্রেণীর অত্যাচার, শোষিতের যন্ত্রণা দূর করে এক নতুন উন্নততর সমাজগঠনের জন্য তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। মর্মভেদী বিদ্রূপ ও ক্ষুরধার সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে

গঠনমূলক ব্যবস্থার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন তাঁর ভাষণ ও চিঠিপত্রসমূহে। তিনি বলেছেন, আমাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে ভিত্তি করেই নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সমাজ বেদান্ত-বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়েছে বলেই আজ এত সমস্যা। আজ তাই বেদান্তের মূলতত্ত্বকে জেনে ব্যবহারিক জীবনে তার যথাযথ প্রয়োগ করে সমাজ-ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর সময় এসেছে। অতীতে আমাদের দেশে বহু সাধু, মহাত্মা, মুনি-ঋষিদের জীবনেই কার্যকরী বেদান্ত পরিস্ফুট, কিন্তু তাঁরা অধিকাংশ সময়ই সমাজের বাইরে নির্জনে বাস করেছেন। কিন্তু আজ স্বামীজী প্রবর্তিত সঙ্ঘের সাধুগণ সমাজে বাস করেই নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়েই দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে বেদান্তবোধকে নিত্য জাগ্রত রাখা যায়। ছুৎমার্গ বা কতকগুলি বিধিনিষেধ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান কখনো সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হতে পারে না। মানুষের প্রতি মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধই আদর্শ সমাজের ভিত্তি। কিভাবে আবার ভারত জাগ্রত হবে? কোন্ দর্শন তার পথ নির্দেশ করবে? স্বামীজীর স্পষ্ট উত্তর—বেদান্ত-দর্শন, ঔপনিষদিক দর্শন। যে উপনিষদ্ একদা অরণ্যে বা ঋষির আশ্রমেই সীমাবদ্ধ ছিল তার মূল-তত্ত্ব উপলব্ধি করে সেই তত্ত্ব বা দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই নতুন ভারত গঠিত হবে। রামায়ণ বা মহা-ভারতের যুগে, বৌদ্ধ যুগে বা তার পরবর্তী কালে এই সনাতন ধর্মের ওপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষ সসম্মানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যখনই এদেশ সেখান থেকে সরে এসেছে তখনই নড়ে উঠেছে ধর্মের ভিত, তখনই হয়েছে পতন। আজ আবার সেই ধর্মের ওপরেই ভিত্তি করে ভারতবর্ষকে জেগে উঠতে হবে। সেই ধর্মবোধ থেকে সরে এসেছি বলেই শুরু হয়েছে সামাজিক অবক্ষয়। সমাজের বহু মানুষের আচরণ পশুর থেকেও নিম্নস্তরে নেমে গেছে। দৈনন্দিন জীবনে সর্বত্রই এই যে মূল্যবোধের অভাব, এ থেকে মুক্তির কি উপায়? স্বামীজী বলেছেন সেই অমোঘ মন্ত্র: "Love God, Love Man"—"জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এটিই বেদান্তের অন্ত-র্নিহিত তত্ত্ব। মানুষের ভিতর ভগবান রয়েছেন, সেই মানুষকে আমরা অবহেলা করছি। এদেশে ঈশ্বরকে আমরা অনেক পূজা করেছি, তাঁর নামে কেঁদেছি। আমাদের যত শ্রদ্ধা ঈশ্বরের ওপর, কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নেই মানুষের ওপর। তাই আমাদের এই দুর্দশা। নিজের ভিতরে যে অনন্ত শক্তি আছে সেই শক্তির বিস্তার করতে আমরা চেষ্টা করিনি। কিন্তু বেদান্তের প্রথম কথাই হলো: নিজের ওপর শ্রদ্ধা রাখ। নিজেকে কখনো ছোট ভেব না, দুর্বল ভেব না, হীন বা অধম ভেব না। তোমার আমার সকলের ভিতরেই রয়েছে অনন্ত শক্তি। তাকে স্বীকার কর, সেই শক্তিকে শ্রদ্ধা কর, তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এই আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মনির্ভরতার ওপর স্বামীজী বারবার জোর দিয়েছেন। তিনি বলছেন: তুমি অশেষ শক্তিধর, তুমি অমৃতের সন্তান।—এই ইতিবাচক মনোবৃত্তি সর্বদা জাগ্রত রাখ। এই বোধ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করলে যে নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব হবে, তারা হবে অসীম শক্তিধর।

শুধু চাই আত্মশ্রদ্ধা। নিজের ওপর শ্রদ্ধা ঠিক ঠিক হলে অপরের ওপরও স্বতই শ্রদ্ধা আসবে।

আমরা যে পরস্পরের সঙ্গে কলহ ও বাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হই, তার কারণ কি? কারণ, পরস্পরের প্রতি ভেদদর্শন। এই ভেদবুদ্ধির জন্যই আমরা অপরকে শ্রদ্ধা করি না, বিশ্বাস করি না। এর জন্যই অন্যের সঙ্গে আমরা সদ্ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হই। ঐক্য, সামঞ্জস্যবোধ, যৌথ প্রচেষ্টা বা সমবেত কর্ম—এদের মূল্য আমরা এখনো বুঝিনি। কিন্তু বেদান্তের মূলতত্ত্বটি যদি আমাদের মর্মে গেঁথে থাকে যে, একই আত্মা সর্বভূতে বর্তমান, তবে অপরের প্রতি প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা স্বতই সঞ্চারিত হবে। একত্র চলাফেরা, সম্মিলিতভাবে কাজকর্ম করায় কোন বিরোধ সৃষ্টি হবে না। কয়েকজন একত্রে থাকাটাই তো সমাজের সংজ্ঞা নয়—পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের ওপরেই সমাজের স্থায়িত্ব। আর একটি বিশেষ ভাবের ওপর স্বামীজী জোর দিয়েছেন—সেটি সেবার ভাব। এই সেবাভাবের কথা আছে বেদ-উপনিষদে, আছে ভাগবতে। একই কথা বলেছেন বুদ্ধ, খ্রীষ্ট

প্রমুখ অবতারপুরুষগণ। সেই বিস্মৃতপ্রায় মহৎ বাণীই আবার মহাকারুণিক স্বামীজীর কণ্ঠে নিঃসৃত হলো—"মানুষের সেবা কর"। সেবার মাধ্যমে পরের কল্যাণ তো হয়ই, নিজেরও আত্মিক উন্নতি আরও অধিক হয়। এই পরস্পর ভাবনা গীতারও বিশেষ শিক্ষা। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে আছে: "পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।"—পরস্পরের ভাবনার দ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করবে। পরস্পরের এই সেবাভাবের সঙ্গে স্বার্থত্যাগের ভাবনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই স্বামীজী সেবার সঙ্গে ত্যাগের ওপরেও সমানভাবেই জোর দিয়ে বলেছেন: "ত্যাগ ও সেবা—এই দুটি হচ্ছে ভারতের জাতীয় আদর্শ।" বলেছেন: ভারতবর্ষ যদি এই আদর্শ আবার গ্রহণ করে তখন তার অন্য সব সমস্যার আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যাবে।

সেবার অর্থ সবাই জানি, কিন্তু ত্যাগের অর্থ কি? আহার-বিহারে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে ছোটখাট যে ত্যাগ আমাদের অহরহ করতে হচ্ছে, এ ত্যাগের অর্থ তা নয়। এ হলো 'অহং'-এর ত্যাগ, স্বার্থপরতা ত্যাগ। এ বড় কঠিন ত্যাগ। 'কাঁচা আমি'কে বিসর্জন দিয়ে 'পাকা আমি'র সাধনা। এই ত্যাগের ফলে আমি সকলের সঙ্গে এক এবং আমি সকলের দাস, আমি কর্তা নই, যন্ত্রী নই, আমি যন্ত্র মাত্র—এই ভাবটি হৃদয়ে দৃঢ় হবে। এই অহমিকা দূর হলে তবেই আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারব, পরস্পরকে সাহায্য করার ও সেবা করার পথ সুগম হবে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভুক্তিমুক্তির বাসনাও ত্যাগ করতে হবে। প্রাচীন ভারতের রাজধর্মের কেন্দ্রে ছিল এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ। "প্রজানুরঞ্জনাৎ রাজা"। প্রজার কল্যাণই রাজার একমাত্র লক্ষ্য এবং যে রাজা এই লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন তাঁর পতন অনিবার্য হয়েছে। আমাদের উচ্চবর্ণের তথা অভিজাতশ্রেণীর ও শাসকশ্রেণীর মধ্যে কোটি কোটি অসহায় মানুষকে দাবিয়ে রাখার যে প্রবণতা, তাদের ওপর যে নির্মম শোষণ তা স্বামীজীর হৃদয়কে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করেছিল। সেই ক্ষোভ ও দুঃখ থেকে তিনি তাঁর শিষ্যদের বা গুরুভাইদের যেসব চিঠি লিখেছেন তা কালিতে ডুবিয়ে নয়—হৃদয়ের রক্তে কলম ডুবিয়ে।

পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন দরিদ্র ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশা, দেখেছেন তাদের ওপর উচ্চবর্ণের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন আচরণ, দেখেছেন ঈশ্বরের প্রতীক যে মানুষ তাকে কিভাবে পশুস্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে, দেখেছেন জগদম্বার অংশভূতা নারীর সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত হতে। এর প্রতিকারকল্পে তিনি মিথ্যা ক্রন্দন বা ক্রুদ্ধ গর্জন করেননি। তিনি দেশের সকল মানুষের কাছে, বিশেষতঃ যুবসমাজের কাছে তুলে ধরেছেন নতুন জীবনদর্শন যার মাধ্যমে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান সম্ভব। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা: "The poor, the down trodden, the ignorant, let these be your God. 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে না কি?" "সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু।" সম্প্রসারণ মানে প্রেম, সকলের প্রতি ভালবাসা। সঙ্কোচন মানে স্বার্থবুদ্ধি, হিংসা, ঈর্ষা ও আত্মকেন্দ্রিকতা।

এই জীবনদর্শনই ব্যবহারিক বেদান্ত। বেদান্তের এই ব্যবহারিক দিক বোঝার জন্য প্রথম প্রয়োজন গীতার মনন। গীতাপাঠ হিন্দুদের কাছে আবহমানকাল ধরে একটি নিত্যপালনীয় ধর্ম। কিন্তু গীতার প্রকৃত বক্তব্য আমরা কেউ কি অনুধ্যান করি? নিছক ধর্মাচরণের জন্য বা মানসিক শান্তিলাভের জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতাপাঠ করি। কিন্তু আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত গীতার যে মূলসুর, তা হলো: কর্ম কর। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্", "মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ", "সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্", "তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"। এটি আমরা কজন হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করি? গীতায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ—সর্ববিষয়ের কথা বলা হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিই ঈশ্বরলাভের পন্থা, তাও স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে গীতায় কর্মযোগের প্রাধান্য এবং এই কর্মযোগ যাঁরা ঠিক ঠিক অনুসরণ করতে পারবেন, তাঁরাই হবেন ভবিষ্যৎ ভারতের রূপকার—এই হলো স্বামীজীর অভিমত। এই যোগই যে ভারতের সনাতন ধর্ম, সে-কথা গীতাতেই পাই: "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্"—হে অর্জুন, সেই লুপ্ত ধর্মই আজ

তোমাকে বলছি, তুমি তা অবহিত হও। একা অর্জুনকে সম্ভাষণ করে শ্রীভগবান যে-কথা বলেছিলেন, হাজার হাজার শতাব্দী পার হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথাই সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশে বলেছেন—কর্ম কর। কিন্তু এই কর্ম করতে হবে দক্ষতার সঙ্গে। দক্ষতার চাবিকাঠি হচ্ছে যোগযুক্ত হওয়া। আজ আমরা দেশের উন্নতির জন্য কত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করি, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের এনে প্রচুর অর্থ লগ্নী করে কত নতুন ধরনের কলকারখানা স্থাপন করি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সার্থকতার মুখ দেখে না, অনেক পরিকল্পনা মাঝপথেই বাতিল হয়ে যায়। তার কারণ কি? কারণ এই যে, আমরা অর্থ, কারিগরি কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিকেই শুধু প্রাধান্য দিই। কিন্তু আধ্যাত্মিক চরিত্রবল, যা যেকোন কর্মের সার্থক রূপায়ণের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন, তার দিকে দৃষ্টি দিই না। যোগযুক্ত না হলে চরিত্রবল আসে না। চরিত্রে নৈতিকতা না থাকলে কর্মে সিদ্ধি ঘটে না। স্বামীজী এই সহজ সত্যটি জানতেন বলেই প্রথম থেকে শিক্ষাব্যবস্থার দিকে জোর দিয়ে বলেছেন: আমাদের চাই man-making education—মানুষ গড়ার শিক্ষা। যে-ধর্ম প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলবে, আমাদের সেই man-making religion আজ প্রয়োজন। স্বামীজী বলছেন: যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের—মানবদেহধারী মানুষের পূজা করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা। এর নাম কর্ম, ঘণ্টার ওপর চামর চড়ানো নয়।

আজ তাই সেই মহান যুগনায়কের নামে আমার তরুণ বন্ধুদের কাছে আবেদন—বেদান্তের মূলতত্ত্ব অনুধাবন করে শ্রদ্ধাবান হও, বীর্যবান হও, সেবাপরায়ণ হও। তোমাদের হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ হোক। গীতোক্ত কর্মযোগ মনন করে সেইভাবে নিজের জীবন গঠন করে স্বদেশবাসীর কল্যাণকল্পে নিজেকে উৎসর্গ কর। তোমাদের চরিত্রবল দেখে, তোমাদের আচরণ দেখে অপরে অনুপ্রাণিত হবে, তোমাদের অনুসরণ করবে এবং তখনই গড়ে উঠবে এক নতুন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা যা হবে সমগ্র বিশ্বের আদর্শ।

গীতা সম্বন্ধে বলা হয়: "সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। / পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥" সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের নির্যাস এই গীতাশাস্ত্র। এই গীতারূপ দুগ্ধামৃতের ভোক্তা আজ ভারতের তরুণসমাজ। এতদিন এই অমৃত আমরা শুধু রক্ষা করেই এসেছি, পান করিনি। কিন্তু পান না করলে কি শক্তি হয়? এই গীতামৃত আজ পান করতে হবে, আত্মসাৎ করতে হবে। তবেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রে শক্তিমান হব। বেদান্তের আলোকে চরিত্র গঠন করে চরিত্রবলে বলীয়ান হব। সেই অপরিসীম শক্তি নিয়ে যখন আমরা মাথা তুলে দাঁড়াব, তখন লোকে দেখবে এক দল নতুন মানুষ এসেছে। তাঁর পতাকাতলে সকলেই তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত হবে। যে চরিত্রবলে বলীয়ান, কর্মে তার সিদ্ধি করতলগত। তাই তরুণ বন্ধুদের আবার বলি, ভালভাবে গীতা অধ্যয়ন করে বেদান্তের কার্যকরী দিকটি নিজেদের জীবনে গ্রহণ কর। মনে রেখ,

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

পারমার্থিক বেদান্ততত্ত্বের সার্থকতা এই ফলিত প্রয়োগে, এই ব্যবহারিক রূপায়ণে। এরই নাম 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনা' এবং এই কাজ স্বামীজী তরুণ ও যুবসম্প্রদায়ের ওপরেই ন্যস্ত করেছেন।'*

* বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ২০ মে, ১৯৯০ পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণ।

অনুলিখন: সীতা রায়চৌধুরী ও
বাসন্তী মুখোপাধ্যায়

দেব-লগ্ন

শ্রীঅরবিন্দ

এমন অনেক মুহূর্ত আছে
যখন ভগবান এসে বিচরণ করেন
এই মানুষেরই মাঝে…
ভগবানের নিঃশ্বাস আমাদের প্রত্যহের
জীবনের ওপর দিয়ে হয় প্রবাহিত…

আবার এমন সময় আসে
যখন দেবতা বিমুখ হয়ে
ফিরে চলে যান…
তখন মানুষ তার আপন শক্তিতে
অথবা অহংকারের হীনতা নিয়েই
কাজ করে চলে…
প্রথমটি হচ্ছে সেই কাল
যখন অতি সামান্য আয়াসেই
বিপুল সাফল্য অর্জন করি—
নিয়তির চাকা ঘুরে যায়…
আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেই ক্ষণ
যখন একটু কিছু সাফল্যের জন্য
করতে হয় প্রাণান্ত প্রয়াস…
জানি, এ-ও সত্য—
শেষের মুহূর্তটি প্রথমটির প্রস্তুতিপর্ব মাত্র·
যজ্ঞের একটুখানি ধূম স্বর্গাভিমুখী হয়ে
ভগবানের অপার করুণারাশি
নামিয়ে নিয়ে আসে এই মর্ত্যের বুকে…

হতভাগ্য সেই মানুষ, সেই জাতি,
যখন দেবতার লগ্ন উপস্থিত—
দেখা গেল সে ঘুমিয়ে আছে, অপ্রস্তুত।
এই মুহূর্তকে কাজে লাগাবার
নেই সামর্থ্য তার…
জীবনের প্রদীপটি তখনো জ্বলা হয়নি
দেবতার আগমনীর জন্য…
শ্রবণ যে রুদ্ধ—
ভগবানের ডাক সেখানে পৌঁছায় না।
তার চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ এই ঃ
যারা শক্তিমান, যারা প্রস্তুত,
অথচ ক্ষমতার অপচয় করে চলেছে—
সদ্ব্যবহার করতে পারছে না সুযোগের
অপূরণীয় এই ক্ষতির জন্যে তাদের ক্ষমা নেই-
তাদের বিনষ্টি মহতী।

দেব-লগ্নে আপন অন্তরাত্মাকে
পবিত্র করে তোল—
আত্ম-প্রবঞ্চনা, কপটতা,
আর আত্ম-তোষণ থেকে…
দৃষ্টিপাত কর তোমার অন্তরের অন্তস্তলে—
আর শোন কার কণ্ঠের আহ্বান
ধ্বনিত হয় সেখানে…
তোমার প্রকৃতির সমস্ত কপটতা
একসময় ছিল বর্মের মতো
ভগবানের দৃষ্টির বিরুদ্ধে
আদর্শের আলোর বিরুদ্ধে…
এখন তারা তোমারই অস্ত্রে ছিদ্রের সৃষ্টি করে
ডেকে নিয়ে আসছে আঘাতকে…
আর এই মুহূর্তে যদি-বা তুমি জয়ী হও—
তোমার অবস্থা হবে আরো শোচনীয়…
পরে আসবেই আঘাত—
বিজয়ের গৌরবময় দিনে
সে তোমায় ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে চলে যাবে…

যদি পবিত্র হও
সমস্ত ভয় পরিহার কর…
এ বড়ো ভয়ংকর মুহূর্ত—
জ্বলবে আগুন, দেখা দেবে ঘূর্ণিবায়ু,
উঠবে ঝড় ঝঞ্ঝা, রুদ্রের তাণ্ডব পদাঘাতে

চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে সব…
তবু এরই মধ্যে যে-জন দাঁড়িয়ে থাকবে
আপন ব্রতের সত্যে অটুট সঙ্কল্প নিয়ে
সেই টিকে যাবে শেষপর্যন্ত…
পড়েই যদি-বা যায়
আবার সে উঠে দাঁড়াবে—
যদি দেখা যায় ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ
তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বহুদূরে—
সে আবার আসবে ফিরে…
সাবধান!
এজগতের রাক্ষসী মায়া
তোমার কানের কাছে এসে
তোমায় যেন না দেয় কোন কুমন্ত্রণা।
কেননা, এ যে অপ্রত্যাশিতের মহালগ্ন।… *

* 'The Hour of God'-এর অনুবাদ: কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

কোথায় রাখি

কঙ্কাবতী মিত্র

বুকের গভীরে তোমার সে কোন্ মূর্তি রাখব বল?
গাঢ় সবুজের ঘাসে মেশা ফিকে সবুজের
কোমল কোন প্রকাশ
নাকি উত্তাল সমুদ্রের পাশে
পাহাড়ের গম্ভীর মহিমা?

বুকের গভীরে ধরব কোন্ সুর?
যে সুর আমার কানে এগিয়ে দেয় সেই মন্ত্র
যে আমাকে স্থির করে উম্মাদনার কোন রাতে
নাকি বিষাক্ত রাত্রির ছলনায় সে সুর সরিয়ে নেয়
আমাকে নক্ষত্রের তলায়?

সে তোমার কোন্ মূর্তি?
যে আমার পাশে থাকে। সে আমার
পরাভব ঢেকে দেয়।

আমার শব্দে থাকে যার নাম বারবার
সে তোমার কোন্ মূর্তি বল?
কোন্ মূর্তি ধরে রাখব আমার বুকের তলায়?

মা দুর্গা

জয়নাল আবেদীন

ওমা দুর্গা,
তুমি আসছ নতুন সাজে
গাইছে শালিক, লতায় পাতায়
হাওয়ায় বাজনা বাজে।

ওমা দুর্গা,
তুমি আসছ নতুন রূপে—
ফুলের মালায়, আলতা রঙে,
করব বরণ ধূপে।

ওমা দুর্গা,
তুমি আসছ বাপের বাড়ি
ছোট বড় থাকবে নাকো
ভুলবে সবাই আড়ি।

ওমা দুর্গা
আমরা গরিব চাষা
সারা বছর রেখ সুখে
দিও ভালবাসা।

দুর্গা

সতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপরা দুর্গা
ওঁকারাত্মিকা ত্রিনয়নী দুর্গা।
হরিহরব্রহ্মা-পূজিতা দুর্গা
ত্রিভুবন-বিশ্বপ্রসবিনী দুর্গা—দুর্গা ॥

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী দুর্গা
অসুরবিনাশিনী চণ্ডিকা দুর্গা।
সর্বশক্তিময়ী মহামায়া দুর্গা
অনন্তলীলাময়ী অনন্যা দুর্গা—দুর্গা ॥

করুণা-নির্ঝর দয়াময়ী দুর্গা
স্নেহসুধাসিন্ধু জননী দুর্গা।
হিমগিরি-নন্দিনী পার্বতী দুর্গা
পল্লব-শস্য-মহীময়ী দুর্গা—দুর্গা ॥

অন্নদা প্রাণদা জ্ঞানদা দুর্গা
গুণদা সুখদা ভক্তিদা দুর্গা।
কলুষবিনাশিনী শুভদা দুর্গা
শত্রুনিপাতিনী অভয়া দুর্গা—দুর্গা ॥

শরণাগত ত্রাণকারিণী দুর্গা
রোগ-বিকার-তাপহারিণী দুর্গা।
শান্তিপ্রদায়িনী কল্যাণী দুর্গা
দৈন্য-দুঃখ-ভয়নাশিনী দুর্গা—দুর্গা ॥

চন্দ্র-সূর্য-তারাসেবিতা দুর্গা
আকাশ বাতাস জলে শব্দিতা দুর্গা।
বিচিত্র চরাচরে চিত্রিতা দুর্গা
জগদানন্দবিধায়িনী দুর্গা—দুর্গা ॥

বুদ্ধিতে বৃত্তিতে ভ্রান্তিতে দুর্গা
চিত্ত-বিত্তরূপে ইন্দ্রিয়ে দুর্গা।
রূপে-অরূপে পূজ্যা শিবজায়া দুর্গা
পরিণামদায়িনী তুমি মা দুর্গা—দুর্গা ॥

চিন্তনে কীর্তনে অনুভবে দুর্গা
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সর্বদা দুর্গা।
গুরুরূপে সাক্ষাৎ কৃপাময়ী দুর্গা
প্রণমি রামকৃষ্ণ-জায়া সারদা দুর্গা—দুর্গা ॥

রানী রাসমণি

অমূল্যরতন ভট্টাচার্য

সহস্রধারার মুখে কে মা তুমি
কৈবর্তের মেয়ে,
উপবিষ্ট যোগাসনে নিমিত্তমাত্রের মতো
নির্লিপ্ত বিনয়ে—
তোমার হাতের অন্ন খাবে বলে
হাত পেতে বসে আছে মৌন মহাকাল।
জাহ্নবীর পূর্ব তীরে জেগে ওঠে আশ্চর্য সকাল।

তোমার কাতর আর্তি স্বেদ হয়ে ক্ষরিল শিলায়
পাথরের মূর্তি ওঠে ঘেমে
দেবতা আসিতে চাহে মর্ত্যভূমে নেমে।
মানুষ না হলে তবু দেবতা জাগে না
সে-মানুষও আসে, মৃন্ময়ী দুয়ার খোলে
চিন্ময় লোকের,
মহাকালী কথা কয় মানুষের খোলে।
মাটির পৈঠার পরে রাখিয়া চরণ
দেবতার সে অবতরণ।

জানি নাতো কতকাল একান্তে দাঁড়িয়েছিলে
মন্দির-চত্বরে—অনধিকারিণী,
তোমারি পূজার ঘটে উজ্জীবিত এ যুগের
মৃতসঞ্জীবনী—রানী রাসমণি।
মন্দিরেরও আগে ভাবমূর্তি জাগে
তোমার অন্তর্লোকে জননীর সে কি জাগরণ।
তুমি তারে বাহিরের সূর্যালোকে,
পাষাণ বেদিতে চেয়েছিলে করিতে বরণ।

তারি তীব্র আকুতির টানে
অদৃশ্যলোকের পথে অগোচরে
ভাগবত ভক্ত ভগবানে
হয় জোটপাট,
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে নাট।

বকলমে পূজা তব
জগন্মাতার
প্রসাদে তাঁহার
মন্দির-প্রাঙ্গণে তব
দেবতা শরীর ধরি হাঁটিয়া বেড়ায়
বকলমে দিয়ে যাই মানুষের দায়।

আনন্দরূপ

শান্তি সিংহ

বালক বয়সে
একা-একা চলেছেন
আলপথে
টেঁকো-ভরা মুড়ি

কালো মেঘ ধেয়ে আসে
বাতাস প্রবল
দুলে ওঠে
আম-জাম-খেজুরের মাথা
জলভরা জাম-মেঘ
চিকনগভীর
সুদূরে দিগন্তে শ্যামরেখা…

হঠাৎ নজরে আসে
এক ঝাঁক দুধে বক
গতিশীল পাখার কাঁপন…

নিবিড় সঞ্চারী মায়া
লুপ্ত চরাচর
আনন্দের মধুর আবেশ।*

* উৎস : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, উদ্বোধন, ১৩১৫, 'অবতার জীবনে সাধকভাব', (২য় অধ্যায়, পৃঃ ৪৩-৪৪)

হে মহাপ্রেমবিদ্

ইউসুফ সেখ

জমিন থেকে উপড়ে যাবে যে-কোন উদ্ভিদ
প্রাণ থেকে মোর উঠবে নাকো তোমায় পাবার জিদ
চন্দনেরে ঘষলে শিলায়
শতাব্দী পরও গন্ধ বিলায়,
প্রেমার্চনা শেখাও আমায়, হে মহাপ্রেমবিদ্।

তব মানসবেলীর গন্ধবাহী
পবন আমার দিশার রাহী
আমি দেউলিয়া যা বিহনে
তাহাই মাগি সঙ্গোপনে
জানি না, কবে কোথায় পাব তোমার কৃপা-বারিদ।

জানি, ভাঙনশিলা ঠুনকো পুতুল,
নয় গল্পের চম্পা, পারুল,
যার আঁখি, ওষ্ঠ-পল্লবদ্বয়,
কল্পতরুর আদি কিশলয়,
সূর্য হিমেল ঝড়ের রাতে ছুটাও তাদের নিদ।

দূর-বিজন বীথির দুষ্ট কাঁদন
থামবে যেদিন, হে মহাজন
মোর ভাসা কাঠ, তোমার তরণী,
এক মোহানায় হবে গো মেলানি
সে দিন হবে গন্ধবহ আসল খুশির ঈদ
প্রেমার্চনা শেখাও আমায়, হে মহাপ্রেমবিদ্।

আত্মার দীপ

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সমস্ত দীপ নিবে গিয়েছিল
কুয়াশায়।
অস্তিত্বেই ভর করেছিল
একলাই।

খেলা ও খেলনা বস্তুজগৎ
হলো সার।
অহমিকা ছিল, যেন সম্রাট
আঁধারের।

পুড়ে গেল এক নয়ন জুড়ানো
আগুনে।
জ্বলে উঠেছিল আত্মার দীপ
সত্তায়।

তখনই দেখল, এই সংসার
হাহাকার।
আত্মার দীপ দুহাতে ধরল
পৃথিবী।

বেলুড়ে এক সন্ধ্যা

প্রসিত রায়চৌধুরী

চপল বাসনা সহসা এখানে চুপ,
পাশেই বহিছে গেরুয়া জলের ধারা
ওপারে মায়ের মন্দির অপরূপ,
আকাশেতে ফোটে দু-একটি করে তারা।

এখানে বাতাস বিদ্যুতে যেন ভরা,
চমকিত হয় শিহরিত হয় প্রাণ,
বজ্রবাণীতে থরো থরো কাঁপে ধরা,
কানে বাজে আজো, "ওঠ জাগো" আহ্বান।

বিক্ষত প্রাণ জুড়ালো এখানে এসে
পেলাম শান্তি, প্রাণের আরাম,—
কে গো তুমি এলে মানুষের বেশে
চিরসুন্দর, নয়নাভিরাম।

জানি একদিন, জগৎ আসিবে হেথা,
পাতিবে আতুর তৃষ্ণার অঞ্জলি,
চিত্ত ভরিয়া শুনিবে তোমার কথা,
মিশিবে প্রীতিতে, বিরোধের গ্লানি ভুলি।

আগমনী

অমিয়া ঘোষ

এসেছ শরতে সারদাদুলালী।
শারদধরণী হাসিছে তাই;
আজি এ পুণ্য-প্রভাতে তোমার জ্যোতিতে,
ভরে গেছে সারা বিশ্বটাই ॥
এসেছ দুর্গা। শারদা-উমা।
বিশ্বনিখিল করিতে ত্রাণ;
তোমারি কৃপা জ্ঞান ও আলোকে
দাও মা ভরিয়ে নিখিল প্রাণ ॥
নব চেতনায় জাগাও জননী,
যারা আছে মোহতন্দ্রাতুর;
ভেদের গরল, মোহের কালিমা
ধরা হতে তুমি করো মা দূর।
নিখিল পরাণে বাঁধো সযতনে,
তোমার সাম্য-মৈত্রী ডোর;
চির-শান্তি প্রেম-অমৃতে
নিখিল বিশ্ব হোক বিভোর।
প্রণমি চরণে শুভদা বরদা অভয়া সারদা শ্রীদুর্গে,
বরাভয় কৃপা, কল্যাণী শিবা, দাও সন্তানবর্গে ॥

ঈশ্বরের খোঁজে

নীহার মজুমদার

একজন ঐশী পাগল, নাম গদাধর—
ডাক নাম গদাই,
বোধহয় মিলিয়ে নাম রাখা।
পাগলঠাকুর ঘোরে দিনরাত
ঈশ্বরের খোঁজে ॥
লেখাপড়া বিষয় বিত্ত পড়ে রয়,
গাঁয়ের বধূরা ওকে সখী ভাবে।
গদাধর আসে কলকাতায়
পাগল অনড়—ঈশ্বরের খোঁজে ॥
পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো,
মোটা কাপড় হাঁটু ছাড়িয়ে
চলে সে—
বিনোদিনী দাসীর চৈতন্যকে দেখতে;
গিরিশের গালমন্দ—উপরিপাওনা।
সত্যি ও বেশ আছে ॥
রামকেষ্ট, অলক্ষ্যে যুগলবন্দী—হাসে
মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, তালহীন চিন্তা, চলাফেরা
তবুও ওঁর কাছে পিঁড়ি পাতে
কেশব, শিবনাথ, বিজয়, অশ্বিনীকুমার
আরও কতশতজন, কে জানে বাপু।
সত্যি ও বেশ আছে ॥
ঐশী পাগল দু-হাত তুলে নেচে নেচে
স্বর্গের শেষ ধাপ পেরিয়ে গেয়ে ওঠে
ঐ শিব এরা। আমি তোদের মাঝে থাকি
যতদিন আছি থাকতে দে নারে।
ওখানেই ঈশ্বরের আড্ডা; সব্বাই ওর শিব
ও পেন্নাম করে কেঁদে ভাসায়।
এতক্ষণে জেনে ফেলেছি
আমি দক্ষিণেশ্বরে—
সামনে: গদাধর চাটুজ্যে, রামকৃষ্ণ ॥

প্রতীক্ষা

নিমাই মুখোপাধ্যায়

নিঃশব্দ পায়ে পায়ে তুমি এগিয়ে যাও।
রোজ রোজ আমি তোমার সেই পায়ের চিহ্ন দেখে
জীবনের ভেলা ভাসাই।
কেউ কেউ তোমায় প্রত্যক্ষ দেখেছে
সকালে ওঠা সূর্যের মতো লাল
কিম্বা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো।
আমি এক বিষণ্ণ বিকেলে
তোমার পায়ের চিহ্ন দেখে হাঁটতে হাঁটতে
আজ তোমার দরজায় এসেছি।
তুমি কি দরজা খুলবে না?
যদি না খোল, আমি এখানে বসে থাকব
নচিকেতার মতো
যতক্ষণ না দেখা দাও।

খোঁজ

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

সে একদিন শূন্যে আঙুল তুলে
নীল দেখিয়েছিল
সে একদিন রত্নাকরে ডুব দিয়ে
তুলে এনেছিল রক্ত-প্রবাল
জড়িয়েছিল নিসর্গ মায়ায়
প্রাণের স্বভাব লিখে দিয়েছিল পোড়া প্রাণে
ছেঁড়া-খোঁড়া এই অতি ধূসর কাগজে।
তার মানে খুঁজতে খুঁজতে
দুপুরের গায়ে এসে রঙ লাগে
সেই রঙ যখন গাঢ় হয় আরো ঘন হয়
তখন সেই বোধের বাগানে
হেসে উঠেছিল ফুল, ডেকে উঠেছিল পাখি।
সদ্যোজাত শিশুর উল্লাসের মতন
শুভ্র সকাল ফুটে উঠেছিল দশদিক॥

প্রতীক্ষা

অরুণকুমার দত্ত

আমরা সবাই জানি, স্বামীজী,
আমাদের দেশ কত প্রিয় ছিল তোমার কাছে,
কত পবিত্র ছিল এর প্রতিটি ধূলিকণা,
কত গভীর ছিল তোমার আত্মপ্রত্যয়ঃ
এদেশ আবার উঠবে,
প্রতিষ্ঠিত হবে সগৌরবে স্বমহিমায়।
তারপর অতিক্রান্ত হয়েছে দীর্ঘকাল,
নানা দেশের মতো
তোমার স্বপ্নের ভারতেও
ঘটেছে কত পরিবর্তন।
তবু ধর্মের নামে এখনো এখানে
মাথা তুলে দাঁড়ায়
বিভেদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর,
জাতপাতের যূপকাষ্ঠে
বলিদান হয় অসহায় দুর্বলের,
নরনারায়ণের মুখে এখনো
অন্ন জোটে না দুবেলা দুমুঠো,
নীতিহীনতার ঘুণপোকা
সমাজদেহ কুরে কুরে খায় অনায়াসে।
অথচ দেশবাসীর কথা ভেবেই
সহায়সম্বলহীন হয়ে তুমি ঘুরে বেড়িয়েছ
আসমুদ্রহিমাচল,
ধনীর বিলাসব্যসন করেছ প্রত্যাখ্যান,
উপেক্ষা করেছ মান ও যশের প্রলোভন,
অঙ্গীকার করেছ
বারম্বার দুঃখ ও যন্ত্রণা।
আজ আমাদের বড় প্রয়োজন
এমন অকপট ভালবাসার
এমন অগ্নিময় বিশ্বাসের
এমন উন্মুখ সেবাপরায়ণতার।
আমরা তাই প্রতীক্ষা করে রইলাম
তোমার পুনরাবির্ভাবের,
হতাশা ও বিভ্রান্তির
ঘন তমসা ভেদ করে
নতুন সূর্যোদয়ের।

প্রবন্ধ

সন্ধিপূজা

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

দুর্গাপূজায় অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিতে দেবীর যে বিশেষ পূজা হয় সেই পূজাই 'সন্ধিপূজা' নামে খ্যাত। অষ্টমীর শেষ চব্বিশ মিনিট এবং নবমীর প্রথম চব্বিশ মিনিট—এই মোট আটচল্লিশ মিনিটের মধ্যে এই পূজা সমাপন করতে হয়। সন্ধিপূজা খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ। ভক্তমানসে এই পূজার একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা রয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস, দেবী এই সময় প্রতিমায় আবির্ভূতা হন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা মনে পড়ে। ঘটনাটি এরূপ ঃ

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ভাদ্র মাস। শ্রীরামকৃষ্ণ কঠিন গলরোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার সুবিধার জন্য ভক্তরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে একটি বাড়িতে এনে রেখেছেন। প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ক্রমে শারদীয়া দুর্গাপূজার দিন এগিয়ে এল। সে-বছর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছেন। শ্যামপুকুরের অনতিদূরেই সুরেন্দ্রের বাড়ি। তাঁর দুঃখ—অসুস্থতার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে পূজায় যোগদান করা সম্ভব নয়। পূজা যথারীতি আরম্ভ হয়েছে। মহাষ্টমীর দিন বিকালে অনেক ভক্ত শ্যামপুকুর বাটীতে সমবেত হয়েছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের) সুধাকণ্ঠে ভক্তিগীতি শুনতে শুনতে উপস্থিত সকলে আনন্দে আত্মহারা। দেখতে দেখতে রাত সাড়ে সাতটা হয়ে গেল। সচকিত হয়ে ডাক্তার সরকার বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস—তখন অষ্টমীর সন্ধিপূজার লগ্ন। অবচেতনায় এই শুভক্ষণ অন্তরে সঞ্চারিত হওয়াতেই শ্রীরামকৃষ্ণের এই দিব্য সমাধি। সমাধিভঙ্গের পর তাঁর ঐ সময়কার দর্শন সম্বন্ধে তিনি ভক্তদের বলেছিলেন ঃ "এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে। তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতি-রশ্মি নির্গত হইতেছে। দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে মা মা বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণের কথামতো সকলে তখনই সুরেন্দ্রের বাড়ি গিয়ে জানতে পারলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থায় দৃষ্ট ঘটনাই যথার্থ। যাহোক, এবার আমরা আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। সন্ধিপূজার মাহাত্ম্যবর্ণনে পুরাণে আছে ঃ

> অষ্টমীনবমীসন্ধিকালোঽয়ং বৎসরাত্মকঃ।
> তত্রৈব নবমীভাগঃ কালঃ কল্পাত্মকো মম॥[২]

—অষ্টমী-নবমীর সন্ধিকালের পূজা একবছরের তুল্য। অর্থাৎ দেবীর বর্ষব্যাপী পূজায় যে-ফল হয়, সন্ধির অষ্টমীভাগে একবার পূজা করলে সে-ফলের তুল্য ফল হয়। আর কল্পকাল পূজা করলে যে-ফল হয় সন্ধির নবমীভাগে পূজা করলে সে-ফল হয়।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ১৩৫৮, সাধকভাব, ৮ম অধ্যায়, পৃঃ ১৬০

২ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।২৯

রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের হয়ে ব্রহ্মা দেবীর বোধন করেছিলেন আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে ঃ

ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ কৃতো ময়া ॥
তস্মাদদ্যার্দ্রয়া যুক্তনবম্যামাশ্বিনে শুভে।
রাবণস্য বধং যাবদর্চয়িষ্যামহে বয়ম্ ॥[৩]

—ব্রহ্মা বললেন, হে দেবি, রাবণের নিধনের জন্য এবং শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে অকালে আমরা তোমার বোধন করছি। আজ শুভ আশ্বিন মাসের আর্দ্রাযুক্ত কৃষ্ণা নবমী তিথি। এই শুভদিনে আমরা সংকল্প করছি আজ থেকে যতদিন পর্যন্ত না রাবণ বধ হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা তোমার পূজা করে যাব।

এই বলে অন্যান্য দেবগণ সহ ব্রহ্মা দেবীর স্তব করতে লাগলেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবী নিদ্রা ত্যাগ করে জাগরিতা হলেন এবং দেবগণকে তাঁদের প্রার্থিত বর প্রদান করলেন। দেবী বললেন, "আমার বরে আজ মহাবল রাক্ষস কুম্ভকর্ণ এবং ত্রয়োদশী তিথিতে লক্ষ্মণের অস্ত্রে অতিকায় নিহত হবে। অমাবস্যার নিশীথে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করবেন। প্রতিপদে মকরাক্ষ এবং দ্বিতীয়াতে দেবকান্ত রাক্ষসগণ নিহত হবে। সপ্তমীতে আমি রামচন্দ্রের অস্ত্রে প্রবেশ করব। অষ্টমীতে রাম-রাবণে ভয়ংকর যুদ্ধ হবে। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিতে রাবণের দশ শির ছিন্ন হবে। কিন্তু তার মৃত্যু হবে না। রাবণের দশ মস্তক পুণর্যোজিত হয়ে বারবার তাকে জীবিত করবে। অবশেষে নবমীর অপরাহ্নে রাবণ বধ হবে।"[৪] দেবী যেমন বলেছিলেন ঠিক সেভাবে অষ্টমী-নবমীর সন্ধিতে রামচন্দ্র রাবণের দশমুণ্ড ছেদ করেছিলেন—"পাতয়ামাস দশ বৈ মস্তকান্ কালসন্ধিকে।"[৫] আর অবশেষে নবমীর অপরাহ্নে রামচন্দ্রের হাতে রাবণ নিহত হলেন—"নবম্যামপরাহ্নে বৈ পাতয়ামাস রাবণম্।"[৬]

সন্ধিপূজায় দেবীর আবির্ভাব হয় চামুণ্ডারূপে। চামুণ্ডার ধ্যানে আছে ঃ

নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্বাহুসমন্বিতা।
খট্বাঙ্গং চন্দ্রহাসঞ্চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে ॥
বামে চর্ম চ পাশঞ্চ ঊর্ধ্বাধোভাগতঃ পুনঃ।
দধতী মুণ্ডমালাঞ্চ ব্যাঘ্রচর্মধরা বরাম্ ॥
কৃশাঙ্গী দীর্ঘদংষ্ট্রা চ অতিদীর্ঘাতিভীষণা।
লোলজিহ্বা নিম্নরক্তনয়না নাদভৈরবা ॥
কবন্ধবাহনাসীনা বিস্তার-শ্রবণাননা।
এষা তারাহ্বয়া দেবী চামুণ্ডেতি চ গীয়তে ॥[৭]

—দেবী চারহাত-বিশিষ্টা, তাঁর রঙ নীলপদ্মের পাপড়ির ন্যায় শ্যামবর্ণা। তাঁর দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ঊর্ধ্ব ও অধঃ ক্রমে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস। বাম হস্তদ্বয়ে অনুরূপভাবে চর্ম ও পাশ। গলদেশে মুণ্ডমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, তিনি কৃশাঙ্গী, দীর্ঘদশনবিশিষ্টা, দীর্ঘাঙ্গী কিন্তু অতি ভীষণা। তিনি লোলজিহ্বা ও আরক্তনয়না। এজন্য তাঁর মূর্তি আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। তিনি কবন্ধবাহনে আসীনা এবং তাঁর কর্ণ ও মুখ অতিবিস্তারা। এই দেবীই তারা ও চামুণ্ডা নামে খ্যাত।

সন্ধিপূজায় দেবীকে দীপমালা প্রদান পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহুশিখাযুক্ত (সাধারণতঃ ১০৮টি শিখাযুক্ত) দীপমালা দেবীকে নিবেদন করা হয়। দীপমালা নিবেদনের মন্ত্রে আছে ঃ

"সংসারধ্বান্তনাশায় পবিত্রজ্যোতিরাপ্তয়ে।
দত্তেয়ং গৃহ্যতাং দেবি কৃপয়া দীপমালিকা ॥

—হে দেবি, সংসাররূপ অন্ধকার নাশ করবার জন্য এবং পবিত্র জ্যোতি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত এই দীপমালিকা কৃপাপূর্বক গ্রহণ কর।

সংসাররূপ অন্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানসূর্যের উদয়েই পূজার সার্থকতা।

৩ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।১৪-১৫
৪ ঐ, ২২।২০-২৫
৫ ঐ, ২২।৪৮
৬ ঐ, ২২।৪৯
৭ কালিকাপুরাণ, ৬১।৮৮-৯৯

নিবন্ধ

"সৌম্যাসৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জগজ্জননীকে যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার পরম মাহাত্ম্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা মায়ের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবিয়া বিস্ময়ে আকুল হন, আনন্দে স্তব্ধ হন। এই বৈশিষ্ট্যটি মায়ের রূপ। চণ্ডী একটি শ্লোকার্ধে ইহার কিছু আভাস দিয়াছেন। (প্রথম অধ্যায়, ৮১ শ্লোক)। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য সজীব ও নির্জীব পদার্থকে আমাদিগকে সর্বদা দেখিতে হয়। প্রত্যেক পদার্থের একটি রূপ আছে। কোনও রূপ দেখিয়া আমরা আকৃষ্ট হই, আনন্দ পাই; কোনও রূপকে বলি কদাকার, কোনও রূপ দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হই। বিশ্বজননীর রূপের প্রসঙ্গে চণ্ডী বলিতেছেন, তিনি 'সৌম্যা'। যে-রূপে কোনও চঞ্চলতা নাই, যে-মূর্তির অবয়ব সংস্থানে কোনও অসামঞ্জস্য নাই, যাহা দর্শককে একটি প্রশান্ত আনন্দে ভরপুর করে সেই রূপের নাম সৌম্য বলিতে পারা যায়। সৌম্য রূপ হাটে-বাটে মিলে না। কিন্তু কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ—কোনও সংসারে গৃহকর্ত্রী অনেক কাজে ব্যাপৃতা থাকিয়াও চিত্তের সাম্য কখনও হারাইতেছেন না। চারটি ছেলেমেয়ের পঞ্চাশটি আবদার হাসিমুখে পূরণ করিতেছেন। স্বামীর কোনও অসন্তোষ বা তিরস্কার ধীরভাবে সহ্য করিতেছেন। পাড়াপড়শীর সহিতও তাঁহার একটি মৈত্রী ও সহানুভূতির সম্পর্ক। মহিলাটি প্রশংসায় উদাসীন, নিন্দায় অচঞ্চল। তিনি হয়তো ফর্সা অথবা কালো। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার সংসারে গর্ব করার অনেক কিছু থাকিলেও চালচলনে কথাবার্তায় সে-গর্বের বিন্দুমাত্র প্রকাশ তাঁহাতে নাই। এমন নারীকে 'সৌম্যা' বলিতে পারা যায়। চণ্ডীগ্রন্থের ঋষি জগন্মাতার মূর্তিকে সংজ্ঞিত করিলেন 'সৌম্যা' বলিয়া।

অপবিত্র মনে মায়ের এই সৌম্য চেহারার কোনও দাম নাই। কামনা-বাসনা বা অন্য হীন স্বার্থ যাহাদিগকে কলুষিত করিয়াছে তাহাদের মাতৃমূর্তিকে অসৌম্যা বলিতে লজ্জা হয় না। ঋষি বলিতেছেন, পাশব দৃষ্টিতে যদি জননীকে কুৎসিত বলিতে চাও তো বলিতে পার। মায়ের মহিমার তাহাতে কোনও হানি হইবে না। যাহা অসৌম্যা তাহাও মায়েরই বিভূতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ নারীমাত্রকেই মা বলিয়া জানিতেন। প্রলোভন-দুষ্ট নারীমূর্তিও ঠাকুরের প্রণম্যা ছিল। যুগে যুগে কামুক দৈত্য, দানব, অসুরগণ জননীর সৌম্য রূপকে পায়ে দলিয়া অপমানিত করিয়াছে। মানুষও যখন রিপুর তাড়নায় অসুরের স্তরে নামিয়া আসে, নারীর মঙ্গলময়ী প্রকৃতিকে লাঞ্ছিত করে তখন সে দণ্ডযোগ্য। মা সেই নরাকার পশুকে নানাভাবে শাসন করেন। মন্দবুদ্ধির জন্যই আমরা জননীর সৌম্য রূপ ভুলিয়া যাই। ইহা মহামায়ারই মায়া। দুর্বুদ্ধি দিয়া মা বাঁধেন, সুবুদ্ধি দিয়া তিনি মুক্ত করেন। ঋষিবাক্য—"অশেষসৌম্যেভ্যঃ তু অতিসুন্দরী"। ত্রিসংসারে যত প্রকার সৌম্যরূপের কথা শুনিয়াছ মায়ের রূপ তাহাদের সকলকে ছাড়াইয়া যায়। দেবতা বল, যক্ষ রক্ষ অপ্সরা কিন্নরী বল, মায়ের রূপের কাছে উহারা সবই মলিন। মা "অতিসুন্দরী"। সেই অতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করা মানুষের সাধ্যাতীত।

জগন্মাতা পর্বতশিখরে বসিয়া আছেন। দেবতারা শুম্ভ ও তাহার ভাই নিশুম্ভ—এই দুই মহাসুরের অত্যাচারে বড়ই বিপন্ন হইয়া আকুল-ভাবে দেবীর স্তব করিয়াছেন। মাতা সাড়া

দিয়াছেন। চারিদিকে তিনি তাঁহার দিব্য রূপে ছড়াইয়া, সাজিয়া গুজিয়া হিমালয় পর্বতের একটি চূড়ায় সমাসীনা। দানবদলনের সূত্রপাত। শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড ঘুরিতে ঘুরিতে পাহাড়ের উপর সেই সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া প্রভুর নিকট গিয়া নিবেদন করিল—মহারাজ, এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীলোক পাহাড়ের উপর বসিয়া রহিয়াছেন, দেখিলাম। তাঁহার রূপে সমগ্র হিমালয় যেন আলোকিত। আপনাদের দুই ভাইয়ের তো ধন-সম্পত্তির অভাব নাই। কিন্তু এই স্ত্রীরত্ন যেকোনও প্রকারে আহরণ করিতে না পারিলে আপনার ভাণ্ডার অপূর্ণ রহিবে। দৈত্যরাজ শুম্ভ চণ্ড-মুণ্ডের কথা শুনিয়া সুগ্রীব নামে একজনকে দূতরূপে দেবীর নিকট পাঠাইলেন। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল তাহা চণ্ডীগ্রন্থের পাঠকের সুবিদিত। সুগ্রীব দৈত্যরাজ শুম্ভের পরাক্রম ও নানা ঐশ্বর্যের বর্ণনা করিল। দৈত্যরাজ শুম্ভ পর্বতের উপর আসীনা সুন্দরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে চান, তাহাও বলিল। অতএব মহাপরাক্রান্ত শুম্ভ অথবা তাঁহার ভাই নিশুম্ভকে তিনি বিবাহ করিতে সম্মতা হউন, শুম্ভের এই বক্তব্য সে জানাইয়া দিল। দেবী শুনিয়া মৃদু হাসিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা সুগ্রীবকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাকে যদি দৈত্যরাজের স্ত্রীরূপে পাইতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। দূত সুগ্রীব শুনিয়া অবাক। কোথায় স্বর্গের দেবতাদের নিগ্রহকারী মহাপরাক্রান্ত দানবরাজ শুম্ভ আর কোথায় এই একাকিনী নিঃসহায়া নারী!

সুগ্রীব ফিরিয়া আসিয়া দৈত্যপতির কাছে দেবীর উদ্ধত বাক্য জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া শুম্ভ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইলেন এবং একের পর এক দৈত্যসেনাপতি ও সৈন্যদের বলপ্রয়োগ করিয়া দেবীকে ধরিয়া আনিতে প্রেরণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে দেবী সমগ্র অসুরসৈন্য ধ্বংস করিয়া পরিশেষে নিশুম্ভ ও শুম্ভকে বধ করিলেন।

এই ঘটনা পরম্পরার মধ্যে "সৌম্যেভ্যঃ অতি-সুন্দরী" জগন্মাতার রূপবৈভব নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যেকটি রূপ কি আমাদের ধ্যানের বস্তু নয়? চতুরঙ্গ সৈন্যযুক্ত চণ্ড-মুণ্ড ছুটিয়া আসিতেছে দেবীকে ধরিতে। দেবীর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তাহার পর, তাঁহার ললাট-ফলক হইতে ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা "শুষ্কমাংসাতি-ভৈরবা জিহ্বাললনভীষণা" রক্তনয়না কালীরূপের আবির্ভাব হইল। এই ভয়ঙ্কর রূপে দেবী মহা-সুরদের বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৈরবনাদিনী কালী 'হং' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। যিনি "অশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতি-সুন্দরী" তিনিই এই ভীষণদর্শনা রণরঙ্গিণী মহাকালী। মায়ের রূপের পরিমাপ কে করিবে? স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে মায়ের যে ভয়ঙ্কর রূপ ধরা পড়িয়াছিল তাহা তিনি 'Kali the Mother' কবিতায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উহা কি ভক্তি-ভালবাসা মাখা নয়? উহা কি দুর্বল পাঠককে ভয় দেখাইবার জন্য? স্বামী বিবেকানন্দ 'ভয়ঙ্করের উপাসনা'র কথা বলিতেন। মানুষের চোখ দিয়া আমরা যাহাকে ভীষণ বলি তাহা সর্বরূপময়ী মায়েরই রূপ। যে-সাধক অতি ভীষণা মাতৃমূর্তিকে অতি সুন্দরী বলিয়া ভাবিতে পারে, সে জগজ্জননীর ত্রিগুণাতীত পরমসত্যকে জানিবার যোগ্যতা লাভ করিতেছে।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ ধ্যানবলে পরাশক্তি মহেশ্বরীর সহিত তাদাত্ম্যবোধ করিয়া নিজের সর্বব্যাপিনী শক্তি ঘোষণা করিতেছেন: "জানো কি আমি কে? আমি সামান্যা নারী নহি। আমি একাদশ রুদ্রের রুদ্রত্ব, অষ্টবসুর অষ্ট অভিব্যক্তি আমিই, দ্বাদশ আদিত্যের তেজ আমারই তেজ। আর যত দেবতার কথা শুনিয়াছ তাহারা আমারই রূপ। আমি জগতের ঈশ্বরী, নিখিল জীবের অন্তরে চৈতন্যরূপে বিরাজিতা। প্রাণিদেহের পরিপুষ্টি আমারই শক্তিতে। ত্রিপুরবিজয়কালে রুদ্রের ধনু আমিই বিস্তার করিয়াছিলাম। আমি যাহার উপর তুষ্ট তাহাকে তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি করিতে পারি, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা করিতে পারি। শ্রদ্ধা করিয়া শুন। আমি সামান্যা নারী নহি। কার্যকারণপ্রবাহ আমা

হইতেই প্রসারিত হইতেছে। অথচ আমি কিছুতেই আসক্ত নহি। আমি বায়ুর ন্যায় বহিয়া চলি, কিছুতেই লিপ্ত হই না।" (ভাবার্থ) মায়ের এই যে সর্বব্যাপিনী শক্তি ইহাকে মায়ের 'রূপ' বলিতে বাধা কি? সংস্কৃত ভাষায় মহামায়ার কত স্তব-স্তুতি রচিত হইয়াছে। এই সকল রচনায় রচয়িতাদের কল্পনায় দেবীর নানা কল্যাণ-গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা যখন ভক্তিভরে এই সকল স্তোত্র পাঠ করি তখন আমাদের মনশ্চক্ষুতে কত আশ্চর্য মূর্তি দর্শন করি। চণ্ডীর ঋষি যে জগজ্জননীকে 'অতিসুন্দরী' বলিয়াছেন তাহা দেবীর শুধু দেহের নয়, তাঁহার হৃদয়ের, প্রাণের, বাক্যের এবং অদৃশ্য নানা শক্তির সকল অভিব্যক্তি-কেই বুঝায়। অনন্তরূপিণীর রূপ শুধু চক্ষু দিয়া দেখিবার নহে। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ই মায়ের শক্তি ও মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে। বিশ্বপ্রকৃতির নানা ক্ষেত্রে মায়ের সৌন্দর্য ছড়াইয়া আছে। ঐ যে বাগানে বড় শেফালী গাছটির তলায় স্তবকে স্তবকে ফুলের ভার পড়িয়া আছে, সারা রাত ধরিয়া নিঃশব্দে সঞ্চিত হইয়াছে, সূর্যোদয়ের আগে উহার দিকে তাকাইলে প্রাণ ভরিয়া যায়। যেন প্রতিটি ফুলের মধ্যে মায়ের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাতে সাজি লইয়া পূজারী যখন অতি সন্তর্পণে ফুলগুলি সাজিতে কুড়াইয়া লন তখন তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি উথলিয়া উঠে।

মেঘমুক্ত মহাকাশের দিকে উপরে তাকাইয়া দেখ। দূর দূরান্তর ধরিয়া আকাশের পরিব্যাপ্তি 'অতিসুন্দরী'রই আর এক প্রকাশ। আবার কালো মেঘ যখন আকাশকে ছাইয়া ফেলে তখন টপ টপ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে থাকে, সেই টপ টপ শব্দ বাড়িয়া যখন ঝপ ঝপ শব্দে জলের ধারা পৃথিবীতে নামিয়া আসে তখন মায়ের আর এক রূপের পরিচয় পাই। সেই রূপকে আমরা চোখ দিয়া দেখি, কান দিয়া শুনি।

বাংলার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত (১ম ভাগ) উপন্যাস হইতে কিছু উদ্ধৃতি ঃ

'অন্ধকারের রূপ'

"রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড়পর্বত, জলমাটি, বনজঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই।?... এই যে আকাশ বাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ-রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি।"

মহানির্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্র হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব ঃ

"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্।"

—ত্রিলোকে যাহা কিছু ভয়াবহ সেই ভয় তোমারই রূপ, তুমি ভীষণ হইতেও ভীষণ। সকল প্রাণীর তুমিই গতি, যেখানে যত পাবনশক্তি তাহা তোমারই শক্তি। যাঁহারা উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন তুমিই তাহাদের একমাত্র নিয়ন্তা, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব তোমা হইতেই, বিশ্বসংসারে যে-সকল শক্তিদ্বারা রক্ষিত তুমিই তাহাদের রক্ষক।

মহামায়ার 'অতিসুন্দরী' রূপের মধ্যে পরব্রহ্মের সকল শক্তি, সকল করুণা, সকল আনন্দ নিহিত। বাক্য দিয়া তাহা বর্ণনা করা যায় না। শরণাগত ভক্তের উপলব্ধিতে কিছু কিছু ধরা পড়ে।

মাধুকরী

দুর্গোৎসব

কি সভ্য, কি অসভ্য, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই উৎসবের মধুর নামে উন্মত্ত। ইহা আমাদিগের প্রকৃতির একটি অনুকূল সৃষ্টি। সকল দেশে সকল কালে এবং সকল জাতিতেই ইহার আধিপত্য আছে। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন ও বিদ্রোহ আসিয়া সমস্ত ছারখার করিতেছে, কিন্তু উৎসব বিলুপ্ত হইবার নয়। ফলতঃ যেখানে মনুষ্যের নামগন্ধ সেইখানেই উৎসব।

দুর্গোৎসব হিন্দুজাতির একটি মহোৎসব। ইহার সহিত ইতিহাস, দর্শন, সমাজ ও সময়ের বিশেষ সংস্রব দৃষ্ট হয়। এই উৎসবের নামমাত্রে স্মরণ হয় যেন রাজা সুরথ বিপক্ষের হস্তে হৃতসর্বস্ব হইয়া একাকী ভগ্নমনে বনপ্রবেশ করিয়াছেন, একজন ধর্মদর্শী মহর্ষি তাঁহাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেছেন এবং দুর্গাদেবীর আরাধনায় উৎসাহিত করিতেছেন। আবার স্মরণ হয়, যেন অযোধ্যাপতি রাম ভার্যার জন্য অতিমাত্র কাতর, মহাবল কপিবল সাহায্যে লঙ্কাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার জয়শ্রী লাভের জন্য ব্রহ্মা বেদমন্ত্রে দুর্গাদেবীর বোধন সাধন করিতেছেন। এই প্রাচীনকালের ঘটনা মনকে অধিকার করে বলিয়া ইহা মহোৎসব।

দ্বিতীয়টি দর্শন। হিন্দু দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞানময়ী শক্তিকে সৃষ্টির মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি, পালন ও সংহার এই শক্তিরই আয়ত্ত। পৌরাণিকেরা সম্ভবতঃ এই বিজ্ঞানময়ী শক্তিকে দুর্গামূর্তি রূপে কল্পনা করিয়া থাকিবেন। এইজন্য দুর্গাদেবী আদ্যাশক্তি নামে অভিহিত হন। এই আদ্যাশক্তির পূজাকালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ ও হোম করা হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বা সপ্তশতী সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উহা রূপকচ্ছলে প্রকৃতি বা বিজ্ঞানময়ী শক্তিরই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং হোমের যেরূপ প্রক্রিয়া তাহা পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে যে সৃষ্টি হয় উহা তাহাই গূঢ়ভাবে প্রদর্শন করিতেছে। ইহা দ্বারা দুর্গাদেবী যে মূল শক্তিরই মূর্তি তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই দুর্গাদেবীর অপর নাম মহামায়া। মায়া বলিলে তাহার সহিত দয়া, স্নেহ প্রভৃতি মঙ্গলভাবের সম্বন্ধ হৃদ্বোধ হইয়া থাকে। পৌরাণিকেরা যে-রূপে দুর্গাদেবীর মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ সোপকরণ যুদ্ধের একটি আদর্শ পাওয়া যায়। মহামায়া অমঙ্গল বা অসুরের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। মহামায়া পার্থিব যুদ্ধোপকরণ বিদ্যা ও ধন লইয়া সিংহবিক্রমে অমঙ্গলকে পরাস্ত করিতেছেন। তাঁহার একদিকে গণাধীশ্বর, অপরদিকে সেনাপতি। দুর্গোৎসবের নামে এই দার্শনিক ব্যাপারটি মনে উদিত হয়। এইজন্য ইহা মহোৎসব।

তৃতীয় সমাজ। এই উৎসবে সমাজের বহুতর আয়োজন। লোকে সংবৎসর কাল মিতাচারে অবস্থানরূপ ধন সংগ্রহ করিয়াছে, এখন তাহা ব্যয় করিবার সময় উপস্থিত। হিন্দুজাতি স্বার্থপর নয়, কেবল স্ত্রীপুত্র ইহাদের সর্বস্ব নয়। ইহারা লৌকিকতা রক্ষা করা বিলক্ষণ বুঝে।

স্বসম্বন্ধী স্বগন্ধী কে কোথায় আছে এই সময়ে তাহার তত্ত্ব লওয়া হয়। ফলতঃ এসময়ে হিন্দুসমাজ একটি নূতন জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বিদেশী কর্মস্থান হইতে বিদায় লইয়াছে, বহু দিবসের পর গুরুজনের শ্রীচরণ দর্শন করিবে, পত্নী উৎসুকমনে পথের পানে চাহিয়া আছে, তাহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিবে, শিশুগুলি চটুল নেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবে, এবং বন্ধুবান্ধব বহুদিন যাবৎ দূরে আছেন তাঁহাদিগকে পাইয়া সুখী হইবে। এইজন্যই দুর্গোৎসব মহোৎসব।

চতুর্থ সময়। এখন শরৎকাল, আকাশে নীলরাগে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, মেঘ নির্জল ও শ্বেতবর্ণ, উহা সমুদ্রে ফেনপুঞ্জের ন্যায় অনন্ত আকাশের বক্ষে বিচরণ করিতেছে, চন্দ্রমণ্ডল নির্মল, জ্যোৎস্নাজাল রজতধারার ন্যায় নিপতিত হইয়া ধরাতল অভিসিক্ত করিতেছে, বৃক্ষে নানাবর্ণের পুষ্প, নদীসকল স্বচ্ছ, পথ কর্দমশূন্য, সমস্ত প্রকৃতিই যেন উৎসবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত ; শস্য পরিপক্ক হইতেছে, তদ্দৃষ্টে সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট। দুর্গোৎসব এই শরতের উৎসব। এইজন্যই ইহা মহোৎসব।

এই উৎসব কোন্ সময়ে হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত হয় যদিও তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়, কিন্তু, এই উৎসবের সহিত যে যুদ্ধ-সংস্রব আছে তাহা বিলক্ষণ অনুমান হয়। প্রবাদ এইরূপ, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় এই উৎসবের প্রথম অবতারণা হয়। এই সিদ্ধান্ত কতদূর সপ্রমাণ তাহা বলা যায় না, কিন্তু যুদ্ধকালে যে দুর্গাদেবীর আরাধনা হইত তাহা সুস্পষ্টই বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন আরও দেখা যায়, পূর্বকালে জিগীষু রাজগণ বিজয়া দশমীর দিন যুদ্ধযাত্রা করিতেন। বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে ঐ দিনে যুদ্ধোপকরণ অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হইত।

দুর্গোৎসব কেবল বঙ্গদেশের নয়, ইহা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় এই উৎসব দশাহ নামে প্রসিদ্ধ। এই উৎসব থাকাতে এতদ্দেশীয় শিল্প নানারূপ শিল্পের উদ্ভাবন করিতেছে, বাণিজ্য সজীব রহিয়াছে, নৃত্যগীত বিলুপ্ত হয় নাই, কবিত্ব অপ্রতিহত স্রোতে চলিতেছে, দয়া নির্বাণ হয় নাই, প্রীতি, স্নেহ নূতন বলে আবির্ভূত হইয়া থাকে, এবং শত্রুতা বিদূরিত ও সদ্ভাবও বদ্ধমূল হয়। ফলতঃ এই উৎসবের উপকারিতা যথেষ্ট। ইহা দ্বারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের ধর্মভাবও রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই উৎসবের যেরূপ গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা, যদি তাহা মূর্তিবিশেষের প্রতি নিয়োজিত না হইয়া অন্তর-ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে ইহার শোভা কতই না বৃদ্ধি পাইত! যাহা হউক, এই উৎসবে হিন্দুসমাজের যতটুকু উপকার তাহা কিছুতেই অস্বীকার করি না ; গুরুজনকে প্রণিপাত, স্নেহের পাত্রকে আশীর্বাদ এবং প্রীতিভাজনকে আলিঙ্গন এই সমস্ত সুরীতি অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু এই উৎসব প্রসঙ্গে যে ভয়ানক পাপাচারসকল প্রশ্রয় পায়, মদ্য যে অতিমাত্রায় হৃদ্য হইয়া উঠে আমরা হৃদয়ের সহিত তাহা ঘৃণা করিয়া থাকি।*

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৯৮ শক, ৩৯৮ সংখ্যা।

সংগ্রহ ঃ আলপনা ভট্টাচার্য

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দময়ীর আবির্ভাব

মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

জগজ্জননী মা আনন্দময়ী আসিবেন, তাই ঋতুরাজ শরৎ তাঁহার অগ্রদূত সাজিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। প্রকৃতিদেবী শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজার জন্য বিশ্ব-মন্দিরকে নানাপ্রকার সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া যেন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিচিত্র নক্ষত্রমালায় সুশোভিত স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল বিমল গগনতল রমণীয় চন্দ্রাতপে পরিণত। অসংখ্য তরুলতা কোমল কিশলয়দলে শোভিত। স্থানে স্থানে নব-দূর্বাদল দ্বারা পূজার অর্ঘ্যপাত্র স্থাপিত। শ্রীশ্রীমহামায়ার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য প্রকৃতি যেন বৃক্ষের শাখায় শাখায় নানাপ্রকার পুষ্পগুচ্ছ সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ভক্ত ভাবুকগণের মনপ্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে। কারণ, এই নিরানন্দ ধরাধামে মা আনন্দময়ী আবার আসিতেছেন।

গত বর্ষেও এমনভাবেই শরৎ আসিয়াছিল এবং জগজ্জননীও আসিয়াছিলেন। তাঁহার শুভাগমনে দেশে যেন একটা নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল, নিদ্রালস হৃদয়ে একটা জাগরণের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আধিব্যাধি শোকসন্তাপ ও দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত বঙ্গীয় নরনারীর অবসন্ন হৃদয়ে কয়দিনের জন্য যেন অপার আনন্দমন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়াছিল, আশার আলোকসম্পাতে বঙ্গজননীর মলিন মুখে বিমল হাসির রেখা দেখা দিয়াছিল এবং বিষাদকাতর হৃদয়ের মধ্যেও যেন নবীন উৎসাহ ও অদম্য উদ্যমের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল, ঐন্দ্রজালিকের মায়ার মতো ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকল নরনারী অকস্মাৎ আনন্দকোলাহলমত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের কর্মফলে—পাপপ্রবৃত্তি ও অনাচারের দোষে সে-আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। মা আনন্দময়ীর বিসর্জনের বাজনার সংগে সংগেই যেন সব থামিয়া গিয়াছিল। তাঁহার অন্তর্ধানে সেই পূর্বাবস্থা উপস্থিত হইল, দিন দিন দুঃখ-দুর্দশার মাত্রা বাড়িয়া চলিল এবং আধিব্যাধি শোকসন্তাপ প্রভৃতি অনর্থরাশি আসিয়া দেশের শান্তিসুখ ধ্বংস করিতে লাগিল। দুর্বলের উপর প্রবলের আক্রমণ, ধর্মের নামে অধর্মের প্রশ্রয়, দয়ার নামে পরপীড়ন, ত্যাগের নামে ঘৃণ্য স্বার্থ-পরতা ও আসুরী শক্তির প্রবল আক্রমণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইভাবে এই এক বৎসর কাল ভাল মন্দ কত শত ঘটনাবলী আমাদের সম্মুখে আসিল, আবার জলবুদ্বুদের ন্যায় অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গেল, কেহ কাহারও অপেক্ষা করিল না। যাহারা রহিল, তাহারা ক্ষণেকের জন্য নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তি ও সিদ্ধিলাভের আশায় অপরীক্ষিত নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। কেহ বা দুরাশার কুহকে পড়িয়া অতীতের সহিত ভবিষ্যৎকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া বর্তমানের আকারে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিল ; কিন্তু সে-সংগ্রামে জয় হইল না, এবং শান্তি বা সিদ্ধির দ্বারও উন্মুক্ত হইল না, ফলে আশার পেটিকাও পূর্ণ হইল না। এরূপ অবস্থায় কেহ বা আপনার অক্ষমতা বুঝিয়া পথ ছাড়িয়া পশ্চাদাবর্তন করিতে বাধ্য হইল, কেহ বা আবার পদে পদে প্রতিহত হইয়াও মোহবশে অন্ধের ন্যায় বিঘ্নবহুল সেই অপরীক্ষিত পথকেই সিদ্ধির সোপান মনে করিয়া ধরিয়া রহিল। কিন্তু যাঁহার শাসনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী নিজ নিজ কক্ষে যথানিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে, জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে বাহিরে যাঁহার মহনীয় মহিমা প্রকটিত রহিয়াছে, যাঁহার অমোঘ ইঙ্গিতে জীবজগতে উত্থান পতন ও জয় পরাজয় সংসাধিত হইতেছে, আর বিশ্বের বিশ্বাসভাজন পরম সুহৃৎ উপনিষদ্ শাস্ত্র—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

বলিয়া যাঁহার অচিন্ত্য মহিমার কথা তারস্বরে কীর্তন করিয়াছে এবং জগতে সকলের উপর সমভাবে যাঁহার অমৃতময় করুণাধারা সতত ক্ষরিত হইতেছে, তাঁহার দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিতেছে না—তাঁহার মঙ্গলময় অঙ্গুলি-নির্দেশ দেখিয়াও দেখিতেছে না ; সকলেই যেন মুখ ফিরাইয়া অন্ধের অনুকরণ করিতেছে। ইহা মোহেরই প্রভাব। তাই উপনিষদ্ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন।"

সকলেই সেই লীলাময়ের বিচিত্র লীলা দর্শন করে এবং সেই লীলাবৈচিত্র্যেরই সমালোচনা করিয়া দিন অতিবাহিত করে, কিন্তু যিনি সেই লীলার নায়ক, তাঁহাকে কেহই দেখে না, বা দেখিবার চেষ্টাও করে না! মোহবশে অবোধ সন্তানগণ বিমুখ বা বিপথগামী হইলেও সন্তান-বৎসল পিতামাতা কখনই বিমুখ বা সন্তানের কল্যাণ সাধনে উদাসীন থাকেন না। তিনি বিবিধ উপায়ে অজ্ঞানোপহত সন্তানগণের মলিন হৃদয়ে নিজের বিশ্বজনীন মহিমার প্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন। শরতের শুভাগমনও তাহারই একটি প্রতীক।

তিনি বহুরূপীর ন্যায় অচিন্ত্য মহিমাপ্রভাবে আবশ্যকমতো কখনো স্ত্রীরূপে, কখনো পুরুষ-রূপে, কখনো বা অন্যবিধরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগজ্জীবের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং শরণাগত ভক্তগণের সর্ববিধ বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার করুণার নিদর্শন। ভগবচ্ছক্তি মা ভগবতী অসুর সংহারের পর শরণাগত দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন ঃ

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥"

শক্তিরূপেই হউক আর শক্তিমান পুরুষরূপেই হউক, কেবল শত্রুসংহার ও সম্পৎপ্রদানই অবতারের মূর্তরূপ পরিগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। যাহারা স্বল্পবুদ্ধি মলিনহৃদয়, তাহাদের মন স্বভাবতই বহির্মুখ—ব্যবহারজগতের ভাল-মন্দ বস্তু গ্রহণেই অভ্যস্ত, সে-মন কখনই অলৌকিক কোন বিষয় ধারণায় আনিতে পারে না, সুতরাং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্ময় বস্তুর স্বরূপ চিন্তা করা তাহাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। অথবা যাঁহাকে দেখা যায় না এবং অনুভবেও ধরা যায় না, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বা প্রেম কিছুই সম্ভবপর হয় না, সুতরাং অর্চনারও অবসর থাকে না। এই জন্যই অল্পবুদ্ধি লোকও যাহাতে তাঁহার অর্চনার অধিকার পাইতে পারে, সেইজন্যই চক্ষুগ্রাহ্য মূর্ত রূপে তাঁহার আবির্ভাব আবশ্যক হয়। সেরূপ শক্তিই হউক বা শক্তিমান পুরুষই হউক, শক্তি ও শক্তিমান যখন বস্তুতঃ এক এবং উদ্দেশ্যও যখন অভিন্ন, তখন এই রূপভেদ লইয়া শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের কলহ মোটেই স্থান পাইতে পারে না। স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত ধর্মশাস্ত্র এই অবতারবাদের উপর নির্ভর করিয়া বিবিধ আখ্যায়িকা প্রচার করিয়াছে। বেদেও অল্পাধিক পরিমাণে অবতারবাদের সূচনা রহিয়াছে। সম্ভব হইলে সময়ান্তরে সে-কথার আলোচনা করিব। সে যাহা হউক, আমরা শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা বলিতেছিলাম, এখন সে-কথাই বলিব।

দুর্গাপূজা ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ প্রচলিত অনুষ্ঠান। বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও দশভুজা মূর্তির পূজা প্রচলিত আছে বলিয়া জানি না। তবে সে-সকল দেশেও নবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নবরাত্রি ব্রতে দশভুজা দুর্গার পূজা হোম চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি সকল কার্যই অনুষ্ঠিত হয়, কেবল মৃন্ময়ী দশভুজা মূর্তি স্থাপন ও তদুপরি পূজানুষ্ঠান হয় না। মূর্তিতেই বঙ্গ-দেশের বৈশিষ্ট্য। ভক্ত ভাবুক বাঙ্গালী যখন নয়ন-মনোহর কমনীয় কান্তি সেই মাতৃমূর্তি সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিযুক্তচিত্তে নানাবিধ উপচারে তাঁহার অর্চনা করে, তখন তাহার হৃদয়ে যে অপূর্ব শ্রদ্ধা ভক্তি আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়, সে-রস অন্যের পক্ষে অনুভব করা সম্ভবপর হয় না। এই যে মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া মা ভগবতীর অর্চনা-পদ্ধতি, ইহা বাঙ্গালী হিন্দুগণের একটা মনগড়া কল্পনা মাত্র নহে, এবং আধুনিকও নহে, ইহা প্রাচীন—অতি প্রাচীন প্রামাণিক পুরাণ-শাস্ত্র ইহার উপদেশক। মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে, রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি ঋষিবর মেধসের

প্রমুখাৎ জগজ্জননী মা ভগবতীর অপূর্ব মহিমা ও অভীষ্ট প্রদানশক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি এতই অনুরক্ত হইলেন যে—"তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্।/অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥" তাঁহারা উভয়ে নদীতীরে গমন করিলেন এবং 'মহীময়ী' (মৃন্ময়ী) মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুষ্প ধূপাদি দ্বারা দেবী ভগবতীর অর্চনা করিয়াছিলেন। কেবল মার্কণ্ডেয় পুরাণে কেন, মৎস্যপুরাণ, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি বহু পুরাণেই দশভুজা ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজাপদ্ধতি সন্নিবদ্ধ আছে। এই জন্য প্রচলিত দুর্গাপূজা পৌরাণিক পূজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রেও দুর্গাপূজার বিধান রহিয়াছে। বেদের মধ্যে পূজাপদ্ধতি না থাকিলেও দুর্গামূর্তির একটি অস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে দুর্গা বা ভগবতী নাম নাই, আছে উমা হৈমবতী নাম।

সামবেদীয় 'তলবকার' উপনিষদে (প্রসিদ্ধ কেনোপনিষদে) একটি আখ্যায়িকায় ঐ রূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আখ্যায়িকাটির বিষয় হইতেছে দেবাসুর সংগ্রাম। দেবাসুর বিরোধ ও তন্নিবন্ধন যুদ্ধবিগ্রহ সর্বজনবিদিত। দেবগণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন, আর অসুরগণ রজোগুণসম্পন্ন। সত্ত্বগুণ স্বভাবতই রজোগুণ অপেক্ষা দুর্বল; সুতরাং প্রত্যেক যুদ্ধেই দেবগণ অসুর-বলের নিকট পরাজিত হইতে লাগিলেন এবং ইহার ফলে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন দেবগণ আপনাদের শক্তিদৌর্বল্য বুঝিতে পারিয়া ঐশী শক্তির শরণাপন্ন হইলেন, এবং সকলে মিলিত হইয়া তাঁহারই উপাসনায় রত হইলেন। দেবগণের উপাসনায় তিনি প্রীত হইলেন, এবং আপনার শক্তিকণা দেবতাগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। দেবতারা বলীয়ান হইয়া অসুরগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ইহাতে দেবগণ বিজয়ী হইলেন, আর অসুরগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। এদিকে দেবগণ বিজয়গর্বে মত্ত হইয়া ঈশ্বর বা ঐশ্বরী শক্তির কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া বিজয়োৎসব করিতে লাগিলেন। সেখানে সকলেই নিজ শক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া বিজয়ের উৎকৃষ্ট ভাগ পাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই ঈশ্বর বা ঐশী শক্তির নামও করিলেন না। তখন ঈশ্বরীয় মহাশক্তি গর্বোদ্ধত দেবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য অদূরে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃরূপে আবির্ভূত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত একে একে অনেককেই পাঠাইলেন। সকলেই হতমান হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন, কেহই তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং সেই জ্যোতির সমীপে গমন করিলেন। তিনি নিকটবর্তী হইবামাত্র সেই জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইয়া গেল, তিনি দেখিলেন :

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম
বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্।"

পূর্বে যেখানে জ্যোতিঃ ছিল, সেই আকাশমণ্ডলেই বহু শোভাযুক্তা একটি স্ত্রীমূর্তি—যিনি হৈমবতী উমা। এখানে 'হৈমবতী' শব্দে হিমালয়ের কন্যা অথবা হেমময় অলঙ্কারযুক্তা—দুই অর্থই হইতে পারে, কিন্তু 'উমা' শব্দের যথাশ্রুত অর্থই ঠিক।

'উমা' ও 'হৈমবতী' মা দুর্গার অভিধান-প্রসিদ্ধ নাম। সুতরাং হৈমবতী উমা যে, আমাদের পরমারাধ্যা দুর্গামূর্তি ভিন্ন আর কেহ নন, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এখানে হৈমবতী উমা আবির্ভূতা হইয়া দেবগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, জগতে যেখানে যেখানে বিজয়, সেখানেই তিনি। তিনিই বিজয়ের একমাত্র কর্ত্রী, জীব উপলক্ষ মাত্র।

বিজয়লাভের পর দেবতাগণ গর্বোদ্ধত হইয়া মহাশক্তিকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি আসিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন। আমাদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। আমরাও কার্যসিদ্ধির জন্য মার আরাধনা করি, কার্যসিদ্ধি হইলেই তাঁহার কথা ভুলিয়া যাই। তাই জগজ্জননী মা ভগবতী আমাদের মোহ ও গর্ব নষ্ট করিয়া প্রবোধ দিবার জন্য বর্ষে বর্ষে দয়া করিয়া আগমন করেন। তাঁহার চরণকমলে কোটি কোটি নমস্কার।*

* উদ্বোধন, ৪২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃঃ ৪৬৭-৪৭০

প্রবন্ধ

দুর্গাপূজা এবং জাতীয় সংহতি

হরিপদ আচার্য

মহাপূজা দুর্গাপূজা একটি মহামিলনের উৎসব। বাঙালী-জীবনে এই মহোৎসবের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এই উৎসবের সূচনা গণদেবতার প্রতি সম্মিলিত আবাহন দিয়ে আর সমাপ্তি বিজয়ার মিলন-মধুর আলিঙ্গন ও মিষ্টিমুখ দিয়ে। দুর্গাপূজাকে কেউ বলেন শারদোৎসব, কেউ বলেন বিজয়োৎসব, কারো মতে মহাপূজা, কারো মতে অকালবোধন, আবার কারো মতে কলিকালের অশ্বমেধযজ্ঞ।

দুর্গাপূজা প্রথম কিভাবে প্রবর্তিত হলো এবং প্রথম এই পূজা কে, কবে ও কোথায় করেছিলেন এবিষয়ে পুরাণগুলি বিভিন্ন মত পোষণ করে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ সংবাদে এবিষয়ে একটি তালিকা পাওয়া যায়—"প্রথমে বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবতী দুর্গার পূজা করেছিলেন, দ্বিতীয় বার মধুদৈত্য এবং কৈটভদৈত্যের ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্রহ্মা মহাদেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন, ত্রিপুরাসুরকে নিধন করার জন্য ত্রিপুরারি শিব তৃতীয়বার মহাশক্তি মহামায়া দুর্গার আরাধনা করেন আর চতুর্থবার মহামুনি দুর্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে পুনরায় সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যলাভের জন্য ভক্তি সহকারে দেবী ভগবতীর অর্চনা করেন। সেখানে নারদের প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণ বলেছেন :

> "প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা।
> বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে॥
> মধুকৈটভভীতে চ ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
> ত্রিপুরপ্রেরিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা॥
> ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্ দুর্বাসসঃ পুরা।
> চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী॥১

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, মেধামুনির উপদেশে মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য সমাধি আশ্রমের নিকটবর্তী নদীতীরে দেবী দুর্গার মাটির মূর্তি তৈরি করে পুষ্প, ধূপ, দীপ (হোম) ও নৈবেদ্যাদির দ্বারা দেবীর পূজা করেছিলেন। সেখানে ঋষি বলেছেন :

> "তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্।
> অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥"২

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে : অন্য কল্পে মেধামুনির শিষ্য মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নদীতীরে অবস্থিত মেধামুনির আশ্রমে মাটির মূর্তিতে দেবী দুর্গার পূজা করেন এবং পূজার শেষে অভীপ্সিত বর লাভ করে সাশ্রুনয়নে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করে মৃন্ময়ী দেবীপ্রতিমা নির্মল এবং গভীর জলে বিসর্জন করেন। ঋষি বলেছেন :

> "কল্পান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
> রাজ্ঞা মেধসশিষ্যেণ মৃন্ময্যাঞ্চ সরিত্তটে॥
> তুষ্টাব রাজা বৈশ্যশ্চ সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ।
> বিসসর্জ মৃন্ময়ীং তাং গভীরে নির্মলে জলে॥"৩

এসকল পৌরাণিক কাহিনীর বিভিন্নতা দেখে ও তার আলোচনা থেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৫৭।২৯-৩১

২ চণ্ডী, ১৩।১০-১১

৩ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৫৭।৩৫, ৩৯

হয়, দুর্গাপূজা কে, কবে ও কোথায় প্রথম আরম্ভ করেছিলেন তা জানার জন্য আরো গবেষণা প্রয়োজন। তবে বর্তমানের দুর্গোৎসব বা মহা-মিলনোৎসবের পিছনে যে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠনমূলক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল এবং আছে—এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই উৎসবের প্রতিটি কাজে এবং অনুষ্ঠানে দেখা যায় মিলন, ঐক্য আর সংহতির চিন্তা ও চেষ্টা।

বর্তমানকালে যেরূপ প্রতিমায় এবং যে পদ্ধতিতে শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় তার প্রবর্তন এবং ক্রমবিকাশ কিভাবে এবং কবে থেকে হয়েছে, এবিষয়েও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে সুপণ্ডিত ও শক্তিশালী রাজা গণেশ এদেশে জাঁকজমক করে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। ঐতিহাসিকদের মতে রাজা গণেশ একজন পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতির সর্ব-প্রকারে উৎকর্ষ ঘটেছিল। তিনি নিজে ছিলেন একজন পরম শাক্ত। তিনি সর্বদা তাঁর ইষ্টদেবী দুর্গার নাম স্মরণ করে চলতেন। প্রতিদিন দুর্গার প্রার্থনা না করে কোন কাজে হাত দিতেন না। প্রজাদের মধ্যেও তিনি শাক্তধর্মভাব প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর মুদ্রাতে "চণ্ডীচরণ-পরায়ণস্য"৪ কথাটি উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। এর পিছনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক প্রজা যাতে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সব-সময় 'চণ্ডীনাম' উচ্চারণ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিদিন চণ্ডীনাম স্মরণ ও মননের দ্বারা সমস্ত অকল্যাণ দূর হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিষ্ঠাশীল পরিপোষক এবং পরম শাক্ত রাজা গণেশের অদম্য মনোবলও তিনি লাভ করেছিলেন পরমা শক্তি দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও বিশ্বাস থেকে। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা করে প্রতি বছর সকলকে সমবেত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতেন। এভাবে দুর্গা-পূজার সাধারণ মঞ্চে সকল হিন্দুকে সমবেত করে তাদের একতাবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। রাজা গণেশের রাজত্বকাল মাত্র সাত বছর। এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর জন্মভূমি শ্রীহট্ট অঞ্চলে এবং বিজিত ভূমি গৌড় অঞ্চলে শাক্ত-মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। শুধু হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই নয়, হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব এবং সম্প্রীতি রক্ষার জন্যও তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। গণেশের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ফেরিস্তার লেখা 'তারিখ-ই-ফেরিস্তা'য় পাওয়া যায়—"গণেশকে হিন্দু ও মুসলমানরা সমানভাবে ভালবাসতেন। তিনিও তাদের সঙ্গে পরিপূর্ণ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতেন।"৫ রাজা গণেশ তাঁর সকল প্রজাকে জাতিধর্মনির্বিশেষে মহামায়া ভগবতীর সন্তানরূপে দেখতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান প্রজা তাঁর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারেননি। মৌলবাদী মুসলমানরা তাঁর উদারতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের আগ্রাসী মনোভাব চরিতার্থ করার জন্য গণেশের রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয়নি।

অনেকে মনে করেন, বঙ্গদেশে মৃন্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজার প্রচলন করেন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সিরাজদৌল্লার সমসাময়িক। অর্থাৎ তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক। দুর্গাপ্রতিমার পূজা তার বহু আগেই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। তবে অধিকাংশ ঐতি-হাসিকের মতে, বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজসাহী জেলার তাহিরপুরের জমিদার রাজা কংসনারায়ণ এই পূজার প্রবর্তন করেন। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকে কংসনারায়ণের পিতামহ রাজা উদয়নারায়ণ জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের অভিলাষে প্রাচীনকালের কীর্তিমান রাজাদের মতো রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুকরণে ইষ্টিযাগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবিষয়ে তিনি সেসময়কার সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং

৪ বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়, ২য় সং, ১৯৬৬, পৃঃ ১৪৫

৫ ঐ, পৃঃ ১৪৭

ক্রিয়াকাণ্ডে পারদর্শী তাহিরপুরের রাজপুরোহিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রীর উপদেশ ও বিধান প্রার্থনা করেন। বহুদর্শী শাস্ত্রীমহাশয় কলিযুগে বেদ-বিহিত যাগযজ্ঞাদিতে না গিয়ে তাঁকে কলিকালের অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফলদানকারিণী দুর্গাপূজা করতে উপদেশ দেন। তিনি শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের মন্ত্র-সমূহের সমন্বয়ে তিনি একটি দুর্গাপূজা-পদ্ধতিও রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা উদয়নারায়ণ সে-পূজা করে যেতে পারেননি। উদয়নারায়ণের মৃত্যু হলেও অনেকে ভেবেছিলেন, তাঁর পুত্র দুর্গাপূজা সম্পন্ন করবেন। কিন্তু উদয়নারায়ণের পুত্র রাজকার্য এবং পূজার্চনাদি অপেক্ষা বিদ্যাচর্চাতেই অধিক মন দিলেন। তিনি বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াপদ্ধতিতে নানারূপ বিভিন্নতা লক্ষ্য করে স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনায় রত হন এবং কুল্লুকভট্ট পরিচয়ে 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামে মনুসংহিতার একটি টীকা রচনা করে বিখ্যাত হন। কুল্লুকভট্টের পুত্র কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা খরচ করে মৃন্ময়ী প্রতিমায় সাড়ম্বরে পিতামহের অভীপ্সিত দুর্গা-পূজা সম্পন্ন করেন। (কারও কারও মতে কংসনারায়ণ কুল্লুকভট্টের দৌহিত্র-বংশজ, কিন্তু অধিকাংশের মতে তিনি কুল্লুকভট্টের পুত্র।) কেউ কেউ মনে করেন, খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকেই বঙ্গদেশ এবং মিথিলায় দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে 'কালীবিলাসতন্ত্রে'র উল্লেখ করা যায়। সেখানে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী (বা জয়া-বিজয়া), অসুর, সিংহ সহ প্রতিমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। সে-তন্ত্রটির রচনাকাল নিঃসন্দেহে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে।

সে যাই হোক, কংসনারায়ণের পূজা নিছক একটি পূজাই ছিল না, তার পিছনে একটি রাজ-নৈতিক এবং সামাজিক সংহতির প্রেরণাও কাজ করেছিল বলে অনেকের ধারণা। হিন্দু-মুসলমানের মিলনচিন্তা এবং বিশেষ করে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসেই তিনি এত জাঁকজমক করে দুর্গাপূজা করেছিলেন। সে-উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর প্রজাদের ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সকলের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। মায়ের পূজার আনন্দের জোয়ারে জাতিধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সকল প্রজা একসাথে মায়ের পূজায় যোগদান করে ধন্য হয়েছিল। তাঁর পূজাপ্রাঙ্গণ সেসময় হয়ে উঠেছিল সকলের মিলনক্ষেত্র। ষোড়শ শতকের যে-সময়ে কংসনারায়ণ জাতীয় সংহতির চিন্তা করে-ছিলেন তার কিছুকাল আগে থেকেই সারা ভারতে একটা ঐক্য এবং সংহতির চিন্তা চিন্তাশীল মানুষের মনে উদয় হয়েছিল। তার আগের শতকে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁর প্রেমের ধর্মে উচ্চ-নীচ, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের মধ্যে হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করে সকল শ্রেণীর মানুষকে হরিনামের ঐক্যবন্ধনে বেঁধে-ছিলেন। যবন হরিদাসকেও তিনি তাঁর সম্প্রদায়-ভুক্ত করেছিলেন। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু কিছু মুসলমানের মনেও তিনি চেতনা জাগিয়েছিলেন। দিল্লীর সম্রাট আকবরও ষোড়শ শতকে 'দীন ইলাহী' ধর্ম প্রচার করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

দুর্গাপূজার মধ্যে একটা সার্বজনীনতা, সামগ্রিকতা এবং প্রাচুর্য লক্ষ্য করার মতো। এতে যেমন প্রয়োজন প্রচুর অর্থের, তেমনই প্রয়োজন প্রভূত লোকবলের। এমনকি তার উপকরণাদি সংগ্রহের মধ্যেও একটা বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য রয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই মহাপূজা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলেই নয়, এই পূজার মূর্তিতে, মন্ত্রে, উপকরণে, লৌকিকতায়—সর্বত্রই একটা সংহতির রূপ লক্ষ্য করার মতো।

প্রতিমায় সংহতি

পূজাটি দুর্গার। তাই মূল প্রতিমা দুর্গা। দেবীর আবির্ভাব মহিষাসুরমর্দিনীরূপে, তাই

সঙ্গে থাকবে দেবীর বাহন সিংহ ও মহিষাসুর। এখানে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অবস্থান অত্যাবশ্যক নয়। কিন্তু সংহতিসাধনের কারণেই প্রতিমায় তাঁদের আগমন। কার্তিকপুজো পূর্ববঙ্গ ও তামিলনাড়ু অঞ্চলের, গণেশপুজো মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মহীশূর অঞ্চলের অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব। লক্ষ্মীপুজো ভারতের সর্বত্র এবং সরস্বতীপুজো বিশেষ করে বাংলা ও উত্তর-ভারতেই অধিক প্রচলিত। কার্তিকপুজো পুত্রার্থীর, গণেশপুজো সর্বসিদ্ধিকামীর, লক্ষ্মীপুজো ধনাকাঙ্ক্ষীর আর সরস্বতীপুজো বিদ্যার্থীর উৎসব। দুর্গাপুজোয় কিন্তু সকলের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সবারই উদ্দেশ্য সামগ্রিক কল্যাণ। তাই মহাশক্তি দুর্গার পিছনের চালচিত্রে থাকেন মঙ্গলময় শিব। তাছাড়া চালচিত্রে হিন্দু ত্রিতত্ত্বের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং হিন্দুদের আরাধ্য প্রায় সব দেবতাই স্থান পেয়েছেন। কী চমৎকারভাবে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মিলন, ঐক্য ও সংহতির প্রচেষ্টা! অন্যান্য পুজোয় থাকে একটি প্রতিমা, কিন্তু এখানে রয়েছে সাতটি। এই প্রতিমাগুলি পৃথক হলেও এদের মূলসত্তা কিন্তু এক। শক্তি, অংশ বা কলাভেদে জগতের সকল দেবতা একই মহাশক্তির বিভিন্ন রূপমাত্র। চণ্ডীতে পাওয়া যায়, অসুররাজ শুম্ভের অভিযোগের উত্তরে দেবী দুর্গা নিজেই বলেছেন, এ-জগতে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় বলতে কেউ নেই। অন্যান্য দেবতার যেসব রূপ দেখা যায় সেসব একই মহাশক্তির বিভূতিমাত্র—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥"৬

মহাদেবী নিজ ঐশ্বর্য সহায়ে নিজেই বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন আবার নিজ বিভূতি সম্বরণ করে একাই সর্বত্র বিরাজ করেন। একের মধ্যেই বহুর প্রকাশ আবার বহুত্বের একত্বে পর্যবসান। একত্বেই মহাশক্তির প্রকাশ—সংহতিই শক্তি। প্রত্যক্ষে অনেক দেবতার পুজোর সমষ্টিতে দুর্গাপুজো হলেও পরিণতিতে "সর্বৈব তব পূজনম্।" সবই এক মহাশক্তির আরাধনা।

মন্ত্রে সংহতি

দুর্গাপুজোর মন্ত্রে রয়েছে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রের সমন্বয়। দেবীর অধিবাসের মন্ত্রগুলি প্রায় সবই বৈদিক, বোধনের মন্ত্রগুলিতে পৌরাণিক মন্ত্রের প্রাধান্য, বীজমন্ত্রগুলি সবই তান্ত্রিক আর পুজোর মন্ত্রে তান্ত্রিক, বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রসমূহের এক অপূর্ব মিলন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীপাঠ দুর্গাপুজোর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। চণ্ডীর প্রথম চরিত্রকে বলা হয় ঋগ্বেদস্বরূপ, মধ্যম চরিত্র যজুর্বেদস্বরূপ আর উত্তর চরিত্র সামবেদস্বরূপ। চরিত্রত্রয়ের মধ্যে বেদত্রয়ের এই সমন্বয় লক্ষণীয়। তিনটি চরিত্রের দেবতা ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী এবং মাহেশ্বরী। তাতেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—হিন্দু ত্রিতত্ত্বের সমন্বয়।

চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাদেবীর আবির্ভাব-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে : "দেবাসুরের একশ বছরের যুদ্ধে পরাজিত এবং স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের দুঃখের কথা চতুরানন ব্রহ্মার মুখে শুনে ক্রোধান্বিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সহ সমস্ত দেবতার দিব্যনেত্র থেকে নির্গত মহাতেজোরাশি একত্র মিলিত হয়ে এক অনুপম দেবীমূর্তির রূপ ধারণ করল—

"অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেব-শরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥"৭

সেই দেবীই প্রথম কাত্যায়ন মুনি পূজিতা কাত্যায়নী দুর্গা। দেবীর দেহগঠনের মধ্যেই কী অপূর্ব এক সংহতি ও ঐক্যের নিদর্শন! তারপর সে-দেবী সকল দেবতার দেওয়া অলঙ্কার আর অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিতা হয়ে অসুরদের উদ্দেশে অট্টহাসি হেসে বারবার হুঙ্কার দিতে লাগলেন। সংহতির

৬ চণ্ডী, ১০।৫

৭ ঐ, ২।১৩

কী বিরাট শক্তি! দেবতারা যতদিন ঐক্যবন্ধ হননি, যতদিন তাঁদের মধ্যে সংহতির অভাব ছিল, ততদিন তাঁরা ছিলেন স্বল্প শক্তির অধিকারী। আসুরিক শক্তিদ্বারা দৈবীশক্তি হয়েছিল পর্যুদস্ত। কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত দেবতারা যখন সমষ্টিগত প্রয়োজনে ঐক্যবন্ধ হলেন, সকলের শক্তি ও প্রচেষ্টা একত্রিত হলো, তখনই তাঁরা হলেন মহাশক্তিযুক্ত। মহাশক্তি হলেন তাঁদের সহায় এবং আসুরিক শক্তির বিনাশে তাঁরা হলেন সক্ষম। এ যেন সামগ্রিক এবং জাতীয় প্রয়োজনে সকল জাতি এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে মহামিলনের এক অপূর্ব ইতিবৃত্ত!

উপকরণে সংহতি

মহাপূজা দুর্গাপূজার উপকরণের প্রাচুর্যে একটি মিলনের সুর রয়েছে, যা অন্যান্য পূজায় বড় একটা দেখা যায় না। এই পূজায় বিশেষ প্রয়োজন নবপত্রিকা (কলাবউ), যাতে রয়েছে নয়টি গাছের সমন্বয়। মহীরুহ, ওষধি, লতা, গুল্ম সবেরই সমন্বয়। মহীরুহ অশোকের সাথে অতি সাধারণ অতি ছোট কালকচু গাছও স্থান পেয়েছে। উভয়েই দেবীরূপে সমভাবে পূজ্য। মহাস্নানে দরকার নানা স্থানের জল ও নানা জায়গার মাটি, যা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সর্বতীর্থের জলের জন্য পরিক্রমণ করতে হয় তীর্থে তীর্থে। দেবদ্বারের মাটির সাথে সমন্বয় করতে হয় রাজদ্বার আর বেশ্যাদ্বারের মাটির। উত্তরভারতের কোন লোক দুর্গাপূজা করতে চাইলে তাকে সাগরজল আনতে হবে দক্ষিণ থেকে, আবার সমতলবাসীকে সংগ্রহ করতে হবে পর্বতের মাটি আর ঝরণার জল। এ যেন পূজাকে উপলক্ষ করে সারা ভারতের এক মেলবন্ধন। সারা ভারতকে চেনাজানার এ এক অভিনব ব্যবস্থা! বিরাট সাগরের লবণাক্ত জলের সাথে ক্ষীণতোয়া সুনির্মল ঝরণাজলের, আকাশ থেকে পড়া বৃষ্টিজল আর শিশিরজলের সাথে নদীর জল ও পুকুরের জলের মেলবন্ধন। যেন বিরাটের সাথে ক্ষুদ্রের আর আকাশের সাথে মাটির মিলন। পঞ্চামৃতের সাথে এখানে হয়েছে পঞ্চকষায়ের সমন্বয়, জলের সাথে মাটির সমন্বয়। তাছাড়া পাঁচটি শস্যের, পাঁচটি পল্লবের, পাঁচটি রত্নের, পাঁচরঙা পতাকার, সবরকম ওষধির এবং জলজ পদ্মের সাথে স্থলজ অপরাজিতার অপূর্ব সমন্বয়। তাই বলা যায়, এই পূজায় সবই সমন্বয়। কোথাও বিভেদ নেই, বিচ্ছিন্নতা নেই—সর্বত্রই ঐক্য আর সংহতি। দুর্গাপূজার বাদ্যবাজনাতেও শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন সুর, তান, লয় এবং রাগরাগিণীর সমন্বয়বিধান করেছেন। দেবীর স্নানের সময় আটটি সুসজ্জিত ঘটে আটপ্রকার জল নিয়ে আটরকম রাগ-রাগিণী বাজিয়ে স্নান করাতে হয়। মালবরাগ বাজিয়ে প্রথম ঘটে, ললিতরাগ দ্বিতীয় ঘটে, বিভাসরাগ তৃতীয় ঘটে, ভৈরবীরাগ চতুর্থ ঘটে, কেদাররাগ পঞ্চম ঘটে, বরাড়ীরাগ ষষ্ঠ ঘটে, বসন্তরাগ সপ্তম ঘটে এবং ধানসীরাগ বাজিয়ে অষ্টম ঘটের জলে দেবীকে স্নান করানোর বিধি। তাছাড়া বিজয়বাদ্য ও শঙ্খবাদ্য বাজবে সবসময়। এ যেন নব রসে সঞ্চারিত নব রাগের ঐক্য সাধন!

লোকসংগ্রহে সংহতি

কথায় বলে, দুর্গাপূজা রাজরাজড়াদের পূজা। এই পূজা করতে বহু অর্থের প্রয়োজন। এই ব্যাপক সাংবৎসরিক উৎসবের সাথে মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র এবং পরবর্তী কালের জমিদারি এবং তালুকদারি তন্ত্রের যোগ রয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত শহরাঞ্চলের ধনী জমিদারদের দুর্গাপূজার উৎসবের খ্যাতি ছিল। গ্রামাঞ্চলেও মহাসমারোহে বার্ষিক দুর্গাপূজা জমিদার ও তালুকদারদের সামাজিক মর্যাদার একটা প্রধান চিহ্ন বলে পরিগণিত হতো। দোল-দুর্গোৎসব বনেদী পরিবারের আভিজাত্য রক্ষার জন্য অবশ্যকরণীয় ছিল। এই পূজায় শুধু অর্থবল থাকলেই হয় না, উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য বহু লোকবলেরও প্রয়োজন। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করতে গেলে এই পূজায় কমপক্ষে তিনজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন—

পূজক, তন্ত্রধারক ও চণ্ডীপাঠক। পূজার মন্ত্র উচ্চারণ ও অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণের দরকার যতখানি, মূর্তি তৈরি এবং সাজসজ্জাদির জন্য শিল্পীর ভূমিকাও কম নয়। তাছাড়া উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জীবিকা ও বর্ণের মানুষের যথা, মালী, জোলা, তাঁতি, কর্মকার, কুম্ভকার, হাড়ি, ডোমেরও প্রয়োজন আছে। জন্মাষ্টমীর দিন সকালবেলায় সূত্রধরের দেবীর কাঠামো তৈরি থেকে পূজার আয়োজনের শুরু। সকালবেলা সূত্রধর কাঠ বা বাঁশ দিয়ে প্রতিমার কাঠামো তৈরি করলে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে সে-কাঠামো পুকুর বা নদী থেকে ধুয়ে আনা হলো, তারপর সদ্যস্নাত ব্রাহ্মণ তাতে সিন্দুর ও ধান-দূর্বা দিয়ে প্রথমে বরণ করে পূজার আয়োজনের সূচনা করলেন। তারপর ডালা, কুলা ও ঝুড়ি তৈরির ভার পেল হাড়ি বা ডোম, মাটির হাঁড়ি-কলসী তৈরির দায়িত্ব পেল কুম্ভকার, বলির জন্য খাঁড়া প্রস্তুত করবে কর্মকার, মণ্ডপ তৈরি করবে ঘরামি, প্রতিমা তৈরির দায়িত্ব মৃৎশিল্পীর, ডাকের সাজের ভার শোলার শিল্পীর। তাঁতি জোগাবে কাপড় আর গামছা, মালী জোগান দেবে ফুল-দূর্বা, বেলপাতা, তুলসী আর মালা। এ-প্রসঙ্গে শশীভূষণ দাশগুপ্তের উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ "দুর্গাপূজায় প্রথমাবধি সবই উৎসব। সে উৎসব একজনের নয়, যাঁহারা বাড়িতে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করেন শুধু তাঁহাদের উৎসব নয়। যাঁহারা পূজা করেন এবং যাঁহারা না করেন সকলেরই উৎসব—ইহা বাংলার শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সৌর-গাণপত্য নির্বিশেষে—এমনকি কিছুদিন পূর্বপর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে—আমাদের জাতীয় উৎসব। বাড়িতে পূজা করি আর না করি, নব বস্ত্র এবং নব পোশাক-পরিচ্ছদ সকলেরই পরিতে হইবে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, আড়শী-পড়শী লইয়া আনন্দ কোলাহল এবং খানিকটা 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বাংলার ঘরে ঘরেই শোনা যাইত। তাহার পরে বিজয়ার পরে দেখা-সাক্ষাৎ, প্রণাম-আশীর্বাদ—ইহাতো ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই অবশ্য করণীয়।"৮

তাই বলতে হয়, এই পূজা এক মহামিলনোৎসব। 'সবার পরশে পবিত্র করা', সারা ভারত থেকে সংগ্রহ করা নানা উপচারে অর্ঘ্য সাজিয়ে সকল 'তীর্থনীরে মঙ্গলঘট' ভরে নিয়ে মহাশক্তি মহামায়ার মহাপূজার অনুষ্ঠান করলে পুরাকালে দেবতাদের সমবেত আহ্বানে যে মহাশক্তি একদিন আবির্ভূতা হয়ে আসুরীশক্তির বিনাশ ঘটিয়ে দৈবীশক্তির জয় ঘোষণা করেছিলেন, সেই মহামায়া ভারতের জনগণের সমবেত আহ্বানে ও প্রার্থনায় এবং সুসংহত ধর্মসাধনায় হবেন জাগরিতা। মানুষের মন থেকে ও দেশ থেকে দূর হবে অশুভ দানবীশক্তির প্রভাব এবং উদ্বোধন হবে শুভকরী দৈবী মহাশক্তির। প্রার্থনা করি, মহাশক্তির পূজা-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরকে পরম আত্মীয়-জ্ঞানে পরম মিলনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবির ভাষায় সমস্বরে বলে উঠবে ঃ

"মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
পরের ছেলে ঘরের মতো
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে
মিলেছি আজ মায়ের ডাকে॥"

৮ ভারতের শক্তিসাধনা—শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৭, পৃঃ ৭৮

নিবন্ধ

দিক্‌ভ্রষ্ট

আশাপূর্ণা দেবী

"সমাজ এখনো পুরুষশাসিত, বুঝলেন? আমরা মেয়েরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই!"

কাঁধ থেকে ব্যাগটাকে প্রায় আছড়ে ফেলে আর নিজেকেও প্রায় সেইভাবেই সোফার ওপর নিক্ষেপ করে কথাটা শেষ করল মেয়েটি : "আমরা এখনো সেই 'মনু'র শাসনের যুগে পড়ে আছি।"

মেয়েটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে বিষম রেগে গেছে। কিন্তু কার ওপর? এযুগের অপদার্থ অবিবেচক সমাজটার ওপর? না বহুযুগ আগে পরলোকগত হয়ে যাওয়া সেই—'মনু' নামের ভদ্রলোকটির ওপর? যিনি নাকি একদা তৎকালীন স্থান-কাল-পাত্রর পরিবেশে আর আপন বোধবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে 'সমাজব্যবস্থা'র জন্য কিছু শাসন-উপশাসন, বিধিনিষেধের আইন-টাইন প্রণয়ন করে বসেছিলেন। করেছিলেন হয়তো সমাজের মঙ্গল হবে ভেবেই।

তা যে যখনই 'পাঁচজনের ভালর জন্যে' কিছু করতে চেষ্টা করে, আপন বিচার-বিবেচনা মতোই করে। না হলে—ভদ্রলোক যে ঘোরতর নারী-বিদ্বেষী ছিলেন বা স্ত্রীজাতির শত্রুপক্ষ ছিলেন, এমন ঘোষণা তো দেখা যায়নি কোথাও! অতএব ধরে নিতে হবে সেই মহাশয় ব্যক্তিটির চিন্তাধারায় যদি কোন গড়বড় থেকেও থাকে, উদ্দেশ্যটা ছিল সমাজের সুব্যবস্থাই।

তবে কোন কালে কোন সুব্যবস্থাই (অথবা অব্যবস্থাও) চিরস্থায়িত্বের ভূমিকায় অনড় থাকতে পারে না। 'কাল' আর পরিবেশই সে ব্যবস্থাকে অবিরত আঘাত হেনে হেনে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভাঙচুর করে চলে এবং ভেঙেচুরে আবার নতুন ছাঁচে গড়তে বসে। তা সে কী সমাজব্যবস্থায়, কী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, কী শিক্ষাব্যবস্থায়, বলতে গেলে—যে-কোন ব্যবস্থাতেই প্রতিনিয়তই এই ভাঙাগড়ার খেলা।

তাই পৃথিবীতে দেশে দেশে কখনো 'রাজতন্ত্র', কখনো 'পুরোহিততন্ত্র', কখনো 'সমাজতন্ত্র', কখনো বা 'গণতন্ত্র'। আবার ঐ 'কাল'-এর খেলাতেই ক্রমশঃ সকল 'তন্ত্র'ই যখন 'স্বৈরতন্ত্রে' পর্যবসিত হয়ে পড়ে তখন বিরক্তচিত্তে চিন্তা-বিদ্‌রা আবার নতুন কোন তন্ত্রের কাঠামো আবিষ্কার করতে বসেন।

এই রকমই তো চলে আসছে।

কিন্তু ঐ মনু? তাঁর বিধিবিধান ব্যবস্থা এত যুগ পরেও টিকে থাকে কোন্ শক্তিতে? কী এমন অজয় অক্ষয় রাসায়নিক কালিতে তাঁর শাসনশাস্ত্রের পুঁথি-টুঁথিগুলো লিখেছিলেন, যা এত যুগের ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, বজ্রপাত, ধুলো-বালিরা ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলতে পারেনি?

পারলে কি এখনো যখন তখন সেই বিদেহী আসামীটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আঙুল তুলে বলা হয় : 'ঐ উনি! উনিই আমাদের এই সনাতনী দেশে মেয়েজাতটার যত দুর্দশা ও দুরবস্থার হেতু। যে দুরবস্থার জের এখনো আমাদের সমাজজীবনে প্রবহমান!' সত্যিই কি এখনো প্রবহমান? না কি এ একটা ধারণাবদ্ধ মানসিকতা মাত্র? যার জন্যে একটা কল্পিত ছায়ার সঙ্গে লড়াই? কোথায় মনু? এযুগে কে তাঁর বিধি-বিধানের ধার ধারতে যাচ্ছে?

মেয়েটা আমার বিশেষ স্নেহের পাত্রী, তাই তাকে আপাততঃ একটু 'সমে' আনতে হেসে বললাম : "কেন রে? হঠাৎ কি হলো?"

"হঠাৎ আবার কি? হয়েই তো চলেছে। সমাজের মূল কেন্দ্রে তো সেই 'মনু' এখনো সেঁটে বসে আছেন! সেই নির্দেশনামা এখনো চলে—

'স্ত্রীজাতি বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন'—"

বললাম : "থাক! জানা আছে, নতুন করে আর আওড়াতে হবে না। তবে কথা হচ্ছে, এই এত অগ্রগতির যুগেও সমবেত নারীশক্তি সেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে হঠাতে পারছে না?"

"কি করে পারবে?"

মেয়েটা তীব্র স্বরে বলল : 'সমাজ তো এখনো পুরুষশাসিত! আর পুরুষরা হচ্ছে—এক নম্বরের স্বার্থপর আর ডিক্টেটর।"

একটু তর্কের লোভ সামলানো গেল না। বললাম : "তা কেনই বা সমাজ এখনো পুরুষ-শাসিত? শাসনদণ্ডটা তোরা নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারছিস না?"

"ওঃ! ঠাট্টা হচ্ছে?"

"বাঃ! ঠাট্টা কেন? সত্যি কথাই বলছি। স্বেচ্ছায় আর কে কবে আপন হাতের ক্ষমতার দণ্ডটি অপরের হাতে তুলে দেয়? ছিনিয়ে নিতে হয়।"

"চমৎকার! আমাদের বড় শক্তি দেখছো না?"

"শক্তিটি সংগ্রহ করতে হবে। লড়াইয়ে নামবার আগে তো ওটাই প্রধান দরকার! সমবেত নারীশক্তি একত্রিত হলে—"

মেয়েটা আরো রেগে বলল : "কে একত্রিত হতে আসছে? বেশিরভাগই তো বুদ্ধুভুতুম! সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করতে পেলেই বর্তে যায়। আর চিন্তাশক্তিসম্পন্ন বিদুষীরা আপন আপন কেরিয়ার গড়ে তোলার চেষ্টাতেই ব্যস্ত।"

"তাহলে তো নাচার। তবে ঐ লড়াইয়ে নামাটা কি নেহাৎই জরুরী?"

"নয়?"

ভীষণ উত্তেজিত দেখালো ওকে। বলল: "চিরকাল সমাজটা পুরুষশাসিতই থাকবে?"

উত্তেজনা প্রশমিত করাবার সাধু উদ্দেশ্যেই বললাম : "আচ্ছা না হয় ধরে নিলাম তোদের জোর তলবে লড়ালড়ির ফলে সেটা আর থাকল না। কিন্তু 'নারীশাসিত সমাজ'-এর চেহারাটা কেমন হবে? তোদের ছকটা কি?"

"বাঃ! এখন থেকে কি বলব? আগে হোক! তখন ভাবা যাবে।"

হেসে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। বললাম : "'হলে' তবে ভাবা যাবে? তবেই আর হয়েছে। বাড়ি গড়বার পর তার নকশা আঁকা?"

মেয়েটা আমার হাসি দেখেই বোধহয় আরও দারুণ রেগে গিয়ে ছিটকে উঠে বলল : "ওঃ! বুঝেছি। এখন তুমি তাহলে ওদেরই দলে! তবে আবার তোমার কাছে কি জন্যে—"

বলেই ব্যাগটাকে হিঁচড়ে টেনে ফের কাঁধে তুলে খটখটিয়ে চলে গেল

চলে গেল। তবে ভয় পাই না। জানি আবার ও আসবে। মেয়েটা আমায় ভালবাসে। আর একমাত্র ভালবাসাই তো পারে সব দোষত্রুটি ক্ষমা করতে।

কিন্তু ঐ মেয়েটাই নয়, এমন অনেক মেয়েই আসে মাঝে মাঝে এবং ঐ একই আক্ষেপ প্রকাশ করে।

"সমাজ এখনো পুরুষশাসিত!"

কেউ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, কেউ ক্ষুব্ধ গলায় বলে, কেউ বা হতাশবিষণ্ণ গলায়! এবং প্রায় সকলেই এই প্রশ্ন রাখে—"আজকের মেয়েদের অবস্থা দেখে আপনার কী মনে হয়? তারা কি সত্যিই স্বাধীনতা পেয়েছে?"

আমার মনে হওয়াহয়িতে কার কি এসে যায় জানি না। তবে আমার কাছে প্রশ্নের এটাই বোধহয় কারণ, আমি একসময় অধিকারমাত্রহীন, অবরোধের অন্ধকারে বন্দী 'আগেকার মেয়েদের' যন্ত্রণা বেদনা আর নিরুপায় অসহায়তার কথা নিয়ে কিছু লেখালিখি করেছি। আর সেই লেখালিখির সময় স্বপ্ন দেখেছি মেয়েদের সেই বন্দীত্ব মোচনের। ভাবতে চেষ্টা করেছি—পাথরের দেয়ালে মাথাকুটে-মরা মেয়েরা যদি ঐ পাথরের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পায়, যদি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে পায়, যদি বৃহৎ বিশ্বের কর্মযজ্ঞের শরিক হতে পায় আর জগতের আনন্দযজ্ঞে তাদেরও নিমন্ত্রণ

জোটে, কি অনির্বচনীয় হবে সেই দৃশ্য! কেমন মহিমময় হয়ে উঠবে আমাদের পুরনো পচা সমাজ!

স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু সেই স্বপ্নের এতখানি সার্থক রূপে দেখে যেতে পারব, তা ভাবিনি তখন। 'দীর্ঘজীবনের' যেমন খেসারৎ গুণতে হয় অনেক, তেমনি প্রাপ্তিযোগও ঘটে বৈকি অনেক। সেই প্রাপ্তির মধ্যে 'পরম প্রাপ্তি' আজকের মেয়েদের এই স্বচ্ছন্দ জীবন এবং আজকের মেয়েদের অসাধারণ কর্মক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণিত বহুবিধ নিদর্শন দেখে যাওয়া!

এই চোখেই তো একদা দেখা হয়েছে, বাড়িতে কোন পুরুষমানুষ উপস্থিত নেই বলে হঠাৎ মরণ-বাঁচন রোগে পড়ে যাওয়া রোগীর চিকিৎসা জোটেনি, ডাক্তার ডেকে আনার লোকের অভাবে। বাড়িতে লোক নেই তা নয়। একান্নবর্তী সংসারের বাড়িতে লোক আছে। আধ ডজনের ওপরই হয়তো আছে। নানা বয়সের, কিন্তু তারা কি করবে? তারা তো 'মেয়েলোক'। যে গিন্নী-বান্নী মহিলাটি হয়তো নিত্য গঙ্গাস্নানে যান পথে বেরিয়ে, যান কালীঘাটে, শীতলাতলায়, তিনিও ভাবতে পারেন না ডাক্তারবাড়ি গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনা, অথবা ডিস্পেনসারিতে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসার কথা! পুরুষজনের অনুপস্থিতির সময়ে বাড়িতে রেজিস্ট্রী চিঠি এলে বা মনিঅর্ডার এলে, বালক-বালিকাদের দিয়ে বলানো হয়েছে—'এখন বাবুরা কেউ বাড়ি নেই, পরে এসো'— এদৃশ্য দেখার ঘটনাও ঘটেছে। মেয়েরা যদি কেউ এগিয়ে গিয়ে—মানে পিয়নের সামনে গিয়ে—সই-সাবুদ মারফৎ কাজটা চুকিয়ে ফেলেন, পরে সেই 'বাবু'দের দাপটে নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে না তাঁকে? খেয়াল হয়নি —ভদ্রঘরের মেয়েছেলের 'আব্রু' বলে একটা জিনিস বজায় রাখতে হয়!

তা এমন ভূরি ভূরি 'দ্রষ্টব্য' দেখার স্মৃতি এখনো মন থেকে মেলায়নি। আজ যদি সেই অবমাননার অবসান দেখার সৌভাগ্য এসে যায়, সেই চোখে যদি আজকের মেয়েদের এই অবাধ জীবনের চেহারাটি ঝলসিত হয়, সেটা কি পরম প্রাপ্তির কোঠায় পড়ে না?

আজকের মেয়েদের তো আইনত কোথাও কোন 'অনধিকার' নেই। কর্মজীবনেও কোনখানেই বাধাবন্ধনের প্রশ্ন নেই। আজ পুরুষের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই মেয়েরা। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা দক্ষতায় পুরুষের থেকে বেশি বৈ কম নয়। দক্ষতা তাদের ঘরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই সমান। এখন ঘরসংসারের সব দায়িত্বই তো মেয়েদের।

দেখে তো অবাকই লাগে। অনেকসময় তো সেলাম ঠুকে বলে উঠতেও হয়ঃ 'মাগো, তোমরা —মা দশভুজার মিনি সংস্করণ!' আর ঘরে-বাইরে 'সমান' মানে, অবশ্যই উপার্জনের সাফল্যের ইশারা। অর্থাৎ আজকের তথাকথিত অগ্রসর মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও থাকে।

অথচ আশ্চর্য! তেমন মেয়েরাই অধিক অভিযোগে নিঃশেষিত হয়—"আমরা মেয়েরা আজও সেই 'মনু'র অনুশাসনের যুগে পড়ে আছি!"

একজন তো নয়, অনেক অনেক জন! নানা পেশার নানা অবস্থার নানা বয়সেরও!

তাহলে?

গড়বড়টা কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে ষোলো আনা কি আঠারো আনাই স্বাধীনতা পেয়েও মেয়েদের মধ্যে কেন নেই সেই স্বাধীনতার স্বাদ?

"সমাজ পুরুষশাসিত!"

তা সেটাতো (কোথাও কোনখানে দু-পাঁচটা 'আরণ্যক সম্প্রদায়' ছাড়া) সমগ্র পৃথিবীতেই চিরকালই ছিল। আজও আছে।

বসুন্ধরা বীরভোগ্যা! আর চিরদিনই বীরের ভূমিকা তো পুরুষেরই। পুরুষজাতটা অবিরতই নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় দুরন্ত বেগে ছুটে চলে, গড়ে তোলে নতুন নতুন মারণাস্ত্র, ফন্দী আঁটে শত্রুনিধনের। সেই প্রস্তরযুগ থেকে এই পারমাণবিক যুগ পর্যন্ত। আবার, চেষ্টা করে চলে নদীতে বাঁধ দেবার, পাতাল খুঁড়ে রত্ন তুলে আনবার, আকাশে ওড়বার, চাঁদে ওঠবার, মহাকাশ জয় করবার। ওদের চিরদুরন্ত নেশা প্রকৃতিকে পরাস্ত করার।

এই দুরন্ত বেগের মধ্যে নারীর ভূমিকা কোথায়? থাকলেও কতটুকু? থাকলে হয়তো

জগতের চেহারা অন্য হতো। হয়তো সহজে 'হিটলারের' অভ্যুত্থান হতো না। অথবা চিরকালীন পৃথিবী, গড়ে ওঠা পৃথিবী বারেবারে যুদ্ধবিধ্বস্ত হতো না। বৃহৎ পৃথিবীর বহিরঙ্গের সমস্ত কিছুই তো বলদৃপ্ত পুরুষের নির্মম নির্দয় কঠোর শক্তির কব্জায়। সে-কব্জা কি সহজে আলগা হবার ?

"সমাজ পুরুষশাসিত!"

কারণ, সমগ্র পুরুষজাতটার পৃষ্ঠবল মনোবল হচ্ছে ঐ চিরকালীন পৃথিবীর তাবৎ পুরুষ-সমাজের দোর্দণ্ড প্রতাপ। এটাকে তো অস্বীকার করা যায় না! ওরা বনেদি। ওরা সাবেকি! ওদের বিশ্বজয়ের অভিযান অনেক প্রাচীন। সেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে ? শুধুই শূন্যতা! মেয়েদের মনোবল বাড়াতে পৃষ্ঠবল কোথায় ?

এমনকি অধ্যাত্মজগতের সাধনার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও অনাদ্যন্ত গৈরিকের মিছিলে মেয়েদের অংশ যৎসামান্যই।

অর্থাৎ মেয়েদের ঘুম ভাঙতে সময় লেগেছে। বিশ্ববিজয় অভিযানে তাদের এখন সবে 'হাঁটি হাঁটি পা পা'! কাজেই পুরুষের হাত থেকে শাসনদণ্ডটি এখনি তাদের হাতে এসে পড়বে—এ আশা বৃথা! অবশ্য 'ঘুম' বলাটা খুব ঠিক নয়, সৃষ্টিকর্তা যে মেয়েদের ওপর এক বিরাট কর্ম-কাণ্ডের ভার দিয়ে পাঠিয়েছেন। মেয়েরা সে-দায় থেকে সহজে মাথা তুলতে পেরেছে কই ? তবু এখন তুলেছে মাথা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—নারী-পুরুষের সম্পর্কটি কি শুধুই শাসক আর শাসিতের ?

সম্পর্ক নেই ভালবাসার ? মমতার ? স্নেহের ? সম্মানের ? পুরুষজাতটা কি শুধুই নারীজাতটাকে শাসনই করে ? নিরাপত্তা দেয় না ? নিশ্চিন্ততার আশ্রয় দেয় না ? বহির্জগতের হিংস্র আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে না ?

আর মেয়েরাই কি সেটা চায় না ? চায়।

চিরদিন তাই-ই চেয়ে এসেছে। বহির্জগতের ভয়ঙ্করতা থেকে সরে এসে একটু নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে।

তা যেখানেই 'বাঁচা' আর 'বাঁচানো'র প্রশ্ন, সেখানে স্বভাবতই এসে যাবে সম্পর্কের তার-তম্য! সেটাই যুগযুগান্তর থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

আজকের মেয়েরা যদি আর ঐ নিরাপদ আশ্রয়টির প্রয়োজন বোধ না করে তাহলে তো তাদের অনেকখানি শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সমবেত নারীশক্তিকে সংহত করে একটি ধ্রুবলক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে!

কিন্তু সেই সম্ভাবনা কোথায় ? আমার সেই 'রাগী নাতনী'টি তো বলেই গেল: "একত্রিত হতে আসছে কে ? 'মেয়েরা' যে যার নিজ নিজ কেরিয়ার গড়তেই ব্যস্ত!"

অবশ্য এই সব কেরিয়ার গড়াগড়ির প্রশ্ন তো মুষ্টিমেয় কিছু তথাকথিত অগ্রসর মেয়েদের! দেশে অগণিত মেয়ে আজও তো অন্তহীন অন্ধ-কারের মধ্যে তলিয়ে আছে! তারাই তো দেশের নারীসমাজের সিংহভাগ। এদেশে বা বিদেশে অবস্থার খুব বেশি তারতম্য নেই। হয়তো ওদেশে যে চাকচিক্যটুকু চোখে পড়ে, সেটা নেহাতই বহি-রঙ্গের! আজও ঐ বৃহৎ নারীসমাজ 'নারীমুক্তি' শব্দটাই শোনেনি। 'সমাজ' নামক বস্তুটা কাদের শাসিত, তার খোঁজ করতেও জানে না। ব্যক্তিগত জীবনটুকুর মধ্যেই তাদের চিন্তা সীমায়িত।

অতএব ঐ মুষ্টিমেয়র মধ্যেই রোষ ক্ষোভ হতাশা আর রাগী মন্তব্য—"সমাজ এখনো পুরুষ-শাসিত!" এই শাসনশৃঙ্খল থেকে কি করে মুক্ত হওয়া যায়, সেই ভেবে এই মেয়েদের অবস্থা আজ 'দিশাহারা'। তারা ভেবে উঠতে পারছে না কিসের দাবিতে সোচ্চার হবে! বিবাহসূত্রে গোত্রান্তর বা পদবী বদলের নিয়ম না মানার? জন্মগত পরি-চয়েই স্থির থাকা? তা সেটা অবশ্য কোন ব্যাপারই নয়। থাকলেই হলো মেয়েদের জন্মগত পরিচয়ে। গ্রহণ না করলেই হলো স্বামীর পদবী! করছে নাও অনেকে। কারো কিছু এসে যাচ্ছে না।

কিন্তু মেয়েদের সেই জন্মের ঘর ? তারা কি 'পার হয়ে যাওয়া' মেয়েকে আর নিজ পরিবারের একজন ভাবে ? মা বাপ ভাবলেও (যদিও তারাও ভাবে না) পরবর্তী অন্যরা ? তার মানে মেয়েদের অবস্থা তাতে 'না ঘরকা, না ঘাটকা।'

তবে আজকের এই মেয়েদের চিন্তাভাবনা তো আরও সুদূরপ্রসারী। তারা তো ভাবতে শুরু করছে—'বিবাহ'-বন্ধনটাই তুলে দেওয়া হোক। কুমারী মায়ের সন্তানকে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। অথবা 'মা' হওয়ার পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেতে 'নলজাতক' ব্যবস্থাটিই ভালমতো চালু হোক!

এমন অনেক কিছুই আমাদের আজকের মেয়েদের মাথার মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে। কারণ, তেমন মুক্ত সমাজের ছবি তাদের চোখের সামনেই বিদ্যমান। পশ্চিমের জানালাটা আজ তাদের চোখের সামনে দু-হাট। সেখানে বিবাহবন্ধনহীন নর-নারীর যথেচ্ছ বিহার ও বিচরণ সমাজ-স্বীকৃত। মানে 'সমাজ' শব্দটি যদি ব্যবহার করা হয়। 'সমাজ' কোথায়? কে কার কড়ি ধারে? ঠিক বললে বোধহয় বলতে হয়—আইন-স্বীকৃত।

আমাদের এখানেও এই দিশাহারা মেয়েরা এমন জীবনকেই বেছে নেওয়া শ্রেয় মনে করছে। কিন্তু ওদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, ওদেশের প্রতিবেশী পড়শী আত্মজনের নির্লিপ্ত উদাসীন দৃষ্টি, আর ওদেশের আর্থিক অবস্থা কি আমাদের এদেশে মিলবে?

তবে এব্যবস্থা অন্য কোন দেশ থেকে আমদানী করারই বা কি আছে? অন্য আদর্শ তো রয়েছে। জীবজগতে তো 'লিভ্‌টুগেদার'ই চালু।

কিন্তু নেহাৎ জীবজগতে 'মা' নামক প্রাণীটা যত সহজে ছুটি পায়, মানুষের জগতে তো তত সহজে ছুটি মেলে না। ওদের তো ডিমে তা দেওয়া বা শাবক আগলানোর কালটুকু সীমিত। পশুপক্ষীদের 'ভূমিষ্ঠ' হওয়ার পর সাবালক হয়ে উঠতে বেশি দেরি হয় না। মনুষ্য-শাবকের সাবালক হতে সময় লাগে। তাছাড়াও বাঘ সিংহ হাতি ঘোড়া গরু ছাগল পাখি পতঙ্গরা জন্মেই বাঘ সিংহ হাতি ঘোড়া গরু ছাগল ইত্যাদি —মানুষের ব্যাপারটা তো আলাদা। মানুষের বাচ্চাকে 'মানুষ' করে তুলতে চাইলে কাঠখড় লাগে বিস্তর।

কাজেই বিবাহবন্ধনহীন সমাজজীবনে 'মা' নামক প্রাণীটাকে শাবকসৃষ্টির পর থেকে দীর্ঘ-দিন যাবৎ বয়ে চলতে হবে একটা ভারাক্রান্ত জীবন!

জীবজগতে 'বাপে'র তেমন কোন কর্তব্যের দায় থাকে না, সেই ছাঁচটাকে বেছে নিলে এক্ষেত্রেও অবস্থা তাই দাঁড়াবে।

যে-দেশের উদ্ভ্রান্ত সমাজের ছাঁচকে গ্রহণ করবার বাসনায় উদ্ভ্রান্ত হচ্ছে তথাকথিত সংস্কার-মুক্ত অতি আধুনিক মেয়েরা, তারা ভেবে দেখছে না আমাদের এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজব্যবস্থা আর আর্থিক অবস্থা—তাদের সে-বাসনার অনুকূল কিনা। এক দেশের গাছ অপর দেশে রোপণ করতে চাইলে আগে তার মাটিটাকে তো কিছুটা 'চৌরস' করতে হয়!

তবে ভরসার বিষয়, অমন অতি প্রগতি-শীল চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত মেয়ের সংখ্যা এখনো নিতান্তই নগণ্য। তার প্রমাণ প্রতিটি দৈনিক কাগজের নিত্যদিনের 'পাত্র-পাত্রী চাই'য়ের কলামের উত্তরোত্তর বাড়বৃদ্ধিতে। আর বাড়বৃদ্ধি—বিয়েতে কনে সাজানো, তত্ত্ব সাজানো, বাসর সাজানো, ফুলশয্যার ফুলের মশারি সাজানোর ব্যবসার। এইসব পার্লার আর সংস্থাগুলির তো দারুণ রমরমা! বিয়ে উঠে গেলে এদের কি গতি? উঠবে না। চট করে উঠবে না। যে-মেয়ে হয়তো মা-বাপের অজ্ঞাতে রেজিস্ট্রী বিয়েটি সেরে ফেলে দু-ছমাস যুগলে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে, সে-মেয়েও কোন একদিন আলপনা আঁকা পীঁড়িতে বসে পড়ে পিতা কর্তৃক পতির হাতে 'সম্প্রদিতা' হতে দ্বিধা করে না!

হবে কেন? তাতে তো অনেক লোকসান! পিতৃগৃহ থেকে খাট পালঙ্ক আলনা আলমারি ইস্তক সংসারযাত্রার যাবতীয় বস্তুসম্ভারে সমৃদ্ধ দানসামগ্রীর বোঝা বয়ে নিয়ে পতিগৃহে যাত্রার রোমাঞ্চই যে আলাদা! সহজে কি সে রোমাঞ্চের মোহ ছাড়তে পারা যায়?

আসলে ঐ 'ছাড়তে পারা'টা মেয়েদের মধ্যে কিছু-কিঞ্চিৎ কম। তার মনোধর্মে ছাড়তে পারার প্রবণতাটা কম, আঁকড়ে ধরার প্রবণতাই বেশি!

তুচ্ছটুকুও যেন হাতছাড়া করতে রাজি নয় সে। দেখে দুঃখবোধ আসে, বলতে কি—লজ্জাবোধও আসে, যখন দেখতে পাওয়া যায় পরম বিদুষী মেয়ে, বৃহৎ পৃথিবীর কর্মযজ্ঞের শরিক মেয়ে, স্বর্গ-মর্ত-পাতালকে হাতের মুঠোয় পাওয়া মেয়ে, অনেকখানি প্রসারিত পরিধির স্বাদ পাওয়া মেয়েও ক্ষুদ্র সংসার-গণ্ডির মধ্যেকার 'হলুদ পাঁচ-ফোড়নের' অধিকার-মোহের বন্ধনে বন্দী! অনেকখানি পাওয়াও তাকে এই সঙ্কীর্ণতাটি থেকে মুক্ত করতে পারেনি। ওটাই যেন সর্বস্ব!

পতিগৃহে এসে এই মেয়েদের প্রথম চেষ্টাই থাকে সংসারের এযাবৎকালের মালিকানাটির মালিকানা-স্বত্বটুকু বাজেয়াপ্ত করে তাকে কেন্দ্রচ্যুত করা! গৃহের গৃহিণীকে সংসারের মূল কেন্দ্র-বিন্দুটি থেকে দূরে নিক্ষেপ করে তাকে অসহায় অনধিকারিণীর ভূমিকায় দাঁড় করানো! যেন ঐ হলুদ পাঁচফোড়নের অধিকারটুকুই পরম পাওয়া। আর সেই পাওয়াটির জন্যে নির্মম হতে আটকায় না, নির্লজ্জ হতে বাধে না, সদ্যবিবাহের রোমান্টিক দিনগুলির মধ্যে অশান্তির জঞ্জাল এনে ফেলতে দ্বিধা হয় না! তখন তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আলোর জগতের স্বাদ—কোন কিছুই কাজে লাগে না! অধিকারবোধ-সচেতনতাই প্রধান হয়ে ওঠে। যেহেতু আমার স্বামীটিই এই সংসারের 'রসদদার' সেহেতু আমিই সর্বময়ীকর্ত্রী! আমিই সব। আমার কথাই শেষ কথা!

একথা বলছি না যে, সব মেয়েই এমন। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন আমও আছে, আমড়াও আছে; ঘেঁটুও আছে, গোলাপও আছে; মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যেও তেমন তারতম্য তো আছেই। তবু একথা বলতেই হবে, আজকের মেয়েদের মধ্যে ঐ সর্বময়ী কর্তৃত্বের বাসনাটি বড় তীব্র! পরমত অসহিষ্ণুতা বড় প্রবল! অথচ শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার প্রথম পাঠই হচ্ছে পরমত সহিষ্ণুতা। কিন্তু যে-বিদ্যা 'বিনয়' দান করে, এযুগে তেমন বিদ্যার চাষ নেই। ঔদ্ধত্যই বাহাদুরি, উর্ধ্বতনদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে অবজ্ঞা করাই বিদ্যা-বিকাশের মহিমা!

আজকের মেয়েদের অনেক গুণ, অনেক কর্মক্ষমতা, অনেক ভারবহনের শক্তি, সাহস; কিন্তু ঐ যে 'আমার কথাই শেষ কথা'—এই আত্ম-স্ভরিতাটিই তাদের এত গুণকেও ছায়াবৃত করে ফেলে। এখানে কর্তা-পুরুষটিও অসহায়। বাইরের সমাজজীবনে যাই হোক—সংসারজীবনে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবচনটি এখন আর কোথাও নেই। গিন্নীর ইচ্ছাতেই কর্ম, এবং সে 'গিন্নী' ঐ নবাগতা নবীনাই। যিনি এই সংসারে এসেই স্বাধীকার সচেতনতায় সবটা মুঠোয় পুরে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। 'কর্তা' নামক ব্যক্তিটির ভূমিকা অসহায়ের কোঠায় ঠেলে দিয়ে রেখেছেন।

আজকের ঐ তথাকথিত আধুনিক মেয়েরা আপাতত এখন সংখ্যায় নগণ্য হলেও, বাড়বৃদ্ধির দিকেই তো প্রবণতা! এই মেয়েরা কৃতিত্বের উচ্চ-শিখরে ওঠা একটি অত্যুজ্জ্বল স্বামী চায় বটে, তবে সেই ঔজ্জ্বল্যকে নিষ্প্রভ করে তাকে প্রজা বানিয়েই রাখতে চায়! রাখতে চায় নিতান্ত বশংবদ করে। এবং ঐ বশংবদ প্রজা বনতে না পারলেই অশান্তি! আর সত্যি বলতে—বাইরের জগতে পুরুষের ভূমিকা যাই হোক, ঘর-সংসারে সে শান্তিপ্রিয়ই। তাই সেই শান্তিটুকু বজায় রাখতে সে এমন দাসখৎ লিখে দিয়ে বসে যে, সংসারে 'ন্যায্য অন্যায্যর' প্রশ্নে একটা রায় দিতেও সাহস পায় না। এমন-কি মা-বাপ সম্পর্কে কর্তব্য করতে ভয় পায়। ভাইবোন আত্মজন সম্পর্কে ভালবাসা প্রকাশেও ভয় পায়।

কারণ, আজকের মেয়েরা স্বামীর সবটায় অধিকার চায়। সেই চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশই স্বামীকে তার সকল ভালবাসার জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একান্ত নিজস্ব করে ফেলে। ফলে তারা একটা অপূর্ণ মানুষের স্বাদ পায়। আজকের পুরুষের জীবনটি ক্রমশই হয়ে চলেছে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন।

একদা আমাদের ভারতীয় সমাজে পরিবার-জীবনটি ছিল নানা সম্পর্কের মালায় গাঁথা। কাকা জেঠা মামা মেসো মাসি পিসি ঠাকুমা দিদিমা কাকিমা জেঠিমা দিদি বৌদি ভাগ্নী ভাইঝি ইত্যাদি বহু সম্পর্কের সমারোহে সমৃদ্ধ একটি পূর্ণ প্রাণের প্রকাশ ছিল, ছিল হাসি আড্ডা কৌতুক আলাপচারিতা ইত্যাদি, যা থেকে

স্বভাবে আসে সরসতা। কিন্তু কালের নিয়মে ঐ সম্পর্কের বন্ধনমালা এখন ছিন্নকুসুম!

এযুগের ছেলেগুলোকে (মানে সাধারণ ঘর-গেরস্তের ছেলেদের কথাই বলছি) দেখলে দুঃখ লাগে। বিয়ের আগে পর্যন্ত বেশ আছে বা থাকে। বেকারত্বের জ্বালা না থাকলে তো মহানন্দেই থাকে (বেকারের তো আর বিয়ে হয় না)। কিন্তু যেই না বিয়ে হলো, ছেলেটা যেন চোরের দায়ে ধরা পড়ে গেল। মা, বাপ, ভাইবোনেদের সঙ্গে আর স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের উপায় নেই। সেখানে একটু বেশি 'সময়' খরচ করে ফেললে, 'ওখানে' প্রলয়! এখানে একটু উচ্চহাসির আওয়াজ উঠলে ওখানে বাক্যবন্ধ!

বাড়ানো কথা নয়, প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা।

স্বামী নামক জীবটিকে পুরো কব্জা করে ফেলতে হলে তাকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলতে হবে, এটাই এযুগের দৃষ্টিভঙ্গি। খেয়াল করে না, শেখড়-ওপড়ানো গাছের প্রাণশক্তি কতদিন বজায় থাকে! থাকে না বলেই এত আদালতে ছোটার বাড়বৃদ্ধি। আজকের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের মেয়েরা অনেক পাচ্ছে, তবু আগের যুগের মেয়েদের মতোই কানাকড়িটুকুও সামলাতে চাইছে। কিন্তু আসক্তির তীব্রতাই তো চিরকালই মেয়েদের মুক্তির অন্তরায়।

তবু ভেবে ক্ষমা করা যায়, আগের যুগের মেয়েদের ঐ কানাকড়িটুকুই ছিল সম্বল। ঐ হলুদ পাঁচফোড়নের অধিকারটাই পরম। এখন তো আর ঠিক তেমন অবস্থা নয়। কিন্তু কই এই মেয়েরা তো ঐ তুচ্ছতা, ঐ ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। ঐ কানাকড়ির অধিকারটুকুকে অনায়াসে ত্যাগ করে বলে উঠতে পারছে না—'আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক। ওটুকু তোমারই থাক।'

হয়তো আজকের মেয়েরা আমার এই লেখাটুকু পড়ে ভাবতে পারে, যদি অবশ্য পড়ে, এটা তাদের প্রতি কটাক্ষপাত। তাদের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা। কিন্তু সেটা ভাবলে ভুল হবে। আমি শুধু আজকের মেয়েদের, অর্থাৎ যে-মেয়েরা বহিরঙ্গে ষোলো আনা স্বাধীনতা পেয়েও অন্তরে সম্যক্ স্বাধীনতার স্বাদটি পাচ্ছে না, তাদের কথাই বলছি। তাদের কাছে একটু আর্জি জানাই—আজ তোমাদের একটু আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। বাসনা, আসক্তি, আর বস্তুর মোহ—এই তিনটি জিনিস মেয়েদেরকে পিছনে টেনে রাখতে চায়, যেটা মুক্তির পরিপন্থী!

আসলে আজ আমাদের মেয়েদের সত্যিই কি একটু বিশেষভাবে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন হয়নি? ভাববার প্রয়োজন হচ্ছে না—কেন এখনো সমাজে 'পণপ্রথা' নামক জন্তুটা এমন প্রচণ্ডভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে ধারালো নখ দাঁত নিয়ে? এই প্রথাটা তো 'মনু'-প্রবর্তিত নয়! সত্যি বলতে, বৃহৎ কোন সামাজিক প্রথাও নয়, এটা তো নিতান্তই পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেকার সমস্যা। যেখানে নারীই নিয়ন্ত্রণকারিণী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। সমস্ত মেয়েদের মধ্যে যদি একবার শুভবুদ্ধির উদয় হয় তাহলেই এই কলঙ্কিত প্রথাটি হয়তো ক্রমশঃ বিদায় নেবে। এই প্রথার জন্যে সমাজ-সংসারে কি নির্লজ্জতা নিষ্ঠুরতা পীড়ন উৎপীড়ন বধূহত্যা আত্মহত্যা! ভদ্রঘরের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। একথা আজ সকলেরই জানা, এই ঘৃণ্য প্রথার কবলে পড়ে আজ অতি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরেও কী নারকীয় ঘটনা ঘটছে, কত প্রাণ অকালে বিনষ্ট হচ্ছে। এর ফলে ঐসব সম্ভ্রান্ত ঘরের শাশুড়ী-ননদজাতীয়া মহিলাদেরও মুখ হেঁট করে অথবা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে পুলিশের গাড়িতে চড়ে হাজতে যেতে হচ্ছে। তবু এই নীচ প্রথাটি কমা তো দূরের কথা, দিনে দিনে বেড়েই চলেছে!

শরীরে একটা বৃহৎ ক্ষত নিয়ে 'সালঙ্কারা' সাজতে যাওয়া যেমন বিড়ম্বনা, তেমনি বিড়ম্বনাই কি নয়, সমাজদেহে এই 'পণপ্রথা' নামক ক্ষতটির প্রকটতা সত্ত্বেও সমাজের চিরকালীন চেহারাকে 'পচাপুরনো' বলে বাতিল করে এক উজ্জ্বল সুন্দর নতুন সমাজ গড়ে তোলার বাসনায় বিক্ষত হওয়া?

দেশে শিক্ষায় দীক্ষায় চিন্তায় চেতনায় অগ্রসর এত মেয়ে, আইনবিভাগে এত মেয়ে,

জোরালো রাজনীতিতে প্রখর এত মেয়ে, ঝাণ্ডা উঁচানো লড়াকু এত মেয়ে, সমাজসেবায় নিয়োজিত এত মেয়ে, সরকারি দপ্তরে দপ্তরে উচ্চপদে অবস্থিত এত মেয়ে—সকলের সমবেত শক্তিতে এই বিষবৃক্ষের শিকড়টা উপড়ে ফেলা যদি সম্ভব না হয়, তবে 'সমাজ এখনো পুরুষশাসিত' বলে শৌখিন ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের মেয়েদের!

যখনই আমি মেয়েদের নিয়ে কিছু ভাবি, অথবা তাদেরই ভাব-ভাবনার প্রশ্নের মুখে পড়ে যাই—তখনি আমার সমাজদেহে কুষ্ঠব্যাধির মতো এই 'পণপ্রথা' নামক ব্যাধিটির কথা মনে এসে যায়। তাই হয়তো অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিকভাবেও ঐ প্রসঙ্গটাই এসে যায়। কেবলই মনে হয়, এ ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করা উচিত ছিল মেয়েদেরই। এর মূল উৎসই হচ্ছে মেয়েমনের লোভ আর ক্ষুদ্রতা। তার সঙ্গে নির্মমতাও।

নারীমন আপন প্রিয়জনের প্রতি যতটা মমতাশীল, অপ্রিয়জনের প্রতি ততটাই নির্মম আর কঠোর। তাই চিরকালীন প্রবাদ—ক্রুদ্ধ গৃহিণীর আক্ষেপ: "চন্দ্রমুখী কন্যে আমার পরের ঘরে যায় খ্যাঁদানাকী বৌ এসে বাটায় পান খায়।" ঈর্ষা আর হিংসার একটি অযৌক্তিক প্রকাশ!

কিন্তু এটা তো মানতেই হবে, অতীতে সেই সব মেয়েরা ছিল চিরবঞ্চিত। তাদের জন্যে আকাশ ছিল না, বাতাস ছিল না, ছিল শুধু চার দেয়ালের আড়ালে পিষে-মরা জীবন, আর অবোধ অন্ধ সমাজের শাসন। তাদের কাছ থেকে উদারতার আশা করা হয়তো অন্যায়!

কিন্তু এখন তো মেয়েদের তেমন অবস্থা নেই। তবু ঐ সঙ্কীর্ণতার তো বিলোপ ঘটছে না। শুধু নির্যাতন আর নির্যাতিত জায়গা বদল করছে।

তা নিষ্ঠুর অবমাননাও একরকম নির্যাতন বৈকি!

আজকের অতি আধুনিক মেয়েদের কাছে কাম্য জীবনের একটাই ছক—বিলাসবহুল আড়ম্বরসমৃদ্ধ পশ্চিমী ছাঁচে ঢালাই একটি সংসার। সে-সংসারের রসদ জোগানদার হাতের মুঠোয় ভরে ফেলা একটি বশংবদ স্বামী, 'সময় সুবিধে' অনুযায়ী নিয়ে আসা দু-একটি শিশু। যে-সংসারে শিশুর জন্য 'ক্রেশ'! বৃদ্ধের জন্য 'ওল্ড হোম'! অতিথির জন্য একটু নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা! আর অভাবী আত্মীয়ের জন্য খোলা দরজা! 'আত্মীয়' শব্দটির ব্যবহারই তো ক্রমেই কমে আসছে।

তবে আগেই বলেছি, সবটাই একরকম নয়। সবটাই নেতিবাচক নয়। এই অতি আধুনিকারা আজও সংখ্যায় নগণ্য! তবু অস্বীকার করা যায় না, আজকের যুগ দুরন্ত বেগে ছুটে চলে চলে ক্রমশই হয়ে উঠছে শুষ্ক ও রুক্ষ, ভালবাসার সঞ্চয়ে দেউলে। এটাই একটা মস্ত আশঙ্কার কথা। কি মেয়ে, কি পুরুষ যতই অনেক ক্ষমতা আয়ত্তে আনতে পারছে, ততই ভালবাসার ক্ষমতাটি হারিয়ে ফেলছে। আর সেই হারিয়ে যাওয়াটা শিশুদের মধ্যেও প্রবলভাবে চোখে পড়ে। আজকের শিশুও তার ছোট্ট গণ্ডির বাইরে কাউকে ভালবাসতে জানে না। অথচ ভালবাসতে পারাটাই তো জীবনের জীবনীশক্তি, শক্তির মূল উৎস!

একদার বহু সম্পর্কের মালা গাঁথা সমাজের মালাটি যদি ছিন্নকুসুমে পরিণত হয়ে গিয়ে শেষমেষ কেবলমাত্র নারী-পুরুষের সম্পর্কে এসে পৌঁছায়, এবং সেখানেও সহিষ্ণুতার অভাব, সমঝোতার অভাব, আর অবিরত লেনদেনের হিসাব-নিকাশ সেই সম্পর্ককে কেবলমাত্র 'শাসক' আর 'শাসিত'র ভূমিকায় দাঁড় করায় তবে অবস্থা যে হয়ে উঠবে 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!'

একথা অবশ্য বলব না, সমাজ আবার পিছু হটতে হটতে সেই 'বহু সম্পর্কের মালায় গাঁথা' যৌথ সংসারের ছাঁচে ফিরে যাক। এবং একথাও বলছি না—মেয়েরা আবার 'বহু সন্তান ভারাক্রান্ত' ষষ্ঠীঠাকরুণের শিষ্যত্ব নিক। আর বৈভব-বিলাসিতা থেকে দূরে হটে 'বুনো রামনাথের' চ্যালা হোক।

ছেড়ে আসা পোশাক আবার কুড়িয়ে গায়ে তোলার চেষ্টাটা হাস্যকর। তেমন অসম্ভব কথ

ওঠে না।—কিন্তু অন্য সমাজের, অপর দেশের পরিত্যক্ত পোশাকটা কুড়িয়ে গায়ে তুলতে যাওয়াটাও কি কম হাস্যকর? স্বকীয়তা বর্জন আর অন্ধ অনুকরণে গৌরব কোথায়? মর্যাদা কোথায়? কিছু-না-কিছু শেখবার আছে সকলের কাছ থেকেই, সব দেশ থেকেই। কিন্তু শেখবার মতো ভাল জিনিসগুলির দিকে না তাকিয়ে যদি কেবল চাকচিক্যটুকুকেই গ্রহণ করা হয়, সেটা নিশ্চয় বুদ্ধির কাজ নয়।

সেইজন্যেই আজ আলোর নেশায় পতঙ্গের মতো অন্ধ আবেগে ছুটে চলা থেকে একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভাবা দরকার, ওটা আলো না আগুন।

একদা ভাবা হয়েছে, ভারতীয় সমাজের কুসংস্কারের অন্ধকার আর জরাজীর্ণ কীটদষ্ট 'ব্যবস্থাপত্রতন্ত্র' ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দেশ যদি নতুন উদ্যমে প্রাচ্যের দীক্ষা আর পাশ্চাত্যের শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়ে চলে, তাহলে একটি আদর্শ জাতি গড়ে উঠতে পারে। যে-সমাজে যেমন থাকবে ভারতাত্মার চিরন্তন ধর্মবোধ, সত্যবোধ, ত্যাগবাদ, তেমনি থাকবে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও কুসংস্কার-মুক্ত চেতনা, আত্মমর্যাদায় বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ। উভয় শিক্ষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠবে উজ্জ্বল সমাজ, আদর্শ দেশ।

দরিদ্র ভারতবর্ষের অর্থসম্পদ না থাকুক, পরম সম্পদতুল্য আদর্শের অভাব নেই। অভাব নেই যুগে যুগে পুণ্যজীবনের আবির্ভাব ঘটার। কিন্তু বারেবারে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভারতের চিরন্তন ধ্যান-ধারণাকে করেছে বিপর্যস্ত, এনেছে বিভ্রান্তি। সেই বিভ্রান্তির বশেই 'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়'কে বুঝতে ভুল করে সমাজজীবনে ডেকে এনেছে অনেক জঞ্জাল, অনেক গ্লানি। আর বহিঃশত্রুর লোভ আর নির্লজ্জতার ভয়ে নারীজীবনকে অন্ধকার অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যে নির্বাসন দিয়ে সমগ্র জাতটাকে ক্রমশঃ করে তুলেছে পঙ্গু। এই পঙ্গুতাই তিলে তিলে ক্ষয় করে চলেছে আপন শুভবোধকেও। এদেশের মতো এতো অনুকরণপ্রিয়তা বোধকরি আর কোন দেশেরই নেই। কিন্তু স্বকীয়তা হারালে আর জাতির রইল কী?

তাই দেশের আজকের যুগ মেয়েদের জীবনের সেই অবসান ঘটাতে পারলেও, তাকে যথার্থ পথ দেখাতে পারছে না।

অনুকরণপ্রিয়তায় এযুগ যেন দিশাহারা। 'শুভ-অশুভ'র পার্থক্য বুঝতে পেরে উঠছে না। বিশেষ করে বহুযুগের অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসা 'সচেতন' মেয়েরা। কিন্তু এই মেয়েদেরই তো স্বচ্ছ চেতনার মধ্য দিয়ে বুঝে নিতে হবে কোন্‌টা তার পক্ষে শুভ। নিজেকে কেবলমাত্র পশ্চিমী ছাঁচে ঢালাই করতে পারলেই কি জীবনের চরিতার্থতা? যারা সেই ছাঁচের জীবন বহন করছে, তারা কতটা সুখী? যতই সমান অধিকার, সমান শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হোক, প্রকৃতির নিয়মে নারী-পুরুষের জীবনে যে-পার্থক্য, তাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় কি? নারী আর পুরুষের মানসিকতাই কি এক? একটি নিঃসন্তান পুরুষের সন্তানহীনতার দুঃখ, আর একটি বন্ধ্যানারীর হৃদয়বেদনা কি একইরকম? এ-বেদনায় কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তানহীনা নারীকে প্রায় মানসিক ভারসাম্যও হারাতে দেখা যায়। কাজেই শিক্ষার আলোক-পাওয়া মনের একটু তলিয়ে দেখার শিক্ষা থাকা দরকার।

অপরজনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার আগে নিজেকে একবার সেই জায়গায় দাঁড় করিয়ে সওয়াল করতে শিখলে কেমন হয়? আমি আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি—পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই মানবজীবনের উত্তরণ ঘটে। দিশাহারাত্ব ঘুচে সত্যকার দিশা মেলে।

তবে শেষ কথা এবং প্রথম কথাও—অন্তরলোকে ঈশ্বরবিশ্বাসের দীপটি জ্বালতে না পারলে শুভ আর সত্য পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সেই দীপটি জ্বালাতে পারা চাই।

ঈশ্বরবিশ্বাসহীন হৃদয় বিগ্রহহীন মন্দিরের মতোই।

বিশেষ রচনা

বিবেকানন্দের আমেরিকা আবিষ্কার এবং ভারত আবিষ্কার

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামী ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্তি হবে। সেই উপলক্ষে প্রকাশিতব্য বিশেষ রচনাবলীর সূচনা হলো বর্তমান নিবন্ধটি দিয়ে।—যুগ্ম সম্পাদক

উনিশশো ছিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনস্থ স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারী থেকে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'অ্যাব্রড ইন আমেরিকা: ভিজিটরস টু দ্য নিউ নেশন—১৭৭৬-১৯১৪'। এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর ডাইরেক্টর মারভিন স্যাডিক। তিনি এই গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছেন, আমেরিকার স্বাধীনতালাভের দেড়শো বছরের মধ্যেই ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশ থেকে কিছু মনীষী এসেছিলেন তাঁদের দেশে এবং এই দেশের ইতিহাস, অভ্যুত্থান এবং ভবিষ্যতের একটি নব জাতির উত্থানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে, চিঠিপত্রে এবং অন্যান্য রচনাদিতে। 'অ্যাব্রড ইন আমেরিকা' গ্রন্থটিতে তৎকালীন আমেরিকা সম্পর্কে কেবল নানা মন্তব্যই লিপিবদ্ধ করা হয়নি, সেই যুগে আমেরিকা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিচয়ও এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির মধ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে পৃথিবীর চৌত্রিশ জন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ব্যক্তিত্বকে, যাঁরা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতালাভের পর থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা পরিদর্শন করেছেন, আমেরিকার জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন এবং নবীন রাষ্ট্র আমেরিকা সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই তালিকায় রয়েছেন চার্লস ডিকেন্স থেকে শুরু করে জে. বি. ইয়েটস, এইচ. জি. ওয়েলস এবং অন্যান্যরা। এই তালিকায় একমাত্র যে-ভারতীয় মনীষী সসম্মানে এবং বিরাট মর্যাদায় স্থান পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন নবীন ভারতের নব রূপকার বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

এই গ্রন্থটির ২৩৮ পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুপরিচিত ফটোগ্রাফ, যেটি 'শিকাগো ভঙ্গি' নামে প্রসিদ্ধ এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোর গোয়েজ লিথোগ্রাফিক কোম্পানীর লিথোগ্রাফিক পোস্টার—'দ্য হিন্দু মঙ্ক অব ইন্ডিয়া' মুদ্রিত হয়েছে। ছবির পরিচয়সূত্রে জানানো হয়েছে—১৮৯০-এর দশকের প্রথম দিকে স্বামীজী আমেরিকায় ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি আমেরিকাকে 'ইয়াঙ্কি ল্যান্ড' বলতেন, এদেশের ভোগবাদী সমাজ সম্বন্ধে তাঁর 'মিস্টিক' ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিলেন এবং আমেরিকাবাসীদের তিনি মুগ্ধ করেছিলেন। তার পরের পৃষ্ঠা অর্থাৎ ২৩৯ পৃষ্ঠায় চব্বিশতম মনীষী হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের একটি জীবনীমূলক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধটি লিখেছেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রখ্যাত অধ্যাপক সি. বি. ত্রিপাঠী। অধ্যাপক ত্রিপাঠী 'কংগ্রেস অব আমেরিকান হিস্ট্রী'র প্রতিষ্ঠাতা এবং সেইসময় তিনি আমেরিকায় 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ইউনাইটেড স্টেটস্: আর্লি কনট্যাক্টস (১৭৮৪—১৮৩৩ খ্রীঃ)' বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। ঐ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধের শিরোনামের নিচেই স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো থেকে লেখা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের একটি চিঠির উদ্ধৃতির কিয়দংশ তুলে দেওয়া হয়েছে:

"Asia laid the germs of civilization, Europe developed man, and America is developing women and masses.... The Americans are fast becoming liberal...and this great nation is progressing fast

towards that spirituality which was the standard boast of the Hindus."

এর পরেই সি. বি. ত্রিপাঠীর প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে (পৃঃ ২৪০—)। প্রবন্ধে তিনি শিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে স্বামীজী যে-ভূমিকা নিয়েছিলেন সেখান থেকেই তাঁর প্রবন্ধের সূচনা করেছেন এবং কিভাবে তিনি তাঁর অসাধারণ বক্তৃতার দ্বারা শিকাগো বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনে প্রথমে সমস্ত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ক্রমশঃ তাঁর বিশ্বজনীন সৌহার্দ্যবোধের বাণী দিয়ে আমেরিকাবাসীকে মুগ্ধ করেছিলেন তা আলোচনা করেছেন। তিনবছর সেখানে বাস করে আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পরি-ভ্রমণ করে আমেরিকার সদ্যজাগ্রত জনসমাজকে যেভাবে তিনি জেনেছিলেন তার বিবরণ প্রকাশ করেছেন ডঃ ত্রিপাঠী। তারপর তিনি স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, গুরুরূপে তাঁকে বরণ, পরে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা, —সমস্ত কিছুই উল্লেখ করেছেন। তবে প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে এবং কি চোখে সেদিনকার নব উন্মেষিত, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ আমেরিকাকে দেখে-ছিলেন, ভেবেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন—তাকেই প্রকাশ করা।

আমেরিকায় আমন্ত্রিত হয়ে আমি গিয়েছিলাম ১৯৯০-এর আগস্ট মাসে। সেসময় আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের পূর্বপ্রান্তের বহু গুণিমানুষের সান্নিধ্যে আমি এসেছিলাম এবং তাঁদের কাছ থেকে স্বামীজী সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম। আমার বন্ধু নারায়ণ মজুমদার নিউ জার্সি স্টেটের ডেটন শহরে থাকেন। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ স্টেটেরই অন্তর্ভুক্ত হোমডেল-এ ডঃ ব্রজদুলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ গন্ধবিজ্ঞানী, যিনি বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভার অ্যান্ড ফ্রাগ্রান্স কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট। ব্রজদুলালবাবুর কাছ থেকেই আমি উপরি-উল্লিখিত বইটির সন্ধান পাই। এছাড়াও তিনি স্বামীজী সম্পর্কে আরও বহু তথ্য আমাকে দেশে ফিরে আসার পর পাঠিয়েছিলেন। পরে একটি চিঠিতে (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০) ওদেশে স্বামীজীর বিরাট প্রভাব সম্পর্কে কিছু কথা তিনি আমাকে লিখেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ

"১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার দ্বিতীয় স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উপলক্ষে যেসব বিদেশী পর্যটক এদেশের ওপর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁদের ওপর প্রবন্ধ সংকলন করে যে-স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রচ্ছদপট সহ স্বামী বিবেকানন্দের যে-জীবনী ছিল তার ফটো কপি আপনার কাছে পাঠালাম। এতে বোঝা যাবে, আমেরিকা স্বামী বিবেকানন্দকে কতদূর সম্মান দিয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে ভাবতে হবে ভারত তাঁর জন্য কি করেছে। ভারতীয়দের, যাঁরা স্বামীজীর সম্পর্কে গবেষণা করছেন ও করবেন, তাঁদেরও হয়তো একটু চক্ষু উন্মেষ হবে।"

আমেরিকা থাকাকালীন ব্রজবাবুর সঙ্গে আমার বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে, নানা আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তী কালে সেই আলোচনার সূত্র ধরে যে-চিঠি ও তথ্যাদি তিনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন তাতে আমার মনে হয়েছে যে, আমেরিকাবাসীরা তাঁদের স্বাধীনতালাভের দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে পৃথিবীর সেই সব শ্রেষ্ঠ মনীষীকে স্মরণ করেছিলেন যাঁরা তাঁদের দেশে এসেছিলেন, তাঁদের দেশকে ভাল-বেসেছিলেন এবং নব-উন্মেষিত একটি জাতির নব-অভ্যুদয়ের নানা বিকাশের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন তাঁদের ভাষণ, রচনা ও চিঠিপত্রাদিতে—যেগুলি ছিল তাঁদের আমেরিকাকে 'আবিষ্কারে'র কাহিনী। আর সেই প্রসঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল, কলম্বাস যেমন ভারত আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে বহু জলপথ পরিভ্রমণ করে শেষ-কালে আমেরিকা ও সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছিলেন, ঠিক তেমনি ছয়বছর ধরে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর পরিভ্রমণ করে তৃণমূল থেকে যে ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন তাকে নতুন করে তিনি 'আবিষ্কার' করলেন আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে। শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলন ছিল সেদিন একটা উপলক্ষ, মানুষ যেমন একটা তিথি বা উৎসব উপলক্ষে তীর্থপর্যটন করে। পাশ্চাত্যদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে কি করে মানুষের জাগতিক জীবনযাত্রার বিষয়গুলি

এত সহজে এবং অল্প সময়ে সমাধান করে ফেলল —সেটিকে মূল থেকে অনুসন্ধান করাই ছিল স্বামীজীর আমেরিকাযাত্রার উদ্দেশ্য। অপরদিকে পাঁচহাজার বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রগতিশীল ভারতবর্ষে মানবসম্পদ এত উচ্চ গুণসমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও কেন দুঃখ-দারিদ্র্য, অসহায়তা, চরিত্রভ্রষ্টতা, মেরুদণ্ডহীনতা ও পরাধীনতা এত দ্রুত তাকে শোচনীয় অবস্থার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে—সেটিও স্বামীজীর অনুসন্ধানের একটি বিষয় ছিল। ছয়বছর ধরে ভারত-পরিক্রমায় যে-প্রশ্ন তাঁর মনে বারবার উত্থিত হয়েছিল তা হলো এই: এত বৃহৎ, এত মহান ভারতবর্ষে কেন এত দুঃখ-দারিদ্র্য, কেন এত অসহায়তা এবং কেন তার পরাধীনতা? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায়—নবোত্থিত, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত, সদাজাগ্রত একটি মহাদেশে, যেখান থেকে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাবেন, আবিষ্কার করবেন তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভারতবর্ষকে। কোন কিছুর ছবি আঁকতে গেলে প্রয়োজন হয় ক্যানভাসের—উপযুক্ত প্রেক্ষাপটের। স্বামীজী এই প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন আমেরিকাকে। তিনি শিকাগোয় ধর্ম-মহাসম্মেলন উপলক্ষে আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে স্বাধীন আমেরিকাকে যেমন 'আবিষ্কার' করেছিলেন, তেমনি স্বাধীন দেশ আমেরিকার প্রেক্ষাপটে পরাধীন ভারতকে নতুনভাবে 'আবিষ্কার' করেছিলেন বললে খুব কমই বলা হবে। ভারত সম্পর্কে এক নতুন উপলব্ধিতে এক নবতর দার্শনিক চেতনায় তিনি উদ্বোধিত হয়েছিলেন। তাঁর এই 'ভারত আবিষ্কার' ছিল পরাধীন ভারতবর্ষের আত্ম-মর্যাদাবোধ, স্বাতন্ত্র্য, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা-স্পৃহাকে নতুন করে উদ্বোধিত করার প্রথম পদক্ষেপ, এককথায় পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার প্রথম বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা।

বিদেশযাত্রার কয়েকমাস আগে খেতড়ি নিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ তারিখে স্বামীজী একটি পত্র লিখেছিলেন বোম্বাই থেকে। সে-পত্রটি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, কেন স্বামীজী বিদেশে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল, কোন্ সত্য উদ্ঘাটনে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, আমেরিকা যাওয়াটা ছিল কেবল তাঁর ভারত আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা নয়, ভারত-মুক্তি তথা ভারতের শৃঙ্খলমোচনের প্রয়াসও বটে। পত্রের সূচনাতেই তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন, এত মহান ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতবর্ষের স্বাধীন চিন্তার বিকাশের এত দ্রুত অবলুপ্তি ঘটল কেন? তাঁর মতে, "হিন্দুগণ চিরকালই সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও সত্যের বিচার দ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের সকল দর্শনেই দেখিতে পাই—প্রথমে একটি সাধারণ 'প্রতিজ্ঞা' ধরিয়া লইয়া তারপর তাহার চুলচেরা বিচার চলিতেছে; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাটি হয়তো সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও বালকোচিত। কেহই এই সকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা অথবা অনুসন্ধান করে নাই।"[১] স্বামী বিবেকানন্দ তাই বললেন: "সুতরাং আমাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। সেইজন্যই আমাদের দেশে পর্যবেক্ষণ ও সামান্যী-করণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্ত অভাব দেখিতে পাই।"[২] এর কারণ হিসাবে তিনি এক অসাধারণ বিশ্লেষণে উপনীত হয়ে আমাদের জানিয়ে-ছিলেন যে, প্রথমতঃ এদেশে গ্রীষ্মের অত্যন্ত আধিক্য ভারতবাসীকে 'কর্মপ্রিয়' না করে 'শান্তি ও চিন্তা-প্রিয়' করেছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করতেন না। যাঁরা করতেন তাঁরা ছিলেন সবাই বণিক। কিন্তু পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাদের নিজেদের ব্যবসাগত লাভাকাঙ্ক্ষা এত মাত্রাতিরিক্ত ছিল যে, তাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে যেসব সংবাদ বিদেশ থেকে আসত তা অধিকাংশ সময়ই ছিল অতিরঞ্জিত, অবাস্তব এবং কাল্পনিক। তাই স্বামীজীর মতে, বেশ কয়েকশো বছর ধরে আমাদের আর্থিক উন্নতি ঘটলেও বহি-র্বাণিজ্যের ফলে জ্ঞানভাণ্ডার বিশেষ উন্নত হয়নি,

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৪৯ ২ ঐ

বরং অবনতই হয়েছিল।

এই পত্রের শেষাংশে স্বামীজী তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টির দ্বারা এমন একটি বক্তব্যে উপনীত হয়েছেন, যা এককথায় অসাধারণ। তিনি বলছেন: "আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে।"[৩] এথেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পরাধীন দেশের একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কেন বিদেশে যাবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করলেন। প্রথমতঃ তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল যে, অন্যান্য দেশে বিশেষ করে স্বাধীন দেশের সমাজ-যন্ত্র কিভাবে পরিচালিত হয় এবং তার দ্বারা ভারতবর্ষীয় সমাজজীবনে কিভাবে পরিবর্তন করা সম্ভবপর। একটি গতিশীল স্বাধীন বিদেশী সমাজ কিভাবে পরিচালিত হয় তার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলিই বা কি, কোথায় একটি জাতির জীবন-সত্য লুক্কায়িত থাকে—এসমস্ত এই নবীন সন্ন্যাসীকে বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলেছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি একথা সার্থকভাবে অনুভব করেছিলেন যে, পরাধীন ভারতবর্ষকে যদি পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হতে হয় তাহলে অপর দেশের অন্যান্য জাতির চিন্তার সঙ্গে গঠনমূলক সংস্রব রাখতে হবে। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ যখন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন: "আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে"—তখন কি আমাদের একথা মনে হয় না যে, স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এই পরাধীন ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি ব্যাপার সংঘটিত হোক, যার দ্বারা তার চিত্তের যে জড়তা তা দূর হবে? একটা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে গেলে প্রথমে দরকার তার চিত্তের জড়তামুক্তি, তারপরে দরকার বিভিন্ন কর্মসূচীর (programmes) মাধ্যমে দেশকে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। এর জন্যে স্বামীজী চেয়েছিলেন ভাবের আদানপ্রদান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিশীল ও বলিষ্ঠ চিন্তা ও আদর্শের সংযোগ। তিনি ঐ পত্রের পরবর্তী অংশে বিদেশের সঙ্গে মেলামেশার ফলে চিত্তের জড়তামুক্তির পর কোন্ কর্মসূচীর মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে তাও একের পর এক সহজ ভাষায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কর্মসূচীর পদক্ষেপ কিভাবে নেওয়া হবে সেকথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "সর্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে।"[৪] দ্বিতীয়তঃ অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত মনোভাব অবিলম্বে দূর করতে হবে। এপ্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল—"ভাঙ্গীরূপে যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সংক্রামক রোগের ন্যায় সকলে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে; কিন্তু যখনই পাদ্রী সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা জামা (যতই ছিন্ন ও জর্জরিত হউক) পরিতে পায় তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়িতেও প্রবেশাধিকার পায়।"[৫] তৃতীয়তঃ একদিকে পৌরোহিত্যের যে অত্যাচার তাও যেমন দূর করতে হবে, ঠিক তেমনি খ্রীস্টান পাদ্রীরা যে বহু হিন্দুকে খ্রীস্টানে রূপান্তরিত করছে, অবিলম্বে তা বন্ধ করার প্রয়োজন আছে, সেদিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেননি। সুতরাং বেশ দেখা যাচ্ছে যে, বিদেশযাত্রার আগে থেকেই তিনি যেমন আমাদের দেশে পরাধীন সমাজব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলো সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন, তেমনি দেশের দারিদ্র্যমুক্তিও তাঁর অন্যতম প্রধান চিন্তা ছিল। দেহের ক্ষুধা থেকে মুক্তি এবং চিত্তের সংকীর্ণতা ও দৈন্য থেকে পরিত্রাণ লাভ করে পরাধীন ভারতবর্ষকে তিনি স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর সেজন্যই তাঁর সমুদ্রযাত্রা। এই যাত্রা তাঁর স্বাধীনতার সন্ধানে যাত্রা।

১৮৯২-এর ৩১ মে আমেরিকা যাত্রা করে ৩০ জুলাই শিকাগো পৌঁছানো পর্যন্ত যে-কাহিনী, তার অনেকটাই আমরা এখন জানি মারি লুইস বার্কের ঐতিহাসিক গবেষণার সুবাদে। আমাদের অনেকেরই আগে ধারণা ছিল যে, শিকাগোর ধর্মসভায় যে-ভাষণ স্বামীজী দেন সেটিই আমেরিকায় তাঁর প্রথম ভাষণ। কিন্তু এখন দেখছি যে, ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করার আগেই তিনি

৩ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪২

৪ ঐ

৫ ঐ

নানাভাবে নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে, ভারতীয় ঐতিহ্যকে, ভারতের ধর্মকে, ভারতবাসীর জীবনযাত্রাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন আমেরিকার মানুষদের সামনে। ভারত যে একটি মহান ঐতিহ্যশালী দেশ, তার যে একটি সুপ্রাচীন অতীত গৌরব আছে সেটি যেমন তুলে ধরবার তিনি চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভারতের দারিদ্র্য এবং বর্তমান সমস্যা কি, তাও তিনি বলবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ব থেকেই স্বামীজী ভারতকে তুলে ধরবার চেষ্টা করছিলেন, আবার স্বাধীন আমেরিকাকেও নানাভাবে জানবার চেষ্টা করছিলেন। এটিই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সেই সময়কার আমেরিকা ও ভারত আবিষ্কারের প্রচেষ্টার সূচনা।

শিকাগো ধর্মমহাসভার পরে ২ নভেম্বর ১৮৯৩ আলাসিঙ্গাকে একটি পত্রে স্বামীজী জানাচ্ছেন আমেরিকানদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব : "এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না। ইহারা সব জিনিস জানিতে ইচ্ছা করে, আর ইহাদের নারীগণ সকল দেশের নারী অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকান নারী আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষেরা অর্থের জন্য সারা জীবনটাকেই দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আর স্ত্রীলোকেরা অবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে; ইহারা খুব সহৃদয় ও অকপট।"[৬] ঐ পত্রেই তাঁর বক্তব্যকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লিখছেন : "আমি সংক্ষেপে জগতের সমুদয় জাতির কার্য ও লক্ষণ এইরূপে নির্দেশ করিতে চাই—এশিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল, ইউরোপ পুরুষের উন্নতিবিধান করিয়াছে, আর আমেরিকা নারীগণের এবং সাধারণ লোকের উন্নতিবিধান করিতেছে। এ যেন নারীগণের ও শ্রমজীবিগণের স্বর্গস্বরূপ। আমেরিকার নারী ও সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করিলে তৎক্ষণাৎ তোমার মনে এই ভাব উদিত হইবে। আর এই দেশ দিন দিন উদার ভাবাপন্ন হইতেছে। ভারতে যে 'দৃঢ়চর্ম খ্রীস্টান' (ইহা ইহাদেরই কথা—'hard-shelled Christians') দেখিতে পাও, তাহাদের দেখিয়া ইহাদিগের বিচার করিও না। তাহারা এখানেও আছে বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। আর যে আধ্যাত্মিকতা হিন্দুদের প্রধান গৌরবের বস্তু, এই মহান জাতি দ্রুত তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।"

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আমরা স্বামীজীর আমেরিকা আবিষ্কারের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। আমেরিকানদের যে-স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যটি সর্বপ্রথম স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন, তা হচ্ছে তাদের অনুসন্ধিৎসা। আমেরিকান জাতি সব জিনিস জানবার এবং বোঝবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মতে আমেরিকান নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। এখানকার নারীগণ যে সকল দেশের নারী অপেক্ষা উন্নত, একথা স্বামীজী স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছিলেন। তৃতীয়তঃ, আমেরিকানরা জাতি হিসাবে সহৃদয় ও অকপট। চতুর্থতঃ, এই দেশ তাঁর কাছে নারী ও শ্রমজীবীদের পক্ষে স্বর্গ-স্বরূপ মনে হয়েছিল। পঞ্চমতঃ, এই দেশ দিন দিন উদার মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠছে। আর সবচেয়ে যে-বৈশিষ্ট্যটি আমেরিকানদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আকর্ষণীয় বলে স্বামীজীর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল, তা হচ্ছে যে-আধ্যাত্মিকতা হিন্দুদের প্রধান গৌরবের বস্তু এই মহান জাতি তার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। একটি নবোত্থিত সংগ্রামশীল স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি সম্পর্কে স্বামীজীর এই উপলব্ধি বিস্ময়কর। প্রায় একশো বছর পরে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন—স্বামীজীর আমেরিকা আবিষ্কারের প্রসঙ্গে। পূর্ব-উল্লিখিত প্রবন্ধের সূচনায় সেই পরিচয় উপস্থিত করা হয়েছে।

স্বাধীন আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজী কেবল আমেরিকাকে আবিষ্কার করেননি, তিনি ভারতকেও আবিষ্কার করেছিলেন নবতর দৃষ্টিতে ও নতুন চেতনার আলোকে। ঐ পত্রেই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন হিন্দু যেন তার ধর্ম ত্যাগ না করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে, ভারতের

৬ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩

উন্নতির জন্য প্রথমতঃ ধর্মকে তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যাপৃত রাখতে হবে আর দ্বিতীয়তঃ সমাজকে উন্নতির স্বাধীনতা দিতে হবে। স্বামীজী এক অসাধারণ প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের অবনতির কারণ, কি করে ভারতবর্ষ আবার জাগ্রত হয়ে উঠবে, তার উপায়ই বা কি—সবকিছু উপলব্ধি করেছিলেন। স্বামীজী ঐ পত্রে বলছেন: "ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রম পড়িয়াছেন যে, পৌরোহিত্যের সর্ববিধ অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁহারা ধর্মকেই দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙিতে উদ্যত হইলেন।"[৭] এর ফল কি হয়েছিল? স্বামীজীর ভাষায়: "নিষ্ফলতা। বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই একসঙ্গে ভাঙিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন।" তাই স্বামীজীর কাছে জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বামীজী এর প্রতিকারকল্পে চেয়েছিলেন ভারতের প্রতিটি মানুষের 'হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি' ফিরিয়ে আনতে। তুলনামূলকভাবে তিনি বলেছিলেন, আমেরিকায় যে কেউ একজন জন্মালে সে জানে—সে একজন মানুষ। কিন্তু ভারতে যে জন্মায় সে জানে—সে সমাজের ক্রীতদাস-মাত্র। স্বামীজীর ভাষায়—"স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও তাহার ফল অবনতি।"[৮] স্বামীজীর আমেরিকা আবিষ্কার যে মূলতঃ ভারত আবিষ্কার এবং তা যে প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ—উপরোক্ত বক্তব্যে এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। ঐ পত্রেই স্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে, আধুনিক প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদপ্রথা কত দ্রুতবেগে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বহু ব্রাহ্মণকে যে জুতোব্যবসায়ী এবং মদ্যব্যবসায়ীরূপে দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল প্রতিযোগিতা। তাই দেখা যায়, সরকারের অধীনে কারো জীবিকার জন্য যেকোন বৃত্তি আশ্রয় করতে বাধা থাকে না। এর ফল হিসাবে স্বামীজী 'প্রবল প্রতিযোগিতার' কথাই বলেছেন।

এর পরেই স্বামীজী পরাধীন, দরিদ্র, পদদলিত দেশবাসীর জন্য আমাদের এখন কোন্ পথে সংগ্রাম শুরু করতে হবে তার আলোচনায় উপনীত হয়েছেন। তাঁর ভাষায়: "সাহস অবলম্বন কর, আমার দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা বড় বড় কাজ হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান বড় বড় কাজ করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, আর আমরা তাহা করিব। নিজদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ।"[৯]

স্বামীজী সেদিন মুগ্ধ আমেরিকার সমাজজীবন এবং তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অনুসন্ধান করে বেশ স্পষ্ট অনুধাবন করেছিলেন যে, কর্মই হবে আধুনিক পৃথিবীর আগামী দিনের একমাত্র ধর্ম। কারণ, কর্মই পারে বাস্তব অর্থে মানুষকে সুখী এবং সমৃদ্ধ করতে। সুখী এবং সমৃদ্ধশালী মানুষই প্রকৃত অর্থে ধর্মপালন করতে পারে। আমেরিকায় এসে তিনি একথা অনুভব করেছিলেন যে, নিরলস কর্ম এবং অধ্যবসায় কেবল একটা জাতিকে শুধু অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির দিকেই নিয়ে যায় না—সেই জাতির আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাস্পৃহাকে মজবুত, সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করে তোলে। স্বামীজী একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটাই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রত্যেক ভারতবাসীকে প্রকৃত কর্মী হয়ে উঠতে হবে এবং তার জন্যে স্বামীজী চাইলেন প্রত্যেক ভারতবাসী যেন "পবিত্র, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ প্রেমসম্পন্ন" হয়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে তারা "দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদের" ভালবাসে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের সাধারণ মানুষ ও নারীসমাজ যেন শিক্ষিত হয়। শিক্ষার প্রসার হলে তাদের আত্মজাগরণ ঘটবে। ভারতবর্ষের অবনতির কারণ যে জনসাধারণ ও নারীসমাজকে অবহেলা করা, তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর ভারত-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাঁর সেই উপলব্ধি স্থির সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হয়েছিল স্বাধীন আমেরিকাকে আবিষ্কারের পর। স্বাধীন আমেরিকাকে চেনা ও

৭ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪

৮ ঐ, পৃঃ ৩৪৪

৯ ঐ, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫

জানার পর তাঁর প্রকৃত অর্থে ভারত আবিষ্কারের সূচনা হয়েছিল। বস্তুতঃ তা থেকেই ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল আত্ম-অনুসন্ধান, আত্মমর্যাদার উন্মেষ, আত্মসচেতনতার আকাঙ্ক্ষা। এককথায় শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর আবির্ভাব-লগ্ন ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাপর্ব।

সুতরাং বলা যেতে পারে, স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যে স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, তা ছিল প্রকৃত অর্থেই একজন আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয়ের আত্মানুসন্ধান ও স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা। তিনি জানতেন যে, তিনি এসেছেন এমন একটি মহান দেশ থেকে—যে-দেশের সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন। তিনি আমাদের গৌরব ও ঐতিহ্যের সেই ইতিহাসকে এইভাবে শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রথম দিবসের অধিবেশনে তুলে ধরেছিলেন : "সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।…যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করিবার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মে পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুসন' শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।"

বজ্রনির্ঘোষে বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সেদিন সমস্ত জগতের সামনে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে ও তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে যা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তা হলো একটি গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ অথচ বর্তমানে পরাধীন জাতিকে আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য-বোধে উদ্বুদ্ধ করা। আর সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছিল প্রকৃত অর্থে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা। স্বামী বিবেকানন্দের ঐ ভাষণ কেবল ভারতবর্ষকেই নয়, সমগ্র পৃথিবীকেও আগামী দিনের নতুন যুগের নব-স্বাধীনতার বার্তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

স্বামীজী সেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সামনে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রথমেই মানবমনের অন্ধকারকে দূর করতে হবে—আর তার মধ্য দিয়েই আসবে মানুষের স্বাধীনতা—মানবমুক্তির মহাসন্ধিক্ষণ। প্রত্যেকটি দেশের, প্রত্যেকটি সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং তার ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা, যা বহুকাল ধরে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে কলুষিত করে রেখেছে, তাকে নির্মূল করতে হবে। উপরোক্ত তিনটি ভয়াবহ ক্ষতিকারক বিষয় "পৃথিবীকে বারবার হিংসায় পরিপূর্ণ করেছে, নরশোণিতে সিক্ত করেছে, সভ্যতার পর সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে এবং সমগ্র মানবজাতিকে হতাশায় আচ্ছন্ন করেছে।" এর ভয়াবহ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারলে তবেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা এবং বিশ্বসৌহার্দ্যবোধ সম্ভব হবে।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে স্বাধীন আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাকে যেমন আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি আবিষ্কার করেছিলেন ভারতবর্ষকে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বমানবের মধ্যে কিভাবে প্রেম ও সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠবে তারও পথের সন্ধান তিনি দিয়েছিলেন সেদিন শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে। ভারতের জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা মহাদেশ। তার অনেক অনেক বছর পরে এক সর্বত্যাগী মহান সন্ন্যাসী আমেরিকা মহাদেশে এলেন, ভ্রাতৃত্ববোধে জয় করলেন আমেরিকাবাসিগণের হৃদয়কে, আবিষ্কার করলেন আমেরিকার স্বরূপকে। আর আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতকে করলেন নতুন করে আবিষ্কার—ঘোষণা করলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উদ্বোধনী বাণী, শোনালেন আগামী দিনের বিশ্বমানবের মুক্তির মহামন্ত্র। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার স্বাধীনতার দ্বিশত বার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানাল ভারতের মহান বীরসন্ন্যাসীকে।

নিবন্ধ

ভক্তি

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

ভাষান্তর: স্বামী প্রভানন্দ

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ছাত্রাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র ছিলেন 'ঈশ্বরকোটি' ভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার—নরেন্দ্রের নিচেই পূর্ণের ঐ বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে।" ঠাকুরের মহাসমাধির পর পূর্ণকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৪২ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

আধ্যাত্মিক পরমানন্দলাভের যেসকল উপায় প্রাচীন মুনিঋষিগণ দেখিয়ে গিয়েছেন তাদের অন্যতম ভক্তিযোগ। স্বামী বিবেকানন্দ 'ভক্তিযোগ' শীর্ষক ভাষণগুলির প্রারম্ভে ভক্তির যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার চেয়ে উত্তম কোন সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। "অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি তার আদি মধ্য ও অন্ত।" "ভগবানে পরমপ্রেমই ভক্তি।" "ভক্তিলাভ করলে জীব সর্বভূতে প্রেমবান ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তৃপ্তিলাভ করে।" উপরোক্ত পরমপ্রেম লাভ করবার জন্য অত্যধিক প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। যদি জাগতিক ঐশ্বর্য এবং বিবিধ সাংসারিক সুখ ও অভীষ্ট বস্তুর নশ্বরত্ব ও শূন্যগর্ভতা সম্বন্ধে তোমার একবার দৃঢ় ধারণা হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে যদি বিশ্বের চিরন্তন সৌন্দর্য ও প্রকৃতির যাবতীয় উদ্ভাসের অন্তরালে লুকনো চৈতন্যদীপ্তির প্রতি তোমার দৃষ্টি একবার উন্মোচিত হয়, তবে এই পদ্ধতিতে তুমি তোমার হৃদয়কে পূর্বোক্ত সৌন্দর্য ও চৈতন্যদীপ্তির মূল উৎসের সমীপবর্তী করতে পারবে। ফলতঃ তোমার মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হবে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপাতা পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ জানা ও অনুভব করার উপায়সকল যত অপ্রতুল বোধ হবে, তাঁকে অধিকতর জানবার এবং তোমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটি বোঝাবার আকাঙ্ক্ষা ততই প্রবল হয়ে উঠবে। তাঁর সমীপবর্তী হওয়ার প্রচেষ্টায় তুমি নিজেকে যত অসহায় বোধ করবে, তোমার প্রযত্ন ততই তীব্র হয়ে উঠবে। সকল বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে তাঁকে লাভ করবার জন্য তোমার প্রয়াস হয়ে উঠবে তীব্রতর। জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছ যেমন জলে ফিরে যাবার জন্য ছটফট করে, অথবা শক্ত হাতে ঘাড় চেপে ধরে নদীর জলে চোবানো একজন মানুষ, যার জলের ওপর মাথা তোলা অসম্ভব, বাতাসের জন্য যেমন হাঁসফাঁস করে, তোমার ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা তেমনটি হলে তখনই বলা যাবে যে, তোমার ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি উৎপন্ন হয়েছে। তুমি যখন ঈশ্বরের জন্য এধরনের টান অনুভব করবে, তখন বুঝতে হবে ভক্তের চরম আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য জীব ও ঈশ্বরের মধুর মিলন অদূরবর্তী।—এই হচ্ছে সন্তগণের অভিমত।

ভক্তিপথে ঈশ্বরোপলব্ধির সুবিধা এই যে, এ-পথ হলো সহজতম ও সবচেয়ে স্বাভাবিক। যে-কোন সাধারণ মানুষও এই পথ অনুসরণ করতে সক্ষম। যে ভালবাসতে জানে সে-ই পারে ভক্ত হতে। আর এমন কোনও মানুষ আছে কি, যে সারাজীবনে কোন-না-কোন সময়ে ভাল না বেসেছে? মাতৃক্রোড়ে শৈশব অবস্থা থেকেই আমরা ভালবাসতে শিখি। শৈশব অবস্থা থেকেই যাকিছু আমাদের মনে হয় সুন্দর, তাকেই ভালবাসতে, প্রশংসা করতে শিখে থাকি। ক্রমে আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে আমাদের ভালবাসার পরিধি। বস্তুতঃ তখনই আমরা ভালবাসার মর্যাদা দিতে, ভালবাসার পাত্রকে শ্রদ্ধা করতে শিখি। বার্ধক্যে আমাদের জীবনগ্রন্থের পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখতে পাই —গৃহস্থ স্বামী পিতা বা ভ্রাতা—যেকোনও ব্যক্তির ভূমিকায় আমরা যখন যখন প্রীতির আলোকে আমাদের কাজকর্ম পরিচালনা করেছি, তখন তখনই আমরা পেরেছি সুখী হতে। অপরপক্ষে যখনই

আমরা প্রীতি ভিন্ন অপর কিছু দ্বারা পরিচালিত হয়েছি, তখনই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ভোগ করেছি দুঃখ ও দুর্দশা, বাহ্যতঃ যদিও আমাদের মনে হয়েছে অন্যরূপ। এই ধরনের ভালবাসা বা প্রীতি বিশুদ্ধ, উর্ধ্বগামী এবং সম্পূর্ণ-ভাবে স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হলে, তাকে বলব ভক্তি।

'আমাকে ভালবাস, আমার কুকুরকেও ভালবাস' এই ইংরেজী প্রবচনটি গতানুগতিক হলেও নেহাতই সত্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। পাঠকদের বলা নিষ্প্রয়োজন যে, প্রবচনটির অর্থ হচ্ছে, 'আমার প্রতি তোমার যে-ভালবাসা আমার সামান্যতম প্রিয় বস্তুটির প্রতিও যদি তুমি তা সঞ্চারিত করতে না পারলে, তবে তোমার প্রীতিতে আমি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারব না।' ঈশ্বরপ্রীতির ক্ষেত্রেও একথাটি সত্য। তোমার ঈশ্বর-প্রীতি খাঁটি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বর-সৃষ্ট সামান্যতম জীবটি পর্যন্ত তোমার প্রেমের অংশ-ভাক্ হতে পারছে। তোমার প্রেমের শক্তি ও সামর্থ্যে যখন তোমার ঈশ্বরের সর্বব্যাপী স্বরূপটি সম্বন্ধে বোধোদয় হবে, তখনই তুমি পাপী ও সাধু, শত্রু ও মিত্র—সকলের মধ্যেই সমভাবে দেখতে পাবে ঈশ্বরকে। সেসময়ে অনুভব করবে তোমার ব্যক্তি-সত্তা মিলিয়ে গেছে বিশ্বজনীন সত্তাতে।

বিবাহের লক্ষ্য একটি পুরুষের জীবাত্মা ও একটি নারীর জীবাত্মার মধ্যে ঐক্যসাধন। ঠিক তেমনি যাবতীয় ধর্মসাধনার লক্ষ্য সাধকের জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মার একত্বলাভ। পাশ্চাত্যদেশে বিবাহে ইচ্ছুক পুরুষ তার পছন্দমতো একটি নারীর সাথে পরিচিত হয়। দুজনের বারম্বার দেখা-সাক্ষাতের ফলে গড়ে ওঠে একটা প্রণয়ের সম্পর্ক। কালক্রমে তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রণয়াকর্ষণ এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, দুজনের প্রত্যেকেরই মনে হয় অপরজন ব্যতীত সে বাঁচতে পারবে না, সুখী হতে পারবে না। এই অবস্থাতে বলা যায়,তাদের বন্ধুত্ব পরিণত হয়েছে প্রেমে। তারপর আসে পাণিপ্রার্থনা ও বিবাহের প্রস্তাব। উভয়ের সম্পর্কের এই পর্যায় পর্যন্ত তাদের দুজনের প্রত্যেকেই ভাবে যে, তারা দুজন বিভিন্ন ব্যক্তি, তাদের স্বার্থ ভিন্ন, তাদের নাম ভিন্ন, তাদের নিবাস ভিন্ন, তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত; তাদের সম্বন্ধে অপর সকলের মধ্যেও দেখা যায় অনুরূপ ভাবনা। কিন্তু তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের পর এটাই প্রত্যাশিত যে, তারা দুজন হবে এক হৃদয়, এক আত্মা, এক চিন্তাভাবনার অধিকারী। একজনের ন্যূনতা পূরণ করে দেবে অপরজন। পুরুষটির স্বার্থ হয়ে দাঁড়াবে নারীটির স্বার্থ। নারীটির স্বার্থ পুরুষটির। পুরুষটি ও নারীটির বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন একাকার হয়ে যাবে। দুজনের মধ্যে পরিচিতির পর ক্রমে ক্রমে তাদের সম্বন্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার ভালবাসা নিশ্চয়ই জন্মে থাকে, নতুবা তাদের দুজনের পরস্পরের মধ্যে পরিচিতি বন্ধুত্বে, বন্ধুত্ব প্রীতিতে এবং তা শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে পৌছাত না। প্রেমিকের এধরনের আচরণের মতোই এগুতে থাকেন ধর্মপথের পথিক। গুরু তাঁকে ঈশ্বরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ক্রমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং তা ধীরে ধীরে প্রীতিতে উত্তরিত হয়। এই প্রীতি ঘনীভূত হলে ধর্মার্থীর হৃদয়ে উদ্ভূত হয় ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ঐক্যের উপলব্ধি। তাঁর অনুভব হয় ঈশ্বরই সকল আত্মার আত্মা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা, যাবতীয় দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুসকলের আত্মা।

সেসময় ধর্মার্থী নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে শেখেন। তিনি সর্বভূতে নিজেকে, আবার সর্বভূতকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে শেখেন। তিনি অনুভব করেন, অপরকে সেবা না করে তিনি নিজেকে সঠিকভাবে সেবা করতে পারেন না। অপরকে না ভালবেসে তিনি নিজেকে পুরোপুরি ভালবাসতে পারেন না। তিনি নিজেকে আঘাত না করে অপরকে আঘাত করতে অসমর্থ। তিনি যতক্ষণ জগতের হিতসাধন করতে পারছেন ততক্ষণ তিনি সংসারের ভ্রূকুটি বা অনুগ্রহকে গ্রাহ্য করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি দেখতে পান অপর সকলের উদর পূর্ণ রয়েছে ততক্ষণ অনাহার তাকে বিচলিত করতে পারে না। এমনকি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তাঁর বিদূরিত হয়। তাঁর নিরন্তর অনুভব হয়, অপরকে ভালবাসা এবং প্রীতির প্রেরণায় কাজ করার অতিরিক্ত অপর কোন কর্তব্য তাঁর নেই।*

* **Brahmavadin, Vol. III, No. 8, 1 January, 1898, pp. 334-336**

দক্ষিণেশ্বরে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে স্বামী বিবেকানন্দ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে গিয়েছিলেন—এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একাধিক কারণে। প্রথমতঃ, দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজীর সেই শেষ রামকৃষ্ণ-উৎসবে যোগদান। কিছুদিনের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই বেদনাদায়ক কাহিনী আমি সবিশেষ বলেছি অন্যত্র (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪০—১৪৭)। দ্বিতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পক্ষে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই হলো শেষ আয়োজিত রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব। (এখন অবশ্য মন্দিরে উদারতর আবহাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক 'কল্পতরু উৎসব' হয়ে থাকে।)

কোন ইতিহাসই একথা অস্বীকার করতে পারবে না—১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের রামকৃষ্ণ-উৎসবের তুল্য গৌরবান্বিত উৎসব আর কখনো দক্ষিণেশ্বরে হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ বৃহৎ বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তার দ্বারা জাতীয় চিত্তে প্রবল আবেগ-অনুভূতির বন্যা বইয়ে সদ্য স্বদেশে ফিরেছেন; সেই তিনি কলকাতার পথে রাজকীয় অভ্যর্থনার মধ্যে দাঁড়িয়েছেন 'কলকাতার বালক' হিসাবে, বস্তুতপক্ষে 'শ্রীরামকৃষ্ণের বালক' হিসাবে, সেই বালক সর্বকিছু উৎসর্গ করেছেন তাঁর পিতার চরণতলে, সেই পিতা কেবল আমার পিতা নন, তিনি তোমার পিতা, সবার পিতা, গর্বে গৌরবে মাতোয়ারা হয়ে তা শুনিয়েছেন কলকাতার গণ্যমান্য সেরা মানুষদের সভায়—শোভাবাজারে—রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় (২৮ ফেব্রুয়ারি):

"ভ্রাতৃগণ। তোমরা আমার হৃদয়ের…গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছ—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গ্রহণ করিয়া।…আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিয়াছি।…সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবনচরিতগুলি ঘষিয়া-মাজিয়া কাটিয়া-ছাটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি যে-জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেমন উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের তেমন নহে।…এইরূপ কোন মহান আদর্শ পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া, তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া, কোন জাতিই উঠিতে পারে না।…যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে।"[১]

এই সভার ঠিক এক সপ্তাহ পরে, ৭ মার্চ, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে পূর্বোক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব আয়োজিত হয়। কলকাতায় তখন বিবেকানন্দ-মহাপ্লাবন। সেই বিবেকানন্দ তাঁর সর্বকিছু অর্পণ করেছেন যে-রামকৃষ্ণে, তাঁরই জন্মোৎসব। সেখানে উপস্থিত থাকবেন মণ্ডলীসহ বিবেকানন্দ। যখন বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন না, তখনই ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের বিপুল আকার চমকিত করেছিল সকলকে। ১৮৯৫-এর উৎসব সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২০৮-২১২

নেশন' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন. এন. ঘোষ) লিখেছিলেন (২৫ মার্চ ১৮৯৫) :

"দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভিতরকার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং বাইরের নদীপার্শ্বের বিস্তৃত ভূমি সারাদিন জনসমাগমে পূর্ণ ছিল। স্টীমারে, নৌকায়, গাড়িতে ও পায়ে হেঁটে স্রোতের মতো মানুষ এসেছে। সেই তরঙ্গায়িত মনুষ্য-সমুদ্রের সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়।... মহান পরমহংসের শিষ্যদের ঐকান্তিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম... মহোৎসবে যোগদানকারী সকলের মনে ছাপ রেখে গিয়েছিল—সকলেই অনুভব করেছিলেন, পরম অধ্যাত্মশক্তিধর সেই পুরুষ অবশ্যই বিরল গুণসম্পন্ন, যাঁর প্রভাব এইভাবে দিন দিন গভীরতর ও বিস্তৃতিতর হচ্ছে।"[২]

স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে যদি উৎসবের ঐ রূপ হয়, তাহলে পাশ্চাত্য-প্রত্যাবৃত্ত তাঁর উপস্থিতিতে তা কোন্ আকার ধারণ করবে—কল্পনা করে শিহরিত হতে হয়। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' ভিন্ন এই মহোৎসবের উল্লেখযোগ্য বর্ণনা কিন্তু অন্যত্র পাইনি। স্বামীজীর পরবর্তী জীবনীকারেরা এক্ষেত্রে প্রধানতঃ শরচ্চন্দ্রের বর্ণনার ওপরই নির্ভর করেছেন। সমকালীন সংবাদপত্রগুলিতেও (যেগুলি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে) এই উৎসবের বিবরণ নেই। ৭ মার্চের ইণ্ডিয়ান মিরারে কেবল, উৎসব হবে—এই বিজ্ঞপ্তিটুকু পাচ্ছি :

"To-day, the disciples of Sri Paramhamsa Ramkrishna will hold their annual celebration at Dakhineswar. This year, the celebration is likely to be on a grander scale than ever, in honour of Vivekananda."

মহাবোধি সোসাইটি জার্নালে (এপ্রিল ১৮৯৭) এইটুকু বেরিয়েছিল :

"Ramkrishna Anniversary. The Birthday Anniversary of Paramhansa took place with great splendour on Sunday, the 7th ultimo, at Rani Rashmoni's Kalibari at Dukhinesswer, Bengal."

এর মধ্যে স্বামীজীর উপস্থিতির উল্লেখ নেই।

॥ ২ ॥

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে'র সুপরিচিত বর্ণনায় পাই, স্বামীজী তাঁর কয়েকজন গুরুভ্রাতা এবং "দুইটি ইংরাজ মহিলা"-সহ (সম্ভবতঃ মিসেস সেভিয়ার ও মিস মুলার) উৎসবস্থলে সকাল ৯-১০টা নাগাদ উপস্থিত হয়েছিলেন। "তাঁহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ দর্শন করিবে, পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া।" স্বামীজী যখন দেবী ভবতারিণীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হয়েছিল। রাধাকান্ত-মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-কক্ষে গিয়েছিলেন। তারপর দুই ইংরাজ মহিলাকে পঞ্চবটী ও বিল্বমূলে দেখাতে নিয়ে যান। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী উৎসব সম্বন্ধে সংস্কৃত স্তব লিখেছিলেন—পঞ্চবটী যাবার পথে সেটি পড়ে স্বামীজী তারিফ করেন। পঞ্চবটীর একপাশে গঙ্গার দিকে মুখ করে গিরিশচন্দ্র বসেছিলেন, তাঁকে ঘিরে ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম-গানে মাতোয়ারা—স্বামীজী সেখানে উপস্থিত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম করেন, গিরিশচন্দ্রও করজোড়ে প্রতিনমস্কার করেন। পুরাতন স্মৃতিতে আলোড়িত ঐ দুজনের মধ্যে সুগভীর বাক্যবিনিময় হয়। (স্বামীজী—"ঘোষজা, সেই একদিন আর এই একদিন।" গিরিশ—"তা বটে; তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি।") বিরাট জনসঙ্ঘ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে চাইলেও প্রচণ্ড কলরবের জন্য তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেদিন চতুর্দিক 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। নহবত বাজছিল। "উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা ধর্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্তিমান" হয়ে "শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ"

২ দ্রঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শংকরীপ্রসাদ বসু, ২য় খণ্ড, ১৩৮৩, পৃঃ ১২৪ পাদটীকা

করেছিল। "সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ির সর্বত্রই একটা দিব্যভাবের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল।"

স্বামীজী বেলা তিনটার সময়ে উৎসবস্থল থেকে চলে আসেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্যগণ লিখিত স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী বা স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিত বাঙলা জীবনীতেও অতিরিক্ত কিছু নেই।

॥ ৩ ॥

সৌভাগ্যবশতঃ এই উৎসবে উপস্থিত এক ব্যক্তির বিবেকানন্দ-চিত্র আমরা পেয়েছি। লেখক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। লেখাটি বেরিয়েছিল প্রবাসী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ সংখ্যায়। যোগেন্দ্রকুমার প্রবাসীতে একাধিক সংখ্যায় "আমার দেখা লোক" শিরোনামে স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। তিনি বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণকেও দর্শন করেন, কিন্তু সেই বয়সে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিশেষ চমকপ্রদ কিছু খুঁজে পাননি। যোগেন্দ্রকুমার লিখেছেন:

"ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎলাভের দুই বৎসর কি দেড় বৎসর পরে আর একজন মহাপুরুষের দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি জগদ্বিখ্যাত পরমহংস রামকৃষ্ণদেব। পরমহংসদেবকে একদিন চার-পাঁচ মিনিটের জন্য চোখের দেখা দেখিয়াছিলাম মাত্র। আমার পিতার এক মাতুল ৺অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুরে ওকালতি করিতেন। আমি কি একটা প্রয়োজনে তাঁহার বাসাতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার সময় একটা বাগানের নিকটে দেখিলাম যে, ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু দর্শনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, যে-জন্য তথায় আজ লোক সমাগম হইয়াছে। কৌতূহলবশতঃ একজনকে সেই জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব ঐ বাগানে আসিয়াছেন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছে। আমার ইচ্ছা হইল, পরমহংস কিরূপ দেখিয়া আসি। তখন পরমহংস কাহাকে বলে, সে-জ্ঞান আমার ছিল না। আমাদের বাটীতে একখানা পাতলা চটি বই ছিল, তাহার নাম, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের রচনাবলী'। [?]। সেই পরমহংসই যে এই পরমহংস তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, জনতার সঙ্গে মিশিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। তখন বোধ হয় বেলা পাঁচটা। দেখিলাম একটা গাছতলায় এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন, একটু স্থূলকায়, দাড়ি-ছাঁটা, অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অনেক লোক বসিয়া আছে। সকলেই নীরব, তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী লোকের সহিত দুই-একটি কথা বলিতেছেন। অতি মৃদুস্বরে কথা হইতেছিল, আমি কিছুই শুনিতে পাইলাম না। যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। যুবক বালক একজনকেও দেখিলাম না। তাই সাহস করিয়া আর অগ্রসর না হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি আমার নিকটবর্তী একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পরমহংস কোথায়?' তিনি সেই জনতার মধ্যে উপবিষ্ট দাড়ি-ছাঁটা লোকটিকে দেখাইয়া বলিলেন, 'উনিই পরমহংসদেব'। আমার সেই বয়সে আমি পরমহংসদেবের সহিত সাধারণ লোকের কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম না। চার-পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের অন্ততঃ ১৩-১৪ বছর পরে যোগেন্দ্রকুমার স্বামীজীকে দেখেন। ইতিমধ্যে তিনি পরিণত যুবক, বিবাহিত। সঠিকভাবে দেখার মতো মানসিক শক্তি কিছুটা হয়েছে। তাঁর স্মৃতিকথায় স্বামীজীর এক চমৎকার কথাচিত্র পেয়েছি। এবার সেটি উধৃত করব।

"বাল্যকালে পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহার অসাধারণত্ব কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও পরে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য, জগদ্বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, একজন অসাধারণ মানুষকে দেখিলাম। স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার বৎসরেই হউক বা তাহার পর বৎসরেই হউক, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। [প্রত্যাবর্তন-বছরেই দেখেছিলেন]। তাঁহার দর্শনলাভের পূর্বেই শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে তিনি অপূর্ব বক্তৃতা করিয়া সমগ্র আমেরিকাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা

একাধিকবার পড়িয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমার অতি উচ্চ ধারণা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে বালীতে আমার শ্বশুরালয়। একদিন শ্বশুরবাটীতে গিয়া শুনিলাম যে, সেইদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ৺পরমহংসদেবের আবির্ভাব অথবা তিরোভাব উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে। বিবেকানন্দ স্বামীর তথায় আসিবার কথা আছে। স্বামীজী কালীবাড়িতে আসিবেন শুনিয়াই আমি তথায় যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। আমার সমবয়স্ক পাঁচ-সাতজন সঙ্গী জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া একখানা নৌকা করিয়া কালীবাড়িতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে, সুপ্রশস্ত অঙ্গন লোকে লোকারণ্য। বাঙালী অপেক্ষা মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীর সংখ্যাই অধিক বলিয়া মনে হইল। [?]। শুনিলাম যে, স্বামীজী তখনও আসেন নাই, তবে আসিবেন, ইহা নিশ্চিত। আমি বন্ধুবর্গ-সহ নাটমন্দিরে উঠিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলাম। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে একটা ছোট গালিচা পাতা ছিল। বুঝিলাম যে, সেই আসন স্বামীজীর জন্য রিজার্ভড্ রাখা হইয়াছে। আমি গালিচা হইতে কিছু দূরে বসিয়া রহিলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে, বাহিরে হঠাৎ একটা হৈহৈ শব্দ উঠিল—'পরমহংস রামকৃষ্ণজীকী জয়', 'স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকী জয়' ধ্বনিতে সেই প্রাঙ্গণ বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বুঝিলাম, স্বামীজী আসিতেছেন।

"মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজী সন্ন্যাসী, হয়তো ধীরগম্ভীর ভাবে, মৃদু পদক্ষেপে, নাটমন্দিরে আগমন করিবেন। কিন্তু আমার ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া যিনি নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাতে ধীরতা বা গাম্ভীর্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। উদ্দাম চঞ্চল বালকের মতো যেন অস্থিরভাবে তিনি নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা বাহিরে জয়ধ্বনি শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। স্বামীজী নাটমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র, আমরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলাম। তেমন উজ্জ্বল আয়ত-লোচন আর কাহারও দেখি নাই। মুখে হাসি। স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে সাধারণতঃ যেরূপ উষ্ণীষ ও আপাদমস্তক আলখাল্লা-পরিহিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামীজী ঠিক সেইরূপ পোশাকই পরিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও পাঁচ-সাতজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচ্ছদও স্বামীজীর পরিচ্ছদের অনুরূপ। [?]। তাঁহারা বেশ সুশ্রী, উন্নত ললাট, গৌরবর্ণ, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় তাঁহারাও ধার্মিক, বুদ্ধিমান, বিদ্বান। কিন্তু স্বামীজীর চক্ষুর মতো অত উজ্জ্বল চক্ষু কাহারও দেখিলাম না। স্বামীজীর পার্শ্বে তাঁহাদিগকে যেন একটু নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হইল।

"নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজী যাহা করিলেন তাহা দেখিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইলাম, মনে মনে একটু যে গর্ব ও অনুভব করি নাই তাহা নহে। স্বামীজীকে দেখিয়া সকলেই করজোড়ে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীরাও প্রতিনমস্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় প্রায় আট-দশ হাত দূর হইতে তাঁহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র তিনি আমাকে নমস্কার করিয়াই একেবারে আমার নিকটে আসিলেন। আমার বন্ধুরা মনে করিলেন যে, স্বামীজীর সহিত আমার পূর্বপরিচয় ছিল। কিন্তু সেই একদিন ব্যতীত আর কখনও তাঁহাকে দর্শন করি নাই। তবে তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য আমার মনে এক-এক সময় প্রবল ইচ্ছা হইত। জানি না, আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আমার সেই প্রবল আগ্রহের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা।

"তিনি উপবেশন করিলে আমরাও উপবেশন করিলাম। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু কি কথা বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি আজ এখানে বক্তৃতা করিবেন কি?' তিনি বলিলেন, 'এ ভীষণ ভিড়ে বক্তৃতা করা অসম্ভব। করিলেও সকলে তাহা হয়তো শুনিতে পাইবে না।' স্বামীজীর সহিত আমার এই প্রথম বাক্যালাপ এবং বোধ হয় ইহাই শেষ। কারণ সেদিন তাঁহার সহিত আর কোন কথা হইয়াছিল কিনা আমার মনে নাই। স্বামীজী সেই নাটমন্দিরে বোধ হয় কুড়ি মিনিট বসিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় দুইবার কি তিনবার তিনি মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া আবার

বন্ধন করিয়াছিলেন। সমস্তক্ষণ তাম্বূল চর্বণ করিতেছিলেন এবং চঞ্চল শিশুর মতো ছটফট করিতেছিলেন। তাঁহার সেই চঞ্চল ভাব দেখিলেই মনে হইত যেন একটা অদম্য শক্তিকে তিনি আপনার মধ্যে দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আর সেই শক্তি যেন বাহিরে ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীরা কিন্তু ধীর, স্থির, গম্ভীর।

"স্বামীজী নাটমন্দির হইতে বাহির হইয়া গুরু-স্থান অভিমুখে অর্থাৎ পরমহংসদেবের অধ্যুষিত কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সমস্ত জনতা সেই দিকে ধাবিত হইল। আমার সঙ্গীরা আর সেই জনতার মধ্যে যাইতে সম্মত না হওয়াতে আমরা বালী প্রত্যাবর্তন করিলাম।"

॥ ৪ ॥

যোগেন্দ্রকুমারের চমৎকার স্মৃতিকথাটির বিষয়ে দু-একটি মন্তব্য করা চলে। বিবেকানন্দ-দর্শনের ৩৮ বছর পরে তাঁর স্মৃতিকথা প্রবাসীতে বেরোয় (লেখা হয় কোন্ সময়ে?)—এই ব্যবধানে কোন কোন বিষয়ে স্মৃতির কিছু ম্লানতা ঘটতে পারে। সেইসব জায়গায় আমি তৃতীয় বন্ধনীমধ্যে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। যেমন, তিনি বলেছেন, ঐদিন দক্ষিণেশ্বরে সম্ভবতঃ বাঙালী অপেক্ষা অবাঙালী দর্শকের ভিড় বেশি হয়েছিল। অবাঙালীরা প্রচুর সংখ্যায় এসেছিলেন, একথা মেনে নেওয়া যায়। তার দ্বারা বিবেকানন্দ যে, ভারতের সকল ভাষা ও শ্রেণীর মানুষের মনে নাড়া দিয়েছিলেন, তাও প্রমাণিত—কিন্তু অবাঙালীদের সংখ্যা বাঙালী অপেক্ষা বেশি হয়েছিল, এই তথ্যের সমর্থন অন্য কোন সূত্রে পাই না। মনে হয়, সাধারণতঃ এই ধরনের উৎসবে অবাঙালী-উপস্থিতি বেশি সংখ্যায় হয় না, অথচ এখানে হয়েছিল, তাই লেখকের পরবর্তী স্মৃতিতে তা বাঙালীদের উপস্থিতি-সংখ্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল —আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে।

নাটমন্দিরে স্বামীজী যুবক যোগেন্দ্রকুমারকে পরিচিতের মতো নমস্কার করেছিলেন—এই মহা-ভাষ্য শ্বশুরবাড়িতে বয়ে নিয়ে যাবার পরে, ঈষৎ কৌতুকজনক যে-ঘটনা ঘটেছিল, তার বর্ণনা যোগেন্দ্র-কুমার দিয়েছেন—সেই সূত্রে সে-সময়ের সমাজমনের একাংশের সংকীর্ণরূপের কথাও তিনি বলেছেন:

"শ্বশুরবাড়িতে (বালীতে) ফিরিয়া আসিবার পর এক মজার ব্যাপার হইয়াছিল, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমার শ্বশুরমহাশয়ের মাতামহীর ভগিনী তখন জীবিত ছিলেন, তাঁহার বয়স তখন বোধ হয় আশী বৎসরের কাছাকাছি হইলেও তিনি বেশ শক্ত ছিলেন। তিনি বাটীর গৃহিণী ছিলেন। রাত্রিতে আমরা আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময় আমার বড় শ্যালক (তিনিও আমাদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন) বলিলেন, 'বিবেকানন্দ স্বামী যোগিনকে দেখিয়াই উহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন; আমরা মনে করিয়া-ছিলাম, বোধ হয় যোগিনের সঙ্গে তাঁহার পূর্বে পরিচয় ছিল।' এই কথা শুনিয়াই বৃদ্ধা সগর্বে বলিয়া উঠিলেন, 'নমস্কার করবে না? হলেই বা বিবেকানন্দ! কুলীনের ছেলের মান রাখবে না? যোগিনকে নমস্কার করেছে, এ কি বেশি কথা নাকি?' বলাবাহুল্য, তিনিও কুলীনের কন্যা, কুলীনের বধূ। সেকালের লোকের মনে কৌলীন্য-গর্ব কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার এ-কথাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।"

যোগেন্দ্রকুমারের বর্ণনায় কয়েক ছত্রে স্বামীজীর ছবি যেমন সজীব তেমনি উজ্জ্বল। স্বামীজীর অসাধারণ আকার, বিশেষতঃ দুই আয়ত-উজ্জ্বল চোখ, চঞ্চল ছটফটে ভাব, বারবার মাথার পাগাড় খোলা-পরা—এ ছবি খাঁটি। দর্শনের অনেক পরে বর্ণিত হলেও যোগেন্দ্রকুমারের বর্ণনার সত্যতায় সন্দেহ করা যায় না। স্বামীজীর প্রত্যক্ষদর্শীরা পরবর্তী কালে স্মৃতিকথায় কখনো কখনো একথা বলেছেন বলেই যেন মনে পড়ছে—স্বামীজীকে একবার দেখলে বহু বছর পরেও তিনি স্মৃতিতে জীবন্ত থাকেন—যদিও পারিপার্শ্বিক স্থান ও ঘটনাদি ম্লান হয়ে যায়। এমন ঘটার মূলে কেবল স্বামীজীর অপরিমেয় দৈহিক সৌন্দর্য নয়—তা তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের ওজঃশক্তি। বিশেষজ্ঞদের এই ব্যাখ্যা। সুতরাং যোগেন্দ্রকুমার ঐ সময়ের চঞ্চল বালকবৎ

বিবেকানন্দকে ঠিকই দেখেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর অমন হাবভাবের যে-কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন, তা আংশিক সত্য—পুরো নয়। তিনি বলেছেন, স্বামীজী শক্তির আবেগে ছটফট করছিলেন—'ভিতরকার বিপুল শক্তিকে যেন ধরে রাখতে পারছিলেন না। অবশ্যই। কিন্তু শক্তির প্রমাণ তো কেবল চঞ্চল প্রকাশে নয়—তাকে সংহত করে রাখার মধ্যেও। বজ্র আপাতদৃষ্টিতে জড়—নিক্ষেপ করলেই তার আগ্নেয় বিদারণ। হিমালয়ে ধ্যানস্থ শিব ও পর্বত-বিদারণ প্রবাহিত গঙ্গা—দুই-ই বিবেকানন্দ।

তাই আমাদের মনে হয়—দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজীর ছটফটে বালক হয়ে যাওয়ার একটা তৎকালোচিত কারণ ছিল।

এক সপ্তাহ আগে কলকাতার সম্বর্ধনা-সভায় স্বামীজী কলকাতাবাসীদের সম্বোধন করে বলেছিলেন :

"... তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়,এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মতো সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলি।"[৩]

যুবকদের উদ্দেশ্য করে স্বামীজী বিশেষভাবে বলেছিলেন :

"... ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও একসময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও একসময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলিয়া বেড়াইতাম।"[৫]

কলকাতার ঐ বহুজনসমাকীর্ণ সভায় স্বামীজী সর্বসাধারণের সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলার ইচ্ছায় নিজের বাল্যস্মৃতির মধ্যে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। আর দক্ষিণেশ্বরে তিনি চেয়েছিলেন সত্যই বালক হয়ে যেতে।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। নিজের ঘর আর বিশ্বখেলাঘর যেখানে এক—সেইখানে—দক্ষিণেশ্বরে। খেলার রাজা তো এখানেই ছিলেন। মাতা যশোদাও—নহবতে। শ্রীদাম-সুদামের দলও ঘুরছে ফিরছে। কী পরিবর্তন পূর্ব ক্রীড়াস্থলীর! ঠাকুরের কী ! স্ফূর্তিতে হাততালি : "সেদিন—আর—এদিন!!" এদিনের মধ্যেও সেদিনটিকে চাই। সেদিন তাঁর গেরুয়ার খুঁটে তিনটি শব্দ বেঁধে দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল—"নরেন শিক্ষে দিবে।" না, আরও দুটি শব্দ—"হাঁক দিবে।" পৃথিবী ঘুরে, বুকের রক্ত তুলে, অনেক শিক্ষা দেওয়া গেছে—অনেক হাঁক। ধুত্তোর, শিক্ষা দেওয়া আর হাঁক দেওয়া। এতদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে ফিরেও সেই শিক্ষে-মার্কা বক্তৃতা দেবার তাগিদ? কার শিক্ষে দিয়েছি আমি—আমার না তাঁর?

"... যদি কায়মনোবাক্য দ্বারা আমি কোন সৎ-কার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনও অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখনও কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত, সবই আমার। যাহা কিছু জীবন-প্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র—সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী, এবং তিনি স্বয়ং।"[৪]

'বড় অর্থকষ্টের সময়ে ঠাকুরই তো আমাকে মা-কালীর কাছে পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু কোথায় আর টাকা চাইতে পারলাম—চেয়ে বসলাম জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য। তারপরে আবার ওঁরই 'চক্রান্তে' মা-কালীর সঙ্গে নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত হলো—অবাধ্য ছেলের সঙ্গে দুষ্টু মায়ের ঝগড়াঝাটির সম্পর্ক" :

"স্বামীজী : ওঃ! কালীকে ও কালী-ব্যাপারকে কী ঘৃণাই না করতাম! ছ-বছর ধরে সেই লড়াই—কেননা কালীকে কিছুতে মানব না।..."

৩ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫

৫ ঐ, পৃঃ ২০৯

৪ ঐ, পৃঃ ২১৬

"[কিন্তু] মানতে বাধ্য হয়েছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজেও তিনি [মা-কালী] আমাকে চালিত করেন—আমার এই বিশ্বাসের কথা তুমি [নিবেদিতা] জানো।

"তবু কত দিনের লড়াই। লোকটিকে [শ্রীরামকৃষ্ণকে] আমি ভালবাসতুম। বুঝতে পারছ, তাতেই আটকে পড়েছিলুম। আমার দেখা পবিত্রতম ব্যক্তি তিনি—অনুভব করেছিলুম। আর জানতুম, তিনি আমায় এত ভালবাসেন—সে ভালবাসার শক্তি আমার বাপ-মায়েরও নেই।...

"তাঁর বিরাটত্ব সম্বন্ধে বোধ কিন্তু আমার মধ্যে তখন জাগেনি। সেটা এল পরে, আত্মসমর্পণের পরে। তার আগে তাঁকে খ্যাপা শিশুর মতো ভাবতাম —সব সময়ে এ-ই দেখছেন, আর সে-ই দেখছেন, দেবদেবী, কত কি। সেসব জিনিসকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু তার পরে—এমনকি কালীকেও—মেনে নিতে হলো আমাকে।"[৬]

কালীকে তো মেনে নিলেন—কালী তাঁকে গোলাম করে ফেললেন—কিন্তু সেখানেও গোলাম-রাজার কাণ্ড।

"কিন্তু কিভাবে না তিনি [জগন্মাতা] আমাকে যন্ত্রণা দেন কখনও কখনও। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলি, 'যদি তুই এই-এই জিনিস আগামীকাল আমাকে না দিবি, তাহলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্রীচৈতন্যের পুজা করব।'—এবং সেই জিনিসগুলি আমি অতি অবশ্যই পেয়ে যাই।"[৭]

মজার ব্যাপার। রামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্র শিশু, নরেন্দ্রের কাছে রামকৃষ্ণ শিশু। কালীর কাছে নরেন্দ্র শিশু, এমন অবাধ্য জেদী শিশু যে, মাকে ইচ্ছা-পূরণে বাধ্য করে।

স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতিকথায় বলছেন :

"কী অপরূপ দৃশ্য ভেসে আসে চোখের সামনে —আমার সারা জীবনের অপরূপতম দৃশ্যগুলি। পূর্ণ নৈঃশব্দ্য, শৃগালের চীৎকারে শুধু সে নীরবতা কচিৎ বিঘ্নিত; অন্ধকারে দক্ষিণেশ্বরের বিরাট পঞ্চবটীর আসন। রাতের পর রাত, সারা রাত, আমরা সেখানে বসেছি—আমি তখন বালক—তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে গেছেন।"[৮]

জীবনের দেনা ঘুচিয়ে, সে-দেনা বিশ্ব-উত্তমর্ণের দায় হলেও—বিবেকানন্দ ফিরতে চেয়েছিলেন তাঁর 'নরেন্দর' জীবনে। সেই তাঁর অন্তিম আকুতি।

"কত কি হলো গেল, তবু আমি সেই একই বালক,
দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলে বসে যে শুনত
রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী
অবাক হয়ে, বিভোর হয়ে—সেই আমার প্রকৃতি।
অন্য যা-কিছু কাজকর্ম, পরোপকার, লোকসেবা
—সবই আরোপিত,
একদা ছিল—এখন নেই।

আ-হা, আবার সেই মধুর বাণী,
সেই চিরচেনা কণ্ঠস্বর,
কণ্টকিত অন্তর, রোমাঞ্চিত প্রাণ,
নেই বন্ধন মায়াজাল, নেই জীবনের আকর্ষণ,
শুধু আছে প্রভুর মধুর গম্ভীর আহ্বান।
যাই প্রভু যাই।
ঐ তিনি বলছেন, মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক গে,
সংসারের ভালমন্দ দেখুক সংসারীরা,
ওসব ফেলে তুই চলে আয়।
যাই প্রভু যাই।
আমার জন্য ফিরতে হবে সংসারে নেই এমন কেউ,
যাচ্ছি না কোন বন্ধন নিয়েও আমি।
পুরনো বিবেকানন্দ আর নেই।
নেই শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য—নেই।
রয়েছে একটি বালক—প্রভুর চিরপদাশ্রিত দাস।
বিবেকানন্দ আর নেই।"[৯]

"আমার বালক-ভাবটাই আমার আসল প্রকৃতি" —বিবেকানন্দ বলেছিলেন।

৬ নিবেদিতা লোকমাতা—শংকরীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩০৪-৩০৫

৭ ঐ, পৃঃ ৩০৬

৮ ঐ, পৃঃ ৭৮

৯ বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন—শংকরীপ্রসাদ বসু, ১৯৮৫, পৃঃ ১০৯-১১০

এগিয়ে চলো

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যে যত পায় সে তত চায়, এই হলো সংসারের কথা। সংসারী মানুষের চাহিদার শেষ নেই। নিবৃত্তি নেই। কথাটা যদি উল্টে নিই, যে যত চায় সে তত পায়, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল ধর্মের কথা, সাধনজগতের কথা। এই জগতে যে যত চাইবে সে তত পাবে। অফুরন্ত! নিয়ে শেষ করা যাবে না। কিভাবে? সেও খুব মজার। যত ছাড়বে তত পাবে। জাগতিক জিনিস যত ছাড়বে, যত রিক্ত হবে তত পূর্ণ হবে অন্যভাবে। ভোগে নয় ত্যাগেই আছে পূর্ণতা।

এ আবার কি কথা! সব যদি ছেড়েই দিলুম, তাহলে আমার রইলটা কি? রইলে তুমি! আমার মা আছেন আর আমি আছি সংসারে। মাঝখানে আর কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন: "লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য একঘটি কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ির কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়দুড় করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।"

চুষি ফেলে দিতে হবে। চুষি কি? স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, টাকা, যশ-খ্যাতি, প্রতিপত্তি। নিশ্ছিদ্র একটা বাতাবরণ। তার মধ্যে বসে শৌখিন ভগবত-স্মরণ। একটু চোখ বুজে বসে রইলুম, মনে করলুম খুব ধ্যান হলো। এক রাউন্ড কর গুণলুম, হয়ে গেল জপ। তিনবার গম্ভীর গলায় 'ঠাকুর ঠাকুর' করলুম। ঠাকুর অমনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। 'এসে গেছি, আমার নিষ্কাম ভক্ত! তোমার ডাকের কি জোর ছোকরা, যেন ফেরি-ওয়ালা হাঁকছে, স্টিলের বাসন। ঐ মোড়ের মাথা থেকে শোনা যাচ্ছে। বৎস, মুখের ডাকে কিছু হবে না। মনে ডাকো।' সাধন মানে স্লোগান নয়। ধারাপাতের নামতা পড়া নয়। দু এককে দুই, দুই দুগুণে চার। সাধন মানে সার্কাস নয়। মন-মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি—'হে ভগবান! তুমি আমার সর্বস্ব ধন' এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েছি—এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল হয়।

ছুঁচের মতো সূক্ষ্ম সেই মহিমময়ের রাজত্বের প্রবেশপথ। সেখানে প্রবেশ করতে হবে মন দিয়ে। সেই মনটি কেমন হওয়া চাই? ঠাকুর বলছেন: "বাসনার লেশমাত্র থাকতে ভগবানলাভ হয় না। যেমন সুতোতে একটু ফেঁসো বেরিয়ে থাকলে ছুঁচের ভেতর যায় না। মন যখন বাসনারহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।"

বাসনা ত্যাগ করতে হবে। মুখে ত্যাগ করা খুব সহজ। বলে দিলুম ত্যাগ। হয়ে গেল ত্যাগ। ভিতরে কিন্তু সব গজগজ করছে মটরের দানার মতো। ঠাকুরের সেই বিখ্যাত উপমা—"পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজগজ করে, সেইরকম বদ্ধ জীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয়বাসনা তাদের ভেতর গজগজ করছে। বিষয়ই তাদের ভাল লাগে, ধর্মকথা ভাল লাগে না।" এমনও হয়, ধর্মের মধ্যে আছি, মহাপুরুষের সঙ্গে দিনাতিপাত করছি, তিনি আমাকে কৃপা করতে চাইছেন, আমাকে জ্যোতির্ময় লোকের সন্ধান দিতে চাইছেন, তবু আমার হচ্ছে না। আমার আসছে না। আমি মজে আছি অন্য রসে।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ জমায়েতে আসতেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরের কৃপাধন্য গৃহী-শিষ্যদের অন্যতম। আদি নিবাস ছিল ঢাকায়। সেখান থেকে এসে বসবাস শুরু করেন হালিশহরে। তিনি ঢাকার সরকারি অফিসে অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করতেন। ১৮৮০-তে ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। তাঁর এই পথের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সংস্কার ছিল। অনেক কিছু করেছিলেন। প্রথমজীবনে ব্রাহ্মসমাজ, কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে

ঠাকুরের শরণাগত। তিনি যখন ঢাকায় ছিলেন, সেইসময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে তাঁর আলোচনা হতো। ঢাকা থেকে কলকাতায় এলেই ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে ছুটতেন। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেদারনাথের তর্ক বাঁধিয়ে দিয়ে বেশ মজা পেতেন।

সেই কেদারনাথ সম্পর্কে ঠাকুর বলছেন সাঙ্ঘাতিক কথা ঃ "কেদারকে বললুম, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হলো, একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি,—কিন্তু পারলুম না। ভিতরে অঙ্কট-বঙ্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, ঢুকতে পারলাম না। যেমন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ কাশী পর্যন্ত জড়। সংসারে আসক্তি—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে হবে না।"

এই যে 'অঙ্কট-বঙ্কট', এ যাবে কি করে! মানুষ বড় কিছু পাবার জন্যে ছোট জিনিস ত্যাগ করে। নিজেকে প্রস্তুত করে। হীরে পাবার আশা থাকলে কাঁচ ফেলে দেয়। অঙ্কট-বঙ্কট সরাতে পারলে কি লাভ হবে? সমাধি লাভ হবে। ঠাকুর বলছেন ঃ "সমাধি মোটামুটি দুইরকম। জ্ঞানের পথে, বিচার করতে করতে অহং নাশের পর যে-সমাধি, তাকে স্থিতসমাধি বা জড়সমাধি (নির্বি-কল্প সমাধি) বলে। ভক্তিপথের সমাধিকে ভাবসমাধি বলে। এতে সম্ভোগের জন্য, আস্বাদনের জন্য, রেখার মতো একটু অহং থাকে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে এসব ধারণা হয় না।"

কি সুন্দর কথা, রেখার মতো, সোনার সুতোর মতো একটু অহঙ্কার!

কি তাহলে সেই বড় প্রত্যাশা? ভাব। ভাবে আমি সমাহিত হব। তার আগে জানতে হবে মনের সাতটি ভূমি কি কি? ঠাকুরই আমাকে বুঝিয়ে দেবেন। "বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। জ্ঞানপথ—বড় কঠিন পথ। বিষয়বুদ্ধির—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না। এ-পথ কলিযুগের পক্ষে নয়। এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। এই সাতভূমি মনের স্থান।

যখন সংসারে মন থাকে—তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের অবস্থান। মনের বাসস্থান। মনের তখন ঊর্ধ্বদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে।

মনের চতুর্থভূমি—হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে-ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, 'একি! একি!' তখন আর নিচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

মনের পঞ্চমভূমি—কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।

মনের ষষ্ঠভূমি—কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে-ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপদর্শন করে, উন্মত্ত হয়ে সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন **লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম ছুঁলাম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না।**

মনের **সপ্তমভূমি—শিরোদেশ**। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে-অবস্থায় শরীর বেশি দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু।"

তাহলে সেই বৃহৎ প্রত্যাশাটা কি—যার জন্যে আঁষচুবড়ির মতো এই সংসারকে ছাড়ব? এ তো ঠাকুরেরই সেই পথিকের গল্প—'এগিয়ে যাও'। দেহ-পথে মন-পথিকের ভ্রমণ। "এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ এনে কোনরকমে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাত। একদিন জঙ্গল থেকে সরু সরু কাঠ কেটে মাথায় করে আনছে, হঠাৎ একজন লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে ডেকে বললে, 'বাপু, এগিয়ে যাও।' পরদিন কাঠুরে সেই লোকের কথা শুনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে

মোটা মোটা কাঠের জঙ্গল দেখতে পেলে; সেদিন যতদূরে পারলে কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি পয়সা পেলে। পরদিন আবার সে মনে মনে ভাবতে লাগল, তিনি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন; ভাল, আজ আর একটু এগিয়ে দেখি না কেন। সে এগিয়ে গিয়ে চন্দন কাঠের বন দেখতে পেলে। সে সেই চন্দনকাঠ মাথায় করে নিয়ে বাজারে বেচে অনেক বেশি টাকা পেলে। পরদিন আবার মনে করলে, আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন। সে সেদিন আরও খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে তামার খনি দেখতে পেলে। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগল—ক্রমে ক্রমে রূপা, সোনা, হীরার খনি পেয়ে মহা ধনী হয়ে পড়ল। ধর্মপথেরও ঐরূপ। কেবল এগিয়ে যাও। একটু আধটু রূপ, জ্যোতিঃ দেখে বা সিদ্ধাই লাভ করে আহ্লাদে মনে করো না যে, আমার সব হয়ে গেছে।"

শুধু এগিয়ে যাও, যত চাইবে ততই পাবে। 'যতই না পাবে তত পেতে চাবে, ততই বাড়িবে পিপাসা তাহার।' এখন প্রশ্ন হলো, কি করে এগুব! মনের তো পা নেই। ডানা আছে। স্বভাবে মাছি। অথবা বানরের মতো চঞ্চল। বিচারের বেড়া দিয়ে তাকে আটকাতে হবে। ঠাকুরের নির্দেশ ঃ

১। বিষয়ের কথা একেবারে ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বলো না। বিষয়ী লোক দেখলে আস্তে আস্তে সরে যাবে।

২। ভাববে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরই সত্য, আর সব দুদিনের জন্য। সংসারে আছে কি ?

৩। একটু নির্জন দরকার। নির্জন না হলে মন স্থির হবে না। তাই বাড়ি থেকে আধপো অন্তরে ধ্যানের জায়গা করতে হয়।

৪। আর আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেনই শুনবেন।

৫। অভ্যাসযোগ। রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। একদিনে হয় না; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।

৬। সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে। অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে; সব এই দেখা যাচ্ছিল !—কে এমন করলে! মোসলমানেরা দেখো সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নামাজটি পড়বে। **জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন। যেমন জলের** ভিতর ডুবানো বাহাদুরী কাঠ আছে—তীরেতে **শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক এক পাব** ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়। **পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।**

৭। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়।

৮। শুদ্ধাভক্তিই সার, আর সব মিথ্যা। এই ভক্তি কিরূপে হয় ? প্রথমে সাধুসঙ্গ করতে হয়। সাধুসঙ্গ করলে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না।

৯। তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়—বীরভাব, সখীভাব বা দাসীভাব আর সন্তানভাব।

১০। পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।

১১। তাঁকে পেতে গেলে বীর্যধারণ করতে হয়। শুকদেবাদি ঊর্ধ্বরেতা। এঁদের রেতঃপাত কখনও হয় নাই। আর এক আছে ধৈর্যরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্য-ধারণ। বার বছর ধৈর্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নতুন নাড়ী হয়, তার নাম মেধানাড়ী।

১২। তিন টান এক করা—সতীর পতির ওপর টান, মায়ের সন্তানের ওপর টান, বিষয়ীর

বিষয়ের ওপর টান—এই তিন টান **যদি একত্র** হয়, তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।

১৩। তাঁর নাম গুণকীর্তন সর্বদা করতে হয়।

১৪। খুব রোখ চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে যাকে 'আমি আমি' করছ, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর, তুমি শরীর না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে, তুমি কিছু নও।

১৫। ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। কর্তাভজারা মন্ত্র দেবার সময় বলে, এখন 'মন তোর'। অর্থাৎ এখন সব তোর মনের ওপর নির্ভর করছে। তারা বলে, 'যার ঠিক মন তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ।'

১৬। যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নেই। নিচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতকপাখির বাসা নিচে, কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে।

১৭। একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়।

১৮। সকলেরই জ্ঞান হতে পারে, প্রার্থনা কর। **রোজ অভ্যাস করতে হয়।** সার্কাসে দেখে এলাম ঘোড়া দৌড়াচ্ছে তার ওপর বিবি একপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত অভ্যাসে ঐটি হয়েছে। এই দুটি উপায়—অভ্যাস আর অনুরাগ।

১৯। তমোগুণ ছাড়তে হবে—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এইসব। সত্ত্বগুণের সাধনা করতে হয়। যে-ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়তো মশারির ভিতর ধ্যান করে। সবাই জানছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয়নি, তাই উঠতে দেরি হচ্ছে। এদিকে শরীরের ওপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত। শাকান্ন পেলেই হলো। খাবারে ঘটা নেই। পোশাকের আড়ম্বর নেই। বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নেই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনো তোষামোদ করে ধন লয় না।

২০। কেঁদে নির্জনে প্রার্থনা করবে। বলবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয়কর্ম কমিয়ে দাও। কেননা ঠাকুর, দেখছি যে বেশি কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে করছি, নিষ্কামকর্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়। ভক্তিই সার।

২১। জপের সময় অন্যমনস্ক হবে না। ষোল আনা মন দিতে হয়।

২২। ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর **সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ—কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ—কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে। কামিনীকাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু।** টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে। **তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।**

এই ভাবে ধীরে ধীরে সাবধানে, সন্তর্পণে। মানুষ যখন বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় তখন কি করে? যা-যা সঙ্গে যাবে, সব গোছগাছ করে একটা বেডিং তৈরি করে। হোল্ডল, সুটকেস একপাশে রেখে অপেক্ষা করে ট্রেনের। প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেয় না। কামরায় উঠে বাঙ্কের ওপর সব গুছিয়ে রেখে আসনে বসে পড়ে। ঠিক সেইরকম সাধনার মেল-ট্রেনে মন যাত্রী। তার লাগেজে সত্ত্বগুণ। সংসারের স্টেশানে স্টেশানে গাড়ি ভিড়ছে—রোগ, শোক, বিপদ, আপদ, জরা, ব্যাধি। হকারের হইচই। পাওনাদার-ব্যবসাদার। আত্মীয়-স্বজনের ওঠা-নামা। যাত্রী-মন বসে আছে। বৈঠিয়ে আপনা ঠাম—হাঁ জী, হাঁ জী করছে। আর মেখেছে কী? না বিবেক-হলদি। "সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক।" বহু ভেণ্ডার লোভনীয় অখাদ্য, কুখাদ্য নিয়ে উঠছে। মন প্রলোভিত হচ্ছে। কিন্তু মনের হাত ধরে আছেন পিতা। সঙ্গে আছে টিফিন বক্স। বাইরের খাবার চলবে না। 'সঙ্গেতে সম্বল আছে পুণ্যধন।" মন চলেছে নিজ-নিকেতনে। সংসার-বিদেশ ছেড়ে।

> "সংসার দুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
> ক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
> দুর্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
> রামকৃষ্ণ মম দেহিপদাবলম্বম্॥"

প্রবন্ধ

স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ওপর গীতার প্রভাব

শিশির কর

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বাল গঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী থেকে অরবিন্দ, বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম, সুভাষচন্দ্র—সকলেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন গীতা পড়ে। জীবন-মৃত্যুকে 'পায়ের ভৃত্য' করে নিয়ে দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্ব পণ করে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ভারতের মুক্তি-যোদ্ধারা বহুলাংশে এই 'গীতা' থেকেই। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মনোবল তৈরি করতে ও নৈতিক শক্তি জোগাতে গীতার অবদান অপরিসীম। কিশোর ক্ষুদিরাম যখন নির্ভয়ে অবিচল পদক্ষেপে ফাঁসির রশিকে চুম্বন করতে এগিয়ে যান, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ঃ "মৃত্যুকে তোমার ভয় করে না?" মৃত্যুপথযাত্রী এই কিশোর তখন নিষ্কম্প কণ্ঠে বলেছিলেনঃ "না, আমি মরতে ভয় পাই না। আমি গীতা পড়েছি।" পরবর্তী কালেও অগণিত মুক্তিযোদ্ধা এই গীতার বাণী থেকে প্রেরণা পেয়ে নির্ভয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পকেটে সর্বক্ষণ একটা গীতা থাকত। এমনকি রণাঙ্গনেও।[১]

ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে আমাদের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামে অসংখ্য দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা অনুপ্রেরণা পান এই গীতা থেকে। অহিংস সত্যাগ্রহীরা যেমন, তেমনি সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবীরাও এই গীতা থেকেই পেয়েছিলেন রসদ—যা ছিল বোমা রিভলভারের চেয়েও অধিক শক্তিধর।

বিশেষ করে গীতার সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ পড়ে তরুণেরা উদ্বুদ্ধ হতো দেশকে স্বাধীন করার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। বাস্তবিক, ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন ও মুক্তি-সংগ্রামে গীতা অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। গীতার মন্ত্র বিপ্লবীদের নিষ্কাম কর্মে অনুপ্রাণিত করেছে, স্বাধীনতা লাভের জন্য হত্যাকে সাধারণ খুনের থেকে ভিন্ন এবং আদর্শ কৃত্য বলে ভাববার মানসিকতা দিয়েছে। সেযুগে গীতা পাঠ ছিল বিপ্লবীদের পক্ষে আবশ্যিক। কোন কোন বিপ্লবীসংস্থায় সদস্যদের মুণ্ডিত মস্তকে গীতা হাতে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হতো। বহু বিপ্লবী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী তাঁদের জীবনে গীতার এই প্রভাবের কথা লিখেছেন এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

ভারতের বিপ্লব-আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, 'যুগান্তর' দলের নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী বিপ্লব-আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দ এবং গীতার প্রভাবের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেনঃ "বিবেকানন্দ সোসাইটিতে এবং অনুশীলন সমিতিতে (৪১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) গীতার ক্লাস নিতেন স্বামী সারদানন্দ। অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের আদর্শকে কার্যকরী করবার জন্য। অনুশীলন সমিতিতে নানা রকম শিক্ষা দেওয়া হতো। শরীরচর্চার ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসের ক্লাস হতো, সখারাম গণেশ দেউস্কর ইতিহাস পড়াতেন। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি শেখাবার জন্য গীতার ক্লাস নিতেন সারদানন্দ। সারদানন্দের গীতা ক্লাস যথেষ্ট উদ্দীপনাপূর্ণ হতো।"[২]

বিশিষ্ট বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বিপ্লবীদের চরিত্র গঠনের জন্য গীতা পাঠের ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হতো সে-প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

"১৯০৫ সালে আমি অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্রে যোগ দিই। কলকাতার ৪১ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এই সমিতির অফিস ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ছিল। এটি দেশের ভাবী মুক্তিকামীদের প্রস্তুত করার ক্ষেত্র ছিল। সারা বাংলায় এটির বহু শাখা গড়ে উঠেছিল।...

১ 'যুগনায়ক ও দেশনায়কঃ বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র'—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ৮১৫; Roll of Honour—Kalicharan Ghosh, p. 587; Unto Him a Witness—S. A. Ayer, 1951, p. 269

২ বিশ্ববিবেক, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ২৪৭

"প্রতি রবিবারে আমাদের moral class হতো। এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এখানে নীতিকথা, ইতিহাস, ধর্ম, চরিত্রগঠন, রাজনীতি, সেবাব্রত এবং দেশহিতৈষণার বিশেষ অনুষ্ঠান হতো। স্বামী সারদানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী—আমাদের গীতা ক্লাস নিতেন।"[৩]

আমাদের দেশে গীতাই বিপ্লববাদের বীজ বপন করেছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"...বারীন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীরা বাংলাদেশের সমিতিগুলির মাধ্যমে বালক ও যুবকদের সহিত ভাবচর্চা, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেন। তাহাদের গীতা পড়াইয়া বুঝাইতেন—আত্মা অমর, হত্যা পাপ নহে ইত্যাদি। এইভাবে বিপ্লববাদের বীজ বপন হইল। ১৯০২ সালে অরবিন্দ যখন বাংলাদেশে আসেন, তখন তিনি মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগোকে এক হাতে গীতা ও আর এক হাতে তরবারি দিয়া গুপ্ত সমিতির কার্যে দীক্ষা দেন।"[৪]

তিনি আরও লিখেছেন যে, 'যুগান্তর' গীতার আদর্শে যুবকদের মৃত্যুভয়হীন করে তোলে ঃ "১৯০৬ সালের মার্চে অর্থাৎ বঙ্গচ্ছেদ হইবার পাঁচমাস পরে 'যুগান্তর' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা যুবকদিগকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রয় করিতে দেখা গেল। যাহারা পড়িল তাহারা চমকিয়া উঠিল—ইহার ভাব ও ভাষা 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শারীরিক শক্তির দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসিতে হইবে,—হত্যা পাপ নহে—গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন; আত্মা অমর—এই শিক্ষা দিয়া 'যুগান্তর' যুবকগণকে মৃত্যুভয়হীন করিয়া তুলিবার প্রয়াসী। রাজনৈতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিক করিবার চেষ্টা হইল; পরের যুগে গান্ধীজীও অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন।"[৫]

অনুশীলন সমিতিতে গীতা হাতে বিপ্লবীদের শপথ নেবার কথা লিখেছেন বিপ্লবী ও বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস-লেখক নলিনীকিশোর গুহ ঃ

"এখানে অনুশীলনের গোড়াকার প্রতিষ্ঠা গ্রহণের নমুনা দিতেছি; এখানে পুলিনবাবু স্বীয় দীক্ষা ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণের বর্ণনা করিতেছেন—

'পি. মিত্রের আদেশ-মতে একদিন (কলিকাতায়) একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি. মিত্রের বাড়িতে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইলাম। ধূপ দীপ নৈবেদ্য পুষ্প চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্যোপনিষদ্ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি. মিত্র যজ্ঞ করিলেন, পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম। আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল, তদুপরি অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি. মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান হইলেন—উভয়হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নিকে ও পি. মিত্রকে নমস্কার করিলাম।'"[৬]

কলকাতার মতো ঢাকাতেও এইভাবেই গীতা নিয়ে শপথ নিতে হতো বিপ্লবীদের। বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ তাও লিখেছেন।

গীতা পড়ে কিভাবে বিপ্লবীরা নিষ্কাম কর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতেন, তা লিখেছেন বিপ্লবী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। তাঁর স্মৃতিকথা আছে তাঁর 'অবিস্মরণীয়' নামক গ্রন্থে ঃ

"আজ মনে পড়ে বৈপ্লবিক কর্মধারার কাল-বিধৃত চেতনার প্রতিফলনে রঙিন কৈশোরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মৌল পরীক্ষা ও নিরীক্ষার দিনগুলি। মৃত্যুর জন্যে সবসময় তৈরি থাকার সে কী দুঃসাধ্য সাধনা। কর্মে আনন্দই তখন অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্যের পরিচয়। মনে হতো এ উৎসাহ, এ উদ্যম, এ স্পর্ধা, কাল-তিরোহিত চিন্ময়ী শক্তির এষণা—প্রাণের কেন্দ্র থেকে প্রকাশমান। হৃদয়াবেগের প্রমত্ততায় স্বপ্নের মতো সে দিনগুলো আজও মনে পড়ে। সেদিন বিপ্লবের আদর্শ মাথায় ঢুকিয়েছিল দেশজননী জগংজননীর বরাভয় মৃন্ময় মূর্তি। গীতায় জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্বের মধ্য থেকে পেয়েছিলুম সংসার-কুরুক্ষেত্র-পঙ্কে

৩ বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৫২-২৫৩

৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪১

৫ ঐ, পৃঃ ২৪২

৬ বাংলার বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, পৃঃ ২২

পীড়তের একমাত্র শাশ্বত ও বিশ্বজনীন ধর্মযুদ্ধ; মুক্তি—উপাস্য, কর্তব্য—নিরাসক্ত নিষ্কাম কর্ম, বিশুদ্ধ প্রেম—জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন অবান্তর। চণ্ডী ও গীতার পথই একমাত্র পথ—জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ মায়া-মরীচিকামাত্র। সেই সঙ্গতি ও অসঙ্গতির মধ্যে মনের গভীরতম উপলব্ধির পথের সন্ধানে শক্তির নিরলস উদ্যমে, আত্মদানযজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে, সর্বস্ব সমর্পণের পরমৈশ্বর্যে যাঁরা পথ দেখিয়ে আমাকে কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে আশ্চর্য নৈপুণ্যে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন—দেখিয়েছিলেন মৃত্যুর সামনে অফুরান হাস্যধারা, তাঁরা বিপ্লবধর্মে দীক্ষিত, প্রাণশক্তিকে আচ্ছন্ন আবৃত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।"[৭]

গীতা বিপ্লবীদের কিরকম প্রভাবিত করেছিল তার পরিচয় পাই এই বর্ণনায়ঃ "বেনারসের মদনপুরায় শ্রীসুশীলচন্দ্র লাহিড়ী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে জড়াবার জন্য বহু খোঁজ করেও পুলিশের কর্তারা সফল হননি। ১৯১৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি লখনৌ-এ ধরা পড়লেন।...১৯১৮ সালে ১৭ জুলাই তাঁর... বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত হলো। বিচারে ১১ আগস্ট তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। তিনি গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে উঠলেন ফাঁসির মঞ্চে। মুখে শুধু হাসি।"[৮]

এ ধরনের নজির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে কত যে আছে, তার হিসাব নেই। কিছু কিছু মাত্র উল্লেখ করলাম। গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিপ্লবীরা দলে দলে এগিয়ে গেছেন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। তাঁর এই সাহস আমাদের কাপুরুষতার অবসান ঘটিয়েছে। তাঁদের মন্ত্র ছিলঃ "মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়।"

বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেনঃ "বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনায় তাহারা জাতীয়তার সন্ধান বিশেষ করিয়া পাইত। যে বিপ্লববাদী লেখাপড়া তেমন জানে না—সেও দেশের অনেকখানি ইতিহাস, দেশের অনেকখানি সাধনার কথা ও বিদেশের অনেক বিপ্লবের খবর রাখিত। পৃথিবীর বিপ্লববাদীদের চিন্তাধারার সহিত তাহারা ঐ ধরনের সাহিত্য ও নানা আলোচনার ভিতর দিয়া যুক্ত হইয়াছিল। সাধারণ বিপ্লববাদীর পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে সাধারণতঃ দেশ-বিদেশের ইতিহাস, বিপ্লববাদীদের জীবনী, বিপ্লব-সাহিত্য, ফরাসী-বিপ্লব ও সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, জাতীয় ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ, যেকোন যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণী-সংক্রান্ত পুস্তক, কর্মী ও ত্যাগীদের জীবনী, প্রচুর ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি স্থান পাইত। এক পাশে গীতা, উপনিষদ্, অপর পার্শ্বে রুশ বিপ্লবের ইতিহাস।"[৯]

বিপ্লবীদের অবশ্য পাঠ্য বইয়ের তালিকায় গীতা যে ছিল তা বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও পাই।[১০]

বিপ্লবীদের ওপর গীতার প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল সে-সম্পর্কে সরকারি আমলা ও গোয়েন্দারা কি বলেছেন তা আলোচনা করলেও আমরা বুঝতে পারি। ব্রিটিশ সরকার গীতাকে বাজেয়াপ্ত না করলেও পুলিশের 'বিপজ্জনক গ্রন্থের' তালিকায় গীতা ছিল। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বিচারপতি রাওলাটের নেতৃত্বে গঠিত রাওলাট কমিটি বা সিডিশন কমিটির রিপোর্টে সে-তথ্য পাওয়া যাবেঃ

"রাজদ্রোহের চক্রান্তে লিপ্ত ব্যক্তিরা (অর্থাৎ বিপ্লবীরা) নিজেদের দলের সদস্যদের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যগ্রন্থ নির্ধারণ করেছিল। ভগবদ্-গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের রচনা, ম্যাৎসিনী এবং গ্যারিবল্ডীর জীবনী ছিল ঐ নির্বাচিত পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।"[১১] সিডিশন কমিটির অন্যতম সদস্য বিচারপতি মুখার্জী তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেছেনঃ "ঈশ্বরেচ্ছার নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ প্রভৃতি ধর্মীয় নীতিকে চক্রান্তকারীরা অনৈতিক-ভাবে দুর্বলচিত্ত লোকেদের প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করার শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করত এবং পরিশেষে তাদের এমন সব জঘন্য অপরাধে প্রবৃত্ত হবার যন্ত্র হিসাবে প্ররোচিত করত, যে-অপরাধে লিপ্ত হতে গেলে অন্য সময় তারা ভয়ে কুঁকড়ে যেত।"[১২] বিচারপতি মুখার্জী তাঁর ঐ মন্তব্যে

৭ অবিস্মরণীয়—গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯ ৮ ঐ. পৃঃ ১২৬-১২৭ ৯ বাংলার বিপ্লববাদ, পৃঃ ৭৪
১০ স্বাধীনতার সন্ধানে—যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিশোর ট্রাস্ট, কলকাতা, পৃঃ ১৮
১১ Sedition Committee's Report, p. 23 ১২ Ibid ; Calcutta Weekly Notes, Vol. 29, p. 698

গীতা, বিবেকানন্দের রচনা এবং ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনীকে দুরভিসন্ধিমূলক এবং প্ররোচক প্রধান তিনটি গ্রন্থ বলে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রখ্যাত ইতিহাসকার ও বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষও তাঁর নিজের ও অন্যান্য বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানিয়েছেন: "পুলিশের তালিকায় ভগবদ্‌গীতা ছিল একটি প্রচণ্ড রাজদ্রোহমূলক গ্রন্থ ("highly seditious literature") এবং বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র এবং রাজদ্রোহমূলক গ্রন্থাদির খানাতল্লাসী করতে গিয়ে [অভিযুক্তদের ঘরবাড়ি ও আস্তানায়] হিন্দুদের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি পাওয়া গেলে তা পুলিশ নিয়ে আসত।"[১৩] অর্থাৎ যদি কোন যুবকের ঘরে বা কাছে গীতা পাওয়া যেত তাহলে পুলিশ ধরেই নিত যে, সে বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অরবিন্দ এবং তিলকের মতো বিপ্লবনায়কদের কাছে গীতা কোন্ স্থান নিয়েছিল সেবিষয়ে আলোচনা করেছেন কালীচরণ ঘোষ তাঁর গ্রন্থে।[১৪]

পদস্থ ব্রিটিশ প্রশাসক জেমস ক্যাম্বেল কারও গীতার এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি কেবল মুক্তি-সংগ্রামীদের ওপর গীতার প্রভাবের কথাই বলেননি, বিপ্লবীদের সংস্থায় গীতা কত জনপ্রিয় ছিল সে-তথ্যও দিয়েছেন। 'Political Troubles in India'-তে তিনি লিখেছেন:

"এই পরিচ্ছেদে যেসব বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলিই বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন তল্লাসিতে এই প্রতিটি বইয়ের অনেকগুলি কপি পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ঢাকার অনুশীলন সমিতির কয়েকশো বই আছে এবং ওখানে পাওয়া বই ইস্যুর এক তালিকা থেকে এইসব বইয়ের জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট আভাস মেলে। প্রথম প্রিয় বইটি হচ্ছে 'জালিয়াৎ ক্লাইভ', যা ঐ সময়ের মধ্যে ১৩বার নেওয়া হয়েছিল। বইটির চরিত্র জানবার পক্ষে এর নামই যথেষ্ট। যার উদ্দেশ্য, এটাই দেখানো যে, ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়েছে জালিয়াতির মাধ্যমে। যেসব তরুণ অনুশীলন সমিতির লাইব্রেরী থেকে এই বইটি নেন, তাদের একজন বই-ইস্যুর রেজিস্টারে সই করেছেন 'প্রফুল্লচন্দ্র চাকি' বলে। ইনি মজঃফরপুরের খুনীদের একজন। দেখা যাচ্ছে, তিনি কি ভাবছেন, যখন তিনি ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিনগুলি সম্পর্কে পড়াশোনা করছেন। এই ধরনের আর একটি বই 'মহারাজ নন্দকুমার'ও বহুবার লাইব্রেরী থেকে ইস্যু হয়েছে। এই বইটিও একই কারণে জনপ্রিয় হয়েছিল। পাঠকদের কাছে এর পরই জনপ্রিয় ছিল রাণা প্রতাপের জীবনী। বইটি ১৯০৬ সালে ছাপা হয়। বইটি বাংলার ছাত্রসমাজকে উৎসর্গ করা হয় এই আশায় যে, নিজের মাতৃভূমির জন্য প্রতাপ যেমন বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, তারাও সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন। পাঠকদের কাছে সমান প্রিয় ছিল 'শিখের বলিদান' ও 'ভগবদ্‌গীতা'। প্রতিটি বই ঐ সময় ৮বার করে ইস্যু হয়েছিল। প্রায় একই রকম জনপ্রিয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যা ৬বার ইস্যু হয়েছিল ঐ সময়ে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য এবং তরুণ বিপ্লবীদের কাছে সবচেয়ে বেশি আবেদন সৃষ্টি করেছিল 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি। সহজেই দেখা যায়, এই সব পুস্তক পাঠে কিভাবে একজন যুবককে সহজে সরাসরি ধর্ম ও দর্শনের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ থেকে রিভলভার ও বোমা ব্যবহারে নিয়ে যেত।"[১৫]

জেমস ক্যাম্বেল কার লিখেছেন: ঢাকা অনুশীলন সমিতির পাঠাগারে শুধু গীতারই ছিল ১৭টি কপি। মাণিকতলার বিপ্লবীদের আস্তানা থেকেও ৩ কপি গীতা পাওয়া যায়। কার বলেছেন: "বিপ্লবীদের বইপত্রে যে দুটি ধর্মগ্রন্থ প্রাধান্য পেত, তা হলো ভগবদ্‌গীতা ও চণ্ডী। ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে ১৭খানা গীতা, মাণিকতলার বাগানে ৪টি চণ্ডী ও ৩টি গীতা গ্রন্থ পাওয়া যায়।"[১৬]

সুতরাং গীতা হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হয়েও পুলিশের চোখে কেন বোমা-রিভলভারের মতোই বিপজ্জনক বস্তু হয়ে উঠেছিল তা বোঝা গেল। তবে এই পবিত্র গ্রন্থটিকে তারা সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত করতে পারেনি। বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ লিখেছেন: "বইপত্র নিষিদ্ধ হতো প্রায়ই।...

১৩ Roll of Honour, p. 70

১৪ Ibid, p. 128

১৫ দ্রঃ Political Troubles in India (1907-1917)—James Cambell Ker, p. 447

১৬ Ibid,

'লঘু অভিনব ভারতকথা' (সাভারকরের মারাঠী কবিতা), 'মুক্তি কোন পথে', 'বর্তমান রণনীতি', 'ভবানী মন্দির', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী', 'দেশের কথা' প্রভৃতি গ্রন্থের ওপর বিশেষ নজর রাখা হতো। 'শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ', 'অনল প্রবাহ', 'নব উদ্দীপন', 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ' প্রভৃতি গ্রন্থও এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। পুলিশের তালিকায় ভগবদ্গীতা অত্যন্ত বিদ্রোহাত্মক গ্রন্থ। এবং এমন ঘটনা কম নয় যে, বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র ও বিদ্রোহাত্মক গ্রন্থের খোঁজে তল্লাসির সময় পুলিশ হিন্দুদের এই পবিত্র গ্রন্থটি আটক করেছে।"[১৭]

গীতার দর্শন প্রয়োজন ছিল বিপ্লবীদের। বিপ্লবীদের অনেক সময় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে হতো। অথচ তাঁরা ছিলেন মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন পুরুষ, এক্ষেত্রে এমন একটা দর্শন দরকার ছিল যা তাঁদের মনকে গ্লানিমুক্ত রাখতে পারে। তাঁরা তা পেয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কথিত গীতার নিষ্কাম কর্মাদর্শে। ঈশ্বরে সর্বকর্মফল অর্পণ করে যেমন কর্মযোগী কাজ করে যান, সেই ভাবে বিপ্লবীরাও ঈশ্বরে ও দেশমাতৃকায় কর্মফল অর্পণ করে কর্মসাধনে অগ্রসর হবেন।

গীতার শত্রুবধের দর্শনকে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে এভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন: "তোমরা কেউ কেউ ভগবদ্গীতা পড়েছ। পাশ্চাত্যদেশে তোমরা অনেকেই বোধহয় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে বিস্মিত হয়েছ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভণ্ড ও কাপুরুষ বলেছেন, কেননা অর্জুন তাঁর বিপক্ষে বন্ধু ও আত্মীয়রা দণ্ডায়মান বলে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর অজুহাত —অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ প্রেমাদর্শ। এখানে একটি মস্ত শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে—দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্ত প্রায় একই রকম দেখতে—চূড়ান্ত অস্তি ও চূড়ান্ত নাস্তি আকারে সদৃশ। আলোকস্পন্দন অতি মৃদু হলে তা আমরা দেখতে পাই না, অতি দ্রুত হলেও নয়। শব্দের ক্ষেত্রেও তাই সত্য—অতি নিম্নগ্রাম বা অতি উচ্চগ্রাম—কোন ক্ষেত্রেই শব্দ শোনা যায় না। প্রতিকার বা অপ্রতিকারের ক্ষেত্রে একই জিনিস দেখা যায়। দেখা গেল কোন একজন প্রতিরোধ করছে না, যেহেতু সে অলস, দুর্বল; বস্তুতঃ সে প্রতিকারে অসমর্থ। আর একজন জানে যে, সে ইচ্ছা করলেই দুর্নিবার আঘাত হানতে পারে, কিন্তু সে শত্রুকে আঘাত নয়—আশীর্বাদ করছে। যে-লোকটি দুর্বলতার কারণে অশুভের প্রতিরোধ করল না, সে পাপ করল, সে তার 'অপ্রতিকার' থেকে কোন সুফলই পেল না। অন্যদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি প্রতিরোধ করতে চায়, সে পাপ করবে। বুদ্ধদেব সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করেছিলেন, যথার্থ তাঁর ত্যাগ; কিন্তু নিঃস্ব ভিখারীর ত্যাগের কোন কথাই ওঠে না। সুতরাং অপ্রতিকার বা প্রেমের আদর্শ ইত্যাদির কথা বলবার সময় আমাদের সর্বদাই সাবধান হতে হবে। আমাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে—অপ্রতিরোধের শক্তি আমাদের আছে কিনা। সেই শক্তি যদি থাকে, তখন ত্যাগ করলে বা অপ্রতিরোধ করলে আমরা বিরাট প্রেমের আদর্শ দেখাব। কিন্তু যদি অপ্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকে, অথচ আত্মপ্রতারণা করে ভাবি যে, আমরা সর্বোচ্চ প্রেমাদর্শের দ্বারা চালিত, সেক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো আচরণই করছি। অর্জুন বিপক্ষে প্রচণ্ড শক্তিশালী সৈন্যসমাবেশ দেখে ভীরু হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর তথাকথিত 'প্রেম' তাঁকে দেশ ও রাজার সম্বন্ধে কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছিল। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভণ্ড বললেন: 'তুমি জ্ঞানীর মতো কথা বলছ, অথচ কাজ করছ কাপুরুষের মতো। ওঠ, দাঁড়াও, যুদ্ধ কর'।"[১৮]

গীতার এই আদর্শে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীরা পেয়েছিলেন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে, দেশদ্রোহীদের রক্তের বন্যায় নিজেদের হাত রঞ্জিত করার সময়, পুলিশের গুলি ও ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুবরণ করার সময় তাই তাঁদের বুক কাঁপেনি, দেহে-মনে দুর্বলতার লেশমাত্রও স্থান পায়নি। এবং সেই মহান আদর্শে বিশ্বাসের ফলশ্রুতি, সেই আদর্শে নিবেদিত অগণিত মুক্তি-সংগ্রামীর আত্মদানের ফলশ্রুতি, হলো ভারতের পরাধীনতার অবসান—স্বাধীন ভারতের আবির্ভাব।

১৭ Roll of Honour, p. 70

১৮ দ্রঃ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II, 1972, pp. 38-39

অনুবাদ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু (দ্রঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৮, পৃঃ ২৪)

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীহরিঃ শরণম্

ওপুরী
শশিনিকেতন
২৮।৭।(১৯)১৭

প্রিয় নির্মল[১],

*মহারাজের[২] শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ নহে। শীঘ্র ভুবনেশ্বরে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, শুনিয়া সুখী হইবে। ভুবনেশ্বরে একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য প্রায় পাঁচ একর জমি খরিদ করা হইয়াছে। অমূল্যে[৩] খুরদা যাইয়া তাহা রেজিস্টারি করিয়া আসিয়াছে. সত্বরই সেই জমির উপর আশ্রম-কুটির নির্মাণের উদ্যোগ হইবে। অনেকদিন হইতে মহারাজের ইচ্ছা ছিল ভুবনেশ্বরে একটি আশ্রম হয়। প্রভুর কৃপায় এতদিনে তাহা কার্যে পরিণত হইতে চলিল—ইহাতে তিনি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছেন। সেদিন তোমার কথা হইতেছিল। অল্পদিনে কাহাকেও আমেরিকা যাইতে হইবে। হরিপদ[৪] নিউইয়র্ক হইতে চলিয়া আসিবে। তাহার স্থানে একজনকে পাঠাইতে হইবে। মহারাজ তোমাকেই ঐ কার্যে উপযুক্ত মনে করিতেছিলেন। যেমত হয় পরে জানিতে পারিবে। প্রভুর ইচ্ছা যাহা হয় হইবে। তিনি মঙ্গলময় মঙ্গলই করিবেন। এখানকার সকলে ভাল আছে। ওখানকার সকলকে আমাদের ভালবাসাদি জানাইবে। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

১ স্বামী মাধবানন্দ ২ স্বামী ব্রহ্মানন্দের ৩ স্বামী শঙ্করানন্দ ৪ স্বামী বোধানন্দ

* চিঠিটির পূর্ববর্তী অংশ 'স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র' গ্রন্থে (৫ম সং, পৃঃ ১৯৭, নং ১৬৮) ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। —যুগ্ম সম্পাদক

(২)

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়

57 Ramkanto Bose St.
(Baghbazar, Calcutta)
19.8.(19)18

প্রিয় নির্মল,

কাল তোমার ১৫ই তারিখের পত্রখানি পাইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। কাল শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের[১] উদ্দেশে মঠে মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। আমিও মঠে গিয়াছিলাম। উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার একখানি enlarged photo লতা পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া, যেখানে বসিয়া চা খাওয়া হয় সেইস্থানে স্থাপিত করিয়া পূজা ভোগরাগ দেওয়া হইয়াছিল। সম্মুখে অতি সুন্দর কীর্তনের পর গান হয় এবং সমস্ত মঠ বেড়িয়া হরিসংকীর্তন নাম গান প্রভৃতি হইয়াছিল। Visitors' room-এও একদল অতি সুমধুর কীর্তনের দ্বারা সকলকেই মোহিত করিয়াছিল। অনেক পুরাতন ভক্ত আশাতীত-ভাবে সেদিন তথায় সমবেত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের কথাবার্তা, চরিত্র আলোচনায় তাঁহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিল। আন্দাজ ১২।১৪ শত লোক মহা পরিতোষের সহিত খিচুড়ি, মালপো, রাধাবল্লভী, জিলিপি, সন্দেশ, দৈ, পায়েস, ডালনা, চচ্চড়ি, ভাজা, অম্বল, লুচি, হালুয়া ও ফলমূল ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া মহানন্দে ঠাকুরের ও তাঁহার জয়ধ্বনিতে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়াছিল।

১ স্বামী প্রেমানন্দের

ভোজনকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় বিষম ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় সকল কর্মই অতি সুশৃংখলে ও বিনা বাধায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। বাস্তবিকই তিনি যেমন উচ্চদরের ছিলেন সেইরূপ উচ্চভাবেই অতি আনন্দের সহিত তাঁহার উৎসবকার্য নির্বিঘ্নে ও মহানন্দে সম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা আবার সেইদিনই বৈকালে ফিরিয়া আসিয়াছি। তাঁহার অবর্তমানে মঠে তাঁহার অভাব খুবই অনুভব করিয়াছিলাম। তবে প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহা পূর্ণ হইয়াছে ইহাতে আমাদের আর বলিবার কি আছে। তাঁহার বিধান অবনত মস্তকে স্বীকার করা ভিন্ন অন্য উপায় কিছুই নাই। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমার শরীর এখন আবার ভাল হইয়াছে অর্থাৎ যে জ্বর হইয়াছিল তাহা সারিয়াছে, তবে দুর্বলতা ও আহারে অরুচি এখনও আছে। তবে পূর্বেকার হাত-পায়ে বেদনা ইত্যাদি যেরূপ ছিল সেইরূপই আছে। কবিরাজী চিকিৎসা হইতেছে। এইবার নুনজল বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করিবেন প্রস্তাব করিয়াছেন। মহারাজ, শরৎ মহারাজ[২] প্রভৃতির অনুরোধ [যে,] আমি ইহাতে রাজি হই। যেমন হয় সংবাদ পাইবে। গরম এখানে খুব, বৃষ্টি নাই বলিলেই হয়। সুতরাং চাষের [জন্য] এখানেও হাহাকার। কি যে হইবে প্রভুই জানেন। মতিলালের এক পোস্ট কার্ড পাইয়াছি, তাহাকে আর স্বতন্ত্র পত্র দিলাম না। তুমি তাহাকে আমার পত্র শুনাইও এবং আমার ভালবাসাদি দিও। তোমাদের আশ্রমে মধ্য ইংরাজী ইস্কুল খোলা হইয়াছে শুনিয়া খুশি হইয়াছি। প্রথমে সামান্যভাবে কার্য করাই উত্তম কল্প, প্রভুর কৃপায় ক্রমে ধীরে ধীরে উন্নতি হইবে এবং পরে সাধারণকে সাহায্যের জন্য জানাইলেই হইল। তোমাদের কার্য উত্তমরূপে চলিতেছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। সকলে একমত হইয়া কার্য করিলে কখনও কোন অসুবিধা হইবে না ইহা নিশ্চয়। বেশ পড়াশুনা হইতেছে জানিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। জপধ্যানও সঙ্গে সঙ্গে চলা চাই। Gurudas[৩]-এর পত্র পাইয়াছি, তাহাকে উত্তরও দিয়াছি। তাহাকে আমার শুভেচ্ছা ভালবাসা জানাইবে। শ্রীশ্রীমা ভাল আছেন এবং আর সকলেই ভাল কেবল গোলাপ মা আমাশা রোগে ভুগিতেছেন। কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে। সম্প্রতি একটু ভাল আছেন। অন্যান্য সমস্ত কুশল। তোমাদের কুশল সর্বদাই প্রার্থনীয়। সকলকেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাইবে এবং তুমি জানিবে।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

২ স্বামী সারদানন্দ ৩ স্বামী অতুলানন্দ

(৩)

শ্রীহরিঃ
শরণম্

৺কাশী
২৬।৮।(১৯)২০

প্রিয় নির্মল,

তোমার ২১শে তারিখের পোস্ট কার্ড ও সেইসঙ্গে রেলের রসিদ সহ একখানি খাম গত পরশ্ব পাইয়াছিলাম। গতকল্য আপেলের পার্শেল আনানো হইয়াছে। ৫।৭টি মাত্র খারাপ হইয়াছিল নতুবা আর সব বেশ ভাল অবস্থায় পেঁছিয়াছে। এবার চুঙ্গি বেশি লাগে নাই—পাঁচ আনা লাগিয়াছে। ফলগুলি এবার বড় বড়। দেখিয়া সকলে আনন্দ করিতেছিল। গতবারে সকলেই পাইয়াছিল। এবারও সকলকেই দিব। আমার শরীর মুলে ভাল যাইতেছে না। সম্প্রতি সর্দি-জ্বরের মতো হইয়া কষ্ট দিতেছে। পায়ের বেদনা সমুহই আছে। দুর্বলতা খুব। সময়টা ভাল নয়। অনেকেরই জ্বরজ্বাড়ি হইতেছে। তুলসী মহারাজ[১] তিন-চারদিন হইল এখানে আসিয়াছেন। অনেককাল পরে তাঁহাকে দেখিয়া খুশি হইয়াছি। দু-একদিনের মধ্যেই চলিয়া যাইবেন বলিতেছেন। প্রত্যহ বৈকালে আমাদের এখানে যোগ-বাশিষ্ঠ পাঠ হইয়া থাকে। নির্বাণ-প্রকরণ চলিতেছে। ললিত[২] পাঠ করে। বেশ আনন্দ হইতেছে। তোমরা

১ স্বামী নির্মলানন্দ ২ স্বামী কমলেশ্বরানন্দ

সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। সীতাপতিরা[৩] বোধহয় এইবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। সতীশ[৪] এখানে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। সত্যেনের[৫] কাজ বেশ চলিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। মঠে স্থায়ী শাস্ত্রচর্চার বন্দোবস্ত সুদূরপরাহত—একরূপ অসম্ভবই জানিবে। তেমন লোক কোথায়? মন্দির নির্মাণ সহজ… এখানকার সেবাশ্রমে চারুবাবুর[৬] আমলে যে সেবার ভাব ছিল তাহা এখন ক্রমে লোপ পাইতে চলিল। নূতন বন্দোবস্তে নূতন ভাব সব প্রবর্তিত দেখিতেছি। সকলেই মজা চায়, যথার্থ নিঃস্বার্থভাব খুব বিরল। অন্যান্য সংবাদ কুশল। আমার শুভেচ্ছা ভালবাসাদি জানিবে।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

৩ স্বামী রাঘবানন্দ ৪ স্বামী সত্যানন্দ ৫ স্বামী আত্মবোধানন্দ ৬ স্বামী শুভানন্দ

(৪)

শ্রীহরিঃ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম
লক্সা, বেনারস সিটি
৩রা ডিসেম্বর / (১৯)১৩

প্রিয় প্রজ্ঞানন্দ,

তোমার ১লা তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। মহারাজকে[১] আজ উহা পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন যে, খ্রীস্টান মিশনারীরা বেতন লইয়া কার্য করে, কিন্তু আমাদের সাধুরা কেবল ভিক্ষান্নেই সন্তুষ্ট থাকিয়া যথাসাধ্য ভগবদ্ভজন ও তাহার প্রচার করেন। সুতরাং পূর্বোক্তের সহিত আমাদের সাধুর তুলনা অসমীচীন—ইহা তোমার সাহেবকে জানানো উচিত ছিল। যাহা হউক, তিনি তোমার পত্র শুনিয়া খুশি হইয়াছেন। এখানে শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধাম হইয়া গিয়াছে। সকলেই এক বাক্যে বলিতে লাগিল যে, আশ্রম হইয়া অবধি এত আনন্দ আর কখনও হয় নাই, যদিও উৎসব এখানে অনেকবার হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই সেদিনকার সকল কার্যই অতি পরিপাটিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। X-masও সুচারুরূপে নির্বাহ হয়। আর নিউ ইয়ার্স-ডের দিনও মায়ের বাটীতে চর্ব্যচষ্যের আয়োজন হইয়াছিল, অনেক লোকসমাগম হয়। আশ্রমেও সেদিন সকালে মোগলাই চা ও লাড্ডু কচুরির ছড়াছড়ি হইয়াছিল। মার আজ বিন্ধ্যবাসিনীর দর্শনে যাইবার কথা ছিল। সকল আয়োজনও হইয়াছিল। কিন্তু সম্মুখে অমাবস্যা বলিয়া স্থগিত হইল। ভবিষ্যতে সুবিধামতো আবার চেষ্টা হইবে। মাঘ মাসের প্রথমেই কোন শুভ-দিনে মার কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব হইয়াছে। তাঁহার শরীর ভাল আছে। তাঁহার বাটীর অন্যান্য সকলেও ভাল আছেন। আশ্রমের সংবাদও কুশল। Land acquisition-এর আর কোন কথা এখনও হয় নাই। বোধ হয় কোন গোল হইবে না। নির্বিঘ্নেই কার্য সমাধা হইবে। অমূল্য[২] চিঠি পড়িয়া বলিল যে, যদি তুমি সুবিধামতো রিপোর্ট—যাহা অসম্পূর্ণ আছে—সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। চেষ্টা করিয়া দেখিবে কি? তোমার শরীর ভাল আছে ও সিমলার আবহাওয়া অত সুন্দর জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আমার তথায় যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে ঘটিবে কিনা সন্দেহ। শরীর আমার সেইরূপই আছে। বোধ হয় কলিকাতা যাইতে হইবে। যেমন হয় পরে জানাইব। তারাপদবাবু, অক্ষয়বাবু প্রভৃতি সকলকেই আমাদের ভালবাসাদি জানাইবে। তোমার ভায়াকেও[৩] আমার শুভেচ্ছাদি দিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ২ স্বামী শংকরানন্দ ৩ স্বামী চিন্ময়ানন্দকে (?)

পরিক্রমা

জয় সোমনাথ

স্বামী অচ্যুতানন্দ

এসে উঠেছিলাম সোমনাথ মন্দিরকমিটির গেস্ট হাউসে। গেস্ট হাউস মন্দির থেকে সামান্য দূরে, ব্যবস্থাদি খুব ভাল। ডাবল্ বেড ঘর, সংলগ্ন স্নানাগার ইত্যাদি। সামনে পিছনে দুদিকে খোলা বারান্দা। সেখান থেকেই সমুদ্র দেখা যায়। আমরা এসে পৌঁছেছিলাম বিকালে। ধুলো পায়েই দর্শন হয়েছিল ভগবান সোমনাথের। আধুনিক মন্দির—যেটি ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে সর্দার প্যাটেলের ব্যবস্থাপনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপর। খুবই চিত্তাকর্ষক। একেবারে সমুদ্রের ওপরই বলা যায়। ধূসর রঙের গ্র্যানাইট পাথরের অপূর্ব কারুকার্যখচিত মন্দির।—নীল আকাশ, নীল সমুদ্রের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গিয়েছে। আর মন্দিরের গঠনও অদ্ভুত। গর্ভমন্দিরের মধ্যে সোমনাথের বিরাট জ্যোতির্লিঙ্গ। তাঁর পশ্চিমের দেওয়ালে শ্বেতপাথরের বেশ বড় পার্বতীর মূর্তি। মন্দিরের ভিতর ও নাটমন্দির আয়না ও সুন্দর ছবি দিয়ে সাজানো। মন্দির-চত্বরের প্রবেশমুখে ঐ গ্র্যানাইট পাথরেরই অতি অপূর্ব কারুকার্যকরা তোরণ। তৈরি করিয়েছিলেন জামনগরের রানী তাঁর পরলোকগত স্বামী জামসাহেব দিগ্বিজয় সিংজীর স্মরণে। বর্তমানের বিশাল সুদৃশ্য মন্দিরটি ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ৮ মে সৌরাষ্ট্রের জনগণের অর্থসাহায্যে জামনগরের জামসাহেব ও সর্দার প্যাটেলের উদ্যোগে তৈরি করা শুরু হয়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ১১ মে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অর্ধসমাপ্ত মন্দিরের প্রাচীন ব্রহ্মশিলার ওপরে নতুন মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এটি সোমনাথের সপ্তম লিঙ্গ ও মন্দির। এর আগে ছয়বার তা ধ্বংস ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মনে পড়ছে ইতিহাসে পড়েছিলাম, আলবেরুনীর বইতেও সোমনাথের প্রাচীন সুবিশাল মন্দিরের উল্লেখ আছে। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সেই মন্দিরের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের তুলনা ছিল না। তখন নিত্য গঙ্গা থেকে জল আসত সোমনাথের অভিষেকের জন্য। পশ্চিমভারতের ধনী রাজন্যবর্গের প্রণামীতে এই মন্দিরের সেবাপূজাদি ছিল আকর্ষণীয়ভাবে প্রাচুর্যে ভরপুর, কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী অভিযানকারীদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল এই মন্দিরের ওপর। ১০২৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি মহম্মদ গজনী প্রথম ভারত আক্রমণের সময় এই মন্দির লুঠ ও ধ্বংস করেন। মন্দির রক্ষায় স্থানীয় মাণ্ডলিক নরপতি আপ্রাণ চেষ্টা করেও, তার পঞ্চাশ হাজার সৈন্যবাহিনীর রক্তস্রোতের বিনিময়েও তুর্কী-বাহিনীর নৃশংসতার কাছে দাঁড়াতে পারেননি। লাল-পাথরের বিরাট সেই মন্দির বিধ্বস্ত হয়, বিগ্রহ ধ্বংস ও প্রচুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। এর পরে সম্ভবতঃ চালুক্যবংশের প্রচেষ্টায় নতুন মন্দির তৈরি করে সোমনাথ বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরে ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে আলাউদ্দিন খিলজির সৌরাষ্ট্র আক্রমণের সময় সোমনাথ বিগ্রহ কলুষিত ও মন্দির লুণ্ঠিত হয়। সেবারও জুনাগড়ের রাজা মহীপাল ও তাঁর পুত্র নতুন মন্দির করে নতুন বিগ্রহ স্থাপন করেন। এরপরে ১৪৬৯-এর কাছাকাছি কোন সময়ে মহম্মদ বেগড়া এই মন্দির ধ্বংস করে এখানে একটি মসজিদ তৈরি করেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। নতুন মন্দির তৈরি হয়ে আবার পূজাব্যবস্থাদি চালু হয়। এর বেশ কিছুকাল পর আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি এই মন্দিরের ওপর পড়ে এবং ১৭০১ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের বাহিনী শেষবারের মতো সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করে। এর আশি বছর পর মধ্যভারতের ধর্মশীলা সাধ্বী মহারানী অহল্যাবাঈ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপরে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির

তৈরি করে তাতে সোমনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির আজও আছে। ছোট দ্বিতল মন্দিরের ওপরের তলায় ছোট লিঙ্গ, তার নিচে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ভূগর্ভে নেমে যেতে হয়। স্বল্প পরিসরে এই ভূগর্ভ-গর্ভমন্দিরে সোমনাথের মূল জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। আমার কেন জানি না বর্তমানের সুবিশাল সোমনাথ মন্দিরের থেকেও এই ছোট মন্দিরের প্রাচীন এই সোমনাথকেই বেশি ভাল লেগেছিল। নতুন মন্দিরের শিবলিঙ্গকে দর্শন করতে হয় দূর থেকে। পূজারীদের হাত দিয়ে পূজো নিবেদন করতে হয়, তাঁকে স্পর্শের সুযোগ নেই। আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম গোমুখ থেকে আনা গঙ্গাজল ও রাজকোট আশ্রম থেকে নিজে হাতে তোলা কচি কচি বেলপাতা ও ধুতরো ফুল। পূজারীর হাত দিয়ে সেগুলি পাঠিয়ে দিয়ে মন ভরেনি। কিন্তু অহল্যাবাঈ-এর মন্দিরের গর্ভে নেমে গিয়ে যখন জ্যোতির্লিঙ্গের কাছে পেঁছালাম, তখন প্রাণ ভরে গেল আনন্দে। সান্ধ্য আরতির আগে অভিষেকের আয়োজন হচ্ছে। পূজারীরা নিজেরাই আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডেকে নিয়ে লিঙ্গমূর্তির কাছে আসন দিয়ে বসতে দিলেন। আমার সঙ্গে গোমুখের গঙ্গাজল আছে বলায় তাঁরা আমাকেই তা নিবেদন করতে বললেন। তাঁরা নিজেদের শৃঙ্গার থামিয়ে দিলেন। আমার মন সত্যিই সেই মুহূর্তে আশুতোষ মহাদেবের করুণার কথা ভেবে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গের কমণ্ডলু থেকে গোমুখের জল দিয়ে শিব-পঞ্চস্নান মন্ত্রে প্রাণভরে সোমনাথের স্নান করালাম। রাজকোট আশ্রম থেকে আনা চন্দন গঙ্গাজলে গুলে মহাদেবের শরীরে লেপন করে পুষ্পবিল্বপত্রের অঞ্জলি দিয়ে, বিভূতি দিয়ে ত্রিপুণ্ড্রক করে আমাদের ধূপ কর্পূর নৈবেদ্যাদি পূজারীর হাতে দিলাম। তাঁরা আমাদের পূজা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করে তাঁদের অভিষেকের সময় আমাদের সাজানো নষ্ট করলেন না। তার ওপরই তাঁদের পুষ্পমাল্যের সাজ দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। আমার আনা ১০৮টি বেলপাতা সুন্দর করে মাথায় সাজিয়ে দিয়ে তাঁরা যথারীতি নৈবেদ্যাদি নিবেদন করে আমাদের দেওয়া ধূপ-কর্পূরাদি দিয়ে আরতি করলেন। তাঁদের আরতির পরে দেবাদিদেব সোমেশ্বরকে প্রণাম জানালাম :

"সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে
জ্যোতির্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসং।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাঽবতীর্ণং
তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥"

পূজারীরা সমস্বরে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁসর ঝাঁজ বাজাতে বাজাতে স্তবপাঠ করতে লাগলেন—

"ভজ শিব ওঁকার হর শিব ওঁকার
নাথ ভোলে মহাশম্ভু
ওঁ হর হর হর মহাদেব।..."

উদাত্ত কণ্ঠের সেই সমস্বরে গীত স্তোত্র ছোট ঘরটির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। স্তবপাঠের শেষে প্রধান পূজারী শান্তিজল দিয়ে আমাদের প্রসাদ দিলেন। প্রণাম করে উঠতেই দেখি পশ্চিমের দেওয়ালে অপূর্ব সুন্দর কষ্টিপাথরের দেবী পার্বতীর তিনহাতের মতো উঁচু দণ্ডায়মানা বিগ্রহ, দেওয়ালের কুলুঙ্গির মধ্যে রক্ষিত। অনবদ্য সুন্দর কমনীয় মাতৃমূর্তি যেন জীবন্ত! তাঁর চরণে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে শুধু এই প্রার্থনাই জানিয়েছিলাম :

"ন মন্ত্রং ন যন্ত্রং তদপি চ ন জানে নুতিমহো,
ন চাহ্বানং ধ্যানং,
তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাম্।
ন জানে মুদ্রাস্তে,
তদপি চ ন জানে বিলপনং,
পরং জানে মাতঃ ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥"

কৃপাময়ী মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে ভূগর্ভ থেকে ওপরে উঠে এলাম। সেখানেও বিগ্রহ রয়েছেন। বোধহয় বিধর্মীর আক্রমণ থেকে মূল বিগ্রহকে রক্ষা করবার জন্যই ওপরের বিগ্রহটি ক্যামোফ্লেজ মাত্র। এখানে শুধু স্নান ও পুষ্পসজ্জা—নিত্য পূজাদির কিছুই নেই। যাই হোক আবরণ দেবতাকেও প্রণাম জানিয়ে বাইরে এলাম। পশ্চিমাকাশে তখন বিরাট সোনার থালাটি অস্তোন্মুখ। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে নতুন মন্দিরের সংলগ্ন প্রাচীরের ওপর উঠে বসলাম। সেখানে বহু দর্শনার্থীর ভিড়। ধীরে ধীরে আরবসাগরের জলের গোলাপী রং পাল্টে, রক্তিম আভায় দিগন্ত গলিয়ে দিয়ে সারা-দিনের দীর্ঘযাত্রার অবশেষে রাজকীয় চেহারার বিরাট

স্বর্ণতনু টুপ্ করে নেমে গেলেন সাগর-শয্যায়। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা কুড়ি। কলকাতা থেকে এখানে সূর্যাস্তের সময়ের তফাৎ প্রায় একঘণ্টা কুড়ি মিনিট। এদিকে সূর্যাস্তও হলো, ওদিকে নতুন মন্দিরের আরতির বাজনাও শুরু হলো। যাত্রীরা পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে হাজির হলো প্রধান মন্দিরের নাটমন্দিরে। কোনরকমে ভিড় বাঁচিয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম মন্দিরে। কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম একটা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। দূর থেকেই আরতি দর্শন করে শান্ত হতে হলো। এখানে ভগবানের রাজকীয় ভাব, বিপুল ঐশ্বর্য। বিরাট জনসমাবেশ। আর অহল্যাবাঈয়ের মন্দিরে শান্ত, স্নিগ্ধ, সমাহিত তপোমগ্ন মহিমা—দুয়ের মধ্যে এই পার্থক্যটাই আমার মনে হলো। যাই হোক আরতির শেষে বেরিয়ে এসে মন্দিরের চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগলাম। ঠিক মন্দিরের পিছনের চত্বরে একেবারে সমুদ্রের ধারে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের জীর্ণাবশেষ এখনও রয়েছে। তার কয়েকটি এখনো একমানুষ সমান উঁচু। এইরকম একটি জীর্ণাবশেষের ওপর উঠে একটু বসতে পেরেছিলাম। কত শত বছরের পুরনো এই বেদি কে জানে। সমুদ্রের নোনা হাওয়া, কত, ঝড়-বৃষ্টি, কত নৃশংস অত্যাচারীর নির্মম অস্ত্রের আঘাত সহ্য করেছে এই পাথরের আসন। আবার কত কাল আগে, কত ভক্ত শ্রদ্ধাশীল মানুষের কত ভক্তি-শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে অভিসিঞ্চিত হয়েছিল নিশ্চয়ই এই বেদি কোন দেববিগ্রহের আধার হিসাবে। এর যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত, কত অজানা ইতিহাসের পাতা আমার সামনে সে মেলে ধরতে পারত। বড় কষ্ট হচ্ছিল আমার। তাই সেই ভাঙা আসনেই প্রণাম জানিয়ে নেমে এলাম—অতীতের দেবতার অধিষ্ঠানভূমি থেকে। সম্ভবতঃ কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিত্তি সেটি। চারিপাশের দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে, শুধু ভিত্তির মাঝখানে গোল একটি গর্তের মতো। হয়তো এই গর্তের মধ্যেই কোন লিঙ্গ অথবা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এখন বালি দিয়ে সেই গর্তের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভিত্তির দেওয়ালে এখনো অপূর্ব কারুকার্যকরা হাতির প্যানেল ও নানা অলংকরণ। শত শত বছরের সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় ও দুর্বৃত্তের অত্যাচারে কিছু কিছু বিকৃত হলেও এখনো যা অবশেষ আছে তাতে বোঝা যায়, কত দক্ষ শিল্পীর হাতের কাজ ছিল এসব। আরও উত্তরে একটি সূর্যমন্দিরের অবশেষ দেখা যায়। এছাড়া পিছনের দিকে ও দক্ষিণের নতুন সাজানো বাগানে অনেক পাথরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনো স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে নানা জায়গায়।

সমুদ্রের হাওয়া হুহু করে ছুটে আসছে। অনেক দূরে দুটি বেশ বড় বড় জাহাজ নোঙর করা আছে, তাদের আলোগুলি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। বাঁদিকে একটি লাইট-হাউসের সার্চ-লাইট ঘুরে ঘুরে আকাশের গায়ে আলোর রেখা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশের রঙ ক্রমশই ঘোর হচ্ছে, সমুদ্রের জলও কালো, আর তার ওপর সাদা ফেনার রেখা লম্বা-লম্বিভাবে ঢেউ-এর মাথায় নিয়ে একের পর এক এসে আমার পায়ের তলায় পাথরের প্রাচীরে আছড়ে পড়ছে। শান্ত পরিবেশ। প্রাচীরের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও দু-একজন বসে আছেন। এমন সময় আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হলেন অহল্যাবাঈয়ের মন্দিরের পূজারীজী। আমার সঙ্গে তাঁর মন্দিরে কথা হয়েছিল—সন্ধ্যার পরে আমি এই প্রাচীরের ওপর বসে থাকব। এই বয়স্ক মারাঠী ব্রাহ্মণ সাধু ও সন্ন্যাসীদের খুবই ভক্তি করেন মনে হলো। কারণ, কিছুতেই আমার পাশে বসতে চাইলেন না। অনেক করে বলতে একটু দূরত্ব বজায় রেখেই বসলেন। এবারে আমিই বললাম: "পূজারীজী, এখন আমাকে এই তীর্থমাহাত্ম্য কিছু শোনান। এই উদ্দেশ্যেই আপনাকে ডাকা।" তাই আর দ্বিরুক্তি না করে তিনি হাতজোড় করে প্রার্থনা করলেন:

"বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণম্।
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং।
বন্দে সূর্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং।
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চবরদং বন্দে শিবং শঙ্করং।"

তারপরে বলতে শুরু করলেন: "এই যেখানে আমরা বসে আছি, বহু প্রাচীন তীর্থ এটি। ঋগ্বেদে ও মহাভারতে এই তীর্থের উল্লেখ আছে—সোমতীর্থ ও প্রভাসতীর্থ বলে। এই 'প্রভাস' নামকরণের পিছনে একটি সুন্দর কাহিনীও প্রচলিত। বহুকাল

আগে এখানে সরস্বতী নদী এসে সমুদ্রে পড়েছিল। তাই এই সঙ্গম ছিল মহাপবিত্র। স্বর্গের চন্দ্রদেবতার সঙ্গে প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। সুদর্শন চন্দ্র তাঁর এতগুলি স্ত্রীর মধ্যে রোহিণীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। ফলে তাঁর অন্য বোনেরা বা সতীনেরা এতে স্বামীর ওপর খুব চটে গিয়ে বাবা দক্ষের কাছে গিয়ে নালিশ করেন। দক্ষ তাঁর জামাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলেন —সব স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু চন্দ্র নিজের স্বভাব বদলাতে পারলেন না। ফলে তাঁর শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষ দারুণ চটে গিয়ে জামাইকে অভিশাপ দিলেন, 'যে-শরীর ভোগের প্রতি এত আকৃষ্ট, তোমার সেই শরীর ক্ষয়রোগগ্রস্ত হোক।' শাপগ্রস্ত চন্দ্রের শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে লাগল। স্বামীর এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে অন্যান্য স্ত্রীরাও খুব কাতর হয়ে পড়লেন। দেবতারাও নিশিকান্ত চন্দ্রের এই দুর্দশায় গভীর চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। তখন সকলে মিলে দক্ষের কাছে গিয়ে আবেদন করলেন চন্দ্রকে ক্ষমা করতে হবে। শেষে অনেক অনুনয়ের পরে দক্ষ রাজি হলেন এক শর্তে যে, চন্দ্রকে তাঁর সকল স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে হবে আর সরস্বতী ও সাগরের সঙ্গমে স্নান করে মহাদেবের তপস্যা করতে হবে। তবেই তিনি শাপমুক্ত হবেন। সেইমতো চন্দ্রদেব এই তীর্থে এলেন, কিন্তু সেই ব্যাপার, রোহিণীকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন। এখানে সঙ্গমে স্নান করে মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করলেন তিনি। বহু বছর তপস্যা করার পর মহাদেব এই স্থানে চন্দ্রকে দেখা দিয়ে বললেনঃ 'তোমার তপস্যায় আমি খুশি হয়েছি। তবে তোমার স্বভাব তো পাল্টায়নি। সেজন্য তুমি পনেরোদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, আবার পনেরোদিন ঔজ্জ্বল্য ফিরে পাবে।' এইভাবে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের সৃষ্টি হলো। সোমদেব তাঁর জ্যোতিঃ এখানে ফিরে পেলেন বলে এই স্থানের নাম হলো—প্র(পুনঃ) ভাস (প্রকাশ)। এখানে ব্রহ্মার পরামর্শমতো চন্দ্রদেব সুবর্ণময় মন্দির তৈরি করে তাতে দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর নাম দিলেন 'সোমনাথ'। ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হলো এই তীর্থ। ত্রেতাযুগে এখানে রৌপ্যময় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন রাবণ। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ দারুময় মন্দির করিয়ে দিয়েছিলেন, আর এই কলিতে প্রস্তরময় মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই তীর্থে স্নান-দানে মানুষ অশেষ পুণ্যলাভ করে।"

আধুনিক মন্দিরের উত্তরে শঙ্করাচার্যের সারদা মঠের একটি শাখা আছে। এটি দ্বারকার সারদাপীঠের অন্তর্গত। তবে এখন এখানে দু-একজন সাধু ছাড়া আর কেউ বড় একটা থাকেন না। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বলে আমার আর সেখানে যাওয়া হলো না। পরদিন আমাদের দ্বারকা যাবার কথা। সেখানে মূল মঠ তো দেখতে পাবই।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টায় সমুদ্রের ধারে এক দোকান থেকে রুটি, ডাল, সব্জী কিনে এনে তাই খেয়ে আমরা সমুদ্রের তীরে এসে আবার বসলাম। তখন লোকজন কেউ ছিল না। দূরে দু-একজন পাহারাদার ঘুরছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ভক্তদের জয়ধ্বনিঃ 'জয় সোমনাথ!' 'জয় সোমনাথ!' হঠাৎ দেখি একজন ভিখারী গাইতে গাইতে এসে শুয়ে পড়ল উঁচু প্রাচীরের ওপর। তার সুর আর গানের দরদমাখা গলা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। সে গাইছিল—

"অব শিব পার করো মেরে নেইয়া।
অউ ঘট ঘাট অগাধ জলধি,
বল্লী লাগে ন খেইয়া॥
বারি বরোবর বারি রহো হ্যায়।
তা পর অতি পুরবৈয়া।
থরো থরায়ত কম্পত হিয়া মেরে,
শিব কি দেত দুহৈয়া।
শিব সহায় প্রভাত পুকারত।
শিব পিতু গিরিজা মেইয়া।"

তার অদ্ভুত ভাবের সঙ্গে এই নির্জন পরিবেশে সমুদ্রের গর্জনের মাঝে তার কণ্ঠের গান শুধু গান নয়, তার প্রাণের আকুতিরই বাঙ্ময় প্রকাশ বলে মনে হচ্ছিল। সে-রাত্রে ঐ গানের সুর বুকে নিয়ে ডেরায় ফিরে এসেছিলাম। সারারাত ঘুম হয়নি। মনের মাঝে ঐ সুরই বাজছিল সারারাত—"অব শিব পার করো মেরে নেইয়া।" হে দেবাদিদেব, হে চন্দ্রকান্ত, হে দেবেশ, তুমি আমার জীবনতরণীকে পার করে দাও, নিয়ে যাও তোমার নিত্য-সান্নিধ্যে। জয় সোমনাথ! জয় সোমনাথ!

রম্যরচনা

খাদ

স্বামী গোপেশানন্দ

হৃষীকেশের পথে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসীর দর্শনলাভ এই লেখার প্রেরণা। তেল-কালি-মাখা এ কোন্ সন্ন্যাসী! বাঁহাতে ছেনি, ডানহাতে হাতুড়ি নিয়ে গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এলেন। সহযাত্রীর মন্তব্য—'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—ইনি তাই।' কোথায় হাতে কমণ্ডলু, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, নগ্নপদ ও ভস্মাচ্ছাদিত এক সন্ন্যাসীর দর্শন পাব, না, দর্শন পেলাম এক কারিগর-সন্ন্যাসীর—তা-ও আবার এই হৃষীকেশে! অহো ভাগ্যম্

সে কোন্ টেকনিশিয়ান, যিনি কারিগরকে সন্ন্যাসী, না, সন্ন্যাসীকে কারিগর বানালেন? এইরকম এলোপাতাড়ি চিন্তা যেমন যেমন মনে আসছে তেমন তেমন লিখছি। চিন্তাগুলোর যোগসূত্র খুব দৃঢ় নয়; তবে একেবারেই যোগসূত্র নেই এমনও কিন্তু বলব না।

স্বামীজী আমাদের জন্যে বিজ্ঞান-শিক্ষা বিশেষ করে কারিগরি-শিক্ষা তথা প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। বিজ্ঞান আমরা পড়ি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো কি সত্যি সত্যি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়? যেমন "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" তেমনই বিজ্ঞানের তত্ত্বও গুহায় নিহিত বললে বিশেষ ভুল বলা হবে কি?

এখন সামান্য 'বিন্দু'-কে নিয়ে আরম্ভ করা যাক। বিন্দু কাকে বলে ছাত্রাবস্থাতেই শিখে ফেলেছি। পূজনীয় মাস্টারমশায়ের বেতের এমনই মহিমা যে, বিন্দুকে না বুঝে উপায় ছিল না। সে-মাস্টারমশায়ও নেই, সে-বেতও নেই! সুতরাং খোলসা করে বলতে এখন আর ভয় নেই। যার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই—বোধ হয় রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ কিছুই নেই—শুধু নেই-নেই, অথচ তিনি আছেন, তাঁকেই নাকি বলে বিন্দু! এমন সহজ সরল বস্তুটিকে আপনি দেখেছেন কি? কোন বৈজ্ঞানিকও দেখেছেন কিনা সন্দেহ। বিন্দুর দর্শন মেলেনি বলে বিন্দুর সংজ্ঞাটি ভুল—এমন কথা বলে এই বিজ্ঞানের যুগে নিজেকে মহাপাপী বলে প্রতিপন্ন করবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই।

বিন্দুর এই সংজ্ঞাকেই ভিত্তি করে রেখা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এই নিয়ে আমরা নকশা তৈরি করি, জায়গা পরিমাপ করি, ঘর-বাড়ি তৈরি করি। অঙ্কশাস্ত্র তথা বিজ্ঞানশাস্ত্র এর ওপরেই আবার বহাল তবিয়তে বিরাজিত। যদি বিন্দুই ভুল হয় তাহলে সবই তো ভুল, জগৎটাই ভুয়া—এইরকম একটা উৎকট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, বৈজ্ঞানিকের এই শুদ্ধসত্ত্ব বিন্দু দিয়ে আমাদের কোন কাজ কস্মিন্‌কালেও হয়নি এবং এখনো হবে না। যাকিছু হয়েছে তা সবই প্রয়োগবিদ্ বা টেকনিশিয়ানদের কেরামতিতে। এঁরা বলেন—কাজ করতে গেলে, এই ব্যবহারিক জগতে সুখে বাস করতে হলে এই বিশুদ্ধ বিন্দুর সাথে কিছু খাদ মেশাতে হবে। অর্থাৎ সেই হচ্ছে কাজের বিন্দু—যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ আছে। তবে মাপে খুব ছোট, যত ছোট হয় ততই মঙ্গল, ততই সে আদর্শ বিন্দু। সুতরাং এই যুগটাকে বৈজ্ঞানিকের যুগ না বলে কেন প্রয়োগবিদ্‌দের যুগ বলা হয় না তা বোঝা যায় না। খুব নামকরা একজন প্রয়োগবিদের নাম বলতে দম বের হয়ে যাবে, অথচ গণ্ডায় গণ্ডায় বৈজ্ঞানিকের নাম হড়হড় করে বলা যায়। মানুষ এমনই নিমকহারাম, বৈজ্ঞানিকদের পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পুজো করবে, অথচ যাঁরা বিজ্ঞানকে আমাদের জীবনে কাজে লাগালেন তাঁদের নাম ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করবে না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোকে ব্যবহারিক জগতে প্রয়োগ করতে গেলে যেমন দরকার হয় কিছু খাদের মিশ্রণ, ধর্মের তত্ত্বগুলোকে কার্যকরী করতে গেলেও চাই কিছু খাদের ব্যবহার। এযুগে শ্রীভগবান নিজমুখে উপমার সাহায্যে বলেছেন—খাঁটি সোনায় অলঙ্কার গড়নের কাজ হয় না, তাতে কিছু খাদ মিশিয়ে নিলে তবে হয়। যিনি পরম ব্রহ্ম, নিরাকার, নির্গুণ তিনি কাজ করবেন কি করে? তাঁর হাত-ই বা কোথায়, পা-ই বা কোথায়? নিরাকার, নির্গুণ পণ্ডিতী শব্দগুলো আমাদের কাছে শুধু শব্দমাত্র, এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারি না। সেই কারণে শ্রীভগবানের আমাদের জন্যে যদি কিছু বলবার থাকে, করবার থাকে তাহলে তাঁকেও কিছু-না-কিছু অন্ততঃ বিন্দুমাত্র খাদের সাথে মিশাতে হবে, যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের হয়েছিল। উনি যখন সমাধিস্থ হয়ে থাকতেন তখন উনি কি অবস্থায় থাকতেন, কোন্ রাজ্যে বিচরণ করতেন তা আমরা জানি না, বুঝি না। উনিও অনোচ্ছিষ্ট ব্রহ্মের উপলব্ধি-কথা কখনো বলেননি বা বলতে পারেননি। বলবার অনেক চেষ্টা করেও 'এটা নয়, ওটা নয়' বলে বলতে গিয়ে ফিক করে হেসে সমাহিত হয়ে যেতেন—বলা আর হতো না।—

"বাঙ্-মনোঽতীত-গোচরঞ্চ নেতি-নেতি-ভাবিতম্।
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্॥"

ওনার মধ্যে খাদ ছিল সে-কথা বলা যাবে না। হয়তো আমাদের মতো মানুষকে 'জীবনের উদ্দেশ্য কি'—এটা বোঝানোর ইচ্ছা তাঁর ক্ষেত্রে খাদ হিসাবে কাজ করেছে। যাই হোক, এই জগতে বাস করে শ্রীভগবানকে জানতে হলে ঘুরে ফিরে রামকৃষ্ণদেবকেই জানতে হবে। এছাড়া অন্য উপায় আছে কি? ইনিই আদর্শ ভগবান। আমাদের সকলের মধ্যেই উনি আছেন ঠিকই, কারণ উনি সকলের মধ্যে নিজেকে দেখেছেন এবং নিজের মধ্যে সকলকে দেখেছেন। কিন্তু আমাদের মুখে এটাও কথার কথা। আমরা বলি কিন্তু উপলব্ধি করতে পারি কৈ? কারণ, আমাদের হৃদয়ে খাদের এত বেশি প্রাচুর্য যে, আসল জিনিস বেপাত্তা। আমাদের মধ্যে যাঁদের খাদের ভাগ যত কম তাঁরা তত উন্নত বলে পরিচিত। শ্রীভগবানের দরকার হলো খাদের। আমাদের দরকার হচ্ছে খাদ তাড়ানোর ব্যবস্থা করা। এই যা পার্থক্য। কি করে এই খাদ তাড়াব তার কথা কথামৃতের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। শুধু কথামৃত কেন, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থেও আছে। কিন্তু বর্তমান যুগে এই ব্যবহারিক জগতে কি করে সেটা প্রয়োগ করতে হবে সেটা একটা মহাসমস্যা। আরও বড় কথা হচ্ছে যে, ধর্মের তত্ত্ব ভাল করে না বুঝে সেটা কি আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারব? আগেই বলা হয়েছে—"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"। খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে ধর্ম কি বলছে তার আভাস হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিনা অভ্যাসে উপলব্ধি তো হবে না। এটা আবার আর একটা সমস্যা।

তত্ত্ব না বুঝেও কিন্তু আমরা এগুতে পারি। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—'মহাজনদের পথ' অবলম্বন করে। আমরা দুপায়ে হাঁটি, কেন পড়ে যাই না? তা শিশুকালেও জানতাম না, এখনো অনেকে জানি না। বড়দেরকে দেখেই হাঁটা শিখেছি। মূলে ছিল চেষ্টা ও অভ্যাস। তাই তো ভগবান গীতামুখে বললেন: "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়—"

স্বামীজী ধর্মের তত্ত্বগুলোকে এই ব্যবহারিক জগতে কি করে প্রয়োগ করতে হবে তা দেখিয়ে গেছেন। এইখানে স্বামীজী প্রয়োগবিদের কাজ করেছেন। ঠাকুরের কাছে যাঁরা ধর্মের কথা অথবা সমাধিস্থ হওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদেরকে ঠাকুর কতই-না উৎসাহ দিতেন! কিন্তু স্বামীজীর সাথে ঠাকুরের ব্যবহার সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। স্বামীজী সমাধিস্থ হয়ে থাকতে চাইলে ঠাকুর তাঁকে 'হীন' বলে কঠোর তিরস্কার করেছেন। কারণ, ঠাকুর জানতেন, স্বামীজীই ধর্মতত্ত্বগুলোকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করবার কৌশল দেখাতে পারবেন এবং তাতে করে মানুষকে ঠিক পথে চালনা করতে পারবেন। স্বামীজীও তাই ত্যাগ ও সেবার পথ দেখিয়ে গেছেন। আমাদের সেবা করতে হবে—জীবের

সেবা। মনে প্রশ্ন আসবেই—ভূতের সেবা কেন করব ?

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥"

গীতার এই শ্লোকের অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও মনে রাখতে হবে সেই কথা —"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়—"। এবং এতেই আমরা খাদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারব। অবশ্য বলা যত সহজ, কাজ তত সহজ নয়। যে-ভগবানকে আমরা দেখিনি, জানিনি তাঁকে মানুষের মধ্যে দেখে সেবা করা কি দুরূহ কাজ তা যাঁরা চেষ্টা করেছেন তাঁরাই হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। সেবার পিছনে মান-যশ ওত পেতে আছে এবং তারপর আছে আবার অহঙ্কার। অহঙ্কারের মতো সর্বনাশা কঠিন আঠালো খাদ ত্রিভুবনে আর নেই। অবশ্য এর জন্যে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। অহঙ্কার আসে আসুক। ঠাকুর নিশ্চয়ই তাঁর মঙ্গলহাতে সময়মতো আমাদেরকে উল্টে দেবেন। তখন 'তুঁহু তুঁহু' রবে অহঙ্কারের হাত থেকে আমরা নিশ্চয়ই নিস্তার পাব। কিছুই করলাম না, মাথা উঁচুই হলো না, আগের থেকে কেন "আমার মাথা নত করে দাও হে..." বলে কাঁদুনি গান গাইব? তাই বলি, সেবার কাজ আমাদের করতেই হবে। সেবা হতে পারে অন্নদানে, হতে পারে মিষ্টিকথাতে, হতে পারে ছেঁনি-হাতুড়ি দিয়েও। জ্ঞানদানে তো হবেই। অর্থাৎ যার যা আছে তাই নিয়ে সেবা-কাজে বেরিয়ে পড়া ভাল। এবং শুভস্য শীঘ্রম্।

বাতায়ন

মস্কোয় দুর্গোৎসব

'সোভিয়েত দেশ'-এর প্রতিনিধির প্রতিবেদন

মস্কোতে গতবছর (১৯৯০) প্রথম দুর্গোৎসব পালিত হলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপে এর আগে কখনো দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়নি। মস্কোবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় এই উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসব মূলতঃ মস্কোতে বাসরত ও কর্মরত ভারতীয়দের জন্য হলেও, ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ধর্মীয় ও লোক-উৎসবের সঙ্গে মস্কোবাসী ও সোভিয়েত রাজধানীর অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াও ছিল এর অন্য উদ্দেশ্য।

আমি যখন উৎসব-মণ্ডপে পৌঁছালাম, আমার মনে হলো, আমি যেন একটি হিন্দু-মন্দিরে ঢুকে পড়েছি : সামনে মা দুর্গার প্রতিমা, তাঁর দুই পাশে প্রদীপ জ্বলছে, তার পাশেই সাজানো হরেক রকম ফুল, মিষ্টি ও ফলের নৈবেদ্য। ধূপের সুগন্ধে সমস্ত মণ্ডপটি ভরে ছিল। এই উদ্দেশ্যে ভারত থেকে আগত পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করছিলেন। তাঁর চারপাশে ঘিরে ছিলেন বৃদ্ধ ও শিশুসহ কয়েক ডজন ভারতীয় নরনারী। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরোহিতের চণ্ডীপাঠ নিমগ্নচিত্তে শুনছিলেন, আবার কেউ কেউ প্রার্থনা করছিলেন বা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন। এর পর সবাই পুষ্পাঞ্জলি দেন। অঞ্জলির পর সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঢাক-ঢোল কাঁসির বাদ্যে মণ্ডপ গমগম করছিল।

মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের কর্মিবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও মস্কোর উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রিবৃন্দ ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীরা। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। মস্কোতে যে দুর্গোৎসব পালিত হচ্ছে, সে-সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কি জানতে চাইলাম।

তাঁরা বললেন : "এখানে পুজা-প্রাঙ্গণে যোগ দিতে পেরে আমরা সত্যিই খুশি, আর মনে হচ্ছে আমরা যেন নিজেদের দেশেই আছি। বিশেষ করে বাঙালীরা যাঁরা বেশ কয়েক বছর ধরে এখানে আছেন, কাজ করছেন তাঁরা বিশেষভাবে খুশি এজন্যেই যে, তাঁরা ছুটি কাটাতে দেশে যান ঠিকই, তবে সবসময়ই সেটা দুর্গাপূজার সময়ে হয়ে ওঠে না।

"আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে পুজামণ্ডপে নিয়ে আসি যাতে আমরা পরস্পরকে এই খোলা-মেলা পরিবেশে আরও ভালভাবে জানতে পারি। পুজাপার্বণ পালন ভারতীয়দের মনে এক সুন্দর প্রভাব রেখে যায়।"

সোভিয়েতের মানুষেরাও এই দুর্গোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। আমি মণ্ডপে বেশ কয়েকজন সোভিয়েত তরুণীকে এক সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করতে দেখলাম। মনে হলো, যেখানে দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছিল, এ'রা সবাই সেই 'হাউস অব ইয়ুথ সায়েন্টেফিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন' থেকে এসেছেন। এ'রা সবাই কম্পিউটার ক্লাস ও প্রোগ্রামারের শিক্ষিকা।

"আমরা দুর্গোৎসব দেখে অভিভূত", আমাকে তাঁরা বললেন : "এখানে সবকিছুই দেখছি ছবির মতো সুন্দর ও সবকিছুতেই সুরুচিবোধের ছাপ আছে। আমরা এখানে অনেক চমৎকার জিনিস দেখলাম ও ভারত সম্বন্ধে বেশি করে জানতে পারলাম।"

ভারত ও বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে খ্যাতনামা সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ প্নাতিয়ুক দানিলচুক বললেন : "এমন সুন্দরভাবে ও এমন রুচিসম্মতভাবে পুজানুষ্ঠান করা যেতে পারে, তা আমি ভাবতেও পারিনি। আমি যে মস্কোয় আছি সে-কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি যেন আবার কলকাতায় ফিরে গেছি।..."

সেই মহান দেশটি সম্পর্কে যাদের আগ্রহ বিপুল, সেইসব সোভিয়েত মানুষদের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে মস্কোতে দুর্গোৎসব একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।*

*সোভিয়েত দেশ, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃঃ ৪০—৪১

নিবন্ধ

প্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ চিড়িয়াখানায় গিয়ে সিংহ দেখেছিলেন, একথা কথামৃতেই উল্লিখিত আছে। সিংহকে 'মায়ের বাহন' হিসাবেই দেখেছিলেন। এই ঘটনার কথা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের শ্রুতিগোচরও হয়েছিল, 'একেশ্বরবাদী' ও 'নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী' রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের এই ব্যাকুলতা প্রকাশের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন তাঁর 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে। অবশ্যই কবি উক্ত প্রবন্ধে স্পষ্ট করে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু বাক্যবাণের ইঙ্গিতে ঠাকুরকেই বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। সে-সময়ে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে নানা মহলে আলোচনার তাপ ও উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছিল নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সামনে। উত্থাপন করেছিলেন কুমুদবন্ধু সেন, যিনি ছিলেন গিরিশচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী ও সাহচর্যে ধন্য এবং পরবর্তী কালে তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'গিরিশ বক্তৃতামালা' 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কুমুদবন্ধু সেনের 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'রসচক্র সাহিত্য সংসদ' (১৫ নং রাজা বসন্ত রায় রোড, কলকাতা) থেকে। এই গ্রন্থে কুমুদবন্ধু সেন স্বীয় অভিজ্ঞতা ও স্বকর্ণে শ্রুত বিষয় ও বক্তব্য স্মৃতিচারণ করে পৌত্তলিকতা এবং এ-ব্যাপারে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ও গিরিশচন্দ্রের মতামত প্রকাশ করেন। কুমুদবন্ধু সেনের বয়ান থেকে জানা যায় যে, উক্ত প্রসঙ্গটি সেদিন গিরিশধামে উত্থাপিত ও আলোচিত হয়, সেদিন আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কুমুদবন্ধু, গিরিশচন্দ্র এবং ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী তিন/চার পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রসঙ্গটি বিন্যস্ত। বিষয়টি যথাযথভাবে বোঝার জন্য এবং আনুপূর্বিক সূত্র বজায় রাখার প্রয়োজনে আমরা উক্ত আলোচনার গতিধারাকেই নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করতে চাই।

তার আগে আমরা প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে এবং সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে অনুধাবন করার স্বার্থে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি একটু স্মরণ করে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়' নামক গ্রন্থে (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪১-৩৪২) 'রূপ ও অরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিমাপূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেবমূর্তিকে উপাসক কখনোই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না। কারণ, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যই রূপের সৃষ্টি করি—দেবমূর্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি।"

কবি আবার বলেছেন ঃ "তবে কেন কোন কোন বিদেশী ভাবুকের মুখে আমরা প্রতিমাপূজার সম্বন্ধে ভাবের কথা শুনিতে পাই? তাহার কারণ তাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা পূজক নহেন। তাঁহারা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোন মূর্তিকে দেখিতেছেন ততক্ষণ তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন না। একজন খৃস্টানও তাঁহার কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করিতে পারেন; কারণ সরস্বতী তাঁহার কাছে ভাবের প্রকাশমাত্র—গ্রীসের এথেনীও তাঁহার কাছে যেমন, সরস্বতীও তেমনি। কিন্তু সরস্বতীর যাঁহারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন

করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটিমাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না।"

তারপরই তিনি বলেছেন : "এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোন একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা 'সিংহ মায়ের বাহন' শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোন এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।"

কবির এই বক্তব্য সে-যুগে প্রচণ্ড সৃষ্টি করেছিল। কারণ, তিনি যে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, সেবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তবে তিনি যে-ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণকে 'শক্তি উপাসক' আখ্যা দেন, তাতে কিছু সঙ্কীর্ণতাই যেন প্রকট হয়ে পড়ে। পরমহংসদেব সাকার ও নিরাকার সাধনায় সিদ্ধ, সিদ্ধ বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনায়, এটা সুপরিজ্ঞাত সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক এবং 'যত মত তত পথ'-এর মহান প্রবক্তা। এব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেকে অনন্তস্বরূপ নিরাকারের সাধক হিসাবে সপ্রমাণ করতে অগ্রসর হয়েও থাকেন, তাহলেও তিনি সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট হবেন। কবি নিজেই একটি বিশেষ গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন, এমন কথা ভাবা কষ্টকর। কবির এই বক্তব্য সে-যুগে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র এপ্রসঙ্গে যে-মতামত উপস্থাপিত করেছিলেন, সেটা আমরা পরে আলোচনা করব।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটে (বাংলা সন ১৩১১)। সেসময় রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বভার বহন করে চলেছেন এবং স্বীয় সমাজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠায় দারুণভাবে উদ্যোগী। যেসময় তিনি 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধ লেখেন, তারই কাছাকাছি সময়ে (১৯১০ খ্রীস্টাব্দে) ১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজে কবি 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অন্য প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করার আগে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিংহদর্শন প্রসঙ্গটি স্মরণ করতে পারি।

শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর চতুর্থ ভাগ, একাদশ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত ঘটনার উল্লেখ পাই। মণিলাল মল্লিককে ঠাকুর উপদেশ দিচ্ছিলেন। সেদিন ছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪ (বাংলা ১৩ ফাল্গুন, ১২৯০)। মণিলাল মল্লিক ঠাকুরকে বলছেন, আপনার অসুখ,—তা না হলে আপনি একবার গিয়ে দেখে আসতেন গড়ের মাঠের প্রদর্শনী। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশায় প্রমুখ উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলছেন : "আমি গেলে সব দেখতে পাব না! একটা কিছু দেখেই বেহুঁশ হয়ে যাব—আর কিছু দেখা হবে না। চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিয়েছিল। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!—ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন হলো—তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে ? সিংহ দেখেই ফিরে এলাম।"

উপরোক্ত ঘটনাটিকেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপাত্মক ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, 'সঞ্চয়' গ্রন্থে সংযোজিত এবং সমসাময়িককালে রচিত রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু প্রবন্ধে তাঁর 'মূর্তি-পূজা বিরোধী' মনোভাবের পরিচয় পাই। 'ধর্মের নবযুগ' (পৃঃ ৩৫৯-৩৫২) প্রবন্ধে তিনি রামমোহন রায়ের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘোরতর আক্রমণ চালান। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "তিনি (রামমোহন) মূর্তি-পূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই

মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা—যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধ-সকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারো প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং প্রবেশ করিতে দিবই না।... বস্তুতঃ মূর্তিপূজা সেইরূপ কালেরই পূজা—যখন মানুষ বিশ্বের পরমদেবতাকে একটি কোন বিশেষ রূপে একটি কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্যফলের আকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই, সেখানে বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণ ছাড়া প্রবেশের অন্য কোন উপায় রাখা হয় নাই ; মূর্তিপূজা সেই সময়েরই—যখন পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী—এক কথায় যখন ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সঙ্কুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সঙ্কুচিত করিয়াছে...।"

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে মূর্তি-পূজার স্বরূপ ও মৌল ধারণাকে বর্জন করে লৌকিক ধারণাকেই গুরুত্ব দিয়ে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। মূর্তিপূজা যে "ঈশ্বরকে সঙ্কুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সঙ্কুচিত" করে না তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবন ও সাধনায় প্রমাণ করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বকে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় ও পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সাকার ও নিরাকার তত্ত্বের সামগ্রিক ভূমিকে অগ্রাহ্য করেই মূর্তি-পূজাকে আক্রমণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখেই একাজ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজে ভাঙ্গন, ব্রাহ্মচেতনা নিয়ে বিভ্রান্তি ইত্যাদি হতাশাজনক পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে কিছু কিছু চোখা বাণ ছাড়তে হয়েছিল। শুধু মূর্তিপূজাকে আক্রমণ নয়, ব্রাহ্মধর্মের হয়ে তাঁকে একই সঙ্গে সওয়াল করতেও হয়।

এবার আমরা সূত্র অনুসরণ করে কুমুদবন্ধু-গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গে ফিরে যাই। 'রূপ ও অরূপ'-এর বিষয় উল্লেখ করে কুমুদবন্ধু সেন বললেন ঃ "প্রবাসীতে রবিবাবুর 'রূপ ও অরূপ' নামে একটি প্রবন্ধ পড়লাম। কিন্তু তিনি পরমহংস-দেবের নাম স্পষ্টতঃ না করলেও এক রকম উল্লেখ করেছেন, আর ভাব হিসাবে তাঁকে কিছু আক্রমণ ও কটাক্ষ করেছেন।"

কুমুদবন্ধুবাবুর এই বক্তব্য শুনে গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন ঃ "রবিবাবু ঠাকুরকে আক্রমণ করেছেন ? কেন ?"

গিরিশচন্দ্রের সবিস্ময় প্রশ্নের উত্তরে কুমুদ-বন্ধু সেন 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করে ভাবগত দিকটি বোঝাতে উদ্যোগী হন। বলেন ঃ "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলেছেন, বিদেশী ভাবুকেরা প্রতিমাপূজার সম্বন্ধে যে ভাবের কথা বলে থাকেন তাঁরা ভাবুক, তাঁরা পূজক নন। তাঁরা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোন মূর্তিকে দেখছেন ততক্ষণ তাঁরা চরম করে দেখেন না। কিন্তু যাঁরা পূজক তাঁরা বিশেষ মূর্তিকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন। জ্ঞান-স্বরূপ অনন্তের এই একটি মাত্র রূপকেই চরম করে দেখছেন। তাঁদের ধারণাকে তাঁদের ভক্তিকে বিশেষ রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন না।"

সেখানে উপস্থিত ডাক্তার কাঞ্জিলাল শ্রীসেনকে আবার প্রশ্ন করেন ঃ "কিন্তু ঠাকুরের কথা রবিবাবু কি বলেছেন ?"

কুমুদবন্ধু এই প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে সচেষ্ট হন, বলেন ঃ "তিনি

(রবীন্দ্রনাথ) বলেছেন যে, এই রূপের বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে তার দৃষ্টান্ত-রূপ তিনি লিখেছেন যে, তিনি শুনেছেন, শক্তি উপাসক কোন একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালার সিংহকে বিশেষ করে দেখবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন কেননা সিংহ মায়ের বাহন। রবিবাবু বলেন যে, শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করতে দোষ নেই কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে দেখলে কল্পনার মহত্ত্বই চলে যায়। কেননা, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ দেখায়, সেই কল্পনা সিংহে শেষ হয় না বলে তার রূপ উদ্ভাবনকে সত্যি বলে গ্রহণ করা যায়—যদি তা কোন এক জায়গায় এসে বদ্ধ হয়, তবে তা মিথ্যে—মানুষের শত্রু।"

এই ব্যাখ্যা শুনে গিরিশবাবু কুমুদবন্ধুকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ "এখানে সিঙ্গিকে (সিংহ) শক্তিরূপে দেখা হলো কোথায় ?" কুমুদবন্ধু বললেন ঃ "ঐ যে পরমহংসদেব বলেছিলেন সিংহ মায়ের বাহন।"

গিরিশবাবু এবার জানতে চান ঃ "এর মানে কি সিঙ্গি সেই মহাশক্তির রূপ ? তুমি যে বললে রবিবাবু বলেছেন যে, শক্তিকে সিঙ্গিরূপে কল্পনা করতে দোষ নেই, কিন্তু সিঙ্গিকেই শক্তিরূপে দেখলে কল্পনার মহত্ত্বই চলে যায়।—এটা যে কি তা তিনি বোধ হয় নিজেই ভাল করে প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর বলবার উদ্দেশ্য কি সিঙ্গিকে শক্তির প্রতীক বলে কল্পনা করতে পার, কিন্তু সিঙ্গিই শক্তির রূপ এই কল্পনা করলেই দোষ ? এর মানে কি ? সিংহ মায়ের বাহন এর ভিতর তার কি সম্বন্ধ ? কোন হিন্দু কি কখনো সিংহকেই স্বয়ং মহাশক্তি বলে কল্পনা করে থাকে ? পূজা করা তো দূরের কথা !"

কুমুদবন্ধু সেন বলেন ঃ "রবিবাবু প্রতিমার পূজাকেই দোষ দিচ্ছেন—মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরম শত্রু মনে করছেন এবং পূজাকে ভাবের কল্পনা বলে স্বীকার করতে চান না।"

এসময় ডাক্তার কাঞ্জিলাল আবার প্রশ্ন করেন ঃ "কেন? সাধকদের হিতের জন্য তো ব্রহ্মরূপ কল্পনা হয়েছে।" তখন কুমুদবন্ধুবাবু আলোচনার সূত্র গ্রথিত করেন ঃ "রবিবাবু বলেন যে, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে যে-রূপ যে-সৃষ্টি ব্যক্ত করতে থাকে—তা বদ্ধ রূপ নয়—তা প্রবাহ-শীল—তা বহু। কিন্তু সত্য সুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখন কোন লোক বিশেষ দেশকালপাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করতে যায়, তখনি তা সত্য সুন্দর মঙ্গলকে বাধাপ্রাপ্ত করে—তখনই সে অবনতির পথে যায়।"

রবীন্দ্র-ভাবনার এই ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ গিরিশ-চন্দ্রকে তৃপ্ত করতে পারেনি বরং এটা খণ্ডিত ভাবনা বলেই তাঁর মনে হয়েছে। তাই গিরিশচন্দ্র বলেন ঃ "হিন্দুও তাই বিগ্রহের রূপকে নিত্য রূপ বলে মনে করে—কেননা যা সত্য সুন্দর ও মঙ্গলকে ব্যক্ত করতে থাকে তা বদ্ধরূপ নয়—তা একরূপ নয়—অনন্তের অনন্তরূপ। শুধু রূপকে তো একটা জড়রূপ বলে পূজা করা হয় না, সেই রূপের ভেতর অরূপেরই পূজা হয়। মৃন্ময় প্রস্তর কিংবা ধাতুনির্মিত বিগ্রহকে সেবক চিন্ময়ভাবে গ্রহণ করে। পূজা তো কল্পনা ছাড়া নয়। তা তো প্রবাহশীল—তার শক্তি নানামুখী। ভাবগ্রাহী জনার্দন, এটা তো সবাই জানে। ভাব ছাড়া পূজা কোথায়? ভাব দিয়ে কল্পনা দিয়ে পূজা হয়। শুধু জড়রূপ জড়বস্তু আর চর্মচক্ষুর সম্বন্ধ নয়।"

গিরিশচন্দ্রের বক্তব্য শোনার পর কুমুদবন্ধু সেন বললেন ঃ "রবিবাবু তা স্বীকার করতে চান না। তিনি বলেন যে, শিক্ষিত লোক যখন প্রতিমা-পূজাকে সমর্থন করেন তখন তিনি বলে থাকেন, প্রতিমা জিনিসটা আর কিছু নয়, ভাবকে রূপ দেওয়া। মানুষের ভিতর যে-বৃত্তি শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করে প্রতিমাপূজাও তেমন যেন একটা বৃত্তির কাজ।"

গিরিশচন্দ্র কবির বক্তব্য সঠিকভাবে অনু-ধাবন করার জন্যই যেন প্রশ্ন করেন ঃ "কি বলছ ? রবিবাবু কি লিখেছেন?" জবাবে কুমুদবন্ধু সেন বললেন ঃ "তিনি তাঁর 'রূপ ও অরূপ'-এ বলেছেন যে, দেবমূর্তিকে উপাসক কখনো সাহিত্য হিসাবে দেখেন না।" রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য কুমুদবন্ধু-বাবুর বয়ানে শুনে গিরিশচন্দ্র কিছুটা নির্লিপ্ত-

ভাবে জানালেন : "এটা সবাই জানে, এ কাউকে বলে দিতে হয় না। কিন্তু ভাবকে রূপ দেওয়া কি বলছিলে ?"

কুমুদবন্ধু সেন এবার আরেকটু স্পষ্ট করেই বলেন : "রবিবাবু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে, প্রতিমা ভাবকে রূপ দেওয়া নয়। তিনি দেবীমূর্তি কল্পনা আর সাহিত্যের কল্পনা এক নয় বলেছেন। কেননা কল্পনাকে মুক্তি দেবার জন্য সাহিত্যে রূপের সৃষ্টি আর দেবীমূর্তি কল্পনাকে বন্ধ করার জন্য।" রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বুঝিয়ে বলার জন্য কুমুদবন্ধু সেন আরও বলেন : "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলেন কল্পনাকে তখনই কল্পনা বলে জানা যায় যখন তার প্রবাহ থাকে—যখন তার গতি থাকে—যখন তার সীমা ঠিক থাকে না—তখনি কল্পনা সত্যি কাজ করে। সেই কাজ রবিবাবু বলেন—সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করা।"

গিরিশচন্দ্র বললেন : "এটা ঠিক হয় না। কিন্তু কল্পনা—কল্পনা। সাহিত্যে শিল্পে যে-কল্পনা সত্য শিব সুন্দরকে নির্দেশ করে দেব-পূজাও সেই কল্পনার অনুগামী হয়ে তার ইষ্টচিন্তা করে, সেই সত্য শিব মঙ্গলের ধ্যান করে। পূজার মন্ত্র অনুষ্ঠানপদ্ধতি কি শুধু জড়বস্তুকে নির্দেশ করে ? এই সর্বব্যাপী মহা-শক্তির উদ্বোধন করে না ? আবাহন, 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' তবে কি ?"

কুমুদবন্ধু সেন কবির বক্তব্যকে আবার স্পষ্ট করে উপস্থাপিত করার জন্য বললেন : "কিন্তু কল্পনা যখন থেমে গিয়ে কেবলমাত্র একটা রূপেই একান্তভাবে আবদ্ধ থাকে তখন আর রূপের অনন্ত সত্যকে দেখায় না—রবিবাবু তাই বলেছেন।" গিরিশচন্দ্র প্রশ্ন করেন : "কিন্তু কল্পনা থামে কোথায় ? হিন্দুর প্রতিমাপূজায় যে রূপকে ভাব দেওয়া হয়নি আর কল্পনায় যে সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করে না তা তিনি জানলেন কি করে ? হিন্দুর দেবমূর্তির রূপ যে সত্য সুন্দর শিবকে ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে নয় তা তিনি জানলেন কি করে ? সে সাধনা কি তিনি করে দেখেছেন ? আর তিনি একজন এতবড় কবি, তিনি জানেন না ভাবে রূপ ফুটে ওঠে ? ভাব, তাতো একান্তভাবে কোথাও বন্ধ হতে পারে না।"

কুমুদবন্ধু যেন গিরিশচন্দ্রের বক্তব্যকেই সরলতর করার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে টেনে নিয়ে এলেন। বললেন : "রবিবাবু তাঁর 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধেই স্বীকার করেছেন, সাহিত্য শিল্পকলার ভাবরূপে ধরা দেয় বটে, কিন্তু রূপে বন্ধ হয় না; তাতে নবনব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করতে থাকে। তাই প্রতিভাকে 'নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি' বলা হয়, প্রতিভা রূপে বন্দী থাকে না—তার কাজ শুধু রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করা। এইজন্য প্রতিভার নব নব উন্মেষের শক্তি থাকা চাই।" কবির বক্তব্যকে অনুসরণ করেই গিরিশচন্দ্র যোগ করেন : "যে-কোন প্রতিমাপূজক-সাধকের সাধন-কাহিনী আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, সাধকের পূজা রূপ দিয়ে সাধকের চিত্তকে বিকাশ করে নিত্যনূতনভাবে নূতন কল্পনার প্রবাহে।... কল্পনা ছাড়া কি পূজা কখনো করা যায় ? মানস-পূজাটা কি ? মানসধ্যান কি ? ভাব ছাড়া কি ভাবময়কে ভাবা যায় ? রবিবাবুর মতো ভাবুক কবি যে রূপে অরূপের সন্ধান পান না, ব্যক্তের ভিতর অব্যক্তের আভাস দেখতে পান না এটাই বেশি আশ্চর্য।"

তারপর গিরিশচন্দ্র কিছুটা ব্যথিতচিত্তে বলেন : "ঠাকুরের সাধনার ওপর, ভাবের ওপর রবিবাবুর এই নিরর্থক কটাক্ষ একেবারে হাওয়ার ওপর তাঁর কবিকল্পনা। যিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থকেই সেই ব্রহ্মবস্তু-মহাশক্তির বিকাশ দেখতেন, মহাভাবে সমাধিস্থ থাকতেন, শ্যামল তৃণরাশি পদদলিত দেখলে যিনি নিজের দেহে বেদনা বোধ করতেন, কোন মূর্তি, কোন মন্দির —সৃষ্টির যেকোন স্থানে শক্তির ভাবের বিশেষ দেখলে, যিনি তৎক্ষণাৎ অরূপের ভাবসাগরে ডুবে যেতেন, ব্রাহ্মভক্তরাও যাঁকে একাধারে শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক যোগী বলে নির্দেশ করেছেন, তাঁকে শুধু শক্তির উপাসক, ভক্ত বলে উল্লেখ করা উদারতার পরিচায়ক হয়নি।"

স্বীয় আবেগে গিরিশচন্দ্র বলতে থাকেন : "কেশববাবুর মতো মহাপুরুষ ও নিরাকার সাধকও যাঁর অসাম্প্রদায়িক ভাব দেখে অনুসরণ করে নিজের ভাবে মিশিয়ে 'নববিধান' প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁকে একজন শাক্তভক্ত মাত্র বলা সমীচীন হয়নি। কবিত্বের অনুভূতি আর ব্রহ্মানুভূতি এক নয়। কিন্তু তিনি যে পরমহংসদেবের ওপর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাও সম্পূর্ণ ভুল। তিনি (পরমহংসদেব) শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলেন, মায়ের বাহন দেখলাম, আর কি দেখব? তার অর্থ কি রবিবাবু এমন নিজের মনগড়াভাবে গ্রহণ করতে পারেন ? তাঁকে পশুশালায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে সিংগকে দেখে বলেছিলেন— মায়ের বাহন পশুরাজ দেখলাম—আর কি ?"

গিরিশচন্দ্র সম্ভবতঃ এব্যাপারে কিছুটা ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে বলতে থাকেন : "যেমন সূর্যের আলো দেখলে জোনাকির আলো কে দেখতে চায়—ঠাকুর সেইভাবে অন্য পশু দেখতে যাননি। যিনি নিখিল পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ববস্তুকে বিশেষ বিশেষ শক্তি প্রকাশে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখতেন, সেইভাবে যিনি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' দর্শন করতেন, তাঁর সেই অনুভূতির দোষ দেখানো, যিনি যত বড় সাহিত্যিক হোন-না-কেন, তা তাঁর অনধিকার চর্চা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি গিরিশচন্দ্রকে ব্যথিত করেছিল, ক্ষুব্ধও করেছিল। পরিস্থিতি বুঝেই কুমুদবন্ধু যোগ করেন : "কিন্তু বিচার করতে দোষ কি ?" বিচার করার প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বললেন : "বিচার করতে হলে প্রথমে জীবন আগাগোড়া আলোচনা করতে হয়। তাঁর কিছু জানলাম না আর মাঝখান থেকে একটা কথা টেনে নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করাকে সত্যানুসন্ধিৎসা বলে না। আর তিনি যখন কবি, তিনি তো নিজে প্রত্যহ এই প্রকৃতির ভিতর রূপের পূজা করে থাকেন, শিবের রূপে প্রকৃতির রূপ গড়ে কবিতা রচনা, তা কি রূপের পূজা নয় ? অধিকার ভেদে কেহ ক্ষুদ্র রূপে তন্ময়, কেহ বিরাট রূপে তন্ময়। কিন্তু অরূপ আলোয় যেতে গেলে সেই রূপের ভিতর দিয়ে সেই রূপের পূজা করে অরূপকে খুঁজতে হবে—সেই রূপ দিয়ে অরূপকে পেতে হবে।" এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের 'পৌত্তলিকতা'র বিরুদ্ধে এবং মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা অসঙ্গত মনে হয়। কেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শকে আড়াল করে শুধু তাঁকে শক্তিসাধক বলে চিহ্নিত করলেন ?

দেবমূর্তির রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথও যে অরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন, পুতুল-প্রতিমার মধ্যে পেয়েছিলেন মহত্তর ভাব এবং মৃন্ময়ীকেই আবিষ্কার করেছিলেন চিন্ময়ী সত্তায়, তা আমরা একটি ঘটনা থেকেই বুঝতে পারি। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাদেবীকে একটা চিঠি লেখেন—যে-চিঠিতে তিনি দুর্গাপূজার তাৎপর্য এবং দুর্গাপ্রতিমার মহিমা বর্ণনা করেন। এখানে সেই চিঠি থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "যেটাকে আমরা দূরে থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল-আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে।... হৃদয়ের ভিতর দিয়ে কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়—তাদের সীমা পাওয়া যায় না।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে চরম সত্যটি উচ্চারণ করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : "এই কারণে বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে, ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।"

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের পর তাঁরই লেখা 'রূপ অরূপ'-এর বক্তব্য কি স্ববিরোধী চিন্তার ফসল বলে মনে হয় না ? মূর্তি যে নিছক মাটির পুতুল নয়, এর পিছনে যে একটা গভীর ভাব, একটা অরূপচেতনা বর্তমান—সেটাই তো সনাতন ধর্মের বক্তব্য। তাহলে আর রবীন্দ্রনাথ অহেতুক কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্ধ করলেন বিদ্রূপ কটাক্ষে ?

স্মৃতিকথা

মীরাটে স্বামীজী

নৃপবালা পাল

নৃপবালা পালের স্মৃতিকথাটি উদ্বোধন কার্যালয় থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত এই স্মৃতিকথাটি অবশ্য সংগৃহীত হয়েছিল অধুনা অমুদ্রিত স্বামী নির্লেপানন্দের 'স্বামীজীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন' গ্রন্থ থেকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্বামী নির্লেপানন্দ বেশ কিছুকাল আগে স্বামীজীর সান্নিধ্য-প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিকথা সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলির অধিকাংশই 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়, পরে কয়েকটি 'সুদর্শন' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত (পৌষ, ১৩৪১) স্বামী নির্লেপানন্দের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে' গ্রন্থে সেগুলির কয়েকটি এবং তার প্রায় তেত্রিশ বছর পরে (বৈশাখ, ১৩৭৪) করুণা প্রকাশনী প্রকাশিত স্বামী নির্লেপানন্দের 'স্বামীজীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন' গ্রন্থে সংগৃহীত স্বামীজী-সম্পর্কিত সমস্ত স্মৃতিকথা অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রন্থদুটির সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন কলকাতার করুণা প্রকাশনী। বর্তমানে দুটি গ্রন্থই অমুদ্রিত। করুণা প্রকাশনীর সহৃদয় অনুমোদনক্রমে 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী' গ্রন্থে আমাদের সংগৃহীত অন্যান্য স্মৃতিকথার সঙ্গে স্বামী নির্লেপানন্দ সংগৃহীত স্মৃতিকথাগুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী' গ্রন্থে নৃপবালা পালের স্মৃতিকথাটি পরিশিষ্টে দেওয়ার কারণ স্বামী নির্লেপানন্দ তাঁর গ্রন্থে নৃপবালার নাম উল্লেখ করেননি। তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে শুধু জানিয়েছিলেন: "মীরাটের ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের প্রথমা কন্যা। স্বামীজীদের পরিব্রাজক অবস্থায় মীরাট-পর্ব মধ্যে [স্বামীজীর] সঙ্গলাভ করেন। পরে তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীশিষ্য] দেবেন্দ্র মজুমদার কর্তৃক দীক্ষিত হন।" ফলে 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে নৃপবালা পালের নাম অনুল্লিখিত থাকে, শুধু বলা হয়, 'মীরাটের ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের প্রথমা কন্যা'। এক বছরের মধ্যে গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের সময় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী এবং ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু আমাদের জানান যে, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের প্রথমা কন্যার নাম নৃপবালা ঘোষ। পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থটিতে পুনর্মুদ্রণকালে তাঁর নাম দেওয়া হয়। পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থটি প্রকাশের পর গোরাচাঁদবাবু ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের চতুর্থ ও কনিষ্ঠা কন্যা শশিবালা কুমারের একমাত্র পুত্র বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ্ ডঃ গুরুদাস কুমারকে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। ডঃ কুমার জানান যে, তাঁর বড় মাসিমার নাম নৃপবালা ঠিকই, তবে বিবাহের পর তাঁর উপাধি হয়েছিল পাল। ডঃ কুমার তাঁর মা ও মাসিমাদের কাছে শোনা স্বামীজীর মীরাটবাস সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু তথ্য আমাদের কাছে বলেন। তাঁকে অনুরোধ করায় তিনি সেসব লিখিতভাবে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য আমাদের কাছে পরে দিয়েছেন। নৃপবালা পালের স্মৃতিকথার 'সংযোজন' হিসাবে আমরা এখানে ডঃ কুমারের লেখা উপস্থাপন করলাম। ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, তাঁর ভাই প্রসন্নকুমার ঘোষ, তাঁর চার কন্যা এবং তাঁর মীরাটের বাড়ির ফটো ডঃ গুরুদাস কুমারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য কেউ কেউ মীরাটের ঘোষ পরিবারকে 'মীরাটের হোল পরিবার' বলে অভিহিত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার চন্দননগরের মানুষ ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ উত্তর প্রদেশের মীরাটে সরকারি হাসপাতালে সহকারী শল্য-চিকিৎসক ছিলেন। (চন্দননগরে তাঁদের সাত ভাইয়ের বাড়ি 'Seven Brothers' Lodge' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।) শল্য-চিকিৎসক হিসাবে তিনি মীরাটে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি স্বামীজী হৃষীকেশ থেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে মীরাটে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাড়িতে এসে ওঠেন। তার কিছুদিন আগে থেকেই স্বামী অখণ্ডানন্দ অসুস্থ অবস্থায় সেখানে অবস্থান করছিলেন।—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বাঁদিক থেকে (বসে) :
ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের প্রথমা কন্যা নৃপবালা (পাল), চতুর্থা কন্যা শশিবালা (কুমার), দ্বিতীয়া কন্যা কিরণবালা (হালদার)।

(দাঁড়িয়ে) :
তৃতীয়া কন্যা রসবালা (ঘোষ)।

বাঁদিক থেকে :
প্রতিভা (শশিবালার একমাত্র কন্যা), ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, বীণাপাণি (নৃপবালার প্রথমা কন্যা), প্রসন্নকুমার ঘোষ (ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের সহোদর)।

বাঁদিক থেকে (বসে):
কিরণবালা, শশিবালা, নৃপবালা।
(দাঁড়িয়ে): রসবালা।

ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের মীরাটের বাসভবন যেখানে স্বামীজী এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ কিছুদিন ছিলেন।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকের কথা। আমরা ছোট তখন। আমাদের পিসিমা বলতেন ঃ "তোমরা ওঁদের বিরক্ত করো না। ওঁরা শান্তভাবে আপনাদের ধ্যান-পাঠ করছেন।" কিন্তু আমাদের খুব ভালবাসতেন, কাছে ডাকতেন। বাবা ছিলেন স্বামীজীদের চেয়ে বয়সে বড়। স্বামীজী বাবার সামনে তামাক খেতেন না। বাগানের দিকে একধারে এক ঘরে তক্তপোষের ওপর বসে খুব তামাক খেতেন। হাসতে হাসতে বলতেন ঃ "বাবাকে যেন বলিসনি।" তখন তিনি তপস্বী, পরন্তু সদা আনন্দময়। আমাদের দু-বোনকে নিকষা মাসি, শূর্পনখা মাসি বলে খেপাতেন। আমরা রেগে গেলে বলতেন ঃ "তোরা চটিস কেন? ওরা দুজনে কি কম? স্বয়ং লক্ষ্মণ যার নাক কেটেছেন; বিভীষণ একজনের ছেলে।" চাটনি পরিবেশনের সময় মজা করতেন— "দেখিস যেন লাল না পড়ে দিতে দিতে।" বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তুড়ি দিয়ে গান গাইতেন। আলু কলাইশুঁটি সেদ্ধ জামবাটি ভরে খেতেন শীতকালে আগুন পোয়াতে পোয়াতে। এই সময় গঙ্গাধর মহারাজকে (স্বামী অখণ্ডানন্দকে) আমরা 'ছোট স্বামীজী' বলতাম। ছিপছিপে চেহারা, অদ্ভুত স্মরণশক্তি। খড়ের গাদার ওপর উঠে একলাটি বসে থাকতেন। স্বামীজী আমাদের বলতেন ঃ "কেন একলা বসে আছে জানিস? ওর মা-মাসির জন্য চুপি চুপি কাঁদছেরে! কেউ দেখতে না পায়! কান্না কেন বাপু? দেশে গিয়ে দেখে এলেই হয়। তারা বোধকরি যেতে মানাই করেছে। আর এখান থেকে যাবেই বা কি করে? এমন খ্যাটের বহর কোথায় পাবে?" শুনে হো হো হাসি সবাই মিলে। আমরা সবাই যেন একটা সুবৃহৎ পরিবার। সাধু বলে সংকোচ হতো না, পিসিমার হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও। ঘরের লোক, আপনজন মনে হতো।

স্বামীজী লাইব্রেরী থেকে বড় বড় বই আনাতেন, একদিনেই ফেরৎ দিতেন। একবার গ্রন্থাধ্যক্ষ এসে বললেনঃ "মশাই, এসব বই একমাসে কেউ শেষ করতে পারে না। আর আপনি একি করছেন?" স্বামীজী বললেন ঃ "এসব বই থেকে আপনার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।" তিনি পরখ করে অবাক।

স্বামীজীর দুখানি গাওয়া গান মাঝে মাঝে মনে আসে—"ভজন পূজন কিছুই নাহি জানি, জানি মা তোর চরণ সার" এবং "পরাণপুতুলি মোর উমা হর রমা।"

গুরুদাস কুমারের সংযোজন

আমার মা ও মাসিমাদের কাছে শুনেছি, উত্তরভারতে হিমালয় ভ্রমণকালে স্বামীজী একবার হৃষীকেশে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দৈবকৃপায় সংকট কেটে গেলে এবং কিছুটা সুস্থ হলে তিনি গুরুভাইদের সঙ্গে দেরাদুন এবং সাহারানপুর হয়ে মীরাটে আমার দাদামশাই ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। আমার দাদামশাই ছিলেন মীরাটের একজন খ্যাতনামা শল্য-চিকিৎসক। স্বামীজী মীরাটে আসার আগেই স্বামী অখণ্ডানন্দজী আমার দাদামশায়ের চিকিৎসাধীনে থেকে তাঁরই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। স্বামীজী এবং তাঁর কয়েকজন গুরুভাই অখণ্ডানন্দজীর খবর পেয়ে তাঁকে দেখবার জন্য আমার দাদামশায়ের বাড়িতে আসেন। মা ও মাসিমাদের মুখে শুনেছি, স্বামীজীরা যখন দাদামশায়ের গৃহে উপনীত হন তখন ছিল শীতের সন্ধ্যা। এতজন সন্ন্যাসী একত্রিত হওয়াতে দাদামশায়ের গৃহে হুলুস্থুল পড়ে যায়। নানা তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে দীর্ঘকাল পরে গুরুভায়েরা একত্রে মিলিত হলে স্বামীজীরাও সকলে আনন্দে মেতে

স্বামীজীর শরীর তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। ঠিক হয়, চিকিৎসার জন্য স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে দাদামশায়ের গৃহে অবস্থান করবেন। অন্যান্য সাধুদের জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা হলো। তাঁরা প্রথমে কয়েকদিন মীরাটে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে থেকে পরে সেখান থেকে মীরাটেই শেঠজীর বাগানে চলে যান।

দাদামশাই ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ শুধু একজন প্রখ্যাত চিকিৎসকই ছিলেন না—অতি

সৎ এবং হৃদয়বান ব্যক্তি হিসাবেও তিনি মীরাটের জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসার গুণে অচিরেই স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে তিনি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ওঁদের দুজনকে দাদামশাই বলতেন ঃ "আপনারা ইঁদারা থেকে জল তুলবেন না। আগে শরীরটা সেরে নিন।" দিন পনের পর সুস্থ হয়ে স্বামীজী এবং অখণ্ডানন্দজী শেঠজীর বাগানে গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হন। মীরাটের শেঠজীর বাগান তখন 'দ্বিতীয় বরানগর মঠ'-এ পরিণত হয়।

স্বামীজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের পাদস্পর্শে দাদামশায়ের গৃহাঙ্গন পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়। মায়ের মুখে শুনেছি, দাদামশায়ের নির্দেশ ছিল মঠের কোন সাধু-সন্ন্যাসী তাঁর গৃহে এলে যেন কখনো ফিরে না যান—মীরাটে তাঁর গৃহেই তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতো। স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গে যখন শেঠজীর বাগানে অবস্থান করছিলেন, তখন দাদামশায়ের বাড়ি থেকে প্রতিদিন তাঁদের জন্য সিধা পাঠানো হতো। স্বামীজীও ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে প্রতিদিন দাদামশায়ের ঘরে প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন। পরবর্তী কালে বেলুড় মঠের বহু সাধু মীরাটে এসে দাদামশায়ের ঘরে অতিথি হয়েছেন। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী অচলানন্দ, আরও অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ঠাকুরের গৃহীশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মীরাটে দাদামশায়ের গৃহে অতিথিরূপে বাস করেছেন।

দাদামশায়ের আদিনিবাস ছিল হুগলী জেলার চন্দননগরে। তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁর চার কন্যা, যথা—নৃপবালা, কিরণবালা, রসবালা ও শশিবালা। আমি দাদামশায়ের কনিষ্ঠা কন্যা শশিবালার একমাত্র পুত্র। স্বামীজী যখন মীরাটে দাদামশায়ের বাড়িতে ছিলেন, আমার মা তখন খুবই ছোট। মা স্বামীজীর কোলে উঠেছেন। মাকে কোলে বসিয়ে স্বামীজী চা খেতেন। মা বলতেন, স্বামীজী খুব কড়া চা খেতেন।

মায়ের মুখে শুনেছি, স্বামীজী আমার বড় দুই মাসিমাকে নিয়ে খুব মজা করতেন। কাউকে 'শূর্পনখা মাসি', কাউকে 'নিকষা মাসি' বলে খেপাতেন। আনন্দময় পুরুষ—সময় সময় এমন এক-একটি কথা বলতেন যে, বাড়িময় আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত।

দাদামশায়ের পুত্রসন্তান না থাকায় মায়ের পিসিমার (দাদামশায়ের বিধবা ভগ্নীর) মনে একটা বিশেষ দুঃখ ছিল। একদিন পিসিমা খুব কাকুতি মিনতি করে স্বামীজীর কাছে দিদিমার জন্য মাদুলি প্রার্থনা করেন, যাতে দিদিমা পুত্রমুখ দর্শন করে 'পুৎ' নামক নরক থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। স্বামীজী বললেন ঃ "মুশকিল হলো এই যে, আমরা 'মাদুলে সাধু' নই।" মা বলতেন, পিসিমা কেমনভাবে দাঁড়িয়ে, কতখানি আর্তস্বরে, কিরকম কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—স্বামীজী গুরুভাইদের কাছে তা অভিনয় করে দেখাতেন। আর সকলে হেসে লুটোপুটি খেতেন। মা বলেছিলেন ঃ "আমরা কোনদিন বেলুড় মঠে এলে মঠের মহানুভব সন্ন্যাসিবৃন্দ আমাদের প্রতি যে অফুরন্ত স্নেহ এবং করুণা প্রদর্শন করতেন তা চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকবে।" ব্রহ্মানন্দজীর কথা মা বেশি করে বলতেন। বেলুড় মঠে প্রথম মাকে ও মাসিমাদের দেখে ব্রহ্মানন্দজী উল্লাসভরে বলেছিলেন ঃ "ওরে, স্বামীজীর মাসিরা মঠে এসেছে—দেখ, দেখ, এদের খুব করে আদর-যত্ন কর।"

স্বামীজীদের মীরাটে থাকাকালীন দাদামশায়ের কনিষ্ঠভাই প্রসন্নকুমার ঘোষ স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে প্রায়ই তর্ক-বিচার করতেন। স্বামীজীর সঙ্গে তর্কজাল বুনতে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর তর্কের সাধ মিটে যেত। তিনি বলতেন ঃ "স্বামীজী জ্ঞানের জাহাজ!" একদিন স্বামীজী প্রসন্নকুমারকে বলেছিলেন ঃ "আপনি ঠাকুরকে চিন্তা করবেন। আপনার অভাব তিনি পূর্ণ করবেন।" সেই সময় একরাত্রিতে প্রসন্নকুমার স্বপ্নে দেখতে পান, ঠাকুর সর্বাঙ্গে ময়লা মেখে নাচতে নাচতে তাঁর কাছে এসে বলছেন ঃ "আমায় কোলে কর।" তাঁর দেহে ময়লা দেখে প্রসন্নকুমার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অমনি ঠাকুরও অন্তর্হিত হলেন। এই কাহিনী শুনে

স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন ঃ "আপনার ঘরে ঠাকুরের আসতে এখনো বিলম্ব আছে।"

আমার মা বলতেন, দাদামশায়ের মীরাটের বাড়িতে বহু ওস্তাদ আসতেন। দাদামশাই উচ্চাঙ্গ ও ভজন সঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিলেন। স্বামীজীর গানের গলা ছিল অপূর্ব। প্রায়ই সন্ধ্যায় বাড়িতে গানের আসর বসত। স্বামীজী ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গাইতেন। বাড়ি যেন তখন গন্ধর্বলোক হয়ে যেত। মায়ের মুখে শুনেছি, স্বামীজীরা চলে যাবার কয়েক বছর পরে একদিন হঠাৎ দাদামশাই বাড়ির মধ্যে এসে আনন্দ ও উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। শিকাগো বিজয়ের পর স্বামীজীর সংবাদ ও ছবি তখন ভারতের পত্র-পত্রিকায় বেরোতে শুরু হয়েছে। দাদামশাই সেসব দেখে-শুনে বুঝলেন যে, কাকে তিনি নিজের ঘরে রেখে চিকিৎসা করেছিলেন। প্রায় চিৎকার করেই তিনি বাড়ির সকলকে বলেছিলেন ঃ "ওরে কি আশ্চর্য! দ্যাখ, দ্যাখ, যেসব ছোকরা সন্ন্যাসী এবাড়িতে ছিলেন, জানিস তারা কত বড়, কত অসাধারণ! খবরের কাগজে বেরিয়েছে। এবাড়ি ধন্য! আমরা সবাই ধন্য! মীরাট শহর ধন্য!"

মাসিমারা বলতেন ঃ "স্বামীজীর মতো সুদর্শন মানুষ কখনো দেখিনি। দেবতার মতো চেহারা! আর তাঁর চোখ ছিল অপূর্ব সুন্দর। পদ্মপলাশলোচন! স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাই-রাও—যাঁদের আমরা দেখেছি—সুন্দর দেখতে ছিলেন, তবে স্বামীজী ছিলেন তুলনাহীন—যেমন আকৃতিতে তেমনই ব্যক্তিত্বে।"

প্রবন্ধ

শারদোৎসবে শ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

"বাবুরামের মার বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে! জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গাপুজো করতে বসেছে!"[১]—আমেরিকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে। সময় ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ। বাবুরাম মহারাজের (শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দের) মা অর্থাৎ মাতঙ্গিনীদেবীর বাড়ি হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে। আঁটপুরে মাতঙ্গিনীদেবীদের পারিবারিক দুর্গামণ্ডপে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হতো। বিভিন্ন কারণে এই পুজো বেশ কয়েক বছর বন্ধ ছিল। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে মাতঙ্গিনীদেবীরা স্থির করলেন যে, তাঁরা আবার পুজো শুরু করবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর উপরোক্ত মন্তব্য। স্বামীজীর মন্তব্যের ফলেই কিনা জানি না, তবে বাবুরাম মহারাজের মা ঐ বছর (ইং ১৮৯৪ খ্রীঃ ঃ বাংলা ১৩০১ সাল) 'জ্যান্ত দুর্গা'র পুজোই করেছিলেন। 'জ্যান্ত দুর্গা' বলতে স্বামীজী বুঝিয়েছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীকে। তাঁরই দিব্য উপস্থিতিতে সেবার আঁটপুরে ঘোষদের দুর্গা-মণ্ডপে যেমন 'মাটির দুর্গা'র পুজো সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীমাও পূজিতা হয়েছিলেন ঐ আঁটপুরেই। মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসি-সূত্রে জানা যায় যে, ঐ বছর (১৩০১ সাল) শ্রাবণ মাসে একদিন মাতঙ্গিনীদেবী বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে প্রার্থনা জানালেন ঃ "মা, তুমি যদি অনুমতি দাও, তবে ছেলেরা (বাবুরাম মহারাজের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর তুলসীরাম ঘোষ ও শান্তিরাম ঘোষ) এবার থেকে বছর বছর দুর্গা-পুজো করতে চায়।" সানন্দে সম্মতি জানিয়ে শ্রীমা বললেন ঃ "ছেলেরা পুজো করতে চায়, এতো

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪৩

আনন্দের কথা।" ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মাতঙ্গিনী-দেবী পুনরায় প্রার্থনা জানালেন: "তোমায় সামনে থেকে যে পুজো দেখতে হবে মা।" সে-প্রার্থনাতেও মাথা নেড়ে শ্রীমা সম্মতি দিলেন।

দুর্গাপুজো এসে গেল। আঁটপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন মাতঙ্গিনীদেবী এবং শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীদ্বয়—গোলাপ-মা ও যোগীন-মা। সঙ্গে চললেন কৃষ্ণভাবিনী (মাতঙ্গিনীদেবীর কন্যা ও বলরাম বসুর স্ত্রী), শান্তিরামবাবু, স্বামী সদানন্দ এবং আরও কয়েকজন। হাওড়া থেকে মার্টিন রেলে হরিপাল স্টেশন। সেখান থেকে পালকি করে শ্রীমা পৌঁছালেন আঁটপুরে। পালকিতে শ্রীমায়ের সঙ্গে ছিলেন তুলসীরামবাবুর পাঁচ বছরের বালকপুত্র হরেরাম। অন্য সকলে গরুর গাড়িতে করে আঁটপুরে এলেন।[২]

তুলসীরামবাবু উড়িষ্যায় ছিলেন বলে পুজার ভার ছিল শান্তিরামবাবুর ওপর। শ্রীমায়ের দিব্য উপস্থিতিতে ঘোষেদের দুর্গামণ্ডপে[৩] দুর্গাপুজো আরম্ভ হলো মহাসমারোহে। স্বয়ং মহামায়া শ্রীমায়ের উপস্থিতিতে সৃষ্টি হলো এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে শ্রীমা ও ঘোষেদের বাড়ির অন্যান্য মহিলারা পুষ্পাঞ্জলি দিলেন মা-দুর্গার শ্রীপাদপদ্মে। আবার এই তিনদিনই ঘোষেদের বাড়ির সকলে শ্রীমায়ের পাদপদ্মেও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে 'জ্যান্ত দুর্গা'র পুজো করার মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের মা মাতঙ্গিনীদেবীর দুর্গাপুজো করা সার্থক হলো। তিনিই প্রথম 'জ্যান্ত দুর্গা'র পুজো করেছিলেন। স্বামীজীর স্বপ্ন সফল হলো।

শ্রীমায়ের অনুমতিতে ও উপস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রথম প্রতিমায় দুর্গাপুজো করেছিলেন ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে।[৪] মঠে সে কি আনন্দের হিল্লোল। শ্রীমায়ের আগমনে সৃষ্টি হয়েছিল এক অপূর্ব স্বর্গীয় পরিবেশ। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে মঠভূমি মুখরিত। শ্রীশ্রীমহামায়ার অর্চনায় স্বয়ং শ্রীশ্রীমহামায়ার উপস্থিতি। আবার অন্যদিকে রয়েছেন মহামায়ার সন্তানেরা—শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদবর্গ। সাধু-ব্রহ্মচারি-ভক্তদের মনে পরম পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীমা, মা ভবতারিণী ও নিজ জননী চন্দ্রমণি অভেদ। তিনি স্বয়ং শ্রীমাকে ষোড়শীরূপে পুজো করে সব সাধনার ফল শ্রীমায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের কাছে শ্রীমা-ই ছিলেন নরদেহে আদ্যাশক্তি, মহামায়া, দুর্গা। 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীমায়ের উপস্থিতি ব্যতীত দুর্গাপুজো অসম্পূর্ণ মনে করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণ। মঠের সন্ন্যাসীরা শ্রীমায়ের শ্রীমুখের দিকে চেয়ে থাকতেন দুর্গাপুজোর সময়। 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীমায়ের শুভাগমনে পুজো-মণ্ডপে কেমন আনন্দঘন, ভাবগাম্ভীর্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হতো, তা আমরা কল্পনা করতে পারি।

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, মঠে প্রতিমায় দুর্গাপুজো করবেন। কিন্তু কারুর কাছে সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। একদিন তাঁর দর্শন হলো—মঠে দুর্গা-পুজো হচ্ছে। তখন পুজার বেশিদিন বাকি নেই। এদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দেরও ভাবচক্ষে দর্শন হলো—দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার ওপর দিয়ে মা-দুর্গা মঠে এসে বেলগাছের তলায় মিলিয়ে গেলেন। এদিকে ঐ দর্শনের পর স্বামীজীর মঠে দুর্গাপুজার ইচ্ছা দৃঢ় হলো। তিনি তাঁর দর্শনের কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলে পুজার আয়োজন করতে বললেন। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দও তাঁর দর্শনের কথা প্রকাশ করলেন। শ্রীমা তখন বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে থাকেন। অনুমতির জন্য স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে পাঠালেন শ্রীমায়ের কাছে। পুজো করার অনুমতি

২ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ২০০

৩ স্বামী প্রেমানন্দের জন্মস্থান আঁটপুরে ভক্তগণ একটি প্রাইভেট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে। আশ্রমটি বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয় ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর। নতুন নাম হয় 'রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর'। বর্তমানে ঘোষদের বহু শরিক হয়ে যাওয়ায়, প্রতিবছর দুর্গামণ্ডপে দুর্গাপুজো করায় তাঁদের অসুবিধা হয়। তাঁরা আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠকে এই দুর্গাপুজোর ভার অর্পণ করেন গত ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে।

৪ দ্বিতীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ বলেছেন: 'আমাদের সেই বরানগর মঠ থেকেই স্বামীজী এ-দুর্গাপুজো আরম্ভ করেন। তখন অবশ্য ঘটে-পটে পুজো হতো।" (শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, ৫ম সং, পৃঃ ১৮০)।

দিলেন শ্রীমা।[৫] কুমারটুলিতে প্রতিমার খোঁজ করতে লোক পাঠানো হলো। একটিমাত্র প্রতিমা ছিল। যিনি প্রতিমার বায়না দিয়েছিলেন, তিনি কোন কারণে নিয়ে যাননি। ওটিই তখন মঠে আনা হলো।

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, মঠে শ্রীশ্রীমহামায়ার আরাধনায় শ্রীমা উপস্থিত থাকুন। তিনিও রাজি হলেন। দক্ষিণে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি (বর্তমানে 'পুরাতন মঠ') ভাড়া নেওয়া হলো শ্রীমাদের জন্য। ষষ্ঠীর দিন (১৮ অক্টোবর) শ্রীমা এলেন মঠে। রাধু, ছোটমামী সুরবালা, মায়ের কাকা নীলমাধব, যোগীন-মা, গোলাপ-মা শ্রীমায়ের সঙ্গে মঠে এলেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দের স্মৃতি: "মঠে যেবার দুর্গা-পুজো হোলো, সেবার স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে মঠে নিয়ে এলো। পাশের বাগানবাড়িতে মা রইলেন...।"[৬]

মঠের প্রথম দুর্গাপূজার পূজক ছিলেন শ্রীমায়ের শিষ্য ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল (পরে স্বামী ধীরানন্দ) এবং তন্ত্রধারক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বাবা তান্ত্রিকাচার্য ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। দুর্গাপূজার সংকল্প হয়েছিল শ্রীমায়ের নামে। শ্রীমা বলেছিলেন: "নরেনের কি গুরুভক্তি! আমার নামে সংকল্প করালে। বললে, 'মার নামে সংকল্প হবে। আমরা তো কপানধারী—আমাদের নামে হবে না'।"[৭] মঠে ও অন্যান্য শাখাকেন্দ্রে দুর্গাপূজার সংকল্প আজও শ্রীমায়ের নামে হয়ে আসছে।

মঠবাড়ি ও পুরাতন ঠাকুরমন্দিরের মাঝখানের জায়গাতে পূজার মণ্ডপ করা হয়েছিল। প্রতিমা ছিল পশ্চিমমুখী। আমগাছের গোড়া পর্যন্ত ছিল মণ্ডপ।[৮] সেবার পূজার তারিখ ছিল ১৯—২২ অক্টোবর (১৯০১), বাংলা ১৩০৮ সালের ২—৫ কার্তিক।[৯]

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল দুর্গাপূজার সময় যেন ছাগ-বলি হয়। তিনি বলেছিলেন: "রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'—এবার তা-ই করব।"[১০] কিন্তু মায়ের আদেশে পশুবলি বন্ধ হয়।[১১]

প্রতিদিন পূজার সময় সঙ্গিনীদের নিয়ে শ্রীমা নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি থেকে মঠে আসতেন। আবার পূজা হয়ে গেলে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে চলে যেতেন। 'জ্যান্ত দুর্গা'র উপস্থিতিতে মাটির প্রতিমা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী, প্রেমানন্দজী, অদ্ভুতানন্দজী, সারদানন্দজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদবর্গও থাকতেন পূজামণ্ডপে। ফলে মঠে এক অভাবনীয় আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। শোনা যায়, মণ্ডপেই স্বামীজী 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীমায়েরও পূজা করেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত কুমুদবন্ধু সেন এক অপরূপ স্মৃতি-চিত্র উপহার দিয়েছেন: "ভক্তেরা দেখিতেছেন—

৫ বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়ার রক্ষণশীল ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের তীব্র কটাক্ষ ছিল স্বামী বিবেকানন্দ ও মঠবাসিদের প্রতি। নৌকাযাত্রীরাও কটূক্তি ও নিন্দাবাদ করত। বলত, মঠের সাধুদের আহার-বিহারে বাছ-বিচার নেই; জীবনযাপন সন্ন্যাসোচিত নয়; সাহেব-মেমদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করেন; তাঁদের শিষ্য-শিষ্যাত্বে বরণ করেন; আর সবচেয়ে বড় অপরাধ—স্বামীজী ও তাঁর গুরুভায়েরা 'কালাপানি' পার হয়েছেন। সুতরাং সব অশাস্ত্রীয় কাজ-কর্ম করছেন মঠের সাধুরা। শাস্ত্রানুযায়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজা করে ঐসব গোঁড়া পণ্ডিতদের ভুল ভাঙতে, সন্দেহ ও বিরক্তি দূর করতে চাইছিলেন স্বামীজী। বাস্তবে দেখা গিয়েছিল, স্বামীজীর এই পূজায় অনেকেরই ভুল ভেঙেছিল।

৬ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং, ১৩৮৩, পৃঃ ২৮৩

৭ শ্রীমা—আশুতোষ মিত্র, ১৯৪৪, পৃঃ ৩১ (বৈদিক পূজা বা ক্রিয়াকর্মে সন্ন্যাসীদের অধিকার নেই।)

৮ A Bridge to Eternity: Sri Ramakrishna and his Monastic order, Advaita Ashrama, Calcutta, 1986, pp. 517-518

৯ A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda—Sailendra Nath Dhar, Madras, part II, 1976, p. 1390

১০ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২১৬

১১ উদ্বোধন: বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৌষ ১৩৭০, পৃঃ ২০১-২০২; শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮০; শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৮৩; সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী, ১০ম মুদ্রণ, পৃঃ ২৫৬

একদিকে দশপ্রহরণধারিণী-সিংহবাহিনী-অসুরদলনী দশভুজা—দক্ষিণে সর্বৈশ্বর্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ—বামে পরাবিদ্যাস্বরূপিণী জ্ঞানদাত্রী কমলদলবাসিনী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপরদিকে স্বয়ং মহাশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রীজগজ্জননী মাতৃরূপে অবতীর্ণা—উপাস্য ও উপাসিকাভাবে পূজামণ্ডপে বিদ্যমানা। এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া আনন্দরসে ভক্তদের হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছিল।··· মহাষ্টমী। মঠে হাজার হাজার নরনারী পূজা দেখিতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে।··· চারিদিকে আনন্দের হাট চলিয়াছে, হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। দরিদ্রনারায়ণদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া খাওয়াইতে হইবে—ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ। পরদিন সোমবার প্রাতে সন্ধিপূজা—ভোর সাড়ে ছয়টার কিছুক্ষণ পর সন্ধিপূজা আরম্ভ—স্বামীজী পূজামণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার পাদপদ্মে সচন্দনজবা-বিল্বদলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন··· উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সহাস্য মুখমণ্ডল,—ভাবগম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। যথাবিধি কয়েকটি কুমারীর পূজা হইল—স্বামীজী একজনকে পূজা করিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন।"[১২]

দুর্গাপুরীদেবী কুমারীপূজা সম্বন্ধে অন্যরকম তথ্য দিয়েছেন। স্বামীজীর অনুরোধে গৌরীমা কুমারীপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাদ্য-অর্ঘ্য-শঙ্খবলয়-বস্ত্রাদি দিয়ে স্বামীজী স্বয়ং ন-জন অল্পবয়স্কা কুমারীর পূজো করেছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদার কনিষ্ঠা কন্যা রাধারানীও অন্যতমা ছিলেন। জীবন্ত প্রতিমাগণের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে এবং তাঁদের হাতে মিষ্টি, দক্ষিণা ইত্যাদি প্রদান করে স্বামীজী তাঁদের ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন। একজন কুমারীর বয়স খুবই কম ছিল এবং পূজাকালে সে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। এই কুমারীর কপালে রক্তচন্দন পরাবার সময় স্বামীজী শিহরিত হয়ে বলেছিলেনঃ "আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো।" এদিন শ্রীমা ও রামলালদাদার জ্যেষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণময়ী এবং আরও কয়েকজন সধবাকে 'এয়োরানী-পূজা' করেছিলেন।[১৩]

সপ্তমী থেকেই স্বামীজীর জ্বর ছিল। সন্ধিপূজার সময় তিনি মণ্ডপে এসে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিলেন মা-দুর্গার চরণে। নবমীর রাত্রিতে স্বামীজী তাঁর অপূর্ব দৈবীকণ্ঠে গাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া মাতৃসঙ্গীত। একদিন 'নল-দময়ন্তী' যাত্রা হয়েছিল। ঢাক-ঢোলের আওয়াজে ও সানাইয়ের সুমিষ্ট স্বরে চারদিকে সৃষ্টি হয়েছিল এক স্বর্গীয় পরিবেশ।

বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজা সম্পর্কে শ্রীমায়ের স্মৃতিতে ধরা পড়েছে অনেক নতুন তথ্য; জানা গেছে, শ্রীমা ও তাঁর প্রিয় সন্তান নরেনের অনুপম সম্পর্কের নানা কাহিনী। শ্রীমায়ের স্মৃতি: "আহা! নরেন আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম পূজো (দুর্গাপূজো) যেবার করায়—সেবার পূজককে[১৪] আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালে। চৌদ্দশ টাকা খরচ করেছিল। পূজার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, 'মা, আমার জ্বর করে দাও'? ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদেই হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি, 'ওমা, একি হলো, এখন কি হবে?' নরেন বললে, 'কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এই জন্য যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথায় কি ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড় দিয়ে বসব, তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বললুম, 'ও নরেন, এখন তাহলে ওঠ।' নরেন বললে, 'হাঁ মা, এই উঠলুম আর কি।' এই বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল।

১২ উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৬১, পৃঃ ৫০৭-৫০৮

১৩ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ২০৭

১৪ পূজক ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজো করলেও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বাবা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী তন্ত্রধারক হিসাবে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দেওয়ায় কার্যতঃ তিনিই পূজক ছিলেন। শ্রীমা 'পূজক' বলতে তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীকেই বুঝিয়েছেন।

"তার (স্বামীজীর) মাকেও পুজোর সময় মঠে নিয়ে এসেছিল। সে বেগুন তোলে, লঙ্কা তোলে আর এ বাগান, ও বাগান ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মনে একটু অহং যে, আমার নরেন এসব করেছে। নরেন তখন তাকে এসে বলে, 'ওগো, তুমি করছ কি? মায়ের কাছে গিয়ে বস না—লঙ্কা ছিঁড়ে বেগুন ছিঁড়ে বেড়াচ্ছ! মনে করছ বুঝি তোমার নরু এসব করছে। তা নয়, যিনি করবার তিনিই করেছেন, নরেন কিছু নয়।' মানে ঠাকুরই সব করেছেন।"[১৫]

বিজয়া দশমীর দিন গঙ্গায় নৌকা করে প্রতিমা বিসর্জন হলো। বিসর্জনের পূর্বে মা-দুর্গার সামনে বালকের মতো অপূর্ব নৃত্য করলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সকলে উপভোগ করলেন সেই মনোরম দৃশ্য। দুর্গাপুজার অনুষ্ঠান দেখে পরম সন্তোষ লাভ করলেন শ্রীমা। শ্রীমা বলেছিলেন: "প্রতি বৎসরই মা-দুর্গা এখানে আসবেন।"[১৬] মঠের সকলকে আশীর্বাদ করে পরদিন (২৩ অক্টোবর) কলকাতায় ফিরে গেলেন শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীরা।

এর পর দশ বছর (১৯০২-১১) মঠে প্রতিমায় দুর্গাপুজা হয়নি মূলতঃ আর্থিক সমস্যার জন্য। দুর্গাপুজা হয়েছিল ঘটে-পটে। এক ভক্ত প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মঠের প্রতিমায় দুর্গাপুজার ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে আবার শুরু হলো প্রতিমায় দুর্গাপুজা।[১৭] বোধনের দিন (১৬ অক্টোবর ১৯১২, ৩০ আশ্বিন ১৩১৯) সন্ধ্যায় মা মঠে আসেন, একাদশী (২১ অক্টোবর, ৫ কার্তিক) পর্যন্ত তিনি মঠে থাকেন। মঠের দুর্গাপুজায় সেটি তাঁর দ্বিতীয়বার শুভাগমন। বোধনের দিন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। কিন্তু শ্রীমা তখনও এসে পৌঁছাননি। স্বামী প্রেমানন্দ ছোটাছুটি করছেন আনন্দের জোয়ারে। তিনি দেখলেন, মঠের প্রধান প্রবেশদ্বারে তখনো বসানোই হয়নি কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট। তা দেখে তিনি বলে উঠলেন: "এসব এখনো হয়নি, মা আসবেন কি?"[১৮] বোধন শেষ হওয়ামাত্র শ্রীমায়ের গাড়ি প্রবেশ করল মঠে। সঙ্গে যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি ও ভানুপিসি। প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী বর্ণনা দিয়েছেন: "ষষ্ঠীর দিন মঠের ফটকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া প্রেমানন্দ স্বামী ও অন্যান্য রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ গাড়ি টানিয়া মঠ-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিতেছেন। প্রেমানন্দ স্বামী আনন্দে টলিতেছেন—চোখমুখ দিয়া যেন আনন্দ ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে।"[১৯] গাড়ি প্রাঙ্গণে এল। গোলাপ-মা হাত ধরে শ্রীমাকে নামালেন। সমস্ত দেখে শ্রীমা বললেন: "সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা-দুর্গাঠাকরুণ এলুম।"[২০] মঠের উত্তরে বাগান-বাড়িতে (বর্তমানে লেগেট হাউসে) শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীমা ছিলেন সর্বদক্ষিণের ঘরটিতে।

প্রথমবার যেখানে দুর্গাপুজা হয়েছিল, এবারেও সেই একই জায়গায় হয়েছিল। মঠবাড়ির দোতলায় বারান্দায় বসে শ্রীমা অষ্টমীতে 'জনা' নাটক ও বিজয়ার রাত্রে 'রামাশ্বমেধযজ্ঞ' যাত্রা দেখেছিলেন।[২১]

শ্রীমায়ের শিষ্য ও সেবক স্বামী অরূপানন্দের স্মৃতি: "অষ্টমীর দিন অনেক লোক শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিল, তিনশতের উপর হইবে।… তক্তপোষের উপর পশ্চিমমুখে পা ঝুলাইয়া বসিয়া স। ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তিন-চারিজন মন্ত্রও লইলেন। … বিজয়ার দিন ডাক্তার কাঞ্জিলাল যে-নৌকাতে প্রতিমা গঙ্গায় ভাসান হইতেছিল উহাতে দেবীর সামনে নানাপ্রকার মুখভঙ্গি রঙ্গব্যঙ্গ করিতেছিলেন এবং অনেকেই সেই সব দেখিয়া হাসিয়া অধীর হইতেছিল। একজন ব্রহ্মচারী কিছু মার্জিতরুচি ছিল। সে উহাতে খুবই চটিতেছিল। মঠের উত্তর পাশের বাগানে থাকিয়া মাও নৌকার এই সব ব্যাপার দেখিতেছিলেন এবং আনন্দিত হইতেছিলেন। আমি

১৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১১শ সং, ১৩৮৩, পৃঃ ৮৫-৮৭ ১৬ শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮৩

১৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের জন্য ১৯৪৩-১৯৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মঠে প্রতিমায় পুজো হয়নি। তার আগে ও পরে অন্য সব বছরে প্রতিমায় দুর্গাপুজা হয়ে আসছে।

১৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, ১৩৮০, পৃঃ ১৩৪-১৩৫

১৯ শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১০ম সং, ১৩৭৪, পৃঃ ১৬২

২০ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৩৫ ২১ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৪৩

মাকে বলিলাম, 'মা, দেবীর সামনে ওরূপ করায় জন্য কাঞ্জিলাল ডাক্তারকে গাল দিচ্ছে।' মা বলিলেন, 'না, না, এসব ঠিক। গানবাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ, এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়'।"[২২]

নবমীর দিন দুপুরে শ্রীমা গোলাপ-মাকে পাঠালেন স্বামী সারদানন্দের কাছে। গোলাপ-মা বললেন: "শরৎ, মা-ঠাকরুণ তোমাদের সেবায় খুব খুশি হয়ে তোমাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।" অতিবাঞ্ছিত শ্রীমায়ের আশীর্বাদে স্বামী সারদানন্দ কি উত্তর দেবেন সহসা ভেবে কিছু পেলেন না। শুধুমাত্র গম্ভীরকণ্ঠে একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, "বটে"? তারপরেই তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পার্শ্বে উপবিষ্ট গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দকে বললেন: "বাবুরামদা, শুনলে?" প্রেমানন্দজী উত্তরে শুধু তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।[২৩]

সপ্তাহ খানেক মঠে থেকে শ্রীমা (২২ অক্টোবর, ৬ কার্তিক) ফিরে গেলেন বাগবাজারে 'উদ্বোধন'-এ।

আলমোড়া থেকে স্বামী তুরীয়ানন্দ লিখছেন স্বামী প্রেমানন্দকে: "...এবার মঠে প্রতিমা আনাইয়া দুর্গোৎসব করিতে শ্রীশ্রীমা অনুমতি দিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়াছিলাম। তোমার পত্রে উহা নিশ্চয় হওয়াতে যে কত আনন্দিত হইলাম তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে।"[২৪] এটি ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের (১৩২৩ সালের) দুর্গাপূজা। সেবার ষষ্ঠী ছিল ২ অক্টোবর, ১৬ আশ্বিন। শ্রীমা অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি এবারও মঠের দুর্গোৎসবে উপস্থিত থাকবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ লিখছেন: "মঠে মহামায়ার প্রতিমায় পূজা হচ্ছে। আর শ্রীশ্রীমাও উপস্থিত থাকিবেন আশা দিয়াছেন।"[২৫] এবারের পর শ্রীমায়ের আর মঠের দুর্গাপূজায় আসা হয়নি।

সপ্তমীর দিন শ্রীমা মঠে এলেন সদলে। সঙ্গে যোগীন-মা, গোলাপ-মা, রাধু, ভগিনী সুধীরা প্রভৃতি মেয়ে-ভক্তেরা। সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল 'লেগেট হাউসে'। মঠে এসেই পূজামণ্ডপে পূজা দেখলেন তাঁরা। কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারা গেল, রাধুর শরীর খারাপ। শ্রীমা উদ্বোধনে ফিরে যেতে চাইলেন। স্বামী ধীরানন্দ স্বামী প্রেমানন্দকে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি শ্রীমাকে গিয়ে থাকার জন্য বলেন। সব শুনে স্বামী প্রেমানন্দ বললেন: "মহামায়াকে কে বাধা, নিষেধ করতে যাবে? তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে—তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি করবে?"[২৬] অবশ্য রাধু সুস্থ হওয়ায় শ্রীমা মঠে থেকেই গেলেন।

সেবার পূজায় উপস্থিত প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলীর দুর্গাপূজার স্মৃতি: "অষ্টমীর দিন সকালবেলা আটটা-নয়টার সময়ে মঠ ও প্রতিমা দর্শন করিতে (শ্রীমা) আসিয়াছেন। রান্নাঘরের পাশের 'হলে' ভক্তেরা ও সাধু-ব্রহ্মচারিগণ অনেকে কুটনো কুটিতেছিলেন। মা দেখিয়া বলিতেছেন: 'ছেলেরা তো বেশ কুটনো কোটে।' জগদানন্দজী বলিলেন: 'ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতা লাভই হলো উদ্দেশ্য, তা সাধন-ভজন করেই হোক, আর কুটনো কুটেই হোক'।"[২৭]

সেবার এত ভিড় হয়েছিল যে, পূজামণ্ডপে তিলধারণের স্থান ছিল না। ভিড় হয়েছিল লেগেট হাউসে শ্রীমায়ের ঘরেও। তাঁর ঘরের সামনে গঙ্গায় যাত্রীপূর্ণ নৌকার ভিড় লেগেই থাকত। চারদিকে সে এক মহা আনন্দময় পরিবেশ। সে-বছর দুর্গাপূজায় বারোটি কুমারীর পূজা হয়েছিল। শ্রীমায়ের নির্দেশে তাঁদের সকলকে উত্তম ভোজ্য ও বস্ত্রাদি দানে তুষ্ট করা হয়।"[২৮]

শ্রীমায়ের শিষ্য স্বামী গিরিজানন্দ সেবারের পূজার স্মৃতিচারণ করেছেন: "এবার মঠে দুর্গোৎসব।...আমার ইচ্ছা ছিল, এই তিনদিন মার পায়ে ফুল বেলপাতা দিয়া পূজা করি। স্নানান্তে পাশের বাগানে যাইয়া মার পায় অঞ্জলি দিয়া আসিতাম।... সন্ধিপূজার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, 'এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।' ব্রহ্মচারীটি

২২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃ: ১৩৬

২৩ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃ: ৩৪৩

২৪ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ৩য় সং, ১৩৭০, পৃ: ২৬৬

২৫ স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী, ২য় সং, ১৩৮৬, পৃ: ৬৪

২৬ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃ: ৩৪৪

২৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃ: ১৬৩-১৬৪

২৮ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃ: ৩৪৫

বুঝিলেন উল্টা, তিনি মনে করিলেন, দুর্গা প্রতিমার সামনে বোধ হয় দিতে বলিতেছেন। তিনি নিঃসন্দেহ হইবার জন্য মহারাজকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন: 'ও বাগানে মা আছেন, তাঁর পায় গিনিটি দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজো হলো'।"[২৯]

শিবানন্দজীর পত্রে এবারের দুর্গাপূজার স্মৃতিঃ "এবার আবার শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন সব প্রত্যক্ষরূপে হইল—অনুমানের আর প্রয়োজন ছিল না। প্রতিমাখানি অতি সুশ্রী ও সুগঠিত হইয়াছিল।... যদিও তিনদিন অনবরত বৃষ্টি ঝড় তথাপি মার কৃপায় কোন কার্যে বিঘ্ন হয় নাই। এমন-কি, ভক্তরা যেসময় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে ঠিক সেই সময় বৃষ্টি খানিকক্ষণের জন্য ধরিয়া যাইত। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য। পরে যোগেন-মার কাছে শোনা গেল যে, যখনই ভক্তরা প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এল এল—অমনি শ্রীশ্রীমা দুর্গানাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিতেন—'তাই তো, এত লোক কি করিয়া এই বৃষ্টিতে বসিয়া খাইবে? পাতাটাতা সব যে ভাসিয়া যাইবে। মা, রক্ষা কর।' মাও সত্য সত্যই রক্ষা করিতেন; তিনদিনই ঐ রকম। তিনদিনে প্রায় ৪ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছে (দুবেলা ধরিয়া)।

"বিজয়ার দিন মা ও তাঁহার সঙ্গিনীরা আসিয়া বরণাদি সব করিলেন। তারপর ছেলেরাই সব প্রতিমা লইয়া দুখানা নৌকা জুড়িয়া তাহার উপর বসাইয়া একবার উত্তরদিকে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত ও তারপর ফিরিয়া দক্ষিণে লালাবাবুদের সায়ের পর্যন্ত, তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া মঠের ঘাটে প্রতিমা জলমগ্ন করিল।"[৩০] স্বামী তুরীয়ানন্দ লিখেছেনঃ "শ্রীশ্রীমার শুভাগমন ও উপস্থিতিতে যে সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন এবং আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইবে, ইহা তো জানা কথা।"[৩১] শ্রীমায়ের কৃপা-প্রাপ্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দের স্মৃতিঃ "...সেবার মা পূজোর সময় এসে সোনার বাগানে (বর্তমানে 'লেগেট হাউস'-এ) ছিলেন। পূজো শেষ হলে অথবা সন্ধিপূজোর সময় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ মায়ের চরণপ্রান্তে পড়ে ভূমিতে লুটোতে লাগলেন—সেই স্থানে যেখানে মায়ের আরতি করা হয়েছিল।"[৩২]

শ্রীমায়ের আরেক শিষ্য প্রেমেশানন্দজী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেনঃ "মা যখন মঠের লেগেট হাউসে ছিলেন, তখন একবার দুর্গাপূজার সময় তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। অনেক লোক মাকে প্রণাম করতে এসেছিল। লোকজনের সামনে মা ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। এদিনও তেমনি ঘোমটা দিয়েছিলেন। আমি প্রণাম করে ঘোমটার তলা দিয়ে মায়ের মুখ এক ঝলক দেখে নিয়েছিলাম। সেই সময় তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল খুব প্রখর—যেন উগ্টের মতো, মায়ের ভাবটাব তো একেবারে চাপা থাকতো, বোধ হয় সেইসময় কোন ভাব হয়েছিল।"[৩৩] একবার দুর্গাপূজায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাষ্টমীর দিন ১০৮টি পদ্মফুল দিয়ে মায়ের চরণ পূজা করেছিলেন।[৩৪]

এবার চলুন কলকাতার শারদোৎসবে। শ্রীমা আছেন বাগবাজারে ১০/২ বোসপাড়া লেনের ভাড়া বাড়িতে। সময় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ (১৩০৫ সাল)। মহাষ্টমীর দিন (৬ কার্তিক) স্বামীজী কাশ্মীর থেকে ফিরে শ্রীমাকে প্রণাম করতে এসেছেন। সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামীজীর শিষ্যদ্বয় স্বামী

২৯ মাতৃদর্শন—স্বামী চেতনানন্দ সংকলিত, ১ম সং, ১৩৯৪, পৃঃ ৫৪-৫৫

৩০ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, ২য় সং, ১৩৮৭, পৃঃ ১২৩-১২৪ (চিঠিটি স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখেছেন। তারিখঃ ৯ অক্টোবর, ১৯১৬।)

৩১ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রাবলী, পৃঃ ২৭০ (চিঠিটি স্বামী প্রেমানন্দকে লিখেছেন। তারিখঃ ১০ অক্টোবর ১৯১৬।)

৩২ শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর-প্রসঙ্গ—স্বামী কমলেশ্বরানন্দ, ১ম সং, ১৩৮৪, পৃঃ ৫-৬

৩৩ মাতৃদর্শন, পৃঃ ৯৪

৩৪ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৪৫

প্রকাশানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ। শ্রীমার দেহখানি চাদরে আবৃত। স্বামীজী প্রণাম করলেন। শ্রীমাও দক্ষিণ হস্তদ্বারা স্বামীজীর মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। তারপরেই একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। স্বামীজী ক্রুদ্ধ শিশুর ন্যায় অনুযোগ করে শ্রীমাকে বললেন: "মা, এই তো তোমার ঠাকুর। কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত যেত বলে সে (ফকির) আমায় শাপ দিলে, 'তিন দিনের ভেতর ওকে উদরাময়ে এখান ছেড়ে যেতে হবে।' আর কিনা তাই হলো।—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না। তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।" শ্রীমা সেবক কৃষ্ণলাল মহারাজের দ্বারা উত্তর দেওয়ালেন: "বিদ্যা। বিদ্যা মানতে হয় বই কি, বাবা। তাঁরা তো আর ভাঙতে আসেন না। আমাদের ঠাকুর হাঁচি টিকটিকি পর্যন্ত মেনেছেন। শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই নিজের শরীরে ব্যাধিকে আসতে দিয়েছিলেন। ···তোমার শরীরে রোগ আসা আর ঠাকুরের শরীরে আসা, একই কথা।" কিন্তু স্বামীজী তখনো অভিমানভরে বললেন, মা যাই বলুন না কেন, তিনি তাঁর কথা মানবেন না। ঠাকুর কিছুই নন। শ্রীমা উত্তর দেওয়ালেন: "না মেনে থাকবার জো আছে কি, বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা।" কথাটি শুনে স্বামীজীর দুচোখ জলে ভরে উঠল। তিনি সজল নয়নে দুহাতে কিছুক্ষণ শ্রীমায়ের শ্রীচরণদ্বয় জড়িয়ে ধরলেন।[৩৫]

শ্রীমা আছেন বাগবাজারে ২/১ বাগবাজার স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের (১৩১২ সাল) শারদীয়া দুর্গাপূজা। মহাষ্টমীর দিনে শ্রীমা গৌরী-মার মানসকন্যা শ্রীদুর্গাপুরী দেবীকে মন্ত্র-দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেছিলেন।

বাগবাজারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি। গিরিশ স্বপ্নে মা-দুর্গার আদেশ পেলেন পূজা করার। তাঁর পূজা করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। তবে তিনি রাজি হবেন যদি শ্রীমা স্বয়ং উপস্থিত থাকেন এই দুর্গাপূজায়। গিরিশের দিদি দক্ষিণারও তাই ইচ্ছা। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্তা। পত্রযোগে স্বামী সারদানন্দ বীরভক্ত গিরিশের মনোবাঞ্ছার কথা জানালেন শ্রীমাকে। শ্রীমাও সম্মতি জানালেন ভক্তের আশা পূরণের জন্য।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে এই স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটেছিল। বাংলা ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীমা এলেন বলরাম মন্দিরে। সঙ্গে সেবক আশুতোষ মিত্র, রাধু ও তার মা। শ্রীমা এক ভক্তকে লিখলেন (১০।১০।১৯০৭): "আমার দেশে জ্বর হওয়ায় ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরামবাবুর বাটীতে আজ সাতদিন হইল আসিয়াছি।··· গিরিশবাবুর বাটীতে দুর্গাপূজা হইবে বিশেষ সেইজন্য আমার এখানে আসা জানিবে।"[৩৬] আর এক ভক্তকে লিখছেন শ্রীমা: "আমি পূজা উপলক্ষে গিরিশবাবুর বাড়িতে আসিয়া এখন বলরামবাবুর বাড়িতে আছি।"[৩৭] শ্রীমা বলরাম মন্দিরে এলে গিরিশের দিদি দক্ষিণা এলেন তাঁকে প্রণাম ও নিমন্ত্রণ করতে। দক্ষিণা শ্রীমাকে জানালেন: "গিরিশ তো বেঁকে বসেছিল, মা। বলে, 'মা না এলে পূজো করব কাকে নিয়ে?—করবই না'।"[৩৮]

ধুমধামের সঙ্গে গিরিশ-ভবনে মা-দুর্গার পূজা আরম্ভ হলো। শ্রীমায়ের সামনেই কল্পারম্ভ হলো। গিরিশ ও তাঁর দিদির আনন্দ আর ধরে না। সপ্তমীর দিন প্রায় সকাল দশটায় গিরিশ প্রতিমার সামনে গান ধরলেন—'কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই'। এমন সময় শ্রীমা সদলে এলেন গিরিশের বাড়িতে। দক্ষিণাদেবী শ্রীমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে এনেছেন। গোলাপ মার হাত ধরে শ্রীমা ঘোমটার মধ্য দিয়ে পূজার দালানের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি-পাত করে চলে গেলেন অন্দরমহলে। গিরিশের গানের রেশ তখনো চলছিল—'এবার নিতে এলে, বলবো হরে, উমা আমার ঘরে নাই।' গানের শেষ কলিটি শুনলেন শ্রীমা। দক্ষিণাদেবী গিরিশকে ডেকে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে।

৩৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৩৭-২৩৮
৩৬ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ২৫৬
৩৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩
৩৮ শ্রীমা, পৃঃ ১০৫

শ্রীমা পূজার দালানে এসেছেন মহিলা-ভক্তদের নিয়ে। মা-দুর্গার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের কয়েকজন ও ভক্তেরা প্রথমে মা-দুর্গা ও পরে শ্রীমায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম করলেন। তার পরেই পূজার দালানে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হলো। শ্রীমায়ের সেবক আশুতোষ মিত্র স্মৃতিচারণ করেছেন: "একই পূজার দালানে একদিকে প্রতিমার পাদমূলে স্তূপীকৃত ভক্তদের পত্রপুষ্পরাশি, অপরদিকে সজীব প্রতিমা শ্রীমায়ের চরণতলে তাঁহাদের ভক্তি-অর্ঘ্য-চিহ্নস্বরূপ বিল্বদল ও তুলসীসহ চন্দনে চর্চিত পদ্ম-জবাদি নানাবিধ পুষ্পরাশি। এ এক অভাবনীয় অপূর্ব শোভা! গিরিশচন্দ্র ও ন-দিদি (দক্ষিণা) ধন্য হইলেন শ্রীমার করস্পর্শ দ্বারা আশীর্বাদ লাভে এবং তদীয় ভবনে ভক্ত-পদধূলি প্রাপ্তে।"[৩৯]

তার পূর্বেই বলরাম মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'জ্যান্ত দুর্গার পূজা। "মহাসপ্তমীর দিন প্রাতঃকাল হইতে বলরামবাবুর বাটীতে ভক্ত সমাগম হইতে থাকে। শ্রীমার নিকট এত ভক্ত সমাবেশ পূর্বে কখনও হইতে দেখা যায় নাই। লোকের পর লোক, দলের পর দল আসিয়া কেহ কেহ প্রণাম, কেহ বা পূজা করিতেছেন আর শ্রীমা ঘন্টার পর ঘণ্টা একভাবে দাঁড়াইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। এ এক অদ্ভুতপূর্ব দৃশ্য।"[৪০]

একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল মহাষ্টমীর দিনেও। অসুস্থ শরীর নিয়েই শ্রীমা সকল ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন। কিন্তু এত পরিশ্রম সইতে পারলেন না তিনি। ফলে জ্বর দেখা দিল তাঁর শরীরে। গিরিশ-ভবনে প্রসাদ পেয়ে বলরাম মন্দিরে ফেরার আগে শ্রীমা দক্ষিণাকে বলে আসলেন: "দেহ ভাল না থাকলে, সন্ধিপূজার সময় আসতে পারব না।" গিরিশকে জানানো হলো একথা। গিরিশের প্রফুল্ল আনন হলো গম্ভীর। সন্ধ্যার পর খোঁজ নিয়ে গিরিশ জানতে পারলেন যে, শ্রীমা আসতে পারবেন না। গিরিশ সংকল্প করলেন—বৈঠকখানা ঘরেই বসে থাকবেন, শ্রীমা না এলে পূজার দালানে যাবেন না। দক্ষিণারও মন খারাপ। কিন্তু কিছু করার উপায় ছিল না।

সেবার সন্ধিপূজার লগ্ন ছিল গভীর রাত্রে। বলরাম মন্দিরে শ্রীমায়ের ঘরে রাত্রিতে জপ করছিলেন গোলাপ-মা ও যোগীন-মা। অন্য সকলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সন্ধিপূজার কিছু আগে শ্রীমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় বসেই তিনি বললেন: "ও গোলাপ, ও যোগেন, চলো গিরিশবাবুর বাড়ি যাব।" বলেই শ্রীমা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন মোটা চাদরখানা। সাড়া পড়ে গেল বাড়িময়। গাড়ি ডাকার সময়ও নেই—পূজার সময় প্রায় আগত। গোলাপ-মা, যোগীন-মা, সেবক আশু ও একজন চাকরকে নিয়ে শ্রীমা বলরাম মন্দিরের পিছনের দরজা দিয়ে সরু গলি ধরে হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হলেন গিরিশ-ভবনের খিড়কির দরজায়। জোরে নাড়া দিয়ে শ্রীমা বললেন: "আমি এসেছি।" ঝি এসে দরজা খুলে দিল। "মা এসেছেন, মা এসেছেন" শব্দে বাড়ি মুখর হয়ে উঠল। মাতৃগত প্রাণ গিরিশ ও পরম ভক্তিমতী দক্ষিণার আর আনন্দ ধরে না। শ্রীমা সোজা চলে এলেন পূজার দালানে। সন্ধিপূজা আরম্ভ হতে আর সামান্যই দেরি।[৪১] ঐ রাত্রির ভাবগম্ভীর আনন্দমুখর ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত সিদ্ধনাথ পাণ্ডা: "গিরিশবাবু উপরের বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন। মা আসিলেন না এই অভিমানে সন্ধিপূজার সময় চণ্ডীমণ্ডপেই যান নাই। এমন সময়ে সাড়া পড়িয়া গেল, মা আসিয়াছেন। সকলে তাড়াতাড়ি চণ্ডীমণ্ডপে ছুটিয়া গেলেন। আমিও তাহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি, দেবীমূর্তির সম্মুখে উত্তর-পশ্চিমের কোণটিতে মা প্রতিমার উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মানা-সমাধিস্থা। ভক্তগণ রাশীকৃত ফুল ও বেলপাতা লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতেছেন। সকলের দেখাদেখি আমিও অঞ্জলি দিলাম এবং অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। গিরিশবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া উল্লাসপূর্ণ গদগদস্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন, 'আমি তো ভেবেছিলুম আমার পূজোই

৩৯ শ্রীমা, পৃঃ ১০৭ ৪০ ঐ, পৃঃ ১০৬-১০৭ ৪১ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৯৯

হলো না। এমন সময় দরজায় ঘা দিয়ে বলছেন—'আমি এসেছি'।"[৪২] এই অভূতপূর্ব ঘটনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন স্বামী প্রেমানন্দ: "...ঠিক সন্ধিপূজার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আসিয়া হাজির। আমরা অবাক। গিরিশবাবু আনন্দে অধীর। আবার অন্যদিকে সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অতি ঘৃণ্য আর পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী একসঙ্গে। এও এক অভিনব দৃশ্য!"[৪৩] মহানবমীর পূজাও একইভাবে কাটল। তিনদিনই শ্রীমা গ্রহণ করলেন সকলের ভক্তি-অর্ঘ্য। গিরিশের আত্মীয়-স্বজন, থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচিত-অপরিচিত কেউই বঞ্চিত হলো না শ্রীমায়ের আশীর্বাদ থেকে। গিরিশের দুর্গাপূজা ও 'জ্যান্ত দুর্গা'র পূজায় স্বামী সারদানন্দের স্মৃতি: "গিরিশবাবুর বাড়িতে দুর্গাপূজা। মা অষ্টমীপূজার দিন ভাবাবেশে মিষ্টান্নাদি খেলেন। ...জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, সেদিন আমি 'আমি' ছিলুম না।"[৪৪] 'মহামায়ার' উপস্থিতিতে গিরিশের মহামায়ার পূজা সার্থক হলো।[৪৫]

বাগবাজারে শ্রীমায়ের নিজস্ব আবাস 'উদ্বোধন'। ভক্তেরা বলে থাকেন 'মায়ের বাড়ী'। উদ্বোধনের বাড়িতে শ্রীমায়ের গৃহপ্রবেশ ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মে (৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬)। ঐ বছরের দুর্গাপূজার সময় শ্রীমা ছিলেন এই বাড়িতে। যদিও উদ্বোধনে দুর্গাপূজা হয়নি, তবু স্বয়ং 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীমাকে নিয়ে পূজার কয়দিন বিশেষ আনন্দ উৎসব হলো। বেলুড় মঠ থেকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা এসেছিলেন শ্রীমায়ের কাছে। ভক্তগণও তাঁদের পূজার ডালি নিয়ে ভক্তিনম্র চিত্তে শ্রীমায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিলেন। মাদ্রাজ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও সেবার এসেছিলেন উদ্বোধনের বাড়িতে। পূজার দিনগুলিতে শ্রীমায়ের অবসর মিলত না। সকলের ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন তিনি। আবার কোন কোন ভাগ্যবান শ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেয়ে ধন্য হয়েছেন। পূজার তিনদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যা গৌরী-মা শ্রীমায়ের সম্মুখে চণ্ডীপাঠ করেছিলেন। মহানবমীতে গৌরী-মা বিধিমতে হোম করেছিলেন। তারপর শ্রীমায়ের রাতুল চরণে ১০৮টি রক্তকমল দিয়ে অঞ্জলি প্রদান করে গৌরী-মা গদগদস্বরে বললেন: "মা, আজ আমার চণ্ডীপাঠের ব্রত উদ্‌যাপন হলো। সর্বার্থসাধিকা চণ্ডীর সামনে চণ্ডীপাঠ করে।"[৪৬]

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের (১৩২৫) দুর্গাপূজায় (২৪—২৮ আশ্বিন) শ্রীমা ছিলেন উদ্বোধনের বাড়িতে। সরযূবালা দেবীর স্মৃতিপটে 'জ্যান্ত দুর্গা' পূজার দৃশ্য: "প্রাতে গিয়েছি। মা ফল কাটছিলেন, দেখেই বললেন, 'এসেছ, মা, এস। আজ বোধন। ঠাকুরের এই ফুলগুলি বেছে সাজিয়ে রাখ, ফলের থালা এই পাশটিতে রেখে দাও।' আদেশ পালন করলুম। ... আজ মহাষ্টমী!...এসে দেখি কয়েকটি স্ত্রী-ভক্ত ফুল নিয়ে এলেন। মায়ের শ্রীচরণ পূজা করে তাঁরা গঙ্গায় নাইতে গেলেন।... কিছুক্ষণ পরেই পূজনীয় শরৎ মহারাজ মায়ের চরণে প্রণাম করতে এলেন। আমরা পাশের ঘরে গেলুম। মা তক্তপোশে বসে আছেন, পা দুটি মেঝেতে। আরও অনেক ভক্ত প্রণাম করলেন।... বিস্তর মেয়েরা মাকে পূজো করছেন। অনেকেই কাপড় এনেছেন। কালীঘাটে মা-কালীর গায়ে যেমন কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হয়, পূজান্তে তেমনি করে সকলে মায়ের গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিচ্ছেন। মাও এক-একখানি করে দেখে নামিয়ে রাখছেন। কাউকে বা বলছেন, 'বেশ কাপড়খানি!' একজন ব্রহ্মচারী সংবাদ দিলেন—এখন সব পুরুষ-ভক্তেরা মাকে প্রণাম করতে আসবেন। সে কি সুন্দর দৃশ্য। হাতে ফল, প্রস্ফুটিত পদ্ম,

৪২ শ্রীশ্রীসারদা দেবী, পৃ: ৭৩ ৪৩ ঐ

৪৪ ঐ, পৃ: ৭৩-৭৪

৪৫ গিরিশচন্দ্র শ্রীমায়ের উপস্থিতিতে আগেও একবার দুর্গাপূজা করেছিলেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃ: ২৬৫)। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমা দুর্গাপূজার সময় বলরাম মন্দিরে ছিলেন। এই দুবারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

৪৬ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃ: ২৮৪

বিল্বদল—একে একে সকলে পূজো ও প্রণাম করে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গেল।… বলরামবাবুর বাড়ির সকলে এসে পূজো করে গেলেন। শেষে আমি গেলুম। পূজো করে কাপড়খানি গায়ে দিতে যেতেই মা বললেন, 'ওখানা পরব। আজ তো একখানি নতুন কাপড় পরতে হবেই।' এই বলে কাপড়খানা পরলেন।… গৌরী-মা তাঁর আশ্রমের মেয়েদের নিয়ে এসেছেন। সকলেই পূজো করে প্রসাদ নিয়ে বিদায় নিলেন।… মায়ের শ্রীচরণপূজো সমভাবেই চলতে লাগল। স্তূপাকারে ফুল বেলপাতা বারান্দায় রেখে আসতে না আসতেই আবার তত ফুল পাতা শ্রীচরণতলে জমে উঠতে লাগল।"[৪৭]

এবার চলুন আধুনিক শক্তিপীঠ জয়রামবাটীতে—স্বয়ং মহামায়ার আবির্ভাবস্থলে। ঐ অজ পাড়াগাঁতে দুর্গাপূজো হতো না। কিন্তু ভক্তরাই শ্রীমার পূজো করতেন। তবে বিশেষ চিহ্নিত দিনটি থাকত মহাষ্টমী। ভক্তসংখ্যা তখন কম হতো। শ্রীমায়ের মহিমা জয়রামবাটী ও আশপাশের গ্রামের মানুষেরা একটু একটু করে জানতে পেরেছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আসতেন এই শুভদিনটিতে। পূজোর সময় শ্রীমা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের জন্য জামা-কাপড় কিনে দিতেন। কলকাতায় থাকলে কিনে গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন।

এক মহাষ্টমীর দিনে ভক্তেরা শ্রীমায়ের চরণ পূজো করছেন। চারদিকে আনন্দের ফোয়ারা। একে একে ভক্তেরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছেন। তাজপুরের এক বাগ্দী বাইরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছে। তারও মনে প্রবল ইচ্ছা শ্রীমায়ের পায়ে অঞ্জলি দেবে। কিন্তু নিজেকে সঙ্কুচিত বোধ করছে। শ্রীমায়ের লক্ষ্য পড়ল তার ওপর। তাকে সস্নেহে ডেকে নিলেন শ্রীমা। ফুল দিয়ে চরণে পূজো করার অনুমতি দিলেন তিনি। আনন্দে ডগমগ হয়ে বাগ্দী-ভক্ত শ্রীমায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে তার মনের সাধ পূরণ করল।[৪৮]

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২৬ সাল) দুর্গাপূজোর মধুর চিত্র শ্রীমায়ের শিষ্য-সেবক স্বামী ঈশানানন্দের স্মৃতিতে: "… শ্রীশ্রীদুর্গাপূজো আসিল। অষ্টমীর দিন একটি ভক্তছেলে কতকগুলি পদ্মফুল লইয়া আসিলেন। সদর দরজার নিকট আমাকে দেখিয়াই ভক্তটি দুই হাতে ফুলসমেত হাত তুলিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দাদা, নমস্কার।' মা উহা দেখিয়াছিলেন। ভক্তটি ফুল রাখিয়া চলিয়া গেলে মা আমাকে বলিলেন, 'ঐ ফুল দিয়ে সিংহবাহিনী বা ঠাকুরের পূজো চলবেনি; ওগুলি ফেলে দাও।' ফুলগুলি ফেলিয়া দিয়া আমরা আবার অনেক পদ্মফুল তুলিয়া আনিলাম। মা কতকগুলি ফুল লইয়া একটি থালাতে ফুল চন্দন ধূপ ইত্যাদি এবং আর একটি থালায় ফল মিষ্ট সিঁদুর সাজাইয়া আমাকে ও হরিকে ৺সিংহবাহিনীর পূজো দিয়া আসিতে বলিলেন।… ঐদিন সন্ধিপূজোর সময়… ভক্তেরা একে একে তাঁহার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। পরে মা বলিলেন, 'আরও ফুল আনো। রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, যোগেন, গোলাপ—এদের সব নাম করে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকল ছেলেরা যে যেখানে আছে, সকলের হয়ে ফুল দাও।' আমি দুই হাতে ফুল তুলিয়া ঐরূপ অঞ্জলি দিতে থাকিলে শ্রীশ্রীমা জোড়হাতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া বলিতেছেন, 'সকলের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হোক। ঠাকুর, তুমি সকলকে দেখো'।"[৪৯]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে মা ছিলেন সাক্ষাৎ আদ্যা-শক্তি—'জ্যান্ত দুর্গা'। একই মণ্ডপে প্রতিমায় দুর্গা ও 'জ্যান্ত দুর্গা'র পাশাপাশি পূজো করেছিলেন স্বামীজী। ধর্মজগতের ইতিহাসে সে এক অপূর্ব অভূতপূর্ব অভাবনীয় যুগান্তকারী ঘটনা! শ্রীমায়ের শিষ্য-সেবক স্বামী সারদেশানন্দ লিখেছেন: "'জ্যান্ত দুর্গা'র শরণাগত হইয়া তাঁহার স্নেহময়ী মোক্ষদাত্রী মূর্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বামীজী প্রবর্তন করিলেন মঠে তাঁহারই অভ্যুদয়দায়িনী মূর্তি, দশভুজা দুর্গারূপের পূজা।"[৫০]

৪৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩৬-১৩৯

৪৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪৬৩

৪৯ মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, ৩য় সং, ১৩৮৯, পৃঃ ১৩২-১৩৩

৫০ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, ১৯৮২, পৃঃ ৩২

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

টনসিলের অসুখ

দুলাল বসু

'টনসিল' (Tonsil)—এই শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। শিশুকালে বা বড় বয়সে দু-একবার এর বৈকল্যে প্রায় সকলকেই পড়তে হয়েছে। সাধারণভাবে 'টনসিল' বলতে যা বোঝায় সেটা হচ্ছে, তালুর টনসিল—মুখ হাঁ করলে অনেক সময় যেটি গলার ভিতর দুদিকে দেখা যায়। কিন্তু আসলে টনসিল যে-ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি অর্থাৎ লিমফয়েড টিস্যু (Lymphoid Tissue), তা নাকের ও মুখবিবরের পিছনে চক্রাকারে বিভিন্ন নামে অবস্থান করে, যেমন 'অ্যাডিনয়েড' বা 'গলরস গ্রন্থি', 'লিঙ্গুয়াল' (জিভের) ও 'প্যালেটাইন' (তালুর) টনসিল প্রভৃতি। এগুলোর ভিতরে যেটির সংক্রমণে আমাদের বারবার ভুগতে হয়, তাহলো তালুর টনসিল। গলার গলবিল (ফ্যারিংস—Pharynx) অংশের দুধারে মাংসপেশীর পরিখা থাকে। গর্তগুলোর সামনে ও পিছনে প্রাচীর-বেষ্টনী রয়েছে। এই ত্রিভুজাকৃতি পরিখার ভিতরেই টনসিলের অবস্থিতি। টনসিলের আকারের তারতম্য থাকে। শুধু বড় দেখলেই ভয় পেলে চলবে না, কতটা সংক্রামিত হয়েছে তার ওপর টনসিলের অসুখ নির্ভর করে। এমনও দেখা গেছে, খুবই বড় আকারের টনসিল গলবিল জুড়ে অবস্থান করছে, অথচ সে-ব্যক্তির কোন কষ্টই নেই। সেক্ষেত্রে মাথা ঘামানোর দরকার পড়ে না। আবার টনসিল আকারে ছোট হলেও অনেক রকমের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

টনসিল আমাদের অনেক উপকার করে থাকে। অনেকেই বিশ্বাস করেন, শরীরের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে টনসিলের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

শরীরে লিম্ফ (Lymph বা লসিকা) নামক রস-বাহী যে তন্ত্র (system) আছে, টনসিল তারই অংশ। সামগ্রিকভাবে শারীরিক প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে এই তন্ত্র এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। অনেকটা প্রহরীর কাজ করে এরা। প্রহরীর কাজ হলো আক্রমণ প্রতিরোধ করা। কোন দেশকে আত্ম-নির্ভর হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে সুদক্ষ প্রহরার বা সৈন্যদলের প্রয়োজন। সেই রকম মানুষের শরীর-কেও বাইরের আক্রমণ থেকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সুস্থ লিম্ফতন্ত্রের দরকার। আমাদের শরীরের এই বিশেষ ধরনের সম্মিলিত কোষগুলো বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করে, দেহকে সুস্থ রাখে। সৈন্যদলের যেমন বিশেষ বিন্যাস অনুযায়ী কাজ ভাগ করা থাকে, শরীরের এইসব বিশেষ লিম্ফকোষ-গুলোতে বহিরাক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শ্রেণী-বিন্যাস রয়েছে। শরীরের প্রতিরোধশক্তি 'লিমফো-সাইট' নামক লিম্ফকোষ থেকে গড়ে ওঠে। এই লিম্ফোসাইট টনসিলে তৈরি হয়। সংক্রমণ ও অ্যালার্জি প্রতিরোধ করার জন্য এর দায়িত্ব সর্বাধিক।

আগেই বলা হয়েছে, খাদ্য ও শ্বাসনালীর প্রবেশ-পথে অবস্থিত টনসিল ও অন্য লিম্ফতন্ত্রের কাজ হলো নিঃশ্বাস ও খাদ্যের সঙ্গে প্রতিদিন যে অজস্র জীবাণু শরীরের ভিতর ঢোকে, সেগুলি কি ধরনের, সেটা পরখ করে তার প্রতিরোধ করা। লিম্ফতন্ত্র তার ফোকরের ভিতরে জীবাণুগুলিকে টেনে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর প্রতিফলন হয় রক্তে অ্যান্টিবডির সৃষ্টি।

কারা এর শিকার হন

সকল মানুষ যেমন অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সবসময় খাপ খাওয়াতে পারে না, তেমনই সকল দেহে এইসব অপরিচিত জীবাণুদের সঙ্গে লড়বার সহজাত প্রতিরোধ-ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য এই ধরনের লোকদের ঘন ঘন টনসিলের প্রদাহ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশু যখন প্রথম স্কুলে যায় বা স্কুল পরিবর্তন করে, অথবা প্রাপ্ত বয়স্কের কেউ চাকরি ছেড়ে অন্য পরিবেশে চাকরি নেয়—তখন এদের মধ্যে এই ধরনের রোগাক্রমণের

প্রাবল্য দেখা যায়। এর মূল কারণ হচ্ছে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর উপস্থিতির মাত্রার হেরফের বা জীবাণুর প্রকারভেদ। যেসব টনসিলাইটিসের রোগীদের এই ধরনের ইতিহাস রয়েছে, তাদের টনসিল অপারেশনের আগে এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। এভাবে অপেক্ষা করলে অনেকেরই টনসিলের ঘন ঘন প্রদাহ কমে যেতে দেখা যায়।

ভ্রমাত্মক ধারণা

সাধারণ সর্দি এবং রাইনাইটিস বা নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী-প্রদাহকে সাধারণ চিকিৎসকরা অনেক সময়েই টনসিলের প্রদাহ বলে ভুল করে থাকেন। অনেকেই এই ধরনের জ্বরকে টনসিলপ্রসূত ভেবে ভুল করেন। এটা সাধারণ সর্দিজ্বরও হতে পারে। যদি যত্ন করে এদের পরীক্ষা করে দেখা হয় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে, এদের টনসিলে কোন ব্যথা নেই বা টনসিলে প্রদাহের (টনসিলাইটিস) কোন লক্ষণ নেই। এইসব রোগীদের ভুল করে টনসিলের অপারেশন করা সত্ত্বেও দেখা যায়, তাদের আগেকার উপসর্গগুলোর উপশম হচ্ছে না।

অতীতে কিছু সামান্য কারণে অনেকেরই টনসিল অপারেশন করা হয়েছে। সেজন্য টনসিল কেটে বাদ দেওয়া সম্বন্ধে মানুষের একটি ভুল ধারণা জন্মে গেছে। আধুনিক যুগে চিন্তাধারা পালটেছে, সুস্পষ্ট লক্ষণ না থাকলে এখন টনসিল অপারেশন করা হয় না। শল্যচিকিৎসার পরে টনসিলাইটিসের রোগীদের সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। অপারেশন-জনিত অপকারিতা এখন খুবই কম।

কাদের অপারেশন করা দরকার

টনসিল বেড়ে গেলেই যে অপারেশন করতে হবে তা ঠিক নয়। কারণ, সাধারণভাবে টনসিল আকারে বড়ও হতে পারে আবার ছোটও হতে পারে। আসলে দেখতে হবে, রোগীদের সুস্পষ্ট উপসর্গ আছে কিনা এবং টনসিল ও অ্যাডিনয়েড বেড়ে গিয়ে শ্বাসকষ্ট, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে কিনা। লক্ষ্য রাখতে হবে, ঘুমের মধ্যে শিশুদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কিনা, গভীরভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছে কিনা, কয়েক সেকেন্ড ধরে তার নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিনা ইত্যাদি। এসব লক্ষণ অপারেশনের এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এসব ক্ষেত্রে টনসিল ও অ্যাডিনয়েডের তাৎক্ষণিক শল্যচিকিৎসা প্রয়োজন। কারণ, এটা এক জরুরি অবস্থা। স্থানীয় কারণে বা শরীরের অন্যত্র অসুখের কারণে টনসিল অপারেশন করা হয়ে থাকে।

স্থানীয় কারণ

(কেবল টনসিলের প্রদাহের [টনসিলাইটিসের] ক্ষেত্রে)

১. টনসিলের আকস্মিক প্রদাহ

অ্যাকিউট টনসিলাইটিস বা টনসিলের আকস্মিক প্রদাহ যদিও যেকোন বয়সে হতে পারে, তাহলেও নয় বছরের নিচের শিশুদেরই তা বেশি হয়ে থাকে। হাঁচি ও কাশির মারফৎ জীবাণু বায়ুবাহিত হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সুস্থ দেহে প্রবেশ করে রোগ ছড়ায়। সাধারণতঃ স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু থেকে এই রোগ উদ্ভূত হয়।

রোগের উপসর্গ

(ক) গলার ব্যথা, ঢোক গিলতে অসুবিধা ইত্যাদি উপসর্গ দিয়ে রোগ শুরু হয়। দশ বছরের নিচের শিশুরা গলায় ব্যথার অভিযোগ সাধারণতঃ করে না। কিন্তু তারা কিছু খেতে চায় না।

(খ) কানে ব্যথা।

(গ) গা ম্যাজ ম্যাজ করা।

রোগের লক্ষণ

(ক) জ্বর আসে, চোখ-মুখ গরম ও লাল হয়ে যায়।

(খ) জিভে ময়লা ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ থাকে।

(গ) গলবিল রক্তাভ হয়ে ওঠে।

(ঘ) টনসিল রক্তাভ ও স্ফীত হয়ে ওঠে।

(ঙ) চোয়ালের কোণের তলদেশের গ্রন্থিগুলো বড় হয়ে ওঠে। টিপলে ব্যথা লাগে।

যদি দেখা যায়, কোন শিশুর বছরে চারবার বা তার বেশি টনসিলের আকস্মিক প্রদাহ হয়েছে এবং এই অবস্থা বেশ কয়েক বছর ধরে হচ্ছে তাহলে টনসিলের শল্যচিকিৎসা করালে সে উপকৃত হবে।

২. টনসিলে ফোড়া, টনসিলের বাইরাংশে পুঁজ জমা (পেরিটনসিলার অ্যাবসেস)

টনসিলের আবরণের বাইরে, টনসিলের ঊর্ধ্বাংশের খুব কাছে পুঁজ জমে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ এই দূষণ একদিকের টনসিলেই হয়ে থাকে। টনসিলের আকস্মিক প্রদাহ হওয়ার পরে ফোড়া-ঘটিত এই জটিল উপসর্গ দেখা যায়। ঢোক গিলতে ব্যথা লাগে। তার সঙ্গে কানে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হয়। জমা পুঁজ টনসিলকে গলার মাঝের দিকে ঠেলে দেয়। তার ফলে রোগীর মুখ খুলতে অসুবিধা হয় এবং মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। আলজিভকে সাদা আঙুরের মতো দেখায়।

গোড়ার দিকে পুঁজ জমার আগে সংযোগ-তন্তুর প্রদাহ হলে (সেলুলাইটিস) অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কাজ হতে পারে। বেশি পরিমাণে পুঁজ জমে গেলে শল্যচিকিৎসার সাহায্যে সেটা বের করে দেওয়া দরকার। এতে উপসর্গগুলোর তাৎক্ষণিক উপশম হয়। অ্যান্টিবায়োটিক অন্ততঃ পাঁচ থেকে সাত দিন দেওয়া উচিত। টনসিলের শল্যচিকিৎসা না করালে পরে তার এই ধরনের আক্রমণের আশংকা থাকে।

৩. ডিপথেরিয়ার বাহক

শিশুদের ডিপথেরিয়া হলে আশংকার কারণ থাকে। একথা সকলের অল্পবিস্তর জানা আছে যে, ডিপথেরিয়া গলার ভিতর টনসিলের চারপাশে হয়ে থাকে। টনসিলের ওপর একটা ধূসর বা ছাই রঙের পাতলা আবরণ পড়ে। এই পর্দা টনসিলের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত থাকে। ডিপথেরিয়ার জীবাণু-বাহকদের (carrier) কোন উপসর্গ থাকে না; পর্দার কোন অস্তিত্ব থাকে না। জ্বর-জারি বা গলা ব্যথাও থাকে না। অথচ তারা রোগ বহন করে সমাজের আর দশজন শিশুর দেহে রোগ ছড়িয়ে চলে।

বয়স্কদের ভিতর মাঝে মাঝে দেখা যায়, একদিকের টনসিল অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। যদি টনসিলের গাত্র স্ফীত দেখা যায় এবং টিপলে শক্ত মনে হয়, তাহলে এক্ষেত্রে ক্যানসার হয়েছে কিনা জানার জন্য বায়োপসি বা রোগাক্রান্ত অংশ কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা একান্ত দরকার।

মাঝে মাঝে টনসিলের গায়ে সাদা সাদা ছিট-যুক্ত দাগ দেখা যায়। এর সঙ্গে রোগীর জ্বর ও গলা ব্যথা থাকে। এই অবস্থাকে ডিপথেরিয়া বলে ভুল হতে পারে। আসলে এগুলো কিন্তু টনসিলের দূষণের জন্যে ক্রিপ্টের বা ফাঁকা ফাঁকা অংশগুলির মুখে জমা রসপিণ্ড। ক্রিপ্ট হচ্ছে টনসিলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা বারো থেকে ষোলটা নালীমুখ। এই রসপিণ্ডগুলো দেখতে সাদা নয়—হলুদ, আর সহজেই অপসারণ করা যায়, তাতে রক্তও পড়ে না। ডিপথেরিয়ার সঙ্গে এই অবস্থার এখানেই তফাৎ।

টনসিল ও শরীরের অন্য অসুখ

যেসব রোগীদের রিউম্যাটিক ব্যাধি বা নেফ্রাইটিস (বৃক্কের প্রদাহ) টনসিলাইটিসের পরে হয়েছে, দেখা গেছে টনসিলে এক বিশেষ ধরনের (বিটা হিমোলিটিকাস স্ট্রেপ্টোকক্কাস) জীবাণুর জন্যই এই অবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। এই ক্ষতিকারক জীবাণু যাতে রক্তে বাড়তে না পারে, সেজন্য এসব রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী পেনিসিলিন দেওয়া হয়ে থাকে। রিউম্যাটিক জ্বরে বা বাতব্যাধিতে গাঁটের ব্যথা থাকে। আর নেফ্রাই-টিসে মুখ ফুলে যায়, প্রস্রাব খুবই কম হয় ও তাতে অল্প রক্ত মিশ্রিত থাকে। মনে রাখতে হবে, এই বিটা হিমোলিটিকাস স্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুই গাঁটের ব্যথা, বৃক্কের প্রদাহ এবং হৃৎপিণ্ড জখম করার জন্য পুরোপুরি দায়ী। সেজন্য চিকিৎসার আগে টনসিলের সোয়াব নিয়ে (তুলো বুলিয়ে নিয়ে) কালচার বা জীবাণু চাষ করা হয়। দেখা গেছে, পর পর বেশ কয়েকবার এভাবে কালচার করার পরও এই ধরনের জীবাণু টনসিলে বর্তমান। পেনিসিলিনে আবার কারুর কারুর অ্যালার্জি বা স্পর্শকাতরতা থাকে বলে তা দেওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে টনসিলের অপারেশন প্রয়োজন হতে পারে।

উপসংহার

প্রকৃতি শরীরের প্রয়োজনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিন্যাস করেছে। প্রতিটি অঙ্গ শরীরের বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যস্ত। টনসিলও তাই। শরীরের প্রয়োজনে একে ভালভাবে রাখার দায়িত্ব যেমন আছে, আবার প্রয়োজনে একে বাদ দিতেও হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, বাড়ির দারোয়ান বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন। ঐ দারোয়ান যদি নিজে চোর হয় তবে সেই বাড়ির সুরক্ষা কখনো সম্ভব নয়। তেমনই হচ্ছে টনসিল।

গ্রন্থ-পরিচয়

স্বামী বিবেকানন্দ এবং জোসেফিন ম্যাকলাউড: সাধনা, স্বাধীনতা, সংস্কৃতি

হোসেনুর রহমান

Tantine: The Life of Josephine Macleod—Friend of Swami Vivekananda: Pravrajika Prabuddhaprana. Sri Sarada Math, Dakshineswar, Calcutta-700 076, Rs. 125'00/$: 25'00.

এতদিনে বোধকরি বলা সম্ভব, আমরা 'ঘরে ফিরতে' আরম্ভ করেছি। হীনম্মন্যতা, পরানুকরণ, পশ্চিমায়ন—এসবে যেন ভাটা পড়ছে। আত্মশক্তি, আত্মবোধ, স্বদেশীয়তা একটু একটু করে যেন ফিরে আসছে। আর তাই আমরা আমাদের স্বদেশ ও সভ্যতার জোরের জায়গাগুলি (points of strength) সনাক্ত করতে পারছি। এই মোড় ঘোরানোর মূলে রয়েছেন এক অজেয় প্রতিভাধর, অনন্যসাধারণ অমিত-বিক্রম পুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দ। কোন ধর্মের বিচারে আজও তাঁকে ধরা যাবে না। কারণ, ধর্ম এখনও সেই উন্নত মার্গে গিয়ে পৌঁছায়নি। কোন মঠ-মন্দিরে স্বামীজীকে ধরবে না। কারণ, মঠ-মন্দিরের যে অসাধারণ ধারণা তিনি দিয়ে গেলেন সে-ধারণা আজও অধিকাংশ মানুষের কাছে দুরধিগম্য থেকে গেল। আর সে-ধারণা স্বামীজীর নিত্যনতুন গতিমান জীবনের সঙ্গে প্রতিদিন আরও কত বিস্তৃত হয়েছিল তারও আঁচ আমরা কতটাই বা পেয়েছি। সাধারণ মানুষ তার আত্যন্তিক প্রয়োজনে দেবতা গড়ে নেন। সত্যিই তো, অজানায় শান্তি। স্বামী বিবেকানন্দকে জানতে হলে দিতে হবে যে অনেক। নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে প্রতিনিয়ত। ত্যাগে, শিক্ষায়, কল্যাণব্রতে জীবনের রূপান্তর চাই। বুদ্ধি, প্রেম, সাধনায় নব জীবনের উদ্বোধন চাই। নইলে নয়। ভক্তি, ধূপ-ধুনো, বিশ্বাস, বাণীপাঠ—এসব ভাল। কিন্তু কতটা ভাল?

আলোচ্য গ্রন্থ তেমন একটি অসাধারণ রচনা যেখানে 'মানুষ' বিবেকানন্দ নিত্য অভিব্যক্ত। বিবেকানন্দকে ঘিরে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন এদেশে এবং ওদেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হচ্ছে। কি করে এমন একটি নিঃশব্দ বিপ্লব সম্পন্ন হচ্ছে? তার এক মুক্ত, স্বচ্ছ, স্বাধীন চিত্র এই গ্রন্থ। যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবটিকে বুঝতে চান, একেবারে প্রত্যক্ষ করতে চান, তাঁরা যদি এ-গ্রন্থ না পড়েন তাহলে এই মানব-পন্থার বিস্তারক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁদের অজানা থেকে যাবে। ধরা যাক, বিবেকানন্দের পাঠক যত্ন করে বিবেকানন্দ রচনাবলী পাঠ করলেন। বিবেকানন্দ রচনাবলী অবশ্য সকলেরই অবশ্যপাঠ্য। কিন্তু এটা তো আরম্ভের আরম্ভ। এরপরই আরম্ভ আসল কাজ। অর্থাৎ বিবেকানন্দ-জগতে আপনার অভিযান। এই গ্রন্থ তেমনি এক চরম অভিযান। প্রধান অভিযাত্রী জোসেফিন ম্যাকলাউড। 'জো-জো', 'জো'—এক মানুষের বহু নাম। দয়া, করুণা, সত্যনিষ্ঠা, প্রেম, বিশ্বচেতনা, বিবেকানন্দ-সর্বস্বতা ম্যাকলাউডের প্রধান পরিচয়। আর এসব পরিচয় এ-গ্রন্থে ফুলের মতো নিত্য প্রস্ফুটিত। এখানে অন্যান্য সম্পদের মধ্যে এমন ফুল হলো অসংখ্য সুন্দর পত্রাবলী। পত্রকার—স্বামীজী, বহু সন্ন্যাসী, সিস্টার নিবেদিতা, ম্যাকলাউড, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং আরও অনেকে। ঐ সঙ্গে অনেক সুন্দর ছবি এই গ্রন্থের অশেষ সৌন্দর্য। এবং এগুলিই হলো ইতিহাসের ইতিহাস। মানুষকে নাকি জানা যায় তার অসংখ্য স্বাভাবিকতায়, হাসি-ঠাট্টায়, ভালবাসায় ও ক্ষমায়। জোসেফিনের জীবন-কর্মের একটি বড় ঐশ্বর্য 'fun and joy'। মার্কিন ধনীর কন্যা ভারতবর্ষে এসেছেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের প্রাণবিশেষ হয়ে উঠেছেন। তবু তিনি ষোল আনা মার্কিন, ষোল আনা পাশ্চাত্য সভ্যতার সন্তান। সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সত্যকথন, নির্ভীক, নির্মম হয়ে উঠতে পারার ক্ষমতা। সেই

নারী-পুরুষের সমানাধিকার। সেই সহজ প্রকাশ। এবং সর্বোপরি নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারা। ফিরে ফিরে বলা : "আমি যে স্বামীজীকে দেখেছি। আর কী চাই ?"

নিবেদিতা লিখছেন জো-কে : "He (Swamiji) said your charm was that you were complete before you came to Him···but after all, your real charm is your generous heart that can forgive everything and give freedom to everyone, and leave yourself out !" (পৃঃ ১৪৪) এই হলো মানুষ ম্যাকলাউড—যাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ "shared some of his deepest and loftiest thoughts" (পৃঃ ২১)। কী গভীর বন্ধুত্ব, আত্মিক সম্পর্ক দুটি মানুষের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে পরম স্নেহে, ভালবাসায়, পারস্পরিক বোঝাপড়া থেকে একান্ত নির্ভরতায়—তা যদি দেখতে হয় তাহলে এই মহাজীবন-চর্চা অনিবার্য।

লেখিকা মনে করেন, জো-কে লেখা নিবেদিতার সুন্দরতম চিঠিটি মৃত্যুর প্রায় একবছর আগে লেখা হয়। সেই চিঠির কয়েকটি লাইন : "I have just been lost in a dream of all I owe to you, how you taught me step by step to love Swami, and be constantly true to that love, in every little thing as well as big···your life had [has] been full of loving and being loved···you were born to love····.

'By this time you have seen Christine and your circle is complete. But no one—no one—could ever have filled your place, dear Yum. Christine did her part and in that one thing was perfect. It was the high water mark of her life. But did infinitely more. She gave the keystone of experience, so far as woman was concerned. But you were the very ground on which rested the arch itself. I know you both, you know, and very intimately, and I say this." (পৃঃ ১৪০)

একটা তুলনা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'-এ রবীন্দ্রজগৎ যত প্রকাশমান, যত ব্যাখ্যাত, যত উজ্জ্বল, বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে বিবেকানন্দ-বিশ্ব যত সত্য, যত নিত্য প্রকাশিত, তত বোধকরি শত সহস্র রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ টীকা, ব্যাখ্যায় নয়। ঠিক তেমনি এই গ্রন্থে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য জগতে বেদান্তচর্চা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বলুন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচার বলুন এবং সর্বোপরি বিদেশিনী সন্ন্যাসিনী (বর্তমান গ্রন্থের লেখিকা প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা আমেরিকার মানুষ) এবং অসংখ্য বিবেকানন্দ অনুরাগিণীদের ভারতচর্চা বলুন—এসব সম্যক্ উপলব্ধি (কেবল বুদ্ধি-বিচার দিয়ে নয়) করতে হলে আমাদের মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে মহিয়সী ম্যাকলাউডের কাছে যেতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কী একাগ্রতা নিয়ে তিনি স্বামীজীর উদ্দেশে নিজেকে অর্পণ করেছেন। এই গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় একটি অনুভূতি ছড়িয়ে আছে, তা হলো স্বামীজী-ম্যাকলাউডের বন্ধনহীন গ্রন্থি। একটি তুলনা মনে পড়ে। মীরার ভজন। আমার কৈশোরে কম করে বার দশেক শুভলক্ষ্মীর মীরা চলচ্চিত্রটি পর্দায় দেখি। তবু আরও দেখার ইচ্ছা মেটেনি। জানি না, একালে কোন দক্ষ চিত্র-নির্মাতা এই গ্রন্থের চিত্ররূপ প্রস্তুত করার কথা ভাবতে চাইবেন কিনা। তবে এই চলচ্চিত্র যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করবে সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আর এই চলচ্চিত্র এই অশান্ত, ভগ্ন, হিংসাত্মক পৃথিবীকে এক নতুন পথের নির্দেশও দিতে পারবে বৈকি। যা এত রাজনীতিক শীর্ষ সম্মেলন, বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্বকথা, অর্থনৈতিক খসড়া দিতে পারল না, তা হয়তো দিতে পারবে এমন একটি চলচ্চিত্র।

এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে পূর্ব-পশ্চিমের মহাসম্মিলন। এই মহাসম্মিলনের একমাত্র কথা : দেশ, কাল, ধর্ম—এই ত্রি-শক্তির অতীতে একমাত্র মানুষই চলে যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। কারণ, মানুষ স্বাধীন, সৃজনশীল, সুন্দর। সেই মানুষের এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে জোসেফিনের মধ্যে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এক চূড়ান্ত প্রকাশ যেন জোসেফিন ম্যাকলাউড। নিজস্ব জীবন-জিজ্ঞাসা,

স্বাধীন সত্তা নিয়ে ম্যাকলাউড ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। এবং এই স্বাধীন সত্তার বিকাশ, পরিণতি, পূর্ণতা তিনি নিজের পাশ্চাত্য ঐতিহ্য রক্ষা করেই সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে গোটা ভারত-বর্ষকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এই দেখতে পাওয়া এক আধ্যাত্মিক মাত্রা অর্জন করেছিল। জানি, 'আধ্যাত্মিক' কথাটা বলে ফেলা গেল সহজেই। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা জীবনে সংগ্রহ করা আদৌ সহজসাধ্য নয়। তা তো জোসেফিনকে দেখলেই বেশ সহজ হয়ে আসে। এই গ্রন্থে জোসেফিনের অনেক ছবি আছে। একেবারে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত জোসেফিনের ছবিগুলি কেউ যদি মনঃ-সংযোগ করে দেখেন, তাহলেই দেখবেন—হঠাৎ আলোর ঝলকানি—যুবতী জো-জো-র আবির্ভাব—ভারতবর্ষের ইতিহাসে। আর তিল তিল করে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া। উদ্দেশ্য—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবের প্রতিষ্ঠা। শেষের অধ্যায়ে জো-জো—জোসেফিন ম্যাকলাউড যেন বলছেন: 'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি'। ঐ সঙ্গে জোসেফিন বলতেই পারতেন: আমার ধর্মবিশ্বাস মহাত্মা যীশু থেকে প্রাপ্ত, আর আমার গোটা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে বেদান্ত, যা আমাকে দিয়েছেন বিবেকানন্দ। এই যে পাশ্চাত্য জীবনের আকণ্ঠ প্রাচ্য-দর্শনতৃষা, এই প্রাচ্য মনস্কতার মূল্যায়ন আজও কি এদেশে সম্ভব হয়েছে? হয় আমরা স্বদেশ ও সভ্যতার বিচার করতে বসে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মন্তব্য মুখস্থ বলে যাচ্ছি (এবং নিশ্চয়ই গৌরববোধ করছি), নয় তো আমাদের সভ্যতা কত মহান একথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছি। আসলে এই দুই আচরণের দ্বারাই আমরা প্রমাণ করছি আমাদের দীনতা, আমাদের একপ্রকার অশেষ অক্ষমতা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জোসেফিন ম্যাকলাউডের জীবনবৃত্তান্ত আমাদের কেবল মুগ্ধ করবে না, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সজাগ করবে। আমরা বুঝতে পারব, এমন মহৎ জীবনে যাঁর এমন স্বচ্ছন্দ অধিকার ছিল তিনি তো যথার্থই গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রাণে ধারণ করে চলেছিলেন দিবারাত্রি: "অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।" নিজেকে সম্পূর্ণ ক্ষয় করে অক্ষয় সত্যকে অর্জন করেছিলেন বিবেকানন্দের মানসকন্যা, বিবেকানন্দের বন্ধু জোসেফিন ম্যাকলাউড। আমরা বারবার শুনেছি: "শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ"। "শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হয়ে যায়, তেমনি করে তন্ময় হয়ে ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ কর।" এ যে তেমনই জীবনসাধনা। এ যে শরবিদ্ধ হয়ে কেবলই আরও চৈতন্যপ্রাপ্তির জন্যে প্রতীক্ষায় থাকা।

জোসেফিন নামক মহাজীবনের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু ঘটনার উল্লেখ আছে এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষকে বোঝাবার জন্যে তাদের মূল্যও কম নয়। বলতে পারেন গোলাপচর্চার পর সূর্যমুখীর দিকে একটু তাকিয়ে থাকা। বৈচিত্র্যই জীবন। কারণ তাতেই সম্প্রসারণ, এবং সংকোচনে মৃত্যু। দেখুন কেমনতর এই তাকিয়ে থাকা: "It was a Mussalman who, in Naini Tal, had said to the Swami, 'Swamiji, if in aftertimes any claim you as an Avatar, remember that I, a Mohammedan, am the first'।" (পৃঃ ৫৬)

অন্যটি বহু-বিচিত্র, বহু-বর্ণময় বিবেকানন্দ। বিচার করছেন জোসেফিন: "Vivekananda was everything to everyone. Each one could take what suited him best. (She says) 'From him I took mainly energy and manifested this most. Becuase this was what did me good and I know it was best for me. But when I used to tell Sister Nivedita, 'He is all energy', she used to answer, 'He is all tenderness.' I would argue, 'But I never felt it'." (পৃঃ ২০৯)

কত আর উদ্ধৃতি দেব। ৩৩৯ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে এমন কত উক্তি, মন্তব্য, সরস গভীর কথা। এককথায়, এই গ্রন্থ পড়তে হবে, বারবার পড়তে হবে। এতে প্রকাশিত ছবিগুলি দেখতে হবে, ঘুরে ফিরে দেখতে হবে। এভাবেই পাঠক-পাঠিকা একদিন হঠাৎই আবিষ্কার করতে পারবেন: এমন করে তো 'মানুষ' বিবেকানন্দকে ইতিপূর্বে বুঝতে পারা যায়নি। আর এখানেই এই গ্রন্থের চূড়ান্ত সার্থকতা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৩ জুলাই ১৯৯১ বাগবাজারের (৭ গিরিশ এভিনিউ) বলরাম মন্দিরে প্রতি বছরের মতো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-আকর্ষিত ঐতিহ্যবাহী রথকে উপলক্ষ করে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১০৬ বছর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলরাম মন্দিরে রথযাত্রা উৎসবে যোগ দেন। তিনি প্রথমে সুসজ্জিত রথটির রজ্জু আকর্ষণ করেন এবং পরে রথের সম্মুখে ভক্ত ও কীর্তনীয়াদের সাথে নৃত্য ও কীর্তন করেন। সেই পুণ্য ও পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করে প্রতি বছর বলরাম মন্দিরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ পূজা, হোম, ভজন প্রভৃতি সারাদিন-ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, বহু ভক্ত সমাগমে সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভক্তিগীতি ভক্তদের আনন্দবর্ধন করে। বিকাল ৪টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ রথের রজ্জু প্রথম আকর্ষণ করে রথযাত্রার সূচনা করেন। তারপরে বহু সাধু-ব্রহ্মচারী রথ টানেন। তারপরেই পরম আগ্রহে অপেক্ষারত বিপুল সংখ্যক ভক্তদের রথটানা আরম্ভ হয়। দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত কীর্তনীয়া দল (সন্তোষ চৌধুরী ও সম্প্রদায়) রথটানার সাথে সাথে সংকীর্তন করে একটি ভাব-গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। সারা দিনে প্রায় চার হাজার ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন। ২১ জুলাই ১৯৯১ পুনর্যাত্রা উৎসবও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দী-পনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ রথের রজ্জু প্রথম আকর্ষণ করে পুনর্যাত্রার সূচনা করেন।

গত ৭—৯ জুন তমলুক রামকৃষ্ণ মঠে দ্বাদশ বার্ষিক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৭ জুন বিকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। স্বাগত ভাষণ দেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন প্রত্যহ তিনটি করে অধিবেশন হয়। জপ, ধ্যান, পাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী এবং নানা ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। আলোচনা-সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করেন স্বামী সনাতনানন্দ, স্বামী সারদাত্মানন্দ, স্বামী বীতরাগানন্দ, স্বামী একরূপানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ৯ জুন শেষদিনে আলোচিত বিষয়ের ওপর প্রশ্নোত্তরের একটি অধিবেশন হয়। অধিবেশনে ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ৮ এবং ৯ জুনের সান্ধ্য অধিবেশন-দুটি ছিল প্রকাশ্য অধিবেশন। এই দুটি অধিবেশনে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শচীকান্ত বেরা, অশোককুমার বেরা, অজিতকুমার দে। মোট ১৫০জন ভক্ত এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন স্বামী হরিদেবানন্দ এবং দীপককুমার দত্ত।

গত ২৭ থেকে ৩০ জুন পুরী রামকৃষ্ণ মঠে তৃতীয় ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথমদিন সভাপতিত্ব ও সম্মেলন পরিচালনা করেন স্বামী ভক্ত্যানন্দ, ভাষণ দেন পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী দীনেশানন্দ। পরবর্তী দুদিন ছিল প্রশ্নোত্তর অধিবেশন। এই অধিবেশনগুলিতে ভক্ত-গণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ। শেষদিন অখণ্ড জপ ও পাঠ এবং ঠাকুরের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার ছয়টি জেলা থেকে আবাসিক ও অনাবাসিক মিলিয়ে মোট ৬০জন ভক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। এই ভক্তসম্মেলনের সঙ্গে উড়িষ্যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের একটি অনুষ্ঠানও হয়।

উদ্বোধন

গত ২৯ জুন আলং আশ্রমের রজত জয়ন্তী ভবনের উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের উন্নয়ন কমিশনার মদন ঝা।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর আশ্রমের ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমির একজন ছাত্র শতকরা ৭৬ নম্বর পেয়েছে। একাডেমির অন্য ছ-জন ছাত্রও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ত্রাণ

আসাম বন্যাত্রাণ

শিলচর ও করিমগঞ্জ আশ্রমের মাধ্যমে কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১১৯৭টি শাড়ি, ১২২০টি ধুতি, ২৯১৭টি পুরনো কাপড়, ১৩৫ কিলো. গুঁড়ো দুধ পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৬৬০৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

গুয়াহাটি আশ্রমের মাধ্যমে কামরূপ জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রাথমিক ত্রাণকার্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ

বাংলাদেশে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২৫০০ শাড়ি, ২৫০০ লুঙ্গি ও ২১০০ পশমী কম্বল পুনরায় পাঠানো হয়েছে।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ

বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামণ্ডিলি ব্লকের কোঠাপালেমে আশ্রয়গৃহ তৈরির কাজ চলছে এবং গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের মুক্তেশ্বরম ও কোঠাপালেমেও আশ্রয়গৃহসমূহের নির্মাণকার্য সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো : গত জুলাই মাসের রবিবারগুলিতে সেন্ট লুইস কেন্দ্রের প্রধান স্বামী চেতনানন্দ, নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির প্রধান স্বামী তথাগতানন্দ ধর্মীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্রের প্রধান স্বামী প্রপ্রধানন্দ যথারীতি রবিবাসরীয় ক্লাস নিয়েছেন। ৩ ও ১৭ জুলাই মাণ্ডুক্য উপনিষদের ওপর বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন স্বামী প্রপ্রধানন্দ এবং ১০ জুলাই বিবেকচূড়ামণির ক্লাস নিয়েছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ। শনিবারগুলিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ক্লাস হয়েছে। ২৬ জুলাই সন্ধ্যায় সঙ্গীত, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি পালন করা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো) : গত ২১ ও ২৪ জুলাই এবং ১৮ ও ২৫ আগস্ট বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ২৭ জুলাই সকালে পূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, ভক্তিগীতি, আলোচনা ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি পালন করা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস : গত জুলাই ও আগস্ট মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গের ব্যবস্থা ছিল। ৪ জুলাই 'স্বামী বিবেকানন্দ ফেস্টিভ্যাল' নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন : গত জুলাই মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ২ ও ৯ জুলাই 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ৬ জুলাই এই বেদান্ত সোসাইটির সদস্যদের নিয়ে একটি সাধন-শিবির হয়েছে। সাধন-শিবিরে স্বামী শান্তরূপানন্দ ভাষণ দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ৮ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি ও ২৫ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার কথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ লীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, কলকাতা-৩২ : গত ৭ এপ্রিল এই কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করা হয়। নগর পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃত ও গীতা পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। দুপুরে দেড় হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সংপ্রভানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক অরুণকুমার গুপ্ত এবং বক্তা ছিলেন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী। সভার শেষে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন বেহালার সুরপীঠ গোষ্ঠীর অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাশ্রম (হরিশ পার্ক, কলকাতা-২৬) : গত ৯—১১ মার্চ এই আশ্রমের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ধর্মসভা ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান ও যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী অসক্তানন্দ, স্বামী ভৈরবানন্দ, প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা প্রমুখ। যুবসম্মেলনের উদ্বোধন করেন সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। বিভিন্ন দিনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমির ছাত্রবৃন্দ এবং সারদামণি পাঠচক্র, শ্রীসারদা সংঘ, ব্রততী সংঘ প্রভৃতি সংস্থার শিল্পিবৃন্দ। উৎসব উপলক্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের সহযোগিতায় 'রামকৃষ্ণ-সারদার কলকাতা' বিষয়ক এক চিত্র-প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

রামপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘের (হুগলী) উদ্যোগে গত ১০ মার্চ পূর্বদুর্গাপুর গ্রামে এবং ২৪ মার্চ চাঁচুয়া গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সনাতনানন্দ। বক্তা ছিলেন কানাইলাল দে। সভার পর 'কথায় ও গানে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম মাহাত্ম্য' পরিবেশন করেন বেতার-শিল্পী সুকুমার বাউরী। দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, বক্তব্য রাখেন কানাইলাল দে ও হিমাংশু ঘোষ। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী সাংখ্যানন্দ। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বলরাম দত্ত, পারমিতা বারিক, অমিয় ঘোষ ও সম্প্রদায়। প্রথম দিনের সভায় আড়াইশো ও দ্বিতীয় দিনের সভায় প্রায় পাঁচশো ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৯—৩১ মার্চ **চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে (কলকাতা-২৭)** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম জন্মোৎসব এবং আশ্রমের ৭৭তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ২৪ মার্চ সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসবের তিনদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্থানীয় অহীন্দ্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন বিশেষ পূজা ও হোমাদির পর প্রায় পাঁচশতাধিক ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানসূচীর বিশেষ অঙ্গ ছিল মীরা-স্মৃতি সংসদ কর্তৃক পরিবেশিত গীতি-আলেখ্য কথা ও গানে 'দশমহাবিদ্যা-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদা', রামকৃষ্ণ-সারদা সংসদ কর্তৃক পরিবেশিত শ্রুতিনাট্য 'নটী বিনোদিনী', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'; চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং ধর্মসভা। প্রথম দিনের ধর্মসভায় স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ ও দ্বিতীয় দিনের সভায় স্বামী প্রভাকরানন্দ যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রানিয়া কুলটি-কারী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ৭ এপ্রিল নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। দুপুরে সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে

অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গোপেশানন্দ। প্রধান অতিথি ও বক্তা ছিলেন যথাক্রমে স্বামী শিবনাথানন্দ ও স্বামী অকল্মষানন্দ। এই উপলক্ষে আশ্রমের তরফ থেকে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ): গত ৬ ও ৭ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। পূজানুষ্ঠানাদিসহ দুইদিনই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দ, ডঃ কমল নন্দী, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

গত ১৪ এপ্রিল **হরিণডাঙা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সঙ্ঘের** উদ্যোগে হরিণডাঙ্গা কাছাড়িবাড়ি-প্রাঙ্গণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম জন্মোৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ, কয়েকটি নার্সারি স্কুলের শিশুদের নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠান, ধর্মসভা ও যাত্রাভিনয়। দুপুরে প্রায় সাতশো ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী শিবনাথানন্দ ও স্বামী অকল্মষানন্দ।

ভাবপ্রচার সম্মেলন

গত ৭—৮ এপ্রিল '৯১ **বিহার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় **মজফ্‌ফরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে**। বিহারের বারোটি আশ্রম থেকে মোট চল্লিশজন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শিবময়ানন্দ। তাছাড়া স্বামী সুহিতানন্দ, স্বামী আত্মবিদানন্দ, স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী নিয়মানন্দ, স্বামী অমলেশানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দও সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে ভাবপ্রচার পরিষদের কার্যাবলী ছাড়াও শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা, পাঠ এবং যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ৮ এপ্রিল যুবসম্মেলনের দিন সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। পরে যুবক-যুবতীদের মধ্যে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার পর পুরস্কার বিতরণ এবং অংশগ্রহণকারী চারশো জনকে ফুড প্যাকেট দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুহিতানন্দ, স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী আত্মবিদানন্দ, ডাঃ কেদারনাথ লাব প্রমুখ।

বহির্ভারত

নতুন আশ্রমের উদ্বোধন

গত ১২ এপ্রিল '৯১ বাংলাদেশের খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার কৈলাসগঞ্জ গ্রামে একটি নতুন **রামকৃষ্ণ আশ্রম** উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বাগেরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দ। আশ্রমটির নাম হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম'। উল্লেখ্য, এখানে 'স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ শিশু বিদ্যাপীঠ' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে। গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় আশ্রমের জন্য চার বিঘা জমি দান করেছেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **সুজাতা সিংহ রায়** গত ২২ এপ্রিল রাত ১১-৩০ মিনিটে করজপরত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর। তিনি হোলি চাইল্ড স্কুলে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছিলেন। সুজাতা দেবী দীর্ঘকাল যোগোদ্যান মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সেবাপরায়ণতা, সরল স্বভাব ও সহৃদয় ব্যবহার তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **শিবকিঙ্কর চক্রবর্তী** গত ১২ ফেব্রুয়ারি বেলা ২-১০ মিনিটে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মারনাই গ্রামে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল উনসত্তর বছর। তিনি গ্রামের নানা সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রয়াত চক্রবর্তী দীর্ঘকাল উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

সুরক্ষিত বসন্তরোগের ভাইরাসকে নষ্ট করতে হবে

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'অর্থোপক্স ভাইরাস সংক্রমণ' কমিটির (World Health Organisation Committee on Orthopox Virus Infection) মিটিং-এ ঠিক হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসন্ত-রোগের ভাইরাসের যে মজুত ভাণ্ডার আছে তা নষ্ট করতে হবে। [বসন্তরোগের টিকা নষ্ট করা হবে এইজন্যে যে, রোগটি আগেই পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে; রোগের কারণ যে ভাইরাস, তাও নির্মূল করা হলে বসন্ত টিকা রাখার আর প্রয়োজন কি? তাছাড়া আগেই জানা গিয়েছে যে, বসন্তরোগের টিকা নিলে টিকা-ঘটিত কিছু অসুখ হতে পারে।] মাত্র দুটি দেশে এই ভাইরাস মজুত করা আছে—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাদের ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর-এর মধ্যে কমিটির প্রস্তাব কার্যকরী করতে হবে। ভাইরাসের জিন (Gene—বংশগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান) সংক্রান্ত গঠন বিষয়ে আরও গবেষণা করার জন্য এই সময় দেওয়া হলো।

সরকারিভাবে পৃথিবী থেকে বসন্তরোগকে নির্মূল করা হয়েছে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পৃথিবীর শেষ বসন্তরোগী ছিল আফ্রিকার সোমালিয়াবাসী এক রাঁধুনী। অবশ্য ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে একটি ছোট-খাট বসন্তরোগের মড়ক হয়েছিল ইংল্যান্ডে, যাতে একজন মারাও গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটি ঘটেছিল বার্মিংহামের একজন ল্যাবরেটরি-কর্মীর সংক্রমণের মাধ্যমে (অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে বসন্ত-ভাইরাসের ওপর কাজ করার সময় সংক্রমণ হয়েছিল)। বর্তমানে দুটি জায়গায় উচ্চ ধরনের নিরাপত্তা-ব্যবস্থার (high security) মধ্যে জমানো (frozen) অবস্থায় ভাইরাস রাখা আছে—অ্যাটলান্টার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (Centre for Disease Control)-এ এবং মস্কোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ভাইরেল প্রিপ্যারেশন (Research Institute for Viral Preparation)-এ। ঠিক হয়েছে যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ব্যাপারে ৬০ লক্ষ ডলার খরচ করবেন এবং তাদের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি ভাইরাসের জিন সংক্রান্ত এই গবেষণার তত্ত্বাবধান করবেন। এই কাজে কয়েকটি ভাইরাসের ডি. এন. এ. গঠনের বিন্যাস (DNA sequence) দেখা হবে; অন্য কিছু বসন্ত-ভাইরাসের অবিন্যস্ত ডি. এন. এ.-র টুকরো ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে (Bacterial genome) সঞ্চিত রাখা হবে। এইরকম ভাবে রাখলে ভবিষ্যতে পক্স জাতীয় অন্য রোগ নির্ণয়ে সাহায্য হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করেছে, জীবাণু বা জীবপরমাণুর কোন প্রজাতিকেই তার জিন-সংক্রান্ত গঠন সম্পর্কে সমস্ত খবর জানার আগে ধ্বংস করা হবে না। দুটি জায়গায় মজুত ভাইরাস ধ্বংস করার পরে যে পাঁচ লাখ মাত্রার বসন্তরোগের টিকা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় রক্ষিত আছে, তাও ধ্বংস করা হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে বসন্তরোগ নির্মূল করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। সেই সময় সারা বিশ্বে এক কোটি বসন্তরোগী ছিল। রোগ নির্মূল করার কর্মসূচীতে ছিল: শহর ও গ্রামে সর্বত্র কাজে নামা, লক্ষ্যীভূত লোকদের টিকা দেওয়া এবং যেসব সুস্থ লোক রোগীর সংস্পর্শে এসেছে, তাদের আলাদা করে রাখা। এর ফলেই সর্বপ্রথম মানুষের একটি রোগকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

[British Medical Journal, 16 February, 1991, p. 373]

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র
বাঙলা মুখপত্র, বিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

৯৩তম বর্ষ কার্তিক ১৩৯৮

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও দেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

৯৪তম বর্ষ **উদ্বোধন**

সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় যে, গত কয়েকমাস যাবৎ গ্রাহকদের অনেকে সাধারণ ডাকে, এমনকি রেজিস্ট্রি ডাকেও, উদ্বোধন হয় দেরিতে পাচ্ছেন অথবা একেবারেই পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন। সহৃদয় গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানাই যে, স্থানীয় ডাকঘর এবং ঊর্ধ্বতম ডাকবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের পত্রিকা-প্রাপ্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিতরণের আশ্বাসও দিয়েছেন। গ্রাহকদের অনেকেই ভাবছেন হয়তো উদ্বোধন-এর পক্ষ থেকে ঠিকমতো পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয় না। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। আমরা নিয়মিত পত্রিকা ডাকে দিয়ে থাকি। ডাকঘরের সঙ্গে ব্যবস্থামতো প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ২৩ অথবা ২৪ তারিখ গ্রাহকদের পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়।

মাঘ ১৩৯৮—পৌষ ১৩৯৯

জানুয়ারি ১৯৯২—ডিসেম্বর ১৯৯২

☐ আগামী মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১-এর মধ্যে আগামী বর্ষের (৯৪তম বর্ষ : ১৩৯৮-১৩৯৯/১৯৯২) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ : চল্লিশ টাকা ☐ ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ : পঞ্চাশ টাকা ☐ বাংলাদেশ—নব্বই টাকা ☐ বিদেশের অন্যত্র— দুশো টাকা (সমুদ্র-ডাক), চারশো টাকা (বিমান-ডাক)।

আজীবন গ্রাহকমূল্য : এক হাজার টাকা

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও (অনূর্ধ্ব বারোটি) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা (প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা) জমা দিতে হবে।

☐ ভারতের বাইরে (বাংলাদেশ ছাড়া) থেকে আজীবন গ্রাহক হলে সমুদ্র-ডাক ও বিমান-ডাক সহ যথাক্রমে ৩৫০ ও ৬০০ ডলার (আমেরিকান) দিতে হবে। বাংলাদেশ—২০০০ টাকা (ভারতীয়)।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়। চেকের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

☐ উদ্বোধন-প্রকাশিত গ্রন্থে গ্রাহকরা ১০% এবং আজীবন গ্রাহকরা ২০% কমিশন পাবেন।

☐ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯·৩০—৫·৩০ ; শনিবার বেলা ১·৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

☐ ঠিকানা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ ; টেলিফোন : ৫৪-২২৪৮

☐ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র (মাসিক) উদ্বোধন আপনাকে পড়তেই হবে।

কার্তিক ১৩৯৮ | অক্টোবর ১৯৯১ | ৯৩তম বর্ষ—১০ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

পুরা কল্পে যথাবৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা।
প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ ॥
প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ।
তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিদশসত্তমঃ ॥
এবং রামো সহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ।
ভাবিভব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ততে ॥

—পূর্ব কল্পে যেমন ঘটিয়াছিল (দেবী কর্তৃক মহিষাসুর প্রভৃতি দানবগণকে নিধন), প্রতি কল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে (যেমন ত্রেতাযুগে আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমীতে রামচন্দ্রের প্রার্থনায় দেবীর আবির্ভাব এবং নবমীতে তাঁহার আশীর্বাদে রাবণ-নিধন)। প্রতিকল্পেই দৈত্যগণের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্তা হন এবং রাবণরূপী রাক্ষস ও রাম প্রতিকল্পেই জন্মগ্রহণ করেন।

কালিকাপুরাণ (৬০।৪০-৪৩)

কথাপ্রসঙ্গে

শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধন-এর পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতা আমাদের সকলের হৃদয়ে সতত শুভবুদ্ধি ও আত্মশক্তি জাগ্রত রাখুন এবং তাঁহার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

প্রসঙ্গ বিজয়া

যাহার জন্য সম্বৎসর ধরিয়া স্বদেশে প্রবাসে বাঙালী ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেই দুর্গোৎসব সমাপ্ত হইয়াছে। আনন্দময়ী আসিয়াছিলেন; আমাদের প্রাসাদ কুটির সর্বত্র এক অপূর্ব আনন্দ-মূর্ছনা মন্দ্রিত হইতেছিল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের মধ্যে সেই মূর্ছনা এক মধুর শিহরণ সৃষ্টি করিয়াছিল। বাঙালীর জীবনে দুর্গোৎসব যে কোন্ গভীর তন্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না। বাস্তবিক, আর কোন উৎসব যে কোন জাতিকে, কোন দেশকে এইভাবে ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা-শিশু নির্বিশেষে এমনভাবে মাতাইয়া দিতে পারে, আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে, অভিভূত করিয়া দিতে পারে, তাহার অন্যতর দৃষ্টান্ত ভারত বা জগতের অন্যত্র কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ সমাজের নানা সম্প্রদায়, নানা স্তরের মানুষ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যেভাবে দুর্গাপূজার সহিত যুক্ত থাকে তাহার তুলনা সত্যই বিরল। আজ বাঙালীর জীবনে নানা সমস্যা, নানা সংকট। বলা যায়, সমস্যা ও সংকটে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী আজ জর্জরিত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙালীর দৈন্যদশা অতি-প্রকট। কিন্তু এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালী যেন তাহার সমস্ত দৈন্য ও মালিন্যকে কয়েকদিনের জন্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়। বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অভাব, অনটন, প্রাত্যহিক জীবনের বহুতর গ্লানি ও অসাফল্য—কোন কিছুই যেন বাঙালীর মনে উৎসবের কয়েকদিন কোনভাবে রেখাপাত করিতে পারে না। সত্যই ইহা অভাবনীয়, অথচ বাস্তব একটি ঘটনা। কি গ্রামে, কি শহরে উৎসব-প্রাঙ্গণগুলিতে মানুষের উজ্জ্বল ও আলোকিত মুখগুলি দেখিতে দেখিতে বারবার মনে একটি আকুতি স্বতই গুঞ্জরিত হইয়া উঠে—দুর্ভাগা বাঙালীর জীবনে দুর্গোৎসব যেন কখনও হারাইয়া না যায়! দুর্গোৎসব হারাইয়া যাইলে কী লইয়া সে বাঁচিবে, কোন্ উদ্দীপনায় সে বৎসরের বাকি দিনগুলিতে সংগ্রাম করিবে?

বৎসরান্তের ঐ আনন্দমুখর দিন তিনটি অবশ্যই কালের নিয়মে শেষ হয়। প্রতি বৎসরই হয়। কিন্তু চতুর্থদিনের পরিবেশে পরিমণ্ডলে আনন্দময়ীর প্রত্যাবর্তনে দুঃখের যে সুর বাজিয়া উঠিতেছিল তাহাই আবার আশ্চর্যজনকভাবে কোন্ যাদুতে দিনান্তে নূতনতর এক আনন্দ-সঙ্গীতের মূর্ছনায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। দুর্গোৎসবের চতুর্থ দিবসের এই অসাধারণ পর্বটির নাম 'বিজয়া'। কী অপূর্ব নামকরণ! কী অসাধারণ ঐ শব্দটি। তিন দিবসের আনন্দকে অনাগত তিনশত এবং ততোধিক দিবসের জন্য পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিবার জন্যই যেন ঐ তিন অক্ষরের শব্দটি নির্বাচন করা হইয়াছে। দশমীর দিন হইতে পূজামণ্ডপের স্বর্ণোজ্জ্বল দীপশিখার আলোক, চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎমালার রোশনাই, ধূপের স্নিগ্ধ সুরভি, অগণিত মানুষের উৎফুল্ল মিছিল—সবই অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু রহিয়া যায় বিজয়ার আলিঙ্গনের সুখস্পর্শ, বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের আনন্দস্মৃতি, বিজয়ার অঙ্গীকারের অগ্নি-শিহরণ, বিজয়ার প্রার্থনার পুণ্য-প্রবাহ।

পুরাকালে অথবা আমাদের পূর্বপুরুষগণের কল্পনায় আনন্দময়ীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল নিরানন্দের হেতুকে ধ্বংস করিবার জন্য। মা আসিয়াছিলেন আমাদের জীবন হইতে দুঃখকে নাশ করিতে, দুর্বলতাকে বিদলন করিতে। মহিষাসুর, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ, চণ্ড-মুণ্ড প্রমুখ মানুষের দুর্দৈবের, মানুষের দুর্বলতার চিরন্তন প্রতীক, যাহা যুগে যুগে, কালে কালে, ক্ষণে ক্ষণে মানুষের জীবনে নামিয়া আসে, মানুষের মনে বাসা বাঁধে। উৎসবের প্রথম তিনদিন, মায়ের সহিত—আদি-শক্তির সহিত মহিষাসুরপ্রমুখের সংঘর্ষ হয়, সংগ্রাম হয় এবং অবশেষে মা উহাদের পর্যুদস্ত করেন। আদি-শক্তির সহিত সংগ্রামে অপশক্তির পরাভব ঘটে। মায়ের এই বিজয়, আদি-শক্তির এই জয়লাভ অবধারিত, অনিবার্য। সেই বিজয়ের স্মারকরূপে দুর্গাপূজার চতুর্থ দিবসে 'বিজয়া'র অনুষ্ঠান।

মহিষাসুর প্রমুখ যে আমাদেরই দুর্বলতার প্রতীক, আমাদেরই কুৎসিৎ সত্তার প্রতিভূ তাহা আগেই বলা হইয়াছে। এখন ঐ 'মা' কে, ঐ আদি-শক্তি কী তাহা বলিব। ঐ 'মা' হইলেন আমাদের অন্তরস্থিত নিত্য-জাগ্রত বিবেক, ঐ আদি-শক্তি হইল আমাদের সহজাত দিব্যভাব, দিব্যসত্তা। মানুষের মধ্যস্থিত দিব্যভাব বা দিব্যসত্তা যেমন মানুষের

সহজাত, তেমনই সহজাত উহার দুর্বলতাও, উহার পশুভাবও। উভয়কে লইয়াই মানুষ পৃথিবীতে আসে। সৃষ্টির নিয়মই বুঝি এই যে, শুভশক্তির প্রভাব ও পরাক্রম অনতিক্রম্য এবং অমোঘ হইলেও, প্রাথমিক ভাবে অশুভশক্তির প্রভাব যেন দুরতিক্রম্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। অশুভশক্তির তাৎক্ষণিক একটি তড়িৎপ্রভাবতুল্য প্রসারণ-ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য। যুগে যুগে, কালে কালে, দেশে দেশে ইহার প্রমাণ আমরা পাই। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রমাণটিও পাই যে, শেষ পর্যন্ত অশুভশক্তি শুভ-শক্তিকে দাবাইয়া রাখিতে ব্যর্থ হয়ই এবং শুভশক্তি অশুভশক্তিকে পর্যুদস্ত করেই। কিন্তু যে-ক্ষতি, যে-বিপর্যয়, যে-রক্তক্ষয় প্রাথমিক পর্যায়ে অশুভশক্তি করিয়া দিয়া যায়, পরিণামে শুভশক্তির জয় হইলেও অশুভ-কৃত ক্ষত শুকাইতে সময় লাগে এবং ক্ষতির পরিমাণও ভয়াবহ। কিন্তু মানুষের ইতিহাস বলে যে, এই ক্ষত এবং ক্ষতিকে পরিহার করিবার উপায় নাই। ইহা যেন প্রকৃতির নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে মানুষের মনে, বিশেষতঃ যাহারা সৎ, যাহারা ন্যায়-পরায়ণ, যাহারা শুভের প্রেরণায় পরিচালিত, তাহাদের মনে হতাশা জাগা স্বাভাবিক। সৎ হইতে, ন্যায়ের পথে চলিতে, শুভের আদর্শকে অনুসরণ করিতে মানুষের আগ্রহ এবং উদ্যম ইহাতে নষ্ট হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। অথচ শুভ না থাকিলে সমাজ রক্ষা পাইবে না, সভ্যতা বিপন্ন হইবে, মানুষ পশুস্তরে নামিয়া যাইবে। আবার অশুভও তো থাকিবেই এবং উহার প্রভাবও প্রচণ্ড শক্তিশালী। অশুভের শক্তিকে নাশ করিবার জন্য, অশুভের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য শুভ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ফলপ্রদ মাধ্যমও কিন্তু নাই। অশুভকে দূর করিতে হইলে শুভের দ্বারাই তাহা সম্ভব। অন্ধকার দূর করিতে হইলে যেমন আলোকই একমাত্র মাধ্যম, তেমনই অশুভের মূলোৎ-পাটনের জন্য শুভকেই প্রয়োজন। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ তাই তাঁহাদের সৃষ্ট কাব্য ও সাহিত্যে, ধর্মগ্রন্থ ও লোককাহিনীতে, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে শুভ এবং অশুভের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে শুভের বিজয়কে মানুষের মনে গাঁথিয়া দিবার জন্য তুলিয়া ধরিয়াছিলেন রক্তমাংসে গঠিত অ-লৌকিক কিছু চরিত্র, যাঁহাদের মধ্যে প্রতীকায়িত হইয়াছিল মানুষের অন্তরস্থিত চিরন্তন শুভ এবং চিরন্তন অশুভ। উহাতে দেখানো হইয়াছে যে, অশুভ অবশ্যই পরাক্রান্ত, তবে উহার পরাজয়ও অবশ্যম্ভাবী। শুভের প্রভাব বিস্তৃত হইতে সময় লাগিতে পারে, কিন্তু শুভের প্রভাব অমোঘ এবং পরিশেষে শুভের জয় অনিবার্য। আমাদের পূর্বপুরুষগণের পূর্বোল্লিখিত সদর্থক চিন্তা ও ভাবনা যে কত সঠিক ছিল তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির আবেদনের কালোত্তীর্ণতা এবং উহাতে চিত্রিত আদর্শ চরিত্রগুলি সম্পর্কে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষের সমুচ্চ শ্রদ্ধা বিচার করিলে। সুপ্রাচীন লোককাহিনী ও লোকগাথাগুলিতে এবং গুহা, মন্দির, বিহার প্রভৃতির শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে উপস্থাপিত আদর্শ চরিত্র ও ঘটনাগুলি আজও মানুষকে আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সাংস্কৃতিক বিপর্যয় যে বারবার প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে তাহার পিছনে আমাদের পূর্বপুরুষগণের উল্লিখিত চিন্তা ও কীর্তির ভূমিকা কম নহে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি প্রাচীন ধর্মসাহিত্যের প্রধান তাৎপর্য হইল প্রতীকী। উহাদের মধ্যে ইতিহাস বা ঐতিহাসিক উপাদান যে নাই তাহা নহে, তবে উহাদের প্রকৃত বক্তব্য প্রতীকীই। যেসমস্ত মহৎ অথবা হীন চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা সেখানে পাই, অথবা যেসব কাহিনীর মাধ্যমে সেইসমস্ত চরিত্রের মহত্ত্ব বা হীনত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাদের ঐতিহাসিকত্ব আমাদের পূর্ব-পুরুষগণের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তাঁহারা ঐ চরিত্রগুলি অথবা ঘটনাগুলির মাধ্যমে মানব-আদর্শের উজ্জ্বল ও অন্ধকার দিকগুলি তুলিয়া ধরিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি এবং রাবণ, দুর্যোধন, মহিষাসুরাদি বাস্তবিক ছিলেন কিনা এবং থাকিলে ঐরূপ মহৎ অথবা দুরাত্মা ছিলেন কিনা, তাহার 'পাথুরে প্রমাণ' পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু যেভাবে তাঁহারা চিত্রিত হইয়াছেন তাহাতে পরবর্তী কালের মানুষ তাঁহাদের মধ্যে মহত্ত্ব ও হীনত্বের চূড়ান্ত রূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। তাহার ভিত্তিতে তাহারা মহৎকে অনুসরণ এবং হীনকে বর্জন করিবার জন্য প্রেরণালাভ করিয়াছে।

'বিজয়া'র উৎস ও তাৎপর্য লইয়া নানা মত রহিয়াছে। তবে আমাদের মনে হয়, 'বিজয়া'র উৎস থাকিতে পারে 'চণ্ডী'তেই। 'বিজয়া'র অর্থ বিজয়োৎ-সব—শত্রু-বিজয় উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠান। 'চণ্ডী'তে দেখি, ত্রিলোকের ত্রাস, দেবতা ও মানবের পরমশত্রু

মহিষাসুর দেবী দুর্গা কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং এই ঘটনা যেমন দেবতাদের পক্ষে আনন্দের, তেমনই ঋষি মুনি ও সাধারণ মানুষের পক্ষেও উল্লাসের। দুরাত্মা মহিষাসুর যেন সভ্যতার শত্রু। সেই মহিষাসুর নিহত হওয়াতে ত্রিভুবনে যে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কী? দুর্গার খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক মহিষাসুর ধরাশায়ী হইলে অসুরসৈন্য হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে, আর অন্যদিকে স্বর্গে-মর্তে বিজয়োৎসব শুরু হইয়াছে। 'চণ্ডী'র সেই 'বিজয়'-বর্ণনা অতি সুন্দর :

ততো হাহাকৃতং সর্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥
(৩।৪৩—৪৪)

—তখন সেইসকল অসুরসৈন্য হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং দেবতাগণ পরম আনন্দ করিতে লাগিল।

দেবতাগণ স্বর্গস্থিত মহর্ষিগণের সহিত দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্বপতিগণ গীতবাদ্য এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন।

দেবীর এই অসুরবিজয়ের স্মারক হিসাবেই 'বিজয়া'র প্রবর্তন হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ বলেন, নবমীতে রাবণবধের পর দশমীর দিন রামচন্দ্রের সৈন্যগণ যে বিজয়োৎসব করিয়াছিল, তাহা হইতেই নাকি 'বিজয়া'র উৎপত্তি। এবিষয়ে শেষকথা বলিবার অধিকারী অবশ্যই আমরা নহি। তবে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান বহুপ্রসিদ্ধ কিংবদন্তী। তদনুসারে দুর্গার অনুগ্রহেই রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণেও এবিষয়ে ইঙ্গিত রহিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে তিরাশিতম অধ্যায়ের চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইতেছে—ধনুষ্পাণি রঘুনন্দন রামচন্দ্র জয়লাভের জন্য ব্রহ্মার বিধান অনুযায়ী মায়াযোগ অর্থাৎ মহামায়া দুর্গার আরাধনা করিয়াছিলেন :

স সংপ্রেক্ষ্য ধনুষ্পাণির্মায়াযোগমরিন্দমঃ।
তস্থৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং রঘুনন্দনঃ ॥

[বাল্মীকি রামায়ণের এই শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণ দুর্গাপূজার সহিত রাবণবধের সম্পর্ক বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত এবং শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত কালিকাপুরাণের ভূমিকায় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন।] ঘটনা হিসাবে মহিষাসুরবধ রাবণবধ অপেক্ষা প্রাচীন, তবে গ্রন্থ হিসাবে বাল্মীকি রামায়ণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের ('চণ্ডী' যাহাতে অন্তর্ভুক্ত) মধ্যে প্রাচীনত্ব লইয়া পণ্ডিতগণ বিচার করিতে পারেন।

দেবীর বিজয় অথবা রামচন্দ্রের বিজয়—যাহাই 'বিজয়া'র উৎস হউক না কেন, 'বিজয়া'র তাৎপর্য হইল শুভশক্তির বিজয়। দেবী এবং রামচন্দ্র শুভশক্তির প্রতীক, মহিষাসুর এবং রাবণ অশুভশক্তির প্রতীক। পুরাকালে হিন্দু রাজারা যুদ্ধযাত্রা করিতেন বিজয়া দশমীর দিন। সেই প্রথা বা রীতির পশ্চাতে বিজয়ার পূর্বোক্ত পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রভাব যে ক্রিয়াশীল ছিল তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তী কালে 'বিজয়া'র সহিত একটি ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্য সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিজয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে মিলনের উৎসব, সম্প্রীতির উৎসব, সংহতির উৎসব। বিজয়া যেন মিলন, সম্প্রীতি ও সংহতির প্রতীক। যাহা মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে, দ্বেষ-হিংসা জাগাইয়া তোলে, অনৈক্যের বীজ বপন করে তাহাকে নাশ করিবার প্রেরণা দেয় বিজয়া। সেই 'শত্রু'-নাশের মধ্যে নিহিত থাকে মানুষের সার্বিক কল্যাণ, সমাজের 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল' প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। অশুভশক্তির প্রকাশ লোভে, হিংসায়, স্বার্থপরতায় এবং নীতিহীনতায়। শুভের প্রকাশ ত্যাগে, প্রেমে, দাক্ষিণ্যে এবং ন্যায়নিষ্ঠায়। 'বিজয়া'র তাৎপর্য মানুষের মধ্যে শুভবোধের জাগরণ ঘটানো, সেই শক্তির বিকাশ করা যাহাতে সে অশুভকে জয় করিতে পারে, অসুরকে নাশ করিতে পারে। সেই বোধ, সেই শক্তি স্ফুলিঙ্গের মতো শুধু বিজয়ার কয়েকটি মুহূর্তে স্থায়ী হইলে বিজয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। স্ফুলিঙ্গের মধ্যে অগ্নি থাকে, কিন্তু সেই অগ্নি ক্ষণস্থায়ী। জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা, আমাদের অন্তরস্থ শক্তিকে আপনি জাগ্রত করিয়া দিন। কিন্তু সেই শক্তির প্রকাশ যেন স্ফুলিঙ্গস্তরেই শেষ না হইয়া যায়, তাহা যেন বিস্তৃতি ও স্থিতি লাভ করে অচঞ্চল অগ্নিশিখায়।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীহরিঃ

শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির
আলমোড়া
১।৬।(১৯)১৬

প্রিয় প্রজ্ঞানন্দ,

তোমার ২৬শে মের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আমরা ২২শে মে সোমবার ঠাকুরের কুটিরে পূজাহোমাদি করিয়া সেইদিন হইতেই তথায় আশ্রয় লইয়াছি। কারণ চিলকাপিঠা বাংলায় সাহেবের জিনিসপত্র তখন হইতেই আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অতুল তাহার ভাড়াবাটীতে দুইদিন পরে উঠিয়া গিয়াছিল। অতুলের বাটী বাড়িওয়ালারা চূণকাম, আবশ্যকীয় মেরামত ইত্যাদি ও ডিস্ইনফেক্ট করিয়া দিয়াছে। এখন সে তথায় বেশ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে। আমরা বাধ্য হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই কুটিরে উঠিয়া আসায় কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। ক্রমে আমরা উহা বাসোপযোগী করিয়া লইতেছি। শীঘ্রই একরূপ কাজ-চালানো গোছের হইয়া যাইবে। পরে অন্যান্য যাহা প্রয়োজন [তাহা] হইতে থাকিবে। মহাপুরুষের[১] পত্র পাইয়াছি। তিনি জুন মাসে আলমোড়া আসিবেন লিখিয়াছেন। সুতরাং দুই-এক সপ্তাহ মধ্যেই তিনি এখানে আসিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি আসিলে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইব বলা বাহুল্যমাত্র। বোধহয় তাঁহাদের আর একবার শিলং যাওয়া হইল না। বর্ষাকালে শিলং-এর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। এখানে আজ দুইদিন হইতে বেশ বৃষ্টি হইতেছে। লোকজনের মহানন্দ। শস্যাদি রক্ষা পাইবে, নচেৎ সব মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখন বেশ ঠাণ্ডাও পড়িয়াছে। কিছুদিন এইরূপ থাকিবে। কাল গুরুদাসের[২] এক পোস্ট কার্ড পাইয়াছি। শ্রীনগর ছাড়িয়া লিখিয়াছিল, দশ দিনে উহা আসিয়াছে। বেশ আনন্দে যাইতেছে, অবনী[৩] সঙ্গে আছে। বোধহয় এতদিনে ৺কেদারনাথ দর্শন হইয়া থাকিবে। সীতাপতি[৪] অতুলকে এক পত্র লিখিয়াছিল। সে কেদারনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় পথে জ্বরাক্রান্ত হইয়া কোনরূপে ওখীমঠে আসে এবং তথাকার হাসপাতালে আশ্রয় লয়। অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছে, তাই এবার আর বদ্রীনারায়ণ-দর্শনের চেষ্টা করিবে না। চামোলি বা লালসাঙ্গায় আসিয়া দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে স্থির করিয়াছে। তারানাথ তাহার সঙ্গে আছে। অতুলকে দশটি টাকা টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছে। অতুল তাহা কাল পাঠাইয়া দিয়াছে। কালীকৃষ্ণের[৫] নিকট হইতেও একখানি পত্র পাইয়াছি। মিসেস সেভিয়ার নিরাপদে গৃহে পৌঁছিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কালীকৃষ্ণ অনেক কথা লিখিয়াছে—তাহার মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছে আমি শীঘ্র মায়াবতী যাইতেছি কিনা। আমি তাহার অবশ্য সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হই নাই। প্রভুর ইচ্ছা যেমন হয় হইবে, এইরূপ লিখিয়াছি। ব্রহ্মচৈতন্য কনখল যাইবে স্থির হইয়াছে। তাহার পত্র পাইয়াছি। মহারাজ[৬] তাহাকে কনখলে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। বেশ ভাল হইল। কনখল স্থান মন্দ নহে এবং সেখানে সকল বন্দোবস্ত আছে। সে মাসিক পঁচিশ টাকা তাহার খরচের জন্য সংগ্রহ করিতে পারিবে লিখিয়াছে। অতএব তাহাতে তাহার অনায়াসে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিবে। তাহার অসুখ তত ভারি নহে। কনখলে সহজেই সে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।

১ স্বামী শিবানন্দের ২ স্বামী অতুলানন্দের ৩ স্বামী প্রভবানন্দ
৪ স্বামী রাঘবানন্দ ৫ স্বামী বিরজানন্দের ৬ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

বৈরাগ্যশতক এরই মধ্যে তোমরা ছাপাইয়া ফেলিয়াছ। প্রবন্ধ ভাণ্ডারের মুদ্রিত অংশ বোধহয় অধিক সংখ্যায় ছাপাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলে। তাহাই উত্তমকল্প। স্বরূপানন্দও ঐরূপ করিত দেখিয়াছিলাম। তোমাদের প্রকাশিত ক্ষুদ্র উপনিষদ্ আমি পাই নাই। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইবে জানিয়া খুশি হইলাম। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ স্বামীজীর Complete Works-এ কেন বাহির হইবে বুঝিতে পারিলাম না। উহা তো শরৎ চক্রবর্তীর লেখা। স্বামীজীর Complete Works-এ স্বামীজীরই নিজের যাহা কিছু থাকাই উচিত।... আমার শরীর একরূপ ভালয় মন্দয় চলিতেছে। অতুল, ক্ষুদু, কানাই সকলেই ভাল আছে। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। ওঁকার-স্বামীর একটি বুকপোস্ট আমার নিকট আসিয়াছিল, মায়াবতীতে পাঠাইয়া দিয়াছি। তোমরা সকলে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে।*

ইতি—
শ্রীতুরীয়ানন্দ

* এই পত্রের '...' চিহ্নিত অংশ ইতিপূর্বে উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ৫ম সং, পৃঃ ১৫৪-তে মুদ্রিত হয়েছে।—যুগ্ম সম্পাদক।

(২)
শ্রীহরিঃ
শরণম্।

আলমোড়া
১২।৬।(১৯)১৬

প্রিয় প্রজ্ঞানন্দ,

তোমার ৭ই জুনের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। গতকল্য ৺বদ্রীনারায়ণ হইতে গুরুদাসের এক পোস্ট কার্ড আসিয়াছে। তাহারা চারজনে বদ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়া ৬ই কি ৭ই তারিখে সেখান হইতে ফিরিয়াছে ও সকলে বেশ ভাল আছে। এইবার বোধহয় তাহারা আলমোড়ার দিকে আসিবে। আলমোড়ায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির নির্মিত হইয়াছে তাহা কিরূপ তুমি জানিতে চাহিয়াছ। উহা অতি ক্ষুদ্র—চারিটি মাত্র ঘর। দুটি উপরে ও তাহার নিম্নে দুটি। ১২ × ১০ ফুট। উভয় দিকে বারান্ডা, উপরে ও নিচে একটি রোয়াক ঘরের সম্মুখে, উপরের পিছন বারান্ডায় একটি ছোট বাথরুম। বারান্ডা বেশ প্রশস্ত ও তাহার সম্মুখের দৃশ্যও বেশ সুন্দর। খুব একান্ত দেশ। বাজার হইতে এক মাইলের উপর দূর। চিলকাপিঠা হাউস নিচে বেশ দেখা যায়। কিছুদূরে অন্যদিকে দু-তিনটি বাংলো। যাহার একটিতে লক্ষ্ণৌ-এর একটি ভদ্রলোক প্রতিবেশী—পরিবার লইয়া ৫/৬ বৎসর হইতে বাস করিতেছেন। আর দুটি বাংলায় কখনো লোক থাকে, কখনো-বা খালি পড়িয়া থাকে। সুতরাং খুব নির্জন থাকে। সর্বদাই বেশ বায়ু চলিয়া থাকে, তজ্জন্য ঠাণ্ডা। অন্য স্থানে গরম বোধ হইলেও এখানে তেমন গরম বোধ হয় না। কুটিরটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে আমরা বাসের জন্য একরূপ ঠিক করিয়া লইয়াছি। কেবল একটি পায়খানা তৈয়ার করিতে হইবে। মোহনলাল লোহার চাদরের পায়খানা করিতে পরামর্শ দিতেছে। যাহা হয় শীঘ্র একটা করিতে হইবে। তাহা হইলেই এখানে থাকার আর কোন কষ্ট হইবে না। যাহা বাকি থাকিবে তাহা পরে ক্রমেই তৈয়ার করিলে ক্ষতি নাই। অবশ্য বারান্ডা একটি (সম্মুখের) যত শীঘ্র তৈয়ার হয় ততই ভাল। কারণ বর্ষার জলে উহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। টিনের চাদর দিয়া ঘিরিয়া দিতে হইবে এবং কাচ লাগাইয়া ঘরের মতো করিয়া নিতে পারিলে সুন্দর হয়। কিন্তু তাহা ব্যয়সাপেক্ষ। আর দেওয়াল তুলিয়া জায়গাটি terrace-যুক্ত করিতে হইবে—উহাতেও অনেক খরচ। এই দুইটি করিতে পারিলেই আর

কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু সম্প্রতি উহা স্থগিত থাকিবে বোধ হইতেছে। মহাপুরুষ আসিলে তিনি যেমন বিবেচনা করেন সেইরূপ করিবেন। আমি নিশ্চিন্ত হইব। এইমাত্র তোমাদের অফিস হইতে প্রেরিত রেজিস্টারড বুকপোস্ট পাইলাম। কানাই ও আমি এখন উপরের ঘরে রহিয়াছি ও নিচের একটি ঘরে রান্নাবান্না হয়। বাহিরে ময়দানে মলত্যাগের জন্য যাইতে হইতেছে। সুতরাং যত শীঘ্র হয় পায়খানাটি করিতে হইবে। মহাপুরুষ একটি স্বতন্ত্র রান্নাঘর ও চাকরদের ঘর করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। হইলে খুব ভাল হয়। তা তিনি আসিয়া যেমন হয় করিবেন। অতুল বাজারের নিকট অথচ বেশ একান্ত স্থানে একটি বাটী ভাড়া লইয়াছে। ক্ষুদুও তাহার নিকট রহিয়াছে। উভয়েই ভাল আছে। কানাই আমার নিকট থাকে, তাহার শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ নয়। যকৃতের দোষ তাহার পূর্ব হইতেই ছিল। দেশে নামিয়া গিয়া শরীরটা খুব খারাপ হইয়াছিল। এখানে আসিয়া অনেকটা সারিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু গোলমাল হয়। আমার শরীর এই ঠাণ্ডা পড়ায় একটু ভাল বোধ করিতেছি। তবে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রায় একরূপই আছে। ...প্রতাপবাবুর সহিত আমার পত্র-ব্যবহার অনেকদিন হইতেই আছে। তিনি আমাকেও পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন। আমি উত্তরও দিয়াছি। মহাপুরুষের গত পরশ্ব এক পত্র পাইয়াছি। শীঘ্রই আসিবেন লিখিয়াছেন। সঙ্গে কেহ আসিবে এরূপ লিখেন নাই। কালীকৃষ্ণ আমাকে অনেকদিন হইতে তাহার আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছে। প্রভুর ইচ্ছা হয় তো কখনো উহা দেখিব।...*

ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

*** এই পত্রের '...' চিহ্নিত অংশ ইতিপূর্বে উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ৫ম সং, পৃঃ ১৫৬-তে মুদ্রিত হয়েছে।—যুগ্ম সম্পাদক।**

(৩)

শ্রীহরিঃ

শরণম্।

আলমোড়া

১০।৮।(১৯)১৬

প্রিয় প্রজ্ঞানন্দ,

তোমার ৮ই আগস্টের পত্র গতকল্য বৈকালে পাইয়াছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম।... সীতাপতি বেশ স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। যখন প্রথম কেদার-বদ্রীর ফেরৎ এখানে আসিয়াছিল তখন যদি দেখিতে তো চেনা ভার হইত। সে এখান হইতে অনেক ভাল অবস্থায় মায়াবতী গিয়াছিল। এইখানে অনেকদিন পূর্বে ওজন হইয়াছিল। মাত্র এই কয়দিনেই তিন সের ওজন বাড়ে নাই। যাহাই হউক তাহার শরীর সারিতেছে ইহাই সুসংবাদ ও পরম লাভ। বিশ্রাম ও আহারাদির একটু পরিপাটি হইলেই আবার পূর্ব স্বাস্থ্য শীঘ্র লাভ করিতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সীতাপতি এখন সুখীডাঙ্গা না যাইয়া ভালই করিয়াছে। কালীকৃষ্ণ ভাল আছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। মাদার[১] দেশে যাইয়া এখান হইতে বেশ ভালই আছেন শুনিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। বুড়ি কিছুকাল বাঁচিয়া থাকুক, এই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের এখানে দুটি বাঙ্গালী সাধু সম্প্রতি কৈলাস দর্শন করিয়া আসিয়া দুই-তিন দিন ছিলেন। আজ প্রাতে তাঁহারা গোরক্ষপুর যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক কথা শোনা গেল।

১ মিসেস সেভিয়ার

শুধু কৈলাস নয়, তাঁহারা সমস্ত নেপাল ও তিব্বতের কিয়দংশ পার হইয়া আসিয়াছেন। বয়স অল্প, তাই এত কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়াও শরীর বেশ ভাল রাখিতে পারিয়াছেন। ইহাদের একটিকে আমি কনখল ও পরে হৃষীকেশে দেখিয়াছিলাম। দুইজনেই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। যাহাকে আমি জানি তিনি ঢাকা conspiracy মকদ্দমায় সাত বৎসরের জন্য কারাবাসদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, পরে আপিলে মুক্তিলাভ করিয়াই সাধু হইয়া যান। আমাদের মঠে থাকিবার জন্য অনেক যত্ন-চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য না হওয়ায় গোরক্ষপুরের গম্ভীরনাথ বাবার শরণ গ্রহণ করেন। এক্ষণে তাঁহার নিকটেই আবার গিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞাতেই এই দুষ্কর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিলেন এবং তাঁহার আদেশমতোই পূর্বেও চার বৎসরের জন্য উত্তরাখণ্ডের অনেক স্থানে থাকিয়া সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়স আন্দাজ পাঁচিশ বৎসর হইবে। অন্যটির বয়স বোধহয় কুড়ি-একুশ। ছোটটি এখনও সম্পূর্ণভাবে সংসার ত্যাগ করেন নাই। বোধহয় চেষ্টায় আছেন। তিনিও গম্ভীরনাথের শিষ্য। তাঁহার পিতা-মাতাও গম্ভীরনাথের দ্বারা দীক্ষিত। পিতা মৈমনসিং-এর একজন ভাল উকিল।

আমাদের এখানে আজকাল বৃষ্টি কিছু কম পড়িয়াছে। তাই কুটির মেরামতের চেষ্টা আবার ভাল করিয়া হইতেছে। যদি এইরূপ চলে, আশা হয় তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে অনেক কাজ হইয়া যাইতে পারিবে। নিচের দেওয়াল হইয়া গিয়াছে। প্রথমে উহা যেরূপ দীর্ঘায়তন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল পরে বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহা রহিত করা হয়। এখন উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় চল্লিশ ফুট ও উচ্চতায় আট-দশ ফুট করা হইয়াছে। গভীর পাঁচ ফুট মাত্র হইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীরের কার্যও চলিতেছে। পরে বারাণ্ডা প্রভৃতি যাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার সংস্কার হইবে। শ্রীযুক্ত শিবানন্দ স্বামীর দার্জিলিং হইতে সেদিন এক পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি শীঘ্রই বেলুড় মঠে আসিবেন, এই কথা লিখিয়াছিলেন। আলমোড়া আসিবার কোন উল্লেখ করেন নাই। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছি। কিরূপ করিবেন বলিতে পারি না। যদি তাঁহার জন্য পাথেয় মঠে রাখিয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি মহারাজের নিকট যাইতে পারেন। মহারাজ মান্দ্রাজ মঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়া এখন সেইখানে অবস্থান করিতেছেন। তুলসী মহারাজ২ সঙ্গে আছেন, তাই মনে হয় বিশেষ বিলম্ব না করিয়া সত্বরই মহারাজকে বাঙ্গালোর লইয়া যাইবার জন্য তিনি বিশেষই চেষ্টা করিবেন। কুটিরের জন্য আমাকে বিশেষ কিছুই করিতে হয় না। এখন তো তাহার উপর আবার ঠিকায় কার্য হইতেছে। অতএব কোন হাঙ্গামাই নাই। বাহ্যবস্তুর মূল্য বাড়া সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, বিশেষ বোধগম্য হইল না। অনিদ্রা মূত্ররোগের এক উপসর্গ। কি কারণে কখন যে বৃদ্ধি হয় তাহা বড় বুঝিতে পারি না। বুঝি আর নাই বুঝি ভুগিতে হয় সন্দেহ নাই। অতুল বেশ ভাল আছে। বর্ষার জন্য এখনও তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। কানাইও বেশ ভাল আছে। যে-দুটি সাধুর কথা লিখিয়াছি তাঁহারা ক্ষুদুমণিকে৩ কৈলাসের পথে দেখিয়াছিলেন। ক্ষুদুমণির কৈলাস পৌঁছাইতে তখন মাত্র চার ক্রোশ ব্যবধান ছিল। সুতরাং মনে হয় দু-দশদিনের মধ্যেই ক্ষুদুমণি ফিরিয়া আসিতে পারে। তাহার মায়াবতী যাইবার ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য হয়তো তোমরাই তাহাকে আমাদের পূর্বেই দেখিতে পাইবে। আমার জুতার এখন তত প্রয়োজন নাই। আবশ্যক হইলে তুমি যেমন বলিয়াছ সেইরূপ করিয়া পায়ের মাপ পাঠাইয়া দিব। তোমরা সকলে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

২ স্বামী নির্মলানন্দ

৩ স্বামী শ্যামানন্দকে

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : ভাদ্র, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

॥ ৭ ॥

সন্ধ্যায় মঠবাসিগণের নিয়মিত জপ-ধ্যানের পর বসত প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনার আসর। মঠের প্রবীণ ও নবীনগণ তো বটেই, দেশী-বিদেশী অতিথিগণও সে-আসরে যোগদান করতেন। আবার তাদের কেউ কেউ সক্রিয় অংশগ্রহণও করতেন। প্রশ্নের উত্তর সাধারণতঃ সভার সভাপতি অথবা তাঁর নির্দেশে অপর কেউ দিতেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, যে-আসরে স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন, সে-আসরই হয়ে উঠত সবচাইতে জমজমাট। উদাহরণ তুলে ধরা যাক—৬০

১৩ মার্চ, ১৮৯৮। আসরটি আয়তনে ছিল বড়ই। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রশ্ন করেনঃ নির্গুণব্রহ্ম কি সত্যসত্যই অবাঙ্মনসগোচর ?

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর দেন : হ্যাঁ ঠিকই। উপস্থিতগণের মধ্যে কয়েকজন এবিষয়ে আলোচনা করেন। শেষে স্বামীজী মন্তব্য করেন যে, বেদের সে-অংশই গ্রাহ্য হবে যা যুক্তিসম্মত এবং বেদের সেই অংশই প্রামাণ্য বলে গৃহীত হবে। পুরাণাদি অন্য শাস্ত্র যতটুকু বেদবিরোধী নয়, ততটুকুই আদরণীয়। তিনি আরও বলেন, বেদোৎপত্তির পর সারা বিশ্বে যত ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির প্রেরণার উৎস বেদ।

অতঃপর ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ প্রশ্ন করেন : চরিত্রের সুষম বিকাশ কিভাবে আয়ত্ত করা যায় ? স্বামীজীর উত্তর : সুষমভাবে গঠিত চরিত্রের মানুষের সঙ্গে বাস করলেই এরূপ চরিত্রগঠন সুগম হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ : ভারতের পুনর্গঠন-কাজে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা কি হবে ?

স্বামী বিবেকানন্দ : এই মঠ থেকে শিক্ষিত চরিত্রবান শত শত মানুষ বেরিয়ে ভারত-বাসীকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় প্লাবিত করবে। এ-ধরনের প্লাবন অনুসরণ করেই উদ্ভূত হবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য জাগরণ। তার ফলে ভারতীয় সমাজে উপস্থিত হবে বিপুল পরিবর্তন। তার ফলে সৃষ্টি হবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে চরিত্রবান মানুষ। শূদ্রশ্রেণীর সামগ্রিক উন্নয়নের ফলে এদেশে শূদ্র বলে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের চিরাচরিত কায়িক পরিশ্রমের কাজগুলি করবে যন্ত্রপাতি। বর্তমান ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রয়োজন ক্ষাত্রশক্তির।

স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন : নিজে পূর্ণতা লাভ না করে কেউ কি প্রকৃত প্রচার করতে সমর্থ ?

স্বামী বিবেকানন্দ : না, সমর্থ নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, এই মঠের সকল অঙ্গই পূর্ণতা লাভ করুক এবং প্রচারকার্যের যোগ্য হয়ে উঠুক।

আলোচনা বিষয়ান্তরে বিস্তারিত হয়। ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দের প্রশ্ন : কুণ্ডলিনী কি এবং কিভাবে একে জাগরিত করা যায় ?

মনে হয় স্বামীজীর নির্দেশেই শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী উত্তর দেন : বিভিন্ন নামে পরিচিত শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহের অধিষ্ঠান সাধারণ মানুষের মূলাধার চক্রে। যোগী তাঁর মনকে মূলাধার থেকে তুলে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাবার নিয়ত চেষ্টা করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে-শক্তি যোগীর সহস্রারে ওঠে এবং যোগী ব্রহ্মলীন হয়ে যান। আমার মতে, এরূপ শক্তি-সমূহের উন্নয়ন হচ্ছে কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

৬০ উদাহরণসকল মঠের ডায়েরী থেকে প্রাপ্ত।

এস্থলে স্বামীজী সংযোজন করেন: শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন যে, যোগশাস্ত্রে কথিত বিভিন্ন পদ্ম প্রকৃতপক্ষে মানবদেহে থাকে না। তাদের সৃষ্টি হয় যোগীর যোগশক্তির দ্বারা। অতঃপর স্বামীজী যোগ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

আলোচনা আবার বিষয়ান্তরে যায়। স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে কথা ওঠে। স্বামীজী বলেন: স্থাপত্যকলা ও বাড়িনির্মাণের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, স্থাপত্যকলা একটি ভাবের দ্যোতক। অপরপক্ষে দ্বিতীয়টি শুধুমাত্র মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ করে গড়া। যেকোন স্থাপত্যকলার মূল্য নির্ধারিত হয় তার ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশের ক্ষমতার ওপর। স্বামীজী এই বলে শেষ করেন—আমাদের ঠাকুরের মধ্যে শৈল্পিক কুশলতা সু-উচ্চভাবে বিকশিত হয়েছিল। ঠাকুর বলতেন, কারুর শিল্পবোধ বিকশিত না হলে সে খাঁটি আধ্যাত্মিক হতে পারে না।

এ-ধরনের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্বামীজীর মৌলিক চিন্তাভাবনা শ্রোতাদের যে চমৎকৃত করত সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তেমনি আবার স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দের চিন্তাভাবনা মঠবাসিগণের মনে প্রেরণা জোগাত। উদাহরণ দেওয়া যাক।

১৫ এপ্রিল প্রশ্নোত্তরের আসরে স্বামী স্বরূপানন্দ প্রশ্ন করেন: জগতের অনিত্যত্ব ও ব্রহ্মের নিত্যত্ব কিরূপে প্রমাণিত হয়?

স্বামী শিবানন্দ উত্তর দেন: জগতের অনিত্যত্ব ও অসারত্ব স্পষ্টতই প্রতীয়মান। প্রায় সকল বস্তুর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি থেকে এটি সুস্পষ্ট। আমাদের অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের বস্তুসকলের পরিবর্তনশীলতা নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করলেই সমগ্র জগতের অসারত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা জ্ঞাত বহির্জগতে ঘটমান প্রতিটি পরিবর্তনের জন্যই অন্তর্জগতে থেকে যায় একটি প্রতিরূপ। বহির্জগৎ যতটা পরিবর্তনশীল, ততটা পরিবর্তনশীল অন্তর্জগৎ। কোন বস্তুর সত্তা (reality) বলতে বোঝায় বস্তুটি চিরকালের জন্য অপরিবর্তিতভাবে স্থায়ী। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সংসারে কোন বস্তুই এক সেকেন্ডের জন্যও অপরিবর্তিত থাকে না। পরম সত্য নির্ধারণের জন্য আমরা যদি আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ আরও এগিয়ে নিয়ে যাই তবে দেখতে পাব যে, যাবতীয় পরিবর্তনশীল ঘটনার পশ্চাতে রয়েছে পরিবর্তনাতীত ব্রহ্ম। প্রথমে স্থূল বস্তু, তারপর সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বস্তু—বহির্জগতের যা-কিছু আমরা বিশ্লেষণ করি, আমরা কোন কিছুর মধ্যেই নিত্যত্ব দেখতে পাই না। চূড়ান্ত মীমাংসায় অক্ষম হয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত বাইরে অনুসন্ধান বর্জন করে অন্তর্মুখীন হই। আর ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমতত্ত্বে উপনীত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে অন্তর্মুখিনতা।[৬১]

আসরে উপস্থিত ছিলেন মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটির উত্তর দিতে অগ্রসর হন। তিনি বলেন: মানুষের মনের ভিতরের ও বাইরের সবকিছু রূপান্তরিত করা যায় একটি শক্তিতে। কিন্তু শক্তিমাত্রই আপেক্ষিক। যখন আমরা বলি এই বস্তুটি সচল, বুঝতে হবে অপর একটি নিশ্চল বস্তুর তুলনায় এটি সচল। যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটিমাত্র শক্তিই বিদ্যমান থাকে এবং অপর কোন বস্তুই বিদ্যমান না থাকে, সেই শক্তিকে বলতে হবে অসীম সার্বভৌম। যুক্তির নিরিখে আমরা তাকে বলতে পারব না চলনশীল, কারণ দ্বিতীয় কোন নিশ্চল বস্তুই নেই যার তুলনায় একে বলব সচল। সুতরাং সেই শক্তি নিত্য সত্য।

১৯ মার্চের সান্ধ্য আসরটি হয় বিশেষ স্মরণীয়। নবীন মঠবাসিগণের বারংবার অনুরোধে স্বামী প্রেমানন্দ মঠের জন্মলগ্ন থেকে তার ধারাবাহিক ইতিহাসটি বলেন। মাঝে মাঝে প্রয়োজন মতো স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তাঁকে সাহায্য করেন।

অপর একটি প্রশ্নোত্তরের আসর। ৯ এপ্রিল সান্ধ্য আসরে স্বামী শিবানন্দ 'সংসারে সন্ন্যাসীর

৬১ মঠের ডায়েরী এবং A man of God—Swami Vividishananda, 1957, p. 70 দ্রষ্টব্য

স্থান' শীর্ষক একটি ভাষণ দেন। ভাষণ শুনে শ্রোতৃগণ একে একে প্রশ্ন করতে থাকেন।

প্রথম প্রশ্ন স্বামী সারদানন্দের। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : জীবব্রহ্মৈক্য অনুভূতির শিখরে আরোহণের পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কি অবশ্যই সন্ন্যাসের পর্যায় অতিক্রম করতে হবে?

স্বামী শিবানন্দ : হ্যাঁ।

স্বামী সারদানন্দ : একজন গৃহিব্যক্তি কি সন্ন্যাস নিতে পারে?

স্বামী শিবানন্দ : হ্যাঁ, পারে। উদাহরণস্বরূপ আমরা উপনিষদের যুগের জনক ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজার উল্লেখ করতে পারি।

মিসেস বুল : কোন নারী কি সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করতে পারে?

স্বামী শিবানন্দ : হ্যাঁ, পারে। মানুষমাত্রেরই সন্ন্যাস-ব্রত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। আত্মাতে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ নেই।

১৭ মে সান্ধ্য আসরে সভাপতি ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। ব্রহ্মচারী বিমলানন্দ বহু-আলোচিত একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁর প্রশ্ন : জনসাধারণের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করা কি কল্যাণকর?

স্বামী সারদানন্দ প্রশ্নোত্তরে বলেন : একজন অধ্যাপকের সঙ্গে কোন দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা চলে, কিন্তু একজন মুচির সঙ্গে তা করা চলে না। কারণ, একজন অধ্যাপক দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্মচিন্তার সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু সাধারণতঃ একজন মুচির তা থাকে না। জনসাধারণ কিভাবে অদ্বৈতবেদান্তের জটিল ও সু-উচ্চ তত্ত্ব বুঝতে পারবে? সেজন্য তাদের সামনে অদ্বৈতবেদান্তের ব্যবহারিক দিকটা উপস্থাপিত করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে অসীম শক্তি ও সামর্থ্য। প্রত্যেককে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে শেখাতে হবে। অবশ্যই শেখাতে হবে কিভাবে তারা নিজেদের হিতসাধন করতে পারে, আবার অপরের কল্যাণবিধানও করতে পারে।

ব্রহ্মচারী বিমলানন্দ আবার জিজ্ঞাসা করেন : কিন্তু ঈশ্বরের করুণার ওপর আস্থা রেখেও কি আত্মবিশ্বাস অর্জন করা যায় না?

স্বামী সারদানন্দ বলেন : এরূপ ক্ষেত্রে ভক্ত মনে করে থাকেন, তাঁর আত্মবিশ্বাস তাঁর নিজের সত্তা থেকে অনুৎপন্ন, তার উৎপত্তি বাইরে থেকে। কিন্তু কেউ যদি এবিষয়েও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন তাহলেও ক্ষতি নেই। আসল কথা, পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে সর্বতোভাবে।

কিন্তু বোধকরি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বুদ্ধিচর্চার পরিমণ্ডল রচিত হতো সেসকল সান্ধ্য আসরে, যেখানে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা হতেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ। এধরনের বহু আসরের একটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যাক।

১৪ এপ্রিল প্রশ্নোত্তরের আসর বসেছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রশ্ন করেন : গীতাতে বলা হয়েছে, "যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।/হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥" অহঙ্কার বা অহং-ভাব কিরূপে উত্তরণ করা সম্ভব, কিরূপে সম্ভব সংসারে থেকেও সংসারে লিপ্ত না হওয়া?

স্বামী সারদানন্দ দুটি দিক থেকে বিবেচনা করে প্রশ্নটির উত্তর দেন। প্রথমতঃ, তিনি মহাভারত প্রমুখ শাস্ত্রাদি থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেন। মহাভারতে কথিত ধর্মব্যাধের বিষয়টি উল্লেখ করেন। ধর্মব্যাধ পারিবারিক জীবিকা অনুসরণ করে পশুবধ করতেন, মাংস-বিক্রয় করতেন, অথচ তিনি ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী। দ্বিতীয়তঃ, স্বামী সারদানন্দ বলেন, একথা শাস্ত্রে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, সাধক তার 'কাঁচা আমি'কে নাশ করতে পারলে তবেই সে উচ্চতম সত্তা বা পরমাত্মা লাভ করতে পারে এবং এ-সংসারে নির্ভয়ে থাকতে পারে। ধর্মব্যাধ কর্তব্যের খাতিরে প্রাণিহিংসা করলেও সকল কর্মে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাঁর কোন কাজকর্মের পশ্চাতে তাঁর নিজের স্বার্থসাধনের কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ আবার প্রশ্ন করেন : ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু সাধককে আবশ্যিক প্রস্তুতি হিসাবে জ্ঞানবিরোধী রজঃ ও তমঃ ত্যাগ করে

সত্ত্বগুণ আশ্রয় করতে হয়। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, জীবন্মুক্ত পুরুষ রজোগুণান্বিত ক্রোধ ইত্যাদির বশীভূত হয়ে থাকেন। যেমন দুর্বাসা, যীশুখ্রীস্ট ও অন্যান্য কেউ কেউ। এটা কিরূপে সম্ভব ?

এ-প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী শিবানন্দ। তিনি বলেন ঃ প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ আশ্রয় করে। অবশ্য প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তিনটির মধ্যে একটি গুণের আধিক্য এবং অপর দুটির স্বল্পতা থাকে। দেখা যায়, কেউ অধিক পরিমাণে সত্ত্ব এবং কম পরিমাণে রজঃ ও তমঃ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আবার কেউ জন্মেছে বেশি পরিমাণে রজঃ এবং কম পরিমাণে সত্ত্ব ও তমঃ নিয়ে। শুধুমাত্র তিনগুণের অতীত যে মুক্তি, তা অর্জন করতে পারলেই সাধক তিনগুণের ওপর সত্যকার নিয়ন্ত্রণলাভ করেন। এরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষই আচার্যের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। সেই ভূমিকা পালনের জন্য তিনি তাঁর সহজাত প্রবণতা অনুসারী একটি গুণের আধিক্য আশ্রয় করে থাকেন। সাধারণতঃ আমরা জীবন্মুক্ত আচার্যগণের জীবনে দেখতে পাই সত্ত্ব ও রজঃ—এ-দুটি গুণেরই বিশেষ প্রকাশ। কোন আচার্য সত্ত্বগুণের আধিক্য আশ্রয় করে নির্জন কোন স্থানে পড়ে থাকেন, সমীপাগতদের তিনি নিভৃতে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আবার রজোগুণের প্রাবল্যে কোন আচার্য দেশে-বিদেশে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে থাকেন। আবার কোন আচার্য মানুষের ভুলভ্রান্তির জন্য রাগতভাবে অভিশাপ পর্যন্ত দেন। কিন্তু এ-ধরনের ক্রোধের অভিপ্রকাশ আচার্যের বাহ্য প্রকাশমাত্র, ফলে এটা অপরের ক্ষতিকারক হয় না। জীবন্মুক্ত এসকল আচার্যের তিরস্কার বা অভিশাপের দ্বারা অপরের কল্যাণই সাধিত হয়। পিতা পুত্রকে যেমন স্নেহ করেন, তেমনি আচার্য স্নেহ করেন শিষ্যকে।

এরপরেই শুরু হয় একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা। আলোচনার বিষয় ঃ বন্মুক্তের জীবনে প্রারব্ধ কর্মের প্রভাব কতটুকু। উপস্থিত প্রত্যেক মঠবাসী নিজ নিজ অভিমত যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত করেন। কেউ বলেন, আত্মোপলব্ধির পর মানুষ দেহের অসারত্ব ও অনিত্যত্ব সহজেই উপলব্ধি করে। অপর কেউ বলেন, প্রারব্ধ কর্ম বা অন্য যেকোন কর্ম আলোচ্য ব্যক্তির দেহের সঙ্গে সম্পর্কিতমাত্র, আত্মার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। আবার অপর অন্য কেউ বলেন, মুক্তিলাভের পূর্বে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি যে-কর্মের বাসনা পোষণ করতেন, মুক্তিলাভের পর সেই কর্মে তাঁর দেহ ও মন নিযুক্ত হয়। মুক্তিলাভের পরও তাঁকে আরব্ধ কর্ম করতে হয় বটে, কিন্তু তাঁর দেহ বা মন কৃত কোন কর্মে তিনি কখনই আসক্ত হয়ে পড়েন না। তাঁর দেহ-মনকৃত কোন কর্মই নতুন কর্মের বীজ বপন করে না। জ্ঞানলাভের পূর্বে তাঁর রোপিত কর্ম-বীজের ফলমাত্র তিনি ভোগ করে থাকেন।

প্রশ্নোত্তরের আসরে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনের সূক্ষ্ম তত্ত্বাদির আলোচনা হতো না, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ও উত্থাপিত হতো। যেমন ১৩ জুলাই জনৈক মঠবাসী জানতে চান ঃ অশ্লেষা, মঘা ইত্যাদির দৃঢ় কোন ভিত্তিই যদি না থেকে থাকে তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেসকল মানতেন কেন ?

স্বামী সারদানন্দ উত্তর দেন ঃ সত্যি কথা, মানুষের ওপর জ্যোতিষ্কের কিছু প্রভাব রয়েছে। কিন্তু তা এতই ক্ষীণ যে, অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মুখ্য কারণ সেটি হতে পারে না। তাছাড়াও জ্যোতিষ্কের প্রভাবসকল খণ্ডন বা প্রতিরোধ করবার উপায়ও বর্তমান। শ্রীরামকৃষ্ণ এসকল আপাত-কুসংস্কার মেনে চলতেন, কারণ তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সু-উচ্চ ভূমি থেকে নেমে এসে এসকল সামান্য ব্যাপারে অনুসন্ধান করবার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। তিনি কতকটা যন্ত্রবৎ এসকল মেনে চলতেন, কারণ এগুলি মানা এবং না-মানার মধ্যে তিনি বিশেষ পার্থক্য কিছু দেখতে পাননি।

১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার আসরে প্রশ্নোত্তর স্থগিত থাকে। মঠবাসিগণের, বিশেষতঃ তরুণ মঠবাসিগণের অনুরোধে স্বল্পবাক্ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'ভক্তি' সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান উপদেশ দেন।

এই সান্ধ্য আসরে অধিকাংশ দিনই বিভিন্ন

সোৎসাহে এতে যোগদান করতেন। আবার কোন কোন দিন এর ব্যত্যয়ও ঘটত। যেমন ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় গান গেয়ে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। ঠাকুরের গাওয়া কয়েকটি গান এবং ঠাকুরের পছন্দের কয়েকটি গান পরিবেশন করে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন তিনি। আবার ২০ এপ্রিল স্বামীজীর লন্ডনে প্রদত্ত ভক্তিযোগের একাংশ পাঠ করা হয়েছিল। তারপর স্বামী সারদানন্দ জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার পদ্ধতিসকল প্রদর্শন করেন।

২ জুন সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর-ক্লাস, বক্তৃতা ইত্যাদির পরিবর্তে নবীন মঠবাসিগণ একত্রে বসে আলোচনা করেন একটি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান —কায়িক পরিশ্রম করে গঙ্গা থেকে মঠে জল তোলার পরিবর্তে সাইফন পদ্ধতির (syphon system) প্রয়োগ সম্ভবপর কিনা। লাইব্রেরি থেকে বই এনে আলোচনা করা হলো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে, গঙ্গার নিম্নতল থেকে মঠবাড়ির উচ্চতলে এই পদ্ধতিতে জল তোলা সম্ভবপর নয়।

আবার কোনদিন গানের আসর বিশেষতঃ ভজন-কীর্তনের আসর বসেছে। কোনদিন স্বামী সারদানন্দ সকলকে গান গেয়ে শুনিয়েছেন। অবশ্য নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানে থাকাকালীন মঠে সঙ্গীতচর্চার কোন নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল না।

॥ ৪ ॥

যেকোন আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি যোগদানকারী মানুষগুলির উঁচু মানের ওপর নির্ভর করে। সংখ্যা-বৃদ্ধির চাইতে আন্দোলনকারী নেতা ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের গুণগত সমৃদ্ধি কাম্য। সে-কারণে নেতা স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদাই জোর দিয়েছেন চরিত্রগঠনের ওপর। কিন্তু চরিত্রগঠনের জন্য কোন্ আদর্শ অনুসরণ করবে নবাগত ব্রহ্মচারিগণ ?

বরাহনগর মঠে সাড়ে পাঁচবছর এবং আলমবাজার মঠে প্রথম পাঁচবছর সাধু-ব্রহ্মচারিগণ ত্যাগ, তপস্যা, জপ, ধ্যান, পূজা, বিদ্যাচর্চা ইত্যাদি অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শ অনুসরণ করছিলেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শের গভীরতর উপলব্ধি এবং বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ আদর্শের পর্যালোচনা সুস্পষ্ট করে তোলে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের নতুন ভূমিকা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নেতা স্বামী বিবেকানন্দ নতুন মানুষ ও নতুন ধরনের সন্ন্যাসী গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষে পদার্পণের পূর্বেই স্বামীজীর এই বিষয়ে চিন্তা সুস্পষ্ট দানা বেধে উঠেছিল, স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ দু-একজন তা জানতে পেরেছিলেন। মিস মার্গারেট নোবল এদেশে আসার পর স্বামীজীর এই ভাবনাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে মিস্টার ও মিসেস এরিক হ্যামন্ডকে লিখেছিলেন ঃ "The Swami's great care now is the establishment of a monastic college for the training of youngmen for the work of education—not only in India but also in the West. This is the point that I think we have always missed." এই ভাবনারই কিঞ্চিৎ হেরফের করে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে বসে স্বামীজী নির্দেশ দিলেন ঃ "শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।" যোগ্য যুবকদের যথার্থভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই হলো নব-প্রতিষ্ঠিত মঠের লক্ষ্য। স্বামীজীর মতে চরিত্রগঠনের জন্য ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ যা প্রত্যেক মঠবাসীর অনুসরণীয়।৬২ শ্রীরামকৃষ্ণকে আদর্শ করে জ্ঞান, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্রগঠনই উদ্দেশ্য। মস্তিষ্ক, হৃদয় ও বাহুর সুসমন্বিত বিকাশের দ্বারা নতুন সন্ন্যাসীদের একাধারে পরম আদর্শবাদী ও কঠোর বাস্তবমুখী হতে হবে। সাধু-ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য করে স্বামীজী বলে-

৬২ নীলাম্বরবাবুর বাগানে ১৫ মার্চ ১৮৯৮ তারিখে স্বামীজী একটি প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেছিলেন।

ছিলেন : "তোমাদিগকে গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমুহূর্তেই এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, আবার পরমুহূর্তেই এই জমিতে যে ফসল হইবে, তাহা বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"৬৩ বিবেকানন্দ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। রামকৃষ্ণ মিশন এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ৫ মে ১৮৯৭ তারিখে ওলি বুলকে লিখলেন : "আমার বর্তমান অভিপ্রায় হচ্ছে, (ভারতে) তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার শিক্ষকদের শিক্ষণকেন্দ্র-স্বরূপ হবে—সেখান থেকেই আমি ভারতবর্ষ
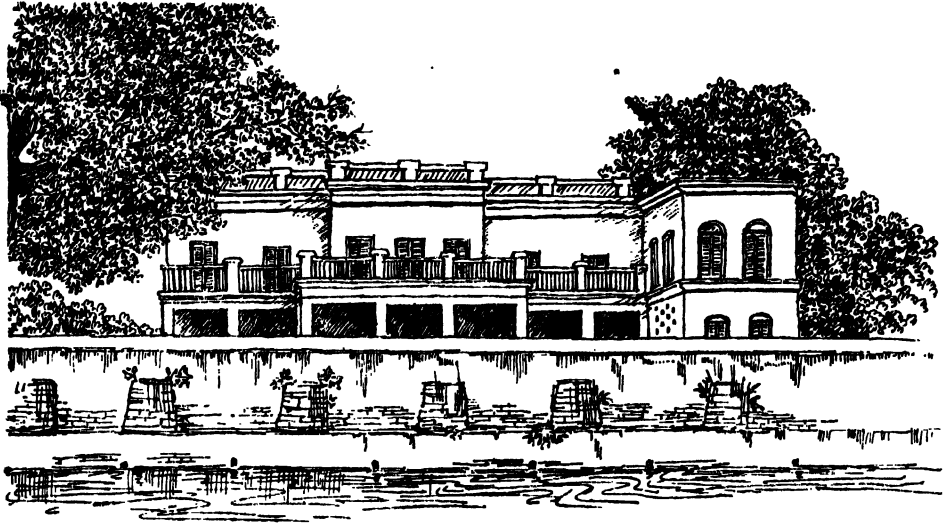
নীলাম্বর-ভবন। সময় : ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। মঠ এখানে সাড়ে দশ মাস ছিল।

শিল্পী : বিমল সেন

শুধুমাত্র এইটুকুতে স্বামীজী সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি চাইলেন, নতুন সন্ন্যাসিগণ স্বাধীনচিন্তা ও আজ্ঞাবহতা—এই দুই আপাতবিরোধী গুণের সমন্বয়ের অধিকারী হবে। তিনি চাইলেন, এঁরা যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজকর্মে দক্ষ হয়ে উঠবেন। এধরনের মানুষ গড়ে তোলার জন্য স্বামী আক্রমণ করতে চাই।" প্রতিষ্ঠান গড়তে প্রয়োজন অর্থের। প্রত্যাশিত অর্থাগম না হওয়াতে ১১ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখে স্বামীজী মুন্সী জগমোহনলালকে লিখলেন, প্রস্তাবিত কলকাতা-কেন্দ্রের জন্য তিনি নিজে ঘুরে ঘুরে অর্থসংগ্রহ করবেন।৬৪ [ক্রমশঃ]

৬৩ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭

৬৪ Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter of His Life—Beni Sankar Sarma, p. 119

বিশেষ রচনা

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ : প্রতিক্রিয়া এবং তাৎপর্য

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণটি দিয়েছিলেন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে। ঐ দিনটি মানবসভ্যতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। তারিখটির শততম আবির্ভাব হবে আগামী ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর। যুগনায়কের সেই বিস্ময়কর আবির্ভাবের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিভিন্ন মহলে, তা আমাদের বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। কোন্ পটভূমিকায় তাঁর ভাস্বর ব্যক্তিত্বের সাড়াজাগানো প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাও লক্ষ্য করার বিষয়। প্রতিক্রিয়াগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবন্ধ করা যায়। যেমন, পাশ্চাত্যভূমিতে প্রতিক্রিয়া, ভারতভূমিতে প্রতিক্রিয়া, তাৎক্ষণিক ও তাৎকালিক প্রতিক্রিয়া এবং স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া। শতবর্ষের প্রেক্ষাপটে অবশ্য প্রতিক্রিয়ার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—অমন অতর্কিত আবির্ভাবের নিগূঢ় তাৎপর্য।

আমরা দু-ই একটু বিশদভাবে আলোচনা করব। সৌভাগ্যক্রমে মারি লুইস বার্কের ছয় খণ্ডে সমাপ্ত অপূর্ব গ্রন্থ 'Swami Vivekananda in the West : New Discoveries'-এর দৌলতে তথ্যের অপ্রতুলতা এখন আর নেই। পূর্বে অনাবিষ্কৃত অনেক তথ্য তিনি বহু অনুসন্ধান করে খুঁজে পেয়েছেন এবং ঐ পুস্তকের ছয় খণ্ডে পরিবেশন করেছেন। এছাড়া, সাত খণ্ডে সমাপ্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' নামক বিশাল গ্রন্থে (বিশেষ করে প্রথম খণ্ডে) এবিষয়ে অনেক নতুন তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আলোচনার পরিধি সীমিত রাখবার জন্য আমরা প্রতিক্রিয়াগুলির কথা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে বলব। তাৎপর্যের ব্যাখ্যা অনিবার্যভাবেই দীর্ঘতর হবে; কারণ ধর্মমহাসভায় স্বামীজী-প্রদত্ত সবগুলি বক্তৃতারই বিশ্লেষণ ঐপ্রসঙ্গে করতে হবে। মারি লুইস বার্ক তাঁর উপরি-উল্লিখিত গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডের উপনাম (sub-title) দিয়েছেন—'His Prophetic Mission' ('তাঁর দিব্যবার্তা') এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের উপনাম দিয়েছেন—'The World Teacher' ('বিশ্বাচার্য')। স্বামীজীর 'দিব্যবার্তা' এবং 'বিশ্বাচার্য' হিসাবে তাঁর ভূমিকা—এদুটিরই প্রাথমিক আভাস আমরা পাই তাঁর ধর্মমহাসভার উদ্বোধনী ভাষণেই (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩), যদিও সেটি খুবই সংক্ষিপ্ত আয়তনের। মহাসভার অন্য বক্তৃতাগুলিতে এবং পরবর্তী কালে তাঁর অজস্র বক্তৃতা, ক্লাস এবং আলোচনায় তারই ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে।

শিকাগো ধর্মমহাসভার বিশদ বর্ণনা ভগিনী গার্গীর (মারি লুইস বার্ককে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রদত্ত নাম) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম দুটি অধ্যায়ে আছে। স্বামীজীর আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ সেখান থেকেই আহরণ করব। এছাড়া, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর উপরি-উল্লিখিত গ্রন্থের সাহায্যও কিছু কিছু নেব। কিন্তু তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য আমরা বিশেষ করে নির্ভর করব ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাগুলির ওপর (১১ সেপ্টেম্বর—২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রীঃ)।

॥ ২ ॥

আমেরিকায় যাত্রার পূর্বে স্বামীজী তাঁর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ)-কে বলেছিলেন : "ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এইটের জন্য। আমার মন তাই বলছে। অদূর ভবিষ্যতে তা ঘটবে দেখে নিও।" বাস্তবিক তাই ঘটেও ছিল। একটু পরে আমরা তার বর্ণনায় আসছি। তার আগে ধর্মমহাসভার পটভূমিকা খানিকটা

আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।

মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক জি. এস. আয়ারের রচনাসমূহের মাধ্যমে ঐ মহাসভার পরিকল্পনাসমূহ এদেশে প্রধানতঃ প্রচারিত হয়েছিল। স্বামীজীও ঐকালে মাদ্রাজেই পরিব্রাজন করছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ সূত্রেই তিনি প্রথম জানতে পেরেছিলেন ধর্মমহাসভার কথা—১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে। তাঁর মাদ্রাজী বন্ধু ও অনুগামিগণ তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ঐ মহাসভায় যোগদানের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁরা সেইমতো তাঁর যাত্রার ব্যয় ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থসংগ্রহ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। অর্থসংগ্রহের বিশদ ইতিহাস আমরা আলোচনা করছি না, এ-প্রবন্ধের দিক থেকে খুব প্রয়োজন নেই বলে। ঐকালে স্বামীজীও আমেরিকা যাবার একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন; তবে তা হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্য ততটা নয়, যতটা পরাধীন ভারতের প্রকৃত অবস্থা এবং ভারতের দরিদ্র জনগণের কল্যাণের জন্য ধনী এবং নতুন সভ্য দেশ আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। মানসিক দ্বন্দ্বও অবশ্য অনেকদিন ধরে চলেছিল তাঁর—যাব, কি যাব না। অবশেষে যাবার নিশ্চিত সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। পরবর্তী কালে তিনি বলেছেন, এসময়ে তিনি দৈব প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। (শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি অলৌকিক দর্শন তাঁর হয়েছিল—'ঠাকুর যেন নীল মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালার ওপরে হাওয়ার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হেঁটে চলেছেন এবং পিছন পানে মাঝে মাঝে চেয়ে ইশারাতে তাঁকেও যেতে বলছেন'।) এছাড়া, তাঁর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমায়ের অকুণ্ঠ অনুমোদনও ঐ যাত্রার জন্য পেয়েছিলেন। বহু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজী (তখন 'নরেন') সম্পর্কে যে বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেটিও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য—"নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে-বাইরে হাঁক দিবে।" ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কাগজ ও পেন্সিল চেয়ে নিয়ে নিবিষ্ট মনে ঐটি লেখেন। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তখন তিনি ক্যান্সার রোগে শয্যাশায়ী।[১]

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১ মে স্বামীজী বোম্বাই বন্দর থেকে 'পেনিনসুলার' নামক জাহাজে রওনা হন। এযাত্রা তিনি কলম্বো হয়ে ক্রমাগত পূর্বদিকে চলে হংকং, চীন ও জাপানে অল্প সময় কাটিয়ে জাপানের ইয়াকোহামা বন্দর থেকে ১৪ জুলাই তারিখে 'এস. এস. এমপ্রেস্ অব্ ইন্ডিয়া' নামক জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেন। ২৫ জুলাই সন্ধ্যা সাতটায় তিনি কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে অবতরণ করেন। ওখানে এক রাত্রি কাটাতে বাধ্য হন; কারণ পূর্বগামী শেষ ট্রেন (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যাবার) সেদিন তার আগেই চলে গিয়েছিল। পরের দিন ভোরের গাড়িতেই তিনি শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পথে তিনবার গাড়ি পরিবর্তন করে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ৩০ জুলাই রাত এগারোটায় শিকাগো পৌঁছান।

তাঁর শিকাগোয় পৌঁছানোর তারিখ এবং ধর্মমহাসভার উদ্বোধন (১১ সেপ্টেম্বর)-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় ছয় সপ্তাহ। এই সময়টা তিনি কোথায় কোথায় কাটিয়েছিলেন এবং কি কি কাজ করেছিলেন তার অতীব চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে মারি লুইস বার্কের গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৬-৬৫)। ঐ মহাসভার দিক থেকে অর্থবহ এবং স্বামীজীর সেখানে যোগদানের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা অবশ্য প্রয়োজন বলে মনে হয়। সেই তথ্যগুলি নিম্নে পরিবেশিত হলো :

শিকাগো শহর অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় এবং স্বামীজীর আর্থিক সম্বল তখন স্বল্প থাকায় তাঁকে অপেক্ষাকৃত সস্তা শহর বস্টনে চলে যেতে হয় অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই। বস্টনগামী ট্রেনের এক সহযাত্রী বর্ষীয়সী বাগ্মী ও লেখিকার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ঐ মহিলার নাম মিস ক্যাথারিন অ্যাবট স্যানবর্ন (সংক্ষেপে মিস কেট

১ দ্রঃ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮

স্যানবর্ন); তাঁর বয়স তখন ৫৪ বছর। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর 'ব্রীজি মেডোজ' (Breezy Meadows) নামক খামারবাড়িতে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানান। ঐ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও মহানুভব মহিলার সৌজন্যে তিনি বস্টনের সন্নিহিত বেশ কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করেন এবং বক্তৃতাও দেন। তাঁরই মাধ্যমে স্বামীজী হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রবীণ অধ্যাপক জন হেনরী রাইটের সঙ্গেও পরিচিত হন। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক রাইটের সাময়িক আবাস অ্যানিসকুয়ামে অতিথি হিসাবে তিনি কয়েকদিন কাটান। অ্যানিসকুয়াম বস্টন শহর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত সমুদ্র-তীরবর্তী একটি গ্রাম। ওখানে অধ্যাপক রাইট তখন গ্রীষ্মের ছুটি কাটাচ্ছিলেন। ধর্মসভায় যোগদানের জন্য স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়পত্র ছিল না। প্রতিনিধি (delegate) হবার শেষ তারিখও অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক রাইট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীজীর পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। এছাড়া, তিনি তাঁর সঙ্গে শিকাগোর প্রয়োজনীয় ঠিকানাসমূহ এবং একটি ব্যক্তিগত পরিচয়পত্রও দিয়ে দেন। শিকাগো ফিরে যাবার পথে স্বামীজী ঐগুলি সব হারিয়ে ফেলেন এবং পুনরায় এক অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হন।

ধর্মমহাসভা শুরু হবার পূর্বেই তদানীন্তন আমেরিকান সমাজের বিদগ্ধ শ্রেণীর একটা অংশের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। এর প্রমাণ মেলে মারি লুইস বার্কের গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'Before the Parliament' অর্থাৎ 'ধর্মমহাসভার পূর্বে' নামক প্রথম অধ্যায়ে। বস্টনের সন্নিহিত স্থানসমূহে (অ্যানিসকুয়াম, সেলেম, সারাটোগা ইত্যাদি) তিনি বেশ কয়েকটি বক্তৃতা ঐকালে দিয়েছিলেন। আগস্ট মাসের শেষে তিনি মিস স্যানবর্নের ব্রীজি মেডোজের বাড়ি ছেড়ে সেলেমে যান মিসেস কেট ট্যানাট উডস-এর আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে। সেখানে তিনি এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। (ধর্মমহাসভার অধিবেশনের পরেও স্বামীজী আর একবার ঐ বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন।) ট্যানাট উডস-এর বয়স তখন মধ্য-পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনিও মিস স্যানবর্নের মতোই উদ্যোগী, বক্তা এবং লেখিকা ছিলেন। ২৯ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বামীজী উডস-এর বাড়িতে ছিলেন। ২৯ আগস্ট ছিল মঙ্গলবার। ঐদিনই তিনি ঐ বাড়ির উদ্যানে শিশুদের সঙ্গে এক বৈঠক করেন। পরের রবিবার অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর তিনি সেলেমের 'East Church'-এ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় একটি বক্তৃতা দেন। ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার রাত্রিতে তিনি চলে যান সারাটোগা শহরে সেখানকার আমেরিকান সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়ে। মিঃ ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন স্যানবর্ন (মিস স্যানবর্নের জ্ঞাতি ভাই) এই আমন্ত্রণ জানান। মিঃ স্যানবর্ন ছিলেন ঐ অ্যাসোসিয়েশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী। অপরিচিত তরুণ এক হিন্দু সন্ন্যাসীকে ঐ বিশিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে বক্তৃতাদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে স্যানবর্ন তাঁর গুণগ্রাহিতার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। অধ্যাপক রাইটের মতোই তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বামীজী তিনবার ঐ সম্মেলনের সম্মুখে বক্তৃতা করেন। ৫ সেপ্টেম্বরে তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'The Mohammedan Rule in India' এবং ৬ সেপ্টেম্বরের বিষয় ছিল 'The Use of Silver in India'।

আগেই বলা হয়েছে যে, অধ্যাপক রাইট ধর্মমহাসভার কর্মকর্তাদের কাছে স্বামীজী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় একটি পরিচিতিপত্র পাঠিয়েছিলেন। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বামীজী জানতে পারেননি, ঐ চিঠির কোন জবাব এসেছে কিনা। তাই তিনি ঐদিন অধ্যাপককে এক পত্র দিয়েছিলেন এই অনুরোধ করে যে, ঐ চিঠির জবাব এসে থাকলে তিনি যেন তা সারাটোগার 'স্যানাটোরিয়াম' নামক বোর্ডিং হাউসে স্বামীজীর নামে পাঠান (স্বামীজী কয়েকদিন ওখানে ছিলেন)। মারি লুইস বার্ক জানিয়েছেন, মাত্র

তিন সপ্তাহের মধ্যে স্বামীজী অন্ততঃ এগারোটি বক্তৃতা ও আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাক্-ধর্মমহাসভাকালে (সাকুল্যে প্রায় ছয় সপ্তাহ) তিনি তৎকালীন আমেরিকান জীবনধারার একটি বিশিষ্ট অংশের সান্নিধ্যে এসে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি শিকাগোর বিশ্বমেলা অনেকটা দেখে নিয়েছিলেন; রমাবাঈ সার্কলের সম্মুখে বক্তৃতা দিয়েছিলেন; কিছু খ্রীস্টান পাদ্রীর সংস্পর্শে এসেছিলেন; একটি জেলখানার আবাসিকদের সঙ্গে (inmates of a reformatory) কথাবার্তা বলেছিলেন; কতিপয় খ্যাতনামা চিন্তাবিদ্ ও অধ্যাপকের সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি বক্তৃতাও করেছিলেন। সুতরাং ধর্মমহাসভায় বলবার প্রাথমিক প্রস্তুতি তাঁর মোটামুটি ভালই হয়েছিল বলা যায়।

স্বামীজী শিকাগোতে ফিরে গিয়েছিলেন ৮/৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। পথে চিঠিপত্র এবং ঠিকানাদি হারিয়ে তিনি কেমন বিপন্ন হয়েছিলেন এবং দৈবক্রমে মিসেস জর্জ ডব্লিউ. হেলের নজরে হঠাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর বাড়িতে (৫৪২, ডিয়ারবর্ন অ্যাভিনিউ, শিকাগো) সম্মানিত অতিথি হিসাবে আশ্রয়লাভ করেছিলেন সেই চমকপ্রদ কাহিনী এখন সবারই জানা। ধর্মমহাসভার অফিসে ঐ মহীয়সী মহিলাই (স্বামীজী তাঁকে 'মাদার চার্চ' বলে সম্বোধন করতেন) তাঁকে প্রথম নিয়ে যান। এরপরে স্বামীজীকে আমরা দেখতে পাই শিকাগো ধর্মমহাসভার অন্যতম প্রাথমিক সংগঠক ডঃ জন হেনরী ব্যারোজের সঙ্গে তাঁর বৈঠকখানায়। (সম্ভবতঃ সেটি ছিল ১০ সেপ্টেম্বর, রবিবার)। ১১ সেপ্টেম্বর 'শিকাগো রেকর্ড' পত্রিকার 'সংবাদ' শিরোনামে এই খবরটি বেরোয়। ওতে আরও খবর ছিল—চারজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নেতা (খ্রীস্টান প্রেসবিটিরিয়ান একজন, একজন জৈন, হিন্দু একজন এবং একজন ধর্মযাজক যিনি ষোল বছর চীনদেশে কাটিয়ে এসেছিলেন।) পাশাপাশি বসে ঐ বৈঠকখানায় যেন ভ্রাতৃবৎ কথাবার্তা বলছিলেন। হিন্দু প্রতিনিধির (অর্থাৎ স্বামীজীর) চেহারা, পোশাক এবং ইংরেজী ভাষার ওপরে দখল সম্পর্কেও ঐ সংবাদে বর্ণনা ছিল। সাংবাদিকদের কাছে স্বামীজী বলেছিলেন, তিনি ধর্মমহাসভায় যোগদান করে অনেক কিছু শিখতে পারবেন আশা করেন। শিখেও ছিলেন বটে, তবে সবটাই তাঁর আশানুরূপ হয়নি।

ধর্মমহাসভার সাধারণ সমিতি (General Committee) গঠিত হয়েছিল ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে। এর সভাপতি হয়েছিলেন রেভারেন্ড জন হেনরী ব্যারোজ (শিকাগো ফার্স্ট প্রেসবিটিরিয়ান চার্চের তদানীন্তন পাদ্রী)। মহাসভার উদ্দেশ্যসমূহ ছিল সংখ্যায় দশটি।২ আপাতদৃষ্টিতে ঐগুলি উদারই ছিল; কিন্তু বস্তুতপক্ষে যাতে ঐগুলি খ্রীস্টধর্মের প্রাধান্য বিস্তারের পক্ষে সহায়ক হয়, তার প্রচেষ্টাই পরে হয়েছিল। কালে স্বামীজীর একটি পত্রেও (১১ জানুয়ারি, ১৮৯৫) এর প্রমাণ মেলে; তাতে তিনি লিখেছিলেন—"The Parliament of Religions was organized with the intention of proving the superiority of the Christian religion...." (অর্থাৎ "খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য নিয়েই ধর্মমহাসভা সংগঠিত হয়েছিল..."।)৩

১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ ধর্মমহাসভার উদ্বোধন হয় শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে সকালবেলায়। মিশিগান অ্যাভিনিউতে ওটি তখন নবনির্মিত ভবন ছিল। এই বিশাল ভবনটি আজও আছে, তবে অনেক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে। ধর্মমহাসভাকালে ভবনটির উত্তর ও দক্ষিণ অংশে দুটি বিরাট হলঘর নির্মিত হয়েছিল। উত্তরেরটি 'হল অব কলম্বাস' এবং দক্ষিণেরটি 'হল অব ওয়াশিংটন'। এর প্রত্যেকটিতেই বসবার আসনসংখ্যা ছিল ৩০০০ এবং আরও অন্তত ১০০০ লোকের দাঁড়াবার মতো জায়গা ছিল। প্রথমোক্ত হলটিতেই মহাসভার প্রতিনিধিগণ ঐ স্মরণীয় সকালে সমবেত হয়ে-

২ Swami Vivekananda in the West : New Discoveries—Marie Louise Burke, Vol. I, pp. 69-70

৩ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, 1973, p. 4

ছিলেন। ঠিক বেলা দশটার সময়ে দশটি ধর্মের প্রতিনিধিরা এবং উদ্যোক্তারা হলটির প্ল্যাটফর্মে আরোহণ করেন। বক্তৃতা দেবার জন্য স্বতন্ত্র একটি মঞ্চ তার পাশেই তৈরি হয়েছিল। স্বামীজী তখন তাঁর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পরে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : "My heart was fluttering and my tongue nearly dried up," ("আমার বুক তখন কাঁপছিল এবং জিভ প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল")।৪ এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। প্রথমতঃ, প্ল্যাটফর্মে তাঁর পাশে বিভিন্ন ধর্মের প্রবীণ ও বিখ্যাত প্রতিনিধিগণ উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকায় এর পূর্বে ছোট ছোট সমাবেশে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা তিনি দিয়ে থাকলেও এত বড় সমাবেশে এত জ্ঞানি-গুণীর সম্মুখে আগে তিনি বক্তৃতা দেননি। মঞ্চের সম্মুখের সমস্ত আসন এবং ওপরের গ্যালারী তখন ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কমলা রঙের পোশাক ও পাগড়ির জন্য এবং আভিজাত্যপূর্ণ মুখচ্ছবির জন্য স্বামীজী অবশ্য প্রথমেই দর্শক ও শ্রোতাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

মোট সতেরো দিন ধরে (১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর) এই মহাসভা চলেছিল। প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় বক্তৃতার পর বক্তৃতা হয়েই চলেছিল। প্রথমদিন থেকেই শ্রোতার সংখ্যা ছিল অভূতপূর্ব। ক্রমে তাও বাড়তে থাকে এবং চতুর্থদিনে বেড়ে এত বেশি হয় যে, 'হল অব ওয়াশিংটন' পর্যন্ত ভিড় উপচে পড়ে এবং সেখানে প্রতিটি কর্মসূচীর পুনরাবৃত্তি করতে হয়। পঞ্চমদিনে 'Scientific Section' (বিজ্ঞান অধিবেশন') স্বতন্ত্রভাবে খুলে দেওয়ায় দর্শক ও শ্রোতারা দুভাগে ভাগ হয়ে যান এবং স্বতন্ত্র ঘরে তাদের বসবার ব্যবস্থা হওয়ায় ভিড় খানিকটা কমে।

প্রথমদিনের অধিবেশনে শুধু কর্মকর্তাদের স্বাগত ভাষণ ও প্রতিনিধিদের তরফে তার প্রত্যুত্তরসমূহ শ্রোতারা শুনতে পেয়েছিলেন। ঐদিন সকালের বৈঠকে সাতটি দীর্ঘ বাগ্মিতাভরা স্বাগত ভাষণ হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা আটটি সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর তার বিনিময়ে দিয়েছিলেন। ঐসময়ে স্বামীজী তাঁর আসনে উপবিষ্ট থেকে যেন ধ্যানস্থ ও প্রার্থনারত অবস্থায় ছিলেন। বিকালের বৈঠকে আরও চারজন প্রতিনিধির পূর্বে থেকে প্রস্তুত বিবৃতির পরে স্বামীজী উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রথম ভাষণটি প্রস্তুতিহীনভাবেই তাৎক্ষণিক (কোন লিখিত কাগজপত্র ছাড়াই—extempore) দেন। তাঁর পার্শ্বেই উপবিষ্ট ছিলেন ফরাসী প্রতিনিধি জি. বন. মোরী (G. Bonet Maury)। তিনিই বারবার স্বামীজীকে উঠে দাঁড়াবার এবং বলবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন ইতঃপূর্বে। অবশেষে মনে মনে দেবী সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রথম সম্বোধনেই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কী বিদ্যুৎ শিহরণ জেগেছিল তার কথা এখন সবারই জানা। ধর্মসভার সাধারণ সমিতির সভাপতি ডঃ ব্যারোজ-এর 'History of the World's Parliament of Religions' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১০১) এর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

"When Mr. Vivekananda addressed the audience as 'Sisters and Brothers of America', there arose a peal of applause that lasted for several minutes." ("যখন মিঃ বিবেকানন্দ শ্রোতৃবৃন্দকে 'আমেরিকার ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ' বলে সম্বোধন করলেন, তখন কয়েক মিনিট ধরে আনন্দের উন্মাদনা বয়ে গিয়েছিল।" ওয়াল্টার আর. হাটন (Walter R. Houghton)-এর সম্পাদিত "The Parliament of Religions and Religious Congresses at the World's Columbian Exposition' নামক ইতিহাসগ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বয়ং স্বামীজীও পরে কথাপ্রসঙ্গে এর বর্ণনা দিয়েছিলেন : "a deafening applause of two minutes followed." অর্থাৎ ঐ সম্বোধনের পরে "দুমিনিট ধরে কানে তালা লাগানোর মতো হাততালি পড়েছিল।" তাঁর ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের ঐটিই হলো প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এর পরের প্রতিক্রিয়াগুলি আমরা এখন লক্ষ্য করব। ঐ মহাসভায় স্বামীজীর বাণীসমূহের তাৎপর্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করবার জন্য আমরা ঐ প্রতিক্রিয়াগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে এর পর আলোচনা করব। [ক্রমশঃ]

৪ Complete Works of Swami Vivekananda, p. 203

কবিতা

‘অবতারবরিষ্ঠ’

গায়ত্রী গোস্বামী

সর্বধর্ম মিলনতীর্থ
স্থাপন করিতে এলে ধরায়
সর্বোত্তম অবতার তুমি,
হে রামকৃষ্ণ! নমি তোমায়।
গীতার সাংখ্য, মোক্ষ যোগের,
সরস কাহিনী কথাছলে
কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, ধ্যান, ন্যাস
সরল সত্যে শিখাইলে।
পুরুষোত্তম! দেখালে মানবে
পুনরায় তার বিশ্বরূপ,
বিশাল প্রেমের মিলনে ঘুচিল
ক্ষুদ্র-বৃহৎ অন্ধকূপ।
কঠিন সহজ, রুক্ষ সরস,
তোমার কথায় মহাত্মন,
ক্লান্তি ঘুচাল, শ্রান্তি নাশিল,
তৃষ্ণা মেটাল বিশ্বজন।
তোমার দেখানো আলোকমার্গে
চলার শক্তি দাও,
সংসার মাঝে বিবেকের হালে
বাহি' অমৃত-নাও।

ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে

শান্তিকুমার ঘোষ

আলোক-স্তম্ভের সঙ্গে তোমার তুলনা
রঞ্জিত কল্পনা নয়। ভেঙে তমিস্রার স্তর
দৃশ্য দাও জেবলে : গলির কিশোর উদ্ভাসিত
বিদ্যালয়ে : দ্যাখে রোগিণী সহসা—দীপলক্ষ্মী
শিয়রে দাঁড়িয়ে। বিজ্ঞানীর সম্মুখে
যেই নিরেট পাথর...
বাধা ভেদ করে তোমার আনন্দ-রশ্মি :
ঘুরিয়ে ধরলে ছটা
সুকুমার হৃদয়-শিল্পের পটে।
কী মন্ত্র নিয়েছ জিনে
বীরসন্ন্যাসীর কাছে : শৃঙ্গ থেকে আরো তুঙ্গ
শিখর-বিজয়ে
অভিযাত্রী ছেদহীন। নিম্নে উথলে সিন্ধু—
নয় দুস্তর দুর্জ্ঞেয়।
আলোক-স্তম্ভের সঙ্গে তোমারই তুলনা॥

হে পূর্ণ তব

পলাশ মিত্র

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
বারেবারে আসি।
বেদনার ভারে অবনত হই :
আত্মগ্লানি দগ্ধ করে সারা দিনমান
ডুবে যাই লবণাক্ত সাগরে।

আবার কখনো কোন ছোট অভিমান
ছিঁড়ে ফেলে শুভ্র ফুলহার :
অহঙ্কারে স্ফীত করে সারাটা সকাল।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
এসেও পিছিয়ে যাই বুঝি চিরকাল।

পূর্ণতার তীরে

অনিলেন্দু ভট্টাচার্য

আমরা সকলে পেঁাছে যেতে চাই
আপন আপন নিশ্চিত আশ্রয়ে
পরিচিত স্বস্তির শান্তিময় গণ্ডিতে।
কিম্বা, মা-ভাই-বোনের পরিমিত পরিচর্যার কাছে
সুখ ভিন্ন দুঃখ প্রবেশ করবে
এমন অধিকার যেখানে কঠিন।
যাবতীয় ছল-চাতুরি ও চটুলতা
দু-দণ্ড থেমে থাকে এখানে।
খোলা বাতাস আসে বিশুদ্ধতা মেখে,
হিরণ্ময় আলো কিরণ ব্যয় করে
সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলায়।
এমন সমন্বিত সময়ের অলক্ষ্যে
অদেখা একটা তরী নিয়মিত দুরন্ত গতিতে
পারাবার পেরিয়ে চলে যায়
দূরে বহু দূরে—অনাবিষ্কৃত অস্তিত্বের মধ্যে।
সময় বাহু-পাশে ফাঁদ পেতে রাখে
ব্যাধিময় প্রকট রূপ অনাকাঙ্ক্ষিত অপলাপ;
মৃত্যু-বেশে নির্মম হাতে বয়ে আনে
বিবর্ণ শোক-বিহ্বলতা
ধ্বস নামে স্বপ্ন-সাফল্যের।
বেঁচে থাকতে গেলে
লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও অপমানের মতো
অসংখ্য যন্ত্রণা মর্মন্তুদ হয়ে বিঁধলেও
উদাসীন উপেক্ষার ভান করে
চিরস্থায়ী থেকে যেতে ভালবাসি আমরা
পার্থিব সংসারের দুর্বার আকর্ষণ ছুঁয়ে।
মনের ভিখারির ওই এক অভ্যেস
যত পায় আরো পাবার উৎকণ্ঠায়
লোলুপ হাত বাড়িয়ে থাকে নিশিদিন।
এমনিতর অবাধ সরণীর
ভোগ-লালসার পাদপীঠে
নিঃস্বার্থপরতা নির্লিপ্ততার বিস্ময়ের মতো
নির্বাসনার উজ্জ্বল প্রত্যয় সঙ্গে নিয়ে
মর্তলোকের আনন্দময় সম্রাটকে
পূর্ণতার পারে পেঁাছে যেতে
অসংখ্যবার দেখেছি আমি।
আত্মভোলা ঐ মানুষটি অকিঞ্চন আগ্রহে
আমার বুকে প্রবেশ করে
অন্তরঙ্গ হতে চায়।
রোমাঞ্চিত আনন্দে দ্রবীভূত আমি
সচকিত দৃষ্টিপাতে
চারিদিকে চোখ রাখি তখন।
বহু পুরাতন হঠাৎ সঙ্গহারা
লালসা-সিক্ত ইচ্ছাগুলোর পদশব্দ
আর শুনতে না পেলেও
বিভ্রান্ত করবার প্রলোভনে
আবার ছুটে আসবে না তো?

যতিরাজ

নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

যেদিন প্রথম বাহির হইনু পথে
সেদিন রজনী ছিল দুর্যোগে ভরা
পরিচিত যারা রহিল পিছনে পড়ে
বাহিরে এলেম শুনিয়া তোমার সাড়া।
সেইদিন হতে কত নিশান্ত ধরি
সম্মুখপানে চলেছি সে-উদ্দেশ
পদতলে কাঁটা ফুটিয়াছে কতবারই
কত বন্ধুর পথ হয়ে গেছে শেষ!
তবু অনন্ত চলা—দূরে, আরো দূরে,
মহাশূন্যের মহাজ্যোতিঃ, যতি নয়;
ক্ষণতরঙ্গ অম্বুতে হবে লীন
জগবন্দন, বন্ধন হলে ক্ষয়।
আমার ললাটে তোমার লিখন রবে
ক্ষুরধার পথে নির্ভীক যতিরাজ!

প্রবন্ধ

বৃহত্তর ভারত-পথিক আচার্য কালিদাস নাগ

অরুণকুমার বিশ্বাস

॥ ১ ॥

আচার্য কালিদাস নাগ (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ—৮ নভেম্বর, ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দ) বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিসাবে জীবৎকালে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বললে তাঁকে সঠিক-ভাবে বর্ণনা করা হবে না; তিনি ছিলেন Greater India-র (বৃহত্তর ও মহত্তর ভারতবর্ষের) ঐতিহাসিক। ভারতবর্ষের ইতিহাস বা ভারতবর্ষের অতীত যে যুগে যুগে ভৌগোলিক-সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং অতীত ভারতবর্ষের মহৎ চিন্তা যে কালাতিক্রম করে বর্তমানকে প্লাবিত করে অদূর ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিকই নির্বিকার ও উদাসীন। এই বিষয়ে আচার্য কালিদাস ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

১৯১৯—১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে কালিদাস প্যারিসের Sorbonne University-তে গবেষণা করেছিলেন কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ সিলভ্যাঁ লেভি, আর তাঁর আদর্শ-জগতের মন্ত্রগুরু ছিলেন রোম্যাঁ রল্যাঁ (বাঙলায় বানান, ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ কালিদাস নাগের দেওয়া)। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আলোচনায়[১] জানতে পারি, লেভি কতটা বিবেকানন্দ-বিদ্বেষী এবং রল্যাঁ-বিদ্বেষী ছিলেন। এই তথ্য দিয়েছিলেন কালিদাসই।

আচার্য নাগ নিজে লেভি-চরিত্রের সমালোচনা করেননি, তার কারণ তিনি সশ্রদ্ধভাবে লক্ষ্য করে-ছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ওপর লেভির অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথও আগস্ট ১৯২০-তে লেখা এক পত্রে ক্ষিতিমোহন সেনকে জানিয়েছিলেন: "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যেমন গভীর তেমনি প্রশস্ত। ভারতবর্ষকে ইনি সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে ভালবাসেন।"

লেভির উৎসাহেই শান্তিনিকেতনের বিশ্ব-ভারতীতে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে Institute of Asian Culture এবং Department of Sino-Indian Studies স্থাপিত হয়। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং বিশ্বভারতীতে চীনাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন।[২] রবীন্দ্রনাথ যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন ও জাপান পরিভ্রমণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন লেভির ছাত্র কালিদাস নাগ এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্, 'দ্বীপময় ভারত'-এর রচয়িতা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

একসময় রল্যাঁ Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন (১৯০০-১৯১২)। নোবেল পুরস্কার লাভের (১৯১৬) পরে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যকর্মে নিবেদিত করেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে তরুণ গবেষক-ছাত্র কালিদাসের সঙ্গে রল্যাঁর যোগাযোগ করিয়ে দেন Oriental Languages School-এর অধ্যাপক Jules Bloch। সেই সময়েই কালিদাস একদিকে ভ্রাম্যমাণ রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে Henri Bergson ও 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদকার Andre Gige-এর সঙ্গে এবং অপরদিকে রোম্যাঁ রল্যাঁ ও তাঁর ভগিনী মাডেলেইনের মাধ্যমে Bertrand Russell, George Duhamel এবং ভবিষ্যতের নোবেল-লরেট (১৯৪৬) Hermann Hesse-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন।[৩] ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে Lake Lugano-র ধারে অনুষ্ঠিত International Congress for Peace and Freedom উপলক্ষে হেসে-রল্যাঁ-কালিদাস—এই 'ত্রিমূর্তি'র সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় হয়। সম্প্রতি অধ্যাপক পি. লাল সেই আত্মিক যোগাযোগের মধুর কাহিনী বিবৃত করেছেন।[৪]

১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, ১৯৮৮, পৃঃ ২১৬
২ 'Tagore : Pioneer in Asian Relations'—Kalidas Nag, Modern Review, February, 1966, p. 109-112
৩ Ibid, pp. 113-115 & 132-137
৪ 'Trimurti'—P. Lal, The Statesman, Literary Supplement, 10 & 17 March 1991

Hermann Hesse তখন সবেমাত্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Siddhartha রচনা করেছেন। উপন্যাসটির মর্মবাণী এবং ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে তিনি কালিদাসের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। জাতকের বোধিসত্ত্ব-চেতনায় বিধৃত একটি বিশেষ কবিতা 'Alle Tode' (All Deaths) রচনা করে তিনি তরুণ কালিদাসকে উৎসর্গ করেন।

রোম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে কালিদাসের সম্বন্ধ ছিল গুরু-শিষ্যের। রল্যাঁকে কালিদাস সম্বোধন করতেন 'mon maitre' বা 'my master' বলে। ম্যাক্সমুলার এবং নিবেদিতার পরে এমন ভারতদরদী ঋষিকল্প বিদেশী মনীষীর সন্ধান শুধু কালিদাস কেন, অন্য কোন ভারতবাসীও পায়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ভারতবর্ষের সঙ্গে রল্যাঁর আত্মিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্যতম সেতু ছিলেন তরুণ কালিদাস।

আচার্য নাগ ফরাসী ভাষায় বিশেষ দক্ষতালাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতাগ্রন্থের ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তিনি। আবার রল্যাঁর বিখ্যাত রচনাবলী—'Jean Christophe', শেক্সপীয়ার-প্রশস্তি, রল্যাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'Credo Quia Verum' ইত্যাদি ফরাসী ভাষা থেকে ইংরেজী এবং বাঙলায় তিনি অনুবাদ করেন। আচার্য নাগ-কৃত রল্যাঁ-সাহিত্যের অনেক অনুবাদ তাঁর শ্বশুর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত Modern Review, প্রবাসী এবং অগ্রজ গোকুল নাগ-সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

টলস্টয়ের রচনা থেকে গান্ধীর মতো রল্যাঁও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, তাই স্বভাবতই কালিদাস টলস্টয়-প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করেছিলেন। টলস্টয় এবং গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর মনোজ্ঞ রচনা সুবিদিত; তিনি টলস্টয়-রল্যাঁর পত্রাবলীর (১৮৮৭) অনুবাদও করেন।[৫] একথা সর্বজনবিদিত যে, স্বয়ং টলস্টয় বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' পড়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে এক রুশ-ভক্তের পাঠানো স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থের কপি রাশিয়ার Yama Paliyana গ্রামে টলস্টয়ের পিতামহ-ভবনে রক্ষিত আছে; ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়া-ভ্রমণের সময় কালিদাস সেই সযত্নে রক্ষিত কপি দেখে এসেছিলেন।[৬]

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে গবেষণাকার্য সমাপ্ত করে কালিদাস ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময়ই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং যদুনাথ সরকারের আনুকূল্যে তিনি বৃহত্তর ভারত-সংস্কৃতির গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বিবেকানন্দ-জীবনীতে রল্যাঁ মন্তব্য করেছিলেন যে, কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে Greater India Society স্থাপিত হয়েছে "to study the radiations of Greater India and its forgotten empire in the past."। সোসাইটি-প্রকাশিত নভেম্বর ১৯২৬-এর প্রথম বুলেটিনে সম্পাদক ডঃ কালিদাস নাগের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—'Greater India: A Study in Indian Internationalism', যা রল্যাঁর ভাষায় "a very interesting historical account of the spread of the Indian spirit beyond its own frontiers."।[৭]

রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখ তরুণ গবেষকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পরে মিশর, ইরাক, ইরান থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করেন এবং শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী-চর্চার সূত্রপাত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও আচার্য কালিদাস নাগের উদ্যোগে South-East Asian Art and Culture বিষয়ক গবেষণার আয়োজন করা হয়। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'The Golden Book of Tagore'-এর সম্পাদনা আচার্য নাগের এক অক্ষয়

৫ Modern Review, January, 1927, pp. 83-88; Reprinted, February, 1966, pp. 134-140

৬ 'বিবেকানন্দ-শিক্ষাসূচী'—কালিদাস নাগ, উদ্বোধন, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, পৌষ ১৩৭০, পৃঃ ১২১-১৩০

৭ The Life of Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, 1947, pp. 387-388, footnotes 1 [Plotinus-এর Enneades, Alexandrine Epoch এবং Hellenic-Christian Mysticism প্রসঙ্গে (pp. 382-422) Greater India Society-র কথা উল্লিখিত হয়েছিল।]

কীর্তি।[৮] রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী (১৯৬১) উপলক্ষে কালিদাস তাঁর সারা জীবনের গবেষণার ফসল 'Greater India' পুস্তক প্রকাশ করেন।

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চায় আচার্য কালিদাস নাগের অবদান অনবদ্য। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Face of Silence' প্রকাশিত হয় এবং প্রধানতঃ ঐ গ্রন্থটি পড়ে রল্যাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আকৃষ্ট হন। রল্যাঁর ভগিনী ম্যাডেলেইন ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন এবং আচার্য কালিদাস নাগের কাছে তিনি বাঙলা ভাষা শিক্ষা করে রল্যাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। কালিদাস রল্যাঁ-পরিবারকে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' উপহার দেন। ভারতবর্ষ থেকে তিনিই রল্যাঁর সঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন।[৯] [অবশ্য মিস ম্যাকলাউডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে স্বামী শিবানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে রল্যাঁর যোগাযোগের ক্ষেত্রে।] এসবেরই ফলস্বরূপ স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে রল্যাঁর পত্র-বিনিময় হয় এবং আমরা রল্যাঁ-রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অমর চরিতকথা উপহার পাই, যা বিশ্বসাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ধনগোপাল এবং কালিদাস সম্বন্ধে প্রীতিমুগ্ধ রল্যাঁ লেখেন :

"I can never forget that it was to the perusal of this (Dhangopal's) beautiful book that I owe my first knowledge of Ramakrishna and the impetus leading me to undertake this work (Life of Ramakrishna) ... I must also express my gratitude to my faithful friend, Dr. Kalidas Nag, who has more than once advised and instructed me."[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগেই যে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক সম্পর্ক ছিল, সেই তথ্যের আবিষ্কার করেন আচার্য কালিদাস নাগ।[১১] তথ্যটি কালিদাস রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাদেবীর ডায়েরী থেকে পান। ১২৮৮ সালের ১৫ শ্রাবণ লীলাবতীর বিবাহ হয় ভাবী 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য এবং নরেন্দ্রনাথের সহচর কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে। ঐ বিবাহসভায় 'দুই হৃদয়ের নদী', 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' এবং 'জগতের পুরোহিত তুমি'—এই তিনটি সদ্য-রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য গায়কগণ।[১২] উক্ত প্রসঙ্গে পরে আরও মূল্যবান তথ্যের সংযোজন করেন প্রবোধচন্দ্র সেন, ক্ষিতিমোহন সেন, নলিনীকুমার ভদ্র প্রমুখ।

উপরোক্ত গবেষকরা ১৮৭৯-৮১ খ্রীস্টাব্দের প্রাক্-রামকৃষ্ণ-পর্বের বিবেকানন্দ-জীবনী সম্বন্ধে আরও কিছু আলোকপাত করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা করেননি। আমি দুটি প্রস্তাব করছি, যা আগামী-কালের গবেষকদের বিচার্য।

প্রথম—১৫ শ্রাবণ, ১২৮৮/আগস্ট, ১৮৮১ তারিখের আগেই নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের রচিত গান গাইতেন। বিলাত থেকে ফিরে তরুণ রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসব উপলক্ষে (জানুয়ারি, ১৮৮১) ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় কাজে হাত দেন এবং সেই সময়কার রচিত কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত নরেন্দ্রনাথ গাইতেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অন্তর্ভুক্ত সমবেত দস্যু-কণ্ঠে গীত 'কালী কালী বলো রে আজ' রবীন্দ্রসঙ্গীতটি নরেন্দ্রনাথ দত্তের 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ের পরে গৃহীত group photo-

৮ দ্রঃ পাদটীকা ২ ৯ ঐ, ৬

১০ The Life of Ramakrishna,—Romain Rolland, 1947, pp. xi-xii & 325

১১ 'স্বামী বিবেকানন্দ'—কালিদাস নাগ, মাসিক বসুমতী, ৩০ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৫৮, পৃঃ ৬০৪-৬০৯, [পুনর্মুদ্রিত, উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৯৭, পৃঃ ২০০-২০৩]। ডঃ নাগ পরিবর্ধিত আকারে উদ্বোধন-এর মাঘ ১৩৬৮ সংখ্যায় প্রবন্ধটি লেখেন।

১২ বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৩৮ ; যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪ ; বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮-২০০

graph-এ একজন দস্যু-চরিত্রের অভিনেতার সঙ্গে বিবেকানন্দের মুখের সাদৃশ্য আছে। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন) মাসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাটিকাটি রচিত ও অভিনীত হয়। অভিনয়ে অন্যতম দস্যুর ভূমিকায় কি নরেন্দ্রনাথ অভিনয় করেছিলেন ? এবিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাতের তারিখের বিতর্কিত বিষয়টি পুনর্বিবেচ্য। রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের পাঠকরা জানেন যে, নভেম্বর ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে তাঁদের প্রথম আলাপ। কিন্তু আচার্য কালিদাস নাগ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে।[১৩] বিষয়টি পুনর্বিবেচ্য, কারণ প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন :

"১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ভাগিনেয় (হৃদয়রাম)। সেদিন উপাসনা করিতেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সঙ্গীত করিতেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত।"[১৪]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১০ মাঘ, ১৮৮১ তারিখে (জানুয়ারির শেষ ভাগে)। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রচারকার্যের জন্য মাদ্রাজে থাকেন ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ থেকে মে মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত। হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বিতাড়িত হন ১২ জুন, ১৮৮১ তারিখ নাগাদ। অতএব কৃষ্ণকুমার-বর্ণিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাক্ষাৎকার (পরস্পর দর্শনমাত্র, আলাপ নয়) ঘটেছিল জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি অথবা মে/জুন, ১৮৮১ তারিখে (অর্থাৎ নভেম্বরের আলাপের আগেই)।

আচার্য কালিদাস নাগের দেওয়া তারিখ (জুন, ১৮৮১) একেবারে ভিত্তিহীন নাও হতে পারে। 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭৮) পাই যে, প্রথম আলাপের সময় নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন : "এঁদের নিকট আপনার কথা অনেক শুনিয়াছি, সময় হয় নাই তাই আসি নাই।" নভেম্বর ১৮৮১ তারিখের আগে পৌত্তলিকতা-বিরোধী ব্রাহ্মভক্ত নরেন্দ্রনাথ দূরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন, কিন্তু সংশয়ে এড়িয়ে গেছেন। ১৮৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দের কলকাতার সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁরা আমার দুটি প্রস্তাব সম্পর্কে আলোকপাত করলে বাধিত হব।

'উদ্বোধনে'র সুবর্ণ-জয়ন্তী সংখ্যায় (১৩৫৪) আচার্য কালিদাস নাগ বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 'ভারতীয় শিল্পের ওপর তথাকথিত গ্রীক প্রভাব' প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে বিবর্তন হয় তারও বিশ্লেষণ করেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মনোজ্ঞ আলোচনার[১৫] পরেও বিষয়টি গভীরতর গবেষণার বস্তু হয়ে রয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব গ্রীক-মৌর্য-কুষাণ পর্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়েছিল তাতে শুধু শিল্পচিন্তা নয়, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনচিন্তার বিভিন্ন দিকও প্রতিফলিত হয়েছিল। রল্যাঁ 'Hellenic-Christian Mysticism'-এর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, 'Alexandrine Epoch'-এ Plotinus রচিত 'Enneades' গ্রন্থে বেদান্ত-দর্শনের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছেন এবং এই প্রসঙ্গেই আচার্য কালিদাস নাগের 'Greater India Movement'-এর সাফল্য কামনা করেছেন।[১৬] সাম্প্রতিককালের আবিষ্কারে আমরা জেনেছি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে দস্তা বা Zinc-এর সর্বপ্রথম ব্যবহার হয় ভারতবর্ষের Zawar mines এবং তক্ষশিলায়, যা ভারতীয় সভ্যতার অবদান, গ্রীক সভ্যতার নয়। এই ধরনের multi-dimensional গবেষণায় বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান যে কত মূল্যবান তার ওপর জোর দিয়েছেন লেভি, কালিদাস নাগ এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আচার্য কালিদাস বিবেকানন্দের পাণিনি-প্রীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও কৃষ্টি প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ

১৩ দ্রঃ পাদটীকা ১১

১৪ কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃঃ ৬৮৩ ; আত্মচরিত, মাঘ, ১৩৪০ ; 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১০২-১০৩

১৫ 'জাতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়'—কালিদাস নাগ, উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৪, পৃঃ ১১-১৫ ; বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৭-১০৫

১৬ দ্রঃ পাদটীকা ৭

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য শিক্ষাসূচী হবে।[১৭] প্রস্তাবটি তিনি প্রথম নরেন্দ্রপুরে একটি বক্তৃতায় দেন এবং পরে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় লেখেন যে, "এই বিশ্ব-বিদ্যালয় যেন গতানুগতিক না হয়ে জাতির প্রকৃত কল্যাণ করতে পারে।" তিনি কি 'ভগ্ননীড় বিশ্ব-ভারতী'র কথা ভেবে সম্ভাব্য 'গতানুগতিকতা'র কথা লিখেছিলেন ?

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর এক দশকেরও আগে (১৩৫৮) তিনি অধিকতর বিবেকানন্দ-চর্চা, গবেষণা ও নতুন আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।[১৮] কালিদাস রল্যাঁর কাছে শুনেছিলেন, 'Schopen-hauer সমিতি' কিভাবে নতুন গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশে উৎসাহ দিতেন, এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, সেই আদর্শেই নতুন গবেষণা-পত্রের জন্য "প্রতি বৎসরে বিবেকানন্দ-পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা এই ৯০তম জন্মবৎসর (১৩৫৮/১৯৫৩) থেকেই শুরু হওয়া উচিত।"[১৯] স্মরণে রাখতে হবে যে, তখনও বিবেকানন্দ-সাহিত্যের আকাশে পুরস্কার-ধন্য মারি লুইস বার্ক, শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমুখ গবেষকদের আবির্ভাব হয়নি। আচার্য কালিদাস নাগ আশা করেছিলেন যে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানা যাবে। সেই আশা সফল হয়েছে; মারি লুইস বার্ক ও শঙ্করীপ্রসাদ বসুর যুগান্তকারী গবেষণার পরেও নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। খেতড়ি-বিবেকানন্দের মধুর সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা অজানা তথ্য প্রকাশ করেছি[২০], যা তিরো-ধানের আগে আচার্য কালিদাস দেখে যেতে পারেননি।

॥ ৩ ॥

আচার্য কালিদাস নাগের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ হয় ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে। তবে আমাদের যোগাযোগ মুখ্যতঃ পত্র-বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একবার আমি তাঁকে চিঠিতে প্রশ্ন করেছিলাম, (১) Greater India Movement-এর ভবিষ্যৎ কি, (২) গ্রীক Neo-Platonism এবং ভারতীয় দর্শনের যোগসূত্র আবিষ্কারের জন্য কি প্রকার গবেষণা হওয়া উচিত, (৩) তিনি রোমাঁ রল্যাঁর জীবনী (বাঙলায়) কেন লিখছেন না, (৪) পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের ভবিষ্যৎ কি ইত্যাদি। তাঁর ২৬ আগস্ট ১৯৬৩ তারিখের উত্তরই (প্রতিলিপি দেওয়া হলো) প্রমাণ করে যে, এই প্রসঙ্গগুলিতে তিনি কতটা উৎসাহিত ছিলেন। তাঁর পত্রটি নিচে দেওয়া হলো।

Council of States
Indian Parliament
New Delhi
26. 8. 63

স্নেহাস্পদেষু,

পার্লামেন্টের তাগিদে দিল্লী আসতে হলো, তাই জবাব দিতে দেরি হয়েছে। কিছু মনে করো না। সংক্ষেপে জবাব আজ দিচ্ছি—পরে দেখা হলে সবিস্তার জানাব।

(১) Greater India Society-র কাজ এখন দেশের মানুষ ও রাষ্ট্রই চালাবে। আমি দূরে থেকে সাহায্য করছি।

(২) Neo-Platonism ও ভারতীয় দর্শনের সংযোগ খুব সম্ভব গভীর, কিন্তু কোনও ভারতীয় দার্শনিক (শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া) মূল গ্রীক ভাষা জানেন না—তাই জোর দিয়ে বলতে পারেননি। গ্রীক শিখতে হবে।

(৩) R. Rolland-এর জীবনী সত্যি বাঙলায় শীঘ্র প্রকাশ করা উচিত; তোমাদের মতো তরুণ কর্মীদের সাহায্য পেলে হয়তো আমি লিখে দিতেও পারি।

(৪) আমেরিকা বিরাট দেশ—[রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের] মাত্র ১২টি বেদান্ত-কেন্দ্র সকলের সঙ্গে যোগরক্ষা করতে পারেনি। ভাসা ভাসা খবর কিছু দেওয়া হয়েছে—Prejudices এখনও ভারতের বিরুদ্ধে। Emerson ও Whitman-দের প্রেরণা ক্ষীণতর হয়ে আসছে; Thoreau-কে পাগলই হয়তো ভাবে—তবে সাহিত্যিক প্রভাব খানিকটা আছে বিদ্যায়তনে ও সাহিত্য-গোষ্ঠীতে।

রবীন্দ্রনাথ বহুবার ওদেশে বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু হায়! গত ২০ বছরের মধ্যে তাঁকেও ভুলতে বসেছে। বিশ্বভারতীরও ত্রুটি আছে—প্রচার ভালরকম হয়নি; আমাদের দুর্ভাগ্য।

আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে কবিগুরুর ও মহাত্মাজীর বাণী প্রচার করে এসেছি, ২৫।৩০ বছর ধরে। তোমাদের সজাগ হয়ে কাজে নামতে হবে; Sept. 15 পরে দেখা করো বাড়িতে।

ইতি শুভার্থী
শ্রীকালিদাস নাগ

১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিরোধানের আগে তাঁর সঙ্গে আমার আর মৌখিক আলাপ হয়নি।

১৭ দ্রঃ পাদটীকা ৬ ১৮ ঐ, ১১ ১৯ ঐ,

২০ A Pilgrimage to Khetri and the Sarasvati Valley—Arun Kumar Biswas, 1987; 'স্বামীজীর স্বহস্তে লিখিত খেতড়ির নর্তকী-গীত সুরদাসের ভজনের বাণী'; 'আমেরিকা থেকে প্রেরিত স্বামীজীর সর্বপ্রথম (১৮৯৩) চিঠি', '১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কলকাতার সাঙ্গীতিক জলসায় স্বামীজী' ইত্যাদি 'নতুন আবিষ্কার'।

॥ ৪ ॥

আরও কিছুদিন জীবিত থাকলে আচার্য নাগ ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস-চর্চার নব অধ্যায় দেখে যেতে পারতেন। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দেই INSA (Indian National Science Academy) প্রবর্তিত বিশ্ববিখ্যাত Indian Journal of History of Science প্রকাশনা শুরু হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন আচার্য দেবেন্দ্রমোহন বসু, যিনি লাফো-সংক্রান্ত গবেষণায় আমাকে সাহায্য[২১] ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। এখন এই জার্নালের কর্ণধার আমার প্রাক্তন শিক্ষক ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

যখন ডঃ নাগ পরলোকগমন করলেন তখন মারি লুইস বার্কের বিবেকানন্দ-গবেষণার প্রাথমিক ভাগ শেষ হয়ে গেছে আর শঙ্করীপ্রসাদ বসুর যুগান্তকারী গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে। তাঁরা দুজনেই কালিদাস-প্রস্তাবিত 'বিবেকানন্দ-পুরস্কারে' সম্মানিত হয়েছেন।

রোম্যাঁ রল্যাঁর বিস্তৃত জীবনী যদি আচার্য নাগ লিখে যেতে পারতেন তাহলে বড়ই ভাল হতো। যাই হোক, সান্ত্বনার কথা এইটুকু যে, মডার্ন রিভিউ-এর 'রল্যাঁ সেন্টিনারী সংখ্যায় (১৯৬৬) তিনি তাঁর 'Mon maitre'র উদ্দেশে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে যেতে পেরেছেন।[২২]

রল্যাঁর ডায়েরী, চিঠিপত্রের বহুলাংশ প্রকাশিত হয়েছে (Inde, 1915-1943); শুধু গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথই নন, বহু চিঠির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আচার্য নাগ। রল্যাঁর মৃত্যুর (1944) পরে কালিদাস লক্ষ্য করেন যে, তাঁর বহু চিঠি এবং ডায়েরীর অনেকাংশ অপ্রকাশিত রয়েছে। অনুরূপভাবে কালিদাসের জামাতা অধ্যাপক পি. লাল ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের বহু পরে আবিষ্কার করেছেন যে, আচার্য নাগকে লেখা Romain Rolland ও Herman Hesse-এর বহু চিঠি এবং আচার্য নাগের বাঙলা এবং ইংরেজীতে লেখা ডায়েরী পুরনো ট্রাঙ্কের মধ্যে রয়ে গিয়েছে।[২৩] অপ্রকাশিত এই রত্নসম্ভার জাতির সম্পদ; আমরা শুনেছি যে, অধ্যাপক পি. লাল এবং অধ্যাপক চিন্ময় গুহ মূল্যবান দলিলগুলি সম্পাদিত ও প্রকাশিত করবেন।

সর্বশেষে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আচার্য নাগ ছিলেন Greater India (বৃহত্তর ও মহত্তর ভারত)-র সংস্কৃতির ঐতিহাসিক। কিন্তু ইতিহাসের পদ্ধতি তো অনেকাংশে দ্বান্দ্বিক। আচার্য নাগ যতটা তথ্যের সম্ভারে বিশ্বাস করতেন ততটা দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে প্রবেশ করেননি। তথ্যের মধ্য দিয়েই তত্ত্বে যেতে হবে ঠিকই, তবে যেতে তো হবেই।

অনেক ঐতিহাসিক নৈর্ব্যক্তিকতার কথা বলেন, আরও বলেন যে, তাঁরা 'চিরন্তন বা অখণ্ড সত্যের কারবারী নন', কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে কি তাঁদের আত্মবিশ্লেষণমূলক সত্যের সম্মুখীন হতে হয় না?

রোম্যাঁ রল্যাঁ নৈর্ব্যক্তিক ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আদর্শ জগতের জীবনসংগ্রামী। তাই তিনি টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর আদর্শে প্রভাবিত হয়েও সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হননি এবং অবশেষে বিবেকানন্দের সংগ্রামী বাণীর পূর্ণ মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে অহিংসা মানব-জীবনের "একটি মহৎ পথ, কিন্তু একমাত্র পথ নয়।"

রল্যাঁ তাঁর আদর্শ-জগতে সংগ্রাম ও চিন্তার বিবর্তনের কথা লিখেছিলেন '*Quinze ans de Combat*' এবং '*Par la Revolution La Paix*' শীর্ষক দুটি ফরাসী ভাষায় লিখিত অমর গ্রন্থে, যার কথা তিনি সুভাষচন্দ্রকে বলেন।[২৪] আচার্য কালিদাস এই দুটি গ্রন্থের অনুবাদ ও বিশ্লেষণ করে যেতে পারেননি; হয়তো তাঁর উত্তরসূরীরা এই কাজের ভার গ্রহণ করবেন।

আমরা আচার্য কালিদাস নাগের আহরিত তথ্য থেকে ভারতীয় ও বিশ্বসংস্কৃতির তত্ত্বকথায় উন্নীত হতে চাই। বিভিন্ন পাশ্চাত্য ও ভারতীয় আদর্শের সঠিক তুলনামূলক মূল্যায়নই হবে বৃহত্তর ভারত-পথিক আচার্য কালিদাস নাগ প্রমুখ অগ্রসূরীদের উদ্দেশে প্রকৃত ও সার্থক শ্রদ্ধার্পণ।

২১ দ্রঃ পাদটীকা ৬ ২২ ঐ, ৩ ২৩ ঐ, ৪

২৪ 'What Romain Rolland Thinks', Subhas Chandra Bose—১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের রচনাটি Modern Review পত্রিকায় February, 1966, (pp. 141-144) সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ ভাদ্র, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

মহারাজের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা, ভাবাবেশ প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার-বুঝিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে তাঁহার কয়েকটি চিত্র যাহা অন্তরে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

মহারাজকে একই দিবসে বিভিন্ন সময়ে দেখিয়াছি, যেন বিভিন্ন মূর্তি—চোখে-মুখে, গলার স্বরে, কথাবার্তার ধরনে, এমনকি পায়ের রঙে পর্যন্ত যেন স্বতন্ত্র একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইত। সেই সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের দিব্যভাবের অভিব্যক্তির প্রেরণায় যে উহা সংঘটিত হইত তাহা এখন বুঝিতে পারি। বস্তুতঃ মহাপুরুষের মহাভাবসকল বুঝিবার যোগ্যতাও তো থাকা চাই।

মহারাজ একদিন সকালবেলা—বেলা আটটা-নয়টার সময় হইবে—মঠে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মঠবাড়ির দোতলা হইতে নামিয়া স্বামীজীর মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন, সঙ্গে দু-তিন জন সেবক। একটু অগ্রসর হইয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া সহাস্যবদনে দাঁড়াইয়াছেন। একজন সেবক একখানা রেঙ্গুনের সুন্দর রঙ্গীন ছাতা মাথার উপর ধরিয়াছেন। মহারাজের পরিধানে অতি উজ্জ্বল গৈরিক বস্ত্র ও গায়ে সেইরকম চাদর। আমি তখন স্বামীজীর মন্দিরের দিক হইতে মঠবাড়ির দিকে আসিতেছিলাম। একটু দূর হইতেই মহারাজের সেই পরম চিত্তাকর্ষক মূর্তির দিকে নজর পড়িল। বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিলাম। মনে হইল তিনি যেন এ-পৃথিবীর লোক নহেন। উজ্জ্বল দেহকান্তি গৈরিক বসনের ভিতর দিয়া যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। সমস্ত মুখাবয়ব যেন অতি কোমল ঢল ঢল লাবণ্যময় স্নিগ্ধ সুমধুর হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত। মহারাজের সেই অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যমূর্তি আজও যেন চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

মহারাজ একবার বলরাম মন্দিরে বাস করিতেছেন। সন্ধ্যাকালে সেখানে তখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। আমরা একদিন সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে সেখানে গিয়াছি। উপরের হলঘরে পাঠ হয়। পাঠক হরিহর মহারাজ (স্বামী বাসুদেবানন্দ) গ্রন্থ সম্মুখে লইয়া পাঠ করিতেছেন। ঘরভর্তি লোক। মহারাজ আপনমনে দ্রুত হলের সম্মুখবর্তী লম্বা বারান্দার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করিতেছেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে হইল তিনি যেন এই সংসার ছাড়িয়া অন্য কোন ভাব-জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সেই মূর্তি দেখিয়া বিস্মিত স্তব্ধ হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল এই কি সিংহবৎ আত্মারামের বিচরণ? শ্রোতাদের অনেকেই মহারাজকে দেখিতেছেন। মহারাজের কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

মঠে কতদিন দেখিয়াছি, তাঁহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া আছেন, যেন গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। কিন্তু নিকটে থাকিয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তখন ঠিক বুঝা যাইত—তাঁহার দৃষ্টির লক্ষ্য বাহিরে নয়, অন্তরে। চক্ষের সেই চাহনি মন মুগ্ধ করিত। ইহাই কি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত পাখির ডিমে তা দিবার দৃষ্টি?

কথাবার্তা বলিবার সময় কখনো কখনো তাঁহার কণ্ঠস্বর হইতে এমন মধুবর্ষণ হইত যে, সেই স্নেহ-করুণার ধারায় শ্রোতাদের অন্তর শান্ত ও স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। ভাগবতে যে লেখা হইয়াছে—'তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্', তাহা যে বাস্তবিক কত সত্য তাহা তখন বুঝিতে পারিতাম।

ভবানীপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ, পেশায় উকিল, মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ছুটির দিনে প্রায়ই মঠে আসিতেন, এক-দুইদিন থাকিতেনও সুযোগ সুবিধামতো। প্রৌঢ়বয়স্ক ভক্তিমান ভদ্রলোক মঠে আসিলে জপধ্যানে অনেক সময় কাটাইতেন। মহারাজ ও মহাপুরুষের সঙ্গে সাধন-ভজন সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ আলোচনাও হইত। একদিন একান্তে উপরের বারান্দায় মহারাজের পদতলে বসিয়া তিনি নিজ সাধনার উপলব্ধির কথা বলিতেছিলেন। কোন বিশেষ কারণে আমাকে বারান্দায় যাইতে হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহাদের প্রসঙ্গের একটুমাত্র কর্ণগোচর হয়। ভক্তটি ভজনের ফলে তাঁহার আনন্দ অনুভবের কথা বলিতেছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া আরও অগ্রসর হইতে বলিয়া বলিলেন: "আনন্দও নিচের অবস্থা; তারও ওপরের অবস্থা আছে। সে যে কী প্রশান্তি তাহা মুখে বলা যায় না।"

বেলুড় মঠ হইতে পূজ্যপাদ মহারাজ বলরাম মন্দিরে যাইতেছেন। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য মোটর আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে। মহারাজ উপর হইতে নিচে নামিয়া উঠানে ঠাকুরঘরের সিঁড়ির সামনে আমগাছের ছায়ায় দাঁড়াইলে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া প্রণাম করিলেন। অতঃপর হাসিমুখে ঠাকুরঘরের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে প্রণাম করিয়া গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় খোকা মহারাজ দ্রুত আসিয়া তাঁহার পদে মাথা নুয়াইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিলেন: "শীঘ্র শীঘ্র ফিরে আসবেন।" মহারাজ কোন জবাব না দিয়া তাঁহার মুখের দিকে সহাস্যে তাকাইয়া দেখিলেন; তৎপরে গাড়িতে উঠিলেন, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সমবেত সাধুগণ গাড়ির দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মহারাজের উপস্থিতিতে মঠে যে আনন্দোৎসব চলিতেছিল, তাহা স্থগিত হইবে ভাবিয়া সকলেরই মুখ বিষন্ন। এদিকে মঠবাসীদের বিষাদ দিনে দিনে বাড়িয়া চলিল। কারণ, খবর আসিয়াছে, মহারাজের শরীর খুব অসুস্থ, কলেরা হইয়াছে। মঠ-কলকাতা সদা সর্বদা লোক যাতায়াত চলিয়াছে। কখনও একটু ভাল খবর শুনিয়া মনে আশা বাড়ে, আবার খারাপ সংবাদ শুনিয়া বিষাদ বাড়িতে থাকে। আনন্দমুখর বেলুড় মঠ নীরব-নিস্তব্ধ, দিবসেই যেন অন্ধকার বোধ হয়। বিশেষ পূজার্চনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন চলিতেছে। মহারাজের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধু ও অনুরাগিগণ প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য। ইহারই ভিতর সংকটাপন্ন অসুখের মধ্যেও মহারাজের অলৌকিক দিব্য ভাবাবেশ সকলকে চমৎকৃত করিতেছে, সেসকল বার্তা শুনিয়া সকলেই পুলকিত। একদিন চিন্ময় নিত্য ব্রজধামের অধিপতি চিন্ময় শ্যাম তাঁহার নিত্যসঙ্গী রাখালকে স্বয়ং আসিয়া হাত ধরিয়া নিজ সকাশে লইয়া গেলেন। মর্ত্যলোকে পরিত্যক্ত তাঁহার শুদ্ধ পবিত্র দেহ মঠে আনীত হইয়া ঠাকুরঘরের দিকে মুখ করিয়া উঠানের সেই স্থানেই রাখিয়া পূজা, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইল। চিন্ময়ধামে যাত্রার প্রাক্‌কালে প্রিয়তমের স্পর্শে তাঁহার বদনমণ্ডলে যে দিব্য জ্যোতির্ময় আভা প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে মঠে আনীত হইবার পরেও তাহা একই ভাবে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। খবর পাইয়া শোকসন্তপ্ত বহু ভক্তের স্রোত আসিয়া বেলুড় মঠে আছড়াইয়া পড়িল। মহারাজের সেই অপূর্ব মুখশ্রী তাঁহার বিয়োগব্যথা ভুলাইয়া দিতেছিল।

স্মৃতি দুর্বল। অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে যখনই স্নেহ-করুণার সাকার-মূর্তি শ্রীশ্রীমহারাজের কথা স্মরণ করি তখনই মন এক অপূর্ব আনন্দে ভরিয়া উঠে। পুলকিত সেই মনে অভাবিত-ভাবে বহু স্মৃতি, বহু কথা, বহু মুহূর্ত জীবন্ত হইয়া উঠে। লেখনী চলিতে থাকে। জানি না, আমার এই লেখনী সেই পরম প্রেমময় অধ্যাত্ম-বিগ্রহের অমানুষী চরিত্রের কতটুকু আভাস তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইল। তবে যদি এই লেখা শ্রীশ্রীমহারাজ সম্পর্কে কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাঠককে দিতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রয়াস সার্থক হইবে।

কালিন্দীফুল্লকমলে মাধবেন ক্রীড়ারত।
ব্রহ্মানন্দং নমস্তুভ্যং সদ্‌গুরো লোকনায়ক ॥

—যমুনাবক্ষে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়ারত সদ্‌গুরু, লোকনায়ক ব্রহ্মানন্দ, তোমাকে প্রণাম করি।

৺বিজয়াদশমী, ১৩৭২—বৃন্দাবনধাম

[সমাপ্ত]

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : ভাদ্র, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

কালীতত্ত্ব

প্রশ্ন : মা-কালীর অর্থ কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : সর্বভূতকে কবলিত করেন বলে মহাকাল, আবার মহাকালকেও যিনি গ্রাস করেন তিনিই আদ্যাকালী।

প্রশ্ন : কালকে তিনি কিরূপে গ্রাস করেন ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : অস্পন্দ ব্রহ্মে তিনি অনির্বাচ্যা ভ্রান্তিস্পন্দরূপে উদিতা হন। স্পন্দের পূর্বাপর সম্বন্ধ ভ্রান্তিকে আশ্রয় করে কালের উৎপত্তি—কালেতেই উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ। সেই স্পন্দকারিকা মহামায়া যখন নিস্পন্দা হন, তখন পূর্বাপর সম্বন্ধাভাবে কালও তিরোভূত হন।

প্রশ্ন : তখন তিনি কি অবস্থায় থাকেন ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : তিনি ব্রহ্মাশ্রিতা, তখন তাঁর ব্রহ্মস্বরূপতাই প্রাপ্ত হয়। দেখনি, কোন বস্তুর ওপর যে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, সেই ভ্রান্তি অপগত হলে সেই ভ্রান্তির অধিষ্ঠান যা ছিল, তাই থাকে।

প্রশ্ন : দৃষ্টান্ত ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : শুক্তিতে যে 'শুক্তি-রজতের' ভ্রান্তি হয়, শুক্তির জ্ঞান হলে 'শুক্তিরজত' শুক্তিতেই বিলীন হয়।

প্রশ্ন : ভ্রান্তি দিয়ে ব্রহ্ম জগৎ-সৃষ্টি কি করে করেন ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : জগদম্বা মহামায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যারূপা ব্রহ্মশক্তি। বিদ্যারূপে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, জীবের মোক্ষবিধান করেন। অবিদ্যারূপে তিনি জীব ও জগৎ ব্রহ্মে বিক্ষেপ করেন, তাদের স্বরূপ আবরিত করে রাখেন।

প্রশ্ন : তাহলে জীবের উপায় ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : মা-কালী, মা-ভবতারিণী ব্রহ্মবিদ্যারূপা। তাঁর কৃপায় জীবের নির্বিকল্প সমাধি হয়। সেখানে জীবজগৎ, ব্রহ্মমায়া সব সমরস, একাকার। সেখানে দেশ নেই, কাল নেই, স্পন্দ নেই, বহু নেই—এক অনন্ত অপার সত্যজ্ঞানানন্দ অখণ্ড পূর্ণই চিরবিদ্যমান।

প্রশ্ন : ঐ অবস্থার সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : ঐ সত্য গুণাতীত, কালাতীত, দেশাতীত, বাক্যাতীত, বুদ্ধ্যতীত ব্রহ্মবস্তু। সেখানে দৈশিক পরিণাম, কালিক পরিণাম বা অবস্থা পরিণাম নেই। মা-কালী দক্ষিণা, তাঁর অতি বিশুদ্ধা বিদ্যাশক্তি। তাঁকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক ভাবনা চলে না। যেমন আগুন ও তার প্রকাশশক্তি।

প্রশ্ন : আর ঐ অবিদ্যা মায়া ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : তাও ব্রহ্মশক্তি, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে তাঁর নাশ হয়। দেখনি, আগুনের দুটো শক্তি—একটা প্রকাশ, আর একটা দাহিকাশক্তি। মণি ঔষধী মন্ত্র যোগে আগুনের দাহিকাশক্তি বাধিত হয়, তথাপি প্রকাশশক্তি থাকে। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের অতি বিশুদ্ধ বিদ্যাশক্তিকে চিতিশক্তিও বলা হয়, ইনি দর্শিত-বিষয়া, অনন্তা, অপরিণামিনী, কূটস্থা বলে শাস্ত্রে পরিচিতা। এঁরই কৃপায় তোতাপুরীর ব্রহ্মস্থিতি হলো। ইনিই পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের সদা-পার্শ্বস্থা মাতৃশক্তি। এঁরই কৃপায় নির্বিকল্প-ভূমিতে বোঝা যায় 'আমি ও মা এক', আবার 'মা ও ব্রহ্ম এক'। তন্ত্রে তাঁর নাম দিয়েছে অনিরুদ্ধ-সরস্বতী, অর্থাৎ যে ব্রহ্মবিদ্যার সত্যমুখী গতি কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না।

প্রশ্ন : তবে তাঁকে জগদম্বা বলা হয় কেন ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : তিনিই তো ব্রহ্মের বক্ষে জীবজগৎ প্রপঞ্চরূপে অবিদ্যারূপে লীলায়িত হয়ে ওঠেন।

প্রশ্ন : অবিদ্যা কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : যিনি ব্রহ্মস্বরূপে আবরণ করে তার ওপর ভ্রান্তিময় এই জগৎ বিক্ষেপ করেন।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে বিক্ষেপ করেন ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ যেমন অবিবেকী দড়িকে সাপ দেখে।

প্রশ্ন ঃ তাহলে এই জগতের কোন সত্তা নেই ? আপনাকে আমরা দেখছি শুনছি, এসব 'ইলিউসন' ? তবে আর জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ আছে। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এই জগতের ও জীবের প্রতি নামরূপে সত্তারূপে বর্তমান। তবে এই জীবজগৎ ব্যবহারিক সত্তা, আপেক্ষিক সত্তা —'অ্যাবসলুট' নয়। নামরূপ, দেশ-কালের চশমা এঁটে সেই 'অ্যাবসলুট' সচ্চিদানন্দকেই দেখা হচ্ছে—এ-জগৎ হলো ভ্রান্তিময় সোপাধিক ব্রহ্ম। যতক্ষণ এই ভ্রান্তির এলাকায় থাকা যায় ততক্ষণ এটি নিছক সত্য বলেই উপলব্ধ হয়, যেমন যেই রজ্জুজ্ঞান হলো আর সঙ্গে সঙ্গে তাতে সর্পভ্রান্তি চলে গেল।

প্রশ্ন ঃ এই ব্যবহারিক কল্পনাটার ব্যবহারিক কোন উপাদান নেই ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ জগৎটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনটি শক্তির কাজ চলছে—(১) সত্ত্ব—যা দৃশ্যজগৎকে সত্য বলে প্রতীয়মান করায়, (২) রজঃ—যা অচঞ্চলকে গতিশীল বলে বোধ করায়, (৩) তমঃ—যা দৃশ্যজগৎকে জীর্ণ করে নিরোধ করে দেয়। এই হলো বিক্ষেপাবরণাত্মিকা অবিদ্যামায়ার প্রথম রূপ।

প্রশ্ন ঃ এই 'ব্লাইন্ড' অর্থাৎ অন্ধ জড়োপাদান-গুলোর দ্বারা কি করে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশের 'ডিজাইন' অর্থাৎ রচনার কৌশলগুলো বাস্তবে পরিণত হচ্ছে ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ আর এক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই মহামায়া জগদম্বিকা ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা। কোন কিছুর সৃষ্টির পূর্বে একটা উৎকট ইচ্ছা, 'উইল' হওয়া চাই। একটা কিছুর অভাববোধ, সেটা মেটাবার প্রবৃত্তি হলো ইচ্ছা। কিন্তু শুধু ইচ্ছা হলেই হয় না, যা সৃষ্টি হবে তার 'আইডিয়া'টা অর্থাৎ জ্ঞানটা ওঠা চাই, যেটা ধীরে ধীরে রূপ নেয়—যাকে আধুনিক 'সাইকোলজি'তে 'সেল্ফ এক্সপ্রেশান' বলে। তারপর ক্রিয়া, 'অ্যাক্সান'। কোন কিছু ধ্বংস করতে গেলেও ঐ তিনটে দরকার। সৃষ্টিতে রজোগুণের ক্রিয়াই প্রধান এবং ধ্বংসতে তমোগুণের ক্রিয়াই প্রধান। রজঃতে গতির প্রসার—'ইভোলিউশান, এক্সটেনশান, সিন্থেটিজেশান'। এটাও যেমন ক্রিয়া, তেমনি তমঃ শক্তিও 'নেগেটিভ' ক্রিয়া—তমঃতে প্রসারের সংকোচ—'ইনভলিউশন, কন্ট্রাকশান, ডিসইন্টিগ্রেশান'—এসব নেতিমূলক ক্রিয়া। আর ইচ্ছা ও জ্ঞান সত্ত্বগুণোত্থা এদেরও দুটো দিক—ব্রহ্মমুখী ও জগন্মুখী। এই ব্রহ্মমুখী ইচ্ছার নাম, বেদান্তশাস্ত্রে, সাধনার প্রথম ভূমিকা শুভেচ্ছা বা মুমুক্ষুত্ব দিয়েছেন। আর জগন্মুখী ইচ্ছার নাম কাম বা বাসনা। সাধারণতঃ ব্রহ্মমুখী প্রযত্নকে ব্রহ্মবিদ্যা বলে। তার ফলও ব্রহ্মবিদ্যা। আর জগন্মুখী জ্ঞান হচ্ছে সৃষ্টির ছোট-বড় যাবতীয় সংস্কার অর্থাৎ 'আইডিয়া'।

প্রশ্ন ঃ আর ঐ বিদ্যামায়ার চিত্তিরূপটি কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ ওটি মহামায়ার তৃতীয় রূপ, এই জগতেই উপলব্ধ হয়। যার চোখ আছে সে-ই এটা দেখে—(১) অস্তিরূপা—ঘট-পট প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুকে 'অস্তি' বলে স্বীকার করতে হয়। সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ—এই পট উপাধি অর্থাৎ নাম-রূপ, আকার-প্রকার নষ্ট হবে, কিন্তু 'অস্তি'র উপলব্ধি ঘট-পটাদির যেকোন কালিক এবং দৈশিক অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে হবেই হবে। ঘট ভেঙে গেলে ঘটের উপাধি অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট 'লিমিটেশন' নাশ হলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল অস্তিরূপা মা ঘটচূর্ণের ভিতর দিয়ে উপলব্ধ হচ্ছেন। (২) ভাতি-রূপা—যা অস্তি অর্থাৎ আছে, তা নিশ্চয়ই জ্ঞানে আছে। অর্থাৎ 'এক্‌জিস্টেনস'টা জ্ঞানেরই আর একটা দিক মাত্র। যা অস্তি কিন্তু অনুপলব্ধ, সেটা নাস্তিই। আবার যা জ্ঞান, তার যদি অস্তিত্ব না থাকে, সেটাকে জ্ঞানই বলা যায় না। অর্থাৎ অস্তি ও ভাতি যেন একই টাকার দুটো দিক। যেখানেই অস্তি ও ভাতি, সেখানেই উপলব্ধ হয় আনন্দ, যেখানেই আনন্দ, সেখানেই প্রীতি। অস্তি ও ভাতির উপলব্ধি আত্মাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক, সেইজন্য আত্মা 'প্রিয়'। অস্তি ভাতি প্রিয়রূপ

আত্মাকে আশ্রয় করেই জগতের যাবতীয় অস্তি, ভাতি, প্রিয়রূপ আপেক্ষিক সত্তার বিদ্যমানতা।

প্রশ্ন: ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁর শক্তি—অস্তি, ভাতি ও প্রীতির সম্বন্ধ কি?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: ব্যবহারিকভাবে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ, কিন্তু পারমার্থিক হিসাবে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়, ভিন্নাভিন্নও নয়—অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। ব্যবহারিক সোজাভাবে ব্রহ্ম যেন 'নাউন' আর তাঁর শক্তি অস্তি-ভাতি-প্রীতি, সত্ত্ব রজঃ তমঃ, ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া, দেশ-কাল-নিমিত্ত, বিক্ষেপ-আবরণ যেন 'ভাব'। দার্শনিক পরিভাষায় এ-সমস্ত পরিচয়ের সংক্ষেপ হলো নাম ও রূপ।

(১৬।১১।৪২)

কালীমূর্তি-তত্ত্ব

প্রশ্ন: মায়ের রং নীল কেন?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: দূরে বলে। যেমন আকাশ, কাছে কোন রং নেই—এটি আমাদের প্রভুর উপমা। দৃষ্টির দোষ আছে বলে, আবরণ রয়েছে বলে, নীল। সূর্য অতিরূপ বলে আমাদের চোখ দেখে কালো। আমরা বলি চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। মায়ের প্রভা 'সূর্যকোটি-প্রতিকাশং চন্দ্রকোটি-সুশীতলম্'। মায়ের রূপে সূর্যের উষ্ণতা নেই—'চন্দ্রকোটি-সুশীতলম্'।

প্রশ্ন: আর মুণ্ডমালা?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: অসুরদের বুদ্ধি, রক্ত ঝরছে—রজোগুণ বেরিয়ে যাচ্ছে; আর সত্ত্বগুণের দ্বারা তাদের অসুরভাব নির্জিত করে তাদের বুদ্ধিকে দেবীসম্পদে পরিণত করে মা মালা করে পরে আছেন। অথবা যোগবাশিষ্টের নির্বাণ প্রকরণ এবং কর্পূরাদিস্তুতির টীকাকাররা বলেন, আগামী সৃষ্টির জন্য পূর্ব-সৃষ্টির সংস্কার মুণ্ডমালাতে মালা করা রয়েছে। আবার তন্ত্র বলছেন, 'পঞ্চাশৎ বর্ণমুণ্ডালী'। শব্দ ছাড়া অর্থের অভিব্যক্তি হয় না। শব্দের সার স্বর ও ব্যঞ্জন। স্থূল অর্থ বা প্রত্যয় যখন নাশ হয়, তখন সূক্ষ্ম স্বর ব্যঞ্জন-সংস্কার প্রকৃতিকে আশ্রয় করে থাকে। আর মুণ্ডমালা হলো তাঁর কোটি কোটি বিভূতিশক্তি। পদ্মপুরাণে আছে, ত্রিপুরাসুন্দরী অর্জুনকে দেখালেন, এক-একটি মুণ্ডাদানায় এক-একটি অদ্ভুতপূর্ব ব্রহ্মাণ্ড, যা আমাদের ব্রহ্মার জ্ঞানের বাইরে। আমরা ভাবি, দৃশ্য-জগৎ ছাড়া বুঝি আর কোন জগৎ থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখালেন, কালী কল্পতরুতে থলো থলো কৃষ্ণ ফলে রয়েছে।

প্রশ্ন: খড়্গটি কি?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: ইষ্টানিষ্ট-বস্তু-বিবেক অর্থাৎ আত্মানাত্মবিচার—যা 'নেতি' নেতি' করতে করতে জগৎ বিশ্লেষণপূর্বক আসল সত্যটা তা থেকে বের করে। বেদমত সমর্থন এবং দুষ্টমত খণ্ডন।

প্রশ্ন: করকাঞ্চি কি?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: হাত হলো কর্মের প্রতীক। কর্ম থেকেই জীবের সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারব্ধ সংস্কার-বীজ উদ্বুদ্ধ হয়। প্রলয়ে প্রতি জীবের কর্ম-বীজ মা আগামী সৃষ্টির জন্য গর্ভে ধারণ করে রয়েছেন। মা ষোড়শী, অর্থাৎ ষোলকলায় পূর্ণা হয়ে বিচিত্র সৃষ্টি বিকাশ করেন, আবার অমাকলা-রূপে মহাকারণরূপা হন। সৎ-স্বরূপা বলে চিরকিশোরী। হসন্মুখী অর্থাৎ মা আনন্দময়ী। আর শিব হলেন নির্বিকার ব্রহ্ম, কূটস্থ—তাঁর ওপর শক্তির ক্রীড়া চলেছে—একদিকে সংহার, আরেক-দিকে বরাভয়। বিপরীত রতি—কারণাতীত ব্রহ্মই আধার, তাঁর ওপর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অনির্বাচ্যা শক্তি-ক্রীড়া। রতিরসমহানন্দরসিকা—ব্রহ্মসাযুজ্য-রূপ পরিনির্বাণশক্তিরূপা -যেথায় এক রসের আস্বাদ হয়, আর আস্বাদকালে 'তুমি' বা 'আমি' থাকে না—শক্তি ও শক্তিমানের সাযুজ্য হয়। চণ্ডীতে মহাসরস্বতীর ধ্যানের বর্ণনাটি আমার বড় ভাল লাগে—কালো মেঘে ঢাকা সূর্যজ্যোতিঃ যেমন ঠিকরে বেরোয়—'ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্'। ঐ কালো মেঘ হলো তাঁর বিক্ষেপ আবরণাত্মিকা শক্তি এবং জ্যোতিঃ হলো জ্ঞানালোক, আর মায়ের স্বরূপে হলো ঐ ব্রহ্মসূর্য। (২২।১১।৪২)

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীকালী

রাসমোহন চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

যিনি সর্বভূতকে 'কলন' বা গ্রাস করেন তাঁহাকে 'কাল' বলে। সেই কাল-শক্তির যিনি নিয়ন্ত্রী তিনিই 'কালী'। কালীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

কাল-নিয়ন্ত্রণাৎ কালী তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনী। (১১।১৮)

কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম 'কালী', ইনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন।

'কালী' নামের তাৎপর্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহানির্বাণ-তন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন—

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
(৪।৩১)

মহাকাল সর্বপ্রাণীকে 'কলন' অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া উক্ত নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন। তুমি মহাকালকেও কলন কর বলিয়া তোমার নাম আদ্যা পরমা কালিকা।

"আদিভূতত্বাদ্ আদ্যা" (মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।৩২) এই বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তিনিই বর্তমান ছিলেন এবং তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব প্রসূত হইয়াছে, এই কারণে তাঁহাকে 'আদ্যা' বলা হইয়া থাকে।

সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় পদার্থ কালগর্ভে বিলীন হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বত্র মহাকালের প্রভাব অপ্রতিহত। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সাগর পর্বত চরাচর সমুদয় জগৎ মহাপ্রলয়কালে রুদ্রের তাণ্ডব নর্তনে ধূলিকণায় পরিণত হইয়া মহাব্যোমে উৎক্ষিপ্ত হয়। শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে মহাকালের এই প্রলয় তাণ্ডবের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে। যে-মহাশক্তি মহাকালের সর্বসংহার শক্তির নিয়ন্ত্রী, তিনিই 'কালী'। উপনিষদের ঋষি সেই মহাশক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥
(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৮)

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য উদিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু (কাল) স্ব স্ব কার্যে ধাবিত হইতেছে।

এই মহাশক্তি "মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" উদ্যত বজ্রের মতো অতি ভীষণ। (কঠোপনিষদ্, ২।৩।২)

মহাপ্রলয়ে সমুদয় ধ্বংস করিয়া কালশক্তি কালীতে লীন হইয়া যায়। তখন তমোরূপিণী কালীই একমাত্র বর্তমান থাকেন। মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন—

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্। (৪।২৫)

সৃষ্টির পূর্বে তমোরূপে একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে। তোমার সেই রূপ বাক্য ও মনের অগোচর।

মৈত্রায়ণী শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ"—এই তমঃই তন্ত্রের আদ্যাশক্তি কালিকা।

দেবী হিমালয়কে বলিয়াছেন, আমি সৃষ্টির জন্য নিজ রূপকে স্বেচ্ছাক্রমেই স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। শিব প্রধান পুরুষ, শিবা পরমা শক্তি। তত্ত্বদর্শী যোগিগণ আমাকে শিবশক্তি উভয়াত্মক পরাৎপর ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করেন—

সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপুম্মানিতি ভেদতঃ॥
শিবঃ প্রধানপুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত এব পরাৎপরম্॥

তন্ত্রশাস্ত্রের মতে পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইলে শক্তি হইতে নিখিল জগৎ সৃষ্ট হয়।

মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত সমুদয় জগৎ শক্তি হইতেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। সকল কারণের কারণ পরম ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তমাত্র—

নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্বকারণ-কারণম্‌ ॥

(মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।২৬)

পরব্রহ্মের ক্রিয়া নাই, কর্তৃত্বও নাই ; পরন্তু চুম্বক-সান্নিধ্যে প্রচলিত লৌহের ন্যায় শক্তি পরব্রহ্মের সত্তা-মাত্রেই সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন। বৃক্ষসমুদয়ের পুষ্পপল্লবাদি উদ্গম বিষয়ে বসন্ত ঋতুর সান্নিধ্য যেরূপ নিমিত্তমাত্র, সেইরূপ সৃষ্টি স্থিতি লয় বিষয়ে পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্তমাত্র। সদাশিব আদ্যাশক্তিকে বলিতেছেন—

তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥

(মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।২৯)

পরাৎপরা মহাযোগিনী তুমি ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি কর, পালন ও ধ্বংস করিয়া থাক।

ভগবতী গীতায় দেবী বলিয়াছেন—

সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্‌।
সংহরামি মহারুদ্ররূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া ॥
দুর্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরম-পুরুষঃ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে ॥

(৪।১২-১৩)

আমি ব্রহ্মরূপে এই চরাচর জগৎ সৃজন করি, আবার অন্তকালে স্বেচ্ছাক্রমেই মহারুদ্ররূপে জগৎ সংহার করি। হে মহামতে, আমি দুষ্ট দমনের জন্য পরম পুরুষ বিষ্ণু হইয়া এই সমস্ত জগৎ পালন করিয়া থাকি।

॥ ২ ॥

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক ঘটপটাদি বস্তুরই রূপ আছে। যাঁহা হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী, সূক্ষ্মা হইতেও সূক্ষ্মতরা সেই আদ্যাশক্তি মহাকালীর রূপ-ধারণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সদাশিব উত্তর দিয়াছেন—

অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা ॥

(মহানির্বাণতন্ত্র, ৫।১৪০)

মহাকালজননী মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী কালিকার বস্তুতঃ কোনও রূপ নাই, তিনি অরূপা। পরন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রাদুর্ভাবহেতু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ কার্য অনুসারে তাঁহার রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে।

উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধত্সে নানাবিধাস্তনুঃ ॥

(মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।১৬)

তুমি উপাসকগণের কার্যসিদ্ধির জন্য, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং দানবদিগের সংহারের জন্য নানা মূর্তি ধারণ করিয়া থাক।

চণ্ডীতেও উক্ত হইয়াছে, দানব সংহারাদিদ্বারা দেবগণের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত দেবী ভগবতী যখন কোন দিব্যদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন তখন বলা হয় যে, তাঁহার উৎপত্তি হইল। বস্তুতঃ তিনি নিত্যা, তাঁহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই।

দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥

জীব পরব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি কালিকার নিরাকার স্বরূপের ধারণা করিতে পারে না। অরূপার রূপ নির্মাণ করিয়াই তাহাকে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন—

অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরি।
অরূপাং রূপিণীং কৃত্বা কর্মকাণ্ডরতাঃ নরাঃ ॥

পরব্রহ্ম রূপাতীত ও চিন্তার অনধিগম্য। জীবগণ অরূপা পরব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তির স্থূল-রূপ কল্পনা করিয়া উপাসনাদিমূলক কর্মকাণ্ডে রত হইয়া থাকে।

মহানির্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্‌ ॥

(১৩।১৩)

অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণের হিতের নিমিত্ত গুণানুসারে ভগবতীর বহুবিধ রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।

স্থূলরূপের সাধনার ভিতর দিয়া অগ্রসর না হইয়া কেহ তাহার সূক্ষ্মস্বরূপের ধারণা করিতে পারে না। এইজন্য পরতত্ত্বের কোনও একটি স্থূল-রূপকে আশ্রয় করিয়াই সাধককে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে হয়। ভগবতী গীতায় এই তথ্যটি এইভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে—

অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্টবা মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ।
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃপূর্বমাশ্রয়েৎ ॥
(৪।১৭)

হে পর্বতশ্রেষ্ঠ! আমার স্থূলরূপ চিন্তা না করিলে আমার সূক্ষ্মরূপ বোধগম্য হইবে না। ঐ সূক্ষ্মরূপের দর্শনেই জীবের মোক্ষ লাভ হয়। অতএব মুক্তিপিপাসু ব্যক্তি প্রথমে আমার স্থূল-রূপের আশ্রয় লইবে।

ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্য বিধানতঃ।
শনৈরালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্‌ ॥
(৪।১৮)

ক্রিয়াযোগানুসারে যথাবিধি সেই সকল স্থূল-রূপের অর্চনা করিয়া ক্রমে আমার অবিনাশী পরম সূক্ষ্মরূপের ধারণায় প্রবৃত্ত হইবে।

হিমালয় ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তোমার স্থূলরূপ তো অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কোন্‌ রূপকে আশ্রয় করিলে সাধক অবিলম্বে মুক্তিলাভ করিতে পারে? দেবী উত্তর করিলেন—

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থূলরূপেণ ভূধর।
তত্রারাধ্যতমা দেবী-মূর্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা ॥
(৪।২০)

হে ভূধর! স্থূলরূপে আমি এই বিশ্বে ব্যাপ্ত আছি। সেই সকল স্থূলরূপের মধ্যে দেবীমূর্তিই আরাধ্যতমা, যেহেতু দেবীমূর্তি আশুমুক্তিপ্রদায়িনী।

শক্ত্যাত্মকং হি মে রূপমনায়াসেন মুক্তিদম্‌।
সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥
(৪।২১)

হে মহারাজ! আমার শক্তি-মূর্তি অনায়াসে মুক্তি প্রদান করে। তুমি তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে মোক্ষলাভ করিতে পারিবে।

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা ত্রিপুরসুন্দরী ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদা।
আসু কুর্বন্‌ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্‌ ॥
(৪।২২-২৩)

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুর-সুন্দরী (কমলা), ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী—এই দশমহাবিদ্যা নরগণকে মোক্ষফল প্রদান করেন। ইঁহাদের প্রতি পরম ভক্তি করিলে অবিলম্বে মোক্ষলাভ হয় সন্দেহ নাই। পরিশেষে দেবী পর্বতরাজ হিমালয়কে বলিলেন, এই দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে যেকোন এক বিদ্যাকে ক্রিয়াযোগে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি মনবুদ্ধি অর্পণ করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাসামন্যতমাং তাত ক্রিয়াযোগেন চাশ্রয়।
মর্য্যর্পিত-মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতম্‌ ॥
(৪।২৪)

॥ ৩ ॥

তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা নির্বিকারা নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশিকা। ইনি আদিরূপা ও সাক্ষাৎ কৈবল্য-দায়িনী। অপরাপর মহাবিদ্যা ব্রহ্মরূপিণী কালিকারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। নিরুত্তরতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

সর্বাসাং সিদ্ধবিদ্যানাং প্রকৃতির্দক্ষিণা প্রিয়ে।

সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার মধ্যে দক্ষিণা কালী সকলের প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ।

যোগিণীতন্ত্রে শিব বলিতেছেন—

মহামহাব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যেয়ং কালিকা মতা।
যামাসাদ্য চ নির্বাণমুক্তিমেতি নরাধমঃ।
অস্যা উপাসকাশ্চৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥
(দ্বিতীয় পটল)

এই কালিকাবিদ্যা মহা মহা ব্রহ্মবিদ্যা, যাহা দ্বারা মহাপাপিষ্ঠও নির্বাণলাভ করিতে পারে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণ কালিকার উপাসক।

কালীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

ন হি কালীসমা বিদ্যা ন হি কালীসমং ফলম্‌।
ন হি কালীসমং জ্ঞানং ন হি কালীসমং তপঃ ॥
(৯।২১)

কালীর তুল্য বিদ্যা নাই, কালীর তুল্য ফল নাই, কালীর তুল্য জ্ঞান নাই, কালীর তুল্য তপস্যাও নাই।

তন্ত্রশাস্ত্র তন্ত্রোত্তরে বলিতেছেন, কালীর উপাসনা সর্বযুগে সকল জীবকেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে; পরন্তু কলিযুগে পরাপ্রকৃতি কালীই বিশেষভাবে জাগ্রতা, তাঁহার উপাসনাতেই জীবগণ শীঘ্র সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।

কুব্জিকাতন্ত্র বলেন, "কালিকা মোক্ষদা দেবি কলৌ শীঘ্র-ফলপ্রদা" মোক্ষদায়িনী কালিকার উপাসনাই কলিযুগে শীঘ্র ফলপ্রদান করে। পিচ্ছিলা-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে: "কলৌ কালী কলৌ কালী নান্যদেব কলৌ যুগে"—কলিযুগে কালীই একমাত্র আরাধ্য, কলিযুগে অপর কেহ আরাধ্য নাই। মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন—

শ্রীআদ্যা-কালিকা-মন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ।
সদা সর্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ॥
(৭।৮৬)

আদ্যা কালিকার মন্ত্র সর্বতোভাবে সিদ্ধ মন্ত্র। এই মন্ত্র সকল সময়েই এবং সকল যুগেই সিদ্ধি প্রদান করে, বিশেষতঃ কলিযুগে আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

কালিকার উপাসনা দ্বারা সাধক ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই লাভ করিয়া থাকেন। কালীতন্ত্রে ভৈরব বলিতেছেন—

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং বলং পুষ্টিং মহদ্ যশঃ।
কবিত্বং ভুক্তি-মুক্তী চ কালিকা-পাদ-পূজনাৎ॥
(১১।১০)

সাধক কালিকার পদ পূজা করিয়া আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, বল, পুষ্টি, বিপুল কীর্তি, কবিত্ব শক্তি, ভোগ ও মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।

সর্ব-প্রাণি-হিতকরং ভোগ-মোক্ষৈক-কারণম্।
বিশেষতঃ কলিযুগে জীবানামাশু-সিদ্ধিদম্॥
(মহানির্বাণতন্ত্র, ৭।৫)

পরাপ্রকৃতি কালীর সাধনা সমুদয় প্রাণিগণের হিতকর এবং ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ কলিযুগে জীবগণ এই সাধনা দ্বারাই সত্বর সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।

কালীর অর্চনাকারী সাধক কিরূপ ভাগ্যবান এবং ঐ অর্চনা দ্বারা তিনি কি প্রকার ঋদ্ধি লাভ করেন, কালিকাতন্ত্রে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। "যিনি দেবীর সম্যক্ অর্চনা করেন, তাঁহার মুখে সরস্বতী এবং গৃহে লক্ষ্মী সর্বদা বাস করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ বিরাজিত। কালীসাধক ধনে কুবেরতুল্য, তেজে সূর্যসদৃশ এবং বলে বায়ুতুল্য হইয়া থাকেন। কালীসাধক সঙ্গীতে তুম্বুরু নামক গন্ধর্বতুল্য, দানে কর্ণসদৃশ এবং জ্ঞানে দত্তাত্রেয়তুল্য হইয়া থাকেন। যে-সাধক দেবী কালিকার সম্যক্ অর্চনা করেন তিনি শত্রুনাশে বহ্নিতুল্য, মলিনতা নাশে গঙ্গাতুল্য, পবিত্রতায় অগ্নিতুল্য এবং চন্দ্রের ন্যায় সুখদায়ক হন। তিনি যমতুল্য শাসনকারী, কালের মতো দুর্বার গতি, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং বজ্রের মতো দুর্ধর্ষ হইয়া থাকেন। তিনি বৃহস্পতির মতো বাগ্মী, পৃথিবীর মতো সহিষ্ণু এবং রমণীগণের নিকট কন্দর্পতুল্য বিবেচিত হইয়া থাকেন। (নবম পটল, ১৩—১৯)

স এব সুকৃতী লোকে স এব কুল-নন্দনঃ।
ধন্যা চ জননী তস্য যেন দেবী সমর্চিতা॥
(ঐ, ৯।১২)

যে-সাধক দেবী কালিকার সম্যক্ অর্চনা করেন, তিনিই এই সংসারে সুকৃতী, তিনিই বংশের গৌরব-স্বরূপ, তাঁহার জননী ধন্যা।

মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন—

ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যা-প্রসাদতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥
(৭।৮৯)

আদ্যা কালিকার অনুগ্রহে সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞানী নর যে জীবন্মুক্ত হন, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।*

* উদ্বোধন, ৪৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৪, পৃঃ ৫০৯-৫১২

কালী কি

বিহারীলাল সরকার

কালীর স্বরূপ

তিনি পরমজ্যোতিঃ সূক্ষ্ম নিষ্কল নির্গুণ অপরিচ্ছিন্ন অনাদি অদ্বৈত মূল কারণ সচ্চিদানন্দ। তিনি পরমব্রহ্ম অদ্বৈত—পুরুষ নহেন, স্ত্রী নহেন। তিনি নিরাকার নিরাধার নিরঞ্জন নিরুপাধি—অব্যয়; তিনি সচ্চিদানন্দ, বৃহৎ—ব্রহ্ম। তিনি অনন্ত ব্রহ্ম। তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব হইতে পারে না। তিনি সর্বকালে সর্বদেহে বিরাজমান।

মহাদেবীর পরমানন্দ মহাকারণরূপের আবির্ভাব হইতে পারে না। সেরূপ অনবচ্ছ সত্তামাত্র অগোচর, ইহাই দেবীর স্বরূপ। ইহা স্বপ্রকাশ, স্বপ্ন-জাগ্রত সুষুপ্তির অতীত, অবাঙ্মনসগোচর, সন্মাত্র।

মন্ত্র

'ক্রীঁ'—শুদ্ধসত্ত্বাত্মক সচ্চিদানন্দ। 'ক'—জ্ঞান, চিৎ কলা। 'র'—সর্বতেজোময়ী শোভা। 'ঈ'—সাধকের অভীষ্টদায়িনী। 'ঁ'—কৈবল্যদায়িনী। তিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-চৈতন্যময়ী ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী।

ধ্যান

কালিকা—তাঁহার নাম কালিকা অর্থাৎ তিনি অনাদি অনন্ত।

মেঘবর্ণ—কান্তি মেঘের বর্ণ। আকাশ নীল বর্ণ। আকাশ যেরূপ বিভু, তিনি সেইরূপ বিভু। ঘনীভূত তেজোময়ী চিদাকাশ শুদ্ধগুণাত্মক। কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কোন বর্ণ নাই, গুণত্রয়ের অতীত।

মুক্তকেশী—তিনি নির্বিকার। যদিচ তিনি অপরিণামী, কিন্তু অসংখ্য জীবকে মায়াপাশে বাঁধেন। মুক্ত কেশগুলি মায়ার পাশ।

ত্রিনয়না—চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি তিন নয়ন; কারণ বিরাটরূপে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ দেখিতেছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞা।

শবশিশুকর্ণভূষণ—নির্বিকার শিশুস্বভাব সাধকরাই তাঁহার প্রিয়।

স্মিতমুখী—নিত্যানন্দময়ী।

যোনি—সৃষ্টিকর্ত্রী।

তুঙ্গস্তন—পালনকর্ত্রী। ত্রিজগৎ-পালয়িত্রী ও সাধকের মোক্ষদাত্রী।

ভীষণাকার—প্রলয়কর্ত্রী।

বিগলিতরুধিরগণ্ড—রক্তধারা রজোগুণ। তিনি রজোরহিতা, শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা বিরজা।

লোলজিহ্বা—প্রকটিতদশনা—জিহ্বা রক্ত রজোগুণ। দন্ত শ্বেত সত্ত্বগুণ। মদিরা—তমোগুণ। রজোগুণ বর্জন করিয়া সাধকের তমঃ নাশ করেন। সত্ত্ববৃদ্ধি করিয়া নির্বাণ দেন। নরকপাল-পাত্রে ত্রিজগতের জাড্য মোহময়ী সুরা পান করিতেছেন।

মুণ্ডমালা—বর্ণমালা। তিনি পঞ্চাশৎবর্ণময়ী শব্দব্রহ্মরূপিণী।

দক্ষিণ করে বরাভয়—অভয় ও বর মুদ্রা। সকাম সাধকের বিপদ নাশ করেন।

বাম করে অসিমুণ্ড—জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা নিষ্কাম সাধকের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া বিগতরজঃ তত্ত্বজ্ঞানাধার মস্তক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দেন।

চন্দ্রার্ধচূড়া—নির্বাণ-মোক্ষদাত্রী।

দিগম্বরী—তিনি ব্রহ্মরূপিণী—মায়াবরণশূন্যা নির্বিকারা।

নরকরকাঞ্চী—কর জীবের প্রধান কর্মেন্দ্রিয়। কল্পান্তে সকল জীব কর্মের সহিত মহামায়ার অবিদ্যা শক্তিতে লীন থাকে।

ত্রিভুবনবিধাত্রী—জীবের সঞ্চিত কর্মানুসারে পুনর্জন্ম ও ভোগবিধানকর্ত্রী

শবস্থাদি—মহাদেবীর স্বরূপ অবস্থা নির্গুণ। অতিবন্নতী—অব্যয়া—একভাবাপন্না—নির্বিকারা।

(১) শ্মশানে শিবাদল ও (২) শবমুণ্ডাস্থি ও (৩) প্রকটিত চিতা—(১) শিব-প্রকৃতি অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত মহাভূত সহিত, (২) জীবের সত্ত্বগুণ সহিত ও (৩) স্বপ্রকাশ চিৎশক্তিতে অধিষ্ঠিত।

বিপরীত রতা—কল্পারম্ভে যদিচ তিনি নিত্যানন্দময়ী, সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পরমশিবকে বশীভূত করিয়া ইহা করিয়া থাকেন। পরমশিবকে বশীভূত করিয়া স্বেচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। তিনি সৃষ্টি-উন্মুখী।

শ্মশানে মহাকাল-সুরতরতা। কল্পান্তে আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্যন্ত নাশ হয়। তখন ঐ 'শ্মশানস্থ তল্পে' নির্গুণ আধারে তিনি মহাকালের সহিত এক হন। কল্পাবসানে নিষ্ক্রিয়ত্ব হেতু, পরমশিবের সহিত অভিন্নতা হেতু অখণ্ডানন্দ অনুভব করেন।

যন্ত্র

সাধনার অঙ্গ জপ ধ্যান যন্ত্র পূজা ও স্তুতি। বৃত্ত—অবিদ্যা, অষ্টদল—ক্ষিত্যাদি অষ্ট প্রকৃতি। ত্রিকোণ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ। বিন্দু—মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। ভূপুর—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক স্বদেহ। ত্রিগুণ ও চব্বিশ তত্ত্ব নির্মিত স্থূল-সূক্ষ্মদেহে তিনি পরমাত্মা।

বলি

ছাগ—কাম। মহিষ—ক্রোধ। মার্জার—লোভ। নর—মদ। মেষ—মোহ। উষ্ট্র—মাৎসর্য। এই-গুলি নাশের জন্য [প্রতীকরূপে] পূজোপহাররূপে অর্পণ করা হয়।

দশমহাবিদ্যা

শূন্যের কোন ব্যবহারিক মূল্য নাই। কিন্তু শূন্য নিরাকার অনন্ত। কিন্তু এক সংখ্যার সহিত যুক্ত হইলে দশ সংখ্যা হয়। তখন তাহার ব্যবহার হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম নিরাকার অনন্ত, প্রকৃতিযুক্ত হন এবং সাধকের কল্যাণের নিমিত্ত ত্রিগুণের তারতম্যানুসারে দশমহাবিদ্যারূপ ধরেন। তন্মধ্যে কালী—শুদ্ধসত্ত্ব, কৈবল্যদায়িনী। তারা—সত্ত্বপ্রধানা, জ্ঞানদায়িনী। ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা—রজঃপ্রধানা, ঐশ্বর্যদায়িনী। ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা—তমঃপ্রধানা, ষট্‌কর্মে ব্যবহৃত হন।

বেদান্ত ও তন্ত্র

বেদান্ত ভাবাদ্বৈত উপদেশ দেন। তন্ত্র বলেন, কেবল ভাবাদ্বৈত হইলে চলিবে না। ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত হওয়া, সর্ববিষয়ে অদ্বৈতভাব হওয়া চাই।

ভাল-মন্দ

ভাল-মন্দ বস্তুনিষ্ঠ নহে। বাহ্য বস্তুতে ভাল-মন্দ নাই; কিন্তু মনেতেই ভাল-মন্দ। শিশুমনে ভাল-মন্দ নাই। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন: "শুচি অশুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।" নির্বিকল্প আচরণই শ্রেষ্ঠ আচরণ। ইহাই কুলাচার।

তন্ত্রে অধিকার

সাধক ছাড়া তন্ত্রের অধিকারী হইতে পারে না। তন্ত্র সাধকের জন্য, অপরের জন্য নহে।

শ্মশান

শ্মশানে মা থাকেন। মা শ্মশানবাসিনী। শ্মশানে সকল বাসনার, সকল কামের নিঃশেষ নাশ হয়। যে-মনে বাসনার লেশ নাই,—সেই মনে মা আবির্ভূতা হন, সেই মন মা ভালবাসেন। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন:

"শ্মশান পেলে ভালবাস মা,
তুচ্ছ কর মণিকোঠা ॥"

যে-হৃদয় শ্মশানসদৃশ অর্থাৎ কামবীজশূন্য সেই হৃদয় মার প্রিয়। সে মনে 'মণিকোঠা' যেন তুচ্ছ। শ্মশানে ভয় হয়, তার মানে কামের নাশ হয়।*

* মাসিক বসুমতী, ৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৩৩৫, বৈশাখ সংখ্যা, পৃঃ ৮৮—৮৯

সংগ্রহ: আলপনা ভট্টাচার্য

পরিক্রমা

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : ভাদ্র, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

বাবাজী বলতে শুরু করলেন : "সনাতন গোস্বামীর এই টিলায় বাসকালের প্রথম যুগে তাঁকে মাধুকরী ভিক্ষার জন্য নিত্য মথুরায় যেতে হতো। সেই সময় একদিন তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেন। মহাবন মথুরায় এক চৌবের বাড়িতে সেদিন ভিক্ষায় গিয়েছেন। গিয়ে দেখেন তাদের ছেলেরা কালো পাথরের একটি অপূর্ব কৃষ্ণ-বিগ্রহ নিয়ে খেলা করছে। আর সেই খেলা যেন বিগ্রহকে জীবন্ত মনে করে তাঁর সঙ্গে সখ্যবিহার। এই অপূর্ব বিগ্রহ দর্শন করে সনাতন রোমাঞ্চিত হলেন। তাঁর কুটিয়ায় ফিরে এসে সেই রাত্রেই তিনি স্বপ্নে নির্দেশ পেলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঐ চৌবের বাড়ি থেকে তাঁর কাছে এসে থাকতে চান। আনন্দে উৎফুল্ল সনাতন পরদিনই মথুরায় সেই চৌবের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত জানিয়ে বিগ্রহটি প্রার্থনা করলেন। আরও আশ্চর্য হয়ে জানলেন, চৌবে-গৃহিণীও ঐ একই স্বপ্ন পেয়েছেন তাঁকে শ্রীবিগ্রহ দান করবার জন্য। চৌবে-গৃহিণী কৃষ্ণলীলায় মা যশোদার মতো যাঁকে বুকে করে এতদিন ছিলেন, সেদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন ব্রজলীলার মধুরতর বিলাসের প্রয়োজনে। আর বৈরাগী সনাতন তাঁর হারামানিক মদনগোপালকে বুকে নিয়ে আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে ফিরে এলেন এই আদিত্যটিলার নিজের পর্ণকুটিরে। ভিক্ষু সনাতন ব্রজবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে চানা, আটা যা পেতেন তাই জলে ভিজিয়ে গোল গোল ডেলা পাকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিতেন ও নিজে তাই প্রসাদ পেতেন। এই ভোগের নাম সেদেশে ছিল 'আঙা-কাড়ি'। সেই ধারামতে আজও মদনমোহনকে 'আঙাকাড়ি' ভোগ দেওয়া হয় অন্যান্য রাজভোগের সঙ্গে। যাই হোক, কয়েকদিন পরেই কিন্তু বিপদ দেখা দিল। রাজার ছেলে মদনগোপালের মুখে এই শুকনো খাবার রুচবে কেমন করে! একটু চিনি নেই, একটু নুনও নেই। একদিন সনাতনকে তিনি বলেই ফেললেন : 'দেখ শুকনো রুটি খেতে বড় কষ্ট হচ্ছে, একটু নুনও সঙ্গে দিও।' ভিক্ষু সনাতন ভাবাবেশে ছিলেন। তাঁর ঠাকুরের এই কথা শুনে সন্ন্যাসী ভাবাবস্থাতেই বলে উঠলেন : 'এ তো তোমার অদ্ভুত কথা! তুমি তো জান আমি মাধুকরীতে যা পাই তাই তোমাকে দিই। তুমি বড়লোকের ছেলে, তার ওপর চৌবের ঘরে ছিলে। আজ নুন চাইছ, কাল মিষ্টি চাইবে, এসব আমি কোথা থেকে যোগাড় করব? আমি লোকের কাছে ওসব চাইতে পারব না। তোমার খেতে ইচ্ছে হলে তুমি নিজেই যোগাড় করে নাও।' ভাবগ্রাহী জনার্দন ভক্তের ভাব বুঝে চুপ করে গেলেন। তার পরেই ঘটল এক মজার ব্যাপার। সেই দিনই টিলার নিচে যমুনা বেয়ে যাচ্ছিল এক মস্ত বজরা, নানা জিনিস-পত্র নিয়ে, আগ্রায় ব্যবসা করতে। হঠাৎ যমুনার বালির চড়ায় নৌকা গেল আটকে। নৌকার মালিক রামদাস কাপুর, কেউ বলে কৃষ্ণদাস কাপুর, মুলতান থেকে আসছিলেন। নৌকার এই দশা দেখে বিহ্বল হয়ে তিনি পাড়ে এসে লোকজন যোগাড় করে নানা-ভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন চড়া থেকে নৌকা তুলতে। কিন্তু অত ঠেলাঠেলি করেও নৌকার নড়বার নামটি নেই। তিনি তখন মাঝিদের পরামর্শে, এই টিলায় ঝুপড়িতে যে-সাধুটি আছেন, তাঁর কাছে এলেন আশীর্বাদ নিতে যাতে নৌকা সচল হয়। সাধু তাঁর মদনঠাকুরটিরই এই কান্ড বুঝে নিয়ে কাপুরজীকে বললেন : 'ঘরের ঐ কোণেতে এক ঠাকুর আছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি কৃপা করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' সাধুর কথায় বিশ্বাস করে রামদাস মদনগোপালের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে

বললেন ঃ 'নৌকা বিপন্মুক্ত হলে, এবারে যা লাভ হবে সব এখানে দিয়ে যাব।' আশ্চর্য কাণ্ড! এই প্রার্থনা যখন চলছে ওপরের পর্ণকুটিরে, তখন নিচে যমুনার জলেও লেগেছে তার দোলা। সেই দোলায় নৌকা হয়েছে সচল। খবর পেয়ে বণিক ফিরে এলেন নৌকায়। তারপর নৌকা নিয়ে আগ্রায়। সে-যাত্রায় বাণিজ্যে লাভ হলো প্রচুর। আর ফেরার পথে এই ঘটনার মূলে যে-দেবতার কৃপা ও যে-সাধকের আশীর্বাদ, তাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদন করে কাপুরজী দেবতার সেবার জন্য কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সনাতনের সম্মতি পেয়ে ১৫২৩ খ্রীস্টাব্দে আদিত্যটিলায় রামদাস কাপুর প্রাচীর-বেষ্টিত একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করে দিলেন। এই অঞ্চলে প্রাচীনকালে একটি সূর্যমন্দিরও ছিল। তারই ধ্বংসস্তূপের পাশে এই মন্দির তৈরি হয়। এই যে তোরণটি দেখছেন, এটি সেই আমলেরই, আর এই সুদৃশ্য অথচ জীর্ণ বর্তমানে পরিত্যক্ত নাটমন্দিরটি হচ্ছে রামদাস কাপুরের তৈরি। এর ভিতরের মাপ হলো ৫৭ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া। এর উচ্চতা ২২ ফুট আর গর্ভমন্দিরের উচ্চতা ছিল এর দ্বিগুণ। পশ্চিমে জগমোহন ২০´×২০´, যার চূড়া ভেঙে গেছে। তারও পশ্চিমে ছিল মূল মন্দির। সেটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

"সে যাই হোক, রামদাস কাপুর এই মন্দির ও সেবার সুবন্দোবস্ত করার পর কিন্তু বৈরাগ্য-ব্রতধারী সাধক সনাতন এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী এই ঐশ্বর্য ও নিয়মনিষ্ঠার সেবার ঊর্ধ্বে বিরাজ করতেন, সেজন্য এই দেবসেবার ভার তিনি দিলেন তাঁর এক অন্তরঙ্গ সেবক কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীকে। তাঁকে ভার দিয়ে নিজে মন্দিরের পিছনে একটি ছোট কুঠুরিতে চলে গেলেন সাধন-ভজনের জন্য। ঐ যে নাটমন্দিরের উত্তরে দেখছেন—সেই ছোট কুঠুরি, যার ভিতরে সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথা ঠেকে যায়, এখন সেখানে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ পূজা হচ্ছে। আর সনাতনের একটি কল্পিত পট রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই কুঠুরি আজও আছে—ভজনানন্দী মহাতপস্বীর একান্ত সাধনকুটির। তার পিছনে রয়েছে আরও কয়েকটি ছোট ছোট ঘর, একটি ফুলের বাগান। সেখানে এখন কয়েকজন বাবাজী আশ্রম করে আছেন। সনাতন গোস্বামী এই কুঠিয়ায় থাকতেন, মাঝে মাঝে চলে যেতেন কখনো রাধাকুণ্ড বা পাবন সরোবরের ধারে। তবে যেখানেই থাকুন, তাঁর নিত্যকৃত্য ছিল দুটি—একটি গিরিগোবর্ধন প্রত্যহ পরিক্রমা করা, অন্যটি প্রতি সন্ধ্যায় গোপেশ্বর মহাদেব দর্শন। যতদিন শরীর সমর্থ ছিল প্রতিদিন এই রুটিন তাঁর ছিল বাঁধা। কিন্তু জীবনের শেষদিকে শরীর যখন অসমর্থ হয়ে পড়ল, তখন একদিন এক গোপবালক বেশে স্বয়ং মদনমোহন এসে তাঁকে একটি শ্রীগোবর্ধনের শিলা দিয়ে বললেন ঃ 'এত কষ্ট করে নিত্য আর গোবর্ধন পরিক্রমা করতে হবে না, এই শিলাটিকে পরিক্রমা করলেই পুরো পরিক্রমা হবে।'

"এরপর থেকে নিত্য শিলাস্মারকটিকেই পরিক্রমা করে তীর্থকৃত্য সম্পাদন করতে লাগলেন সনাতন। এই সময় একইভাবে গোপেশ্বর মহাদেবও দর্শন দিয়ে তাঁকে বলেছিলেন, ভক্তের জন্য তিনি নিকটেই জঙ্গলের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁকে আর কষ্ট করে প্রতিদিন দূরে গোপেশ্বর মন্দিরে যেতে হবে না। তার পরেই বনখণ্ডীর মহাদেব প্রকট হলেন তাঁরই জন্য। সনাতন প্রভুর জীবনে আরও অনেক দিব্যলীলার ঘটনা জানা যায়। যখন তিনি পাবন সরোবরে ছিলেন, সেই সময় ভাবাবেশে বিভোর সাধকের ভিক্ষার কথা প্রায়ই স্মরণ থাকত না। সেজন্য মদনগোপাল বালকবেশে এসে তাঁকে নিত্য দুধ খাইয়ে যেতেন। একটি পুরনো পদে তাঁর এই সময়ের অবস্থার কথা জানা যায় ঃ

'কতদিনে অন্তর্মনা, ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নামগানে সদা থাকে,
অবসর নাহি এক তিলে ॥' "

[ক্রমশঃ]

'পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব'

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

'কে জানে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।' মা-কালীর এ কেমন গঠন? গৃহকর্ত্রী প্রশ্ন করছেন গুরুঠাকুরকে। মায়ের একি রূপ। মায়ের জিভ কেন বেরিয়ে আছে সামনে? মা কেন জিভ কেটেছেন? গুরুঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন: 'দেখ মা, এ আগমবাগীশের মত। আগমবাগীশের মনে হলো কিভাবে জীবের কল্যাণ বিধান করা যায়। এই কথা চিন্তা করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নে আদেশ হলো—আগম, কাল ভোরে উঠে প্রথমেই তুমি যে-রমণীকে দেখবে, ও যে-রূপে দেখবে, সেই রূপই কালীর রূপ, মহামায়ার রূপ।'

বহুকালের প্রচলিত এই গ্রাম্য লৌকিক ব্যাখ্যা অপ-ব্যাখ্যা। আমার মাকে বোঝা অতই সহজ! জীব যদি শিব হন, তাহলে তার হৃদয়গত বন্ধনমুক্তির ঘন আকুতিই হলেন মা-কালী। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "বন্ধন আর মুক্তি—দুয়ের কর্তাই তিনি।" তিনি ছেদন ও বন্ধন দুয়েরই কর্ত্রী। "তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কাম-কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি ভববন্ধনের বন্ধন-হারিণী তারিণী।"

শ্রীম সাক্ষী। ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন কালীতত্ত্ব। গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠে ঠাকুর গাইছেন: "শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে)।" গান শেষ করে বলছেন: "তিনি লীলাময়ী। এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।" ঠাকুর বলতেন: "পাশবদ্ধ জীব এবং পাশমুক্ত শিব"। একই জীবের দুই অবস্থা। "কালী ও ব্রহ্ম অভেদ।" সেই অভেদ কখন? যখন আমি নামরূপের ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পেরেছি। আমার 'আমি'কে নস্যাৎ করতে পেরেছি। আমি এবং আমার—এই হলো জীবের সংজ্ঞা। সংসার আমাকে পেড়ে ফেলেছে। অষ্ট-পাশের বন্ধনে আমার ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। মা, মা চিৎকার। কেউ নেই আমার, দারা-পুত্র-পরিবার। ঊর্ধ্ব-দৃষ্টিতে তাঁকে খুঁজছি আর কাতর কণ্ঠে ডাকছি, কৃপাময়ি। কৃপাদৃষ্টি কর মা। তখন তিনি তাঁর ডান হাত তুলে অভয় দিচ্ছেন: 'বাবা, ভয় কি তোমার। এই যে আমি তোমার জননী।' আমি তাঁর কণ্ঠ শুনেছি। মনে হয়েছে, কেউ একজন আছেন আমার এই নির্বান্ধব, মরুভূমি-সম সংসারে। কিন্তু আমি যে তাঁকে আরও কাছে পেতে চাই, 'মা, আমি যে তোমার কোল পেতে চাই।' সে কিরকম আকুতি? সেই ডাকের শক্তি কেমন হওয়া চাই? ঠাকুর যেভাবে ডাকতেন। মাটিতে পড়ে আছেন, অচৈতন্য। দুচোখের জলের ধারায় মাটি কর্দমাক্ত। দেহে প্রাণ আছে কি নেই। তখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় দক্ষিণহস্ত তুলে শোনান অভয়বাণী: 'ভয় নেই, ভয় নেই। আমি থাকতে তোমার কিসের ভয়!' ভক্তের এতেও আশ মেটে না। বন্ধনের কি হবে। ভবভয়-বন্ধন। অজস্র বন্ধন। সম্পর্ক, কর্তব্য, জীবিকা, রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, সংসার, সমাজ, মান, সম্মান, অভ্যাস, ইন্দ্রিয়। মা, মুক্তি কোথায়? জীবের এই তৃতীয় আর্তনাদে মা বের করবেন তাঁর বামহস্ত। সেই হাতে ধরা আছে অসি। তিনি একে একে সব বন্ধন কর্তন করে জীবকে মুক্তি দেবেন। জীবরূপ মুণ্ডটি তাই মায়ের দ্বিতীয় বামহস্তে ধৃত। এই হলো মায়ের চারটি হাতের রহস্য। এখন জীবের জীবত্ব নাশ মানে মৃত্যু। এই অবস্থাই হলো জীবের শিব-অবস্থা। অর্থাৎ তখন তার আর কোন কর্ম থাকে না। জৈবভাবে কোন কাজই শুদ্ধ নয়। শিবত্ব প্রাপ্তিতে তার কাজ হয় মঙ্গলকর্ম। শিবের আর এক অর্থ শুভ, মঙ্গল। কিন্তু শিবত্ব-লাভেই তো শেষ হচ্ছে না। সে তো

ব্রহ্মময়ীকে তখন চিনেছে। মায়ার আড়ালে সরে গেছে। জীবাত্মা তখন পরমাত্মায় লীন হতে চাইছে। জীবাত্মা যখন পরমাত্মায় মিলিত হলো, তখন সে শব। শিব যেই শবাকার হলো আনন্দময়ী স্বপ্রকাশিত হলেন হৃদয়ে। জীবের এই অবস্থার নাম সমাধি।

ঠাকুর বলছেন: "তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না। দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এইসব কার্য করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপভেদ।"

ঠাকুর প্রশ্ন করছেন: "কালী কি কালো?" নিজেই উত্তর দিচ্ছেন: "দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূরে থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোন রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূরে থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রঙ নেই।"

রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের অতীত একটা অবস্থাই হলো সত্য অবস্থা। সত্য কেন? গণিত দিয়ে বুঝতে হবে। আপেক্ষিক তত্ত্ব যেখানে নেই। আমি নেই, তুমি নেই। আলো নেই, অন্ধকারও নেই। রূপ, অরূপ কিছুই নেই। সেই অবস্থা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়। সাদাও নয়, কালোও নয়। তাই শিব শ্বেত শুভ্র, মা নিকষ কালো। দুই বিপরীত মেরুর সহ-অবস্থান। জীবন আর মৃত্যু। কর্ম আর নিষ্ক্রিয়তা, এক আর একের ওপর। ঠাকুর একটি গান গাইতেন—'ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কালো রূপ কেন হলো!' ঠাকুর ভক্তকে বলছেন: "যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। সাকাররূপও মানতে হয়। কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তারপরে দেখতে পায় যে, সেই রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই কালী।"

"তিনি অনন্ত পথও অনন্ত।" ঠাকুর সমন্বয়ের কথা বলছেন, জ্ঞানের কথা, ওপর থেকে দেখা, যার নাম দর্শন—"যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ। 'নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারি,/ কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।'

"বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ। শিবঃ কেবলঃ কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে, কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।"

কতভাবে ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন শক্তিরূপিণী কালীকে। "যিনি সৎ তাঁর একটি নাম ব্রহ্ম, আর একটি নাম কাল (মহাকাল)। কালী যিনি কালের সহিত রমণ করেন। আদ্যাশক্তি। কাল ও কালী—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা।"

ঠাকুর বলতেন, মায়া, মহামায়া। মহামায়ার এমনি লীলা, মানুষ জেগে ঘুমোয়। সাধু, সিদ্ধ মহাপুরুষ নিষ্কৃতি নেই কারও। তিনি প্রসন্ন হয়ে পথ না ছাড়লে সত্যলাভ অসম্ভব। বুদ্ধিকে বিমোহিত করতে তাঁর ক্ষণমাত্র সময় লাগবে না। মহাবিদ্যা ষোড়শী কে? সালঙ্কারা মা সারদা আসনে আসীন। ঘোর অমানিশা। পূজারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়ের পাদপদ্মে সাধনকালের সিদ্ধিপ্রদ জপমালা সমর্পণ করে দিলেন। 'মা, সাধনাও তোমার, সিদ্ধিও তোমার।'

"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্॥"

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

রক্তে কোলেস্টেরল

ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত

ডায়াবেটিস রোগে রক্তে 'সুগার', কিডনীর (বা বৃক্কের) বিকৃতিতে রক্তে 'ইউরিয়া'র মতো হার্টের অসুখে 'কোলেস্টেরল' (Cholesterol)-এর সম্পর্ক জানতে সকলেই আগ্রহী। করোনারি থ্রম্বোসিস বা অ্যানজাইনা পেক্টোরিসের (বুকে ব্যথা) সঙ্গে রক্তে কোলেস্টেরল অথবা ট্রাইগ্লিসেরাইড (tryglyceride—সাধারণ ভাষায় ফ্যাট বা চর্বি) বৃদ্ধি কতটা মূলগত সম্পর্কিত তা গবেষণাধীন থাকলেও শরীরে কোলেস্টেরলের পরিমাণ সীমিত রাখা প্রয়োজন বলে সবাই স্বীকার করেন।

কোলেস্টেরল বলতে ঠিক কি বোঝায়? কোলেস্টেরল একটি অ্যালকোহল জাতীয় পদার্থ, কিন্তু এর মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় এটিকে ফ্যাটি অ্যাসিডের পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। এর গঠনকেন্দ্রে 'স্টেরল' থাকায় এটি 'স্টেরয়েড' পর্যায়ে পড়ে। শরীরের পিত্তপাথরে (gall stone) প্রথমে ধরা পড়লেও মানুষের প্রায় প্রত্যেক কোষঝিল্লীতে (cell membrane) কোলেস্টেরল থাকে। কোলেস্টেরল শরীরে তৈরি হয় (endogenous) এবং খাদ্যের সঙ্গেও তা দেহে প্রবেশ করে (exogenous)। শরীরে পিত্তরস (bile) এবং বহুপ্রকারের স্টেরয়েড হরমোন তৈরিতে কোলেস্টেরল আবশ্যক। ভিটামিন 'ডি'-এর সঙ্গে এর কার্যগত সম্পর্ক আছে।

কোলেস্টেরল জলে দ্রবীভূত হয় না, তবে চর্বিতে গলে যায় এবং রক্তে বাহিত হবার জন্য প্রোটিন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে লাইপোপ্রোটিন (lipoprotein) আকারে সঞ্চালিত হয়। লাইপোপ্রোটিন দুই প্রকারের: লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (low density lipoprotein—L.D.L.) বা বিটা লাইপোপ্রোটিন (beta lipoprotein) এবং হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (high density lipoprotein—H.D.L.)। প্রথমটি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং দ্বিতীয়টি নয়, হয়তো উপকারীই। সুস্থ অবস্থায় উভয়ের সমতা বজায় থাকে। রক্তের অধিকাংশ কোলেস্টেরল পিত্তরসের সঙ্গে অন্ত্রপথে শরীর থেকে নির্গত হয়।

শৈশব থেকে ক্রমবর্ধিত হয়ে সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি ১০০ মিলিলিটার (১০০ সি. সি.) রক্তে ১৫০—২০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল (এইচ. ডি. এল. ও এল. ডি. এল. মিলিতভাবে) থাকে। এল. ডি. এল. কোলেস্টেরলের বৃদ্ধি হৃৎপিণ্ডে করোনারি রোগের সম্ভাবনা বাড়ায় অথচ এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরল সেদিক থেকে সুফলদায়ী। যাদের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি তাঁদের এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি থাকলে করোনারি রোগের সম্ভাবনা কম, কিন্তু এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল বৃদ্ধিতে ঐ রোগ-সম্ভাবনা বেশি হয়। সেজন্য যাঁদের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি পাওয়া যায়, তাঁদের রক্তে 'ট্রাইগ্লিসারাইড' নামক রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ নির্দেশিত হওয়া বিধেয়। কারণ, ট্রাইগ্লিসারাইডের সঙ্গে রক্তে এল. ডি. এল. সম্পর্কিত।

অতিরিক্ত কোলেস্টেরলবাহী খাদ্য গ্রহণ করা ছাড়াও কয়েকটি রোগে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায়। যেমন ডায়াবেটিস, হাইপোথাইরয়েড, পিত্তরোধ (cholestasis), নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম (কিডনীর অসুখ) ইত্যাদি।

ক্ষেত্রবিশেষে বংশগত (hereditary) কারণে একই পরিবারে অনেকের মধ্যে কোলেস্টেরল বাড়তে দেখা যায়। অর্থাৎ রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি কেবল চর্বি-জাত খাবার খাওয়ার জন্যই নয়। তবে কোলেস্টেরল বৃদ্ধিকে দমিত রাখার জন্য খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ দরকার।

যে কারণেই হোক, বেশিদিন কোলেস্টেরল বৃদ্ধির ফলস্বরূপ রক্তনালীতে অ্যাথিরোসক্লেরোসিস (atherosclerosis) বা রক্তনালীর সংকোচন, চামড়ায় অসুখ 'জ্যানথোমা', স্নায়ুক্ষয়, চোখে কর্নিয়াল আর্কাস, প্যাংক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়)-এর প্রদাহ প্রভৃতি হতে পারে। উল্লিখিত অ্যাথিরোসক্লেরোসিস হার্টে করোনারি রোগের কারণ। এবং এটিই ব্যক্তি ও

সামাজিক ক্ষেত্রে কোলেস্টেরল-ভীতি ও কোলেস্টেরল সম্পর্কে সচেতনতার হেতু।

অ্যাথিরোসক্লেরোসিস হবার শুরুতে রক্তনালীতে ঘা-এর মতো হয়ে তার ওপর কোলেস্টেরলের স্তর জমা হয়। যার ফলে রক্তনালীর পথ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রক্তচলাচল ব্যাহত হয় (ischaemia—ইসকিমিয়া) অথবা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের গায়ে যে রক্তনালীগুলি আছে (করোনারি রক্তনালী) সেগুলিতে এভাবে রক্তচলাচল ব্যাহত হলে লোকের করোনারি রোগ হয়।

কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখার জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয়, তার মধ্যে কয়েকটি হলো—(১) পরিমিত খাদ্যগ্রহণ (balanced diet), নিয়মিত ব্যায়াম, শরীরের ওজন (কত হওয়া উচিত তা চিকিৎসকের কাছে জেনে নিয়ে) ঠিক রাখা এবং মেদের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখা। (২) যেসব খাদ্যে কোলেস্টেরল বেশি, তা কমানো বা বর্জন। ডিম, মাখন, ক্রীম, বনস্পতি, ঘি, চীজ (প্রোসেসড), নারকেল তেল, পাম তেল, খাসি-শুকের-ভেড়া-গরুর মাংস, লিভার, কাজু-পেস্তা-আখরোট ইত্যাদি এই তালিকায় পড়ে। সম্প্রতি এক নতুন তথ্য জানা গেছে যে, নির্দিষ্ট মাত্রায় মাছের তেল খাওয়া উপকারী। বাঙালীর প্রিয় সরষের তেল সম্বন্ধে সঠিক বলা দুরূহ, তবে তা ব্যবহার করলেও মাত্রা নির্দিষ্ট রাখা আবশ্যক।

প্রত্যহ খাদ্যবাহিত কোলেস্টেরল ২৫০—৩০০ মিলিগ্রামের বেশি হওয়া অনুচিত। অথচ একটি ডিমেই প্রায় ২৫০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে।

(৩) পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রান্নার তেল, ঘি, চর্বি বা ঐ ধরনের কিছু ব্যবহার করা হয়। এসবেরই মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, যাকে রাসায়নিক ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—স্যাচুরেটেড (সংপৃক্ত) এবং আনস্যাচুরেটেড (অসংপৃক্ত)। যেসব তেলে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, সেগুলি খেলে রক্তে কোলেস্টেরল ১৫–২৫ শতাংশ বাড়তে পারে। যেসব তেলে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, সেগুলি খেলে রক্তে কোলেস্টেরল কমে।

পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল কমায়। বাদাম তেল, সয়াবীন তেল, রেপসীড অয়েল, কর্ন অয়েল, সূর্যমুখী তেল বা সানফ্লাওয়ার অয়েল এবং প্রমাণ সাপেক্ষে সরষের তেল এবিষয়ে উপকারী।

(৪) অধুনা কয়েকটি ওষুধ কোলেস্টেরল কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা, ক্লোফাইব্রেট, নিকোটিনিক অ্যাসিড, কোলেস্টাইরামিন প্রভৃতি। তবে এসব ওষুধের প্রয়োগবিধি, মাত্রা, কতদিন ব্যবহার্য ইত্যাদির সম্যক্ জ্ঞান ব্যতিরেকে ব্যবহারে অপকারের সম্ভাবনা থাকে।

কোলেস্টেরল সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত পাওয়া গেলেও সাধারণক্ষেত্রে কতগুলি বিষয়ে সকলেই একমত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে নির্দেশিত হয়েছে যে, করোনারি রোগ উদ্ভবের তিনটি 'দায়ী বিষয়' (risk factor) আছে: (১) ধূমপান, (২) রক্তের উচ্চচাপ অর্থাৎ হাই ব্লাডপ্রেসার, (৩) রক্তে লিপিড জাতীয় পদার্থের (যার মধ্যে কোলেস্টেরল পড়ে) বৃদ্ধি। যখনই কারও উপরোক্ত যেকোন একটি 'দায়ী বিষয়' পাওয়া যায় তখনই সেবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রোগীর জীবনধারণপ্রণালী, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ইত্যাদি নানা কারণ উপরোক্ত বিষয়গুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্লাডপ্রেসার, সিগারেটের নিকোটিন অংশ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির সঙ্গে কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্দেশিত হওয়া আবশ্যক। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশিত পুস্তকাদিতে উক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে উচ্চ ও নিম্ন মাত্রা নির্দিষ্ট আছে, তা আমাদের দেশে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। অতএব রোগী হিসাবে প্রত্যেককে আলাদাভাবে বিচার করা প্রয়োজন। সুখের বিষয়, আমাদের দেশের গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে ইদানীং এই সব বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে এবং দেখা হচ্ছে, আমাদের দেশে উপরি-লিখিত 'দায়ী বিষয়'-এর কোন্‌টা স্বাভাবিক এবং কোন্‌টা অস্বাভাবিক মাত্রা।

পরিশেষে বলা যায়, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখা বাঞ্ছনীয়। রক্তে কোলেস্টেরল বাড়লে আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে সুচিকিৎসকের পরামর্শে অনেক ক্ষেত্রেই এর পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রায় বজায় রাখা সম্ভব।

গ্রন্থ-পরিচয়

জয়নগরের ইতিহাস
সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

কৃষ্ণমোহন ও জয়নগর মিত্র পরিবার ঃ ভৈরবচন্দ্র মিত্র ও গোপালচন্দ্র মিত্র। সিনথডেভ কনসালটেন্টস, ৭৫/৭২, এস. এন. রায় রোড, কলকাতা-৭০০০৩৮। মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে জয়নগর গ্রাম একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারদ্বয় জয়নগর গ্রাম এবং এই গ্রামের এক বিশিষ্ট পরিবার মিত্র বংশের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ থেকেই জয়নগর গ্রামের নামকরণ, গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষা-দীক্ষা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রামের অগ্রগতি এবং মিত্র বংশের বিভিন্ন কীর্তিকাহিনীর কথা জানা যায়। জয়নগরের প্রথম দুর্গোৎসব, প্রথম ডাকঘর, প্রাচীনতম বিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি, থানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, বিভিন্ন ধর্মীয় ও জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য এই গ্রন্থে আছে।

জয়নগর গ্রামের শৈশব ও ক্রম-বৃদ্ধির ইতিহাস ওতপ্রোত হয়ে আছে মিত্র বংশের কয়েকজন কৃতী সন্তানের জীবনেতিহাসের সঙ্গে। এঁদেরই উৎসাহ ও দাক্ষিণ্যে গড়ে উঠেছে জয়নগরের দ্রষ্টব্য নানা মন্দির-মণ্ডপ, উদ্যান-ময়দান, রাস্তাঘাট প্রভৃতি, যা জয়নগর-জনপদের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সহায়তা করেছে। এঁরাই খনন করেছেন দীর্ঘব্যাপ্ত মিত্রগঙ্গা, তার তীরে নির্মাণ করেছেন দ্বাদশ মন্দির —যার চিত্র দর্শনমাত্রেই স্মরণে আনে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরশ্রেণীর কথা। এঁরাই প্রতিষ্ঠা করেছেন জয়নগরের বিখ্যাত রাধাবল্লভ জিউর বিগ্রহ ও তাঁর অধিষ্ঠানের জন্য মন্দির ও চাঁদনী—যেখানে পঞ্চম দোল-উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট মেলা। এই দোল-উৎসবের খ্যাতি একদা জয়নগরকে পরিচিত করেছিল সমগ্র বাংলায়। পঞ্জিকায় বাংলার নানা উল্লেখ্য উৎসবের মধ্যে এই পঞ্চম দোলোৎসবও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পরিবারেরই একজন শিল্প-রুচিসম্পন্ন পুরুষ রচনা করেছিলেন 'অমর কানন' নামে একটি সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যান, যা নানা স্থানের মানুষকে আকর্ষণ করত তার রূপ-মাধুর্যে। এই উদ্যানের একাংশে তিনি নির্মাণ করেন এক রমণীয় রঙ্গমঞ্চ (যা বর্তমানে 'রূপ ও অরূপ' নামে খ্যাত), যেখানে বহুবার অভিনয় করে গিয়েছেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ নট-নটীরা। মিত্র পরিবারের এই-সব কীর্তি জয়নগর গ্রামকে সুপরিচিত করেছে সারা দক্ষিণবঙ্গে।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মিত্রপরিবারের কর্মকাণ্ড জয়নগর গ্রামের এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং সেইহেতু তা বাংলার ইতিহাসেরও অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়েছে।

এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জি. এম. ট্রেভেলিয়ান (G. M. Trevelyan) তাঁর 'History and the Reader' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন ঃ "You cannot understand your own country··· unless you know something of its history."

উক্তিটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কারুরই দ্বিমত থাকতে পারে না। একদা সুন্দরবনের অংশবিশেষ জঙ্গলাকীর্ণ এই ভূমিখণ্ডে গুণানন্দ মতিলাল পত্তন করেছিলেন জয়নগর গ্রামের। সুদূর অতীতের সেই সামান্য সূচনা কেমন করে বর্তমানের সমৃদ্ধ জনপদে ক্রমবিকশিত হলো তার কাহিনী নিহিত রয়েছে মিত্র-পরিবারের ইতিহাসের মধ্যে। দুশো বছর পূর্বে এই বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণমোহনের কাল থেকে সেই ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এই অতীত উদ্ঘাটনের জন্যে লেখকদ্বয় যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করেছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। বইটি জয়নগর তথা দক্ষিণবঙ্গের ইতিহাস-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রের কাছেই আদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত এবং তাঁর চরিত্রগঠন ও মানুষ তৈরির আদর্শে নিয়োজিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম কলেজ। বেলুড় মঠ সংলগ্ন এই আবাসিক কলেজ ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই যাত্রা শুরু করে ৪ জুলাই ১৯৯১ তারিখে তার গৌরবময় পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করেছে। এই উপলক্ষে বর্ষব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

৪ জুলাই সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজো ও ভজনের মধ্য দিয়ে এই দিনের উৎসবের সূত্রপাত হয়। সকাল ১০টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ পঞ্চাশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন এবং তারপরে নব-নির্মিত ছাত্রাবাস 'শ্রদ্ধাভবন'-এর তিনি দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১০-৩০-এ বিদ্যামন্দির পরিচালনসভার সভাপতি স্বামী নির্জরানন্দ বিদ্যামন্দিরের পতাকা উত্তোলন করেন। কিছুক্ষণ পরে কলেজের দেওয়াল-পত্রিকা 'শ্রদ্ধা'র বিশেষ সংখ্যা উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় সমবায়মন্ত্রী সরল দেব। বিকাল ৩টায় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী সভায় অভ্যাগতদের স্বাগত জানান বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী মেধসানন্দ এবং সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দ। সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডঃ অম্লান দত্ত, বালি পৌরসভার অধ্যক্ষ অধ্যাপক সত্যপ্রকাশ ঘোষ এই অনুষ্ঠানে যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠানে ধ্রুপদ পরিবেশন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রখ্যাত ধ্রুপদী অরুণ ভট্টাচার্য, সঙ্গীতশিল্পী স্বরাজ রায়, অধ্যাপক তপন ঘোষ ও স্বামী সর্বগানন্দ। সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে বিদ্যামন্দিরের কর্মী ও ছাত্ররা ছাড়াও সাধু-ব্রহ্মচারী, প্রাক্তন ছাত্র এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে প্রাক্ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্ত স্মরণ অনুষ্ঠান ২ জুলাই, '৯১ বিবেকানন্দ হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ। স্বামী জয়ানন্দ এবং মিলনকুমার চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। ছাত্ররা সঙ্গীত, আবৃত্তি, আলোচনা, যন্ত্রসঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, নাটক প্রভৃতি পরিবেশন করে।

সালেম আশ্রম (তামিলনাড়ু) গত আগস্ট মাসে একদিনের এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ঐ সম্মেলনে মোট ১৮০ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল।

উদ্বোধন

গত ২৩ আগস্ট ত্রিপুরার উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী দ্রৌকুমার রিয়াং আগরতলা বিবেকনগর (আমতলী) আশ্রমের বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনীসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬ আগস্ট ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এল. রামদাস দিল্লী আশ্রম পরিদর্শন করেন।

ত্রিপুরার কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জামাতিয়া গত ১৫ আগস্ট বিবেকনগর (আমতলী) আশ্রম পরিদর্শন করেন।

ত্রাণ

আসাম বন্যাত্রাণ

গুয়াহাটি আশ্রমের মাধ্যমে কামরূপ জেলার ডিমোরিয়া অঞ্চলের তিনটি গ্রামের ৪২৫টি পরিবারের মধ্যে ৫০০ শাড়ি, ৫০০ ধুতি, ১৩৮৬টি শিশুদের পোশাক, ৩১৭২টি পুরনো পরিচ্ছদ, ১০০০টি টিউব

টুথপেস্ট, ৯০০ টুথব্রাশ, ২০,০০০ জল শোধনের বড়ি বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৫৪০ জন বন্যাক্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে এবং বিনা-মূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়েছে।

উড়িষ্যা বন্যাত্রাণ

কটক জেলার জগৎসিংহপুর ও নিয়ালি ব্লকের ১৪টি গ্রামের ৯৭০টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ১০০০ শাড়ি, ১০০০ ধুতি, ২৬৮০টি শিশুদের পোশাক ভুবনেশ্বর আশ্রমে পাঠানো হয়েছে।

পুরী মঠ পুরী রেলস্টেশনের আশপাশে জলবন্দী তিনহাজার মানুষকে গত ২৬ আগস্ট থেকে প্রতিদিন ভাত ও ডালমা বিতরণ করছে।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন ২২-৩১ আগস্ট পুরী জেলার ডেলাং, কোনাস ও কাকটপুর ব্লকের ১৩টি গ্রামের ১৫৯০ জন রোগী এবং ৪০০ জন শিশুকে ঔষধ ও খাদ্য বিতরণ করেছে। পুরী শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক বন্যাক্লিষ্টদের চিকিৎসা-কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

মহারাষ্ট্রে বন্যাত্রাণ

নাগপুর আশ্রমের মাধ্যমে নাগপুর জেলার মৌয়াদের সন্নিকটস্থ জালালখেদা গ্রামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ২৮৫ সেট বাসনপত্র (প্রতি সেটে পাঁচটি করে বাসন) বিতরণ করেছে।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ

বিশাখাপত্তনম জেলার এস. রায়ভরম মণ্ডলের ধর্মভরম গ্রামে ৮১টি বাড়ির নির্মাণ-কার্য শেষ হয়েছে। বাড়িগুলির শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। তাছাড়া আশ্রয়গৃহ নির্মাণের কাজও চলছে।

বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম জেলার বংশখালি ও কাটরোলি এলাকায় এক ব্যাপক পুনর্বাসন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৯৭৮টি বাড়ি নির্মাণ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন : গত আগস্ট মাসে যথারীতি রবিবাসরীয় ভাষণ হয়েছে এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'র ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ১৭ আগস্ট তিনি যুবক-যুবতীদের জন্য একটি বেদান্তের ক্লাসও নিয়েছেন। বেদান্ত সোসাইটির সদস্যদের জন্য অনুষ্ঠিত মাসিক সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১০ আগস্ট।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা) : গত ৮ সেপ্টেম্বর স্বামী আদীশ্বরানন্দ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর স্বামী সর্বগতানন্দ অতিথি-বক্তা হিসাবে বিশেষ ভাষণ দিয়েছেন। গত ১ সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, ১৪ সেপ্টেম্বর রামনাম ভজন এবং ২১ সেপ্টেম্বর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ওপর আলোচনা হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর স্বামী প্রমথানন্দ 'বেদান্ত ও বিশ্বশান্তি' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। ১ সেপ্টেম্বর ডঃ বি. গুপ্ত রায় পরিচালিত বস্টনের 'সৃজন' সংস্থার সদস্যগণ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এটি কেন্দ্রের তহবিল গঠনের জন্য আয়োজিত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো : গত সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে যথারীতি ধর্মীয় ভাষণ হয়েছে। ১১ ও ২৫ সেপ্টেম্বর 'বিবেকচূড়ামণি'র ক্লাস নিয়েছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ এবং ১৮ সেপ্টেম্বর উপনিষদের ওপর একটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ১ সেপ্টেম্বর পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, মাল্যদান, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো) : গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। শনিবারগুলিতে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৮ সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছে। ওয়েবস্টার স্ট্রীটস্থ এই বেদান্ত সোসাইটির পুরনো মন্দিরে প্রতি শুক্রবার স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ বেদান্ত শাস্ত্রের ক্লাস নিচ্ছেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক : গত ২২ ও ২৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার স্বামী আদীশ্বরানন্দ ভাষণ দিয়েছেন। তিনি প্রতি শুক্রবার 'বিবেকচূড়ামণি' এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার, বোর্ন এন্ড (যুক্তরাজ্য) -এর ব্যবস্থাপনায় গত ২৫ থেকে ৩০ জুলাই ইউরোপে অবস্থিত কেন্দ্রগুলির সন্ন্যাসীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী সভাপতিত্ব করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী প্রেমরূপানন্দ (হরিপদ) গত ৪ আগস্ট রাত ৯-৪০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার ল্যান্সডাউন নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি জয়রামবাটীতে অসুস্থ হয়ে এই নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি হৃদ্‌-যন্ত্রের রক্তাল্পতা ও বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। স্বামী প্রেমরূপানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভুবনেশ্বর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে কাটিহার, এলাহাবাদ, উদ্বোধন, রেঙ্গুন এবং মাদ্রাজ মঠের কর্মী ছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পূজারী ছিলেন। তিনি সুরাটে (গুজরাট) রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত প্রায় দু-বছর বেলুড় মঠের অন্যতম ম্যানেজারের কর্তব্য পালন করেন। তার পূর্বে তিনি কানপুর ও শিলং কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ হন এবং আমৃত্যু তিনি ঐ পদে ছিলেন। দয়ালু, প্রেমিক এই সন্ন্যাসী অতি মধুর ব্যবহারের জন্য সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

স্বামী সুশান্তানন্দ (ফণীন্দ্র) গত ১৭ আগস্ট রাত ২-১৫ মিনিটে বারাণসী সেবাশ্রমে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাঁর শরীরের বামভাগ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হওয়ায় তাঁকে গত ২৪ জুলাই সেবাশ্রমের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। স্বামী সুশান্তানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তিনি ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে বাঁকুড়া কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি আসানসোল, কাটিহার, মেদিনীপুর, উদ্বোধন, বেলুড় মঠ, ভুবনেশ্বর, জয়রামবাটী, বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম এবং সেবাশ্রমের কর্মী ছিলেন। তিনি তমলুক ও বাঁকুড়া আশ্রমের অধ্যক্ষরূপেও কাজ করেছেন। সম্প্রতি তিনি বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমে অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। অনাড়ম্বর ও কঠোর জীবন-যাপনের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ১ সেপ্টেম্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি ও ৭ সেপ্টেম্বর শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী কমলেশানন্দ ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার কথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ লীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া : গত ১৯ মে অপরাহ্ণে আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণ সরকার, অসীম দত্ত ও অমিত ঘোষ। স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে বিমল কুমার ঘোষ এবং প্রফুল্ল রায়।

রাখালচণ্ডী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ৫ মে এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। ঐদিন পল্লী পরিক্রমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, কথামৃত পাঠ, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুরে সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ এবং স্বামী মন্ত্রসঙ্গানন্দ। পরদিন সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌজন্যে ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ধানবাদ (বিহার) : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি এই আশ্রমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উৎসব এবং ১৪—১৬ মার্চ বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। বাৎসরিক উৎসবে স্বামী চন্দ্রানন্দ, স্বামী দেবদেবানন্দ ও স্বামী গিরিশানন্দ যোগদান করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্বামী দেবদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী অবলম্বনে দুদিন গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন।

গত ২৭ ও ২৮ এপ্রিল **বজাই চক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ** গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রমের বাৎসরিক উৎসব রাজা রামমোহন বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত উৎসবে বিশেষ পূজা, মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা, গীতাপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ এপ্রিল সকালে সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। ২৮ এপ্রিল সকালে প্রভাতফেরী, বেলা ১১টায় প্রশ্নোত্তর সভা ও বিকালে পুরস্কার বিতরণ, ধর্মসভা এবং কথায় ও গানে কথামৃত পরিবেশিত হয়। পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দ। ঐদিন দুপুরে প্রায় ৫০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ভক্তি-মূলক ছায়াছবি 'ভক্ত কবীর' দেখানো হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) গত ৭ এপ্রিল, রবিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উৎসব পালন করে। বেলা ১১টায় কথামৃত পাঠ ও ১০০ জন দুঃস্থ বালক-বালিকার মধ্যে প্যান্ট ও গেঞ্জি বিতরণ করেন রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বদেবানন্দ। বিকালে ধর্মসভার পূর্বে ৫০টি ধুতি ও শাড়ী বিতরণ করেন স্বামী মন্ত্রসঙ্গানন্দ। দুপুরে ২০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী মন্ত্রসঙ্গানন্দ, স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দ এবং গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সন্ধ্যায় বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুজিত দে ও সম্প্রদায়।

গত ৭ এপ্রিল '৯১, রবিবার হুগলী জেলার **হেলান শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের** ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। কথামৃত পাঠ, পদযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ এবং প্রায় সহস্রাধিক ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী অমেয়ানন্দ, স্বামী নির্লিপ্তানন্দ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী ব্যক্তি-গণ ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় 'কংস' চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও রাত্রে কীর্তনানুষ্ঠান হয়।

গত ২০ ও ২১ এপ্রিল '৯১ **প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের চকপাড়া শাখার** উদ্যোগে হাওড়ার বেলগাছিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা, সভা ও সভ্যা-

গণের সমবেত প্রার্থনা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা ইত্যাদির মাধ্যমে পালিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী জীবানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন সঙ্ঘের সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী, বক্তব্য রাখেন হরিপদ মজুমদার ও নারায়ণচন্দ্র নাগ। 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ বাণী-প্রচার সংঘ। অনুষ্ঠান শেষে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে 'ধ্যান-ভারতী' নামে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

অশোকনগর শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গত ২০ ও ২১ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। এ-উপলক্ষে উভয়দিনই বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের সভায় আলোচনা করেন স্বামী অমলানন্দ এবং দ্বিতীয়দিনের সভায় আলোচনা করেন স্বামী পুরুষানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-রামকৃষ্ণানন্দ আশ্রম, ইছাপুর (হুগলী): গত ৫ মে রবিবার শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের বার্ষিক স্মরণ-উৎসব সকাল ৫-৩০ মিনিটে চণ্ডীপাঠ দিয়ে শুরু হয়। তারপর প্রভাতফেরী, ভজন, কথামৃত পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে তিন সহস্রাধিক ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী দেবদেবানন্দ এবং স্বামী নির্লিপ্তানন্দ। সভার প্রারম্ভে গত বছরের চক্ষু-পরীক্ষা শিবিরের ৮জন বালককে স্বল্প মূল্যে চশমা বিতরণ করেন স্বামী গহনানন্দজী। স্বামী দেবদেবানন্দ ও স্বামী নির্লিপ্তানন্দ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্বামী প্রভানন্দ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর তুলনামূলক আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী গহনানন্দজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের রামকৃষ্ণগতপ্রাণতা, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

গত ৪—৬ জানুয়ারি '৯১ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভক্তসঙ্ঘ, জামালপুর (বিহার) ও স্টুডেন্টস চ্যাপ্টার, ইন্‌স্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স (ইণ্ডিয়া), ই. বি. সি. জামালপুর শাখার যৌথ উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে তিনদিনের এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের প্রথমদিন সন্ধ্যায় মশাল-পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ভক্তসঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বক্তৃতা, আবৃত্তি ও কুইজ ছিল প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু। শতাধিক ছাত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ শীতাংশুকুমার চক্রবর্তী। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ১ম ও ২য় স্থানাধিকারীদের শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন অনিতা ভিজ্। সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ-লীলা-গীতি' পরিবেশন করেন ভক্তসঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ। এই উভয়দিনের অনুষ্ঠানে হিন্দীতে ভাষণ দেন স্বামী বিপাশানন্দ। এই উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ করেন 'দিল্লী রেল ইণ্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসেস'-এর জেনারেল ম্যানেজার জে. এম. আজাদ। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ডিরেক্টর ভি. কে. ভিজ।

গত ১০ মার্চ সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ধর্মসভায় স্বামী লোকনাথানন্দ ও স্বামী একদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, গত ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ভাজামোড়া (হুগলী) গত ৩১ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক (কলকাতা)-এর সহযোগিতায় বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুবসম্মেলনে ১২জন যুব-প্রতিনিধি, উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম

সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, রহড়া বালকাশ্রমের স্বামী কৌশিকানন্দ, সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী, ডাঃ বিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রায় একহাজার যুবপ্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল।

দুপুরে প্রায় আটহাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। পরে নানা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি উৎসব

আলোচনাচক্র

যদুলাল মল্লিক স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি উৎসব উত্তর কলকাতার ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের ঠাকুরদালানে গত ২১ জুলাই ১৯৯১ প্রতিবারের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হয়। এবার প্রধান আকর্ষণ ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ধারায় কর্ম-প্রবাহ' শীর্ষক আলোচনাচক্র। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী মেধসানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী শিবময়ানন্দ এবং উৎসব-সভাপতি স্বামী মুমুক্ষানন্দ। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। আলোচনাচক্রের আগে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' আদর্শে নবম 'বিশ্বধর্ম সমাবেশ' হয়। বৈষ্ণবধর্মের দীনবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, জৈনধর্মের গণেশ লাল-ওয়ানি, খ্রীস্টানধর্মের ফাদার ম্যাথু সিলিং, ইসলাম-ধর্মের মণিরুজ্জমান ও মৌলনা আবদুল অহাব এবং শিখধর্মের পক্ষ থেকে হীরালাল চোপরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কীর্তনে শোভনা চৌধুরী, ভক্তিগীতিতে গীতা মাইতি ও শ্যাম বসু যোগদান করেন। সভান্তে আন্দুল রাজবাড়ি 'পূর্বা' দলের প্রদ্যোতকুমার মিত্রের পরিচালনায় রমেন্দ্রনাথ মল্লিক রচিত গীতিবিচিত্রা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বোধন' উপস্থাপিত হয়। উৎসবটির সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন 'যদুলাল মল্লিক স্মৃতি সমিতি'র সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক।

গত ১৯ এপ্রিল ১৯৯১ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাশ্রিত দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়িতে দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দ মাসিক 'সৎসঙ্গ ও প্রবচন' পরিচালনা করেন। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'ঈশ্বরলাভের উপায় সাধন-ভজন'। সভার সূচনা হয় সমবেত কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক ভজন দিয়ে। তারপর কয়েকটি ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সভার শেষে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সুধালতা বসু গত ৬ ডিসেম্বর '৯০ দক্ষিণ কলকাতার কেয়াতলায় নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি এবং তাঁর স্বামী প্রয়াত প্রফুল্লকাশিত বসু বেলুড় মঠ ও বর্মার রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

গত ২৭ মে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা অসীমা বিশ্বাস এক বাস দুর্ঘটনায় গুরুতররূপে আহত হয়ে কলকাতার আর. জি. কর হাসপাতালে ভর্তির পর দুপুর ১-১০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। বেলুড় মঠ, কাশীপুর উদ্যানবাটী, যোগোদ্যান, উদ্বোধন, বলরাম মন্দির, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোকের সঙ্গে গভীর-ভাবে যুক্ত ছিলেন। রামবাগান বস্তির উন্নয়নকল্পে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তিনি অনেক অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। কলকাতার বাইরেও বহু সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি এবং তাঁর স্বামী প্রয়াত অন্নদারঞ্জন বিশ্বাস যুক্ত ছিলেন।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

হাঁপানির ওষুধগুলি রোগীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে না তো?

ইংল্যান্ড ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে হাঁপানিতে মৃত্যু হওয়ার যেন মড়ক লেগে গেছে। অসুখটিও যেমন বাড়ছে, এতে মৃত্যুর সংখ্যাও তেমনি বাড়ছে। সেই সঙ্গে হাঁপানি চিকিৎসায় ওষুধের সংখ্যাও বাড়ছে। স্বভাবতই কোন কোন চিকিৎসক ভাবছেন, 'আমাদের ওষুধগুলিই রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তো?' অথচ এই অসুখে সুপরিকল্পিত চিকিৎসা-পদ্ধতি বহুদিন যাবৎ চালু আছে।

হাঁপানির চিকিৎসায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ওষুধ হচ্ছে 'বিটা টু অ্যাগোনিস্ট' (Beta-2 Agonist) জাতীয় ওষুধগুলি, যার কাজ হলো ফুসফুসের মধ্যে যে শ্বাসনালী আছে তার ফাঁককে বড় করা, যাতে ফুসফুসে বেশি হাওয়া ঢুকতে পারে। এই ওষুধ পাউডার বা স্প্রেভাবে শ্বাসের সঙ্গে নিলে দু-এক মিনিটেই ফল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু বর্তমানে চিন্তা করা হচ্ছে—রোগীকে এর জন্য সাংঘাতিক খেসারত দিতে হয় না তো? এই প্রশ্নের উত্তর বহু ব্যয়-সাপেক্ষ। ব্রিটেনেই প্রায় ৩০ লক্ষ হাঁপানিরোগী আছে, যাদের জন্য ন্যাশনাল হেল্থ সার্ভিস (NHS)-কে ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে ২৭০ লক্ষ পাউন্ড ওষুধ (সার্ভিসের সমগ্র ওষুধের আট শতাংশ) সরবরাহ করতে হয়েছে।

হাঁপানিতে মৃত্যু কেন বাড়ছে, তার উত্তর দেওয়া কঠিন। একটি কারণ হচ্ছে যে, হাঁপানিরোগ বেড়ে চলেছে। ব্রিটেনে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে রোগ বৃদ্ধির হার ছয়-শতাংশ। হাঁপানির তীব্রতাও বেড়েছে। হয়তো এর মূলে আছে পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার পরিবর্তন। বাড়ি আরামদায়ক করার জন্য ভেলভেটে মোড়া আসবাবপত্র এবং কেন্দ্রীয় শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে ছোট ছোট কীট মীট (mite) জন্মে, যাদের মল শ্বাসের মধ্য দিয়ে শরীরে ঢুকে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। কিন্তু অনেক ডাক্তার মনে করেন, রোগের বৃদ্ধি বা তার তীব্রতার বৃদ্ধিই হাঁপানিতে মৃত্যুহারের বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। তাই তাঁরা পূর্বোল্লিখিত বিটা টু অ্যাগোনিস্ট জাতীয় ওষুধগুলির (যেমন আইসো-প্রিনালিন, ফেনোটেরল, স্যালবিউটামল প্রভৃতি) ওপর সন্দেহের দৃষ্টি দিচ্ছেন। এই ওষুধগুলির হৃৎপিণ্ডের ওপর কিছু বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া আছে বলে মনে হয়। এসত্ত্বেও গ্ল্যাক্সো কোম্পানির স্যালবিউ-টামল কিন্তু সারা পৃথিবীতে যত রকমের ওষুধ বিক্রয় হয়, তার মধ্যে চতুর্দশ বৃহত্তম।

তবে এটা ঠিক যে, বিটা টু অ্যাগোনিস্ট জাতীয় ওষুধ কি করে রোগীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে তা জানা নেই। তাছাড়া হাঁপানির ওপর বহু গবেষণা হয়ে গেছে সত্য কিন্তু রোগটিকে এখনও ভালভাবে বোঝা যাচ্ছে না। কেবল এইটুকু জানা গিয়েছে যে, অ্যালার্জি সৃষ্টি করে এমন সব দ্রব্য (অ্যালার্জেন, যেমন ঘরের ধুলোয় কীটের মল, বিড়ালের লোম প্রভৃতি) রোগীর শ্বাসনালীকে সংকুচিত করে এবং তার ফলে শ্বাসকষ্ট হয়।*

* New Scientists, 6 April, 1991, pp. 17-18

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, বিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচিপত্র

৯৩তম বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৯৮

যুগ্ম সম্পাদক

স্বামী সত্যব্রতানন্দ — স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আগামী বর্ষের (৯৪তম বর্ষ : ১৩৯৮—১৩৯৯/১৯৯২)

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঞ্চাশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা

বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ পাঁচ টাকা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

৯৪তম বর্ষ **উদ্বোধন**

সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
যুগ্ম সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় যে, গত কয়েকমাস যাবৎ গ্রাহকদের অনেকে সাধারণ ডাকে, এমনকি রেজিস্ট্রি ডাকেও, উদ্বোধন হয় দেরিতে পাচ্ছেন অথবা একেবারেই পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন। সহৃদয় গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানাই যে, স্থানীয় ডাকঘর এবং ঊর্ধ্বতম ডাকবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের পত্রিকা-প্রাপ্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিতরণের আশ্বাসও দিয়েছেন। গ্রাহকদের অনেকেই ভাবছেন হয়তো উদ্বোধন-এর পক্ষ থেকে ঠিকমতো পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয় না। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। আমরা নিয়মিত পত্রিকা ডাকে দিয়ে থাকি। ডাকঘরের সঙ্গে ব্যবস্থামতো প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ২৩ অথবা ২৪ তারিখ গ্রাহকদের পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। গত আশ্বিন (৯ম) সংখ্যা ডাকে পাননি বলে কেউ কেউ জানাচ্ছেন এবং ডুপ্লিকেট কপি পাঠাতে অনুরোধ করছেন। গত আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যায় প্রতিবারের মতো আমরা জানিয়েছিলাম যে, আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।

মাঘ ১৩৯৮—পৌষ ১৩৯৯
জানুয়ারি ১৯৯২—ডিসেম্বর ১৯৯২

☐ আগামী মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১-এর মধ্যে আগামী বর্ষের (৯৪তম বর্ষ : ১৩৯৮-১৩৯৯/১৯৯২) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ : চুয়াল্লিশ টাকা ☐ ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ : পঞ্চাশ টাকা ☐ বাংলাদেশ—নব্বই টাকা ☐ বিদেশের অন্যত্র— দুশো টাকা (সমুদ্র-ডাক), চারশো টাকা (বিমান-ডাক)।

আজীবন গ্রাহকমূল্য : এক হাজার টাকা (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য)

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও (অনূর্ধ্ব বারোটি) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা (প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা) জমা দিতে হবে।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়। চেকের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

☐ উদ্বোধন-প্রকাশিত গ্রন্থে গ্রাহকরা ১০% এবং আজীবন গ্রাহকরা ২০% কমিশন পাবেন।

☐ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯·৩০—৫·৩০ ; শনিবার বেলা ১·৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

☐ ঠিকানা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ ; টেলিফোন : ৫৪-২২৪৮

☐ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র (মাসিক) উদ্বোধন আপনাকে পড়তেই হবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ নভেম্বর, ১৯৯১ ৯৩তম বর্ষ—১১শ সংখ্যা

দিব্য বাণী

"আমরা মানবজাতিকে সেইস্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম 'একত্ব রূপ সেই এক-ধর্মে'রই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

(বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩৯)

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম কি এবং কেন

এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা আলোচিত এবং বিতর্কিত বস্তু সম্ভবতঃ ধর্ম এবং কোন কোন মহলে সর্বাপেক্ষা নিন্দিতও। কেহ বলিতেছেন, ধর্মই দেশের সর্বনাশের মূল, প্রগতির পথে সর্ববৃহৎ প্রতিবন্ধক; কেহ বলিতেছেন, ধর্মই দেশ ও জাতির অস্তিত্ব ও উত্থানের ভিত্তি, সমৃদ্ধির পথে দূরত্ব-প্রস্তর (milestone); কেহ-বা বলিতেছেন, ধর্ম-বস্তুটি লইয়া শিক্ষিত মানুষদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—উহা নিতান্তই অন্তঃপুরের ব্যাপার অথবা অশিক্ষিত এবং দেহাতী মানুষদের বিষয়।

বলা বাহুল্য, যে-ধর্ম আজ আমাদের দেশে এত আলোচনা, বিতর্ক, নিন্দা-উপেক্ষার কেন্দ্রবিন্দু তাহা কিন্তু মোটেই 'ধর্ম' নহে, তাহা হইল 'ধর্মমত'—সাম্প্রদায়িক ধর্মমত। ধর্মের সহিত ধর্মমতকে মিশাইয়া ফেলা হয়; কিন্তু ধর্ম এবং ধর্মমত কখনই সমার্থক নহে। ধর্মমত বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানুষের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। যেকোন ধর্মমত বা যেকোন সম্প্রদায়—সে যতই প্রাচীন হউক না কেন—ইতিহাসের এক-একটি যুগে, এক বা একাধিক ব্যক্তির (কোথাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম অথবা কাল জানা গিয়াছে, কোথাও-বা তাহা অজ্ঞাত-রহিয়া গিয়াছে।) নেতৃত্বে প্রবর্তিত হয়, কোন-কোনটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, আবার কোন-কোনটি অল্পকাল বা দীর্ঘকাল পরে লুপ্ত অথবা শক্তিহীন হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'ধর্ম' বলিতে যাহা বুঝায় তাহার উদ্ভবের কোন কাল নিরূপণ করা সম্ভব নহে, কাহাদের মধ্যে এবং কোথায় উহার প্রথম উন্মেষ ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করাও অসম্ভব। সেই সঙ্গে ইহাও আবার সত্য যে, প্রকৃত অর্থে ধর্ম

বলিতে যাহা বুঝায় তাহার উন্মেষ-লগ্ন নিরূপিত না হইলেও উহার অস্তিত্ব সন্দেহাতীত এবং উহার যেমন প্রাকৃতিক বিলুপ্তি কখনও সম্ভব নহে, তেমনই সম্ভব নহে উহাকে নিস্তেজ করাও।

ভারতীয় ঐতিহ্যে 'ধর্ম' শব্দটি সুগভীর তাৎপর্য-বাহী। বলা হয়, ধর্ম হইল সেই অনির্বচনীয় বস্তু যাহা না থাকিলে সভ্যতা টিকিবে না, সমাজ বাঁচিবে না, মানুষ 'মানুষ' থাকিবে না। মহাভারতে (কর্ণপর্বে) বলা হইয়াছে—"ধারণাৎ ধর্মঃ"—ধর্মের ধর্ম হইল ধারণ করা। "ধর্মঃ ধারয়তে প্রজাঃ"—যাহা সভ্যতাকে ধারণ করে, যাহা সমাজকে ধারণ করে, যাহা মানুষকে ধারণ করে তাহাই ধর্ম। 'ধর্ম' সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু হইতে উহা নিষ্পন্ন। পাণিনি বলিতেছেন, 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা'।

এখন প্রশ্ন হইবেঃ বুঝিলাম যে, যাহা সভ্যতাকে, সমাজকে এবং মানুষকে ধারণ করে এক কথায় উহার নাম 'ধর্ম'। কিন্তু ধর্ম বস্তুটি আসলে কি? ধর্ম কি তাহা এক কথায় বলা সম্ভব নহে, সম্ভব নহে সহস্র কথাতেও। পরমসত্য বা ব্রহ্মের মতোই ধর্ম অনির্বাচ্য বস্তু। সেই কারণে উপনিষদে ধর্ম এবং সত্য বা ব্রহ্মকে সমার্থক বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, ধর্ম হইল জীবনের অমৃত, জীবনের মধু; ধর্ম জীবনের রস, জীবনের সার। তবে অনির্বাচ্য ব্রহ্মকে যেমন আমরা একটি বাক্যে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি—"তিনি পরম প্রেমস্বরূপ" বলিয়া, ধর্মকেও আমরা একটি বাক্যে এইভাবে সংজ্ঞিত করিতে পারি—"প্রেমেরই অপর নাম ধর্ম" অথবা "ধর্মের অপর নাম প্রেম"। বস্তুতঃ, সভ্যতা, সমাজ এবং মানুষ—সকল কিছুর জীবনীশক্তিই হইল প্রেম। প্রেমই পশুর সহিত মানুষের, দুর্বৃত্তের সহিত সাধুর, পাপীর সহিত সন্তের পার্থক্যের সূচক। ধর্ম আবহমানকাল ধরিয়া মানুষের অন্তরে কখনও সুপ্তভাবে কখনও ব্যক্তভাবে পরমপ্রেমকেই জাগ্রত রাখিয়াছে।

উপরের আলোচনায় আমরা বুঝিলাম যে, ধর্ম হইল প্রেম। এখন প্রশ্ন হইবে প্রেম কি? প্রেম হইল সেই বোধ বা সেই দৃষ্টি যাহাতে 'আমি-তুমি-সে' ভেদ থাকে না, 'আত্ম-পর' বুদ্ধি থাকে না। সকলের মধ্যে আমি, আমার মধ্যে সকলে। অন্যের সুখে আমার সুখ, অন্যের দুঃখে আমার দুঃখ। এই বোধ, এই উপলব্ধি, এই দৃষ্টির নাম প্রেম। "আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।"—সকলকে যিনি আত্মবৎ দেখেন তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা। উপনিষদ্, গীতা এবং ভারতীয় শাস্ত্রের ভাষায় ইহার নাম সমদর্শন বা একত্বদর্শন। আমি যে আমার নিকটজনকে ভালবাসি, তাহার দুঃখে দুঃখ অথবা সুখে সুখ অনুভব করি, উহা আসলে সেই পরম-প্রেমেরই স্ফুলিঙ্গ, পক্ষান্তরে প্রকৃত ধর্মের স্ফুলিঙ্গ। ঐ বোধ যত বিস্তৃত হইবে ততই যথার্থ ধর্মের বিকাশ ঘটিবে আমাদের জীবনে। ধর্মের লক্ষ্য হইল ঐ প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ। অন্যভাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, ধর্ম মানুষকে উদার হইতে শিক্ষা দেয়, সহিষ্ণু হইতে শিক্ষা দেয়, হিংসা-দ্বেষ-মুক্ত হইতে শিক্ষা দেয়, পরস্পরকে প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনে মিলিত হইতে শিক্ষা দেয়। সঙ্কীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা, ভেদ-বিবাদ কখনই ধর্মের বাণী হইতে পারে না। উহাদের সহিত ধর্মের নহে, অধর্মেরই সম্পর্ক। উহাদের প্রকাশ যেখানে হয়, সেইস্থান ধর্মের চূড়ান্ত বিপরীত আদর্শের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়ায়।

প্রশ্ন উঠিবে, আমি আমার নিকটজনকে ভাল-বাসিতে পারি, তাহার বা তাহাদের সুখ-দুঃখের সহভাগী হইতে পারি এই কারণে যে, সে বা তাহারা আমার সহিত রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত। কিন্তু নিকটজনের গণ্ডির বাহিরে সেই বোধ বা দৃষ্টি কিরূপে আসা সম্ভব? ইহার উত্তরে ধর্ম বলে যে, তুমি তোমার নিকটজনের সহিত রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত ঠিকই এবং সেইহেতু তুমি তোমার নিকটজনকে 'আত্মজন' ভাব, তাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী ভাব, তাহার সহিত একাত্মতা অনুভব কর। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও তো নিকট-সম্পর্ক তোমার স্থাপিত হয়, যেমন তোমার সহিত তোমার বন্ধুর, যাহাকে তুমি হয়তো প্রাণের চাহিতেও বেশি ভালবাস; তোমার স্ত্রীর অথবা স্বামীর সহিত তো তোমার রক্তের সম্পর্ক নাই, তথাপি স্ত্রীকে অথবা স্বামীকে কি তুমি তোমার রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়গণ অপেক্ষা কম ভালবাস? পরন্তু জগতে মধুরতম সম্পর্ক তো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই। কিভাবে ইহা সম্ভব হইল? ভারতের ঋষিগণ ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেনঃ "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।..."(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।৫, ৪।৫।৬)। পতির জন্যই যে পতি (পত্নীর) প্রিয় হন তাহা নহে, (পত্নী) নিজেকে ভালবাসে বলিয়াই পতি তাহার প্রিয় হন। পত্নীর জন্যই যে

পত্নী (পতির) আদরণীয়া হন তাহা নহে, (পতির) আত্মপ্রীতির জন্যই পত্নী পতির আদরণীয়া হন।

এই 'আত্মপ্রীতি' কেন? উহা এই কারণে যে, আমাদের সকলের মধ্যে সেই পরম প্রেমস্বরূপ পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। আমি আমাকে ভালবাসি অর্থাৎ আমি আমার হৃদিস্থিত সেই পরমাত্মাকে ভালবাসি। তিনিই জীবাত্মারূপে আমার মধ্যে, আমার স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে, আমার সকল আত্মীয়ের মধ্যে, আমার বন্ধুর মধ্যে, ভারতের ও ব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমি আমার স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে বা অন্য আত্মীয়-বন্ধুগণের মধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে আমাকেই, আমার বৃহত্তম আমিকেই দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি বলিয়াই এই আত্মপ্রীতি, এই পারস্পরিক আকর্ষণ, এই পারস্পরিক বন্ধন।

ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বর রহিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতপক্ষে সকলের অন্তরাত্মা। সুতরাং ধর্ম বলিতেছে, মূল-অর্থে তুমিই তো রহিয়াছ পৃথিবীর সকলের মধ্যে। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ, সকল প্রাণীর মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্ক রহিয়াছে। তাহা হইলে আমি তো কাহারও সহিত বিবাদ করিতে পারি না, কাহাকেও ঘৃণা বা দ্বেষ-হিংসা করিতে পারি না, কাহাকেও আঘাত করিতে পারি না।

এই তত্ত্ব হইতে আর একটি তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধরূপেই আসে। তাহা হইল, মানুষ বা জীব মাত্রই স্বরূপতঃ ঈশ্বর। প্রতিটি মানুষের মধ্যে, প্রতিটি জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর স্ফুলিঙ্গরূপে রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধর্ম কখনও বলিতেছে 'সত্য', কখনও বলিতেছে 'শক্তি'। ধর্ম বলিতেছে, জীবনের চরিতার্থতা হইল ঐ অন্তর্নিহিত ঈশ্বরকে বা সত্যকে বা শক্তিকে, যাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত নহি, প্রকাশ করা। ধর্মের মূল বক্তব্য হইল ঐ উন্মোচন বা আবিষ্কার বা বিকাশ। ঐ উন্মোচন বা আবিষ্কার বা বিকাশই হইল ধর্ম। এক বা একাধিক উন্নত মানুষ বৃহত্তর গোষ্ঠী-মানুষের প্রয়োজনে ধর্মমতগুলির প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মকে কেহ প্রবর্তন করেন নাই। ধর্মের সহিত 'যুগ-প্রয়োজন'-এরও কোন সম্পর্ক নাই। জগতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব-লগ্ন হইতেই ধর্ম মানুষের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে, বিকশিত হইতে শুরু করিয়াছে। উহার প্রয়োজনীয়তা কোন বিশেষ কালের জন্য বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য বা বিশেষ ভূমি বা দেশের জন্য নহে। উহার আবেদন সর্বকালীন, সর্বজনীন এবং সার্বভৌমিক। ধর্ম মানুষের সহজাত। ধর্ম মানুষের প্রকৃতিতে, মানুষের স্বভাবেই নিহিত। যাহাকে পূর্বে ঈশ্বর, সত্য বা শক্তি বলা হইয়াছে, উহাকেই আবার বলা হয় দিব্যত্ব বা দেবত্ব। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যত্ব বা দেবত্বকে স্বীকার করে এবং স্বীকার করে যে, পৃথিবীর মালিন্যের স্পর্শদোষে সহজাত দিব্যত্ব বা দেবত্ব হইতে মানুষের বিচ্যুতি ঘটে। দিব্যত্ব বা দেবত্বই ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপ। ধর্মমতগুলিতে উপাসনালয়, শাস্ত্র, প্রার্থনা, ব্রত, উপবাস, সন্তসঙ্গ, তীর্থ-পরিক্রমা প্রভৃতির উদ্ভব ক্রমে ক্রমে হইয়াছে ঐ বিচ্যুতিকে রোধ করিবার মাধ্যম বা উপায় হিসাবে। ঐগুলি আর কিছুই নহে, বাহির হইতে মানুষকে অন্তরের দিকে লইয়া যাইবার প্রয়াসমাত্র এবং ঐগুলির আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। তবে উহারা নিতান্তই ধর্মের বহিরঙ্গ। কোন কোন ক্ষেত্রে উহারা ব্যক্তিবিশেষকে ধর্মজীবনে সত্যই আগাইয়া দেয়, তবে বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, উহারা মানুষের মঙ্গল অপেক্ষা অনিষ্টই করে অধিক। ধর্মমতগুলিতে যে সঙ্কীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ-বিবাদ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও উপেক্ষা আমরা দেখিয়া থাকি তাহার জন্য প্রধানতঃ ধর্মমতগুলির স্বার্থান্বেষী নেতারাই দায়ী। দেখা যায় যে, উহাদের জন্য ধর্মমতগুলি ক্রমেই অধিকতর সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং এক ধর্মমত বা ধর্মসম্প্রদায় অপর ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দেয়। দুঃখের বিষয়, সাধারণের নিকট ধর্মমতই হইয়া দাঁড়ায় ধর্ম এবং ধর্মমতে মত হইয়া যায় প্রধান, ধর্ম চলিয়া যায় দূরে—অন্তরালে। ভেদ-বিবাদের চির-অবসান ধর্মের লক্ষ্য, কিন্তু ধর্মমতগুলিতে দেখা যায় যে, ভেদ-বিবাদের চির-অবস্থান উহাদের ব্যাপকভাবে চিহ্নিত করিয়া দিতেছে।

এই পরিস্থিতিতে উপায় কি? উপায় ধর্মের মর্মকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা, ধর্মমতগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সমুচ্চয়ের সূত্রগুলিকে তুলিয়া ধরা। বলিতে দ্বিধা নাই যে, বেদান্তের মধ্যে ইহার সমাধান রহিয়াছে এবং সেই সমাধানের প্রণালী ও পদ্ধতি সাম্প্রতিককালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভারত ও পৃথিবীকে দিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের জীবন ও বাণীতে।

শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ গত ৩ অক্টোবর ১৯৯১ সন্ধ্যা ৬-৩২ মিনিটে মাদ্রাজ বি. এস. এস. হাসপাতালে মহাসমাধিতে লীন হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি হাইপোগ্লাইকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মাদ্রাজের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। ঐসময় থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পান এবং চিকিৎসকগণ তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেন। পুনরায় গত জুন মাসে তিনি তীব্র ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া এবং অন্যান্য উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে ২৭ জুন থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ঐসময় সর্বক্ষণ সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁর পরিচর্যা করেছেন এবং খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদের একটি দল তাঁর চিকিৎসা করেছেন। ঐসময় তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতিও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ৩১ আগস্ট তিনি তিনবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ৬ সেপ্টেম্বর তাঁকে মাদ্রাজ মঠের সন্নিকটে বি.এস.এস. হাসপাতালে করা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে ১১টায় তিনি কোমা অবস্থায় চলে যান। ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হলে তাঁকে 'ভেন্টিলেটর' ব্যবস্থায় রাখা হয়। অবশেষে ৩ অক্টোবর তিনি মহাসমাধিতে লীন হন। রাত ৮-৩০ মিনিটে তাঁর নশ্বর দেহ মাদ্রাজ মঠে আনা হয় এবং ৪ অক্টোবর দুপুর ১টায় বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে তার মরদেহ মাদ্রাজ মায়লাপুর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তের উপস্থিতিতে তাঁর পবিত্র দেহ চিতাগ্নিতে উৎসর্গ করা হয়।

শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজীর পূর্বনাম ছিল কে. পি. বালকৃষ্ণ মেনন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেরালার ওট্টাপালম-এ জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ (রাজা মহারাজ) এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজের) দর্শন লাভ করেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট দীক্ষালাভ করেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে এম. এ. পাস করার পর তিনি ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোম-এ যোগদান করেন। গুরুর নিকট ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর নাম হয় পূর্ণচৈতন্য। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'বেদান্ত কেশরী'-র সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের প্রধান নিযুক্ত হন। দীর্ঘ তিন দশক তিনি ঐ আশ্রমের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর সময়েই সেই আশ্রমের ক্ষুদ্র ডিসপেনসারিটি বড় হাসপাতালে পরিণত হয়। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকে তাঁর মহাসমাধি পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ হন।

স্বামী তপস্যানন্দজী ছিলেন প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি বহু সংস্কৃত শাস্ত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। চার খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজী অনুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। এছাড়া তাঁর গীতা, অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদও বিদগ্ধ মহলে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর রচিত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ইংরেজী জীবনীতে তাঁর অনুভূতি, প্রজ্ঞা ও মনস্বিতার স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর রচিত 'ভক্তি স্কুলস অব বেদান্ত' অত্যন্ত সমাদৃত একটি গ্রন্থ। এর মধ্যে তিনি রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, চৈতন্য এবং বল্লভের দার্শনিক মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এটিই তাঁর শেষ বৃহৎ গ্রন্থ।

শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ এক প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাধনোচিত জীবন, আত্ম-শৃঙ্খলা, ত্যাগ-বৈরাগ্য, সেবা, ভক্তি ও নিষ্ঠার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণে ভক্তগণ হারিয়েছেন এক স্নেহময় দরদী আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শককে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মঠ
১ কার্তিক
১৮।১০।১৯০২

প্রিয় কালীকৃষ্ণ[১],

তোমার প্রীতিপূর্ণ ৺বিজয়ার পত্র পাইয়াছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার ৺বিজয়ার কোলাকুলি ও ভালবাসাদি জানিবে এবং আশ্রমের সকলকে জানাইবে। আমি আসিয়া অবধি বড় কাহাকেও পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। শরীর মন নিতান্ত অবসন্ন ছিল। সম্প্রতি শারীরিক একটু ভাল, কিন্তু মস্তিষ্ক এখনও অতিশয় দুর্বল। শীঘ্রই স্থান পরিবর্তন করিব, বৃন্দাবন অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা আছে। তুমি সাধন-ভজনে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছ জানিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি প্রভু তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। স্বামীজীর ভৌতিক শরীর গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মহাশক্তি জগতে জাজ্বল্যমান—উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া কার্য করিবে। তুমি তাঁহার আশীর্বাদ পাইয়াছ, তোমার কল্যাণ হইবেই। তাঁহার কার্যে সহকারী হইবার বাসনা কর—ইহাপেক্ষা অধিকতর সদুদ্দেশ্য এজীবনে আর কি হইতে পারে? তুমি সাধ্যমত সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ এবং সকলেই তোমার উপর সন্তুষ্ট। অতএব সিদ্ধিতে সন্দিহান হইও না। স্থির বিশ্বাসে ভজন কর। তিনিই সকল সাহায্য করিবেন এবং কি কর্তব্য জানাইয়া দিবেন। প্রার্থনা করি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক। অধিক আর কি লিখিব।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীবৃন্দাবন
৫ জুলাই, ১৯০৩

প্রিয় কালীকৃষ্ণ,

তোমার ৩০শে জুন তারিখের পত্র পাইয়াছি। তুমি এখনও সেই অসুখে কষ্ট পাইতেছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। বায়ু পরিবর্তন করিতে হইলে বৃন্দাবন এখন তত ভাল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ চাতুর্মাস্যে বৃন্দাবন বিশেষ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। যদি কবিরাজি চিকিৎসা করানো তোমার সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে আমার বোধহয় তোমার পক্ষে কলিকাতায় স্থান পরিবর্তনই সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে। কলিকাতার স্বাস্থ্য খুব ভাল। তুমি কি মঠে তোমার অসুখের বিষয় লিখিয়াছ? রাখাল মহারাজ[২] অথবা শরৎ মহারাজের[৩] সহিত পরামর্শ করিলে এবিষয়ে সদ্যুক্তি পাইতে পারিবে। যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে, এবিষয়ে আমি আর কি বলিব। বৃন্দাবনে থাকিতে হইলে পারশ খাইয়া অসুখ সারা চলে না।

১ স্বামী বিরজানন্দ ২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৩ স্বামী সারদানন্দের

দীর্ঘকাল পারশ খাইলে সুস্থ শরীরও রুগ্ন হইয়া পড়ে, সকলে এইরূপ বলিয়া থাকে। আমার শরীর এখন অনেক ভাল আছে। তবে এখনও সম্পূর্ণ সবল হইতে পারি নাই। আমার নিজের এখানে থাকিবার কোন স্থিরতা নাই। রাখাল মহারাজ শীঘ্রই পশ্চিমাঞ্চলে আসিতেছেন। আমার সহিত এখানে দেখা করিবেন লিখিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমার অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা আছে। এখনও স্থানের নিশ্চয় হয় নাই। অনেকদিন একস্থানে হইয়া গেল, আর বড় ভাল লাগিতেছে না। প্রভুর মনে যা আছে হইবে। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে এবং আর সকলকে ভালবাসাদি জানাইবে।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
তুরীয়ানন্দ

পুনশ্চ : কৃষ্ণলাল[৪] ভাল আছে ও তোমাদের সকলকে নমস্কারাদি জানাইতেছে।

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীবৃন্দাবন
১৬ জুলাই, ১৯০৩

প্রিয় কালীকৃষ্ণ,

তোমার ৯ই জুলাই-এর আর একখানি পত্র গত ১৩ই তারিখে পাইয়াছি। উত্তরে আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। রাখাল মহারাজ ৺কাশীতে আসিয়াছেন। গত পরশ্ব তাঁহার পত্র পাইয়াছি। [তিনি] লিখিয়াছেন ১৫/১৬ দিনের মধ্যে এখানে আসিবেন। তাঁহার আসিবার পর অল্পদিনই এখানে থাকিয়া আমি অন্য স্থানে যাইবার সংকল্প করিয়াছি। কোথায় যাইব এখনও নিশ্চয় করি নাই। পর্বতবাস বর্ষাকালে তত ভাল নয় শুনিয়াছি। যাহা হউক স্বরূপ[৫] প্রভৃতি সকলকে আমার ধন্যবাদাদি দিবে এবং মিসেস সেভিয়ারকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবে। আমি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। তিনি এলাহাবাদে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আমন্ত্রণ করিলে আমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত আছি। তাঁহাকে আমার সাদর সম্ভাষণাদি দিবে। আমার শরীর সেইরূপই আছে। তুমি যেমন ভাল বুঝিবে করিবে, আমার আর কিছু বলিবার নাই জানিবে। ইচ্ছা করিলে আমাকে তোমার প্রশ্নাদি করিতে পার। যথাযথ উত্তরদানে সাধ্যমত ত্রুটি হইবে না, কিন্তু তোমার প্রশ্নাদি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে নিবেদন করাই তোমার ইহ ও পর উভয়েরই কল্যাণকর হইবে এবং তাঁহার নিকট হইতেই চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে, এই আমার বিশ্বাস। কারণ, তিনি তোমার ইষ্ট ও স্নেহময়ী জননী। অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। সকলকে আমার ভালবাসাদি দিবে এবং তুমি আমার ভালবাসাদি জানিবে।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

৪ স্বামী ধীরানন্দ   ৫ স্বামী স্বরূপানন্দ

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা ও মাদ্রাজে দুটি কেন্দ্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতা কেন্দ্র মূলকেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়েছিল। কলকাতা কেন্দ্রে প্রায় ৩০জন যুবক প্রশিক্ষণলাভ করছিল, কিন্তু একবছর আগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৪জন।৬৫ মূলকেন্দ্র কলকাতায় নবীন-প্রবীণ সকলে একত্রে বাস করতেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মুখ্যতঃ নির্দিষ্ট ছিল নবীনদের জন্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ "মঠের Rules & Regulations-এর ইংরেজী অনুবাদ বা বাঙলা কপি শশীকে পাঠাইবে এবং সেখানে যেন ঐ প্রকার কার্য হয়, তাহা লিখিবে।"৬৬

একদিকে স্বামীজী মানুষ গড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, অপরদিকে তাঁর গুরুভাইদের নতুন নতুন কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হতে বলছিলেন।৬৭ তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করে ২৪ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "যে প্রকার আমাদের কলিকাতার মঠ, ঐ নমুনায় প্রত্যেক জেলায় যখন এক-একটি মঠ হইবে, তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" তিনি নিজেও কেন্দ্র স্থাপনে তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, দেরাদুন ও আলমোড়ায় কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন।৬৮ অবশ্য ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে চেষ্টা করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ শহরে একটি কেন্দ্র দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন। রামনাদের রাজার মাসিক ১০০ টাকা অর্থসাহায্য মঠ পরিচালনায় খুবই সাহায্য করেছিল। মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য সমাপ্ত করে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহুলা গ্রামে একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে অনাথ শিশুদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২জন। বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতা মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তকেন্দ্র পরিচালনা করছিলেন। এই সবকটিই ছিল শাখাকেন্দ্র। প্রতি সপ্তাহে শাখাকেন্দ্রগুলিকে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন পাঠাতে হতো মূলকেন্দ্র কলকাতার মঠে এবং সেখান থেকে তার সারাংশ নিয়মিত পাঠানো হতো স্বামীজীকে।

এধরনের স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও আর্ত ও পীড়িত মানুষের সেবাপূজার জন্য মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা ইত্যাদিতে উৎপীড়িত অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে এঁরা দাঁড়াতেন, তাদের যথাসাধ্য সেবাযত্ন করতেন। নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানে মঠ স্থানান্তরের পূর্বেই স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য করেছিলেন, স্বামী বিরজানন্দ দেওঘরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করেছিলেন, দক্ষিণেশ্বর গ্রামে বন্যাপীড়িতদের সেবা করেছিলেন স্বামী প্রকাশানন্দ এবং দিনাজপুরে বিরল গ্রামে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে সেবার কাজ করেছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্লেগরোগ ছড়িয়ে পড়েছে—এ-খবর শুনেই স্বামীজী দার্জিলিং থেকে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়। ৩মে কলকাতায় পৌঁছেই স্বামীজী প্লেগাতঙ্ক-গ্রস্ত কলকাতাবাসীদের সাহায্য করবার জন্য

৬৫ পত্রাবলী (স্বামী বিবেকানন্দ), ৪র্থ সং, পৃঃ ৫৪৩ ৬৬ ঐ, পৃঃ ৫৯২

৬৭ উদাহরণস্বরূপ স্বামীজীর ১১ জুলাই ১৮৯৭ তারিখের চিঠি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দকে লিখেছেন ঃ "ব্রহ্মানন্দকে বলো বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ করা যায়।"

৬৮ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৬৮

সেবাকার্য সংগঠন করলেন। কলকাতায় প্লেগাতঙ্ক সম্বন্ধে একটু ধারণা করা যেতে পারে ১ মে ১৮৯৮ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা শ্রীম-র পত্র থেকে। তিনি তাতে লিখেছেন: "By

ও হিন্দিতে প্রচারপত্রের খসড়া তৈরি করলেন। বাঙলায় প্রকাশিত হ্যান্ডবিলের একটি আমরা পেয়েছি। "মা ভৈঃ! ভয় নাই!! জয় জগদম্ব!!!" শীর্ষক হ্যান্ডবিল কলকাতাবাসীদের মধ্যে বিতরণ

মা ভৈঃ ! ভয় নাই !! জয় জগদম্ব !!!

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

কলিকাতা-নিবাসী ভাইসকল

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্লেগের সময় স্বামীজীর নির্দেশে বিতরিত হ্যান্ডবিলের ফটোকপি।

the evening of yesterday I think about half of our township had left panic-stricken." ৩ মে সন্ধ্যার প্রশ্নোত্তরের ক্লাসের পরিবর্তে স্বামীজীর নির্দেশে মঠবাসিগণ বাঙলা

করা হলো। স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে রাস্তা ও বস্তি পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ হলো। রোগীদের পৃথক করে রাখবার জন্য শিবির তৈরি হলো। ইতস্ততঃ অল্প কয়েকজন রোগী ভিন্ন প্লেগের

আর বিস্তার না হওয়ায় সেবাকাজ কয়েকদিন পর বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এধরনের সংগঠিত সেবাকাজ ছাড়াও, যখনই প্রয়োজন হয়েছে মঠবাসিগণ মানুষের বিপদে সাড়া দিয়েছেন। একটা ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাক। ২৬ মে, ১৮৯৮ তারিখে বৃষ্টি ও ঝড় গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। মঠের নতুন জমিতে ছোট-বড় কয়েকটি গাছ উপড়ে পড়েছিল। মঠের কাছেই গঙ্গাতে মালবোঝাই সাতটি নৌকার ভরাডুবি হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে কোন প্রাণহানি ঘটেনি। মঠবাসিগণ বিপদগ্রস্ত মাঝিদের চাল, ডাল, তেল, নুন ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেন।

আর্ত-পীড়িতদের শুধুমাত্র অন্ন বা ভেষজ দান করেই সেবাকাজ শেষ করতে চাননি স্বামীজী। তিনি চেয়েছিলেন, সেবিতগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। চেয়েছিলেন তাদের আত্ম-নির্ভরতা শেখাতে তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন "আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের জন্য শিক্ষার বিস্তার। আমি সে-সম্বন্ধে তো কোন কথা শুনছি না—কেবল শুনছি এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।... মনে হচ্ছে, এ-পর্যন্ত ঐ কার্যে ফল কিছু হয়নি; কারণ তারা এখন পর্যন্ত স্থানীয় লোকের মধ্যে তেমন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারেননি, যাতে তারা দেশের লোকের শিক্ষার জন্য সভাসমিতি স্থাপন করতে পারে এবং ঐ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক না থাকে এবং এইভাবে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।"[৬৯]

আজকের দিনে অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, তদানীন্তন সমাজের ছোট-বড় অনেকেই সন্ন্যাসী-দের সেবাকর্মকে সুনজরে দেখেনি। গৃহী ভক্তদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠেছিল। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন। কাশীর পণ্ডিত ও ধনী ব্যক্তি প্রমদাদাস মিত্রের আপত্তি খণ্ডন করে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তাঁকে ২৪ জানুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে লিখেছিলেন ঃ "দুর্ভিক্ষ-পীড়িত-গণ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে শুনিয়া এবং গৃহস্থ মহাশয়গণ নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম—মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগকে অন্নদান করিতেছেন না দেখিয়াই ধ্যানধারণাদি কার্য কিয়ৎকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া উক্ত কার্যে গিয়াছিলাম। যাঁহারা ঈশ্বরকে ডাকেন তাঁহারা দয়াশীল হন। যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং একটি লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে দেখিয়াও যদি নিশ্চিতভাবে নিজের উদর পূর্ণ করিতে রত থাকেন, তিনি যে কিপ্রকার ব্যক্তি তাহা বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ হস্তদ্বারা অন্য কার্য করিলে মনের দ্বারা কি ঈশ্বরকে আরাধনা করা যায় না? নিশ্চয়ই যায় (অনেকের পক্ষে)।" এ-প্রসঙ্গে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা স্বামী অখণ্ডানন্দের চিঠিগুলি অধিকতর মর্মস্পর্শী। একটির অংশ-মাত্র এখানে উদ্ধৃত করছি। ১০ জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন ঃ "দেশের বড় বড় গৃহস্থেরা যে পাষাণ দিয়া বুক বাঁধাইয়াছেন! তাঁহাদের হৃদয় এমন বজ্রোপম কঠিন উপাদান-নির্মিত বর্ম দ্বারা আবৃত যে, আর্তের সকাতর ক্রন্দনধ্বনিও সে-কানে প্রবেশ করিতে পায় না। আর শুষ্ক শাস্ত্রীয় কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু কেবল গিরিশৃঙ্গে বা নানা মন্দিরেই বসিয়া নাই। আমার প্রভু, আমার আত্মা সর্বজীবে। সেই সর্ব-জীবরূপী ভগবানকে আমি মুহুর্মুহু বলিতে শুনিতেছি, 'ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষেই রামকৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি অভাবনীয় অবস্থা দেখছিসনি?' একথা যে শোনে তার কি আর স্থির থাকিবার যো আছে! এই মানুষ ভগবানের সেবায় জীবন তো দিয়াইছি, আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না।" কিন্তু এসকল কথায় গোঁড়াদের মধ্যে অবিলম্বে কোন পরিবর্তন ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। তবে নিন্দা, কটুকাটব্য ইত্যাদির ধার অবশ্য কমে গিয়েছিল।

৬৯ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৯

॥ ৯ ॥

গঙ্গার ধারে নিজস্ব জমিতে নিজস্ব বাড়িতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং মঠের স্থায়ী সংস্থাপনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দীর্ঘকাল ধরে দুশ্চিন্তা বহন করে চলেছিলেন। বারংবার চিঠি-পত্রে তিনি লিখে চলেছিলেনঃ "কলিকাতায় একটা মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই।" ৩০ নভেম্বর ১৮৯৭ তারিখে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেনঃ "মিস মুলার যে টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার কতক কলিকাতায় হাজির। বাকি পরে আসিবে শীঘ্রই। ...তুমি নিজে ও হরি পাটনায় সেই লোকটিকে ধর গিয়া—যেমন করে পার influence কর; আর জমিটা যদি ন্যায্য দাম হয় তো কিনে লও। নইলে অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ।" জমির ব্যবস্থা হয়। মঠের বাড়িঘর নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য স্বামীজী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমরা লক্ষ্য করি, স্বামীজী ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে নীলাম্বর মুখাজীর বাগানবাড়ি থেকে লিখেছেনঃ "আমি যা কিছু সময় পাই, তার সবটাই নতুন মঠ ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যে নিয়োজিত হচ্ছে।" চিকিৎসক ও গুরুভ্রাতাদের পরামর্শে স্বামীজী যান দার্জিলিং-এ। নতুন মঠের জমি ও বাড়ি তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এবং স্বামী অদ্বৈতানন্দ। আম, নারকেল, তাল, কলা ও কচুগাছের জঙ্গলে ভর্তি জমিখন্ড। তার উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল একতলার জীর্ণ একটি পাকাবাড়ি। তার উত্তরাংশে দুটি ঘর ও দক্ষিণাংশে একটি ঘর এবং দুটি অংশকে সংযুক্ত করেছিল একটি লম্বা ঘর। তার পূর্বে বারান্ডা উত্তরে-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। এই বাড়ির উত্তর-পশ্চিমাংশে ছিল কর্মীদের বসবাসের জন্য একটি ছোট বাড়ি। খানাখন্দে ভরা এবড়ো-খেবড়ো জমিকে সমান ও ব্যবহারযোগ্য করতে ব্যয় হয় প্রায় চারহাজার টাকা। চারটি তালগাছ কেটে ফেলতে হয়েছিল। স্বামী অদ্বৈতানন্দ জমির একাংশে তরিতরকারির চাষবাস আরম্ভ করেছিলেন। আড়িয়াদহের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর পি. সি. ব্যানাজীর পরামর্শ নিয়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একতলা বাড়িটির সংস্কার আরম্ভ করেন এবং আর একটি তল তাতে সংযুক্ত করেন। এই বাড়িটির পিছনে তিনি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। দোতলায় ঠাকুরঘর, ধ্যানঘর ইত্যাদি এবং একতলায় রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ইত্যাদি স্থান পায়। দ্বিতীয় বাড়িটির ভিত খোঁড়া হয়েছিল ১৩ জুন ১৮৯৮। সেপ্টেম্বর মাসে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া ও শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে কোটালের বান বাড়ি তৈরির কাজে প্রবল অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। গোলাম রসুল লেবার কনট্রাক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন। জমি ও গৃহনির্মাণের সামগ্রিক দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের। তিনি প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা একাজে ব্যয় করতেন।[৭০] বিজ্ঞানানন্দজীর (তখনো তিনি হরিপ্রসন্নবাবু) অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিভিন্ন ব্যক্তির সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মাণকাজ শেষ হয়। মঠ নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় ২ জানুয়ারি ১৮৯৯।

বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে স্বামীজীর অনুমতি নিয়ে ওলি বুল ও জোসেফিন ম্যাকলাউড জীর্ণ একতলা বাড়িটি রং করে, আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন। এই দুই আমেরিকান মহিলা এবং তাঁদের অতিথি হিসাবে আয়ারল্যান্ডের মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল (পরে ভগিনী নিবেদিতা) এ-বাড়িতে বাস করেছিলেন প্রায় দু-মাস। এই বাড়িখানি সম্বন্ধে স্বামীজী মন্তব্য করেছিলেনঃ "ধীরামাতার ক্ষুদ্র বাড়িখানি তোমার স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে; কারণ, ইহার আগাগোড়া সবটাই ভালবাসা-মাখা।"[৭১] বাড়িখানির ভিতরে ছিল পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও অবাধ মেলা-মেশা, আর বাইরে ছিল একদিকে গঙ্গা ও সবুজ ঘাস, অপরদিকে ছিল ছোট-বড় গাছের মেলা।

এই অনুকূল পরিবেশে স্বামীজী তাঁর এই তিন বিদেশিনী শিষ্যার শিক্ষাদান শুরু করেন। ভারত-পরিচয় দিয়ে শিক্ষা শুরু হয়। ৩০ মার্চ দার্জিলিং যাত্রার পূর্বে প্রতিদিন সকালে স্বামীজী এই কুটিয়াতে কয়েক ঘণ্টা কাটাতেন।. আমগাছের তলায় চেয়ারে বসে স্বামীজী চা পান করতেন। কোন কোন দিন

৭০ স্বামীজী লিখেছেনঃ "রাখাল নূতন জমি-বাড়ি লইয়া আছে।" (পত্রাবলী, পৃঃ ৬২৫)

৭১ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৫

বিকালেও আসতেন। আলোচনার আসর বসত গঙ্গার ধারে। অন্যতম ও প্রধান শিক্ষার্থিনী ভগিনী নিবেদিতা সেসময়কার স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন ঃ "স্বয়ং স্বামীজী তথায় আসিতেন, উমা-মহেশ্বরের ও রাধাকৃষ্ণের গল্প বলিতেন, কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃত্তি করিতেন। বেশির ভাগ তিনি আজ একটি, কাল একটি—এইরূপ করিয়া ভারতীয় ধর্মগুলিই আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন।...কিন্তু তিনি কেবল যে ধর্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন, তাহা নহে। কখনও ইতিহাস, কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতি-বিভাগ ও লোকাচারের বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি—এসকলেরও আলোচনা হইত। বাস্তবিক তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মনে হইত, যেন ভারতমাতা শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-স্বরূপ হইয়া তাঁহার মুখাবলম্বনে স্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন।... আলোচনার বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহা সর্বদাই পরিণামে অদ্বয় অনন্তের কথায় পর্যবসিত হইত।"[৭২] যত অবান্তর প্রশ্নই হোক না কেন স্বামীজী ধৈর্য ধরে শিক্ষার্থিনীদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

এঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে যোগ্য বিবেচনা করে স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। তাঁর নতুন নাম দেন 'নিবেদিতা'। ২৫ মার্চ ১৮৯৮ তারিখে নীলাম্বর-ভবনের ঠাকুরঘরে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান হয়। তারপর তিন বিদেশিনী মহিলা ও স্বামীজী মঠবাড়ির দোতলায় যান। স্বামীজী গায়ে ভস্ম মেখে কানে হাড়ের কুণ্ডল ও মাথায় জটা ধারণ করে শিবযোগী সাজেন এবং তানপুরা সহযোগে ঘণ্টাখানেক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যে সেই চেহারা দেখে এবং সেই সঙ্গীত শোনে, সে-ই নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে করে। ঠিক এক বছর পরে স্বামীজী নিবেদিতাকে 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী' বলে ঘোষণা করেন। ঠাকুরঘরে বসে স্বামীজী তাঁকে পুজো করতে শেখান। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন ঃ "গোঁড়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণীরই মতো হবে তোমার সম্পূর্ণ জীবনধারা—বাইরে ও ভিতরে।"[৭৩]

ডাক্তারদের পরামর্শে স্বামীজী দার্জিলিং চলে গেলে মঠের অতিথি এই তিন বিদেশী মহিলাকে যথাসাধ্য দেখাশোনা করতে থাকেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ। অতিথিগণ কখনো মঠের হলঘরে (নাটমন্দিররূপে ব্যবহৃত) ধ্যান করতেন, কখনো বা সান্ধ্য প্রশ্নোত্তর ক্লাসে যোগদান করতেন। তাঁরা ভারতীয় মঠজীবনের ভাবধারাটি জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেন। অপরপক্ষে মঠবাসিগণ তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

॥ ১০ ॥

নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে থাকাকালীন সাড়ে দশমাসের মঠজীবন ঘটনাবহুল। কোন ঘটনা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কোন ঘটনা মঠজীবনে অভিনব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, কোন ঘটনা গুরুগম্ভীর ভাবোদ্দীপক, আবার কোনও ঘটনা রসালো এবং স্মরণযোগ্য।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করছিলেন বটে, কিন্তু ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে পালিত এই জন্মোৎসব নানা কারণেই অনন্য এবং স্মরণযোগ্য। মঙ্গলবার, ২২ ফেব্রুয়ারি (১১ ফাল্গুন, ১৩০৪) শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে। মঠ তখন সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে ভরাট। স্বামীজী মঠ আলো করে অবস্থান করছিলেন। তিথি-পুজোর দিন হাজির হয়েছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ।

তিনদিন পূর্বে পড়েছিল শিবরাত্রি। যথারীতি চারপ্রহরে পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর বিশেষ এই যে, ঐদিন বিকালে স্বামীজীর সভাপতিত্বে সাধু-ব্রহ্মচারীদের একটি ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ পাঁচজন প্রবীণদের প্রত্যেকের উদ্দেশে লিখিত ইংরেজী অভিনন্দন-পত্র পড়ে শুনিয়েছিলেন। তারপর স্বামীজীর নির্দেশে তাঁদের প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে অভিনন্দনের সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। সভাপতির ভাষণে স্বামীজী ভাবী কার্যধারা এবং তাকে সফল করবার জন্য মঠবাসিগণের ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধরূপে কি করতে হবে সে-সম্বন্ধে একটি প্রেরণাপ্রদ ভাষণ দিয়েছিলেন।

ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া। নীলাকাশের চন্দ্রাতপের নিচে সূর্যের কিরণ, পুষ্পগন্ধবাহী বাতাস উৎসবের

৭২ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৫-২৬৬

৭৩ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 93

আবহ রচনা করেছিল। অন্যান্য বছরের তুলনায় সেবার শীত ছিল একটু বেশিই। নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল দেড়শোর মতো সাধু ও গৃহীভক্ত। সকলে আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। উৎসবানুষ্ঠানের একটি ছোট ও মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর একটি চিঠিতে। প্রাপক মাদ্রাজের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনি লিখেছেন: "তিথিপূজার দিন সুশীল পূজা ও সুধীর তন্ত্রধারকের কাজ করিয়াছিল। ঐদিন শতাধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ একটি সুন্দর আরতির গান রচনা করিয়াছে।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥

"সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুণ্ডল, গাত্রে বিভূতি ধারণ করায় এক অপূর্ব শোভা হইয়াছিল। আমরা অনেকেই ঐরূপ সাজিয়াছিলাম। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত পূজা হোমাদি হইয়াছিল। ঐদিন গঙ্গা ও সুরেন মহুলা হইতে এক মণ ওজনের দুই ছানাবড়া[৭৪] লইয়া হাজির। স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম কি?' এসম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছে। তোমায় একখানি পাঠাইব।"

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর রচনা থেকে জানা যায় যে, স্বামীজী স্বয়ং সকালবেলা সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছিলেন। স্বামীজীর আদেশে সমাগত চল্লিশ-পঞ্চাশজন অব্রাহ্মণ ভক্তের উপনয়ন সংস্কার করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।[৭৫] মঠে হুলুস্থুল পড়ে গেছিল। নাটমন্দিরে সঙ্গীতের আসর বসেছিল। মঠের সন্ন্যাসীরা স্বামীজীকে মনের সাধে যোগী সাজালেন। "কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বামহস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা" প্রভৃতি দিয়ে সাজানো স্বামীজীকে মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ শিব। মুক্ত পদ্মাসনে বসে অর্ধনিমীলিতনেত্র স্বামীজী 'কূজন্তং রামরামেতি' ইত্যাদি স্তবটি পাঠ করেন, এবং তারপর 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' একথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে থাকেন। স্বামীজীর মধুর কণ্ঠের রামনামে আকাশ-বাতাস মধুময় হয়ে ওঠে। আধঘণ্টার বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়। অতঃপর স্বামীজী যেন নেশার ঘোরে গাইতে থাকেন 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই'। স্বামী সারদানন্দ গাইলেন 'একরূপ-অরূপ-নাম-বরণ'। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল গান গাইতেন, তাদের কয়েকটি গাওয়া হলো। স্বামীজীর মনের ভাব পরিবর্তিত হয়। তিনি সহসা নিজের বেশভূষা খুলে গিরিশবাবুকে সাদরে সাজান। স্বামীজী বলেন: "পরমহংসদেব বলতেন, ইনি ভৈরবের অবতার। আমাদের সঙ্গে এঁর কোন প্রভেদ নেই।" ঠাকুরের কথা বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে গিরিশচন্দ্র চুপ করে বসে থাকেন। অবশেষে তিনি ঠাকুরের অপার দয়ার কথা বলতে বলতে ভাবাবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

স্বামীজী কয়েকটি হিন্দি গান পরিবেশন করেন। এদিকে প্রথম পূজান্তে ভক্তগণ জলযোগ করতে যান। ইতিমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ থেকে দুটি বড় ছানাবড়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করে স্বামীজী কর্মযোগের মাহাত্ম্য বলতে থাকেন। তিনি বলেন: "জ্ঞানভক্তি প্রভৃতির সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্মদ্বারা ঠিক তাই হয়।" আরও কিছু আলোচনার পর স্বামীজী তাঁর কিন্নরকণ্ঠে গিরিশচন্দ্রের রচিত 'দুঃখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছে আলো করে', 'মজল আমার মন ভ্রমরা' ইত্যাদি কয়েকটি গান পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, স্বামীজী ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে[৭৬] 'ওঁ হ্রীং ঋতং' স্তবটি রচনা করেছিলেন। এই সুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তবটি পরে সন্ধ্যারতির পর প্রতিদিন গীত হতে থাকে। [ক্রমশঃ]

৭৪ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা স্বামী অখণ্ডানন্দের চিঠি থেকে জানা যায় যে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করার জন্য বহরমপুরের জনৈক জমিদার দুটি বড় ছানাবড়া তৈরি করেছিলেন। রসসমেত দুটির ওজন ছিল এক মণ চোদ্দ সের।
৭৫ শ্রীম-র ডায়েরী সূত্রে প্রাপ্ত।
৭৬ দ্রঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১৮১, পাদটীকা।

কবিতা

দীক্ষা দাও

মৃদুল মুখোপাধ্যায়

আকাশে নক্ষত্রমালা
অমল জ্যোৎস্নায় ভেজা চাঁদ
ওপারে দক্ষিণেশ্বরী
এপারে অনন্ত মহাপ্রাণ
মাঝখানে বহমান গঙ্গার ধারায়
হৃদয়ের তুচ্ছতাকে বিসর্জন দিয়ে
এসেছি তোমার কাছে উদ্‌ভ্রান্ত সংসারী
ভাঙা নৌকোয় চড়ে
অন্ধকারে, কাদামাখা দেহে
তোমার পবিত্র স্পর্শে, গাঙ্গেয় হাওয়ায়
হৃদয় জুড়াব বলে আজ।

নদীর প্রবাহ চিনি, মমতা চিনি না
আকাশের বিশালতা, উদারতা নয়
জ্ঞান চিনি জাগতিক মায়ার বন্ধনে,
চিনি না 'বিজ্ঞান'—
অভিমান তুচ্ছ করে করজোড়ে আভূমি আনত
এসেছি তোমার কাছে ঃ
দাও চিত্তশুদ্ধি-মন্ত্র, অন্ধকারে দিশারী আলোক
তোমার মঙ্গলস্পর্শে খুলে দাও
আনন্দের সেই দিব্যলোক।

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ও কে?

'মাগো! দুটি ভিক্ষা পাব?
দুটি ভিক্ষা দেবে গো জননী?'
'এখন বসেছি জপে।
পারব না ভিক্ষে-টিক্ষে দিতে।'
'ছেলেকে উপোসী রেখে
মা কি পারে বসে থাকতে জপে?
কোথা গেলে মা জননী?
দুটি ভিক্ষা দিয়ে যাও মাগো!'
'জ্বালালে এ বুড়ো দেখছি।
রোজই আসে পুজোর সময়ে।
যত বলি পরে এস,
কিছুতে শোনে না কোন কথা।
লোলচর্ম বৃদ্ধ এক।
গালে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি।
দু-চোখ কোটরাগত।
হাতে এক ভিক্ষার ঝুলি।
জীর্ণ বস্ত্র, শীর্ণ দেহ।
হাত কাঁপে থর থর করে।
দেখলে মায়াই হয়, রাগ হয় চিৎকার শুনে।
কিছুতেই উঠব না, এই ভেবে বসে থাকি জপে।
মিথ্যে এই বসে থাকা।
চোখ বুজলে দেখি শুধু তাকে।
দুয়ারে চিৎকার চলে।
ধৈর্যের বাঁধ যায় ভেঙে।
জপ ছেড়ে উঠে পড়ি।
ছুটে যাই দুয়ারের দিকে।
অতিরিক্ত বেড়েছে সে।
আজ তাকে শিক্ষা দিতে হবে।
ক্রোধে অন্ধ! দরজা খুলে
শিক্ষা তাকে দিতে যাব যেই—
দেখি আমি, এ কী দেখি।
এ কী দেখি আমি!
কোথায় ভিখারী! এ যে গদাধর!
ভিক্ষুকের বেশে আছেন দাঁড়ায়ে!
দুয়ারে দাঁড়ায়ে তিনি, জীবে জীবে অধিষ্ঠান যাঁর-
ভিক্ষাপ্রার্থী ভিক্ষাপাত্র হাতে।'

কেউ কি পার?

দীপক বসু

ওগো, কেউ কি পার আমার বুকের অন্ধকারে
একটু আলো জেবলে দিতে
পৃথিবীতে এত আলো
তবু কেন আমার মনের প্রান্তরে
ধূ ধূ অন্ধকার।
চারদিকে খ্রীস্টমাসের কোলাহল, আনন্দ উচ্ছ্বাস
আর চড়ুইভাতির আয়োজন
আকাশের তারাগুলো ক্যাথিড্রাল চার্চের মাথায়
লাল নীল সবুজ নক্ষত্র হয়ে জবলছে স্বমহিমায়
সমস্ত রাত ধরে,
অথচ আমারই বুকের পৃথিবীটা
প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে ডুবে আছে;
ওগো, কেউ কি পার আমার বুকের অন্ধকারে
একটু আলো জেবলে দিতে?
আমি তাকে আমার বাকি জীবনের পরমায়ুটুকু
দিয়ে যাব।

জীবন

পামেলা মুখোপাধ্যায়

জীবন এক গভীর রহস্য;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাতের মধ্য দিয়ে,
সুখ দুঃখ ভাল-মন্দের
দোলায় দুলতে দুলতে,
জীবন এগিয়ে চলেছে
তার আপন পথে।
বিশাল নীল শূন্যতার তলে দাঁড়িয়ে,
জীবনের এই বিশাল ঢেউকে দেখে
আমি স্তব্ধ, বিস্ময়ে অভিভূত।
কী বিচিত্র সম্ভারে পূর্ণ
এই প্রাণের হাট,
এই ক্ষয়হীন বিরাট ঢেউয়ের মাঝে
ছোট্ট ভেলার মতো
অতি ক্ষুদ্র মানুষ তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
সুখ দুঃখ নিয়ে
ভেসে চলেছে—কোথায়!

কাকে যে কাছে টানি

হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী

সন্ত সন্ততি পিরিতি বিপরীত
কাকে যে কাছে টানি, ছাড়ি যে কাকে,
দুয়েতে ভালবাসা রয়েছে সন্নিহিত
সবুজ জীবনের প্রতিটি শাখে।

সন্ত সন্ততি রয়েছে পাশাপাশি
হিসাবে সীমাহীন সন্তত,
তাই তো সংসারে রয়েছে কাঁদা হাসি
মানুষ বাঁচে তাই অন্ততঃ।

সন্তরণ করি জীবন-পারাবার
সন্ত সন্ততি ছাড়িনি টান।
হিসাবে ভয় জাগে কেবলই হারাবার
করেছি তাই দুয়ে হৃদয় দান।

সূর্যের কাছে

বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্য, তুমি কি দিতে পার
আমাকে তোমার দেহের কিছু উত্তাপ?
তুমি কি মুছে দিতে পার, সূর্য!
এই ধরিত্রীর দুঃখ, গ্লানি, পাপ?

যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হলো অমাবস্যা রাতে
তাকে কি দেখাবে সূর্য! আলোকের মুখ?
যে-বৃদ্ধ অপেক্ষায় আছে আসন্ন মৃত্যুর—
তাকে কি দেবে তুমি উষ্ণ স্পর্শ, সুখ?

এই জমাট অন্ধকারে
চারিপাশে শুধু পাপ ঘোরাফেরা করে
গলিত স্খলিত দেখি মানুষের শব
এখনো কি কেউ পাঠ করে সূর্যের স্তব?

'জগদ্ধাত্রীমঙ্গল'

দেবেন্দ্রনাথ সেন

রবীন্দ্র-সমসাময়িককালে আবির্ভূত, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ও রবীন্দ্র-অনুরাগী কবি হয়েও কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) রবীন্দ্রানুসারী কবি ছিলেন না, ছিলেন স্বকীয়তায় দীপ্ত। 'নব্য রোমান্টিক'দের অগ্রণী, এক বিশিষ্ট কবিরূপে তিনি ছিলেন এক পৃথক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান কাব্য-পাঠকদের কাছে কবি দেবেন্দ্রনাথ প্রায় অপরিচিত। কবিকে আধুনিককালের কাব্যরসিকদের কাছে যথাযথ পরিচিত করার দায়িত্ব নিয়ে ডঃ বীরেনকুমার চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ) যে গবেষণা-কর্ম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্পাদন করেন, তা মুদ্রিত পুস্তকাকারে 'কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন : জীবন ও কাব্য' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের বর্তমানে দুর্লভ ও অপ্রকাশিত 'জগদ্ধাত্রীমঙ্গল, থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যপঙ্‌ক্তি আমাদের অনুরোধে বর্তমান সংখ্যার জন্য সঙ্কলন করে দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন 'হরিমঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', 'শ্যামামঙ্গল', 'রুদ্রমঙ্গল', 'গণেশমঙ্গল', জগদ্ধাত্রীমঙ্গল', 'কার্তিকমঙ্গল', প্রভৃতি কয়েকটি মঙ্গলকাব্য জাতীয় গ্রন্থ রচনা করে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ, 'শ্যামামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থটি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে উৎসর্গ করেছেন।—যুগ্ম সম্পাদক

আয় মা আয় মা, আরক্তবসনা,
বালার্কসদৃশ গাত্রি,
সিংহস্কন্ধারূঢ়া, চতুর্ভুজাদেবি,
আয় আয় জগদ্ধাত্রি!
নানা অলঙ্কারে, কি শোভন তনু!
কঙ্কণ-কিঙ্কিনী রোলে
কি মধুর ধ্বনি! মুগ্ধ শ্রোতৃহিয়া
দোলে আনন্দের দোলে!

যেই দিকে চাই, তোরই নাম রূপ
অয়ি ত্রিভুবনময়ি!
তুই ধৃতিরূপা, সারা জগতের
তুই মা বহিস ভার,
অচলস্বরূপা— বিশ্বে নাই নাই,
হেন ভাব চমৎকার!

বালকিরণের বরমাল্যকণ্ঠে,
হাসিরাশি চারিভিতে
ছড়াইয়া যেন, এসেছে প্রাচীতে,
হেমাঙ্গিনী উষাসতী!
এসেছ কেন গো শারদী পূর্ণিমা-
হয়ে আজি মূর্তিমতী!
তুই নিখিলের আধারস্বরূপা
আধেয়স্বরূপা তুই-ই—

অপূর্ব রহস্য! নখের দর্পণে
কোটি বিশ্ব পরকাশ—
ইচ্ছাময়ি, তোর ইচ্ছার পলকে
কোটি বিশ্ব হয়ে নাশ!
লো আনন্দময়ি, দরশনে তোর
ভক্তচিত্তে কি উল্লাস
ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টির বিক্ষেপে,
অভক্তের সব নাশ!

ওলো লীলাময়ি,   আছি হয়ে তুই
দংশিস দুষ্টের দেহে—
শিষ্টজন তরে   ভরা তোর বুক
কি মধুর মাতৃস্নেহে।

কাম ক্রোধ লোভ,   ক্রূর ও ভীষণ;
দেহের অসুরত্রয়,
হোক আজি বলি,   মা তোর সম্মুখে,
ঘুচুক ঘুচুক ভয়।
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা   হইবে আমার
বাসনা দানবী রক্ত
হুম্‌ শব্দে আজি   করিব মা পান—
লোহুপানে কি উন্মত্ত।

রাগ দ্বেষ,   দুই দুর্দান্ত অসুরে
তোর পদে দিলে বলি,
গালভরা হাসি,   জয়লক্ষ্মী আসি,
দিবে করে পুষ্পাঞ্জলি।
আকাশ হইতে হবে   পুষ্পবৃষ্টি
লাজবৃষ্টি, হুলুধ্বনি;
ত্রিভুবন মাঝে   পড়ে যাবে সাড়া—
আনন্দের রণরণি।

আজি কি আনন্দ!   আজি কি আনন্দ!
আজি জগদ্ধাত্রী-পূজা!
সিংহস্কন্ধারূঢ়া,   জয়শ্রীস্বরূপা
এসেছিস চতুর্ভুজা!
নাহি জানি মন্ত্র,   নাহি জানি তন্ত্র,
নাহি জানি স্তুতি তোর;
না জানি আহ্বান,   নাহি জানি ধ্যান,
আমি মা অজ্ঞান ঘোর।
নাহি জানি মুদ্রা,   আকুল ব্যাকুল,
নাহি জানি বিলপন—

এই জানি সার,   সর্বক্লেশহারী
তোর ওই শ্রীচরণ।

অধম সন্তান   আমিই মা তোর
তবু তাহে নাহি ডর।
কুপুত্র যদিও,   কুমাতা কখন
নাহি হয়, হে শঙ্করি!
আমি ত্যাজ্যপুত্র,   তবুও আমারে
কভু না করিবি ত্যাগ—
স্নেহময়ী মার
শতগুণ অনুরাগ।

ভূতেশ কপালী,   জগদীশ পদ
পেয়েছেন, বলিহারি!
সাধে কি মা তোর   ও রাঙা চরণ,
বক্ষে ধরে ত্রিপুরারি?
মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা,   নাহি মোর নাই,
বিভব-বাসনা নাই!
জনমে জনমে   মা গো মা আমার
তোর ও চরণ চাই।
জনমে জনমে   মা মা মা মা ডাকি;
হোক শুধু এই শিক্ষা—
শক্তিমন্ত্রে মোর   হউক মা দীক্ষা;
মাগি শুধু এই ভিক্ষা।
'শিব শিব শিব,   ভবানী ভবানী'—
এই মন্ত্র উচ্চারিয়া,
এ জনম মোর   কেটে যায় যেন।
ঝঙ্কারিয়া, ঝঙ্কারিয়া।
গুণ গুণ মন্ত্র   কমলের গর্ভে
ভৃঙ্গ যথা মহাসুখী;
ও পদকমলে   প্রমত্ত মধুপ,
আমিও গো শশিমুখি;
গুণ গুণ স্বরে,   মধুর মা নাম
ঝঙ্কারিয়া ঝঙ্কারিয়া,
কাটাইব দিন,   কাটাইব রাত্রি,
তনু-মন সমর্পিয়া।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

কুণ্ডলিনী জাগরণ

প্রশ্ন : কুণ্ডলিনী জাগরণ কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : কুণ্ডলিনী হচ্ছেন জীবের দুর্নিবার সংস্কার-শক্তির উর্ধ্বগামিনী দিক। উৎসাহে, সানন্দে, ব্যাকুলতায়, ভয়ে, ক্রোধে, লোভে, লিপ্সায় ও অভাবে—সংস্কার উত্তেজিত বা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তখন যে জৈবী ধাতু সর্বদেহে ছড়িয়ে আছে তা ঘোল থেকে মাখনের মতো ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এরই নাম কুণ্ডলিনী জাগরণ। কিন্তু মনে রাখবেন, এ হলো সংস্কারের উর্ধ্বদিক, আবার অধোদিকও আছে। তখন এই শক্তির বাহ্য বিকাশ হয় বিলাসে, অশ্রুতে, মিলনে, মূর্চ্ছাদিতে, রসাস্বাদনে আবার কখনো বা নিষ্ঠুরতায়। ঐ অদ্ভুত শক্তির, যার উর্ধ্বগতিতে সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, যদি দেহ ও মনের অধোদিকে গতি হয় তাহলে একটা জঘন্য অবসাদ নিয়ে আসে এবং শক্তিটিও নিবীর্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐসময় সংযম অবলম্বনে যদি চিত্তকে কোন বৌদ্ধ বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের গভীরতায় নিয়োগ করা যায় তখন ঐ শক্তি সুষুম্নামার্গে প্রবেশ করে। তখন সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর জগতের অনেক সু-খপর পাওয়া যায়। আদর্শ হিসাবে এই ভাবেই মানুষ শিল্পী, কবি, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কর্তা ও স্রষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু সব সাধকের মূল সাধনা হলো ভাবের বা জ্ঞানের উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, সংযম। (১১।৯।'৪৩)

কুণ্ডলিনী যোগ

প্রশ্ন : কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে বিশদ বলুন।

স্বামী বাসুদেবানন্দ : মূলাধার হলো 'স্যাকরাল প্লেকসাসে'র ভিতর একটি অতি সু-সূক্ষ্ম স্থান। জৈবী উত্তাপ যেখান থেকে বহির্দেহের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার থাকিছু বর্তমান জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষাদির ওপর লাভ হয়, সেগুলো অতীত হলেই তাদের সংস্কারগুলো ওজঃ ধাতুকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। সমস্ত দেহের এসেন্স হচ্ছে ওজঃ। এই ওজঃ আবার মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে থাকে। যার যত ওজঃ ধাতু বেশি সে তত বুদ্ধিতে ও আধ্যাত্মিকতায় দৃঢ়, তার ভাষা তত জোরাল ও মোহিনী। আমি পূর্বেই বলেছি যে, ভয়, ভালবাসা প্রভৃতি যেকোন উত্তেজনায় মূলাধার কেন্দ্র উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ঐ মস্তিষ্কস্থ ওজঃ সর্বসংস্কারের সহিত মূলাধারে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখান থেকে তার 'এক্সট্রো-ভারশান' অথবা 'ইন্ট্রোভারশান' উপস্থিত হয়। প্রথমটার মানে—যখন সংস্কার ঈড়া ও পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ 'গাঙ্গ্লিয়া' দিয়ে বাহ্যদেহে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে 'এ্যাফারেন্ট' ও 'এফারেন্ট' প্রবাহরূপে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়। আর দ্বিতীয়টার মানে হচ্ছে —যখন সংস্কার সুষুম্নামার্গ অবলম্বন করে অর্থাৎ চিন্তাপ্রবাহ অন্তর্মুখী হয়। সাধারণ শুক্র ও ওজঃতে ভেদ আছে। শুক্র যেন ঘোল আর ওজঃ হলো যেন তারও সারাংশ মাখন। শুক্র তরল, দেহ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে জাত হয়। দেহের ও জৈবী উত্তাপের বিবৃদ্ধির সঙ্গে কাম ও অপরাপর দৈহিক পরিবর্তন দেখা যায়। শারীরিক উত্তেজনাসকল সংযম করতে পারলেই শুক্র ওজঃ ধাতুতে পরিণত হয়। স্বামীজী তাঁর রাজযোগের বক্তৃতায় এসব ব্যাখ্যা করেছেন : মনুষ্য শক্তির সেই অংশটা, যাকে যৌন-শক্তি বলে, যেটা কাম-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়, সেটাকে যদি বাধিত ও সংযমিত করা যায়, তাহলে সেটা ওজঃ ধাতুতে পরিণত হয়। কেউ কেউ বলেন সংযম না করতে পারলেই যৌনশক্তি ... পিঙ্গলার মধ্যবর্তী বেদন (সেন্সরী) ও প্রতিক্রিয়াপর (মোটর) স্নায়ু দিয়ে বহির্মুখ হয়ে পড়ে। তখন শক্তি ক্ষয় হয়, ক্লান্তি ও অবসাদ আসে। ক্রোধ দমন করলেও শুক্র ওজঃ ধাতুতে পরিণত হবে। আর ক্রোধ যদি বেদন ও প্রতিক্রিয়া স্নায়ুর মাধ্যমে ভিতরে ও বাহিরে কাজ করে, তাহলেই শক্তিক্ষয়, অবসাদ প্রভৃতি আসবেই। এইরূপ কামাদিরও বুঝতে হবে। সেইজন্য তন্ত্রান্তরে পঞ্চ মকারের

সহিত তীব্র সংযম সহকারে জপাদিপূর্বক শুক্রকে ওজঃ ধাতুতে পরিণত করার কথা আছে। সেই ওজঃ সম্পন্ন মহাসংযমী সাধকগণ মহাবায়ুকে সুষুম্না-মার্গে আকর্ষণ করতে সমর্থ হন, অর্থাৎ তৎকালে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হলে ব্রহ্মবিদ্যা সংস্কাররূপা সরস্বতী কুণ্ডলিনী ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করেন। আরও সোজা করে বলি, মূলাধারপদ্মে ঐ ওজঃকে আশ্রয় করে যে বিদ্যা-সংস্কার কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে তারা ঐ সুষুম্নারূপ অতীন্দ্রিয় মার্গে প্রবেশ করে বিষয়বতী হয়। ফলে হয় কি, যেসব সংস্কারের কার্য আমরা বাহ্যজগতে সর্বদাই একটা আবরণ ও সন্দেহের ভিতর দিয়ে দেখছি, তখন আমরা তাদের উত্তরোত্তর অতি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ সাত্ত্বিক ভাবের ভিতর দিয়ে দেখতে পাব; যেমন তুলসীপাতা আমরা এই চোখে একরকম দেখছি, আর অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে দেখলে তার চাইতে আরও অনেক বেশি সৌন্দর্য ও তত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করি।

এপথে সত্যের অনুরাগই সাধকের শক্তি। সেই অনুরাগে যদি ব্রহ্মবিদ্যার গভীর অধ্যয়ন ও ধ্যান করা যায়, তাহলেই মূলাধারস্থ কুণ্ডলীকৃত বিদ্যা-সংস্কার-শক্তি জাগরিতা হয়ে ব্রহ্মধ্যানের সহিত ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করেন। স্বামীজী স্বপ্ন ও দিব্য-দর্শনের ভেদ এই ভাবে দেখাচ্ছেন—"যখন আমাদের জৈবী শক্তি প্রবোধিত হয়ে সুষুম্নার মধ্যবর্তী ব্রহ্মনাড়ী ত্যাগ করে তদন্তবর্তী অপর কোন বজ্রা চিত্রাদি স্নায়ুতন্তুতে প্রবেশ করে এবং ঐসকল ষট্‌কেন্দ্র থেকে প্রতিক্রিয়াশীল হয়, তখন যে একটা প্রত্যক্ষের মতো আন্তর অনুভূতি উপস্থিত হয় তাকে আমরা অভিনব স্বপ্ন বা কল্পনা বলি। কিন্তু যখন দীর্ঘ ও আন্তর ধ্যান শক্তি সহায়ে বিরাট বিশুদ্ধ সংস্কার-সমূহ, যা মূলাধারে স্তূপীকৃত হয়ে আছে, ঠিক ঠিক সুষুম্নার জ্ঞাননাড়ীকে আশ্রয় করে ষট্‌কেন্দ্রকে আঘাত করে, তখন যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় তা ঐসব অভিনব স্বপ্ন, চমৎকারিণী কল্পনা বা সঠিক ঐন্দ্রিক প্রত্যক্ষের প্রতিক্রিয়াপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। একেই অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বলে। অতীন্দ্রিয় শক্তিপ্রবাহ যখন সকল অনৈন্দ্রিকবেদনের রাজধানীতে উপস্থিত হয় তখন সর্ব-মস্তিষ্ক অর্থাৎ সহস্রার প্রতিক্রিয়াশীল হয়, যার ফল হলো পরিপূর্ণ জ্ঞানালোক অর্থাৎ আত্মদর্শন।" রাজযোগ বড় সূক্ষ্ম, বুদ্ধি কিছু দূর গিয়েই হোঁচট খেয়ে মরে।

(১১।১২।৪৫) [ক্রমশঃ]

রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য

আবেদন

আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বন্যাত্রাণকার্য শেষ হতে না হতেই এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়-ত্রাণ ও পুনর্বাসনকার্য অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ মিশন সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ব্যাপক বন্যাত্রাণকার্য শুরু করেছেন। মালদহের ভুতুনি ও মহারাজপুরে, পশ্চিম দিনাজপুরের বাহিন ও রাধিকাপুরে এবং মুর্শিদাবাদের রানীনগর ১নং ব্লকে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্রাদি, কম্বল, ঔষধ-পত্র এবং পানীয় জল শুদ্ধিকরণের বড়ি বিতরণ করা হচ্ছে। এই প্রাথমিক ত্রাণকার্য অন্ততঃ আরও কিছুদিন চালিয়ে যাওয়া অত্যাবশ্যক এবং তার জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন।

আমরা তাই সকলের কাছে অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। "রামকৃষ্ণ মিশন" নামাঙ্কিত একাউন্ট পেয়ী চেক/ড্রাফট্ বা মনি অর্ডার ত্রাণকার্যের জন্য উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করুন। ভারতীয় আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারানুযায়ী এই অনুদান আয়করমুক্ত।

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

স্বামী গহনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

জগদ্ধাত্রী-তত্ত্ব

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

শক্তিদেবতার বহুপ্রকার মূর্তির অন্যতম জগদ্ধাত্রী। তন্ত্রমতে জগতের মূল সত্তা আদ্যাশক্তি মহামায়া। এই আদ্যাশক্তি স্বরূপতঃ নিত্যা, নির্গুণা এবং নিরাকারা হলেও কখন কখন তিনি সগুণা, সাকারা হন, জগজ্জননীর, জীব-জগতের আকার ধারণ করেন। আবির্ভূতা হন বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে। তাঁর এই আবির্ভাব কখনো হয় 'দেবানাং কার্য-সিদ্ধ্যর্থম্'—দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য, আবার কখনো হয় 'সাধকানাং হিতার্থায়'—সাধকের হিতের জন্য, তাকে অনুগ্রহ করবার জন্য। 'অরূপা-রূপ-ধারিণী' এই আদ্যাশক্তির বহুপ্রকার রূপধারণের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্রে, কীর্তিত হয়েছে তাঁর লীলা-মাহাত্ম্য। ঐসকল গ্রন্থে আদ্যাশক্তির যেসব রূপের কথা রয়েছে সেসব রূপের মধ্যে তাঁর দশমহাবিদ্যার দশবিধ রূপ—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ এই দশবিধ রূপ ছাড়াও আদ্যাশক্তির অসংখ্য প্রকার রূপধারণের দিব্য কাহিনী পুরাণ-তন্ত্রে বিদ্যমান। পুরাণ-তন্ত্রে বর্ণিত আদ্যাশক্তির অসংখ্য প্রকার রূপের মধ্যে জগদ্ধাত্রী বিশেষ একটি রূপ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যেমন রয়েছে দেবী দুর্গার নানা রূপে অবতরণের কথা, কাত্যায়নীতন্ত্রে রয়েছে জগতের শান্তিবিধায়িনী ও পালনকর্ত্রী জগদ্ধাত্রীর কার্তিকী শুক্লা নবমী তিথিতে প্রকটিত হওয়ার দিব্য সংবাদ। দুর্গাকল্পেও আছে—'কার্তিকে শুক্লপক্ষেঽহ্নি ভৌম-বারে জগৎপ্রসূঃ। সর্বদেবহিতার্থায় দুর্বৃত্তশমনায় চ॥ আবিরাসীৎ জগৎশান্তৈ যুগাদৌ পরমেশ্বরী।'[১] পূজার বিধানেও রয়েছে—'কার্তিকেঽমলপক্ষস্য ত্রেতাদৌ নবমেঽহনি পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহ-পৃষ্ঠে নিষেদুষীম্।'[২]

ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী। কেনোপ-নিষদে কথিত উমা-হৈমবতী কর্তৃক বলগর্বী ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অহঙ্কার চূর্ণ করবার সুপ্রচলিত উপাখ্যানের অনুরূপ একটি উপাখ্যান রয়েছে কাত্যায়নীতন্ত্রে, ৭৬ পটলে, জগদ্ধাত্রী সম্বন্ধে। সেখানে আছে, একদা অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও চন্দ্র—এই চারজন দেবতা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে, ঈশ্বর মনে করে আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন যে, দেবতা হলেও তাঁদের স্বতন্ত্র কোন শক্তি নেই। মহাশক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রীর শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান। মিথ্যাগর্বে গর্বিত দেবতাগণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য দেবী 'কোটিসূর্য-প্রতীকাশং চন্দ্র-কোটিসমপ্রভম্'—কোটি সূর্যের তেজসদৃশ এবং কোটি চন্দ্রের প্রভাসম দীপ্তি নিয়ে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা হলেন। শক্তি পরীক্ষা করবার ছলে সম্মুখস্থ তৃণখণ্ডকে স্থানচ্যুত ও দগ্ধীভূত করতে বললেন। সর্বশক্তি প্রয়োগেও দেবতারা তাতে অসমর্থ হলেন। পরাজিত ও লাঞ্ছিত দেবতাগণের অহঙ্কার চূর্ণ হলো। তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন, উপলব্ধি করলেন ব্রহ্মশক্তির শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান এবং 'কোটিসূর্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটি-সমপ্রভম্' জ্যোতির্ময়ী ঐ দেবী যিনি 'তেজস্যান্ত-র্হিতে তস্মিন্ চমৎকারা কলেবরে। মৃগেন্দ্রোপরি সুস্মেরা সর্বালঙ্কারভূষিতা॥ চতুর্ভুজা মহাদেবী রক্তাম্বরধরা শুভা। বালার্কসদৃশীদেহা নাগযজ্ঞো-পবীতিনী॥ ত্রিনেত্রা কোটিচন্দ্রাভা দেবর্ষিমুনি-সেবিতা।'—সমস্ত তেজরাশিকে স্তিমিত করে কোটি চন্দ্রের প্রভাসদৃশ ও রক্তিমাভ অনিন্দ্যমূর্তি ধারণ করে আবির্ভূতা হয়েছেন, যিনি ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা মঙ্গলময়ী মহাদেবীরূপে দেবর্ষি নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক অভিনন্দিতা, যিনি রক্তবস্ত্রপরিহিতা, সর্বালঙ্কারভূষিতা এবং নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী। সেই মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী সকল শক্তির আধার, সকলের শ্রেষ্ঠা, নমস্যা ও আরাধ্যা। 'দর্শয়ামাস দেবানামেবং রূপং জগন্ময়ী। ততস্তাং তুষ্টুবুর্দেবা জগদ্ধাত্রীং

১ শব্দকল্পদ্রুম্, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৮২-১৮৪

২ কালবিবেক—শূলপাণি

মহেশ্বরীম্‌'—দেবতারা দেবীর এবম্প্রকার রূপ দর্শন করে পরিতুষ্ট হয়ে প্রবৃত্ত হলেন জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর আরাধনায়।[৩] ভাব ও তত্ত্বের দিক দিয়ে কেনোপনিষদ্‌ এবং কাত্যায়নীতন্ত্রে বর্ণিত উপাখ্যান দুটি অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণীর শক্তিতেই দেবতারাও যে শক্তিমান, এটি বোঝাবার জন্যই উপাখ্যান দুটির অবতারণা।

ধৃতিরূপিণী মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী। সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশরূপ তিন গুণের সমভাবের প্রকাশ যেমন কালীরূপের বৈশিষ্ট্য, তাঁর ধারণী ও পোষণী গুণের সমভাবের প্রকাশ জগদ্ধাত্রীরূপের বৈশিষ্ট্য। দেবীপুরাণে আছে, 'ধাত্রীমাতা সমাখ্যাতা ধারণে চোপগীয়তে। ত্রয়াণাঞ্চৈব লোকানাং নাম ত্রৈলোক্যধাত্রিকা ॥'[৪] 'যস্মাদ্ধারয়তে লোকান্‌ বৃত্তিমেষাং দদাতি চ। ভূধাপ্রে ধারণে ধাতুস্তস্মাধাত্রী মাতা বুধৈঃ ॥'[৫] 'ধাত্রী' শব্দে জননী এবং যিনি ধারণ করেন। ধাত্রীমাতা যেরূপ সকলকে বক্ষে ধারণ করে পীযূষদানে পরিপালিত করেন, ভগবতী জগন্মাতাও সেরূপ নিখিল বিশ্বকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে সকলকে পরিপালিত করেন। 'ধা' ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ, ভগবতী নিখিল বিশ্বকে বক্ষে ধারণ করে পরিপালন করেন বলে মুনিগণ কর্তৃক তিনি ত্রৈলোক্যধাত্রিকা নামে খ্যাত। বলা বাহুল্য, ত্রৈলোক্যধাত্রিকা এবং জগদ্ধাত্রী অভিন্না, এবং এই ত্রৈলোক্যধাত্রিকাই ধৃতিরূপিণী মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী। শুম্ভনিশুম্ভ বধের পর পরিতুষ্ট দেবতারা যে-স্তবে দেবীকে বন্দনা করেছিলেন তাতে আছে, 'বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্‌'[৬]—তুমি বিশ্বেশ্বরী, তাই বিশ্বকে পালন কর, তুমি বিশ্বাত্মিকা, তাই বিশ্বকে ধারণ কর। লক্ষণীয়, এখানে দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী অভিন্না, এক হয়ে গেছেন।

নিত্য পরিবর্তনশীল এই জগৎ। প্রতিমুহূর্তেই তার বিবর্তন-পরিবর্তন হচ্ছে। ভাঙা-গড়া চলছে অহর্নিশ, অনন্তকাল ধরে। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই ভাঙা-গড়ারূপ মহাবিপ্লবের মধ্যেও, বিবর্তন-পরিবর্তন সত্ত্বেও জগতের অস্তিত্ব ক্ষণকালের জন্যও লোপ পায় না,—বন্ধ হয় না তার গতিশীলতা। কেন? এর কারণ কি? কারণ, নিয়ত পরিবর্তনশীল এই জগতের পিছনে রয়েছে তার রক্ষণ ও পোষণের জন্য অচিন্তনীয়া মহাশক্তির অদ্ভুত এক খেলা। সতত পরিবর্তনশীল জগৎ সেই মহাশক্তির ওপর বিধৃত—যিনি নিত্যা শাশ্বতী ও অপরিবর্তনীয়া। আর দেবী জগদ্ধাত্রীই সেই ধৃতিরূপিণী মহাশক্তি। জগদ্ধাত্রীরূপের এই তত্ত্বটি অতি সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট্ট একটি কথায়, তাঁর অননুকরণীয় প্রকাশভঙ্গিতে। তাঁর কথায়, 'ঈশ্বরীর রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগৎ ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়।'[৭]

ধ্যানে সাধকের হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী 'সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্‌। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্‌ ॥ শঙ্খশার্ঙ্গসমাযুক্তবামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্‌। চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ দধতীং দক্ষিণে করে ॥ রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্‌। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্‌ ॥ ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীম্‌। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে ॥ প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্‌ ॥'—সিংহস্কন্ধসমারূঢ়া, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, চতুর্বাহুযুক্তা, নাগরূপযজ্ঞউপবীতধারিণী। দেবীর বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ এবং শার্ঙ্গধনু, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পঞ্চবাণ ও চক্র। রক্তবস্ত্রপরিহিতা সেই ভবসুন্দরী প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় রক্তাভতন্বী। নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক তিনি নিত্য সেবিতা। তাঁর ত্রিবলীবলয়সমন্বিত নাভি মৃণালবিশিষ্ট পদ্মের ন্যায় অপূর্ব শোভায় শোভিত। সেই শিবগেহিনী রত্নদ্বীপস্বরূপ উচ্চ বেদিকায় স্থিত সিংহাসনে প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর উপবিষ্টা।

ধ্যানমন্ত্রে যদিও দেবীর বাহ্যরূপের বর্ণনারই প্রাধান্য, স্বরূপগত তত্ত্বটিও তাতে সুস্পষ্ট। জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তির ধারণী ও পোষণী শক্তির প্রতীক। ধ্যানমন্ত্রে আছে দেবী 'বালার্কসদৃশীতনু'। 'অর্ক' বা সূর্যই বিশ্বের পোষণকর্তা। পৃথিব্যাদি আবর্তনশীল গ্রহ-উপগ্রহদিগকে সূর্যই নিজের দিকে আকর্ষণ

৩ শব্দকল্পদ্রুম্‌, পৃঃ ১৮২-১৮৪
৪ দেবীপুরাণ, ৩৭।২৯
৫ ঐ, ৩৭।২৫
৬ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৩৩
৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, আনন্দ সংস্করণ, ১ম সং, পৃঃ ৭৩

করে রেখেছেন—নিজ নিজ কক্ষে তাদের ধরে রেখেছেন। দেবী জগদ্ধাত্রীর মধ্যেও ধারণী ও পোষণী শক্তির পরিচয় বিদ্যমান। তাই তাঁকে বলা হয়েছে "বালার্কসদৃশীতনু"। একই কারণে জগৎ-পালক বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-শার্ঙ্গধনু-আদি আয়ুধ দেবীর শ্রীকরে।'

'দেবী "নাগযজ্ঞোপবীতিনী"। নাগ বা সর্প যোগের পরিচায়ক। উপবীত ব্রহ্মণ্যশক্তির প্রতীক। দেবী জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মময়ী; তিনি পরমা যোগিনী। মহা-যোগবলেই ব্রহ্মময়ী ধরে আছেন এই নিখিল বিশ্ব-সংসারকে। এ জগদ্ধারণই জগদ্ধাত্রীর পরমা তপস্যা—তাঁর নিত্য লীলা, তাঁর নিত্য খেলা। জননীরূপে তিনিই বিশ্বপ্রসূতি, আবার ধাত্রীরূপে তিনিই বিশ্বধাত্রী।'

'দেবীর রক্তবস্ত্র ও রক্তবর্ণের মধ্যে, দেবীর সিংহাসনস্থ রক্তকমলে সেই রজোগুণেরই ছড়াছড়ি। রজোদীপ্ত বলেই জগদ্ধাত্রী মহাশক্তিময়ী। তাঁর অস্ত্রশস্ত্র, তাঁর বাহন—সকলই তাঁর শক্তিমত্তার ভাবটি আমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত করে দেয়। তবে দেবীর এই বীর্য সংহারের নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্বকে মহা-সর্বনাশ থেকে রক্ষাপূর্বক তাকে আত্মসত্তায়—ঋতে এবং সত্যে সুস্থির করে রাখবার জন্য।'[৮]

ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও দেবীর বাহন সিংহের পদতলে একটি হস্তিমুণ্ড থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস, দেবী করীন্দ্রাসুরকে বধ করেছিলেন। দুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলে 'মহিষাসুরমর্দিনী', জগদ্ধাত্রীও সেরূপ 'করীন্দ্রাসুর-নিসূদিনী'। তত্ত্বের দিক দিয়ে দেবীর এই 'করীন্দ্রা-সুর-নিসূদিনী' নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যে-কোন সাধনায় মনকে সংযত করে বশে আনা সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের মন মত্ত করী, মত্ত মন-করীকে বশ করতে পারলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন। ...সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ করে রেখেছে।'[৯] মত্ত মন-করীকে বশ করে সাধক-হৃদয়ে জগদ্ধাত্রীর প্রতিষ্ঠাই জগদ্ধাত্রী-সাধনার সার্থকতা, পূজার পরিসমাপ্তি।

ধ্যানমন্ত্রের ন্যায় স্তবমন্ত্রেও জগদ্ধাত্রীরূপের তত্ত্বটি অতি সুস্পষ্ট। স্তবে দেবীর স্বরূপগত তত্ত্ব বর্ণনায় তাঁকে 'আধারভূতা', 'শাক্তাচারপ্রিয়া' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। 'আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে। ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে। শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥' অর্থাৎ, 'হে জগদ্ধাত্রি, তুমি আধার ও আধেয়স্বরূপিণী, তুমি ধারণ-শক্তিরূপিণী এবং সর্বকর্মবিধাত্রী, তুমি সনাতনী, শাশ্বতধামরূপিণী ও অবিচলিতস্বভাবা—তোমায় নমস্কার। তুমিই শিব, তুমিই শক্তি; তুমি সমস্ত শক্তিতে অবস্থিতা এবং তুমিই শক্তিরূপিণী; তুমি শাস্ত্রোচিত আচারে সন্তুষ্টা হও; হে দেবী জগদ্ধাত্রি, তোমায় নমস্কার।'[১০] স্তবের প্রত্যেকটি বিশেষণই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। 'দেবী "আধারভূতা"। অর্থাৎ তিনিই এই বহুধা, বৈচিত্র্যময় বিশ্বের আধার বা অনন্যাশ্রয়। আবার বিশ্বাতীত স্বরূপে তিনিই একা, অদ্বিতীয়া, তাই তিনি আধেয়া, তিনি ধৃতিশক্তির প্রভাবে বিশ্ব ধারণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় ধৃতিরূপা। সংসারের 'ধুর' বা ভারলোকস্থিতির দায়িত্ব বহন করেন, তাই দেবীর এক নাম ধুরন্ধরা। এভাবে সমগ্র বিশ্বের রক্ষণ, পালন, পোষণ, বর্ধনের গুরু-দায়িত্ব পালন করেও তিনি অনবসন্না, অবিকারা। তাই তিনি ধ্রুবা, তিনি ধীরা। দেবী নিত্যা, তাঁর বিধানও সনাতন, তাঁর শরণাগত যাঁরা তাঁদের ক্ষয়, ভয়, বিনাশ নেই, তাই তাঁকে বলা হয় ধ্রুবপদা।

'দেবী শক্তিস্থা, শক্তিবিগ্রহা, শাক্তাচারপ্রিয়া কেন? যে বিশ্বমহাশক্তি নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণীভূতা, দেবী জগদ্ধাত্রীর সত্তা বা স্থিতি তারই ওপর, তাই তিনি শক্তিস্থা। দেবীর রক্তাম্বর, রক্তবর্ণ চক্রাদি আয়ুধ এবং বাহন সিংহ প্রভৃতির ভিতরও মহাশক্তির মহাপ্রকাশ। মায়ের মূর্তিভাবনায় এসব শক্তিচিহ্ন রয়েছে, এজন্য তিনি শক্তিবিগ্রহা। তিনি আপন শক্তিপ্রভাবে সমস্ত বিশ্বজগতের গুরুভার নিত্যকালের জন্য ধারণ করে আছেন, তাই তিনি

৮ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—স্বামী নির্মলানন্দ, শ্রীশ্রীপ্রণব মঠ, ৩য় সং, পৃঃ ৩০৩-৩০৪
৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৭৩
১০ স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ৯ম সং, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪

শান্তাচারপ্রিয়া।'[১১]

দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী স্বরূপতঃ অভিন্না। তাঁদের বিভিন্ন প্রণাম ও স্তবাদিমন্ত্রে উহা সুস্পষ্ট। যেমন চণ্ডীতে দেবতারা তাঁকে 'বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।'[১২]—তুমি বিশ্বেশ্বরী, তাই বিশ্বকে পালন কর; তুমি বিশ্বাত্মিকা, তাই বিশ্বকে ধারণ কর—ইত্যাদি বলে স্তব করলেন। আরও বলা হয়েছে, 'দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ'[১৩]—তিনিই দুর্গা, ভগবতী, ভদ্রা, যিনি এই জগৎকে ধারণ করে আছেন। এখানেও দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী একেবারে এক হয়ে গেছেন। মহিষাসুর বধের পর দেবতারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার জন্য দেবীর যে-স্তব করেছিলেন তাতে তাঁরা দেবীকে জগদ্ধাত্রীরূপেই—'জগতাং ধাত্রীং'—অবগত হয়েছিলেন। 'এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ। অর্চিতা জগতাং ধাত্রীং তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥'[১৪]

অপরপক্ষে জগদ্ধাত্রীর প্রণামমন্ত্রে তাঁকে দুর্গা বলেই সম্বোধন করা হয়েছে। 'জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে। জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥ দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি। সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥'—হে দুর্গে, তুমি জয়বিধায়িনী ও জগতের আনন্দস্বরূপিণী। জগতে একমাত্র তুমিই প্রকৃষ্টরূপে পূজিতা ও তুমি সর্বব্যাপিনী,—তোমার জয় হোক, হে জগদ্ধাত্রি, তোমায় নমস্কার। হে জগদ্ধাত্রি, তুমি দয়াস্বরূপা, কৃপাদৃষ্টিস্বরূপা, করুণাময়ী, দুঃখবিনাশিনী, সর্ববিঘ্নবিনাশিনী; হে দুর্গে, তোমায় নমস্কার।'[১৫]

পূজার রীতিতেও দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর অভিন্নতা লক্ষণীয়। জগদ্ধাত্রীপূজায় দুর্গাপূজার রীতিই মুখ্যতঃ অনুসরণীয়। 'জগদ্ধাত্রীপূজা দুর্গাপূজারই সংক্ষিপ্ত রূপ। দেবীমূর্তি দুর্গাপ্রতিমার আদর্শে নির্মিত, পার্থক্য কেবল দেবীর দশবাহুর স্থলে চতুর্বাহু। মহিষাসুরের অন্তর্ধান, দেবী উপবিষ্টা, লক্ষ্মী-সরস্বতীর স্থলে জয়া ও বিজয়া—কার্তিক গণেশের অনুপস্থিতি। পূজার রীতি দুর্গাপূজার মতোই, কেবল ষষ্ঠ্যাদি কল্প, নবপত্রিকা স্থাপন ও বোধন হয় না। নবমী তিথিতে একই দিনে দুর্গাপূজার রীতি অনুসারে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।'[১৬] তাই এই পূজা যেন দুর্গাপূজারই সংক্ষিপ্ত একটি আকার, ক্ষুদ্র সংস্করণ।

পণ্ডিতদের অনুমান, জগদ্ধাত্রীপূজার সূচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। 'কিম্বদন্তী অনুসারে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রীপূজার প্রচলন করেছিলেন। বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, সেই সময় দুর্গাপূজার কাল উত্তীর্ণ। নৌকা থেকেই ঢাকের বাদ্য শুনে মহারাজ জানতে পারেন যে, সেদিন বিজয়া দশমী। সেই বছর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করতে না পারায় দুঃখে কাতর হওয়ায় দেবী দুর্গা তাঁকে জগদ্ধাত্রীমূর্তিতে দেখা দিয়ে একমাস পরে কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রীপূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নদৃষ্ট দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করিয়ে ধুমধাম সহকারে কার্তিকের শুক্লা নবমীতে পূজা করেছিলেন।... মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রীপূজা করে এই দেবীর অর্চনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে কৃষ্ণচন্দ্রের সুহৃদ্ চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে জাঁকজমক সহকারে জগদ্ধাত্রীপূজা করেছিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এখনও কৃষ্ণনগরে এবং চন্দননগরে সাড়ম্বরে সার্বজনীন জগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।'[১৭]

জগদ্ধাত্রীপূজার সূচনাকাল এবং প্রবর্তক সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি যাই থাকুক না কেন, যে-সাধক অনন্যচিত্ত হয়ে ইহকাল-পরকালের সর্বপ্রকার চাওয়া-পাওয়াকে উপেক্ষা করে নির্মল নিষ্কাম প্রীতিতে ধৃতিরূপিণী জগদ্ধাত্রী-মূর্তিতে মন-প্রাণ নিবিষ্ট করতে পারেন, তাঁর হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদিত হন। এখানেই তাঁর পূজার সার্থকতা, সাধনার পরিসমাপ্তি।*

১১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, পৃঃ ৩০৫
১২ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৩৩ ১৩ ঐ, ৫।১৬
১৪ ঐ, ৪।২৯ ১৫ স্তবকুসুমাঞ্জলি, পৃঃ ৫৫৪, ৩৩৭
১৬ হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ৩য় পর্ব, ১ম সং, পৃঃ ৩৩২
১৭ ঐ, পৃঃ ৩২৯-৩৩০ এবং ৩৩২

* উদ্বোধন, ৮৬তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৯১, পৃঃ ৬৮১—৬৮৫

বিশেষ রচনা

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ : প্রতিক্রিয়া এবং তাৎপর্য

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রতিক্রিয়া

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চিত্তাকর্ষক কাহিনী মারি লুইস বার্ক তাঁর পুস্তকে (১ম খণ্ড) সন্নিবেশিত করেছেন, যথা মিসেস এস. কে. ব্লজেট (S. K. Blodgett)-এর বর্ণনা (পৃঃ ৮১)। [পরবর্তী কালে (১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ) লস এঞ্জেলসে এই বর্ষীয়সী মহিলার গৃহে স্বামীজী অতিথি হয়েছিলেন।] বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

"১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। ঐ তরুণ যুবকটি (স্বামীজী, তাঁর বয়স তখন ত্রিশ) যখন উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ', তখন ৭০০০ (?) লোক উঠে দাঁড়িয়ে প্রশস্তি জানালেন ; কিন্তু কি কারণে তা ঠিক তাঁদের জানা ছিল না। হাততালি যখন থামল, আমি দেখতে পেলাম, দলে দলে মহিলারা বেঞ্চগুলি টপকে তাঁর কাছে পোঁছবার চেষ্টা করছে এবং আমি তখন আমার নিজের মনে মনে বলছিলাম, 'হে তরুণ, তুমি যদি এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পার, তবে বুঝব, তুমি সত্যিই ঈশ্বর।'"

প্রতিহত যে স্বামীজী করতে পেরেছিলেন, তার যথার্থ প্রমাণ হলো, তিনি তারপরেই তাঁর জগদ্বিখ্যাত সংক্ষিপ্ত অথচ অনবদ্য ভাষণটি দিয়েছিলেন, শ্রোতাবৃন্দ নীরবে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে যা শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়াটা অবশ্য মোটেই একতরফা ছিল না। স্বামীজীর মনেও গভীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, যার বর্ণনা আছে তাঁর জীবনীতে। তিনি ঐ রাত্রিতে তাঁর ঘরের মেঝেয় লুণ্ঠিত হয়ে অঝোরে ক্রন্দন করেছিলেন ভারতের অগণিত দরিদ্রজনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবে; ঘরের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব হয়নি।

এছাড়া, আরও প্রতিক্রিয়ার বিশদ বিবরণ আমরা বার্কের পুস্তকে পাই। সবগুলি দিতে গেলে প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ হয়ে পড়বে। আমরা সংক্ষেপে শুধু সেগুলিই উল্লেখ করব যাতে এমন অতিরিক্ত সংবাদ আছে, যা স্বামীজীর পাশ্চাত্যে তৎকালীন ও পরবর্তী প্রভাবের কথা বুঝতে সহায়তা করে। মিসেস বার্কের ধারণা, স্বামীজীর প্রথম ভাষণের প্রথম পাঁচটি শব্দের মধ্যে এমন এক সুগভীর ও আন্তরিক প্রেরণা ছিল যা শ্রোতাদের মর্ম স্পর্শ করে এবং এক তাৎক্ষণিক সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত করে বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে। ফল হয়েছিল এই—এর পরে ধর্মমহাসভায় যতগুলি অধিবেশনে স্বামীজী বক্তৃতা (বিজ্ঞানবিভাগের বক্তৃতাগুলি-সহ) করেছিলেন, তার সবগুলিতেই গভীর আগ্রহে শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতার জন্যই শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করত। অধিকাংশ দিনই তাঁর বক্তৃতা শেষের দিকে পিছিয়ে দেওয়া হতো, যাতে শ্রোতারা শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। এপ্রসঙ্গে প্রথম ভাষণটি সম্বন্ধে বার্কের মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য—"The people had recognized their hero and had taken him to their hearts ; thenceforth he was the star of the Parliament." (লোকেরা তাঁদের নায়ককে চিনে নিয়েছিল এবং অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল ; সেই থেকে তিনি হয়ে পড়েছিলেন মহাসভার নক্ষত্রস্বরূপ)।

প্রথমদিন (১১ সেপ্টেম্বর) স্বামীজীর ভাষণের পরে আরও চারটি ভাষণ হয়ে অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছিল। ঐদিন সর্বসাকুল্যে ২৪টি বক্তৃতা হয়েছিল। তদানীন্তন আমেরিকান পত্র-পত্রিকাগুলিতে স্বামীজী সম্পর্কে বহু বর্ণনা ও প্রশস্তি প্রকাশিত

হয়। তার বেশকিছু স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতেও উদ্ধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে মহাসভার বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি মাননীয় মিঃ মারউইন-মেরী স্নেল-এর বর্ণনা খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে স্বামীজী ছিলেন "··· Beyond question the most popular and influential man in the Parliament··· (who) on all occasions··· was received with greater enthusiasm than any other speaker, Christian or Pagan". [স্বামীজী ছিলেন ··· মহাসভায় অবিসংবাদিতভাবে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি··· (যিনি) প্রতিটি উপলক্ষেই··· অন্য যেকোন খ্রীস্টান অথবা পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী বক্তা অপেক্ষা অধিক উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন]।

মিস হ্যারিয়েট মনরো ছিলেন ঐকালের এক বিশিষ্ট আমেরিকান মহিলা কবি। তিনি 'Poetry: A Magazine of Verse' নামক একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা ছিলেন। পরবর্তী কালে আমেরিকায় কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এমন বহু কবিরই প্রথম পরিচয় হয়েছিল ঐ পত্রিকাটির মাধ্যমে। মিস মনরো তাঁর আত্মচরিত 'A Poet's Life' নামক পুস্তকে ধর্মমহাসভা ও স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। তার আংশিক উদ্ধৃতি আমরা নিম্নে দিচ্ছি:

"···It was the last of these, Swami Vivekananda, the magnificent, who stole the whole show and captured the town. Others of the foreign group spoke well—the Greek, the Russian, the Armenian, Mazoomdar of Calcutta, Dharmapala of Ceylon···. But the handsome monk in the orange robe gave us in perfect English a masterpiece. His personality, dominent, magnetic; his voice, rich as a bronze bell; the controlled fervour of his feeling; the beauty of his message to the Western world he was facing for the first time—these combined to give us a rare and perfect moment of supreme emotion. It was human eloquence at its highest pitch." [··· এঁদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি, স্বামী বিবেকানন্দ, ছিলেন সর্বোত্তম, যিনি সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং সারা শহর মাতিয়েছিলেন। অন্যান্য বিদেশী ধর্মীয় প্রতিনিধিগণও—গ্রীক, রাশিয়ান, আর্মেনিয়ান, কলকাতার মজুমদার ও সিংহলের ধর্মপাল—ভালই বলেছিলেন··· কিন্তু কমলারঙের পোশাক পরিহিত সন্ন্যাসীই নিখুঁত ইংরেজীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রভুত্বব্যঞ্জক ও চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন; ব্রোঞ্জনির্মিত ঘণ্টাধ্বনির মতো ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর; তাঁর আবেগের সংযত উত্তাপ—এসব মিলিয়ে আমাদেরকে মহত্তম অনুভূতির দুর্লভ ও নিখুঁত মুহূর্তটি এনে দিয়েছিল। মানব-ভাষণের তা-ই ছিল সর্বোচ্চ শিখর।]

সমসাময়িক পত্রিকাগুলিতেও (যথা, শিকাগো টাইমস, শিকাগো অ্যাডভোকেট, বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট প্রভৃতি) ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর উপস্থিতি ও প্রভাবের, বিশেষ করে তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যের, পোশাকের চমৎকারিত্ব এবং সর্বোপরি ইংরেজী ভাষার ওপরে তাঁর অসামান্য দখলের অজস্র বর্ণনা বেরিয়েছিল। ছোট্ট একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি (বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপট-এ ২৩ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত এক সাংবাদিকের রচনাংশ): "He is a great favourite at the Parliament, from the grandeur of his sentiments and his appearance as well. If he merely crosses the platform he is applauded, and this marked approval of thousands he accepts in a childlike spirit of gratification, without a trace of conceit." (তাঁর ভাবাবেগ এবং আকৃতি উভয়েরই ঐশ্বর্যের জন্য তিনি মহাসভায় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে পড়েছেন। তিনি যদি কেবলমাত্র মঞ্চের ওপর দিয়ে হেঁটে যান, তাহলেই হাততালি পড়তে থাকে এবং হাজারো লোকের এই প্রশস্তি তিনি একটুও আত্মাভিমান না দেখিয়ে শিশুসুলভ সারল্যে গ্রহণ করেন।)

উদ্বোধনী ভাষণ ছাড়াও স্বামীজী ধর্মমহাসভায়

অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মূল মহাসভার বক্তৃতাগুলি স্বামীজীর রচনাবলীতে (Complete Works, Vol. I, pp. 3-24) প্রকাশিত হয়েছে। মহাসভার পঞ্চমদিবসে যে বিদগ্ধ বিজ্ঞানবিভাগটি (Scientific Section) খোলা হয়েছিল, সেখানেও তিনি অন্ততঃ চারবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এগুলির কোন অনুলিপি পাওয়া যায়নি। তবে সভাপতি ব্যারোজের রিপোর্টে বক্তৃতাগুলির তারিখ ও শিরোনাম পাওয়া যায়। ২২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার স্বামীজী বিজ্ঞানবিভাগে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং 'Orthodox Hinduism and the Vedanta Philosophy' ('সনাতন হিন্দুধর্ম ও বেদান্তদর্শন')-এর ওপরে একটি সভা পরিচালনা করেছিলেন। ঐদিনই অপরাহ্নে তিনি ও মিঃ মারউইন-মেরী স্নেল যৌথভাবে আর একটি সভা পরিচালনা করেছিলেন; তার বিষয় ছিল 'The Modern Religions of India' ('ভারতের আধুনিক ধর্মসমূহ')। পরের দিন অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর স্বামীজী আবার ঐ বিভাগে বক্তৃতা দেন এবং 'The Rinzai Zen of Japanese Buddhism' ('জাপানী বৌদ্ধধর্মের রিনজাই জেন') নামক বিষয়ের ওপরে একটি সভা পরিচালনা করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর (সোমবার) অপরাহ্নে তিনি 'The Essence of the Hindu Religion' ('হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব') শিরোনামে একটি বক্তৃতা দেন।

সাধারণ সভায় স্বামীজী যে-বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি ছিল সর্বজনবোধগম্য এবং ঐ কারণে বহুলাংশে কূট দার্শনিক তত্ত্ববিবর্জিত। বিজ্ঞানবিভাগের বক্তৃতাগুলি ছিল কিন্তু ভিন্ন ধরনের; একথা নিশ্চয়ই অনুমান করা যেতে পারে— যেহেতু ঐগুলি ছিল তুলনামূলক ধর্মসংক্রান্ত এবং বিজ্ঞানবিভাগের বিদগ্ধ শ্রোতাদের কাছে প্রদত্ত, was crowded to overflowing and hundreds of questions were asked by auditors and answered by the great Sannyasi with wonderful skill and lucidity. At the close of the session he was thronged with eager questioners who begged him to give them a semi-public lecture somewhere on the subject of his religion. He said that he already had the project under consideration." [গতকাল সকালে বিজ্ঞানবিভাগে স্বামী বিবেকানন্দ 'সনাতন হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিন নম্বর হলটিতে তখন ভিড় উপচে পড়ছিল এবং শ্রোতারা শত শত প্রশ্ন করছিলেন। ঐ মহান সন্ন্যাসী আশ্চর্য দক্ষতার সহিত এবং সরলভাবে ঐগুলির উত্তর দিচ্ছিলেন। সভার শেষে জিজ্ঞাসু প্রশ্নকর্তারা তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর ধর্মের ওপরে কোথাও একটি আধা-সাধারণ বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, পূর্ব থেকেই ঐরূপ একটি পরিকল্পনা তাঁর আছে।] মিসেস বার্কের অনুমান, স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে একটি বক্তৃতা 'The Love of God' ('ঈশ্বরপ্রেম') নামে প্রকাশিত হয়েছে; সম্ভবতঃ ওটিই সেই সার্ধ-সাধারণ বক্তৃতা। ওটি প্রদত্ত হয়েছিল শিকাগোর থার্ড ইউনিটেরিয়ান চার্চে ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, রবিবার। কোন ইউনিটেরিয়ান চার্চে এই প্রথম তাঁর বক্তৃতা। স্বামীজীর মতো স্পষ্টবক্তার জন্য অন্য কোন খ্রীস্টীয় গীর্জার দরজা আমেরিকায় তখন খোলা ছিল না। বক্তৃতাটি ২৫ সেপ্টেম্বরের 'শিকাগো হেরাল্ড' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত, তবে পুরো বক্তৃতা ওটি নয়।

ধর্মমহাসভা চলাকালে স্বামীজী ও অন্যান্য বৈদেশিক প্রতিনিধিরা বিভিন্ন তরফে বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, যেমন, প্রথমদিন সন্ধ্যায় সভাপতি রেভারেন্ড ব্যারোজ এক সম্বর্ধনাসভার আয়োজন করেছিলেন মিঃ ও মিসেস এ. সি. বার্টলেট-এর বিশাল প্রস্তরনির্মিত ভবনে। এছাড়া, চতুর্থদিন (১৪ সেপ্টেম্বর) বিশ্বমেলার মহিলা পরিচালিকাদের সভাপতি মিসেস পটার পামার মেলাপ্রাঙ্গণের 'মহিলা ভবনে' ('Woman's Building')

তাঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন। সেখানে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে স্বামীজী 'ভারতীয় নারী' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ২২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার আর্ট ইনস্টিটিউটের ৭ নং হলেও অনুরূপ একটি সভার আয়োজন করেন মিসেস পটার পামার। ঐদিনও একই বিষয়ের ওপরে বলতে অনুরুদ্ধ হন স্বামীজী। সেদিন তাঁর ভাষণের ছোট্ট এক খণ্ড মিসেস বার্কের পুস্তক থেকে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৮) উপহার দিচ্ছি ঃ

"The Hindu women are very spiritual and very religious, perhaps more so than any other women in the world. If we can preserve these beautiful characteristics and at the same time develop the intellects of our women, the Hindu women of the future will be the ideal woman of the world." (হিন্দুনারীরা অতিশয় আধ্যাত্মিক এবং ধর্মপ্রাণ, হয়তো বা বিশ্বের অন্যান্য নারীদের চাইতেও বেশি। আমরা যদি এই সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ করতে পারি এবং একই সঙ্গে আমাদের নারীদের মননশীলতা বৃদ্ধি করতে পারি, তাহলে তাঁরা হবেন বিশ্বের নারীজাতির আদর্শ ।)

এইসব বিরাট সম্বর্ধনা এবং ক্ষুদ্রতর মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজের মাধ্যমে স্বামীজী শিকাগোর জনসমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন এবং বহু মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব করেন। তিনি ছিলেন "one of the most popular guests in Chicago drawing rooms." (শিকাগোর বৈঠকখানাসমূহের জনপ্রিয়তম অতিথিদের অন্যতম ।) (ঐ, পৃঃ ৯৯) তাঁর জনপ্রিয়তার আরও বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী মিসেস বার্কের গ্রন্থে আছে।

এতাবৎ আমরা অনুকূল প্রতিক্রিয়াগুলিই লক্ষ্য করলাম ; কিন্তু প্রায় শুরু থেকেই একটি প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার প্রবাহও ভিতরে ভিতরে চলছিল। পরে ক্রমে তা প্রসারিত হয়ে প্রকাশ্যরূপ পরিগ্রহ করে। মিসেস বার্কের উল্লিখিত গ্রন্থে এবং স্বামীজীর জীবনী ও অন্যত্র তার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে। প্রবন্ধের আকার সীমিত রাখার জন্য আমরা ঐ বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াগুলি (যা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল) সংক্ষেপে আলোচনা করব।

স্বামীজীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা প্রথম থেকেই খ্রীস্টান বিরুদ্ধবাদীদের চক্ষুশূল হয়েছিল। তাঁরা তাঁর রঙিন ঝলমলে পোশাক ও পাগড়িকেই এর প্রধান কারণ বলে প্রচার করতে থাকেন ; বিশেষ করে, শিকাগোর মহিলাগণ স্বামীজীর বক্তৃতাসমূহে অধিকসংখ্যায় হাজির থাকতেন নাকি ঐ রঙচং-এর আকর্ষণেই। উনিশ শতকের শেষদিকে আমেরিকান নারীরা যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষদের (যারা রাজনীতি, অর্থোপার্জন প্রভৃতিতেই বিশেষভাবে মগ্ন ছিলেন) চাইতে অনেক বেশি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, এই বিরুদ্ধবাদীরা মোটেই তা মানতে চাননি। ধর্মমহাসভার পরবর্তী কালে তাঁরা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে স্বামীজীকে হেনস্তা করার অনেক অপপ্রয়াস চালিয়েছিলেন ; তার ভূরি ভূরি নজির আছে উপরিলিখিত গ্রন্থগুলিতে। এমন-কি, ডেট্রয়েটে কফির পাত্রে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছিল। তাঁর নামে বহু মিথ্যা কুৎসা রটনাও করা হয়েছিল। কী অসাধারণ মনোবল এবং একক প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি এসব বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলিকে প্রতিহত করেছিলেন। আমেরিকার জনগণের উল্লেখযোগ্য একাংশ, বিশেষ করে বিদগ্ধ, বিত্তবান ও প্রভাবশালী নারী-পুরুষেরা ঐসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং ক্রমশই তাঁর বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। সেই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী সবিস্তারে লিখতে গেলে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে দাঁড়াবে। প্রতাপ মজুমদারের মতো ভারতীয় ধর্মনেতা, রমাবাঈ সার্কেল ও থিওজফিস্টদের বিরোধিতাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ; কিন্তু স্বামীজীর অপরিমিত বিক্রম ও ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই পরাস্ত হয়েছিল। যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র ধর্মমহাসভার সঙ্গেই যুক্ত, সেহেতু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জের, যা পরেও চলেছিল কিছুকাল, তার উল্লেখমাত্র করেই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় অসামান্য সাফল্যের সংবাদে তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষেও নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তার বিস্তারিত সংবাদ আমরা

পাই অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর পুস্তক 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর প্রথম খণ্ডে। এই প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যেও কতকগুলি ছিল তাৎকালিক বা সাময়িক আর কতকগুলি ছিল দীর্ঘমেয়াদী এবং সুদূর-প্রসারী। দ্বিতীয়োক্ত প্রতিক্রিয়ার জের এখনো কোন কোন ক্ষেত্রে চলছে। ভারতে শিকাগো ধর্ম-মহাসভার সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ থেকেই—নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'মিনিস্টার' নামক কাগজ, পুণার 'মারাঠা', 'বোম্বে গার্ডিয়ান', 'ট্রিবিউন', সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার', বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের মুখপত্র 'সুবোধ' ইত্যাদি পত্রিকাতে। এই পত্রিকা-গুলিতে বিবেকানন্দের সাফল্যের কথা আদৌ ছিল না অথবা থাকলে অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং এদেশে স্বামীজীর সাফল্যের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া শুরু হতে বেশ খানিকটা বিলম্ব হয়েছিল। যিনি ঐ সাফল্যের সংবাদ প্রথম এদেশে যথাযথভাবে প্রকাশ করে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি হলেন নরেন্দ্রনাথ সেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্ঞাতিভাই, সাংবাদিক-চূড়ামণি, 'ইন্ডিয়ান মিরার' ('মিরার') পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক।

এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর উপরি উক্ত পুস্তক (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ৫১-৬৪) থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যার মধ্যে স্বামীজীর শিকাগোয় সাফল্যে ভারতে তাৎকালিক প্রতিক্রিয়ার কিছু পরিচয় মিলবে :

"বিবেকানন্দের প্রথম বড় সংবাদ কিন্তু 'মিরার'-এ বেরোয়নি—বেরিয়েছিল বোম্বাই-এর 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ৪ নভেম্বর, ১৮৯৩। পশ্চিম-ভারতে এই সংবাদ যথোচিত নাড়া দিয়েছিল ; কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশে, যখন ঐ একই সংবাদ 'স্টেটসম্যান'-এ ৯ নভেম্বরে প্রকাশিত হলো। ঐ সংবাদই মাদ্রাজের 'হিন্দু' প্রকাশ করে ১৭ নভেম্বর।..."

"উল্লিখিত সংবাদটি সঙ্কলিত হয়েছিল 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' পত্রিকা থেকে। ওতে ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ডাউটি ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ভারতীয়-গণের যে বিবরণ দেন, তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ নামক জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল বিবরণ ছিল—তা পাঠ করেই বাঙালী ও ভারতীয় পাঠক প্রথম জানতে পারে—ধর্মমহাসভায় সর্বাধিক জনপ্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর চেহারা অপূর্ব, ব্যক্তিত্ব অসামান্য, ততোধিক মহান তাঁর বাণী। 'স্টেটসম্যান'-এর এই বিবরণটি দুদিন পরে, ১১ নভেম্বর, 'মিরার'-এ পুনশ্চ প্রকাশিত হয়, এবং চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়।"

এর পরে ১৫ নভেম্বর 'মিরার'-এর সম্পাদকীয়তে এবং তার দশদিন পরে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে পরিচয়-জ্ঞাপক রচনা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি যে বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। ১৪ নভেম্বরের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়তেও অনুরূপ প্রাথমিক পরিচিতিই বিশেষ করে ছিল।

এসব সংবাদ বেরনোর পরেই তাঁর সম্বন্ধে বাংলা-দেশে কৌতূহলের সৃষ্টি হয় ; ক্রমে তা বিস্তৃত হয়ে সারা দেশে অসাধারণ আলোড়নের সৃষ্টি করে। অধ্যাপক বসুর পূর্বোক্ত গ্রন্থে তার বিশদ বর্ণনা আছে (ঐ, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ১২২-১৮১)। স্বামীজীর আবির্ভাবে ভারতে যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার সম্বন্ধে অধ্যাপক বসু সুন্দর মন্তব্য করেছেন :

"বিবেকানন্দ তারপর ভারতবর্ষে এলেন, সশরীরে নয়, সংবাদের রথে চড়ে—এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কাঁপতে লাগল সেই বার্তা-শিহরণে। ঐ সংবাদগুলি পরাধীন পতিত ভারতবর্ষকে তার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিল—আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষে তখন দেশনেতা ও সমাজ-সংস্কারকের অভাব ছিল না; ভারতীয় সমাজের দোষের চেহারাটা দেশী-বিদেশী সকলের কল্যাণে বে-আব্রু হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি··· আত্মাবমাননার সেই বিপুল আয়োজনের মধ্যে নির্বাসিত মর্যাদাকে নিজের মধ্যে আহ্বান করে বিবেকানন্দ যেন ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'—জাতিপ্রাণ সহর্ষে তখান সাড়া দিয়ে-ছিল, বন্দনা গেয়েছিল সেই মানুষটির যিনি লজ্জিত করতে আসেননি, উদ্বুদ্ধ করতে এসেছেন, ক্ষমা

করতে আসেননি, পূর্ণ করতে এসেছেন।

"বিবেকানন্দের মহিমার ভিত্তি বিদেশীর প্রশংসায় নয়, তা আমরা এখন যথেষ্টই জানি, কিন্তু আজ বোধহয় কল্পনা করাও সম্ভব নয়, বিবেকানন্দের বৈদেশিক প্রশংসা লাঞ্ছিত ভারতবাসীকে কতখানি দিয়েছিল। বিবেকানন্দই প্রথম ভারতবাসী যিনি এতটুকু মাথা না নামিয়ে, কোনভাবে আপস না করে, নিজ তেজে অর্জন করে এনেছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষে তখন অজ্ঞাতপূর্ব সেই অভিজ্ঞতা।... বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে দেখা গেল, রচিত হয়েছে অভিনব কাহিনী—তার রোমাঞ্চ তাই মুকুলিত করেছিল জাতির মর্মমূল।

"আরও একটি অভাবিত ব্যাপার ঘটেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে, অন্ততঃ ভারতের ইতিহাসে, এমন কখনো হয়নি যে, কোন একটি মানুষের বহির্দেশে সাফল্যের সংবাদেই সমগ্র জাতি জেগে উঠেছে। সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার, একেবারে তা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারত, যদি-না আমাদের কাছে সমসাময়িক সংবাদগুলি না থাকত।" (ঐ, পৃঃ ১২৩-১২৪)

অধ্যাপক বসু তাঁর উপরি উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে সমসাময়িক বহু সংবাদপত্র থেকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ঐসব উদ্ধৃতির সাহায্যে তিনি ভারতের নবজাগরণে স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় যোগদানের প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বিরূপ প্রতিক্রিয়াও অবশ্য যথেষ্টই বেরিয়েছিল ঐকালের বিভিন্ন গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান, থিওজফিক্যাল ও বৈষ্ণবীয় পত্র-পত্রিকায় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। ঐসবেরও বেশ কিছু নমুনা অধ্যাপক বসু তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকের নানা স্থানে পরিবেশন করেছেন। সেগুলি যে শেষপর্যন্ত খুব কার্যকরী হয়নি, তার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। আগ্রহী পাঠকেরা অধ্যাপক বসুর সুবিখ্যাত গ্রন্থে তা দেখে নিতে পারেন।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সাফল্যের দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত ভারতের জাতীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৫—১৯০৬-এর বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, তৎপরবর্তী সশস্ত্র বিপ্লব, তরুণ বিপ্লবীদের প্রত্যেকের সঙ্গেই একখানি পকেট গীতা ও স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা রাখা প্রভৃতি ঐ প্রতিক্রিয়ারই সাক্ষ্য দেয়। মহাসভায় প্রদত্ত তাঁর বাণীসমূহ নানাসূত্রে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতের জনচিত্তকে উদ্বোধিত করে। [ক্রমশঃ]

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও প্রায় একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্বমুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের 'দেখছেন'? 'কলকাতা' মানে অবশ্য শুধু কলকাতা নামক ভূখণ্ডটিই নয়, কলকাতা এখানে একটি প্রতীক। সারা পৃথিবীর মানুষ এবং সারা পৃথিবীই এখানে উদ্দিষ্ট। সুতরাং কলকাতার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, কলকাতার মাধ্যমে সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের দৃষ্টি প্রসারিত—মা সারা জগৎ অর্থাৎ সারা জগতের লোককে 'দেখছেন'। কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক।

আলোকচিত্র: স্বামী চেতনানন্দ

পরিক্রমা

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাবাজী বলে চললেন ঃ

"সনাতন গোস্বামীকে ব্রজবাসীরা সকলেই পরম সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধা করে 'বাবা' বলে ডাকতেন। তাঁর কঠোর বৈরাগ্য নিয়ে বৃন্দাবনে বহু কাহিনী প্রচলিত। তার মধ্যে বাঙলা 'স্পর্শমণি' কবিতার কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। স্পর্শমণি লাভ করেও তিনি সেটি যমুনার জলে ফেলে দিয়েছিলেন পরম অবহেলায়। আর ঐ যে গোবর্ধনশিলাটি, যা শেষদিকে তিনি নিত্য পরিক্রমা করতেন, সেটি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে জীব গোস্বামীর শ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে। আপনাকে যেদিন সেখানে নিয়ে যাব, দেখিয়ে দেব। এইভাবে তেতাল্লিশ বছর শ্রীব্রজে বিরাজ করে ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ৭০ বছর বয়সে শ্রীবৃন্দাবনের রজঃপ্রাপ্ত হন তিনি। এই দিনটিতে তৎকালীন ব্রজবাসীরা নিজেদের পিতৃহারা মনে করে গভীর বিরহবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন ও তাঁর স্মরণে সকলে মস্তক মুণ্ডন করেন। আজও তাঁর স্মরণে আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রাচীনগণ মস্তক মুণ্ডন করেন। সেজন্য এই দিনটিকে বলা হয় 'মুড়িয়া পূর্ণিমা'।

"সেই আমলে এঁরা দুই ভাই ও এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী সমগ্র বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তার মধ্যে সনাতন ছিলেন মহা ত্যাগী-তপস্বী, রূপ ছিলেন মহাবিদগ্ধ পণ্ডিত সাধক এবং জীব ছিলেন একাধারে পণ্ডিত ও দক্ষ নেতৃত্বের অধিকারী। এঁরা তিনজনে মিলে সেই সময় বৈষ্ণব সমাজের বিধি-বিধান, সাধন-প্রণালী ও প্রধান ভক্তি-গ্রন্থাবলীর বিশদ ব্যাখ্যাদি ও আলোচনা সহ বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ওপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। সনাতন চারখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন—টীকাসহ দুই খণ্ডে 'ভাগবতামৃত', দিক্‌দর্শিনী টীকাসহ 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থ, ভাগবতের দশম স্কন্ধের সুবিস্তৃত টীকা 'দশটিপ্পনী' সহ 'বৈষ্ণবতোষিণী' গ্রন্থ এবং 'লীলাস্তব' নামে ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম ৪৫ অধ্যায় নিয়ে 'দশমচরিত গ্রন্থ'। এর মধ্যে 'হরিভক্তিবিলাস' ও তার টীকাখানি বৈষ্ণব সমাজের প্রাচীনতম স্মৃতিগ্রন্থ হিসাবে সর্বজন-স্বীকৃত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতনপ্রভুকে বৈষ্ণবতত্ত্বের মূল বা সূত্রাকারে কাশীতে শুনিয়েছিলেন, তদনুযায়ী সনাতন আরও বহু শাস্ত্র মন্থন করে 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকাসহ এই মহাগ্রন্থটি রচনা করেন। কারও মতে এই 'হরিভক্তিবিলাস' মূল ও টীকা তাঁর এবং পরবর্তী কালে শ্রীগোপাল ভট্ট বৈষ্ণব সমাজের সেবার জন্য এটি বিস্তৃতাকারে প্রণয়ন করেন।

"অনেক কথাই যা মনে পড়ল, বললাম ভাই, বড়বাবাজী সনাতন গোস্বামী প্রভুর সম্পর্কে। তাঁর দিব্যচরিত্র ও পাবনজীবন স্মরণে মন পবিত্র হয়। এখন তাঁর মন্দিরের কথা আর একটু স্মরণ করি।" বাবাজী আমায় নিয়ে এসে দাঁড়ালেন প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরের পাশে আর একটি সুউচ্চ শিখরসমন্বিত অপূর্ব টেরাকোটার কাজ করা মন্দিরের কাছে। এই মন্দিরের পূর্বদ্বারের মাথার ওপর একটি প্রাচীন লিপি আজও আছে, সেটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাবাজী বললেন ঃ "দেখছেন, ঐ লিপি? চেষ্টা করলে এখনো পড়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত কিন্তু ওপরের দিকে বাঙলায় ও নিচে দেবনাগরীতে লেখা। তোলা অক্ষরে উৎকীর্ণ, খোদাই করা নয়। এতে লেখা আছে ঃ

'হর ইব গুহবংশ্যো যৎ পিতা রামচন্দ্রো
গুণিমণিরিব পুত্রো যস্য রাজা বসন্তঃ
সকৃত-সুকৃতিরাশিঃ শ্রীগুণানন্দ নামা
ব্যধিত বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ।'

—অর্থাৎ গুহবংশীয় শিবতুল্য রামচন্দ্র যাঁর পিতা এবং গুণিগণ শিরোমণি রাজা বসন্ত যাঁর পুত্র, সেই সুকৃতিশালী শ্রীগুণানন্দ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই মন্দির যথাবিধি করিয়ে দেন।

"যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কাকা, রাজা

বসন্ত রায়ের বাবা রাজা গুণানন্দ (গুহমজুমদার) এই মন্দিরটি তাঁর বৃন্দাবন বাসকালে, সম্ভবতঃ ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে, নিজের ছেলে বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তৈরি করিয়েছিলেন। রামদাস কাপুরের আদি মন্দিরটি জীর্ণ হলে মদনগোপাল বিগ্রহ এখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সনাতনের আমলে বর্তমানের 'মদনমোহন' নাম ছিল না। তিনি 'মদনগোপাল' বলতেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ-রুদ্রের ছেলে পুরুষোত্তম শ্রীরাধার দুটি বিগ্রহ তৈরি করে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন। তারই একটি মদন-গোপালের বামে শ্রীরাধা। অন্যটি শ্রীললিতারূপে বিরাজিত হন এবং মদনগোপাল—মদনমোহন নামে পরিচিত হতে থাকেন বলে প্রবাদ আছে। কিংবদন্তী —মদনগোপাল বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ তৈরি করিয়ে মথুরায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালক্রমে সে-বিগ্রহ ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েও কোনক্রমে উদ্ধার পেয়ে তা ঐ চৌবেদের হাতে আসে। তারপরে ১৬৮০-তে ঔরঙ্গজেব যখন বৃন্দাবন ধ্বংসে উঠেপড়ে লাগলেন তখন সেবাইতরা গোপনে শ্রীবিগ্রহকে সরিয়ে নিয়ে যান রাজস্থানের করৌলীতে। আজও সেই প্রাচীন বিগ্রহ সেখানেই আছেন। তারপরে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আর একটি মন্দির হয়, সেখানে প্রতিনিধি-বিগ্রহ স্থাপিত হয়। কালক্রমে সে-মন্দিরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে বর্তমানে আদিত্যটিলার নিচে এখন যে-মন্দির, সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এক বাঙালী জমিদার নন্দকুমার বসু। তিনি বৃন্দাবনের বিখ্যাত মন্দির গোবিন্দজীর মন্দির এবং গোপীনাথজীর মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব মন্দিরে আদি বিগ্রহ মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে অন্যত্র স্থানান্ত-রিত হওয়ায় বর্তমানে প্রতিনিধি-বিগ্রহ আছেন। সেবাইতরা সবাই বাঙালী ও মুর্শিদাবাদ জেলার এক গ্রামের ব্রাহ্মণ সন্তান।"

বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে টিলা থেকে নেমে এলেন বাবাজী। একটু ডানদিকে মোড় নিয়েই একটি প্রাচীরঘেরা চত্বরে প্রবেশ করলেন আমাকে নিয়ে। বহু প্রাচীন—দেখেই বোঝা যায়। দরজা থেকে একটু নেমে মূল চত্বরে যেতে হয়। বাঁদিকে অতি প্রাচীন কয়েকটি কুঠরী, ডানদিকেও কয়েকটি পুরনো ঘর, কয়েকটি বহু প্রাচীন গাছ। আর চত্বরের মাঝে একটি আয়তাকার একতলা ঘর। মাঝখানে একটি দরজা, দুদিকে দুটি জানালা। ঘরের মাঝে একটি বেদি হাতখানেক উঁচু, তার ওপর অর্ধগোলাকৃতি উঁচু ঢিপির মতো। একটি নামাবলী দিয়ে ঢাকা আর তার ওপর অনেকগুলি তুলসীকাঠের মালা দেওয়া। একপাশে কয়েকটি কাঁথা ভাঁজ করা। পাশে একটি মাটির কমণ্ডলু। দেওয়ালের গায়ে রাধাকৃষ্ণের ছবি ও এক বৈষ্ণব বৈরাগী বাবাজীর ছবি। এই স্থানেই সাধকশ্রেষ্ঠ সনাতন গোস্বামীর সমাধি-স্থান। ঘরের পরিবেশ আজও গম্ভীর। চারিদিকে অনেক গাছপালা। সমাধিপীঠের বাইরে আরও অনেক ছোট-বড় বৈষ্ণব বাবাজীর সমাধি। এই ঘরে এসে, এই পবিত্র পরিবেশে আপনা থেকেই মন শান্ত হয়ে যায়। বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে একটু বসা যেতে পারে কিনা। তিনি মৌন সম্মতি জানালেন। আমি ঘরের এককোণে একটু বসার জায়গা করে নিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম সেই মানুষটির কথা, যিনি বিরাট রাজ-ঐশ্বর্য, সম্মান সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিলেন চৈতন্যদেবের আকর্ষণে, শেষে তাঁরই আদেশে, তাঁকেও ছেড়ে আসতে হয়েছিল এই জঙ্গলে ভিক্ষুকের বেশে। তারপর প্রেম-বিরহ-বিবশ ভাবময় একটি তপস্যাপূত দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে সমগ্র ভক্তসমাজের কাছে এক অনবদ্য আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। মনে মনে স্মরণ করলাম তাঁরই কনিষ্ঠ সহোদর রূপের রচিত একটি প্রণাম মন্ত্রঃ

"নামাকৃষ্ট রসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥"

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম দরজার বাইরে। সাধক-শ্রেষ্ঠ সনাতনের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে সে-দিনের মতো বিদায় নিলাম বাবাজীর কাছ থেকেও।

পরদিন বিকেলে আবার এলাম বাবাজীর কুঠিয়ায়। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন বৃন্দাবনের পশ্চিমদিকে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের পিছনে একটি প্রাচীরঘেরা অঙ্গনে। সামনেই ছোট্ট একটি গোলাপী রঙয়ের কুঁড়েঘরের আকৃতির ঘর, তার মধ্যে একটি আয়তাকার বেদির ওপর অর্ধগোলাকৃতি আর একটি বেদি নামাবলী ঢাকা দেওয়া। তার ওপর তুলসীকাঠের মোটা মালা জড়ানো। একপাশে একটি

মাটির করঙ্গ। তাতে জল। অন্যদিকে ধূপ জ্বলছে। সমস্ত পরিবেশটা বড় শান্ত। একটি বহু প্রাচীন তেঁতুল গাছের তলায় এই ঘর। প্রাচীন বনস্পতি তার বহু ডালপালা মেলে এই পবিত্র স্থানটিকে যেন বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তি, অপূর্ব ত্যাগ-তিতিক্ষাময় বৈষ্ণব সাধকাগ্রগণ্য রূপ গোস্বামীজীর পূতদেহের সমাধি-পীঠ এটি। জীব গোস্বামীজীর আরাধ্য দেবতা শ্রীরাধাদামোদরজীকে প্রণাম জানিয়ে বাঁদিকের ছোট দরজা দিয়ে একটু ঘুরে বাবাজী আমাকে নিয়ে এলেন। এখনো লোকজনের ভিড় শুরু হয়নি। তাই ফাঁকাই রয়েছে এদিকটা। ভাবে বিহ্বল বাবাজী সমাধিপীঠের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে পরম আকুতির সঙ্গে প্রার্থনা করলেন: শ্রীচৈতন্যের মনোভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য যিনি ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই শ্রীরূপ কবে আমাকে তাঁর শ্রীচরণে স্থান দেবেন—"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে, সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।" বললেন: "এটি শ্রীজীবের রচনা।" তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন বাবাজী। সর্বাঙ্গে ধূলি মেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে আবার আবৃত্তি করতে লাগলেন: "স্বপদ-নখরমিন্দুং তাপদগ্ধায় দত্তে। / মুকুর-মজ্জিত-ভক্ত্যা স্বং পরিস্ফুটতে চ / অপি কিমপি কমিত্রে যস্তু চিন্তামণিং মে / তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে।।"—যিনি ত্রিতাপজর্জরিত আমার হৃদয়ে নিজের শ্রীচরণচন্দ্রের প্রশান্তি দান করেছেন, আমার চিত্ত-দর্পণকে যিনি অনাবিল ভক্তিবারি সিঞ্চনে নির্মল করেছেন, কোন সাধারণ বস্তু চাইলেও যিনি সাক্ষাৎ চিন্তামণিই দান করেন, সেই মহারূপবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শ্রীরূপ গোস্বামীর আমি ভজনা করি।"

আমি বাবাজীর সঙ্গেই আছি। আমাকে তিনি নিয়ে গেলেন সমাধিপীঠের ঠিক বিপরীতদিকে ঐ সমাধিপীঠের আকারেরই আর একটি কুঠিয়ার সামনে। এটি একটি বকুলগাছের তলায়। এখানে কুঠিয়ার ভিতরে একটি বেদিতে আসন পাতা। পিছনে রাধাকৃষ্ণের পট। এটিই রূপ গোস্বামীর ভজনকুঠিয়া। শেষজীবনে এখানেই ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য জীব গোস্বামীর এই শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের সংলগ্ন উদ্যানে ভগবৎচিন্তায়, বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়নে ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় তিনি অতিবাহিত করেছিলেন। ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দের শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বৃন্দাবন-প্রাপ্তির পর তাঁর পূত দেহ পূর্বোক্ত সমাধিপীঠে সমাহিত করা হয়। সেখানে প্রণাম জানিয়ে পাশেই একটি ছোট বাঁধানো চৌবাচ্চার মতন জায়গা বাবাজী দেখালেন—যেখানকার মাটি রূপ গোস্বামীজী ব্যবহার করতেন। তাঁর করঙ্গের অতিরিক্ত জলও এখানে ফেলতেন। সেই মাটি একটু মাথায় ঠেকিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে বাবাজী ঐ প্রাঙ্গণের অন্য প্রান্তে, যেখানে ভূগর্ভ গোস্বামীর প্রাচীন সমাধি আছে তার পাশে, নিয়ে গিয়ে বসালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবাজী বললেন: "এই বৃন্দাবন ভাবের জগৎ—কত সাধু, মহাত্মা তাঁদের সাধন-ভজন, ভক্তি-অনুরাগের স্রোতে এই বৃন্দাবনকে মধুময় করে তুলেছেন। আমরা আর কতটুকু জানি। রূপ গোস্বামী তাঁর জীবনের তিপান্ন বছর এই ব্রজধামে কাটিয়েছেন। তাঁর সেই ব্রজবাসকালের কথা কতটুকু আমরা জানি। তাঁর এটা বিনয় বুঝে নিয়েই তাঁর কাছে আমি হাত জোড় করে বললাম: "বাবাজী, বইতে হয়তো অনেক লেখা আছে। তা থেকে যা জানা যায়, তা তো পুঁথিগত জানা, আর আপনার জানা পরম্পরাগত অনুভূতির ব্যাপার। এটাই আমার জানতে ইচ্ছা, দয়া করে যেটুকু জানেন তাই বলুন।" তাঁর দুচোখ ক্রমশঃ ছোট হতে লাগল। রূপ গোস্বামীর ভজনকুটির লক্ষ্য করতে করতে একসময় তিনি বলতে শুরু করলেন:

"রূপ গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তাঁর উপাধি ছিল 'দবীর খাস'। তাঁর জন্ম ১৪৮৯ অথবা ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে উত্তরবঙ্গেই। এঁদের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে সনাতন গোস্বামীর জীবন প্রসঙ্গে কিছু স্মরণ করেছিলাম। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সন্তোষ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এঁদেরই টানে এসে উপস্থিত হন মালদহের রামকেলি গ্রামে, যেখানে এঁদের তিন ভাইকে দর্শন দিয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথের নির্দেশ দিয়ে তিনি ফিরে যান। এপ্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—'জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার,/অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায়

করিবেন উদ্ধার।' সেই সময় এঁদের তিন ভায়ের নাম তিনি দেন—সনাতন, রূপ ও অনুপম। মহাপ্রভুর নীলাচল যাওয়ার পরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তিন ভাই সংসার ত্যাগ করে আলাদা আলাদা ভাবে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। নীলাচলে থাকাকালে রূপ তাঁর বিখ্যাত নাটক 'বিদগ্ধমাধব'-এর কিছু অংশ মহাপ্রভুকে শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। পরে প্রয়াগে থাকাকালে শ্রীমহাপ্রভু তাঁর কাছে দশদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বাদি ভাগবত-সিদ্ধান্ত শুনেছিলেন। এপ্রসঙ্গে আরও শোনা যায়—'শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা / সর্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা।' মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন: 'আমি ভক্তিরসের এই দিগ্‌দর্শন দিলাম মাত্র। তুমি হৃদয়ে এর বিস্তার ভাবনা করবে।' এই বলে রূপকে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যেতে আদেশ করলেন।

"সেই নির্দেশমতো রূপ ছোট ভাই বল্লভকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় আসেন ও সেখানে মহাপ্রভুর আর এক বাঙালী ভক্ত সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে একমাস ধরে বৃন্দাবনের দ্বাদশবন পরিক্রমা করেন। এই লীলাস্থলী দর্শনের সময়েই তাঁর মনে শ্রীকৃষ্ণের লীলানাটক 'বিদগ্ধমাধব' রচনার ভাবের উদয় হয়। নাটকের রচনার সূচনা এই সময়েই হয়ে যায়। বৃন্দাবন থেকে দাদা সনাতনের খোঁজে আবার তাঁরা প্রয়াগে আসেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে সেখান থেকে কাশী হয়ে তাঁরা জন্মভূমি গৌড়ে যান বিষয়-সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার জন্য। পথে কনিষ্ঠ অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হলে তাঁর ছেলে জীবের প্রাণে কৃষ্ণভক্তিবীজ বপন করে রূপ চিরতরে গৃহত্যাগ করে নীলাচলে গিয়ে হাজির হন চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে। যাওয়ার পথে পুরীর সত্যভামাপুর গ্রামে রাত্রি-বাসকালে স্বপ্নে এক দেবীর দর্শন পান। সেই দেবী তাঁকে বলেন: 'আমার সম্বন্ধে একটি পৃথক নাটক তুমি রচনা কর। আমার আশীর্বাদে ঐ নাটক খুব ভাল হবে।' ঘুম ভেঙ্গে উঠে তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন, তাঁর কল্পনায় যে-নাটক রচনার ভাব এসেছে তাতে ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা একসঙ্গে হবে ভেবেছিলেন। কিন্তু এখন এই তীর্থের অধিশ্বরী সত্যভামাদেবী দর্শন দিয়ে আদেশ দিলেন—দুটি পৃথক নাটক রচনা করতে হবে। এই স্বপ্নেরই ফলশ্রুতি দুটি বিখ্যাত নাটক 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব'। শ্রীক্ষেত্র পুরিধামে গিয়ে মহাপ্রভুর শরণাগত হলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর পার্ষদদের রূপকে আশীর্বাদ করতে বলেছিলেন: 'তোমাদের কৃপায় রূপের এমন শক্তি হোক, সে যেন পৃথিবীতে কৃষ্ণরস-ভক্তি প্রচার করতে পারে।' মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদদের আশীর্বাদধন্য রূপ এখানেই তাঁর বিখ্যাত 'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণনাম-বিষয়ক 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী…' শ্লোকটি তাঁদের শুনিয়ে বিহ্বল করেছিলেন। তাঁরা এবিষয়ে বলেছিলেন: 'সবে বলে নামমহিমা শুনিয়াছি অপার,/এমন মাধুর্য কেহ বর্ণে নাহি আর।' রূপের হাতের লেখার প্রশংসা করতেন মহাপ্রভু। বলতেন: 'শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুক্তার পাঁতি।' বেশ কয়েকমাস তাঁদের দিব্য সঙ্গলাভ করে তাঁর আদেশ পেলেন: 'ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ / লুপ্তসব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ।/ কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করিহ প্রচার/ আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার।' মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ শিরে ধারণ করে আর একবার জন্মভূমি গৌড়ে গিয়ে সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাদি করে রূপ ব্রজধামে এসে উপস্থিত হলেন ১৫১৫ বা ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে। গৃহস্থাশ্রমে তিনি ছিলেন বাইশ বছর। তারপর দীর্ঘদিন শ্রীব্রজধামের সেবা করে ভ্রাতুষ্পুত্র জীবের কাছে এই রাধাদামোদর মন্দিরেই তিনি ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে ব্রজরজঃ-প্রাপ্ত হন।"

বলতে বলতে বাবাজীর কণ্ঠ ধরে এল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে হঠাৎ উঠে পড়লেন। বললেন: "চলুন এবার তাঁর লীলাস্থল দর্শন করি গিয়ে।" যাবার আগে আবার তাঁর সমাধি ও ভজনস্থলীতে গড়াগড়ি দিয়ে সেই চত্বর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে আসার পথে বাঁদিকে একটি ছোট্ট দালানের মতন আছে, তার ভিতরে অন্ধকার চারটি খুপরির মতো ছোট ছোট ঘর। প্রথমটিতে চৈতন্যচরিতামৃত-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজের এবং তারপরে একেবারে শেষেরটিতে জীব গোস্বামীর সমাধি দর্শন ও প্রণাম করে বাবাজী বললেন: "এখানেই দীর্ঘ একষট্টি বছর বৃন্দাবনে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণব সমাজের সেবা করে চুরাশি বছর বয়সে ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দের পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে জীব বৃন্দাবন-ধাম-প্রাপ্ত হলে তাঁর পবিত্র দেহ এখানে সমাহিত করা হয়।" [ক্রমশঃ]

শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : ভাদ্র, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

এবং সতি—"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী"ত্যত্রাত্মলোকো বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। "স বা এষ মহানজ আত্মা" ইতি প্রক্রান্তস্যাত্মন এতচ্ছব্দেন পরামৃষ্টত্বাৎ। লোক্যতেঽনুভূয়ত ইতি লোকঃ। তথাচ আত্মানুভবমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি শ্রুতেস্তাৎপর্যার্থঃ সম্পদ্যতে।

অন্বয়

এবং সতি (এরূপ হলে)—এতমেব (এইরূপ) লোকম্ ইচ্ছন্তঃ (লোককামী), প্রব্রাজিনঃ (সাধকেরা), প্রব্রজন্তি (সন্ন্যাস অবলম্বন করেন), ইতি (এইরূপে), অত্র (এখানে), আত্মলোকঃ (আত্মলোক), বিবক্ষিত (বলা হয়েছে), ইতি গম্যতে (এরূপ বোঝা যায়), সঃ বৈ (সেই তিনি), এষঃ (এই), মহান্ অজঃ আত্মা (মহান জন্মরহিত আত্মাই), ইতি প্রক্রান্তস্য (এই প্রকরণের), এতৎ শব্দেন ('এতৎ' শব্দ দ্বারা), আত্মনঃ (আত্মার), পরামৃষ্টত্বাৎ (সূচনা করা হয়েছে)। লোক্যতে (লোকিত হয়), অনুভূয়তে (অনুভূত হয়), ইতি লোকঃ (এরূপে লোকশব্দ নিষ্পন্ন)। তথাচ (অতএব সেভাবে), আত্মানুভবম্ ইচ্ছন্তঃ (আত্মানুভূতির ইচ্ছায়), প্রব্রজন্তি (সন্ন্যাস গ্রহণ করেন), ইতি (এইরূপ), শ্রুতেঃ (শ্রুতির), তাৎপর্যার্থঃ (তাৎপর্য), সম্পদ্যতে (সম্পন্ন হয়)।

অনুবাদ

এরূপ হলে—"এইরূপ লোককামী সাধকেরা (আত্মতত্ত্ব লাভেচ্ছু সাধকেরা) সন্ন্যাস অবলম্বন করেন" এইরূপ বৃহদারণ্যক (৪।৪।২২) শ্রুতিবাক্যে আত্মলোকের কথাই বলা হয়েছে—এরূপ বোঝা যায়। কারণ, "সেই তিনি এই মহান জন্মরহিত আত্মাই" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।২২), এই প্রকরণের 'এতৎ' শব্দ দ্বারা সূচিত হয়েছেন। 'লোক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয়—[যার দ্বারা] 'লোকিত হয়' অর্থাৎ 'অনুভূত হয়'। অতএব সেভাবে আত্মানুভূতির ইচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—এরূপ শ্রুতির তাৎপর্য।

বিবৃতি

এখানে 'এতৎ' শব্দ দ্বারা কিরূপে আত্মতত্ত্বেরই নির্দেশ করা হয়—এই প্রশ্নের নিরসন করতে শাস্ত্র-বাক্য অবধারণের জন্য ষড়্‌বিধ লিঙ্গ সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা শাস্ত্রতাৎপর্য নির্ণয় করা হয়। গ্রন্থের আদি ও অন্তে প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনকে 'উপক্রম-উপসংহার' লিঙ্গ বলে। ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়ের পুনঃ পুনঃ কথনকে 'অভ্যাস' বলা হয়। প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্য প্রমাণ দ্বারা অগম্যতাকে 'অপূর্বতা' বলা হয়। প্রকরণে প্রতিপাদিত কর্ম, উপাসনা বা বিচারের দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয় হলো 'ফল'। প্রকরণ-মধ্যস্থ স্তুতি ও নিন্দাপর বাক্য 'অর্থবাদ', এবং শাস্ত্রোক্ত যুক্তিসমূহই 'উপপত্তি' নামে অভিহিত।

'এতৎ' শব্দটিকে ষড়্‌বিধ লিঙ্গের 'উপক্রম-উপসংহার' এবং 'অভ্যাস'—এই দুই লিঙ্গ হিসাবে ধরে তার দ্বারা নিরূপণ করা যায় যে, উক্ত শব্দটি আত্ম-তত্ত্বকেই নির্দেশ করে। কারণ ঐ প্রকরণের আদি ও অন্তে 'মহান, জন্মরহিত, আত্মার' কথাই বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রকরণ মধ্যে 'এতৎ' শব্দ দ্বারাই পুনঃ পুনঃ আত্মার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

স্মৃতিশ্চ—

"ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভায় পরমহংসমাহ্বয়ঃ।
শান্তিদান্ত্যাদিভিঃ সর্বৈঃ সাধনৈঃ সহিতো ভবেৎ"
ইতি।

অন্বয়

স্মৃতিঃ চ (স্মৃতিতেও বলা হয়েছে)—ব্রহ্মবিজ্ঞান-লাভায় (ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য), পরমহংসম্ (পরম-হংস), আহ্বয়ঃ (আখ্যা দেওয়া হয়)। [অতঃ সঃ =অতএব সেই পরমহংস সন্ন্যাসী] শান্তিদান্তি-আদিভিঃ (শমদমাদি), সর্বৈঃ সাধনৈঃ (সকল সাধনা-দ্বারা), সহিতঃ (যুক্ত), ভবেৎ (হবেন)।

স্মৃতিতেও বলা হয়েছে—

"ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের জন্য পরমহংস আখ্যায়িত সন্ন্যাসী শমদমাদি সকল প্রকার সাধনসম্পন্ন হবেন।"

বিবৃতি

এই স্মৃতিবাক্যের আকর এপর্যন্ত নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে নারদপরিব্রাজকোপনিষদে (৬ষ্ঠ উপদেশ/২২) এই বাক্য দেখা যায় বলে দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন।

শমদমাদি সাধন বলতে—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান—এই ছয়প্রকার সাধনের কথা বলা হয়েছে। বাজারে দ্রব্যসংগ্রহের জন্য যেমন অর্থাদির প্রয়োজন তদ্রূপ অধ্যাত্মবিদ্যালাভের জন্য সাধকের এই ছয় প্রকার সম্পত্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। শম বলতে—অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, দম—বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম, উপরতি—বিষয় থেকে চিত্তবৃত্তির উপরম, তিতিক্ষা—চিন্তাবিলাপরহিত হয়ে সকল দুঃখের সহন, শ্রদ্ধা—গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে একান্ত বিশ্বাস, সমাধান—সৎ বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতা। 'বিবেকচূড়ামণি', 'অপরোক্ষানুভূতি', 'বেদান্তসার' প্রভৃতি গ্রন্থে এই তত্ত্বগুলির বিস্তৃত আলোচনা আছে।

ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সম্যগনুষ্ঠিতৈর্বেদানুবচনাদিভিরুৎপন্নয়া বিবিদিষয়া সম্পাদিতত্বাদয়ং বিবিদিষাসন্ন্যাস ইত্যভিধীয়তে। অয়ং চ বেদনহেতুঃ সন্ন্যাসো দ্বিবিধঃ, জন্মাপাদককাম্যকর্মাদিত্যাগমাত্রাত্মকঃ প্রৈষোচ্চারণপূর্বক-দণ্ডধারণাদ্যাশ্রমরূপশ্চেতি ॥

অন্বয়

ইহ (এই), জন্মনি (জন্মে) বা (অথবা) জন্মান্তরে (অন্য জন্মে), সম্যক্ অনুষ্ঠিতৈঃ (যথাযথ অনুষ্ঠিত), বেদানুবচনাদিভিঃ (বেদাধ্যয়নাদি কর্মদ্বারা), উৎপন্নয়া (উৎপন্ন), বিবিদিষয়া (জ্ঞানলাভেচ্ছা দ্বারা), সম্পাদিতত্বাৎ (সম্পাদনহেতু), অয়ম্ (তাকে), বিবিদিষা সন্ন্যাসঃ (বিবিদিষাসন্ন্যাস), ইতি অভিধীয়তে (এইরূপ বলা হয়)। অয়ম্ চ (এই বিবিদিষা সন্ন্যাস), বেদনহেতুঃ (আত্মজ্ঞানের হেতু), সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস), দ্বিবিধঃ (দু-প্রকারের), জন্মাপাদককাম্যকর্মাদিত্যাগমাত্রাত্মকঃ (কেবলমাত্র জন্মসম্পাদক কাম্যকর্মাদিত্যাগরূপ সন্ন্যাস), চ (এবং), প্রৈষোচ্চারণপূর্বকদণ্ডধারণাদ্যাশ্রমরূপঃ (প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দণ্ডধারণাদিরূপ আশ্রম গ্রহণ)।

এই জন্মে অথবা পূর্বজন্মে যথাযথভাবে বেদাধ্যয়নাদি কর্মানুষ্ঠান থেকে উৎপন্ন জ্ঞানলাভেচ্ছাদ্বারা সম্পাদনহেতু এই সন্ন্যাসকে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলা হয়। আত্মজ্ঞানের হেতু এই বিবিদিষা সন্ন্যাস দুই প্রকার। প্রথম, কেবলমাত্র জন্মসম্পাদক কাম্যকর্মাদি ত্যাগরূপ সন্ন্যাস এবং দ্বিতীয় প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দণ্ডধারণাদিরূপ আশ্রম গ্রহণ।

"পুংজন্মলভতে মাতা পত্নী চ প্রৈষমাত্রতঃ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সুশীলশ্চ জ্ঞানং চৈতৎপ্রভাবতঃ ॥"

অন্বয়

প্রৈষমাত্রতঃ (কেবলমাত্র প্রৈষমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা), মাতা (মা), চ (এবং), পত্নী (স্ত্রী), পুংজন্ম (পুরুষ জন্ম), লভতে (লাভ করে), চ (এবং), এতৎ প্রভাবতঃ (ইহার প্রভাবে), সুশীলঃ (সেই সুশীল সন্ন্যাসী), ব্রহ্মনিষ্ঠঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ), চ (এবং), জ্ঞানম্ (আত্মজ্ঞান), [লভতে=লাভ করেন]।

অনুবাদ

কেবলমাত্র প্রৈষমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা মা এবং স্ত্রী পুরুষজন্ম লাভ করে। এবং ইহার প্রভাবে অর্থাৎ প্রৈষমন্ত্রপ্রভাবে সেই সুশীল সন্ন্যাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ হন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করেন।*

ত্যাগশ্চ তৈত্তিরীয়াদৌ শ্রূয়তে—

"ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইতি।

অন্বয়

ত্যাগঃ (এই ত্যাগের কথা), তৈত্তিরীয়াদৌ চ (তৈত্তিরীয় প্রভৃতিতে), শ্রূয়তে (শোনা যায়)—

ন কর্মণা (কাম্যকর্মাদিদ্বারা নহে), প্রজয়া (প্রজা অর্থাৎ সন্তানাদি দ্বারা), ধনেন (ধনের দ্বারা), ন (নহে), একে (কেউ কেউ) ত্যাগেন (কেবলমাত্র ত্যাগ দ্বারাই), অমৃতত্বমানশুঃ (অমৃতত্বলাভ করেছেন)।

অনুবাদ

এই ত্যাগের কথা তৈত্তিরীয় প্রভৃতিতেও শোনা যায় (কৈবল্য উপনিষদ্, ৪র্থ কণ্ডিকায় এবং মহানারায়ণোপনিষদ্, ১৬।৫)—(মহাত্মাগণ) কাম্যকর্মাদিদ্বারা নহে, সন্তানাদি ধনদ্বারা নহে, কেবলমাত্র ত্যাগের দ্বারাই কেউ কেউ অমৃতত্ব লাভ করেছেন। [ক্রমশঃ]

* এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।

স্মৃতিকথা

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

সে প্রায় ৬৫ বছর আগেকার কথা, যখন আমি বাড়ি ছেড়ে স্থায়িভাবে জয়রামবাটী এবং কোয়ালপাড়া আশ্রমে থাকা আরম্ভ করি। প্রয়োজনমত উভয় স্থানেই কাজ করতে হতো। সেই সময় থেকে মাঝে মাঝে কাজের প্রয়োজনে কলকাতা এবং বেলুড় মঠে গিয়েছি। ঐসকল স্থানে থাকবার সময় এবং কখনো কখনো জয়রামবাটী থাকাকালীন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা-পার্ষদদের সঙ্গে দেখা করার এবং কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি, ঐসব কথাবার্তার কত গুরুত্ব রয়েছে। তাই সেসব কথা কিছু লিখেও রাখিনি। দীর্ঘকাল পরে এই বৃদ্ধ বয়সে তার কত কথা ভুলেও গিয়েছি।

একবার কিছুদিন বিশ্রামের জন্য এবং মহারাজের পূত সঙ্গলাভের আশায় ভুবনেশ্বর মঠে যাই। শ্রীশ্রীমহারাজ সেই সময় ভুবনেশ্বর মঠে ছিলেন। মঠবাড়ির একতলার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে। দোতলায় ঠাকুরঘর ইত্যাদি নির্মিত হচ্ছে। মহারাজের নির্দেশমত স্বামী শঙ্করানন্দ নির্মাণকার্যের তদারক করেন। মহারাজ সঙ্গীত পছন্দ করতেন। সন্ধ্যার পর বা অবসর সময়ে মঠে গান-বাজনা হতো। তার মাঝে কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। একদিন জয়রামবাটীর জায়গা-জমি নিয়ে গন্ডগোল প্রসঙ্গে আমাকে বললেন: "একটা কিছু ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে কোন action না নিয়ে তার গতি কোন্ দিকে কি হয়, লক্ষ্য করে কাজ করবে। Wait and See."

যেসময়ের কথা বলছি সেসময় ওখানে হাট-বাজারের অসুবিধা ছিল। জিনিসপত্রও তেমন পাওয়া যেত না। কলকাতা থেকে একজন ভক্ত (বিপিনবাবু কি বিনোদবাবু—নাম ঠিক মনে নেই) সপ্তাহে দুদিন এক ঝুড়ি ফল এবং এক ঝুড়ি তরকারি পাঠাতেন। কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একদিন বলছিলেন: "মঠে তেমন ক্ষিদে হয় না, কিন্তু সেখানে কত খাবার! আর এখানে খুব ক্ষিধে হয়, কিন্তু উপযুক্ত খাবার পাওয়া যায় না।" তিনি ওখানে গৌরীকুণ্ডের জল খেতেন। বিকালে অনেক সময় আশ্রমের মধ্যেই বেড়াতেন। মহারাজকে দেখে আমার মনে হতো, তিনি যেন অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। একটা যেন ভাবে থাকতেন সব সময়।

সেবারে প্রায় এক মাস তাঁর পূত সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটানা এতদিন তাঁর সঙ্গে থাকবার সুযোগ আর কখনো আমার হয়নি।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুরের তিথিপূজার কিছু আগে শ্রীশ্রীমা তিনজনকে গৈরিকবস্ত্র দিয়ে বলেন বেলুড় মঠে মহারাজের কাছে বিরজা হোম করিয়ে সন্ন্যাস নাম নিতে। আমিও তখন তাঁর কাছে গৈরিক-বস্ত্র প্রার্থনা করি। কিন্তু শ্রীশ্রীমা আমাকে তখন তা দেননি। কিছুদিন পর এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে শ্রীশ্রীমা কৃপা করে একদিন আমাকে হঠাৎই গেরুয়া-বস্ত্র দিলেন। গেরুয়াবস্ত্র দানের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করলেন। ঐসময় কেন জানি না, একটা ভীষণ ভয় আমার শরীর-মন জুড়ে বসল। মাকে সেকথা বললে তিনি বললেন: "বাবা, কোন ভয় নেই, শ্রীশ্রীঠাকুর রক্ষা করবেন।" তারপর বললেন: "মঠে তাড়াতাড়ি রাখালের নিকট গিয়ে বিরজা হোম করে নাম নেবে।" আমি বললাম: "আপনি কৃপা করে সন্ন্যাস দিয়েছেন—এই-ই যথেষ্ট। বিরজা হোম করে নাম নেওয়ার আর কি দরকার?" শ্রীশ্রীমা উত্তরে বললেন: "না গো, দরকার আছে। তোমাদের অনেক কাজ করতে হবে।"

সন্ন্যাস নেওয়ার কিছুদিন আগে মহারাজ কোয়ালপাড়া আশ্রমের প্রয়োজনে চাঁদা আদায়ের জন্য আমার নামে একখানা letter of authority দিয়েছিলেন। এর মেয়াদ ছিল দু-বছর (১৯১৬-১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ)। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সন্ন্যাস পেয়ে

চাঁদা আদায়ের জন্য খড়্গপুর যাই। সেখানে একদিন হঠাৎ একটা ড্রেনে পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পাই। ক্রমে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়ায় হাঁটাচলা করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। তখন চাঁদা আদায়ের কাজ বন্ধ রেখে সেখান থেকে বেলুড় মঠে চলে আসি। সেদিন বিকালবেলা মহারাজ পুরনো মঠবাড়ির পূর্বদিকের মাঠে গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা বেঞ্চির ওপর বসে তামাক খাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর মন অন্য কোথাও রয়েছে। কাছে কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) ছিলেন। আমি প্রণাম করতে মহারাজ কুশল প্রশ্নাদি করলেন। একটু পরে সুযোগ বুঝে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশিত বিরজা হোম এবং সন্ন্যাস-নামের কথা তাঁকে বললাম। শুনেই কৃষ্ণলাল মহারাজ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: "এই তো সেদিন—শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন —একবার সন্ন্যাস হয়ে গেল, এখন আবার এসব ঝঞ্ঝাট তোমার একার জন্য কি করে হবে?" আমি উত্তরে বললাম: "সন্ন্যাস হোক না হোক আমার আপত্তি নেই। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, তাই বলছি।" মহারাজ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। পরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: "মায়ের বাড়ী গিয়ে শরৎ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস নাও। আমি বললাম: "শ্রীশ্রীমা আমাকে আপনার নিকট সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বলেছেন। আমি শরৎ মহারাজের কাছে কেন সন্ন্যাস নেব?" একটু চুপ করে থেকে মহারাজ বললেন: "সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) বলরামবাবুর বাড়িতে আছে। সেখানে গিয়ে তাকে একটা দিন স্থির করতে বল, আর তাকে ঐদিন মঠে আসতে বলবে। উদ্বোধনে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) রয়েছেন, তাঁকেও একথা জানাও এবং তাঁকেও ঐদিন মঠে আসতে বলবে।" মহারাজের নির্দেশমত আমি সুধীর মহারাজের কাছে যাই। তিনি দিন স্থির করে দিলেন। পরে উদ্বোধনে শরৎ মহারাজের কাছে যাই এবং সকল বিষয় বলি। তিনি কোন আপত্তি করলেন না। সন্ন্যাসের ২/৩ দিন আগে আমি শরৎ মহারাজের সঙ্গে মঠে ফিরে আসি।

নির্দিষ্ট দিন মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখের উপস্থিতিতে পূজা, বিরজা হোম, আহুতি হতে হতে ভোর হয়ে গেল। মহারাজ আমাকে বললেন: "তুমি এখন স্নান করে জল খাও গিয়ে। পরে আমার কাছে এস। তোমার নাম দেবার জন্য একটু ভাবতে হবে।" গঙ্গাস্নান করে জল খেয়ে শ্রীশ্রীমহারাজের কাছে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তিনি সহাস্যবদনে বললেন: "তোমার নাম 'পরমেশ্বরানন্দ'। বল, কেমন নাম হয়েছে?" আমি খুশি হয়ে বললাম: "আপনি দিয়েছেন—আর ভাল হবে না? খুব ভাল হয়েছে।" সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই আমতলায় স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই তিনি বললেন: "যা ব্যাটা, উদ্ধার হয়ে গেলি।" শ্রীশ্রীমা এই সংবাদ শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। অনেক বছর পরে উৎকলবাসী জনৈক প্রবীণ জ্যোতিষী আমার কোষ্ঠীবিচার করে বলেছিলেন যে, সন্ন্যাসের সময় আমার মৃত্যুযোগ ছিল। তখন বুঝলাম কেন মা সেদিন হঠাৎ আমাকে গেরুয়াবস্ত্র দিয়ে সন্ন্যাস দান করেছিলেন, কেনই বা তাড়াতাড়ি মহারাজের কাছে বিরজা হোম করিয়ে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস ও যোগপট্ট (সন্ন্যাস-নাম) নিতে আদেশ করেছিলেন।

অপর এক সময় শ্রীশ্রীমহারাজ মঠবাড়ির দোতলার পূর্বদিকের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে আছেন। আমি প্রণাম করে নিচে বসলাম। আরও কয়েকজন সাধু সেখানে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁদের সাথে কথা বলছিলেন। সেই সময় মঠের দু-তিন জন সাধু হৃষীকেশ থেকে এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ তাঁদের উদ্দেশে বললেন: "যাদের তীব্র বৈরাগ্য এবং সাধন-ভজনের খুব শক্তি নেই, তাঁদের সেখানে না যাওয়াই ভাল। যারা ছত্রের খাবার যোগায়, তারাই অর্ধেক সত্তা টেনে নেয়। শেষটায় সাধকের মনে কেবল আসতে থাকে—কখন ছত্রের ঘণ্টা পড়বে, কবে ভাণ্ডারা হবে, কবে ধুতি-কম্বল বিতরণ হবে। তার চেয়ে মঠে থেকে স্বামীজীর প্রবর্তিত জনকল্যাণমূলক কাজ নিষ্কাম-ভাবে করা অনেক ভাল। যখন জপ-ধ্যান করার খুব ইচ্ছা হবে, সেই সময় যে কদিন পার, সেখানে গিয়ে তপস্যা করবে।"

কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একবার আমাকে বলেছিলেন:

"কামারপুকুরে আবলুস কাঠের গড়গড়ার নল পাওয়া যায়। আমার জন্য একটা আনতে পারিস?" আমি বলেছিলাম: "কেন পারব না? আবার আসবার সময় নিয়ে আসব।" পরের বার যখন মঠে যাই সঙ্গে দুটি গড়গড়ার নল নিয়ে গিয়েছিলাম। একটি ছবিতে মহারাজের গড়গড়ার নল মুখ-সংলগ্ন দেখা যায়—তা ঐ নলের একটি।

আর একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "যদি জয়রামবাটী যাই মেঠাই, মুড়ি আর কড়ায়ের ডাল খাওয়াবি তো?" আমি বলেছিলাম: "কেন খাওয়াব না, এতো সাধারণ জিনিস।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থূলদেহে থাকতে তাঁর আর জয়রামবাটী আসা হয়নি। প্রতি বছর তাঁর শুভ আবির্ভাব-তিথিতে জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে বিশেষ পূজাদির অনুষ্ঠান হয়। সেই সময় ঐ ক'টি জিনিস বিশেষ যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত করে ভোগ নিবেদন করা হয়।

প্রবন্ধ

বেদের আঙিনায় ভারতবর্ষের আলপনা

বলরাম মণ্ডল

ভারতীয় সভ্যতা, জাতি, ধর্ম ও কর্মের উৎস বেদ। দৈব-দুর্বিপাক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কালে কালে ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুরই উদয়-বিলয় হয়েছে। কিন্তু বেদের বিনাশ নেই এবং তা কোনদিন বিনষ্ট হবেও না। হিন্দুদের কাছে বেদই সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়ে আসছে। নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, বিশ্বের সব-থেকে পুরনো সাহিত্য হচ্ছে বেদ। বিবিধ মনীষীর মতানুসারে বেদকে আমরা আজ থেকে প্রায় পাঁচ-হাজার থেকে দশহাজার বছর পূর্বের বলে ধরে নিতে পারি। ঋক্, সাম, যজুঃ প্রধানতঃ তিনটি বেদগ্রন্থ। অথর্ববেদকে অনেক পরের রচনা বলে মনে করা হয়। তবে অথর্ববেদের কাল যে ব্যাসদেবের বেদবিভাগের বহু পূর্বেই, সেবিষয়ে পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ। শাশ্বত ভারতবর্ষের যাকিছু সত্য ও চিরন্তন তাই বেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পরবর্তী কালের লেখকরা বেদের চারটি বিভাগ স্বীকার করেছেন। যথা—সংহিতা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষদ্। পরবর্তী কালে বেদের বহু সূত্র ও টীকা রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইলসন মনে করেন যে, বেদের অধ্যয়ন ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব থেকে শুরু হয়েছে। মানুষের জীবিকা এবং উপার্জনমুখী জীবনধারার সাথেও বেদের যোগসূত্র অতি নিবিড়। বেদে উল্লিখিত বিবিধ গল্পকাহিনীর প্রাচীনতা নির্ণয়ে আমরা সত্যই দিশাহারা হয়ে পড়ি। তবে বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও তাদের ইতিহাস (আর্থ ও সামাজিক) নির্ণয়ে সহায়ক গ্রন্থ হচ্ছে বেদ। বেদ হিন্দু জনজীবনের একটি দর্পণস্বরূপ। প্রথমে বেদ অখণ্ড ছিল এবং পরে তার বিভাগ হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণে (রচনাকাল দ্বিতীয় শতাব্দী) বেদ-বিভাগের কথা দৃষ্ট হয় যথা—

> "ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
> যজুংষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
> রাজ্ঞস্ত্বথর্ববেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ।
> কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥"

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪।১৩-১৪)

হয়তো পরবর্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত কিছু বিষয় বেদের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে। যেমন ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ভাব ও ভাষা কিছুটা পরিবর্তিত বলে মনে হয়। সে যাই হোক, ভারতীয় জনজীবনে ও সাহিত্যে বেদের প্রভাব যে অপরিসীম তা অনস্বীকার্য। কলব্রুক বেদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: "Veda is the most valuable contribution to Indian literature that has yet been made."

পঞ্চনদ প্রদেশের গঙ্গা, যমুনা বিধৌত ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার উৎস-গ্রন্থ বেদ ভারতীয় মনীষার সমুচ্চ চিন্তাধারার পরিপক্ব ফল। ইংরেজদের অনূদিত বেদ হিন্দুদের কাছে প্রথমে বিশেষ সমাদর লাভ করেনি। ইংরেজীতে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাই ছিল তার মুখ্য কারণ। কিন্তু এমন কোন মানুষ ভারতে নেই যিনি বেদের নাম শোনেননি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কালক্রমে শূদ্ররা বেদপাঠে অধিকার হারায়। প্রত্যেকটি সূক্তে একজন করে ঋষির নাম উল্লিখিত হয়েছে। ঐ ঋষিদেরকে বৈদিক ভারতবর্ষের শিক্ষক হিসাবেও চিহ্নিত করতে পারা যায়। আসলে তৎকালীন মানুষের যাকিছু শিক্ষণীয় বিষয় ও জ্ঞানের বিষয় তাই হলো বেদ। ঋষিরা ছিলেন যেমন জ্ঞানী, তেমনই ছিল তাঁদের বাগ্মিতাও।

বেদ যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের সম্পদ ছিল গরু, ছাগল, ঘোড়া, মেষ, মহিষ প্রভৃতি। এগুলিই ছিল বৈদিক ভারতবাসীর কাছে গৃহপালিত পশু। বৈদিক মানব মুদ্রার আকারে অর্থকে জানত না, এখনকার মতো 'কারেন্সী নোট'ও ছিল তাঁদের কাছে অপরিচিত। সোনা ও অন্যান্য ধাতু এবং গবাদি পশুই ছিল তখনকার মানুষের বিনিময়-মাধ্যম। (ঋগ্বেদ, ৬।২৮।৫)। এগুলি ছিল তাঁদের ধনসম্পত্তির প্রাচুর্যের প্রধান পরিচয়। গরু ছিল তাঁদের খুব প্রিয় সম্পদ। গরু বেদে বিবিধভাবে বর্ণিত হয়েছে। কখনো গরুকে আকাশের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আকাশ যদি হয় গাভী তবে মেঘ হলো গাভীর স্তন এবং মেঘ থেকে বর্ষিত জলধারা হলো দুধ। আবার বলা হয়েছে—পৃথিবী যদি গাভী হয় তবে গাভীর দুধ হচ্ছে পৃথিবীতে উৎপাদিত সবুজ শস্য। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, বৈদিক যুগের মানুষের আনন্দদায়ক চিন্তাধারার কেন্দ্রই ছিল যেন গরু বা ধেনু। অবেস্তা ধর্মগ্রন্থেও গাভীকে প্রধান অবলম্বন বলা হয়েছে। মানুষেরা গরুর জন্য ভিক্ষা করত দেবতার কাছে—"অস্মভ্যং শর্ম সপ্রথো গব্যেহশ্বায় যচ্ছত"— ঋগ্বেদ, ৮।৩০।৪)। পণ্যবিনময়ের ক্ষেত্রেও গরু সাদরে গ্রহণীয় ছিল। জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয় হতো প্রধানতঃ গরুকেই মাধ্যম হিসাবে রেখে। গরু যেমন ছিল অর্থস্বরূপ আবার গরুর দুধ ও তার থেকে তৈরি ননী, ঘি, মাখন প্রভৃতি ছিল মানুষের প্রধান খাদ্য। চাষীরা গরুকে ক্ষেতে চাষের জন্য ব্যবহার করত, ভারবাহী হিসাবেও কাজে লাগাত। ভূমিকর্ষণ করে ক্ষেতে যেসকল শস্য আর্যগণ উৎপাদন করতেন, তার মধ্যে যব ছিল প্রধান। এই 'যব' শব্দটি দ্বারা কেবল বর্তমানকালের যবকেই বোঝাত না। যব বলতে সেযুগের অন্যান্য সকল শস্যকেও বোঝাত। পানীয় হিসাবে সোমরস ও সুরা ছিল প্রধান। এই সোমরস রাখা হতো গরুর চামড়ায় তৈরি আধারে। বৈদিক হোম ও যজ্ঞকাণ্ডে গরুকে আহুতি দেওয়া হতো। আবার যজুর্বেদের কালে গো-হত্যাকারীর শাস্তিবিধান প্রচলিত ছিল। কাজেই মনে করা যায় যে, বৈদিক ভারতে দুটি সম্প্রদায়ের মানুষের প্রাধান্য ছিল—একটি সম্প্রদায় গো-বধ করত এবং আর একটি সম্প্রদায় ছিল, যারা মনে করত গো-বধ করা মহাপাপ। অবেস্তা সাহিত্যেও (৬ষ্ঠ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) আমরা লক্ষ্য করি যে, সেখানে গো-হত্যা এবং গো-বিক্রয়কে ঋষি জরথুস্ট্র নিষিদ্ধ করেছিলেন।

বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থা ছিল খুব উন্নত মানের। মানুষের চলাফেরার জন্য ছিল সুসজ্জিত ও প্রশস্ত রাজপথ। স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার জন্য এবং জিনিসপত্র বহন করার জন্য যান হিসাবে ব্যবহৃত হতো শকট এবং রথ। সাধারণতঃ এগুলির বাহক ছিল ঘোড়া। প্রাচীন ইরানেও যানবাহক হিসাবে ঘোড়া এবং উটকে ব্যবহার করা হতো। বেদের মধ্যে যুদ্ধরথেরও উল্লেখ আছে। এই শকট বা রথ ছিল কাঠের তৈরি। চাকা ছিল পিতলের এবং স্তম্ভগুলি ছিল লোহার। বসার জন্য আসন ছিল। ওপরে টাঙানো থাকত চাঁদোয়া কোন কোন ক্ষেত্রে চাঁদোয়াটির ভিতর দিকে লাগানো হতো সোনালী ঝালর।

বৈদিক যুগের নরনারী উভয়েই সোনার গহনা পরিধান করত। যেসকল অলংকারের উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে হাতের বালা, কানের কুণ্ডল (ঋগ্বেদ, ৮।৭৮।৩), পায়ের তোড়া এবং মুকুটই ছিল প্রধান (ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।৮)। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম হিসাবে মহাবর্ম, শিরস্ত্রাণ, তরবারি, বর্শা, তীর (লোহার

ফলকযুক্ত), বক্ষস্ত্রাণ ও পৃষ্ঠত্রাণের উল্লেখ বেদে পাই। সাধারণ যোদ্ধাদের বক্ষঃদেশে ও পৃষ্ঠদেশে বর্ম আটকে দেওয়া হতো। এরূপ বর্ম আটকে দেওয়ার রীতি আসিরীয় ও পারসিক যোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও ছিল।

বৈদিক ভারতবর্ষে গৃহকোণেও যে ছোট ছোট হস্তশিল্পের প্রচলন ছিল, নরনারীর কর্মের উল্লেখের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পাই। যেমন, পুরুষেরা সুতো বা দড়ি তৈরি করতে পারতেন এবং মেয়েরা সূক্ষ্ম সূচের কাজ জানতেন। তাঁরা চামড়ার তৈরি ব্যাগে, পারসী ভাষায় যাকে 'ভিস্তি' বলা হয়, করে জল নিয়ে আসতো নিজেদের ব্যবহারের জন্য। বৈদিক ভারতবর্ষে সুতির ও তুলার বস্ত্র তৈরি হতো। বস্ত্রের উল্লেখ ঋগ্বেদে লক্ষ্য করি। 'রোমশা গান্ধারীণামিবাবিকা' (১।১২৬।৭), সৌমেরোর্ণস্তু জুর্ন বর্ন্ত্রেঃ (২।১৪।৩)। স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র তৈরিতে খুবই নিপুণ ছিলেন এবং সপ্তসিন্ধুপ্রদেশে (বর্তমান পাঞ্জাব ও হরিয়ানার) একসময় বস্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল বলে মনে করা হয় (২।৩।৬, ২।৩৮।৪, ৫।৪৭।৬)। তন্তুবায়রা বস্ত্রতৈরির কাজে এতই সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে তাঁরা কখনো বস্ত্রতৈরির সময় বস্ত্র ছিন্ন করতেন না ('বি তন্বাথেধিয়ো বস্ত্রাণ্যসৈব', ১০।১০৬।১)।

বৈদিক ভারতবর্ষে যেমন প্রচুর অরণ্যসম্পদের উল্লেখ পাই, সেরূপ একাধিক বন্য জন্তুরও উল্লেখ লক্ষ্য করি। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে যেসকল জন্তুর উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে সিংহ, বাঘ (পুরুষাদ), ভালুক (ঋক্ষ), বানর (কপি), শূকর, নেকড়ে বাঘ (বৃক) প্রভৃতি প্রধান। বেদে বুনো হাতির অধিক উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু গৃহপালিত হাতির সাথে মাত্র একবারই আমরা পরিচিত হই। যুদ্ধক্ষেত্রে হাতির ব্যবহার হতো কিনা সেরূপ কোন উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। এই বিষয়টি ঐতিহাসিকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হাতি ও রুদ্র বা শিবের বাহন ষাঁড়ের উল্লেখ নেই।

সে-যুগের মানুষ অনেক স্তম্ভযুক্ত বড় হলঘরের আকৃতিবিশিষ্ট ঘরেই বসবাস করত। বেদে সেই ঘরকে আকাশের সাথে তুলনা করা হয়েছে। (ঋগ্বেদ, ২।৪১।৫, ৩।৬২।৬)। এখনকার মতো সে-যুগেও শহর ছিল, কেননা তৎকালীন মানুষেরা একত্র হতো নগরীতে। শত্রুনগরীর উল্লেখও দৃষ্ট হয়। কিন্তু নগরীর কোন নাম পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্ন রাজার নাম পাওয়া যায়, যেমন—ভরত, যদু, তুর্বসু, অনু, পুরু প্রভৃতি। এই সকল রাজার অধীনে অনেক জাতির লোকেরা বাস করত। প্রয়োজনে এইসব লোকেরা রাজার হয়ে যুদ্ধও করত। চেদী জাতির লোকেরা যমুনা ও বিন্ধ্যপর্বতমালার মাঝামাঝি জায়গায় বসবাস করত—কশু রাজার অধীনে (ঋগ্বেদ, ৮।৫।৩৭-৩৯)। গান্ধার জাতির লোকেরা বাস করত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। কীকট, কিরাত, চণ্ডাল, পর্ণক প্রভৃতি জাতি অনার্য বলে খ্যাত ছিল। এরা প্রায়ই গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস করত। তবে তারা কোন না কোন রাজার অধীনে ছিল। রাজা সকল বর্ণ ও আশ্রমের মানুষকে রক্ষা করতেন। গৌতমের ধর্মসূত্রে লিখিত রয়েছে: "বর্ণানাশ্রমাংশ্চ ন্যায়তোহভিরক্ষেৎ। চলতশ্চৈতান্ স্বধর্মে স্থাপয়েৎ। ধর্মস্য হ্যংশভাগ্‌ভবতীতি। (১১।৯-১১)। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রেও লিখিত আছে: "দেশধর্মজাতিকুলধর্মান্‌সর্বানেবৈতাননুপ্রাবিশ্য রাজা চতুরো বর্ণান্ স্বধর্মে স্থাপয়েৎ। তেষ্বপচরৎসু দণ্ডং ধারয়েৎ।" (১৯।৭-৮) মনু বলেছেন: বর্ণানামাশ্রমাণাং চ রাজা সৃষ্টোহভিরক্ষিতা।' (মনুসংহিতা, ৭।৩৫)। পরবর্তী কালে অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন রাজার কর্তব্যাকর্তব্যের। সেটি ছিল বেদেরই ঐতিহ্য। তিনি বলেছেন (১।৪-১৬):

"চতুর্বর্ণাশ্রমো লোকো রাজ্ঞা দণ্ডেন পালিতঃ।
স্বধর্মকর্মাভিরতো বর্ততে স্বেষু বর্ত্মসু॥"

সুতরাং, বেদ এবং বৈদিক পরম্পরা রাজারা যে জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রজাদের রক্ষা করতেন, তা এসকল সূত্র থেকে আমরা ধারণা করতে পারি।

রাজার আলোচনা-কক্ষ বা বিচারশালাও ছিল। এখনকার মতো সেযুগে আলোচনার জন্য 'সভাকক্ষ' বা 'সমিতিগৃহ' ব্যবহৃত হতো। ঋগ্বেদের মধ্যে এই ধরনের সভার উল্লেখ লক্ষ্য করি (৬।২৮।৬, ৮।৪।৯)। বৈদিক যুগে এই সভাকক্ষে পাশাখেলাও হতো (১০।৩৪।৬)। এই পাশাখেলার ধারা মহাভারতের যুগেও (১৪০০—১৬০০ খ্রীস্টপূর্ব) অব্যাহত ছিল।

বেদে কোন মন্দিরের এবং প্রতিমার উল্লেখ পাই না। প্রাচীন ইরানে অবশ্য দেবী অনাহিতার এবং অগ্নি ও মিথ্রের মন্দির ছিল। কিন্তু অবেস্তা-পরবর্তী যুগে তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। সুপ্রশস্ত রাজপথের ধারে পান্থনিবাস ছিল। তবে দস্যু ও তস্করের প্রাদুর্ভাবে পথিকদের যথাসর্বস্ব যে লুণ্ঠিত হতো, এমন প্রমাণও আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই। বৈদিক ভারতবর্ষে সুচিকিৎসার সাথে সাথে ভাল ঔষধপথ্যাদিও ছিল। রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

ভারতবর্ষের সমাজে নারী ছিলেন সম্মানিতা। তাঁরা ছিলেন দয়া, দাক্ষিণ্য ও মমতার আধার। বহু ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নীর উল্লেখ পাই, যাঁরা প্রজ্ঞা ও মনস্বিতায় ছিলেন সমুজ্জ্বল। ঋষিপত্নীরা ঋষিদের সঙ্গেই চলাফেরা করতেন, যজ্ঞে একই সাথে মন্ত্র উচ্চারণ এবং একই সাথে যজ্ঞাহুতি দিতেন। ঋষিদের মতো তাঁরাও আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করতেন। শিক্ষা-দীক্ষাতেও তাঁরা উন্নত ছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, লোপামুদ্রা, প্রভৃতি প্রথিতযশা বিদুষী নারীর উল্লেখও দৃষ্ট হয়। মনোহারিণী, সুন্দরী নারীর উল্লেখও বেদে রয়েছে। সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। মানুষ যে চিরসুন্দরের মধ্যেই বিলীন হতে চায়, তার প্রমাণ রয়েছে বেদের পাতায় পাতায়। নবীনা উষার হৃদয়হারী মূর্তি দেখে নবীন ঋষিগণ তাকে আহ্বান করেছেন ঃ

"যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব উতয়ে
জুহূরেঽবসে মহি।
সা নঃ স্তোমাঁ অভি গৃণীহি
রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥"
(ঋগ্বেদ, ১।৪৮।১৪)

অবিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রীলোক শোভাযাত্রাতেও অংশগ্রহণ করতেন। বিবাহযোগ্যা কন্যা পিতৃগৃহে বেশ সুখেই কালাতিপাত করতেন। অবিবাহিতা কন্যাকে কোনরকম ভর্ৎসনা সহ্য করতে হতো না। তৎকালীন সমাজে একাধিক বিবাহেরও প্রচলন ছিল। একজন পুরুষ একাধিক মহিলাকে বিবাহ করতে পারতেন, যেমন ঋষি কক্ষিবৎ বিবাহ করেছিলেন দশজন কন্যাকে। জরথুস্ত্রীয় যুগে প্রাচীন ইরানে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এই প্রথা বৈদিক যুগে বজায় থাকলেও প্রাচীন ইরানে তা অনুসৃত হয়নি। বৈদিক যুগেও স্বয়ম্বর প্রথার মাধ্যমে বিবাহ হতো। অনেক সময় বিবাহের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধত। বেদে লিখিত আছে—পুরুমিত্রের কন্যা কমদ্যু বিমদকে বিবাহ করায় প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পথের মধ্যেই বিমদকে আক্রমণ করে। তখন অশ্বিদ্বয় সেই আক্রমণ থেকে উদ্ধার করে কমদ্যু ও বিমদকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন (ঋগ্বেদ, ১।১১৬।১)। পরবর্তী কালের গন্ধর্ব বিবাহ বা রাক্ষস বিবাহের আদিরূপও বেদে পাওয়া যায়।

বৈদিক ভারতবর্ষের দেব-দেবী ও তাঁদের উপাসনা কিরূপ হতো? ধর্মের উপাসনার জন্য মঠ ও মন্দিরের অভাব বেদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পুরাণের যুগের বহু দেব-দেবীর নামই বৈদিক ভারতে লোকের জানা ছিল না। শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি বর্তমানে প্রচলিত নামে পুরাণের দেব-দেবীরা ও অবতারগণ বেদের মধ্যে অনুপস্থিত। বেদে উল্লিখিত রুদ্র হচ্ছেন ঝঞ্ঝার দেবতা, ঝড়ের পিতা। পরবর্তী কালে শিবই বেদের রুদ্রের স্থান নিয়েছেন। বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই ছিলেন প্রধান। ইন্দ্র ছাড়াও অগ্নি, বরুণ, আদিত্য, মিত্র, পূষণ ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারাও উপাসিত হতেন। বিষ্ণু কখনো কখনো আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছেন। সূর্যরশ্মির সাথে তিনি ব্যাপ্ত আছেন—এরূপও বলা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে "ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" (ঋগ্বেদ, ১।২২) অর্থাৎ বিষ্ণু ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, কালের গতিপথে সাহিত্য ও সমাজ বিবিধরূপে পরিবর্তিত হতে হতে ভারতীয় জনজীবনে যে-রূপে প্রতিফলিত হয়েছে, তাকে আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখতে পাই যে, এই রূপ বৈদিক এবং পরবর্তী কালের পৌরাণিক ভারতবর্ষের রূপেরই আধুনিক সংস্করণমাত্র।

পরমপদকমলে

‘মন-মত্তকরী’

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সবাই বসে আছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তখন সাধন-জগতের এক উচ্চ মণ্ডলে অবস্থান তিনি সমাধিস্থ। বসে আছেন রাখাল, পরবর্তী কালের স্বামী ব্রহ্মানন্দ। রাখাল হঠাৎ বললেন: “মন-মত্তকরী।”

অবশ্যই। কোন সন্দেহ নেই। ভিতরে নড়ছে-চড়ছে আর দেহ তার খিদমত খাটছে। রামপ্রসাদ দুঃখ করছেন: “মন-গরিবের কি দোষ আছে!” ঠাকুর রামপ্রসাদকে বড় ভালবাসতেন। প্রায়ই উল্লেখ করতেন তাঁর জীবনদর্শনের।

রামপ্রসাদ লিখছেন:

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
(ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ)
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুখে নাচ॥
রঙের বেলা রাঙে কড়ি,
সোনার দরে তা কিনেছ।
ও মন, দুঃখের বেলা রতন মানিক,
মাটির দরে তা বেচেছ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা,
সেই রূপে মন মজায়েছ।
যখন সে রূপে বিরূপ হবে,
সে রূপের কিরূপ ভেবেছ॥

“তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ।” দুঃখে রোদন সুখে নাচটা তবু সহ্য হয়। ঠিক আছে, ঐটাই যুগ যুগ ধরে জীবের স্বভাব-ধর্ম; কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এই ফেরা ঘোরা? এ যে মহাযন্ত্রণা! মন-মাছি ভন ভন, ফন ফন করে উড়ছে। ঠাকুর আমাদের মনের স্বরূপ আমাদের কাছেই উদ্ঘাটন করে দিচ্ছেন। মন কেমন? (১) মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার ছুঁচ, (২) সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে। (৩) বজ্জাৎ ‘আমি’। সেটা কে? যে ‘আমি’ বলে, ‘আমায়’ জানে না? আমার এত টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরি করে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপর চোরকে খুব মারে; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিসে দেয় ও ম্যাদ (মেয়াদ) খাটায়, ‘বজ্জাৎ আমি’ বলে জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে! এত বড় আস্পর্ধা! (৪) মন যেন সাধারণ মাছি, সন্দেশেও বসে আর পচা ঘায়েও বসে, বিষ্ঠাতেও বসে। (৫) মন কাম-কাঞ্চনে। (৬) কত রকমের ‘আমি’ কাচা আমি, বজ্জাত আমি, পাকা আমি। ‘পাকা আমি’ কেমন—(ক) বালকের আমি, (খ) ঈশ্বরের দাস আমি, (গ) বিদ্যার আমি। (৭) আমি—সে কেমন? (ক) অবিদ্যার আমি, (খ) কাঁচা আমি। তার স্বরূপ? একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচ্চিদা-নন্দ সাগরের জলে ঐ লাঠি। জলকে দু-ভাগ করেছে। আর ‘ঈশ্বরের দাস আমি’, ‘বালকের আমি’, ‘বিদ্যার আমি’ জলের ওপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে—শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দুভাগ জল। বস্তুতঃ একজল দেখা যাচ্ছে। (৮) মন নিয়ে কথা। মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ হবে। মনেতেই জ্ঞান, মনেতেই অজ্ঞান। অমুক লোক খারাপ হয়ে গেছে অর্থাৎ অমুক লোকের মন খারাপ রঙ ধরেছে। (৯) মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে তো ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছ; কাম-কাঞ্চনে বন্ধক। তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার।

মনস্তাত্ত্বিক ঠাকুর আমাদের মন চুরমার করে দিয়ে গেছেন। ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন বিচার। হুঁশ

'ইনজেক্ট' করে দিয়েছেন। বেতালা পা পড়লেই ভিতরটা হায় হায় করে ওঠে। একালের মিছিলে স্লোগান দেয়—চলছে না, চলবে না। সেইরকম মন মনকে দেখে বলে ওঠে—হচ্ছে না, হবে না। ওভাবে হবে না। বন্ধ ঘরে চড়ুই পাখির মতো ফরফর করে মন উড়ছে। ধরে বসানো যাচ্ছে না। কোথায় বসানো? ত্যাগের পিঁড়িতে। বাইরে ত্যাগ নয়, ভিতরে ত্যাগ। চাই না, সত্যিই কিছু চাই না। বিষয়ের জন্যে, ভোগের জন্যে, ক্ষমতার জন্যে, যশ-খ্যাতির জন্যে অন্তরে দগ্ধ হই না। রবারের থলেতে দামাল হুলোর মতো, এদিকে চেপে ধরলে ওদিকে ঠেলে ওঠে না।

সম্রাটের মতো মন বসে আছে মনের আসনে। তৈলধারার মতো গড়িয়ে চলেছে ইষ্টপদের দিকে। অচল, অটল। মন নিয়ে মহা লাঠালাঠি। অবোধ, নির্বোধ বালকের মতো, চেনে বাঁধা বাঁদরের মতো তিড়িং বিড়িং। এমন মন তো কোন সত্যের ধারণা করতে পারবে না।

রামপ্রসাদ বলছেন:

বাসনাতে দাও আগুন জেবলে
স্বভাব হবে পরিপাটি।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই
মনের ময়লা ফেল কাটি।
কালীদহের কূলে চল,
সে জলে ধোপ হবে ভাল।
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল,
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি॥

চৈতন্যের ভাঁটি, চৈতন্যের আগুন জেবলে সব পাপ পুড়িয়ে ফেল, আর চল, নিজেকে নিয়ে বসাই কালীদহের কূলে।

তুলসীদাস বলছেন:

যো পরবিত্ত হরে সদা,
সো কহু দান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার করে সদা,
সো কহু তীর্থ গয়া ন গয়া॥
যো পর আশ করে সদা,
সো বহু দিন জিয়া ন জিয়া।
যো মুহুমে পরচুকলি ওগারত,
সো মুহুমে হরিনাম লিয়া ন লিয়া॥

নিরন্তর যে পরস্বহারী সে দান করল কি না করল, দুই-ই সমান। নিরন্তর পরদারগামী, তার তীর্থে যাওয়া আর না যাওয়া। পরপ্রত্যাশীর মরা বাঁচায় কিছু যায় আসে না। আর পরনিন্দাকারীর হরিনাম করাও যা না করাও তাই। সবই ভস্মে ঘি ঢালা।

নলখাগড়ার বন, ঘোলা জল, সরীসৃপের বিচরণ, ব্যাঙাচির লাফ, তারই মধ্য দিয়ে যেতে হবে সাবধানে। একটু একটু করে সরিয়ে সরিয়ে, প্রখর দৃষ্টি, সজাগ মন। ছুঁচে সুতো পরাবার সময়ের তীক্ষ্ণ মন। একমুখী মন। কাম-কাঞ্চনে বন্ধক মন নিয়ে কি করা দরকার? ঠাকুরের নির্দেশ:

"সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার। মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন-ভজন হবে। সর্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জনে রাত-দিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসঙ্গ। মন একলা থাকলে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়। এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গাজলের ভিতর যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখ তাহলে শুকবে না। কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল। আবার আলাদা করে রাখ, যেমন কালো লোহা, তেমনি কালো। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়। আমি কর্তা, আমি করছি তবে সংসার চলছে; আমার গৃহ পরিজন—এসকল অজ্ঞান। আমি তাঁর দাস, তাঁর ভক্ত, তাঁর সন্তান—এ খুব ভাল। একেবারে 'আমি' যায় না। এই বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছ, আবার কাটা ছাগল যেমন একটু ভ্যা ভ্যা করে হাত পা নাড়ে, সেইরকম কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। তাঁকে দর্শন করবার পর, তিনি যে 'আমি' রেখে দেন, তাকে বলে 'পাকা আমি'। যেমন তরবার পরশমণি ছুঁয়েছে, সোনা হয়ে গিয়েছে।" আবার সতর্ক করছেন ঠাকুর এইভাবে: "হাতির বাহিরের দাঁত আছে আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাহিরের দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি ভিতরে ভোগ করলে ভক্তির হানি হয়।" ঠাকুর বলছেন: "শকুনি উপরে ওঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। হাওয়াই হুস করে প্রথমে আকাশে উঠে যায় কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায়।" বাইরে থেকে মন দেখা যায় না।

বসে আছে অন্দরমহলে। সেখানে হাসছে, সেখানে কাঁদছে, বসে বসে কালনেমির লঙ্কা-ভাগ করছে। ভাঙছে-চুরছে। কতকাল আগে মজার একটি কবিতা লিখেছেন ই. এ. রবিনসন :

RICHARD CORY

[উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা গেল না]

"Whenever Richard Cory
went downtown,
We people on the pavement
looked at him :
He was a gentleman from
sole to crown,
Clean favoured,
and imperially slim.

And he was always quitely arrayed,
And he was always
human when he talked ;
But still he fluttered pulses
when he said
"Good Morning" and
he glittered when he walked.

And he was rich—yes,
richer than a king
And admirably schooled
in every grace :
In fine, we thought that
he was everything
To make us wish that
we were in his place.

So on we worked and
waited for the light,
And went without the meat,
and cursed the bread ;
And Richard Cory,
one calm summer night
Went home and put a
bullet through his head."

এই 'isolation'-এর কথাই ঠাকুর বলছেন তাঁর অনবদ্য অসাধারণ ভাঁড়ের উপমায়। চিত্ত নামক জল শুকিয়ে যায়। কত কি? তবু 'প্রাণ কেন কাঁদে রে।' রিচার্ড কোরির মতো অবশেষে একটি বুলেট কপালে। ঠাকুর আমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্। বলছেন, শোন, ঐ নরেন (স্বামীজী) গাইছে :

সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম
শ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ,
সে পান্থ-নিবাসীজনে ॥

'দি বুক অফ ফাইভ রিংস'-এ আছে—'হেইহো কোকোরো মোচি নো কোতো'। 'হেইহো' জাপানী সাধনধারা, বুদ্ধ প্রভাবিত। মনই যেখানে মানুষের তরবার। ঠাকুর যে-তরবারে পরশমণি ছোঁয়াতে বলেছেন, সেই মনের সাধনা 'হেইহো'। পরিষ্কার নির্দেশ : "keep your mind on the centre and do not waver. Calm your mind, and do not cease the firmness for even a second. Always maintain a fluid and flexible, free and open mind. Even when the body is at rest, do not relax your concentration."

তাহলে, চলে আসি আবার প্রথমে। রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলছেন : "মন-মত্তকরী।"

ঠাকুর বলছেন : "ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।"

আর ঐ সিংহ। ঐ তো প্রহরী, "পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে।" ঠাকুর বলছেন : "সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে।"

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের আয়ু ও জনসাধারণের আয়ুঃ একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

জলধিকুমার সরকার

সাধু-সন্ন্যাসীদের আয়ু সম্বন্ধে অনেক কথা ও উপকথা শোনা যায়। কারও কারও ভাসা ভাসা ধারণা আছে যে, সাধুরা জনসাধারণের চেয়ে বেশি-দিন বাঁচেন। তবে এই বিষয়ে, বিশেষতঃ কোন বিশেষ ধর্মীয় সঙ্ঘের সাধুদের কেন্দ্র করে তথ্য-ভিত্তিক আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (স্থাপিত ১৮৯৯) নিয়মিতভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী-দের দেহত্যাগের খবর প্রকাশিত হয়ে আসছে। গোড়ার দিকে কোন কোন সাধুর দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স উল্লিখিত না থাকলেও পরবর্তী কালে ও বর্তমানে প্রয়াত সাধু-ব্রহ্মচারীদের বয়স উদ্বোধন পত্রিকায় উল্লেখিত হয়। গোড়ার দিকে বয়স উল্লেখ না থাকার একটি কারণ হয়তো এই যে, মঠের যোগদানকারীদের বয়স লিখে রাখার ব্যবস্থা তখন চালু ছিল না, যা পরবর্তী যুগে হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় 'উদ্বোধন পত্রিকার নব্বইতম বর্ষে পদার্পণঃ কিছু সংবাদ' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—"পুরাতন সংখ্যাগুলি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করলে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ও তদানীন্তন বাঙালী সমাজের অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যাবে।" বর্তমান প্রবন্ধ সেই অধ্যয়নের ফলশ্রুতি।

কিভাবে এই সমীক্ষা করা হয়েছে

যেসব সাধু বা ব্রহ্মচারীর মৃত্যুকালে বয়স উল্লিখিত আছে (প্রায় ৯৫ শতাংশ) কেবল তাঁদেরই এই সমীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ঃ এইসব সাধু-ব্রহ্মচারীরা যে-বয়সে মঠে যোগদান করেছিলেন, তৎকালীন সেই বয়সের গৃহী ভারতীয়রা এঁদের তুলনায় কম বা বেশি বছর জীবিত ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে সাধুদের মঠে যোগদানকালের বয়স বলা নেই। হিসাবের সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধে সব সাধুদের মঠে যোগ-দানকালের বয়স ধরে নেওয়া হয়েছে ২৫ বছর, কারণ দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ সাধু সঙ্ঘে যোগদান করেন ২১—৩০ বছর বয়সে। দেহত্যাগের বয়স থেকে হিসাব করে সাধু-ব্রহ্মচারীদের যে-বছর (খ্রীস্টাব্দে) ২৫ বছর বয়ঃক্রম পড়ে, সেই বর্ষে ২৫ বছর বয়স্ক গৃহী ভারতীয়দের 'প্রত্যাশিত আয়ু' (Expectation of life) গণনা করে, তার সঙ্গে প্রয়াত সাধু-ব্রহ্মচারীদের আয়ুষ্কালের তুলনা করে, সাধুরা অপেক্ষাকৃত বেশি (+) বা কম (−) বছর জীবিত ছিলেন এবং সেই বেশি বা কম কত বছরের, তা হিসাব করা হয়েছে। বিভিন্ন বয়সের ভারতীয়দের 'প্রত্যাশিত আয়ু' পাবার জন্য ভারত সরকার প্রকাশিত একটি পুস্তিকার[১] তালিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই পুস্তিকায় ভারতে প্রথম লোকগণনার (census) বছর ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন বয়সের লোকদের 'প্রত্যাশিত আয়ু' দেওয়া আছে। তুলনার জন্য সাধুদের মঠে যোগদানের সময়টিকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, ঐসময় থেকেই সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনধারা গৃহীদের থেকে তফাৎ হয়ে

১ অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্থ, কলকাতার প্রফেসর অফ এপিডিমিয়লজি ডাঃ অরুণকুমার চক্রবর্তীর সহযোগিতায় 'Health Information India—1988, Central Bureau of Health Intelligence, Director General of Health services New Delhi, p. 44. অবলম্বনে হিসাব করা হয়েছে।

যায়। কিভাবে এই হিসাব করা হয়েছে, তা উদাহরণের সাহায্যে বোঝালে সুবিধা হবে। ধরা যাক ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে যেসব ভারতীয়দের বয়স ২৫ বছর, উপরি উক্ত সরকারি তালিকা অনুযায়ী তাঁদের 'প্রত্যাশিত আয়ু' আরও ৩২ বছর। অর্থাৎ তাঁদের দেহত্যাগ করার সম্ভাবনা ৫৭ বছর বয়সে (অর্থাৎ ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে)। একজন সাধু যিনি [উদ্বোধনের খবর অনুযায়ী] ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন, হিসাব করলে পাওয়া যাবে যে, তিনি মঠে যোগদান করেছিলেন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে (২৫ বছর বয়সে)। তালিকার হিসাবমত তাঁর দেহত্যাগের সময়—৫৭ বছর বয়সে, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ সেই সাধু ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করায় গৃহীদের তুলনায় তিনি তিন বছর বেশি (+৩) বেঁচেছিলেন।

বিহীন জীবন, নিয়মিত (ব্রাণকার্যকাল, পরিব্রাজক অবস্থা ও পাহাড়ী অঞ্চলে তপস্যাকাল ছাড়া অন্য সময়) ও পরিমিত আহার এবং সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন—এগুলি হয়তো সাধুদের দীর্ঘজীবী হওয়ার কয়েকটি বিশিষ্ট কারণ। দীর্ঘ জীবন লাভে ধ্যান-জপের প্রভাবও বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

তালিকাতে দেখানো নেই, এরূপ দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে। বিরানব্বইতম বর্ষ পর্যন্ত উদ্বোধন পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে যে, সর্বাপেক্ষা বেশি বয়সে (১০০ বছর) দেহত্যাগ করেছেন স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ); তার পরেই আছেন স্বামী নির্বাণানন্দ (৯৪ বছর)। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের আয়ু বিষয়ে, যা দিয়ে উপরিলিখিত তালিকার গণনা আরম্ভ হয়েছে। আরম্ভ হয়েছে বলা হলো এই জন্য যে, ভারত

	কম (—)			কম বা বেশি নয়	বেশি (+)					
বয়স	১-১০	১১-২০	২১-৩০	০	১-১০	১১-২০	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০
কতজন	১০	১৪	৫	৩	৫২	৭২	৯১	৬১	১৯	১
শতকরা	২'৯	৪'১	১'৪	০'৪	১৫'৮	২১'৮	২৭'৪	৫'৬	৫'৬	০'২
মোট	২৯জন			৩জন	৩০০জন					

সমীক্ষার ফল

উদ্বোধনের প্রথম বর্ষ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে ৯২তম বর্ষ (১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত ৩৩৯জন প্রয়াত সাধু-ব্রহ্মচারীর 'প্রত্যাশিত আয়ু' হিসাব করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, এঁদের মধ্যে ২৯জনের (৮'৫ শতাংশ) গৃহীদের চেয়ে আয়ু কম, ৩জনের (০'৮ শতাংশ) আয়ু গৃহীদের সমান এবং ৩০৭জনের (৯০'৫ শতাংশ) গৃহীদের তুলনায় বেশি ছিল। কতজন প্রয়াত সাধু-ব্রহ্মচারীর বয়স 'প্রত্যাশিত আয়ু'র চেয়ে কম বা বেশি ছিল এবং তা কত, উপরিলিখিত তালিকায়* সেটি দেখানো হয়েছে।

ওপরের তালিকা থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধুরা গৃহীদের তুলনায় বেশিদিন জীবিত ছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এরকম হয়? এর সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। সৎ চিন্তা, সৎ জীবনযাপন, ব্রহ্মচর্য পালন, সাংসারিক উদ্বেগ-

সরকারের 'প্রত্যাশিত আয়ু'র তালিকা শুরু হয়েছে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আগে যেসব সাধুর (যেমন স্বামী যোগানন্দের) দেহত্যাগ হয়েছিল, ঐ তালিকা থেকে তাঁদের সময়ের গৃহীদের 'প্রত্যাশিত আয়ু' গণনা করা সম্ভব নয়। স্বামীজীরও ২৫ বছর বয়স ধরে হিসাব করলে ঐ তালিকার আওতায় আসবে না বলে তাঁর ক্ষেত্রে ৩৮ বছর বয়ঃক্রম ধরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বয়সের গৃহীদের 'প্রত্যাশিত আয়ু' হিসাব করা হয়েছে। এইভাবে হিসাবে স্বামীজীর 'প্রত্যাশিত আয়ু' দাঁড়ায় ৫৬ বছর। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, স্বামীজী সেইকালের মাপকাঠিতে 'প্রত্যাশিত আয়ু'র ১৭ বছর আগে দেহত্যাগ করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের স্বামী বিবেকানন্দের আয়ু প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "তোদের সুবিধা করবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে করে তাঁর আয়ু এত কমে গেল।"

* তালিকা প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছেন কুমকুম ঘোষ।

মহাজীবনকথা ও তত্ত্বভাবনা

তারকনাথ ঘোষ

হে মহাজীবন [চিরকালের দিগ্‌দিশারী], **৩য় খণ্ড ঃ** সমীরণ রুদ্র। সলিল সাহিত্য প্রকাশনী, ৩/এ বিডন স্কোয়ার, কলকাতা-৬। মূল্য ঃ কুড়ি টাকা।

বিশ্ব-রহস্য ঃ মৃগেন্দ্রচন্দ্র দাস। প্রকাশিকা ঃ শ্রীমতী সতী দাস, ১৯৯/২ এস. কে. দেব রোড, কলকাতা-৪৮। মূল্য ঃ আট টাকা।

সৎ চিৎ আনন্দময় (শ্রীঅরবিন্দ ভাষ্য) ঃ সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য ঃ পাঁচ টাকা।

'হে মহাজীবন' চল্লিশটি নিবন্ধে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনবৃত্ত ও কৃতিত্বের বর্ণনা। এঁদের মধ্যে আছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাতজন শিষ্য, আবার কয়েকজন সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষও। নিবন্ধগুলি পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় বা স্মরণিকাগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি নিবন্ধ বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে লেখা হয়েছে। লেখক সহজ ভাবাবেগময় ভাষায় নানা প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন, বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হননি। প্রচুর তথ্যের সমাবেশ থাকলেও অনেক রচনা গ্রন্থনার দিক দিয়ে তরল 'ফিচার'-ধর্মী হয়েছে। নিবন্ধগুলি সুসম্পূর্ণ না হলেও লেখকের আন্তরিকতার প্রশংসা করতে হয়। মূল গ্রন্থের প্রারম্ভে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশংসাপত্র অবান্তর এবং গ্রন্থটির মর্যাদাবৃদ্ধি করেনি।—মুদ্রণে কিছু কিছু ত্রুটি আছে; বাঁধাই ও প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়।

'বিশ্ব-রহস্য' দার্শনিক সন্দর্ভ-সংকলন। লেখক প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নমুখে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আধুনিক পদার্থবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদ্ তত্ত্ব-ভাবনার বিচার ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক বিভিন্ন উপনিষদ্ থেকে মন্ত্র বা মন্ত্রাংশের ভাব অথবা বৈদান্তিক তত্ত্ব উপস্থাপনা করেছেন এবং মুখ্যতঃ স্বামী বিবেকানন্দের তত্ত্ব-চিন্তামূলক রচনাবলীর অনুসরণ করে এবং কোন কোন উক্তি উৎকলন করে বক্তব্য বিষয় প্রতিপাদন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। জগদ্রূপ, জ্ঞান, জ্ঞাতৃ বা সাক্ষীরূপ, বিশ্বমন বা হিরণ্যগর্ভ-চৈতন্য, স্বরূপ বা ব্রহ্মচৈতন্য ইত্যাদি বিষয়ে বৈদান্তিক তত্ত্বের সঙ্গে অবিরোধে স্বামীজীর ভাবনাই রূপায়িত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে লেখক বৈদিক বা ঔপনিষদিক তত্ত্ব, আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শন এবং বিশেষভাবে স্বামীজীর তত্ত্বচিন্তার সমন্বয়সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আশা করা যায়, গ্রন্থটি বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হবে। কাগজের মলাট; কিছু কিছু অশুদ্ধি থাকলেও (সংশোধনপত্র আছে) মুদ্রণাদি পরিপাটি।

'সৎ চিৎ আনন্দময়' শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের সরলীকৃত ভাষ্য। অবশ্য লেখকদ্বয় গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিসরে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের আংশিক পরিচয়ই দিতে পেরেছেন। গ্রন্থটি দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত—'সত্যই দিব্য' আর 'দিব্যজীবনের সাধন-পথ পূর্ণযোগ'। সম্ভবতঃ প্রয়োজনের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রথম নিবন্ধটির বক্তব্য সর্বথা সুপরিস্ফুট হয়নি। ভারতীয় ঋষিরা অতিমানসের জ্যোতিকে 'প্রত্যগাত্মা' বা 'পরমাত্মা' বলেছেন—এই মন্তব্য (১৯ পৃঃ) সঙ্গত বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় নিবন্ধটি তুলনায় স্পষ্টতর। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের ভাবনাটি সংক্ষেপে হলেও যথাযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে পরমাত্মায় মুক্তিকামী সাধকদের 'আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা'র প্রতি কটাক্ষপাত না করলেই শোভন হতো। চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্যের 'ভূমিকা' সংক্ষিপ্ত হলেও সুলিখিত। (তবে পাদটীকায় তাঁর দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী পারিচিতির প্রয়োজন ছিল কি ?) মলাট সাধারণ, কিন্তু সুন্দর; মুদ্রণাদি প্রশংসনীয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৭ জুলাই ১৯৯১ বেলা ১১-৩০ মিনিটে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবেশ-দূষণ রোধের কর্মসূচী হিসাবে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্ররা 'বৃক্ষ বন্দনা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বালকাশ্রমের বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন চতুর্থ শাখার প্রধান শিক্ষক কিশোরীধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধান শিক্ষক স্বামী স্নেহময়ানন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে তিরিশটি গাছ লাগান হয়। ছাত্রদের সহযোগিতায় ও পরিচর্যায় গত নয় বছরে মোট পাঁচশোর বেশি গাছ লাগান হয়েছে।

গত ১৯—২১ অক্টোবর '৯১ মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মঠে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২১ অক্টোবর সন্ধ্যায় আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী বিশোকাত্মানন্দের আশীর্বাণীর মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সারদাত্মানন্দ। ২০ ও ২১ অক্টোবর প্রত্যহ চারটি অধিবেশন হয়। অধিবেশনগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন স্বামী শান্তিদানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। গীতা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পাঠ করেন যথাক্রমে স্বামী শশধরানন্দ ও সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ২১ অক্টোবর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন ছিল প্রশ্নোত্তরের আসর। এই দুই অধিবেশনে ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও স্বামী শান্তিদানন্দ। সন্ধ্যারতির পর সমাপ্তি অধিবেশনে প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ছয়জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। আবাসিক ও অনাবাসিক মোট ১৪৫জন ভক্ত যোগদান করেন।

শিক্ষা সেমিনার

রাজকোট আশ্রম গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর 'ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভারতীয়-করণ' শীর্ষক এক আলোচনা-সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় মোট ১৮০ জন শিক্ষাবিদ্ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মূর্তিস্থাপন

বিশাখাপত্তনম আশ্রমের সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ১০ ফুট ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল কৃষ্ণকান্ত মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন।

পরিদর্শন

গত ২ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি. সুব্রহ্মণ্যম সস্ত্রীক পুনে আশ্রম পরিদর্শন করেন।

বেস্ট টিচার অ্যাওয়ার্ড

রামকৃষ্ণ মিশন (মাদ্রাজ) পরিচালিত সারদা বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সেলভি. জে. রাজলক্ষ্মী গত ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০-৯১ খ্রীস্টাব্দের 'বেস্ট টিচার অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ মিশন আশ্রম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত অডিটিং ও অ্যাকাউনট্যান্সি পরীক্ষায় মোট ৬০০ নম্বরের মধ্যে ৫৯৯ নম্বর পেয়েছে।

চিকিৎসা শিবির

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ বিনামূল্যে এক দন্ত-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। এই শিবিরে ২৮৭জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে। রাউরকেল্লার ডাঃ কমলাকান্ত পাল এই চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করেন। পুরী জেলার কালেক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিশ্র এই চিকিৎসা-শিবিরের উদ্বোধন করেন।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

মালদা আশ্রমের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মালদা জেলার ভুতুনী ও মহারাজপুরে এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাহিন ও রাধিকাপুরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ২৪,৬০০ কিলোঃ আটা, ৬,৫০০ কিলোঃ আলু ও ৬৫০ কিলোঃ লবণ দেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতপুর, বেগমপুর এবং ১নং রানীনগর ব্লকের অন্তর্গত ১নং হুরশী গ্রাম-পঞ্চায়েতের অধীন চারটি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য ১২০০ শাড়ি, ১৩০০ ধুতি, ২১৫৪ সেট শিশুদের পোশাক, ৯৭৫টি পশমী কম্বল ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সারগাছি আশ্রমের মাধ্যমে বিতরিত হয়েছে। লোচনপুর গ্রামপঞ্চায়েতে ক্ষতি-গ্রস্তদের মধ্যেও পোশাক ও ঔষধপত্রাদি বিতরিত হয়েছে।

উড়িষ্যা বন্যাত্রাণ

ভুবনেশ্বর আশ্রমের মাধ্যমে কটক জেলার জগৎ-সিংহপুর নিয়ালী ব্লকের অন্তর্গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি গ্রামের ১২৪৩টি পরিবারকে ১৩,২০০ কিলোঃ চাল, ২৬৫০ কিলোঃ ডাল, ১২২০ সেট বাসনপত্র, ২২৮০টি ধুতি, ২২১৫টি শাড়ি ও ২৩২০ সেট শিশুদের পোশাক দেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ চিকিৎসাত্রাণ

নারায়ণপুর আশ্রম নারায়ণপুরের আশপাশে পাঁচটি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে ৪০০ কলেরা রোগীর চিকিৎসা করেছে। তাছাড়া উপজাতি অঞ্চল অবুঝমারের অভ্যন্তরস্থ যেসব গ্রামে কলেরা মহামারীর রূপ নিয়েছে, সেসব গ্রামে ঔষধপত্র, ডাক্তার ও চিকিৎসা-কর্মীদের পাঠানো হয়েছে। ঐ অঞ্চলে একটি অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন করে দুই সপ্তাহে বহির্বিভাগে ১২০৬ জন রোগীর ও অন্তর্বিভাগে ৮৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বন্যাত্রাণ

দিনাজপুর আশ্রমের মাধ্যমে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার ১৮২৬টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ১১৬২ কিলোঃ চাল, ৩২৮ কিলোঃ ডাল, ৫৬২ কিলোঃ চিঁড়া, ১১২ কিলোঃ মুড়ি, ১৯৭ কিলোঃ গুড়, ২৫০টি পাউরুটি, ১০০ প্যাকেট বিস্কুট এবং ৭৫ কিলোঃ লবণ বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭ জনের চিকিৎসা করা হয়েছে।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ

গত ১০ সেপ্টেম্বর বিশাখাপত্তনম জেলার এস. রায়ভরম মণ্ডলের পি.ধর্মভরম গ্রামে ৮১টি নবনির্মিত বাড়ির উদ্বোধন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল কৃষ্ণকান্ত। গ্রামটির নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'বিবেকানন্দপুরম'। ঐদিন ঐ গ্রামে একটি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরও উৎসর্গিত হয়েছে। তাছাড়া ইস্লামপল্লি মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে আশ্রয়গৃহের নির্মাণকার্য চলছে।

গুন্টুর জেলার নিজামপত্তনম মণ্ডলের মুক্তে-শ্বরম ও কোঠাপালেম গ্রামে আশ্রয়গৃহ-সহ-সমাজ-গৃহের নির্মাণকার্য এগিয়ে চলেছে। আদিবিপালেম গ্রামে একটি রামালয় পুনর্নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে।

গুজরাট

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে ভাবনগর জেলার গিরিধর তালুকের রামকৃষ্ণনগর গ্রামে গত ৫ সেপ্টেম্বর একটি পাঁচকক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যালয়-গৃহটি বন্যায় ধ্বংস হয়েছিল।

বাংলাদেশ

ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলার পুনর্বাসনের কাজ চলছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল): গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ২১ আগস্ট তিনি যুবক-যুবতীদের জন্য একটি বেদান্তের ক্লাস নিয়েছেন। বেদান্ত সোসাইটির সদস্যদের জন্য মাসিক সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৮ সেপ্টেম্বর।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো): গত অক্টোবর মাসের প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। শনিবারগুলিতে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা হয়েছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ ১৩ সেপ্টেম্বর দুর্গাপূজা বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি, স্তোত্রপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার অব নিউইয়র্ক ঃ গত অক্টোবর মাসে স্বামী আদীশ্বরানন্দ রবিবাসরীয় ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রতি শুক্রবার 'বিবেকচূড়ামণি' ও প্রতি মঙ্গলবার 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরণ্টো (কানাডা) ঃ গত ৫ অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দ, ৬ অক্টোবর ঈশ্বরের মাতৃরূপ, ১২ অক্টোবর স্বামী অখণ্ডানন্দ, ২০ অক্টোবর কথামৃত, ২১ অক্টোবর তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ প্রসঙ্গে আলোচনা এবং ১৯ অক্টোবর রামনাম সংকীর্তন হয়েছে। এছাড়া মহালয়া, মহাষ্টমী এবং ৺বিজয়া দশমী উপলক্ষে ৭, ১৬ ও ১৮ অক্টোবর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঠাধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ ২৭ অক্টোবর উইনিপেগে বেদান্ত দর্শন বিষয়ে একটি ভাষণ দিয়েছেন।

উদ্বোধন

গত ৮ সেপ্টেম্বর মরিশাস কেন্দ্রের নবনির্মিত আশ্রমভবনের উদ্বোধন করেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী অনিরুদ্ধ জগন্নাথ। অনুষ্ঠানে মরিশাসে ভারতের হাইকমিশনার কে. কে. এস. রানা সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দেহত্যাগ

স্বামী নিত্যসত্যানন্দ (মূর্তি) গত ১১ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় বারাণসী সেবাশ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর। গত ৪ সেপ্টেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি বহুমূত্র, ইউরিমিয়া, নিউমোনিয়া, রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগে ভুগছিলেন।

স্বামী নিত্যসত্যানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, বিশাখাপত্তনম, বৃন্দাবন, দিল্লী, কনখল, আলমোড়া, শ্যামলাতাল, চণ্ডীগড় কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হন। দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। অনাড়ম্বর সাধু-জীবন, ভদ্র, সহৃদয় ব্যবহার ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এবং ৭ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং স্বামী দেবস্বরূপানন্দ।

পূজানুষ্ঠান

৭ অক্টোবর মহালয়া উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুরে বহু ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ পান। ১৬ অক্টোবর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুরে অগণিত ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। গত ৫ নভেম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরদিন সকালে হাতে হাতে ভক্তদের খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার কথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ লীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করবেন নভেম্বর মাস থেকে। অক্টোবর মাসে (প্রথম শুক্রবার ছাড়া) পূজা উপলক্ষে ধর্মালোচনা বন্ধ ছিল।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিবেকানন্দ সোসাইটির ৯০তম প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৩ আগস্ট '৯১ তারিখে সোসাইটির সভাগৃহে সোসাইটির ৯০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। সোসাইটির সভাপতি স্বামী নির্জরানন্দ পৌরোহিত্য করেন ও উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে সোসাইটির প্রধান অনুপ্রেরণাদাত্রী ভগিনী নিবেদিতার সোসাইটি এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কিত স্বপ্নের কথা আলোচনা করেন। স্বামী নির্জরানন্দ স্মরণ করিয়ে দেন যে, নিজেকে জানা বা আত্মজ্ঞানই ধর্ম। এর পূর্বে সোসাইটির পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও সেই সঙ্গে পূর্বকথা বর্ণনা করেন সোসাইটির সম্পাদক শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় (রচনা ও বক্তৃতা) ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পারিতোষিক দেওয়া হয়। বিষয় ছিল—'দেশ গঠনে স্বামীজীর অবদান'। বক্তৃতা বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীরা ভাষণ দেয়।

গত ২৮—৩০শে মে তিনদিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠার ৩য় বার্ষিক উৎসব মেদিনীপুরের হরেকৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখেন স্বামী অসক্তানন্দ ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গীতিনাট্য পরিবেশন করেন শংকর সোম ও সম্প্রদায়। এছাড়া বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ৮ মার্চ থেকে ১০ মার্চ সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। ঐ উপলক্ষে ৮ মার্চ রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ৯ মার্চ বিকালে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং বেলাদেবী। সভার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ পরিচালিত বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। ১০ মার্চ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দ এবং বন্দিতা ভট্টাচার্য।

গত ২৫ আগস্ট, রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে (রাজারহাট বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪ পরগনা) শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের ১৩০তম শুভ-জন্মতিথি ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, কথামৃত পাঠ, ভজন, হোম এবং অপরাহ্ণে লীলাগীতি 'বিলে' ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী। দুপুরে শতাধিক ভক্তকে বসিয়ে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়।

পরলোকে

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ফরিদপুর-এর সভাপতি শ্রীশচন্দ্র ঘোষ গত ২৮ মে ১৯৯১ ভোর ৫-৫০ মিনিটে পরলোক গমন করেছেন। তিনি ছিলেন ফরিদপুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নির্ভীক ও নীরব সমাজসেবী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই বছর। তিনি ছয় পুত্র ও দুই কন্যা, আত্মীয়স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গত ১৯ জুলাই ১৯৯০ প্রমীলা মজুমদার তাঁর কৃষ্ণনগরের বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। শিশুকালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, পরে শ্রীমা-র সাক্ষাৎলাভও করেন। স্মরণ-মনন, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি তাঁর দিনগুলি কাটাতে ভালবাসতেন। ভারতের বহু তীর্থও তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। [illegible] অবস্থায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খাদ্য-অসহিষ্ণুতা

'প্রজাতির উৎপত্তি' ('The origin of Species') বইটি প্রকাশিত হবার পর ভিক্টোরিয়া যুগের ইংল্যান্ডের চার্লস ডারউইন ছিলেন সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরে বর্তমানে আবার তিনি এক বৈজ্ঞানিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছেন; এবার বিতর্ক তাঁর মতবাদ নিয়ে নয়, তাঁর কি অসুখ হয়েছিল তাই নিয়ে।

চল্লিশ বছর যাবৎ ডারউইন গা-বমি, মাথাধরা, ক্লান্তি, বুক ধড়ফড় করা, একজিমা, বমি প্রভৃতি নিয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কি অসুখ হয়েছিল, এই নিয়ে অনেক রকম মত প্রচলিত। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর শরীরে ওষুধের বিষক্রিয়া হতে আরম্ভ করেছিল (তিনি পারদ এবং আর্সেনিক দেওয়া ওষুধ খেতেন), তাঁর ভাইরাসজনিত অসুখ হয়েছিল এবং আফ্রিকায় কাজ করার সময় সেখানে সংক্রামিত হয়ে 'ছাগার অসুখ'-এ (Chagas' diseases) ভুগেছিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর অসুখের উপশম হওয়ায় এবং মানসিক দুশ্চিন্তার চাপে অসুখ আবার বাড়াতে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, তাঁর অসুখটি ছিল মানসিক-দৈহিক (Psychosomatic)।

সম্প্রতি এই দীর্ঘকালীন বিতর্কের একটি নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাখ্যাতে ডারউইনের অসুখকে বলা হচ্ছে বহুবিতর্কিত 'খাদ্য-অসহিষ্ণুতা' (food intolerance) বা 'মুখোশ-পরা খাদ্য-অ্যালার্জি'। এটা ঠিক পরিচিত খাদ্য-অ্যালার্জি নয়, যাতে কোন খাবার খাওয়ার পরেই ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—মুখ ফুলে উঠে, অজ্ঞান হয়ে যায়, এমন-কি মৃত্যু পর্যন্ত হয় (anaphylactic shock)। খাদ্য-অসহিষ্ণুতার লক্ষণ প্রকাশ পায় খাদ্যগ্রহণের অনেক পরে এবং সে-লক্ষণগুলি অনেক রকমের। দেরিতে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় এবং ক্ষতিকারক খাদ্যটি সাধারণতঃ (পাশ্চাত্যে) আটা, দুধ প্রভৃতি মুখ্য খাদ্যের পর্যায়ে পড়ায়, রোগী খাদ্যের সঙ্গে রোগের সম্পর্ক ধরতে পারে না। যেসব ডাক্তার খাদ্য-অসহিষ্ণুতা নামক অবস্থায় বিশ্বাসী, তাঁরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না যে, এই অবস্থায় এই এই লক্ষণ দেখা দেবে। তবে চার্লস ডারউইনের অসুখের সব লক্ষণগুলিই খাদ্য-অসহিষ্ণুতার লক্ষণগুলির শ্রেণীতে পড়ে। তাঁরা আরও বলেন যে, মানসিক চাপে (stress) বা উদ্বেগে অসুখ বাড়ে, যেমন মানসিক চাপে হাঁপানি প্রভৃতি অ্যালার্জি বাড়ে। যেসব রোগী ডাক্তারের কাছে ঘন ঘন যান এবং অসুখের নানারকম গোলমেলে লক্ষণের কথা বলেন (যার সবগুলি লিখলে একটি টেলিফোন ডাইরেক্টরি হয়ে যায়), তাঁরাই খাদ্য-অসহিষ্ণুতা রোগের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য ফল পান। জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ঐসব রোগী বহু বিশেষজ্ঞকে দেখিয়েছেন, যাঁরা তাঁদের অসুখের কোন শারীরিক (organic) কারণ খুঁজে না পেয়ে ডারউইনের অসুখের মতো তাঁদেরও মানসিক-দৈহিক অসুখ হয়েছে বলে সাব্যস্ত করেন। এইসব রোগীর অনেকেই খাদ্য-অসহিষ্ণুতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসায় স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন। শেষোক্ত ডাক্তাররা খাদ্য-অসহিষ্ণুতার চল্লিশাধিক লক্ষণের নাম বলেন—মাথাধরা, বিষণ্ণতা, হাঁপানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, বারে বারে মুখে ঘা হওয়া, গাঁটব্যথা, পাকস্থলীতে ঘা, সবসময়ে নাক দিয়ে জল পড়া প্রভৃতি। কেউ কেউ কেবলমাত্র সাময়িক মাথার যন্ত্রণা (migraine) বা ক্লান্তিতে ভোগেন; আবার অন্যদিকে কেউ কেউ এত বেশি কষ্ট পান যে, তাঁরা সাধারণ জীবনযাত্রা ও দৈনিক কাজকর্ম চালাতে পারেন না। শেষোক্তদের মধ্যে দেখা যায় যে, অনেকে দশ বা তার বেশি রকমের খাদ্যে বা ফুলের রেণুতে, ধোঁয়ার বা রাসায়নিক দ্রব্যে স্পর্শকাতর (sensitive) হয়ে রয়েছেন।

আর একটা কারণে সাধারণ ডাক্তাররা খাদ্য-অসহিষ্ণুতার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেন না। সেটি হলো, খাদ্য ও রোগলক্ষণের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্ক খুব কম ক্ষেত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই খাবার প্রতিদিন না খেলে বা একদিনে অনেকবার না খেলে অসহিষ্ণুতা বুঝা যায় না। যদিও পাশ্চাত্যে ঐ

রকম খাবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গমজাত বা দুধ। একজন ভাইওয়ানের ডাক্তার তাঁর দেশে আচার বা চাটনিকে প্রধান অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর একটা গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে যে, এই খাবার খেলে রোগী অনেক সময় অসুখের বদলে ভাল বোধ করেন, এই জন্য এর 'মুখোস-পরা খাদ্য-অ্যালার্জি' নাম হয়েছে।

যখন ডাক্তাররা রোগীর খাদ্য থেকে সন্দেহজনক খাবারকে বাদ দেন, তখন রোগী প্রথমে খুব খারাপ বোধ করেন এবং কখনো কখনো তাঁদের রোগলক্ষণ অধিকতর ভাবে দেখা দেয়। ঐসময় সেই খাবার খেতে দিলে রোগী অনেক ভাল বোধ করেন। কয়েকদিন সেই খাবার বন্ধ রাখলে রোগীর খারাপ বোধ হওয়া (withdrawal symptoms) কমে যায়; সেই সঙ্গে খাদ্য-অসহিষ্ণুতার লক্ষণও কমে যায়। দুই থেকে আট সপ্তাহ সন্দেহজনক খাবার বন্ধ রাখার পর ঐ খাবার পুনরায় দিলে রোগী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অবস্থার পরে অনেক রোগীরই ঐ খাবার সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা জন্মায়, অর্থাৎ তাঁরা নিয়মিত-ভাবে সেই খাবার খেতে সমর্থ না হলেও কখনো কখনো তা খেলে সহ্য করতে পারেন। খাদ্য-অ্যালার্জিতে কিন্তু এরকম হয় না; ২০ বছর সেই বিশেষ খাবার না খাওয়ার পরে সামান্যমাত্র খেলেও আগের মতো রোগলক্ষণ দেখা দেয়।

চেষ্টা সত্ত্বেও খাদ্য-অসহিষ্ণুতা ধরবার জন্য কোন ল্যাবরেটরি টেস্ট বের হয়নি। একমাত্র পথ হচ্ছে, খাদ্য বন্ধ করা (elimination diet) এবং প্রায় সব খাদ্য বন্ধ করে দেওয়ার পরে এক এক করে খাবার দেওয়া। এই প্রথাই আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য অনেক দেশের ডাক্তাররা অবলম্বন করছেন এবং সকলেই প্রায় একই রকম ফল পাচ্ছেন। কোন কোন ডাক্তার রোগীকে প্রথম পাঁচদিন উপবাসে রাখেন। কেউ কেউ প্রথম কয়েকদিন কেবল ভেড়ার মাংস ও নাসপাতি খেতে দেন, কেউ বা আবার পুরো প্রোটিন না দিয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড-এর সঙ্গে অন্য পুষ্টিকর কিছু মিশিয়ে খেতে দেন, কেউ বা আবার এমন কিছু খাবারের মিশ্রণ দেন যেগুলি শরীরে খারাপ প্রতিক্রিয়া করে না বলে জানা আছে। চিকিৎসার ধারা যাই হোক, ফল সবক্ষেত্রে প্রায় এক ধরনের। বেশির ভাগ রোগী বলেন যে, প্রথম চার-পাঁচদিন তাঁদের খাবার না পাওয়ার জন্য কষ্ট হয়েছিল, তারপর ছয়-সাতদিন নতুন খাবার খেয়ে স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে। শিশুরা আরও তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্য ফিরে পায়; যেসব বয়স্ক রোগীর অসুখ খুব বেশি ছিল, তাদের দশদিন লাগে। এই একই ধরনের ফল পাওয়া এবং নানারকম রোগলক্ষণ এক সঙ্গে চলে যাওয়া—এ দেখে সন্দিগ্ধ ডাক্তাররাও মনে করছেন যে, 'খাদ্য-অসহিষ্ণুতা' বলে কিছু একটা আছে। বাত-বিশেষজ্ঞ (Rheumatologist) গেল ডার্লিংটন ৫৩জন রিউমে-টয়েড রোগীর অর্ধেককে উপরোক্ত প্রকার খাদ্যবন্ধের চিকিৎসা করে এবং অন্য অর্ধেককে অন্যভাবে চিকিৎসা করে দেখেছেন যে, প্রথমোক্তদের তিন-চতুর্থাংশ রোগী অদ্ভুত উপকার পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও ডাক্তার ডার্লিংটন খাদ্য-অসহিষ্ণুতার ব্যাপারটি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না; তবে মনে করেন যে, এই বিষয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। আর একটা এই ধরনের অসুখ—ঘন ঘন পাতলা দাস্ত (Irritable bowel syndrome); এই ধরনের রোগীদের উপরোক্ত খাদ্যবন্ধ প্রথায় চিকিৎসা করে ডাক্তার হাণ্টার খুব ভাল ফল পেয়েছেন। এই শ্রেণীর তৃতীয় অসুখ—মাইগ্রেন বা মাথার যন্ত্রণা। মিডল-সেক্স হাসপাতালে এই শ্রেণীর রোগীদের খাদ্যবন্ধ প্রথায় চিকিৎসা করে ৭০ শতাংশ রোগী সুফল পেয়েছেন। শিশুদের মাইগ্রেন রোগে ফল আরও ভাল। কোন কোন চিকিৎসক মনে করেন যে, এককালে একটি একটি করে খাবার বাদ দিয়ে খাদ্যবন্ধ প্রথায় চিকিৎসা করলে ভাল ফল হয় না। ডাক্তার মাইকেল র‍্যাডক্লিফ দশ বছরের অভিজ্ঞতায় বলেন: "অনেক রোগীই একাধিক খাদ্যে অসহিষ্ণু; সেজন্য একসঙ্গে সবগুলি বাদ না দিয়ে একটি একটি করে বাদ দিলে কি করে হবে?"

মধ্য লন্ডনের একজন সাধারণ ডাক্তার (general practitioner) রোনাল্ড উইলিয়ামস বলেন: "আমি এই চিকিৎসা করে খুব ভাল ফল পেয়েছি। মাইগ্রেন বা রিউমটয়েড আর্থ্রাইটিস-এ গাদা গাদা ওষুধ খাইয়ে কি হবে, যদি তুমি কি খাবার খেয়ে এই অসুখ হয়েছে তা ধরতে না পার?"

[New Scientist, 8 July, 1989. pp. 45-49]

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

৯৩তম বর্ষ পৌষ ১৩৯৮

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আগামী বর্ষের (৯৪তম বর্ষ ঃ ১৩৯৮—১৩৯৯ / ১৯৯২)

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঞ্চাশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা

বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ পাঁচ টাকা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

৯৪তম বর্ষ **উদ্বোধন** সম্পাদকঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
যুগ্ম সম্পাদকঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় যে, গত কয়েকমাস যাবৎ গ্রাহকদের অনেকে সাধারণ ডাকে, এমনকি রেজিস্ট্রি ডাকেও, উদ্বোধন হয় দেরিতে পাচ্ছেন অথবা একেবারেই পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন। সহৃদয় গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানাই যে, স্থানীয় ডাকঘর এবং ঊর্ধ্বতম ডাকবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের পত্রিকা-প্রাপ্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিতরণের আশ্বাসও দিয়েছেন। গ্রাহকদের অনেকে মনে করছেন হয়তো উদ্বোধন-এর পক্ষ থেকে ঠিকমতো পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয় না। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। আমরা নিয়মিত পত্রিকা ডাকে দিয়ে থাকি। ডাকঘরের সঙ্গে ব্যবস্থামতো প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ২৩ অথবা ২৪ তারিখ গ্রাহকদের পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়।

গত আশ্বিন সংখ্যা ডাকে পাননি বলে কেউ কেউ জানাচ্ছেন এবং ডুপ্লিকেট কপি পাঠাতে অনুরোধ করছেন। গত আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যায় প্রতিবারের মতো আমরা জানিয়েছিলাম যে, আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। সহৃদয় গ্রাহকগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণ এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, এবছর শারদীয়া সংখ্যার অত্যধিক চাহিদায় মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলিও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত।

শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন বলে জানিয়ে যাঁরা এখনো সংগ্রহ করেননি, তাঁরা ৩১ ডিসেম্বরের ('৯১) মধ্যে সংগ্রহ না করলে পরে তা পাবার আর নিশ্চয়তা থাকবে না।

মাঘ ১৩৯৮—পৌষ ১৩৯৯ / জানুয়ারি ১৯৯২—ডিসেম্বর ১৯৯২

☐ আগামী মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১-এর মধ্যে আগামী বর্ষের (৯৪তম বর্ষ : ১৩৯৮-১৩৯৯/১৯৯২) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ : চল্লিশ টাকা ☐ ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ : পঞ্চাশ টাকা ☐ বাংলাদেশ—নব্বই টাকা ☐ বিদেশের অন্যত্র— দুশো টাকা (সমুদ্র-ডাক), চারশো টাকা (বিমান-ডাক)।

আজীবন গ্রাহকমূল্য : এক হাজার টাকা (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য)

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও (অনূর্ধ্ব বারোটি) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা (প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা) জমা দিতে হবে।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়। চেকের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

☐ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯·৩০—৫·৩০ ; শনিবার বেলা ১·৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

উদ্বোধন

পৌষ ১৩৯৮ ডিসেম্বর ১৯৯১ ৯৩ তম বর্ষ—১২শ সংখ্যা

দিব্য বাণী

সন্তোষের সমান ধন নাই, সহ্যের সমান গুণ নাই।

শ্রীমা সারদাদেবী

কথাপ্রসঙ্গে

সন্তোষের চেতন প্রতিমা

ইংরাজ কবি শেলীর একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়িতেছে :

"...that content surpassing wealth
The sage in meditation found,
And walked with inward glory
crowned !"

—[আহা,] সেই সন্তোষের অধিকারী আমি যদি হইতাম, যাহা সকল সম্পদ-ঐশ্বর্যের চাহিতেও মূল্যবান—ঋষিগণ ধ্যানের গভীরে যাহা আস্বাদ করেন এবং যাহার গুণে তাঁহারা অন্তরের জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া বিচরণ করেন।

বিষাদের ক্ষণে মুহ্যমান কবি গভীর ব্যাকুলতায় চাহিতেছিলেন জীবনের পরম মহার্ঘ সেই বস্তুটি—সন্তোষ। বস্তুতঃ আমরা সবাই সন্তোষ খুঁজি, কিন্তু কোটির মধ্যে গুটিকয় মাত্রেরই উহাকে প্রাপ্তির দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষের নিকটেই মনের নিরন্তর সন্তোষ বা প্রফুল্লতার অবস্থান মরীচিকার মায়া।

সুখে-দুঃখে, মানে-অপমানে, স্তুতি-নিন্দায়, সম্পদে-বিপদে, বৈভবে-দৈন্যে—সকল অবস্থাতেই যে স্থির প্রসন্নতা, যে অভিযোগহীন ধ্রুব প্রশান্তি—উহারই নাম সন্তোষ। সারদাদেবীর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখি, পরিবার, সংসার, সমাজ এবং একটি বিশ্বখ্যাত নবীন ধর্মসঙ্ঘের নানা সমস্যা, নানা জটিলতা চারিদিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বৈদেহীকে যেমন লেলিহান অগ্নিশিখা কোনভাবেই স্পর্শ করিতে পারে নাই, সারদাদেবীকেও তেমনই কোন সমস্যা, কোন জটিলতা কদাপি বিচলিত করিতে পারে নাই। পরিবার, সংসার ও সমাজের দেওয়া সম্মান ও অসম্মান, বন্দনা ও সমালোচনা যেমন তাঁহার মানসিক স্থৈর্যকে টলাইতে পারে নাই, সঙ্ঘের দেওয়া মর্যাদা এবং সঙ্ঘের জটিল সমস্যার বোঝাও তেমনই তাঁহাকে কখনও তাঁহার নিত্য-সন্তোষের অবস্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। পরিবার, সমাজ ও সঙ্ঘের সকল কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিয়া, সমস্তকিছুর সহিত একান্তভাবে সংপৃক্ত থাকিয়াও নিরুদ্বেগ সন্তোষ এবং অচলা শান্তির তুঙ্গ-শিখরকে তিনি সর্বদা স্পর্শ করিয়া রহিতেন।

ইহাই তাঁহার সমগ্র জীবনের ইতিবৃত্ত। তবে পরিণত বয়সে সন্তোষ ও প্রসন্নতা একজন অর্জন করিতে পারে, কিন্তু নিতান্ত অল্প বয়সে, জীবনের প্রথম প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির প্রহরে মানুষ যদি একইভাবে সেই অবস্থান লাভ করিতে পারে তাহা হইলে তাহা বিস্ময়কর নিঃসন্দেহে। বর্তমান আলোচনা সেই কারণে আমরা দক্ষিণেশ্বরে সারদাদেবীর প্রথম যৌবনের দিনগুলিতেই প্রধানতঃ সীমিত রাখিব। সেই সময়কার কথায় পরবর্তী কালে সারদাদেবী বলিতেন : "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্বদা অনুভব করিতাম।"

বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালে সাধারণ অর্থে নারীর পরম কাঙ্ক্ষিত 'স্বামী-সঙ্গ' সারদাদেবী পান নাই, প্রাচুর্যের মুখ তিনি কখনোই দেখেন নাই, অন্ন-বস্ত্রের অভাব শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে তো তাঁহার যারপরনাই শোচনীয়ই হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালেই হৃদয়ের চরম দুর্ব্যবহার এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মীয়বর্গের নিষ্ঠুর উপেক্ষা ও বিরোধিতা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। পরবর্তী কালে আপন ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ এবং ভ্রাতৃকন্যাগণের গঞ্জনা এবং পারস্পরিক ঈর্ষার জ্বালা

তাঁহাকে আজীবন কঠোর আঘাতে জর্জরিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ধ্রুবনক্ষত্রের মতো প্রশান্ত অবস্থানে তিনি অচঞ্চল রহিয়াছেন। সন্তোষের যে অটল ভূমি.ত তিনি নিত্য অবস্থান করিতেন তথা হইতে কিঞ্চিত স্থানান্তর কদাপি তাঁহার ঘটে নাই। পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত: "[লোকে] কেবল [বলে] অশান্তি, অশান্তি—কিসের অশান্তি···? আমি তো তখন [দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে] অশান্তি কেমন জানতুম না।" [কথাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে জানিয়েছেন: "কী সদানন্দ পুরুষই ছিলেন।··· আমার জ্ঞানে তো আমি কখনো তাঁর অশান্তি দেখিনি।"]

দক্ষিণেশ্বরে সারদাদেবীকে প্রথমেই যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা হইল অত্যন্ত স্বল্প-পরিসর অন্ধকার ঘরে বাস এবং অমানুষিক পরিশ্রম। ঐ ক্ষুদ্র ঘর এবং দরমাঘেরা এক ফালি বারান্দার মধ্যে তাঁহার এবং কখনও কখনও অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তদের থাকা, তাঁহার ও শ্রীরামকৃষ্ণের রান্না, ভক্তগণের রান্না (সময়ে-অসময়ে এক-একজন ভক্তের এক-একধরনের ফরমায়েসী রান্না)। ঐ অতি ক্ষুদ্র কক্ষে (শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরটিকে 'খাঁচা' বলিতেন) বাসকালে আরও কাজ ছিল তাঁহার, যেমন বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা। ইহা ভিন্ন ছিল সেকালের পল্লীনারীর পর্দারক্ষার সমস্যা (সারদাদেবী আবার অধিকমাত্রায় লজ্জাশীলা ছিলেন)।

নহবতের 'খাঁচায়' তাঁহাকে কিভাবে থাকিতে হইত সে-সম্পর্কে কিছু ধারণা তাঁহার অন্তরঙ্গ আলাপ-চারিতায় ধরা পড়িয়াছে: "রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। [নহবতে] নিচের একটুখানি ঘর, তা আবার জিনিসপত্রে ভরা।··· তবু··· কোন কষ্ট জানিনি।"

"দক্ষিণেশ্বরে নহবত দেখেছ? সেইখানে থাকতুম। প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে ঠুকে যেত। [সারদাদেবী দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন।] একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যাস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটাসোটা মেয়ে লোকরা দেখতে যেত, আর দরজায় দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!'"

"একদিন কতকগুলি পাট এনে আমাকে দিয়ে [শ্রীরামকৃষ্ণ] বললেন, 'এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও···।' আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম আর ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলুম। চটের ওপর পটপটে মাদুর পাততুম আর সেই ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনো তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হতো এখন এই সবে (খাট-বিছানা দেখিয়ে) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাত বোধ হয় না।··· আহা! দক্ষিণেশ্বরে কী সব দিনই গেছে!··· কী আনন্দই ছিল!"

"[নহবতে] কখনো কখনো একা ছিলুম। আমার শাশুড়ী থাকতেন। মধ্যে মধ্যে গোলাপ [গোলাপ-মা], গৌরদাসী [গৌরী-মা], এরা সব থাকত। ঐটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হতো··· অপর সব ভক্তদের রান্না হতো।··· দিনরাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রাম দত্ত এল। গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।' আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের ময়দার রুটি হতো। রাখাল থাকত; তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হতো।" "নরেনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বললেন, 'বেশ করে রাঁধো'। আমি মুগের ডাল, রুটি করলুম। খাবার পর নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরে, কেমন খেলি?' নরেন বললে, 'বেশ খেলুম, যেন রোগীর পথ্য।' ঠাকুর শুনে বললেন, 'ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ? ওর জন্য ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি করে দেবে।' আমি শেষে তাই করলুম। তবে নরেন খেয়ে তুষ্ট হলো।"

এত কষ্ট, এত পরিশ্রম! কিন্তু কোন অবস্থায় তিনি তাঁহার মনের প্রফুল্লতাকে হারান নাই, কোন অভিযোগ-অনুযোগও কখনও করেন নাই।

তখনকার দিনে জয়রামবাটী হইতে কলকাতা আসা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল, সময়ও লাগিত প্রায় তিনদিন। একবার জয়রামবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসামাত্র হৃদয় সারদাদেবীর উদ্দেশে রূঢ়ভাবে বলিতে লাগিলেন: "কেন এসেছে? কিজন্য এসেছে? এখানে কি?" সেবার সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁহার গর্ভধারিণীও ছিলেন। হৃদয় তাঁহাকেও অপমান করিলেন। সেইদিনই সারদাদেবী ও তাঁহার জননীকে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু তখন বা পরবর্তী কালেও হৃদয় সম্পর্কে কোন অনুযোগ কখনও তিনি করেন নাই। নিজের স্বামীর নিকট নিজের অধিকারেই তিনি আসিয়াছিলেন, স্বামীর নিকট হইতেও কোন প্রতিকার তিনি পান নাই। তবুও স্বামীর নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে

কোন অভিযোগ তাঁহার ছিল না। নীরবে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিবার কালে মা ভবতারিণীর নিকট মনে মনে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন: "মা, যদি কোন দিন আনাও তো আসব।" যেন আসিয়া তিনিই অপরাধ করিয়াছেন, যেন স্বামীর নিকট আসার অধিকারও তাঁহার নাই। জনৈক সন্ন্যাসী সন্তান একবার শ্রীরামকৃষ্ণের উপর হৃদয়ের নির্যাতন ইত্যাদি প্রসঙ্গে পরবর্তী সময়ে তাঁহাকে বলেন: "তিনি [হৃদয়] ঠাকুরকে অনেক কষ্টও নাকি দিতেন, গালমন্দ করতেন?" সারদাদেবী তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের পক্ষ লইয়া এককথায় ঐ প্রসঙ্গের যবনিকা টানিয়া দিলেন: "যে অত সেবা করে পালন করেছে, সে একটু মন্দ বলবে না? যে যত্ন করে সে অমন বলে থাকে।"

মানুষের মনে যে অসন্তোষের অগ্নি ধিকিধিকি জ্বলে তাহার মূলে থাকে মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা—অপরের দোষদর্শন। সারদাদেবী বলিতেন: "মনেতেই সব, মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ। মানুষ নিজের মনটি আগে দোষী করে নিয়ে তবে পরের দোষ দেখে। পরের দোষ দেখলে কি হয়?—নিজেরই ক্ষতি। আমার এইটি ছেলেবেলা থেকেই স্বভাব যে, আমি কারও দোষ দেখতে পারতুম না।" জগতের উদ্দেশে তাঁহার অন্তিম বাণীও ছিল তাহাই: "যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না।"

জয়রামবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বর আসার পথে তারকেশ্বরের কাছে তেলো-ভেলোর মাঠে সারদাদেবী একবার ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। সে-কাহিনী সুপরিচিত। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন প্রাণরক্ষার তাগিদে তাঁহাকে পথে ফেলিয়া নিজেরা চলিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যখন কাহিনীটি বহুল-পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তখন কেহ সে-সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সঙ্গী-সঙ্গিনীদের তাঁহাকে ফেলিয়া যাওয়ার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করিতেন না, পাশ কাটাইয়া যাইতেন। একবার একজন ঐ সম্পর্কে বারম্বার কৌতূহল প্রকাশ করিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং প্রসঙ্গটিই বন্ধ করিয়া দেন। পরে সকলে চলিয়া যাইলে সেবককে একান্তে বললেন: "দেখ দিকি, বারবার ডাকাতের গল্প। আমি বলতে চাই না। লক্ষ্মী, শিবু (শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা ও পুত্র), ওরা সব সঙ্গে থেকে ফেলে গেল। এখন ঐ কথা উঠলে তারা মনস্তাপ করে, সঙ্কোচ হয়। আর হাজার হোক একটা অন্যায় করে ফেলেছে। আমারই তো ভাসুর-পো, ভাসুর-ঝি। আমি সকলের কাছে ঐ কথা বারবার বললে তাদের অপমান হয়।" নহবত হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর—মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধান। এত কাছে তাঁহার আরাধ্য দেবতা, কিন্তু দুটি ঘরের মধ্যে যেন লক্ষ যোজনের দূরত্ব। স্বামীকে দর্শন, তাঁহার সঙ্গলাভ সারদার কাছে ক্রমেই দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। সারাদিনে সামান্য সময়ের জন্য স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ তিনি পাইতেন। তাহা হইল শ্রীরামকৃষ্ণের খাবার সময়। নানা প্রসঙ্গ করিয়া 'শিশু ভোলানাথে'র ঊর্ধ্বগামী মনকে আহারের দিকে তিনি নামাইয়া রাখিতেন। কিন্তু এমন অনেকদিন হইয়াছে যে, সেই সামান্য দর্শনের সুযোগটুকু হইতেও অতি-উৎসাহী কোন কোন মহিলা-ভক্ত তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ক্রমে পুরুষ-ভক্তগণের আগমন বাড়িয়া যাওয়ায় পরের দিকে সেই ক্ষণিক সাক্ষাতের সুযোগ একেবারেই হারাইয়া গেল। তিনি পরবর্তী কালে বলিয়াছেন: "তখন কী দিনই গেছে! দিনান্তে হয়তো একবার ঝাউতলায় যেতে ঠাকুরকে দেখতে পেতুম, নয়তো নয়! —তা-ও দূর থেকে। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকতুম।" নহবতের বারান্দায় যে দরমার আড়াল ছিল তাহার মধ্যে ফুটো করিয়া স্বামীকে তাঁহার ঘরে অথবা বারান্দায় এক ঝলক দেখিবার চেষ্টা করিতেন। ঐভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে গিয়া তাঁহার পায়ে বাত ধরিয়া গিয়াছিল। নহবতের সেই বাত-যন্ত্রণা তাঁহাকে সারাজীবন বহন করিতে হইয়াছে। স্বামীকে কাছে পাওয়া তো দূরের কথা, এক ঝলক দেখা—তাহাও মাসের পর মাস হয় নাই সারদার। প্রাণ আটুপাটু করে তাঁহার। কত ভক্ত আসিতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। পুরুষ-ভক্তগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও মহিলা-ভক্তগণও আসেন। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেন, শোনেন তাঁহার অমৃতকথা, প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করেন তাঁহার ঘরে অনুষ্ঠিত নিত্য-উৎসবের মাধুর্যরস। কিন্তু মানুষটির উপর যাঁহার দাবি ও অধিকার সকলের চাহিতে অধিক, তাঁহার সহিত যাঁহার সর্বাধিক নিকট সম্পর্ক, সেই সারদার কথা কাহারও খেয়াল থাকে নাই। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের কখনও কখনও সারদার কথা মনে পড়িলেও ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পাবশে সেই মনে পড়া বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। অথচ সারদা নিজের জন্য স্বামীর সেবাধিকার ভিন্ন আর কিছুই চাহেন নাই এবং ঐ সেবার আকুতিও তিনি মুখ ফুটিয়া স্বামীর নিকট কখনও প্রকাশ করেন নাই। অন্তরের অন্তস্তলে তাহা গোপন রাখিয়া অভাবিত সুযোগের প্রতীক্ষায় নীরবে দিন কাটাইয়াছেন। কিন্তু কখনও তিনি কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন

নাই, কাহারও উপর দোষারোপ করেন নাই। পুরুষ-ভক্ত, মহিলা-ভক্ত কাহারও সম্পর্কে তাঁহার কোন ক্ষোভ ছিল না। 'উদাসীন' স্বামীর সম্পর্কে তো নহেই। তাঁহার সেসময়কার মনোভাব ধরা পড়িয়াছে তাঁহার এই কথায়ঃ "কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন তুই এমন কী ভাগ্য করেছিস যে, রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি!'"

কোন অভিযোগ, কোন অভিমানের লেশমাত্রও নাই। বরং তিনি যে সামান্য সময়ের জন্য হইলেও 'সকলের ঠাকুর'-এর সান্নিধ্য পাইয়াছেন, সেবাধিকার পাইয়াছেন তাহা ভাবিয়াই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন। শেষ বয়সে যখন সারদাদেবী 'উদ্বোধন'-এ আছেন তখন একদিন একটি অল্পবয়সী বধূর কথা উঠিয়াছে। বধূর স্বামী সন্ন্যাস লইয়াছেন। বধূকে তাহার শাশুড়ী অত্যধিক শাসন করেন। সারদাদেবী বলিলেনঃ "আহা! ছেলেমানুষ বউ, তার একটু পরতে খেতে ইচ্ছে হয় না?... একটু আলতা পরেছে, তা আর কি হয়েছে? আহা! ওরা তো স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তো চোখে দেখেছি, সেবাযত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন কাছে যেতে পেরেছি, যখন বলেননি এমনকি দুমাস পর্যন্ত নহবত থেকে নামিইনি। [তবে] দূরে থেকে পেন্নাম [তো] করেছি।" কতটুকু তিনি স্বামীকে কাছে পাইয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু তাঁহার নিজের দিক হইতে নারীজীবনের সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত বিষয়টিতে অপ্রাপ্তিজনিত কোন অসন্তোষকে তিনি স্বপ্নেও কখনও স্থান দেন নাই।

বস্তুতঃ স্বামীর উপর তাঁহার যে অন্য কাহারও চাহিতে অধিক দাবি আছে তাহা তাঁহার চিন্তাতেই আসিত না। ভগিনী নিবেদিতা পরবর্তী কালে লিখিয়াছেনঃ "তাঁহাকে জানে না এমন কাহারও পক্ষে তাঁহার কথাবার্তা হইতে কোনভাবেই অনুমান করা সম্ভব নহে যে, চারিপাশের অন্য কাহারও অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁহার দাবি অধিকতর বা তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।"

ভাবিতেও আমাদের কষ্ট হয় যে, স্বামীর নিকট তাঁহার যাওয়া লইয়া মহিলা-ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ নির্মমভাবে তাঁহার সমালোচনাও করিয়াছেন। একবার এক ভক্ত মহিলা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির আতিশয্যে সারদাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেনঃ "তুমি ঠাকুরের কাছে যাও কেন?" সারদা নীরবে উহা শুনিলেন এবং পাছে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যাইলে বিপরীত সমালোচনা হয় তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যাওয়া বন্ধ রাখিলেন। এই যন্ত্রণা ছিল তাঁহার কাছে অসহনীয়, কিন্তু তিনি সর্বদা সতর্ক থাকিতেন তাঁহার আচরণে যেন অপর কেহ পীড়িত না হয়, আঘাত না পায়, এমনকি তাঁহার নিজস্ব এবং ন্যায্য অধিকারের সীমায় হস্তক্ষেপ করিলেও। নারীর অলঙ্কার-প্রীতি স্বাভাবিক। সারদারও অল্প-বয়সে তাহা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কিছু অলঙ্কার গড়াইয়া দিয়াছিলেন। একদিন জনৈক ভক্তমহিলার ঐ বিষয়ে কিছু তির্যক মন্তব্য তাঁহার কানে আসেঃ "উনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) অত বড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ি-টাকড়ি এত গয়না পরেন, এ ভাল দেখায় কি?" সারদা সঙ্গে সঙ্গে এয়োস্ত্রীর চিহ্নস্বরূপ শুধু দুগাছি বালা হাতে রাখিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অলঙ্কার পরার সেইখানেই ইতি। কারণ, এই ঘটনার অল্প পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের সূত্রপাত এবং তাহার পর তাঁহার মহা-প্রয়াণ ঘটে। কিন্তু কোনদিন সংশ্লিষ্ট মহিলা সম্পর্কে কোন অনুযোগ তিনি করেন নাই।

সাধারণ বিচারে সারদাদেবীর নহবতের জীবনে প্রাপ্তির চাহিতে অপ্রাপ্তির দিকেই পাল্লা বহুগুণে ভারী। বাস্তবিক, বাহ্যদৃষ্টিতে কী-ই বা তিনি সেখানে পাইয়াছেন? কিন্তু পৃথিবীর অসাধারণ এই জীবনশিল্পী জানিতেন যে, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির নাম সন্তোষ। তাঁহার বাণীও ছিল তাহাইঃ "সন্তোষের সমান ধন নাই।" ইহা তাঁহার বচনমাত্র ছিল না, তাঁহার জীবনটিই ছিল সন্তোষের নির-বচ্ছিন্ন স্রোতোধারা। অপাপবিদ্ধ সরলতায় জীবনের প্রত্যন্তপ্রহরে তিনি বলিতেনঃ "লোকে আমার কাছে আসে, বলে জীবনে বড় অশান্তি... কিসে শান্তি হবে, মা।—কত কি বলে। আমি তখন তাদের দিকে চাই, আর আমার দিকে চাই, ভাবি—এরা এমন সব কথা কেন বলে। আমার কি তাহলে সবই অ-লৌকিক। আমি অশান্তি বলে তো কখনো কিছু দেখলুম না।"

তিনি ছিলেন যথার্থই সন্তোষের চেতন প্রতিমা।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

পিলিভিত
১৫।৩।(১৯)০৫

প্রিয় গঙ্গাধর[১],

তোমার ৯ই তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহোৎসবের বার্তা অতীব সন্তোষজনক। এখানেও বর্ষা চলিতেছে। স্বাস্থ্য বড় ভাল নহে। আমার শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ নয়। মাদার[২] প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। তোমার পত্রের বিষয় ও সম্ভাষণাদি মাদারকে জানাইয়াছিলাম। তিনি তোমায় ভালবাসা ও নমো নারায়ণায় জানাইয়াছেন ও তোমার আশ্রমের উন্নতি সংবাদে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মিস বেল কলিকাতা গেছেন। সকলে তোমাকে প্রণাম ও ভালবাসাদি জানাইতেছে। প্রভু তোমাকে ভাল রাখুন ও তোমাদ্বারা তাঁহার অনাথাশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি করুন। ছেলেদের আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে।

ইতি
শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

পিলিভিত
১৯।৩।(১৯)০৫

প্রিয় গঙ্গাধর,

তোমার ১৫ই তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়া সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব বিষয়ে লোকের আগ্রহ ও উৎসাহ কিরূপ আন্তরিক তাহা তাহাদের ঐকান্তিকতা দেখিয়া বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বড়ই সুখের বিষয় ঐরূপ ঐকান্তিকতা তোমাদের আশ্রমে বর্তমান। এখানে মহোৎসবের দিন বিশেষ কিছুই হয় নাই। বোধহয় মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমেও কোনরূপ উৎসবাদি করিবার নিয়ম নাই। সেদিন আমরা ঠাকুরের বিষয়ে অনেক আলোচনাদি করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। এখানকার স্বাস্থ্য আদৌ ভাল নহে। বোধহয় শীঘ্রই সকলে মায়াবতী যাত্রা করিবেন। মাদার ও স্বরূপানন্দ আমাকে তথায় যাইবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিতেছেন। আমিও ইঁহাদের সহিত যাইব মনে করিতেছি। স্বরূপানন্দ ও কৃষ্ণলাল[৩] গত পরশ্ব কনখলে গিয়াছে। যদি সুবিধা হয় এই যাত্রায় শ্রীবৃন্দাবনে একটি সেবাশ্রম স্থাপনের চেষ্টা করিবে। আর আর সংবাদ মঙ্গল। তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিও। আমাদের সকলের ভালবাসাদি সকলকে দিবে ও তুমি জানিবে।

ইতি
শ্রীতুরীয়ানন্দ

১ স্বামী অখণ্ডানন্দ ২ মিসেস সেভিয়ার ৩ স্বামী ধীরানন্দ

২

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

মায়ের পূজা

মণিকুন্তলা সেন

জীবনে বড় দুঃখ যখন পাই তখন 'মা' বলিয়াই প্রাণটা কাঁদিয়া ওঠে, আবার বড় সুখ যখন পাই তখনও মাকেই প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। সন্তানের চোখের জলফোটা, মুখের হাসিটি যেমন মায়ের বুকে দাগ করিয়া দেয়, মুখে হাসি ফোটায়, মায়ের স্নেহকরুণ দৃষ্টি ও প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তিও তেমনি সন্তানের অতি বড় শান্তির ও সান্ত্বনার। জীবনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের বুকে মানুষ যে স্নেহসুধার প্রথম আস্বাদটুকু পায়, সেই স্নেহকেই সে মানুষের হৃদয় বুঝিবার মাপকাঠি করিয়া লয়। যত ভাণ্ডার হইতে যত স্নেহৈশ্বর্য সে লাভ করে, ইহারই কষ্টিপাথরে ফেলিয়া সে তাহাকে যাচাই করিতে ত্রুটি করে না। মায়ের বুকের স্নেহগন্ধ যত বেশি করিয়া তাহার ভিতরে সে পায়, তত বেশি করিয়াই সে তাহাকে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করে। যেখানে যেখানে এই মাতৃস্নেহের আস্বাদটুকু আমরা পাই সেখানেই ফুটিয়া ওঠে মায়ের শান্তিময়ী মুখখানি, হৃদয় আপনি সেখানে লুটিয়া পড়ে। জীবনে মাতৃরূপের, মাতৃবুকের বড় প্রয়োজন, তাই মানুষের কণ্ঠ প্রথমেই ডাকিয়া ওঠে 'মা'। এই ডাক শুধু আমার শান্তিরূপিণী ধরার মায়ের পাশ ঘিরিয়াই বাজে না—এই ডাক চিরন্তনী হইয়া বিশ্বজননীর চরণতলে পৌঁছায়। সংসারের বিষ-[জ্বালার অন্তরাত্মায় যে দারুণ হাহাকার জাগে তাহারই তীব্র মর্মবেদনা লইয়া আত্মময়ী মায়ের ডাকের বার্তা।

কথা ভাবিতে গিয়া দেখি, তিনি জগতের উপরে গিয়াও মাতৃত্বের বিশাল পরিণতি বিশ্বজননীর সহিত মিলিত হইয়া বিরাট হইয়াই বর্তমান রহিয়াছেন। তাই আজ সেই মাতৃমূর্তির স্মরণে যে-ডাক বুক ফাটিয়া তাহারই উদ্দেশে ছুটিয়া যায়—তাহার ব্যাকুলতা, তাহার বেদনা জগতের কোন বস্তু, দেহের কোন অভাব লইয়া নয়।

বড় দৈন্য, বড় অভাব আজ আমাদের মনে, আত্মায় পীড়া দেয়; অবিশ্বাসে, অভক্তিতে পূর্ণ আমাদের এই মনের জ্বালা এত তীব্র যে, তাহাতে শুধু আমরাই পুড়িয়া মরি না, আশেপাশের সকলকেই সেই তীক্ষ্ণ গরলের উত্তাপ নিস্তেজ করিয়া ফেলে। ভক্তি ও বিশ্বাসের, নিষ্ঠা ও সাধনার জীবন্ত প্রতিরূপিণী যে মাতৃমূর্তি দেহে থাকিয়া সন্তানের এই আত্মার জ্বালা নিবারণ করিতে সর্বদা নিরত থাকিতেন, যাঁহার সরল অকপট বিশ্বাসের স্বাভাবিক গাম্ভীর্যই অবিশ্বাসীকে স্তব্ধ করিত—আজ অন্তরের বেদনা লইয়া সেই জননীকেই ডাকিয়া উঠি। সন্তানের দুর্যোগ-দুর্দিনে মায়ের অভয়বক্ষ ছাড়া তার আর আশ্রয় কোথায়?

শ্রীশ্রীমায়ের সমগ্র জীবনটি আমাদের সম্মুখে যে আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ চিত্রটি ফুটাইয়া তোলে, যে নিস্পৃহ, অনাড়ম্বর, বিশুদ্ধ চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা সেখানে দেখিতে পাই—আমরা সেই জীবন সেই চরিত্রকে দুর্লভ বলিয়া শুধু শ্রদ্ধায় নমস্কার করি, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ইহা কঠিন আয়াসলব্ধ বস্তু ছিল না। এই ছিল তাঁহার সহজ স্বাভাবিক জীবন এবং এই স্বাভাবিকতার জন্যই জীবনের সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব, প্রভাব ও আকর্ষণ-শক্তি ছিল অসামান্য। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পার্শ্বে থাকিয়া এই নিঃশব্দচারিণী অবগুণ্ঠনবতী নারীও যে পরমহংসত্বের সীমানা সহজেই স্পর্শ করিয়াছিলেন, দেহের আবেষ্টনকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া পরমাত্মাতেই অবস্থান করিতেন, তাহা কাহারও অগোচর ছিল না। গ্রামের সরল স্বাভাবিক হাওয়ায়

বর্ধিতা, শিক্ষা ও শিক্ষিত সমাজের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিতা এই নারী বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, তপস্যায় দুরধিগম্য আধ্যাত্মিক উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া গেলেন—হৃদয়ের স্বাভাবিক বিকাশে ও প্রেরণায়। কোন বাধার সঙ্গে সংগ্রামের কাহিনী তাঁহার জীবনে আমরা পাই নাই। প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবনে যাঁহারা জয়লাভ করেন তাঁহারা বীর, তাঁহারা পূজনীয়, কিন্তু যাঁহার তপস্যার অনলমূর্তির সম্মুখে পাপপ্রবৃত্তি আপনিই সঙ্কুচিত হইয়া সভয়ে পলায়ন করে, মুহূর্তের দুর্বলতাও যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশের পথ পায় নাই, পাপকে দলন করিয়া পুণ্যকে বরণ করিতে যাঁহার আয়াস পাইতে হয় নাই, পাপ যাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, পুণ্যই যাঁহার সমগ্র জীবন ; সে-নারী কেমন ? কোন্ অদ্ভুত শক্তি লইয়া তিনি আবির্ভূতা ? স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া যে-নারীর হৃদয়ের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শুধু শ্রদ্ধা, শুধু ভক্তি, শুধু আধ্যাত্মিক প্রেমেরই জাগরণ হইল, মুহূর্তের চঞ্চলতা যাঁহার দৃষ্টিকে অশুদ্ধ বা কুটিল করিতে পারে নাই, স্বামীর নিকট হইতে মাতৃপূজার অঞ্জলি লইয়া যিনি জগন্মাতারূপে বিশ্ববাসীকে সন্তান করিয়া ফেলিলেন, স্বামীর মাতৃ-সম্বোধন যাঁহার হৃদয়ে কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ আনে নাই অথবা অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তিনি দেবী না মানবী ? ইনি দেবী না হইয়া যদি মানবীই হইতেন তবে স্বামীও এত সহজে পরমহংস হইতে পারিতেন না, একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনিই স্বীকার করিলেন। স্বামী পত্নীর ভিতরে দেখিতে পাইলেন জগন্মাতাকে, পত্নী স্বামীর ভিতরে খুঁজিয়া পাইলেন আপনার আরাধ্য দেবতাকে। এমন পতি-পত্নী জগতে নূতন অথবা দুর্লভ। সংযমের পরীক্ষা দিতে তাঁহাদের পরস্পরের নিকট হইতে দূরে থাকিতে হয় নাই, অথচ এই সংযম তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগ বা প্রেমকেও রুদ্ধ করিয়া রাখে নাই। স্বামীর প্রতি তাঁহার এই শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং অগাধ প্রেম শুধু ইহজীবনেই শেষ হইয়া যায় নাই। দেহের ওপারে গিয়াও স্বামী মুহূর্তের জন্য তাঁহার চক্ষুর অন্তরাল হইলেন না। বিধবা হইয়াও স্বামীর এই জাজ্বল্যমান বর্তমানতায় বিধবার বেশ তিনি কোনদিন পরিতে পারেন নাই এবং স্বামী আপনার অমরত্ব ও পত্নীর সহিত অবিচ্ছিন্ন মিলন জানাইয়া দিয়া আপনিই তাঁহাকে সধবার বেশ রক্ষা করিতে আদেশ করেন। সতীত্বের এত বড় পরাকাষ্ঠার নিদর্শন তো জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

এই অটুট সংযম ও উজ্জ্বল পবিত্রতাকে ভিত্তি করিয়াই শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের আরম্ভ এবং ইহারই চূড়ান্তে তাঁহার পরিসমাপ্তি। চরিত্রের এই অপরাজেয় শক্তিকে আরও বলশালী করিয়াছিল ভগবানে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস এবং তাঁহাকে সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিয়াছিল তাঁহার অপূর্ব ভগবদ্ভক্তি ও আত্মভোলা জীব-প্রেম। এই বিশ্বাস ও ভক্তির বলে সাধন-রাজ্যের যে-স্তরে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞান ও বিচারের নিকট সহজপ্রাপ্য বস্তু নয়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার মূর্তিরূপা হইয়া তিনি সকলকেই এই দেব-পথে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা তিনি সহিতে পারেন নাই, প্রতি কথাবার্তায় তাহা প্রকাশ পাইত।

এই চরিত্র-বল ব্যতীত মানুষের হৃদয় জয় করিবার অন্য উপাদান ছিল তাঁহার মাতৃত্ব। বিশ্ব-জননীর আসনে বসিয়া তিনি শুধু পূজা গ্রহণই করেন নাই, মাতৃস্নেহে সকলকে সেবাযত্ন করিয়া তৃপ্ত করিতেন। সেবার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা বা প্রতিসেবা তিনি পাইতে চাহিতেন না এবং না পাইলে উহা তাঁহার মনকে তিলমাত্র বিরূপ করিয়াও দিত না। এ-শিক্ষায় পরমহংসদেব নিজেই তাঁহাকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। আপনার সুখ দুঃখ, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াও সাধারণের সুখ দুঃখে, প্রয়োজনে, অভাবে আপনাকে তিনি সম্পূর্ণ-রূপে বিলাইয়া দিলেন ; সকলের সুখের উচ্ছ্বাস, দুঃখের ইতিহাস মায়ের চরণে নিবেদন করিয়া সকলে হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া যাইত। শিশুরা পর্যন্ত এই মায়ের অকৃত্রিম আকর্ষণের কাছে বশীভূত হইয়া আপনার মায়ের কাছে গিয়া এই অদ্ভুত মায়ের কথা গল্প করিত। সকলকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অদ্ভুত। সন্তানের জননী না হইয়াও এই অদ্ভুত মাতৃত্বের বলে তিনি নরেন্দ্রের মতো তেজস্বী

পুরুষকেও শিশু করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই মাতৃত্ব শুধু সন্তানের দেহের সেবাতেই নিঃশেষ হইয়া যাইত না। প্রতি সন্তানের আত্মিক কল্যাণের জন্য তাঁহার কত চেষ্টা, কত উৎকণ্ঠা। আপনি সিদ্ধ হইয়াও সাধনাহীন সন্তানদের জন্য দিবারাত্র তাঁহার জপে পূজায় কাটিয়া যাইত। তাই তো আজ আত্মার দৈন্য লইয়া এই মায়ের কাছেই আসিয়াছি।

পুণ্যে, পবিত্রতায়, বিশ্বাসে, ভক্তিতে, নিস্পৃহতায় ও মাতৃত্বে এই অসামান্যা নারীর সহিত পরিচিত হইতে আজ আমরা উপস্থিত। যে-মহাসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া তিনি এত বিশাল, আজ আমরা তাহারই অভাবে এত কাঙাল। যে-দেহকে তিনি ঘৃণায় অবহেলায় অতিক্রম করিয়া গেলেন, সেই দেহের প্রয়োজনেই আমরা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতেছি। তাঁহার যে-পবিত্রতার তেজের সম্মুখে প্রবৃত্তি পুড়িয়া যাইত, সেই তেজোদীপ্ত পবিত্রতাকে হারাইয়া প্রবৃত্তির আগুনে আমরাই দগ্ধ হইতেছি। যে-ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁহার জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল, আজ তাহারই অভাবে আমরা তুফানে-পড়া তরণীর মতো ভাসিয়া যাইতেছি। যে-বিশ্বপ্রেমে বিশ্বজননী মাতৃত্বের পূর্ণ মূর্তি হইয়া তিনি সকলকে জয় করিয়া লইলেন, আজ নারী আমরা—তাহারই অভাবে ক্ষুদ্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বার্থপর করিয়া ফেলিয়াছি। তাই আজ এই দেবীর চরণে, এই জননীর চরণে আমাদের হৃদয়ের বেদনা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আজ ব্যথার জ্বালায় আমরা জর্জরিত হইয়া 'মা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছি এই জননীকে। এই দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া যদি আমাদের শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া লইতে পারি, তাঁহার জীবনের বিশেষত্বগুলির কণামাত্রও যদি জীবনে গ্রহণ করিতে পারি তবেই তাঁহার স্মরণের সার্থকতা, আমাদের শ্রদ্ধার মূল্য।*

* উদ্বোধন, ৩৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪০, পৃঃ ১৭৪—১৭৬

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে কলকাতার লোকদের 'দেখতে' বলেছিলেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী, যদিও প্রায় একই সারিতে অবস্থিত স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা বলেন যে, মায়ের বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই মায়ের মন্দিরের সম্মুখভাগ গঙ্গার দিকে ফেরানো—মা গঙ্গা দেখছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও অনুরোধের স্মরণে মায়ের মন্দির পূর্বমুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী—মা কলকাতার লোকদের 'দেখছেন'? 'কলকাতা' মানে অবশ্য শুধু কলকাতা নামক ভূখণ্ডটিই নয়, কলকাতা এখানে একটি প্রতীক। সারা পৃথিবীর মানুষ এবং সারা পৃথিবীই এখানে উদ্দিষ্ট; সুতরাং কলকাতার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, কলকাতার মাধ্যমে সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের দৃষ্টি প্রসারিত—মা সারা জগৎ অর্থাৎ সারা জগতের লোককে 'দেখছেন'। কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক

আলোকচিত্র : স্বামী চেতনানন্দ

প্রবন্ধ

সারদাদেবী এবং নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা

শুস্মিতা ঘোষ

সারদাদেবী শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর লীলাসঙ্গিনীও। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনব্রতে তাঁর ভূমিকা ছিল সহায়কের এবং পরিপূরকের। বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁর আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সারদাদেবী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে প্রধানতঃ তাঁর ভূমিকা ছিল নেপথ্যচারিণীর। নেপথ্যে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনব্রতকে ভোরের শিশিরের মতো তিনি প্রয়োজনীয় পুষ্টি, সঞ্জীবনীশক্তি যুগিয়েছিলেন। তাঁর ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণের নারীমুক্তি-ভাবনার প্রকাশ কতদূর হয়েছিল এবং তিনি নিজস্ব নারীত্বের অনুভূতির সাহায্যে কোথাও কোথাও সেই সীমা অতিক্রম করে নতুন পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন কিনা সেবিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসেছে। সারদাদেবী তাঁর প্রতিদিনের সংসারের খুঁটিনাটি কাজকর্মে নানা মানুষের, বিশেষ করে বহু সাধারণ নারীর সংস্পর্শে আসতেন। তাই তিনি সাধারণ নারীর দুঃখ-বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি নারীর অধিকার বা নারীমুক্তির জন্য কোন আন্দোলন করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিতা সারদাদেবীর কাছে মনুষ্যত্বের সাধনাই ছিল বড় ধর্ম। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোই ছিল তাঁর চোখে নারীর প্রধান কাম্য। তিনি বুঝেছিলেন, মনুষ্যত্বের সাধনা এবং সিদ্ধিতেই নারীর যথার্থ মুক্তি। এর জন্য প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। নারীর নিজেকে জানতে হবে—কেন সে এসেছে, কতটুকু তার সম্ভাবনা এবং কোথায় তার শক্তি তা তাকে উপলব্ধি করতে হবে। অর্থাৎ কর্তব্য সম্পাদনের ভিতর দিয়েই তাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা অর্জন করতে হবে। তাই হবে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পথ।

সারদাদেবী তাঁর সহজ সরল জীবনে সনাতন ভারতীয় জীবনাদর্শ এবং আধুনিক মনন ও মানসিকতার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাঁর জীবন কি বর্তমান যুগের নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শবোধ ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করতে পারে? তাঁর জীবন ও বাণী থেকে নারী তার জীবনসংগ্রামের পাথেয়ের সন্ধান পায় কি? মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের প্রতি সমাজের অবিচার ও অত্যাচার সারদাদেবীর কাছে অসহনীয় ছিল। তাই তিনি নারীর অন্তর্বেদনাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন এবং সেই দৃষ্টির বলেই তিনি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর মর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়ে গেছেন।

মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্যক্তিগত পার্থক্যের জন্য সকলের ক্ষমতা এক নয়। সেইজন্যই সব নারীই রাজিয়া সুলতানা বা লক্ষ্মীবাঈ হতে পারেন না। কিন্তু মুক্তির ইচ্ছা মানুষের জন্মগত এবং মানুষের পূর্ণ অধিকার লাভই নারীমুক্তির অন্তিম লক্ষ্য। প্রাচীনকালের হিন্দু ঋষি ও আচার্যগণ কঠোরের মধ্যে কুসুমের কোমলতা কল্পনা করেছিলেন। তাঁরা নারীর মধ্যে সেই মিলনকে বাস্তবায়িত দেখেছিলেন। তাই নারীকে তাঁরা শক্তি বলেছেন, যে-শক্তি পুরুষের সকল কর্ম ও প্রেরণার উৎস এবং সহায়ক। নারী এবং পুরুষের দৈহিক পার্থক্য প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। জীবজগতে সর্বত্রই পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। সভ্য সমাজে এই দৈহিক শক্তির প্রাধান্যকে অবলম্বন করে কতকগুলি সামাজিক প্রথা এমনভাবে চলে আসছে যে, সেগুলি স্ত্রী-পুরুষের তারতম্যকে কৃত্রিমভাবে আরও বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে। নারী স্বভাবতঃ সহিষ্ণু, ধীর, স্থির। তার স্বভাবে কোমলতা ও বাৎসল্য—এ দুটি গুণ প্রবল। কিন্তু পুরুষ অধিকাংশ সময়ে এগুলিকে নারীর দুর্বলতা বলে ভুল করে। কোমলতা, মমতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতিকে নারীসুলভ

এবং তেজ, বীরত্ব, কঠোরতা প্রভৃতিকে পুরুষসুলভ গুণ হিসাবে চিহ্নিত করার রেওয়াজ আজও আছে যদিও চারিত্রিক গুণের তারতম্য একান্তভাবে লিঙ্গ-ভেদের ওপর নির্ভরশীল নয়। তথাকথিত নারীসুলভ বা পুরুষসুলভ গুণের সমাবেশ পুরুষ এবং নারী উভয়ের মধ্যেই সম্ভব। উভয়গুণের সুষ্ঠু বিকাশ এবং ভারসাম্যের ওপর পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ একান্ত নির্ভরশীল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা বোধহয় এই ভাবনার দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করে।

নরনারীর চারিত্রিক গুণের বৈষম্য যদি কিছু থাকে তবে তা নারীর মাতৃভাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, পাশ্চাত্যদেশে নারীর জায়াভাব প্রাধান্য পেয়েছে, প্রাচ্যে পেয়েছে জননীভাব। ভারতবর্ষ তার সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যে জননীকেই নারীর আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছে। বাস্তবিক, মাতৃভাবই নারীর আকাঙ্ক্ষার প্রথম ও শেষ কথা। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, সন্ত তেরেসা, সারদাদেবী প্রাকৃতিক অর্থে বা আক্ষরিক অর্থে কেউই সন্তানের জননী নন। এঁরা মায়ের ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ ত্যাগধর্ম দিয়ে নির্বিচারে সকল মানুষকে আশ্রয় দিয়ে গেছেন। আক্ষরিক অর্থে 'মা' না হয়েও জননীর আদর্শ এবং শক্তির উদ্ঘাটন যে নারীর ভিতর সম্ভব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সারদাদেবী। কিভাবে তিনি অপরকে আপন সন্তানজ্ঞানে ভালবাসতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। ময়মনসিং থেকে একবার চারজন ভক্ত সন্তান জয়রামবাটীতে এসে-ছিলেন সারদাদেবীর কাছে। এঁদের মধ্যে একজন হঠাৎই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যাবতীয় চিকিৎসা ছাড়াও যথাসম্ভব সেবা সারদাদেবী সেই সন্তানের জন্য করেছিলেন। কিন্তু অসুখ কিছুতেই সারে না। তখন তাঁকে কোয়ালপাড়া আশ্রমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অসুস্থ ভক্তকে নিয়ে যখন পালকি রওনা হয়ে যায় তার একটু পরেই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। ঝড়ের শব্দ শুনেই সারদাদেবী চিৎকার করে ওঠেন: "আমার বাছার কি হবে গো!" তাঁর আর কোনদিকে হুঁশ নেই, ব্যাকুল হয়ে শুধু প্রার্থনা করছেন: "দোহাই ঠাকুর, আমার ছেলেকে রক্ষা কর। আমার ছেলেকে রক্ষা কর ঠাকুর।" আবার বাইরে এসে আকাশের দিকে চেয়ে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন: "আমার বাছাকে রক্ষা কর।" এই আকুল প্রার্থনা কি জননী ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব? নারীর মনুষ্যত্বের সাধনার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনার প্রথম সোপান—মাতৃত্বগুণের প্রকাশ। আধুনিক নারীমুক্তিবাদীদের কেউ কেউ এই চিন্তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে মাতৃত্বের নামে নারীর আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সারদাদেবী বা স্বামীজী কি নারীকে মাতৃত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার কথা বলেছেন, না এর ভিতরই নারীর শক্তির উৎস খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস করেছেন? মাতৃত্ব নারীর পায়ের শৃঙ্খল নয়, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার এবং এগিয়ে যাওয়ারই পাথেয়।

সারদাদেবীর সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মন মানুষের মনুষ্যত্বকেই সবসময়ে বড় করে দেখেছে। মিনার্ভায় 'রামানুজ' নাটক দেখার পর বারবধূ নীরদাকে কোলে টেনে সারদাদেবী সস্নেহে চুম্বন করেছেন। পতিতা, সমাজচ্যুতা নারীর মধ্যেও দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা থাকে, সেকথা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন। তাই তাঁর কাছে 'সতীধর্মের' চেয়ে 'নারী-ধর্ম' অনেক বড়। এইজন্যই তিনি নারীকে মানুষ হিসাবে তার প্রকৃত মূল্য দিতে পেরেছিলেন। সে পতিতা বলে যে তার অন্তরেও ধুলো লাগবে এমন কোন কথা নেই। সে শুদ্ধ, পবিত্র, সুন্দর। অনুকূল পরিবেশে তার মধ্যেও যথার্থ নারীধর্মের বিকাশ ঘটতে পারে। মানুষের ভিতর, তথাকথিত পতিতার মধ্যেও সারদাদেবী চিন্ময়ী শক্তির প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। আধুনিক নারীমুক্তিবাদীরা নারীকে 'সতী' এবং 'পতিতা'—এই দুইভাবে চিহ্নিত করার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কিভাবে স্বল্প-শিক্ষিতা, প্রাচীনপন্থী পরিবেশে মানুষ সারদাদেবী এই বিভাজন অতিক্রম করে নারীকে তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই সুবিখ্যাত ঘটনাটি মনে পড়ছে। সারদাদেবী রোজই শ্রীরামকৃষ্ণের আহার নিয়ে তাঁর ঘরে যেতেন। একদিন এক মহিলা এসে

বললেন : "দিন মা, আমায় দিন।" এই বলে তিনি থালাটি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে রেখে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অন্ন স্পর্শ করতে পারলেন না এবং সারদাদেবীকে বললেন : 'তুমি একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? ওকে কি তুমি জান না? ও চরিত্রভ্রষ্টা। এধরনের মানুষের স্পর্শ করা জিনিস যে আমি খেতে পারি না।" তিনি আরও বললেন : "আর কখনো আমার খাবার কারো হাতে দেবে না বল।" তখন সারদাদেবী বললেন : "তা তো আমি পারব না, ঠাকুর। তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব। কিন্তু আমায় 'মা' বলে কেউ তা চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।" এক্ষেত্রে সারদাদেবীর ঔদার্য ও দৃষ্টির প্রসারতা সত্যিই অভাবনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবন-ভাষ্যকারগণ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঐভাবে সারদাদেবীর মাতৃত্বকে যাচাই করে নিয়েছিলেন। কারণ, সারদা-দেবীর ঐকথা বলার পর তিনি আর কোন কথা না বলে সহাস্যে ঐ খাবারই অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে-ছিলেন। সে যাইহোক, এই আচরণে সারদাদেবী প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, নৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডে তিনি নারীজীবনের মূল্য যাচাই করেননি। তাঁর মাতৃদৃষ্টিতে মানুষের স্খলন কোন গুরুত্ব পায়নি, কোন রকম সামাজিক সংকীর্ণতা তাঁর অন্তরকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। আবার নারী যাতে ভুল পথে পরিচালিত না হয় সেইজন্য তার শক্তির ওপর বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন। ভ্রষ্টা নারীকে তিনি যেমন সস্নেহে কাছে টেনেছেন, সেই সঙ্গে তার মধ্যে নারীর মর্যাদাকেও জাগ্রত করে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর জীবনী-গ্রন্থে এ-সম্পর্কে অগণিত ঘটনা রয়েছে।

আত্মবিশ্বাসই মানুষের আসল শক্তি। আত্ম-শক্তি জাগ্রত না হলে কোন কাজই হয় না। প্রায় সমস্ত জীবনই সারদাদেবীর কায়ক্লেশেই অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু একদিনও তিনি অপরের কাছে তাঁর দুঃখমোচনের জন্য সাহায্য চাননি। তাঁর এই নীরবতায় কতখানি শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা তাঁর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হলে আমরা বুঝতে পারি। প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও তাঁর শান্তি ও উদ্যম কখনো নষ্ট হয়ে যায়নি। অন্যত্র যেখানেই এবং যখনই মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমানিত হতে দেখেছেন সেখানেই তিনি মুখর হয়ে উঠেছেন। গভীর আত্মবিশ্বাসের জোরেই তিনি দুঃখে ও বিপদে অবিচলিত থেকে তাঁর কর্তব্য করে গেছেন। তথাকথিত সামাজিক বিপ্লবের তিনি পরিপোষক ছিলেন না, কিন্তু নিষ্ঠুর অর্থহীন সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার তিনি মেনে নিতে পারেননি। নারীকে তিনি সেই শক্তির অধিকারিণী দেখতে চেয়েছিলেন, যে-শক্তি তাদের সমাজের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে। তাঁর সক্রিয় প্রেরণা ও আশীর্বাদে গৌরী-মার নেতৃত্বে ১৩০১ সালে 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে এর আগে কোথাও সম্পূর্ণ স্বাধীন সন্ন্যাসিনী সংঘ কখনো দেখা যায়নি। নারীও যে প্রকৃত স্বাধীন সত্তার অধিকারিণী, এই আশ্রম তারই নিদর্শন। সারদাদেবীর নারীমুক্তি-চেতনার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর সহজ সরল ভাষায় : "মেয়েদের বুঝিয়ে দিও তারা থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িথোড় করতেই এজগতে আসেনি।" দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, উদারতা, পবিত্রতা, সহমর্মিতা, সততা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি মানবধর্মের বৃত্তিগুলির সাথে মেয়েদের মধ্যে যুগোপযোগী শিক্ষা, শক্তি ও দৃঢ়তা থাকবে এবং এই পথেই হবে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, সারদাদেবীর মতে।

প্রত্যেক নারীর ওপর সমাজের কিছু দায়িত্ব সমর্পিত আছে। তাই সামগ্রিকভাবে দেশের ও সমাজের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে নারীর শক্তি ও ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও বিকাশের ওপর। এজন্য শিক্ষার প্রয়োজন। সারদাদেবী চাইতেন মেয়েরা সবরকম শিক্ষা গ্রহণ করুক। ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু ও মাকুকে তিনি সেইকালে কলকাতায় লেখাপড়া শিখিয়েছেন অন্য মেয়েদের কটাক্ষ ও বাধাকে উপেক্ষা করে। স্বামী কর্তৃক নিপীড়িতা অথবা পরিত্যক্তা বালবিধবা এবং কোন কারণে যার বিবাহ হয়নি—সকলেই যাতে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তিনি তা অন্তর দিয়ে চাইতেন। এজন্য তিনি মেয়েদের অর্থকরী শিক্ষারও সমর্থক ছিলেন। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ধাত্রীবিদ্যা, সূচীশিল্প—এসবও শিখে মেয়েরা স্বাবলম্বী হলে তবেই আসবে তাদের ভিতরের স্বাধীনতা, কুসংস্কার থেকে মুক্তি, অন্তরে-বাইরে

ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন। যে পরমুখাপেক্ষী, তার স্বাধীন মতামত ফুটে উঠবার সুযোগ থাকে না। এইজন্যই প্রখর বুদ্ধিমতী পল্লীনারী সারদাদেবী বলতে পেরেছিলেন: "সারাজীবন পরের দাসত্ব করা, পরের মন যোগানো একি কম কষ্টের কথা!" প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ হবে শিক্ষার মাধ্যমে। জীবনের বাধাবিঘ্নের মধ্যেও মানুষের আত্মশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায় না যদি সে স্বাবলম্বী হয়। সারদাদেবীর কাছে গৃহধর্ম ও ইংরেজী-শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না, সবই একসঙ্গে হতে পারে। তাই তিনি তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্রী দুর্গাপুরী দেবীর শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছিলেন: "আমার মেয়ে ইংরেজী পড়বে।"

অনুশীলনের মাধ্যমে আধুনিক নারী যদি সারদাদেবীর আদর্শকে অনুসরণ করে তবে সে সমাজে তার সম্মানিত স্থান নিজেই করে নিতে পারবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করেছেন। তাঁর মতামত ও পরামর্শকে তাঁরা সর্বদা শিরোধার্য করেছেন। এই সম্মান ও মর্যাদা আমৃত্যু তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধারগণের কাছে পেয়েছেন এবং এই সম্মান ও মর্যাদা তিনি পেয়েছেন আপন মহিমায়।

পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে যে পরিবার-প্রথা প্রচলিত আছে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে মিলে যে সংসারের কাজগুলি করার রীতি প্রচলিত আছে, তাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব উভয়েরই। জীবন-শিল্পী সৃষ্টির লীলাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতেই গড়েছেন নারী ও পুরুষ। নারী হচ্ছে পুরুষের সঙ্গিনী, সহকর্মী। উভয়েরই সমান মানসিক যোগ্যতা রয়েছে বলেই তো একে অন্যকে সাহায্য করে। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসিকতার ওপর ইংল্যান্ডের ভিক্টোরীয় যুগের গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শে নারীর সহকর্মী মূর্তির প্রভাবের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই আদর্শ আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যেই ছিল। সারদাদেবী তাঁর জীবন দিয়ে তা দেখিয়ে গেছেন। তিনি ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও ব্রত অসম্পূর্ণ থেকে যেত। নারী ও পুরুষ উভয়েই যদি একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তবেই নারী পুরুষের সঙ্গে সমভাবে সর্ব স্বাধীনতা উপভোগ করবে। প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম-পরিধিতে পূর্ণ স্বাধীন হতে পারবে। সারদাদেবী তাঁর সমগ্র জীবনের কর্ম ও আচরণে আমাদের সামনে তা কেমন করে সম্ভব দেখিয়ে গেলেন।

নারী পুরুষকে প্রভু বা মালিক হিসাবে দেখতে চায় না। সে চায় তার সহধর্মী হিসাবে পুরুষকে পেতে। নারী এবং পুরুষের সহযোগিতায় জগতে মহৎ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। এখানে হারজিতের কোন প্রশ্ন নেই, সম্মান-অসম্মানের কোন ব্যাপার নেই। কারণ, নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। নিজের নিজের স্থানে, কর্তব্যে উভয়েই সমান, উভয়েরই সমান ভূমিকা। কেউ কারো চেয়ে হীন নয়, ছোট নয়, নিম্নমানের নয়। একের ভূমিকা অন্যে পূরণ করতে পারে না। নারী ও পুরুষকে সারদাদেবী একই মানে দেখেছেন। তাই তাঁর সুন্দর ঘরোয়া কথায় বলেছেন: "সংসারে সবই দুটি দুটি। এই দেখ না চোখ দুটি, কান দুটি, হাত দুটি, পা দুটি তেমনই পুরুষ ও প্রকৃতি।" কথাটি হয়তো আপাতদৃষ্টিতে হাল্কাভাবে বলেছিলেন তিনি। কিন্তু নারী ও পুরুষের মর্যাদার পারস্পরিক স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি ভিন্ন যে কোন পরিবার, কোন সমাজ, কোন দেশ উঠতে পারে না, তার ইঙ্গিত সারদাদেবীর এই কথার মধ্যেই ছিল।

আজ আমাদের সমাজ অনেক এগিয়েছে, নারীর স্থান আজ সমাজে অবহেলিত নয়, নারী আজ আর অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। প্রশাসনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে—সর্বত্র নারী তার ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছে। দেশের সর্বোচ্চ কর্ণধারের আসনও নারী অলঙ্কৃত করেছে। ঘরে ঘরে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা আজ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এই শিক্ষা, এই স্বাতন্ত্র্য, এই উন্নতি আমাদের পরিবার-জীবনকে সুদৃঢ় করছে কিনা, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনাকে সঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। যদি নারীর বর্তমান উন্নতিতে নারী অহঙ্কৃত হয়, পুরুষকে তার নিছক প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী ভাবে তাহলে বুঝতে হবে, নারীমুক্তির লক্ষ্য থেকে নারী এখনো অনেক দূরে। কোন্ পথে নারী তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে তার উত্তর সারদাদেবী।

কবিতা

যে পথ তোমার দিকেই শুধু

নিভা দে

এখন আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই—সোজা যে পথ
চলে গেছে তোমার দিকে—
তোমার দিকেই শুধু—সেই দিকে হেঁটে যাব
ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে—
রাজপথের দু-ধারে, শুঁড়ি অন্ধকার গলিতে
অনেক ছলনা ছিল একদা ওঁত পেতে,
ভুলিয়েছে আমাকে অনেক সোনালী তঞ্চকতায়।
অনেক মোহিনী বাঁশি নিয়ে গেছে
পথভ্রষ্ট আমাকে একা নদীতীরে…
তারপর চারদিকে উঠেছে বেজে অট্টহাসি শুধু।
এখন চোখের মায়া—আর কিছু নেই।
এখন যে পথ তোমার দিকেই শুধু—
সেই পথে হাঁটব।

সন্ধ্যা নেমে এল

মানসী বরাট

সন্ধ্যা নেমে এল
আকাশের ছায়া বুকে নিয়ে
বহমান গঙ্গার ধারে হরিদ্বারে।
সন্ধ্যা নেমে এল
মুসৌরীর মেঘমাখা পাহাড়ে পাহাড়ে।

সন্ধ্যা নেমে এল
মায়ের মন্দিরে, দক্ষিণেশ্বরে।
সন্ধ্যা নেমে এল
জাহ্নবীর অপর তীরে
বেলুড়ের মন্দিরে মন্দিরে।

সন্ধ্যা নেমে এল
দিগন্ত হলো রাঙা
রক্ত আবীরে—ধীরে, অতি ধীরে।
জীবন আমার আজ মিল খুঁজে পেল,
সেখানেও হয়েছে সময়,
কে যেন বলিছে ডেকে :
'সন্ধ্যা নেমে এল,
আর দেরি নয়,
ক্লান্ত বিহগের দল,
ঐ দেখ ঘরে সবে ফেরে।'

প্রার্থনা

মাগো, হৃদয়ে আসন পেতে যে রেখেছি,
তোমাকে বসাব বলে,
মনের কথাতে মালাটি গেঁথেছি,
পরাব তোমারই গলে।
দাও মোরে মাগো করুণা-প্রসাদ,
দাও তব পদধূলি।
এমন কাজে রেখ যেন মোরে,
তোমারে না যাই ভুলি।
প্রাণে সাড়া দাও, মনে বল দাও,
দাও দাও আঁখি খুলি।
জনম আমার ধন্য করগো,
বেশি কি তোমারে বলি।
করুণা-ভিখারী হয়ে আজি মাগো,
এসেছি তোমারই দ্বারে।
ভকতিহীনের লহ প্রণিপাত,
ফিরিয়ে দিয়ো না মোরে।
করজোড়ে আজ রহিয়াছি বসি,
তোমারই আসনতলে।
তুমিই আমার আপনার জন
হৃদয়ে সাড়াটি মেলে॥

চল যাই বেলুড়ে মায়ের মন্দিরে

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

চল যাই ঘুরে আসি মায়ের মন্দিরে,
গঙ্গার তীরে, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে
মা বিরাজমানা বেলুড়ে,
চল যাই সে মন্দিরে।
মন্দিরের সোপানশ্রেণীতে বিনম্র প্রণামখানি রেখে
চল যাই এগিয়ে।

মায়ের চিত্রপটখানি ঘিরে
সোনালী জরিপাড়ের শাড়ি
সুন্দর এবং নিখুঁত করে পরানো।
নানারঙের নানান ফুলের রাশি
আলিম্পনের ভঙ্গিতে সাজানো মেঝেতে।

মায়ের ছবির দুপাশে রয়েছে
ফুলভরা দুটি মোরাদাবাদী ফুলদানি,
মায়ের স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল ছবির নিচে
মায়ের রক্ত-রাঙা পদচিহ্ন।
গঙ্গার দিকে মুখ করে
মা বসে আছেন কলকাতার মানুষের দিকে তাকিয়ে
সে-দৃষ্টিতে পরম অভয়, সে-হাসিতে পরম আশ্রয়।
মায়ের চরণ ধুয়ে বয়ে চলেছে কলস্বরে
হেমন্তের নির্মল জাহ্নবী।
চারপাশে কয়েকটি বড়গাছের বিনম্র ছায়া—
দেখে মনে হয় যেন পটে লেখা ছবি।

এখানে এলে শান্তি—পরমা শান্তি।
প্রতিদিন ছুটে আসে অগণিত মানুষ।
ঠাকুরের বিরাট মহিমময় কারুকার্যখচিত
মন্দিরের পাশে
কত ছোটখাটো মায়ের মন্দিরটি,
কিন্তু কী অপরিসীম মহিমায়
আসীনা তিনি সেখানে।
ঠাকুরের মন্দিরে প্রণতি জানিয়েই
সবাই ছুটে চলে মায়ের কাছে—
তিনি যে 'মা'—সকলের মা।
চল যাই বেলুড়ে মায়ের মন্দিরে।
আজ যে তাঁর পুণ্য জন্মতিথি।

অনন্ত রূপ

সুহাসিনী ভট্টাচার্য

বিশ্বরূপ-শতদলে তোমার বিচিত্র রূপ
হেরি আমি পরম পুলকে।
অসীম শূন্যে হেরি অগণিত তারকার দ্যুতি
পরম বিস্ময়ে

তোমার মধুর হাসি ছড়ায় ভুবনময়,
প্রভাতের সূর্যকিরণে।
মধু সমীরণ বহে ভরিয়া ভুবন,
তোমার স্নেহের পরশ দেয় প্রাণে প্রাণে।

কোন্ মহামন্ত্রবলে একই ছন্দে একই তালে
ছয় ঋতু আসে বারবার।
সাজায়ে বরণডালা বিচিত্র ফলে ফুলে
ধরণীরে দিতে উপহার ?

নিদাঘের রুদ্রতাপে ক্লান্ত ধরণী যবে
চেয়ে থাকে চাতকিনী প্রায়।
তোমার আশিসবারি ঢাল তুমি শতধারে
সকল ক্লান্তি জ্বালা জুড়ায় ধরার।

মহাসিন্ধুর বক্ষ হতে প্রবল ঝঞ্ঝা যবে
ছুটে আসে ধরা'পরে করিয়া হুঙ্কার
সে-রুদ্র রূপ হেরি ভয়ে কাঁপে কলেবর।
তোমার অমৃতনাম স্মরি বারবার
ছুটে চলে স্রোতস্বিনী অনন্ত বারিধি পানে
তোমার মহিমা গীতি গাহে অনিবার।
মলয় পবনাঘাতে তরুশাখা নতশিরে
তোমারেই জানায় প্রণাম।

তোমার রক্তিম হাসি অশোকে কিংশুকে
ফাগুনের মূর্চ্ছনা আনে
ঋতুরাজ 'আসে হাসি' ধরিয়া নবীন সাজ,
ধরণীও সাজে নব সাজে।

কণ্ঠে দিয়েছ ভাষা, হৃদয়ে দিয়েছ আশা
তোমার মহিমা গীতি গাহিবারে চাই,
অঞ্জলে পুরিয়া চাই মাপিতে সিন্ধুবারি,
শ্রীচরণে ক্ষমা মাগি তাই॥

সমাজ সংস্কারে শ্রীসারদাদেবী

রওশন আরা ফিরোজ*

শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর অসীম প্রেম, প্রজ্ঞা, মাধুর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারীত্বের এক অন্যতম আদর্শ যা পতিপ্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডি ও সংসারের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে এক সর্বজনীন সখ্যতা বা বিশ্বপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সিস্টার নিবেদিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "মেয়েদের যেটা ইমোশন সেটা যদি শুধু ইমোশনই হয় তবে তা অতি সহজেই বিকৃত হয়। কিন্তু তার মধ্যে যদি একটা চরিত্র থাকে তবেই হয় তার সত্য প্রতিষ্ঠা··· বিদেশী মেয়েরা তাদের ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করে কাজের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে। এরকম ভালবাসা আছে যা তুলে ধরে বড় করে।"[১] প্রাচ্যের রমণী সারদাদেবী সেই চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম শক্তিরূপে বিস্তৃত হয়েছিল সমাজের বিশাল পরিমণ্ডলে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁর মমতার হাত ছিল চিরপ্রসারিত। স্বার্থপরতার উর্ধ্বে থেকে পরার্থপরতার উন্মুক্ত দিগন্তে ছিল তাঁর বিচরণ, যার কাছে ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা ছিল অতি তুচ্ছ।

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে মাত্র পাঁচবছর বয়সে সারদাদেবীর বিয়ে। তারপর দীর্ঘ একযুগ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক বিস্মরণ। প্রথমে কামারপুকুরে ও পরে জয়রামবাটীতে স্ত্রীকে রেখে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উক্ত দীর্ঘ সময়টিতে নিষ্ঠুর প্রতীক্ষার যন্ত্রণা সারদাদেবীর মনোবলকে ভাঙতে পারেনি। পাড়া-পড়শী গ্রামবাসীদের উপহাস ও কটাক্ষের মাঝেও তিনি ছিলেন ধ্রুবতারার মতো ধৈর্যে স্থির। "জয়রামবাটীর মানুষজন তাঁকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করে। পাগলা মানুষের বউ বলে সখীদের কাছেও সারদা যেন অনুকম্পার পাত্রী।"[২] কিন্তু সকলের করুণা ও উপহাসের পাত্রী হয়েও সারদাদেবী ছিলেন নির্লিপ্ত। কোন রকম হীনম্মন্যতা ও মনোবিকার তাঁকে স্পর্শ করেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ যে অন্যান্য পুরুষের চেয়ে ভিন্ন চরিত্রের ও সাধারণের মাপকাঠিতে তাঁকে বিচার করা যায় না এ স্পষ্ট প্রতীতি সারদাদেবীর হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ছিল। তাঁর অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে তিনি 'সময় হলে ডাক আসবেই' এই বিশ্বাসে বলীয়ান ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে উদাসীন স্বামীর প্রতীক্ষায় না থেকে নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চলে এলেন তিনি। একদিকে সত্যিকারের নিষ্ঠাবতী স্ত্রী, গৃহকর্মে সুনিপুণা মহিলা, অন্যদিকে স্বামীর শিষ্যা, পরামর্শদাত্রী এক কথায় 'Friend, Philosopher & Guide'-এর ভূমিকায় ও সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেন সারদাদেবী। পাশ্চাত্যের লেখক ক্রিস্টোফার ঈশারউডের মন্তব্য উল্লেখ্য : "বিয়ে করে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। হিন্দুর বিবাহে তখন ভ্রষ্টাচার এসেছে। পুরুষের সমাজে স্ত্রীর মর্যাদা তখন হেয় হয়ে গেছে। বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে উঠেছে স্বামীর লালসার বস্তু। সংসারে তার পরিচয় হয়েছে দাসীরূপে। রামকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রীকে সর্বগুণান্বিতা করে শিক্ষা দিয়েছিলেন শুধু পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেবার জন্য নয়, তাঁকে আরও মহীয়সীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে একটি দৃষ্টান্ত রাখতেই রামকৃষ্ণ যত্নবান হয়েছিলেন।"[৩] বাস্তবিকই সারদাদেবী তাঁর স্নেহ-প্রেম মায়া-মমতার বলে নিজের সন্তানের মা না হয়েও লক্ষ লক্ষ

* রওশন আরা ফিরোজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা।

১ ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ—শঙ্খ ঘোষ, ১ম সং, পৃঃ ৭০

২ রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ- ক্রিস্টোফার ইশারউড, ১ম সং, পৃঃ ১২২

৩ ঐ, পৃঃ ৭৯

সন্তানের জননীরূপে জগজ্জননীর অসাধারণ আসনে নিজেকে অলঙ্কৃত করেছিলেন।

রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের কন্যা হিসাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে লালিত হয়েও শ্রীমা সারদাদেবী সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও নীচতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সেই যুগে একজন নিষ্ঠাবতী হিন্দুকুলবধূ হয়ে পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গিনী খ্রীস্টান মহিলাদের সাদরে বরণ করা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। ইউরোপের শিক্ষিতা মহিলা মিসেস ওলিবুল সারদাদেবীকে সাক্ষাতের পর তাঁর অভিজ্ঞতা অধ্যাপক Max Muller-এর কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন: "আমরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদাদেবীকে দর্শন করার অনুমতি পেয়েছি। তিনি 'আমার মেয়েরা' বলে আমাদের গ্রহণ করলেন।"[৪] সারদাদেবীর বহু সন্তানের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মার্চ নিবেদিতার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় শ্রীমার। তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে এসে প্রাচ্যের নারীদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীদের বহুদিনের বদ্ধমূল ধারণা দূরীভূত হয়। এই দিনটিকে নিবেদিতা চিহ্নিত করেছেন 'Day of Days' বলে। প্রায় ১৩ বছর সারদাদেবীর সাথে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান ঘটে। নিবেদিতার সকল রকম সমাজসংস্কারমূলক কাজে প্রেরণা যোগাতেন শ্রীমা। তাঁরই উপস্থিতি ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলে প্রাচ্যের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে একজন পাশ্চাত্য মহিলা সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নিরলস কর্ম-সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন অতি সহজেই। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে সারদাদেবীকে লেখা সিস্টার নিবেদিতার চিঠি: "তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ, শান্ত তা সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো।"[৫] সারদাদেবী নিবেদিতা-সহ আরও অনেক খ্রীস্টান রমণীদের নিজগৃহে স্থান দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যার ঘরে ম্লেচ্ছ বিদেশিনীর অবস্থানকে সেযুগে তাঁর আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত গর্হিত ও সমাজবিরোধী কাজ বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু সারদাদেবী ছিলেন নির্ভীক, প্রতিজ্ঞায় অটল। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা সারদাদেবী সম্পর্কে লেখেন: "সারদাদেবীকে আমরা হোলি মাদার বলি। খুব সাধাসিধে হিন্দুরমণী তিনি। কিন্তু তবুও আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।"[৬]

শ্রীমা সারদাদেবী নিজে লিখতে পারতেন না, পড়তে পারতেন, কিন্তু শিক্ষার প্রতি অগাধ অনুরাগ ছিল তাঁর। কলকাতায় ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য সিস্টার নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে প্রায়ই পরিদর্শনে যেতেন তিনি। 'লোকমাতা নিবেদিতা'য় উল্লেখিত ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ অক্টোবর সারদাদেবীর বিদ্যালয় দর্শনের একটি বিবরণে দেখা যায়—"কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 'বেশ তো করেছে মেয়েরা'।" অগ্নির মতো তেজস্বিনী ত্যাগী রমণী সিস্টার নিবেদিতা সারদাদেবীর নিকট শিশুর মতো নির্ভীক ছিলেন। শ্রীমার সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধের সাহায্যে অনেক সমস্যার সমাধান পেতেন তিনি। ভারতের বিভিন্ন দেশ ও তীর্থভ্রমণের ফলে তাঁর [শ্রীমার] জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল বিস্তৃত।

সংকীর্ণ ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে থেকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথের" আদর্শে অনুপ্রাণিত সারদাদেবী ইস্টার দিবসে সঙ্গিনীদের নিয়ে নিবেদিতার আবাসে এসে উপস্থিত হতেন। এসম্পর্কে নিবেদিতার মন্তব্য লক্ষণীয়—"আমাদের ছোট ফরাসী অর্গানযোগে ইস্টারের গীতবাদ্য করা হলো। খ্রীস্টের পুনরুত্থান স্তোত্র শ্রীমার কাছে অজ্ঞাত ও বিদেশীয় হলেও যেরকম দ্রুত তার মর্মানুভব করে সুগভীর ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অসন্দিগ্ধভাবে উন্মোচিত হলো সারদাদেবীর ধর্মসংস্কৃতির মহিমা কি বিরাট।"[৭]

৪ লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, আনন্দ সং, পৃঃ ১৭৬

৫ ঐ, পৃঃ ৯১০ ৬ ঐ, পৃঃ ৯৮৭ ৭ ঐ, পৃঃ ৯৯৫

অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে খাওয়া, ওঠা-বসা, ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ব্যাপারে কোন সংস্কার তাঁর ছিল না। সমাজের রক্তচক্ষু ও লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্য করে খ্রীস্টান-কন্যা নিবেদিতার রান্না-করা খাবার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। সারদাদেবীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য সকল শ্রেণীর মহিলাগণ তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। কলকাতায় সর্বদা ১৪।১৫ জন উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা তাঁকে ঘিরে থাকতেন। তাঁদের কোন্দলপ্রিয় স্বভাব সকলের বিরক্তি ও অসন্তোষের কারণ ছিল। শ্রীমা তাঁর প্রফুল্লতা ও অপূর্ব বিচক্ষণতার সাহায্যে এঁদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে স্থায়ী শান্তি রক্ষার চেষ্টা করতেন। সারদাদেবীর বাড়িতে গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি সহ আরও অনেক হিন্দু বিধবা থাকতেন। এঁরা অনেকেই স্বামী-সংসার কর্তৃক নির্যাতিতা হয়ে অত্যন্ত করুণ ও বেদনাময় জীবনযাপন করতেন। শ্রীমার মমতাময় স্পর্শে তাঁরা তাঁদের সমস্ত দুঃখে সান্ত্বনার প্রলেপ পেয়েছিলেন।

সারদাদেবী অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্না ও সংস্কৃতি-মনা মহিলা ছিলেন। ২।১ বাগবাজার স্ট্রীটের ওপর সারদাদেবীর ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতি বিকেলে এক বিরাট আনন্দের হাট বসত। সমাজের সর্বস্তরের মহিলারা ভক্তরূপে এই আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি বালবিধবা লক্ষ্মীমণি দেবী রামপ্রসাদের গান ও কীর্তন গাইতেন অপূর্ব দরদ দিয়ে। এক কথায় তার গৃহ ছিল নির্মল আনন্দ আহরণের এক লীলাভূমি, যেখানে হিন্দু বিধবারা তাঁদের কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধনের জীবনেও এক ঝলক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেতেন।

প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের অপূর্ব সমন্বয় ছিলেন সারদা-দেবী। যেকোন জটিল সমস্যার ব্যাপারে তিনি বিনা দ্বিধায় উদার ও মহৎ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করতেন। ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের কঠোরতার মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হলেও তিনি প্রতিক্ষেত্রে নিজেকে পরিবেশের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উন্নীত করতে পারতেন। এমনকি অভিজ্ঞতার বহির্ভূত সামাজিক সমস্যাবলীও তিনি অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি ও স্বজ্ঞার মাধ্যমে সঠিক সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। সারদাদেবী প্রেমময়ী হলেও প্রয়োজনে হতেন বজ্রের মতো কঠোর। কর্তব্যকর্মে তিনি কিছুতেই বুদ্ধিহীন ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হননি। আশ্রমে যারা সাধুর আচরণ লঙ্ঘন করেছিল তাদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছেন। নারীসুলভ ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে অপরাধকে ক্ষমা করেননি। তবে 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়'—এ মতাদর্শে বিশ্বাসী সারদাদেবী মাতাল, ডাকাত, মজুর-মাঝি-ডোম—সকলকেই তাঁর গৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানাতেন। কারণ তিনি ছিলেন 'সতেরও মা অসতেরও মা'। নিজের হাতে তাদের খাবার পরিবেশন করতেন। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সকলের প্রতি অবারিত ছিল তাঁর গৃহের দুয়ার। জাতিভেদ-বর্ণভেদ, মানুষে মানুষে কোন ভেদা-ভেদই তিনি মানতেন না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বুভুক্ষু মানবের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন ত্রাণকর্ত্রী হিসাবে। এক কথায় সারদাদেবী ছিলেন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অধিকারী চরম মানবতাবাদী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রাচ্যের রমণীকুল যখন অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে অন্ধ ও সমাজের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট, সেই সময়ে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে সারদাদেবী ভক্তদের বিশেষ অনুরোধে হ্যারিংটন নামে একজন ইংরেজ ফটোগ্রাফারকে তাঁর ছবি তোলার অনুমতি দেন। বর্তমানে সারদাদেবীর যে-ছবিটি সর্বত্র অর্চিত ও প্রচারিত হয়, এটি সেই ছবি। বলা বাহুল্য, সেই যুগে একজন হিন্দুকুল-বধূর পক্ষে বিদেশী ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ছবি তোলা একটি দুঃসাহসের পর্যায়ে পড়ে। সারদাদেবীর আরেক সন্তান ছিলেন নাট্যজগতের বিস্ময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ। শ্রীমা কলকাতার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ, বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর, জনা, পাণ্ডবগৌরব, কালাপাহাড় এবং অপরেশচন্দ্রের রামানুজ নাটক দেখেছিলেন। নাটকে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও তিনি পুত্র-কন্যাসম স্নেহ করতেন। সারদাদেবী যে কতখানি সংস্কারমুক্ত, উদার হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এসব তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সারদাদেবীর জীবনাদর্শকে নীতিবিদ্যার পূর্ণতাবাদের (Perfectionism) পর্যায়ে দেখা চলে। কারণ, তাঁর জীবন ছিল কৃচ্ছ্রতাবাদ ও সুখবাদের এক অপূর্ব সমন্বয়। নিজের ক্ষুদ্র সংসারের খুঁটি-নাটি কাজ সমাধা করেও বিশ্বমানবতার প্রতি তাঁর বিশাল দায়িত্ব ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর সেবার আদর্শে বিস্মিত হয়ে বলেন: "তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কল্পনা করতে পার যে, মহামায়া সাধারণ স্ত্রীলোকদের মতো ঘরকন্না ও আর সবরকম কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবে মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন।"[৮] বাস্তবিকই মানবজাতির জন্য তিনি যে অসাধারণ আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেই পথই যেকোন ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে সর্বজনীন সুখের জগতে যা শুধু প্রেম ও ত্যাগের মাধ্যমেই সম্ভব।*

৮ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১ম সং, পৃঃ ২২৮

* উদ্দীপন, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৫-৪৮; প্রকাশ-স্থান—ঢাকা, বাংলাদেশ।

সংগ্রহ: তাপস বসু

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণিকা

ইন্দুবালা ঘোষ

আমার বাবার নাম চন্দ্রমোহন দত্ত। আমাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশে)। বিক্রমপুরের অন্তর্গত গাওপাড়া গ্রামে আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। ঠাকুরদার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত। তাঁর পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। আমার বাবা চন্দ্রমোহন দত্ত ছিলেন ঠাকুরদার তৃতীয় সন্তান। সকলের বড় ছিলেন কালীকুমার দত্ত। তিনি রেলে চাকরি করতেন, থাকতেন কলকাতার শোভাবাজারে। বাবা দেশ থেকে কলকাতায় আমার জ্যাঠামশাই কালীকুমারের বাড়িতে আসেন চাকরির সন্ধান করতে। কোনরকম সুবিধা করতে না পারায় একদিন জ্যাঠামশাই বাবাকে বললেন: "টাকা-কড়ি দিতে না পারলে তোমাকে খাওয়াতে পারব না।" বাবা জ্যাঠামশায়কে 'সোনা-দা' বলে ডাকতেন। সোনা-দার মুখে এরকম নিষ্ঠুর কথা শুনে নিজের ওপর ধিক্কার এলো এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, আজকের মধ্যে যদি চাকরি না পাই তবে রেললাইন ধরে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। সেদিন রাস্তায় নেমে এক ভদ্রলোকের কাছে জানতে পারেন রামকৃষ্ণ মিশনে গেলে চাকরি হতে পারে। বাবা আগে কোনদিন রামকৃষ্ণ মিশনের নাম শোনেননি। যাইহোক খোঁজ করতে করতে তিনি উদ্বোধনে আসেন।

উদ্বোধনের ('শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'র) বাইরের বারান্দায় বাবা বসে আছেন। ওখানকার একজন কর্মী সদর-দরজার কাছে এলে বাবা তাকে বললেন: "এটা কি রামকৃষ্ণ মিশন?" লোকটির নাম মোহন। সে বলল: "হ্যাঁ"। বাবা বললেন: "এখানে যিনি সবচেয়ে বড় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। দেখা হতে পারে?"

মোহন বলল: "আমি ওপরে গিয়ে 'মা'কে জিজ্ঞাসা করে আসি।" মোহন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে বলল: "মা, একজন ভদ্রলোকের ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।" শ্রীশ্রীমা বললেন: "আমার কাছে নিয়ে এস।" বাবা কাছে যেতে শ্রীশ্রীমা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার নাম কি? দেশ কোথায়? তুমি কি কাজ কর?" ইত্যাদি। বাবা নাম ও দেশ বললেন, আর বললেন যে, কাজের চেষ্টা করছেন। শ্রীশ্রীমা বললেন: "তুমি কি এখানে কাজ করবে?" বাবা বললেন: "আপনি আমায় যে-কাজ দেবেন, আমি সেই কাজ করব।" তখন মা বললেন: "কাল থেকে তুমি এখানে কাজ করবে। তোমাকে বাজারের টাকা দেবে, তুমি মোহনকে সঙ্গে করে নিয়ে বাজারে যাবে। বাজার করে যা পয়সা থাকবে, তুমি নিও, ফেরৎ দিতে হবে না।" শ্রীশ্রীমা বলায় শরৎ মহারাজও কোন আপত্তি করেননি। বাবাকে শরৎ মহারাজেরও পছন্দ হয়েছিল। কদিন পর শ্রীশ্রীমা বাবাকে বললেন: "তুমি কাল থেকে এখানেই থাকবে। খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা সবই এখানে। তোমার মাইনে দশ টাকা। শ্রীশ্রীমা বাবাকে আদর করে 'চন্দ্র' বলে ডাকতেন। এরপর একদিন বাবাকে বললেন: "যেখানে যেখানে ঠাকুরের উৎসব হবে সেখানেই তুমি উদ্বোধনের বই বিক্রি করতে যাবে।" মুটে ঠিক হলো। তার নাম পাঁচু। বাবা মুটের মাথায় বই তুলে দিতেন। বাবা কোথাও গেলে শ্রীশ্রীমা তাঁর জন্য সরবৎ করে রাখতেন। রোদ থেকে 'চন্দ্র' যখন ফিরবে তখন খাবে।

একদিন বাবা উৎসবের জন্য বই নিয়ে বাঁকুড়া যাবেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে বললেন: "তুমি তো বাঁকুড়া যাচ্ছ, তোমার মেয়েকে বলে যেও, যখন যা দরকার হবে আমার কাছে যেন আসে।" এর আগে আমরা মা-ভাই-বোনেরা দেশে থাকতাম। বাবাকে একদিন শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন: "চন্দ্র, এবার বৌমাকে আর তোমার ছেলেমেয়েকে কলকাতায় নিয়ে এস।" তখন বাবা আমাদের দেশ থেকে নিয়ে এলেন। আমাদের বিধবা পিসিমাও আমাদের সঙ্গে এলেন। আমরা তখন বাগবাজারে নিবেদিতা লেনে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকতাম। ক্রমে বাবার মাইনে হলো ২৪ টাকা। শ্রীশ্রীমা সবসময় আমাদের সাহায্য করতেন। আমার মাকে শাড়ি কিনতে হতো না।

আমার মাকে শ্রীশ্রীমা-ই শাড়ি দিতেন। শুধু আমার মাকেই নয়, আমার বাবার এবং আমাদের সকলের কাপড়চোপড় তিনিই দিতেন।

আমি তখন নিবেদিতা স্কুলে পড়ি। শ্রীশ্রীমা-ই ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন আমি ও আমার খুড়তুতো বোন রানী [আমার কাকা লালমোহন দত্তের মেয়ে রানীবালা (নাগ)। শ্রীশ্রীমা তাকে আদর করে ডাকতেন 'ছোট খুকি', আমায় ডাকতেন 'বড় খুকি'।] দুজনে উদ্বোধনে গেছি। গোলাপ-মা, যোগীন-মা দুজনেই শ্রীশ্রীমার কাছে সবসময় থাকতেন। গোলাপ-মা খুব রাগী ছিলেন। যোগীন-মা ছিলেন খুব ঠাণ্ডা। গোলাপ-মা আমাদের দেখে বললেন: "এত বেলায় কেন এসেছিস?" আমরা ঐকথা শুনে ভয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি, বারান্দায় এসে শ্রীশ্রীমা আমাদের ডাকছেন আর বলছেন: "ও খুকিরা, রাগ করিস না, চলে আয়।" মাথা বাড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে মা খুব ডাকছেন। দু-তিন বার আমিও হাত নাড়িয়ে বললাম: "আমরা যাব না, গোলাপ-মা আমাদের বকেছেন।" তারপর বাবা বাড়ি ফিরে এলে তাঁর কাছে শুনলাম যে, শ্রীশ্রীমা বলেছেন: "গোলাপের তো ঐরকম কথা, আমি খুকিদের কত ডাকলাম, কিছুতেই এল না।" বাবা বাড়িতে এসে আমাকে বললেন: "মা কত ডাকলেন, কেন গেলি না?" আমরা কি তখন অত বুঝেছি, মা কি জিনিস? আমি তো তখন সবে দশ বছরের মেয়ে! আমার পরের ভাইয়ের (অমূল্যচরণ দত্তের) জন্য শ্রীশ্রীমা তিনভরি সোনার গোট হার গড়িয়ে দিয়ে বাবাকে বলেছিলেন: "এই হার তোমার ছেলেকে দিলাম, গলায় পরিয়ে দিও।"

আমি মাঝে মাঝেই উদ্বোধনে যেতাম। শ্রীশ্রীমা আমাকে শালপাতা করে মোহনভোগ দিতেন। একদিন স্কুলের মেয়েরা চড়ুইভাতি করবে। চার আনা পয়সা দিতে হবে আমায়। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, উদ্বোধনে গিয়ে মায়ের কাছে চাইব। শ্রীশ্রীমাকে আমি 'ঠাকুমা' ডাকতাম। ওখানে গিয়ে 'ঠাকুমা' বলে ডাকতেই শ্রীশ্রীমা জানতে চাইলেন কেন ডাকছি। চড়ুইভাতি করবার জন্য চার আনা পয়সা দরকার শুনে বাক্স থেকে একটা সিকি এনে আমার হাতে দিলেন। তখন সস্তার দিন ছিল। এক পয়সায় একটা ডিম পাওয়া যেত।

প্রায়ই স্কুল থেকে ফিরে বলরামবাবুর বাড়িতে গিয়ে ঐ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে খেলতাম। একদিন উদ্বোধনে গিয়ে দেখি রাধু-দি, মাকু-দি রেশমী চুড়ি পরছে চুড়িওয়ালীর কাছ থেকে। মা আমার দু-হাতেও ছয় ছয় করে বারো গাছা চুড়ি পরিয়ে দিতে বললেন। মা আমাকে মাথার পাকা চুল তুলে দিতে বলতেন। আমিও বসে বসে মায়ের পাকা চুল তুলতাম। মায়ের চুল খুব ঘন আর কাঁচা-পাকা, কোঁকড়ানো—কোমর পর্যন্ত ছিল। চুল তোলার পর আমাকে বড় একটা অমৃতি কিংবা সন্দেশ দিতেন। একদিন ঢাকা থেকে কোন ভক্ত মাকে অমৃতি পাঠিয়েছেন। এক-একটি অমৃতির ওজন প্রায় আধ কিলো হবে। আমার হাতে একটি অমৃতি দিয়ে বললেন: "তোমার মাকে গিয়ে দাও।" আমরা তখন গিরিশবাবুর বাড়ির সামনের বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। আমি অমৃতি হাতে চলেছি। এমন সময় গিরিশবাবুর বাড়ির কুকুর এসে লাফিয়ে আমার হাত থেকে অমৃতিখানা নিয়ে খেয়ে ফেলল। আমার মাকে দৌড়ে গিয়ে একথা জানালাম। মা (নাম চপলাসুন্দরী) তাড়াতাড়ি এসে রাস্তায় যে দু-একটা টুকরো পড়েছিল, তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। শ্রীশ্রীমা পাঠিয়েছেন কিনা! আমি গিরিশবাবুর বাড়ি গিয়ে একজনকে বললাম যে, তাদের কুকুর আমার অমৃতিটি খেয়ে নিয়েছে। শুনে তিনি বললেন: "কুকুর খেয়েছে, কি আর করব?" তখন অবশ্য জানতাম না যে, ওটা গিরিশবাবুর বাড়ি। পরে শুনেছিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বাবার দীক্ষা আগেই হয়েছিল। একদিন আমার মা স্বপ্নে দেখেন যে, শ্রীমা তাঁকে দীক্ষা দিচ্ছেন। বাবাকে মা কথাটা জানালেন। বাবা তখন শ্রীশ্রীমাকে মায়ের স্বপ্নের কথা বললেন। শ্রীশ্রীমা হেসে বললেন: "বৌমাকে বলো একখানা নতুন লালপেড়ে শাড়ি পরে যেন আমার কাছে আসে, আর পাঁচটা হরীতুকী যেন আনে।" শাড়িটাও বোধহয় শ্রীশ্রীমা-ই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাবার হাত দিয়ে। আমার মা পরদিন ঐভাবে উদ্বোধনে গেলেন। দীক্ষা নেবার আগে মা জানালেন যে, তিনি কুলগুরুর

কাছে আগে দীক্ষা নিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা বললেনঃ "আগের মন্ত্র প্রথমে জপ করে পরে আমারটা করো।"

আমার মা খুব ইলিশ মাছ, পোনা মাছের স্বপ্ন দেখতেন। বাবা ঐকথা শুনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে বললেনঃ "মা, আপনার বৌমা খুব মাছের স্বপ্ন দেখে।" শ্রীমা শুনে হেসে বললেনঃ "ঐ স্বপ্ন দেখা খুব ভাল—মাছের খোসার মতো টাকা আসবে।"

বাবা শ্রীশ্রীমাকে বলতেনঃ "আমার ছেলে-মেয়েদের আশীর্বাদ করুন যেন তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব না হয়।" শ্রীশ্রীমা বলতেনঃ "তোমার ছেলেমেয়েদের সবসময় আশীর্বাদ করি। আমি আশীর্বাদ করছি, কোনদিনও ওদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।"

শ্রীশ্রীমা একবার বাবাকে তাঁর একান্ত অনুরোধে নিজের স্বরূপ দেখিয়েছিলেন। জগদ্ধাত্রী মূর্তি। তারপর তিনি বলেছিলেনঃ "তোমাকে যে এই রূপ দেখালাম, তা আমার শরীর থাকতে কাউকে বলো না।" বাবা আমার মাকে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর যাবার পর ঐকথা বলেছিলেন। জগদ্ধাত্রী মূর্তির দু-পাশে জয়া ও বিজয়ার মূর্তি থাকে। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেনঃ "গোলাপ আর যোগীন আমার জয়া-বিজয়া।" আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পরে ঐ ঘটনার কথা শুনেছি।

আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের যে-ছবি পুজো করা হয় তা শ্রীমা নিজে পুজো করেছিলেন। উদ্বোধনে দুর্গাপুজোয় আমরা চারদিনই প্রসাদ পেতাম। মহাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীমা 'কুমারীপুজো' করতেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। কি ভালই যে লাগত! শ্রীশ্রীমাকেও সবাই অষ্টমীর দিন পায়ে ফুল দিয়ে পুজো করত। আমার মা একবার অষ্টমীর দিন গঙ্গাজল দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পা ধুইয়ে দিচ্ছিলেন। অমনি তিনি বললেনঃ "বৌমা কি করছ? গঙ্গাজল দিয়ে পা ধুয়ে দিচ্ছ?" আমার মা খুব লজ্জা পেলেন এবং বললেন যে, তিনি বুঝতে পারেননি। তারপর শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে ফুল দিয়ে মা পুজো করলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের হাতে দুগাছি সোনার বালা থাকত। খুব সরু লাল নরুনপাড় ধুতি পরতেন। তাঁর দুই পায়ের বুড়ো আঙুলে একটি করে লোহার আংটি ছিল। মাকে আমি অনেক সময়েই দেখতাম পা ছড়িয়ে বসে আছেন। শুনেছি বাতের জন্যই শেষ বয়সে তিনি ঐভাবে বসতেন।

আমরা যে-বাড়িতে ভাড়া থাকতাম তার বাড়িওয়ালা আমাদের খেলা করতে দিত না। কাজের লোককে বলে দিত আমাদের খেলার জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিতে। প্রায়ই চলত এমন ব্যবহার। বাবা একদিন শ্রীশ্রীমাকে একথা জানালেন। তিনি বাবাকে বললেনঃ "তুমি বৌমা ও ছেলেমেয়েদের এখন দেশে পাঠিয়ে দাও।" আমরাও তখন দেশে চলে গেলাম। শ্রীশ্রীমা পরে শরৎ মহারাজকে বলেনঃ "ওদের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই করে দাও, শরৎ।" শরৎ মহারাজ বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে সাড়ে সাত কাঠা জমি আন্দুল-মৌড়ীর জমিদারদের কাছ থেকে যোগাড় করে দিলেন বাবাকে। সাড়ে তিন কাঠার ওপর বাড়ি হলো। ছাউনির টিনও মায়ের আদেশে শরৎ মহারাজ যোগাড় করে দিলেন। চার কাঠা জমিতে বাগান করা হলো। অনেক রকম গাছ লাগানো হলো বাগানে। তার মধ্যে সরষে গাছও ছিল। শরৎ মহারাজ একদিন বাড়ি দেখতে এসে বললেনঃ "সরষে গাছ লাগিয়েছ কেন? বাড়ির জমিতে সরষে গাছ লাগাতে নেই।" বাবা তখনই সেগুলি সব তুলে ফেলে দিলেন।

আমার ঠাকুরদাদার গলায় ঘা হয়েছিল। বাবা শ্রীশ্রীমাকে সেকথা জানালেন। মা সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে বললেনঃ "তোমার বাবাকে কলকাতায় নিয়ে এস। এখানে কাঞ্জিলাল (জ্ঞানেন্দ্রনাথ), দুর্গাপদ (ঘোষ), শ্যামাপদ (মুখোপাধ্যায়)-র মতো বড় বড় ডাক্তার আছে। এখানে তাঁর চিকিৎসা করাও।" ঠাকুরদাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। দুর্গাপদ ডাক্তার দেখে বললেনঃ "ক্যান্সার হয়েছে।" শ্রীশ্রীমা কত ফল পাঠাতেন তাঁর জন্য। কিন্তু তিনি কিছুদিন পরই মারা গেলেন। ঠাকুরদাদা যখন মারা গেলেন শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখে খবর দিলেন বাবা। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরদাদার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বাবাকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। বেশ কয়েকখানা চিঠিই শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন সময়ে বাবাকে দিয়েছিলেন। আমার ছোট ভাই কার্তিক শ্রীশ্রীমায়ের চিঠিগুলি আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে বাঁধিয়ে রেখেছে।

শরৎ মহারাজ একদিন আমার মাকে বললেনঃ "আমরা তো কালিয়া কোরমা কখনো কখনো খাই,

এবার আপনার দেশের রান্না খাব।" মা ইলিশ মাছের ভাপা ও ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে মুসুর ডাল রান্না করে উদ্বোধনে পাঠালেন। তারপর মাঝে মাঝেই মা এরকম রান্না করে মায়ের বাড়ীতে পাঠাতেন। একদিন হঠাৎ গরম ডালের হাঁড়িতে বাটি পড়ে মার সারাশরীর পুড়ে গেল। মা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। বাবা তাড়াতাড়ি উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে একথা জানালেন। শ্রীশ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে এক বাটি সরষের তেল ঠাকুরের নাম জপ করে পাঠিয়ে দিলেন এবং ঐ তেল পোড়া জায়গায় লাগাতে বললেন। ঐ তেল লাগাবার পরই মায়ের যন্ত্রণা কমে গেল। শ্রীশ্রীমা একবার কিছু চাল বাবাকে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: "এই চাল বাড়িতে চালের জালায় রেখে দিও, কোনদিন তোমার চালের অভাব হবে না।"

বাবাকে মা তাঁর মাথার চুল, নখ এবং কাপড় দিয়েছিলেন। আমার মা ঐগুলিকে নিত্য পুজো করতেন। আমিও মায়ের কাছ থেকে ঐসব বস্তুর কিছু নিজের কাছে নিয়ে এসে এখনো পুজো করি।

এক ভক্ত রাধুদিকে প্রায় ১৫।১৬ রকমের আচার খেতে দিয়েছিলেন। মা সেই আচারের অর্ধেক আমার বাবাকে দিয়ে বললেন: "বৌমাকে দিও, খাবে। এত আচার কি হবে?"

হঠাৎ বাবা একদিন বললেন, মায়ের শরীর খুব খারাপ। তিনি সেদিন উদ্বোধনেই সারা রাত থাকলেন, সকালে এসে খবর দিলেন: "মা দেহ রেখেছেন।" আমরা তাড়াতাড়ি উদ্বোধনে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরে শুয়ে আছেন। দলে দলে ভক্তরা সব আসছেন, সাধুরা আসছেন। প্রণাম জানাচ্ছেন। আমরাও তাঁকে প্রণাম করে চলে এলাম। তখন আমার বয়স ১৪ বছর ২ মাস, নিবেদিতা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। শ্রীশ্রীমা দেহ রাখলেন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। আমার বিয়ে হলো ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের বৈশাখ মাসে।

আমি তখন ছোট। শ্রীশ্রীমা একদিন বাবাকে বলেছিলেন: "চন্দু, বড়খুকির (আমার) বিয়ে দিও না, নিবেদিতা স্কুলে লেখাপড়া শেখাও।" বাবা বলেছিলেন: "আমার দাদা, দিদি সব আছেন, দেখি তাঁরা কি বলেন।" যাহোক বাবা আমার বিয়ে দিলেন। তখন আমার বয়স প্রায় পনের বছর। নিবেদিতা স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে স্বামীকে হারাই। পরে বাবা দুঃখ করতেন—"মার কথা শুনলাম না। এখন তো দেখছি, ওকে বিয়ে না দিলেই ঠিক হতো।"*

বাবা মারা যান ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর দুর্গাপঞ্চমীর দিন। সেদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ বাবা বাড়ির সবাইকে বললেন: "তোমরা এখন এখান থেকে সরে যাও। মা এসেছেন আমাকে নিতে—লালপাড় শাড়ি পরে।" কিছুক্ষণ পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন বেলা তিনটে।

শ্রীশ্রীমা আমার বাবাকে রুদ্রাক্ষের জপমালা শোধন করে জপ করার জন্য দিয়েছিলেন। বাবা ঐ মালা জপ করতেন। বাবা মারা যাবার পর আমার মা একদিন সত্যেন মহারাজকে (স্বামী আত্মবোধানন্দকে) জিজ্ঞাসা করলেন, জপের মালা নিয়ে তিনি কি করবেন? মহারাজ গঙ্গায় দিতে বললেন। মা অবশ্য গঙ্গায় দেননি। শ্রীশ্রীমায়ের নিজের হাতে শোধন করা মালা কি করে গঙ্গায় দেন! মা পরে ঐকথা আমাকে বললে আমি বলেছিলাম: "ভাগ্যিস ঐ মালা তুমি ফেলে দাওনি—লাখ টাকা দিলেও এ জিনিস পাওয়া যায় না—মায়ের নিজের হাতের জপকরা মালা।" এখন ঐ মালা আমার ছোট ভাই কার্তিকের কাছে রয়েছে।

শ্রীশ্রীমা আমাদের খুব আশীর্বাদ করেছেন। এখনো তাঁর কৃপায় এই ৮৫ বছর বয়সে সুস্থ শরীরে চলাফেরা করছি।

* এই প্রসঙ্গে ইন্দুবালা দেবীর কনিষ্ঠ সহোদর কার্তিকচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন: "দিদির যখন চব্বিশ বছর বয়স তখন তাঁর জীবনে একটি চরম বিপর্যয় ঘটে। জামাইবাবু (নাম যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ) একদিন খিদিরপুরে তাঁদের বাসাবাড়ির কাছে বড়গঙ্গায় (পাশেই ছিল আদিগঙ্গা, তাই হুগলী নদীকে ওখানকার লোকেরা 'বড়গঙ্গা' বলত।) স্নান করতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেননি। তিনি স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে যান অথবা নিরুদ্দিষ্ট হন তা জানা যায়নি। স্নান করে ফিরে না আসায় সবাই ভাবেন তিনি নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবে গিয়েছেন। তাই গঙ্গায় ডুবুরি নামানো হয়, কিন্তু তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি। ঐসময় গঙ্গার ধারে একজন সাধুকে দেখা যায়। তিনি জামাইবাবুর বাড়ির লোকজনদের বলেন: 'ওকে খুঁজে লাভ নেই, ওকে আর তোমরা কোনদিন পাবে না।' তারপর সাধুটি সেখান থেকে চলে যান, তাঁকে পরে আর কোনদিন দেখা যায়নি। এই ঘটনার সময় জামাইবাবুর বয়স ছিল তিরিশ বছর। সেসময় দিদির একমাত্র কন্যা রত্নের বয়স চার বছর এবং একমাত্র পুত্র হারির বয়স মাত্র নয় মাস।"—যুগ্ম সম্পাদক

প্রবন্ধ

নির্বাসনা

ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁর গুরুভ্রাতাদের বললেন: "ঠাকুরের এক-একটি কথাকে অবলম্বন করে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যেতে পারে।"[১] তারপর তিনদিন ধরে দেশ-বিদেশের দর্শন থেকে নানান দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। চিন্তা করলে দেখা যায়, শ্রীশ্রীমায়ের কথার গুরুত্বও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীও বোধসৌকর্যে, ভাব-গাম্ভীর্যে গূঢ় অর্থাবগাহী। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর একটি বাণী সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য এখানে নির্বাচিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী একজন সাধুভক্তকে বলেছিলেন: "নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি হয়।" শ্রীমা সারদাদেবীর শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাণী যেন সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে তার নির্যাসরূপে নির্গত হয়েছে।

বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি-পুরাণাদি সকল মোক্ষশাস্ত্র মুমুক্ষু সাধকের বাসনাত্যাগের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়-তার কথা সমস্বরে ঘোষণা করেন। বাসনা যেকোন প্রকারের হোক না কেন, তা মনের দৈন্য বা কার্পণ্য প্রকাশ করে। অভাব আছে বলেই তা পূরণের প্রেরণা অন্তরে জাগে। কলস শূন্যগর্ভ হলেই তার আওয়াজ হয়, কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেলে আর তাতে কোন শব্দ হয় না। পূর্ণতার প্রাপ্তিতে সে তখন ভরপুর। এই পূর্ণতা বা স্ব-স্বরূপতা প্রাপ্তিই ভারতীয় দর্শনে সর্বোচ্চ জীবনাদর্শরূপে স্বীকৃত হয়েছে। নদী তার সুদীর্ঘ প্রবাহপথে আবর্জনা, বৃক্ষ-প্রস্তর, গলিত শবাদি স্রোতের সঙ্গে নিয়ে চলে, শেষে ঐগুলিকে পরিত্যাগ করে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়। মানুষও বহু-জন্মার্জিত শুভাশুভ সংস্কার-রাশি নিয়ে চলতে থাকে। প্রতি জন্মে যেমন নতুন সংস্কারসমূহ সংযোজিত হয়, আবার কিছু কিছু পরিত্যক্তও হয়। শুভাশুভ সংস্কার গঠন ও বর্জনের মাধ্যমে সাধনজীবনের পথচলা। কিন্তু কোন্ সংস্কারগুলির পরিপোষণ আমরা করব এবং কোন্-গুলিই বা সযত্নে পরিহার করব এবং কেনই বা করব? এর উত্তরে শ্রীমায়ের পূর্বোল্লিখিত শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীটি স্মরণীয়: নির্বাসনা হলে এখনই হয়। যদি প্রশ্ন করি, কি হয়? তবে সে-উত্তরটি সহজেই নির্গলিত হয় তা হলো, তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয় অথবা ভগবদ্দর্শন হয়। বাক্যের প্রথম অংশটির ওপর পরেরটি নির্ভর করছে। কিংবা বিপরীতক্রমে বলা যায় ভগবদ্দর্শন হলে সকল কামনার পরিতৃপ্তি হয়ে যায়, যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন: 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'[২]—যাকে লাভ করলে আর কোন লাভকেই অধিক অর্থাৎ অধিকতর কাঙ্ক্ষিত বলে মনে হয় না।

সোজা কথা হলো এই যে, ঈশ্বর-দর্শন করতে হলে বাসনা জলাঞ্জলি দিতে হবে, ভোগসুখে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হতে হবে। সংসারের যাবতীয় ভোগসুখের মধ্যে থেকে ঈশ্বরলাভ করার কোন সহজ সুগম পন্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ—ভগবৎ-সাধনার সকল স্তরের মূল ভিত্তিই হলো বাসনাত্যাগ। বাসনাত্যাগ না করে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা নোঙর করে নৌকা চালনা করার মতো নিবুদ্ধিতা-মাত্র। অনেক সময়ই দেখা যায়, সাধক সাধনার পরবর্তী স্তরে উন্নীত হতে অপারঙ্গম হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়েন। মনকে অধিক থেকে অধিকতর অন্তর্মুখী করতে না পারলে, 'আবৃতচক্ষু' না করতে পারলে রূপরসাদি গ্রাহ্য বহির্জগতের সীমানা অতিক্রম করে অন্তর্জগতে প্রবেশলাভ করা যায় না। "লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা" আমাদের মনকে সর্বদা মত্ত করে রেখেছে। পাগলা

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ১৩৫৮, গুরুভাব : পূর্বার্ধ, পৃঃ ১-২

২ গীতা, ৬।২২

কুকুরের মতো বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মন হন্যে হয়ে ঘুরে মরছে। বাসনাক্ষয় না হলে মনের এই চাঞ্চল্য দূর হয় না, লক্ষ্য স্থির হয় না। অশান্ত মনে কোন চিন্তাই আসে না, ঈশ্বরচিন্তা তো দূরের কথা। তাই দেখা যায়, সকল মোক্ষশাস্ত্র ত্যাগের অতুল মহিমা কীর্তন করছেন। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" বলেছেন উপনিষদ্।[৩] ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"[৪]—বাসনা ত্যাগের দ্বারা নির্বাসনা ভোগ কর, কারণ, সম্পূর্ণ ত্যাগ বা নিরাসক্ত না হলে সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিলাভ করা যায় না। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মানুভূতি জীবনে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই অনুভূতিতেই জীবনে সর্বাধিক আনন্দ লাভ হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে, "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা··· মর্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"[৫]—কামনাসকল যখন সম্যক্ প্রকারে নাশ হয় তখনই মর্ত্য মানুষ অমর্ত্য হয়, অমৃতত্বলাভে কৃতকৃত্য হয়। তখনই জন্ম-মরণের আবর্ত থেকে মানব চিরতরে মুক্তিলাভ করে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে"[৬]—এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

অধ্যাত্মশাস্ত্র শিরোমণি যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ বাসনার সংজ্ঞায় বলেছেন:

"দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্বাপরবিচারণম্
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্তিতা ॥
(উপশম প্রকরণ, ৯১।২৯)

—পূর্বাপর বিচার না করেই 'আমি, আমার'-রূপ দেহাদি পদার্থের যে গ্রহণ হয়, তাকে 'বাসনা' বলে। অর্থাৎ 'আমি, আমার' এরূপ দৃঢ় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হবার কারণ বা ফল কি—তা বিচারের পূর্বেই নিজেকে যে দেহ, কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি বলে মনে করা ও তদনুরূপ কার্য করা—এসমস্ত বাসনাবশতই হয়ে থাকে।"

যা পারমার্থিকভাবে অসত্য বা আত্যন্তিক মিথ্যা তাকেই আমরা দৈনন্দিন জীবনে ধ্রুবসত্য বলে গ্রহণ করি। বিনাশশীল দেহ, গৃহ, ধনৈশ্বর্যকে অবিনাশী ও সত্যরূপে নিশ্চিত জেনে ঐগুলিকে আমরা হৃদয়ে জন্মে জন্মে প্রতিষ্ঠা করেছি। ফলে দেহ ও আত্মার ঐক্যবোধ হয়েছে, আত্মজ্ঞান হয়েছে তিরোহিত। অনাদি অনন্ত সংসারের কারণ এটিই। দেহকে সত্যজ্ঞান করলে তা সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বিচার দ্বারা অসত্যজ্ঞান করলে ক্রমে তা অসত্য বলে দৃঢ় ধারণা হয় ও মোক্ষের জনক হয়। বিষয় ধ্বংসশীল, আজ আছে কাল নেই। সেই বিষয়বাসনায় বশীভূত হয়ে যা অবিনশ্বর, যা চিরন্তন তাকে ত্যাগ করা কি বিবেকীর সাজে? বাসনা নাশ না হলে জ্ঞান দৃঢ় হয় না। বিষয়ীর জ্ঞান যেন তপ্ত বালুকাতে জলবিন্দুর ন্যায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। বাসনার নিঃশেষে পরিত্যাগেই মুক্তি। বাসনাবশেই প্রাণিগণ পুনঃপুনঃ জন্মসূত্রে গ্রথিত হয়ে থাকে। তার আত্যন্তিক ক্ষয় হলে মনের অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে মন বাসনায় পূর্ণ থাকলে সে কর্তৃত্ব-সম্পন্ন হয়ে নানা দুঃখভোগ করে। স্নেহশীলতা, অর্থলোভ, কামকাঞ্চনে আসক্তি, 'আমি, আমার' ভাব থেকেই চিত্তের স্ফীতি ঘটে। বাসনাক্ষয় দ্বারা চিত্ত অচিত্ততা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্ব-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

বাসনার এমনিই দৌরাত্ম যে, মানুষকে অবশভাবে সে নাচিয়ে বেড়ায়। বাসনা-তাড়িত মন যত দুঃখের আকর। শঙ্করাচার্য বলেছেন, ইন্দ্রিয়ের রূপরসাদি বিষয় তীব্র সর্পবিষ অপেক্ষাও তীব্রতর। বিষ তার ভোক্তাকেই নিহত করে, কিন্তু বিষয়বিষ তার দর্শন-কারীকেও হত্যা করে অর্থাৎ নিত্যনতুন ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে মনকে নিরন্তর ক্ষোভিত করে তোলে।[৭] 'বৈরাগ্যশতক' গ্রন্থে ভর্তৃহরি ভোগ ও তার ব্যর্থতার একটি মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন:

"ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ,
তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতাঃ,
তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ।"[৮]

—আমরা ভোগ করিনি, বরং নিত্যনতুন ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হয়ে হয়রান হয়ে গেছি, বিভিন্ন

৩ নারায়ণ-উপনিষদ্, ১২।৩
৪ ঈশ-উপনিষদ্, ১
৫ কঠ-উপনিষদ্, ২।৩।১৪
৬ শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্, ৩।৮
৭ বিবেকচূড়ামণি, ৭৯
৮ বৈরাগ্যশতক, তৃষ্ণাদূষণ, ৭

তপস্যাদি অনুষ্ঠান করার নামে আমরাই তপ্ত হয়েছি। তপস্যার অতি কঠোর নিয়মানুষ্ঠানের বেড়াজালে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে তপস্যার নেশায় মেতে উঠেছি। ফলে তপশ্চর্যা হয়েছে মুখ্য, তার লক্ষ্য হয়েছে গৌণ। কিন্তু সত্যবস্তু নাগালের বাইরে বহুদূরে থেকে গেছে, এমনই বিড়ম্বনা। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে কাল অতিবাহিত করে তাকে জীবনের অঙ্গীভূত করে নেবার আগেই সর্বভক্ষক কালরূপী সর্প আমাদের গ্রাস করতে চলেছে। কিন্তু হায়! তৃষ্ণা বা বাসনা কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্ত হয়নি, শান্ত হয়নি মনের দুর্দমনীয় নিত্যনতুন ভোগ-লালসা, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। তৃষ্ণা ও জরায় আমরাই জীর্ণ ও শিথিলাঙ্গ হয়েছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সর্বত্র ত্যাগের গুণকীর্তন করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় গীতার মূল সুরটি ফুটিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "গীতা দশবার উচ্চারণ করলে যা হয়, তাই গীতার সারমর্ম।" অর্থাৎ 'তাগী'। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। ত্যাগই গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন: রজোগুণ সমুদ্ভূত কাম প্রতিহত হলে ক্রোধরূপে তা আত্মপ্রকাশ করে এবং ক্রমে আত্মনাশে পর্যবসিত হয়। অগ্নি যেমন ধূমাবৃত থাকে, স্বচ্ছদর্পণ যেমন মল দ্বারা আবৃত থাকে, গর্ভ যেমন থাকে জরায়ু দ্বারা আবৃত, তেমনি কামরূপ অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামের অধিষ্ঠান। এই কাম মুমুক্ষু সাধকের প্রবলতম শত্রু। সর্বনাশা কামনার বশে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মানুষের সংসারে প্রবল আসক্তি ও আত্মবিস্মৃতি ঘটে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল যত্ন-সহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা বাসনাসকল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে যিনি ভগবদ্‌কৃপায় নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নিরাসক্ত হতে পারেন, তিনি সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকেন, তিনিই শাশ্বতী শান্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন। যিনি বিনিবৃত্ত-কামা অর্থাৎ কামসঙ্কল্প বর্জিত, সর্বারম্ভ পরিত্যাগী, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মারাম, আত্মক্রীড়।

ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-রূপী জড়ভরত রাজা রহূগণকে 'সংসার অরণ্য' সম্বন্ধে যে-চিত্রটি প্রদান করেছেন তা থেকে পরিস্ফুট হয় যে, বাসনাই সংসারের বীজ। জড়ভরত বলছেন: প্রতি বছর ক্ষেত্রকর্ষণ করা হলেও তৃণগুল্মাদির বীজ দগ্ধ না হওয়ায় সেগুলি ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ অঙ্কুরিত হয়। এই সংসার তেমনি কর্মবীজের ক্ষেত্র, কামনার আধার। কর্পূরপাত্রে কর্পূর না থাকলেও যেমন তার গন্ধ যায় না, কর্মক্ষয় হলেও কামনার শেষ হয় না। সংসারে ধনৈশ্বর্য প্রভৃতি আত্মভিন্ন বহির্বস্তু জীবের প্রাণ; অনিত্য গৃহধনাদি বস্তুতে জীব নিত্যদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়। বিষয়ের মোহজনিত তৃষ্ণা এমনই বিভ্রান্তিকর যে তার অনিষ্টকারিতা বুঝেও মন তার পিছনে দৌড়ায়। কখনো-বা অসৎসঙ্গে পাষণ্ডপক্ষের অনুবর্তন করে জীবের দুঃখভোগ হয়। দাবাগ্নি-সদৃশ প্রিয়বস্তুবিহীন ও পরিণামে দুঃখদায়ক গৃহে অবস্থানপূর্বক ঐ জীব শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। কখনো গুরুতর দুষ্কর্মের ফলে জীব ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্রব্যাদি অপহরণকারী ঐ জীব যদি কারাগৃহ থেকে মুক্ত হয় তাহলেও অপরজন বলপূর্বক ঐ ধন অপহরণ করে। ক্রমাগত একজন থেকে অপরজনের দ্বারা ঐ ধন অপহৃত হতে থাকে। ভোগ আর হয় না, এমনি ভোগের স্বভাব। আবার ঐ জীব কখনো-বা পারমেশ্বরী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে স্ত্রীসংসর্গে ভোগব্যসনে ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা বিস্মৃত হয়ে পড়ে। ঐ রমণীর জন্য ক্রীড়াগৃহ নির্মাণ করে। স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-পরিবার জীবের সমগ্র সত্তা অপহরণ করে। অহিতাত্মা জীব অপার অন্ধ-নরকে নিপাতিত হয়। সর্বনিয়ন্তা ভগবান বিষ্ণুর কালচক্র অপ্রতিহত বেগে সদা-প্রবর্তিত—যা সকল প্রাণীর প্রাণ হরণ করে। ঐ কালচক্রের ভয়ে ভীত হয়ে জীব পাষণ্ডগণের দেবতাদের আশ্রয় করে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করে না। সংসারে অবাধে যথেচ্ছ ভোগ করতে করতে সে নানা ব্যাধির কবলে পড়ে। বহু ক্লেশ ও উপসর্গে পীড়িত হয়ে যে-ব্যক্তি বিপদাপন্ন বা মৃত হয়, অপর ব্যক্তিরা তাকে সেস্থানেই পরিত্যাগ করে নবজাত পুত্রাদিকে গ্রহণ করে হর্ষ-শোকাদিতে মোহিত হয়। এইভাবে বাসনাতাড়িত হয়ে জীব সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু যিনি সকল কারণের কারণ, যাঁর থেকে সংসার ও জীব-জগতের

উদ্ভব, তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারে না বা চায় না। ফলে সংসারের গমনাগমনও তার রুদ্ধ হয় না। জ্ঞানিগণ বলেন, মক্ষিকা যেমন গরুড়ের মার্গ অনুসরণ করতে পারে না, সেরূপ কোন রাজা মনে মনেও রাজর্ষি ভরতের অনুসৃত যোগমার্গ অনুষ্ঠান করতে সমর্থ হয় না। মহাত্মা ভরত ভগবানের প্রতি প্রেমভাব স্থাপন করে স্ত্রী পুত্র সুহৃৎ ও রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন।

এইভাবে সকল শাস্ত্রেই বাসনাজয়ের কথা দেখা যায়। সাধকজীবনের ইতিহাস হলো প্রথম থেকে বাসনাজয়ের সংগ্রাম। প্রথম স্তরে স্থূল ভোগবাসনা ত্যাগ। আত্মীয়-পরিজন, ধনৈশ্বর্য, স্বদেহের জন্য ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে প্রবর্তক সাধক পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু ক্রমে অগ্রসর হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঐ স্থূল বাসনা ত্যাগ—সে কেবল 'এহো বাহ্য', লক্ষ্য তখনো বহুদূরে। চিত্তে রাগ-দ্বেষ, মদ-মাৎসর্য-অভিমান তখনো অলক্ষ্যে দৃঢ়রূপে বাসা বেঁধে আছে। নামযশের দুর্জয় নেশা হয়তো মনকে পেয়ে বসেছে, শিকড় যার বহুদূরে প্রোথিত। সর্বস্ব পরিত্যাগ করেও নিষ্কাম কর্মের অন্তরালে কর্তৃত্বের মোহ হয়তো হাজির হলো। অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম এই সকল রিপুদের তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে তাদের নির্মূল করা কম কঠিন কাজ নয়। বিবেক অর্থাৎ সদসদ্বিচার—সাধনপথের যেটি ত্যাজ্য তাকে বর্জন এবং যেটি গ্রাহ্য তাকে গ্রহণ। এই বৈরাগ্য বা স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক বাসনাত্যাগই সাধক-জীবনের প্রকৃত সুহৃদ্—যা তাঁকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিতে পারে।

আধ্যাত্মিক রাজ্যে সাধকের অলৌকিক শক্তিসম্পদ বা বিভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে। এগুলি ঈশ্বর-প্রদত্ত সম্পদও বটে, আবার বিরাট প্রলোভনও বটে। কারণ, ঐগুলি ব্যবহার করলে আধ্যাত্মিকতার অপমৃত্যু ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে উদ্ধবের কাছে সিদ্ধাইকে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগসূত্রে একই কথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-প্রসূত বিভূতিকে কঠোর উপমায় নিন্দা করেছেন। সাধকের পক্ষে এগুলি বিষবৎ ত্যাজ্য। মহামায়া যে বিচিত্র জগজ্জাল রচনা করেছেন, তাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব সংসারে নটনটী-রূপে অভিনয় করে চলেছে। তার মধ্যে যে জন্মার্জিত সৌভাগ্যবশে জগজ্জাল থেকে মুক্ত হতে অভিলাষী, মহামায়া তাকে হাজারো পরীক্ষার পর তবেই রেহাই দেন, মুক্ত করেন। সোনাকে যেমন আগুনে পোড়ালে খাদমুক্ত হয়ে ভাস্বর হয়, ধূপ যেমন অগ্নি সহযোগে সুরভিত হয়ে ওঠে, তেমনি মনের বাসনারাশি যতই নির্বাপিত হয়ে আসে, আত্মজ্যোতিঃ ততই স্ফুরিত হয়। জন্মান্তরে বাসনা-রূপ মলিনতা আত্মজ্যোতিঃকে আবৃত করে রাখে। বিচারের দ্বারা, ধ্যান-সাধন-ভজনের দ্বারা এই আবরণের নাশ হয়। আবরণ যত সরে যাবে বাসনাও তত ক্ষয় হবে। বাসনার নিঃশেষ ক্ষয় হলেই মুক্তি আসবে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ নির্বাসনা না হলে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণের কোন সম্ভাবনাই নেই। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারম্ভ থেকে সর্বশীর্ষ পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে বিচার, বৈরাগ্য, বাসনাত্যাগ অপরিহার্য। পাতঞ্জল যোগদর্শনের সাধনপাদে ৪২ নং সূত্রের ব্যাসভাষ্যটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সেখানে বলা হয়েছে—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্।"

—ইহলোকে যে কাম্যবস্তুর উপভোগজনিত সুখ, অথবা স্বর্গীয় যে মহৎ সুখ, তা তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁর সামান্য একটি কথায় অধ্যাত্মজীবনের সার-নির্যাসকে কত প্রাঞ্জলভাবে বলে দিয়েছিলেন ভেবে অবাক হতে হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ছিলেন জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্বাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ দিক্‌পাল ধর্মনায়কগণ পরিচালিত বিশ্বখ্যাত ধর্মসঙ্ঘের অবিসংবাদী নেত্রী-রূপে বন্দিতা হয়েও সারদাদেবী ছিলেন সম্পূর্ণ অহং-কর্তৃত্ববোধহীনা। অহং-কর্তৃত্ববোধই আমাদের সকল দুঃখের মূল। শ্রীশ্রীমা বলতেন: "সন্তোষের সমান ধন নেই।" অহং-কর্তৃত্ববোধ নাশের উপায় ঐ 'সন্তোষ'-এর অনুশীলন। শ্রীশ্রীমা-কথিত নির্বাসনাই হলো সন্তোষের উৎস।

পরিক্রমা

প্রাচীন তীর্থ পুষ্কর

শান্তা মুখোপাধ্যায়

রাজস্থানের আজমীর শহর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরে হিন্দুদের অতি পবিত্র ও প্রাচীন তীর্থ পুষ্কর। পুষ্করে যেতে হলে দিল্লি থেকে বাসে বা ট্রেনে রাজস্থানের জয়পুর শহরে আসতে হবে। জয়পুর থেকে বাসে আজমীরে আসা যায়। সময় নেয় প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার মতো। আজমীর থেকে পুষ্কর—এই পাহাড়ী মনোরম ১১ কিলোমিটার পথও বাসে আসতে হয়।

পুষ্কর কিন্তু কোন মন্দির নয়। পুষ্কর একটি সরোবর। নির্মল পবিত্র জল প্রায় ৪ কিলোমিটার পরিধি নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে, যা কখনো শুকোয় না। এর চারিদিকের নাগ পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য যেকোন দর্শনার্থীকে করে। সরোবরের চারিদিকে বাহান্নটি বাঁধানো ঘাট রয়েছে। পুষ্করের প্রধান আকর্ষণ সাবিত্রী এবং ব্রহ্মার প্রাচীন মন্দির। কথিত আছে যে, ব্রহ্মা কার্তিক মাসে পাঁচদিন ধরে যজ্ঞ করেছিলেন। প্রতিদিন দূর দূর থেকে হাজার হাজার ভক্ত পুষ্করের পবিত্র জলে স্নান করেন এবং সাবিত্রী ও ব্রহ্মার মন্দির দর্শন করে পুণ্য অর্জন করেন। 'ওঁ' মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পুষ্করের জলে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা ও স্তুতি করা হয়। পুষ্করের চারিদিকে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির, সাধুদের গুহা ও আশ্রম রয়েছে। কপিলমুনির আশ্রমের নিচে রয়েছে পঞ্চকুণ্ড। কথিত আছে, এখানে পঞ্চপাণ্ডব কয়েক বছর কঠিন তপস্যা করেছিলেন। এই পঞ্চকুণ্ডের পূর্ব-দিকে রয়েছে গোমুখ। গোমুখ থেকে বারো মাস জল বের হয়। কার্তিকী পূর্ণিমার সকালে অগণিত ভক্ত নরনারী পুষ্করের জলে পুণ্য অবগাহন করেন। এই উপলক্ষে ঘাটগুলিতে প্রচুর ভিড় হয়। স্নানের পর সকলেই সোজা চলে যান ব্রহ্মার মন্দিরে। সন্ধ্যার সময় আরাত্রিক ঘণ্টার ধ্বনি চারিদিকের পরিবেশকে এক অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ করে। ঐদিন সন্ধ্যায় সবুজ পাতার ঠোঙার ওপর প্রজ্বলিত প্রদীপ জলে ভাসিয়ে 'দীপদান' অনুষ্ঠান করা হয়।

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে কত মানুষ এসেছেন এই পুষ্করে। পঞ্চম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনও এসেছিলেন পুষ্কর তীর্থে। রাজপুত রাজারা বিভিন্ন সময়ে এই পুণ্য সরোবরের চারিদিকে অনেক মন্দির তৈরি করেছিলেন। সেইসব মন্দিরের অধিকাংশই ঔরঙ্গজেবের আমলে ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু ৫২টি ঘাট আজও তার মৌন-মুখর অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্রহ্মা এবং সাবিত্রীর মন্দির ভিন্ন পুষ্করের প্রসিদ্ধ মন্দির হলো বৈকুণ্ঠনাথজীর মন্দির। কেউ কেউ বৈকুণ্ঠনাথজীর মন্দিরটিকে রঙ্গজীর মন্দিরও বলে থাকেন। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের ধাঁচে এই মন্দিরটি তৈরি।

পুষ্করের সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা বহুলপ্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। পদ্মপুরাণের মতে, ব্রহ্মা তাঁর বৈদিক যজ্ঞের জন্য একটা পবিত্র স্থানের সন্ধান করছিলেন, যেখানে তিনি বিনা বাধায় সুষ্ঠভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারবেন। যখন তিনি এই জায়গার (বর্তমানে পুষ্কর) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর হাতের পদ্মফুল হঠাৎ তিন জায়গায় পড়ে যায় এবং সেখান থেকে ফোয়ারার মতো জল বের হয়ে তিনটি সরোবর হয়। এই তিন সরোবরই যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ (বড়) পুষ্কর, মধ্যম (মধ্য) পুষ্কর ও কনিষ্ঠ (ছোট) পুষ্কর। ব্রহ্মা তাঁর বৈদিক যজ্ঞের জন্য প্রথম স্থানটিকে অর্থাৎ বড় পুষ্করকেই নির্বাচন করলেন। এই যজ্ঞে সমস্ত দেব-দেবীকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। ব্রহ্মা আদেশ দিলেন, এই যজ্ঞে কেউ যেন বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্ত না থাকে। প্রত্যেক শুভকার্যে অর্ধাঙ্গিনীর উপস্থিতি

আবশ্যক। তাই ব্রহ্মা পত্নী সাবিত্রীর কাছে বার্তা পাঠালেন। বার্তা শুনে সাবিত্রী খুব খুশি হলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই যজ্ঞে উপস্থিত হবেন বলে জানালেন। যজ্ঞে অনেকের উপস্থিতির মধ্যে একলা যাওয়া ঠিক হবে না মনে করে সাবিত্রী এক ঋষি-পত্নীকে ডাকবার জন্য পবনদেবকে পাঠালেন।

এদিকে যজ্ঞক্ষেত্রে সাবিত্রীর বিলম্ব দেখে ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে আদেশ দিলেন: "যজ্ঞের শুভলগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ সাবিত্রী এসে উপস্থিত হলেন না। এখন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কন্যার খোঁজ কর।" ইন্দ্র কন্যার অন্বেষণে বের হলেন। কন্যার অন্বেষণ করতে করতে এক জঙ্গলে এক গোপবালিকাকে দুধের কলস মাথায় নিয়ে যেতে দেখে তাকেই শ্রেষ্ঠ কন্যা মনে করে যজ্ঞের জন্য আনলেন। এই গোপ-কন্যাকে ব্রহ্মার বামপাশে গায়ত্রী নামে বসিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ হলো। যজ্ঞ চলাকালীন হঠাৎ এক নগ্ন ও ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক এক হাতে মড়ার খুলি ও অন্য হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হলো। যজ্ঞভূমিতে এসে ভিক্ষুক বলল: "ব্রহ্মার যজ্ঞের কথা শুনে আমি বহুদূর থেকে এখানে এসেছি।" উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা ঐ ভিক্ষুকের ওপর রাগ করলে ঐ ভিক্ষুক মাথার খুলি যজ্ঞভূমিতে ফেলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওখান থেকে যতবার মাথার খুলিটি বাইরে ফেলে দেওয়া হতে লাগল, ততবার ঐ জায়গায় অন্য খুলি এসে পড়তে লাগল। ব্রহ্মা ধ্যানে বসে বুঝতে পারলেন, এ মহাদেবের লীলা। তাই তিনি করজোড়ে মহাদেবের স্তুতি করলেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে খুলিরূপী ঐ মায়া থেকে যজ্ঞভূমিকে মুক্ত করলেন। ঐ জায়গায় (পুষ্করে) অটপটেশ্বর মহাদেবের মূর্তি রয়েছে (উল্টোপাল্টা কাজকে হিন্দীতে 'অট্‌পট্‌ কাম' বলা হয়ে থাকে)।

ইতিমধ্যে সাবিত্রী ঋষি-পত্নী সহ উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মার পাশে অন্য নারীকে বসে থাকতে দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হলেন। অপমানিত সাবিত্রী ব্রহ্মাকে শাপ দিলেন: "হে ব্রহ্মা, তুমি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলে না? আমার অভিশাপে পুষ্কর ছাড়া আর কোথাও তোমার পূজা হবে না।" অন্যান্য দেব-দেবীদেরও সাবিত্রী অভিশাপ দিলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞভূমি ত্যাগ করে এক পাহাড়ের ওপর বসে কঠিন তপস্যা শুরু করলেন। সেই পাহাড়টি 'সাবিত্রী পাহাড়' নামে পরিচিত। পুষ্কর সরোবরের থেকে কিছু দূরে এই পাহাড়ের ওপর সাবিত্রীদেবীর মন্দির রয়েছে।

যজ্ঞভূমি থেকে সাবিত্রীর প্রস্থানের পর ব্রহ্মা চিন্তিত দেবতাদের ভয় দূর করে পুনরায় যজ্ঞকার্য আরম্ভ করতে অনুরোধ করলেন। গায়ত্রী ব্রহ্মাকে বললেন: "আপনার দ্বারা নির্মিত এই পুষ্করতীর্থে স্নান-দান না করা পর্যন্ত কারও চার-ধামের তীর্থ পরিক্রমা সফল হবে না এবং আপনার এই তীর্থ-স্থানকে 'তীর্থগুরু' বলা হবে।" এরপর গায়ত্রী উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য দেব-দেবীদের শাপমুক্ত করলেন। অতঃপর বড় পুষ্করে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ হলো। যজ্ঞশেষে ব্রহ্মা উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কার ও বরদানে সন্তুষ্ট করলেন।

কূর্মপুরাণে পুষ্করের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

"তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
পুষ্করং সর্বপাপঘ্নং মৃতানাং ব্রহ্মলোকদম্‌॥
মনসা সংস্মরেদ্‌ যস্তু পুষ্করং বৈ দ্বিজোত্তমঃ।
পূয়তে পাতকৈঃ সর্বৈঃ শক্রেণ সহ মোদতে॥"

—পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার [প্রিয়] সর্বপাপনাশক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত পুষ্কর নামে একটি তীর্থ আছে; সেখানে মৃত্যু হলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। যে-দ্বিজোত্তম মনে মনেও পুষ্করতীর্থ স্মরণ করেন, তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন এবং দেহান্তে ইন্দ্রলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন।

কালের যাত্রায় কত শতাব্দী ধরে কত নরনারী এই পবিত্র সরোবরে এসেছে, রাজপুতানার বুকের ওপর দিয়েও গিয়েছে কত বিপর্যয়, কিন্তু পুষ্কর তার মৌলিক ও পুরাতন আধ্যাত্মিক গৌরবকে আজও রেখেছে অক্ষুন্ন। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু তাই আজও পুষ্করের দুর্বার আকর্ষণে ছুটে যায়।

নিবন্ধ

আশ্রয়, আশ্বাস, আদর্শ

আশাপূর্ণা দেবী

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী।

এযুগের আশ্রয়।

এযুগের আশ্বাস।

এযুগের আদর্শ। আর সর্বযুগের নারী-জীবনের আদর্শ।

মায়ের পুণ্য জন্মতিথিটি এলেই যেন নতুন করে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হতে হয়। কত করুণায় করুণাময়ী দেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন আমাদের এত কাছাকাছি!

এমন বিরাট বিশাল আবির্ভাব তো ঘটে সমগ্র বিশ্বের জন্যই, তবু সেই পরম আবির্ভাবটিকে 'আমাদের' বলতে পারার আনন্দ-গৌরবটি কি কম কথা? ভাবতে বসলেই তো আনন্দ, 'মা সারদা আমাদের ঘরের মেয়ে!' কত গৌরবের অধিকারী আমরা—'আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের আপনজন!'

আনন্দ এবং গৌরব অবশ্যই হয়, তবে সেই পরম আবির্ভাবের তাৎপর্যটি উপলব্ধি করবার চেতনা ক-জনের আছে? সে-চেতনা থাকলে আমাদের আজকের মেয়েদের জীবনের বহিরঙ্গে এমন দিগ্‌ভ্রান্ত মূর্তি দেখা যেত না। দিঙ্‌নির্ণয়ের যন্ত্রটি তো সামনেই দীপ্যমান, তার ব্যবহারবিধিটি জানা নেই। তাই এই দিগ্‌ভ্রান্ততা।

নারীজীবনের যথার্থ আদর্শ, আর আধুনিক জীবনযাত্রার ভোগবাদী লক্ষ্যহীন পথ, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আজকের মেয়েরা অনেকেই বেশ-বিভ্রান্ত। এযুগে, কালের নিয়মেই সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদেরও অনেককেই বাইরের কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে হয়, সেখানে 'অনাধুনিক' হওয়াটা লজ্জার বিষয়, কাজেই অতি আধুনিক হবার ঠাটবাটটি বজায় রাখার চেষ্টা চলে আপ্রাণ। আর 'পুরুষের সঙ্গে সর্ববিষয়ে সমান হওয়া চাই'—এই জেহাদে পুরুষোচিত জীবনযাত্রার সামিল হতে হয়। অথচ তার ভিতরের নারীসত্তাটি পুরুষের মতো কেবলমাত্র ঐ বহির্জীবনের কর্মকাণ্ডের সাফল্যেই পরিতৃপ্ত হতে পারে না, পূর্ণতার স্বাদ পায় না। আসলে যে তার মধ্যে রয়েছে একটি নিভৃত গৃহকোণ আর সুখময় সংসারের চিরন্তন পিপাসা। আর পিপাসা কোথাও কোনখানে একটু মানসিক আশ্রয়ের। সে-আশ্রয় সংসার-সীমানা ছাড়িয়ে আর কোথাও—অন্য কোন-খানে যেখানে সে একেবারে একান্তে নিজেকে সমর্পণ করে নির্ভর হতে পারবে।

আসলে মেয়েদের মধ্যে, বোধহয় বিশেষ করে ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে সহজাত একটি ধর্মবিশ্বাসের প্রবণতা থাকে, যেটি অধ্যাত্মজগতের সঙ্গে একটি সম্পর্ক-বন্ধনের প্রেরণা। দেবদেবীর জগৎ তার কাছে অলীক নয়। একদা আমাদের এখানে প্রচলিত পারিবারিক বিশ্বাসে মেয়েদের শৈশব থেকেই ব্রত, নিয়ম, পূজা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাদের ঈশ্বরবোধের একটি বীজ বপন করা হতো, তাদের একটি নিজস্ব অন্তর্জগতের কাঠামো তৈরি করে দেওয়া হতো। হোক সে ব্রত-পূজার মন্ত্রগুলি ছেলেমানুষী, হাস্যকর আর কামনা-প্রধান। কিন্তু পূজা তো। তাছাড়া কোন্ পূজার মন্ত্রেই বা চাওয়া নেই? 'যা দেবী সর্বভূতেষু' তো চাহিদার তালিকাবিশেষ।

তা মানুষ তো চাইবেই। চাওয়াই তো তার ধর্ম। তবে চাইতেই যদি হয়, তো দেবতার কাছে চাওয়াই ভাল। সেকালের সমাজে মেয়েদের জীবন তো ছিল অপ্রাপ্তির একটি বৃহৎ নজির। সেই বেদনার উপশম ঘটাতেই দেবতার কাছে প্রার্থনা। সেটি 'ঠিক কি বেঠিক' সে-বিচার থাক, তবে ব্যাপারটি এই যে, আগে এটি ছিল।

আজকের জীবনের পরিবেশ আর আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েদের মধ্যে সেই এক 'অন্য জগতের

স্বাদ'-এর কাঠামোটি গড়ে ওঠে না। তার সামনে একটি ধ্রুবলক্ষ্য নেই, একটি যথোচিত আদর্শ নেই, শুধু ধুলিধূসর পথে পথচলা। এইখানেই নারীমনের সেই যে একটি বিশেষ প্রবণতা, সেটি ব্যাহত হয়।

তাই আজকের মেয়েদের মনোজগতে অনেক জটিলতা, অনেক অস্থিরতা। যেন মাঝিবিহীন নৌকার অবস্থা।

অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় রীতিমত বিদুষী, কৃতী, কর্মজীবনে অবিশ্বাস্য রকমের সফল, হয়তো সংসারজীবনেও চাকচিক্যের বিস্তৃতিতে উজ্জ্বল মেয়ে, তবু তার মধ্যেও কেমন একটা হতাশা। যেন একটা কিছু প্রাপ্তির ঘরে ঘাটতি ঘটেছে তার, তাই ভিতরে গভীর শূন্যতা। যেন জীবনে যাকিছুই পেয়েছি, সেটা যথার্থ 'পাওয়া' নয়। অথচ নিজেই জানে না, কি তার পাবার ছিল, কিসের অভাবে তার এই শূন্যতাবোধ।

অনেকে অবশ্য দায়ী করে পুরুষশাসিত সমাজকে। যথার্থ 'নারীমুক্তি' এখনো সমাজে আসেনি। তাই এই অভাববোধ, শূন্যতাবোধ, অপ্রাপ্তিবোধ। কাজেই সন্তোষ আর শান্তি তাদের কাছ থেকে 'দূর অস্ত'।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে দেখলে বিগত যুগের কট্টর সমাজব্যবস্থার শিকার মেয়েদের সঙ্গে এযুগের মেয়েদের আকাশপাতাল তফাৎ। সকল বিষয়ে অধিকার-বিহীন সেকালের সেই মেয়েদের পরবর্তী প্রজন্মেরই তো সর্ব অধিকার করতলগত হয়েছে। তবু তারা বিদ্রূপ মন্তব্যে সোচ্চার হয়—'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'। আর শেষমেষ, কাঠগড়ায় দাঁড় করায় চির-কালের আসামী স্বামীটিকেই। 'ওই, ওর জন্যেই এখনো—'

আসলে মেয়েদের মধ্যে এখন নোঙরছেঁড়া নৌকার অস্থিরতা।

টালমাটাল অবস্থায় আকাশের কোণের ধ্রুবতারাটি তারা দেখতে পায় না। কিন্তু লক্ষ্যপথ স্থির রাখতে ধ্রুবতারার যে একান্ত আবশ্যক। অথচ সেই ধ্রুব-তারাটি আমাদের চোখের সামনে, আমাদের আপন ঘরে।

আধুনিক জীবনের পক্ষে এই পরম আদর্শটি কি বেমানান? আমাদের মা সারদাদেবী কি অনাধুনিক? তাঁর মতো এমন সর্বকুসংস্কারমুক্ত নির্ভেজাল আধুনিক আর কোথায়? একশো বছরেরও অনেক বেশি আগের পটভূমিকায় মা সারদার সংস্কারমুক্তির যে দৃপ্তপ্রকাশ দেখা গিয়েছে, তা কি অবিশ্বাস্য রকমের নয়? হিসাব করে দেখলে, আজকের এই অতিপ্রগতির যুগেও তেমন সংস্কারমুক্ত মন দুর্লভ।

যে-দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করতে চাইছি, তা অবশ্যই সকলের জানা, তবু 'মায়ের কথা' তো লক্ষবার উল্লেখেও পুরনো হবার নয়, ঔজ্জ্বল্য হারাবার নয়। তাই আরও একবার তার উল্লেখ। যে-যুগে শহর কলকাতায় গৃহস্থজনেরা ছুঁৎমার্গের প্রতাপে বিদেশিনী মেয়ে নিবেদিতার কাছে আপন মেয়েদের পড়তে দিতে নারাজ এবং যদি বা লেখাপড়া শেখাটা দরকার বিবেচনায় তারা রাজি হয়েছে তো তার খেসারৎ দিতে হয়েছে মেয়েগুলোকে অবেলায় 'স্নান-শুদ্ধ' হতে—সেই যুগে, বাংলার এক নিতান্ত গণ্ডগ্রামের মেয়ে সেই বিদেশিনীকে একান্ত আপন করে নিয়ে—তাকে 'খুকি' বলে ডেকে কোল দিলেন, নিজে হাতে করে খাওয়ালেন। ছুঁৎমার্গের প্রশ্নই নেই সেখানে। আরও একটি দৃষ্টান্ত। সেও সকলের জানা। তখনকার কালে 'জাত যাবার' প্রশ্ন ছিল ভয়ানক কাণ্ড। মা সারদা অনায়াসে তেমন একখানি কাণ্ড করেও নির্দ্বিধায় বলে উঠলেন: "শরৎ আমার যেমন ছেলে, আমজাদও আমার তেমনই ছেলে।"

'ছেলে'ই যখন, তখন তার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারেই বা দোষ কোথায়? করে ফেলেছেন নির্দ্বিধায়।

মায়ের এই ঘোষণার মধ্যে চেষ্টাকৃত কোন অভি-ব্যক্তি ছিল কি? এ তো স্ফটিকতুল্য নির্মল হৃদয়ের একটুখানি প্রকাশমাত্র।

আবার ঐ আচার-আচরণের, সংস্কারবিধির ঊর্ধ্বে আরও যে একটি পরম অভাবিত 'সংস্কারমুক্তি'র প্রকাশ দেখা যায় মায়ের জীবনে, সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসেও কি তার তুল্য কোন দৃষ্টান্ত আছে?

সেই নিতান্ত গণ্ডগ্রামের একটি অবগুণ্ঠনবতী তরুণী মেয়ে তাঁর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকেই কী অনায়াস মহিমায় অবতারপুরুষ দিব্যসাধক স্বামীর হাত থেকে নিলেন পূজার অর্ঘ্য, সেই সাধকের জপের মালাটিকে গ্রহণ করলেন চরণে। ভাবা যায়?

কেউ কখনো পেরেছে এমন অবিচলতায় এমন পূজা গ্রহণ করতে? তাঁর পূর্বে অথবা পরে? নজির তো দেখা যায় না। আবার 'ফলহারিণী কালিকাপূজা'র সেই অসাধারণ রাত্রিটির অবসান-মাত্রই দেবী সারদা আবার আগের মতোই অবগুণ্ঠনবতী সংসারকর্ম-নিপুণা গৃহিণী।

মা সারদার এই মূর্তিটিকে চোখের সামনে রেখে দেখলে কি একবার মনে হয় না যে, অবিচলতা, স্থিরতা আর সকল অবস্থাতে সংহত থাকতে পারার ক্ষমতাই হচ্ছে 'শক্তি'র প্রকাশ? নারীমুক্তির আন্দোলনে উত্তাল না হয়ে নারীশক্তির বিকাশ ঘটে কিসে, তা আজ গভীরভাবে ভাবা প্রয়োজন।

এ আদর্শ চিরকালীন নারীজীবনের। এযুগেও সমান কার্যকরী।

মা সারদাদেবীর জীবন-কথাটি ভাবতে বসলে আমার একটি তুলনা মনে আসে, হয়তো ছেলে-মানুষী তুলনাই। তবু মনে হয়, আপাতদৃশ্যে মা যেন সুইচ অফ করে রাখা একটি হাজার বাতির ইলেকট্রিক বাল্ব। যখন ভিতরের শক্তিটি আবরিত থাকে, তখন বোঝবার উপায় নেই, সুইচটি হঠাৎ 'অন' হয়ে গেলেই মুহূর্তে জ্বলে উঠবে হাজার বাতির দীপ্তি। ধরা পড়বে ঐ আপাত-নিরীহ মিহি কাঁচের আধারটি কতখানি শক্তি সংহত রাখতে পারে। শক্তিকে সংহত রাখতে পারাই তো হচ্ছে পরম শক্তি।

নারীজাতি তো শক্তিরূপিণীই। আজকের সমাজের নারীজীবনে সে-শক্তির বিকাশ ঘটবার সুযোগ তো অনেক। জ্ঞান-বিজ্ঞান দুই-ই তার হাতের কাছে এসে ধরা দিয়েছে। যদি ভারতীয় জীবনের সেই প্রাচীন জ্ঞানের শক্তি আর পাশ্চাত্য জীবনধারার কাছে প্রাপ্ত বিজ্ঞানের শক্তি—এই দুইকে সংহত করে আপন জীবনে প্রতিফলন ঘটানো যায়, তবে কেমন হবে সেই শক্তিময়ী নারীমূর্তিটি?

মা সারদার মধ্যে সেই উভয় শক্তিই সুসমঞ্জস-ভাবে বর্তমান এবং সেটি অধীত বিদ্যার দ্বারা অর্জিত নয়, নিজস্ব মহিমার মধ্যেই তা উজ্জীবিত। সকল জ্ঞানের নির্যাস দিয়ে গঠিত এই সারদা-মূর্তি। স্বয়ং ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন: "ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!" বলেছেন: "ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞানদায়িনী।"

তবে এই অনন্ত মহিমাকে আবৃত করে রাখা মায়ের গেরস্থালী সাধারণ মূর্তিটি আবার যেন আমাদের কাছে আরও মনোরম। মা সংসারে অতি সাধারণ কাজগুলি করছেন, মা ভক্তসন্তানের জন্য জলখাবার গোছাচ্ছেন, পান সাজছেন, আর্তহৃদয় নিয়ে যেকেউ তাঁর কাছে ছুটে আসছে—তাকে কাছে বসাচ্ছেন, নিতান্ত ঘরোয়া কথায় তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কারো শিশুপুত্রটিকেও হয়তো কোলে নিচ্ছেন। যেন একেবারে আপনজন।

কত শোকার্ত-তাপিত-চিত্ত মানুষ তাঁর কাছে ছুটে এসেছে, মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে। কাউকে তিনি বিমুখ করতেন না। তাদের জন্যে সর্বদাই অবাধ রেখেছেন তাঁর 'সমুদ্র-হৃদয়'খানি।

মায়ের হৃদয় সত্যই বিশাল সমুদ্রতুল্য। সেখানে সকলের ঠাঁই। তিনি জোর গলায় বলেছেন, আমি সকলের মা। সতেরও মা, অসতেরও মা। পুণ্যাত্মারও মা, পতিতেরও মা। মায়ের কাছে 'পতিত' বলে কিছু নেই। স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বরং এবিষয়ে কিঞ্চিৎ খুঁৎখুঁতে ছিলেন, কিন্তু মায়ের কাছে সবাই সমান। 'সেই' মেয়েটির কাহিনীটিও তো সবার জানা। মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তেমন সুনাম নেই, অথচ তার একান্ত ইচ্ছে, ঠাকুরের অন্নের থালাটি হাতে করে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের ঘরে পৌঁছে দেবে। মাকে সেকথা বলতে মা-ও নির্দ্বিধায় তার হাতে ঠাকুরের খাবারের থালা তুলে দিয়েছেন। ঠাকুর এতে বিরক্ত হয়েছেন, মাকে বলেছেন পরে কোনদিন আর ঐরকম কারো হাতে তাঁর খাবার যেন না দেন, মা যেন নিজেই তাঁর খাবার নিয়ে আসেন। কিন্তু মা ঠাকুরকে সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন: "তা তো আমি পারব না, ঠাকুর!...আমায় 'মা' বলে চাইলে আমি তো [না দিয়ে] থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।"

মমতা আর করুণা দিয়েই তিনি গড়া, তবু তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তেজ। যে-তেজ ঠাকুরের

ওপরও প্রতিবাদী কণ্ঠে কথা বলতে পারে।

চাইতেন তাঁর গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারী ভক্ত-শিষ্যরা আহারে আরও সংযত হোন। বলতেন, ভরপেট খাওয়া সাধনার অন্তরায়। মা সেকথা নস্যাৎ করে বলেছেন, আমার ছেলেদের আমি পেটে মেরে খেতে দিতে পারব না। ফলে নরেন এলেই তাঁর জন্যে বরাদ্দ মোটা মোটা রুটি আর পুরু ছোলার ডাল, তা তিনি যখনই এসে হাজির হোন। শুধু নরেন কেন, গিরিশ ঘোষ আসছেন, বাবুরাম, রাখাল প্রভৃতি সব ছেলেরা আসছেন। তাই ভক্তসন্তানদের জন্য খাটুনির বিরাম ছিল না মায়ের, তবু একবারও ক্লান্তি দেখা যেত না। সর্বংসহা ধরিত্রী যে আমাদের মা-টি।

মায়ের অগাধ গুণ-সমুদ্রের ধারে বসে এইসব ছোটখাট ঘটনার উল্লেখ নেহাতই সমুদ্রের তীরে বসে ঝিনুক বাছার মতো, কিন্তু এই উল্লেখগুলির মধ্যেই যেন ভয় ভাঙে, দূরত্ব কমে।

অর্জুন হেন জনও 'বিশ্বরূপ'টি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেননি। মা যশোদা বলেছিলেন: "গোপাল তোর মহিমা দেখাতে আসিসনে বাবা। সহ্য করতে পারব না। আমার মাখনচোরাই ভাল।"

সেই 'ভাল'টি সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করতেই মা বললেন, অমুকের বৌটি খুব বিদ্বান। ঘড়ি দেখতে জানে, জ্বরকাঠি দিয়ে জ্বর দেখতে পারে।

'মায়ের কথা'র মধ্যে এমন কত অজস্র মণি-মুক্তা ছড়ানো আছে। তার ফাঁকে ফাঁকে অতি সহজ ভাষায় জীবনের অতি বিশেষ উপদেশ। কোন কিছুর অভাব ঘটলে বিচলিত হতে জানতেন না মা। এমনকি পুজার উপকরণে ঘাটতি হলেও না। বলেছেন: "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।" মানিয়ে নিতে আর মেনে নিয়ে চলতে হবে। এই তাঁর শিক্ষা।

'এ্যাডজাস্ট' করার এই সহজ মন্ত্রটির কণিকা-মাত্রও কি আমরা আজকের মেয়েদের মধ্যে দেখতে পাই? অতি গুণী মেয়েও ঐ একটু এ্যাডজাস্ট করে নেবার ক্ষমতার অভাবে জীবনটাকেই ছন্নছাড়া করে বসে। পরম ভালবাসার বিয়ে, বছর না ঘুরতেই বিচ্ছেদের মামলা ঠুকতে ছোটে। পরিবারজীবনে কেবলমাত্র ঐ মানিয়ে নেওয়া আর মেনে নেবার শক্তির অভাবে বিচ্ছিন্নতা ডেকে আনে। বিরুদ্ধতাকে মেনে নেবার কৌশলী শক্তিই যে লড়াইয়ে জেতার একটি উপায়, তা ভেবে দেখে না। অপরকে বশীভূত করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হচ্ছে নিজে তার বশ্যতা স্বীকার করা। সেই শক্তিটির প্রয়োগ করতে পারলে পরিবারজীবনে অনেক ভাঙন রক্ষা হয়।

মা বলেছেন, অপরের দোষ দেখতে যেও না, নিজের দোষটি আগে দেখো। কে নিতে পারছে সেই শিক্ষা? সবাই তো আমরা উল্টোটাই করে চলি।

মেয়েরা শিক্ষিত না হলে দেশের উদ্ধার নেই, সেকথা তৎকালীন সকল মনীষীই ঘোষণা করে গেছেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ-পতিদের অনেক নিন্দা কটুক্তি অগ্রাহ্য করে নিজ পথে চলেছেন। ঠাকুর তাঁর পরম স্নেহের গৌরদাসীকে বলেছেন: "আমি জল ঢালি, তুই কাদা চটকা।" স্বামীজী দেশকে উন্নত করতে, তাকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর "অন্ততঃ গোটা-কতক জ্যান্ত জগদম্বা" চেয়েছেন। আর মা সারদা বলেছেন: "ওরে আলো জেবলে দে! আলো জেবলে দে!"

*

আজকের সমাজে তো আলো জ্বলেছে, কিন্তু ঠিক সেই প্রার্থিত আলোটি কি জ্বলেছে? "জ্যান্ত জগদম্বা"র সৃষ্টি হয়েছে গোটাকতক কেন—হাজারে হাজারে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য কি দেশকে গড়ে তোলার? দেখা তো যায়, কায়মনোবাক্যে আপন 'কেরিয়ার'টি গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য।

আজকের তথাকথিত 'শিক্ষিত' মেয়েরা উত্তাল হচ্ছে 'নিজের প্রাপ্য পাওনাটি পেলাম কিনা'—এই প্রশ্নে। নিজেরাই তার উত্তর জোগাচ্ছে—'কিছু পাইনি, কিছু পেলাম না।'

অর্থাৎ ঘুরেফিরে সেই মায়ের উপদেশের বিরোধী ব্যাপারটিই। সেই নিজের দোষটি না দেখে অপরের দোষটি দেখে বেড়ানোর মতোই আপন কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না থেকে অপরের কর্তব্যচ্যুতির হিসাব কষতে বসা।

আমার একথাটি শুনে হয়তো আমার নাতনী, প্র-নাতনীরা রেগে যাবেন। বলে উঠবেন, দিচ্ছি না তো কি? সর্বশক্তিই তো নিঃশেষ করে ঢেলে দিচ্ছি সংসারের পায়ে। ঘরে-বাইরে খেটে সংসারটার শ্রী-সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে চলেছি কি না?

কিন্তু তখনই বিনীত প্রশ্ন, সেই সংসারটি কার? তোমার নিজেরই তো? এটা তো আমাদের নিতান্ত নিরক্ষর মা মাসি ঠাকুমা দিদিমারাও করে গেছেন, সর্বশক্তি উৎসর্গ করেছেন সংসারের পায়ে। তবু তাঁদের সেই সংসারটি একান্ত নিজেরও হতো না। যৌথ সংসারের একজন শরিকমাত্র ছিলেন তিনি। তথাপি তাঁদের মুখের চেহারায় শান্তি ও সন্তোষের একটি ছাপ দেখা যেত।

আজকের যত সুখের অধিকারিণীদের মুখে তেমন শান্তি আর সন্তোষের ছাপটি অনুপস্থিত। তবে আর 'শিক্ষাপ্রাপ্তি'র বাড়তি লাভটা কি?

এযুগে অনেক সমস্যা।

সেটা ঠিকই।

এযুগের জীবন অনেক জটিল, জীবনযাত্রা অনেক কণ্টকবহুল। সবই ঠিক। তবু অনেকের মধ্যে আমরা মেয়েরা কি নিজেরাও সেই অনিবার্য কিছু সমস্যা ডেকে আনি না?

কিন্তু সে কথা থাক। এ-তর্কের শেষ নেই।

তাই বলি—সকল তর্কের শেষ উত্তর তর্কাতীত সেই শান্তি আর সন্তোষের, ক্ষমা আর মমতার, ধৈর্যের আর সহিষ্ণুতার, সেবা আর ভালবাসার মূর্তিমতী প্রতিমা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর এই পুণ্য আবির্ভাব লগ্নে আমরা মেয়েরা একবার আত্মসমীক্ষা করে দেখতে পারি না কি? কোন্‌খানে সংহত রয়েছে এই অগাধ শক্তি? তার এক কণা পেলেও বুঝি এই উত্তালতা স্থির হতে পারে।

মা তো আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর কর্মের মধ্যে, শিক্ষার মধ্যে, জীবনাদর্শের মধ্যে দিনে দিনেই তো ব্যাপ্তিতে বিশাল হয়ে উঠছেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সেই নহবৎ ঘরের অবগুণ্ঠনবতী আজ জগজ্জননীরূপে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে উঠছেন।

তা আমাদের ঘরের ঐশ্বর্য ক্রমশই অপরের ঘরের শ্রী-সৌন্দর্য ঘটাতে থাকবে, আর আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখব? আর শুধু মনে মনে গর্ব করতে চেষ্টা করব, 'মা আমাদের, মা আমাদের কাছের মানুষ, মা আমাদের আপনজন।' ব্যাস?

মায়ের কাছে গিয়ে দুদণ্ড বসতে চাইব না?

মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ হতে যাব না?

সত্যি বলতে, চিরন্তন মেয়ে-মনের মূল চাহিদা হলো আশ্রয়, আশ্বাস আর স্নেহচ্ছায়া। আজকের মেয়েরা বাইরে সেটি অস্বীকার করতে চাইছে, পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের চিন্তায় হৃদয়ের বিপরীত পথে চলতে চাইছে বলেই তারা শান্তি আর সন্তোষের অভাব অনুভব করছে। তাই তার ভিতরে এত অস্থিরতা।

চিরকালীন নারীমনের একান্ত অন্তর্নিহিত চাওয়াটি কিন্তু কেবলমাত্র স্বাধিকার নয়, কেবলমাত্র স্বয়ংপ্রভু হয়ে ওঠা নয়, কেবলমাত্র জাগতিক সুখটিকেই সর্বস্ব ভাবা নয়। অথচ ভ্রান্তিবশে আজ সেইগুলোই মেয়েরা চেয়ে চলেছে।

আসলে সেই মনটি চায় নির্ভরতা। চায় একটি মানসিক আশ্রয়। চায় জীবনের একটি ধ্রুবলক্ষ্য। তার অবচেতনের এই চাওয়াটিই তাকে স্থিরতা দিতে পারছে না। খেয়াল করে দেখছে না সেই আশ্রয়, আশ্বাস আর ধ্রুব আদর্শ তার হাতের কাছেই। একটিবার শুধু খেয়াল করে 'কাছে' এসে বসার অপেক্ষা।

যেকোন পরিবেশ, যেকোন ধরনের কর্মজীবন, বহিরঙ্গে যেকোন ব্যবস্থাই থাক, মায়ের কাছে কিছুই ঠেক খাবে না। মায়ের নেই কোন কট্টর নির্দেশ।

সেখানে পরম আশ্বাসের মন্ত্র: "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।"

মা সারদাদেবীকে তাই বলতেই হয়—এযুগের আশ্রয়। এযুগের আশ্বাস। এযুগের আদর্শ।

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

শিশুদের আবশ্যকীয় টিকা কি ও কেন

কুমকুম ঘোষ

শিশু অবস্থায় কয়েকটি সাধারণ রোগজনিত জীবাণু আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকা (vaccine) দিয়ে তার জীবাণুজনিত রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। শিশু বয়সের ছয়টি সাধারণ অথচ গুরুতর অসুখ হলো ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি (যার জীবাণুর নাম পার্টুসিস—Pertussis), টেটেনাস, পোলিও-মায়েলাইটিস, যক্ষ্মা এবং হাম। এই রোগগুলি শিশুমৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী। এইসব অসুখের জন্য টিকা দিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঐ অসুখ আর হবে না, অবশ্য যদি টিকা ঠিকমতো দেওয়া হয়ে থাকে এবং বিধিমত তৈরি হওয়া থেকে দেওয়া পর্যন্ত টিকা সুরক্ষিত থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত টিকা ঠাণ্ডা বাক্সে রেখে পৌঁছে দেওয়া একটি দুরূহ ব্যাপার। টিকায় সুফল না পাওয়ার একটি বড় কারণ হলো, গরম তাপে টিকার কার্যকারিতা কমে যাওয়া। প্রথমেই টিকা-প্রয়োগের কিছুটা তাত্ত্বিক আলোচনা দরকার। রোগজীবাণু শরীরে ঢুকলে অথবা মৃত জীবাণুকে শরীরে ইন্‌জেকশন দিলে শরীরের মধ্যে কিছু জিনিস (অ্যান্টিবডি—antibody) তৈরি হওয়ার ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা জন্মে। উপরি উক্ত জীবন্ত বা মৃত জীবাণুকে অ্যান্টিজেন (antigen) বলে। কোনও রোগকে প্রতিরোধ করতে হলে, আগে থেকে শরীরে অ্যান্টিজেন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকার জন্য ভবিষ্যতে রোগজীবাণু শরীরে বংশবৃদ্ধি করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। জীবন্ত জীবাণুকে শরীরে ঢোকালে রোগ সৃষ্টি হতে পারে বলে অনেক জীবাণুকে ল্যাবরেটরীতে চাষ করে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হয় যে, তারা জীবন্ত থেকে শরীরে প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি করার ক্ষমতা রাখলেও রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সেই পরিবর্তিত জীবাণু দিয়ে টিকা তৈরি করলে তাকে 'জীবন্ত রোগক্ষমতাহীন' (Live attenuated) টিকা বলে।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তিনটি রোগের প্রতিরোধের জন্য টিকা দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হতো—ডিপথেরিয়া, টেটেনাস ও হুপিং কাশি। এখনকার প্রোগ্রামে আরও তিনটি রোগের টিকা এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে—পোলিও মায়েলাইটিস, যক্ষ্মা ও হাম। টিকা দেওয়ার তালিকাটি বাড়ানো হয়েছে বলে এই প্রোগ্রামকে বলা হয় 'টিকা দেওয়ার বর্ধিত তালিকা' (ই. পি. আই. বা Expanded Programme of Immunisation—E. P. I.)। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা কর্তৃক সারা পৃথিবীতেই এখন ই. পি. আই. প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। প্রায় সব দেশেই বিনা পয়সায় সরকার এই টিকা দেবার ব্যবস্থা করে।

প্রথমেই ধরা যাক ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি এবং টেটেনাসের কথা। এই তিনটি রোগের টিকা একসঙ্গে দেওয়া হয়। একে ট্রিপল অ্যান্টিজেন (Triple antigen) বলা হয়। একে ডি. পি. টি. (D. P. T.—Diphtheria-Pertussis-Tetanus) টিকাও বলে। এই টিকা শিশুর এক বছর বয়সের মধ্যেই দিতে হবে। এর প্রথম টিকা শিশুর ছয় সপ্তাহ বয়সে দেওয়া উচিত। প্রথম টিকার পর চার থেকে আট সপ্তাহ বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় টিকা এবং তারপর আবার চার থেকে আট সপ্তাহ বিরতি দিয়ে তৃতীয় টিকা দেওয়া হয়। এরপর বারো থেকে আঠারো মাস পরে একবার এবং তারপর পাঁচ বছর বয়সে আর একবার টিকা দিতে হবে; শেষোক্ত দুটি টিকাকে বলা হয় 'জোরদারকারী মাত্রা' (Booster dose)। এরপর প্রতি দশ বছর অন্তর এইরকম মাত্রা একটি দিলে ভাল হয়। ইত্যবসরে আঘাতজনিত ক্ষত হলে ক্ষতস্থানের অবস্থা বুঝে টেটেনাস টিকা (Tetanus toxoid)

দিতে হবে। হুপিং কাশির টিকা শিশুর ছয় বছর বয়স অতিক্রম করার পর দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, যদি না এই অসুখ কোন সময়ে মহামারীরূপে দেখা দেয়। টিকা ঠাণ্ডায় সুরক্ষিত করতে হয়। কোন্ বয়সে টিকা দেওয়া উচিত, এবিষয়ে যা বিবেচ্য তা হলো, জন্মকালে শিশু তার মায়ের কাছ থেকে অনেক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। সেই মাতৃলব্ধ প্রতিরোধক্ষমতা আস্তে আস্তে কমতে কমতে ছয় মাস বয়সের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে আবার শিশুর ছয় মাস বয়স হবার আগেই কয়েকটি অসুখের শিকার হয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন যে, জন্মের দু-তিন মাসের মধ্যে টিকা নিলে রক্তে প্রতিরোধক্ষমতা থাকার জন্য ভাল কাজ হবে না। কিন্তু অধুনালব্ধ গবেষণায়[১] একথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে না। গবেষণায় জানান হচ্ছে যে, ডিপথেরিয়া এবং টেটেনাস রোগ প্রতিরোধ করতে শিশুর এক সপ্তাহ বয়সে একটি এবং এক মাস পরে আর একটি টিকা দেওয়া যেতে পারে। হয় ঠাণ্ডায়। শিশুর বয়স যখন ছয় সপ্তাহ তখন প্রথম মাত্রা খাওয়ানো উচিত। এরপর এক মাস অন্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রা খাওয়ানো উচিত। 'জোরদারকারী মাত্রা' দেওয়া হয় তৃতীয় মাত্রার বারো থেকে আঠারো মাস পরে অর্থাৎ শিশুর দেড় থেকে দুই বছর বয়সে। স্কুলে ঢোকার সময়ে আর একটি জোরদারকারী মাত্রা দিলে ভাল হয়। শিশুটি যদি আগে পোলিও অসুখে আক্রান্ত হয়েও থাকে, তাহলেও এই টিকা দেওয়া দরকার।

বর্তমানে মুখে খাওয়ানো টিকা বেশি প্রচলিত হলেও দেখা যাচ্ছে যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কখনো কখনো (খুব সামান্য সংখ্যায়) টিকা খাওয়ানোর পরেও শিশুর পোলিও হয়েছে। তাই মুখে খাওয়ানো বা ইন্জেকশন—কোন্ টিকা এদেশে চালু হওয়া উচিত তা নিয়ে মতভেদ হয়েছে এবং এই ব্যাপারে গবেষণা চলছে। কোন কোন দেশে তিন মাত্রার জায়গায় এক মাস অন্তর চার বা পাঁচ মাত্রায় এই টিকা দেওয়া হয়ে থাকে।

ভ্রম সংশোধন

উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ (৯৩তম বর্ষ ১১শ) সংখ্যার ৬৫৩ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান-নিবন্ধ 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের আয়ু ও জনসাধারণের আয়ুঃ একটি তুলনামূলক সমীক্ষা' প্রবন্ধের সারণির (table) বাঁদিকের স্তম্ভে, ওপর থেকে নিচে 'বয়স, কতজন, শতকরা, মোট' দেওয়া আছে। 'বয়স'-এর স্থলে 'বছর' হবে।—যুগ্ম সম্পাদক

শিশুর জ্বর অবস্থায়, মৃগী জাতীয় অসুখ থাকলে অথবা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা চলাকালীন বা পোলিও মহামারীর সময়ে এই টিকা দেওয়া যাবে না। যে-অসুখের টিকা দেওয়া হচ্ছে শিশু যদি ইতিমধ্যেই সেই অসুখে আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ হয়, তাকেও ঐ টিকা দেওয়া যাবে না।

এরপর আসা যাক পোলিও টিকার কথায়। দুরকম পোলিও টিকা আছেঃ ইন্জেকশন (SALK) এবং মুখে খাওয়ানো (SABIN)। ইন্জেকশনে মৃত পোলিও ভাইরাস থাকে এবং মুখে খাওয়ানো (oral) টিকাতে 'জীবন্ত রোগক্ষমতাহীন' পোলিও ভাইরাস থাকে। নানা সুবিধার জন্য বর্তমানে মুখে খাওয়ানোর টিকাই বহুল প্রচলিত। এটি সুরক্ষিত

যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বি. সি. জি. (B. C. G.) টিকা দেওয়া হয়। এটি একটি যক্ষ্মা-রোগের 'জীবন্ত রোগক্ষমতাহীন' জীবাণু টিকা। এটি যক্ষ্মার সমগোত্রীয় কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে। শিশুর জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই বি.সি.জি. টিকা দিতে হয়। শিশুর শরীরে যক্ষ্মা প্রতিরোধ-ক্ষমতা আছে কিনা, তা ম্যান্টো পরীক্ষা (Mantoux test) করে দেখে এই টিকা দেওয়া হয়। শরীরে যক্ষ্মা প্রতিরোধক্ষমতা থাকলে এই টিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই টিকার রোগপ্রতিরোধক্ষমতা প্রায় সাত বছর বহাল থাকে। যেখানে যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি, সেখানে বি. সি. জি. দেওয়া বেশি প্রয়োজন। জন্মের পরই অথবা তিন

১ British Medical Journal, 2 March, 1991, p. 481.

মাসের মধ্যে এই টিকা দেওয়া উচিত এবং তা একবারই। ইনজেকশনের জায়গায় ছোট একটি ঘা হয় বলে অনেক মা-ই এই টিকা দিতে রাজি হন না।

হাম প্রতিরোধ করার জন্য শিশুর পূর্বে হাম না হয়ে থাকলে নয় থেকে বারো মাস বয়সের মধ্যে হামের 'জীবন্ত রোগক্ষমতাহীন' টিকা চামড়ার নিচে ইনজেকশন করে দিতে হবে এবং তা একবারই। শিশুর বয়স ছয় মাসের কম হলে, স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ চলাকালীন, মৃগীজাতীয় রোগ বা অ্যালার্জি থাকলে এই টিকা দেওয়া উচিত নয়। সম্প্রতি এই টিকা তৈরির ক্ষেত্রে ভারত আত্মনির্ভরশীল হয়েছে।

পূর্বোল্লিখিত ছয়টি টিকা ছাড়াও এখন টাইফয়েড, মাম্পস, রুবেলা প্রভৃতি অসুখের টিকা শিশুদের দেওয়া হয়। এছাড়া শিশুর ও মায়ের স্বার্থে মাকে গর্ভাবস্থার প্রথমদিকে একমাস অন্তর দুটি টেটেনাস টক্সয়েড ইনজেকশন দেওয়া দরকার। সুখের বিষয়, টিকা তৈরির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এখন মোটামুটি আত্মনির্ভর হয়েছে। এমনকি কোন কোন টিকা বাইরে রপ্তানি করার কথাও ভাবা হচ্ছে। অনুন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলিতে টিকার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। কিন্তু সমাজের যে-শ্রেণীর জন্য টিকা সবচেয়ে বেশি দরকার তাদের নিয়মিত টিকা নেওয়ানো সবচেয়ে কঠিন। আরও একটি সমস্যা হলো, টিকার একটি বা দুটি মাত্রা নিয়ে বাকিগুলি না নিতে আসা। সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে এই সম্বন্ধে সচেতনতা জাগাতে খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে; তবে তা যথেষ্ট নয়, আরও প্রচার দরকার। ☐

পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে

পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা (যথাক্রমে সারদাদেবী সংখ্যা, স্বামী বিবেকানন্দ সংখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সংখ্যা) হওয়ায় এগুলিতে ধারাবাহিক রচনাগুলি প্রকাশিত হবে না। অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত যেসব ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি আগামী চৈত্র সংখ্যা থেকে আবার পুনঃপ্রকাশ করা হবে।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য

আবেদন

উত্তরপ্রদেশের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত উত্তরকাশী জেলার একচল্লিশটি গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন শুকনো খাদ্য, পশমের কম্বল, তাঁবু, ত্রিপল প্রভৃতি বিতরণ করা ছাড়াও চিকিৎসা-ত্রাণকার্য পরিচালনা করছেন। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এতই বিশাল যে, সারা দেশের সহৃদয় জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভবপর নয়। আমরা তাই সকলের কাছে অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন সংখ্যক পশমের কম্বল এবং ত্রিপল সরাসরি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল-২৪৯৪০৮ অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে। অন্যথা 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামাঙ্কিত একাউন্টপেয়ী চেক/ড্রাফট্ বা মনি অর্ডার 'ভূমিকম্প ত্রাণের জন্য' উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করুন। ভারতীয় আয়কর বিভাগের ৮০ জি ধারানুযায়ী এই অনুদান আয়করমুক্ত।

২৬ নভেম্বর, ১৯৯১
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

স্বামী গহনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

গ্রন্থ-পরিচয়

সকলের মা সারদা

শ্রীময়ী মুখোপাধ্যায়

শ্রীমা সারদা ঃ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০০৭৬। মূল্য ঃ দশ টাকা।

সবদেশে, সবসমাজে, সবকালে যে ইতিহাস, বীরগাথা, রূপকথা-উপকথা-পুরাণকথার সাক্ষাৎ আমরা পাই তার সিংহভাগ জুড়ে থাকে পুরুষের কীর্তি ও গৌরব কাহিনী, নারীর স্থান, নারীর ভূমিকা সেখানে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। নারীর স্থান দেশ-বিদেশের কাব্য ও নাটকে গুরুত্ব পেলেও নারী সেখানে প্রধানতঃ পুরুষের নর্মসহচরী অথবা প্রেমিকা। কাব্য ও নাটকের নায়িকার মধ্যে রচয়িতা-গণ ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, তেজস্বিতা প্রভৃতি ফুটিয়ে তোলার দিকে ততটা প্রয়াসী হননি, যতটা ভাবালুতা, কোমলতা ও রোমান্সকে বিন্যাস করেছেন। ফলে সারা পৃথিবীতে আজ এই প্রগতির বিস্ময়কর অধ্যায়েও নারীর মানবিক রূপ বাঞ্ছিত প্রকাশলাভ করতে পারেনি। দু-চারজন মৈত্রেয়ী, গার্গী, দ্রৌপদী, জনা, রাজিয়া, লক্ষ্মীবাঈ, জোয়ান অব আর্ক, মার্গারেট থ্যাচার, ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎ যে আমরা কখনো-সখনো পেয়েছি বা পাই তাঁরা নিতান্তই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে প্রায়শই যে-ধারণা আমাদের, তা হলো নারীর মধ্যে তাঁরা যেন পুরুষ, যেন নারীত্বকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁদের পৌরুষ। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন নারী নারীর সকল মহিমা ও বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে নারীত্বের গৌরবে মহীয়সী হয়ে উঠেছেন এমন কোন দৃষ্টান্ত রয়েছে কিনা সন্দেহ। মানুষের কল্পনার রঙে রঞ্জিত কাব্য, নাটক, উপন্যাসেও সে-ধরনের নজির সম্ভবতঃ নেই। বলতে দ্বিধা নেই, পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁর দেখা আমরা পাইনি এবং পাই না, মানুষের সৃষ্ট সাহিত্যে যিনি এখনো অকল্পিত রয়েছেন, রক্তমাংসের শরীরে অল্প কিছুকাল আগে তিনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। হ্যাঁ, কন্যারূপে, ভগ্নীরূপে, পত্নীরূপে, জননীরূপেই। নারীর কোমলতা, স্নেহ, মমতা, সেবাপরায়ণতা, বাৎসল্য—সকলকিছুর জীবন্ত প্রতিমা ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে নারীর দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, স্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশবান হয়েছিল তাঁর কথায়, কর্মে, আচরণে এবং জীবন-চর্যায়। কিন্তু যে দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং ব্যক্তিত্বকে পুরুষোচিত বলতে সমাজ অভ্যস্ত, তাঁর মধ্যে তার প্রকাশ ছিল না। তা ছিল একান্ত-ভাবেই নারীজনোচিত। সমকালীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুজন পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সেই নারীর কাছে মাথা নত করেছিলেন। সর্বকালের সর্বদেশের সর্বাপেক্ষা মহীয়সী সেই নারীর নাম সারদাদেবী।

সারদাদেবী সম্পর্কে বহু স্মৃতিকথা, বেশ কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থ, বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থের (ইংরেজী, হিন্দী এবং বাঙলায়) সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত। বস্তুতঃ, সারদাদেবীর জীবনকথা এখন বহু-পঠিত, বহু-প্রসিদ্ধ। ইদানীংকালে তাঁর সম্পর্কে রচিত গ্রন্থের তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখা বৃহৎ জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীমা সারদাদেবী' এবং সম্প্রতি প্রকাশিত সুবৃহৎ প্রবন্ধ সঙ্কলন-গ্রন্থ 'শতরূপে সারদা' জনপ্রিয়তায় অনেক বিখ্যাত উপন্যাসকেও হার মানিয়েছে। তবে এ-দুটি গ্রন্থ এত দীর্ঘায়তন যে সবার পক্ষে সবসময় পড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সে-কথা মনে রেখে রামকৃষ্ণ মঠ দু-একটি ছোট বই প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি সারদা মঠ থেকে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 'শ্রীমা সারদা' শিরোনামে সুন্দর কাগজে সুমুদ্রিত যে ক্ষুদ্র-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সেটিও সম্ভবতঃ ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই লেখা। 'নিবেদন'-এ লেখিকা জানিয়েছেন, "বইটির অধিকাংশ উপাদানই" স্বামী গম্ভীরানন্দের সুবিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। শুধু এ-বই কেন, সারদাদেবী সম্পর্কে যত বই পরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে সব বইয়েরই

অন্যতম প্রধান আকর-গ্রন্থ স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থ ; সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'শতরূপে সারদা' সম্পর্কেও কথাটি একইভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থের লেখিকাকেও গম্ভীরানন্দজীর গ্রন্থকে অনুসরণ করতে হয়েছে। তবে অনুসরণের সঙ্গে তিনি যে-কাজটি করতে সমর্থ হয়েছেন তা হলো সারদাদেবীর মহাজীবনকে তাঁর নিজের অনুভূতি ও চেতনার রঙে দেখা। বস্তুতঃ সেই দেখার সামর্থ্য একটি দুর্লভ যোগ্যতা। লেখিকার জীবন সারদাদেবীর আদর্শে নিবেদিত বলেই 'দেখা'-র কাজটি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

'নিবেদন'-এ লেখিকা যথার্থই লিখেছেন : "বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেছেন, 'আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে ইতিহাস রচনা হবে, তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম কখনই বাদ পড়বে না।' আমাদের মনে হয় শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনও অনুরূপভাবেই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে ও পাবে। জগতের অন্যান্য মহান আচার্যগণের সঙ্গে তাঁর নামও উচ্চারিত হবে একইভাবে।"

পনেরটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত। এই পনেরটি অধ্যায়ে শৈশব থেকে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত সারদাদেবীর জীবনের একটি ধারাবাহিক জীবনচিত্র আমরা গ্রন্থটিতে পাই। একথা বলতেই হবে যে, অল্প পরিসরে গ্রন্থটি সারদাদেবীর একটি উৎকৃষ্ট জীবনকথা। শ্রীমায়ের জীবনের প্রায় আনুপূর্বিকই এখানে রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে তাঁর জীবনের শিক্ষা ও মহিমার কথাও। একটি ছোট অধ্যায়ে ('দিব্যবাণী') শ্রীমায়ের কয়েকটি বাণীকে চয়ন করে লেখিকা উপস্থাপন করেছেন। সহজ, সরল ভাষায় কত গভীর কথা শ্রীমা বলতেন, তার একটা আভাস পাঠকরা সেখানে পাবেন। গ্রন্থের একটি প্রধান আকর্ষণ স্বচ্ছ, সুন্দর, সাবলীল ভাষা, যা আগ্রহের আবেগে পাঠককে টেনে নিয়ে যায় সেই মহাজীবনের পরিক্রমায়। সরলা, নিরক্ষর, পল্লীবালা সারদা কিভাবে রামকৃষ্ণ সংঘজননীতে রূপান্তরিত হলেন, সেই বিচিত্র প্রবাহকে যেমন পাঠক এখানে অনুসরণ করার সুযোগ পাবেন, তেমনি পাবেন সেই প্রবাহ কিভাবে পরিব্যাপ্ত হলো 'সকলের মা সারদা'-র অনন্ত মোহনায়।

কবিতায় নারীর মন

অলকানন্দা সেনগুপ্ত

চক্রবাল : জ্যোতির্ময়ী দেবী। সিস্টেম লাইব্রেরী, ২৪১-সি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৪। মূল্য : আট টাকা।

নারীর মন সম্পর্কে সাধারণের যা ধারণা তার প্রধান অংশ পুরুষেরই তৈরি করে দেওয়া। নারী কি চায়, নারীর হৃদয়ের কথা, নারীর অনুভূতি, নারীর আকাঙ্ক্ষার যে-রূপ আমরা কাব্য, নাটক, উপন্যাসে দেখতে অভ্যস্ত তার ব্যাখ্যাতা ও প্রকাশকর্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ লেখককুল। অতি সাম্প্রতিককালের কথা বাদ দিলে নারীর কলমে কাব্য, নাটক, উপন্যাস সবদেশে, সবকালেই প্রায় বিরল বললেই চলে। নারী যখন হাতে কলম তুলে নেয়, প্রকাশ করে তার নিজের মনের কথা, তখনো কিন্তু তাকে প্রভাবিত করে চলে পুরুষ-কথিত, পুরুষ-ব্যাখ্যাত, পুরুষ-বর্ণিত নারী-মনস্তত্ত্ব।

জ্যোতির্ময়ী দেবী বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রধানতঃ সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যে নারীর একটি নিটোল রূপ আমরা পাই। নারীর চিরন্তন সমস্যা, নারীর মানসজগৎকে নানাভাবে তিনি উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন এবং করেছেন নারীর দৃষ্টি থেকেই। বর্তমান গ্রন্থটি জ্যোতির্ময়ী দেবীর ৭০টি কবিতার একটি সংকলন। 'উদ্বোধন' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানকালে 'আধুনিক কবিতা' বলতে আমরা যা বুঝি জ্যোতির্ময়ী দেবীর কবিতা তার গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তাঁর মৌলিক চিন্তা, মৌলিক প্রকাশভঙ্গি, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মৌলিকতা আধুনিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সে-বিচারে জ্যোতির্ময়ী দেবীর সকল কবিতাই আধুনিক এবং কয়েকটি কবিতা, যেমন 'শ্রাবণ পূর্ণিমা রাতে', 'মৈত্রেয়ী', 'কন্যাকুমারী' প্রভৃতি, আবেদনে এমনই মর্মস্পর্শী এবং নতুন আলোকপাতে সমৃদ্ধ যে, 'আধুনিক' কবিতার সীমাকে অতিক্রম করে তারা 'সর্বকালীন' কবিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৫—১৮ অক্টোবর বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজার প্রতিদিন এবং মহাষ্টমীর দিন কুমারীপূজা দর্শনের জন্য প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। প্রতিদিন ভক্তদের হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। তিনদিনে মোট পঁয়ত্রিশ হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত ভারতস্থ শাখাকেন্দ্রসমূহে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঃ

আঁটপুর, আসানসোল, বোম্বাই, বারাসাত, কাঁথি, গুয়াহাটি, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদা, মেদিনীপুর, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং, শিলচর, বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম ও বিবেকনগর (আমতলী)।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম প্রাক্ ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্ত স্মরণ অনুষ্ঠান ২ জুলাই '৯১ 'বিবেকানন্দ হল'-এ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ। বক্তব্য রাখেন স্বামী জয়ানন্দ ও মিলনকুমার চক্রবর্তী। ছাত্ররা সঙ্গীত, আবৃত্তি, আলোচনা, যন্ত্রসঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও নাটক পরিবেশন করে।

যুবসম্মেলন

সালেম (তামিলনাড়ু) আশ্রম, গত ২৯ সেপ্টেম্বর এক মহিলা যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ঐ সম্মেলনে মোট ২১০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

পরিদর্শন

গত ১৭ অক্টোবর মহানবমীর দিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার বিবেকনগর কেন্দ্র (আমতলী) পরিদর্শন করেন।

গত ১৪ অক্টোবর কেরালার রাজ্যপাল বি. রাচাইয়া তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ কালাডি আশ্রম পরিদর্শন করেন।

বইমেলা

বোম্বাই আশ্রম নাসিকের কুম্ভমেলায় গত ১৫ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বইমেলার আয়োজন করেছিল। ঐ মেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী অবলম্বনে একটি চিত্রপ্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

ত্রাণ

উত্তরপ্রদেশ ভূমিকম্প-ত্রাণ

কনখল সেবাশ্রমের মাধ্যমে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরকাশী জেলার নয়তলা ও গৌয়ানা গ্রামের এক হাজার পরিবারের মধ্যে শুকনো খাবার, পশমী কম্বল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসক ও চিকিৎসা-কর্মীদের একটি দল ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে চিকিৎসাকার্য করেছেন গত অক্টোবর '৯১ মাসে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

মালদা আশ্রমের মাধ্যমে ঐ জেলার ভুতনী ও মহারাজপুর এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাহিন ও ডালিমগাঁও-এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শুকনো খাবার এবং রান্না করা খাবার দেওয়া ছাড়াও ধুতি, শাড়ি, শিশুদের পোশাক এবং প্রচুর পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর ২নং ব্লকের চরকুঠিবাড়ি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য ১০০০ শাড়ি, ১০০০ ধুতি, ১৩৭৯ সেট শিশুদের পোশাক এবং ৮৫১টি পশমী কম্বল সারগাছি আশ্রমে পাঠানো হয়েছে।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ

অস্বাভাবিক বৃষ্টি এবং অন্যান্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গুন্টুর জেলার নিজামপটনম মণ্ডলের

মনুক্কেশ্বরপুরম ও কোট্টাপালেম গ্রামে দুটি আশ্রয়গৃহ-সহ সমাজগৃহের প্লাস্টার-করণ ও অন্যান্য শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে।

বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামঞ্চেলী মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে আশ্রয়গৃহের একতলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর দোতলার কলাম তৈরির কাজ চলছে।

দেহত্যাগ

স্বামী যোগস্থানন্দ (সনৎ) গত ১০ অক্টোবর বিকাল ৩-৫৫ মিনিটে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তিনি তীব্র শ্বাসকষ্ট রোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

স্বামী যোগস্থানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি এলাহাবাদ, আসানসোল, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, মায়াবতী, পুরুলিয়া ও কাঁকুড়গাছি কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। তাছাড়া তিনি খেতড়ি ও কাশীপুর কেন্দ্রের প্রধানরূপেও কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। সরল ও নিরহংকারী এই সন্ন্যাসী সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

স্বামী মননানন্দ (কালীপদ) গত ২৫ অক্টোবর রাত ১২-৪০ মিনিটে ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। অনেক দিন ধরেই তিনি ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন।

স্বামী মননানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিলেট আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বাগেরহাট, মায়াবতী, আলমোড়া, রাজকোট এবং করিমগঞ্জ কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি করিমগঞ্জ আশ্রমে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে থাকতেন। ত্যাগ-তপস্যা, সরলতা ও সর্বদা হাসিখুশি স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

স্বামী শিবস্বরূপানন্দ (প্রীত) গত ২৮ অক্টোবর দুপুর ১টা ২০ মিনিটে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে ভুগছিলেন। যথাসাধ্য ভাল চিকিৎসা সত্ত্বেও সম্প্রতি তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ (মহাপুরুষ মহারাজ)-এর মন্ত্রশিষ্য স্বামী শিবস্বরূপানন্দ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মহাপুরুষ মহারাজের সেবক ছিলেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, মহীশূর ও উদ্বোধন কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। তাছাড়া তিনি কালিম্পং (বর্তমানে বিলুপ্ত), শ্যামলাতাল, পুরী মঠ ও জামতাড়া কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি প্রথম একবছর বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমে ও পরে বেলুড় মঠে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। মধুর স্বভাব ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানন্দ (জামবভ ভাট) এক দুঃখজনক ঘটনায় দেহত্যাগ করেছেন। গত ২৭ অক্টোবর তিনি অধ্যক্ষ সম্মেলন ও সন্ন্যাসী সম্মেলনে যোগ দিতে বেলুড় মঠে এসেছিলেন। পরদিন সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। ২৯ অক্টোবর তাঁর মরদেহ গঙ্গায় ভাসতে দেখা যায়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি মহীশূর আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি ম্যাঙ্গালোর আশ্রমের প্রারম্ভ থেকেই সেখানকার সহকারী প্রধান ছিলেন। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঐ কেন্দ্রের প্রধান হন। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন সালেম কেন্দ্রের প্রধান। ভদ্র ও দয়ালু এই সন্ন্যাসী সকলের প্রিয় ছিলেন।

বহির্ভারত

বাংলাদেশের বালিয়াটি, বরিশাল, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ ও সিলেট কেন্দ্রে এবং মরিশাসে প্রতিমায় দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের পাঁচজন মন্ত্রী, বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা ও ঢাকার মেয়র ঢাকা কেন্দ্রের দুর্গাপুজায় উপস্থিত ছিলেন।

মরিশাসের গভর্নর জেনারেল বীরস্বামী রিঙ্গাড়ু, নারী অধিকার, শিশু ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শীলাভাই বাপ্পু এবং মরিশাসে ভারতের হাই কমিশনার মরিশাস কেন্দ্রের দুর্গাপুজায় যোগদান করেছিলেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল): গত অক্টোবর মাসের প্রতি রবিবার ধর্মীয় ভাষণ এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস যথারীতি হয়েছে। ১৭ অক্টোবর মহানবমীর দিন দুর্গাপুজা এবং ১৮ অক্টোবর '৺বিজয়া' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস: নভেম্বর মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ, প্রতি মঙ্গলবার মুণ্ডক উপনিষদ্ ও প্রতি বৃহস্পতিবার 'শ্রীরামকৃষ্ণ দ্য গ্রেট মাস্টার' পাঠ ও আলোচনা করেছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া: গত নভেম্বর মাসের প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। রবিবারগুলিতে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা হয়েছে। ৫ নভেম্বর পুজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, ভক্তিগীতি পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীকালীপুজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক: নভেম্বর মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রতি শুক্রবার 'বিবেকচূড়ামণি' ও 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা): ২ ও ১৭ নভেম্বর তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৯ ও ২৩ নভেম্বর যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জীবন ও বাণী আলোচনা এবং ৩ নভেম্বর 'স্পিরিচুয়াল লাইফ: এ জয়ফুল অ্যাডভেঞ্চার' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের প্রধান স্বামী প্রমথানন্দ। এছাড়া ৫ নভেম্বর ভক্তিগীতি, ধ্যান-জপ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীকালীপুজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ১৯ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ এবং ২১ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং স্বামী দেবাশ্রয়ানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার কথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ লীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২ অক্টোবর সাভেলের বিল (উত্তর ২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের অঙ্গ ছিল পূজা, জপ-ধ্যান, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি। দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয়-বস্তু ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের ওপর বিভিন্ন আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ভজন-কীর্তন প্রভৃতি। সম্মেলনে স্বামী শিবময়ানন্দ ও স্বামী দিব্যানন্দ যোগদান করেন। সম্মেলনে যোগদানকারী ভক্তের সংখ্যা ছিল মোট ১৩৫ জন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসংঘ, সম্বলপুর (উড়িষ্যা): গত ১৮ সেপ্টেম্বর সঙ্ঘের ৮ম বাৎসরিক উৎসব স্থানীয় কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ হয়। এই উৎসব উপলক্ষে ২২ সেপ্টেম্বর সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, কথামৃত পাঠ, ভক্তসম্মেলন, প্রসাদ বিতরণ, কীর্তন প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। ভক্তসম্মেলনে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণীর ওপর ভাষণ দেন প্রভাতচন্দ্র বেহেরা। ঐদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচারকল্পে একটি বুকস্টল খোলা হয়।

গত ১৮ আগস্ট উত্তর কলকাতা বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের বার্ষিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণীসভা বাগবাজারের কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাঙ্কন, স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা আবৃত্তি, স্বামীজীর ওপর বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তরের আসর ছিল প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। তাছাড়া অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকেই সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গর্গানন্দ, পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। যুবমহামণ্ডলের আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সম্পাদক সোমনাথ বাগচী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কোষাধ্যক্ষ প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভগিনী নিবেদিতার ১২৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে গত ২৭ অক্টোবর '৯১ সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে বাগবাজারের গিরিশ এভিনিউ ও বোসপাড়া লেনের সংযোগস্থলে নিবেদিতার মূর্তি ও স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করা হয়। আবরণ উন্মোচন করেন প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ২৮ অক্টোবর ছিল নিবেদিতার জন্মদিন। সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করেন। আনন্দবাজার পত্রিকা ঐদিন ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

স্বামীজীর 'ভারত পরিক্রমা'র শতবর্ষ পূর্তি

১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর কন্যাকুমারীর 'শ্রীপাদ পরাই'-এ স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানমগ্ন হওয়ার একশো বছর পূর্ণ হবে। কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্র ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দকে বিশেষভাবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই বছরকে তাঁরা বিবেকানন্দের কন্যাকুমারী সফরের শতবর্ষ হিসাবে পালন করছেন। এই উপলক্ষে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের উদ্যোগে পঞ্চাশজন কর্মীকে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সারা ভারত পরিক্রমা করবে। 'বিবেকানন্দ ভারত পরিক্রমা' নামে এই শোভাযাত্রা ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি শুরু হবে কলকাতা থেকে। একশো বছর আগে পরিব্রাজক স্বামীজী যে-পথ দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথ ধরেই এই শোভাযাত্রা বাইশ হাজার কিলোমিটার সাইকেল পরিক্রমা করে কন্যাকুমারীতে পৌঁছাবে আগামী বছরের ২৪ ডিসেম্বর। ৩৪৭ দিনের এই ভারত পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারীরা দেশের ১৮৭টি ছোট-বড় শহর এবং ৬০০ গ্রাম ছুঁয়ে যাবে। বিভিন্ন জায়গায় দেশের নানা প্রান্ত থেকে কয়েকটি 'বিবেক জ্যোতি' এই শোভাযাত্রায় যোগ দেবে। শোভাযাত্রায় থাকবে স্বামীজীর মূর্তি, ছবি, বাণী, পুস্তক এবং অন্যান্য দর্শনীয় সামগ্রীতে

সজ্জিত বেশ কয়েকটি ট্যাবলো। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক এ. বালকৃষ্ণ বলেন, 'বিবেকানন্দ ভারত পরিক্রমা'র প্রধান উদ্দেশ্য দেশের যুবশক্তিকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে জাতীয় ঐক্য রক্ষা এবং পুনর্গঠনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা। পরিক্রমার পথে বিভিন্ন স্থানে যুবশিবির, সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। সেইসব অনুষ্ঠানে পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, মাদকদ্রব্যের নেশা প্রভৃতি সম্পর্কে যুবসমাজকে সচেতন করানো হবে।

যুবসম্মেলন

বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলী, সাঁকতোড়িয়া, ডিসেরগড় (বর্ধমান) গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। উভয় দিনই সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা এবং বিকাল ২-৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত দুটি করে অধিবেশন এবং তারপর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই দিনের বিভিন্ন অধিবেশনে ও ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন স্বামী উমানন্দ, স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী দেবরাজানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রণবেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। তাছাড়া যুবপ্রতিনিধিগণের পক্ষ থেকেও বক্তব্য রাখা হয়। সম্মেলনের প্রথম দিন ২৬৩ জন এবং দ্বিতীয় দিন ২৭৭ জন যুবক-যুবতী যোগদান করেছিল। প্রথম দিন তরুণী ও যুবতী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১৫৭, দ্বিতীয় দিন ১৬০। উভয় দিনেই প্রতিনিধিরা ভাষণ দেয়। যুবসম্মেলনের পর দ্বিতীয় দিন একটি প্রকাশ্য ধর্মসভা আয়োজিত হয়। সেখানে ভাষণ দেন স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী দেবরাজানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

পরলোকে

গত ১৮ জুন '৯১ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা রেণুকা দে ১/২ বি, হেম কর লেনস্থ (কলকাতা-৫) বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও দুই পুত্র রেখে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের বসবাস-ধন্য বাগবাজারের 'লক্ষ্মীনিবাস' তাঁর পিতৃগৃহ ছিল। আশৈশব রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে লালিত শ্রীমতী দে মৃত্যুকালে 'জয় রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

☐ ২৭ ডিসেম্বর '৯১ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসবের দিন উদ্বোধন কার্যালয়ের পুস্তক-বিক্রয় বিভাগ এবং উদ্বোধন পত্রিকার গ্রাহকভুক্তি ও নবীকরণ বিভাগ খোলা থাকবে।

☐ উদ্বোধন কার্যালয়ের পুস্তক-বিক্রয় বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় (২৪ ডিসেম্বর '৯১ থেকে ৫ জানুয়ারি '৯২) এবং কলকাতা পুস্তক মেলায় (২৯ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি '৯২) অংশগ্রহণ করছে। এ-দুটি গ্রন্থমেলায় উদ্বোধনের স্টল পরিদর্শন করতে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

☐ আগামী ১—৩ জানুয়ারি '৯২ কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে উদ্বোধন কার্যালয়ের একটি পুস্তক-বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে। সেখানে উদ্বোধনের সমস্ত বই-এ ১০% ছাড় দেওয়া হবে।

☐ আমাদের সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর জন্য কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

১০ ডিসেম্বর, ১৯৯১

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

জাপানে চাকুরে মেয়েদের সমস্যা

দেখা যাচ্ছে যে, জাপানে নারী প্রতি সন্তানসংখ্যা গড়ে ১'৫৭। হয়তো এইজন্যই জাপান সরকার গত মে মাসে একটি আইন পাস করেছেন যাতে চাকরিরতা মেয়েরা গর্ভবতী অবস্থায় এবং সন্তানপ্রসবের পর বাধ্যতামূলক ভাবে বেশি ছুটি পান। চাকুরে মেয়েরা মনে করেন যে, অনেক চাকরিতে দাবি এমন যে, তাতে সন্তান প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। জাপান ইনস্টিটিউট অব উইমেন্স এমপ্লয়মেন্ট একটি পরিসংখ্যানে দেখিয়েছে যে, অফিসার স্তরে ৫৯'৩ শতাংশ মেয়ে অবিবাহিত, ৮০ শতাংশের বয়স চল্লিশের বেশি এবং ৭৪ শতাংশ নিঃসন্তান। এতে পরিষ্কার হচ্ছে যে, এইসব মহিলাদের জীবনধারা সমগোত্রীয় পুরুষদের বা অন্যান্য চাকুরে মহিলাদের থেকে পৃথক।

যদিও ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে জাপানে স্ত্রী-পুরুষের 'কর্মে সমান সুযোগ' আইন পাস হয়ে গেছে, কিন্তু কার্যতঃ সমান অবস্থা এখনো বহু দূরে। 'সমান সুযোগ' আইন সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। জাপানের সমাজ এখনো মেয়েদের পুরুষের সমান স্তরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। 'সন্তান প্রতিপালন ছুটি' আইন পাস করা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জাপান সরকার মেয়েদের সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বের বিকল্প ভাবতে পারে না। ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে জাপান সরকারের শ্রম মন্ত্রকের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, বড় বড় স্টক এক্সচেঞ্জ অফিসে আংশিক প্রধানদের মধ্যে ২'১ শতাংশ এবং বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে ১'২ শতাংশ মাত্র মেয়ে।

মহিলা অফিসারদের সঙ্গে অন্যান্য অফিস কর্মচারীদের সংঘর্ষ হয় বেশি। মেয়েরা অন্যত্র বদলি হতে চায় না। এই মানসিকতা তাদের ওপরের পদে যাওয়ার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রধান সমস্যা হলো, বেশির ভাগ বড় কোম্পানি মনে করে যে, মেয়ে অফিসারদের ওপর পুরুষের মতো নির্ভর করা যায় না। সন্তানসম্ভবা ও সন্তানবতী হলে তো এই সন্দেহটা আরও বাড়ে। ফলে নিয়োগকর্তারা চায় যে, সন্তানসম্ভবা বা সন্তানবতী মেয়েরা যেন তাড়াতাড়ি চাকরি ছাড়েন।

আর একটা মুশকিল হলো, 'কর্মে সমান সুযোগ আইন' বা 'সন্তান প্রতিপালন ছুটি' আইন —কোনটিতেই আইনভঙ্গকারীদের শাস্তি দেবার কোন কথা নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, 'সন্তান প্রতিপালন ছুটি' আইনে মা বা বাবা (parents) যে কেউ সন্তান পালনের জন্য কাজের সময় কমাতে পারেন বা এক বছর বিনা বেতনে ছুটি নিতে পারেন।

এক মহিলা, ইয়ামানেকা, তাঁর ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বললেন যে, সেখানকার কর্তৃপক্ষ স্ত্রী ও পুরুষ কর্মীদের সমান চোখে দেখে না। ব্যাঙ্কে ম্যানেজারদের মধ্যে একজনমাত্র মহিলা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মেয়েদের ইউনিফর্ম পরতে হতো এবং মহিলা কর্মীদের এখনো পুরুষ কর্মীদের জন্য চা তৈরি করতে হয়। এইসব মহিলা যাঁরা অনেক আশা নিয়ে ব্যাঙ্কে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই হতাশ হয়ে ব্যাঙ্ক ছেড়ে চলে যান।

গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে, সন্তান প্রতিপালনের জন্য মেয়েরা চাকরি ছেড়ে চলে যায় এবং সন্তান বড় হলে আংশিক সময়ের জন্য (part-time) কোন চাকরিতে নিযুক্ত হয়।

[Japan Calling, Sept. 1991, pp. 3-4]

রহড়া বালকাশ্রমের ৭০০ অনাথ, দুঃস্থ ও আদিবাসী বালকদের সাহায্যার্থে আবেদন

উদ্বোধন পত্রিকায় আমাদের পূর্বপ্রকাশিত আবেদনে আমরা সাড়া পেয়েছিলাম। যে সকল সহৃদয় মহানুভব ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য এসেছিল তাঁদের প্রত্যেককেই সকৃতজ্ঞ প্রাপ্তিস্বীকার করে পৃথকভাবে পত্র দেওয়া হয়েছে। সে সময়ে এই প্রতিষ্ঠান যে গভীর অর্থসঙ্কটে পড়েছিল, ঐ সাহায্য ছাড়া তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতো না। তাই আজ আবার ঐ উদার দানের ঋণস্বীকার করে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কিন্তু এই জাতীয় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান। তাছাড়া গত দুই বছরের মধ্যে সকল দ্রব্যমূল্যের আকাশস্পর্শী ঊর্ধ্বগতি সমস্যাকে বিশেষ কঠিন করে তুলেছে। আশ্রমের ৭০০ অনাথ, দুঃস্থ ও আদিবাসী বালকদের অতি সাধারণভাবে প্রতিপালন করা ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিছু কিছু অতি প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজও অর্থাভাবে আটকে আছে। এখন একান্ত আবশ্যক আশ্রমের জন্য একটি উপযুক্ত "স্থায়ী ফাণ্ড" গড়ে তোলা, যাতে তার একটি নির্দিষ্ট বাৎসরিক আয় নিশ্চিত হয়।

তাই আমরা উদ্বোধনের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সাহায্যের জন্য নতুন করে প্রার্থনা জানাচ্ছি। সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতিই আমাদের প্রধান মূলধন। ব্যক্তিগত সাহায্য ছাড়াও তাঁরা যদি এই আবেদনটি তাঁদের সহানুভূতিসম্পন্ন বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনদের গোচরে আনেন তাহলেও এই অনাথ বালকেরা উপকৃত হবে।

যেকোনও দান ক্ষুদ্র হলেও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তার প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। **Cheque, Bank Draft** বা **Money order** পাঠালে **Ramakrishna Mission Boys' Home** এই নামে পাঠাতে হবে। এই সকল দান আয়কর আইনের ৮০ জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত বলে গণ্য হবে।

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম
রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪৩১৮৬

স্বামী জয়ানন্দ
কর্মসচিব

আগামী ৯৪তম বর্ষের (১৩৯৮-৯৯/১৯৯২)

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য □ চুয়াল্লিশ টাকা □ সডাক পঞ্চাশ টাকা □ প্রতি সংখ্যা □ ছয় টাকা

সম্পাদকঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ — যুগ্ম সম্পাদকঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ